উপাসনা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২৪শ বর্ষ

বৈশাখ ১৩৩৬—চৈত্র ১৩৩৭

সম্পাদক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক

শ্রীকিরণকুমার রায়

কার্য্যালয়ঃ—

৩০৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক
তিন টাকা

নগদ মূল্য
চারি আনা

বর্ষ-সূচী. বৈশাখ, ১৩৩৬—চৈত্র, ১৩৩৭

অ

অগ্নিমুখী (গল্প) শ্রীনিখিলেশ রাহা, বি এ ৪২৩, ৪৭১
অঙ্গরাগ (গল্প) শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা ১৩৭
অর্ঘ্য (কবিতা) শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী, বি-এ, ৪২১
অনুবাদ-সাহিত্য শ্রীঅবিঞ্চন দাশ ৪৮৮
অনাহূত (অনুবাদ) শ্রীমতী কনক-চাঁপা মুখোপাধ্যায় ৫৭৪, ৬৫৭, ৭০৫
অন্তরীণ (কবিতা) শ্রীউপেন্দ্র মৈত্রেয় ৬৪৫
অবগুণ্ঠিতা (কবিতা) শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৩২
অনুরাগ (কবিতা) সুফী মোতাহার হোসেন ৬২৪

আ

আকাঙ্ক্ষা (কবিতা) শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ ৩৪৪
আকাঙ্ক্ষিত (কবিতা) শ্রীমতী নমিতা দেবী ৪১
আজো প্রিয়া ভুলি নাই (কবিতা) শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৩৩
আত্মকাম (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায়, বি-এ, বি-টি ৩৮৫
আর্থিক ভারত ৬১, ১২৬, ১৭৯, ২৩৪, ২৯১, ৩৭৬, ৪৩৫, ৪৯১, ৫৫০, ৬১২
আদি নর (কবিতা) শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩১৭
আলো-আঁধারি (উপন্যাস) শ্রীকিরণকুমার রায়, বি-এ, ৫৩, ৭৩, ৪৬৩
আষাঢ়ে গল্প (গল্প) শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী, এম্ এ ৫৩৫
আসঙ্গ (কবিতা) আবদুল কাদের ১৫৪
"আহরণী" শ্রীকিরণকুমার রায়, বি-এ ৭২৬
আর্ট,— বর্ত্তমান ও অতীত স্বামী বাসুদেবানন্দ ৩০৫

ই

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩৮১
ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোম্পানী লিঃ ২৩৯

উ

উপাসনার কুলজী কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ. ৪৫

এ

একটি কথা (কবিতা) শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ, বি-এ, ৫০৯
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিঃ ৪৩৫

ও

ওরিয়েন্টাল জীবন-বীমা কোম্পানী লিঃ ১২৬

ক

কন্যারাশি (গল্প) শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ৩১৮
কবিবর হাফেজ কাজী নওয়াজ খোদা ১৯
কমন্‌ওয়েলথ্ লাইফ এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩৮০
কল্যাণি (কবিতা) শ্রীদিলীপকুমার রায়, এম্-এস্-সী ৪১৫
কষ্টি-পরীক্ষা (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ ৪৯৭
কাকজ্যোৎস্না (উপন্যাস) শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল্ ২৫, ৮১, ১৩০, ২১২, ৩১৮, ৪৪৯, ৫২৭, ৫৮২, ৬৪৬, ৭১৭
কাজল (গল্প) শ্রীগিরিবালা দেবী ৯৯
কামনা (কবিতা) শ্রীসরোজবাসিনী দেবী ৬০০
কাল সে নিশুতি রাতে (কবিতা) শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ, বি-এ ১৪৪
কালোমেয়ে (গান) শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বি-এ ৩৯৭
কাব্য-পরিমিতি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ই ৫৫৪, ৬১৯, ৬৯৪
কাঁটা (কবিতা) শ্রীনিখিলেশ রাহা, বি-এ ১৯৩
কুপুত্র (গল্প) শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত ৩১১
কেবল একটি কথার জন্য (গল্প) শ্রীভীমাপদ ঘোষ, এম্-এ ৫৪৭
ক্ষণেক (কবিতা) শ্রীপ্রণব রায় ১৯৯

গ

গল্পের শেষ (গল্প) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯
গারদ (গল্প) শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ ৬৮১
গান জসীমউদ্দীন বি-এ ৮
গান শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৫০, ৮৭, ১২৯, ২০৯, ৩০৪, ৩৪৮
গান শ্রীহাসিরাশি দেবী ১০৬
গান শ্রীঅরুণকুমার সেন ২৫৯
গীত গোবিন্দ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি-এ ৪

গীতার শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ কিনা শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ৬৮
গীতায় ইন্দ্রিয় সংযম শ্রীঅনিলবরণ রায়, এম-এ, বি-এল্ ৬২৬

ঘ

ঘুমা বধূ ঘুমা (কবিতা) সুফী মোতাহার হোসেন ৫৭০

চ

"চরিত্রহীন" শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৭১৩
চোখে যদি জল আসে (কবিতা) সুফী মোতাহার হোসেন ৭২৯
চৈতী-হাওয়া (গল্প) শ্রীহাসিরাশি দেবী ৩৫২
চৈত্র-পূর্ণিমা (কবিতা) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ, বি-এল্ ৬৯৩

জ

জন্ গল্স্‌ওয়ার্দি শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব, এম্-এ, বি-এল্ ৭৩০
জসীমের কবিতার বৈশিষ্ট্য শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায় বি-এ ১২৩
জয়-পরাজয় (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ ৩৬৮
জাগো (কবিতা) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ৭২
জীবন বীমা ও অক্ষমতার সুবিধা শ্রীশরদিন্দু সাহা ৪৯১
জীবন বীমার কথা শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এল্ ১৭৯
জীবন বীমার জন্মকথা শ্রীশরদিন্দু সাহা ২৩৪, ২৯১
জীবনবীমার মৃত্যু-হার শ্রীযোগেশ দত্ত চৌধুরী ৫৫০
জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ ২৩৮

ট

টিপ্পনী ৬৩, ১২৭, ১৮৩, ২৯৫, ৬১৫

ঠ

ঠিকে ভুল (গল্প) শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী ৪০৮

ত

তাজ-পথে (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ ৬৬৩
তাজ-পরিচয় (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ ৫৯৬
তাজ হ'তে (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ ৫০৭
তাজ স্বপ্নে (কবিতা) শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ ৩৩৭
ত্রয়োদশী (কবিতা) শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত ২৪

দ

দখিণা (কবিতা) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৬
দার্জ্জিলিং (কবিতা) গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি ৩৮
দি আউয়িয়াল ডিমোক্রাটিক অ্যাসিয়োরেন্স এণ্ড মর্টগেজ লোনস লিমিটেড ৬১২
দিগন্ত (কবিতা) আবদুল কাদের ৪৬২
দীওয়ান্-এ-হাফেজ (কবিতা) কাদের নওয়াজ বি-এ ৩১, ৯০, ২৭৬, ৪৩৩
দূতী (গল্প) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ৩২
দেশীয় জীবনবীমা ২৯৪
দীপ পতঙ্গ (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ই ৬০৭

ধ

ধন্যবাদ (কবিতা) শ্রীবুদ্ধদেব বসু ১৮৫
ধর্ম্ম ও সমাজ স্বামী বাসুদেবানন্দ ৫০০, ৬৭৫
ধোঁয়া আর ধূলা (গল্প) শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ ৬৬১

ন

নখদর্পণ (গল্প) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ৩৩৮
নাট্য কথা শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ৩৭৪
নির্ব্বাপিত খদ্যোৎ (গল্প) শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত ২০০
নাগপুর পাওনিয়ার ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩৭৬
নেশা (গল্প) শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী, এম্-এ, ১৮৯
নির্ঝর (গান) শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় ৫৬৩
নিউ ইণ্ডিয়া এসিয়োরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩৮২
নুট হামসুন শ্রীনিখিলেশ রাহা, বি এ ৫৩৯

প

পরম বাণী (কবিতা) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫৩
পুস্তক-সমালোচনা ৬০, ৫৪২, ৭০৮
প্রস্থায়িনী (কবিতা) শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৪৪১
প্রতিদান (কবিতা) মোতাহার হোসেন চৌধুরী, বি-এ ২১৮
প্রাচীন ভারতের নারী শ্রীউমাশশী দেবী ১০৭
প্রিয়-পরিচয় (কবিতা) শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৩
পত্রাংশ শ্রীলীলা দেবী ৫৯২
প্রভাতের প্রেম (কবিতা) শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৬৭৬

ফ

ফটিক জল (কবিতা) শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪৮
ফারসী সাহিত্যের আলোচনা কাজী নওয়াজ খোদা ৫০৮
ফোটগ্রাফি পি, গোস্বামী, এম্-এ ৪২, ৯৮

ব

বসন্তের ব্যথা (কবিতা) শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৭
বম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩৭৯
বর্ষা সুন্দরী (কবিতা) শ্রীঅবনীকুমার দে ২১০
বসন্ত শেষে (কবিতা) সুফী মোতাহার হোসেন ৩৮
বাঙ্গলা বার ব্রতের ছড়া শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
ও বাঙ্গালী ১৫৫
বাঙ্গালা সাহিত্যে সনেট শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৪৭৮
বাসন্তী জ্যোছনায় (কবিতা) শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ ১১১
বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ ৪৯৬
বিজয়িনী (কবিতা) শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ, বি-এল ৪৪
বিরহিণী প্রিয়া (কবিতা) শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ৬৫
বিবাহ-বন্ধন ও শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু যুবক
ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্ ৬৮৮
বিদুরবাণী (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ৩১০
বীমা-ব্যবসায়ে ধনবিনিয়োগ শ্রীপ্রাণবন্ধু মুখোপাধ্যায় ৬১
বিষ-বসন্ত (কবিতা) শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ, বি-এ ৭০১
বিজয়িনী (গল্প) শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪৫
বিনিদ্র রজনী শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি-এ ৪৪৩
বৈশাখে (কবিতা) শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ ৭৬
বৈষ্ণব কবি বসন্তকুমার শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১৯৫
বিচিত্রা (কবিতা) শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ ৫২৫
বিশ্ববাণী শ্রীনিখিলেশ রাহা, বি-এ ৫৩৯
বিশ্ববাণী শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ৫৯৫

ভ

ভালবাসি (কবিতা) শ্রীশিশির ঘোষ ১২২
ভাঙ্গন (উপন্যাস) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২,
১৬১, ২২৩, ২৬৬, ৪১৬, ৪৮৬, ৫১৯, ৬০৮, ৬৫৩, ৬৯৭
ভালবাসা (কবিতা) সুফী মোতাহার হোসেন ৪১৪
ভোলানাথের জীবনী (গল্প) শ্রীপরিমল গোস্বামী, এম্-এ ৯২
ভাবাদর্শে সর্ব্বজাতির ঐক্যসাধন স্বামী বাসুদেবানন্দ ২৭৭

ম

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ২৬০, ৩৯৪
মহানন্দ মঠ (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ ২৪১
মহামতি বার্ট্রাণ্ড রাসেল শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায়, বি-এ ৩৯৪
মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ ৩৯, ৭৭, ৪৭০
মাইকেল শ্রীঅবনীনাথ রায়, বি-এ ৩৪৫
মানব, দানব ও প্রেম শ্রীমতী উমাশশী দেবী ১৮৭
মাদকদের আনন্দ (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ৪০৭
মায়ের দান (গল্প) শ্রীমতীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৫০
মা ও ছেলে (কবিতা) শ্রীনিখিলেশ রাহা, বি-এ ৩৫৬
মুক্তিধূম (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ঈ ২৯৭
মাঝি (কবিতা) শ্রীবসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৪৪৮
মরুর মায়া (বড় গল্প) শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৪, ৬৬৪
মূল্যের কথা শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়, বি-এ ৫৭১
মরাবিল (কবিতা) শ্রীহিরন্ময় মুন্সী ৫৯৪

য

যাত্রার দল (কবিতা) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্-সী ৫৩৭
যোগেন্দ্রচন্দ্র মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম্-এ, এম্-এল্-সী ৩০১

র

রঘুনাথ ও রঘুনন্দন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ ৬৪২
রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম শ্রীসতীশ রায় ২১৯
রাতের তলে (কবিতা) শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ ১২৫
রামদা' (গল্প) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২৮
রূপজীবিনী শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ ৬১৭

শ

শরতে (কবিতা) শ্রীসুফী মোতাহার হোসেন ৩২৭
শারদীয় পল্লীপূজা শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়, বি-এ ৩৪৯
শিলং (ভ্রমণ কাহিনী) শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ৩৮৭, ৫১১,
৫৯৭, ৬৬৮, ৭০৩
শিশু (কবিতা) মোতাহার হোসেন ১৭৩

স

সমসাময়িক সাহিত্য ৫৭, ১৭৪, ২৮৮
সহজ পাওয়া (কবিতা) কুমারী জ্যোৎস্না বসু ১৩৬
সুন্দরবনের গান (কবিতা) শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ঈ ১
সম্পাদকের কৈফিয়ৎ ৩৭৩
সন্দেহভঞ্জন (গল্প) শ্রীগিরিবালা দেবী ৩৫৯

সাময়িক প্রসঙ্গ		৩৭০
সাম্যবাদী (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	৫৮০
স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	৪৮
স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	৫১
স্বপ্ন-অভিসারিক (সনেট)	শ্রীরিয়াজউদ্দিন চৌধুরী	২১৮
স্বপ্ন ও জীবন (গল্প)	শ্রীফণীন্দ্র পাল	৫০৪
সেকেলে গল্প	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-ই	৪৪৫
স্বপ্নস্মৃতি (গল্প)	শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা	৫৪৫
সংসারে ও সমাজে বঙ্গনারীর কর্ত্তব্য	কুমারী শোভনা ঘোষ	১৪৬
সংস্কার (গল্প)	শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ	২৮৪
সন্ধানা (কবিতা)	শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর	৫১৫
সন্ধান (গল্প)	শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ	৫১৬
সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৫১৫
সোণার তাল (কবিতা)	শ্রীভূদেবচন্দ্র শোভাকর, বি-এ, বি-ই, এ-এম-আই-সী-ই,	৬৪৪
সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়	মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্রনন্দী, এম্-এ, এম্-এল্-সি	৬৬১

হ

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিয়োরেন্স লিঃ		১৮২, ৩৭৭
হোমিওপ্যাথি (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৬৩০

"হে দুর্দ্দম, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণ-পুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।"
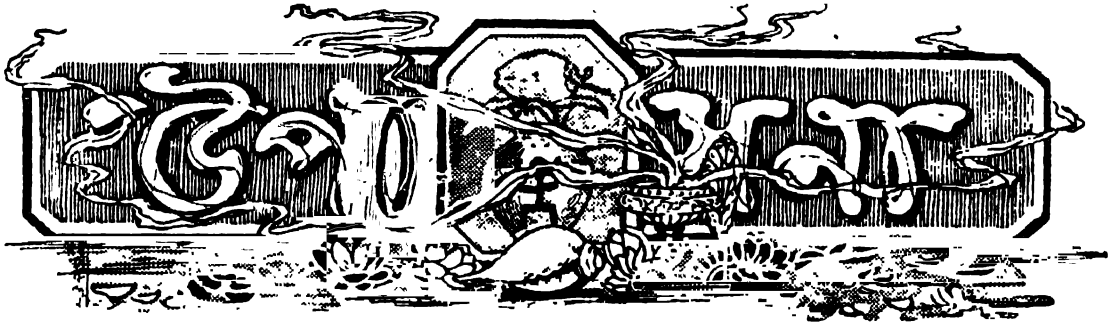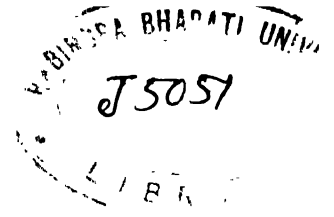
২৩শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৭ | ১ম সংখ্যা

সুন্দরবনের গান

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রেমের লাগি' দেশ ছেড়েছি, শোন বন্ধুবর!
প্রিয়ার সাথে বেঁধেছি ভাই সুন্দরবনে ঘর।
সুন্দরবনে বাস আমাদের, সুন্দরবনে বাস;—
ভেরি বেঁধে' নোনাপানি ঠেকাই বারোমাস।

সুন্দরবনের চর গো বন্ধু, নুন-দরিয়ায় ঘেরা,—
তারি মাঝে মিঠে পানি সকল পানির সেরা।
'গেঁয়ো'র খুঁটি, 'বাণী'র রুয়ো, 'হাঁতাল' কেটে' ছড়,
উলু খড়ের ছাউনি দেওয়া মোদের কুঁড়ে ঘর।

উলু খড়ের ছাউনি চালে, উলু খড়ের ছাউনি,—
তারি তলে কেঁপে' জ্বলে পিয়ার চোখের চাউনি।

বনে জ্বলে বুনো আগুণ কালা-জঙ্গল-পার,—
পিয়া করে আমার তরে শনিমঙ্গলবার।
'সুন্দ্রী' গাছে মাচান্ বেঁধে কাটাই চৈতি রাতি
দখিন্ হাওয়ায় নেবে জ্বলে দূর দরিয়ার বাতি
বনে ডাকে বনের বাঘা আগা-গোড়া ডোরা;
হাঁতাল-ঝোপে ময়াল সাপে ধরে 'দাঁতাল বোরা'
চরের পাখী হঠাৎ ডাকি' ঘুরে' উড়ে যায়।
সাঁতার কেটে' কুমীর উঠে' জোচ্ছনা পোহায়।
চমকে চেয়ে থমকে দাঁড়ায় ভীতু হরিণ দল,—
দুর-দুরিয়ে ছুটে' পালায় কাঁপিয়ে জঙ্গল।
চাঁদের ঝোঁকে জোয়ার ঢোকে সোঁদর গাঙে গাঙে,—
ভাঙ্গন-মুখে সুন্দুরী গাছ কেঁপে কেঁপে ভাঙে।
দখিন্ হাওয়ায় জোয়ার লাগে জংলা গাছের তল্,—
তটের বুকে ঢেউএর সুখে তল্-তলাতল্ তল্।
হেথা, পাপিয়া পিক্ কাঁদায়না দিক্ চাঁদ্নি আকাশ ভ'রে,
সাগর-কূলে আগড় খুলে' দখিন্ হাওয়াই ঘোরে
সাগর-পারের স্বপন এনে' গাঙে সে ভুলায়;
গাঙ্-কপোতীর সাথে সাথে সোঁতে ভেসে যায়।
দখিন্ হাওয়া, দখিন্ হাওয়া, মাতল হয়েছে রে!
পালের তরীর আঁচল ধরি' গাঙে গাঙে ফেরে।
কাঁচা বনের সবুজ কাঁচল টানে দখিন্ হাওয়া;—
পিয়ার পিঠের এলোকেশে আমার তনু ছাওয়া!
দেশের শেষে সুন্দরবন রে, দখিন্ হাওয়ার দেশ,—
চোখে মুখে ঝাপট্ লাগে পিয়ার এলোকেশ!
এদেশের মৌমাছিরা কেবল পদ্মমধুই খায়,—
পিয়াসী আমারে পিয়া অধর পিয়ায়।
লোলুপ দিঠি পিয়ার মুখে উড়ে পাকে পাক,—
পদ্মবনের মৌমাছি বা পদ্মে বাঁধে চাক!

সুন্দরবনে বাস গো বন্ধু, সুন্দরবনবাসী ;
নোনাপানি ঠেকিয়ে মোরা এক ফসলের চাষী।
মিছে আমায় ডাকো বন্ধু, মিছে ফিরে ডাকো,
তার চেয়ে ভাই তুমিই মোদের অতিথ হইয়ে থাকো।
তোমার সাথে বাইনু প্রাতে গাইনু কাঁদন্ গান,
টানা পথের বাঁকে বাঁকে ছিল ভাঁটার টান।
মোহানাতে দেখি—একি উজান বহে বারি!
সাধে কি হইনু রে বন্ধু সুন্দরবনচারী!
ফিরিতে কোয়োনা গো আর, ফিরে যেওনাকো ;
দুখের বন্ধু সুখের ভাগী অতিথ হইয়ে থাকো।
থেকে যেও, দেখে যেও, ভাদর অমার রাতে,—
—ষাঁড়াষাঁড়ির বানে সাগর গাঙে যখন মাতে—
আমি দাঁড়ে পিয়া হালে, থাক্‌বে না আর কেউ,
এই সুন্দ্‌রী কাঠের নায়ে কাট্‌বো কালাপানির ঢেউ! *

* প্রত্যেক কবির কবিতা রচনা কালীন স্বকীয় একটি পদ্ধতি, একটি ভঙ্গী থাকে। কবি যতীন্দ্র নাথের নিজস্ব ভঙ্গী হইতেছে, কবিতার কলি যখন মাথায় আসে, তখন তাহাকে বার বার মন্ত্রের মত সুরে ভাঁজা। এই কবিতাটি পড়িতে গিয়া প্রত্যেক পাঠকই তাঁহার সেই ভঙ্গীর কথা মনে রাখিলে, কবিতাটি পাঠ করিতে সুবিধা হইবে। কেননা, কবিতাটি ছড়ার সুরে না পড়িলে, ইহার অনেক স্থানে ছন্দে পড়িতে বাধিয়া যায়। ঠিক এই কারণে প্রাচীন অনেক কবির রচনা পড়িতে গিয়া আমরা মুস্কিলে পড়ি, পড়িতে গিয়া প্রত্যেক পদে পদে ছন্দোবোধে আঘাত পাই। ইহার কারণ এ নয় যে তাঁহাদের ছন্দোবোধ ছিল না, ইহার কারণ এই যে তাঁহাদের সমস্ত কবিতাই সুরে রচিত—এ বিষয়ে তাঁহাদের আরও একটি সুবিধা ছিল এবং আজও আছে এই যে তাঁহাদের কবিতা সকলেই সুর করিয়া পড়িত, এখনও সেই ভাবেই পড়ে। নহিলে ধরিলাম বিদ্যাপতির একটি কলি—

অপরূপ রূপ রমণী মণি
যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী

সুরে না পড়িলে, ছন্দ রাখিয়া পড়া যায় না। সুরে যাহার জন্ম তাহা সুর করিয়া পড়িতেই হইবে—যতীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি পড়িবার সময়, সুরে ইহার জন্ম,—এই কথাটি মনে রাখিলেই ইহার ঝঙ্কার উপলব্ধি হইবে।—উঃ সঃ।

গীত-গোবিন্দ

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

তখন স্বদেশী যুগের হাওয়া পুরো দমে বইচে আমরা সবাই তখন আনন্দ মঠের সন্তান। আনন্দ মঠ আর গীতা পকেটে না থাক শয্যার পাশে বিরাজ করত, আনন্দ মঠের 'হরে মুরারে' আর 'প্রলয় পয়োধিজলে'র সঙ্গে সঙ্গে তখন জয়দেবের নাম আমাদের কানে এসে পৌঁছাল। সুতরাং জয়দেব যে একজন অসামান্য ব্যক্তি সেই কথা মনে বদ্ধমূল হ'তে আর দেরী হ'ল না। অথচ আমরা যে দিক দিয়ে তাঁকে অসাধারণ জ্ঞান করেছিলাম সে দিক দিয়ে তাঁর খোঁজ করাটা তখনকার দিনে নিরাপদ ছিল না। আমার এক বন্ধু অনেক ক'রে 'দেশের কথা' আর 'যুগান্তর' সংগ্রহ করেছিলেন, তিনিই জয়দেবেরও খোঁজে লাগলেন। একদিন কোন এক দোকান থেকে তো জয়দেবের গীত গোবিন্দ একখণ্ড কিনে পকেটে পুরে একেবারে সোজা আমার এখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ—বাঙলা অনুবাদ সহিত—উদ্ঘাটিত করে বন্ধু পড়া সুরু করলেন। আমার বয়স তখনো গীত-গোবিন্দের রস গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট হয়নি, আমার বন্ধুটির হয়েছিল। কিন্তু তিনিও তখন দেশ সেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। কয়েক মিনিট পরেই বেশ ক্রুদ্ধভাবেই গীতগোবিন্দের বক্ষ একেবারে বিদীর্ণ করে ফেললেন; দশাবতার স্তোত্রের নৃসিংহাবতারের অভিনয় হয়ে গেল। ঘটনাটা প্রাণে লেগেই রইল।

তারপর 'সন্তান' ব্রত শেষ হয়ে গেল একদিন নানা ঘটনার স্রোতে; আবার আমরা সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে এলাম। তখন আরেক বন্ধুকে সাথী করে গীত গোবিন্দ পড়া সুরু করা গেল। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার বর্ণনা শ্রবণ করে মানুষের মঙ্গল হবে ব'লে আশ্বাস দিয়েচেন সেই সব লীলা পাঠ করতে করতে অগ্রসর হওয়া গেল। বইখানা পড়ে তাতে যে খুবই মঙ্গল হবে এমন কোনো ভরসাই হ'ল না বটে কিন্তু পাঠে অরুচিও হ'ল না যদিচ লজ্জা হতে লাগল।

তারপর কীর্ত্তনের আসর এল। সেখানে ঘন ঘন জয়দেবের নাম হ'তেই বৈষ্ণবদের করযোড়ে প্রণাম দেখলাম এবং জয়দেবের সেই সব মঙ্গলকারী শ্লোকরাশির আবৃত্তি এবং সটীক এবং স-'আখর' ব্যাখ্যা বাঙলায় শুনতে লাগলাম। সভার সাধু পুরুষেরা তাতে কখনো অশ্রুপাত কখনো গদ্‌গদ্ আহাধ্বনি করতে লাগলেন। বিস্ময়ের অন্ত রইল না। বিদ্যাসুন্দরকে সবাই বললে অশ্লীল অথচ গীত-গোবিন্দকে সবাই ধর্ম্মগ্রন্থ বলে প্রণাম করলে এটা অদ্ভুত লাগল। এর পরও অদ্ভুত ছিল। একদিন শুনলাম গীত-গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের এত প্রিয় ছিল যে এর শ্লোক শুনতে শুনতে তাঁর নাকি পুলক রোমাঞ্চ হ'ত। এর পর আর বুদ্ধির ওপর আস্থা রইল না স্পষ্টই বুঝলাম যে গীত-গোবিন্দ বোঝা সহজ বুদ্ধির কাজ নয়। অতঃপর অধিকারী ভেদের গূঢ় তত্ত্বের ওপর অসাধারণ শ্রদ্ধা অনিবার্য্য হয়ে পড়ল। মনে করলাম শ্রদ্ধা বিশ্বাসের চাইতে বড় কি-ই বা আছে। শ্রীচৈতন্য হেন যুগাবতার যাকে এত ভালো বেসেছেন, যে চৈতন্য স্ত্রীলোকের কাছ থেকে ভিক্ষা নেবার অপরাধে শিষ্যের মুখদর্শন করেন নি তিনি যখন জয়দেবের গীত-গোবিন্দকে এত সমাদর দিয়ে গেছেন তখন আমার মত নগণ্যের পক্ষে সেই গীত-গোবিন্দকে··· বলতে যাওয়াটা অশ্লীল লেখার চাইতেও বড় অপরাধ। সুতরাং স্থির মনে করলাম যে লঙফেলো ঠিক বলেছেন 'Things are not what they seem'. আপাত দৃষ্টিতে গীত-গোবিন্দ যাই হোক এর সত্যকার অর্থ এত গভীর যে তা সাধারণের অবোধ্য। একেবারে স্থির করে ফেললাম যে এখানে বিশ্বাসই একমাত্র পথ।

এরপর কীর্ত্তনীয়ার মুখে নির্ব্বিকার ভাবে গীত-গোবিন্দের লীলা বর্ণনা শুনতে লাগলাম। হঠাৎ দৈবক্রমে একজন কীর্ত্তনীয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যিনি গীত-গোবিন্দকে নতুনভাবে দেখবার পথ খুলে দিলেন। তিনি সেদিন 'দানখণ্ড' গান করছিলেন; শ্রীরাধিকার আত্মদানের যে বর্ণনা সেদিন আসরে দেওয়া হয়েছিল তা বহু সাধু পুরুষের কর্ণে সুধাবর্ষণ করেছিল, কিন্তু আমার কানে সেটা কেমন

যেন বড় বেশি স্থূল মনে হ'তে লাগল। আমি জানি সে বর্ণনা যদি কাগজে তুলে দেওয়া যায় আর তার পাত্র পাত্রী যদি রাধা কৃষ্ণ না হয়ে 'পরেশ' এবং 'লীলা' হয় তা হ'লে পরে লেখককে আইনের জালে জড়িয়ে কিছুকাল মনস্তাপ পেতেই হবে। কীর্ত্তনীয়া বোধ করি বলতে বলতে বর্ণনার এই মোটা সুরটায় নিজেও একটু কেমন অনুভব করছিলেন। কারণ তখনি তিনি অনধিকারীদের অপবিত্র মনের দিকে ইঙ্গিত ক'রে যথেষ্ট কটুক্তি বর্ষণ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন·· যাক্ যা বলতে লাগলেন তা লিখতে গেলে বাধবে; ফল কথা তিনি বলতে লাগলেন যে অপবিত্র মনে যেগুলোকে আমাদের কামোপভোগের ব্যাপার বলে বোধ হচ্চে সেগুলো বাস্তবিক অতি উচ্চাঙ্গের কথা; ও বর্ণনা-গুলো হচ্চে রূপক; শ্রীরাধা যা দান করচেন সে হচ্চে সেবা, ভক্তি, প্রীতি ইত্যাদি। মনে মনে ভাবলাম হযত হবেও বা। আবার জয়দেব ধরা গেল। শ্লোকের পর শ্লোক পাঠ ক'রে তাতে আধ্যাত্মিক রূপক লাগানোর চেষ্টা করা গেল। কিন্তু সে অসাধ্য চেষ্টা; বার বারই মনে হ'ল গীত-গোবিন্দের আর যাই অর্থ হোক্‌না ও রূপক নয়; রতি কেলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাকে যে কেমন করে আধ্যাত্মিক রূপকে পরিণত করা যেতে পারে তা সেদিনও যেমন বোধগম্য হয়নি তেমনি এত কাল পরেও না।

কিছুকাল পূর্ব্বে কোনো এক বন্ধু 'উজ্জ্বল নীলমণি' নিয়ে এসে হাজির। বহুকাল থেকেই শুনে আসছিলাম যে ওখানা বৈষ্ণব রসগ্রন্থের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বন্ধু বইখানি আগাগোড়া পড়ে তার নানা রকমের নায়ক নায়িকা ভেদ, তাদের নানা প্রকারের সম্ভোগাদির বর্ণনার কথা আমায় শোনালেন। এসব শোনার পর আধ্যাত্মিক রূপক একেবারে শূন্যেই মিলিয়ে গেল; মনে হ'ল যদি রূপকই মাত্র লক্ষ্য হ'ত তাহ'লে নায়ক নায়িকা এবং তাদের সম্ভোগাদির এত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক এবং দেহতাত্ত্বিক বর্ণনা দেবার প্রয়োজনও হ'ত না এবং এতটা করা সম্ভবও হয়ত হ'ত না। তাই মনে হ'ল যে বৈষ্ণব রস শাস্ত্র এবং পরকীয়াতত্ত্বকে যৌনবিজ্ঞানেরই একটা উচ্চ অঙ্গ ব'লে ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে এও বলতে হবে যে বৈষ্ণবেরা দৈহিক সম্বন্ধের মাঝ দিয়েই কোনো একটা অপরূপ উপলব্ধিকে সম্ভব ক'রেছিলেন। এ ছাড়া বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের এবং পদাবলীর ধর্ম্ম সঙ্গত কোনো মানেই হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে আমার উক্ত বন্ধুবর বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোনো একজন পণ্ডিতের কাছ থেকে আরেকখানি পুস্তিকা এনেছিলেন, তিনি বইখানি দিয়ে মৃদু মধুর হেসে আমায় বললেন, বন্ধুবর এই বইখানিতে রসতত্ত্বের অনেক গুহ্য কথা রয়েচে; বইখানি দুষ্প্রাপ্য, ইঁদুরের মুখ থেকে উদ্ধার করা হয়েচে, পড়ে দেখবেন। বইখানির নাম দেখলাম 'স্বরূপ কল্পতরু'। বইখানি স্বরূপ গোস্বামী লিখেচেন এবং যাতে সাধারণ লোকের অর্থাৎ অনধিকারীর কানে ওর কথা না পৌঁছায় তার জন্য বার বার সতর্ক ক'রে তবে তিনি তাতে নিগূঢ় রসতত্ত্ব নিয়ে গোপন সাঙ্কেতিক ভাষায় আলোচনা করেচেন। সহজিয়া এবং বাউল সম্প্রদায়ের গানে ছড়ায় আমরা যেমন কতকগুলো সাঙ্কেতিক কথার ভঙ্গী পাই এতেও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে তেমনি ভাষায় আলোচনা রয়েচে। চণ্ডীদাসের সহজ সাধন সম্বন্ধে যে সব রাগাত্মিক পদ আছে স্বরূপ গোস্বামী তার চেয়েও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এই ছোট্ট বইখানি লিখেচেন। এক কথায় বইখানির বক্তব্য বিষয় কিছুই বুঝতে পারিনি' তবে সমস্তটা পড়ে যে কয়েকটি কথা মনে হয়েচে তাই এখানে বলবার চেষ্টা করব এবং পাঠকদের মাঝে আর কেউ যদি বইখানি পড়ে থাকেন এবং বেশী কিছু বুঝে থাকেন তাঁর কাছ থেকে শোনার আশা করব।

বইখানি পড়ে হঠাৎ মনে হতে পারে যে হয়ত চৈতন্য দেবকে হেয় করবার উদ্দেশ্যে কেউ এই বইখানা লিখেচে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে বইখানি একজন সত্যিকার ভক্তের লেখা। কারণ লেখক বার বার চৈতন্য নিত্যানন্দকে এই গূঢ় রসের গুরু বলে স্বীকার করেচেন। এবং ওই দুর্ব্বোধ্য ভাষার ফাঁকে ফাঁকে এমন সব উক্তি বইখানিতে রয়েচে যাতে বইখানিকে নিতান্ত অর্থহীন এবং বাজে বলতে সাহস হয় না। বইখানি আমার কাছে নেই, তা না হ'লে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে দিতাম, আপাততঃ তা সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ বইখানির মধ্যে চৈতন্য দেব এবং তাঁর জীবনকে একটা নূতন দিক দিয়ে দেখা হয়েচে, নতুন বললে ঠিক হয়

না, একেবারে অভিনব ইংরাজিতে যাকে বলে startling. স্বরূপ গোস্বামী তাঁর পরম গুরু চৈতন্য দেবকে বার বার 'কপট সন্ন্যাসী' বলে প্রণাম ক'রেচেন। এই কথাটা পড়েই আমার মনে হয়েছিল যে এ একখানি ব্যঙ্গ কবিতার বইমাত্র। কিন্তু পরে দেখা গেল তা মোটেই নয়। তিনি বলতে চেয়েচেন এই যে চৈতন্যদেব পরকীয়া রস সাধনার উদ্দেশ্যেই স্বকীয়াকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজেছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না! তার পর চৈতন্য চরিতামৃতেরই বোধ করি নজির তুলে দেখিয়েছেন যে তিনি কোন্ গ্রামে গিয়ে কিছুকাল পরকীয়া রস সাধনা করেছিলেন। কথাটা এই পর্য্যন্ত ব'লে মনে হচ্চে এ না বলাই বোধ করি ভালো ছিল। কারণ এ থেকে মনে হতে পারে স্বরূপ গোস্বামীর নামকে আশ্রয় ক'রে চৈতন্য দেবের নামকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করচি। যদি কেউ এ কথা মনে করে' থাকেন তা হ'লে সেটা নিতান্ত ভুল মনে করা হবে। আমি যে কথাটি বলতে চাই তা বলতে হ'লে কোনো কথাকেই চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করি পাঠক একটু ধৈর্য্য ধ'রে এর পরবর্ত্তী কথাগুলো বিবেচনা করবেন।

পাঠকের হয়ত মনে আছে যে আমি সূত্রপাতেই গীত গোবিন্দের কথা—অর্থাৎ বৈষ্ণব রস পদাবলীতে যৌন ধর্ম্মাশ্রিত দেহতত্ত্ব ঘটিত আলোচনার আধিক্যের কথা নিয়েই আলোচনা সুরু করেচি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেবও যে গীত-গোবিন্দকে সাগ্রহে শুনতেন এবং তার ভাবে বিভোর হ'তেন সেই কথাও ব'লেচি, এবং এ কথাও পরে বলবার চেষ্টা করেচি এই ভালো-লাগাকে গীত-গোবিন্দের রূপকাত্মক অর্থ দিয়ে বোঝা যায় না। সুতরাং চৈতন্যদেব গীত-গোবিন্দকে যে অন্য কোনো ভাবে বুঝেছিলেন সেই সম্ভাবনা বেশী; স্বরূপ গোস্বামী মহাশয় পরকীয়া-রসতত্ত্বের যে আলোচনা করেচেন এবং তাতে চৈতন্যদেবকে যে স্থান দিয়েচেন তাতেও সেই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়।

এখন একটু অবান্তর দুয়েকটা কথা সেরে নিয়ে আবার আমি এই আলোচনায় ফিরে আসতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই বাঙলার প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীকারদেরই উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন এবং বৈষ্ণব ভাবের সঙ্গে তাঁর ভক্তি ভাবাত্মক কবিতার ভাবসাদৃশ্য দেখিয়ে সেই কথাটি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। যখন রবীন্দ্রনাথ গেয়েচেন,—

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
আমার সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার ভবন দ্বারে

কিম্বা যখন গেয়েচেন,—

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে
তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

—তখন সেই আত্ম-নিবেদনের ব্যাকুলতায় আমাদের বৈষ্ণব প্রাণের আকুলতাই মনে এসেচে। এমনি ধারা রবীন্দ্রনাথের অগণিত কবিতায় মিলন-তৃষ্ণা, মিলন-কাতরতা জীবন-দেবতার সঙ্গে মিলনের আনন্দ কতভাবেই প্রকাশ পেয়েচে এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব ভাবের ভাবুক বলতে কোথাও আমাদের দ্বিধা হয়নি বরং মনে হয়েচে রবীন্দ্রনাথে এসে যেন আত্মার মিলন-কামনা আরো spiritualised—দৈহিকতা মুক্ত মানসিক আবেগের গভীরতা লাভ করেচে। বৈষ্ণব পদাবলীকার মিলন বর্ণনা করতে গিয়েই যেন দেহের স্তরে নেমে এসেচেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো যেন দেহের স্থূলতার মধ্যে নামতেই চান্ নি, তিনি যখনি মিলনের আনন্দে মগ্ন হয়েচেন সে যেন দেহমুক্ত শুদ্ধ মানস লোকে। বৈষ্ণব কবিতার সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভক্তি ভাবাত্মক কবিতার সুরের এইখানে একটা বড় রকমের ভেদ রয়েচে। অনেকে এই প্রভেদটাকে শুদ্ধমাত্র রুচিগত প্রভেদ দিয়েই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবেন জানি; তাঁরা বলবেন সেই যুগের কথাবার্ত্তায় শ্লীলতা যেমন আজকের মত মার্জ্জিত ছিল না তেমনি কবিতায় ভাব প্রকাশও অনেকটা স্থূল ব্যাপার দিয়েই করা হ'ত। যাঁরা এই ব'লেই রবীন্দ্রনাথের এবং বৈষ্ণব পদাবলীকারদের পার্থক্যটাকে মেটাবার চেষ্টা করতে চান তাঁদের মতে সায় দিতে পারি না।

এখানে সে সম্বন্ধে আপাততঃ বিস্তৃত কোনো আলোচনা না ক'রে এই কথাটিই বলতে চাই যে বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণবদের নিকট কেবল কাব্য ছিল না—এমন কি কাব্য বলতে আমরা ইংরাজী শিক্ষিতেরা যা বুঝে আসচি মোটেই তা ছিল না। বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণবদের নিকট একটা সত্য বস্তু, সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবির সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েচে। রবীন্দ্র কবিতা কোনো একটা বিশেষ সাধন-পদ্ধতির ফল নয়; অথচ বৈষ্ণব কবিতার সর্ব্বত্র এই সাধন-পদ্ধতির কথা রয়েচে। চণ্ডীদাস যে সহজিয়া-সাধনের কথা বলেচেন এবং রামীর সঙ্গে তাঁর যে পরকীয়া রস সাধনার কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেচেন, আমার মনে হয় সেই সাধনার মর্ম্মকথা না বুঝতে পারলে বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মূল্য কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না।

সহজিয়া এবং বাউলদের ছড়াগান আলোচনা করলে পরে একটা জিনিস চোখে পড়ে। আমাদের দেশে দেহতত্ত্ব ব'লে একটা আশ্চর্য্য জিনিস ছিল এবং বোধ করি এখনো তা কেবল কথায় পর্য্যবসিত হয় নি। এই দেহতত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্য Physiologyর বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না; কিন্তু তা বলে দেহতত্ত্বটা যে মিথ্যা এ কথাও বলা চলে না। কারণ এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই সমস্ত রস সাধনাটা গড়ে উঠেচে দেখা যায়। স্বরূপ গোস্বামী তাঁর কল্পতরুতে এ নিয়ে এত বেশি সাঙ্কেতিক আলোচনা করেচেন যে এই তত্ত্বকে তা থেকে বাইরের লোকের বোঝা মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর আলোচনা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি দৈহিক ব্যাপারের মাঝ দিয়েই এক অতি বিচিত্র রস সাধনার কথা বলেচেন। এবং চৈতন্য দেবও যে দেহকে আশ্রয় করেই লীলারসকে উপলব্ধি করেছিলেন সেই কথাও স্বীকার করেচেন।

যে-বৈষ্ণব সাহিত্য আগাগোড়া কাম থেকে প্রেমকে একান্ত ভিন্ন ব'লে প্রচার করেচে তাতেই যখন আবার আগাগোড়া কামক্রীড়ারই বিশদ বর্ণনা পাই তখন বুঝতে হবে যে দৃশ্যতঃ কাম-লীলা হ'লেও বৈষ্ণব সাধনা একে কোনো না কোনো ভাবে একটা রূপান্তর দান করেছিল। এই রূপান্তরের তত্ত্ব, এই উর্দ্ধায়নের তত্ত্ব বৈষ্ণব-সাধনার গোপন কথা, সে কথা কোথাও কেউ প্রকাশ করেচেন বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যখন ভক্তির গান গেয়েচেন তখন তিনি আমাদের দৈহিক সত্তাকে ভুলিয়ে দিয়ে মানস-সত্তার জগতে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে যে কিছু দরশ-পরশ যে কিছু সম্পর্ক সবই মনোময় হয়ে উঠেচে। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব সাধনা বলেচে যে যদি কোনো রসময় সত্তার সঙ্গে আমার মিলন হয় তবে তা শুধু মানস-লোকে নয়, তা হবে আমারই ভৌতিক দেহের সমগ্রতায়। তাই বৈষ্ণব দৈহিক মিলন বর্ণনার কোনো খুঁটি নাটিই বাদ দেননি—কারণ তাঁর নিকট স্থূল, মলিন ব'লে কিছুই থাকেনি, স্বরূপ-রসের পরশ-পাথরের স্পর্শে দেহ মন ইন্দ্রিয় সব এক আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় সত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে—সেখানে দেহ মন সবই সার্থক হয়ে গেছে, সমস্ত প্রেরণাই পরম শুদ্ধতা এবং অখণ্ডতা লাভ করেচে। এই স্বরূপ লীলা সাধনায় চৈতন্যদেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই গীত-গোবিন্দ শুনতে তাঁর কোথাও চক্ষু লজ্জা ছিল না।

গান

[শ্রীজসীম উদ্‌দীন]

(বন্ধের গানের সুর)

ও তুই যারে আঘাত হানলি মনে
সেজন কি তোর পর,
সেত তোরি তরে কেন্দে কেন্দে
বেড়ায় দেশান্তর—
রে পরাণ বন্ধু।

তোরি তরে সাজাইলাম মনফুলের ঘর
ও তুই ভ্রমর হয়া হানলি কাঁটা সেই না ফুলের পর,
রে পরাণ বন্ধু।

এক ঘরেতে লাগলে আগুন পোড়ে অনেক ঘর
মনের আগুন মনেই পোড়ে নাই কোন দোসর
রে পরাণ বন্ধু।

আগে যদি জানতাম রে তোর রূপে আগুন জ্বলে
রূপ থুইয়া আগুনের মালা পরিতাম নিজ গলে
রে পরাণ বন্ধু।

চিতার আনলে ঝাপ দেয় যেই জন
ও তার দেহও পোড়ে মনও পোড়ে পোড়ে তার ক্রন্দন
রে পরাণ বন্ধু।

রূপের আনল মনেই লাগে, লাগে না কোর গায়
ও সে মনে মনেই মন জ্বালায় কেউ নাহি টের পায়,
রে পরাণ বন্ধু।

গায়ে যদি হানতি আঘাত ওসুধ দিতাম ঘায়
মনের আঘাত মনেই থাকে ঔষধে না যায়,
রে পরাণ বন্ধু।

তীর যদি বেন্দে গায়ে তাওত তোলন যায়
কথার আঘাত কোথায় লাগে কেউ নাহি টের পায়
রে পরাণ বন্ধু।

গল্পের শেষ

[শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়]

১

অমূল্যর স্ত্রী তাহার স্বামীকে মোটেই বিশ্বাস করিত না। তর্ক উঠিতে পারে—এ আর নূতন কথা কি? - কোন স্ত্রীই বা এত মূর্খ কিম্বা এত দরাজ যে আপনার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকে?—কথাটা খুব সত্য এবং পৃথিবীর স্বামী সাধারণের সহিত সমভাবে অর্জ্জিত অমূল্যর এই দুরদৃষ্টটুকুর কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতাম না। তবে নাকি শ্রীমতী কাদম্বিনী যে কাণ্ডটুকু বাধাইয়া বসিলেন এই প্রচ্ছন্ন কূট মনস্তত্বটুকুই ছিল তাহার মূল হেতু, সেই জন্য এই ইঙ্গিত দিয়া রাখিলাম।

অমূল্যর একটু দোষ ছিল '...তবে দোষের কথা যখন উঠিলই তখন অমূল্যর বন্ধু সাতকড়িও ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে;—আবার সাতকড়িকে টানিতে গেলে তাহার বিদুষী স্ত্রী কনকলতাও আপনা আপনিই লিপ্ত হইয়া পড়েন; কারণ তিনি যদি···

কিন্তু সে কথা এখন থাক্; অমূল্যর কথাই বলি। অমূল্যর দোষ সে সাহিত্য চর্চ্চা করিত। অবশ্য নিক্তি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে এ দোষটুকু নিষ্ঠুর বিধাতার কি অসহায় মানুষের বলা শক্ত। মোট কথা এই যে অমূল্য গল্প লিখিত এবং নূতন বিবাহের ভাবের ধাক্কা খাইয়া ঝোঁকটা এদিকে বাড়িয়াই গিয়াছিল।

তথ্যটি গোপনে রাখিবার চেষ্টা থাকিলেও কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়ে—যেমন চাঁদনী রাতে একটু আনমনা ভাব, বর্ষার সন্ধ্যায় একটু নির্জ্জনতাপ্রিয়তা, যত সব "অখাদ্য" পাখীদের আওয়াজে বিরক্ত না হওয়া ইত্যাদি। এমন কি এমন সময়ও অনেকদিন গিয়াছে যে জানালার ধারে বসিয়া ভাবমন্থর কলমে নিবিষ্ট মনে তাহাকে লিখিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কেহ কাছে আসিলেই খাতাটি উল্টাইয়া রাখে—প্রশ্ন করিলেই বলে—"বন্ধুকে চিঠি দিতে হবে, একটা খাতা করচি"—কি এইরকম একটা কিছু ছুতানাত······।

হিতোপদেশ পড়া বধূটি হাসিয়া বলে—"এত চিঠি!—তোমার দেখচি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।"

অমূল্য হাসিয়া জবাব দেয়—"দু'বছর থেকে তুমি আবার 'বড় কুটুম্বকের' দল জুটিয়ে দিয়েছ কিনা।"

সামনাসামনি এই হয়। আড়ালে গিয়াই কিন্তু কাদম্বিনীর চটুল ভ্রূ জোড়াটি কুঞ্চিত হইয়া উঠে। ভাবে—ভালরে ভাল, এত চিঠি লেখালিখির ধূম কিসের তোমার?

বেলফুলকে জরুরি তলব হয় এবং আরও দু'একজন সখীকে জড় করিয়া গোপনে আলোচনা চলে। যাহারা তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করে - অর্থাৎ তাহার সন্দেহের পরিপোষণ করে, তাহাদের দরদ জাগাইয়া বলে—"তাই তো ভাই, যদি তাই-ই হয় তো কি উপায় করি বলদিকিন্? পুরুষ মানুষের মন, কথায় বলে···" ইত্যাদি।

যাহারা নিজের নিজের যুক্তি খাটাইয়া নানারকম স্বাধীন সমাধান দিয়া তাহার কুটিল সন্দেহের খণ্ডন করিতে যায়, তাহাদের দিকে একটু স্থির নেত্রে চাহিয়া কথাগুলোকে একটু চিবাইয়া চিবাইয়া বলে—"কে জানে;—তোমাদের সবার মুখেই তো 'খুব ভাল, খুব ভাল' শুনচি, শুধু আমার কাছেই ভাল নয়। তা' হ'লে আমার চেয়ে তোমরাই বেশী জানো দেখ্চি।···কে জানে ভাই পুরুষ মানুষকে চিনলাম না—আর মেয়েদের তো কথাই নেই..."

ইহাতে কেহ চটিয়া গিয়া দু'দিন কথা বন্ধ করে; কাহারও রোখ্ চাপিয়া যায়,—অমূল্য সম্বন্ধে নানারকম মনগড়া কাহিনী জড় করিয়া কাদম্বিনীর চক্ষে বর্ষা নামাইয়া তবে ছাড়ে। অবশ্য বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে অশনিপাতও না হয় এমন নয়; কিন্তু আক্রমণকারীরা হঠাৎ এমন নন্-কন্‌ডাক্টার হইয়া বসে যে তাহাদের একটি লঘু শক্ পর্য্যন্ত লাগিতে পারে না।······

সমস্ত দেহাবয়বে বিদ্যুৎ লইয়া খেলা করিতে হয় বলিয়াই বোধ হয় স্ত্রীজাতির শরীরযন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রতিষেধক যন্ত্রটি যত্ন করিয়া ফিট্ করা আছে;—যখন

ইহারা দরকার বোঝে না তখন রূঢ়তম কথাও গায়ে না মাখিবার এমন একটা ক্ষমতা দেখিতে পাই যে বিস্ময় না মানিয়া থাকা যায় না।......

কাদম্বিনী না শুনিবার ভাণ করিয়া শোনে, ক্ষুদ্র বৈঠকটির গণ্ডীর মধ্যে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করে; কিন্তু যাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই সব তাহারা অবিচল চিত্তে বসিয়া থাকে, বলে—"আমাদের শাপমন্যি দিলে কি করব বল ভাই? অমূল্যবাবু লোকতো খুবই ভাল; তবে কথাগুলো শুনি—তাই হুজুরে পেশ করলাম......"

ইহার পর যে যাহার বাড়ী চলিয়া যায়, শুধু 'বেলফুল' আরও খানিকটা থাকিয়া যায়। কি সব মন্ত্রণা হয় কে জানে, শেষে ঝোঁকটা গিয়া পড়ে অমূল্যর উপর। সে নিরীহ বেচারী, সমস্ত দিন বোধ হয় কোথায় একটু কোকিলের ডাক্, কোথায় একটা ঝরা ফুল, কোথায় একটু উদাস হাওয়া—এই সবের নিকট চাঁদা করিয়া খানিকটা আবেগ সংগ্রহ করিয়া রাত্রিটুকুর জন্য তৈয়ার হইয়া আছে—শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দেখিল প্রচণ্ড অভিমান! বিপদ আর কাহাকে বলে......?

—তখন সে ভাষাসমুদ্র মন্থনে লাগিয়া যায় এবং বাছাবাছা রত্নরাজি বধূকে উপহার দিয়া মানভঞ্জনের প্রয়াস পাইতে থাকে। দেবী প্রসন্না হন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অমূল্য আজকাল তাঁহার এই নিতুই অভিমানের কারণটি এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেনাই। কাদম্বিনী সেদিকটা চাপা দিয়া বলে—"আচ্ছা, দেখতে তো ভালমানুষের মত; কিন্তু এত ছাঁদের কথা কার কাছে শেখ বল দিকিন?"

অমূল্য হাতে স্বর্গ পায়; হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দিয়া বলে—"কথা?—কথা তোমার প্রেম আমায় শিখিয়েচে কাদু। তুমি তো শুধু কথাগুলোই শুনতে পাও; আমার মনের মধ্যে যে কী সে-এক সুরের হাওয়ায় এই কথাগুলো দোল খেতে থাকে তার পরিচয় তো তোমায় আমি দিতে পারি না সখি—সে খেদ যে আমার মনেই থেকে যায়....."

—মূঢ় বোঝে না, ভাবের মাথায় সে প্রতি কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কি বিপদের আবর্ত্তের মধ্যেই না টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সমস্তটাই গভীর অভিনিবেশের সহিত কাদম্বিনী শোনে, তাহার পর ভ্রূ খেলাইয়া একটু বক্র হাসিয়া বলে—"ও ব্বাবা!—তা এত উঁচু উঁচু কথা শেখাবার ক্ষ্যামতা আমাদের মত মুখ্যুসুখ্যুর প্রেমে কি আছে?—কোথায় পাও তুমিই জানো। তোমার শিক্ষাগুরুটিকে পেলে হোত; কিছু শিখে নিতাম।"

—মনে মনে জাতীয় ভাষায় বলে—"আঁশবটি দিয়ে নাকটা কেটে নিতাম চলানীর.."

এইরূপে দিন যায়। সরল বিশ্বাসে স্বামী হৃদয় মন উন্মুক্ত করিয়া দেয়, আর স্ত্রী—সে প্রচ্ছন্ন সন্দেহে সামান্য একটু ভঙ্গী, এতটুকু একটু ইঙ্গিতকে নাড়িয়া চাড়িয়া নিজের সংশয়ের প্রমাণ সঞ্চয় করিয়া যায়।

খানাতল্লাসি যদি শুধু এই রকম বেচারার মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের পরিসরটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে বিশেষ কোন গোল ছিল না; কিন্তু সংশয় দারোগা ক্রমে কোটের পকেট, বইয়ের অভ্যন্তর, বিছানার গদির তলা প্রভৃতি যায়গায়ও উপদ্রব সুরু করিয়া দিল,—এমন কি রুমালটির গন্ধ পর্য্যন্ত অমূল্যর নিজের বাক্সের এসেন্সের কিনা রোজ তাহার হিসাব রাখা হইতে লাগিল।

এতটা অধ্যবসায়ের একটা ফল আছে তো? বিধাতা শেষে অনুকূল হইলেন।—

২

অমূল্য "মানিনী" নাম দিয়া একটা নূতন গল্প লিখিতেছে। অনুমান করি বধূর এই নববিধ আচরণের দ্বারাই গল্পটি অনুপ্রাণিত। একখানি খাতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং আর বাঁধান খাতা মজুত না থাকায় চিঠির কাগজের সুদৃশ্য প্যাডখানিতেই অবশিষ্টাংশ সুরু করিয়া দিয়াছে।

বাঁধান খাতার শেষ দিকে ছিল গল্পের নায়িকার অভিমান ভরা একখানি চিঠি এবং প্যাডের প্রথম পাতাটিতে অমূল্য নায়কের তরফ হইতে তাহারই জবাব লিখিতেছে।

পত্রটি বেশ প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ-ই প্যাডখানিতে অমূল্য বধূকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছে,—সেইজন্য ভাবের কিছু সমতাও আসিয়া পড়িয়াছে; তাহা ভিন্ন বিবাহের দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাপতি ঠাকুর যৌতুক-

স্বরূপ সকলকেই চিঠি লিখিবার ক্ষমতাটা একটু বেশী করিয়া দিয়া থাকেন দেখা যায়।—অমূল্য আবার লেখক!

• —জবাবটা এইরূপ চলিতেছিল -

প্রিয়তমে,

তোমার সুধা-সিঞ্চিত লিপিখানি পেলাম। অনেক দিন থেকে তৃষাতুর ছিলাম, তাই প্রথমেই বুকে চেপে শত সহস্র, অগুন্তি চুমো দিলাম। তোমার কনকচাঁপা আঙ্গুলের যে সৌরভের প্রলেপ চিঠিখানিতে মাখিয়ে দিয়েছিলে তা' আমার বুকের যে কী সম্পদ হয়ে আছে কি ক'রে জানাবো? এ যেন সারা রজনী তোমাকেই বুকে ধরে রাখবার একটা স্মৃতিকণা। কৃপণের মত দু'টি ছত্র পাঠিয়েছ, তার সঙ্গেই কত সুষমা, মধুর চারিপাশে ফুলের পাপড়িগুলির মত বিকশিত হ'য়ে উঠেচে। কবে যে তোমায় সমগ্রভাবে পাব তাই ভাবচি।

—সমস্ত গ্রীষ্মকালটা একবারও যেতে পারি নি বলে বড় নাকি অভিমান হয়েচে? তবু ভাল। কিন্তু আমি যে সেবারে সারা পূজার ছুটিটা কলকাতায় ধন্না দিয়ে পড়ে রইলাম—কৈ মশায়ের মধুপুর যাওয়া কি বন্ধ হল? না, গিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেই এলে? সেই অবিচারের শোধ নিয়েছি একটু; শোধবোধ হয়ে গেল,—এবার যখন আস্‌ব শিলমোহর করে সন্ধি স্থাপন ক'রতে হবে।—শিল-মোহরটি কোথায় বসাব জানতো?...

না গো না—আসলে হ'য়েছে কি জানো?—গ্রাম থেকে একটা ছেলে সেদিন পালিয়ে লড়ায়ে চলে গেছে। সেই থেকে যত সব গার্জ্জেনরা একেবারে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেচেন—এমন কি সন্ধ্যার পর বাড়ীর চৌকাটের বাইরে পা দেওয়ার হুকুম নেই। এক কথায় বলতে গেলে গ্রামের কর্ত্তারা আমাদের সব অন্তরীণ করে রেখেচেন। নিছক সত্যি কথা বললেও এঁরা ভাবেন ফন্দী এঁটেচে—ছুতো করচে; সেক্ষেত্রে সত্যিই একটা ছুতো ক'রে কি ক'রে যেতুম বলত?—ছাড়লেও সঙ্গে একটা দারোয়ান লাগিয়ে রাখতেন।

তাই গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে আর যাওয়া হোল না, নিরুপায়—বন্দী হ'য়ে আছি। কবিরা পরামর্শ দেন দরদী দেখে বেদনার খানিকটা বেঁটে দিলে সেটা নাকি লাঘব হ'য়ে ওঠে।—তাই এই আতুর বন্দী বুকের কাছে অহরহ একটি বন্দিনীকে ধ'রে রেখেচি;—সেটি কে কিম্বা কি জানো? তোমার সেই ফটোখানি। বুকটা শীতল করে রাখে বটে; কিন্তু যখন ফুরসৎ পেয়ে বের ক'রে দেখি, প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় বড় রাগও হয়—দেখতো আমি বেচারা বিরহের জ্বালায় মরচি—মনের মধ্যে কত বেদনার মূক ভাষা গুমরে উঠচে—আর তুমি তোমার সেই দুষ্টু চোখ দুটিতে সলজ্জ হাসি ভরে দিব্যি চেয়ে রয়েচ আমার পানে—এতটুকু দয়া নেই, কিছু নেই।...দুষ্টু, ওরে দুষ্টু!

এবার কলকাতায় গিয়ে কি করব জানো? তোমার নানান রকম ভাব অভিব্যক্তির ফটো তুলে নোব—তার মধ্যে একটি থাকবে "সান্ত্বনা"—আমার বিরহের সময় সেটি বেদনার ম্লানিমা নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকবে। কেমন, রাজী? আর একটি হবে তোমার আমায় জ্বালাবার জন্তে মাঝে মাঝে যে রোগ হয় তার,—নীচে লেখা থাকবে—"অভিমান"। এক এক দিন সমস্ত রাত সেই ঈষৎ-হেলান ভার ভার মুখখানির দিকে চেয়ে, কত সেধে, সেধে, সেধে কাটিয়ে দোব।

আচ্ছা কতদিন আর এরকম ফাঁকির ওপর চলবে বলত? আশায় আশায় আর কতদিন বসে থাকবো? শুধু স্মৃতিটুকুর ওপর ভর ক'রে বাস্তবের আর কত আরাধনা করব? লগ্ন যে বয়ে যায় সখি, আর কতদিন—কতদিন—ওগো কতদিন?...

—বাহির হইতে কে ডাকিল, "অমা বাড়ী আছিস্?"

অমূল্য বিরক্ত ভাবে কাগজ হইতে কলমটা তুলিয়া আপন মনে বলিল—"কাঠ্‌গোঁয়ার সাতকড়েটা।—নিজের মধ্যে রসকস তো বিলকুলই নেই—; পরেও যে একটু নিরিবিলিতে চর্চ্চা করবে তাও হ'তে দেবে না।"

"যাইরে, বোস্"—বলিয়া একটু হাত চালাইয়া লিখিতে লাগিল—তোমাদের ঠিকানা বদলে গেছে? ভালই হ'ল—একটু পাড়াগাঁয়ের দিকেই থাকা ভাল। সকলের চেয়ে ভাল হ'ল—ফুলটিকে গাছপালার আবেষ্টনীর মধ্যে মানাবে ভারী। সেই বৌবাজারের ইঁটের পাঁজার মধ্যে, না, সে

যেন নেহাৎ টবে সাজান ছিল। গিয়েই দেখা করব'খন। ঠিকানা দিয়ে দিয়েছ, তার জন্য সহস্র ধন্যবাদ···

সাতকড়ি আর একবার ব্যস্ত তাগাদা দিল।—"এই এলাম"—বলিয়া অমূল্য লিখিয়া চলিল—

কিন্তু জানো?—ঠিকানা না জানলেও আমি গিয়ে ঠিক পৌঁছুতাম, তুমি নিতান্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে তখন আমায় প্রশ্ন করতে—"বাঃ, কি ক'রে এলে!" আমি তোমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে রোমিওর ভাষায় বলতাম—

'প্রেমের নির্দ্দেশে—
সে আমারে দিল যুক্তি, আমি দৃষ্টি দিনু...'

বাহিরে পায়ের শব্দ হইল—"তা হ'লে পাহাড়ই মহম্মদের কাছে এল—আমার গরজ বেশী"—বলিয়া সাতকড়ি ঘরে প্রবেশ করিল।

শুষ্ক মুখ, উস্কখুস্ক কেশ; অমূল্যকে লিখিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কি পদ্যটদ্য লিখচিস্ না তো? তা হ'লে বল,—পত্রপাঠ বিদায় হই।"

অমূল্য হাসিয়া বলিল—"না, চিঠি একটা; বোস্; এই দুপুর রদ্দুরে?"

সোরাইয়ে জল ছিল, খানিকটা ঢক্‌ঢক্ করিয়া পান করিয়া সাতকড়ি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল—"ভাই, একটা শলা নিতে এসেচি;—পদ্যর চোটে তো আমার প্রাণ গেল, কি উপায় করি বলত?"

অমূল্য কুতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—"কি রকম?"

সাতকড়ি পকেট হইতে একটা রেজেষ্টারি খাম বাহির করিয়া অমূল্যর হাতে দিল, বলিল—"আন্দাজ কর দিকিন এটা কি?"

অমূল্য আগ্রহের সহিত ঠিকানাটা পড়িল—"শ্রীমতী সুমিত্রা ভট্টাচার্য্যা, জয়েন্ট এডিটার—'চালচিত্র'; নং ৬।২ ছিদাম সদাগরের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা"—

—পড়িয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ভাই, সাহিত্যের ঝোঁকটা তো এইরকমই হওয়া চাই, রোদ বৃষ্টি মানলে চলবে না—এই রকম উগ্র সাধনা করতে হবে; তবেই তো···"

সাতকড়ি চটিয়া উঠিয়া বলিল—"কি আপদ! আমি কি তোর কাছে inspiration নিতে এসেচি?···গিন্নীর কবিতা ভাই, পোষ্ট করতে যাচ্ছি। কাল সমস্ত রাত এক রাশ বিরহের কবিতা পড়ে পড়ে শুনতে হ'য়েছে—বাইরে মশা, মশারির ভেতর কবিতা—একবার ভাব দিকিনি অবস্থাটা।···"

অমূল্য সম্ভ্রমের সহিত বলিল—"তিনি কবিতা লিখতে পারেন? —বাঃ! এটা কিসের ওপর?···"

সাতকড়ি ভেংচাইয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, পারেন লিখতে; এটা আমার ওপর—ফুলস্কেপের আড়াইপাতা ভরা একটা রাবিশের বোঝা। লেখা আছে আমায় নিয়ে কত জন্ম জন্ম মিলন বিরহের মালা গাঁথতে গাঁথতে এ জন্মে এসে ঠেকেছেন। এবার নাকি হৃদয়-পদ্মের পাঁপড়ি দিয়ে আগলে রেখেছেন—বিশ্ব রসাতলে গেলেও ছাড়বেন না। অথচ মজা এই যে আমি সেই কবিতা ঘাড়ে ক'রে ঘর ছেড়ে এই দুপুর রদ্দুরে টো টো ক'রে ফিরছি। ভাই, কি উপায় করি বলত? চোখ কাণ বুঁজে স'য়ে যাচ্ছিলাম কোন রকমে, কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে! সামনে আবার এই বর্ষাকাল আসছে···তাই ভাবলাম—যাই 'অমা'র কাছে তার তো বছর তিনেক কাটল—একটা experience হয়েছে···কপালগুণে তুইও উল্টে ওরই দিকে হলি?..."

অমূল্য প্রথমটা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, তাহার পর সুর বদলাইয়া সময়োচিত রাগ দেখাইয়া বলিল—"না, বলছিলাম—দু'এক ছত্র পদ্য যদি কখনও লেখে তো বিশেষ ভয়ের কারণ নেই তাতে, কিন্তু এযে আস্পর্দ্দা—তোকে দিয়ে এই ঠিক দুপুরে সেইসব পদ্য ডাকে রেজেষ্টারি করতে পাঠাবে! তুই বা পুরুষ হ'য়ে কি বলে রাজী হলি?"

"ভাবলাম—পাপ বিদায় ক'রে আসি; না হ'লে এই নিয়ে আমার আজ সারারাত জ্বলতে হবে। আর যত নষ্টের কু হয়েচে এই কাগজওয়ালারা—শ্রীমতী ভটচায মশায় নাকি আবার নতুন লেখক লেখিকাদের বেশী করে উৎসাহ দিচ্ছেন···"

অমূল্য কথাটা শুনিয়া অন্যমনস্ক ভাবে আগ্রহের সহিত বলিয়া ফেলিল—"দিচ্ছেন নাকি?"—সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পৌরুষ দেখাইয়া চড়া গলায় বলিতে

লাগিল—"আমি হ'লে কিন্তু এরকম অন্যায় ফরমাস করলে বৌয়ের চ'খের সামনে লেখাটা ফাঁৎ ফাঁৎ করে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম! ও জাতটাকে যত আস্কারা দেবে তত মাথায় উঠবে—সর্ব্বদা কড়া চোখের ওপর রাখা চাই—"

—"হ্যাঁ, সখ্ হ'য়ে থাকে মাঝে মাঝে দু'এক কলম লেখ, রাজী আছি;—তোমাদের কাছ থেকে স্তুতিগানটা আসটা আমাদের একটা ন্যায্যপ্রাপ্য - তা মুখেই বল কিম্বা কাগজে কলমে···"

দোরের পাশে চাবীর গুচ্ছের আওয়াজ হইল।

অমূল্যর স্বরটা আপনা আপনিই একটু মোলায়েম হইয়া গেল, বলিল—"কথা হচ্ছে—পুরুষের প্রতি স্ত্রীর একটা সহানুভূতি থাকা দরকার বই কি—তাকে প্রেমই বল আর অনুকম্পাই বল। তা না হ'লে পবিত্র দাম্পত্য-জীবন···"

দুয়ারের গায়ে চাবীর গুচ্ছের 'ছট্ ছট্' করিয়া গোটা-কতক ঘা পড়িল। সাতকড়ি বলিল—"কিছু কথা আছে বোধ হয়, দেখে আয়।"

অমূল্য বলিল—"নাঃ, চল্ নীচে যাই; কিছু কাজ আছে বোধ হয়, ঘরে আসবে।"

সাতকড়ি বন্ধুর ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, বলিল—"আচ্ছা, একবার বাজলে বুঝব কথা আছে; দু'বার বাজলে বুঝব ঘরে কাজ আছে।"

চাবী 'ছট্' করিয়া একবার বাজিয়া থামিয়া গেল।

সাতকড়ি হাসিয়া অমূল্যর গায়ে একটা টোকা দিল। অমূল্য তাড়াতাড়ি প্যাডের লেখা-পাতার এককোণে 'চালচিত্রের' জয়েণ্ট এডিটারের নামধামটা টুকিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল।"

সাতকড়ি প্রশ্ন করিল—"ও আবার কি হ'ল?

চাবী জোর তাগাদা দিতেছিল, প্যাড্টা বিছানার তোষকের নীচে তাড়াতাড়ি রাখিয়া অমূল্য বন্ধুকে লইয়া নীচে চলিল। নামিতে নামিতে বলিল—"ঠিকানাটা লিখে নিলাম, কাগজটা আনাব; তোর গিন্নী কেমন লেখেন একবার দেখতে হচ্ছে···ওরা নতুন লেখকদের খুব বুঝি উৎসাহ দিচ্ছে?—পাঠালেই বুঝি ছাপাবেন?"

"উৎসাহ দেবেনা কেন দাদা?—ওদের তো আর ভুগতে হয় না; কাগজ বিকোলেই হল।···বলি, এই বুঝি তোমার বীরত্ব? গিন্নীর চাবীর আওয়াজ হওয়া আর অমনি টোন বদলে গেল? আমি এসেচি আবার তোর কাছে শলা নিতে!···"

দুই বন্ধুতে হাসিতে লাগিল।

৩

বলা বাহুল্য চাবীর মালিকাটি অমূল্যর স্ত্রী—স্ত্রী ভিন্ন চাবীর শব্দে অমন কড়া আদেশ ফুটাইতে অন্য কেহ পারে না।

কাদম্বিনী ঘরে ঢুকিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া একচোট খুব হাসিল, বলিল—"ওরে বাস্‌রে! কড়া নজরে রাখা চাই—রোসো···"

আরশীর সামনে গিয়া খোঁপার ত্রস্ত চুলগুলা গুছাইয়া দিতে লাগিল; তাহাও ভুলিয়া খানিকক্ষণ নিজের ঈষৎ হেলান প্রতিবিম্বটির পানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর হঠাৎ অহেতুক ভাবে লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আবার হাসিয়া বলিল—"রোসো, আজ রাত্তিরে তোমার কড়া নজরে অঝোরে জল না বওয়াই তো আমার নাম···"

বিছানার দিকে নজর গেল,—বালিসটা গড়াইয়া গিয়াছে, চাদরটা কুঁচকাইয়া গিয়াছে, তোষকটা কোণের দিকে গুটাইয়া গিয়াছে। কাদম্বিনী গুছাইতে গুছাইতে গর্‌গর্ করিতে লাগিল—"দেখেচ?—এমন অগোছ, মনিষ্যি যদি দু'টি আছে;—কতবার ব্যাগ্যতা করে—জোড় হাত ক'রে ···ওমা, একি!!"

—সেই প্যাডটা। তাড়াতাড়িতে মলাটটাও বন্ধ করে নাই অমূল্য।

কাদম্বিনী প্রথমেই পড়িল—'প্রিয়তমে'—তাহার পর এক নিঃশ্বাসে বাকী সমস্তটা শেষ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই যে-মুখটা রাগরঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল, একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। কম্পিত হস্তে আরও দুই তিনবার পড়িল; যতই পড়িতে লাগিল, রাগ এবং ঈর্ষায় মনটা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল চিঠিটা কুঁচি কুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেয়; তাহা করিল না। একবার মনে হইল শ্বশুর শাশুড়ীর হাতে

চিঠিটা পঁহুছাইয়া দিয়া এই অবিচারী, কুমার্গগামী স্বামীকে অপদস্ত করে; কিন্তু এত দুঃখেও মনে কোথায়, কি একটা অস্পষ্ট বেদনা উঠিল;—সুতরাং সে ব্যবস্থা সুবিধার হইল না। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সুচিত্রার নাম এবং ঠিকানাটার দিকে চাহিয়া রহিল।—চাহিয়া, চাহিয়া—শেষে রাগ ঈর্ষা সব গিয়া, গাঢ় অভিমানে তাহার চক্ষে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নামিল···

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া মনটা হাল্কা হইলে, তাহার মধ্যে যে গোয়েন্দাটি বাসা বাঁধিয়া ছিল, সে বিজয়গৌরবে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল।—

কাদম্বিনীকে ফাঁকি দেওয়া যে সোজা নয়, এবং তাহার সন্দেহ যে একেবারে পাকা, তার এতটুকুও মিথ্যা নয়, এইটা তাহার একটা মস্ত সান্ত্বনা হইয়া উঠিল। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—ক্রমে ধরা-পড়িয়া-যাওয়া, পরাজিত এবং পলায়িত স্বামীর প্রতি তাহার একটা করুণার ভাব জাগিয়া উঠিল এবং শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত রাগ এবং আক্রোশটা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উপর।

রাত্রিটা দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া কাটাইল, সকালটা সুচিত্রার কাল্পনিক পত্রখানি খুঁজিয়া কাটাইল, দুপুরের মজলিসটা মাথা ব্যথার অজুহাতে শীঘ্র ভাঙিয়া দিল, তাহার পর দুয়ারে খিল দিয়া—কমিটি করিতে বসিয়া গেল। মেম্বর সে, তাহার 'বেলফুল' এবং বেলফুলের দেওর খোকা-বাবু—বয়স এক বৎসর সাত মাস। বৌদিদি কথায় কথায় তাহার যেরূপ পরামর্শ লইতেছিল তাহাতে তাহাকেই কমিটির সভাপতি বলা সমীচীন।

বেলফুলের বর নব্য উকিল। দেওরটি বেলফুলের নয়নের মণি, একটু চোখের আড়াল হইবার জো নাই। বর বেল-ফুলকে ঠাট্টা করিয়া বলে—"প্রাণটি দুইভাইকেই ভাগ ক'রে দিয়েছ দেখচি···"

ক্রমাগত 'বেলফুল' 'বেলফুল' করিতে হইল বলিয়া পাছে কেহ মনে ভাবেন মিষ্ট গন্ধের মোহে পড়িয়া গিয়াছি, সেই জন্য বলিয়া রাখি নামটি শ্রীমতী কদম্বমঞ্জরী। খুবই শ্রুতিমধুর স্বীকার করি; কিন্তু বড় কসরৎ করিয়া লিখিতে হয়।

—সমস্ত চিঠিখানি পড়িয়া 'বেলফুল' নথের পান্না দু'টি তর্জ্জনী দিয়া গালে টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"অবাক্ হলাম ভাই, এযে শিবের অসাধ্য রোগ দাঁড়িয়ে গেছে!···"

কাদম্বিনী ভীত স্বরে বলিল—"কি হবে ভাই?"—বলি-তেই তাহার চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠিল।

বেলফুল ধম্‌কাইয়া বলিল—"ওকি লো!—এই কি তোর কাঁদবার সময় হ'ল? কি হবে আবার?—তাকে ধরে ফিরিয়ে আন্তে হবে। পুরুষ মানুষের ও রোগ একটু হয়-ই, —তা ব'লে কি হাল ছেড়ে দিতে হবে? হ্যাঁ খোকাবাবু, তুমি যখন পুরুষ মানুষ হবে, তোমার ও রোগ হবে না?—নানারকম চিঠি আসবে না?—তুমি জবাব দেবে না?"—বুকে চাপিয়া একটি চুম্বন দিল।

বেলফুলের নব পরিণীতা ননদের অনেকদিন পত্রাদি আসে নাই বলিয়া বাড়ীতে আলোচনা চলিতেছিল। খোকা বলিল—"ডিডি টিটি আছবে।"

দুজনেই 'হোহো' করিয়া হাসিয়া উঠিল, খোকাও যোগ দিল। কাদম্বিনীর অশ্রু নাড়া পাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া হাসিমাখা গালে ঝরিয়া পড়িল। 'বেলফুল' বলিল—"তুমি তা'হলে সবাইকে টেক্কা দেবে দেখচি"—আবার সবাই হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে কাদম্বিনী গম্ভীর হইয়া বলিল—"গরমের ছুটিতে যেতে পারেন নি ব'লে একবার কাতরানিটা দেখলে বেলফুল?—তাই দেখি সর্ব্বদাই যেন একটা অস্বাস্ত অস্বস্তি ভাব। আমার যেন মনে হচ্ছে ক'লকাতা যাবার কথাও দু'একবার তুলেছিল। তা ভিন্ন 'কবিত্ব' তো আজকাল কথায় কথায়। আমার বরাবরই কেমন একটা খট্‌কা ভাই, যে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় অন্তঃসলিলা ফল্গু বইচেন..."

'বেলফুল' বলিল—"ফটোটার কোন সন্ধান পেয়েচিস্—যেটা বুকের কাছে কাছে ঘুরচে? রসময়ীর চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করচে যে—ভদ্দর লোকের মেয়েই হবে বা অপর কেউ কে জানে।"

"না, সেটা এখনও পাই নি, তবে বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যদি কোন খানে থাকে তো বাছাধনকে বের করবই। ···ইস্, যাঁরা সব দরদ দেখিয়ে বলেন, আমি মিছে সন্দেহ করে মরি, ইচ্ছে করে তাঁদের একবার দেখাই যে···"

বেলফুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"সেকিলো!—অমন কাজটি করিস্ নি। বলে—'নিজের মান নিজে রাখো, কাটা কান চুল দে ঢাকো'—ওদের বললে কি তোর প্রতিকার হবে বেলফুল?"

কাদম্বিনী একটু লজ্জিত হইয়া গেল, বলিল—"সেই জন্যেই তো তোমায় ডাকলাম ভাই। ওদের কি আর সত্যিই আমি বলতে যাচ্চি। এখন এর কি বিহিত করি একটা পরামর্শ কর।"

"বিহিত তো একটা করতেই হবে।...কি বিহিত করি বলতো খোকা বাবু?...ওমা, দেখেচ!..."

খোকা অমূল্যর একপাটি ফুটবল বুট লইয়া বুকে চাপিয়া দোল দিতেছিল, সংক্ষেপে বলিল—"বউ।"

বেলফুল হাসিয়া বলিল—"সখ্ বলিহারি; এখন থেকেই 'বউ বউ' ক'রে পাগল।"

কাদম্বিনীও হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল—"হ'লে তো এই হেনস্তা।"

কথাটিতে কাদম্বিনীর যে বেদনাটুকু উহ্য ছিল সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সঙ্গী একটু গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল—"আমি বলি কি,—ঠিকানা তো লেখাই রয়েচে..."

কাদম্বিনী সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"তোর বরের কাছ থেকে একটা উকিলের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হোক, এই তো?—ঠিক কথা, আমিও..."

বেলফুল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—"দূর—তুই খেপলি নাকি লো ছুঁড়ি!...খোকা বাবু, শুনচ তোমার বেলফুল বৌদির কথা?"

খোকাবাবু দাম্পত্য আচারে ব্যস্ত ছিল, শুধু সম্মতি সূচক একটু ঘাড় নাড়িল।

—"আমি বলছিলাম কি আয়, একটা বেশ কড়া ক'রে চিঠি লিখে, দু'খানা চিঠিই সেই আবাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই। তাতেই তাঁর গুপ্ত লীলার সখ্ মিটে যাবে'খন। আর এদিকে বরটিকে সুবিধে বুঝে জানিয়ে দিও—তাঁর কীর্ত্তি ধরা পড়ে গেছে। আমি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে একটু সাজাও দিয়ে দিতাম, বুঝলে খোকাবাবু?"

—খোকা পত্নীত্যাগ করিয়া বৌদিদির কোলে আসিয়া বসিয়াছিল, বেলফুল তাহার গালের নীচেটা একটু টানিয়া ধরিয়া বলিল—"এই রকম ক'রে গোঁফটা ধ'রে টেনে দিতাম,—কিই বা করত তোর দাদা আমার?"

খোকা বৌদিদির অনেক দাম্পত্য অভিনয়ের সাক্ষী, মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ডাডা টুমো খাবে।"

"দূর হতভাগা"—বলিয়া হাসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল—"আমার ঘরে আর কখন তোকে ঢুকতে দোব না।...বারণ করি, তবুও এইটের সামনেই বেহায়াপানা করবে।"—বলিয়া লজ্জিত ভাবে তাহার বেলফুলের মুখের পানে আড়ে চাহিয়া, প্রথমে মুখ টিপিয়া টিপিয়া এবং তাহার পরে সামলাইতে না পারিয়া জোরেই হাসিতে লাগিল। কাদম্বিনীও যোগ দিল। সকলের হাসির ওপরে আওয়াজ উঠিতে লাগিল খোকার হাসির এবং কথাটার মধ্যে বিশেষ একটা কৌতুক আছে সিদ্ধান্ত করিয়া সে হাস্যস্রোতের মধ্যে সেটাকে তরঙ্গায়িত করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল—"ডা—ড—টুমো—খা—বে—ডা—ডা—টুমো—খাবে..."

এইরূপ হাস্য কৌতুক, বেদনা, গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আরও খানিকক্ষণ পরামর্শ চালাইয়া সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যকে একটা গরম গরম পত্র লেখাই স্থির হইল। তাহার সহিত অমূল্যর চিঠিটাও যাইবে।

কাদম্বিনী বলিল—"তা হ'লে শুভস্য শীঘ্রম্"—বলিয়া কালী কলম কাগজ আনিয়া লিখিতে বসিয়া গেল এবং সখীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই প্রথমে মনের আক্রোশ মিটাইয়া লিখিয়া রাখিল—"হাঁলা কালামুখী কুলমজানি..." তাহার পর সখীর দিকে চাহিয়া বলিল—"না ভাই, এটুকু থাকবেই, আমি কোন মতে বদলাব না।"

সখী হাসিয়া বলিল—"তা, তোর সতীন, তুই যেমন ভাবে সম্ভাষণ করিস্।" লেখা হইতে লাগিল—

"তুই কি ভেবেচিস্ তোর লীলা খেলা চিরকালটাই সমানভাবে চলবে, কখনও ব্যক্ত হবিনি? জানিস্?—এখনও মাথার ওপর চন্দ্র সূর্য্য উঠছেন। ধরাতলে মা গঙ্গা বইচেন। আর তুই সতী সীমন্তিনীর ধন কেড়ে নিবি? একি মগের মুল্লুক পেয়েচিস্? আমার মনে এতদিন যা যন্ত্রণা দিয়েচিস্ তা তুই কি বুঝবি লা ভা—"

বেলফুল বলিল—"দূর্, ওটা কেটে দে। লেখ্‌না 'শতেক খোয়ারি' 'ভালখাকী' আরও তো কত গাল রয়েছে।"

কাদম্বিনী বলিল—"আমার গা জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে ভাই।" কথাটা কাটিয়া আবার লিখিতে লাগিল—'শতেক খোয়ারি'! এই দেখ্ মা সতীরাণী কেমন সতীর মান রেখেছেন। তোর নাগরের চিঠি কেমন পেয়ে গেছি। আহা-হা-হা, গরমের ছুটিতে যেতে পারেনি বলে সরল প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে, না? ব্যথার ওষুধ আমার কাছে আছে। মুড়ো খ্যাংরা। নিয়ে যেও। ফের যদি কখন আমার জিনিষের দিকে কুনজর কর্‌বি তো কি আর বলবো —তোর মা কালীর দিব্যি।"

বেলফুল বলিল,—"ওসব মেয়ে মানুষ কি দেবতা টেবতা মানে যে দিব্যি দিচ্চিস্?"

কাদম্বিনী দিব্যিটা কাটিয়া দিয়া বেলফুলের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কহিল—"লেখ্ তোর বাড়ী চড়াও হ'য়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়ে আসব'—ভয় পেয়ে যাবেখন।"

কাদম্বিনী তাহাই লিখিল; জিজ্ঞাসা করিল—"আমি যে ভয়ঙ্কর দেখতে, গায়ে হাতীর মতন জোর—এই রকম কিছু লিখব?"

বেলফুল বলিল—"সে চিঠির ভাবেই টের পাবে—আর আলাদা ক'রে লিখতে হবে না।···শেষ কালটা এই রকম লেখ্—"

'তোমার সেই সোহাগের ফটোখানিও পেয়েচি। শীঘ্রই তোমার বাপ মা, শ্বশুর কি স্বামীর নাম জেনে নিয়ে, তোমার সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনীর ইতিহাস দিয়ে সেখানা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দোব। আর যদি হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে পাঠাও তো বিবেচনা করা যাবে। তোমার ঠিকানা দেওয়ার জন্যে শতসহস্র ধন্যবাদ। ধর্ম্মের কল কেমন বাতাসে নড়ে টের পেলে তো?'

সখীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন, এটুকু বেশ হ'ল না?"

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিল—"চমৎকার, হাজার হোক উকিলের বউ তো।—শামলা-পরা মাথা যার পায়ে লুটোয়।"

বেলফুল সখীর মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আঃ মর্, উপকারের এই কি পুরস্কার নাকি?"

বৌদিদি ভক্ত খোকা বলিল,—"মাবো?"

বৌদিদি বলিল—"মার তো ভাই, তোমার দাদার নামে মিছে বদনাম দিচ্ছে।"

কাদম্বিনী বলিল—"এই থাক্, শেষ করি, কি বল্?"

লিখিল—এখন তবে আসি। কথাগুলো যেন মনে থাকে।

ইতি তোমার যম
শ্রীমতী কাদম্বিনী মাইতি।

উকিলের বউ বলিল—"এবার ও চিঠিটাতে তোর বরের নামটি বসিয়ে দে।"

কাদম্বিনী লিখিতে যাইতেছিল, উকিলের বধূ বলিল—"আমরণ!—এক রকম লেখা হ'য়ে যাবে যে। কোন বইটইএ অমূল্য বাবুর নাম লেখা নেই? না হয় তোর একটা চিঠিই বের কর না..."

৪

উক্ত ব্যাপারের সাত আট দিন পরের ঘটনা।—

অমূল্য উদীয়মান লেখকদের উৎসাহদায়িনী 'চাল চিত্র' সম্পাদিকার নামে একটা গল্প পোষ্ট করিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া সাহিত্য-যশের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এই মাত্র 'সাতকড়ে' আসিয়া তাহার কাব্যবিড়ম্বিত জীবনের হা-হুতাশ তুলিয়া একচোট জ্বালাতন করিয়া গেল।...আর দুদিন পরে সে যখন বুঝিতে পারিবে কত বড় একটা সাহিত্য-রসিকের কাছে সে অরসিকতার পরিচয় দিতে আসিত তখন তাহার মনের অবস্থাটা কিরকম হইবে চিন্তা করিতেই অমূল্যর অধরে কৌতুকের হাসি দেখা দিল।—এমন সময় একটি মোটা সোটা কালো ভদ্রলোক পিছন দিকে হাত করিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"অমূল্য মাইতির বাড়ী?"

অমূল্য একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ, কেন?"

ভদ্রলোক হাত দুইটা সম্মুখে আনিলেন; ডান হাতে একটা আঁকাবাঁকা গেঁঠে লাঠি,—চৌকাঠের উপর ঠুকিয়া শুধু বলিলেন—"আছে?"

ঠিক দুপুর বেলা ; বাড়ীর সব উপরে নিদ্রামগ্ন বোধ হয় ; রাস্তায় লোকের চলাচল নাই।...অমূল্য একবার লাঠিটার দিকে আড়ে চাহিয়া বলিল—"না, কোথায় বেরিয়েচে বোধ হয়। কি কাজ আপনার ?"

ভদ্রলোক একটা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। হাত দিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া লাঠিটা সযতনে পাশে রাখিলেন, তাহার পর বলিলেন —"কে হ'ন তার ?"

অমূল্যর আর 'অমূল্য'এর সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে সাহস হইল না ; বলিল—

"কেউ নয়, এই জানা শোনা আছে মাত্র।"

"বন্ধু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এক রকম বলতে পারেন।"

"একদিন গলায় ছুরি দেবে,—এই বলে গেলাম···এক গ্লাস জল।"

পাশের ঘরেই জল ছিল, অমূল্য উঠিয়া গেল। ভালয় ভালয় মুক্তি পাইয়া আবার ফিরিয়া আসা ঠিক কি খিড়কির দুয়ার দিয়া চম্পট দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত—প্রথমটা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দোমনা হইয়া অনেক ক্ষণ কাটাইয়া কি ভাবিয়া জল লইয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা শেষ করিয়া বলিলেন, "আঃ, প্রাণ দিলেন।"

অমূল্য মনে মনে বলিল—"কথাটা মনে থাকলে বাঁচি,—তুমি না উল্টে নাও।"

গেলাসটা রাখিয়া দিতে গিয়া হাত লাগিয়া লাঠিটা পড়িয়া গেল। না তুলিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটার দিকে চাহিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"আচ্ছা থাক্ ঐখানে।"

লাঠির প্রতি এই অবহেলায় অমূল্য অনেকটা আশ্বস্ত হইল। দেখিল ভদ্রলোকটিকে যেমন সাংঘাতিক রকম অল্প-ভাষী বলিয়া বোধ হইতেছিল, আসলে সে রকম নয়। বলিলেন—"রক্তটা মাথায় উঠে গিয়েছিল। হ্যাঁ গরম বটে ; মেজাজ আর কি করে ঠিক থাকবে?···লক্ষ্ণৌয়েও গরম আছে—সেখানে প্রথম বিয়ে—আম পুড়িয়ে গায়ে মেখেচি। মলয়ের ধার ধারে না,—'লু' আছে—যখন বইত, কাব্যি মাথায় থাক—বউয়ের ঠ্যাং ধরে আছাড় মারতে ইচ্ছে হ'ত ; কিন্তু কখন ঘামিনি এরকম ;—গলে গলেই শরীর আধখানা হ'য়ে গেল···"

অমূল্য আধখানা হওয়ার পূর্ব্বেকার অবস্থা কল্পনা করিবার জন্য শরীরটার দিকে সমীহ নেত্রে একবার চাহিল। ভদ্রলোক বলিলেন—"আপশোষ সে শরীর দেখাতে পারলাম না। সে দেখেচে যত বেটা উড়ে চোর ; 'যোগিন্দড় দড়োগা' বলতে বেটারা এই রকম ক'রে কাঁপত। এখন পেন্সন নিয়ে সাহিত্য চর্চ্চা চলচে।...'চালচিত্রে'র নাম শুনেচেন ?

অমূল্য উৎসাহিত হইয়া বলিল—"খুব শুনেচি,—মস্ত বড় নামী পত্রিকা···"

ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে অমূল্যর দিকে চাহিয়া বলিলেন —"বটে ! —নিজের গাঁট থেকে মুখের রক্ত-ওঠা পাঁচটি হাজার টাকা বের করে দিতে হোত তো এ ভক্তি থাকত না। ও ঢের দেখা গেছে। তাহ'লে সব কথা তোমায় খুলে বলতে হয়। কি কর ? —ভট্‌চার্য্যিগিরি কর না তো ?—তা হ'লে পেটে কথা রাখতে পারবে না। আমার পঞ্চম পক্ষের সেজ সম্বন্ধীর মত ওর কথা এর কাছে, এর কথা তাঁর কাছে ক'রে বেড়াবে। বৌটা ম'ল কিসে ?—সেই তো কারণ।...সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের নাম শুনেচ তা হ'লে ?"

অমূল্য খানিকটা সম্ভ্রমের সহিতই বলিল—"চালচিত্রের জয়েণ্ট এডিটার তো ?"

ভদ্রলোক মাথা দুলাইয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—"হুঁ চিনবেনই তো, অমূল্যর বন্ধু কিনা।···ও জয়েণ্ট ফয়েণ্ট কিছু নয় তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা—তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ হবার কথা ছিল কিনা তাই আমার নামটা জুড়ে দেওয়া হ'য়েছিল। ও একটা ধাপ্পাবাজি।—আর এর মধ্যে আপনার রাস্কেল অমূল্যও আছে এই ব'লে দিলাম।"

নিজের বাড়ীতে বসিয়া অমূল্যর এরকম গাল শুনিতে মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিল—"তা'কে এমন ক'রে গাল দিচ্চেন কেন বলুন তো মশায় ?"

ভদ্রলোক প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়া বলিলেন —"গাল দিচ্ছি সে একটা রাস্কেল বলে। এই নিন, আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই—আপনিও না হয় পড়ুন এটা—ভক্তি উবে যাবে'খন"—বলিয়া পকেট হইতে নথীকরা তিনখানি চিঠি বাহির করিয়া আগন্তুক অমূল্যর হাতে দিলেন, দিয়া বলিলেন—"কখন আসবে বলুন দেখি আপনার

বন্ধু?—দরকার কি বেশী গাল মন্দ করবার?—আমি কাজের লোক…”

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে ভদ্রলোক অনাদৃত লাঠিটা কুড়াইয়া চেয়ারে ঠেস্ দিয়া রাখিল। অমূল্য একবার আড়ে দেখিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।—

প্রথমেই একখানা উকিলের চিঠি—প্রতি অক্ষরটি হুম্‌কিতে ঠাসা—মানহানি, ড্যামেজ এই সব! তাহার মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু কথাগুলো যেন বড় অসংলগ্ন ঠেকিতেছে…

দ্বিতীয় চিঠিটা পড়িতেই তাহার আক্কেল গুম্ হইয়া গেল।—এ সেই তাহার প্যাডে লেখা গল্পের চিঠি—কয়েক দিন হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছে।..তাহার মাথাটা বেশী রকম গুলাইয়া যাইতেছিল। চিঠিটা শেষ করিয়া বিস্মিত ভাবে ভদ্রলোকের পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন—“বন্ধুর চরিত্রটা টের পেলেন তো?—এবার ওর নীচেরটা পড়ুন তা হ’লে জান্তে পারবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েচে।”

অমূল্য তাঁহার কথার অপেক্ষা না করিয়াই সেটাও আরম্ভ করিয়াছিল।—তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জাগিয়া উঠিল এবং হাতটা কাঁপিতে লাগিল। এটা কাদম্বিনীর নিজের হাতের লেখা পত্র, প্রথমেই—‘হাঁলা কালামুখী কুলমজানি’ বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ‘ইতি তোমার যম শ্রীমতী কাদম্বিনী মাইতি’ বলিয়া শেষ হইয়াছে।

অমূল্যর আর বুঝিতে বাকি রহিল না ব্যাপারটা কিরূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং এই উগ্র প্রকৃতির লোকটির হাতে পড়িয়া—কোথায় যে শেষ হইবে তাহাও চিন্তা করিয়া সে চক্ষে ধোঁয়া দেখিতে লাগিল…

আগন্তুক বলিলেন—“গালাগালের তোড়টা দেখলেন? খুব জাঁহাবাজ মেয়ে ।…ওতে আর আসে যায় না কিছু—ওরকম ভাষা আমার সহ্য আছে;—আমার তৃতীয় আর চতুর্থ পক্ষ দু’বছর একসঙ্গে ছিল কিনা—চতুর্থটি শেষে মরেই গেল।…তা’ কাদম্বিনী মাইতির ওপর আমার রাগ নেই। গেরস্তের বউ;—যে তার স্বামীর সঙ্গে ওরকম চিঠিপত্র চালায় তাকে কি নেমন্তন্ন ক’রে…”

অমূল্যর এদিকে মন ছিল না—“দাঁড়ান, আসি একটু” বলিয়া বাধা পাইবার আগেই সে চিঠির তাড়া লইয়া একেবারে প্রায় ছুটিয়াই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * * *

মিনিট ২৫।৩০ পরে সহাস্য মুখে বাহিরে আসিয়া বলিল—“ওঃ, অনেক ক্ষণ বসিয়ে রাখলাম আপনাকে, মনে কিছু করবেন না।—একটা মস্ত ভুল হ’য়ে গেছে…”

ভদ্রলোক আগ্রহ ভরে আরাম-চেয়ারের হাতলে ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। অমূল্য বলিয়া যাইতে লাগিল—“আমারই নাম অমূল্য”—একবার লাঠির দিকে দৃষ্টিপাত করিল—“প্রথম চিঠিখানি আমারই লেখা; তবে বিশেষ কাউকে লেখা নয়—গল্প লেখা রোগ আছে—ওটা তারই একটা অংশ।…আমার স্ত্রীর হাতে পড়ে; তারপর আমার চরিত্রের ওপর সন্দেহ করে তিনি যা’ যা’ করেছেন আপনারা জানেনই। তিনি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত হ’য়ে পড়েছেন; আর আমি তো—”

আগন্তুক প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, তাহার পর তাঁহার প্রচণ্ড হাস্যে ঘরটা কম্পিত হইয়া উঠিল। বেশ বোঝা গেল তাঁহার সরল মনে এই সাত আট দিন ধরিয়া যে দুশ্চিন্তা জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, হাসির তোড়ে পরিষ্কার হইয়া ধুইয়া গেল; বলিলেন—“আরে ছাঃ—একটা কাণ্ড হ’য়েছিল আর কি। ভাগ্যিস্ নামটা আগে বলেননি—হাঃ—হাঃ—হাঃ। আর ভাগ্যিস্ সুচিত্রাকে দেখাইনি চিঠিটা! প্রথমে আমার হাতেই পড়ে কিনা—রক্ত মাথায় উঠে গেল—ছোট্ট উকিলের বাড়ী, বল্‌ল—“আগে অমূল্যকে হুম্‌কি দিয়ে সব কথা বের করে নিতে হবে—নইলে সুচিত্রা মেয়েমানুষ—কোন মতেই ধরা দিতে চাইবে না।…হায়, হায়, মিছে কতই সন্দেহ কর্‌লাম সে বেচারীর ওপর—সে যে কত ভাল—কত চমৎকার…নাঃ, আপনার কাছে—তোমাকে আর আপনি বলি কেন—তোমার কাছে তার প্রশংসা করতে আবার সাহস হয় না—হাঃ—হাঃ—হা…”

অমূল্য বলিল—“সব দোষটা আমাদের—বিশেষ ক’রে আমারই—কিছু লক্ষ্মীছাড়া ‘সাতকড়ে’রও আছে—সে যদি সেদিন ঠিক দুপুরে…”

ভদ্রলোক সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মোটেই না, সব দোষ সাহিত্যচর্চ্চার। হাঃ—হাঃ—হাঃ—সাংঘাতিক জিনিষ—আমার জানা আছে কিনা। ছেলেবেলায় একবার পদ্যর ঝোঁক চেপেছিল—লিখেছিলাম—

মধু খুড়ো নাদা পেটা
গিলতে পারে আস্ত পাঁটা।

"মধুখুড়ো ছিলেন হেড মাষ্টার। আমার বইটাই নিয়ে কেন যে সেদিন ক্লাস একজামিন ক'রতে লাগলেন জানিনা—গেরো! লর্ড মেয়োর নাদুসনুদুস্ ছবিটার নীচে পদ্যটা লেখা ছিল- সেই পাতাটাই গেল উল্টে।—বললেন,—"লর্ড মেয়ো সম্বন্ধে কি জানো বলো"—বলেই পদ্যটার ওপর নজর পড়ে গেল!... আমি লর্ড মেয়োর খুব তারিফ করে বলতে সুরু করে দিলাম; কিন্তু কে শোনে সে সব...

"সেই থেকে পদ্য ছাড়তে হ'য়েছে। সুচিত্রা বলেন—'হেডমাষ্টারই তোমার প্রতিভা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন।' ভদ্রলোক দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিছু পরে একটু দম লইয়া বলিলেন—

"যা হ'ক আপনি খুব বেঁচে গেলেন—আসল কথা আমি ঈর্ষানলে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ডিজ্ঞানশূন্য হ'য়েছিলাম—হাঃ—হাঃ—হা, কেমন?—বইয়ের মত ভাষাটা হ'ল?—আমার আবার ওসব আসে টাসে না। সুচিত্রা তবু বলবে—'তুমি লেখ, কেন পারবে না?'

"আমি বলি 'হেডমাষ্টার প্রতিভাটা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন,—হাঃ—হাঃ—হাঃ"

কবিবর হাফেজ

[কাজী নওয়াজ খোদা]

ফারসী সাহিত্য এরূপ বিত্তশালী যে তার 'লা'লে বাদাখশাঁ' (১) আর 'গওহরে বে বাহা' (২) পরিপুরিত রত্ন-ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ ক'রে যুগ যুগান্তর ধ'রে আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ক'রলেও সে অক্ষয় ভাণ্ডার শেষ হবার নয়, আর তার গুল-বুলবুল, লালা-নার্গিস্ পরিশোভিত ফুলবাগিচা থেকে কুসুমরাজি চয়ন ক'রে বহুকাল ধ'রে আমাদের সাহিত্য-মন্দিরের পূজার অর্ঘ্য সাজালেও সে বাগানের মনোহারিত্ব একটুও কমবার নয়। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের এই উন্নতির যুগেও 'থোড়বড়িখাড়া' আর 'খাড়াবড়িথোড়ে'র মরসুম চ'লছে, প্রকৃত খাঁটি জিনিষের উল্লেখযোগ্য আমদানী এ বাজারে হ'চ্ছে ব'লে মনে হয় না। তাই বলি, শক্তিশালী সাহিত্যিকের দল ফারসী সাহিত্যের দিকে একটু মনোযোগী হ'লে, আর তা থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমাদের সাহিত্য-সৌধ গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রলে একটা কাজের মত কাজ হয়। কিছুদিন থেকে দু-একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'য়েছে, তাঁরা তাঁদের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী সে পথে দু-এক পা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা পেয়েছেন, এইসব দেখে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হ'য়েছে, কিন্তু নানাদিক থেকে এ পথের অন্তরায় অনেক। পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢেউয়ে বাঙ্গলা দেশ থেকে ফারসী সাহিত্যের চর্চ্চা একরূপ ভেসে গিয়েছে। তারপর ফারসী সাহিত্য আরবী ভাষা থেকে এত বেশী উপকরণ সংগ্রহ ক'রে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হ'য়েছে, যে আরবী ভাষায় বেশ জ্ঞান লাভ না ক'রলে ফারসী সাহিত্যের শব্দ-প্রাকার ভেদ ক'রে স্বাধীন ভাবে তার ভাব-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করবার কোন উপায় নেই। আবার বাঙ্গলা ভাষার মধ্যবর্ত্তীতায় সে ভাব ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতাই বা কজনের থাকতে পারে? এরূপ অবস্থায় হিন্দু সাহিত্যিকদের কথা ছেড়ে দিলেও মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ২।১ জন ছাড়া আর কেউ আছে ব'লে আমাদের জানা

(১) মহামূল্য রত্ন বিশেষ। (২) অমূল্য মুক্তা।

নাই। তবে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' রকমের যিনি যা কিছু ক'রেছেন বা করবার মতলব এঁটেছেন, তা জানতে পারলে ফারসী সাহিত্যিকের দল কবরের শান্তিময় কোল থেকে এতদিন পরেও "বেচায়েন" হ'য়ে উঠবেন। Fitzgerald এর দল হয়তো হাসবেন কিন্তু 'ওমর খাইয়ামে'র দল যে নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবেন তা আমরা 'হলফ্' ক'রে ব'লতে রাজী আছি। তা হ'লেও আমাদের সাহিত্যিক মহলে যে এই 'খেয়াল' জেগে উঠেছে আর তাঁরা মাঝে মাঝে তার 'মহলা' দিতে সুরু ক'রেছেন, এও অবশ্য সুখের কথা।

সেদিন দেখ্‌লুম ফাল্গুন সংখ্যার 'বিচিত্রা' হাফেজের 'রোবাইয়াতে'র অঙ্গরাগে অঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ক'রে বের হ'য়েছে। আবার দেখ্‌লুম আমাদের স্নেহাস্পদ তরুণ কবি কাদের নওয়াজ বাবাজীবন উপাসনা পত্রিকায় হাফেজের 'গাজালিয়াতে'র রস নিংড়ে 'উপাসনা'রত পাঠকদের শুষ্ক কণ্ঠ সরস ক'রে দিচ্ছেন। সাহিত্যের বাজারের এসব সুখবর শুনলে আমাদের ঊষর হৃদয়েও আনন্দের নির্ঝরিণী ব'য়ে যায়, অসাড় দেহেও আশার শিহরণী জেগে উঠে। তাই আজ আমরা কবিবর হাফেজের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিতে আর তাঁর 'দীওয়ান' সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলতে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত হ'য়েছি।

পরিচয়

ফারসী সাহিত্যে কবিবর হাফেজের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যতদিন ফারসী সাহিত্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকবে, সুধী সমাজ যতদিন সাহিত্য-আসরের শোভা বর্দ্ধন করবেন, ততদিন হাফেজের নাম সাহিত্য জগত হ'তে লুপ্ত হবার নয়। তাঁর যশোগান চিরদিনই কবির বীণায় ঝঙ্কৃত আর সুধীসমাজে সাদরে গৃহীত হবে।

কবির প্রকৃত নাম মোহাম্মদ। তাঁর অধ্যাপক, পণ্ডিত "শামসুদ্দীন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ" নিজের গৌরবপূর্ণ 'শামসুদ্দীন' (ধর্ম্মের সবিতা) উপাধি তাঁকে দিয়ে পাঠ শেষে বিদায় দিয়েছিলেন। কবি কিন্তু তাঁর কবিতার শেষে 'হাফেজ' নামই ব্যবহার ক'রেছেন। কাব্য-জগতে তিনি এই নামেই সুপরিচিত। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ ঈরাণের 'সর্কান্' নামক একটী ক্ষুদ্র-পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা পল্লীবাস ত্যাগ ক'রে 'সিরাজ' নগরে এসে বসবাস আরম্ভ ক'রেছিলেন। শিক্ষা, সভ্যতা ও আভিজাত্য-মর্য্যাদায় তাঁদের বংশ খুব সুপরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম 'কামালুদ্দীন'। তিনি একজন খুব বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কবি ৭১৫ হিজরী সনে সিরাজ নগরে এই প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। সব প্রথমে তিনি সমগ্র 'কোরান শরীফ্' কণ্ঠস্থ ক'রে 'হাফেজে কোরান' (১) ব'লে সকলের নিকট সুপরিচিত হন। কবিতার শেষে 'হাফেজ' নাম ব্যবহার করার ইহাও একটী কারণ ব'লে অনেকে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। তাঁর বিপক্ষদলের মধ্যে অনেকে তাঁর 'কোরানের হাফেজ' হওয়া সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু সে কেবল তাঁর বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে ব'লেছেন, না হয়তো ভুলই ক'রেছেন। কবি ব'লেছেন—

> এয় চশ্ম ফেরোবোর্দ্দা বখুনে দিলে হাফেজ,
> ফিকরৎ মগার আজ্ ইজ্জাতে কোরআন খোদা নিস্ত।

হে বৈরীদল, হাফেজের হৃদয়ের রক্তরাগে তোমাদের হাত রঞ্জিত ক'রতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছো না, কোরানের সম্মান বলেও কি তোমাদের কিছু ভেবে দেখবার নাই?

আবার তিনি ব'লেছেন—

> নাদিদাম্ খুশতার আজ্ শেরে তুহাফেজ্
> ব কোর্‌আনেকে আন্দার্ সীনা দারী।

হে হাফেজ, তুমি যে সমগ্র কোরান কণ্ঠস্থ ক'রেছ, তারই শপথ নিয়ে ব'লতে পারি, তোমার কবিতার চেয়ে ভাল কবিতা আর কোথাও দেখিনি।

এই সব দেখে তিনি যে নিশ্চয় সমগ্র কোরান মুখস্থ ক'রেছিলেন তা সুধীসমাজ একযোগে স্বীকার ক'রেছেন। বাড়ীতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হ'য়েছিল। তারপর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা শমসুদ্দীন মোহাম্মদের দেশপ্রসিদ্ধ শিক্ষালয়ে তিনি ভর্ত্তী হ'য়ে প'ড়তে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষাগারটী সে সময় সুধী সমাজে খুব প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিল। অনেক দেশ দেশান্তর ও দূর দূরান্তর থেকে বহু আয়াস স্বীকার ক'রে পাঠার্থীর দল এখানে শিক্ষা লাভ

(১) যে সমগ্র কোরান মুখস্থ করিয়াছে
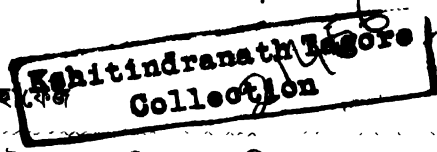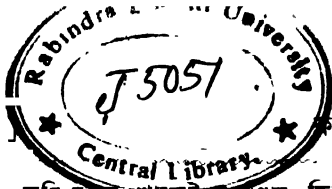
ক'রতে আসতেন। কবি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত নামের পরিবর্ত্তে কবি নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষী হ'য়ে প'ড়েছিলেন। সাধকদের সাহচর্য্য লাভ করতে আর তাঁদের উপদেশ শুনতে তিনি খুব ভাল বাসতেন। ঐতিহাসিকের দল সকলেই তাঁকে পণ্ডিত, সাধক আর শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। ৭৪৫ হিজরী সনে তিনি পারস্যরাজের প্রধান মন্ত্রী হাজী কেওয়া-মদ্দীনের স্থাপিত জগৎবিখ্যাত শিক্ষাগারে প্রধান শিক্ষকের পদে 'বহাল' হ'য়েছিলেন। কিন্তু এই সব ন্যায়ের কচকচি আর দর্শনের চুলচেরা বিচার বিতর্ক তাঁর ধাতে সহ্য হল না, কিছুদিন পরে তিনি একাজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চায় তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলেন।

কবিত্ব শক্তি ও প্রসিদ্ধি

হাফেজ একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কারও কাছে শিক্ষা পেয়ে অথবা কারও পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁকে কবি-প্রতিভা অর্জ্জন করতে হয়নি। প্রকৃতি স্বেচ্ছায় তাঁর জন্য কবিত্ব-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ফারসী ভাষায় 'গজল' রচনা ক'রতে তাঁর সমকক্ষ কবি আর কেউ জন্ম গ্রহণ করেন নি। অধিকাংশ লেখকই এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ দীওয়ান-এ-হাফেজ ফারসী সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর রচিত 'গজলে'র বিশেষত্ব এই যে পণ্ডিতের দল আর ছাত্রের দল, ঈশ্বর-প্রেমিক সাধকশ্রেষ্ঠ আর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লম্পট চূড়ামণি, সকলের নিকটেই তাঁর গজল সমান ভাবে আদর পেয়েছে, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁর গজল পড়ে তাদের রুচি অনুযায়ী তৃপ্তিলাভ করে। তাঁর অনেক 'গজল' সাধারণ কথা বার্ত্তার মধ্যে ব্যবহৃত আর গায়কের মুখে সাধকদের সাধনা-কুঞ্জে আর বিলাসীদের বিলাস-মন্দিরে তান লয় সহযোগে গীত হ'য়ে থাকে। সুরা, সাকী আর প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেম নিবেদন, এই নিয়েই তাঁর অধিকাংশ গজল রচিত হ'য়েছে। কখন তিনি বিরহ-কাতর হৃদয়ে ভোরের বাতাসকে দূতের পদে বরণ ক'রে প্রিয়ার সন্ধানে পাঠাচ্ছেন, আবার কখন সুরার আর সাকীর গুণ গানে আকাশ বাতাস মুখরিত ক'চ্ছেন। এই সব কথার উল্লেখ করে তাঁর সমসাময়িক কোন কোন লেখক তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। পরবর্ত্তী যুগের ২।৪ জনও সেই সুরে সুর মিলিয়েছেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনা করবার সুযোগ পেলে আর পারস্য কবিদের কবিতার ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করলে, হাফেজের বিরুদ্ধে আর কিছু বলবার থাকেনা। তাঁর রচিত কবিতার মধ্য দিয়েই তাঁর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ব'লেছেন—

> মানাম্ কে শোহ্রায়ে আফাক্ এশ্ক্ ওর্জিদান্
> মানাম্ কে দিদা নিয়ালুদা আম্ নবাদ্ দিদান
>
> *　　*　　*　　*　　*
>
> হাফেজা দার্ কুন্জে ফিক্র্ও খিল্ওতে শাব হায়্ তার্
> তা বুওদ্ ভের্দাৎ দোওয়া ও দর্সে কোর্ আ গম মখোর্

অর্থাৎ দেশ দেশান্তরে বাহ্য প্রেমের উপাসক ব'লে আমার দুর্ণাম র'টেছে কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি কখন কুদৃষ্টিতে কারও দিকে চেয়েও দেখিনি। হে হাফেজ, যে যাই বলুক যতদিন তুমি তোমার নির্জ্জন সাধনা-কুঞ্জে তমোময়ী নিশার কোলে 'ধ্যান ধারণায়' আর কোরানের আলোচনায় কাটাতে পারবে ততদিন তোমার দুর্ভাবনার কথা কিছুই নেই।

এই সব পড়লে আর তাঁর কবিতার ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত হ'লে বেশ বুঝতে পারা যায় যে কবি একজন নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। কষ্ট কল্পনা আর স্বভাবের বিপরীত বর্ণনায় তাঁর লেখনী পরিচালিত হ'য়েছে।

জীবদ্দশাতেই তাঁর কবিতার যশঃদুন্দুভি দেশময় বেজে উঠেছিল। তিনি নিজেই একথা ব'লে গিয়েছেন—

> কেগান্দ জাম্জামায়ে শৌক্দার্ এরাক ও হেজাজ
> নওয়ায বাঙ্গ গজাল হায়্ হাফেজে শিরাজ

হাফেজের সুমিষ্ট গজলের পীযূষ-ধারা পানের জন্য সুদূর এরাক ও হেজাজের অধিবাসীরাও তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

হাফেজের আবির্ভাবের কিছুদিন পূর্ব্বেই কাব্য জগতের দিগ্বিজয়ী বীর মহাকবি সাদীর তিরোভাব ঘটেছিল; কিন্তু তখনও তাঁর বিজয়-নিশান সাহিত্য ক্ষেত্রে পত পত ক'রে উড়ছিল, তাঁর যশঃ-সৌরভে তখনও সাহিত্যের আকাশ বাতাস আমোদিত হ'য়ে ছিল; এরূপ অবস্থায় পুরাতন বীণায়

নূতন সুর বাঁধা আর সুধী সমাজে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে বিজয়-মালা অর্জ্জন করা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্ব আর কম গৌরবের কথা নয়।

ইং ১৮৫৬ সালের জুন সংখ্যার 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় একজন পাশ্চাত্য লেখক কর্ত্তৃক সাদী ও হাফেজের নিকট আত্মীয়তার কথা আর উভয়ের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে একটী গল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল। সাহিত্যের বাজারে এই প্রকারের আরও ২।১টী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ; কিন্তু এ সবের মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। ৬৯১ হিজরী সনে সাদীর মৃত্যু হয়, তাঁর মৃত্যুর ২৪ বৎসর পরে ৭১৫ হিঃ সনে হাফেজ জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই এই প্রকারের গল্প গুজব গুলিকে কল্পনাপ্রসূত ও অমূলক ব'লে মত প্রকাশ করেছেন।

হাফেজ তাঁর সারা জীবন জন্মভূমির শান্তিময় ক্রোড়েই অতিবাহিত ক'রেছেন। তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তৎকালীন বোগ্দাদের অধিপতি সোলতান আহম্মদ আর ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সোলতান মহমুদ বাহমনী নানা উপহার ও পাথেয় স্বরূপ বহু টাকা কড়ি তাঁদের বিশ্বস্ত লোক দিয়ে কবির নিকট শিরাজ নগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর তাঁকে তাঁদের রাজ্যে সাদরে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন। সোলতান মহমুদ বাহমনী তাঁর জন্য পারস্যের হুরমুজ বন্দরে একটী সুবৃহৎ অর্ণবযান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কবি জন্মভূমি পরিত্যাগ করে বিদেশ ভ্রমণের কষ্ট সহ্য ক'রতে রাজী হন নাই। সোলতান গিয়াসুদ্দীন ইয়াকুব নামক তাঁর একজন প্রিয় অনুচরকে বহু ধন রত্নাদি দিয়ে শিরাজ নগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছুদিনের মত একবার ভারতবর্ষে আসবার জন্য কবিকে সাদরে আহ্বান ক'রেছিলেন কিন্তু এবারও তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ ক'রে ভারতে আসতে সম্মত হননি।

সাহিত্য চর্চ্চা আর কবিতা রচনার পর কবি অধিকাংশ সময় ধ্যান ধারণা আর সাধনা ভজনাতেই রত থাকতেন। তিনি সাধক-শ্রেষ্ঠ খাজা বাহওদ্দীনের মন্ত্রশিষ্য (মুরীদ) ছিলেন। রাজ দরবারে এবং আমীর ওমারাদের মজলিসে কবি অবাধে যাতায়াত করতেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখতেন। পরোপকারই তাঁর বড় লোকদের দরবারে যাতায়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিকার আর দুঃখ দৈন্য পীড়িত বিপন্নের উদ্ধার সাধনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতেন।

এই সময় পারস্য রাজ্যের বিশেষতঃ শিরাজ নগরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল। সময় সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণে শিরাজ নগরী শ্মশানে পরিণত অধিবাসীগণের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত আর রাজপথ দিয়ে নর শোণিতের খরস্রোত প্রবাহিত হ'তো। হাফেজের সময়েই তাঁর চক্ষুর সম্মুখে সাতবার শিরাজ নগরী আক্রান্ত আর পর পর সাতজন নরপতি কর্ত্তৃক রাজ-সিংহাসন অধিকৃত হ'য়েছিল। চারিদিকে অশান্তি ও বিপ্লববাদের প্রবল ঝঞ্চা ব'য়ে গিয়েছিল। এই সব কারণে তাঁর হৃদয়ে জগতের নশ্বরতার ছবি সম্পূর্ণ রূপে অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি ব'লেছেন—

> ব কারাগ্‌ দিল্‌ জামানে নজরে বমাহ্‌রুয়ে
> বেহ্‌ আঁকে চত্‌রে শাহী ও হামা ওমর্‌ হায্‌ ও হুয়ে

অর্থাৎ আজীবন রাজসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য কোলাহলে যাপন করার চেয়ে এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্ট চিত্তে প্রেমাস্পদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকা ঢের ভাল।

পরাক্রমশালী নরপতি তৈমুর গোরগাণী ভীষণ আক্রমণের পর শিরাজ নগরী হস্তগত করেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই কবিবর হাফেজকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে অনুরোধ ক'রে পাঠান। কবি তাঁর দরবারে উপস্থিত হ'লে তিনি কবিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গ্রহণ ক'রলেন।

তারপর

> আগার আঁ তুর্ক শিরাজী বদাস্ত আরাদ দিলে মারা
> বখালে হিন্দুওয়াশ্‌ বখশাম্‌ সমরকান্দ ও বোখারারা।

এই কবিতাটীর উল্লেখ ক'রে, এটী তাঁর রচিত কিনা তাই জিজ্ঞাসা ক'রলেন। কবি সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখন নবীন নরপতি হাসিমুখে ব'ললেন—হে কবি, সামারকন্দ ও বোখারা আমার প্রিয় জন্মভূমি, আমার ইচ্ছা ছিল যে বহু আয়াসে বহু রাজ্য জয় ক'রে আমার জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করব ; কিন্তু তার পূর্ব্বেই আপনি আপনার প্রিয়ার একটী কৃষ্ণতিলের পরিবর্ত্তে

এক প্রকার বিনামূল্যেই আমার সাধের জন্মভূমি বিলিয়ে দিয়েছেন। কবিও হেসে ব'ললেন—হে রাজন্, ঘর থেকে আরও কিছু দিয়ে সামারকন্দ ও বোখারাকে বিদায় দিইনি, আপনার মর্য্যাদা স্বরূপ কিছু গ্রহণ ক'রেছি। এইতো আপনার পক্ষে বিশেষ সান্ত্বনার কথা। কবির এই সরস উত্তরে তৈমুর যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'য়ে বহু ধনরত্নাদি উপহার দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন

গার্হস্থ্য জীবন

হাফেজ সংসারস্পৃহা-শূন্য একজন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন নাই। কবি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে সংসারধর্ম্ম পালন ক'রতেন। অতিথি অভ্যাগত কেহ কখন তাঁর বাড়ী হ'তে ফিরে যেত না। নিজে উপবাসী থেকেও তিনি অতিথি সেবা ক'রতেন। সময় সময় বিপন্নের উদ্ধার চেষ্টায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে প'ড়তেন। তাঁর সহধর্ম্মিণী একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও আদর্শ রমণী ছিলেন। তাঁর দু'টী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। তার মধ্যে একটী শৈশবেই পরলোক গমন ক'রেছিল।

কবি পুত্রবিয়োগে যার পর নাই মর্ম্মাহত হ'য়ে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী শোক-উদ্দীপক কবিতা লিখেছিলেন—

বুলবুলে খুন্ জেগার খুর্দ ও গুলে হাসল কর্দ
বাদ গয়রৎ বদামাশ্ হাল্ পেরিশাঁ দিল কর্দ
কুর্ৎুল আয়েন মন আঁ মেওয়ে দিল ইয়াদাশ বাদ
কে খুদ আসাঁ বশুদ ও কার মারা মুশকিল কর্দ
আহ্ ফরইয়াদ কে আজ চাশমে হসুদে মাহ ও মেহর্
দার লাহাদগাহ কামাঁ আবরুয়ে মান মনজিল কর্দ

অর্থাৎ, একটা বুলবুল বহু আয়াসে একটী বিকশিত কুসুম লাভ ক'রেছিল; কিন্তু চিরবিরহতাপ অচিরেই তার হৃদয়ের সে সুখশান্তি নষ্ট করে দিল। আমার সেই চক্ষের জ্যোতি, হৃদয়-তরুর সুমিষ্ট ফল সহজেই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল, তার বিরহে আমার কি দুর্দশা হবে তা একবার তার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

হায়, চন্দ্র, সূর্য্য আদি গ্রহগণের ঈর্ষা দগ্ধ হ'য়ে আমার সেই অমূল্য নিধি সমাধিগর্ভে বিলুপ্ত হ'ল।

এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরই কবির সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। এই সব মর্ম্মন্তুদ দুঃখ যন্ত্রণা পেয়ে কবি একেবারে মুষ্ড়ে প'ড়েছিলেন। এবারেও তিনি কতকগুলি শোক-উদ্দীপক, মর্ম্ম-বিদারক কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলি প'ড়লে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তাঁর একটী বিধবা ভগ্নী কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকের যাত্রী হ'য়েছিলেন, তাঁর কয়েকটী অপগণ্ড শিশু সন্তানের ভার এই সময় শোকদগ্ধ কবিকে গ্রহণ করিতে হয়। কবির শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটী মাত্র জীবিত ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর এই ছেলেটী ভারত ভ্রমণে এসেছিল, দুঃখের বিষয় আর তাকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়নি। বোরহানপুর দুর্গে তার সমাধি আজও বর্ত্তমান আছে।

হাফেজ একজন তত্ত্বদর্শী সাধক পুরুষ ছিলেন, তাই অনেকে তাঁর রচিত কবিতা দৈববাণী স্বরূপ মনে করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন গুরুতর কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে তাঁর দীওয়ান-এ-হাফেজ হ'তে সেই কাজের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ আর সিদ্ধি লাভ অথবা বিফল মনোরথ হওয়া সম্বন্ধে সঙ্কেত গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। ভারত সম্রাট হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর দীওয়ান-এ-হাফেজ হ'তে 'ফাল' (শুভাশুভ নির্দ্ধারণ) গ্রহণ না ক'রে কোন বিশেষ কাজে হাত দিতেন না, তাঁদের শাহী কুতুবখানার (বাদশাহী পুস্তকালয়) যে একখানি দীওয়ান-এ-হাফেজ হ'তে তাঁরা শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করতেন, সেখানি আজও বাঁকীপুরের সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। সম্রাটদ্বয় এ সম্বন্ধে 'ইয়াদদাস্ত' (স্মারক লিপি) স্বরূপ সন তারিখ সহ ঐ কেতাবে স্বহস্তে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

একবার ভারত সাম্রাজ্ঞী সাধ্বী নূরজাহাঁ বেগমের রত্ন খচিত মহামূল্য একটী কণ্ঠহার চুরি গিয়েছিল, এই ব্যাপার নিয়ে হারেমের মধ্যে মহা হৈ, চৈ, প'ড়ে গেল, তখন এক প্রহর রাত্রি, তিনি সুগন্ধি দীপ আনবার জন্য সহচরীদের আদেশ দিলেন। যে পরিচারিকা হার চুরি ক'রেছিল ঘটনা-ক্রমে সেই দীপ নিয়ে এল। দীপের আলোয় দীওয়ান-এ-হাফেজ খোলা হ'ল, প্রথমেই একটী কবিতার এই চরণটী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল—

চে দিলাওরস্ত দোজ্দে কে বকাফ্ চেরাগ্ দারাদ্

অর্থাৎ, যে চোর হাতে দীপ নিয়ে চুরি করে তার সাহসের বলিহারি যাই। তখনই সেই পরিচারিকাটীকে ধরা হ'ল। অবশেষে তার কাছেই অপহৃত হার পাওয়া গেল। এই ভাবের অসংখ্য কিম্বদন্তী লোকসমাজে প্রচলিত আছে, এখনও অনেকে দীওয়ান-এ-হাফেজ হ'তে শুভাশুভ নির্দ্ধারণ ক'রে থাকেন। এজন্য হাফেজের আর একটী নাম "লেসানুল্ গায়েব্" বা দৈব-রসনা। জানিনা, এসব গল্পের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা।

দীওয়ান-এ-হাফেজ প্রায় ৩৯০০ গজলীয়াতে পূর্ণ, এই 'গাজালীয়াতে'র জন্যই ফারসী-সাহিত্যে হাফেজ অমর হ'য়ে আছেন। দীওয়ান-এ-হাফেজ ব'লতে এই গাজালীয়াৎই বোঝায়।

শেষ

কবি ৭৯১ হিঃ সনে ৭৬ বৎসর বয়সে জন্মভূমি শিরাজ নগরে এই নশ্বর জগৎ হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর জানাজায় (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া) সকল শ্রেণীর লোক সমাগম হ'য়েছিল। তৎকালীন পারস্যরাজ মন্সুর বিন্ মোহাম্মদ স্বয়ং নগ্ন পদে, নগ্ন মস্তকে তাঁর শবের অনুগমন ক'রেছিলেন। কবি জীবনকালে শিরাজনগরে উপকণ্ঠস্থিত "মোসাল্লা" নামক স্থানটী খুব পছন্দ করতেন, তাঁর রচিত গজলেও তিনি তার উল্লেখ ক'রেছেন; তাই সকলে একমত হ'য়ে সেখানেই কবির অন্তিম-শয্যা রচনা ক'রেছেন। তাঁর সমাধি-মন্দির একটী তীর্থ-স্থানে পরিণত হ'য়েছে, এখনও বহু দেশ দেশান্তর থেকে সেখানে যাত্রী সমাগম হয়।

ত্রয়োদশী

[শ্রীরাধারাণী দত্ত]

বাল্য-কৈশোরের সন্ধি বয়ঃ ত্রয়োদশ।
যৌবনের মায়াপুরী জাগিছে অদূরে।
অন্তঃকর্ণে ভেসে আসে অতি মৃদুস্বরে
রিমি ঝিমি শব্দ এক। অতি দূরতম
গিরি-নির্ঝরিণী জল-কল্লোলের সম
সুমধুর। হ'ল হৃদি বিধুর বিবশ
সে অপূর্ব্ব কলতানে। বিস্ময়ে মোহিত
নেহারিছে দশ দিশি; আঁখি সচকিত,
আরণ্য-হরিণীসম,—বাঁশরী-ঝঙ্কার
প্রথম প'শেছে যেন মুগ্ধ কর্ণে তা'র।

অচেনার স্বপ্নজালে নয়ন বিভোর;—
অজানারে জানিবারে মর্ম্মে জাগে তৃষা!—
সর্ব্ব তনু মন প্রাণে পুলকের ঘোর;
অদূর-যৌবন,—আধ-আলোছায়া-মিশা।

কাকজ্যোৎস্না

(উপন্যাস)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

ঘড়িটা বুঝি ঠিকমত চলিতেছে না। দুইটা কুড়িতে কলিকাতার ট্রেণ আসিবে। সেই গাড়িতেই প্রদীপের ফিরিবার কথা। আসিয়া পৌঁছিলে হয়!

অরুণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"ষ্টেশনে গাড়ি থাকবে ত' ?"

স্বামী ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, স্ত্রীর কথায় একটু থামিয়া একটা শোকাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিলেন,—"আর গাড়ি!"

সেই স্তব্ধ স্তম্ভিত ঘরে কথার অর্থটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বারোটা বাজিয়া ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যেন আট্‌কাইয়া গেছে,—সুধী-র জীবনে দুইটা কুড়ি বুঝি আর বাজিল না! প্রদীপের ফিরিয়া আসিবার আগেই প্রদীপ নিভিবে।

আকাশ ভরিয়া তারা জাগিয়াছে,—কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি জীবন! সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া কি বিস্তীর্ণ পথ, কি অপরিমেয় ভবিষ্যৎ! অবনী বাবু জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলেন; রাস্তায় দূরে বাতি-থামের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে শুধু। সুষুপ্ত, প্রশান্ত রাত্রি।

ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুধী-র শিয়রের কাছাকাছি পিল্‌সুজের উপর মাটির বাতি জ্বালানো। সুধী বুঝি একটু চোখ চাহিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ছেলের আরো নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতে আসিতে স্বামীকে কহিলেন,—"সল্‌তেটা একটু বাড়িয়ে দাও শীগগির। সুধী কি যেন চাইছে।"

তারপর ছেলের আর্ত্ত মলিন মুখের কাছে মুখ আনিয়া কোমলতর কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সুধী, বাবা, কিছু বলবে ?"

সুধী নিঃশব্দতার অপার সমুদ্রে ডুবিতেছে; জিহ্বায় ভাষা আসিল না,—দুর্ব্বল ডান হাতখানা মা'র কোলের কাছে একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া কি যেন ধরিতে চাহিল।

অরুণা কহিলেন,—"এ পাশে একটু সরে' এস বৌমা, বুঝি তোমাকে খুঁজছে।"

নমিতা স্বামীর পায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—গভীর রাত্রির যে একটি প্রশান্তিপূর্ণ অনুচ্চারিত বাণী আছে নমিতা তাহারই আকারময়ী। শাশুড়ির কথা শুনিয়া নমিতা নতনেত্রে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অরুণা কহিলেন,—"এ-সময়ে আর লোকলজ্জা নয় মা, তোমার ঘোম্‌টা ফেলে দাও! সুধী! মিতা, তোর মিতা—এই ছাখ্, কিছু বল্‌বি তাকে ?"

সুধী বোধ হয় একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিল না।

ঘরভরা লোকজনের মধ্যেই নমিতা অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া সজল চোখে স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—কেহ না থাকিলে হয়ত সকল লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অনেক কথা কহিত, হয়ত একবার বলিত, "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ, কত দূরে? সেখানে কাহাকে সঙ্গী পাইবে? তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিয়ো, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিব কি করিয়া ?"

অরুণা নমিতাকে সুধী-র পাশে বসাইয়া দিয়া তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত করতলে মুমূর্ষু সন্তানের শিথিল হাতখানি অর্পণ করিলেন। নমিতা দেখিল হাতখানি ঠাণ্ডা, যেন অব্যক্ত স্নেহে সিক্ত হইয়া আছে! মনে পড়িল, মাত্র সাত মাস আগে এই হাতখানিরই কুলায়ে ভীরু পক্ষীশিশুর মত তাহার দুর্ব্বল কমনীয় হাতখানি রাখিয়া এক উজ্জ্বল দীপালোকিত সহস্রকলহাস্যমুখর উৎসব-সভায় সে সর্ব্বাঙ্গে প্রথম পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছিল। আজো বুঝি তাহাদের নূতন করিয়া বিবাহ হইতেছে! নমিতার আজ নববধূর বেশ—সে আকাশচারী মৃত্যু,—প্রতীক্ষামগ্ন দুই চক্ষু মেলিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। তোমরা উলু দিতেছ না কেন? আলো নিভাইয়া দাও, রাত্রির এই প্রগাঢ় প্রচুর অন্ধকারকে অবিনশ্বর করিয়া রাখ!

মৃত্যু আসিতেছে, ধীরে, অতিনিঃশব্দপদে—নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে প্রশান্ত গোধূলির মত! কেহ কথা কহিয়ো

না, মৃত্যুর মৃদুপদপাত শুনিবার আশায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া থাক! চোখের জল ফেলিয়া মৃত্যুর সুসমতল পথকে অপরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়ো না—একটি ক্ষীণায়ু মাটির প্রদীপে আকাশে আর একটি নূতন তারার জন্ম হউক! তাহাকে চিনিয়া লও!

অবনীনাথ চেঁচাইয়া উঠিলেন—"জানলাটা খুলে দাও শিয়রের,—পথ আট্‌কে রেখ না।"

কে একজন শিয়রের জানালা খুলিয়া দিল,—অদূরে মাঠের উপর শিশির পড়িয়া শেফালিকা গাছে ফুল ফুটিতেছে; মাটির আবরণ দীর্ণ করিবার জন্য নূতন তৃণাঙ্কুর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; এত রাত করিয়া তারার ভিড়ে চাঁদ উঠিতেছে!

আরেকজন কহিল,—"আপনি অত অস্থির হবেন না মেসোমশাই।"

অবনীনাথ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিলেন—"পাগল! অস্থির আর হ'তে পারি কই, সত্য! আমাদের শরীর এমন সব স্নায়ু দিয়ে তৈরি যে অস্থির সে হ'তেই শেখেনি। আমরা ত' আর আগ্নেয়গিরি নই!" দুই-পা হাঁটিয়া আবার দাঁড়াইলেন—"শুনেছি ভগবান যোগে ব'সে আছেন সমাহিত হ'য়ে আর প্রকৃতি রাজ্য চালাচ্ছেন, বিধাতাকে আমি দুষ্‌বো না। আমি স্থির, হয়ত ভগবানেরই মতো। আমি ভাব্‌চি ছেলে মরেছে বলে' আমি বড় জোর একদিন কোর্ট কামাই করতে পাব—আমাকে একটা সাত-লাখ টাকার মোকদ্দমার রায় লিখ্‌তে হবে। আমি ভাব্‌ছি, পর্শু আমার লাইফ্-ইন্‌সিয়োরেন্স্-এর 'প্রিমিয়াম্' পাঠাবার শেষ তারিখ। আমার কি অস্থির হওয়া চলে?"

মধ্য রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি মন্থর হইয়া আসিয়াছে,—এত নিঃশব্দতা বুঝি সহিবে না। আত্মীয় পরিজনের অন্ত নাই,—সবাই প্রশস্ত ঘরে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। এখন সবাই সেবাশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—শেষ নিঃশ্বাস পতনের প্রতীক্ষায়। পরিবারের শিশুগুলি অন্য ঘরে দাসীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে,—কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়া গত রাত্রে শোনা পথিক রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখিতেছে, কেহ বা বসিয়া আপন আপন মা'র কথামত অর্থহীন অসম্পূর্ণ ভাষায় অচেনা ভগবানের কাছে অসম্ভব প্রার্থনা করিতেছে। সমস্ত ঘরে সুগম্ভীর শান্তি বিরাজমান। অবনী বাবুর লঘু পদশব্দ ছাড়া কোথা হইতেও একটি অস্ফুট কোলাহল হইতেছে না। সৃষ্টি যেন গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া একটু দাঁড়াইয়াছে।

এইটি সুধী-র পড়িবার বসিবার শুইবার ঘর। এই ঘরেই একদিন পড়িতে পড়িতে সুধী পিছন হইতে বাবার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল—"রংপুরে একটি মেয়ে দেখে এলাম,—প্রতিমার চেয়েও সুন্দর। সামনে ফাগুন মাস, কবিরা বলেন কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত,—তোমাকে একটি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান দিচ্ছি।" সুধী একটু হাসিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—"কার্ল মার্কস্-এর কোনো জায়গায় এমন কথা লেখা নেই, বাবা।" অবনীনাথ বলিয়াছিলেন—"তা না থাক্, নমিতা এখন নমি-ন্যালি আস্‌ছে, তার জন্যে তোমার এক্‌জামিনের মার্কস্ কম্‌বে না।" শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য আপত্তি টিঁকে নাই, পঞ্চদশী নমিতাকে বিস্তৃত শয্যার একটা সঙ্কীর্ণ অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। এই ঘরেই সুধী বোকার মত (প্রত্যেক স্বামীই বিবাহের প্রথম রাত্রির প্রথম সম্ভাষণে একটু বোকা হয়) নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আমাকে তোমার ভালো লাগ্‌বে?" নমিতা নিঃশব্দে কতগুলি ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল—"একবার যখন বিয়ে হ'য়েই গেছে তখন আর ভাল লাগালাগির কথাই নেই। আমাকে আরেকটু বড়ো হ'তে দিয়ে বিয়ের আগে দেখা করে' মতটা জিজ্ঞেস করলেই পারতে!" মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, সুধী-র এত ভাল লাগিয়া গেল যে ফের বোকার মত বলিয়া বসিল—"দেখো, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগবে।"·· একুশ বছর ধরিয়া সুধী এই ঘরে বসিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়াছে ইস্কুলে পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইয়াছিল পণ্ডিত মশাই হইয়া ছেলেদের বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবার মত সুখ বুঝি আর কোথাও নাই; থার্ড ক্লাশে উঠিয়া সে ভাবিয়াছিল যে সে মোক্তার হইয়া শাম্‌লা আঁটিবে ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখিয়া মুন্সেফের পেস্‌কারকে ভয় দেখাইবে। ষোল বছর বয়সে সুধী কীট্‌সের *Endymion* পড়িয়া একটী অপরিচিত ভাববিলাসী ব্যর্থ প্রেমিকের বেদনার স্বপ্নে তাহার স্বল্প-প্রসার ভুবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; বি, এ পাশ করিয়া কঠিন রক্তাক্ত মাটিতে পা রাখিয়া সীমাশূন্য আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই ফুস্‌ফুস্ ভরিয়া

প্রচুর বাতাস নিতে নিতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল স্বাধীন গর্ব্বিত ভারতের—উপরে উদার উজ্জ্বল আকাশ, পদনিম্নে উত্তুরঙ্গ উদ্বেল সমুদ্র! এই ঘরে বসিয়াই।

পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অরুণাকে দেখিবে এস,—মা'কে! চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছেন। যে হাত খানা দিয়া নমিতা স্বামীর হাত ধরিয়া আছে সেই হাতখানি অরুণা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। কত দিন ধরিয়া যে ঘুমান নাই তাহা তাঁহার হতাশ স্থির দুই চক্ষু-তারকা দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব,—সব শ্রান্তি ও প্রতীক্ষার আজ চরম অবসান হইবে। অরুণার মন বাইশ বছর পূর্ব্বের অতীততীরে উড়িয়া গিয়াছে। বাইশ বছর পূর্ব্বে অরুণা এই সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল,—একটি বৎসর ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই যখন অরুণার প্রথম সন্তান সম্ভাবনা হইল তখনকার সেই সুখরোমাঞ্চময় অনুভূতিতে বিস্ময়ে সে বাণীহীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছিল। নভচারী কোন্ নক্ষত্র হইতে একটি জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ মর্ত্তলে প্রাণ পাইবার আশায় তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে,—যেন কোন্ অতিথি আত্মা—আত্মপ্রকাশের বিপুল ব্যাকুলতায় অরুণাকে মিনতি করিতেছে। সে-দিন মনে আছে অরুণা গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া নক্ষত্রমণ্ডিত অবারিত আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামী ডাকিতে আসিলে তাহার মনে হইয়াছিল, যে ক্ষুদ্র মাংস-পিণ্ডটা তাহার জঠরে আকারহীন অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া আছে তাহা একদিন দৈর্ঘ্যে আয়তনে ও বলশালিতায় ঐশ্বর্য্যময় হইয়া উঠিবে—সৃষ্টির এই গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতায় অরুণার মন সুখাবেশে অবশ হইয়া পড়িল! এই ভ্রূণ একদিন কর্ম্মে সাহসে তেজে দীপ্তিতে অগ্রগণ্য হইবে, হয় ত বা ভালবাসিয়া একটি নিখিলব্যাপ্ত বিরহবেদনার কবি হইবে কে বলিতে পারে! কিন্তু সে যে আবার একদিন ক্ষণস্বপ্নের মত কয়েকটি বর্ণের বুদ্বুদ তুলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহা কে কবে ভাবিয়াছিল! আর দু'টি মাত্র মুহূর্ত্তের পর অরুণা কি বলিয়া ও কতখানি জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এতগুলি বৎসর ধরিয়া সে যত আকাঙ্খা করিয়াছে যত স্নেহ বর্ষণ করিয়াছে তাহার এই ভয়ঙ্কর অকৃতার্থতা সে সহিবে কি করিয়া? ভালবাসা এত ভঙ্গুর কেন, আশা কেন এত অসহায়? উৎসবের অবসানের চেয়ে উৎসবের ক্ষণ-স্থায়িতা-ই অধিকতর অশ্রুময় বলিয়া কি আকাশের আনন্দ আজো ফুরায় নাই?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে অরুণার এক সময় মনে হইল আজিকার রাত্রিটি তাহার জীবনের সাধারণ রাত্রিগুলির মত-ই একটা। পরীক্ষার সময় মাঝ রাতে উঠিয়া ঘুমন্ত সুধীকে পড়িবার জন্য জাগাইয়া দিতে হইত,—গায়ে ঠেলা দিলেই বুঝি সুধী এখনি হাত পা মেলিয়া তেমনি জাগিয়া উঠিবে। টেবিলে আলো জ্বালিয়া সুধী পড়িতে বসিলে অরুণা ছাতে উঠিয়া আকাশের কাছে সন্তানের কুশল প্রার্থনা করিবে, অন্ধকার স্বচ্ছতর হইয়া আসিতে থাকিলে মাঠে নামিয়া আসিয়া ফুল কুড়াইয়া ছেলেকে গিয়া উপহার দিবে। অরুণার মনে হইতেছিল খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চাহিয়া দেখিলেই দেখিবে যে এই রাত্রির চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি জাগিয়া জাগিয়া এতক্ষণ একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এই ভাবিয়াই তিনি চক্ষু বুজিলেন, হঠাৎ একটা অসংলগ্ন চীৎকারে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন অবনীনাথ দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন।

ব্যাপারটা আবার আয়ত্ত হইল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় অরুণার চক্ষুপল্লব ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, নিদ্রা যে শোকমাধুর্য্যপূর্ণ বিস্মৃতি আনিয়া দেয় তাহারই নদীতে তিনি এইবার স্নান করিবেন। এই ঘর দুয়ার স্বামী পুত্র—সব অপরিচিত আত্মীয়: এত দিনের কঠিন কদর্য্য ক্লান্তির পর আজ তাঁহার ঘুম আসিবে। অরুণা ছেলের পাশে শুইয়া পড়িলেন।

ইহার পর আর দুইটি মিনিট্-ও বুঝি কাটিল না। রাস্তায় কিসের একটা শব্দ হইতেই সবাই অসঙ্গত প্রত্যাশায় সচকিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ ফিরিয়া আসিল বুঝি। না; মৃত্যুর পদপাত শব্দময় নয়, তাহা অনুভূতির মতই অব্যক্ত!

সমস্ত আত্মীয়বন্ধু সুধী-র আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল; একটা বিয়াল্লিশ মিনিটের সময়

সুধী যে নিশ্বাস ত্যাগ করিল তাহা আর ফিরিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার জন্য বাতাস ফুরাইয়া গেছে।

আশ্চর্য্য, অরুণার ঘুম ভাঙিল না। অবনীনাথ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া ফুঁ দিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন: চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"খবরদার, কেউ কাঁদতে পাবে না—সবাই চুপ করে' থাক, কারু মুখ থেকে যেন একটাও শব্দ না বেরোয়, ওকে চ'লে' যেতে দাও।"

খোলা জান্‌লাগুলি দিয়া বন্যার মত অজস্র অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল—মৃত্যুর নিঃশব্দ তরঙ্গ। চাঁদ কখন অস্ত গিয়াছে,—আকাশে হঠাৎ মেঘ করিল নাকি,—রাত্রি বোধ হয় আত্মঘাতিনী হইল। ঘরে যতগুলি লোক ছিল অবনীনাথের আকস্মিক আর্ত্তনাদে একেবারে হতবাক হইয়া গেছে, নিস্পন্দ নিরালম্ব—কাহারো মুখে কথা ফুটিতেছে না। অবনীনাথ ঘরের মধ্যখানে একটা স্তম্ভের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর নমিতা কি করিবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে স্বামীর হিম শক্ত বাহুটা দুই হাতে মুঠি করিয়া আঁকড়িয়া রহিয়াছে।

২

দুইটা-কুড়ির গাড়িতে প্রদীপ যখন কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া ফিরিল তখনো সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে সুধী মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আনিয়া সে ভালই করিয়াছিল নতুবা অরুণাকেও আর ফিরানো যাইত না।

ষ্টেশনে সোফার্ গাড়ি নিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রদীপ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া প্লাটফর্মে'র বাহির হইতেই ড্রাইভার ডাকিল, "এই যে!"

প্রদীপ ডাক্তারের ব্যাগটা মোটরে তুলিয়া দিবার আগেই ভয়-ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল,—"কেমন আছে এখন?"

মোটরে ষ্টার্ট দিয়া সোফার কহিল,—"তেমনি।"

কপালের উপর চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িতেছিল, বাঁ হাত দিয়া কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে দিতে প্রদীপ কহিল,—"খুব হাঁকিয়ে চল, হরেন। দশ মিনিটের মধ্যে পৌছনো চাই।"

হরেন গাড়ি ছাড়িল। ডাক্তার যেন একটু ভয় পাইয়া বলিলেন,—"পথে য়্যাক্‌সিডেণ্ট করে' রোগীর সংখ্যা বাড়ালে বিশেষ সুবিধে হবে না। যে পথ-ঘাট,—আস্তেই চল হে।"

সরু, আঁকাবাঁকা পথ—নির্জ্জন নিস্তব্ধ, যেন একেবারে মরিয়া রহিয়াছে। দুই ধারে বড় বড় গাছ যেন নিশ্বাসরোধ করিয়া অন্ধকার আকাশের অনুচ্চারিত রোদন শুনিতেছে—একটিও পাতা নড়িতেছে না। প্রদীপ অনেকদিন ঘরের বাতি নিভাইয়া সুধী-র সঙ্গে সাহিত্যালোচনার অবকাশে গভীর রাত্রে মাঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সে-রাত্রির স্তব্ধতা যেন একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বেদনার লাবণ্যে মণ্ডিত ছিল, কিন্তু আজিকার এই নির্ম্মম নিঃশব্দতা প্রদীপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখবেন। ছোট কচি বৌ,—সাম্‌নে ওর বিশাল ভবিষ্যৎ! চমৎকার ছেলে, কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল!"

ডাক্তার কহিলেন,—"ছোট একটু হৃৎস্পন্দন নিয়েই মানুষের এই সুদৃঢ় দেহ, সুদীর্ঘ জীবন। এই স্পন্দনটুকু বন্ধ হ'লে বিজ্ঞানও বোবা হ'য়ে গেল। আমাদের সাধ্য আর কতটুকু, ভগবান ভরসা। বাড়ি আর কতদূর হে? তোমাদের হরেন যে এরোপ্লেন্ চালিয়েছে! দেখো।"

ডাক্তারের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া প্রদীপ সুখী হইল না বটে, কিন্তু একবার অসহায় অন্ধ বিশ্বাসে ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া লইতে পারিলে যেন গভীর স্বস্তি লাভ করিত। এই অপরিমেয় স্তব্ধতা ও প্রগাঢ় প্রসুপ্তির মধ্যে মনে মনে ঐ প্রকার একটা স্বীকারোক্তি যেন অসঙ্গত হইত না। যে অবিশ্বাসী সমস্ত জীবন নাস্তিকতা প্রচার করিয়া মৃত্যুশয্যায় অনুমিত ভগবানের কাছে অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা চাহিয়াছিল তাহাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া প্রদীপ সহসা বলিয়া উঠিল, "এই এসে পড়েছি ডাক্তারবাবু। আপনি ঘুমুচ্ছেন নাকি? আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

এই মাঠটুকু পার হইলেই বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবে। ডাক্তারবাবু এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই ঝিমোনো সুরু করিয়াছেন: দেখিয়া প্রদীপের এত রাগ হইল যে উপকার পাইবার আশা না থাকিলে হয় ত মুখের উপর দুইটা ঘুসি মারিয়া দিত। কোন নামজাদা বড়

ডাক্তারই এত রাতে এই অসময়ে দূরে আসিতে রাজি হয় নাই, তাই এই চার টাকার ডাক্তারকে সে ধরিয়া আনিয়াছে; তাও কত সাধ্য সাধনা করিয়া। ফী যাহা চাহিয়াছেন তাহা জমাইতে তাঁহার এক বৎসর লাগিবে। রোগীর আত্মীয়বর্গকে আশ্বাস দিবার মিথ্যা কলাকৌশলটা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ডাক্তার বাবু এই যাত্রা সারিয়া গেলেন।

গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। হরেন হর্ণ বাজাইতে যাইতেছিল, প্রদীপ বাধা দিল। বাড়িতে কোনো ঘরে একটাও আলো জ্বলিতেছে না,—সুধী-র ঘরেও না। ব্যাপার কি? সুধী বুঝি একটু ঘুমাইয়াছে। আঃ, প্রদীপ সুখে নিঃশ্বাস ফেলিল। সকাল বেলা যখন ডাক্তার আনিতে কলিকাতা যায় তখনো সুধী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, বিবর্ণ হইয়া ছটফট্ করিতেছিল,—এখন যদি তাহার চোখে তরল একটি তন্দ্রা নামিয়া থাকে, তাহা হর্ণের শব্দে ভাঙিয়া যাইতে পারে। প্রদীপ ডাক্তারকে লইয়া নিঃশব্দে নামিয়া যাইবে। পার্শ্ববর্ত্তী কোন্ এক গ্রামের কে-এক সন্ন্যাসী কি-একটা শিকড় বাঁটিয়া খাওয়াইয়া সুধীকে নিরাময় করিয়া তুলিবে—এমন একটা কথা প্রদীপ শুনিয়া গিয়াছিল। হয় ত' সেই সন্ন্যাসীর ওষুধ খাইয়া সুধী শরীরের সকল ক্লেশ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় ত' এই ডাক্তারকে আর দরকারেই লাগিবে না; টাকাগুলি গুনিয়া-গুনিয়া ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিয়া উহাকে বিদায় দিতে উহার যে কী ভাল লাগিবে বলা যায় না। ডাক্তারকে বরখাস্ত করিয়া একটা সন্ন্যাসীর অলৌকিক ওষুধের অসম্ভবপর সাফল্যে সে হঠাৎ বিশ্বাস করিতেছে ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল না। সে যাহাকে প্রত্যক্ষরূপে লাভ করে নাই বলিয়া অস্বীকার করে পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না এমন যুক্তি সে আজ গ্রহণ করিবে না। প্রদীপ কাণ খাড়া করিয়া রহিল। একটিও শব্দ আসিতেছে না,—সমস্ত নীরবতা যেন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুধী-কে ঘুমাইতে দেখিয়া সবাই হয় ত' সাময়িক অনুদ্বেগে একটু বিশ্রাম করিতেছে; নিভৃত ঘরে খালি নমিতা-ই হয় ত' জাগিয়া শিয়রে বসিয়া আছে নির্নিমেষ চোখে; হয় ত' লজ্জিত ভীরু করতলখানি স্বামীর কপালের উপর রাখিয়া ভগবানকে সুধী ভাবিয়া-ই মনে মনে তাহার কাছে অসংখ্য আব্দার করিতেছে। তাহা হইলে প্রদীপও আজ আঠারো রাত্রির বিনিদ্রতার শোধ লইবে; কিম্বা, নমিতা যদি তাহার উপস্থিতিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে প্রদীপ সেই ঘরে বসিয়াই ম্লান দীপালোকে তাহার ও সুধী-র অসমাপ্ত উপন্যাসখানির কিয়দংশ আবার লিখিতে চেষ্টা করিবে। উপন্যাসের নায়ককে মারিয়া ফেলিয়া তাহারা সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল; তাহা হইলে, উপন্যাসকে অত সহজ করিয়া সমস্যাকে অযথা খর্ব্ব করিয়া তুলিবে না।

কে যেন বাড়ির সদর দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। প্রদীপ চাহিয়া দেখিল,—এ কি, সুধী! প্রদীপ চমকিয়া উঠিল,—সুধী যে দিব্যি হাঁটিতে পারিতেছে! সন্ন্যাসীদের এবার হইতে দেখা পাইলেই প্রদীপ পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইবে; চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটা কঙ্কালের কাহিল চেহারা এমন বলশালী হইয়া উঠিল! সুধী দরজাটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রিষ্ট্-ওয়াচে সময় দেখিয়া লইল, তাহাকে এখুনি ট্রেণ ধরিতে হইবে। হঠাৎ প্রদীপের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সুধী অল্প একটু হাসিল—সেই পরিচিত নির্ম্মল হাসি, কত দিন এই হাসি সে দেখে নাই—তারপর ডান হাতটা একটু তুলিয়া স্পষ্ট কহিল, "চল্লাম, কথা বল্বার এখন আর সময় নেই।" বলিয়াই সিঁড়ি হইতে নামিবার জন্য পা বাড়াইল। প্রদীপ বলিতে চাহিল; 'এই রাত করে' কোথায় যাচ্ছিস্, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে।' কিন্তু সুধী-কে আর দেখা গেল না,—ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে!

প্রদীপ চোখ কচ্‌লাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল: "বাড়ির ভেতর থেকে কে বেরুল রে হরেন?" দেখ্‌লি নে? মোটর নিয়ে ফের ষ্টেশনে চল্। ও কি হেঁটেই যাবে নাকি?"

হরেন একটা লণ্ঠন জ্বালাইতে-জ্বালাইতে কহিল,—"কে আবার গেল? পথের একটা কুকুর।"

ডাক্তারবাবু সিট্-এ ঠেসান্ দিয়া তখনো ঘুমাইতেছেন; প্রদীপ তাঁহার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল; "আপনার ঘুমুবার জন্য খাট পেতে রেখেছি, উঠে আসুন দিকি।"

কথাটা ডাক্তারের কানে গেল না, কিন্তু ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং "এত রাতে জেগে থাকার অভ্যেস নেই" বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

অতি নিঃশব্দ পদে উঠান পার হইয়া প্রদীপ বারান্দাতে উঠিল। সমস্ত বাড়ি যেন প্রগাঢ় প্রসুপ্তিতে অবগাহন করিয়াছে,—এই ঘুম যেন আর ভাঙিবে না। বারান্দার কিনারায় দুইটি অপরিচিত লোক চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, প্রদীপকে দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইল না পর্য্যন্ত; প্রদীপ-ও তাহাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন-ও বোধ করিল না। এই গহন নীরবতা তাহার সকল উদ্বেগের উপশম করিয়াছে; সুধী এখন একটু ঘুমাইয়াছে বলিয়া-ই কেহ একটি-ও শব্দ করিতেছে না;—বাতি নিভাইয়া সবাই তাহার ক্লান্তিমুক্ত নবজাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রদীপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"এই, বাঁয়ে আসুন্। আলোটা একটু এ-দিকে, হরেন।"

চৌকাঠ ছাড়াইয়া ঘরে পা দিতেই প্রদীপ একেবারে বসিয়া পড়িল। যে-শোক প্রথম অভাবিত বিস্ময়ের আবেগে স্তব্ধ হইয়া ছিল তাহা আর সম্বরণ করা গেল না। প্রদীপ যেন মূর্ত্তিমান্ ব্যর্থতার মত আসিয়া দেখা দিয়াছে,—নিরুদ্ধ শোক দিকে দিকে আবারিত ও অজস্র হইয়া উঠিল! হরেন্ লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল,—আর, প্রদীপ অশ্রুলেশহীন শুষ্ক কঠোর চোখে সুধী-র মৃত্যুকলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া চোখের পলক আর ফেলিতে পারিল না।

ইঁদুরের মত নিঃশব্দে ডাক্তার সরিয়া পড়িতেছিলেন, অবনীবাবু স্বাভাবিক সংযত কণ্ঠে কহিলেন,—"অমন বোকার মতো কাঁদে না, হরেন্। যা, ডাক্তারবাবুকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয় গে—চারটা চুয়াল্লতে একটা গাড়ি আছে। ভদ্রলোকের এতটা কষ্ট হ'ল। অমন হাঁ' করে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রদীপ। ওঁর ভিজিটের টাকা দিয়ে দাও, এই নাও দেরাজের চাবি।"

ডাক্তারবাবু বারান্দায় আসিয়া কাহাকে বলিতেছিলেন,—"মফঃস্বলে আমরা সচরাচর বত্রিশ টাকা নিয়ে থাকি। কর্ত্তাকে বল্‌বেন ফের্‌বার ভাড়াটা যেন সেকেণ্ড্ ক্লাশের হয়।"

অবনীবাবু প্রদীপের হাতে তাঁহার দেরাজের চাবিটা গুঁজিয়া দিলেন বটে, কিন্তু প্রদীপ নড়িতে পারিতেছিল না। সে ব্যথিত হইবে না বিস্মিত হইবে, কাঁদিবে না সান্ত্বনা দিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতচেতন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই পৃথিবী, যাহার বিপুলতা মানুষের নির্দ্ধারণের নহে, সেই পৃথিবীর কোথাও সুধী-র চিহ্ন রহিল না,—এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতে সুধী-র দিবাস্বপ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেল,—একাকী সুধী কত দূর পথে যাত্রা করিয়াছে তিমির-গহন রুক্ষ পথে অনির্ণীতের সন্ধানে—ভাবিতে-ভাবিতে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া সিগারেট্ ধরাইল।

—

(ক্রমশঃ)

দীওয়ান-এ-হাফেজ

[কাদের নওয়াজ]

"আগার আঁতুর্কে শিরাজী বদাস্ত আরাদ দিলে মারা"
(মূল ফারসী কবিতার সুরুর চরণ)

প্রাণ যদি মোর প্রণয় ভরে চায়:সে নিতে নিঠুর প্রিয়া
গালের কালো তিলের বদল দেখ্‌বে তখন এ মোর হিয়া—
বিলিয়ে দিবে সমরকন্দ(১) ও বোখারাকে(২) তাহার করে
মিট্‌বে ইহ, পরকালের সব আশা মোর চিরতরে
মিল্‌বে না আর এমন সুযোগ এখন তুমি কোথায় সাকি
সঞ্জীবনী আঙুর-সুরা গেলাস্ গেলাস্ দাও ঢালিয়া
'মোসাল্লা'(৩) ও রোক্‌নাবাদের(৪) ঝর্ণা'পাশে এক চুমুক্
পাই যদি হায় গোলাপী রস তুচ্ছ তবে স্বর্গসুখ
ব'ল্‌ব কি আর নিঠুর 'পিয়া' তুর্ক দেশের দস্যু সম
পালিয়ে গেছে মোর মরমের সহিষ্ণুতার বিত্ত নিয়া
অপূর্ণ এই প্রেমের কামী নয়, প্রেয়সী মোর হৃদয়ের
সুন্দরী সে, তার কাছে হায় নাই প্রয়োজন প্রসাধনের
জানি আমি সেই সে 'য়ুসফ্' যার মূরতি স্বপ্নে হেরি'
বাদ্‌শাজাদী 'জোলেখা' তার কুল হারালো প্রণয় দিয়া
জ্ঞান-গরিমার তত্ত্ব নিয়ে কাজ কিরে তোর আলোচনায়
সৃজন দিনের রহস্য কেউ পারবে নাক' ব'লতে ধরায়
তার চেয়ে আজ ধর্‌না রে তুই সুরার গীতি সোহাগ ভরে
গায়িকাদের গান শুনি তোর উঠ্‌ক্ গেয়ে মন-পাপিয়া
দিল্-পিয়ারী হে মোর প্রিয়ে শ্রবণ কর' মোর উপদেশ
যুক্তি এ মোর ক'রলে গ্রহণ থাক্‌বে নাক আশঙ্কা লেশ
ভাগ্য যাদের রয় প্রসন্ন সেই তরুণের সঙ্গ আসি'
শুনবে আমার সকল বাণী তিয়াস ভরে প্রাণ সঁপিয়া
ব'লবে বল বচন কটু, সইব প্রিয়ে অনুরাগে
চাঁদ্‌বদনী সুন্দরীদের তিক্ত কথাও মিষ্ট লাগে
ফেল্‌ছে আজি তারকা-হার হুর পরীরা আকাশ থেকে
তুইরে কবি গজল-গীতির মোতির মালা চল্ গাঁথিয়া।

(১) সমর কন্দ ও (২) বোথারা দুইটী স্থানের নাম উল্লেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহকাল ও পরকাল'। অর্থাৎ প্রিয়তমার নগণ্য কোন জিনিষের বিনিময়ে ইহকাল ও পরকাল দুইই বিলাইয়া দিতে পারি। (৩) মোসাল্লা পারস্যের একটী ভ্রমণের স্থান (৪) রোক্‌নাবাদ একটী ঝর্ণার নাম।

দূতী

[শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল]

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি। তেতলার আলো-হাওয়া যুক্ত ঘরখানিতে সকাল থেকে একটি ভদ্রলোক চুপ করে' বসেছিলেন। চারিদিকে তাঁর বিশৃঙ্খল গৃহ-সরঞ্জাম, মেঝের উপর হরেক রকমের কাগজপত্র ছড়ানো, বিছানাগুলি অগোছালো, ময়লা ও ফর্সা একরাশি তাল পাকানো জামা কাপড়—দেখলে মনে হয় অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও গৃহস্বামী সেগুলির সুবিন্যাস করতে পারেন নি।

অনেকক্ষণ পরে লোকটি উঠে একটি ছোট কাঠের বাক্স পেড়ে নিলেন। সেটি খোলবার পর দেখা গেল তার মধ্যে সবগুলিই হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি। বাক্সটি হাতে করে জুতোটি পায়ে দিয়ে ঘরখানি খোলা রেখেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন।

—এই যে ডাক্তার বাবু, আসুন ভেতরে আসুন। না না চৌকিতে নয়, ওই চেয়ারটাতেই বসুন। ইয়া, ঠিক হয়েছে; আজ খুব সকাল সকাল উঠেছেন দেখছি। হ্যাঁ ভাল আমি বিশেষ নেই, বুঝলেন? কালকের চেয়ে হাত পা গুলো আজ বেশী শাদা দেখাচ্ছে, আপনারও তাই মনে হচ্ছে না কি?

ডাক্তার মুখ তুললেন।

এই দেখুন না, গায়ের ওপর টিপ্‌লে আঙুল বসে' যাচ্ছে। কি আর করি বলুন, সবার অবস্থাই ত সমান, ওষুধ পত্রের জন্য আপনি টাকাকড়ি কিছু নেন্ না তাই জন্যেই ত—আচ্ছা ডাক্তার বাবু, এ রোগ সারে ত?

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে ওষুধ বার করতে লাগলেন। এমনি করে' ঘাড় তিনি বরাবরই নাড়েন, অর্থাৎ এ রোগ সারে কি সারে না তা তাঁর মস্তক সঞ্চালন দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

বয়স তাঁর তিরিশের কাছাকাছি। দাড়ি গোঁফ নেই বটে কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর মাথার চুল অনেকটা শাদা হয়ে এসেছে। কপালে চার পাঁচটি রেখা। চোখ দুটী তীক্ষ্ণ কিন্তু চঞ্চল নয়। মুখখানা সত্যিই গম্ভীর। সে মুখ বোধ করি হাসেওনি কোনোদিন, বিষণ্ণতাও কি কখনও তার ওপর ছায়াপাত করেছে?

দরজার কাছ দিয়ে একটি যুবক পার হয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তারকে দেখেই ভেতরে এসে ঢুক্‌লো। বল্‌ল—নমস্কার ওপরেই যাচ্ছিলাম আপনার কাছে।

এ ঘরের জন্য দুতিনটি ওষুধ গুছিয়ে দিয়ে ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটিকে বললেন—কি?

হাঁপানির টানটা বাবার কাল থেকে আবার বেড়ে গেছে।

ও, তা চলুন, একবার দেখা যাক্।

বারান্দা পার হয়ে এসে যুবকটির পেছনে পেছনে ডাক্তার আর একটি ঘরে ঢুকলেন। রোগী এক প্রৌঢ়, অস্থিসার দেহ, রোগপাণ্ডুর বিবর্ণ চেহারা—বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁ করে' নিশ্বাস টান্‌ছে।

নেড়ে চেড়ে ডাক্তার তাকে অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর পেছন দিকে চেয়ে যুবকটিকে বলিলেন—আমার ওষুধে ভাল হবার সম্ভবনা এঁর আর নেই; আপনারা বরং—

ঘরখানির মধ্যে চারিদিকে কঠোর দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, যুবকটি এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে বল্‌ল—তাই ত, তা হলে কি করা যায় বলুন ত ডাক্তার বাবু?

বোকার মত ছেলেটি উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

বেছে বেছে কি একটি ওষুধ বার করে' তার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ডাক্তার আবার বেরিয়ে এলেন। কোনো সহানুভূতি কোনো সান্ত্বনার কথাই তাঁর মুখে এল না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

—বাড়ীওলার কথা বলছেন? শালা কঞ্জুসের এক শেষ! ভাড়াটের কোনো খবরই রাখে না! দর্মাহাটায় না কোথায় থাকে মশাই, পাটের দালালি করে, মাসকাবারে আসে, গলায় গামছা দিয়ে বেটা টাকা নেয়।

—আমরা ত নতুন এগাম, সবশুদ্ধ ক' ঘর ভাড়াটে জমলো বলুন ত? বাড়ীটা ত তেতলা দেখতে পাই।

—হ্যাঁ তেতলা, তাছাড়া ঘরগুলোও,—এই ত ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন, আপনার মেয়েটিকে একবার দেখিয়ে দিন্ না, চোখ নিয়ে অত ভুগ্‌ছে!

—তা হ'লে ত ভালই হয়, নমস্কার ডাক্তার বাবু—যদি দয়া করে' একবার দেখে যান আমার মেয়েটিকে। চোখে যে তার কি হলো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

নমস্কার গ্রহণ করে' ডাক্তার ভদ্রলোকটির সঙ্গে সঙ্গে এসে নীচেকার একটি অপরিসর অস্বাস্থ্যকর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন।

জান্‌লার দিকে মুখ করে' বিছানার ওপর একটি তরুণী বসে ছিল, লোকটি তাকে উদ্দেশ করে' বল্‌ল—টুলু, উঠে দাঁড়াও ত মা একবার, ডাক্তার বাবু তোমার চোখ দেখ্‌বেন। কি হলো মশাই দেখুন ত,—জ্বালা করছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, রস গড়াচ্ছে—চোখে আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছে না! এত বড় মেয়ের চোখে যদি এমন হয়—

মেয়েটির মাথা হাতের মধ্যে নিয়ে ডাক্তার তার চোখদুটি টেনে টেনে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। এক সময় বল্‌লেন —যে অন্ধকার, সহজে কিছু বোঝা যায় না!

আর অন্ধকার, এই দুটির ভাড়াই পনেরো টাকা ডাক্তার বাবু!

ডাক্তারের কাণে সে কথা গেল কিনা কে জানে! মেয়েটির মাথা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন—তবে এ বিশেষ কিছু নয়, ভাল হ'য়ে যাবে। চোখে কিছু পড়েছিল তার থেকেই—

তাই বলুন ডাক্তার বাবু, শুনে বাঁচি।—ভদ্রলোকের চোখ অন্ধকারে বোধ হয় সজল হ'য়ে এল,—সাম্‌নের জষ্ঠি মাসে বিয়ে দোব ঠিক কর্‌লাম কিন্তু এসব দেখে শুনে ডাক্তার বাবু—

নিষ্প্রয়োজনের কোনো কথা ডাক্তারের মুখে আসে না। বাক্সটি খুলে' আপাততঃ একটি ওষুধের ব্যবস্থা করে' তিনি বেরিয়ে চলে' গেলেন।

ন'টা বেজে গেল, স্নানের সময় হ'য়েছে। ডাক্তার তাঁর স্বাভাবিক গতিতে ওপরে উঠছিলেন। একটি লোক এতক্ষণ ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল। শুক্‌নো ছোট্ট একখানি মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ; রোগা, লম্বা, বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের দিকে গড়িয়ে গেছে। গলা থেকে কোমর পর্য্যন্ত এক গোছা শাদা পৈতে ঝুল্‌ছে। ডাক্তারকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেই পেছন থেকে বল্‌ল—বাবাজি?

ডাক্তার ফিরে তাকালেন।

দারোয়ানি ঢঙে কপালে হাত ঠুকে লোকটি বল্‌ল—আমি তোমার মামা হই বাবাজি। হে হে—

কি চান্?

একটি টাকা। আফিঙ আর দুধ। তামাকের পয়সা আর একজন দেয়। আমি নীচেই থাকি বাবাজি। হে হে—

ডাক্তার পকেট থেকে একটি টাকা বার করে' তার হাতে দিলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ বল্‌ল—চল্‌বে ত বাবাজি?—বল্‌তে বল্‌তে আঙুলের ওপর টাকাটি রেখে টোক্কা মেরে একবার টুং করে' নাচিয়ে পুনরায় বল্‌ল—হাঁ, ঠিক হ্যায়! হে হে—

ডাক্তার ওপরে উঠে গেলেন।

স্নানের পর আহার করতে হয় রাস্তার কোনো হোটেলে গিয়ে। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা তিনি যখন আফিসে গিয়ে পৌছন্ তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। বই-খাতা এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে' খানিক সময় কাটে। বারোটার পর থেকে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেমন একটি অস্বাভাবিক আলস্য তাঁকে ঘিরে ধরে। সে আলস্য মন্থর নয়, অস্বস্তিকর। তার মধ্যে এলায়িত আরামের তৃপ্তি নেই বরং সর্ব্বাঙ্গে একটি অশান্তির আঘাত খোঁচা দেয়।

গোধূলি বেলায় সূর্য্যাস্তের বিপরীত পথে ধাবমান অন্ধকারের দিকে গরু যেমন শ্রান্ত দেহে ফেরে—আফিস থেকে বেরিয়ে তিনিও তেমনি ঘরের পথ ধরেন। চেহারার মধ্যে তাঁর ক্লান্তিও যেমন প্রচুর, ধৈর্য্যও তেমনি অসাধারণ!

ঘরে ঢুক্‌তে সন্ধ্যা হয়। নীচে থেকে তেতলা পর্য্যন্ত উঠ্‌তে গোটা পাঁচেক বিরক্তিকর নমস্কার প্রতিদিন তাঁর প্রতি আসে। কোনো দিকেই তাকাবার মত মন তাঁর থাকে না, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আলোটি জেলে তিনি তক্তাটার ওপর ব'সে পড়েন। নীচের তলাকার গোলমাল কাণে আস্‌তে থাকে। পাশাপাশি দুইটি গৃহস্থের ঠোকাঠুকি সকল সময় যেন বেধেই আছে। সামান্য কলের জল নিয়ে ঝগড়া। দারিদ্র্য তাদের জীবনকে পঙ্গু করে' রেখেছে, নৈলে এমন বিকৃত জঘন্য আত্মপ্রকাশের কি আর কোনো কৈফিয়ৎ আছে?

ঝগড়া যদি বা থামল, একটি লোকের গলাবাজি আর শেষ হয় না। খুব সম্ভবত আপনার কন্যাকে উদ্দেশ করে' লোকটি তিরস্কার করতে থাকে।

—ছাদে উঠবিনে খবরদার কাল থেকে বলে' দিচ্ছি, বারান্দায় দাঁড়াবিনে, জানলায় বসে রাস্তার দিকে তাকাবিনে। মেয়েছেলের বই পড়া কি আবার? দশটা-পাঁচটা খাটতে যাবি নাকি? ওসব চলবে না বলে' রাখলাম; আমার ভাত খেতে গেলে বেয়াদবিটা ছাড়তে হবে। ক'রে না? পান খেয়ে আলতা পরে' জানলায় দাঁড়াতে সরম হয় না?

—চুপ কর গো চুপ কর, বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে কি ওসব কথা বলতে আছে? একটু রেখে ঢেকে কথা বলতে জান না?

তা হোক, অন্যায় কথাটা কি বলছি?

দোতলার কোণের ঘরখানিতে একটি বৃদ্ধ মাতা তাঁর বিধবা কন্যাটিকে নিয়ে থাকেন। কয়েকদিন আগে তাঁর কন্যাটির মাথার দোষ ঘটেছে। মেয়েটি হাসছে, কাঁদছে, চীৎকার করছে, সময় সময় আবার গানও ধরছে। বৃদ্ধাটি যেমন অসহায় তেমনি বিপদগ্রস্ত। ডাক্তারের ওষুধে কোনো ফল হয়নি!

খানকয়েক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিলাতী মাসিক পত্র একপাশে জড়ো করা ছিল, তার মধ্যে একখানি নিয়ে ডাক্তার উল্টাতে লাগলেন। উল্টাতে উল্টাতে খানিক পরে আবার মুখ তুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে' রইলেন।

চারিদিকের গোলমালের পাশে কখন নিঃশব্দে রাত ঘনিয়ে এসেছিল।

দরজার পাশে যেন খস খস করে' কার পায়ের শব্দ হল। ডাক্তার মুখ ফেরালেন। আলোটা বাইরে পড়েছিল, তাতেই বোঝা গেল কে একজন দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলোটা হাতে নিয়ে ডাক্তার উঠে এলেন। - কে?

নীচেকার একটি বউ। কিন্তু মেয়েটি কথা কহিল না, বাঁ হাতের মুঠো থেকে একটি পাকানো কাগজের গুলী পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার সেটি তুলে নিয়ে টেনে টেনে বড় করে' পড়লেন—

ডাক্তার বাবু,

আমি এ বাড়ীর বৌ না হইলে আপনার সহিত কথা বলিতাম। আপনার দয়া ভুলিবার নহে। আপনি মহৎ, উদার; আপনার মত লোক আজকাল দেখা যায় না। আপনার ঋণ শোধ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। আপনার দয়ায় এ যাত্রা আমার বড় ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল। প্রার্থনা করি আপনি রাজা হউন।

যদি আর একটী উপকার করেন তা হলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। মাসের শেষ হওয়ায় আমাদের প্রায় হাঁড়ি চড়া বন্ধ হইয়াছে। দয়া করিয়া দুইটি টাকা ধার দিবেন কি?—ইতি। নীচে নাম সই নেই।

টাকা দুটি হাতের ওপর তুলে দেবার আগে মেয়েটির সমস্ত চেহারাটার প্রতি ডাক্তারের একবার নজর পড়ল। উপবাসী, শ্রীহীন, শীর্ণ দেহ, শিরাবহুল দুখানি হাত, বকের মত সরু সরু দুখানা পা। টাকা দুটি হাতে পেয়ে এক মুহূর্ত সে আর দাঁড়াল না; দুখানি বাঁকারির ওপর ভর দিয়ে সেই মলিন বস্ত্রাবৃত কঙ্কালখানি নিমেষে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

ছাদের ওপর এসে ডাক্তার পায়চারি করতে সুরু করে' দিলেন। মাঝে মাঝে এই পায়চারি করাটা তাঁর অতিরিক্ত বেড়ে যায়।

নক্ষত্রখচিত গগনের অসীম অন্ধকারের এক প্রান্তে শীর্ণ চাঁদটুকু তখন হেলে পড়েছে। দূর থেকে একটা ট্রেণের বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

হঠাৎ ডাক্তারের চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল। মনে হল, ছাদের কোণ থেকে এই মাত্র যে মিলিয়ে গেল সে এক স্থবির, আতুর, রুগ্ন,—সে যেন বিকলাঙ্গ, অথচ বাউলের মত ছন্নছাড়া! দেহ যেন তার ক্ষতবিক্ষত, চোখ দুটো বোবা! হাঁ, এইমাত্র ওখানে মিলিয়ে গেল!

ডাক্তার সেদিকে তাকিয়েই রইলেন। মনের ভুল? তা হবে!

রাত্রে ঘুমের মাঝখানেও তিনি যেন সচেতন থাকেন। সেদিন তিনি বেশ স্পষ্ট স্বপ্ন দেখলেন, রোগাক্রান্ত গলিত

এক নারীর দেহ...প্রকাণ্ড লোল জিহ্বা, তৃষ্ণায় তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে!

ডাক্তার জেগে উঠে আলো জাল্‌লেন। ঘুম আর তাঁর চোখে এল না। গভীর সেই রাত্রে একাকী বসে' তাঁর মনে হচ্ছিল, আশে পাশে চারিদিকে কতকগুলি বুভুক্ষিত, ব্যর্থ, বেদনাতুর নর নারীর ছায়ামূর্ত্তি হাত পেতে নিঃশব্দে তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা করছে।

দোতলার গোলমাল স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।—

—তা বৈ কি, হ্যাঁ—মাছ খাওয়া উঠে যাক্। চুরি করে' যে খায় তার ওলাউঠো হোক। নতুন বৌয়ের এই কীর্ত্তি?—থাক্ বাছা থাক্, পা ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌তে হবে না।

—যা বলেছ বাছা, এত দেমাক ভাল নয়। বলে 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে' যাবে!' তোমার না হয় ফার-ফোরের তাগা আছে, আমার না হয় দুকড়া সোনাও গায়ে নেই, তা বলে' অম্‌নি গা ঘেঁষটে চলে যাবে? যতই কর আমি কি আর গাল দেবো? কখনো না! বরং বলি তোমার হাতের নো' বজ্জর হয়ে থাক্। না কি বল হিমির মা?

হিমির মা হিমিকে নিয়ে তখন নাস্তানাবুদ। পাগলি হিমি তখন চীৎকার ক'রে গান ধরেছে—'সুধামাখা সুরে বল দেখি সখা—'

ও মা, কোথা যাবো গো, ছি ছি--ওমা চুপ কর মা।

ছেড়ে দাও বলছি··খুন করবো—'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে আমারে—' বলি, ও আসমানতারা, তোমার বাড়ী কোন্‌দিকে ভাই? হি হি হি···'না ভাই যাবো না আমি তরুলতা ছাড়ি, সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর বাড়ী। উড়িতে বাসনা মোর,—' ইল্লি?

নিশ্চল পাথরের মত ডাক্তার নিঃশব্দে বসে ছিলেন।

—কোন্ আবাগি খাওয়ায় চোখ দিয়েছে, আমার মেয়ের কোনো রোগ ছিল না! বাছা আমার নট্ নট্ করে' এলতলা বেলতলা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়!

—সময় মত টিকে দাওনি বাছা, দো-আঁস্‌লা সময়—ঝেড়ে বসন্ত বেরিয়েছে···আহা, মা শেতলা।

একটি করুণ কণ্ঠের আওয়াজ সমস্তগুলিকে ছাপিয়ে কানে এসে বিঁধছিল।

—তিন কাল এখনো পড়ে' রয়েছে, পেট আমার চল্‌বে কি করে'? হাজারখানি টাকা, একটি একটি করে' সব তোমাদের সংসারে গেল! বিধবা মানুষ, না জানি লেখাপড়া, না কোনো সেলাইয়ের কাজ! লোকের বাড়ীতে কি এর পর আমি রাঁধতে যাবো?

কথা বলতে বলতে মেয়েটির গলা ধরে' এল।

ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। যক্ষ্মাগ্রস্ত সেই বৃদ্ধ লোকটি আস্তে আস্তে এসে ঘরের মেঝের ওপর বসে' পড়লেন। হাতে তাঁর সদা সর্ব্বদা থুথু ফেলবার জন্য একটি টিনের কৌটো থাকে। বার দুই কেসে কৌটোর মধ্যে গয়ার ফেলে বৃদ্ধ বল্‌লেন—আপনিই বলুন ত, টাকায় এক আনা সুদে 'হ্যান্‌নোট' দিলে, এখন অর্দ্ধেক বই সুদ দিতে চায় না! গরীব ত সবাই বাবাজি? আমি একটা নালিশ ঠুকে দিই ডাক্তার বাবু, কেমন? ও শালাকে জব্দ আমি করবই!

জরাজীর্ণ বৃদ্ধের বৈষয়িক বুদ্ধি আজও বিন্দুমাত্র কমেনি।

ডাক্তার বল্‌লেন—করুন।

হঠাৎ এ উত্তরের জন্য বৃদ্ধ প্রস্তুত ছিল না। আর একবার কেসে থুথু ফেলে বলল—প্যাঁচ না কস্‌লে টাকা বেরোয় না, বুঝলে বাবাজি?

হুঁ!

বৃদ্ধের হঠাৎ যেন কি সন্দেহ হল। ডাক্তারের মুখের দিকে ভাল করে' একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—তাই বলতে এসেছিলাম, আর কিছু না। লেখাপড়া জানা লোকের কাছে বুদ্ধি নেওয়াটা ভালই! নৈলে বুড়ো মানুষ এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে আসবই বা কেন বাবাজি?

টিনের কৌটটি হাতে নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে' বৃদ্ধটি বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন নীচে ডাক্তারের ডাক পড়ল। ভদ্রলোকের স্ত্রীটি প্রসববেদনায় ছট্‌ফট্ করছেন। দাইকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু পাওনার পরিমাণ শুনে সে আসতে রাজি হয়নি। চীৎকার করলে পাছে অশান্তি হয় এ জন্যে বউটি মুখ বুঁজে এতক্ষণ পর্য্যন্ত—

ডাক্তার একটি ওষুধ দিয়ে বললেন—এইটে খাইয়ে দিন, এখুনি হয়ে পড়বে। একটু গরম দুধ খেতে দিন।

ভদ্রলোকটি কৃতার্থ হলেন। বললেন—যে আজ্ঞে! বড় বিপদ মশাই; এদিকে এই, ওদিকে আফিসের চাকরি নিয়ে টানাটানি।—তারপর গলা খাটো করে' বললেন—দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমারই মেয়ে ডাক্তার বাবু,—দেখুন ত মশাই, ওকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা!...পাশের বাড়ীর একটা সুন্দোর মতন ছোঁড়া, বড় বড় মেয়েলি চুল,—আবার নাকি ছবি আঁকা হয় শুনতে পাই! ছোঁড়া আমার মেয়েটার দিকে—সে আর আপনাকে বলব কি, বুঝতেই পাচ্ছেন! তবে এক হাতে তালি বাজে না, বুঝলেন? স্বচক্ষে আমি দেখেছি, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আফিস থেকে ফিরেই—

যান্, ওষুধটা খাইয়ে দিন গে!

এই যে,—বলেই লোকটি অপ্রস্তত হয়ে হন্ হন্ করে' চলে' গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সদর দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই তীক্ষ্ণ চীৎকারের আওয়াজ কানে এল। সে কান্না জরার নয়, দারিদ্র্যের নয়, পঙ্গুতার নয়—সে কান্না অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর! যে ছোট্ট মেয়েটির গায়ে বসন্ত হয়েছিল, সে আর নেই! আর্ত্তনাদে আর দীর্ঘশ্বাসে বাড়ীখানা ভরে' উঠেছে।

সকলের অলক্ষ্যে ডাক্তার তেতলায় উঠে এলেন। ঘরে আর আলো জ্বালা হল না! জানলার ধারে অন্ধকারে তিনি চুপ করে' বসে রইলেন।

অদূরে মাঠের ওপর কয়েকটা নারিকেল গাছের পাতা সির্ সির্ করছে। শেষ-বসন্তের হাওয়া সারাদিনের পর একটু একটু ঠাণ্ডা হয়েছে! আকাশ অন্ধকার, একটিও তারা নেই,—বোধ হয় মেঘ করেছিল।

কতক্ষণ যে কেটে গেছে তা ডাক্তারের হুঁস ছিল না। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল দরজার দিকে। মানুষের একটি ছায়া দেখা গেল। সেদিনকার সেই শীর্ণদেহ বধূটি বকের মত পা মেলে চুপি চুপি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরে ঢুক্ছে। এইমাত্র এরই মেয়েটি নীচে মারা গেছে।

ডাক্তারকে দেখে ফেলবার কোনো উপায় ছিল না, খাটের একটা ধার তাঁকে আড়াল করে' ছিল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে আন্দাজে টেবিলের কাছে বউটি সরে' এল। অতি সাবধান সত্ত্বেও নাক দিয়ে মুখ দিয়ে তার অস্ফুট কান্না বেরিয়ে পড়ছিল। যে ড্রয়ার থেকে সেদিন ডাক্তার তাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, হাতড়ে হাতড়ে সেটি সে খুল্ল, খুলে ভেতরে হাত বুলিয়ে কয়েকটি টাকা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করল। ভয়ে লজ্জায় বোধকরি তার হাত পায়ের ঠিক ছিল না, একটু আধটু শব্দ সাড়া হতে লাগল।

তারপর আর না বললেও চলে। চোরের মত সে যখন লুকিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল—ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে!

তার খানিকক্ষণ পরেই নীচে মৃতদেহ সৎকারের আয়োজনে আর একবার নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

প্রতিদিনের বিচিত্র জীবন-ধারা কিন্তু বাধা পায় না। দারিদ্র্য ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে' সে বয়ে যেতে থাকে। সে অবারিত স্রোতে যত গ্লানি, যত পাপ, পঙ্গুতা, নীচতা, শাঠ্য—মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত কিছু আবর্জ্জনা সমস্ত ভেসে চলে' যায়। জরা ও মৃত্যুর করাল ছায়া মাঝে মাঝে কেবল একটুখানি সে স্রোতকে ব্যাহত ও রহস্যময় করে' তোলে।

অথচ তারই পাশে যে খেলা চল্তে থাকে তার দিকে কারো নজর পড়ে না! আকন্দর চারার চারিপাশে মৌমাছি ঘুর্ ঘুর্ করে, উদাস মধ্যাহ্নের ঢুলঢুলে হাওয়া বারান্দার কার্ণিশের কাছে শুক্‌নো পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, শ্রান্তি ক্লান্তিহীন দুটি কাক জামগাছের আগায় বসে সারাদিন ধরে' একটি বাসা রচনা করে।

সূর্য্যাস্তের পর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি, আকাশের সব-প্রান্তে নক্ষত্র-বালাদের সভা বসেছে। মুখর নারিকেল বনের ওপার থেকে দক্ষিণের চঞ্চল হাওয়া ছুটে আসতে থাকে। বকুলের ঘুমন্ত কোরক আপনার পল্লব দল মেলে জেগে ওঠে, রজনীগন্ধা আপনার গন্ধে সচেতন হয়ে দুলে দুলে সারা হয়।

গরমের রোদ সেদিন চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। দূরে অশথ গাছটার নীচে ছোট ছোট ঘূর্ণী হাওয়ায় ধুলো উড়ছিল। ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে!

একটি তরুণী জুতোর আওয়াজ করতে করতে চঞ্চল পায়ে দোতলায় উঠে এল। সুন্দরী মেয়ে, সবাই ত তার রূপের দিকে তাকিয়ে অবাক। পিঞ্জরাবদ্ধ জীবগুলির কাছে এ যেন বনের পাখী এসে উঁকি মারল। মেয়েটি আপনার প্রাণ চাঞ্চল্যে চোখে মুখে হাসি ছুটিয়ে সবাইকে প্রশ্ন করল—ডাক্তার বাবু কোন্‌দিকে থাকেন ?

সকেল তেতলার দিকে নির্দ্দেশ করল।

খট্ খট্ করে' জুতোর শব্দ করে মেয়েটি আবার তেতলায় উঠে গেল। ডান হাতি ঘর, ভেতরে তখন ডাক্তার হাতের ওপর মাথা হেলিয়ে খাটের ওপর বসেছিলেন।

মুখ তুলে মেয়েটিকে তিনি দেখলেন। চোখ ছটি তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বললেন—প্রমীলা ? এসেছ ?

প্রমীলা একবার হাসল, তারপর তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে গিয়ে বসে বল্‌ল—অনেক খুঁজে খুঁজে এসেছি। আমায় ভুলে থাকতে পেরেছিলে ত ?

এতদিনকার নিঃশব্দতা আজ যেন ডাক্তারের ফেটে চৌচির হয়ে গেল। বললেন—ভুলে ? গায়ের রক্তকেও ত মানুষ ভুলে থাকে প্রমীলা !

গলা তাঁর ধরে' এল। বললেন—দিন আর আমার কাটে না, বুঝলে প্রমীলা ? প্রতিদিন মনে কি আশা নিয়ে যে বসে থাকি তা নিজেই জানিনে। কি যে খুঁজছি, কে যে সকলের থেকে আমায় এমন দূরে সরিয়ে রেখেছে, ঠিক কোন্ জিনিসটি আমি চাই···প্রমীলা, চোখের কান্নাটাই মানুষের বড় কান্না নয় !

প্রমীলা তাঁর হাতটি নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বসে ছিল। বল্‌ল—কি করবে এবার ?

কি করবো তুমি বলে' দাও। তুমি ছাড়া আর আমার অন্য উপায় নেই। তোমারই কাছে থাকবো, চুপ করে' বসে থাকব···তুমি আমায় গান শোনাবে! এখন থেকে তুমি আমার কাজ ভুলিয়ো, বারেবারে আমার ভুল ঘটিয়ো—প্রমীলা, তুমি আমার অভাব জানতে দিও না। আমি যেন সমস্ত দুঃখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি।

প্রমীলার চোখে জল এসেছিল, তবুও একটু হেসে বলল—বেশ লোক তুমি ত, আমার নার্সের চাকরিটা যাক্ আর কি তোমার জন্যে !

রূপ যেন প্রমীলার ফেটে পড়ছিল। হাওয়ায় কয়েকগাছি চুল উড়ে উড়ে ডাক্তারের গায়ে লাগছে। নারী-অঙ্গের একটি সূক্ষ্ম সৌরভ ঘরখানির মধ্যে মায়া রচনা করেছিল !

ডাক্তারের চোখে জল এল। বললেন - তা হোক্ প্রমীলা, যদি আজ ছেলেমানুষের মত কথা বলি কিছু মনে ক'রো না !—ব'লতে ব'লতে অকস্মাৎ তীব্র আবেগে প্রমীলার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে তিনি বলতে লাগলেন—এ আর আমি পারিনে, সত্যি বলছি,—এই রোগ, এই দারিদ্র্য, এই নীচতা, এর মধ্যে যেন আমি তলিয়ে যাচ্ছি! সবাই রুগ্ন, সবাই পঙ্গু—এদের মধ্যে আমার জায়গা কোথায় বল ত ? আমায় তুমি ছেড়ো না প্রমীলা, তোমাদের মধ্যে নিয়ে চল। একটুখানি জায়গা দিয়ে সুস্থ হয়ে আমাকে বাঁচতে দাও !

প্রমীলা বল্‌ল—সবার মাঝখানে থাকবে ব'লে তুমি ত নিজেই চলে' এসেছিলে আমার কাছ থেকে।

সে নেশা আমার কেটে গেছে! এখন এদের ফেলে চলে যেতে চাই। সত্যি চাই, সত্যি—নৈলে এদের গ্লানি আমায় পাগল করবে !

কোথায় যাবে ?

যেখানে হোক, তোমার কাছে গিয়ে থাকবো।—পাগলের মত ডাক্তার বলে যেতে লাগলেন—তোমাকে দেখবো, তোমার কথা শুনবো, তোমাকে নিয়ে সমস্ত দিন ভাববো, সমস্ত মন আমার তোমার চারিদিকে গুন্ গুন্ করে' বেড়াবে। এদের কাছ থেকে শুধু তুমিই আমায় মুক্তি দিতে পারো! তুমি আমার আনন্দের সঙ্গী হও প্রমীলা।

অনেকক্ষণ বসে বসে প্রমীলা কি ভাবল। একবার একটি উদ্গত নিশ্বাস চাপল, তারপর একটু হেসে বল্‌ল—তা হলে ?

হাঁ, তা হলে ওঠো ! না, আর কোনোদিকে তাকিও না। ও সব পড়ে থাক্। এখানকার কিছু আর ছুঁতে ইচ্ছে নেই !

প্রমীলার হাত ধরে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবো না, পেছনের জিনিস পেছনেই পড়ে' থাকুক। চল তুমি আগে আগে।

আচ্ছা পাগল যা হোক !—প্রমীলা একটু হেসে বল্‌ল।

দুজনে বেরিয়ে সটান্ নীচে নেমে এল। হতভাগ্য বন্দী গৃহস্থগুলি তাদের পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পথে গিয়ে দুজনে নাম্‌ল।

প্রমীলা তার হাত ধরেছিল। বল্‌ল—তারপর ?

ডাক্তার বললে—আগে চল মাঠের দিকে। ভাল করে' একবার নিশ্বাস ফেলে আসি !

দার্জ্জিলিং

[গোলাম মোস্তফা]

কে তুমি সুন্দরী কোন্ কুহকিনী স্বপ্ন-মায়াবিনী
দূর হ'তে বাজাইয়া রিণিঝিনি কাঁকন-কিঙ্কিণী
মায়া-মন্ত্রে ভুলাইয়া ডেকে মোরে আনিলে গোপনে
গভীর রহস্য-ভরা এই তব প্রাসাদ অঙ্গনে !
মাটির শ্যামল স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে ছিনু এত দিন,
ধরণীর প্রেম মোরে ধূলিতলে করেছিল লীন,
তার মাঝে কবে তুমি অকস্মাৎ অন্তরে আমার
জাগালে আকুল তৃষা তব প্রেম-পরশ পাবার !
দেখিনি তোমার মুখ, পরিচয় পাই নাই কভু,
অজানারে জানিবার কী দুর্জ্জয় কৌতুহল তবু !
বাহির হইনু পথে সেই হ'তে তোমার সন্ধানে
খুঁজিনু সকল ঠাঁই,—দেখা নাহি পেনু কোনো খানে।
উদাস পরাণে যবে নদীতীরে শেষ সন্ধ্যাকালে
দেখিতাম চেয়ে দূর মেঘমালা দিক্‌চক্রবালে,
মনে হ'ত—তুমি যেন উড়াইয়া তব উত্তরীয়
আমারে কহিছ ডেকে—'এই পথে উঠে এস প্রিয়!'
সে গোপন বাণী তব নিশিদিন ছিল মোর মনে
তাই আজি আসিলাম মেঘলোকে তোমার ভবনে।
অঞ্চল ফেলিয়া দাও, মুখ তোল, চাহ একবার,
আমারে গ্রহণ কর, হে অজানা প্রেয়সী আমার !

বসন্ত শেষে

[সুফী মোতাহার হোসেন]

সোণার বরণী চাঁপা, এতদিনে মেলিছ নয়ন ?
আজি যে বসন্ত যায় ! সে আপন প্রণয়-ব্যথায়
উচ্ছাসি উচ্ছাসি উঠি, কত মুগ্ধ প্রেম-গুঞ্জরণ
করিয়াছে তব তরে। আজি তার বিদায় বেলায়
তুমি কি আনিলে সখি, শেষ মধু বসন্ত উৎসবে ?
মুকুলে মুকুলে বুঝি কাঁপে তাই ত্রস্ত অভিলাষ
ফুটিয়া ঝরার তরে ? হায় সখি, তুমি এলে যবে
বিদায় মাগিছে বঁধু অবহেলি বাসর-বিলাস।
ব্যাকুল মৌমাছি দল আজি তাই তোমারে ঘিরিয়া
অন্তিম মিনতি করে। দ্বিধা, ভয় এখনো কাটেনি
এখনো সরমে বাধে ? বসন্ত যে চলিল ফিরিয়া,
চরম নৈবেদ্য তব, হায় সখি ! এখনো সাজেনি ?
তোমার মতন যদি পারিতাম উঠিতে প্রস্ফুটি,
প্রথম বসন্ত রাতে মরিতাম মহোৎসবে লুটি।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

পঞ্চম অধ্যায়

ইহার পর তথাগত আনন্দকে কহিলেন, 'চল আনন্দ কুশীনগরের উপবত্তনে মল্লদের শালবনে যাই।'—এই শালবন হিরণ্যবতী নদীর ওপারে ছিল।

সশিষ্য ভগবান শালবনে উপনীত হইয়া আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, এই দুই যমজ শালতরুর মাঝখানে একটা পালঙ্ক স্থাপন কর এবং উত্তর শিয়র করিয়া আমার শয্যা রচনা কর।"

শয্যা রচিত হইলে ভগবান ডানকাত হইয়া পায়ের উপর পা রাখিয়া স্থির ও সমাহিত চিত্তে শয়ন করিলেন।

এই সময়ে যমজ শালতরুদ্বয় প্রস্ফুটিত ফুলরাশি বর্ষণ করিয়া তথাগতকে অর্চ্চনা করিল। স্বর্গ হইতে মন্দার পুষ্প বর্ষণ হইল; দিব্য বাদ্যধ্বনিতে দশদিক যেন ভরিয়া গেল।

তথাগত কহিলেন, "হে আনন্দ···তথাগতের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য মর্ত্ত্য ও স্বর্গীয় প্রকৃতি দেবীরা এইরূপে পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু এরূপ বাহ্য সম্মান তথাগতের প্রতি যথার্থ সম্মান নহে। যদি কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা তথাগতকে যথার্থভাবে সম্মান দেখাইতে চান তাঁহার উচিত হইবে সদ্ধর্ম্মাচরণের জন্য অবশ্য পালনীয় ছোট বড় সমস্ত কর্ত্তব্য কায়মনোবাক্যে যথাযথ পালন করা। সদ্ধর্ম্মের বিধি নিষেধ মানিয়া, নিজে সাধুজীবন বহন করা ও অপরকে বহন করিবার মত শিক্ষা দিলেই তথাগতকে যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান দেখানো হইবে।"

ঠিক এই সময়ে মাননীয় ভিক্ষু উপবন তথাগতের সম্মুখে দাঁড়াইলে তথাগত তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলেন। উপবনের প্রতি এই অসন্তোষভাব লক্ষ্য করিয়া আনন্দ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান উত্তর দেন—"হে আনন্দ, চতুর্দ্দশ লোক হইতে অসংখ্য দেবতা তথাগতের তিরোভাব দেখিতে এই শালবনে আসিয়াছেন; ইঁহাদের দৃষ্টির বাধা ঘটানো উচিৎ নহে।

"এক শ্রেণীর ব্যোমবিহারী দেবতা আছেন তাঁহারা সংসারাসক্ত চিত্ত; তাঁহারা তথাগতের পরিনির্ব্বাণ আসন্ন ভাবিয়া শোকে অধীর হইয়াছে।

"আর একশ্রেণীর ভূ-বিহারী দেবতা আছেন তাঁহারাও এইরূপ মায়াসক্ত; তথাগতের তিরোভাব আসন্ন বুঝিয়া মহাশোকে অধীর। কিন্তু যে সব দেবাত্মা বা দেবযোনি বিষয়াসক্তিহীন, আত্মস্থ, আত্মসংযত তাঁহারা জগতের সমস্তই অলীক, অনিত্য ও মিথ্যা জানিয়া স্থির, ধীর ও অচঞ্চল হইয়া থাকেন।

"হে আনন্দ, চারটী স্থান আছে যাহা সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাসবান ব্যক্তিরা ভক্তির সহিত দর্শন করিবেন। তথাগতের জন্মস্থান; তথাগতের নির্ব্বাণ বা বোধিলাভের স্থান; তথাগতের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান; তথাগতের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান।

"যাঁহারা এই চারটী পুণ্যময় স্থান দর্শন করিবেন তাঁহাদের পুণ্যবৃদ্ধির ফলে স্বর্গে উচ্চতর জন্মলাভ হইবে।"

এই সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবন্ স্ত্রীলোকদের সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত হইবে?"

ভগবান উত্তর করিলেন—"ব্যবহার না করাই উচিত; তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করাই ভাল।"

আনন্দ কহিলেন—"যদি দৈবযোগে দেখা হয়?"

ভগবান।—বাক্যালাপ করিবে না—

আনন্দ। যদি তাঁহারা বাক্যালাপ প্রথমে করেন?

ভগবান। খুব সংযত চিত্তে সজাগ মনে উত্তর দিবে; তাঁহাদের সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

আনন্দ ইহার পর জিজ্ঞাসা করেন—"তথাগতের মৃতদেহ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি হইবে?"

ভগবান কহিলেন—"আনন্দ, তথাগতের মৃতদেহ সৎকারের জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই; তোমরা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিও। নিজের শুভ

সাধনায় একাগ্রচিত্ত হইও। নিজ নিজ মুক্তি সম্বন্ধে সজাগ, তৎপর ও একাগ্রচিত্ত হইও; বহু ধনী ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ উপাসক আছেন তাঁহারা তথাগতের দেহ সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য করিবেন।"

আনন্দ কহিলেন—"ভগবন্ তথাপি আমাদের জানা উচিত তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের শেষ কর্ত্তব্য কি হইবে।"

ভগবান কহিলেন—"রাজা মহারাজার দেহ সম্বন্ধে যাহা করা হয় তথাগত সম্বন্ধে তাহাই করা হইবে।"

আনন্দ আবার কহিলেন—"ভগবন্ তাহা কিরূপ?"

ভগবান কহিলেন—"শুন আনন্দ, রাজার অনুচররা রাজার মৃতদেহ এক নূতন বস্ত্রে আবৃত করে, তাহার পর তাহারা উহাকে আবার তুলার দ্বারা আচ্ছাদিত করে; উহা আবার এক নূতন বস্ত্রখণ্ডে মণ্ডিত হয়; এইরূপে বস্ত্র ও তুলার দ্বারা পাঁচ শত বার মৃতদেহ আবৃত হয়। তৎপরে উক্ত দেহ এক লৌহ-পাত্রপূর্ণ তৈলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। তাহার পর নানা সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা রচিত এক উচ্চ চিতায় উহা দাহ করা হয়। এবং সেই চিতাভস্ম লইয়া এক প্রকাণ্ড চৌমাথায় তাহা পাত্রপূর্ণ করতঃ তদুপরি এক স্তূপ রচনা করা হয়। হে আনন্দ, রাজা মহারাজার দেহ এই ভাবে সম্মানিত হয়।

"তথাগতের মৃতদেহ সম্বন্ধে এইরূপ সৎকারই কর্ত্তব্য। এবং যে সব লোক এই স্তূপকে গন্ধ মাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিবে পরকালে তাহার শুভ হইবে।

"হে আনন্দ, এইরূপে স্তূপ দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইবার যোগ্য চারি শ্রেণীর ব্যক্তি। কে, কে? প্রথম, যাঁহারা তথাগত হইয়াছেন; দ্বিতীয়, যাঁহারা কেবল নিজের মুক্তিই সাধন করিয়াছেন। তৃতীয়, যাঁহারা তথাগতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যাঁহারা।"

ইহার পরে এক সময় আনন্দ বিহারের অভ্যন্তরে গমন করতঃ দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া এই ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন, "হায়, গুরুদেব তো আমায় ফেলিয়া চলিলেন; অথচ আমি এখনো অর্হত্ব লাভ করিতেই পারিলাম না; এপর্য্যন্ত স্রোতোপন্ন হইয়াই রহিলাম! আমার প্রতি তাঁহার কতই দয়া ছিল, কিন্তু আমি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না!"

সেই সময়ে তথাগত আনন্দের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। যখন শুনিলেন আনন্দ দুঃখমগ্ন চিত্তে অশ্রুপাত করিতেছেন তখন তিনি তাঁহাকে কাছে ডাকাইয়া সস্নেহে কহিলেন:—

"বৎস আনন্দ, কাঁদিও না ও দুঃখ করিও না; তোমাকে তো কতবার ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে সংসারে সংযোগ উৎপন্ন যাহা কিছু তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী! তাহার অন্যথা হইবেই বা কিরূপে? অনিত্য বস্তুর ধ্বংস অনিবার্য্য; যাহারা আমাদের এত নিকট ও প্রিয় তাহারা নশ্বর দেহধারী; তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ অনিবার্য্য; অনেক দিন ধরিয়া আনন্দ তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে; স্নেহ ভালবাসার কথা ও কার্য্য গুণে তুমি আমার বড়ই স্নেহের পাত্র হইয়াছিলে। তুমি সাধনার পথে একাগ্র-চিত্ত হইয়া লাগিয়া থাকিও; চেষ্টা ও উদ্যমে শিথিলতা প্রকাশ করিও না; অচিরে তুমি রাগ, দ্বেষ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অর্হত্ব লাভ করিবে।"

পরে তথাগত সমাগত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যুগে যুগে যত জ্ঞানপ্রবুদ্ধ তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে প্রত্যেকেরই আনন্দের মতই এক এক পরিচারক ও সেবক ছিল।

"আনন্দ অতি কুশলী ও বিজ্ঞ; কাহার পক্ষে কোন সময় তথাগতের সহিত সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় তাহা আনন্দ ভালই বুঝে। ভিক্ষুগণ, আনন্দ চারটী মহা গুণের অধিকারী। কি কি গুণ?

আনন্দ প্রিয়দর্শন, আনন্দকে দেখিলে বা আনন্দের উপদেশ-কথা শুনিলে সংঘের সকলেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

তথাগতের কথা শেষ হইলে আনন্দ কহিলেন—"আমার ইচ্ছা নয় যে তথাগত এই অজানা অচেনা একটা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশম্বী, কাশী প্রভৃতি মহানগরী তো রহিয়াছে; সেখানে দেহরক্ষা না করিয়া এই সামান্য অপরিচিত একটা গ্রামে ভগবান দেহত্যাগ করিবেন ইহা আমি কি করিয়া দেখিব? এই সব মহানগরীতে কত রাজা মহারাজা ধনী

শ্রেষ্ঠী ও সদ্ ব্রাহ্মণের বাস; তথায় ভগবান দেহরক্ষা করিলে তাঁহার সৎকারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইতে পারিত—"

ভগবান কহিলেন—"না আনন্দ, এ কথা বলিও না; এই কুশীনগর বহুকাল পূর্ব্বে কুশাবতী নাম্নী নগরী ছিল, এবং এইস্থানে মহাসুদর্শন নামে মহারাজা রাজত্ব করিতেন। দেবভূমি অলকানন্দার মতই এই মহানগরী ধনধান্য ও সম্পদ সম্পন্ন জনপদ ছিল। হস্তীর বৃংহতি, অশ্বের হ্রেষা ও রথের ঘর্ঘর শব্দে কুশাবতীর রাজপথ সদা নিনাদিত হইত। অধিবাসীরা দিবারাত্রি নৃত্যগীতে মগ্ন থাকিয়া নগরীর ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার পরিচয় দিত।

"সুতরাং হে আনন্দ, তুমি আর কালবিলম্ব করিও না; যাও, কুশীনগরের মল্লদের গিয়া এই সংবাদ দাও যে আজ রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগত এই স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহারা যেন যথা সময়ে উপস্থিত থাকিতে না পাইয়া দুঃখ বোধ না করেন।"

'যথা আজ্ঞা' বলিয়া আনন্দ নগরী মধ্যে মল্লদের সংবাদ দিতে গেলেন। মল্লগণ এই সংবাদ শ্রবণ করতঃ দুঃখে ও শোকে যারপর নাই অভিভূত হইলেন। এবং বৃদ্ধ, বালক, নারী ও যুবা সকলেই বিষণ্ণ চিত্তে শালবন অভিমুখে চলিল।

আনন্দ সমস্ত মল্লগণকে গোষ্ঠী ও পরিবারে একত্র করিয়া দলে দলে তথাগতের সহিত সাক্ষাতের জন্য সম্মুখে আনয়ন করতঃ তথাগতকে সংবাদ দিলেন। এবং সমস্ত মল্ল নরনারী তথাগতের চরণ বন্দনা করিলেন।

ক্রমশঃ

আকাঙ্ক্ষিত

[শ্রীনমিতা দেবী]

তোমারে যে পাব কভু তা' ভাবিনি
পেতেও তোমারে চাইনি কভু।
তোমারে পূজেছি গোপন পূজায়
হৃদয়-আসনে হে মোর প্রভু!
সারা মন মোর তোমারি ভাবনা
ভেবেছে বসিয়া সারাটী দিন—।
ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া
তোমারি ধেয়ানে হ'য়েছে লীন।

গোপন প্রাণের গোপন বাসনা
রেখেছি গোপনে হৃদয়-পুরে—;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণের বাঁশরী
ধ্বনিয়া উঠেছে করুণ সুরে।
ব্যাকুল পরাণে ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আর ত' সহে না পারি না আর-
নিঠুর সরমে ফুটেনা ক' বাণী
জমে' উঠে শুধু হৃদয়-ভার।

এমনি করিয়া যাবে কত কাল
বল প্রিয়তম হৃদয়স্বামি!
অন্তর দহে মিলন-তিয়াসে
আর ত' সহিতে পারি না আমি।

ফোট'গ্র্যাফি

[পি, গোস্বামী, এম-এ]

ফোটো শব্দের অর্থ আলো। আলোর ক্রিয়ার দ্বারা কোন বস্তুর প্রতিফলিত প্রতিকৃতি, লেন্সের ভিতর দিয়া অন্ধকার ক্যামেরায় অবস্থিত একটি যৌগিক-পদার্থ মাখানো কাঁচে অথবা সেলুলয়েড্ ফিল্মে পড়িয়া তথায় মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে পুনরায় অনুরূপ মশলা মাখানো কাগজে যে ছবি মুদ্রিত করা হয় তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ ফোট'গ্রাফ বলিয়া থাকি। "সাধারণতঃ" বলিলাম এইজন্য যে ফোটো তুলিতে স্থল বিশেষে ক্যামেরার সঙ্গে লেন্স্ না হইলেও চলে, এবং কাগজ ছাড়াও যে কোন দ্রব্যের উপরে ফোটো তোলা যায়। বায়োস্কোপে যে ছবি দেখি তাহাও ফোট'গ্রাফ, কিন্তু তাহা ফিল্ম হইতে ফিল্মেই মুদ্রিত।

ফোট'গ্রাফের বাংলা নাম দেওয়া হইয়াছে আলোক-চিত্র। কিন্তু আমার মনে হয় ফোটো অথবা ফোট'গ্রাফ কথাটা আমাদের দেশে এমন সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে যে ইহার কোন বাংলা পরিভাষা অথবা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা নাই। বস্তুত সাধারণ লোকে ফোটো বলিলে প্রকৃত জিনিসটি বুঝিতে পারিবে—কিন্তু আলোক-চিত্র বলিলে কিছুই বুঝিবে না।

ফোট'গ্রাফি বিজ্ঞানের একটি মহামূল্য আবিষ্কার। ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র এমন বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে আজ যদি পৃথিবী হইতে ফোট'গ্রাফি তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সভ্যতার প্রসার অল্পদিনের মধ্যেই অনেকাংশে থামিয়া যাইবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এমন কি বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনাও অচল হইয়া পড়িবে। চিকিৎসা জগতে ইহা ঔষধের চেয়েও বেশি মূল্যবান। শিক্ষা বিস্তারের ইহা প্রকৃষ্টতম উপায়। বস্তুত, ফোট'গ্রাফি সভ্যতার একটা অপরিহার্য্য এবং অমূল্য অঙ্গ, ইহাকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই, বরঞ্চ ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

আজকাল ফোটো তোলা কত সহজ তাহা আমাদের দেশের সৌখিন ফোটো-চিত্রকরদের সংখ্যার দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। একটি ক্যামেরা পাঁচ ছয় টাকায় পাওয়া যায়, দিনের আলোতে নেগেটিব ভর্ত্তি করা এবং খোলা চলে, দিনের আলোতেই তাহা ডেভেলপ করা এবং কাগজে মুদ্রিত করা চলে। কোন্ আলোতে লেন্সের মুখ কতক্ষণ খুলিয়া রাখিয়া ছবি তুলিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়, কতক্ষণ ডেভেলপ করিতে হইবে তাহাও অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থির করিবার আবশ্যকতা নাই। জলের তাপ কত থার্মোমিটারে জানিতে পারিলেই, জলের তাপ অনুযায়ী ডেভেলপ করিবার সময়ের তারতম্য ব্যবস্থা-পত্রে পাওয়া যাইবে। ডাক্তারী শাস্ত্রে যেমন রোগ নির্ণয়ে অনুমান উঠিয়া গিয়া সেই স্থান অনুবীক্ষণ অথবা অনুরূপ অন্য যন্ত্র অধিকার করিয়াছে, ফোট'গ্রাফিতেও ঠিক তাহাই হইয়াছে,—এখন ছয় সাত বছরের বালক-বালিকারাও নিশ্চিন্তে মাঠে ঘাটে ফোটো তুলিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এই শিল্প শিশু অবস্থাতে এত সুখসাধ্য ছিল না। অন্যান্য শাস্ত্র যেমন, ফোট'গ্রাফিও তেমনি প্রথম যাত্রাপথে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই—কোনো দিন শেষ হইবে কিনা সে ভরসাও পাওয়া যাইতেছে না। একদিকে যেমন ইহার উন্নতি হইতেছে—অন্যদিকে জটীলতাও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই। দুর্ভোগ যাহা কিছু বৈজ্ঞানিকদের ঘাড়ের উপর দিয়া যাইতেছে, শিল্পী মহা আনন্দে তাহার সুফল উপভোগ করিতেছেন মাত্র, সুতরাং বিজ্ঞান হিসাবে ইহা যতই জটীল হউক, শিল্প হিসাবে ইহা সুখসাধ্য, আরাম-দায়ক এবং শিক্ষাপ্রদ।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। সিল্‌ভার ক্লোরাইড নামক একটি যৌগিক পদার্থ সূর্য্যের আলো লাগিলে মলিন হইয়া যায়—এই সামান্য ব্যাপারটি এই সময় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের এক

ভদ্রলোক সিল্‌ভার নাইট্রেট জলে গুলিয়া অদৃশ্য কালি প্রস্তুত করেন। এই কালি দিয়া লিখিলে, কিছুই দেখা যায় না—কিন্তু সূর্য্যের আলোতে ধরিলে সেই অদৃশ্য লেখা ক্রমশঃ দৃশ্য হইয়া উঠে। অর্থাৎ সিল্‌ভার নাইট্রেটও আলো লাগিলে মলিন হইয়া যায়। তখন এই ব্যাপারটি শুদ্ধমাত্র আমোদের জন্যই কাজে লাগানো হইয়াছিল, কিন্তু ইহারই মধ্যে যে ফোটো'গ্র্যাফির বিস্ময়কর আবিষ্কারের ইঙ্গিত ছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

এই সময় সিলুয়েট নামক একপ্রকার চিত্রের প্রচলন ছিল। ইহার আবিষ্কারক সিলুয়েটের নামে চিত্রের নামকরণ হইয়াছে। যাহার সিলুয়েট করিতে হইবে কালো কাগজে তাহার মুখের একপাশের অবয়ব-রেখা আঁকিয়া লইয়া সেই রেখা ধরিয়া কাগজখানি কাটিয়া শাদা কাগজে আঁটিয়া দিলেই সিলুয়েট চিত্র প্রস্তুত হইত। এইরূপ চিত্রে মুখ চোখের পৃথক কোন তথ্য থাকিত না—থাকিত কেবল নিখুঁৎ কালো একটি অবয়ব-চিত্র। এইরূপ চিত্রের আদর এখনো সমান ভাবেই আছে এবং ক্যামেরার সাহায্যে এরূপ সিলুয়েট প্রস্তুত করায় শিল্পীর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তখনকার দিনের দক্ষ শিল্পী মুখের পার্শ্বরেখা দেখিয়া কাগজে অঁকিতেন—এবং অল্প দক্ষ শিল্পী, যাহার সিলুয়েট প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার এক পাশে একটা আলো রাখিতেন এবং অন্যপাশে শাদা কাগজ অথবা শাদা কাপড় ঝুলাইয়া রাখিতেন। ইহাতে মুখের ছায়া শাদা পরদায় পড়িলে তাহার রেখা অনুসরণ করিয়া সেই পরদায় আউট লাইন আঁকিয়া লইতেন। সেই সময় ওয়েজউড চিন্তা করিলেন—কাগজ কাটিয়া সিলুয়েট প্রস্তুত না করিয়া কাগজে সিল্‌ভার নাইট্রেট মাখাইয়া মুখের ছায়া গ্রহণ করিলে ত বেশ হয়। চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইতে দেরী হইল না। ইহা ছাড়া তিনি আরো একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। ক্যামেরা অব্‌স্কুরার সাহায্যে ছবি আকিবার একটা প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। একটা বাক্সের একদিকে গ্রাউণ্ড গ্লাস্—অপর দিকে লেন্স লাগানো থাকিত। যাহার ছবি আঁকিতে হইবে তাহার দিকে এই ক্যামেরাটি ঘুরাইয়া রাখিলে লেন্সের ভিতর দিয়া তাহার প্রতিবিম্ব গ্রাউণ্ড-গ্লাসে আসিয়া পড়িত এবং চিত্রকর সেই ছবি নকল করিয়া লইতেন। এই ক্যামেরা অব্‌স্কুরা অনেকটা বর্ত্তমান ক্যামেরার মতই কিন্তু ইহা গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপর প্রতিফলিত ছবি দেখিয়া নকল করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত।

ওয়েজউড গ্রাউণ্ড-গ্লাসের স্থানে সিল্‌ভার নাইট্রেট মাখানো কাগজ স্থাপন করিয়া ফোটো চিত্র প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে এক্স্‌পোজার এত বেশী দিতে হয় যে ততক্ষণ ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার পর সার হাম্‌ফ্রে ডেভি সিল্‌ভার নাইট্রেটের পরিবর্ত্তে সিল্‌ভার ক্লোরাইড ব্যবহার করিয়া কিঞ্চিৎ সুফল পাইলেন।

ছবি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উঠিতে লাগিল কিন্তু সে ছবি স্থায়ী হইল না। কারণ যে কাগজে ছবি হইল, তাহা আলোয় আনিয়া দেখিতে গেলে ছবির বাহিরের সমস্ত শাদা জায়গা এবং ছবি উভয়েই কালো হইয়া যাইত। ডেভি বুঝিতে পারিলেন, ছবি তুলিবার সময় যে যে জায়গায় আলোর ক্রিয়া হয় নাই, সেই সেই স্থান পুনরায় কালো না হইবার কোন উপায় বাহির করিতে পারিলেই ফোটোগুলি কার্য্যকরী হইতে পারে। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী ফোটোকে স্থায়ী করিবার মশলা আবিষ্কার হয় ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পর। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্যার জন হার্শেল "হাইপো" আবিষ্কার করেন এবং আবিষ্কারের ১৮ বৎসর পরে জানিতে পারেন যে এই হাইপো, সিলভার ক্লোরাইড মাখানো কাগজের আলো-না-লাগা অংশ হইতে সমস্ত অবিকৃত সিলভার ক্লোরাইডকে তাড়াইয়া দিতে পারে। এই আবিষ্কারের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হাইপোর ব্যবহার সমান ভাবে চলিতেছে। ইহাতে ছবি স্থায়ী হয় বলিয়া এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হইয়াছিল—ফিক্স করা অর্থাৎ স্থায়ী করা এবং এই নাম আজও ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্রমশঃ

বিজয়িনী

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী]

'আমায় চিনিতে পারিবে কি ?'
তুলিয়া প্রদীপখানি মুখে ফুটিবে না বাণী ;
চমকি' কহিবে শুধু, 'এ কি !'
কালের জমাট কালি দু' হাতে মুছিয়া গো,—
'তোমায় চিনিব'—বল' দেখি !
হ'বে তব পরাজয়, সে আমি এ আমি নয় ;
আমায় চিনিতে পারিবে না !
আঁচলে প্রদীপ ঢাকি' আনন ফিরায়ে গো—
বলিবে, 'মনে ত পড়িছে না !'

সিঁথীর উপর হ'তে খসিবে বায়ুর স্রোতে,
তোমার আঁচলটুকু হায়,
ঘন কালো কবরীর মধুর মধুর বাস
মধুর হইবে নিরাশয় !
নিবিড় নীরব ক্ষণ দেখিবে আমার মন,
শুনিবে গভীর হাহাকার !
প্রাণের দুর্দ্দম রথ প'ড়ে র'বে মৃতবৎ—
দুলিবে স্মৃতির পারাবার।

তুমি চ'লে যা'বে দূর, মিলা'বে স্বপন-পুর ,
আমার সমুখে রাজপথ ;—
সে জন-সাগর মাঝে ভাসিয়া চলিব গো
একেলা চলিবে মনোরথ !
আমার রজনী ভরি' প্রাণের শ্রাবণ মরি,
ঝর ঝর ঝরে অবিরাম !
তা'রি মাঝে বার বার হৃদয় কহিবে মোর
'তোমারে আমি ত চিনিলাম !'

তোমারে আমি যে চিনিলাম !
তবু তবু সে হৃদয়, কোথায় মিলা'য়ে রয় ?—
কোথায় সে হাসি অভিরাম ?
সারাটি জীবন হ'তে হাসিরে লইল কে ?
মনে হয়, একি পরিণাম ?
বিজয়িনী, তব জয়— নাই হ'ল পরিচয়,
সমুখে চলিল তব রথ !
আমার রহিল গান আর একখানি প্রাণ—
রহিল বিপুল রাজপথ !

উপাসনার কুলজী

[শ্রীকালিদাস রায়]

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম-রচয়িতা বিখ্যাত সাহিত্যরথী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি ছাড়িয়া মহারাজের শরণাপন্ন হন। কতকটা তাঁহাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কতকটা সেক্রেটারী দেবেন্দ্রনাথ বসু ও ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে উপাসনা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হইলেন চন্দ্রশেখর বাবু। চন্দ্রশেখর বাবু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র-মণ্ডলের একজন জ্যোতিষ্ক, বঙ্গদর্শনের লেখক ও সমালোচক—বঙ্কিমেরই অন্যতম শিষ্য। কাজেই উপাসনা বঙ্গদর্শনের আদর্শেই পরিকল্পিত হইল। বঙ্গদর্শনের মত ইহাতে প্রবন্ধগৌরবের দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখা হইল। উপন্যাস ও গল্প যে থাকিত না তাহা নহে—তবে উহা উপাসনার গৌণাংশ। তখন ছবি দেওয়ার প্রথা ছিল না। নিম্নলিখিত লেখকগণের লেখা লইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়—কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রশেখর বসু। নিখিলনাথ রায়, ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায় ইত্যাদি। অধিকাংশ লেখকই স্থানীয়। উপাসনা প্রকাশের পর বহরমপুরে সাহিত্যচর্চ্চার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বহরমপুর কলেজের অধ্যাপকগণ সকলেই সাহিত্যানুশীলন আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে ব্রতী হইলেন। স্থানীয় তরুণ সাহিত্যিকগণ গল্প ও কবিতা লিখিতে সুরু করিলেন। তরুণ লেখকদের মধ্যে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ৺রাধিকাচরণ বরাটের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৺রাধিকাচরণ বরাট উপাসনার সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতে লাগিলেন। উপাসনার দেখাদেখি সৈদাবাদে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইল—তাহার নাম কণিকা। স্থানীয় লেখক-গণের মুখ্য বাসনা থাকিত উপাসনায় রচনাপ্রকাশ—স্থানাভাবে উপাসনাতে যাহা প্রকাশিত হইত না তাহাই কণিকাতে স্থান পাইত। কণিকাকে উপাসনার Bypro-duct বলা যাইতে পারে। এই সময়ে বহরমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিমাসে ইহার অধিবেশন হইত—স্বর্গীয় মহারাজ ইহার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। প্রতি মাসের অধিবেশনে এক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইত। এই প্রবন্ধ একটি মাস ধরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে রচিত হইত। প্রত্যেক প্রবন্ধটি উপাসনায় প্রকাশিত হইত। চন্দ্রশেখর বাবু সম্পাদক ছিলেন কিন্তু সম্পাদকীয় কাজ তাঁহার বেশী কিছু ছিল না—তাঁহার খাটিবার ক্ষমতাই ছিল না। সকলেই ভাবিয়া-ছিল - চন্দ্রশেখর বাবুর ন্যায় সাহিত্য-রথীর কাছে বাঙ্গালী পাঠক অনেক কিছু পাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন ছাড়া আর কিছু করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের লেখা উপাসনাতে ২।১টি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের গতি প্রগতি সম্বন্ধে কোন সাময়িক টীকা টিপ্পনী আদৌ উহাতে প্রকাশিত হইত না। পত্রিকাখানির সহিত সমসাময়িক জাতীয় জীবনের কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয় নাই—যুগ বিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পত্রিকাখানি চলিত না। কেবল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমষ্টি হিসাবেই উহার মূল্য ছিল। চন্দ্রশেখর বাবু উপাসনাকে বঙ্গদর্শনের আদর্শটি দিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। উপাসনার জন্য তিনি যখন পরিশ্রম করিতে পারিলেন না—লোকে যখন উপাসনায় তাঁহার মাসে মাসে রচনা আলোচনা না পাইয়া ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইতে লাগিল—তখন চারিদিক হইতে অসন্তোষজনক সমালোচনা হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু তখন মহারাজকে বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া আমাকে যে বৃত্তি দেন তাহা বিনা সর্ত্তেই দিন। উপাসনার ভার অন্য কোন শ্রমশীল উৎসাহী ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আমাকে অসহায় বোধেই আপনি প্রতিপালন করুন।"—তখন মহারাজ চন্দ্র-শেখর বাবুর বৃত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া উপাসনার ভার রাজস্থানের ঐতিহাসিক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করি-লেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু তখন ধারাবাহিক 'জগতের সভ্যতার ইতিহাস' রচনার ব্যপদেশে মহারাজের সংসারে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। তিনি উপাসনার ভার গ্রহণ করিলে

পত্রিকার যে বিশেষ কোন' উন্নতি হইল তাহা নহে—তবে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল—ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়িয়া গেল—যজ্ঞেশ্বর বাবু নিজেও প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই সময় উপাসনার কিছু বলক্ষয়ও ঘটিল। মহারাজকে বেষ্টন করিয়া যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি বহরমপুরে মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রসগুঞ্জনের অর্থাৎ তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির উপাসনাতে ঠাঁই হইত না। তাই তাঁহারা অর্থাৎ সেক্রেটারী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, বামাচরণ বসু ইত্যাদি লেখকগণ মহারাজের অর্থানুকূল্যে 'গৌরাঙ্গসেবক' নামে একখানি সাম্প্রদায়িক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ এই সময়ে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারের জন্য একটি বিশিষ্ট বিভাগ খুলিয়াছিলেন - সেই বিভাগের কার্য্যাবলীর বিবরণ গৌরাঙ্গসেবকেই প্রকাশিত হইত। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধে 'গৌরাঙ্গসেবক' সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বর বাবু ক্রমে কলেজের অধ্যাপক হইলেন - বর্ত্তমান মহারাজের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ভার লইলেন—তাঁহার অবসরও কমিয়া আসিল—উপাসনার জন্য তিনি বেশী খাটিতে পারিতেন না। ক্রমে উপাসনা দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তখন উপাসনা আবার হস্তান্তরিত হইল।

চন্দ্রশেখর বাবুর সময়ে উপাসনার যে প্রবন্ধ গৌরব ছিল —যজ্ঞেশ্বর বাবুর সময়ে তাহা হ্রাস পাইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবুর আমলে উপাসনার রচনার নীচে নাম প্রকাশিত হইত না। বৎসরান্তে সূচীতে নাম প্রকাশিত হইত—যজ্ঞেশ্বর বাবুর আমলে এ প্রথা ছিল না। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না—সেজন্য রবীন্দ্র-ভক্তদের রচনাও উপাসনাতে প্রশ্রয় পাইত না। সেজন্য উপাসনাতে আমাদের তেমন প্রতিপত্তি হয় নাই—আমরা কণিকাতেই হাত পাকাইতাম। শরদিন্দু কবিতা ছাপিবার জন্য একটু ব্যাকুল ছিল না,—সে আড্ডায় আড্ডায় উহা আবৃত্তি করিত। উপাসনাতে কবিতার প্রতিপত্তি ছিল না বলিলেই হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর আমলের শেষ দুই বৎসরে উপাসনার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবু নিজে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠেন। যজ্ঞেশ্বর বাবুও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার মনের বল চন্দ্রশেখর বাবুর মত প্রবল ছিল না,—সহজেই তাঁহাকে বিগলিত করা যাইত। যজ্ঞেশ্বর বাবুর আমলে সেজন্য আমরা জোর করিয়া কতকটা উপাসনার পৃষ্ঠা দখল করিয়াছিলাম। এমন কি আমি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে পাঁচ সংখ্যায় একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করাইতে পারিয়াছিলাম—তখন আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

উভয়ের আমলেই উপাসনা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ধারার আদর্শই অনুসরণ করিয়া গিয়াছে—বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ধারার আদর্শ সুরু হইল—রাধাকমল বাবুর হাতে আসিয়া—।

উপাসনা রাধাকমল বাবুর হাতে আসিলে সম্পূর্ণ রূপান্তর ধারণ করিল—আকারেরও পরিবর্ত্তন হইল। উপাসনা তখন হইতে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। উপাসনায় এই সময় হইতে সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। উপাসনায় যখন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে মাসের পর মাস আলোচনা চলিত তখন বাঙ্গলা দেশে কোন' পত্রিকাতে তাহার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। রুষীয় সাহিত্যের আদর্শ কোন্ কোন্ দিক হইতে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে পারে—তাহা লইয়া ধারাবাহিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ উপাসনার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকিত।

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বা রসের আদর্শ লইয়া রাধাকমল বাবু মাথা ঘামান নাই। সাহিত্যের অন্তরস্থ তত্ত্ব, তথ্য, বাণী, ব্রত—এককথায় সাহিত্যের প্রতিপাদ্য পরোক্ষ সত্য লইয়াই তাঁহার আলোচনা গবেষণা। রাধাকমল বাবুর পরিকল্পিত সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে কথা-সাহিত্য রচিত হইবার কথা,—তাহার তখনও অভ্যুদয় হয় নাই। তাই উপাসনায় সত্যের বিবৃতিই থাকিত—সাহিত্য-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত থাকিত না। রাধাকমল বাবুর স্বপ্ন এতদিনে সত্যে পরিণত হইয়াছে তাহাও আংশিক ভাবে। তাই তরুণ সাহিত্যিকদের রচনায় তিনি এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেজন্য 'দরিদ্রিয়ানার' অপবাদের জন্য উপহসিত হইয়াছেন। সাহিত্যকে রসের দিক হইতে না দেখিয়া মঙ্গলের

দিক হইতে দেখার যে আদর্শ রাধাকমল তাহা পাইয়াছিলেন —রুষীয় সাহিত্য হইতে। যে সাহিত্য অভিজাত গোষ্ঠীর মনোভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—যাহার সহিত আপামর সাধারণ—শতকরা ৯৫ জনের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নাই তাহা জাতীয় সাহিত্য নহে। তাহার দ্বারা জাতির কোন মঙ্গল হইবে না—তাহা পরগাছার ফুল মাত্র হইয়াই থাকিবে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য। এক কথায়, তাঁহার মতে সাহিত্যের উপাদান জনকতক ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর কৃত্রিম অস্বাভাবিক জীবন যাত্রা নহে, সাহিত্যের উপাদান হওয়া উচিত—মাটির খাঁটি মালিকদের জীবন যাত্রা, তাহা যত দীন হীন পরাধীন দুঃখকারজনক হউক না কেন। উপাসনায় রাধাকমল যে আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন,—তরুণ সাহিত্যিকগণ অজ্ঞাতসারে সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে। তাহারা কতটা তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহারা তাহাকে কতটা দেশকালপাত্রোপযোগী করিতে পারিয়াছে তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

এই সময়ে বিনয়কুমার সরকার, অতুলচন্দ্র দত্ত, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, আমি ও সাবিত্রীপ্রসন্ন রাধাকমলের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিলাম।

রাধাকমল সম্পাদক হইলেও কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন অতিরিক্ত রক্ষণশীল ব্যক্তির উপাসনা পরিচালনায় হাত ছিল। তিনি উপাসনার কতক অংশ লিখিতেন এবং কতক অংশের রচনা সংগ্রহ করিতেন। রাধা কমল বাবু চাহিতেন আগাইতে তাঁহার মত ছিল—'আগে চল আগে চল ভাই।' কালীপদ বাবুর বোল ছিল—'পিছু হট্ —পিছু হট্ ভাই।' ফলে উপাসনার উভয়াংশে একেবারেই সামঞ্জস্য থাকিত না। দুই আদর্শের টানাটানিতে উপাসনার প্রকৃতি আত্মবিসংবাদী হইয়া উঠিল। তখন অতুল বাবু, বিভূতি বাবু, আমি ও সাবিত্রী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলাম,—রাধাকুমুদ বাবু রাধারমণ বাবু ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। —আমরা উপাসনার সহিত Non-cooperation করিব বলিয়া জানাইয়া দিলাম। তখন উপাসনা কালীপদ বাবুর প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাবিত্রীপ্রসন্নের তত্ত্বাবধানে আসিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন বহরমপুর কলেজের ছাত্র।

এ পর্য্যন্ত 'উপাসনা' বহরমপুর হইতেই প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরই রাধাকমল বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সাবিত্রীপ্রসন্নও কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিলেন ও সহ-সম্পাদক পদে বৃত হইলেন। সেই হইতেই কলিকাতা হইতে উপাসনা প্রকাশিত হইতেছে। ১৩৩০ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মহারাজা উপাসনার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর বৎসর হইতে উপাসনার সমস্ত ব্যয়ভার সাবিত্রীপ্রসন্ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন এই ভাবে চলার পর রাধাকমল বাবু লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যান। সেখান হইতে সম্পাদক হিসাবে তাঁহার পক্ষে আর সাহায্য করা অসম্ভব হইলেও নামে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সম্পাদক থাকেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন কংগ্রেসের কার্য্যে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ায় এবং দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে Forward Press এর কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় সন ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পরই উপাসনা বন্ধ হইয়া যায়।

Indian Insurance Journalএর সম্পাদক শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে ইন্‌সিওরেন্স ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের ভার দিয়া তাঁহার সহিত একযোগে সাবিত্রীপ্রসন্ন আবার গত ১৩৩৫ সালে শ্রাবণ মাস হইতে নব পর্য্যায়ে 'উপাসনা' বাহির করিতেছেন। এক "প্রবাসী" ছাড়া উপাসনার মত পুরাতন কাগজ বাঙ্গলায় আর নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা, বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে আহূত হইয়াছিল। সে সভার সভাপতি হইয়াছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য সম্মিলনকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্যই উপাসনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্বর্গীয় মহারাজা এজন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। একটি মাত্র প্রবন্ধের জন্য লেখক ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকাও দক্ষিণা পাইয়াছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন নিজের দুর্ব্বল স্কন্ধে উপাসনার সমস্ত ব্যয়ভার এযাবৎকাল বহন করিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার স্নেহভাজন অনুজকল্প সাবিত্রীপ্রসন্নের সাহিত্য-প্রচেষ্টা উপাসনার মধ্য দিয়া সার্থক হউক ভগবানের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

[শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য]

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের পৈতৃক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলায়। চন্দ্রশেখর বাবুর পিতামহ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবসায়োপলক্ষে খাগড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার রেশমের বিস্তৃত কারবার ছিল। তিনি ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। চন্দ্রশেখরের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ১২৫৬ সালের ১২ই কার্ত্তিক তারিখে চন্দ্রশেখর মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হ'ন। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে ইংরাজী লেখাপড়া শিখান; কিন্তু পিতার ভয়ে পারিতেন না। পিতা রামচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি পৌত্রকে খাগড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম তখন সাত আট বৎসর মাত্র। কিছুদিন পরেই বিশ্বেশ্বর পুত্রকে বহরমপুর কলেজ-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সুযোগ পান। রামচন্দ্র তখন কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহাদের রেশমের কুঠী ছিল। কলিকাতা হইতে আসিয়া যখন তিনি এই ঘটনা জানিলেন তখন পুত্রের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে বলিয়াছিলেন 'ইহার ফল ভাল হইবে না'। হইয়াছিলও তাহাই; ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী কতকাংশে ফলিয়াছিল। চন্দ্রশেখর পাঠ্যাবস্থায়ই মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন এবং আমরণ এই সর্ব্বনাশী নেশার বশীভূত হইয়া বাতব্যাধি প্রভৃতি শারীরিক, নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সত্য যে, চন্দ্রশেখর ইংরাজী না পড়িলে আজ সাহিত্য জগৎ 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' পাইত না, তাঁহার নানাবিষয়ক জ্ঞানগরিষ্ঠ প্রবন্ধরাজি বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিত না বা সুধী-সমাজ তাঁহার ভাবধারার সহিত পরিচয় লাভ করিবার সুযোগও পাইতেন না।

সে যাহা হউক তিনি যথা সময়ে বহরমপুর কলেজ-স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং কলিকাতায় পড়িতে যা'ন। সেখানে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি, এ পড়েন এবং যথা সময়ে যোগ্যতার সহিত বি, এ উপাধি লাভ করেন।

এই সময়ে ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি হওয়ায় ইঁহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। সেইজন্য ইনি কিছুদিন বহরমপুর কলেজ-স্কুলে ও পরে কিছুদিন রাজসাহী কলেজ-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই ইঁহার বিবাহ হয়। প্রথম বিবাহ হয় জিয়াগঞ্জের সন্নিকটে দেবীপুর নামক স্থানে। এই স্ত্রীর গর্ভে একটী মাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু পুত্রটী দুই বৎসরের না হইতেই কালকবলিত হয়। ইহার অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ ঘটে। এই পত্নীর বিয়োগেই তাঁহার অমর কীর্ত্তি 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' রচিত হইয়াছিল। ইঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয় লালবাগ ৺গঙ্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত, কিন্তু ছয় মাস মধ্যেই এই স্ত্রীও মৃত্যুপথের পথিক হ'ন। শেষ বিবাহ হয় নদীয়ার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী ৺চণ্ডীদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত। তখন ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর—। এই স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেটীও অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাঁহার শেষ জীবনসঙ্গিনীও স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বেই লোকান্তরিতা হন।

কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ইনি বি, এল পড়েন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—বহরমপুর কোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন কিন্তু কার্য্যশৈথিল্যের জন্য এখানে পসার করিতে না পারিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। সেখানেও ঐ এক দোষেই সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তখন ইঁহার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত অস্বচ্ছল হইয়া পড়ে। ইঁহার তৃতীয় পত্নীর এক পিতৃব্য তৎকালে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের এষ্টেটে ইনি ম্যানেজার নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু একার্য্য তাঁহার আদৌ প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহার অস্বচ্ছলতার কথা এই সময়ে

বাঙ্গালীর বিখ্যাত দানবীর, পুণ্যশ্লোক, স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কর্ণগোচর হয়। তিনিই ইঁহার কলিকাতার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন এবং সাগ্রহে সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া ইঁহাকে দেশে লইয়া আসেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

তারপর মহারাজের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় ও চন্দ্রশেখরের সুযোগ্য সম্পাদকতায় উপাসনা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য বদান্যবর মহারাজ সেই সময় হইতে চন্দ্রশেখরের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এমন কি উপাসনার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লুপ্ত হইলেও মহারাজ তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ বৃত্তি দিয়া আসিয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় ইনি 'মশলা-বাঁধা কাগজ' নামে একখানি পুস্তক বাহির করেন। সেখানি অধুনা, লুপ্ত-প্রায়। বঙ্কিম চন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ 'মশলা বাঁধা কাগজে'র ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি আর একখানি বই বাহির করেন সেখানির নাম 'কুঞ্জলতার মনের কথা'। সেখানিও আজকাল আর দেখা যায় না। সভ্য সমাজে নরনারীর প্রকৃত সম্বন্ধ, তাঁহাদের অধিকার ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য বাদই কুঞ্জলতার মনের কথা। তারপরই রচিত হয় অমর গদ্য-কাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'। ইহার পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বেশী দিতে হইবে না। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'ই চন্দ্র শেখরকে সমধিক প্রসিদ্ধ করিয়াছে, সাহিত্য জগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

বঙ্গদর্শনে 'সতীদাহ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিকালে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে লিখিয়াছিলেন 'লেখকের লিপি-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি'। পরে বহরমপুরে বাসকালে বঙ্কিম চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি সাহিত্য-রথীর সহিত সাহিত্যালোচনায় চন্দ্রশেখর ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের সেই সাহিত্য-সভার সভ্যগণ বিক্রমাদিত্যের সময়ের মত—কালিদাস প্রভৃতি আখ্যায় নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে পরিচিত হইতেন।

সেই সময় (মুর্শিদাবাদ) বহরমপুর হইতে 'মাসিক সমালোচক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। চন্দ্রশেখর তাহার সম্পাদক ছিলেন। তাহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় 'মাসিক সমালোচক' তৎকালে বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা ইহার পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিত। এই সময় ইঁহার 'স্ত্রী চরিত্র' প্রকাশিত হয়।

ইনি বিভিন্ন পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'সারস্বত কুঞ্জ' নামক একখানি পুস্তকে তাহার অনেকগুলি সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য-গগনের চিহ্নিত নক্ষত্র, বঙ্গ সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের সামান্য মত পরিচয়ও আছে তাঁহারা চন্দ্র শেখরের সাহিত্য-সেবার বিষয় অবগত আছেন। চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্বও তাঁহার সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়াই আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। তিনি সাহিত্য-সেবা ব্যতীত দেশের অন্য প্রকার হিতকর কার্য্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে আত্ম নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সেই সাহিত্য-সেবার মধ্য হইতেই সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোমতের প্রত্যক্ষবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, মিলের হিতবাদ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অসীম ব্যুৎপত্তি ছিল, তাঁহার অনেক

প্রবন্ধ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রও তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় ছিল। ইংরাজী সাহিত্যের ত কথাই নাই, ফরাসী সাহিত্যের সহিতও তাঁহার পরিচয় নিতান্ত অল্প ছিল না। ফরাসী বিদ্রোহের ও নেপোলিয়নের ইতিহাস তিনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সমাজ ধ্বংসের অভিলাষী ছিলেন না। হিন্দু সমাজের মূল উদ্দেশ্য তাঁহার নিকট যুক্তিপূর্ণ বলিয়াই মনে হইত। তাঁহার সতীদাহ প্রভৃতি প্রবন্ধ হইতে তাহার আভাস প্রতিভাত হয়।

সাহিত্য সাধনা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; তিনি অনলস ভাবে আজীবন বাণীর চরণ সেবাই করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যে সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজেও সংযম সহকারেই সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। 'বিবাহের ইতিহাস' নামক একটী সুচিন্তিত গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ উপাসনায় প্রকাশিত হইতেছিল। দুঃখের বিষয় তিনি সেটী সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধটী বাঙ্গালা ভাষার একটী অমূল্য রত্ন হইত সন্দেহ নাই।

১৩২৯ সালের ২রা কার্ত্তিক রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় তিন দিনের জ্বরে চন্দ্রশেখর ইহ জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতটস্থ যে মহাশ্মশানে তাঁহার প্রথমা পত্নীর শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল সেই মহাশ্মশানেই চন্দ্রশেখর তাঁহার শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন।

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তোর ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো
বান ডেকে আজ চল্‌ল ভেসে,
দুয়ারে তোর দেখ চেয়ে ওই
কে দাঁড়াল মধুর হেসে!

কি দিবি তুই তা'র দু'হাতে
ঝড় গিয়েছে গভীর রাতে
তোর, ভাঁড়ারের ধন লুট করেছে
কি জানি কোন সর্ব্বনেশে

ফিরিয়ে দিবি কোন লাজে হায়
সব দিয়ে যে প্রেম শুধু চায়
অনুরাগে রাজার দুলাল
এলরে ভিখারীর বেশে।

স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য]

পরলোকগত প্রবীণ পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নীরবে সাহিত্য সাধনা করিয়া কত যে অমূল্য রত্নে বঙ্গবাণীর কণ্ঠহার অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্যক্ পরিচয়ও অনেকে জানেন না। তিনি সাধকের ন্যায় একান্তে নিভৃত হৃদয়ের অনাবিল ভক্তিতে বাণীর রাতুল চরণ পূজা করিয়া গিয়াছেন। লোক সমাজে আপনার মহিমা কীর্ত্তনের জন্য আদৌ প্রয়াসী ছিলেন না তাই যথার্থ জ্ঞানান্বেষী সাহিত্য-সেবী ব্যতীত প্রায় অনেকেরই নিকট তিনি আজ অখ্যাত, —অপরিচিত।

পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বহু পুস্তকের রচয়িতা ও অনুবাদক। টডের রাজস্থান তাঁহারই কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া বরাট প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত বরাট প্রেস হইতে তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ বাহির করিয়া শাস্ত্র-পাঠ-পিপাসু ব্যক্তির চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন। কত যে দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন না। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও অনেকাংশ অনূদিত করিয়া গিয়াছেন। বহুল শ্রমে অনেক পুস্তক রচনা করিয়া তিনি অনেক সময় সেগুলি প্রকাশকের নামেই প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতেই মনে হয় তিনি নামের প্রয়াসী ছিলেন না।

জীবিত কালে বহুবার তাঁহার নিকট তাঁহার জীবনী জানিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বঙ্গসাহিত্যের কতটুকুই বা করিয়াছি? মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণোপান্তে বসিয়া যাহা লাভ করিয়াছিলাম তাহারই সাহায্যে বাণীর সেবা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আমি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য ব্যক্তি, আমার মত ব্যক্তির জীবনীর প্রয়োজনই বা কি?' শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' নামক পুস্তকে তাঁহার একটী অতি ক্ষুদ্র জীবনী সন্নিবেশিত ছিল। সেটী তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলেন 'ইহাই আমার জীবনী।' তাঁহার রচিত ও অনূদিত পুস্তকের একটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত তালিকা ছিল; সেটী তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে পরে পাইয়াছিলাম। সেইটী দেখিলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অক্লান্ত সাহিত্য-সেবার অনেকটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

শেষ জীবনে তিনি যেরূপ মানসিক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে চক্ষুতে জল আসে। সেই সময় যাহার সহিত তাঁহার দেখা হইত তাহাকেই বলিতেন, 'আমার কৃত পুস্তকের সহিত নাকি আমার কোন সম্বন্ধ নাই! ইহার কি কোন প্রতীকার নাই!' দর বিগলিত অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইত; ক্রমে বালকের ন্যায় উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। সে সময় তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সেই জন্য প্রকৃত ঘটনা কিছুই জানিতে পারি নাই। ইঁহার পুত্র কন্যা কিছুই ছিল না, সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক সেবায় তাঁহার শেষ জীবনের দুঃখ কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল ইহাই সান্ত্বনার বিষয়। বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণীষীর এই নিদারুণ দুর্দশার কথা ভাবিলে একবার কষ্টও হয় আবার ভাবি বাণীর চরণ-পূজারীর অনেকেরই ত' দুঃখ কষ্টে শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। যে মণীষা বাঙ্গলা ভাষার গৌরবের বিষয় সেই মণীষার এমন শোচনীয় পরিণাম কাহার অভিশাপে?

হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলেশিখিয়া গ্রাম ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ১২২৬ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বেলুন গ্রামে, মাতুলালয়ে পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব তথায়ই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় পিতা মাধবচন্দ্র পরলোক গমন করেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহের কোন ভাগিনেয়ের বাসায় থাকিয়া বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই পদ্য গদ্য রচনায় ইঁহার পটুতা। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় যজ্ঞেশ্বর বাবুকে (ইঁহার ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়) ময়মনসিংহে শেরপুর হইতে প্রকাশিত চারুবার্ত্তার সম্পাদক করিয়া পাঠান।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি টডের রাজস্থানের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই সেই সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতানা ও পাঞ্জাব ভ্রমণ করিয়া পাঞ্জাবের ইতিহাস লিখিবার বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। হিতবাদী সংবাদ পত্রের জন্মদিন হইতেই তিনি তাহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া ক্রমাগত তিন বৎসর তাহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'বীরমালা' গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অমূল্য রত্ন। উপাসনাতেও তিনি বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়া জ্ঞানপিপাসু পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতেন এবং কয়েক বৎসর উপাসনার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার রচিত ও তাঁহার কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটী তালিকা দিলাম (এইটী তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম।) সেই সঙ্গে কোন্ সনে কত বয়সে তিনি সেগুলি রচনা করেন ও পুস্তকগুলি কত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—যথাক্রমে সে বিবরণও দেওয়া হইল—

রক্তদন্ত বা আহমদনগরের পতন—(প্রথমবাঙ্গলা পদ্য-নাটক) ১৮৭৪ ; ১৪ ; ৮০। সমর শেখর—(ঐতিহাসিক উপন্যাস—আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত) ১৮৭৬ ; ১৬ ; ৪০০। রাবণ বধ—(পদ্য-নাটক—বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত) ১৮৭৮ ; ১৮ ; ১০০। দুর্য্যোধন বধ—(পদ্য-নাটক)—১৮৭৮ ; ১৮ ; ১০০। টডের রাজস্থানের অনুবাদ—১৮৮২ ; ২২ ; ১২০০। রসমালা (Or the Annals of Gujrat, অনুবাদ) ১৮৮৪ ; ২৪ ; ১০০০। A Comprehensive Dictionary from English to Bengali and English and from Bengali to English and Bengali ১৮৮১—১৮৯০ ; ২১—৩০ ; ১০,০০০। বৃহন্নারদীয় পুরাণ, (অনুবাদ) ১৮৮৪ ; ২৪ ; ৩৫০। মহাভারত (সভাপর্ব্ব হইতে বনপর্ব্ব অনুবাদ) ১৮৮৪ ; ২৪ ; ১০০০। কাশীখণ্ড, বরাহপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ (অনুবাদ) ১৮৮৪ ; ২৪। ভারতে রুস Or the Russian Advance towards India ১৮৮৫ ; ২৫ ; ৩০০। জয়াবতী নাটক ১৮৮৬ ; ২৬ ; ১২০। শ্রীমদ্ভাগবৎ (অনুবাদ) ১৮৮৭ ; ২৭ ; ১০০০। বীরমালা (আট খণ্ডে সম্পূর্ণ—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারতীয় বীরগণ) ১৮৮৮ ; ২৮ ; (১ম খণ্ড) ৪৮০। হিন্দু মহিলা ১৮৮৮ ; ২৮ ; ৪০০। The growth and development of the Hindu Society ১৮৮৯ ; ২৯ ; ২০০। 'Susruta' (only the surgical portion). Materia Medica and Therapeutics, Anatomy and Physiology, Surgery and Midwifery, Practice of Medicines &c. &c. ১৮৮৫—১৮৯০ ; ২৫—৩০ ; ২০,০০০। History of Civilization of the World. ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত ; ৩০ ; ২৫০০০। বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক—

তিনি বহুদিন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার প্রাচীন কালের গুরুর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি মিষ্টভাষী ও সদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন হাস্য রহস্যে তাঁহার অধ্যাপনা চলিত, ছাত্রেরা তাঁহার ঘণ্টায় বিমল আনন্দের সহিত হাস্য পরিহাসের মধ্যে জ্ঞান লাভ করিত। আমাদের সময়ই তাঁহার অধ্যাপক জীবনের অবসান হয় ; শেষ বয়সে অক্ষমতার অপরাধে তাঁহার কার্য্যটী যায়, এই কারণে সেই সময় তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কিছু খারাপ হইয়া পড়ে। কিন্তু সদা মুক্তহস্ত, পরলোকগত, বাঙ্গালার 'বিক্রমাদিত্য' মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্যেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সাহিত্যানুরাগী মহারাজ যজ্ঞেশ্বরের সাহিত্য সাধনার কালেও যেমন উত্তর সাধক ছিলেন তেমনই সেই অক্ষম সাহিত্যসেবীর দুর্দ্দিনেও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৩৩২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলা ১০টার সময় যজ্ঞেশ্বর মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য-গগনের একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভিয়া যায়।

আলো-আঁধারি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীকিরণকুমার রায়]

• [পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের চুম্বক :—প্রকাশ মিত্র সহরের নামজাদা ডাক্তার—রূপে গুণে অতুলনীয়, অপূর্ব্ব তাঁহার সুনাম, যাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় বলে, তাই।—যোগজীবন বাবু তাঁহার উকিল বন্ধু। তাঁহাকে দিয়া ডাক্তার এক উইল করাইলেন—প্রকাশ মিত্র মরিলে কি অন্য কোনও প্রকারে তাহার তিরোভাব ঘটিলে, বিজন গুপ্ত বলিয়া এক ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। কে বিজন গুপ্ত, যোগজীবন বাবু জানেন না। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে, হাসিয়া উড়াইয়া দেন। সরল শাদাসিধে যোগজীবন বাবু মহা ফাঁফরে পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু সতীশ বাবুর কাছে তিনি এই বিজন গুপ্তের নামে এক কাহিনী শুনিলেন। সে নাকি একটি আস্ত মেয়েকে পথে মাড়াইয়া গিয়াছে, অনিচ্ছা করিয়া বলিয়া মনে হয় না।—সতীশ বাবু বলিলেন, এমন ভীষণ আকৃতির লোক জীবনে তিনি দেখেন নাই। যোগজীবন বাবু তটস্থ হইয়া উঠিলেন, রাতবেরাতে এপথে ওপথে বিজন গুপ্তের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন দেখা পাইলেন—পাইয়া বন্ধুর শুভাশুভ ভাবিয়া আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—কেননা তাহাকে দেখিলেই ভয় হয়। এমন লোককে ডাক্তার মিত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন কেন? ডাক্তার মিত্রের আবাল্য সুহৃদ যামিনী ডাক্তার,—তাঁহার কাছে গিয়াও কিছু হদিস্ মিলিল না। এমন সময় আর এক ঘটনা ঘটিল, বিজন গুপ্ত এক হত্যাকাণ্ডের আসামী হইয়া ফেরারী হইয়া গেল। যিনি হত হইয়াছিলেন সেই গোয়েন্কা আবার যোগজীবন বাবুর বড় মক্কেল ছিলেন। যোগজীবন বাবু ক্ষেপিয়া ছুটিয়া গেলেন ডাক্তার মিত্রের কাছে—এমন বিজন গুপ্তের নামে তিনি উইল করেন কেন? ডাক্তার মিত্রের ভাব দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। বিজন গুপ্ত যে ডাঃ মিত্রের স্কন্ধ ছাড়িয়াছে এই ভরসা পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। দিব্য দিন কাটে। মধ্যে একদিন ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে গিয়া শোনেন ডাক্তারের শরীর খারাপ, দেখা হইবে না। যামিনী ডাক্তারের কাছে গেলেন, সেখানে গিয়া দেখেন ফুর্ত্তিবাজ যামিনী ডাক্তার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছেন; কি ব্যাপার? ডাক্তার মিত্রের নাম করিতে তিনি কাণে আঙ্গুল দিলেন।—কিছুদিন পরে যামিনী ডাক্তার মারা গেলেন, যোগজীবন বাবুর নামে তাঁহার কাছ হইতে বিপুল এক লেফাফা আসিয়া জুটিল। খুলিয়া দেখেন, লেফাফায় যা লেখা আছে, ডাক্তার মিত্রের জীবনকালে তা পড়া চলিবে না—বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ডাক্তার মিত্রেরও জীবনকাল বুঝি ফুরাইয়া আসিল।—বাহির হন্ না, খান্না, দান্না—ল্যাবরেটরী-ঘরে দিবারাত্রি কাটাইয়া দেন্। এমন সময় গভীর রাত্রে একদিন ডাক্তার মিত্রের কম্পাউণ্ডার আসিয়া যোগজীবন বাবুকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন, ডাক্তার বাবু ঘরে বন্ধ থাকিয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন বলিয়া। গিয়া দোর ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে যোগজীবন বাবুর পিলা চম্‌কাইয়া গেল। দেখিলেন, ডাক্তার মিত্রের পাত্তা নাই, পরিবর্ত্তে ফেরারী আসামী বিজন গুপ্ত কি একটা আরক খাইয়া ঘরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ডাক্তার মিত্রের লেখা একটি বিপুল লেফাফা ঘরে মিলিল। সেটি যোগজীবন বাবু বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া প্রথমে যামিনী ডাক্তারের লেফাফা খুলিয়া পড়িলেন—যাহা পড়িলেন, তাহাতে এই বুঝিলেন যে ডাক্তার প্রকাশ মিত্র ও বিজন গুপ্ত একই ব্যক্তি—কি করিয়া ও কেমন করিয়া, তাহাই নীচে ডাক্তার মিত্রের আত্মকাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। *]

* R. L. S.এর Dr. Jekyll and Mr. Hyde অবলম্বনে যখন 'আলো-আঁধারি' রচনা আরম্ভ করি, তখন একটি জিনিষ লক্ষ্য করি নাই।—সেটি এই যে Stevensonএর styleএর এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অনুবাদে রূপান্তরিত করা অসম্ভব,—আমি তো মাত্র প্লট অবলম্বন করিয়াছি। ঠিক এই কারণে 'আলো-আঁধারি' কিছু দিন পরে বন্ধ করিয়া দিই—কিন্তু বহু বন্ধুর অনুরোধে এবং অন্ততঃ কয়েকজন পাঠকেরও ক্রমাগত তাগিদে ইহার শেষাংশ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি।—আমার সান্ত্বনা এই যে, যাঁহারা মূল Dr. Jekyll and Mr. Hydeএর রূপ ও রস উপভোগ করেন নাই,—তাঁহারা 'আলো-আঁধারি' পড়িয়া লভাবান্ হইবেন।—কি-কু-রা।

ডাঃ মিত্রের আত্মকথা

এ পৃথিবীতে যাহা কিছু কাম্য, আমার ভাগ্য-দেবতা তাহার সমস্তই আমাকে আজন্ম অজস্র সম্ভারে দিয়া আসিয়াছেন—ধন, জন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ। আমি জানি আমার নাম করিবার সময় অনেক লোকই এ কথা বলে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইই এক সহিত মিতালি করিয়া আমার বাসায় ঘর বাঁধিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিলে, এ কথা বোধ করি সত্যই—বোধ করি কেন, তাই, লোকের এসব কথাই সত্য। আমার দোষের মধ্যে ছিল—যদি ইহা দোষই হয়,—মনে মনে আমার একটি অতি মাত্রায় স্ফূর্ত্তিবাজ লোক বাহিরের হাওয়ায় হাত পা নাড়িবার জন্য মাথা নাড়া দিত—অনেক ছোট বয়স হইতেই! ইহাকে বরাবর দেখিয়া রাখিয়াছি। সচরাচর লোকের মধ্যে এ ভাব থাকিলে, তাহারা দিব্য 'মজলিসী' লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি পায়—কিন্তু আমার 'মজলিসী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার আকাঙ্খা তো ছিলই না অধিকন্তু লোকে যাহাকে বলে 'রাশভারী' লোক তাহাই হইবার জন্য আমি আপ্রাণ প্রয়াস করিতাম। কেননা সাধারণকে যে মুখের দিকে উঁচু করিয়া চাহিয়া কথা কহিতে না হয় - সে মুখে কথা কহিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল, আমি আমার ভিতরকার স্ফূর্ত্তিবাজ লোকটিকে ঢাকিয়া রাখিয়া চলা ফেরা করিতাম। সুতরাং জীবনের আঙিনায় পা দিবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যখন নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার সময় হইল তখন অবধি বিচার করিয়া জীবনের পৃষ্ঠা কয়টি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেলাম,—দেখিলাম, আমার জীবনের নিত্যসঙ্গী হিসাবে আমার পকেটে আমি একটি মুখোস্ নিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য অনেক লোকই ইহাতে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি না দেখিয়া অতি সহজে জীবন কাটাইতে পারিত, কিন্তু জীবনে যে লক্ষ্য ঠিক করিয়াছে, আর সে লক্ষ্য এ পৃথিবীর দুই তিন মাইলের মধ্যে নয়—তাহার পক্ষে সামান্য মাত্র স্খলন কি ত্রুটির যে লজ্জা, সে শুধু যে জানে সেই জানে, অপর কেহ জানে না। সুতরাং 'এই ত্রুটি' আর এই স্খলন আমি নিদারুণ লজ্জার সহিত বহন করিয়া ফিরিতাম। এ সকল ত্রুটি আর বিচ্যুতি মোটের উপর একেবারেই নগণ্য, কিন্তু যে সপ্তকে আমি নিজের উচ্চাশাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, সে সুরে ইহারা বেসুরা ঠেকিত—ফলে আমার মধ্যে পাশাপাশি পরিখা কাটিয়া ভাল মন্দ দুইই যে থাকিল তাহাই শুধু নয়, এমন সকলেরই থাকে—আমার মধ্যে থাকিল একটু বাড়াবাড়ি রকমে আমাকে সচেতন করিয়া।

এই ব্যাপারে আমি আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার দুশ্চর তপস্যার নিয়মকানুন নিয়া এক আধটু ভাবিয়াছিলাম। এই সব বাঁধা নিগড় মূলে থাকিয়াই যে দুই হাতে দুর্ব্বল মানুষকে অন্ধকার পথে ঠেলিয়া ফেলে, এবিষয়ে আজ আমার দুই মত নাই। তখনই বুঝিয়াছিলাম যে আমার পকেটে যে মুখোস থাকিত সেটি মুখে না পরা পর্য্যন্ত আমি যে সেই এবং পরিলে আমি আর আমি নই, সম্পূর্ণ অপর একটি লোক। সুতরাং ভণ্ড বলিতে যাহা বোঝা যায়, আমি তাহা নই। একই সঙ্গে আমার মধ্যে সেই দুটি ব্যক্তি ছিল বটে, কিন্তু এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সহিত অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মিশ্ কোনও রকমে ছিল না। রাত্রের অন্ধকারে আমি যখন সংযমের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফুঁড়িয়া কলঙ্কের অগাধ জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম তখন আমি যাহা তাহাই, আবার দিনের বেলায় এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আমি যে জ্ঞান চর্চ্চা করিতাম, তখন আমি স্বতন্ত্র—দুইই আছে এবং পুরা মাত্রায় আছে, এ যখন আছে তখন এ-ই আছে, ও যখন আছে তখন ও-ই আছে, মাঝখানে ভণ্ডামীর কোনও আশ্রয় নাই। ঘটনা হইল এই যে, আমার বিজ্ঞান চর্চ্চার যে দিকটা সূক্ষ্ম ও বায়বীয়, অলৌকিক ও অপার্থিবকে নিয়া নাড়াচাড়া করিত, তাহা হইতে মাঝে মাঝে এক একটি প্রখর কিরণরশ্মি আমার মধ্যকার সতত যুধ্যমান দুইটি লোককে একটি নূতন আলোকে দেখিতে সাহায্য করিত। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত এবং আমার বুদ্ধির দুইটি বিভিন্ন মুখ, নৈতিক ও ব্যবহারিক, একটি মাত্র তথ্যের নাড়া চাড়া করিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিত—তথ্যটি এই যে একটি মানুষ এক নয়, একটি মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুই। দুই বলিতেছি এই জন্য যে জ্ঞানের যে স্তরে দাঁড়াইয়া আজ আমি কথা কহিতেছি, সেখানে দাঁড়াইয়া দুইজনের বেশী আজ আমার নজরে পড়ে না। কিন্তু একথা আমি নিশ্চয়

করিয়া জানি যে ভবিষ্যতে এমন লোক আসিবে যাহারা আমাকে এবিষয়ে ছাড়াইয়া যাইবে এবং তাহাদের সেই অজ্ঞাত গবেষণার রকম আন্দাজ করিয়া আজ আমি বলিতে পারি যে এই একটি মাত্র মানুষকে ভবিষ্যৎ যুগে লোকে একপাট মানুষ বলিয়া জানিবে—সকলে মিলিয়া অবিরাম ইহার মধ্যে বিবিধ ও বিচিত্র চাহিদার সৃষ্টি করিতেছে। আমার নিজের জীবনের দিক দিয়া দেখিয়া আমি ইহার মাত্র একটা দিকই দেখিয়াছি—নৈতিক ভাগাভাগির দিকটা। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে আমার চেতনায় যে দুটি বিপরিতধর্মী মানুষ ক্রমাগত লড়াই করিত, তাহাদের দুটিতে মিলিয়াই সম্পূর্ণ আমি, যদিও ইহার যে কোনও একটিকেই হয়তো আমার আমি সেই সময়টুকুর জন্য পূরা নির্ভর করিত।

বহুদিন হইতে আমার এই দুটি আমিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার স্বপ্নে আমি বিভোর থাকিতাম—তখন কিন্তু আমার ল্যাবরেটরীর বিদ্যা এমন কিছুই ফল প্রসব করে নাই যাহাতে আমি ঘুণাক্ষরেও ধারণা করিতে পারি যে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে পারে। আমি কেবলই ভাবিতাম যে এই দুটিকে যদি কোনও রকমে পৃথক করা যায়,—দুটিকে দুটি স্বতন্ত্র অবয়ব দেওয়া যায়—তবে হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আমার মধ্যকার এই বিরাম-হীন দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে, আমার জীবন এই অসহ্য বোঝার ভার হইতে মুক্তি পাইতে পারে; তখন আমার অন্যায়কারী আমি তাহার যমজ সহোদরের উচ্চাশা ও অনুতাপের বিড়ম্বনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, আর আমার ন্যায়নিষ্ঠ আমি এই দুষ্কৃতকারীর ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিয়া জীবনের ঋজু পথে মাথা উঁচু করিয়া তাহার লক্ষ্য না ভুলিয়া সোজা চলিতে পারে তাহার কর্ত্তব্য সে আনন্দে সমাধান করিতে পারে। ভাবিতাম, মানব জীবনের ইহা চরম দুর্ভাগ্য যে এই বিভিন্ন অসম ও বিবিধ প্রকারান্তরকে এমন করিয়া একই মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে ঠাসিয়া গাদিয়া রাখা হইয়াছে।—এই দুর্ভাগ্য হইতে মানুষকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় কি না?

আমার চিন্তার এই স্তরে হঠাৎ ল্যাবরেটরীর চেম্বারে বসিয়া একদিন আমার মাথায় অভিনব একটি তথ্য বিদ্যুৎ-শিখার মত খেলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে আমি বুঝিলাম যে মানুষের এই দেহাবয়বের অপরিবর্ত্তনীয় কাঠিন্যকে ভেদ করিয়া মনোজগতের কুহেলি প্রতিক্ষণ বাহিরে যে শুধুই উঁকি মারিতেছে, তাহা নয়—সেই কুহেলিই আবার দেহকে রূপান্তরিত করিবার শক্তিও ধারণ করে। প্রবল ঝটিকা যেমন আমাদের পরিধেয়ের রূপ, রঙ, সমস্ত বদলাইয়া দিতে পারে, তেমনই মানব-মনের এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যে বৃত্তিকে নাড়িয়া চাড়িয়া মানব দেহের বহিরাবরণকেও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়।—ঠিক এমনই করিয়া যে সেদিন আমার মনে এই কথা জাগিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের প্রভাবে সেদিনকার চিন্তা আজ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমার মনে হইতেছে—এমন কথারই সেদিন আমার মনে আভাস আসিয়াছিল।

এই চিন্তার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক যে তথ্যানুসন্ধান আমাকে বহুদিন ব্যস্ত করিয়াছিল, দুইটি কারণে আজ আমি আর সে কথার আলোচনা করিতে চাহিনা। প্রথম কারণ হইতেছে এই যে মনুষ্য-জীবনের অভিশাপ আমাদের স্কন্ধে এমন কঠিন ভাবেই বির জমান যে তাহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা আবার ফিরিয়া দ্বিগুণ করিয়া সেই অভিশাপের নির্ম্মম শাসনেই আমাদিগকে ঠেলিয়া ফেলে। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে—আমার এই আত্ম-কথা পড়িয়াই সে কথা সকলে বুঝিবে—আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা অসম্পূর্ণ ছিল, এ সংশয়কে তো আজ আমি হাজার চেষ্টা করিয়াও মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি তখন এই চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই যে আমারই মনোবৃত্তি দিয়া আমি আমার দেহকে রূপান্তরিত করিতে পারি,—সেই চিন্তারই ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক কারিকরীতে আমি এমন একটি যৌগিক রসায়ন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, যাহা আমার নিম্ন-বৃত্তিকে আমার উচ্চবৃত্তির শাসন হইতে মুক্তি দিয়া আমাকে আমার হইতে বিভিন্ন করিত। আমার স্বভাবে যে দুটি আমি প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব করিত, সেই দুটিকেই স্বতন্ত্র বাসাগার দিয়া সে দ্বন্দ্বের অবসান সেদিন আমি করিয়াছিলাম—অন্ততঃ করিতে পারিয়াছি বলিয়া ভাবিতাম আজ আর তাহা ভাবি না।

বহুদিন ইতস্ততঃ করিয়া তবে আমি আমার ল্যাবরেটরীর গবেষণাকে কাজে লাগাইয়াছিলাম। কাজে লাগাইবার পূর্ব্বে একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে হয়তো ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে। কেননা যে রাসায়নিকের প্রভাব এতখানি, যাহা মনুষ্য-দেহকে এমন প্রচণ্ড রূপে নাড়া দেয় যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত নিমিষে বিপর্য্যস্ত ও বিকৃত করিয়া তুলে,—সে রাসায়নিকের অতি সামান্য মাত্র অপ-প্রয়োগেই যে সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আর একটি নিমিষে নিথর নিশ্চল করিয়া দিতে পারে—একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দশ পা ইতস্ততঃ করিয়া পিছাইয়া আসিতাম—কিন্তু আমার আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা আমাকে ক্রমাগতই অঙ্কুশ মারিয়া আমাকে সেই দশ পা'র পরই আবার এগারো পা অগ্রসর করিয়া দিত এবং সেই সম্ভাবনার মোহে পড়িয়া যে দিন আমি সমস্ত আশঙ্কাকে জয় করিয়াছিলাম, সেদিনটা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আকাশে সেদিন কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ, চরাচর সেদিন গভীর নিদ্রামগ্ন, থাকিয়া থাকিয়া কেবল আমার গেটের পাশের বড় পামগাছটি আচম্‌কা দুলিয়া উঠিতেছিল—সে কি কোনও শুভাকাংখী প্রেতাত্মার নিষেধ-বাণী? যদি সে নিষেধ আমি সেদিন পালন করিতাম,—আঃ!

হাঁ, কি বলিতেছিলাম? বহু পূর্ব্ব হইতেই আমার রাসায়নিক প্রস্তুত করিবার সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ছিল। একটি একটি করিয়া আমি তাহাদিগকে মিশ্রিত করিলাম, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া প্রত্যেকটি উপকরণ অপর উপ-করণের কাছে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া আত্ম সমর্পণ করিল,—দেখিলাম—এবং যে মুহূর্ত্তে শেষ আর্ত্তনাদ নিস্পন্দ হইল সেই মুহূর্ত্তে আমি অপূর্ব্ব সাহসের সহিত—সে যে কি প্রচণ্ড ও দুর্ব্বার সাহস, তাহা যে উপলব্ধি করে নাই, তাহাকে কি করিয়া বোঝাইব?—সেই রাসায়নিক কণ্ঠনালীতে ঢালিয়া দিলাম—

—কী সে যন্ত্রণা! মনে হইল আমার সমস্ত অস্থিগুলি ভাঙিয়া চুরমার হইতেছে,—প্রবল বমনোদ্রেকে মনে হইল, আমার আত্মা বুঝি আমার কণ্ঠনালী ভেদ করিয়া বাহির হইতে চায়, রক্তে মাংসে মজ্জায় ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গের আলোড়ন অনুভব করিলাম—আর সে কি বিভীষিকা,—সে কি মৃত্যুর না জন্মের?—জানিনা।—ধীরে ধীরে সে যন্ত্রণা কমিয়া আসিল—বহু দিনের ব্যাধি হইতে যেন আরোগ্য লাভ করিতেছি এমন মনে হইল।

যন্ত্রণা লাঘবের সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব্ব পুলকাবেশে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, একথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। একটি অভিনব অনুভূতিতে আমার সর্ব্বদেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইল, বয়স আমার কমিয়াছে, আমার দেহে যেন আর কোনও ভার বোধ করিতেছি না; ভিতরে ভিতরে একটি উদ্দাম উশৃংখলতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল, ইহা বেশ অনুভব করিলাম। আমার মানস চক্ষের সম্মুখে এ পৃথিবীর যাহা কিছু ভোগ বিলাসের সামগ্রী সমস্ত একটির পর একটি ভাসিয়া উঠিল। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও দায়িত্ব-বোধের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত, একেবারে অজ্ঞাত একটি স্বাধীনতার প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম। আর উপলব্ধি করিলাম যে আমার এই নূতন আমি স্বেচ্ছা-চারী, স্বার্থপর, দাম্ভিক, দুর্দ্দান্ত—সে বোধ সেদিন আমাকে সুরার প্রথম স্বাদ প্রাপ্তির অপরিমেয় উল্লাস দিয়াছিল, সে উল্লাস আমাকে দিগ্বিদিকে উন্মাদ নর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে বলিয়াছিল—আমি আমার দুই হাত বাড়াইয়া সে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলাম—এবং এই হাত বাড়াইবার সময় আমি বুঝিয়াছিলাম যে আকারে আমি খর্ব্ব হইয়া গিয়াছি।

তখন আমার ল্যাবরেটরী ঘরে আয়না ছিল না। এখন যেটি আমার পার্শ্বে রহিয়াছে, সেটিকে এই নব কলেবর গ্রহণ হেতুই পরে আনাইয়াছিলাম—এই আয়নাতে আমার এই অদ্ভুত রূপান্তরের প্রতিবিম্ব আমি কত রাত্রিতেই না দেখিয়াছি।—

(ক্রমশঃ)
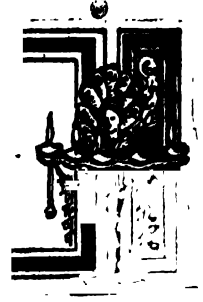
সমসাময়িক সাহিত্য

সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও কিছু বলার আগে এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে নিত্য নব নব সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে আলোচনা করবার যে চাহিদা জাগে তা সাময়িক নয়:—তা'র সম্বন্ধে উপলব্ধিও যেমন নিত্যকার সামগ্রী তা'র আলোচনার ফলটাও কোনও বিশিষ্ট সময়কে আশ্রয় করে ফল্‌তে পারে না। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে তা' মানব-মনের চিরন্তন বস্তু বলেই - সাময়িক সাহিত্যের অনুশীলন থেকে তা' একেবারেই তফাৎ।—কিন্তু এ কথাটা ভুললে চল্‌বে না যে সমসাময়িকের স্থান শুধু যে সাহিত্যের আসরে আছে তাই নয় বেশ উঁচু জায়গাতেই আছে—এবং সাময়িক পারিপার্শ্বিকতার আব-হাওয়ায় সে সাহিত্য গড়ে ওঠে বলেই তা'তে জাতি বিশেষের তৎকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাসটাও আপনার ছাপ রেখে যায়। তা'র আসল ফলটা এই হয় যে, কোনও বলিষ্ঠ জাতির উত্থান ও পতনের ঘটনা পারম্পর্য্য জনসমাজের শিক্ষার অনেক খানি উপকরণ জুগিয়ে দেয়।

আর একটা কথা সমসাময়িক সাহিত্য বল্‌তে শুধু যুগ লক্ষণকেই আমরা একান্ত ক'রে দেখ্‌লে সাহিত্যের ঠিক বিচার করা হবে না। কেননা—সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকায় সাহিত্যের উঁচুদরের সৃষ্টির কাজও যেমন চলে, সমসাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় করে তেমনি যুগসাহিত্যও পুষ্ট হ'তে থাকে। কাজেই সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা বল্‌তে আমরা যেন শুধু যুগসাহিত্যের আলোচনাই না বুঝি!

—॰—

সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্রে যে সব সাহিত্যরথী—আপনাদের স্বকীয়তায় নিত্য নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেন তাঁ'দের সংখ্যা কম বলেই—সাহিত্য-সমালোচনা দূরের কথা সাহিত্য সম্পর্কে অল্পাধিক আলোচনাও আজ কঠিন হয়ে পড়েছে।—কেন না অভ্যস্ত পথে যাঁরা আজ কলমের রেখা বুলিয়ে চলেছেন—তাঁদের নিজস্ব কিছু দান করবার নেই বলেই—পঠিত বিদ্যা, তা সে দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক এবং পুঁথিগত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান নিয়ে তাঁরা পুনরা-বৃত্তি আরম্ভ করেছেন—। নিজেদের একটা লিখন-ভঙ্গী আছে, ভাব-প্রকাশের একটা সরস পদ্ধতি আয়ত্ত হয়ে গেছে—পরিচিত চরিত্র সৃষ্টির প্রতি আমাদের কারণে অকারণে পূর্ব্ব হ'তেই সহানুভূতি বা অনুকম্পা রয়েছে, সবার উপর যে অনুভূতির বিকাশ আমরা আজ কাব্যে, উপন্যাসে ও ছোট গল্প প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ করছি তা'র সঙ্গে হয় তো আমাদের সংস্কারগত একটা ঐক্য আছে, তাই চিরপরিচিত পথে চলতেও আনন্দ পাই,—বিস্ময় বোধ না করলেও, একান্ত অপ্রসন্নতা বোধ করবারও কারণ থাকে না।—কিন্তু যে আকাঙ্খায়, যে প্রত্যাশায় মন উন্মুখ হয়ে থাকে, তা'র পরিপূর্ণতা এ সাহিত্য-রসে আস্‌তে পারে না, আসেও না—কাজেই আমরা বেশী দিন এই তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ঔপন্যাসিক বা গল্প-লেখককে আসর জমাতে দেখ্‌লে অস্বস্তি বোধ করি। যা'র যা' দিবার ক্ষমতা আছে তার অধিক আমরা চাই না—দিলেও দাতার দুর্ব্বলতা তাতে এমনি নির্ম্মম ভাবে প্রকাশ পায় যে তা'তে সৎসাহিত্যের মর্য্যাদা ত রক্ষা হয়ই না বরং একদিন যেটুকু সম্মান শুধু অনুশীলনের গুণে লাভ হয়েছিল তাও লোপ পাবার উপক্রম হয়। সত্যকার সাহিত্য-স্রষ্টারও যে দান করবার ক্ষমতা অপরিমিত হলেও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ কথা মনে

রাখলে সাহিত্যের অক্ষুণ্ন যশোলাভ না হোক অন্ততঃ অকারণ বিড়ম্বনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যের আসল বস্তুই হ'ল 'রস'—সে রসকে ঘনিয়ে তুলে মধুর হতে মধুরতর করে যিনি পরিবেশন করতে পারবেন—তিনিই সত্যকার 'রসিক'—। রসকে যিনি সাহিত্যের পরিণতি ও পরিপূর্ণতার অপরিহার্য্য উপাদান বলে জেনেছেন—নিজের সাহিত্য সাধনার ক্রমপর্য্যায়ে যিনি রস-চর্চ্চাকে স্বকীয়তার গুণে আনন্দ দানের পক্ষে একান্ত অনুকূল করে নিতে পেরেছেন—তিনিই প্রকৃত আনন্দ বিধান করবার অধিকারী—নতুবা শুধু মাত্র অনুশীলনের গুণে সৃষ্টি করবার দুঃসাহস যাঁর আছে প্রতিপদে রসাভাস দ্বারা মার্জ্জিত রুচিকে আঘাত করবার আশঙ্কাও তাঁর কাছ থেকে পুরামাত্রায় রয়েছে।

মূলে যে বস্তুর অভাব, অনুশীলনেও তা'র উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়।—নব নব উন্মেষশালিনী বৃত্তির পরাকাষ্ঠা লাভ সাধনার দ্বারা সম্ভব হ'লেও আনন্দ সৃষ্টির শক্তি মানুষের জন্মগত—একেবারেই তা' সাধনসাপেক্ষ হ'তে পারে না।

প্রতিভা হচ্ছে সেই প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অকৃত্রিম বন্ধু;—বুদ্ধি সে পথের পাথেয় হলেও তা'র উপর নির্ভর করে সাহিত্য-প্রগতির সার্থকতা লাভ হ'তে পারে না।

—*—

সমসাময়িক সাহিত্য হিসাবে যে সব পত্রিকার নাম ছিল—যোগ্যতাও ছিল—সেগুলি একে একে লুপ্ত হয়ে গেল। কালি কলম, প্রগতি, কল্লোল প্রভৃতি যে আদর্শ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে নেমেছিলেন—তা'র সঙ্গে সকলের মত মিলবে এমন কোনও কথা নাই—মিলেওনি। কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁ'দের মতানৈক্য ঘটেছে,—যে সব বিষয় বস্তুকে উপলক্ষ্য করে তাঁরা সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্পে আপনাদের বল্‌বার কথা পাঠক সমাজকে শুনিয়ে গিয়েছেন তা'র মধ্যে উঁচু দরের তত্ত্বকথা থাকবে এমন আশা আমরা করিনি, কিন্তু রুচি ও আদর্শের তারতম্যে মানুষের প্রবৃত্তির দিকটাকে বড় করে দেখাবার মধ্যে সাহিত্যে নূতনত্ব সৃষ্টির চেষ্টাকে আমরা চিরদিন নিন্দা করে এসেছি কিন্তু প্রগতি প্রমুখ এই শ্রেণীর কাগজ যাঁরা চালাতেন তাঁদের এবং তাঁদের লেখকগণের শক্তি সম্বন্ধে আমরা কোনও দিনই সন্দেহ প্রকাশ করি নি।

সত্য, শিব ও সুন্দরের মন্দিরে কুলুপ লাগিয়ে যাঁরা সাহিত্য নিয়ে হাট বসাতে চেয়েছেন তাঁদের সেই নিদারুণ লজ্জাকর আচরণের জন্য আমরাও লজ্জিত হয়েছি। হাওয়া ফিরে আসছিল বোধ হয়—কিন্তু একে একে এই কাগজগুলি বন্ধ হয়ে গেল।—কারণ আমাদের যা মনে হয়েছে তা ছাড়াও হয়ত অন্য বিশেষ কারণ আছে—কিন্তু—প্রকাশ্য ভাবে আমরা দেখ্‌ছি কাগজ ক'খানি চল্‌ল না।—এতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত কেননা—একথা আমরা অকপটে বল্‌তে পারি—যাঁরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতনত্ব সৃষ্টি করতে এসেছিলেন—সাহিত্যের প্রতি তাঁদের দরদ ছিল। যে চেষ্টা তাঁরা করে গেছেন তা তাঁদের অভিপ্রায় অনুরূপ সফল না হলেও তা'র ফল যে কম হয়নি একথা অস্বীকার করা চলে না।

নূতনের একটা বিশিষ্ট আদর্শ, একটা গতিবেগ, একটা দুর্নিবার শক্তি থাকে—তাতে করে' সমস্ত প্রচলিত সংস্কারের মূল শিথিল হয়ে আসে। মনে মনে সে আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারলেও আমার অজ্ঞাতে যে সন্দেহের বীজটি মনের মধ্যে উপ্ত হয় তা'র পত্র পল্লব ফুল ফল ফল্‌তে অনেক দিন লাগলেও—প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে নূতনত্বের সে অভিযানকে স্বীকার না করে পারা যায় না। কিন্তু গোড়া শক্ত ছিল না বলেই—যে ছাপ এই সহযোগী-সাহিত্য পাঠক সমাজের মনে রেখে গেছে—তা'র ক্রিয়া হবে অতি ধীরে, কিন্তু কাগজগুলির সঙ্গে যে তা'র প্রভাবও চলে গেছে একথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তবু বল্‌তে হয়—"So much wit, so much cleverness, so much acute senses, all wasted and wasting in a sort of shameful onanism." (*Romain Rolland*)

সাহিত্যের বাজারে আর্টের নামে মনুষ্যত্বের চরম দুর্গতি দেখেছি, মানুষকে তার নীচ প্রবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে আমাদের তথাকথিত তরুণ সাহিত্য যে সামাজিক জীবনের কি সর্ব্বনাশ করেছে—তা' মনের সঙ্গে নিভৃতালাপ করলেই বুঝা যায়।

যাঁদের সত্যিই দিবার কিছু ছিল তাঁরা সাহিত্যকে লঘু ও মুখরোচক করতে গিয়ে, যৌন সম্পর্কে নিজেদের সাহসিকতা দেখিয়ে সহজে ও সুলভে নাম কেন্‌বার প্রলোভনে পড়ে' গত কয় বৎসর যে সাহিত্য গোষ্ঠি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন—তা' গড়ে' উঠল না—যে যার মত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে এখন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। ফল তা'তে ভালই হ'য়েছে। এঁবার তাঁদের ভিতরের শক্তি—একান্তে আপনাকে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ পাবে। দলের প্রশংসা ও তরুণ পাঠকের জয়ধ্বনি আর তাঁদের বিবেক-বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারবে না—এটুকু আমাদের পক্ষে সান্ত্বনার কথা।

কিন্তু তাই বলে গোষ্ঠিবদ্ধ না হ'লে, সাহিত্য-সংঘ গড়ে তুল্‌তে না পারলে—সাময়িক ও অসাময়িক কোনও সাহিত্যের চিরস্থায়ী শক্তির উদ্বোধন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সাহিত্যের যে সংঘ বা দল পাঠক সমাজকে উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে না—অধঃপতন ও সামাজিক দুর্নীতির পথে অগ্রসর করে দেয়—সে সাহিত্য-সংঘের বা দলের কোনও সার্থকতা নাই। একান্ত সাধনাতেই হোক আর গোষ্ঠি জীবনের প্রভাবেই হোক মনুষ্যত্বের কাছে সাহিত্য-জীবনের বলিদান কখনই প্রশংসনীয় নয়।

'শনিবারের চিঠি'র পাল্টা জবাবে 'রবিবারের লাঠি' বের হ'বে—এমনি একটা কথা কৌতুক করে আমরা একদিন উপাসনায় লিখেছিলাম। আমাদের সে মন্তব্যটি দেখ্‌ছি কাজে লেগেছে—কয়েক মাস ধরে 'রবিবারের লাঠি' প্রকাশিত হচ্ছে।—কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র ব্যর্থ অনুকরণ করে কোনও কাগজ চল্‌তে পারে না একথা বোধ হয় লাঠিয়ালরা ভুলে গেছেন। লেখার মুন্সিয়ানা, ব্যঙ্গ করবার বিশিষ্ট শক্তি, বিষয়-বিন্যাসের পারিপাট্য - সাময়িক ঘটনা বা সদ্য প্রকাশিত সাহিত্যের উপর শ্যেন-দৃষ্টি এসব না থাক্‌লে শনিবারের চিঠির মত কাগজ চল্‌তে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপর তীব্র মন্তব্য, অকারণ শ্লেষ উক্তি বা অযাচিত গ্লানি বর্ষণে 'শনিবারের চিঠি'র মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে থাক্‌লেও—তার নিজের শক্তিতে অতি দুর্গম পথই সে অতিক্রম করে এসেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা যেমন সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য্য নীতি তেমনি তীব্র ব্যঙ্গ উক্তির মধ্যেও লেখকের প্রতি সহানুভূতি রাখা একান্ত প্রয়োজন। সমালোচনার ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি' কোনও কোনও সময় একথা ভুলে যাওয়াতে অনেকের মনে আঘাত করে অপ্রিয় হয়েছেন। আলোচ্য বিষয় ছেড়ে, লেখক-ব্যক্তির উপর বেশী মাত্রায় নজর দিতে গিয়ে সাহিত্যের চাইতে ব্যক্তি-বিশেষের আলোচনাই আমাদের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।—কিন্তু যে শক্তি আছে বলেই 'শনিবারের চিঠি' শনিবারের চিঠি—সে শক্তির সম্যক নিদর্শন ত' 'রবিবারের লাঠি'তে পাওয়া গেল না। অবশ্য তাস খেলায় হেরে গিয়ে—পাঞ্জা ক'সে জব্দ করার মত যদি সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে লাঠিয়ালরা লাঠি নিয়ে তাল ঠুক্‌তে থাকেন তা হ'লে আমরা কুচ্‌কাওয়াজের আগেই হার মেনে নিচ্ছি।

দ্বীপান্তরের 'বারীনদা' না বলে' যদি কেও আজ পণ্ডিচারীর বারীনদা বলে' পরিচয় দিতে যায়—তা হলে বারীনদাও যে বিশেষ আপ্যায়িত হ'বেন এমন মনে হয় না। যাই হোক সম্পাদকের যে পরিচয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকার বিক্রী-বাজারে চাহিদা বাড়ে—সে পরিচয়—বারীনদার বাঙ্গালী পাঠক সমাজে আছে।—কিন্তু দু'সংখ্যা বিজলী পড়েও তাঁর পুনরায় 'বিজলী' বের করবার হেতুটা ঠিক বোঝা গেল না। একটা বিষয় লক্ষ্য করে' স্বস্তি বোধ করা গেল ;—বারীনদা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে মত বদ্‌লেছেন—মহাত্মা গান্ধীও এবার আশ্বস্ত হোন—'বস্তাবন্দী' হয়ে চালান হ'বার ভয় আর তাঁর থাক্‌ল না।—"দ্বীপান্তরের বাঁশী"র সুরটাত উঁচুই ছিল—কিন্তু নব-প্রকাশিত 'বিজলী'র সুর শুনে ঘর ছাড়ার কোনও তাগিদই ত মনে জাগ্‌ছে না—। একটা কথা—'উনপঞ্চাশী'র নামটা classic হয়ে গেছে —ঐ শিরোনামায় অপদার্থ লেখা ছাপিয়ে—বারীনদা যেন সতীর্থের অমর্য্যাদা না করেন।
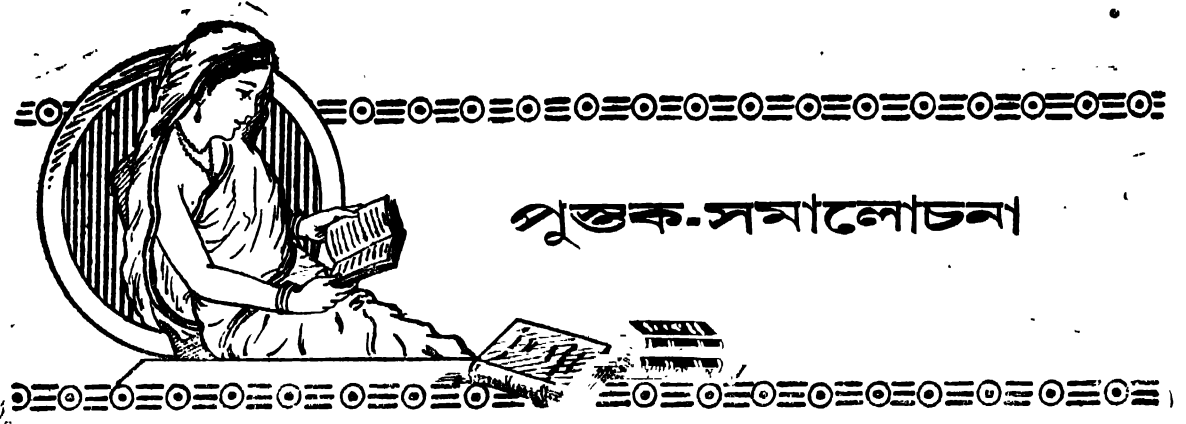
ছন্দের টুং টাং—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগ্‌চী এণ্ড সন্সের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

বাংলার শিশু-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর স্থান আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

তবুও এই বইখানি পড়ে' সুনির্ম্মল বাবুর কাব্য-সাহিত্যের আর একটি দিক্ চোখে পড়্‌লো। সুনির্ম্মল বাবুর ছন্দের হাত চমৎকার। বইখানিতে তিনি কাব্য-প্রিয় শিশু-মনকে বিভিন্ন ছন্দের আকর্ষণে মোহিত করে যাতে ছন্দের জ্ঞানে তার উৎকর্ষ লাভ হয় তার উপায় করে দিয়েছেন। ভাবী-দিনের যারা কবি, কাব্যের এই অপরিহার্য্য বহিরঙ্গ যে তাদের কতখানি সাহায্য ক'রবে, তা' যারা বইখানি পড়বেন, অনায়াসেই তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। অথচ কোথাও কোনো জিনিষ শিক্ষা দেবার চেষ্টা এতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, ছেলেরা নিজেদের আনন্দে এই ছন্দের সুর গুঞ্জন করতে করতে অজ্ঞাতসারে ছন্দের কুশলতাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করে নিতে পার্‌বে। সুনির্ম্মল বাবুর হাতে শিশু-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট দিকটা বেশ সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, নতুন নতুন ছন্দ-মঞ্জরীকে রূপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহজ, সরল, মনোরম ছবিগুলিকে তিনি নিপুণ শিল্পীর মতোই রূপায়িত করে তুলেছেন। যে ছন্দের ঠিক যে ছবি মানায়, ঠিক সেই ছন্দে তাকে ধরেছেন বলে আবৃত্তি করবার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের গুঞ্জন একদিকে যেমন চলছে, ছবিগুলিও তেমনি অন্য দিকে মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে।

—রৌদ্র-দগ্ধ চৈত্রের তৃণহীন ধূসর রিক্ত প্রান্তর ভূমি; একটি গাছে ঘুঘুর অবিশ্রাম করুণ ক্রন্দন ধ্বনি!

ঘুঘু—ঘু	শুধু—যে
ঘুঘু—ঘু	ধুধু—রে
সারা—ভূ	উষ্ণ—হু
	ঘুঘু—ঘু

ঠিক ঘুঘুর শব্দটিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে তিনি একটি ধূলি-ধূসরিত শস্যহীন মাঠকে শিশুর কল্পনায় জাগ্রত করে' তুলেছেন।

ডুলিতে চড়ে একটি মেয়ে তার একদিনকার জন্মভূমি, বাপ-মায়ের স্নেহ-কোল এবং ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে যে খেলাঘর, তাকে পেছনে ফেলে কোন্ দূরে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। পাল্কী চলার শব্দে তার করুণ কান্নার কাঁপনে ছলছল মুখচ্ছবি শিশু-মনে বেদনা ও সান্ত্বনাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছে।

দুলি দুলি	কেঁদে বুঝি	দুটি আঁখি
চলে ডুলি।	মাথা গুঁজি।	থাকি থাকি।
চলে মেয়ে	বাড়ী ছেড়ে	
আঁখি বেয়ে	চলেছে রে	
ঝরে ধারা	স্বামী ঘরে	
আহা সারা	—আহা ঝরে	

ইংরাজী পরিচিত কবিতার হুবহু বাংলা রূপান্তর—

Twinkle, twinkle, little star

চঞ্চল, চঞ্চল, তারার সার।

বইখানি আগাগোড়াই এই রকম ছন্দ-মাধুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে সুকুমার শিশুর কবি-মনকে কয়েকটি ছোট ছোট দৈনন্দিন অখণ্ড এবং অপরূপ আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত করে তুল্‌বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বইখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

—ভাবাশ্রয়ী

বীমাব্যবসায়ে ধনবিনিয়োগ

[শ্রীপ্রাণবন্ধু মুখোপাধ্যায়]

জীবন বীমা বিজ্ঞানে 'ইন্‌ভেষ্টমেণ্টস্' (Investments) ধনবিনিয়োগ অর্থাৎ টাকা খাটানো কথাটি খুব বড় কথা। মোটের উপর দেখিতে গেলে, বীমা-কোম্পানীর কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে অনেকটা এই টাকা খাটানোর উপর।—বীমা-কোম্পানী যখন প্রিমিয়াম নেয়, তখন তাহাদের গড়পর্ত্তা একটি হিসাব থাকে যে প্রিমিয়ামের টাকা খাটাইয়া এত সুদ পাওয়া যাইতে পারে। সেই বীমা-কোম্পানীরই বাহাদুরী, যে নাকি তাহাদের মোটামুটি হিসাবে ধরা সুদ অপেক্ষা বেশী সুদে টাকা খাটাইতে পারে—খাটাইয়া নিজেদের লভ্যাংশের হার বাড়াইতে পারে।—সুতরাং প্রিমিয়ামের টাকা কোথায় কেমন ভাবে খাটানো যায়, এ নিয়া আলোচনা হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে বীমা-কোম্পানী চিরাচরিত প্রথা হিসাবে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে—প্রধান ও প্রথম হইতেছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে টাকা লাগানো। এই নিরাপদ ভাবে টাকা খাটাইতে হইলে, কোথায় কিরূপে খাটাইতে হইবে, সে বিষয়ে ইংরাজী যে কোনও বীমা সম্পর্কীয় পুস্তক উল্‌টাইলে—বহুতর সদুপদেশ পাওয়া যাইবে।

কিন্তু এসব সদুপদেশ লিখিত হইয়াছে বিভিন্ন আব্‌-হাওয়ায়,—আমেরিকা, ইংলাণ্ড কি জার্ম্মানীর অবস্থানুযায়ী। তাই সে সব সদুপদেশ সমূহ বিনা আপত্তিতে আমাদের পক্ষে গলাধঃকরণ করা ঠিক সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না।—আমাদের দেশস্থ বীমা-কোম্পানীকে আমাদের দেশের ভালমন্দ বিচার করিয়াই টাকা খাটানোর পদ্ধতি বাহির করিতে হইবে। সে পদ্ধতি কি?

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে সর্ব্বোত্তম পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে, 'গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি'—এমন কি আমাদের দেশে অনেকানেক কোম্পানী নিজেদের গায়ে পাঞ্জাবীর নামাবলী কি চন্দন-তিলকের মতই নিজেদের অবিমিশ্র সাধুতার পরিচয় দিবার জন্য নিজেদের নামে 'গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি' কথাটি অতি বৃহৎ অক্ষরে আঁটিয়া দেয়— তাঁহাদের দোষ নাই! দোষ আমাদের হতভাগ্যের, কেননা এদেশে সরকারী তহ্‌বিলের অন্দরে যে-টাকা না যায়, সে-টাকার অধিকাংশই পড়ে চোর জোচ্চরের হাতে, এমনই একটি ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।—অন্য দেশে কিন্তু ঠিক এরূপ নয়, অবশ্য যে দেশের কথা বলিতেছি, সে দেশে সরকার ও জনসাধারণ স্বতন্ত্র নয়। সে দেশের বীমা-কোম্পানীগুলির ইতিবৃত্তে এই কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, "Through their enormous investments, life insurance companies to-day exert a powerful influence on the upbuilding of the nation's industrial life."—জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্রম-গঠনে বীমা-কোম্পানীরা—তাহাদের বিপুল অর্থ ঢালিয়াছে, তাই সেখানে তাহাদের বিপুল প্রভাব।

অবশ্য ইহার পরই সস্তা দেশপ্রেমের বুলি কপ্‌চাইয়া অনেক কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু এখানে তাহা না বলিলেও চলে।—বলিতেছিলাম বীমা-বিজ্ঞানের কথা। বীমা-বিজ্ঞানে টাকা খাটানো সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান উপদেশ কি তাহা বলিয়াছি। দ্বিতীয় উপদেশ হইতেছে, শুধু নিরাপদ স্থানে টাকা খাটাইলেই হইবে না, দেখিতে হইবে, "so to make their investments as to yield the largest return consistent with absolute safety"—অর্থাৎ যে টাকা খাটানো হইতেছে, তাহা হইতে যথাসম্ভব অধিক লাভও আদায় হইতেছে।

কিন্তু এ উপদেশ অনুযায়ী কোম্পানীর কাগজের মূল্য কতটুকু? বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের বাজার দর অত্যন্ত কম, সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম,—ইহাতে সুদ আদায় হয় শতকরা মাত্র ৩॥০ টাকা হারে এবং এই রকম ১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের দাম বর্ত্তমানে ৬৮৵০ আনা মাত্র।—একে সুদ কম, তদুপরি মূলধনের স্থিরতা নাই। সুতরাং কোম্পানীর কাগজকে আর যাহাই বলা যাক্, ইংরাজীতে যাহাকে 'gilt-edged'—সোনার পাতে মোড়া বলা হয়,—তাহা বলা যায় না।

অথচ একেবারে নিরুপায় হইয়াই যে আমাদের বীমা কোম্পানী সমূহ কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া থাকে, তাহা নহে।—আমাদের দেশে অপরাপর এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে টাকা খাটানো যেমন নিরাপদ, তেমনই লাভজনক।—ধরুন, সমবায় সমিতি, এগুলি এমন ভাবে গঠিত যে এখানে টাকা খাটাইলে, টাকা কিছুতেই মারা পড়িতে পারে না, এবং সেই সঙ্গে সুদও পাওয়া যায় বেশ। সমবায় সমিতিগুলি শতকরা ৯।৵০ আনা হারে ঋণ গ্রহণ করে—(কোম্পানীর কাগজের সহিত পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন)—আবার এই টাকাই সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে শতকরা ১২॥৵০ আনা হইতে ১৫৲ টাকা হারে, যথাবিহিত স্থাবর সম্পত্তির জামিনে ঋণ দান করে।—এইখানে ইহাও মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে, এই সব সমিতির অধিকাংশ সভ্যই কৃষক,—হলায়ুধের দল—আমাদের 'এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশের কৃষক দল, যাহারা প্রতি বৎসর মহাজন ও কাবুলির নিকট হইতে প্রতি টাকায় মাসিক এক আনা বা দুই আনা সুদে অর্থাৎ বাৎসরিক শতকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ সুদে ঋণ নিয়া সর্ব্বহারা হইতেছে। আর দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের কোটি কোটি টাকা দিয়া শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিব্য এক শত টাকার বিনিময়ে ৬৮৵০ আনার হিসাব করিয়া—(যুদ্ধের সময় দর আরও কমিয়াছিল)—পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছে।

এমনই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসনে আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে।—অথচ জীবনবীমা কোম্পানী-গুলি যদি তাহাদের টাকা সমবায় সমিতিকে ৯।৵০ আনা হারে ঋণ দান করে, তবে বীমা কোম্পানীর তহ্‌বিল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বীমাকারিগণ ও অংশীদারগণ লাভ স্বরূপ একটি মোটা অংশ পাইতে পারে, অন্য দিকে দেশের অন্নদাতা অথচ নিরন্ন কৃষকদলেরও একটি সুবিধা হয়।

দেশীয় কোম্পানীর পরিচালকগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে যত শীঘ্র আকৃষ্ট হইবে—ততই আমরা দেশীয় বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে আশান্বিত হইব। তখন হয়তো আমরাও বলিতে পারিব—"The companies in other words have been the medium through which a vast aggregation of small sums has been devoted to the furtherance on a large scale of the nation's leading business interests."—অর্থাৎ বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যস্থতায় ক্ষুদ্রাকারে সঞ্চিত অর্থ বৃহৎ ভাবে জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থ জোগাইতেছে। —এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সে হইতেছে এ দেশের বীমাকারিগণ ও বীমা কোম্পানীর অংশীদারগণের কিঞ্চিৎ সজাগ আত্মবোধ। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করিতে পারেন।

টিপ্পনী

লাইট অব্ এসিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী দরজা বন্ধ করিবেন, এ সংবাদ সত্য নহে। কোম্পানীর অবস্থা অবশ্য অত্যন্তই শোচনীয় এবং কোম্পানীর সম্বন্ধে আমরা অন্যান্য কথা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কোনটাই প্রত্যাহার করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

কলিকাতার কোন বীমা কোম্পানীর বহু সহস্র টাকা চল্‌তি হিসাবে "কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক"-এ জমা ছিল। এত টাকা চলতি হিসাবে জমা রাখার সঙ্গত কারণ কি হইতে পারে অনুসন্ধান করার ফলে যে সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা গত চৈত্র মাসের "উপাসনা"য় কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে উক্ত মন্তব্যে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য নহে। যে বীমা কোম্পানীর সম্পর্কে আমরা এই কথা লিখিয়াছিলাম তাহাদের গত তিন বৎসরের উদ্বৃত্ত পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুত হইলে এক সঙ্গে সবগুলি পাঠাইবেন। ইহাতে আপাততঃ ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িতে পারে কিন্তু বীমাকারীদের বহু সহস্র টাকা চলতি হিসাবে ব্যাঙ্কে রাখার সুসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য নহে কর্ত্তৃপক্ষ এ সংবাদ আমাদিগকে অবগত করায় আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি এবং আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গও আশ্বস্ত হইবেন। এবং আমাদের লেখার ফলে যদি কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি হইয়া থাকে বা ব্যক্তিগতভাবে কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন তজ্জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

গত ১৯২৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে নিখিল ভারতবর্ষে মোট একুশটী নূতন বীমা কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে সতরটী প্রভিডেণ্ট জাতীয় বীমা কোম্পানীও কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"জীবন বীমা" দেখিতেছি উপাসনা সম্বন্ধে অযথা গ্লানি প্রচার করিতে একেবারে আত্মনিয়োগ করিয়া বসিয়াছেন। গত ফাল্গুন সংখ্যায় "জীবন বীমা" লিখিয়াছেন ;— "ওরিয়েণ্ট্যাল"এর সেক্রেটারী নিমন্ত্রিত না হওয়ায় আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন উহা একেবারে মিথ্যা কথা বলিয়া সেক্রেটারী মহোদয় স্বয়ং আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। মোটের উপর কোন কোম্পানীর প্রতিনিধিই এই ক্লাবের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হন নাই। মাত্র উপাসনার বীমা-বিভাগের সম্পাদকই দেখিতেছি ঈর্ষাবশে এই সাধু চেষ্টাকে পণ্ড করিতে চাহিতেছেন। তিনি এই চেষ্টাকে 'টুলী ষ্ট্রীটের তিন জন দর্জ্জির' ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্লাবের প্রাথমিক সভায় 'ন্যাশন্যাল', 'এম্পায়ার', 'হিন্দুস্থান', 'ভারত' প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিবর্গই উপস্থিত ছিলেন। উঁহারা কি সকলেই 'টুলী ষ্ট্রীটের দরজি?' তাহা হইলে উপাসনার বীমা বিভাগের সম্পাদককে কি নামে অভিহিত করা হইবে? আমরা উপাসনা-সম্পাদক সাবিত্রী বাবুকে অনুরোধ করি তিনি যেন বীমা বিভাগের সম্পাদককে লেখনী একটু সংযত করিতে উপদেশ দেন। নচেৎ তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।—"জীবন বীমা"য় এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা "ওরিয়েণ্ট্যাল"এর কলিকাতার শাখার সেক্রেটারী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া তিনি আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা জানিতে চাহিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাদের কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন এবং আরও জানাইয়াছেন যে, জাত-মাত্র-লুপ্ত ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স ক্লাবের সহিত সকল সম্পর্ক তিনি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। যে কেহ সেই পত্রখানি পাঠ করিলেই "জীবন বীমা" সম্পাদকের সত্যানুরাগের অভ্রান্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ঈর্ষাবশে এই সাধু চেষ্টাকে পণ্ড করিতে চাহিতেছি একথা বলিয়া "জীবন বীমা"র সম্পাদক তাঁহার স্বাভাবিক অনৃতবাদিতার প্রমাণ দান করিয়াছেন! হরি ঘোষের অঙ্গণে কবে কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল শিশু জন্মমাত্রেই পরলোক গমন করিয়াছিল—তাহার জন্য ভারতের বীমা বিষয়ক সাময়িক সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাবক ও পথপ্রদর্শকের ঈর্ষার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা কাহাকেও "টুলী ষ্ট্রীটের দর্জ্জী" বলি নাই—কারণ আমরা জানি এ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার মত বিদ্যা সকলের নাই। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত উচ্চ শিক্ষিত কোন বন্ধু এই-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমরা তাহারই উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। "উপাসনা"র সম্পাদক সাবিত্রী বাবুকে "জীবন বীমা"র সম্পাদক যে অমূল্য উপদেশ খয়রাৎ করিয়াছেন তজ্জন্য সাবিত্রী বাবু অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে অসমর্থ যে "জীবন বীমা"র সম্পাদকের মতে "উপাসনা"র বীমা বিষয়ক লেখাগুলি দিন দিন অপাঠ্য হইয়া উঠিতেছে কেন। "জী বীমা"র প্রথম সংখ্যার আরম্ভেই যে পাদরীর গান ছাপা হইয়াছিল 'উপাসনা'য় সেরূপ কোন ভাবমাধুর্য্যপূর্ণ সঙ্গীত ছাপা হয় নাই বলিয়া কি? অথবা "জীবন বীমা"র প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধে অভাগিনী বঙ্গভাষার প্রতি যে নিষ্ঠুর অস্ত্রোপচার করা হয় সেরূপ 'সার্জ্জারি' বিদ্যায় সাবিত্রী বাবু অনভিজ্ঞ বলিয়া?—কি কারণে আমাদের লেখাগুলি ক্রমশঃ অপাঠ্য হইতেছে, "জীবন বীমা" সম্পাদক তাহা কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিলে সাবিত্রী বাবুর কৃতজ্ঞতা সীমা লঙ্ঘন করিলেও করিতে পারে!

আমরা "ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স রিভিউ" নামক নূতন মাসিকের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুহৃদ্বর ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল এম্-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) এই মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদক এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া'র 'জীবন বীমা' বিভাগের ডাক্তার এস, সি, রায় মহাশয় ইহার পরিচালক। এরূপ পত্রিকার এদেশে বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমরা নবীন সহযোগীকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে উপাসনার ত্রয়োবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। গত চৈত্র সংখ্যার সহিত আপনাদের প্রদত্ত বার্ষিক মূল্য শেষ হইয়াছে। আমাদের অনুরোধ এই সংখ্যা পত্রিকা পাইলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বর্ষের বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইবেন। যাঁহাদের চাঁদা না পাওয়া যাইবে, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠান হইবে। যদি জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতে আপনার অনিচ্ছা থাকে, তবে ৩০শে বৈশাখের মধ্যেই জানাইবেন। অযথা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা
৯৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.
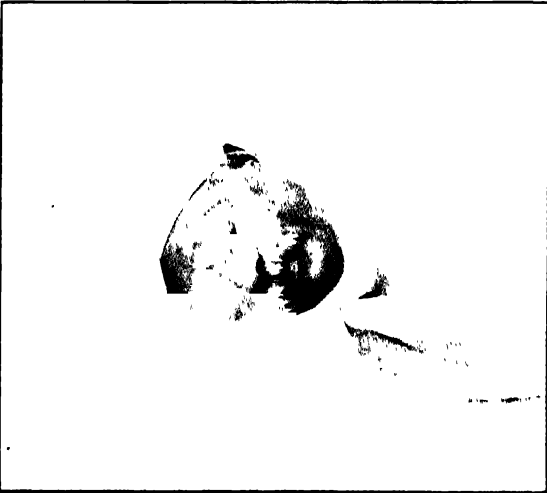
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

২৭শে মে লাহোরের সংবাদে প্রকাশ পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সদলবলে খাবাবাদ রেল ষ্টেশনে বেল ২ ঘটিকার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ১৮২২ সালের সীমান্ত রক্ষা আইনের (Frontier Security Regulation of 1822) বলে তাঁহাকে ধরা হইয়াছিল। মালব্য প্রমুখ রাজবন্দীগণকে কাম্বেলপুর আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

["স্বায়ত্ত-শাসন"এর সৌজন্যে]

রাজবন্দী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ইঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বারদোলী আন্দোলনে ইঁহার প্রকৃত পরিচয় দেশ পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে ইনিই প্রথম রাজবন্দী।

শ্রীমতী নাইডুর ভ্রাতৃজায়া

রাজবন্দিনী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের ৯॥০ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ইনি নটশিল্প ও নাট্যশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদুষী পত্নী।

"দীপ্ত-চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার

লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর ;

নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর

করি' ভস্মসার

চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"
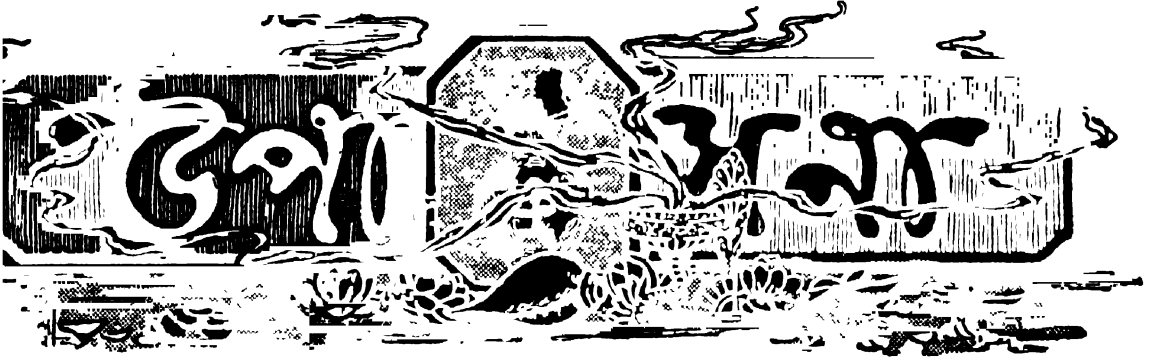
২৩শ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ — ২য় সংখ্যা

বিরহিণী প্রিয়া

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

দূর হ'তে তা'রে বড় ভাল লাগে মোর,

বিরহিণী প্রিয়া আমারি লাগিয়া ফেলিছে নয়ন-লোর !

নাহি নাহি তা'র বিরহের শেষ নাহি,

অচল পথের অনাগত মুখ চাহি'

কত দিনমান করে অবসান বেদনার গান গাহি'

কত নিশি করে ভোর !

দূর হ'তে তারে বড় ভাল লাগে মোর !

আমারি মনের চির-রূপসিনী বালা
প্রভাতে কুড়ায় ছড়ান বকুল সন্ধ্যায় গাঁথে মালা ;
সে মালা শুকায় ভোরের বাতাস লাগি',
মলিন আনন সুন্দর—নিশা জাগি',
দু'টি আঁখি দু'টি তৃষিত চাতক প্রিয় দরশন মাগি'
সহে বন্ধন-জ্বালা !
মন-মুকুরের চির-বন্দিনী বালা !

অনিদ নয়ান আকাশের চাঁদ চাহি'
মুখের আদলে বাদল নামে যে ও দু'টি কপোল বাহি',—
মনে ভাবে প্রিয়া,—এই জ্যোছনার খেলা,
বন-বীথিকার এমন প্রেমের মেলা,
বুকে নিয়ে যা'র মিটেনিক' সাধ, আজি তা'র একি হেলা
মমতার লেশ নাহি ?
বিফল বাসর আকাশের চাঁদ চাহি'।

বাতায়নে বসি' ভাবে বিরহিণী নারী—
—যা'র তরে মোর হিয়া দগদগি তারে যাই বলিহারি !
তা'রে কি ভুলাল নূতন প্রেমের মধু ?
বুকের মাণিক কা'রে বিলাইল বঁধু ?—
চির-মিলনের মন্দিরতলে চির-পূজারিণী বধূ
তা'রে কি ভুলিতে পারি ?
না বুঝে কেবল কাঁদে বিরহিণী নারী।

দূর হ'তে তা'রে বসাই সিংহাসনে
সে রাণী আমার খুলিছে রতন-মঞ্জুষা ক্ষণে ক্ষণে,—
পরে মণিহার মেখলা বলয় সিঁথি,
কঙ্কণ বাজে দূর হ'তে শুনি নিতি,
স্বপন জাগায় দূরের মায়ায় কতনা মধুর স্মৃতি
নিবিড় করিয়া মনে !
সে যে মহারাণী—হৃদয়-সিংহাসনে !

আমারি বিরহে প্রিয়ার চোখের জল
রূপ-সায়রের অথির শোভায় প্রিয়-প্রেমে ঢলঢল!
দূর-সন্ধানী আঁখি-তারকার আলো,
সুদূর-পিয়াসী মোর চোখে লাগে ভালো,
অধর সীমায় যে ছায়া ঘনায় নিঠুর দুখের কালো
আঁখিজলে নিরমল,
পথের পাথেয় প্রিয়ার চোখের জল!

মনে পড়ে তার মধুমাধবিয় রাতে,
যে মিলন মালা গেঁথেছিল প্রিয়া বিনাইয়া নিজ হাতে;
অন্তর তলে বাসনার দীপ জ্বালি'
প্রতি ফুলে দিল প্রেম-চুম্বন ঢালি',
আজি সে ষোড়শী বসি' পল গণে সাজায়ে রূপের ডালি
প্রিয়তম নাহি সাথে;
কে জাগে বাসর মধুমাধবিয় রাতে?

বুকে নাই প্রিয়া, আছে অন্তরতলে
সেথা অবিরাম নয়নাভিরাম তা'রি রূপ-শিখা জ্বলে!
বেদনার সুখে দহন-জ্বালায় দহি'
বিরহিণী-প্রিয়া-প্রেম-অনুরাগ সহি',
তা'রি তরে আমি দিবস রাতের গানের পসরা বহি'
তারই জয়মালা গলে!
কাঁদে বিরহিণী মম অন্তর তলে।

'গীতা'র শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ কি না

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আজকাল গীতার নানাবিধ নূতন ধরণের ব্যাখ্যা বাহির হইতে দেখা যায়। অনেক ব্যাখা পড়িতে গেলে আবার তাহার অনুব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়, কারণ অনেক স্থলে ভাষা ও উদ্দেশ্য উভয়ই বোধগম্য হয় না। গীতার উপদেশ অর্জ্জুন নিজেই বুঝিতে না পারিয়া ভগবানকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্য করিতে গিয়া অনেকস্থলে "যদ্বা" "অথবা" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া একই বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কাজেই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করা যে সহজ-সাধ্য নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তথাপি যে নিঃসন্দেহ ভাবে গীতার নিত্য নূতন ব্যাখ্যা চলিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহাই হউক, গীতা পাঠ করিতে করিতে আমার অনেক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিবার আশায় গীতার বহুবিধ ভাষ্য টীকাদি পাঠ করি ও অনেক শাস্ত্রজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তির নিকট আমার সন্দেহ জ্ঞাপনও করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোথাও প্রকৃত উত্তর পাই নাই, বরং তাহাতে সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। সন্দেহগুলির মধ্যে একটী আজ আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি বা অপর কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা আমার সন্দেহ নিরাকরণোদ্দেশ্যে আপনার পত্রিকায় যথাযথ ভাবে উত্তর লিখিলে, তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

আমার প্রশ্ন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ ছিলেন। প্রশ্নবীজ গীতাতেই পাইয়াছি। বিশ্বরূপ দর্শন করার পর অর্জ্জুন অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়া কাতর ভাবে ভগবানকে বলিয়াছিলেন :—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

অর্থাৎ আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া বিচলিত হইয়াছে। অতএব হে দেব, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আপনি আমাকে আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন।

এখানে প্রশ্ন—"সেই রূপ" অর্থে কোন্ রূপ? শ্লোকে "তদেব" শব্দটী লক্ষ্যের বিষয়। শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিলেন "যন্মৎসুখং" অর্থাৎ "যে রূপ আমার পক্ষে সুখদায়ক সেই-রূপ। সে রূপ যে কি, তাহা শঙ্করাচার্য্য বলিলেন না। শ্রীধরস্বামী নিঃশব্দ। অপর টীকাকার বলিলেন "তদেব প্রাচীনমেব" অর্থাৎ সেই প্রাচীন রূপ। সে রূপ যে কেমন, তাহা তিনিও বলিলেন না। মোটের উপর দেখা যায় কোনও টীকাকারই পরিষ্কার বলিতে পারিলেন না, অর্জ্জুন কোন্ রূপ দেখিতে চান। সকলেই কেবল এইটুকু মাত্র আভাষ দিলেন যে, বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, সেইরূপ। সেইরূপ দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ তাহা অপর কাহারও বলারও প্রয়োজন হয় নাই, কারণ অর্জ্জুন নিজেই বলিয়াছেন :—

*"কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।"*

অর্থাৎ হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, আমি আপনার সেই কিরীটশোভিত গদাধারী চক্রহস্ত রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি সেই চতুর্ভুজরূপে আমার নিকট আবির্ভূত হউন।

এখানে কেবলমাত্র চক্র ও গদার উল্লেখ থাকিলেও, অর্জ্জুন যখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেই দেখিতে চাহিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তিই অর্জ্জুনের লক্ষ্য।

এই শ্লোকে "তথৈব" শব্দটি লক্ষ্যের বিষয়। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "পূর্ব্ববৎ"; অর্থাৎ বিশ্বরূপের পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, সেই রূপ। আর একটী শব্দ আছে "তেনৈব"। ভাষ্যকার অর্থ করিলেন "বসুদেবপুত্ররূপেন"! মোট কথা বিশ্বরূপের পূর্ব্বে যে, ভগবানের চতুর্ভুজ ছিল, তাহা কোনও টীকাকারই অস্বীকার করেন নাই; এবং পরেও যে চতু-

ভুজই ছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ ইহার পরই অর্জ্জুনের উপর প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাঁহাকে বলিলেন "তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য" অর্থাৎ তুমি এক্ষণে আমার সেইরূপ দর্শন কর, এবং "ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাসভূয়ঃ" অর্থাৎ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনকে তাঁহার স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন। শঙ্করাচার্য্য "স্বকং রূপং"এর অর্থ করিলেন "বসুদেবগৃহে-জাতং রূপং" অর্থাৎ চতুর্ভুজ। অপরাপর টীকাকারগণের মধ্যে কেহ গোঁজামিল দিলেন, কেহ ধামাচাপা দিলেন।

যাহা হউক চতুর্ভুজরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন :—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানিমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।"

অর্থাৎ, হে জনার্দ্দন, আপনার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করিয়া আমি যেন এক্ষণে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম এবং আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

অর্জ্জুনের এই উক্তিকেই ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বের শ্লোকে "তদেব" শব্দের অর্থ "যন্মৎসুখং" করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কারণ, এখানেও দেখি তিনি "মানুষং রূপং" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "মৎসুখং প্রসন্নং"। ভগবানের স্বকীয় রূপকে "বসুদেবপুত্ররূপ", "বসুদেবগৃহেজাতরূপ" বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা করার হেতু এই যে, এক শ্লোকে "বাসুদেব" শব্দটী আছে; বিশেষতঃ বসুদেবগৃহেজাতরূপ যে চতুর্ভুজ তাহাতে কোনও মতভেদ নাই। তথাপি এই ব্যাখ্যাতেও যে সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা পরে দেখান হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তখন বসুদেব সেই জাত বালককে দেখিলেন :—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্"

অর্থাৎ সেই সদ্যপ্রসূত বালকের রূপ অদ্ভুত; বালক পদ্মনেত্র, চতুর্ভুজ ও শঙ্খগদাদি অস্ত্রসংযুক্ত। বসুদেব এই অদ্ভুত শিশুকে দর্শন করিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার জ্ঞান করিয়া কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক তাহার স্তব করিলেন। দেবকীও নবজাত কুমারকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুজ্ঞানে স্তব করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া পাছে কংস এই শিশুতনয়কে তাহার নিধনকারী মনে করিয়া নিহত করে, এই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

"উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপং অলৌকিকম্
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া যুষ্টং চতুর্ভুজম্॥"

অর্থাৎ হে বিশ্বাত্মন্, আপনার এই শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিশিষ্ট অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ গোপন করুন। অনন্তর পুত্রবৎসলা জননীর আগ্রহাতিশয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীর সম্মুখেই "বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" অর্থাৎ সাধারণ বালকের আকার ধারণ করিলেন।

ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, ভগবান চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি বসুদেব ও দেবকী ভিন্ন অন্য কাহারও নয়নগোচর হয় নাই; কারণ জন্মের অব্যবহিত পরেই কংসকারাগারে তিনি সাধারণ বালকের আকার অর্থাৎ দ্বিভুজ আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

এই দ্বিভুজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করার পর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ কখন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও গ্রন্থেই পাওয়া যায় না; অথচ অনেক স্থলেই তাঁহাকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা দেখা যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের রূপ যে চতুর্ভুজ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। যুদ্ধকালেও যে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে নিশীথে গুপ্ত ভাবে হত্যা করার পর অর্জ্জুন যখন অশ্বত্থামাকে পশুবৎ বন্ধন করিয়া আনিয়া দ্রৌপদীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, তখন দ্রৌপদী গুরুপুত্রের এবম্বিধ অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জ্জুনকে অনুনয় সহকারে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষে ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার প্রাণবধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ—

"নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব॥"

অর্থাৎ চতুর্ভুজ (শ্রীকৃষ্ণ), ভীম ও দ্রৌপদীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সখা অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন।

টীকাকারগণ এখানে চতুর্ভুজ শব্দ লইয়া মহা গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ত' দ্বিভুজ। এখানে চতুর্ভুজ কোথা হইতে আসিল? কাজেই কেহ বলিলেন, "চতুর্ভুজঃ সন্" অর্থাৎ "চতুর্ভুজ হইয়া"। শ্রীধর স্বামী যুক্তি দিলেন "উভয়োঃ সংবরণায়াবিষ্কৃতচতুর্ভুজ ইতি" অর্থাৎ ভীম ও দ্রৌপদীকে নিবারণ করিবার জন্য চতুর্ভুজ আবিষ্কার করিয়া দুই হাত দিয়া ভীমকে ও দুই হাত দিয়া দ্রৌপদীকে নিবারণ করিলেন। কোনও টীকাকার নিঃশব্দ থাকিলেন, কেহ শ্রীধর স্বামীর মতে সায় দিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী গোলমাল দেখিয়া বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে নিজ মতে আনিবার জন্য নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া চতুর্ভুজ ধারণ করিলেন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় টীকাকারগণের কোনও ব্যাখ্যাই নিঃসন্দেহ নয়।

যুদ্ধাবসানেও শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজই ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছিলেন। এদিকে ক্রমে ইচ্ছামৃত্যুযোগীদিগের বাঞ্ছিত উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইল এবং

> "তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী
> বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে
> কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
> পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ ব্যধারয়ৎ॥"

অর্থাৎ সহস্ররথীনেতা ভীষ্ম তখন নিজবাক্যের উপসংহার পূর্ব্বক মনকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সম্মুখস্থিত আদিপুরুষ পীতবাসা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণকে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, তাঁহাতেই চিত্তধারণা করিলেন।

এখানেও দেখি ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজই ছিলেন। টীকাকারগণ কিন্তু সকলেই নিঃশব্দ, চতুর্ভুজত্ব সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা বলিলেন না।

দ্বারকায় অবস্থিতি কালেও শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা অনেক স্থলে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণপত্নী লক্ষ্মণা দ্রৌপদীর নিকট স্বকীয় বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে বলিয়াছিলেন :—

> "মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্
> সার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ॥"

অর্থাৎ স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য লক্ষ্য ভেদ করিলে আমি তাঁহার গলে বরমালা প্রদান করিলাম। উপস্থিত অভিমানী নৃপতিগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া যখন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উত্তম অশ্বযুক্ত রথে স্থাপন করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তীনাপুরে শ্রুতদেব ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তখনও তাঁহার চতুর্ভুজ ছিল। কারণ, দেখিতে পাই, শ্রুতদেব নিজভবনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভক্তিভরে বহুবিধ প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন :—

> "ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজং"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাপেক্ষা আমার এই চতুর্ভুজ রূপও প্রিয় নয়।

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্লেষাত্মক বাক্যে মর্ম্মাহতা ও রোদনপরায়ণা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন সান্ত্বনা করিয়াছিলেন তখনও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে :—

> "পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ
> কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা"

অর্থাৎ চতুর্ভুজ (শ্রীকৃষ্ণ) তখন সত্বর পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া রুক্মিণীকে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার কেশ অপসারণ করিয়া পদ্মহস্তদ্বারা তাঁহার মুখ হইতে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া দিলেন।

ভক্ত উদ্ধবের নিকট ক্রিয়াযোগ বর্ণনা কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন ও সেই রূপকে চতুর্ভুজ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন —

> "তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ
> লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসং"

প্রভাসে আত্মকলহহেতু, পরস্পর সংগ্রামে যখন যদুকুল প্রায় নির্ম্মূল হইল, তখন বলরাম যোগাবলম্বনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তূষ্ণীভাব অবলম্বনে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করতঃ ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। সে সময়েও তাঁহার যে আকার ছিল তাহাও চতুর্ভুজঃ—

"বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া
দিশো বিতিমিরা কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ"

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন তখন জরা নামক ব্যাধ ভগবানের চরণপদ্মকে মৃগমুখভ্রমে মুসলের অবশিষ্টলৌহখণ্ডনির্ম্মিত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল তৎক্ষণেই :—

"চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ"

অর্থাৎ সেই চতুর্ভুজ পুরুষকে অবলোকন করিয়া কৃতাপরাধ সেই ব্যাধ অসুরদ্বেষী ভগবানের চরণে মস্তক রক্ষা করিয়া ভূমিতে পতিত হইল।

উদ্ধৃত উক্তিগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ইহলোক ত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজই ছিলেন। নন্দগৃহে অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনমত শ্রীকৃষ্ণ দুইখানি অতিরিক্ত হস্ত বাহির করিলেন ও তৎপরেই তাহা লুকাইলেন, এরূপ ব্যাখ্যাও সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ কাহারও নিকট অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলিয়া বোধ হওয়ার কথাও কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বসুদেব ও দেবকী জাতবালককে অদ্ভুত মনে করিয়াছিলেন। কাজেই মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভগবান কোন সময় হইতে চতুর্ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে আরও একটী সন্দেহ উত্থাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহকে "মানুষ দেহ" বলিয়া বর্ণনা গীতায় ও ভাগবতে অনেক স্থলে আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পর চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন
ইদানিমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতা প্রকৃতিং গতঃ"

এখন এই "মানুষ" শব্দের অর্থ কি? যদি "মানুষরূপ" এর অর্থ হয় মানব-দেহ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, দ্বাপর-যুগে মানবগণ চতুর্ভুজ ছিল। এই প্রশ্নেরই বা সমাধান কি?

আশা করি আমার এই প্রশ্ন আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন ও যদি কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ ইহার উত্তর দান করেন, তাহা হইলে তাহা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া একখণ্ড পত্রিকা আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। আমার এই সন্দেহটী নিরাকৃত হইলে অন্যান্য প্রশ্নগুলি ক্রমে আপনার নিকট নিবেদন করিব। আশা করি উত্তরদাতাগণ "লীলা"র দোহাই না দিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করিবেন।

কালীপুর আশ্রম
কামাখ্যা

শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

জাগো

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

"জাগো বৃকভানু-নন্দিনী মোহন যুবরাজে"। *

সকরুণ পুনঃ তরুণ অরুণ
চুমি' তব যুগ-নলিন চরণ
ভাঙে আজি তব এ অলস ঘুম
(তোমায়) সাজাতে নবীন সাজে।

জাগরণে আজি নাহি সখি ভয়
বিরহের দিন হ'ল তব লয়,
শুন সারি শুক পিক কোক চয়
ত্রিভুবন ভরি' গাজে!

ঘেরা গঞ্জনা কঠিন শাসনে
আজি নাহি তুমি সেই ব্রজবনে,
রাজ-ভকতের হৃদয়-আসনে
মরম-কমল মাঝে।

জাগাইয়ে ঐ যুগল মূরতি
মুগ্ধ ভকত করিছে আরতি,
জাগো কৃষ্ণ-পিরীতি-মূরতি
(শুন) তোমার আরতি বাজে।

জাগাও তোমার নব ঘনশ্যামে
ব'স তারে বুকে ল'য়ে, ব'স বামে
সে জাগে যে ওগো শুনি তব নামে
সে জাগে তোমারি মাঝে!

* (১৩৩৬) মাঘ সংখ্যার 'উপাসনা'য় প্রকাশিত "মঞ্জরী"তে উদ্ধৃত প্রাচীন পদটি দ্রষ্টব্য।

আলো-আঁধারি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীকিরণকুমার রায়]

সেই প্রথম রাত্রি! রাত্রি তখন উষার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। উষার প্রথম অরুণ-রাগ দেখিবার পূর্ব্বে আমার এই রূপান্তরিত আমি-কে একবার স্বচক্ষে দেখিবার সাধ জাগিল। বাড়ীর সব লোকজন তখনও সুষুপ্ত এই সুযোগে ল্যাবরেটরী ঘর হইতে বাহির হইয়া আঙিনায় নামিয়া পড়িলাম—আকাশের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, গ্রহ তারা নক্ষত্রগুলি বুঝি এক পলকের নিমিত্ত বিস্মিত দৃষ্টি নিয়া আমাকে চিনিতে চেষ্টা করিল—যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের সজাগ প্রহরায় এমন অবিমিশ্র দুর্ব্বৃত্ত তাহারা আর দেখে নাই।—ধীরে ধীরে আঙিনা পার হইয়া নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত সতর্ক পাদক্ষেপে আমি আমার শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই আয়না ছিল, জীবনে বিজন গুপ্তের সেই প্রথম আবির্ভাব—হ্যাঁ আবির্ভাবই তো! আয়নায় বিজন গুপ্তের প্রতিবিম্ব প্রকাশ মিত্র -না, বিজন গুপ্তই সেই প্রথম দেখিল।

এইখানে আমার গবেষণার একটি সিদ্ধান্ত বলিয়া রাখি। আমার অন্তরস্থিত দুর্জ্জনকে আমি যে আকার দিতে পারিয়াছিলাম, সে আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও অপরিপুষ্ট—আমার পরিচিত যে আমি সে তাহার সংযমনী প্রবৃত্তি, ধর্ম্মবুদ্ধি, সুমতি দিয়া ইহাকে, এই দুর্জ্জনকে বিকলাঙ্গ করিয়াছিল। এবং ঠিক সেই জন্যই প্রকাশ মিত্র সুপুরুষ, বিজন গুপ্ত কুৎসিত। একজনের মুখে প্রশান্ত সদ্‌বুদ্ধি, অন্যজনের মুখে দুর্দ্দান্ত কুবুদ্ধি। তাহা ছাড়া, ইহার অঙ্গে অঙ্গে কুমতির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—অবশ্য কুমতি অর্থে মানুষের তরলতর প্রকৃতি ছাড়া আর কি বোঝা যায়?—কিন্তু একথা আমি স্বীকার করিতেছি যে দর্পণে ঐ বিকলাঙ্গ কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে কোনও প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই, বরং এক প্রকার পুলকই ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছিল, আয়নার ঐ প্রতিবিম্বকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরি—কেননা সে মূর্ত্তিও যে আমার —নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমার।—নিজের চোখে সে মূর্ত্তিকে অধিকতর সত্য বলিয়া লাগিতেছিল,—গত জীবন ভোর আমি যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব-খণ্ডিত হৃদয়ের, বিবেক-দষ্ট মনের প্রতিকৃতি নিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছি,—সে মূর্ত্তির মধ্যে আর যাহা কিছুর হোক, সে দ্বন্দ্বের পরিচয় ছিল না- সে মূর্ত্তি যেন আরও প্রাণময়, আরও জীবন্ত। এবং সেদিন যাহা মনে হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের অভিজ্ঞতায় তাহার বহুতর প্রমাণই আমি পাইয়াছি। ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে বিজনগুপ্তের নৈকট্যে আসিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়াছে, সে সঙ্কোচ শুধু আমি তাহাদের চোখে মুখে নয়, তাহাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। এ সঙ্কোচও খুবই স্বাভাবিক, কেননা এ পৃথিবীতে মনুষ্যদেহ নিয়া যত প্রাণী বেড়াইয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে ভালো মন্দ দুই-ই আছে, একমাত্র বিজন গুপ্তই পৃথিবীর এই চিরাচরিত প্রথাকে বাতিল করিয়াছে—সে অবিমিশ্র মন্দ, তাহার মন্দের মধ্যে কোনও খাদ নাই। সুতরাং অপরাপর লোকে যে তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞাতে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিবে ইহাতে অবাক্‌ হইবার কিছু নাই।

আয়নার সম্মুখে আমি বেশীক্ষণ থাকি নাই—কেননা তখন পর্য্যন্ত আমার গবেষণার আর একটা দিক দেখা হয় নাই। আমার তখনও দেখা বাকী ছিল যে বিজন গুপ্তই সম্পূর্ণ প্রকাশ মিত্রকে ঢাকিয়া ফেলে [illegible]—রাত্রির অন্ধকারে যে বিজন গুপ্ত সেই যে আবার দিনের আলোকে প্রকাশ মিত্র হইয়া ফুটিয়া উঠিবে—উঠিতে পারে, এই ব্যাপারটি দেখিবার জন্য আমি তখনই ল্যাবরেটরী ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আমার

আবিষ্কৃত রাসায়নিক প্রস্তুত করিয়া গলাধঃকরণ করিলাম, পুনর্ব্বার সেই অস্থি মজ্জা মেদ মাংসের ভাঙাগড়ার পর্ব্বের মধ্যে দিয়া প্রকাশ মিত্রের সঞ্জীবন হইল।

সেই রাত্রি আমার কাল রাত্রি। সেই রাত্রে আমি জীবনের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। এবং যদি সে রাত্রে আমি আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতাম, যদি সে রাত্রে আমি আমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া উন্মুক্ত বিশ্ব জগতের পাশে বাহির হইয়া বিশ্ব মানবের স্কন্ধে ভ্রাতৃবোধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতাম,—তোমাদের জন্য আমি নূতন জগতের বার্ত্তা আনিয়াছি, নূতন উষার স্বর্ণদ্বারের পথে আসিবে তো আমার হাত ধর—তবে আজ আমাকে এই কাহিনী লিখিতে বসিতে হইত না। সেদিন আমি জন্ম মৃত্যুর বোঝাবুঝির মধ্য দিয়া যে নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলাম, সে তো সহজ নয়, সে যে শত সহস্র বর্ষের সাধনার ধন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাহা দিয়া আমি দেবত্ব অর্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা দিয়াই আমি শয়তানের কুক্ষিগত হইলাম। যে যৌগিক রাসায়নিক আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহার ফল তো ছিল এই যে মানুষের মগ্ন চৈতন্যে যে গোপন বৃত্তিগুলি, সেইগুলিকে এক মুহূর্ত্তে সজাগ করিয়া দেয়—কারাগারে যাহারা বন্দী, তাহাদিগকে সদর রাস্তায় মুক্তি দেয়—সে রাসায়নিক তো অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সে অসাধ্য সাধন আমি করিলাম কই? ভীরু কাপুরুষের মত আমি প্রকাশ মিত্রের নাম ও যশের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেলাম অথচ মগ্ন চৈতন্যে আমার সতত সজাগ রহিল বিজন গুপ্ত, যে আবার প্রকাশ মিত্রকে অবিরাম কাঁটার মত বিঁধিতে থাবিল।

যৌবনের প্রথম মাদকতা তখন কাটিয়াছে, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত আমি লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী নিয়া জীবন যাপন শুরু বলিয়া ভাবিতেছি—যেখানে জীবন পর্যাপ্ত প্রমোদে পরিপূর্ণ, সেই জীবনের মোহ তখনও আমাকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সুতরাং সেই মোহের খাদ্য আহরণার্থে আমাকে বিজন গুপ্তের শরণার্থী হইতে হইল। অগণিত কৌতূহলী ছাত্র পরিবেষ্টিত প্রকাশ মিত্র, অসংখ্য পীড়িত রুগ্ন দরিদ্রের আশা ও ভরসা স্থল প্রকাশ মিত্র, রাত্রির অন্ধকারে একটি মাত্র পানীয়ে চুমুক দিয়া বিজন গুপ্তের বেশ গ্রহণ করিত এবং সেই বেশে সে যে কি করিত আর কি না করিত! প্রথম প্রথম ব্যাপারটি নিজের কাছে নিজেরই বেশ মজার লাগিত—যেন দুরন্ত শিশুর দুষ্টামির মত, হাসিয়া মার্জ্জনা করা ছাড়া আর উপায় কি? তাই বিজন গুপ্তের ঘর দোর আসবাব হইল, যে ঘরে গোয়েনকা হত্যার সন্দেহে পুলিশ তাহার জন্য চড়াও করে, সেই ঘরের রক্ষণাবেক্ষণে দাসীও নিযুক্ত হইল। এদিকে নিজের বাড়ীতে খুব সুস্পষ্ট আদেশ জারি করিলাম যে এই-রকম-দেখিতে একটি লোক, নাম বিজন গুপ্ত, আমার বাড়ীতে তাহার হুকুম যেন সকলে পালন করে, সে যখন যাহা বলিবে, তাহা যেন মাথা পাতিয়া নেওয়া হয়। এবং নিজের কথা নিজেই পরখ করিবার জন্য বিজন গুপ্ত হইয়া মাঝে মাঝে চাকরবাকর, দারোয়ান, কম্পাউণ্ডারকে আদেশে আদেশে বিরক্ত করিয়া তুলিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে আমি সেই উইল প্রস্তুত করি, যে উইলের জন্য তোমার রাত্রে ঘুম ছিল না। এই উইল করিবার উদ্দেশ্য ছিল—আমার মনে মনে ভাবনা ছিল যে কোনও দিন যদি বিজন গুপ্ত আর প্রকাশ মিত্র না হইতে পারে, সেদিন যেন স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে না হয়। এমন করিয়া চারিদিকে আট ঘাঁট বাঁধিয়া মনে করিলাম,—সবাইকে ফাঁকি দিতেছি। কিন্তু যে আটঘাঁট নিজে বাঁধিলাম, সেই আটঘাঁটে নিজেই যে ধরা পড়িব, একথা কে ভাবিয়াছিল?

ইতি পূর্ব্বে বড় বড় লোকেরা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়া নিজেদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে—নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে এবং নিজেরা গদীতে ঠেস্ দিয়া আভিজাত্যের বহিরাবরণ রক্ষা করিয়াছে, ভদ্রতার মুখোস্ তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আমি, একবার গদী ঠেস্ দিয়া আভিজাত্যের নিয়ম কানুন রক্ষা করিলাম—আবার নিজেই গুণ্ডা সাজিয়া পথে বাহির হইলাম,—নিজের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে।—সেদিন আমি আমার এই দ্বিত্বে হাসিতাম—এই ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতাম যে এ পৃথিবীতে আমিই প্রথম যে এক মুহূর্ত্তে মহৎ হইতেও মহত্তর এবং অপর মুহূর্ত্তে দুর্ব্বৃত্ত হইতে দুর্ব্বৃত্ততর—এবং ইহাতে তাহার বাধেনা। এ যেন পাঠশালার

পড়ুয়ার বাড়ীতে ফিরিয়া জামা কাপড় খুলিয়া পুকুরে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটা। কিন্তু পাঠশালার যে পড়ুয়া সেই সাঁতার খেলে, একজন হইতে অপর জন বিভিন্ন নহে। আমার ক্ষেত্রে সে আপদ নাই। আমার এই আমি হইতে সে-আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—। একবার মাত্র ল্যাবরেটরী ঘরে গিয়া পলকের মধ্যে একটি পানীয় গ্রহণ—পর মুহূর্ত্তে বিজন গুপ্ত আর নাই। এ পৃথিবীতে সে যে কোনও অন্যায়, অপরাধ, কি পাপ করিয়া থাকুক্ সে আর নাই, পরিবর্ত্তে ল্যাবরেটরী ঘরে রহিয়াছে উদার মহৎ দেশপূজ্য ডাক্তার প্রকাশ মিত্র!

ছদ্মবেশ গ্রহণের পূর্ব্বে আমি আমার মনে মনে যে সব উশৃঙ্খলতার কল্পনা করিতাম, তাহাদিগকে বড় জোর বলা যায়,—অশোভন, কি অভদ্র। কিন্তু এই সব কল্পনা বিজন গুপ্তের মস্তিষ্কে গিয়া হইয়া উঠিত ভয়ঙ্কর।—অল্পে তুষ্ট হইবার মত লোক সে নয়, যেখানে যেখানে এ জগতে যাহা যাহা মন্দ, সে তাহার শেষ দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিত—কে তাহাকে থামাইবে?—বিজন গুপ্তের অভিযান সাঙ্গ হইলে, প্রকাশ মিত্র যখন পুনরাবির্ভূত হইত, তখন আমি আমারই শয়তানীতে নিস্পন্দ হইতাম। বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম, আমারই ভিতরে আছে এবং ছিল,—অথচ তাহার নাগাল পাই নাই—কি ভীষণ তাহার দাবী—সম্পূর্ণ শঠ ও লম্পট, অত্যাচারী,—তাহার প্রত্যেকটি কার্য্য তাহার নিজের অভিলাষকে কেন্দ্র করিয়া সূচিত—অপর ব্যক্তিকে যে কোনও প্রকার যন্ত্রণা দিয়া সে পাশবিক পরিতৃপ্তির সহিত নিজের এতটুকু উল্লাস সংগ্রহ করিতে পিছপাও নয়—পাথরের মানুষের মতই সে নির্ম্মম। প্রকাশ মিত্র বিজন গুপ্তের কার্য্য কলাপ স্মরণ করিয়া নিথর মরিয়া যাইত।— ফলে এই হইত বিজন গুপ্ত যে অন্যায় করিত, প্রকাশ মিত্র যতখানি সম্ভব সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিত।—কিন্তু বিজন গুপ্তের অন্যায় প্রকাশ মিত্রকে স্পর্শও করিত না,—অন্ততঃ করিত বলিয়া তখন বোধ হইত না। সুতরাং প্রকাশ মিত্রের বিবেক অস্পৃষ্টই থাকিত।

বিজন গুপ্ত যে-সব দুষ্কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত—আমি করিতাম বলিতে আজও আমার বাধিয়া যায়—তাহার বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা নাই। আমি শুধু এই টুকু দেখাইতে চাই যে কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমি পরিণামে আসিয়া উপনীত হইলাম। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা বলিব—তাহাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তবু তাহা এই ইতিবৃত্তে উল্লেখযোগ্য। এক রাত্রে একটি ছোটলোকের মেয়ের প্রতি দুর্ব্যবহারে জনৈক ভদ্রলোকের ক্রোধের কারণ হই—সে ভদ্রলোককে তোমার আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া সেদিন চিনিলাম। সে ভদ্রলোকের সহিত একটি ডাক্তার ও পাড়ার অনেকগুলি লোকও ছিল। বচসা করিতে করিতে তাহাদের উত্তাপের পরিমাণ পরিমাপে এমন বাড়িয়াছিল যে আমি সেদিন প্রাণের ভয়ও করিয়াছিলাম—সুতরাং তাহাদের সে উত্তাপের পরিশম করিতে বিজন গুপ্তকে সেদিন প্রকাশ মিত্রের নামে চেক কাটিয়া তাহাদিগকে দিতে হয়। ব্যাপারটি একটু বিপজ্জনক ছিল—কিন্তু সে বিপদ দূর করিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। একটি ব্যাঙ্কে বিজন গুপ্তের নামে কিছু টাকা রাখিয়া এবং নিজের হাতের লেখাকে একটু বিকৃত করিয়া বিজন গুপ্তের নাম সহি করিবার ব্যবস্থা করিয়াই সে বিপত্তির সমাধান আমি করিয়াছিলাম, অন্ততঃ করিয়াছিলাম বলিয়া সেদিন মনে হইয়াছিল।—

গোয়েনকা হত্যার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বের কথা। সে রাত্রে শফরে বাহির হইয়াছিলাম। শেষ রাত্রে ফিরিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। দিনের আলোয় যখন নিদ্রা ভাঙিল, তখন যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল: চারিপাশে চাহিয়া দেখিলাম, সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই আসবাব পত্র, মশারীটা যেমন ফেলা থাকে তেমনই রহিয়াছে, শিয়রের কাছে টিপায়ের উপর কাঁচের গ্লাসে জল ঢাকা রহিয়াছে, অদূরে রৌদ্র-কিরণ আসিয়া পড়িয়া একটি ফুলদানীকে মনোমোহন রূপ দিয়াছে—কিন্তু আমার মনে হইল, এ আমি যেখানে ছিলাম সেখানে নাই। বিজন গুপ্তের জন্য যে ঘর সজানো হইয়াছিল, সেই ঘরে যেন আমার ঘুম ভাঙা উচিত ছিল, যেন এখানে ঘুম ভাঙা ঠিক উচিত হয় নাই। মনে ভাবিতে ভাবিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম, একটু হাসিও পাইতে লাগিল—আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইলাম এ আবার কি প্রকারের অনুভূতি, ইহার কারণ কি? ভাবিতে ভাবিতে মন্থর আলস্যে আবার কেমন তন্দ্রা আসিল—চোখ ঢুলিয়া পড়িল। হঠাৎ সজাগ হইয়া চোখ মেলিতেই নিজের হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু এ হাত তো আমার নয়! এক মুহূর্ত্ত মাত্র! ক্ষণ পরেই চিনিলাম, এ বিজন গুপ্তের হাত, শিরাবহুল, কঠিন, কর্কশ, লোমশ, বিবর্ণ—হাতখানি বিছানার উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। এ হাত এখানে কিরূপে আসিল?

আধ মিনিটের বেশী নয়।—নিজের হাত নিজে চাপিয়া ধরিয়া বিছানা হইতে নামিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আয়নায় যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে পলকের মধ্যে আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল—হ্যাঁ, ঘুমাইয়াছিলাম প্রকাশ মিত্র, জাগিয়া উঠিয়াছি বিজন গুপ্ত! এ অসম্ভব কেমন করিয়া সম্ভব হইল?　　(ক্রমশঃ)

বৈশাখে

[শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ]

আজো জেগে আছি ওগো মধুভরা আমি মধু-সন্ধানী
কেন তুমি তবে ওই দু'টি হাতে
জ্যোস্নায় ভরা বৈশাখী রাতে—
ধীরে ধীরে আজ আলোর আকাশে আবরণ দিলে টানি'।

মধুমাসে তুমি আছিলে আমার গৃহের মাধবীলতা—
সারা দেহে তুমি রয়েছ ছড়ায়ে
লতার মতন রয়েছ জড়ায়ে
বসন্তে ফোটা ফুলের মতন মধুভারে অবনতা।

বছর ফুরাল শেষ হ'য়ে গেল চৈত্রের শেষ-নিশি
নব উৎসাহে আবার তোমাকে
চাহিয়া দেখেছি নব-বৈশাখে—
গত চৈত্রের চিতার ভস্মে তুমিও কি যাবে মিশি ?

দেহ কেন তব মরণের মত হ'য়ে গেল বিমলিন
নব-বছরের প্রথম আলোকে
গত পুরাতন বছরের শোকে
বিচিত্র এই আকাশের তলে কেন হ'লে আলোহীন ?

বৈশাখী বায়ে কেন উড়ে গেলে পথের ধূলির মত ?
উধাও হ'য়েছ চৈত্রের সাথে
নব-বছরের পূর্ণিমা-রাতে
দু'নয়নে মোর আঁধারের মত নেমে আস অবিরত।

আজ শুধু তব মধুভরা ওই স্বর্ণপাত্র হ'তে
আমার ক্ষুধিত জীবনে আবার,
ভরিবে না বধূ মধুর আধার—
আমার লাগিয়া সঞ্চয় কিছু রাখিবে না কোনমতে ?

তুমি বুঝি আর এ' পারের নও ও'পারের সহচরী
নব-বৈশাখে আমার আকাশে
মুছে দিলে আলো এত অনায়াসে
আজ হ'তে আর আলো করিবে না এ' পারের বিভাবরী ?

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

এই সময়ে সুভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুশী-নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুভদ্র বুদ্ধ-প্রচারিত সত্যধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ সম্বাদ শুনিয়া সুভদ্র ভাবিলেন—"প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ বুদ্ধশিষ্যগণ মুখে শুনিয়াছি জগতে সম্যক-সম্বুদ্ধ তথাগতের আবির্ভাব অতি বিরল ঘটনা, অথচ এরূপ এক তথাগত আজ রাত্রিশেষে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; বহুদিন হইতে আমার চিত্তে এক সংশয় জাগিয়া আছে এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে ভগবান তথাগত ছাড়া অন্য কেহ এই সংশয় উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না; যাহা সত্য তত্ত্ব সে বিষয়ে তিনি নিশ্চয় আমাকে উপদেশ দিবেন।"

এই ভাবিয়া সুভদ্র কুশীনগরের উপবর্ত্তনস্থ মল্লগণের শালবনে আনন্দের সমীপে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"মহাশয়, আমি শুনিলাম আজ রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; বিজ্ঞ জনে বলেন পৃথিবীতে তথাগতের আবির্ভাব অতীব বিরল ঘটনা; আমার সেজন্য ইচ্ছা হইয়াছে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা সংশয় আছে তাহার মীমাংসা এই অবসরে ভগবান বুদ্ধের কাছে জানিয়া লই।"

আনন্দ শুনিয়া বলিলেন—"ক্ষমা করুন ব্রাহ্মণ···তথাগতের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ; উহাঁকে আর ব্যস্ত করিবেন না।"

কিন্তু সুভদ্র ক্ষান্ত না হইয়া বার বার তিন বার একই প্রার্থনা জানাইলেন এবং প্রতি বারে একই উত্তর পাইলেন। অন্তরাল হইতে ভগবান বুদ্ধ উভয়ের এই কথোপকথন শুনিয়া আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—"আনন্দ, এ কাজ ভাল নয়, সুভদ্রকে আসিতে দাও, সুভদ্র জিজ্ঞাসু হইয়াই আসিয়াছেন, আমাকে পীড়া দিতে আসেন নাই। আমি জানি আমি তাহার প্রশ্নোত্তরে যাহা উপদেশ দিব সে তাহা শীঘ্রই বুদ্ধিবলে বুঝিবে।"

তখন আনন্দ সুভদ্রকে তথাগত সমীপে উপস্থিত করিলেন। সুভদ্র বিনীত ভাবে তথাগতের চরণ বন্দনা এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া এক পাশে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন—

"হে গোতম, নানা সম্প্রদায়ের যে সব শ্রমণ ব্রাহ্মণ দল-পতি আছেন, সাধারণে যাহাদের সাধু মহাত্মা বলিয়া সম্মান করেন, এরূপ সব দলপতিরা—যেমন পুরাণ কশ্যপ, মাখ্‌খলি গোশাল, অজিত কেশকম্বল, পাকুড় কচ্চায়ন, বেলঠীপুত্ত সঞ্জয়; নাথপুত্র নিগ্রন্থ—উহারা কি নিজ স্বীকার মতে সত্যই সত্যধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন? না কেহ কেহ হইয়াছেন? না কেহই হন নাই?"

তথাগত কহিলেন—"হে সুভদ্র, ইহাঁরা নিজমতে কতদূর সত্যদ্রষ্টা হইয়াছেন এ কথা লইয়া বাদ প্রতিবাদের কোন সফলতা নাই। সত্যই যাহা সত্যধর্ম্ম আমি তাহা তোমাকে শিখাইতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" সুভদ্র কহিলেন, "যথা আজ্ঞা, শ্রবণ করিতেছি।"

তথাগত কহিলেন—"হে সুভদ্র, যে ধর্ম্ম মত আর্য্য অষ্টাঙ্গ সাধন মার্গের ভিত্তিতে গর্ব্বিত নহে তাহাতে ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিক হইতেই পারে না। ইহার বিপরীত মতেই সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এই অষ্টাঙ্গ সাধন মার্গে যাহারা বিচরণ করেন তাঁহারাই সত্য ধর্ম্মশীল, সাধু ব্যক্তি। এ পথে চলিলে জগৎ কোনকালে সাধুজন বঞ্চিত হয় না। হে সুভদ্র, আমার যখন বয়স ২৯ বৎসর তখন আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি এবং সত্য ধর্ম্মের সন্ধানে ফিরি; এবং ৫০ বৎসর ধরিয়া লব্ধ সত্যধর্ম্ম দেশে বিদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। এ ধর্ম্মের বাহিরে পরম বিমোক্ষ নাই; সংসারজয়ের পন্থা অন্যত্র নাই। অন্যান্য যে সব ধর্ম্ম অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গ অগ্রাহ্য করে তাহা ধর্ম্মই নহে; তাহাতে লোক যথার্থ সাধুত্ব লাভ করে না।"

সুভদ্র উপদেশ পাইয়া আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আপনার বচনামৃত আমাকে কৃতকৃতার্থ করিল—আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখাইলেন,—গোপন

দুর্লভ তত্ত্বরত্নের অধিকারী করিলেন—বিপথ হইতে সুপথে আনিলেন। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সংঘ মধ্যে গ্রহণ করুন, আমি তথাগতের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করি—"

তথাগত বলিলেন—"হে সুভদ্র, উত্তম কথা ; কিন্তু এ সংঘের নিয়ম এই যে যে-ব্যক্তি অন্য ধর্ম্ম হইতে সৎধর্ম্মে আসিবেন তিনি সংঘ মধ্যে ৪ মাস পরীক্ষাধীনাবস্থায় থাকিবেন। ৪ মাস পরে সংঘবাস পরীক্ষা সফল হইলে সংঘের স্থবিররা নবাগতকে উচ্চ বা নিম্ন ভিক্ষু শ্রেণীতে যোগ্যতা বুঝিয়া ভর্ত্তি করিবেন। ইহাতে রাজী আছ ?"

সুভদ্র সম্মতি জানাইলেন। তথাগত তখন আনন্দকে কহিলেন, "হে আনন্দ, সুভদ্রকে দীক্ষা দিয়া সংঘভুক্ত কর—।"

সুভদ্র আনন্দকে কলিলেন—"হে আনন্দ, আপনি ধন্য ও ভাগ্যবান যেহেতু তথাগত স্বয়ং আপনাকে দীক্ষিত করিয়া সংঘে স্থান দিয়াছেন।"

দীক্ষান্তে সুভদ্র নির্জ্জনবাস পূর্ব্বক সাধনা করেন। ঐকান্তিক আগ্রহ, চেষ্টা ও সাধনা বলে সুভদ্র অচিরেই সত্যতত্ত্বের সাক্ষাৎ করেন এবং এজন্মেই সংসারগতির চির বিরামের আভাষ পাইয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করেন।

সুভদ্রই তথাগতের শেষ স্বহস্ত-দীক্ষিত শিষ্য।

হিরণ্যবতীয়াংশের শেষ

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথাগত অতঃপর আনন্দকে কহিলেন—"আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর হয়তো একথা উঠিবে, তথাগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম-উপদেষ্টার শেষ হইল, কে আর আমাদের সৎধর্ম্মপথে চালনা করিবেন ? কিন্তু একথা যেন না ওঠে, ধর্ম্ম, সংঘ ও সংঘের নিয়মাবলী রহিল, উহাই তোমাদের চালনা করিবে। এই সংঘ ও তদ্‌নিয়মাবলী আমার স্থান গ্রহণ করিবে।

"আর এক কথা, আমি তিরোহিত হইলে তোমরা, ভিক্ষুগণ, পরস্পরকে আর 'আবুষ' (বন্ধু) বলিয়া সম্বোধন করিও না। কনিষ্ঠ জনকে জ্যেষ্ঠেরা নাম ধরিয়া বা 'আবুষ' বলিয়া ডাকিতে পারিবেন ; গোত্রনাম ধরিয়াও ডাকিতে পারেন ; কিন্তু কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠদিগকে যেন ভান্তে বা 'আয়ুষ্মা' বলিয়া ডাকেন।

"পুনশ্চ—আমার তিরোভাবের পরে তোমাকে বলিয়া যাই, সংঘ যদি ইচ্ছা করেন ছোট খাটো বিধি নিষেধগুলা তুলিয়া দিতে পারেন। (See Questions of Milinda Vol. I. P.202)

"অপিচ আমার দেহান্ত পরে ভিক্ষু ছন্নকে সংঘ-শাসন দণ্ডবিধির চরম শাস্তি দেওয়া হয় যেন—ছন্ন যাহা বলে বলুক যাহা করে করুক ভিক্ষুরা সবাই যেন তাহাকে 'একঘরে' করেন ; তাহার সহিত বাক্য ব্যবহার বা কোনো ব্যবহার না করেন।"

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলা শেষ হইলে সমবেত ভিক্ষু ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, এমন হইতে পারে যে এই সমবেত ভিক্ষুগণ মাঝে এরূপ কেহ হয়তো আছেন যাঁহার চিত্তে এখনো বুদ্ধ, বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, বা মোক্ষমার্গ বা তৎসাধন পন্থা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে, যাহা আমার তিরোধানের সঙ্গে অমীমাংসিত রহিয়া যাইবে। তখন তাঁহার হয়তো আপশোষ হইবে যে 'বুদ্ধ বাঁচিয়া থাকিতে কেন তাহার মীমাংসা করিয়া লইলাম না!' কাজেই কাহারো কিছু সন্দেহ থাকিলে আমাকে এই সময় জিজ্ঞাসা করুন।"

কিন্তু একজন ভিক্ষুও কোনো উত্তর করিলেন না। অতঃপর তথাগত আরো দুইবার ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইবারই কেহ কোনো সন্দেহ উত্থাপন করিলেন না। তাহাতে বুদ্ধদেব বলিলেন—"হয়তো আমার প্রতি সম্ভ্রম, ভক্তি বশতঃ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন না ; যদি কাহারো জিজ্ঞাস্য থাকে বন্ধু মুখ দিয়া আমাকে অবগত করুন—"

তথাপি কেহ কোনো বাক্য উত্থাপন করিলেন না।

তখন আনন্দ কহিলেন, 'প্রভু এ অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য! এই সমবেত অসংখ্য শিষ্য মধ্যে এমন একজন নাই যাঁহার মনে বুদ্ধ বা বুদ্ধমত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে ?'

তথাগত তাহা শুনিয়া কহিলেন "আনন্দ, তুমি এই কথা হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রণোদিত হইয়াই বলিতেছ কিন্তু আমি স্থির জানিতেছি এই সমস্ত ভিক্ষু শিষ্যদের মধ্যে এমন একটী, কেহ

নাই যাহার বুদ্ধ বা বুদ্ধমত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে। এই দলের মধ্যে যিনি সাধনায় সব চেয়ে কনিষ্ঠ তাহারও মোক্ষ-নির্ব্বাণ অনিবার্য্য; তাহাকে আর জন্মান্তরে ভব দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।"

অতঃপর মুহূর্ত্ত বিশ্রামের পর তথাগত তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের শেষ বাণী উচ্চারণ করিলেন—

"হন্দ দানি, ভিখ্‌খবে আমন্তয়ামি ভো বায়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদদেথ—হে ভিক্ষুগণ এই কথা তোমাদের জানাইতেছি, শ্রবণ কর, সমস্ত-সংযোগ উৎপন্ন সংস্কারই (মানসিক বা ভৌতিক বস্তু বা তত্ত্ব) বায়ুধর্ম্মী; অনিত্য, নশ্বর, অপ্রমত্ত চিত্তে নিজ নিজ নির্ব্বাণ, মোক্ষ লাভ করিও।"

এই বলিয়া বুদ্ধদেব ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। এবং ধ্যানযোগে বিমোক্ষের আটটী সোপান অতিক্রম করিলেন। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রথম তিন ধ্যানাবস্থায় রূপায়তনে স্থিতি; সমস্ত আকাশায়তনে চতুর্থ স্থিতি। অনন্তজ্ঞানায়তনে পঞ্চম স্থিতি। আকিঞ্চনায়তনে ষষ্ঠ স্থিতি। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে সপ্তম স্থিতি। সংজ্ঞা বেদয়িত্ নিরোধায়তনে অষ্টম স্থিতি।

বুদ্ধ অষ্টম ধ্যানাবস্থায় উঠিলে আনন্দ বলিয়া ওঠেন 'হে ভদন্ত অনুরুদ্ধদেব তথাগত বুঝি লীলা শেষ করিলেন।'

অনুরুদ্ধ বলিলেন, "না আনন্দ, তথাগত অষ্টম ধ্যানায়তনে অবস্থান করিতেছেন, এ অবস্থায় সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ হয়।"

অতঃপর তথাগত অষ্টমায়তন হইতে অবরোহ প্রণালীতে এক এক ধাপ নীচে নামিতে নামিতে প্রথমায়তনে আসিলেন।

তারপর আবার আরোহণ প্রক্রিয়া বলে চতুর্থায়তনে উঠিলেন। ইহাই অনন্ত আকাশায়তন স্থিতি। ইহাতে আসিয়াই তথাগত মহা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

এই সময়ে ব্রহ্মা সহম্পতি আকাশ হইতে কহিলেন—

জীবিত যা কিছু দেখ এ চৌদ্দ ভুবনে
সকলি সংযোগজাত; পঞ্চস্কন্ধ যোগে
বিরচিত দেহ মন;—তার ফলে এই
ক্ষণিকের জীবলীলা জঙ্গম জগতে;
অপরের কিবা কথা? শ্রীবুদ্ধ আপনি
ত্রিজগৎ গুরু যিনি শ্রেষ্ঠ নরলোকে,
আদি জ্ঞান গুরুদেব যোগ্য বংশধর
অসীম যাঁহার জ্ঞান প্রজ্ঞা অকলুষ,
তিনিই মৃত্যুর করে সঁপিলেন দেহ!

—ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ অনুরুদ্ধ তথাগতের তিরোভাবে এই গাথা উচ্চারণ করেন—

সমস্ত বাসনাজাল স্বহস্তে কাটিয়া
নির্ব্বাণের পরাশান্তি লভিলেন যিনি
এই সে পরম জ্ঞানী বুদ্ধ ভগবান।
মৃত্যুঞ্জয় মহাবীরে মরণ যাতনা
বিন্দুমাত্র বিচলিত নারিল করিতে॥
সমাধি-শাসিত চিত্তে, অপ্রকম্প বুকে
শমনের কশাঘাত মিলাইয়া গেল
বায়ুর বিক্রম যথা গিরীন্দ্র-শিখরে;
উজ্জ্বল বহ্নির শিখা নিভিয়া যেরূপে
অদৃশ্য হইয়া যায়, বুদ্ধাত্মা তেমতি
পরম নির্ব্বাণ লভি' হইলেন আজি
জন্ম ও মরণের প্রবাহ অতীত—!

আনন্দ আক্ষেপ করিলেন—সর্ব্বগুণাধার তথাগতের তিরোভাবে ভয় ও আশঙ্কা দেখা দিল!!

ভিক্ষু শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় সুখদুঃখাতীত হন্ নাই তাঁহারা খেদ করিতে লাগিলেন—"তথাগত অকালে ধরাধাম ত্যাগ করিলেন।" কিন্তু প্রবীণ আত্মজয়ী ভিক্ষুরা কেবল এই কথা কহিলেন—"সংযোগোৎপন্ন যাহা কিছু সবই অনিত্য ও নশ্বর। তথাগত দেহ মন ও পঞ্চস্কন্ধজাত বলিয়াই ধ্বংস লাভ করিল!"

শোকমুহ্যমান গুরুভ্রাতাদের সম্বোধন করিয়া অনুরুদ্ধ কহিলেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ তোমরা শোকত্যাগ কর; তথাগতের কথা স্মরণ কর! তিনি কি বলেন নাই যাহা কিছু প্রিয় ও শ্রেয় বোধ করি সবই সংযোগ-উৎপন্ন, বায়ুধর্ম্মী, সুতরাং বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী—! যাহা নশ্বর তাহার জন্য শোক করা সত্যধর্ম্ম বিরোধী।"

তথাগতের দেহান্ত পরে যেটুকু রাত্রি বাকি ছিল আনন্দ ও অনুরুদ্ধ ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। পরে প্রভাত হইলে অনুরুদ্ধ কহিলেন—"হে আনন্দ, তুমি কুশীনগরে গিয়া

তথাকার মল্লদের বল "হে বশিষ্ঠগণ, তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইয়াছে। আপনারা যথা কর্ত্তব্য করুন।"

আনন্দ তাহাই করিলেন। মল্লগণ সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন এবং সভাগৃহে সমবেত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইলেন।

তৎপরে মল্লগণ স্বকীয় অনুচরবৃন্দকে আজ্ঞা দিলেন—"প্রচুর পরিমাণে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্যাদি সংগ্রহ কর ও গীত নৃত্য কুশল লোক আহ্বান কর।"

অতঃপর মল্লগণ ৫০০ শত নূতন বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি সম্ভার লইয়া তথাগতের মৃতদেহের নিকট উপনীত হন।

তথায় উপনীত হইয়া মল্লগণ তথাগতের দেহ সম্মানার্থ পুষ্পমাল্যাদি ধারণ করতঃ গন্ধ দ্রব্যানুলেপন পূর্ব্বক মহা-সমারোহে নৃত্যগীত আরম্ভ করেন। মহাকাশ্যপ বহু ভিক্ষু লইয়া তখনো পৌছান নাই বলিয়া অগ্নি সংকার তখন করা হইল না।

এইরূপে ছয়দিন অতিক্রান্ত হইলে মল্লগণ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভদন্ত আমরা তথাগতের দেহ সংকার কিরূপে করিব ?"

আনন্দ কহিলেন, "মহারাজ চক্রবর্ত্তীর দেহ যে ভাবে সৎকৃত হয় সেই ভাবে কর্ত্তব্য।

"মহারাজ চক্রবর্ত্তী দেহ নব বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত হয়। তার-পর তুলা দিয়া জড়ানো হয়। আবার এক নূতন বস্ত্রখণ্ডে দেহ আবৃত হয়। এইরূপে ৫০০ দফা বস্ত্র ও তুলা দ্বারা দেহ মণ্ডিত হয়। তারপর বস্ত্রমণ্ডিত দেহ তৈলপূর্ণ লৌহ-কটাহে রক্ষিত হয়। তারপর সুগন্ধি কাষ্ঠে বৃহৎ এক চিতা গঠন করিয়া নানা সুগন্ধ দ্রব্যাদি সংযোগে দেহ ভস্ম করা হয়। তারপর দাহ শেষে চিতা ভস্ম সংগ্রহ করতঃ একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া চারটী বড় রাস্তা যেখানে মিলিত হই-য়াছে সেইস্থানে উহা প্রোথিত হয় এবং তদুপরি বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়।"

মল্লগণ সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে মহাকাশ্যপ প্রায় ৫০০ ভিক্ষু লইয়া পাবা হইতে কুশীনগরাভিমুখে আসিতেছিলেন। পথে অজীবক সম্প্রদায়ের এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া মহাকাশ্যপ তথাগতের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করেন। সন্ন্যাসী তথাগতের তিরোভাবের সংবাদ দিলে ভিক্ষুগণ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন।

অপেক্ষাকৃত নবীন ভিক্ষুগণ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুভদ্দ নামে এক ভিক্ষু (বুদ্ধের শেষ স্বহস্তে দীক্ষিত শিষ্য সুভদ্দ নহেন, ইনি ব্রাহ্মণ বংশীয়, এ সুভদ্দ আতুমাগ্রাম নিবাসী এক নাপিত শিষ্য) কহিল—

"কেন হে তোমরা কাঁদতে বসলে ? তথাগত দেহত্যাগ করেছেন ; ভালই তো! আমি তো বুঝছি আমরা সব বাঁচ্‌লাম! দিনরাত খুটিনাটী 'এই কর', 'ও ক'র না' 'তা খেওনা' প্রভৃতি নানা বিধি নিষেধের জালায় উত্যক্ত করে তুলেছিলেন! এখন তো ভালই হলো! দিব্য আরামে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তাই করবো! 'হাঁ-না' বলে শাসাবার কেউ থাকলো না!"

মহাকাশ্যপ কিন্তু ভিক্ষুদের বুঝাইলেন—"ভ্রাতৃগণ শোক-ত্যাগ কর; তথাগত কি শিক্ষা দেন নাই যাহা কিছু সংযোগ উৎপন্ন তাহাই নশ্বর তাহা হইতে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য! বস্তুর ধর্ম্মই এই, আজ আছে কাল নাই; যে বস্তু পাঁচটা অন্য বস্তুর সম্মিলনে সংযোগে উৎপন্ন ধ্বংসলাভ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, উৎপন্ন দ্রব্য নাশ না হইয়া থাকিবে এ কোথায় সম্ভব হইতে দেখিয়াছ ?"

এ দিকে মল্লগণ যথারীতি চিতাগঠন করতঃ তথাগত দেহ তাহাতে স্থাপন করিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে গেলেন, কিন্তু চিতায় আগুন ধরিল না!

অনুরুদ্ধকে কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর দেন তথাগতের প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ এখনো আসিয়া পৌছান নাই। তিনি আসিয়া তথাগত দেহ প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিলেই চিতায় আগুন লাগিবে।

ঘটিল তাই। অনুচর ভিক্ষুদল সহ যুক্ত করে সভক্তি চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তথাগতের চরণদ্বয় বস্ত্রমুক্ত করিয়া বন্দনা করিলেন।

এই বন্দনা কাজ শেষ হইলে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। সুপবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইলে মল্লগণ পুত-অস্থিখণ্ডগুলি সংগ্রহ করত কুশীনগরের সভাগৃহে সান্ত্রী পাহারা যোগে সাত দিন রক্ষা করিয়া গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পামাল্যাদি যোগে ও নৃত্যগীত সহকারে সম্মানিত হইতে থাকে।

অতঃপর মগধরাজ অজাতশত্রু আসিয়া তথাগতের অস্থিখণ্ড প্রার্থনা করেন—তিনি বলেন তথাগত ক্ষত্রিয় ছিলেন আমিও ক্ষত্রিয় সুতরাং একভাগ আমার প্রাপ্য। আমি ইহার উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ গড়িব।

বৈশালীর লিচ্ছবীরা আসিয়া বলেন—"আমরাও ক্ষত্রিয় সুতরাং আমরাও একভাগ পাইতে পারি। আমরা উহার উপর এক রমণীয় স্তূপ গড়িব।

কপিলাবাস্তর শাক্যরাও বলিলেন—তথাগত আমাদেরই বংশের মহাগৌরবের পাত্র আমরাও একভাগ অস্থি পাইতে পারি।

এইরূপে অল্লকপ্প জনপদের বুলীরা, রামগ্রামের কলীয়রা, পাবার মল্লরা এবং বেধদীপের এক ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই তথাগতের দেহাস্থি প্রার্থনা করেন। (ক্রমশঃ)

কাকজ্যোৎস্না

(উপন্যাস)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

৩

মানুষের শরীর বলিয়া যে-বস্তুটি আছে তাহার আব্দার না রাখিলেই নয়। অতএব, অরুণাকেও একদিন চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিতে হইল। শুধু তাই নয়, মাসে হিসাবের অতিরিক্ত তেল খরচ হইয়াছে বলিয়া রাঁধুনে বামুনকে তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না

গলায় ভার না বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতে পারে না; প্রতিবন্ধক না থাকিলে জলের তলা হইতে শরীরটা আপনিই চাড়া দিয়া উঠিবে।

অরুণা হিসাব লিখিয়া চাকরকে বাজারে পাঠাইতেছিলেন, প্রদীপ কাছে আসিয়া বলিল,—"সন্ধ্যার ট্রেনেই কল্‌কাতায় ফিরে যাব ভাব্‌ছি। আপনার অনুমতি চাই।"

প্রদীপ জানিত যে অরুণার চোখে জল আসিবে; তাই শোকাশ্রুকে অযথা আর প্রশ্রয় না দিয়া কহিল,—"কল্‌কাতায় গিয়ে ত' চাক্‌রির জন্য ফের পথে-পথে টো-টো কর্‌তে হবে, দু' মুঠো জুটোতে হবে ত'! অনেক দিন থেকে গেলাম, চমৎকার থেকে গেলাম,—একেবারে নিখুঁত।"

প্রদীপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া অরুণা বলিলেন,—"আমাদের ভুলে যেয়ো না, প্রদীপ।"

প্রদীপ তক্তপোষের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"আপনারাও আমাকে ভুলে গেছেন কি না তা দেখ্‌বার জন্যে আমাকেও মাঝে-মাঝে এখানে আস্‌তে হবে। আশা করি সুধী দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে যায় নি।"

অরুণার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া আবার অশ্রু আসিল, এবার আর মুছিলেন না। প্রদীপের পিঠের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—"আরো দু'টো দিন থেকে যেতে পার না? তুমি চলে গেলে এ-ফাঁকা কি ক'রে সইব?"

প্রদীপ কহিল,—"আমার আর থাকা চল্‌বে না, মা। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দেখে এই অসহায় কাকুতি শুনে আমি ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি, মনে আমার অবসাদ এসেছে। এই বৈরাগ্য আমার জীবনের পক্ষে উপকারী হবে না। এর থেকে আমি ছাড়া পেতে চাই।" বলিয়া প্রদীপ অরুণার লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে চাহিল।

"এখন কোথায় যাবে, কল্‌কাতায়? কল্‌কাতায় তোমার কে আছে? য়্যাদ্দিন থেকে গেলে অথচ তোমার কোনো খোঁজই নেওয়া হ'ল না।"

প্রদীপ কহিল,—"খোঁজ নেওয়ায় বিপদ আছে মা। খোঁজ যদি পেলে তবেই ত' বেঁধে রাখ্‌বার জন্যে হাত বাড়াবে; এই অবাধ্য বুনো ছেলেটাকে কেউ বাঁধ্‌তে পারেনি। বাঁধ্‌তে যাবে, অথচ হারাবে সেই দুঃখ আর সেধে নিতে চেয়ো না, মা। আমি আবার আস্‌বো।"

এই ছেলেটির প্রতি অরুণার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, সুধী যেন প্রদীপকে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছে। অরুণা কহিলেন,—"এমন কথা কেন বল্‌ছো প্রদীপ, স্নেহের বাঁধন কি এত সহজেই ছেঁড়া যায়? তুমি কি ভাব্‌ছো তোমাকে আমরা ভুলে' যাবো?"

প্রদীপ কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় উমা আসিয়া হাজির। উমা সুধী-র ছোট বোন, ম্লান ললিততনু মেয়েটি, মৃদু মৃগস্বভাব;—এই তেরোয় পা দিয়াছে। উমাকে দেখিয়াই অরুণা কহিলেন,—"তোর প্রদীপদা চ'লে যাচ্ছেন।"

উমা কহিল,—"আজই?"

প্রদীপ উত্তর দিল,—"আজই উমা। কত কাজ কল্‌কাতায়। আমাকে য়্যাদ্দিন না দেখে ট্রাম বাস্ নিশ্চয়ই ষ্ট্রাইক্ ক'রে ব'সে আছে, রাস্তায় আলো জ্বল্‌ছে না।"

উমা হাসিয়া কহিল,—"রাস্তায় আলো জ্বালাবার চাক্‌রিটা আপনার জন্যে পড়ে' আছে! যাচ্ছিলেন ত' কাশ্মীর, য়্যাদ্দিনে কি তার মেয়াদ ফুরিয়ে যেত?"

"কাশ্মীর-ই বল বা কাশীই বল কলকাতার ডাক দু' সপ্তাহের বেশি উপেক্ষা করা যায় না। সুধী-র সঙ্গে সেই চুক্তি

ক'রেই বেরুচ্ছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কোনো আদালত থাকে মা, সুধী-র বিরুদ্ধে সেই চুক্তিভঙ্গের মামলা আমাকে আন্‌তেই হ'বে। এ-কালে সৌন্দর্য্য যদি কোথাও থাকে উমা, তা হ'লে কলেই আছে।"

বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া উমা কহিল,—"কলহেও।"

প্রদীপ বলিয়া চলিল,—"তাই ত' কল্‌কাতা এমন ক'রে আমার মন ভুলিয়েছে। আকাশের রোদন শুনে বেদ রচিত হয়েছিল পুরাকালে, এ-কালে আমরা যন্ত্রের যন্ত্রণা শুনে আবার মহাকাব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। মাঠের চেয়ে সহর সুন্দর, মঠের চেয়ে ফ্যাক্টরি—প্রান্তরের চেয়ে প্রাচীর। প্রকৃতিকে কল্‌কাতা যে বিকৃত করে' তুলেছে, আমার তা'তে ভারি ভালো লাগে।"

উমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"বলেন কি? প্রকৃতিকে আপনার ভালো লাগে না?"

প্রদীপের স্বর কিঞ্চিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; "একটুও না। তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে মধ্যরাত্রে একবার ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পারে দাঁড়িয়ো। সব ট্র্যাফিক্ বন্ধ, ঘন কালো রাত্রি নেমে এসেছে, চার পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান, স্থির, নিরুত্তর, অভ্রভেদী—ওপরে তারকাদীপ্ত বিস্তীর্ণ আকাশ। ভাব দেখি, কী কৃত্রিম, এবং কী করুণ!"

সমস্ত ছবিটি যেন উমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সুধী-র কাছে উমা অনেক-কিছু পড়াশুনা করিয়াছে; তাই ইহার পর বলিতে পারিল: "এই প্রকৃতির পূজা ক'রেই কত কবি চিরকালের জন্য নাম করেছেন। ধরুন ওয়ার্ডসোয়ার্থ।"

প্রদীপ একটুখানি হাসিল, কহিল,—"যদিও তাঁর wordsএর কোনো worth নেই। ভাগ্যিস্ জন্মেছিলেন কাম্‌বারল্যাণ্ড-এ, ছবির মতো সবুজ গাঁয়ে—তাই প্রকৃতিকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারিটা তিনি কর্‌লেন। জন্মাতেন এসে সাহারায়, কিম্বা গ্রীষ্মকালের মধ্যভারতে, লু-তে লুণ্ঠিত হ'তেন, তবে বুঝ্‌তেন মজা। ঝড়ে যার নৌকো ডুবি হয় উমা, সে বর্ষা নিয়ে আর কবিতা লেখে না।"

উমা বলিল,—"আপনি এবার কল্‌কাতায় গিয়ে বেথুন-বোর্ডিঙে আমার জন্যে একটা সিট্ পাবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন?"

অরুণা হাসিয়া কহিলেন,—"এই হয়েছে। ওর মাথা এবার বিগ্‌ড়ালো।"

উমা চটিয়া কহিল,—"মাথা বিগ্‌ড়ালো কি? দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমার পড়াশুনোও চুলোয় যাক্, না? কল্‌কাতায় ত এবার লোক্যাল্ গার্ডিয়ান্ পেলাম, গিয়ে গিয়ে দেখা কর্‌বেন ত?"

প্রদীপ কহিল,—"সময় হয় ত' ক'রে নিতে পার্‌বো, কিন্তু কল্‌কাতা গিয়ে তোমারই সময়টা বৃথা অপচয় হ'বে। তার চেয়ে আর একটা বছর এখেনে এই শালবনের তীরে ব'সেই বইগুলোর সঙ্গে শুভদৃষ্টি কর্‌তে থাক—ম্যাট্রিক্‌টা তুমি তাতেই উৎরে যাবে। তারপর না হয় কলেজে গিয়ে কলি ফিরিয়ো।"

উমা কহিল,—"আমার বেলায় বুঝি শালবনের টনিক্ প্রেস্‌ক্রাইব্‌ড হ'ল! লক্ষটা শাল গজাক্, কিন্তু এখেনে একা ব'সে থাক্‌লে লক্ষ বছরেও আমার ম্যাট্রিক পাশ হ'বে না।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—"তাতে বরং ভালোই হ'বে—মাঝখান থেকে তোমার লক্ষ বছর বাঁচা হ'য়ে যাবে।"

অরুণা চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"একবার যখন গোঁ ধরেছে, সহজে ছাড়্‌বে ভেবেছ?"

"আমি এক্ষুনি বাবার মত নিয়ে আস্‌ছি।" বলিয়া উমা ছুটিয়া বাহির হইতেই প্রদীপ তাহাকে ডাকিয়া বাধা দিল; কহিল,—"কল্‌কাতায় মেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিংগুলোর কথা ত' আর জান না, তাই অমন খেপে উঠেছ। ওখানে মেয়েদের খেতে দেয় না, তা জান? বিকেল পাঁচটার সময় ভাত খাইয়ে সমস্ত রাত উপোস করিয়ে রাখে, ঝি-দের সুবিধে কর্‌তে গিয়ে ঝিয়ারিদের শুকিয়ে মারে। ও জুজু-মাসির বাড়ি যেতে নেই, উমা। খালি দেয়াল আর কাঠ,—একঘেয়ে কাঠিন্য, জুলুম। হাওয়া নেই, এই শালতরুমর্ম্মর সেখানে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে, আকাশের অর্থ সেখানে মহাশূন্য!"

উমা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: "এই ত এতক্ষণ কল্‌কাতার কালি আর কলের গুণকীর্ত্তন হচ্ছিল। সেখানে আকাশ নেই ব'লে ত আপ্‌শোষ করবার আপনার কারণ

ঘটেনি। আপনার মতো আমিও না হয় হাওয়ার বদলে ধোঁয়া খাবো।"

প্রদীপ কহিল,—"ধোঁয়া আমার সয়, কিন্তু বিকেল পাঁচটার সময় তোমাকে পেট পুরে' ভাত আর কপির ডাঁটা খেতে হ'লে সারা রাত তোমার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠ্‌বে। ছেলেদের যা সয়, মেয়েদেরো কি তাই সইবে ভেবেছো ?"

উমা এইবার রীতিমত চটিয়া উঠিল। "না সয় না! ছেলেরা সব হনুমান কি না সব থার্ড ডিভিশানে পাশ করে।"

"আর মেয়েরা করে ফেল্।"

"ইস্, নিয়ে আসুন-ত' ক্যালেণ্ডার।

"ক্যালেণ্ডারে বুঝি ফেল-এর সংখ্যা থাকে? তুমি ছেলেদের হনুমান বল্‌লে বটে, কিন্তু রামায়ণে হনুমানের মতো বীর আর কি আছে! সেতু বেঁধে দিলে কে?"

"তা আর জানি না। নিজের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে কে? হনুমানের কথা আর বল্‌বেন না। ও একটা প্রথম নম্বরের ইডিয়ট্। বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বতটাই নিয়ে এল।"

"ইডিয়ট্, কিন্তু কি প্রকাণ্ড বীর ভেবে দেখ। কোনো বানরনন্দিনীকে পাঠালে তিনি সমস্ত জীবন ধ'রে ঐ বিশল্যকরণী-ই খুঁজে বেড়াতেন, লক্ষ্মণ আর বাঁচ্‌তো না।"

উমা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল,—"নাই বা বাঁচতো! ঐ দ্বিতীয় ইডিয়ট্ লক্ষ্মণ—রাম ফল এনে ওর হাতে দিয়ে বল্‌তেন—ধর, আর ও এমন গর্দ্দভ যে সে ফল ধ'রেই থাকৃত, খেত না। এম্‌নি ক'রে চোদ্দ বছর লোকটা না খেয়ে বেঁচে রইল। যদি রাম বল্‌তেন: মুখে তোল, ও মুখে তুল্‌ত বটে, কিন্তু নিশ্চয় চিবোত না; যদি বল্‌তেন, চিবোও, ও কখনো গিল্‌ত না দেখো।"

প্রদীপ আর অরুণা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। উমা বলিয়া চলিল,—"আর ইডিয়ট্-শ্রেষ্ঠ রাম সামান্য ধোপা-নাপিত বন্ধ হ'বে ভেবে সোণার সীতাকে বনে পাঠালো—সেই সীতা, যে তাঁর জন্যে সারাজীবন সন্ন্যাসিনী হ'য়ে ছিল। আর যেম্‌নি ধোপার কাপড় কাচ্‌তে ও নাপিতরা দাড়ি চাঁচ্‌তে রাজি হ'ল অমনি আবার উনি সীতার জন্যে মাতামাতি সুরু ক'রে দিলেন। ধন্যি মেয়ে সীতা—ঐ মাতালটাকে ছেড়ে পাতালে গিয়ে মুখ ঢাক্‌লে।"

প্রদীপ আমোদ অনুভব করিয়া কহিল,—"তোমার এই সার্টিফিকেট্ নিয়ে বেচারা বাল্মীকি বাজারে আর তাঁর রামায়ণ কাটাতে পার্‌বেন না।"

"ছেলেদের কথা আর বল্‌বেন না, সব টুকে' পাশ করে।"

"টোক্‌বার মতো ট্যাক্‌ট্ মেয়েদের নেই ব'লে। একটা কথাতেই তফাৎ ধরা যাচ্ছে, উমা। তুমি ছেলে হ'লে এই একা-একা পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার ভয়ে এত ভড়্‌কাতে না।"

"কাজ নেই আমার হনুমান হ'য়ে।" বলিয়া উমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, "দাদা নেই, সমস্ত বাড়ি খাঁ খাঁ কর্‌ছে, বৌদি কাঁদ্‌তে গিয়ে বোবা হ'য়ে গেছে, মা দিবারাত্রি চোখের জল ফেলেন, বাবা পাগলের মতো পাইচারি ক'রে বেড়ান্,—আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। কল্‌কাতায় আমাদের কেউ আত্মীয় থাক্‌লে আপনার সঙ্গেই চ'লে যেতাম এবার। আমি যাবোই পড়্‌তে।"

উমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণা ডাকিলেন। উমা ফিরিল। অরুণা কহিলেন,—"বৌমা কোথায়?"

"স্নান কর্‌তে গেছে।"

"তোর প্রদীপদা আজ চ'লে যাচ্ছেন, ঠাকুরকে বল্ কিছু ভালো ক'রে রেঁধে দিতে। বৌমার ঘরে উনুন ধরিয়েছিস্?"

"এই যাই।" বলিয়া উমা দ্রুত পদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য আবহাওয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার গাঢ় মেঘ করিয়া আসিল। সেই মেঘান্ধকার নমিতার দুই নিঃসহায় চক্ষু হইতেই ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্যে নমিতার আবির্ভাব হইল না বটে, কিন্তু প্রদীপের মনোমুকুরে যাহার ছায়া পড়িল সে হয় ত ঠিক নমিতা নয়, একটি কল্পনাভরণা দুঃখৈশ্বর্য্যময়ীর ছবি। কবির কল্পনা উন্নত হইতে হইতে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া যে মহিমাময়ী নারী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ঠিক সেই মূর্ত্তি! তাহাকে নমিতা, বল, কিছু ক্ষতি হইবে না।"

৪

মেস্-এর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া প্রদীপ উপরে আসিয়া দেখিল তাহার নামে এক চিঠি আসিয়াছে। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়াই পত্র-লেখককে চিনিল এবং সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলিল না। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া শক্ত চিরুনি দিয়া নিজের রুক্ষ চুলগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ম্যানেজারের উপর রাগটা প্রশমিত করিতে লাগিল।

এই যুগে ভীষ্মকে হয় ত' প্রদীপ ক্ষমা করিত না, কিন্তু তাই বলিয়া পৈতৃক সম্পত্তি অটুট রাখিবার জন্য সুধী-র এই পিতৃভক্তিকেও স্বর্গারোহণের সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই। তাই সুধী-র বিবাহে সে ত যায়ই নাই, বরং তাহাদের দুইজনে যে উপন্যাসখানি লিখিতে সুরু করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিয়া সুধীকে লিখিয়াছিল—তোমার বর্ত্তমান মনোভাব নিয়ে তুমি উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। অতএব এই খাতাগুলি তুমি ফিরিয়ে নাও। যে টুকুন লেখা হয়েছে তাই একদিন তোমাদের অভ্যস্ত বিরস জীবনযাপনের ফাঁকে তোমার ভার্য্যাকে পড়িয়ে শুনিয়ো ও যথাসময়ে তোমাদের প্রথম শাবকের আবির্ভাবের পরে কালক্রমে যখন তার জন্যে মাতৃস্তন্য অকুলান্ হ'য়ে উঠবে তখন গো-দুগ্ধ তপ্ত করবার জন্যে এই খাতাগুলো ব্যবহার করো। ইতি—

তাহারই উত্তরে এই বুঝি সুধী-র চিঠি আসিল—সাত মাস বাদে। আশ্চর্য্য হইবার কারণ আছে বৈ কি। এবং আশ্চর্য্য হইবার কারণ ঘটিলে কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে বেশীক্ষণ চিরুনি চালানো অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ম্যানেজারের পিতৃকুলকে নরকে পাঠাইয়া প্রদীপ চিঠি খুলিয়া ফেলিল।

সুধী বেশী কিছু লিখে নাই; শুধু দু'টি কথা: যত শিগ্‌গির পার চলে' এস। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

সাত মাসে নদী শুকাইয়া যে চর জাগিতেছিল তাহা কখন এবং কি করিয়া যে অজস্র জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া দিয়া গেল তাহা সত্যই বুঝা গেল না। প্রদীপ তখুনি অহল্রে ছেঁড়া সুটকেসটা নিয়া ম্যানেজারের ভাতের থালায় লাথি মারিয়া ষ্টেশনের মুখে বাহির হইয়া গেল।

সুধীদের বাড়িতে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখনও বিকালের আলোটুকু আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। দুয়ারের কাছেই উমার সঙ্গে প্রথম দেখা। প্রদীপ সরাসরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সুধী কোথায়?" উমা ভড়্‌কাইয়া গিয়া কি বলিবে কিছু ভাবিতে না ভাবিতেই প্রদীপ প্রায় উমার গা ঘেঁসিয়া তাড়াতাড়ি যে ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিল তাহারই এক কোণে দরজার দিকে পিছন করিয়া সুধী তখনো টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া তন্ময় হইয়া বই পড়িতেছে। হঠাৎ প্রদীপ তাহার দ্রুত পদবিক্ষেপ গুলিকে সংযত করিয়া লইল। অতি ধীরে নিঃশব্দ পদে সুধী-র পিছনে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। অল্প একটু মুখ তুলিয়া সুধী কহিল,—"এই উঠছি নমিতা, এখনো ঢের আলো আছে। বেশ অন্ধকার করে' না এলে শালমর্ম্মরের সঙ্গে মানুষের প্রেমগুঞ্জনের সঙ্গতি হয় না। ছাড়, দেখি কেমন সেজে এলে।"

চক্ষু হইতে হাত দুইটা সরাইয়া সুধী-র কর্ণমূলে স্থাপন করিয়া প্রদীপ কহিল,—"এই তুই পাণিগ্রহণ করেছিস! মূর্খ! এখনো হাত চিনিস্ নি?"

সুধী চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে কহিল,—"তুই এই অসময়ে এসে পড়লি? কখন চিঠি পেয়েছিস্?"

"অসময়ে এসে পড়েছি বলে' এই গণ্ডারের চামড়ার হাতকে তুই এমন অসম্মান করবি? বিয়ে করে' তুই কাণা হ'য়ে গেলি নাকি?"

"দাঁড়া।" বলিয়া সুধী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল তাহাকে দেখিয়া প্রদীপ এতটা অভিভূত হইল যে মানুষের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে একাকী আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ প্রদীপ এমনি করিয়াই অভিভূত হইত হয় ত'। একদিন পুরী ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রের খোঁজে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল গাছ আর বৃক্ষান্তরালে আকাশের টুক্‌রো; সহসা এক সময় দেখিল সমস্ত গাছ সরিয়া গেছে, দৃষ্টিকে অপরিসীম মুক্তি দিবার জন্য আকাশ শূন্যে বিলীন হইয়া গেছে—সম্মুখ ফেনফণাময় মহাসমুদ্র! সেদিনো প্রদীপ এমনিই অভিভূত:

হইয়াছিল। বিকালবেলা স্বামীর সঙ্গে শালবীথিতলে কয়েকটী নিভৃত মুহূর্ত্ত যাপন করিবার জন্য নমিতা সাজিয়া আসিয়াছে,—সেই দেহসজ্জায় কীই বা ছিল আর! প্রদীপ রূপ দেখিল না, দেখিল বিভা—প্রতিভামণ্ডিত ললাটে ব্রীড়ার স্নিগ্ধতা, বুদ্ধিবিকশিত চোখে কুণ্ঠ'র মাধুর্য্য! নমিতা যেন শরীরী আত্মা, যেন শেলির মূর্ত্তিমতী কবিস্বপ্ন! প্রদীপ এমন পাগল যে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইবে না বলিয়া নীচু হইয়া নমিতার পা স্পর্শ করিয়া বসিল।

সুধী বলিল,—"তুই যে দেবর লক্ষ্মণের মতো মুখ ছেড়ে পা-কেই বেশী মর্য্যাদা দিচ্ছিস্?"

নমিতা লজ্জায় চক্ষু নামাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর, এমন একটা মুহূর্ত্তে কেহ এমন একটা বাজে রসিকতা করিতে পারে ভাবিয়া প্রদীপের আর নিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হইল না।

সুধী নমিতাকে কহিল,—"তুমি নিশ্চয়ই এ কে বুঝতে পেরেছ। আমাদের উপন্যাসের নায়কের মাথাটাকে যে ভাগ্যের পায়ের ফুটবল বানিয়েছে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখ। ঘরে অতিথি এসেছেন, আর্য্য পুত্রের কুশল প্রশ্ন কর। তুমি সীতা-সাবিত্রীর মাসতুতো বোন হ'য়ে অমন ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ঘাড় গুঁজে থাক্‌লে চলবে কেন?"

প্রদীপ কহিল,—"একলা তোমার সম্বর্দ্ধনাই যথেষ্ট হয়েছে। বৌদির নীরব সহানুভূতিটির মূল্য তার চেয়ে কম নয়।"

সুধী। (নমিতার প্রতি) মুখেও তা বলছে বটে কিন্তু অমন শ্রী মুখের কথা না শুনে ওর পেট নিশ্চয়ই ভরবে না। তুমি যদি আজ আকাশের তারাগুলোর যোগাযোগে প্রদীপের দীপধারিণী হ'তে তা হ'লে আমি তোমার ঐ বোবা মুখের ওপর অত্যাচার ক'রে কথা ফোটাতাম।

নমিতা সুধী-র কনুইয়ে চিম্‌টি কাটিয়া দিল।

সুধী। এ চিম্‌টি তুমি প্রদীপকেও উপহার দিলে বেমানান্ হ'ত না। কেননা সাত মাস আগে তোমার উপর ওর দাবি আমারই সমান ছিল। তোমার গায়ের গয়না যথেষ্ট নয় দেখে আমি যদি বিয়ে-সভা থেকে সরোষে গাত্রোত্থান করতাম আর প্রদীপ যদি সেই পরিত্যক্ত পিঁড়িতে এসে বসত তা হ'লে তোমার আজকের এই রমণীয় কুণ্ঠাটি আমারই একান্ত উপভোগ্য হ'ত। ও তোমাকে প্রণাম করুক আর তুমি ওকে সামান্য একটু চিম্‌টি কাটবে না?

নমিতার পক্ষে ইহা দাঁড়াইয়া সহ্য করা অস্বাভাবিক রূপে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্বল্প একটু 'যাও' বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইলে প্রদীপ বলিল,—"এ তোমার বাড়াবাড়ি সুধী!"

সুধী। বাড়াবাড়ি মানে? নমিতাকে পাবার জন্যে কী মূল্য দিয়েছি? সমাজকে মেনে নিয়ে ওর দেহের ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব করছি বটে, কিন্তু ওর মনকে আমারই মুঠির মধ্যে চেপে ধ'রে মলিন ক'রে দেব আমি সে বর্ব্বরতা সহ্য করতে পারবো না। ওর লজ্জা তোমাকে জোর ক'রে ভেঙে দিতে হ'বে।

প্রদীপ। ওর লজ্জা ভাঙ্‌তে গিয়ে তোমারো মন যদি ভেঙে যায়?

সুধী। (দৃপ্ত স্বরে) ভাঙুক। এই ঠুন্‌কো মন নিয়ে আমি বাঁচ্‌তে চাইনে।

প্রদীপ। তোকে পাগ্‌লা কুকুরে কামড়ালো কবে? শিলঙ্ যা।

সুধী। ঠাট্টা নয়; নমিতাকে আমার ভালো লাগে নি, লাগ্‌বেও না।

প্রদীপ। বলিস্ কি? এমন সুন্দর মেয়েটি—(থামিয়া গেল)

সুধী। হাঁ জানি, কিন্তু পরখ ক'রে দেখ্‌লাম নারী-মাংস আমার রুচ্‌বে না। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করবার মত আমার মনের সেই প্রশান্তি বা প্রশস্ততা কিছুই নেই। আমি জীবনে যে ভুল ক'রে বসেছি তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তোর সাহায্যের দরকার হয়েছে।

প্রদীপ। যথা?

সুধী। নমিতাকে জাগিয়ে দিতে হ'বে। ও আমাকে ভয় বা ভক্তি করতে পারবে বটে, কিন্তু ভালোবাস্‌তে পারবে না; কারণ আমাকে কোনো দিন হারাবে ব'লে ওর মনে না থাকবে সন্দেহ না বা আশঙ্কা। ও জল হ'য়ে চিরকাল আমার গ্লাশের রঙ ধ'রে থাকবে। তার মধ্যে স্থিরতা থাক্‌তে পারে কিন্তু প্রাণ নেই। যার প্রাণ নেই সে কুৎসিত।

। অন্ধকারে ঘরে ব'সে থেকে সব ঝাপসা দেখছিস্। চল্ বেরোই।

সুধী। বাইরেও অন্ধকার বটে, কিন্তু মুক্তি আছে, বিস্তৃতি আছে। নমিতাকে তোর মানুষ ক'রে দিতে হ'বে; ওর আত্মার অবগুণ্ঠন যদি ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারিস্ ভাই, তবেই হ'বে ওর resurrection!

প্রদীপ। তুই তা হ'লে কি কর্‌তে আছিস্ গর্দ্দভ?

সুধী। ওর শরীরের ওপর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। তোর সঙ্গে নমিতার সম্পর্কেই একটা বন্ধনহীন ক্ষেত্র আছে, তোর কাছে ও নবীন, মধুর রূপে অনাত্মীয়,—সেইখানেই তোদের পরিচয় যটুকু তোর মাঝে নমিতাকে আমি পুনরাবিষ্কার করতে চাই।

প্রদীপ। এই সাত মাসেই এত সব সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল?

সুধী। রমণীর মন লক্ষ বর্ষ ধ'রেও আয়ত্ত করা যায় না উনবিংশ শতাব্দীর এই সেন্টিমেণ্টাল্ উক্তি আমি বিশ্বাস করি না। তাতে শুধু আয়ুরই বৃথা অপচয় ঘটে। আমার হাতে অত সময় নেই।

প্রদীপ। (হাসিয়া) আর আমারই আছে? এর জন্যে তুই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস্? ভেবেছিলাম কারু অসুখ হ'ল বুঝি। আমাকে তোর ভীষণ দরকারের এই যদি নমুনা হয়, দে, সুট্‌কেশটা এগিয়ে দে, চল্‌লাম ফিরে'। ফরমাসে কবিতা এলেও বন্ধুতা আসে না।

এই সময় বেড়াইতে যাইবার পোষাকে অবনীনাথ সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন, সুধী আগাইয়া আসিয়া কহিল,—"এ আমার বন্ধু, প্রদীপেন্দ্র বসু ভারতের ভাবী 'ডেলিভারার্'।"

অবনীনাথ বিস্মিত হইবার আগেই প্রদীপ বলিল,—"তার মানে?"

সুধী। (অবনীনাথের প্রতি) ইনি এক চড় মেরে এক কনষ্টেবল্‌কে শুইয়ে দিয়েছিলেন!

অবনীনাথ। তাই নাকি? দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা ধর ত'। (শিশুর মত সরল বিশ্বাসে হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন)

প্রদীপ। (সঙ্কুচিত হইয়া) কনেষ্টবল্ মেরে আমি যদি ভারতের কনিষ্ঠ ডেলিভারার্ হই তা হ'লে দু' পাতা গল্প লিখে সুধী নিশ্চয়ই ভলটেয়ার্ হয়েছে।

প্রসন্ন হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অবনীনাথ কহিলেন,—"কয়েক দিন আছ ত'?"

প্রদীপের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া সুধী বলিল,—"নিশ্চয়ই।"

তাহার পর বন্ধুকে লইয়া সুধী একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া হাজির,—সেখানে তাহার মা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। সুধী হাঁকিল,—"তোমার জন্যে আরেকটি ছেলে কুড়িয়ে আন্‌লাম, মা। আরেকটি বাতি জ্বল্‌লো।"

প্রদীপ প্রণাম করিতেই অরুণা কহিলেন,—"তোমার কথা অনেক শুনেছি আগে,—সুধী-র সঙ্গে তোমার অনেক দিনের চেনা; অথচ আগে দেখিনি। ওর বিয়ের সময় ত' রাগ ক'রেই এলে না।"

প্রদীপ অল্প একটু হাসিল, কহিল,—"সুধী-ও বিয়ে ক'রে বয়ে যাবে এ-আঘাতের জন্যে তৈরি ছিলাম না। নিয়তিকে আমরা খণ্ডিত করব এই ছিল আমাদের পণ। দেখলাম পণের টাকা মিল্‌লে নিয়তি যথারীতি কাঁধে চড়াও হয়।"

অরুণা। (হাসিয়া) তুমি বিয়ে করছ কবে?

সুধী। ওর বিয়ে ত' হ'য়ে গেছে।

অরুণা। কবে?

সুধী। পুলিশের লাঠির সঙ্গে; জেলে ওর ফুলশয্যা পাতা। বলিয়া সুধী নমিতার খোঁজে তাহার শুইবার ঘরে আসিয়া উঠিল। দেখিল নমিতা তাহার বেড়াইবার দামী কাপড় চোপড়গুলি ছাড়িয়া সাদাসিধা একখানি আটপৌরে শাড়ি পরিয়াছে। সুধী কহিল,—"হঠাৎ এ বেশ? আমার বন্ধুকে দেখে এক নিমেষেই তপস্বিনী সেজে গেলে নাকি?"

নমিতা। বন্ধু এসেছেন; এখন বেড়াতে যাবে কি? যাও!

সুধী। বাঃ, বন্ধু এসেছে ব'লেই মাঠে যাওয়া বন্ধ করে' আমাকে এমন সন্ধ্যাটা মাঠে মারতে হবে নাকি? দাঁড়াও, ডাকি প্রদীপকে।

নমিতা। (বাধা দিয়া) দরকার নেই আজ গিয়ে। আমি যাবো না ককখনো।

সুধী। কেন? আমার বন্ধুকে তোমার কিসের ভয়? তোমাকে ভয় দেখাতে ও বন্দুক নিয়ে আসেনি, যদিও তোমাকে জয় করতে দুই চক্ষুর দৃষ্টিই ওর যথেষ্ট।

নমিতা মনে মনে স্বামীর উপর নিদারুণ চটিতেছে এমন সময় সুধী-র ডাকাডাকিতে প্রদীপ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধী। (নমিতাকে দেখাইয়া) দেখলে?

প্রদীপ। বেশ ত, নিরাভরণেই শ্রী। তারা ফোট্‌বার আগেকার স্নিগ্ধ গোধূলি-আকাশটুকুর মতই তোমাকে দেখাচ্ছে, বৌদি

সুধী। এই যাঃ, মাটি করে' দিলে!

প্রদীপ। তার মানে?

সুধী। ঐ 'বৌদি'-কথাটা এসে এমন সুন্দর উপমা-টাকে একেবারে বধ কর্‌লো। কর্ণ, বধির হও! (নমিতাকে) তুমিও যদি এবার কৃপা করে' ওকে ঠাকুরপো বলে' ডাক তবেই কলির পাপ চারপোয়া পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

হাসিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারান্তরালে তাহার যখন পুনরাবির্ভাব হইল, দেখা গেল উমার ঘর হইতে সে আরেকখানা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। না সাজিলে তাহার লজ্জা যেন ঘুচিবে না। আড়ষ্ট হইতে না পারিলে তাহার এই অপরিচয়ের দৈন্য তাহাকে কেবলই পীড়া দিতে থাকিবে। ভাবের অভাব ঘটিলেই ভাষায় বর্ণবাহুল্যের প্রয়োজন ঘটে—নমিতা সেই ভাববিরহিত অলঙ্কৃত ভাষা, মূক নিরর্থক!

উঠানটুকু পার হইবার সময় অরুণা বলিলেন,—"ওকে এক্ষুনি বেড়াতে নিয়ে যাবি কি? এসে একটুও বিশ্রাম কর্‌ল না।"

সুধী। শালের বনে বসেই বিশ্রাম করা হ'বে 'খন।

অরুণা। বাঃ, একটু জলখাবার খেয়ে যাক্।

সুধী। তুমি ততক্ষণ তৈরি করতে থাক,—তার চেয়ে হাওয়াই বেশী উপকারী হ'বে। তুমি বরং উমাকে ডেকে নাও, বৌ-র সাহায্য আজ পাচ্ছ না। বলিয়া সুধী হাঁক ছাড়িল,—"উমি! উমি!"

উমা তবুও লুকাইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আমি, চাঁপার মালা পরব না,
তোমার ফুলের গন্ধ মধুর গরব আমি করব না—
ফুল ফুটেছে সেইত ভালো,
খোঁপায় কেন পরব বলো?
ফুল দিয়ে যে কুল মজাবে সইতে আমি পারব না—।

তোমায় কে বলেছে গাঁথতে মালা আজকে সাঁঝে?
ছেঁড়া মালার অশেষ জ্বালা সইবে না যে!
আমার বিউনীতে ফুল শুকিয়ে যাবে,
সে হার আমি মানব না।

ফোটো'গ্র্যাফি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[পি, গোস্বামী, এম-এ]

ফ্রান্সের নিস্‌পে এবং দাগুয়েরের আর একটু উন্নত ধরণের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি রৌপ্য চূর্ণ মাখানো প্লেটে আইওডিনের ধোঁয়া লাগাইয়া উপরের স্তরটিকে সিলভার আইওডাইডে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। এইরূপ প্লেটে একস্‌পোজার বেশী দিতে হইত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে লইয়া ইহার উপরে বাষ্পীকৃত পারদের ভাপ লাগাইলে চমৎকার পজিটিভ্‌ ছবি ফুটিয়া উঠিত।

সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া এই ছবি খুব মনোরম হইল, কিন্তু যাঁহার ছবি লওয়া হইবে তাঁহার পক্ষে ব্যাপারটা খুব আরামপ্রদ হয় নাই। দশ পনর মিনিট একচুল না নড়িয়া নির্নিমেষ ক্যামেরার দিকে চাহিয়া থাকা সুখসাধ্য নয়। সখের জিনিষের ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট হইতে যন্ত্রণা পাইতে থাকে তবে শুধু ক্রেতার নয়, ব্যবসার পক্ষেও ব্যাপারটা প্রাণান্তকর হইয়া পড়ে। যাহা হউক দুঃখ এড়াইবার জন্য পরীক্ষা চলিতে লাগিল, এবং প্লেটকে বেশী সেন্‌সিটিভ্‌ করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল।

প্লেটে আলো লাগার দরুণ তৎক্ষণাৎ তথায় একটি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, এই জন্যই ইহাকে সেন্‌সিটিভ্‌ বলা হইয়াছে। সেন্‌সিটিভের অর্থ, অল্পেই যে সাড়া দেয়। মৃদু আঘাতে অথবা মৃদু স্পর্শে কোন বস্তু যদি তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত হয়, অথবা অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাকে যে স্পর্শ করা হইয়াছে তাহা জানাইয়া দেয়, তবে তাহাকে সেন্‌সিটিভ্‌ বলা যাইতে পারে। এক এক জন লোককে সামান্য ভর্ৎসনা করিলেও মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদে অথবা চটিয়া গিয়া চীৎকার করে। আবার এমন লোকও আছে যাহাকে প্রহার দিলেও নির্ব্বিকার থাকে। প্রথমোক্ত লোক সেন্‌সিটিভ্‌। এইরূপ লোককে অভিমানী বলা চলে। লজ্জাবতী লতাও সেন্‌সিটিভ্‌। তাহাকে স্পর্শ করিবা মাত্র, এমন কি তাহার কাছে শব্দ করিলেও তাহার পাতাগুলি যেন লজ্জায় নত হইয়া পড়ে।

যাহা হউক প্রথম অবস্থায় আলো-সেন্‌সিটিভ্‌ প্লেট-গুলিকে এরূপ বেশী সেন্‌সিটিভ্‌ করা যায় নাই যাহা দ্বার' চকিতের মধ্যে মোটামুটি কাজ চলাব মত ফোটো উঠিতে পারে। প্লেটে অল্প সময়ের মধ্যে আলোর ক্রিয়া দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইল বটে কিন্তু এমন কোন জিনিস বাহির করা গেল না যাহা দ্বারা ঐ অদৃশ্য আলোর ক্রিয়াকে দৃশ্য ছবিতে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই লেন্সের মুখ খুলিয়া রাখিয়া যতক্ষণ না প্লেটে প্রতিবিম্বটি কালো হইয়া যাইত ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত। ইহাতে সময় এত বেশি লাগিত যে স্থাবর পদার্থ ছাড়া কোন প্রাণীর ফোটো তোলা কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু য়ুরোপের কোষ্ঠিতে কোন কিছুর মাঝখানে থামিয়া গিয়া "দুত্তোর" বলিয়া তাস পাশা খেলিতে বসিয়া যাইবার ব্যবস্থা নাই। কাজেই পন্থা আবিষ্কার হইল।

ছবির জন্য কেবল মাত্র আলোর উপর নির্ভর না করিয়া চকিত আলোর অদৃশ্য এবং অস্পষ্ট ছাপকে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রিয়ার দ্বারা স্ফুটতর করিবার ব্যবস্থা হইল। ইহাতে ফললাভও সন্তোষজনক হইল। এবং এই উপায়ে ছবি ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা হওয়াতেই এখন কল্পনাতীত অল্প সময়ের মধ্যে ছবি গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে।

১৮৪১ সালে ট্যালবট এই উপায়ে ফোটো প্রস্তুত করেন। সিল্‌ভার আইওডাইড মাখানো কাগজ ক্যামেরার মধ্যে বসাইয়া তাহাতে প্রথমে যে ছবি উঠিল তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু সেই কাগজে সিলভার নাইট্রেট এবং গ্যালিক অ্যাসিড্‌ মিশানো জলে ধৌত করিবার পর সেই আব্‌ছায়া ছবির উপর রৌপ্যের একটি স্তর পড়িয়া গিয়া অস্পষ্ট ছবি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই প্রক্রিয়ার নাম হইল 'ডেভেলপ' করা।

ডেভেলপ করা মানে বাড়াইয়া দেওয়া, অস্পষ্ট ছবির স্পষ্টতা বাড়াইয়া দেওয়া। কিন্তু বর্ত্তমানে ফোটো তুলিতে

প্লেটে আলোর কাজ যতটুকু হয় তাহাতে সমস্ত ছবিটিই সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। সুতরাং এখন ডেভেলপ করা মানে অদৃশ্য ছবিকে দৃশ্য করা—অস্ফুট ছবিকে ফুটাইয়া তোলা।

ট্যালবটই প্রথম নেগেটিভ্ এবং তাহা হইতে কাগজে পজিটিভ্ ছবি ছাপিবার কৌশল আবিষ্কার করেন। কিন্তু নেগেটিভ্ স্বচ্ছ পদার্থে প্রস্তুত না হইলে তাহা হইতে কাগজে ছবি মুদ্রিত করা সম্ভব নহে। ট্যালবটের নেগেটিভ্ কাগজেরই হইল, কিন্তু তিনি সেই কাগজ মোমের সাহায্যে কাজ চলার উপযোগী স্বচ্ছ করিয়া লইলেন। এই সূত্রে নেগেটিভের কিছু পরিচয় দেওয়া যাউক। নেগেটিভ্ মানে অস্বীকার; যাহা হওয়া উচিত তাহার বিপরীত হওয়া। বিদ্যাতের সংশ্রবে নেগেটিভ্ ও পজিটিভের বাংলা নাম দেওয়া হইয়াছে, বিয়োগ ও যোগ, কেহ বলিয়াছেন স্ত্রী ও পুং। ফোটো চিত্রে যাহাকে নেগেটিভ্ ও পজিটিভ্ বলে তাহাকে বিয়োগ-চিত্র কিংবা স্ত্রীচিত্র এবং যোগ-চিত্র কিংবা পুংচিত্র বলা চলিবে না—কেননা ইহা বিদ্যুতের নেগেটিভ্ পজিটিভের সঙ্গে সমশ্রেণীভুক্ত নহে। বিদ্যুৎ একটা অদৃশ্য শক্তি আর ফোটো চিত্র একটা দৃশ্য বস্তু।

পজিটিভ্ ছবিতে আমরা আসলে যা চাই, নেগেটিভে পাই ঠিক তাহার উল্টা জিনিসটি। যেখানে শাদা চাই, নেগেটিভে তাহা কালো দেখি, এবং যেখানে কালো চাই—সে জায়গা শাদা দেখি। কৃষ্ণকেশ যুবকের নেগেটিভ্ চিত্র দেখিলে অনভিজ্ঞ লোক হঠাৎ মনে করিবে ইহা একটি বৃদ্ধের ছবি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটি কাহিনী বলি। একদিন একজন মহিলা ফোটো তুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, কি হইল দেখব। তাঁহাকে বলা হইল এখন যাহা উঠিয়াছে তাহাতে ভাল বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু শেষ অবধি তাঁহাকে প্লেট ডেভেলপ করিয়া দেখাইতেই হইল। দেখিয়া খুব ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মনের ভাব যথা সম্ভব চাপিয়া গিয়াও বলিয়া ফেলিলেন—ওমা, এ যে চুল সব পাকা আর চেহারা ভূতের মত হইয়াছে। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা গেল—ইহার নাম নেগেটিভ্—ইহাতে সবই বিপরীত দেখায়, জীবন্ত মানুষকে ভূতের মত দেখায়—এবং ভূতের ফোটো তুলিবার ব্যবস্থা থাকিলে দেখাইতে পারিতাম যে তাহা ঠিক মানুষের মত দেখায়।

ইহাই নেগেটিভের ধর্ম্ম। কিন্তু কোন মানুষের নেগেটিভ-ছবিতে, শাদা এবং কালো জায়গাগুলি নিখুঁৎ শাদা এবং নিখুঁৎ কালো হইতে পারে না। কেননা মানুষ সমতল ক্ষেত্রের মত নহে—এবং তাহার দেহ একটি মাত্র বর্ণ দ্বারা কাগজের ছবির মত আঁকা নহে। দেহের যে কোন অংশ লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে সেখানে বর্ণের গভীরতার কত তারতম্য রহিয়াছে। বর্ণের বিভিন্নতাও কত। দেহের কোথাও সরল রেখা নাই। কেবলি উঁচু নীচু বাঁকাচোরা রেখা—তাহার পদে পদে বাঁক, পদে পদে টোল, ইহার উপর আলো আসিয়া পড়িলে মোটের উপর এমন একটা বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠে যাহা চোখকেও এড়ায় না—ফোটো-প্লেটকেও এড়ায় না। নেগেটিভে সমস্ত বৈচিত্র্যই প্রতিফলিত হয়, সেইজন্য নিখুঁৎ কালো এবং নিখুঁৎ শাদার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বর্ণের তথ্যই ইহাতে ফুটিয়া উঠে। ইহাকে ইংরেজিতে 'গ্রেডেশান' বলে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করা যাইবে।

ট্যালবটের কাগজের নেগেটিভ্ আবিষ্কারের পর কাঁচের নেগেটিভের প্রচলন হয়। কলডিয়ন নামক একটি আঠার মত পদার্থের সহিত সেন্সিটিভ্ মশলা মিশাইয়া কাঁচে মাখানো হইল। এইরূপ প্লেটে ভিজা অবস্থাতেই ফোটো তুলিতে হইত বলিয়া ইহার নাম হইল 'ওয়েট্ কলডিয়ন প্রসেস্'। ইহার এবং অ্যালকহলের মিশ্রণে নাইট্রেটেড্ কটন গলাইয়া কলডিয়ন প্রস্তুত হয়। একখানা কাঁচ পরিষ্কার করিয়া প্রথমত মশলা মিশ্রিত কলডিয়ন সেই কাঁচের পৃষ্ঠে মাখাইয়া লইয়া পরে সিলভার নাইট্রেট সলুশানে উহা ডুবাইয়া দিলে সেই মশলা সিলভার আইওডাইডে পরিণত হয়, এবং এই অবস্থায় ঐ প্লেট আলোর ক্রিয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাড়া দিতে পারে। এইরূপ প্লেট ভিজা অবস্থাতেই ক্যামেরায় বসাইয়া ফোটো তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ এবং ফিক্স করিতে হয়। এখন ভিজা প্লেটের পরিবর্ত্তে শুষ্ক প্লেটের প্রচলন হইয়াছে এবং ইহাতে কাজের সুবিধা অনেক বেশি হইয়াছে। কেন না সেকালের ফোটো চিত্রকরগণ বাহিরে ছবি তুলিতে গেলে একটা তাঁবু, প্লেট তৈরার মশলা এবং ডেভেলপিং, ফিক্সিং-এর সমস্ত সরঞ্জাম ক্যামেরার সঙ্গে ঘাড়ে করিয়া বহন করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ম্যাডক্স্ কলডিয়নের পরিবর্ত্তে প্রথম জিলেটিন ইমালশান ব্যবহার করিয়া এই দুঃসহ বোঝা ফোটো-চিত্রকরের ঘাড় হইতে নামাইয়া দিয়াছেন।

জিলেটিনও একপ্রকার আঠা। ইহা গরম জলে গুলিয়া লইয়া সিলভার ক্লোরাইড্ কিংবা সিল্ভার ব্রোমাইড্ ইহার সঙ্গে মিশাইতে হয়। এই যৌগিক পদার্থগুলি জিলেটিনে গলিয়া যায় না বলিয়া খুব মর্দ্দন করিয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে ঐ মশলার কণাগুলি জিলেটিনের সমস্ত অংশে সমভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বত্রই ইহারা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। এইরূপ মিশ্রণের নাম ইমালশান। এখন যে সব শুষ্ক প্লেট ফিল্ম এবং কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহা এই সেন্সিটিভ্ ইমালশানে প্রস্তুত। পূর্ব্বে ফোটো চিত্রকরগণ তৈরী ইমালশান্ কিনিয়া নিজে প্লেট প্রস্তুত করিয়া লইতেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহারা এই ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে নিজেদের মুক্তি দিবার জন্য প্লেট তৈরীর ভার কারখানা-ঘরের ছাড়িয়া দিয়াছেন।

———

(ক্রমশঃ)

দীওয়ান-এ-হাফেজ

(দীওয়ানের সর্ব্ব প্রথম কবিতা)

[কাদের নওয়াজ]

"আলায়া আইওহাস সাকী আদের কাসান্ ও নাভিল্ হা"

(১)

দাও সাকী দাও আঙুর সুরা ঘুরিয়ে তোমার লাল পেয়ালা
প্রেম যে প্রথম বড়ই মধুর কিন্তু শেষে বিষের জ্বালা,
জ্ঞান-চেতনা-হরণকারী সুরার তড়িৎ শক্তি বিনা—
শেষ রাখা যে শক্ত বেজায় বেশ জানে তা আঙুর বালা।
প্রিয়ার কালো অলক হ'তে কস্তূরী বাস ছড়িয়ে দিয়ে
স্নিগ্ধ শীতল পেলব পরশ ভোরের হাওয়া বয় নিরালা,
কুঞ্চিত তার চিকুর-জালের দেখতে পেয়ে অতুল শোভা,
মুগ্ধ হ'য়ে সবার হৃদয় ছুট্‌ছে লয়ে বরণডালা।
সত্যি প্রিয়ে, তোর কথাতে মস্‌জিদের ঐ পুণ্য ঠাঁয়ে
শারাব ঢালি নিত্য উজাড় ক'রতে পারি মদের জালা,
চিনেছে যে বাঞ্ছিত ঠাঁই, ভুলবে না সে ভ্রমেও কভু
চল্‌বে সে পথ তড়িৎ বেগে খুঁজবে নাক পান্থশালা।
শান্তি ত' নাই তিলেক প্রাণে বক্ষে পেয়েও প্রিয়ায় মম
বাজছে শুধুই বিদায়ভেরী ভাবছি কখন যাবার পালা,
তরঙ্গিত সাগর মাঝে প'ড়েছি হায় ঘূর্ণীপাকে
বুঝবিনে তুই ডাঙ্গায় বসি' মোর এ দারুণ মর্ম্মজ্বালা।
নিন্দাতে মোর ভর্‌ল ভুবন রইল না আর গোপন কিছুই
জগৎ-সভায় হচ্ছে এখন মোর সুনামে গরল ঢালা,
শোন্ রে হাফেজ, তোর প্রেয়সীর চাস্ যদি তুই সঙ্গসুধা
বিশ্ব ভুবন সব ভুলি আজ তার নামে ধর্ জপের মালা।

(২)

নই গো আমি তেমন প্রেমিক সত্যি জেনো 'মোহতাসেব'[১]
ছাড়ব নাক' তোমার ভয়ে লাল সিরাজী আর সাকী,
বইছে যখন ভোরের হাওয়া ভাবছ তখন মিয়া সাহেব
তোমার আদালতের পানে রইবে চেয়ে মোর আঁখি।

(৩)

শাসন তোমায় মান্‌বে এখন এমন বোকা নয় হাফেজ
ফুটছে যখন পাতার ফাঁকে গুল্‌বালারা ফুলবনে,
কোথায় সাকি পার্শ্বে থাকি দাও আঙুরের লাল আমেজ
পান করি আর বদ্ধ থাকি' প্রিয়ার বাহু বন্ধনে।

(১) মোহতাসেব—ইস্‌লামী শাসনকর্ত্তা

(৪)

ফুটছে 'লালা'[২] ওষ্ঠে ধরি লাল পেয়ালা উল্লাসে
দুলছে দোদুল মাতাল হ'য়ে 'নার্গিস্'[৩] ফুল ঐ গাছে,
দোষ শুধু হয় আমার বেলায় ওদের নাহি কেউ শাসে
হায় খোদা এর বিচার লাগি' জানাই আমি কার কাছে?

(৫)

প্রেম-মুকুতার তল্লাসে এই মদ-সাগরে আজ আমি
ডুব দিয়েছি এখন কি হায় উঠতে পারি আর ভাসি?
হীন জগতের কৃপার কণার এই ভিখারী নয় কামী
থাকনা কেন অঙ্গ ভরা দরিদ্রতার 'ধূল্' রাশি।

(৬)

কবিত্বেরি রাজ্যে আমায় দিলেন বিধি বাদ্শাহী
সেথায় একচ্ছত্র আমি নাই দীনতার একটু লেশ,
মোর আকাশে হুর পরীরা হীরার তরী যায় বাহি'
দয়ার লাগি বিশ্বে কেন ক'রব আমি আর্জ্জি পেশ?

(৭)

সত্যি প্রিয়ে, আমায় যদি আপন হাতে চাও এবার
পুড়িয়ে দিতে অনল মাঝে, দেখবে তবে যন্ত্রণায়,
'কওসরে'রি[৪] ঝর্ণা পানে ফিরেও কভু একটি বার
চাইব নাক সইব হেসে তোমার দেওয়া সব ব্যথায়।

(৮)

জানি আমি এই দুনিয়ায় প্রেমের কোনই মূল্য নাই
প্রেম মাগি তাই তোমার এবং লাল পেয়ালার সকাল সাঁঝ,
যাচ্ছ প্রিয়ে একটু থাম যদিই দেখা আর না পাই
অশ্রুজলের মুক্তা আমি ছড়িয়ে দিব পথের মাঝ।

(৯)

দিব্য দিয়ে ব'ল্লে তখন আসবে প্রিয়ে কাল রাতে
প্রত্যয় নাই ও সব কথায় শিখেছি হায় ঢের ঠেকে,
বসন্তে আজ ফুলের রাণী রঙীন আঁচল ঐ পাতে
এমন দিনে কোন্ সে বেকুব ধর্ম্মকথা কয় ডেকে?

(১০)

ধার্ম্মিকেরি পোষাকে আজ আগুন-শিখা ধরিয়ে দে
চাইনে স্বরগ ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানের সুখ ত্যজি',
কোথায় হাফেজ লাল শারাবে পান-পেয়ালা ভরিয়ে নে
দিবস যামী হর্ষে সুরা সুন্দরীরে চল্ ভজি।

---

(২) লালা—এক প্রকারের লাল ফুল, সুরার পেয়ালার মত আকৃতি (৩) নার্গিস—সুন্দরীর চোখের ন্যায় মাদকতা পূর্ণ এক প্রকার ফুল। (৪) কওসর—স্বর্গের ঝর্ণা।

ভোলানাথের জীবনী

[শ্রীপরিমল গোস্বামী]

হিসেব ক'রে দেখলুম, কালিদাস, ভবভূতি থেকে শেলী, কীটস্, বাইরন, ব্রাউনিং প্রমুখ মহাকবিগণ আমাকে মাসে দুটাকা ক'রে দিচ্ছেন।

ইস্কুলে অঙ্ক শাস্ত্র যেটুকু শিখেছিলুম, তারি সাহায্যে আপিসের কাজ করি। কিন্তু আজ যে আমি তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণী, তা যাদব চক্রবর্ত্তীর গুণে নয়, কাব্য দর্শন ইত্যাদি পড়ে বি-এ পাশ করেছিলুম ব'লেই টাকা আনা পাইয়ের হিসেব রাখবার গুরু দায়িত্ব পূর্ণ চাকরিটি পেয়েচি। কাজেই যাদব চক্রবর্ত্তীর ওপর যতই কৃতজ্ঞতা থাক, মহাকবিদের আন্তরিক ভাবে ভক্তি করি।

অবসর সময় আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চিত্ত-বিনোদন করব, এমন একটা দুরাশা ছিল, কিন্তু দেখা গেল, ছ'ঘণ্টা আপিসের কাজে যেটুকু খাটুনি হয়, এক ঘণ্টার কাব্য-রচনায় তার চেয়ে পরিশ্রম বেশী। অতএব এতে ক'রে চিত্ত-বিনোদন না হ'য়ে চিত্তবিক্ষোভ ঘটতে লাগল। কিন্তু লেখার নেশা বড় মারাত্মক।

গত দু'বছর ধ'রে তিনখানা সংবাদ পত্রের নিজস্ব সংবাদ-দাতার পদে নিযুক্ত আছি এবং আমার দেওয়া সংবাদ পড়ে কোনদিন কেউ বিস্মিত হন নি এমন কথা সত্যধর্ম্ম বজায় রেখে কেউ বলতে পারবেন কি না জানি না।

আমি যে শ্রীমহিমচন্দ্র হালদার তা ছোট ছেলেরাও জানে এবং পথে বেরুলে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

বন্ধুদের কাছেও নিস্তার নেই। কারো সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হ'লে বলেন, ইনিই বিখ্যাত সাহিত্যিক ইত্যাদি—। কিন্তু আমার লজ্জা পাবার পথও বন্ধ। লজ্জিত হ'লে তাঁরা মনে করেন ওটা আমার বিনয়, প্রতিবাদ করলে বান্ধবেরা লজ্জিত হন।

যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁদের কাছে সঙ্কোচ করি না, কিন্তু যাঁরা আমাকে কিছু না জেনেও বেশী জানবার গৌরব করেন, তাঁদের কাছে বিপদ বেশী।

অল্পদিন আগে এই ধরণের একটি বিপদকে বিনা চেষ্টায় ডেকে এনে দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হয়েচে—মনে করেচি চাকরির ফাঁকে সংবাদ-দাতার কাজ আর না ক'রে বরঞ্চ তাস পাশা খেলে সময় কাটাব।

ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু কপালক্রমে আমার পক্ষে সেটা অসামান্য হ'য়ে উঠেচে। কাল আপিসের টিফিনের সময় আমার এক কেরাণী ভ্রাতা সংবাদ রটালেন যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে চরকা কাটবেন ঠিক করেচেন, এমন কি নতুন ধরণের এক ডজন চরকার জন্যে জাপানে অর্ডারও পাঠিয়েছেন। সংবাদটা অত্যন্ত গোপনীয় আর কেউ জানে না। শুনে অবধি মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল, ভাবলুম আজই এটা খবরের কাগজে দিতে পারলে আমার সংবাদ সংগ্রহের অলৌকিকত্ব একদিনে প্রমাণ হবে। বাসায় ফিরে কাগজ কলম নিয়ে বসেচি, এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমার ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়ের নামই কি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র হালদার? —বলেই নমস্কার করলেন।

আমি প্রতি নমস্কার ক'রে বল্লুম, আজ্ঞে আমারি নাম। আগন্তুক আমার বলবার অপেক্ষা না করেই আমার পাশে বিছানার ওপর বসলেন। জিজ্ঞাসা করলুম কোত্থেকে আসচেন?

প্রশ্নের উত্তরে তিনি পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে দিলেন। চিঠিখানা আমার এক বন্ধুর লেখা। তিনি অনুরোধ করেচেন—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তোমার কাছে যাচ্চেন, সাধ্যমত উপকার করবে।

চিঠিটা পড়েই মন খারাপ হয়ে উঠল—উপকার আমার নিজের জীবনে প্রায়ই দরকার হয় বটে, কিন্তু তিরিশ টাকা মাইনে পাই—আমার এক প্রিয়তম বন্ধুকে সেদিন দুটো টাকা ধার দিতে পারি নি, এঁকে ত চিনিই না। তবু মনের ভাব প্রাণপণে গোপন করে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার কি উপকার আমি করতে পারি?

যোগেশ বাবু আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন, একটা জীবনী লিখে দিতে হবে।

শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করলুম—কার জীবনী?

—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের।

—আমি ত তাঁকে চিনি না।

—সেই ভরসাতেই ত আপনার কাছে এসেচি। দেখুন এ শুধু আমার উপকার নয়, আপনারও। এই বলে, তিনি একশত টাকার একখানা নোট আমার সামনে রাখলেন।

আমি ত অবাক। খবরের কাগজে সংবাদ পাঠাই, জীবনী কি ক'রে লিখতে হয় তা জানি না। তারপর যাঁর জীবনী লিখব, তাঁকে চেনা দূরে থাক, তাঁর নাম পর্য্যন্ত শুনি নি; অথচ আমি যে তাঁকে চিনি না, তাঁর জীবনী লেখবার পক্ষে এইটাই হ'ল আমার মস্ত বড় সার্টিফিকেট! সামনে একশ' টাকার নোট পড়ে রয়েচে—এত গুলো টাকা পেলে একটা কাঠের মিস্ত্রীও বোধ হয় কবিতা লিখতে রাজি হয়—সুতরাং চুপ ক'রে রইলুম। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশী—যে দরিদ্র তার মনের জোর থাকে না, নইলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পাগল বলতে আর কি বাধা ছিল?

রাজি হওয়া গেল। মনে হ'ল ভগবান পাগল সৃষ্টি করেচেন কেবল আমাদের মত খবরের কাগজের সংবাদদাতাদের উপকার করবার জন্যে। বল্লুম—আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, কিন্তু আপনি তাঁর জীবন-কথা বলতে থাকুন, আমি নোট ক'রে নি।

যোগেশবাবু বল্লেন—সে কথা আমিও বলতে পারব না।

আমি বল্লুম, তবে যে রচনাটা নানা কারণেই অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। প্রথমত নখদর্পণ জানি না, জ্যোতিষশাস্ত্র শিখতে চেয়েছিলুম কিন্তু সময় পাইনি—দ্বিতীয়ত—

যোগেশবাবু হেসে উঠলেন। বল্লেন, দেখুন ব্যস্ত হবেন না। আমি মশাই পাটের ব্যবসা করি, জীবনে অনেক ব্যবসা করেচি, কিন্তু দেখচি পাটের চেয়ে মনোরম আর কিছু নেই। কিন্তু তাই ব'লে পাটই যে সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস, এ কথাও মানি না। শ্রেষ্ঠ জিনিস হয়ত স্ত্রী, কিন্তু তা নিয়ে বড় জোর জুয়া খেলা চলে, ব্যবসা করা চলে না। প্রেম হয়ত শ্রেষ্ঠ জিনিস, কিন্তু এ নিয়েও ব্যবসা চলে না—চল্লেও শেষ পর্য্যন্ত ঠকতে হয়। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেচি দাদা, কাজেই কথার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব এসে পড়ে,।—এতগুলো অবান্তর কথায় আমার মনটা যে খুব প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল, তা নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতেও পারলুম না। বল্লুম—আপনি যে রকম সরস ভাবে আলাপ করতে পারেন, তাতে মনে হচ্চে, জীবনী লেখার ভারটা এ অধীনের ওপর না দিয়ে—

ঐ বকতেই পারি দাদা, লিখতে পারি না। কিন্তু থাক সে কথা,—আজ এক বছর ধ'রে কেবল হিসেবই লিখচি। তাও যাক চুলোয়। যার জীবনী লিখতে বলছি—সে বর্ত্তমানে নিরুদ্দেশ হয়েচে—কিংবা অজ্ঞাত বাস করচে, কিংবা মরেচে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি আরো পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। বিজ্ঞাপনে কি লিখতে হবে তাও ঠিক ক'রে এনেচি, এই দেখুন।

বিজ্ঞাপন

আমরা হুগলী জেলার রামামৃতগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব ইঁহার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা ইঁহার জীবন-কাহিনী যাহা জানেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে পরম উপকৃত হইব। সংবাদদাতাদিগকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড করিয়া জীবনী উপহার দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন খানা আমার হাতে দিয়ে যোগেশ বাবু বলতে লাগলেন,—এর উত্তরে যা পাবেন, সেগুলো সংগ্রহ ক'রে তা থেকে জীবনী রচনা করবেন, তারপর আমি তা দেখে, তা'র বাল্যকাহিনী আপনাকে শুনিয়ে যাব।

আমি বল্লুম—গোড়ার কথাগুলো আগেই না হয় বলুন; আমি সেগুলো ভাল ক'রে সাজিয়ে রাখবার চেষ্টা করি।

যোগেশ বাবুর মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল, বল্লেন—অত সহজে কাজটা হবে না। গোড়ার কথায় কোন বিশেষত্ব নেই, যেমন আমার আপনার কিংবা আর পাঁচজনের হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ গোপাল অতি সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহাই খায় ইত্যাদি। যেখান থেকে তার জীবনে বৈচিত্র্য ঢুকেছে সেইখান থেকে তার আসল জীবনী আরম্ভ। কিন্তু সে কথা আমিও বলতে পারব না, আপনিও না, কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। আর,

বিজ্ঞাপনের উত্তরে কিছু না আসতে পারে, তা হ'লে কিছু লেখবারও দরকার নেই। আবার অনেক চিঠিও আসতে পারে; তখন পাঁচ জনের মুখের পাঁচ রকম কথা নিয়ে একটা মূল চরিত্র আবিষ্কার করতে হবে। সেইটি হ'লে আপনি আরো টাকা পাবেন, কত টাকা আপনি সাহস ক'রে চাইতে পারেন?—কত টাকা?

শেষে হঠাৎ 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে সম্বোধন চল্ল।

—শোন দাদা, সংসারে টাকা কিছু না, কিন্তু পকেট খালি হ'লে টাকার বড় কিছু নেই। কোন্ হতভাগ্য বলেচে আত্মীয়তা টাকায় হয়! আমি বলি, টাকা থাকলে বড় জোর আত্মাটাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে, আত্মীয়তা গড়া যায় না।

কথাটা ভাল ক'রে বোঝা গেল না, তবে এটা বুঝলুম পাগলের খেয়াল মেটাতে পারলে পকেট খালি থাকবে না। বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। যোগেশ বাবু বলে গেলেন, কয়েক-দিন পরেই তিনি আবার আসবেন, এবং আমি কত দূর এগিয়েচি তা' দেখে যাবেন। যাবার সময় অনেক রকম উপদেশ দিলেন। চিত্রকর ছবি আঁকবার সময় সম এবং বিষম বর্ণ একসঙ্গে মিলিয়ে একটি ভাব ফুটিয়ে তোলেন, আমি যেন তেমনি ক'রে ভোলানাথকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। কালো যদি কিছু মেশাতে হয় তবে যেন মাত্রা ঠিক থাকে অর্থাৎ আগাগোড়া মসীলিপ্ত না করি, অথবা রঙীন করতে গিয়ে কেবলি রক্তরঞ্জিত না করি। তারপর বল্লেন—দেখ আমার আসল উদ্দেশ্য, বন্ধুর একটা ছবি আঁকাতে চাই। সে নিজে কি ছিল তা আমি জানি—কিন্তু বলব না। অপর লোকে তাকে কি চোখে দেখত সেইটে জানতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। আমার সব কথাই বলা হ'ল—এখন তোমার ওপর ভরসা। এই বলে যোগেশবাবু বিদায় নিলেন।

কোন্ এক অজ্ঞাত লোকের জীবনী লেখবার ভার পড়ল এই অখ্যাত লেখকের ওপর—ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে এই ভেবে মনটা দমে গেল। ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাবার আর কোনই পথ ছিল না, একমাত্র বর্ত্তমানের এতগুলো টাকা ছাড়া। বিজ্ঞাপন দেবার চতুর্থ দিনে একখানা চিঠি এল। পড়েই মনে করলুম, এইবার ভাগ্য ফিরল। ভোলানাথ বাবু অজ্ঞাত লোক ব'লে আর দুঃখ রইল না—কেননা ভগবানও অজ্ঞাত, তবু তাঁর জয় গান ক'রে অখ্যাত লেখকেরাইত মুনি ঋষি নামে পরিচিত হয়েচেন।

তখন কি আর ভেবেচি যে খবরের কাগজের সংবাদ-দাতা যে কারণে জীবনী লিখতে রাজি হয়, একমাত্র সেই কারণেই তা লেখা চলে না? যা হোক চিঠিখানা এই—

মহাশয়, আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক, লেখনী ধন্য হোক। ভোলানাথবাবু আমার জীবনে একটি নতুন জিনিস দান করেচেন। তিনি যেদিন আমার সম্মুখে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, আমার মনে হয়েছিল—জীবনের ধ্রুবকে পেলুম। তিনি যেন আলোর দূত, আমার জীবন-নিশায় প্রভাত বয়ে নিয়ে এলেন। মনে করলুম—সার্থক হ'ল আমার সকল কামনা, পূর্ণ হ'ল আমার শূন্য হৃদয়।... এমনি ভাবেই তাকে আমি গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তিনি দেবতা, আর আমি মানুষ। তিনি আমাকে কৃপা করেছিলেন, আমি তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েচি। আমার সকল লালসা সঙ্কুচিত হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেচে।... তাঁর স্মৃতি, সেই আমার অগ্রজোপমের স্মৃতি, আমি রোজ পূজা করি। আপনারাও আমার সঙ্গে তাঁকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়ে দেবেন। ইতি বিনীতা শ্রীকমলবাসিনী।

চিঠিটা পড়ে নিজেকে বড় ছোট মনে হ'ল। সামান্য স্ত্রীলোক হ'য়ে এমন লিখতে পারে, আর আমি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র হালদার একটা জীবনী লিখতে ভয় পাচ্চি! এর ভাষার চেয়ে আমার ভাষা আরো সরস করতে না পারলে আমার জীবন ব্যর্থ। শ্রীমতী কমলবাসিনীকে নমস্কার করলুম—এবং শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র হালদারকে ধিক্কার দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে যে চিঠিখানা পেলুম সেখানা এই,—

মহাশয়, আপনার বিজ্ঞাপিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ অবগত আছি, তাহা জানাইলাম। কিন্তু দেখিবেন ইহা যেন ছাপানো হয়। আপনি এত দেশ থাকিতে একটি অমানুষের জীবনী লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন কেন বুঝিলাম না। যাহা হউক ইহাতে আমা-দের বাসনা পূর্ণ হইবে। আপনি যদি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন তবে তাহাতে আমার পূর্ণ

সহানুভূতি আছে জানিবেন। এমন কি ছাপার খরচের টানাটানি হইলে কিছু অর্থ সাহায্য করিতেও রাজি আছি। গত বৎসর তিনি আমার এক আত্মীয়াকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঠকাইতে আসিয়াছিলেন। নিজের নামধাম গোপন করিয়া এমন কি পূর্ব্বের বিবাহটি পর্য্যন্ত গোপন করিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে কতখানি সুখ পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। দৈবক্রমে একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে বিবাহ-সভায় তাঁহার দেখা হয়। তিনি সব ফাঁস করিয়া দেন। তাহা লইয়া মহা হৈ চৈ। প্রহার ত' খাইলেনই, উপরন্তু পুলিস ডাকিবার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু লোকটির বরাত ভাল, পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। পরে জানা গেল তাঁহার নাম যজ্ঞেশ্বর রায় নয়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

আপনারা যাহা প্রকাশ করিতেছেন তাহার নাম "জীবনী" না রাখিয়া "ভোলানাথের কেচ্ছা" রাখিবেন, এবং তাঁহার সন্ধান যদি আপনাদের জানা থাকে তবে তাহা আমাকে দয়া করিয়া জানাইবেন। ইতি—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আজিমনগর।

প্রথম চিঠিখানা পেয়ে, সমস্ত রাত জেগে ভোলানাথ বাবুর আদর্শ চরিত্রের ওপর প্রায় তিন পাতা গদ্যকাব্য রচনা করেছিলুম। তার শেষ লাইনে লিখেছিলুম, তিনি প্রকৃতই দেবতা। আজ তার পাশে লিখলুম, ভোলানাথ বাবু পশু। যীশুখৃষ্টের সঙ্গে মেষ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গাভীর উল্লেখ করায় বাধে না। বাহন হিসেবে বাবা ভোলানাথের সঙ্গে ষাঁড়ের উল্লেখ বরাবর চলেচে কিন্তু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে দেবতা ব'লে তদ্দণ্ডেই পশু বল্লে —যোগেশবাবু টাকা দিতে রাজি হবেন কি না এই সমস্যাটা মনকে পীড়িত করে তুলচে, এমন সময় আর একখানা চিঠি এল।

মহাশয়, ভোলানাথবাবু সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি তাঁহার জীবনী লিখিতেছেন, আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম তাঁহার জীবন লইতে। যাক সে সব দুঃখের কথা আর জানাইব না, আমাদের সামান্য ব্যবসাটির তিনি যাহা ক্ষতি করিয়াছেন তাহাই জানাইতেছি। তিনি যেরূপ চালের উপর চলিতেন, তাহাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম তিনি একজন বড় জমিদার বা আর কিছু। বিনা ওজরে তাঁহাকে মাসের পর মাস চাল, ডাল, ঘি ইত্যাদি দিয়াছি—মাসান্তে বিল পাঠাইতেও সাহস করি নাই, কি জানি যদি চটিয়া যান। তিনি চটিয়া যান নাই; চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন দয়া করিয়া জানাইবেন। সুযোগ বুঝিয়া আমাদের নিবেদন জানাইয়া রাখিলাম, যদি অন্যান্য পাওনাদারেরা সুবিধা করিয়া লয়, তবে সে সময় আশা করি এই অধীনদিগকে ভুলিবেন না। আমাদের মোট পাওনা দুই শত টাকা সাত আনা মাত্র। নিঃ ইতি—

— ভবদীয় লক্ষ্মীভাণ্ডার।

তিনখানা চিঠি এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়লুম, কিন্তু কোন কিনারা হ'ল না। লিখে রাখলুম—ভোলানাথ বাবু জুয়াচোর।

এর পরে ক্রমাগতই চিঠি আসতে লাগল—তৃতীয় চিঠিখানা এই—

ভোলানাথ আশ্রম।

মহাশয়, আপনার উদ্দেশ্য সফল হউক শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা। আজ চার বৎসর হইল ভোলানাথ বাবু এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে প্রায় পঞ্চাশ জন অনাথ বালকবালিকা, অন্ধ এবং খঞ্জ প্রতিপালিত হইতেছে। অপূর্ব্ব স্নেহ মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি গুণের আধার বলিয়া তাঁহাকে সকলে দেবতা বলিয়া মান্য করিত। বস্তুত তিনি এই ক্ষুদ্র আশ্রমটিকে উপলক্ষ করিয়া ভগবৎ সেবা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ যে একই সূত্রে গ্রথিত, এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য তিনি যে সব আয়োজন করিতেছিলেন এবং পৃথিবী হইতে স্ত্রী স্বাধীনতা তুলিয়া দিবার জন্য যে সমস্ত যুক্তি-গঠন করিতেছিলেন, তাহা সফল হইলে মানব-সমাজের যে কি পরিমাণ কল্যাণ হইত তাহা বলা যায় না।

আশ্রমে কমলবাসিনী নামে একটি মেয়ে ছিল। সে পোড়ারমুখী তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। এই দুঃসাহস তাহার কেমন করিয়া হইল বুঝিতে পারি না। হতভাগী বোধ হয় মনে করিয়াছিল যাহাকে ভক্তি করা যায় তাহাকে প্রেম নিবেদন করাও চলে। ঈশ্বরকে প্রাণেশ্বর করিয়া লওয়া বোধ হয় খুবই

সহজ!—কিন্তু তাহার চরম শিক্ষা হইয়াছে। ঘটনাটা পৃথিবীর আর কাহারো কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু সে নিজের কাহিনী নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমিও যে চোরের মত লুকাইয়া সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলাম একথা কেহ জানে না, এখন জানাইতেছি।

গুরুদেবের ঘরের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনা হইতেছে আভাস পাইয়া একদিন রাত্রে বাহির হইতে উঁহাদের কথা শুনিয়াছি। ইহাতে অপরাধ হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক যাহাই হউক, তাহাতে আমার স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে, এবং তাহা রোধ করা আমার অসাধ্য।

গুরুদেব প্রথমত সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষের তুলনা করিয়া বলিলেন, "সাধারণ মানুষের দেহের কামনা তৃপ্ত করতে সারাটা জীবন কাটে, আর অসাধারণ মানুষ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের পথ অতিক্রম করেন।"

কমলবাসিনীর অধরে চাপা হাসি—চোখ কৌতুকপূর্ণ—গুরুদেবের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। গুরুদেব একটু থামিলেই কমলবাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—কামনাকে ত্যাগ করাই যে শ্রেষ্ঠ পথ তা কেমন করে বুঝব?

ইহার উত্তরে গুরুদেব যাহা বলিলেন—এবং তাহার উত্তরে কমলবাসিনী যাহা বলিল—তাহা দর্শনের কঠিনতম স্তরের কথা—আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু কমলবাসিনী বুঝিয়াছিল। আড়াল হইতেই দেখিলাম তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া গুরুদেবের পদধূলি মাথায় মাখিল, এবং গুরুদেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার পরদিন কমলবাসিনী আশ্রম হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা কেউ জানে না। একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল তাহা হইতে হতভাগীর সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীতে তাহার এক মা আছেন, নিজে আশ্রমের বালিকাদিগকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়া যাহা পাইত তাহা দ্বারা মাকে সাহায্য করিত।

এই ঘটনার চার পাঁচদিন পরে বৃদ্ধা, কন্যার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যখন শুনিল সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে তখনই তাহার চীৎকারে এবং কান্নায় আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম।

সান্ত্বনা লাভের জন্য গুরুদেবের কাছে গিয়া দেখি গুরুদেব গৃহে নাই। সেই দিন হইতে তিনি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত জানি না। ইতি—

জনৈক আশ্রমবাসী।

ভোলানাথ বাবু যে একজন অতিমানুষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। মহামানবেরা আত্মগোপনের জন্যে এমন একটা ছদ্মবেশ পরেন, যা ভেদ ক'রে আসল লোকটিকে দেখার সৌভাগ্য সাধারণ লোকের হয় না—কেউ দেখে তাঁকে পশুরূপে, কেউ দেখে তাঁকে চোর-জুয়াচোর রূপে। এক কমলবাসিনী মনে হচ্চে তাঁর প্রকৃত রূপটি দেখেছিল, নইলে নিরুদ্দেশ হ'ল কেন?···

চতুর্থ চিঠিতে ভোলানাথবাবুর আর এক পরিচয় পেলুম। এক ভদ্রলোক সিরাজগঞ্জ থেকে লিখেচেন—"ভোলানাথবাবু পাটের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্য মোচনের অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক শত কোটী টাকার অভাবে তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। সিরাজগঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া তিনি সমস্ত বাংলাদেশের পাট কিনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে এক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ ধনশালী হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন ইহা সাধন করিতে বিস্তর তপস্যা করিবার দরকার নাই, সমস্ত সাফল্যের মূলে সাধারণ বুদ্ধি এবং কিছু মাড়োয়ারী থাকিলেই যথেষ্ট। স্থানীয় বাঙালী মাত্রেই ইঁহার উপর ভরসা করিয়া চুপ করিয়া ছিলেন—সুযোগ বুঝিয়া প্রতাপচাঁদ আগরওয়ালা সে মরসুমের সমস্ত পাট কিনিয়া ফেলাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সিরাজগঞ্জ পরিত্যাগ করেন।

এমনি চিঠির পর চিঠি পেয়ে আমার ধারণা এবং মনোভাব ক্রমাগত বদলাতে লাগল, কেবলি মনে হ'তে লাগল এর মূল কোথায়, কি ক'রে এই পাঁচ রকম লেখার ভেতর থেকে একটা ঐক্য খুঁজে বের করি। আমার যে একটি স্ত্রী আছেন তা এতক্ষণ গোপন ক'রে এসেছি, কিন্তু আর গোপন করা চল্‌ল না। ক্রমশই দেখতে পাচ্চি তার পাতিব্রত্য শিথিল হ'য়ে আসচে, আমার ওপর বিনা কারণে চটে যাচ্চে—এমন কি আমাকে এবং আমার কথাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেচে। একদিন সে স্পষ্টই বল্লে—

তিরিশ টাকা মাইনে পেতে, খেয়ে প'রে কিছু থাকত না, কিন্তু শান্তি থাকত, আর আজ তোমার কি দশা হয়েচে বলত'।"

আমি স্ত্রীলোকের বুদ্ধির ওপর একটা বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলুম—কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লুম, অভাবঘটিত ভাবনাটা গোপন রাখা চলে ব'লে টের পাওনা, আর প্রচুর পাওনার আশায় যে ভাবনা সেটা অস্বাভাবিক ব'লেই ধরা প'ড়ে গেচি। কিন্তু তুমি যে সহধর্ম্মিণী সে কথা ভুলে যেয়ো না, আমার যা ধর্ম্ম, তা তোমারও ধর্ম্ম, এবং সতী স্ত্রী সে ধর্ম্ম নিয়ে বাছবিচার করে না।

প্রভার অভিমানে আঘাত পড়ল,—বল্লে,—যাও যাও, ঢের দেখেছি—ধর্ম্মের 'বকতিতে' আর তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।

আমি ঠাট্টাটাকে আর একটু দূরে টেনে বল্লুম—ঢের দেখেচি এর মানে কি? তবে কি এই দেবতা ছাড়াও বাদবাকী বত্রিশ কোটি নিরেনব্বুই লক্ষ—

ঠিক এই মুহূর্ত্তে হাত থেকে চিঠিগুলো সরে গেল, আলোটা টেবিল থেকে সবেগে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল, অন্ধকার ঘরে প্রভা মাটিতে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। রাত তখন ১টা, বাইরে দক্ষিণ হাওয়ায় পত্রের মর্ম্মরধ্বনি, ঘরে কেরোসিনের গন্ধ এবং ভূলুণ্ঠিতা স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি। দক্ষিণ হাওয়া, পাটের ব্যবসা, গুরুদেব, চাপা কান্নার শব্দ, ভোলানাথের চরিত্র, স্ত্রীচরিত্র এবং কেরোসিনের গন্ধ আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মত্ততা সৃজন করল। এই মত্ততার আবেগে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব ক'রে নিলুম কিন্তু তাতে একঘণ্টা কেটে গেল। অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাদেবী স্বামী স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে আমার ঘুম ঠিক ভোর বেলাতেই ভাঙবার কথা নয়, কিন্তু প্রকৃতির হাতে কতকগুলো অপরিহার্য্য নিয়ম আছে। সঙ্গীতকার ঠিক যে সময়টা ভৈরবী আলাপের উপযুক্ত ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে গেচেন সেই সময় একটি স্ত্রীলোক ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বাইরে অসুরের চীৎকার শুরু কল্লে—ওরে মিন্সে, মহিম না রহিম—তোর মাথা খাই, বেরিয়ে আয়। ভোলানাথকে বার কর দেখি, কার কস্‌জে কে ভাঙে।

চীৎকারের সঙ্গে দরজায় দুপদাপ আওয়াজ হ'তে লাগল। স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে জানালা খুলে বল্লে—অমন করছ কেন বাছা? এখানে ভোলানাথ ব'লে কেউ থাকে না, তুমি বোধ হয় ভুল করেছ।

কিন্তু সে শান্ত হ'ল না। বরং আরো চীৎকার করে বুঝিয়ে দিলে যে আমার স্ত্রীর চৌদ্দপুরুষ ভুল করলেও সে ভুল করতে পারে না—এবং ভোলানাথকে ঘর থেকে বের করে না দিলে সে ওখানেই মাথা খুঁড়ে মরবে।

আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলুম। দেখলুম স্ত্রীলোককে শাসন করতে পুরুষের দরকার। অনেক বুঝিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করা গেল কিন্তু সে কি সহজে বিশ্বাস করে? ভোলানাথবাবু এবং তার কন্যা কমলবাসিনীকে বের ক'রে না দিলে সে আত্মহত্যা করবে। আমি তার মেয়েকে ফিরিয়ে আনব ভরসা দিয়ে বিদায় করলুম।

বেলা দশটায় একখানা চিঠি এল। অশান্ত মনকে তাড়াতাড়ি একটা কিছু দিয়ে শান্ত করবার জন্যে আবার চিঠির মধ্যে ডুবলুম। এই চিঠিই শেষ চিঠি। এর পরে কাউকে না জানিয়ে একদিনের মধ্যেই বাড়ির ঠিকানা পরিবর্ত্তন করেচি।

শেষ চিঠিখানা এই—

মহাশয়, আমি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। আমার স্বামীর সন্ধান কি আপনি রাখেন? আমি তাঁর একখানা নোটবুক পেয়েচি, তাতে মাত্র দু'পাতা লেখা আছে। আপনি যখন তাঁর জীবনী লিখতে যাচ্চেন, তখন আশা করি আমার কথা তাঁর কাণে পৌঁছুবে।

আপনার হাতে যখন এ চিঠি পড়বে, তার বহু আগে আমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। তাই যে কথা কাউকে বলবার নয়, সে কথা দশজনকে বলে গেলুম।

তিনি লিখেচেন,—প্রিয়তমাসু, আমি তোমার কাছ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছি। তোমার দুর্ব্বলতা এই কঠিন পাষাণকে বেঁধে রাখতে পারল না। তোমাকে যেদিন আমার তৃষ্ণার্ত্ত জীবনে প্রথম পেয়েছিলুম, সেদিন আমার বিশ্ব তোমার মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল। আকাশের যত তারা আমার বুকে জ্বলেছিল। তাদের কেউ ভালবাসার নিবিড়তার স্তব্ধ, কেউ হারাবার ভয়ে কম্পিত, কেউ প্রীতির হাসিতে উজ্জ্বল।

কিন্তু কেন আমি হ্যাভলক এলিস্ পড়লুম! কেন আমি মনুসংহিতা নিয়েই তৃপ্ত হতে পারলুম না! হায়, আজ কত কথাই মনে হচ্চে। বিয়ের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে স্বপ্ন-রাজ্যেব ভিতরে ছিলুম তা ভেঙে গেছে। আমি চল্লুম। আমি আজ মুক্তি চাই—মুক্তি চাই, বিদায়।

তোমার হতভাগ্য - ভোলানাথ।

আমি তাঁর স্ত্রী হ'য়ে তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করে গেলুম, এ অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আমি এতদিন ধরে স্বামীর যে পরিচয় পেয়েচি তা যদি অক্ষুণ্ণ থাকত তবে সুখের হ'ত, কিন্তু এই লেখার ভেতর দিয়ে তাঁকে নতুন ক'রে দেখলুম।

আমি কি দেবতাকে চেয়েছিলুম? দেবতা নিজেকে দান করবার ভাণ করেছিলেন।

লিখেচেন, তিনি মুক্তি চান। আমাকে ভুল বুঝে লিখেছেন। আমার কাছে তাঁর কোন বন্ধনই ছিল না, সে আমি জোর ক'রেই বলচি। আমি হ্যাভলক এলিস্ পড়িনি, তিনি কি মন্ত্র দিয়েছেন তাও জানি না, কিন্তু যাক সে কথা।

পুরুষদের কাণে যদি এসব কথা পৌছয়, তবে তারা হাসবে। এই মরুভূমিতে সকল কান্নার প্রতিধ্বনিই অট্টহাসির মত শোনায়। তারা যদি হাসে, তবে জানব ওটা আমারি কান্নার প্রতিধ্বনি। ইতি—বিনীতা শ্রীউর্ম্মিলা দেবী।

এ কি অদৃষ্টের পরিহাস!—জীবনী লিখতে গিয়ে নারী হত্যার পাতক হ'ল আমার! স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম, আর নয়, জীবনী লিখতে যদি জীবন নিতে হয় তবে রইল পড়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, রইল পড়ে যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? আমি বল্লুম—নারী হত্যা! তাকে সব খুলে বল্লুম, চিঠি দেখালুম, —প্রভা কাঁদতে লাগল। সমস্ত রাত অনুতাপে কাটল। স্থির করা গেল, টাকার মায়া কাটাতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" এই শাস্ত্র বাক্যটি স্ত্রীর মারফৎ বিশ্বাস করলুম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা নটা। চোখ চাইতেই বাইরে থেকে শব্দ শুনতে পেলুম—ব্যোম, ব্যোম, ভোলানাথ। শুনেই মনে হ'ল, হায়রে আবার বুঝি কেউ আক্রমণ করে।

এমন সময় প্রভা এসে খবর দিল, বাইরে জটাধারী এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে।

দেড় হাত দাড়ী আর তিন হাত জটা, হাতে কমণ্ডলু, সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখা। সকাল বেলাতেই সাধু দর্শনের পুণ্য লাভ ক'রে আনন্দ হ'ল। সন্ন্যাসী আমাকে দেখে ডান হাত তুলে বল্লেন—বালক, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

আমি বল্লুম, আশীর্ব্বাদের বড় দরকার সন্ন্যাসী ঠাকুর, কিন্তু তার মূল্য দিতে পারব না যে।

ঠাকুর বল্লেন, আমিই ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় –

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের ভাষা বেরুল—অ্যাঁ বলেন কি? কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। বল্লুম—ঠাকুর সন্ন্যাসী হ'য়ে যদি কিছু পুণ্য করে থাকেন তা আপনার ব্যর্থ হয়েচে।

সন্ন্যাসী চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, বল্লেন—কেন? কেন?

তাঁর স্ত্রীর চিঠিখানা এনে দেখালুম। সন্ন্যাসীর চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল—চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—পারলুম না, আমার সব শেষ হ'ল। বলতে বলতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঠিক এমনি সময় দেখি একজন পুলিসের দারোগা দুজন সিপাইয়ের সঙ্গে কোত্থেকে এসেই সাধুকে ধরে ফেল্লে। ভোলানাথ বাবুর হাতে হাতকড়া পড়ল।

সিপাই দুজন সুযোগ পেয়ে একটু রসিকতার লোভ আর সামলাতে পারল না। সন্ন্যাসীর দাড়ি ধরে খানিকটা টেনে দিলে। আমি তার প্রতিবাদ করতে কাছে যেতেই দেখি সন্ন্যাসীর মুখ থেকে দাড়ি খুলে গেল।—এবং মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, দাড়িশুদ্ধ যিনি ছিলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, দাড়িহীন হ'য়ে তিনিই হলেন যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমি এখন নতুন বাড়িতে এসে আবার তিরিশ টাকার গদিতে ফিরে গিয়েচি কিন্তু ব্যাপারটা আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেচে।

এই গল্পের শেষেও সামান্য একটা উপগল্প আছে। প্রভা ভোলানাথ বাবুর স্ত্রীর চিঠি পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাভলক এলিস কি? আমি বলেছিলুম, ও একখানা ইংরেজি বই আমি আজও পড়িনি, তবে পড়বার ইচ্ছা আছে।

পরদিন দেখা গেল আমার একখানা ইংরেজি বইও টেবিলে নাই।

কাজল

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

বৈশাখের দীপ্ত মধ্যাহ্নে তারাসুন্দরী বঁটী পাতিয়া গত রজনীর ঝড়ে পড়া কাঁচা আমগুলি কাটিয়া 'আমসী' করিতেছিলেন। এমন সময় পাড়ার এক দল বালক বালিকা আসিয়া তাঁহার নিকটে নালিশ করিল, "আজ আবার কাজল আমাদের মেরেচে কাকীমা।" এ অনুযোগ অভিযোগ নিত্য নৈমিত্তিক হইলেও তারাসুন্দরীর শান্ত মুখে বিরক্তির কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি অভিযোগকারী-দের প্রতি চোখ তুলিয়া ধীরে কহিলেন, "তোদের আবার মেরেচে? সেদিন এত মার খেলো, বকুনী খেলো, তাতেও ওর লজ্জা হল না। আমার কপালে কি দস্যি মেয়ে হল। আমি ত তোদের বলেই দিয়েচি যেমন মারতে আসে, তেমনি সকলে মিলে ওকে খুব মার দিয়ে দিবি।"

দলের অগ্রগণ্য ছিদাম ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি বল্লে কি হবে, আমরা যে ওর সাথে পারি না। আমরা সব গুলো একদিকে হলেও কাজলের সঙ্গে পারবার উপায় নাই, পারলে কি চুপ করে থাকতাম?"

দাসেদের টুনী বলিয়া উঠিল, "কে পারবে কাজলের সঙ্গে, ওর গায়ে যে অসুরের বল, হাতীর বল।"

সকলেই তাহার কথায় সায় দিল, "সত্যি—কাজলের গায়ে অসুরের বল, হাতীর বল, নইলে মজা বুঝিয়ে দিতাম।"

তারাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হোক্ বল—তবু তোদের মারলে তোরা কাজলকে মারবি, কখনো ছেড়ে দিবি না। আচ্ছা, আজ কি কাজল তোদের শুধু শুধুই মেরেচে, তোরা কি কিছুই বলিস নি?"

বালক বালিকাগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া অম্লান বদনে বলিল, "বলবো আবার কি—তোমার মেয়ে এমনিই ম'রে।"

বৈশাখের ঘূর্ণী বায়ুর ন্যায় একটি বারো তেরো বছরের শ্যামবর্ণা কিশোরী এক মাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল লইয়া কোথা হইতে অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিল। তাহার অপ্রত্যাশিত আগমনে ছেলে মেয়েদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

শিশুর দলে বর্গীর মত মেয়েটি দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বাম হস্তে ললাটের অবাধ্য কেশ পাশ সরাইয়া, তীব্র কণ্ঠে কহিল, "তোমার মেয়ে এমনিই মারে, মার কাছেও মিছে কথা, এমনি মেরেচি? বল্‌না মিথ্যাবাদীরা বল্‌, আমি তোদের এমনি মেরেচি?"

তারাসুন্দরী বঁটী কাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়ের কাছে অগ্রসর হইয়া ধমকের স্বরে কহিলেন, "দেখ্ কাজল, তোর বড় বাড় হয়েচে, সবাইকে মেরে আবার শাসন করতে এসেছেন। ফের যদি কারুর সঙ্গে লাগাবি তাহলে আর আস্ত রাখবো না।"

কাজল মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ছিদামের বাহুতে একটা ঝাঁকুনী দিয়া পুনরায় কহিল, "মার কাছে লাগাতে আসা হয়েচে, এখন বল না, কেন মেরেচি?"

ছিদামের কলকণ্ঠ সহসা নির্ব্বাক হইল। বন্ধুমহলে সরকারদের বাবলার সাহসের খ্যাতি মন্দ ছিল না। সেই সুনামটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিবার দুরাশায় বাবলা মরিয়া হইয়া কহিল, "আমরা শোলোক বলেছিলাম, মুখুজ্যেদের ননীদি শিখিয়ে দিয়েছিল।"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শোলোক রে?"

বাবলা অপাঙ্গে একবার কাজলের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—

"কাজল কাজল কাজল চোখ,
যার ভয়ে পালায় লোক।"

বাবলার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাহার গালে বিরাশি শিক্কা ওজনের একটি চপেটাঘাত পড়িল। তারা সুন্দরী মেয়ের হাত ধরিতে না ধরিতেই সঙ্গীদের কাহারো মাথায় কাহারো পিঠে কিল চড় উপহার দিয়া অঞ্চল লুটাইয়া কুন্তল উড়াইয়া কাজল ছুটিয়া পালাইল।

মা সরোষে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

তারাসুন্দরীর কুটীরের পার্শ্বে মজুমদারদের আম বাগান, বাগানের পর দ্বিতল গৃহ। কাজল এক লম্ফে প্রাচীরে

উঠিয়া আর এক লাফে বাগানে গিয়া পড়িল। মেয়ের বিদ্যা মার অভ্যাস ছিল না, কাজেই মাকে বাগান ঘুরিয়া মেয়ের অনুসরণ করিতে হইল।

তারাসুন্দরী মজুমদারদের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেই একটি কুড়ি একুশ বছরের সুন্দর শ্যামবর্ণ যুবক কক্ষান্তর হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাকীমা, এত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোথা যাচ্ছেন?"

তারাসুন্দরী আশীর্ব্বাদচ্ছলে যুবকের মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তুই কখন এলি শ্যামল? তোর আসবার কথা ত জানতে পারি নি। ভাল আছিস্ বাবা?"

"হাঁ কাকীমা, ভালই আছি। মাত্র ঘণ্টা দুই হ'ল আমি এসেছি, চান ক'রে এই খেয়ে উঠ্‌লাম, তাই আপনার কাছে যাওয়া হয়নি। আপনার শরীর কেমন আছে—কাকীমা'র কাজল ভাল আছে?" বলিতে বলিতে যুবক তারাসুন্দরীর বসিবার নিমিত্ত বারান্দায় একটা সতরঞ্চি বিছাইয়া দিল।

তারাসুন্দরী মেঝেয় বসিয়া সস্নেহে কহিলেন—"আমায় বোস্‌তে দিতে হবে না শ্যামল, আমি বসেচি, তুই বোস্। রাস্তার কষ্টে তোর মুখখানি শুখিয়ে গেচে। আমি বেশ আছিরে; দুঃখী বিধবারা মন্দ থাকে না। কাজলের কথা বলিস্ না, মেয়েটা আমাকে বড় জ্বালান' জ্বালাচ্ছে। পাড়ার ছেলে মেয়েদের মেরে এই ত এখুনি সে তোদের বাগানে ঢুকে পড়্‌লো।"

শ্যামল মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—"তাকে ধরতেই বুঝি আপনি ছুটে আস্‌ছিলেন কাকীমা? ও যেমন আপনাকে জ্বালায়, আপনারা গাঁশুদ্ধ সকলে ওকে কম জ্বালান' জ্বালান না। মেয়ে হ'লেই যে তাকে শান্ত শিষ্ট হ'তে হবে তার ত মানে নেই। এখন বুদ্ধি হয়নি তাই অমন করে, বুদ্ধি হ'লে সব সেরে যাবে।"

শ্যামলের সহানুভূতিতে তারাসুন্দরীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। একমাত্র সন্তানের দুর্দ্দান্ত স্বভাবের নিমিত্ত প্রতিবেশীদের নিকটে বিধবাকে অনেক লাঞ্ছনা অনেক গঞ্জনা সহিতে হইত। অনাহারে প্রহারে এবং তিরস্কারে মেয়েকে শান্ত করিতে না পারিয়া মা সকলের কাছেই অপরাধী হইয়াছিলেন। কেবল শ্যামল তাঁহার অপরাধের বোঝা লঘু করিয়া কাজলের ভবিষ্যতের শান্ত ছবিখানি চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিত।

স্বজাতি হইলেও তারাসুন্দরীদের সহিত শ্যামলদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রতিবেশী সুবাদে শ্যামল তারাসুন্দরীকে 'কাকীমা' বলিয়া ডাকিত। কাজল শ্যামলের বাল্যসখী, কাজেই কাজলের প্রতি শ্যামলের আন্তরিক স্নেহ। শ্যামলের পিতা সপরিবারে পশ্চিমে চাকরী করিতেন, পশ্চিম তাঁহার কর্ম্মস্থল। একটি ভৃত্য ও সরকার গ্রামের বাড়ী ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

শ্যামল রাজসাহী কলেজে বি-এ পড়িতেছিল। দেশের প্রতি তাহার ভারী মমতা। কলেজের ছুটী হইলে সে সব ছুটিটাই প্রায় পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিত। তাহার ইচ্ছা পাঠ্যজীবন-অবসানে আপনার জন্মভূমির শান্ত শীতল কোলে একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিবে, ইহাতে পিতামাতারও মত আছে; কারণ তাঁহাদের ত অর্থের অপ্রতুলতা নাই।

২

শ্যামলের সহিত কথায় কথায় তারাসুন্দরীর দীর্ঘ দিবা কাটিয়া গেল। অপরাহ্ণ সূচনায় আকাশের ঈশান কোণে কাল-বৈশাখীর ঘন নীল মেঘ রাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে লাগিল। আসন্ন ঝঞ্ঝার আভাস জানাইয়া গুরু গুরু মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

তারাসুন্দরীকে উঠিতে হইল, ঘরের অনেক কাজ বাকী, এখন পর্য্যন্ত মেয়ের খোঁজ হইল না। সময় মত তাহাকে খুঁজিয়া বাহির না করিলে ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছপালার নীচে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গা তাহার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।

তারাসুন্দরী চারিদিকে মেয়ের অনুসন্ধান করিলেন। শ্যামল উচ্চ স্বরে কয়েকবার ডাকিয়াও কাজলের সাড়া পাইল না। তাহারা আম বাগানে যাইতেই হঠাৎ একটি ঘন পল্লবিত আম্রশাখা ঈষৎ নমিত হইল। পরক্ষণেই এক গুচ্ছ কাঁচা আম তারাসুন্দরীর পদতলে খসিয়া পড়িল।

উভয়ে সচমকে ঊর্দ্ধে চাহিতেই কাজলের সন্ধান মিলিল। একটি বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া আর একটি ডালে পদযুগল বিস্তৃত করিয়া কাজল তৃপ্তির সহিত কাঁচা আম খাইতেছে। খোলা

পড়া চোখে মুখে পড়িয়া মুখখানি অর্দ্ধাবৃত। শিথিল আঁচলটা একটা শাখায় জড়াইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কিশোরী বনদেবীর ন্যায় সুন্দর ভঙ্গীটুকু শ্যামলের মিষ্ট লাগিলেও তারাসুন্দরীর লাগিল না, তিনি রুক্ষ স্বরে ডাকিলেন, "কাজল, শীগ্‌গির নেমে আয়, ভদ্রঘরের এত বড় মেয়ে গাছে চড়ে ব'সে থাক্‌লে লোকে বলবে না কেন।"

কাজল পল্লবে লুক্কায়িত একটি আম বিশেষ মনোযোগের সহিত নির্ব্বাচন করিয়া সহাস্যে কহিল, "আমি মারলেই তুমি আমায় মারতে পার; কেমন মা, তাই নয়? বড্ড মেঘ করচে, কালকের মত আজও ঝড় হবে, তুমি বাড়ী যাও মা, আমি পরে যাব।"

মা রাগিয়া বলিলেন, "পোড়ার মুখী, ঝড়ের ভয়ে আমি তোকে গাছে রেখে ঘরে যাব! ফের বলচি নেমে আয়, না নামলে তোর রক্ষা নেই।"

শ্যামল আদেশের স্বরে কহিল, "নেমে আয় কাজল, কাকীমা মারবেন না; আজ আমি এসেচি তোর ভয় নেই। না নাবলে এখুনি গাছে উঠে ধরে আনবো।"

কাজল আম চিবাইতে চিবাইতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল, "তুমি গাছে উঠে আমায় ধরবে, তা আর ধরতে হয় না; এ গাঁয়ে আমার মত কেউ গাছে চড়তে পারে না। তুমি এ ডালে এলে আমি ও ডালে যাব, ধরতে নিলে লাফিয়ে মাটীতে পড়বো। তুমি কতকাল পর এসেছ, মা'র কাছে বোসে গল্প করগে, আমি পরে যাব।"

নিরুপায় মাতা নরম হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আয় কাজল, নেবে আয়, আমি তোকে মারবোনা, শ্যামল কত মজার গল্প করবে শুনবি বসে।"

"কতবার বলবো আমি পরে যাব, এখনো আমার আম খাওয়া হয় নি।" বলিয়া কাজল আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

মা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।

শ্যামল গৃহে ফিরিয়া দুইখানি নূতন লাল টুকটুকে বই লইয়া পুনরায় বাগানে প্রবেশ করিল। শ্যামলের নিকটে কাজল মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়াছিল। নূতন পুস্তকের প্রতি কাজলের অত্যন্ত আকর্ষণ। ইতিপূর্ব্বে শ্যামল কাজলকে অনেকগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক উপহার দিয়াছে। সেগুলির সমাদর এবং গৃহীতার আনন্দ দেখিয়া এবারেও দুইখানা বই আনিয়াছে।

শ্যামল গাছের তলায় গিয়া বই দুইখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ্ কাজল, তোর জন্যে কেমন বই এনেচি, তুই না নাবলে ছিদামকেই দিয়ে দেব। এবারকার বইয়ের ভেতর কি আছে জানিস্, পড়বো?—

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তা'রে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।"

এতক্ষণে কাজলের আসন টলিল। আঁচল কোমরে জড়াইয়া টানিয়া টুনিয়া চুল বাঁধিয়া কাজল তাড়াতাড়ি নামিয়াই শ্যামলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল, "কি বই দাওনা শ্যামল, আমি পড়ে দেখি।"

কয়েক পা পিছু হটিয়া শ্যামল বলিল, "আবার শ্যামল? তুই না বলেছিলি এবার ফিরে এলেই আমায় শ্যামল দা' বলবি, নাম ধরে ডাকিস বলে কাকীমা এত বকেন তা মেয়ের মনে থাকে না।"

"থাকে না আবার—মার সামনে তোমায় ত শ্যামল বলি নি, দাদা বলতে আমার ভাল লাগে না, ও আমি পারবো না, এখন দেখি বইগুলো দাও, ছিদামদের দেখিয়ে আনি গে।" শ্যামল কাজলের প্রসারিত হস্তে বই দিয়া উপদেশ দিতে লাগিল, "এইবার তুই লক্ষ্মী মেয়ে হ' কাজল, আর অবাধ্য হয়ে মাকে কষ্ট দিস্ না। তুই ভাল হ'লে তোকে ঢের বই দেব, আমার কাছে আরো কত সুন্দর বই আছে। তুই ভাল হ'লে রাজসাহী থেকে আনিয়ে দেব। বল্ লক্ষ্মী মেয়ে হ'বি?"

কাজলের উজ্জ্বল চক্ষু আরও উজ্জ্বল হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর চক্ষু দুইটি শ্যামলের মুখের পানে মেলিয়া কাজল নীরবে ঘাড় নাড়িল।

৩

শ্যামলের লক্ষ্মীমেয়ে হইবার হিতোপদেশে অথবা শ্যামল প্রদত্ত পুস্তকের গল্পের প্রভাবে পুরা তিনটি দিন কাজল শান্ত হইয়া রহিল। স্থলে জলে তরু শাখাগ্রে তাহার সব

উপদ্রবের সৃষ্টি হইল না। ভক্ত খেলার সাথীদের সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন হইল। মা আশান্বিত হইলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তাঁহার স্থায়ী হইল না।

সেদিন সন্ধ্যায় কুটম্ব বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া কাজলের মামা মুকুন্দ বাবু বহুকাল পর ভগিনীর কুটীরে পদার্পণ করিলেন। বিধবা বোন ও ভগিনীর ভার স্কন্ধে পড়িবার ভয়ে মুকুন্দ বাবু ভ্রমেও ইহাদের সন্ধান লইতেন না, এখনও লইবার ইচ্ছা ছিল না। অপরিচিত স্থানে রাত্রি যাপন করিবার আতঙ্কে তিনি বাধ্য হইয়াই দুঃখিনী বোনটিকে স্মরণ করিলেন।

অনেক কালের পর ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইয়া তারাসুন্দরী পুলকিত হইলেন, কোথায় তাঁহাকে বসাইবেন কি খাইতে দিবেন ভাবিয়া বিধবার ব্যস্ততার সীমা রহিল না।

পাড়া-প্রত্যাগত কাজল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাতুলকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈশবে কাজল মাতুলকে দুই একবার দেখিয়াছিল কিন্তু সে স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছিল, তাই সে তাহাদের একমাত্র আত্মীয়কে চিনিতেও পারিল না।

কাজল না পারিলেও অনুমানে মুকুন্দ বাবু পারিলেন। এত বড় মেয়ের ধৃষ্টতা তাঁহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল। মনে মনে বিরক্ত হইয়া মুকুন্দ বাবু ভগিনীকে প্রশ্ন করিলেন, "এটা বুঝি তোর মেয়ে তারি? এত বড় হয়েচে একটু নীতি শিক্ষাও দিতে পারিস্ নি? বাড়ীতে গুরুজন এলে তাকে কি হাঁ করে দেখতে হয়?"

তারাসুন্দরী কাজলের আগমন লক্ষ্য করেন নাই, ভ্রাতার ইঙ্গিতে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনাকে কাজল চিনতে পারে নি দাদা, চিনবে কি করে দেখা সাক্ষাৎ ত নেই। কাজল, এখানে প্রণাম কর, ইনি তোমার মামা।"

কাজল মামার পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

মুকুন্দ বাবু কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "মেয়ে যে মস্ত হয়েচে তারি, বিয়ের কি করচিস? এখন বিয়ে না দিলেই যে চলে না!"

"কি করবো দাদা, কে আমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করবে? চেষ্টার লোকও নেই, টাকাও নেই, কাজেই বড় হ'য়েচে।"

"বড় হলে ত চলবে না, আমার ভাগ্নী বিয়ের যুগ্যি হ'য়েচে জানলে লোকে যে আমাকেই দুষবে। আমিই যেন নানা ঝঞ্চাটে খবর করতে পারিনি, তা বলে তোর কি উচিত ছিল না আমার মনে করিয়ে দেওয়া। আমি যখন এসেছি আর ভাবনা নেই, ক'দিনের ভেতর পাত্র এনে হাজির করবো। তোর জমি কখানা বাড়ী সব বিক্রী করতে হবে। মেয়ে পার হ'লে আর ভাবনা কি? সময়ে আমার কাছে গিয়ে থাকতে পারবি; সময়ে মেয়ের কাছেও থাকতে পারবি।"

কাজল নিবিষ্ট মনে উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "আমি বিয়ে করলে ত বিয়ে, আমি বিয়েই করবো না।"

মুকুন্দ বাবু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। এ কি ভদ্র লোকের মেয়ের কথা না অন্য কিছু? যে মেয়ে গুরুজনের মুখের উপর এ কথা উচ্চারণ করিতে পারে সংসারে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই

বিপন্ন তারাসুন্দরী মেয়েকে ভর্ৎসনা করিয়া ভ্রাতাকে শান্ত করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই কাজলের বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। ঘর এবং বরের বিষয় তারাসুন্দরীর অজ্ঞাত থাকিলেও পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখিতে আসিলেন। শঙ্কিত হৃদয়ে মা জলযোগের আয়োজন করিলেন। এক বাটী তৈলের দ্বারা কাজলের রুক্ষ চুল সিক্ত হইল। সাজি মাটীর ঘর্ষণে কাজলের শ্যামবর্ণে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইল।

বোসেদের বিনোদিনী মেয়ে সাজাইতে অদ্বিতীয়া। কত কুরূপা কন্যাও বিনোদিনীর সাজাইবার গুণে পাত্রপক্ষের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কন্যা দেখিবার নির্দ্দিষ্ট সময় হইল। সাজাইবার সরঞ্জাম লইয়া বিনোদিনী আসিলেন। কিন্তু যাহাকে সাজাইবার কথা দেখাইবার কথা, তাহাকেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কাজলের সঙ্গীরা তাহাকে আলাইবার নিমিত্ত-আর একটি নূতন ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল।

"কাজল কাজল কাজল ফুল
দুলবে এবার কাণে দুল।"

নানা ছলছুতায় আগন্তুক ভদ্রলোকদের বসাইয়া রাখিয়া প্রচুর জলযোগ করাইবার পর কাজলের আকস্মিক অসুখের সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করা হইল।

মুকুন্দ বাবুর হাঁক ডাকে প্রকৃত ঘটনা জানিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। প্রতিবেশীরা কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইল। দুঃখে অপমানে মা কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্যামল ঘরে ফিরিয়া দেখিল, কাজল তাহারই গৃহে নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার মুখখানি নিদাঘে দগ্ধ ফুলের মত শুষ্ক ম্লান, ব্যাধভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় কালো চক্ষু দুইটিতে কিসের ব্যথা লুকান রহিয়াছে।

সেই মুখ সেই চোখ নিরীক্ষণ করিয়া শ্যামলের পরদুঃখ-কাতর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। হায় সংসার, বনের বিহগীকে পিঞ্জরে পুরিবার এত প্রয়াস কেন? যাহার নারী-প্রকৃতি শৈশবের সুখ নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কে তাহার সুপ্তি ভঙ্গ করিবে? হৃদয়ের অস্ফুট কলি বিকশিত হইবার সময় আসিলে বালিকা নিজেই যে নব আশ্রয়ের নিমিত্ত নব বন্ধনের নিমিত্ত উন্মুখ হইবে।

শ্যামল কাজলের নিকটস্থ হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তারা চলে গেচে কাজল, তোর আর ভয় নেই, কিন্তু আজ তুই এ কি করলি, এমন করে লুকিয়ে কাকীমাকে লজ্জা দিলি কেন? বিয়ে হলে কত গয়না পাবি, কাপড় পাবি; কেমন বাজনা বেজে আলো জেলে বিয়ে হবে, তাতে তোর এত ভয় কেন রে? যা না কল্লে চলবে না তাতে কি পাগলামী করে।"

কাজল সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বিয়ের কথা শুনলে আমার ঘেন্না করে, ভয় করে, এজন্মেও আমি ওসব পারবো না। মাকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে আমায় কেটে ফেল্লেও আমি আর কোথায়ো যাব না।"

"ছিঃ কাজল, মার ইচ্ছার ওপর জোর করতে নেই। সবাই যা করে তোকেও তাই করতে হবে। যারা মাকে ভালবাসে তারা মার অবাধ্য হয় না।"

"হয় না আবার, জ্যেঠাইমা তোমাকেও না বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তুমি 'এখন বিয়ে করবো না' বল্লে কেন? তুমি বল্লে দোষ হয় না, আমি বল্লেই দোষ হয়? কখনো আমি বিয়ে করবো না, কারুর কথাতেই না।"

এ কথার উত্তর শ্যামল খুঁজিয়া পাইল না।

প্রবাদ আছে, বিবাহের ফুল ফুটিলে শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও বিবাহ হইয়া যায়। কাজলের বিবাহের ফুল ফুটিয়াছিল, মুকুন্দ বাবু দারুণ অপমানে ও ক্রোধে প্রস্থান করিলেও আবার তাঁহাকে ফিরিতে হইল। মানুষ ভাঙ্গিয়া দিলেও বিধাতা গড়িয়া দেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে অকস্মাৎ মুকুন্দ বাবুর শ্যালকের পত্নীবিয়োগ ঘটল। বরের বয়স সম্বন্ধে আপত্তি হইলেও আর কোন বিষয়ে আপত্তির কারণ ছিল না। যেমন ঐশ্বর্য্যের সুনাম তেমনি বংশ-গৌরব। পাত্রী মনোনীত করিবার হাঙ্গাম নাই। ভগিনীপতির উপরেই শ্যালকের অগাধ বিশ্বাস। তিনিই উভয় পক্ষের কর্ম্মকর্ত্তা।

মুকুন্দ বাবুর যুক্তি তর্কে তারাসুন্দরী এ বিবাহে অমত করিতে পারিলেন না। তাঁহার কঠোরপ্রকৃতি রাশভারী দাদাটিকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সংশয়ে সন্দেহে বরের বয়সের উল্লেখ করিতেই মুকুন্দ বাবু ধমকাইয়া উঠিলেন, "ব্যাটা ছেলের আবার বয়সের হিসাব কিসের তারি? মুক্তোর আবার বাঁকা সোঝা, গেছো মেয়ের যে এমন বর পাচ্ছিস এই তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। কত বড় বংশ, কত বড় ঘর, তার মূল্য তোর মত মূর্খ মেয়েমানুষ বুঝতে পারবে না, মেয়ে তোর রাজরাণী হবে। সোণায় মুড়ে থাকবে।"

আষাঢ়ের প্রথমেই বিবাহের দিন স্থির হইল। সময় সংক্ষেপ, কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে। বর বিলম্ব করিতে একেবারেই নারাজ, মাত্র শাঁখা শাড়ী দিয়া কন্যাদান এক্ষেত্রে বিলম্বের কোনই হেতু নাই। মার মন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কাজলকে বিদায় দিতে ব্যাকুল হইতেছিল। আহা একদিনও যে উহাকে দুইটি মিষ্টি কথা বলা হয় নাই, একটু আদর করা হয় নাই, চির আদরের ধন চির অনাদর উপেক্ষা বহিয়াই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে।

সেদিন গভীর নিশীথে মা মেয়ের মুখখানি বুকে চাপিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কাজল মা আমার, এইবার যে তোকে আপন ঘরে যেতে হবে, আর তুই দুষ্টামি করিস্ নে, অবাধ্য হোস্ নে, এক'টা দিন শান্ত হয়ে থাক্।"

কাজল তাহার বিবাহের সংবাদ কতক জানিত, কতক জানিত না। উদ্যোগ আয়োজনের প্রতি একদিনও দৃক্‌পাত করে নাই। পাঁচটা ছেলেখেলার মত এটাও সে খেলার মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছিল। মার হৃদয়ভারের সে ধারও ধারিল না, হাসিয়া বলিল, "মা যেন কি, মামা একজনাদের ডেকে আনলেই আমি বুঝি তোমায় ছেড়ে বাড়ী ছেড়ে অন্য খানে যাব, কাজল অত বোকা নয়। এতদিন আমরা বেশ ছিলাম মা, মামা কেন আমার সঙ্গে লাগাতে এলেন। উনি যেমন আমিও তেমনি মজা বুঝাচ্ছি, যখন ঘুমিয়ে থাকবেন পাকা দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব। মামার দাড়ি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

মাতুলের পক্ক দাড়ির দুর্দ্দশা কল্পনা করিয়া কাজলের হাস্য-স্রোত উচ্ছ্বসিত হইল। মা অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অবুঝ মেয়ের একই কথা "আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না মা, বিয়ে করবো না। আমি ত মিছে কথা বলি না, বিয়ে দিতে নিলেই পালিয়ে যাব।"

মার অন্তরাকাশ আশঙ্কার কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইল। মুকুন্দ বাবু শাসাইতে লাগিলেন তিনি কত দুষ্ট ঘোড়া গরুকে চাবুক কসিয়া শায়েস্তা করিয়াছেন আর এতটুকু মেয়েকে পারিবেন না? হাত পা বাঁধিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া আদরিণী কন্যার একগুঁয়েমীর ঔষধ ভালরূপেই দিতে পারিবেন।

কাজলের বিবাহের কথা, মুকুন্দ বাবুর শাসনের কথা কিছু জানিতেই শ্যামলের বাকী ছিল না। শ্যামলের সুখ-সূর্য্য হঠাৎ যেন অস্তাচলে গমন করিল, গৃহে শান্তি নাই, জীবনে আনন্দ নাই, বিশ্ব যেন নিরানন্দে ভরিয়া গিয়াছে। কাছে থাকিয়া শ্যামল কাজলের নির্য্যাতন দেখিতে পারিবে না বলিয়াই কলেজ খুলিবার পূর্ব্বেই সে রাজসাহী যাইতে সংকল্প করিল।

বিবাহের অল্পদিন বাকী এমন সময় তারাসুন্দরী শ্যামলকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, "একটা দিন থেকে যা বাবা, কাজলের রকম সকম দেখে ভয়ে আমি সারা হয়ে যাচ্ছি। ও কাউকে না মানলেও তোকে মানে, তুইও থাকবি না, আমি কি করবো?"

শ্যামল মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না কাকীমা, ভগবান কাজলের ভাল করবেন, শুভ করবেন, আমি বলচি কাজল আর পাগলামী করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। বিয়ে হয়ে গেলে আমায় একটা খবর দেবেন। রাজসাহী বাঙ্গাল বোর্ডিং ঠিকানা লিখলেই আমি চিঠি পাব।"

কাজল একটা বিড়ালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ভালুক নাচাইতেছিল। বিড়ালটাকে ছাড়িয়া দিয়া শ্যামলের প্রতি চোখ তুলিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আমি বিয়েই করবো না, তার আবার বাঙ্গাল বোর্ডিংয়ে চিঠি লেখা।"

শ্যামল তাহাকে নূতন করিয়া আর উপদেশ দিতে পারিল না। কাজলের মুখের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া সেই দিনই শ্যামল রাজসাহীতে রওনা হইল।

দিনের পর দিন আসিল, প্রভাতের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর প্রভাত। বরকে নৌকা-পথে আসিতে হইবে। নবীন আষাঢ়ের নব সমারোহের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বরের বয়স হইলেও অর্থের অহঙ্কার ছিল। বাসা বাড়ীর চারিদিকে তীব্র আলো জ্বালাইয়া বাজী পোড়াইয়া সেটা তিনি দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে ভালরূপেই জানাইয়া দিলেন।

বরের আগমনে নয়নবিভ্রমকারী শত আলো প্রজ্জ্বলিত হইলেও তারাসুন্দরীর কুটীরে একটি প্রদীপও জ্বলিল না। তাঁহার অন্ধকার হৃদয়-গগনে যে উদ্দাম উজ্জ্বল নক্ষত্র উদয় হইয়া স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিত সন্ধ্যা সূচনায় সে নক্ষত্রটি অন্ধকারে বনপথে হারাইয়া গেল।

৫

তখনো কলেজ খুলিবার বিলম্ব ছিল। ছাত্রেরা সকলেই অনুপস্থিত; বৃহৎ ছাত্র বাস একেবারেই নির্জ্জন। পাচক ও একটি ভৃত্য লইয়া শ্যামল বোর্ডিংএ ছুটি যাপন করিতেছে। বাক্স বন্দী বইগুলি এখনো খোলা হয় নাই। পরীক্ষার বছর হইলেও পড়ার প্রতি আদৌ মন বসে না। কাজলের বিবাহে যোগ না দিয়া ছুটি না ফুরাইতেই কেন যে শ্যামল চলিয়া আসিয়াছে এখন তাহা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পারিলেও মনটা তাহার ভাল নাই। বর্ষার সজল শ্যামল

যেমন প্রকৃতির ন্যায় শ্যামলের অন্তর একটা অব্যক্ত অজানা ব্যথায় বিষন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় শ্যামল দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া সম্মুখের সলিলবিপুলা উচ্ছাসময়ী পদ্মার পানে চাহিয়া ছিল। বর্ষা সমাগমে কলনাদিনী পদ্মা নব নব রূপে দর্শকের নয়নপথে প্রতিভাত হইতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া তটভূমি ধৌত বিধৌত করিয়া দিতেছে। পরপারের অস্পষ্ট মসীরেখা দিগ্‌চক্রবালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

নিম্নে পদ্মার শোভা, ঊর্দ্ধে মেঘের ঘনঘটা নিরীক্ষণ করিয়া শ্যামলের একজনকে মনে পড়িল। যাহার হাসিটি সুন্দরী পদ্মার মতই উদ্দাম আবেগময়। আঁখি দুটি সজল শ্যামল নীলাকাশের নিবিড় মেঘের ন্যায়। মুগ্ধ যুবক তাহার হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে মেঘের দীপ্তি, পদ্মার সলিল উচ্ছাস চাপিয়া একটি মূর্ত্তি গড়িতে লাগিল। কিন্তু মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ হইল না।

পশ্চাৎ হইতে চাকর ডাকিয়া বলিল, "বাবু একটি মেয়ে লোক আপনার সাথে দেখা করতে এয়েচে।"

ধ্যান ভঙ্গে শ্যামল বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ বুঝি ভিক্ষা চাইতে এসেচে। গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিয়ে বিদায় করে দে।"

বিনীতভাবে চাকর বলিল, "ভিকারীর মতন লাগলো না বাবু, ভদ্দরের মেয়ের মতন। অপ্প বয়েস দেখতে -"

শ্যামল ভৃত্যের সরস বর্ণনায় বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা ডেকে আন্—যত উৎপাত জোটে।"

ক্ষণকাল পর ভৃত্যের সহিত যে উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইল শ্যামল ভ্রমেও তাহা আশা করে নাই। এক সঙ্গে শত বজ্রপাত হইলেও সে বুঝি এত চমকিত হইত না। শ্যামলের বিস্মিত কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইল, "কাজল"।

ভৃত্য উভয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পাচকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া শ্রান্ত কাজল শ্যামলের পায়ের কাছে বসিয়া চুপে চুপে বলিল, "আমি পালিয়ে এসেছি শ্যামল। মা আমার কথা শুনলেন না; মামাকে নিয়েই থাকুন, কাজল কাজল করে কেঁদে কেঁদে অন্ধ না হ'লে আমি কখনো মা'র কাছে ফিরে যাব না।"

শ্যামলের চীৎকার করিয়া বলিতে সাধ হইল, "তুমি ফিরিয়া যাইবে কোথায়? যাইবার পথে নিজের হাতে কাঁটা দিয়া আসিয়াছ।" কিন্তু তাহা বলা হইল না। নিজেকে সংযত করিয়া শ্যামল ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কার সাথে এত দূরে তুমি কেমন করে পালিয়ে এলে কাজল? আজ না তোমার বিয়ের দিন?"

"সেই জন্যেই ত পালাতে হ'ল। এইবার দেখবো মামা কাকে বিয়ে দেন। পালাব আবার কার সঙ্গে, একলাই এসেচি। নদীর ধা'র দিয়ে সোজা রাস্তায় এখানে আসতে হয় তা বুঝি আমি জানি না। সন্ধ্যা বেলা বেরিয়ে সারারাত হেঁটে সকাল বেলা গরুর গাড়ীতে চড়ে এখানে এলাম। গাড়োয়ান কি আনতে চায়—হাতের বালা দু'টো খুলে দিলাম, তবে না পদ্মার ধারে এনে নামিয়ে দিলে। দেখ শ্যামল, সারারাত হেঁটে আমার পা দু'টো কেমন ফুলে গেছে; একটু পদ্মার জল ছাড়া কিছু খাইনি, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

কাজলের একটি কথাও শ্যামলের অবিশ্বাস হইল না। তাহার বাল্য সখীকে সে যত চিনিত তারাসুন্দরীও বোধ হয় ততটা চিনিতেন না। কাজলের রাগ হইলে, অভিমান হইলে শ্যামলদেব আম্রকানন বাঁশবন ভিন্ন সে অন্য কোথাও লুকাইত না। সেই চির পরিচিত আম্রকুঞ্জ বাঁশবন পরিহার করিয়া কি বিশ্বাস, কি নির্ভরতা লইয়াই না অবোধ বালিকা শ্যামলের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে, শ্যামল উহাকে কোথায় লুকাইবে। বালিকার বিষময় পরিণাম স্মরণ করিয়া শ্যামল মর্ম্মাহত হইল।

শ্যামলকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া কাজল পুনশ্চ বলিল, "আমি পালিয়ে এসেছি বলে রাগ করেছ শ্যামল? রাগ কি, আমায় কালই মার কাছে দিয়ে এস। তুমি সঙ্গে থাকলে মা আমায় মারতে পারবেন না।"

শ্যামল আবেগ ভরে কহিল, "তুমি কি করেছ কাজল, এ তোমার আমবাগানে লুকান নয়। মনে পড়ে চাটুজ্জেদের বিমলার কথা, সে রাগ করে রাতে একলা শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী পালিয়ে এসেছিল, এই পাপে বাপের বাড়ী

কোথাও তার জায়গা হল না, কাশীর আশ্রমে গিয়ে থাক্‌তে হ'ল? তোমার যদি সেই দশা হয়? কেন তুমি এটা করলে?"

কাজল বিমলার গল্প শুনিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, বিমলার প্রসঙ্গে গ্রামে এবং গ্রামান্তরে পলায়নের প্রভেদ আজ সে প্রথম বুঝিল। তাহার শরীর বেতস পত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বালিকার নিদ্রিত নারীপ্রকৃতি কোন সোণার কাঠির স্পর্শে সহসা জাগ্রত হইল। কাজল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্যামল মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কাজলের অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কান্না কিসের কাজল? তুমি আমার কাছে এসেছ আমিই তোমাকে মা'র কাছে ফিরে নিয়ে যাব। কিন্তু একটি কথা, যে বিয়ের ভয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ সেটা তোমার না করলে চলবে না। এখন আমি কোথায় বর খুঁজতে যাব? আমায় যদি চাও দিতে পারি।"

কাজল তেমনি নত নেত্রে বসিয়া রহিল।

শ্যামল হাসিমুখে বলিতে লাগিল, "চুপ করে থাকলে ত চলবে না কাজল, রাত আটটায় তোমার মামা লগ্ন ঠিক করেছিলেন, আমি লগ্ন ভ্রষ্ট করতে চাই না। কাছেই আমার পণ্ডিত মশায় আছেন, তাকে ডেকে এখুনি কাজ আরম্ভ না করলে, ভোর বেলা মা'র কাছে পৌছান যাবে না। তিনি তোমার জন্যে কত অস্থির হয়ে রয়েছেন। তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, কাজটুকু শেষ না হলে তোমায় খেতে দিতেও পারবো না। এখনো বল আমায় নেবে, না অন্য বর খুঁজতে যাব?"

অশ্রুভরা নয়ন দুইটি শ্যামলের দিকে মেলিয়া কাজল মৃদুস্বরে কহিল, "না অন্য বর নয়, তোমাকেই আমি"—

কথাটা শেষ হইল না। লজ্জায় কাজলের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

শ্যামল দুইখানি বাহুর সুনিবিড় বন্ধনে তাহার খেলার সাথীটিকে বাঁধিয়া কাজলের ললাটে একটি নির্ম্মল চুম্বন দান করিল।

গান

(সুর—"কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে")

[শ্রীহাসিরাশি দেবী]

দেখা কি পাবনা হে, এ দিন বিফলে যাবে,
থাকিয়া এই আঁধারে জীবন-দীপ নিভিবে?
বন কুসুম আনি', গেঁথেছি এ হারখানি,
তোমারই অনাদরে বিফলে শুখাইবে।
গগনে তারার মালা, রংয়েরই চলছে খেলা,
আজি শেষ হ'ল বেলা, কখন দেখা দিবে!
আজিকার ভরা নদী, শুখায়ে যায় হে যদি,
বাঁশী আর বাজবে নাক' দখিনা না বহিবে।
আঁধার যাবে মুছে, পাবনা সে দিন খুঁজে
পরশ তোমার বঁধু তবে কি হৃদয় পাবে॥

প্রাচীন ভারতের নারী

[শ্রীউমাশশী দেবী]

জগতের শীর্ষস্থানীয়া পূত পবিত্র পুণ্যময়ী ভারতমাতার অঙ্কস্থিত আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে নারী জাতির জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক মহীয়সী মহিলার পুণ্যময় জীবন, ত্যাগের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত ও মহিমামণ্ডিত। এবং প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের গৌরবময় ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে। হিন্দুজাতি চিরদিন নারীকে বহু উচ্চে দেবীর আসনে বসাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটী নিবেদন করিয়া পূজা দিয়া আসিতেছেন। এই পূজা ও সম্মান হিন্দুনারীর অবশ্য প্রাপ্য, ইহাতে আধিক্য কিছুই নাই। কেননা প্রেমে, ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বিবেকে, বিচারে, ক্ষমায়, সহিষ্ণুতায়, কঠোরে, কোমলতায়, শাসনে, পালনে, বিদ্যায়, বিনয়ে, স্নেহে, মমতায় তেজে ও মহিমায় আর্য্যরমণীগণ সর্ব্বস্থানে সর্ব্বাবস্থায় দেবী মূর্ত্তিতে ও মাতৃমূর্ত্তিতেই দেখা দিয়া আসিতেছেন। সে কারণ আর্য্য ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ইত্যাদি জ্ঞানী কর্ম্মী বা ভক্ত সকলেই নারীর মহিমা কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পড়িতেন। সর্ব্বশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে তার স্বরে নারী জাতিকেই ত্রিলোকপূজ্যা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের আদি-ভূতা, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি জগজ্জননীর অংশ বা বিভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়া নারীর গৌরব বাড়াইয়াছেন। এবং যুগে যুগে শত শত বা সহস্র সহস্র বার এই মহেশ্বরীর মহাশক্তির অংশ বা বিভূতি মাতৃগণই চিরপূজ্যা হইয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর কোন জাতির নারীগণ ত্যাগের এতখানি মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন জানিনা। জগতের কোন জাতির ইতিহাস এইরূপ মহীয়সী মহিলাদের জীবনী বক্ষে ধারণ করিয়া অক্ষয় অমর হইয়া আছে শুনি নাই। ভারতনারীর এ সম্মান স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি।

আর্য্যাবর্ত্তের চিরপূজ্যা সতী, সীতা, সাবিত্রী, কৌশল্যা, সুকন্যা, সুনীতি, দময়ন্তী, চিন্তা, ভদ্রা ইত্যাদি রাজকন্যা বা রাজরাণীগণ এবং গার্গী, অরুন্ধতী, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী লোপামুদ্রা ইত্যাদি চিরপূজ্যা ঋষিপত্নীগণের অপূর্ব্ব পুণ্যময়ী জীবনী বা নাম বাংলায় কে না জানেন? যুগ যুগ ধরিয়া রাজার প্রাসাদ হইতে দীন দরিদ্র কৃষকের পর্ণ-কুটিরেও এই সকল মহামহিমময়ী মাতৃগণের ইতিহাস মুখে মুখে কীর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু হায়, কোথা দিয়া কতদিন হইল সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। সেই চিরপূজিতা গরীয়সী মহীয়সী মাতৃগণ, সমগ্র পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষকে কতখানি স্মরণীয়, বরণীয়, রমণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতের অতীত যুগের ইতিহাস পড়িলে ও আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

যুগ চলিয়া গিয়াছে অতীতে কিন্তু বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া গিয়াছে তাহার ধ্রুব সত্য ও আদর্শ। যুগের পরিবর্ত্তনে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু আদর্শ আজও তেমনি উজ্জ্বল, অম্লান ও মধুর হইয়া আছে। যুগের পরিবর্ত্তনে, ভাবের পরিবর্ত্তনে আদর্শের মহিমা খর্ব্ব করিতে পারে নাই। অতীতের সেই সব মহীয়সী মহিলা-দের জীবনী যখনই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, ভাসিয়া উঠে, তখনই ভক্তিতে, প্রীতিতে, গৌরবে, শ্রদ্ধায় হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের সেই পূত পবিত্র পদ ধূলি মণ্ডিত ভারতের কোলে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা ভারতের মাতৃজাতি ভাবিয়া শ্লাঘায় গৌরবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। অতীতের সেই সব মহীয়সী মহিলারা দীক্ষায়, শিক্ষায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে, গৌরবে, তেজে, ভক্তিতে, প্রেমে, স্নেহে, ক্ষমায়, কঠোরে, কোমলতায়, ত্যাগে, গ্রহণে, সাধনে, পালনে, বিনয়ে, সরমে, শীলতায়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কর্ত্তব্যবোধে, হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব অবস্থায় স্বাধীন ভাবে, নিজের হৃদয়ে বিবেক ও বিচারকে জাগরূক রাখিয়া সংসার-ক্ষেত্রে স্নেহ-ময়ী কন্যার আসন, প্রেমময়ী পত্নীর আসন, মায়াময়ী ক্ষমাময়ী মায়ের আসন, মহামহিমময়ী দেবীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যুগ তাঁহাদের নশ্বর ক্ষণস্থায়ী রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীরের ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু অবিনশ্বর চিরস্থায়ী মহিমামণ্ডিত আদর্শের ধ্বংস করিতে পারে নাই।

এখন বুঝিতে হইবে, ভারতের অতীত যুগের এই সকল মহীয়সী মহিলারা কোন পথ অবলম্বন করিয়া কঠোর দায়িত্ব-পূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া জগতে পবিত্রতার আধার মাতৃমূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া পূজা লইয়া আসিতেছেন। বিশদ ভাবে ইঁহাদের জীবনী আলোচনা করিবার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি আমার নাই। তবুও হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহারই আলোচনা করিয়া বুঝিতে ও বোঝা-ইতে চেষ্টা করিব। অক্ষম হইলে সকলেই স্নেহের দৃষ্টিতে ক্ষমা করিবেন সন্দেহ নাই।

নারী প্রতিষ্ঠিত হন অনেকগুলি গুণের অধিকারিণী হইলে। তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ তিনটী। প্রেম ত্যাগ এবং ক্ষমা। প্রেমে মানবহৃদয় কোমল, ত্যাগী, পবিত্র, শক্তিশালী ও উন্নত হয়। ক্ষমায় সে হৃদয় আবার সহন-শীল হয়। এবং ত্যাগে স্বাধীন শক্তি অর্জ্জন করে ও বিচারশীল হয়। প্রেমে মানব হৃদয় কি পরিমাণে কোমল ও দৃঢ় হয় এবং কি মধুর ভাবে হৃদয় বিকশিত হয়, তাহা অতীত যুগের একটী পতিব্রতার জীবনী আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। জানিনা কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না। না পারার সম্ভাবনাই ষোল আনা রহিল, তারপর সেই সাধ্বীর কৃপা।

এই সাধ্বী পতিব্রতা রমণী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতির একমাত্র স্নেহময়ী আদরিণী কন্যা ছিলেন। এই রাজকন্যার নাম পতিব্রতা সুকন্যা। রাজকন্যা সুকন্যা ভারতপ্রসিদ্ধ চিরপবিত্র সূর্য্যবংশ বা অযোধ্যার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বংশকে ধন্য করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা শর্য্যাতি। এই মহীয়সী নারীর জীবনী আলোচনা করিবার মত শক্তি বা সাহস আমার নাই। তথাপি সেই জগৎপূজিতা পতিব্রতার মধুরাদপি মধুরতম হৃদয়খানি প্রেমে ত্যাগে জগতের সমক্ষে চিরদিন উজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমার ভাবের ভাষার অক্ষমতা অজ্ঞতা কিছুতেই তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বলতা বা পবিত্রতা এবং মধুরতা ম্লান করিতে, খর্ব্ব করিতে পারিবে না।

ইতিহাসের দিক হইতে সুকন্যার জীবনী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ হিন্দু বিদুষী রমণী মাত্রেই সুকন্যার নাম এবং জীবনী অবগত আছেন। তাহা হইলেও সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে বলা যাইতে পারে তিনি অযোধ্যার রাজা মহাত্মা শর্য্যাতির কন্যা ছিলেন। মহর্ষি চ্যবনের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। নাম তাঁহার সুকন্যা। স্বাধীনতার দৃঢ়তার প্রেমের ও ত্যাগের এবং বিচারশক্তির ও নারীহৃদয়ের কোমলতার সহিষ্ণুতার দিক হইতে আলোচনা করিলে আমার যাহা বলিবার উদ্দেশ্য তাহার কিয়দংশ বলা হইবে মনে করি।

একদা ঋষিদিগের পরম পবিত্র ও চির শান্ত তপোবন ভ্রমণের বাসনায় রাজবালা অপূর্ব্ব রূপবতী কিশোরী সুকন্যা চির প্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমখানি পরম পবিত্র ও চির শান্ত। তথায় মহর্ষি চ্যবনের মত জ্ঞানী বিজ্ঞ প্রাচীন ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। আশ্রমপালিত শান্ত পশুপক্ষী রমণীয় বৃক্ষলতা ও স্নেহশীলা নির্ঝরিণী বেষ্টিত ঋষির আশ্রমখানিতে সুকন্যা উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার হৃদয়খানি ভক্তি ও প্রীতিমাখা পবিত্র-তার বিমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাজকুমারী চঞ্চলা হরিণীর মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি সেই আশ্রমের এক পরম রমণীয় নিভৃত অংশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী মাটীর ঢিপির মধ্যে দুইটী ছিদ্রপথে একটা তীব্র জ্যোতির মত আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। সুকন্যা ভাবিলেন, একটা কীট বা পতঙ্গের দেহজ্যোতি। ইহা ভাবিয়া কিশোরী রাজবালা সুকন্যা দুইটী তীক্ষ্ণ কণ্টক সেই উভয় ছিদ্র পথে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, তাহা হইলেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উক্ত জ্যোতিষ্মান কীট বা পতঙ্গ বাহির হইয়া পড়িবে এবং তিনি তাহা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। রাজকুমারী তখন বুঝিতে পারেন নাই যে এই কৌতূহল ও চপলতার পরিণামে কি সর্ব্বনাশের সৃষ্টি হইতে পারে। সুকন্যা যে ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি দেখিতে পাইয়াছিলেন উহা হীনপ্রাণ কোন কীট বা পতঙ্গের দেহজ্যোতি নয়। উহা মহর্ষি চ্যবনের চক্ষুবিনির্গত উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতি, ছিদ্রপথে নির্গত হইতেছিল।

মহর্ষি চ্যবন বহুদিন যাবৎ ব্রহ্মধ্যানে সমাধিস্থ ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিয়া কতকগুলি উই পোকা বাসা বাঁধিয়া মাটীর ঢিপির মত করিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক ব্রহ্মজ্যোতিসম্পন্ন মহর্ষির চক্ষু দুটী আচ্ছাদন করিতে পারে নাই। রাজকন্যার কণ্টকে বিদ্ধ হইল মহর্ষি চ্যবনের চক্ষুদ্বয়। মহাত্মা চাবন সহসা চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত হইবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। এবং মন সমাধি হইতে বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিবা মাত্র, মহর্ষি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কে অকারণ তাঁহার চক্ষু দুটী বিনষ্ট করিবার কারণ হইল উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুকন্যা তখন ভয়ে ক্ষোভে বিষাদে অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপ সময়ে রাজকন্যার সখী সুকন্যার পিতা রাজা শর্য্যাতিকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া ঋষি সমীপে উপস্থিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে মহর্ষি চক্ষুহীনতার দুঃখ প্রযুক্ত শোকে ক্ষোভে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ক্রোধযুক্ত অবস্থায় অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলেন। সুকন্যার পিতা তৎক্ষণাৎ গল-লগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে মহর্ষির চরণে পতিত হইয়া অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা শর্য্যাতির তাদৃশ অনুনয় ও বিনয়ে মহর্ষি শান্ত হইলেন ও অভিসম্পাতে বিরত হইলেন। কিন্তু চক্ষুহীনতার দুঃখে অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি চাবন কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়, আজি হইতে চিরদিনের নিমিত্ত প্রকৃতি মাতার এই অসীম সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আমার নিকট চির অন্ধকারের গর্ভে নিহিত হইল। আর সে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রকৃতি রাণীর চির আদরিণী বালিকা কন্যা ঊষার রাগরক্ত মাখা স্নিগ্ধ নগ্ন সৌন্দর্য্য, অরুণের উদয়কালীন লালিমামাথা পবিত্র মাধুর্য্য, সায়াহ্নে অস্তগামী প্রাচীন ভাস্করের বিদায়কালীন শেষ রশ্মিটুকুর মধুরতায় ভাবে ভরা বৈরাগ্যময় দৃশ্যাবলী, প্রকৃতির বিষাদময়ী কন্যা সন্ধ্যারাণীর আলো আঁধারে মেশা ম্লান ধূসর শান্ত পবিত্র মাধুর্য্যভরা কান্তিটুকু পার্থিব দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আমার হৃদয়কে আর সেই ব্রহ্মানন্দের আনন্দে অভিভূত করিয়া চির শান্ত চির পবিত্র বৈরাগ্যভরা শান্তির ধারা ঢালিয়া দিবে না। বনদেবীর অঙ্কস্থিত আমার এই চির শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র আশ্রমখানির অঙ্কে বাস করিয়াও আমি আমার ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে পার্থিব দৃষ্টির দ্বারা অভিনন্দিত করিতে পাইব না। ইহা অপেক্ষা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের কারণ জগতে আর কি হইতে পারে!

অসীম করুণাময় বিশ্বপতি কি কুকর্ম্মের ফলে এই স্থবির বৃদ্ধাবস্থায় ঈদৃশ গভীর দুঃখ-সাগরে নিপতিত করিলেন আমাকে। এইরূপ নানা বিপর্য্যয়ভাবে অভীভূত হইয়া মহর্ষি চ্যবন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তরুণী রাজবালা সুকন্যার হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হইল। তিনি এক মুহূর্ত্তকাল নিজ হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে সুকন্যার কর্ত্তব্য স্থির হইবা মাত্র সেই রাজার দুলালী বিদূষী অপূর্ব্ব রূপবতী কিশোরী রাজকন্যা করজোড়ে বৃদ্ধ স্থবির ঋষি মহর্ষির চাবনের পদতলে পতিত হইয়া মধুর ভাষায় নিজ প্রার্থনা জানাইলেন।

রাজবালা সুকন্যা স্নেহবিগলিত হৃদয়ে মধুর ভাষায় বলিলেন, "প্রভো, ধৈর্য্য ত্যাগ ও ক্ষমা ভবদীয় মহর্ষিগণের স্বভাবজাত বলিয়া আপনি অনায়াসে আমার ঈদৃশ কঠোর অপরাধ ক্ষমা করিলেন। হে মহর্ষি, সেইরূপ আমার হৃদয়ও আপনার দুঃখে রমণীহৃদয়সুলভ স্নেহে ও মমতায় অভিভূত হইতেছে। আমি জানি আমি অজ্ঞানা এবং আমার এই কঠিন অপরাধ জ্ঞানকৃত নয় বলিয়া আপনি ক্ষমা করিতেছেন। প্রভো, চপলমতি বালিকা ভাবিয়া যদি ক্ষমাই করিলেন তখন আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়া আমার নারীজীবন ধন্য করুন। পরম পূজ্য স্নেহের আধার পিতা কর্তৃক বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও যে সুকন্যার বিবাহে আদৌ অভিরুচি ছিল না আজ সানন্দে স্বেচ্ছায় সেই সুকন্যা পূর্ণ হৃদয়ে আপনার চির পবিত্র কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবার অনুমতি চাহিতেছে। হে মহর্ষে, অনুমতি দিন আমি চিরদাসীরূপে আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভো, এই অজ্ঞানা নারীকে আপনার ধর্ম্মময় জীবনের চির সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করুন। আমি আমার নিজ চক্ষু দিয়া এই জাগতিক দৃশ্যাবলী আপনাকে দর্শন করাইব। প্রত্যহ নিজ মুখে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের ও সায়াহ্নের বর্ণনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাইব। আপনার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গিনী এবং চিরদাসীরূপে আপনার সেবা করিয়া ধন্য ও

কৃতার্থ হইতে অনুমতি চাহিতেছি। হে স্বামিন্, আমি আশা করি একদিন আমার প্রেম আমার সেবায় আমি আপনাকে আনন্দিত করিয়া আপনার করুণা লাভ করিতে সক্ষম হইব। এ দাসীর ঐকান্তিক প্রেমে নিশ্চয়ই আপনি সন্তোষ লাভ করিবেন। হে মহর্ষে, আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনার শ্রীচরণ ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন ”

তখন মহর্ষি চ্যবন রাজকন্যার সরলতায় এবং দৃঢ়তায় ও স্নেহময় কাতর কণ্ঠে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, “হে রাজকুমারী যাহা হইবার. তাহাই হইবেই। বিধিলিপি অবশ্যম্ভাবী, সে নিমিত্ত অনুশোচনা করিয়া আর কোন লাভ নেই। আমি প্রাচীন বনবাসী ফলমূলাহারী ঋষি। তুমি রাজকন্যা রাজার দুলালী, তুমি কি নিমিত্ত বালিকাসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া এই স্থবির ঋষির কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়া ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অতঃপর গভীর দুঃখ সাগরে চিরনিমগ্ন হইবে? যাহা হইবার হইয়াছে। ঘটনাচক্র মানবের ইচ্ছাধীন নয়, সকলই নিয়তি। তোমার স্নেহময় জনকের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া যাও। অয়ি রাজকন্যা, আমিও অতঃপর আমার দুঃখময় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া পরব্রহ্মে লীন হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হই।”

কিন্তু রাজবালা তরুণী সুকন্যার দৃঢ় সঙ্কল্পে ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অগত্যা মহর্ষি চ্যবন সুকন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন রাজকুমারী স্নেহময় জনকের হৃদয়ের শত সহস্র কাতরতা উপেক্ষা করিয়া চিরতরে সমগ্র রাজভোগে জলাঞ্জলি দিয়া স্থির চিত্তে সানন্দ হৃদয়ে স্থবির ঋষি চ্যবনের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়া বনবাসিনী ঋষিপত্নী হইলেন। বিদুষী পতিব্রতা সুকন্যা রাজার দুহিতা হইয়া কায়মনচিত্তে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তরুণ হৃদয়ের সমগ্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি স্থবির চক্ষুহীন বৃদ্ধ ঋষিচরণে অর্পণ করিয়া মহর্ষির সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া সাধ্বী রমণী গণের অগ্রগণী হইলেন।

এই রাজকন্যার একনিষ্ঠ অলৌকিক প্রেমে অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্পে এবং কঠোর ত্যাগে দেবলোকে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। দেবলোকবাসী দেবতারা মর্ত্তবাসিনী মানবী সুকন্যার একনিষ্ঠ প্রেমে ও অলৌকিক ত্যাগে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ত্রিদিববাসিনী দেবীবৃন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন।

অপূর্ব্ব রূপবতী রাজার দুলালী এই তরুণী কন্যার কি কঠোর ত্যাগশক্তি, কি অপূর্ব্ব মহিমাপূর্ণ বিচারশক্তি, কি পবিত্র মাধুর্য্যময় প্রেমে পূর্ণ হৃদয়, কি অবিচলিত দৃঢ় সঙ্কল্প কি স্নেহবিগলিত কোমল মমতাপূর্ণ নারী হৃদয়! যখনই এই মহীয়সী নারীর অপূর্ব চরিত্র কঠোর আত্মত্যাগ এবং আত্ম-হারা প্রেমের কথা স্মরণপথে উদিত হয় তখনই মনে হয় অতীত যুগে আর্য্য রমণীর অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় কোনও কাজই ছিল না।

সেই পুণ্যময়ী ভারতভূমিতে পবিত্রতার আধার আর্য্যাবর্ত্তের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য নারী আমরা কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছি ভাবিলে হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে।

বাসন্তী-জ্যোছনায়

[শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ]

আমার গৃহের লক্ষ্মী তোমারে আজি দু'টি কথা কই,
উজ্জল করিতে এ গৃহ আমার কেহ নাহি তোমা বই।
লক্ষ্মীর আল্পনা
তুমি দেবে হেথা গৃহের লক্ষ্মী এ ত নহে কল্পনা।
তোমারি স্পর্শ আনুক্ হর্ষ প্রীতির মধুর গানে—
প্রতিষ্ঠা তব হে চিরন্তনী—উৎসব-আহ্বানে।
আকাশে বাতাসে ঐ হের শ্বসে প্রেমিকেরি অন্তর;
তুমি পড় সেথা লাজ-পবিত্র শান্তির মন্তর।

এ গৃহ মাঝারে প্রতিষ্ঠা তব শান্তির দেবি! অয়ি!
আনো কল্যাণ মঙ্গলক্ষণে আয় কল্যাণময়ি!
সদা কল্যাণ-পাণি—
করিবে প্রণয় প্রীতির আরতি জানি তা' সত্য জানি।
বিহগ গাহিছে মিলনের গীতি, বহে দক্ষিণ বায়;
তরুর পুলক জ্যোছনার ধারে ঝরে ব্রততীর গায়।
আজি বসন্ত জাগ্রত হের মধু ক্ষরে অমরার,—
এস লুঠে নিই আশীষ-বারতা মিলনের দেবতার।

প্রাঙ্গণ মোর উন্মুখ সদা লভিতে চরণধূলি।
মন্দিরে চাহে শুনিতে দেবতা কুণ্ঠা-কোমল বুলি।
অন্তরে সখি তায়—
মিলনের মীড়ে সুর সেধে নিয়ে প্রেমিক ভিখারী গায়
বাঁরোয়া রাগিণী বাঁশরী গাহিছে চঞ্চল প্রেরণায়,—
করুণারূপিণী, কবি করুণার মানসী তোমারে চায়।
লুব্ধ বুকের স্নিগ্ধ প্রেমের বাসন্তী শিহরণ;
কোজাগর তব গৃহের লক্ষ্মী, সার্থক জাগরণ।

ভাঙন

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

[বাঙ্গালীর শক্তি অন্তর্মুখী, ব্যক্তির মধ্যে বহু ছাঁদে বহু বর্ণে জ্বালা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াই তাহা শান্ত। বহির্জ্জগতে, প্রত্যক্ষ কর্ম্মরাজ্যে, নিজের নাম যেখানে সেখানে সর্ব্বত্র খোদাই করিতে সে শক্তি উদাসীন ও অপটু। তাই শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ, শক্তিহীনতার আরোপ যখন তখন প্রতিবাদ করাও তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য; কিন্তু এই শক্তি তাহার প্রচুর, বাঙ্গালীর ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য, বর্ত্তমান ইতিহাস ইহার সেরা সাক্ষ্য। জগতের মধ্যে বহির্মুখী শক্তি-সম্পদে ইংরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্দ্ধ পৃথিবী ঘেরিয়া তাহার নিপুণ শাসন-জাল। জনবুলের নাম তাই মরুপথে, গিরি-শৃঙ্গে, সন্ধি বিগ্রহে, তৈজসের পরিচয়-চিহ্নে, সর্ব্বত্র রূঢ় পরুষ হস্তে খোদিত দেখিতে পাই। সেই ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর আজ দুই শত বৎসরের ঘনিষ্ঠতা। সমস্তরের বন্ধু হিসাবে নহে, শাসক প্রভু ও শাসিত প্রতিহত হিসাবে—অবশ্য একথা সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য; ইংরাজ সমগ্র ভারতের নিয়ন্তা, তবে বাঙ্গালীর মত অন্য কোনও ভারত-বাসী ইংরাজকে লইয়া খেলা করে নাই। আর সকলে যখন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট, সন্দিগ্ধ ব্যবধানের অন্তরালে নিরাপদ; তখন বাঙ্গালী ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া, তাহার হাতে ধরা দিয়াও অবলীলায় অক্ষতদেহ। শক্তির পরিচয় এই। আর এক পরিচয় বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধ্যে, তাহার চরিত্রে। সেখানে নিগূঢ় রহস্যে, বৈচিত্র্য-সম্পদে, জটিলতার আবর্ত্তে এই শক্তির সহজ স্বাভাবিক স্ফুরণ। পল্লী-সমাজে এই শক্তি বিশুদ্ধ ও অক্ষুণ্ণ, কারণ পল্লী-জীবনই বাঙ্গালী-প্রাণের প্রকৃত আধার।

অনেকের বিশ্বাস, অন্য শক্তির সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শক্তির পরিণতি নাই। বিশ্বের এক এক যুগ-সমস্যায়, এক এক জাতি তাহার ভাব ও চরিত্র-সম্পদ লইয়া পথ-প্রদর্শক হইয়াছে, হইতেছে; বাঙ্গালীর এরূপ ভাগ্য এখন কল্পনারও অতীত। তবে অনেকের আশা বিলম্বে হইলেও এক সময়ে বাঙ্গালী তাহার বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ রূপেই বিশ্বের চক্ষে সার্থক হইয়া উঠিবে।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালী চরিত্র, জীবন, সমাজ অতি উপাদেয় অনুশীলনের ও গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; জগতে কোন সমাজে ব্যক্তিত্বের এই অভিনব অন্তর্মুখী বিকাশের জোড়া নাই। বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব ও এই বিরোধী-অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহার লীলা, বর্ত্তমান জাতীয় জীবন—এই দুইয়ের যোগাযোগে বাঙ্গালীর পরিচয়। জগত একদিন এই পরিচয়ের আলোচনায় মুখর হইবে এই স্থির বিশ্বাসে বাঙ্গালীর চরিত্র লইয়া এই উপন্যাস। ভাঙ্গন বেশ স্পষ্ট, সর্ব্বত্র তাহার প্রকোপ কিন্তু পত্তন কোথায়?]

-:*:-

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রামের দক্ষিণে বিশাল প্রান্তরের প্রায় মধ্যস্থলে বিপুল বট গাছ,—অতি প্রাচীন, স্থবির ও বিজ্ঞের মত, নিতান্ত একাকী। এই বিরাট মাঠের সে-ই একমাত্র অলঙ্কার ও শোভা।

যেখানে নদীর ধারে গ্রামের ঘাট, সেই পর্য্যন্ত এই মাঠের একটী কোণ আর সেইখান হইতে মাঠের উপর দিয়া পথ মানুষের জন্য, পশুদের জন্য এবং কদাচিৎ বা কালে ভদ্রে 'মেঠো ঘোড়া'র সোয়ারীর জন্য।

শ্রীনগর গ্রামের বিশেষত্ব এই মাঠ আর এই মাঠের বিশেষত্ব তাহার নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার। সে যেন অন্য সমস্ত গ্রামকে সুদীর্ঘ ব্যবধানে সযত্নে প্রতিহত করিয়া দূরে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়াছে। এমন কি বেচারী নদীটি পর্য্যন্ত তাহার পাল্লায় পড়িয়া ভয়ে দূরে সরিয়া চলিতেছে। মাঠের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই বুড়ো বট,—মাঠের পথ এই বটের ছায়ায় বিশ্রামের লোভে তাহার গোড়া ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মোটা মোটা ডাল, বড় বড় জটা আর গোড়ার চারি-দিকে উৎসুক দিবালোক-প্রয়াসী শিকড় যেন মা ধরিত্রীর

অন্তর তুচ্ছ করিয়া বাহিরে আসিয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইতেছে—বুড়া বটের সেই তলায় যেন তাহারা নবীন কায়দায় আসর সাজাইবে। গাছে উঠিলে দুই ক্রোশ দূরে গ্রামের বাঁধান ঘাট,—নদী তাহাকে পরিহার করিতে অভি-মানে কাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে,- গ্রামের কতকাংশ, ওধারের চাষের ক্ষেত, সব দেখিতে পাওয়া যায়। আর বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আরও দূরে যেখানে মেঠো পথ খেয়াঘাটে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়াছে, আর নদীর অপর পারে পাড়-ঘেঁষা আল-বাঁধা শস্য-ক্ষেত্রগুলি দেখা য য়।

রাজুগোপ গ্রামের জমিদারদের নিতান্ত আপনার লোকের মত, বড় কর্ত্তা ব্রজকিশোর নায়েব ইন্দ্র সরকারের কাছে এই কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, সকলেই একথা মানে, কেবল রাজুই শুনিলে গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া থাকে।

রাজুর নিজের গরু বাছুর বলদ আছেই, জমিদার-বাড়ীর কানায় কানায় পূর্ণ প্রকাণ্ড গোয়াল তাহারই তত্ত্বাবধানে বাড়িতেছে। বছরকার চাষ চাকরাণ জমিও খানিকটা আছে আবার আবশ্যক মত কাছারীর কাজে গোমস্তাদের সঙ্গে মহালে যাওয়াও আছে, তখন রাজুর গায়ে কুর্ত্তা হাতে লাঠি। এই সমস্ত স্বত্ব কর্ত্তব্যাদি তাহার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। ভিটেখানি বেশ গোছাল, সংলগ্ন ফলকর বাগান তো আছেই।

রাজুর বয়স বাইশ তেইশ হইবে। তাহারা দুই ভাই, ছোট ফকির এতদিন গ্রামেই ছিল, গরুর গাড়ী চালাইত, বৎসর পূর্ব্বে একদিন ধুত্তোর বলিয়া কলিকাতা যাত্রা করি-য়াছে। সেইখানে সে এখন কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ, মধ্যে একবার আসিয়াছিল। কলিকাতায় রোজগার মন্দ নয়, খরচ বেশী এই পর্য্যন্ত।—

রাজুর স্ত্রী মালতী, নদীর ওপারে 'তিলটে'র বিনয় ঘোষের মেয়ে, এই বিনয় ঘোষের ঠাকুর্দ্দার আমলে, শোনা যায় একটি হাজার-দোহা গাই ছিল—যাই হউক শাশুড়ী মারা যাইবার পর হইতে, এই দুই বৎসর মালতী রাজুর সংসার দেখিতেছে, পিত্রালয়ে ঘন ঘন যাত্রা ও সুদীর্ঘ অবস্থানের আর সুযোগ নাই।

রাজুর দৈহিক ক্ষমতা বিখ্যাত, লাঠি হাতে দাঁড়াইলে কথাই নাই, খালি হাতেই পাঁচজন মরদ তাহার কাছ ঘেঁষিতে ইতস্ততঃ করিত।—লাঠি খেলাও তাহার ছিল চমৎকার—কিন্তু সে ছিল নির্ব্বিবাদী, তাহার ব্যবহারে ভঙ্গীতে রূঢ়তা প্রকাশ পাওয়া দূরের কথা, একটা শান্ত মিষ্ট ভাব স্থির বিরাজ করিত। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে লজ্জাটা পুরুষের আসে, সেই ভাবটি সময় অতিক্রান্ত দেখিয়াও ছাড়ি ছাড়ি করিতে করিতে আজও রাজুকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

শৈশব তাহার কাটিয়াছে বাপের সঙ্গে, মাঠে ক্ষেতে, জমিদার-বাড়ীর গোশালায়, আর ব্রজকিশোর বাবুর সর্ব্বস্বধন বংশরক্ষক খোকাবাবু ললিতকিশোরের একাধারে আনুচর্য্যে ও তত্ত্বাবধানে। তারপর উপযুক্ত বয়সে, বরকন্দাজ, খোট্টা সর্দ্দারের কাছে কুস্তি কসরৎ শিক্ষায়, গ্রামের আড্ডায় লাঠিবাজী অভ্যাসে—এইরূপে সে সকলের অলক্ষ্যেই বড় হইয়া উঠিতেছিল। বাপ মারা যাইবার পর সে যে কতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা যেন বুঝিতে পারিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এই তো সেদিনকার ছেলে গো—যাক্ সে আজ তিন বৎসরের পূর্ব্বের কথা, এখন আর কেহ রাজুকে ছেলে মানুষ ভাবে না। তাহার আকৃতি বেশ দীর্ঘায়তন, হস্তপদ লম্বা ঢিলাধরণের, আলগা, স্বাভাবিক চালচলন ধীর শান্ত, অবয়বাদিপ্রক্ষেপে লক্ষ্যভ্রষ্ট ভাব একেবারে নাই, বিশ্বাসে অনিশ্চিত ভাব নাই—বাহ্যিক ব্যক্তিটির সহিত তাহার নিরীহ মুখভাব আর মেয়েলি চাহনি বেশ খাপ খায়—কিন্তু এই মানুষকে কোনও শারীরিক শ্রম-সাধ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময় একেবারে অন্যরূপ দেখা-ইত,—যেমন অবসর সময়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাদল এবং ড্রিলের বাঁশী বাজার পর শ্রেণীবদ্ধ পল্টন—সেইরূপ স্ফীত জীবন্ত পেশী আর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখন অদ্ভুত অন্তর্নিহিত শক্তি ব্যক্ত করিত নাক মুখ বেশ মানানসই, ভদ্রোচিত, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম।

এ হেন রাজুর সংসারে একটি মাত্র মোহ ছিল—সে ললিত, বর্ত্তমানে কলিকাতায় কলেজের ছাত্র। অতি শৈশবে ছাড়া রাজু ললিতের সহিত 'কায়ার সঙ্গে ছায়া'র ন্যায় মিশিবার একটানা সুযোগ না পাইলেও ললিত যেন ছিল তাহার নিয়তি, ললিতের কথায় সে উঠিত বসিত। ললিত রাজু অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

ললিত মাতৃহীন। সৎমা আছেন, তাঁহার পুত্র নাই, দুইটী কন্যা। তাহারাও বিবাহিত, শ্বশুরালয়ের তীক্ষ্ণ মর্য্যাদা-জ্ঞানের নজরবন্দী। ললিতের এক দূর সম্পর্কীয় নিজের মামা আছেন, গ্রাম্য মাইনর ইস্কুলের মাষ্টার জ্ঞানবাবু। তিনি ললিতের গৃহশিক্ষক, তাহার বাল্যজীবনাকাশের নিত্য বিদ্যমান ধূমকেতু, অক্লান্ত শাসনপুচ্ছে সমৃদ্ধ। বলাবাহুল্য এই ইস্কুলটির প্রতিপালন জমিদারীর উপর একটি অতিরিক্ত বেসরকারী কর-ভার,—সদরস্থ হাকিমবৃন্দের তুষ্টি সাধনার্থ। ললিতের আর আছে, পিসী দিদি খুড়ী,—এইরূপ অনেক-গুলি, যাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক না থাকিলেও বৃহৎ সংসারে একত্রে বাস করিতে হয়

ললিত বাড়ীতেই পড়িত।—তিন বৎসর পূর্ব্বে রাজুর হৃদয়-সমুদ্র আলোড়িত মথিত করিয়া, পিতার উপদেশের দুর্ব্বোধ্য বোঝা, বিভিন্ন প্রকারের রকমারী বিদায়-সম্ভাষণের মেলা, চাকর পাচক তৈজসপত্রের সম্ভার লইয়া সে একুশ মাইল দূরে সহরের এন্ট্রান্স স্কুলে পড়িতে গেল। অলক্ষ্যে তাহার সমভিব্যাহারী হইল তাহার 'দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ'—নূতন রঙ্গে রঞ্জিত হইতে। এক বৎসর পরে বাড়ীতে বিরাট ধুমধাম, দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব ঘোষণা করিল—তখন সে নিজে সেই সমারোহের একটি কোণে নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় উপস্থিত ছিল। রাজুর সেই দিনকার উৎসাহ এখনও গ্রামের আলোচ্য প্রসঙ্গ হইয়া আছে—বড় ভাণ্ডার হইতে যজ্ঞকাণ্ডের সেই প্রকাণ্ড কড়া আর গামলাগুলি যখন সে একাই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ভিয়ান-বাড়ীর উঠানে স্তূপাকার করিল, তখন জ্ঞানবাবুর সেইদিনকার ক্লান্তিহীন গর্জ্জন ক্ষণতুষ্ণীম্ভাব ধারণ করাতে বিস্ময় ও প্রশংসার নানা অস্ফুট শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ব্রজকিশোরের প্রশংসার সীমা রহিল না, "মাষ্টার মশাই, দেখেছো এমন ক্ষমতা মানুষে না ভাবতে পেরেছে কখনো ?"—দ্বিতীয় পক্ষের পর হইতেই পুত্রের শিক্ষক জ্ঞানবাবু তাঁহারও মাষ্টার মশাই হইয়াছেন।

এই ঘটনার পর দুই বৎসর হইল কলিকাতার শ্রেষ্ঠ কলেজে সে 'এলে' পড়িতেছে ; তাহার সহপাঠী জ্ঞানবাবুর পুত্র অক্ষয় বহরমপুর কলেজে পড়ে। এক বৎসর হইল অক্ষয়ের বিবাহ হইয়াছে, আর ব্রজকিশোর অদ্যাবধি অর্দ্ধেক রাজত্বযুক্তা রাজকন্যার সন্ধান পান নাই।

ব্রজকিশোর নিজে এক রকমের লোক ছিলেন,—তাঁহার প্রকৃতিতে দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ ও নিষ্ফল দ্বন্দ্ব সদা বর্ত্তমান। স্বীয় ব্যক্তিগত দোষ নিজের নিকট আদৌ অপরিচিত নহে, এমন কি তীক্ষ্ণ আত্ম-সমালোচনায় স্বীয় অন্তর জর্জ্জরিত করিতে সদা অকুণ্ঠিত, কিন্তু কোনও দুর্ব্বলতাকেই সাময়িক ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পরিহার করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত। আবার মতামত হিসাবে সমক্ষে তিনি সহজেই পরাজিত, কিন্তু জনান্তিকে তাঁহার দৃঢ়তা জিদের সীমানায় বিচরণ করিত। নিজের দৌরাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াও সেই দৌরাত্ম্যের নিকট তিনি নিতান্তই কাবু। বেচারী সমগ্র জীবনটা 'ভগবানের মানব-চরিত্রে' দ্বন্দ্বসৃষ্টির নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিতে দিতে ও সাহিত্যিকগণের প্রিয় 'সুমতি কুমতির রণক্ষেত্রসমাবেশের' ভার লইতে লইতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া একাধারে দার্শনিক, বিলাসী ও মাষ্টার-মহাশয় রূপে জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িয়াছেন।—আচরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও অবিচলিত মতামত নিজের বেলায় এতাবৎ সঙ্কোচে ওলট পালট হইয়া আসিয়াছে। স্বচক্ষে কাহারও কষ্ট দেখিতে অপারগ, কিন্তু অলক্ষ্যে কষ্টের কারণ হইতে দ্বিধা তাঁহার নাই। শরীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কার্পণ্যহীন, বয়সগুণে ঢিলঢালা হইয়া আসিলেও বেয়াড়া বেখাপ্পা নহে। মুখশ্রী সম্ভ্রান্তোচিত, বর্ণ গৌর, কেশ বিরল, কিন্তু সমভাবে বিন্যস্ত চক্ষুদুটী বড় চঞ্চল। সুস্থ সবল মনে হইলেও পর্য্যবেক্ষণের ফলে নাছোড়বান্দা স্থায়ীরোগ যে 'বাস্ত' আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়---বেশভূষা সদা পারিপাট্য-মণ্ডিত।

বাড়ীতে মনোহর সখের পুষ্পোদ্যান, বনিয়াদী দীর্ঘিকা, ঠাকুরবাড়ী অতিথিশালা আছে—কোনও উপকরণের ত্রুটি নাই, ব্যবহার না থাকিতে পারে। সম্প্রতি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, বহুদিন প্রবাসী কনিষ্ঠের জিদে ও অবিরাম তাগাদায় ইহার অভ্যুদয়—জমিদার অট্টালিকার শোভা এই নব কীর্ত্তিতে খর্ব্ব হয় নাই, জাঁক আরও জমাট পাকাইয়াছে।

সঙ্গীতের ওস্তাদ একজন আছেন। সময় বিশেষে ইনি ব্যবহারে আসেন, অন্য সময় দামী আসবাবের মত তোলা থাকেন।—মিশ্রজী গুণী লোক, ব্যক্তি হিসাবে নিরীহ সজ্জন,

কর্ত্তার অন্তরঙ্গ না হইলেও প্রিয়পাত্র। পাইক বরকন্দাজদের একটি কুস্তি ইত্যাদির আখড়া আছে, কর্ত্তা সময়ে তথায় উপস্থিতির উৎসাহদানে কুণ্ঠিত নহেন। রাধামাধবের আরতি দেখিতে গিয়া তিনি ভক্তি প্রেমে বিভোর হইয়া যান। পরিষদবর্গের মধ্যে গ্রামস্থ কতিপয় কীর্ত্তনামোদী সময়ে সময়ে বৈঠকখানা সরগরম করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন। রসপ্রবাহের খরধারায় ব্রজকিশোর আপ্লুত হইতেন অথচ তাঁহার যৌবনের কুৎসা-কাহিনী এখনও গ্রামস্থ তাবতের স্মৃতিপটে জাজ্জ্বল্যমান।

ললিতকে দুই বৎসরের শিশু রাখিয়া তাহার মাতা পরলোক গমন করিলে মাতৃহীনের পিতা বৎসরান্তেই কলিকাতার এক ধনী ঘরের বয়স্থা ও বিদুষী কন্যাকে পত্নীরূপে গৃহে আনিয়াছেন—এই স্ত্রীকে সমীহ করিয়া চলিতেন বলিয়া সদর-মহলে অধিকাংশ কাল যাপন করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্দরে আসা কেবল পত্নীর আদেশ বিশেষ পালনের প্রতিশ্রুতি দানের জন্য। নব পরিণয়ে দুইটী কন্যা, কিন্তু স্বামী স্ত্রীতে আজও ঘনিষ্টতা জন্মে নাই।

দাসদাসীর নিকট রাণীমা, জ্ঞাতি কুটুম্বদের সম্বোধনে গিন্নীমা ও পিত্রালয়ের চারুবালা, বুদ্ধিমতী মহিলা। অনায়াসেই নিজের অবস্থা বুঝিয়া লইতে সমর্থা, অনধিকার বিষয়ে যেমন ঔদাসীন্যপ্রকাশে যত্নবতী, নিজেরটি বজায় রাখিতে সেইরূপ ক্ষিপ্রা ও তৎপরা। সংঘর্ষ নাই অথচ খাতির-আদায়ে অবহেলা নাই।—তরঙ্গ নাই কিন্তু স্রোত আছে। ললিত বিমাতার কাছে খোকাবাবু, সংসারের ভাবী কর্ত্তা—এই পর্য্যন্তই। চারুবালা বিচক্ষণা গৃহিণী, দুই কন্যার বিবাহই পিত্রালয় সম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী পরিবারে দিয়াছেন। স্বামীর উপর স্বীয় প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইলেও শক্তি সংহত রাখেন, অতি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে শক্তির অপব্যয় করেন না তাই ক্ষমতা চির অক্ষুণ্ণ। অভীষ্ট যতক্ষণ না পূর্ণ সিদ্ধির দ্বারসমীপে উপনীত না হয়, ততক্ষণ মোটেই প্রকাশ হয় না,—যখন হয় তখন তাহার গতিরোধ অসম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীনগর গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। অনেক ভদ্রলোকের বাস, অন্য শ্রেণীরাও সংখ্যায় পুষ্ট, সকলেই করিয়া খায়। গরু লাঙ্গল চাষ প্রায় প্রতি ঘরেই আছে। ভদ্রলোকেদের মধ্যে অধিকাংশই জমিদার বাড়ীর সহিত সংশ্লিষ্ট, হয় [illegible] না হয় কর্ম্মচারী অথবা বৃত্তিভোগী। চাষাপাড়া [illegible] পাড়া সদা কলরব মুখরিত। বাগ্দীপাড়ার পুরুষেরা বৎসরের অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকে, নৌকায় কাজ করে, মাছ ধরে, কতক বা মজুর খাটে; পাল্কী-বহন, জাল ঝুড়ি নির্ম্মাণ, সুদূর সহরে মাথায় ফলের ঝুড়ি বিক্রয়ার্থ লইয়া যাওয়া এই সকলেই ইহারা আছে। রাজুদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী লইয়া পাঁচ ছয় ঘর—তাহা ছাড়া নবশাখের প্রতিশাখার প্রতিনিধিও দু' এক ঘর বর্ত্তমান। গ্রামের মধ্যে বড় দোকানদার চন্দ্রপাঠক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বপুরুষ চাকরী উপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া সপরিবারে স্থায়ী হ'ন, শুষ্ক 'চানা'র মায়া কাটাইয়া মুড়িতে মজিয়া দ্বারবান-কার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্তির পর দোকান খুলিয়া বসেন। চন্দ্রপাঠকের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, নগদ দুই পয়সা আছে, প্রতিপত্তিও সামান্য নহে; ছোট খাট মহাজনীও আছে। বড় মহাজনদের এই শ্রেণীর গ্রামে তখনও আবির্ভাব হয় নাই। জমিদার ও তন্নিম্নস্থ ভূম্যধিকারগণের জমির ব্যবহারে অভ্যাস থাকায় ঋণের জন্য উন্মাদ-রোগ তখনও প্রবল হয় নাই। জমিদারী ইতিহাসে বাহুবলসর্ব্বস্ব ও ফৌজদারী-প্রাচুর্য্যের যুগে স্বাগত এই পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ বংশ কালে জমিদারদিগের প্রয়োজনহ্রাসপ্রাপ্তিতেই হউক অথবা অধিকতর সম্মান প্রতিপত্তি-লাভের বাসনাতেই হউক, জমিদার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বিদেশী মাটিতে স্বাধীন সত্তার ভিত্তি স্থাপনা করিয়া সুখে আছেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রপাঠক যে বহু চেষ্টা সত্বেও এক টুক্রা স্থায়ী চাষের জমি নিজস্ব করিতে পারেন নাই, ইহা কর্ত্তাদের সতর্ক কূট বিষয়নীতির পরিচায়ক।

গ্রামে একটি সখের যাত্রার দল নূতন জাকাইয়া উঠিয়া প্রাচীন হরি-সভাকে হৃতগৌরব, ম্লান করিয়াছে—করিবেই, ছোকরার দল কবে বুড়াদের কি হইবে ভাবিয়া আকুল হয়? সমীহের ঘটা পৃথিবীর বয়সের বিপরীত গতিশীল। যাহাই হউক, যাত্রাদল সম্পর্কে প্রাচীনদের উৎসাহ ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইলেও নবীনের উৎসাহ অপেক্ষা তাহা ওজনে ন্যূন ছিল না।—তাঁহারা সাক্ষাৎ কর্ম্মী না হইলেও পৃষ্ঠপোষক,;

সমালোচক, দর্শক পর্য্যায় ভুক্ত।—অক্ষমতা দৈন্ত ঋণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলা প্রবীণের পন্থা। ছোকরাদের মধ্যে বরং কয়েকজন পাশ্চাত্যালোক প্রাপ্ত এই আড়ম্বরকে অশোভন, যাত্রাদলকে মূর্খ অভিজ্ঞানে একটা সচেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া চলিত। ললিত এই দলের মধ্যে প্রধান। জ্ঞান বাবুর সুপুত্র অক্ষয় নিজের শিক্ষাভিমানের খাতিরে সন্ত্রস্তমনা হইলেও যাত্রাদলের সেই ছিল প্রাণ। টাট্‌কা বাতাস, রুচিসঙ্গত থিয়েটারী কায়দার প্রচলন, গান পালা শিখান এই সকলে সে রাবণের বিংশ হস্ত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িত। দূর প্রবাসে পাঠ্যজীবন-যাপন তাহার এই অবকাশের উদ্যমকে দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিল।

একদিন ললিত অনুযোগের সুরে অক্ষয়কে বলিয়াছিল, "ভাই, যাত্রাদলের মধ্যে তুমি কেন যাও?" তদুত্তরে অক্ষয় প্রশ্ন করিতে পারিত, "কেন, তাহাতে দোষ কি?" কিন্তু সে বলিল, "আমি নিজে আর যাই কোথায়, কেবল ছোঁড়াদের শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হয় এই মাত্র।" ললিতের তখন নূতন কলেজ-জীবন, বিদ্যা ও বিধান সম্বন্ধে ধারণাবলীও তাহার তখন তদুপযোগী; সে তাই বন্ধুকে এই সম্পর্ক পর্য্যন্ত বিধানের পক্ষে লজ্জাকর বলিয়া পরিহার্য্য, এইরূপ অভিমত প্রকাশে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল। অক্ষয়ও বহুবিধ যুক্তি ও তর্ক স্বপক্ষে প্রয়োগ করিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহার কথা এই যে, সে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, মিত্তির তাহার ছাতা-পড়া মান্ধাতা আমলের শিক্ষা গ্রামের বুকের উপর জাহির করিতে থাকিবে।—তখন ললিত অনুযোগ ছাড়িয়া ব্যঙ্গে নামিয়াছে—অক্ষয় উপায়হীন হইয়া অবশেষে বলিল, "সময় কাটে কেমন করে তাহ'লে?" ললিত উত্তর করিল, "সময় আমাদের কাটে কেমন করে—আমি ত' একদিনও তোমার ওই যাত্রা শুনতেও যাইনি—তাহলে আমার সময় কাটছে কেমন করে?" অক্ষয় এবার কোণঠেসা হইয়া সরল পথ ছাড়িল, বলিল, "তোমরা বড়লোক, পয়সা আছে, তোমাদের সময় কাটার আবার ভাবনা!" ললিত বিরক্ত হইয়া কহিল, "পয়সার সঙ্গে সময় কাটানর সম্বন্ধ কি পেলে? বাজে কথা!" অক্ষয় শিশুযূথের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালনে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়াছিল, শ্লেষের স্বরে বলিল, "বাজে কথা কেন, কি সম্বন্ধ নিজেই ভেবে দেখ, আমি জানি সব।" মুহূর্ত্তে মন্ত্র-প্রযুক্ত সর্পের মত ললিত মুস্‌ড়িয়া গেল—তাহার মুখ বিবর্ণ ও রক্তহীন হইয়া উঠিল।

সেই হইতে ললিত আর অক্ষয়কে ঘাঁটাইত না, অক্ষয়ও সাক্ষাতে সঙ্কুচিত জড় সড়, যেন একটা অবশ্যম্ভাবী তুফানের প্রতীক্ষায় সদা সশঙ্ক থাকিত।

তখন বঙ্গদেশের এক সন্ধিক্ষণ। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-ভূদেবযুগের উপর সবেমাত্র যবনিকা পড়িয়াছে। নব অঙ্কের দৃশ্য উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে রবীন্দ্রের ঐক্যতান-বাদন সবে সুরু হইয়াছে। সে সুর এলোমেলো, সাধারণের মন আকর্ষণে অপটু। ফেরীওয়ালার বিকট চীৎকারে তখন বঙ্গস্থলী পরিব্যাপ্ত।

বিবেকানন্দ তখন দূরকে নিকট ও পরকে ভাই করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গাঁয়ের যোগীর চিরন্তন অদৃষ্ট-সূত্র ছিন্ন করিতে তিনি তখনও অক্ষম, তখনও তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলেই ব্যস্ত। সমগ্র বঙ্গদেশ তখন একটা আবাহন-ধ্বনির নিশ্চিত আশায় ভরিয়া আছে, সুর অন্তরে ধরা দিয়াছে, এখন শ্রবণ একাগ্র হইয়া আছে। জাতীয় মানসিক জীবনে প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে এক মহা উদ্বোধনের বিপুল গতির সূচনা হইবে, অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে প্রতি রন্ধ্র সে-ই সূচনা ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে।

একদিকে বাংলার সমাজে তখন আগুন লাগিতে সুরু হইয়াছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতির চূড়ান্তের পর তাহার প্রতিক্রিয়া ভাষা খুঁজিতেছে। অন্যদিকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'এর সমস্ত মধুভাণ্ড লুটিয়া হলাহলের পালা আরম্ভ হইয়াছে, নীলকণ্ঠের স্তবস্তুতি চলিয়াছে। কোথাও পাশ্চাত্য রুচির বাঙ্গালী জঠরে পরিপাক-ক্রিয়ার পূর্ণ বেগ, কোথাও বা অর্দ্ধপরিপক্ক অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর উদ্গার,—আবার স্থানে স্থানে 'আধশ্যাম, আধশ্যামা' রূপে মিলিত প্রাচ্যপাশ্চাত্যের অকস্মাৎ আবির্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

আমাদের শ্রীনগর কিন্তু তখনও অক্ষত দেহ। যে হাওয়া সমগ্র বঙ্গকে আলোড়িত করিবার জন্য আকাশের এক নিভৃত কোণে থাকিয়া ঘোষণা-পত্র জাহির করিতেছিল সে উপেক্ষাভরেই হউক বা দৃষ্টিভ্রমেই হউক শ্রীনগরের বৃহদাপি বৃহৎ পাদপের লঘুতম পল্লবকেও আসন্ন বিপদাশঙ্কায় বিচলিত করে নাই। বুড়াবট তাহার বিরাট বপু লইয়া নির্ব্বিকার

চিত্তে যেখানে শিশু শাখা ও জটাগুলির লালন পালনে ও চির-পরিচিত সমীরণে তাঁহাদের নিত্য প্রসাধনে নিয়ত নিরত।

কারণ আর কিছুই নহে, শ্রীনগর নিকটতম রেলষ্টেশন হইতে একুশ মাইল দূরে। সদর মহাকুমাতে রেল হইতে নামিয়া এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে, গোযান আশ্রয়ে অথবা শিবিকা অবলম্বনে অতিক্রম করিতে হয়, জল পথ কালের গতিতে অনিশ্চিত, বিপদসঙ্কুল ও বৎসরের কয়েক মাস সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে—নৌকায় এখনও মালপত্র যাওয়া আসা আছে, মানুষ যাত্রী অতি বিরল।—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ পূর্ব্বে উল্লিখিত খেয়াঘাটের পাশ দিয়া নদীর অপর পারে প্রসারিত। সেই স্থানে একটি গঞ্জ আছে, সপ্তাহে দুইদিন বড় হাট হয়, বৎসরে দুইটী মেলা বসে; অধিকন্তু স্থায়ী বিপণী আদিতেও স্থানটি মন্দ গুলজার নহে।

খেয়াঘাট হইতে যে পথ মাঠের বুক চিরিয়া, বুড়াবটের ছায়া মাড়াইয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা শ্রীনগর হইতে সংস্কৃত রূপে একুশ মাইল পথ সদর মহকুমার রেল ষ্টেশনে গিয়া ক্ষান্ত,—গ্রামের মধ্যে প্রধান রাস্তা এইটী।

ব্রজকিশোর বাবুরা অতি প্রাচীন জমিদার বংশ। চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও তাঁহারা শ্রীসম্পন্ন জমিদার, সেই-জন্যই তাঁহাদের এলাকা খণ্ড খণ্ড নহে; মহাল গুলিও নদীর দুই পারে পাশাপশি; নদীর অপর পারে তিলটে, জোড়াগাছি প্রভৃতি গ্রাম পর্য্যন্ত ও এদিকে সদর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া তাঁহাদের একাধিপত্য।—শ্রীনগর তাঁহাদেরই স্থাপিত গ্রাম, আরও দুই তিন স্থানে কাছারী আছে, সদরে একটি বাড়ী ও দুইজন কর্ম্মচারী। সম্পত্তির আদায় আশী হাজার টাকা। এই বংশের এত দিন বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি করিবার জন্য সরিক বখরাদারের প্রমাদ ঘটে নাই, বিধাতা পুরুষের এ-বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি ছিল।

ব্রজকিশোর বাবুর একটি সহোদর, কনিষ্ঠ নন্দকিশোর। তিনি আকারে স্বভাবে জ্যেষ্ঠের বিপরীত বলিলেও চলে, অথচ সাদৃশ্যও আছে, ছোটখাট সকল বিষয়ে। নন্দকিশোর গ্রামে বাস করেন না, তিনি শিক্ষিত ও উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে দূর প্রবাসে থাকেন; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য।—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজুগোপ বুড়াবটের গোড়ায় একটি শিকড়ে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধ শায়িত। ফাল্গুনের মাঝামাঝি দ্বিপ্রহর। ভোরের হাওয়ায় এখনও শীতের রেশ পাওয়া যায়, মধ্যাহ্নের রৌদ্র কেবলমাত্র কটু হইতে সুরু করিয়াছে, পীড়াদায়ক হইয়া উঠে নাই। সপ্তাহ পূর্ব্বে এক পশলা বর্ষাণ মাঠে একটু ফিকে সবুজ রং-এর ছোপ ধরাইয়া গিয়াছে। রাজুর গাভীদল, মাঠের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সেই রং-এর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছে।

রাজু অনেক কথাই ভাবিতেছে—কখন বা শূন্যদৃষ্টি, কখন বা দূর পশ্চিমে যেদিকে মাঠ দিগন্তের পিছনে দিশা-হারা হইয়া ছুটিয়াছে, সেইদিকে সূর্য্যাস্তের নিরূপিত স্থানে সে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ, হয়ত অজ্ঞাতসারে বেলা কখন পড়িবে এই জল্পনা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। মাথার উপর বুড়া বটের ডালে ডালে এক নূতন জগৎ; প্রাণের চঞ্চল-তায় প্রতি পল্লব জাগ্রত—প্রাণের হুড়াহুড়িতে বিপর্য্যস্ত। কৌতূহলপরবশ রাজু কতবার গাছে উঠিয়াছে—কর্ত্তা গিন্নীর অনুপস্থিতিতে বাসাগুলির মধ্যে শাবকদের একটু স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছে মাত্র, কি কোমল তাহাদের কচি পালক, ভবিষ্যতের কত বিচিত্রতার কত অভিনব অভিজ্ঞানের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ, তাহাদের আপত্তিসূচক কিচিরমিচির কি মধুর ভৎসনায় করুণ। এই চিন্তা রাজুর পুরাতন বন্ধু। আজও স্থানকাল বুঝিয়া এই বন্ধু তাহাকে এক অব্যক্ত সুখময় ও অনিশ্চিত বেদনার রাজ্যের কথা বলিতেছে। পশ্চিমবিলম্বী বড় ডালে যে অজানা দেশের পক্ষীদল নূতন বাসা বাঁধিয়াছে তাহাদের একবার পরিদর্শন করিয়া আসিবার লোভ মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু খেয়াঘাট হইতে আগন্তুক এক ছত্রধারী পথিক-মূর্ত্তি দর্শনে ক্ষণপরেই সে লোভ নিবারিত হইয়াছে। রাজুর স্বভাব নিজের জীবনটাকে একটু অন্তরালে রাখা—বিশেষতঃ যে অংশটা কার্য্যকারণের অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য নিবন্ধন তাহার নিজেরই নিকট প্রহেলিকাময়। স্ত্রী মালতীর কথাও মনে আসিতেছে। মালতীর চিন্তা মাত্রই তাহার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিত, গায়ে-হলুদ দিনের বাঁটা হলুদ মাখান নূতন কাপড়খানি, হলুদের কাঁচা গন্ধও যেন তাহার নাকে আসিত। এখনও মালতীর কাছে তাহার

ভজাটা পুরা কাটে নাই ; বাড়ীর বাহিরে ঘাটে পথে দেখা হইলে চোখাচুখি হইবার পূর্বেই সে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করে, আর অন্ত লোকের উপস্থিতিতে সে চেষ্টা পরিহার্য্য হইলেও কম্পিত পদে এমন ভাবে চলিয়া যায়, যেন মালতীর সামীপ্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। গৃহে মালতীকে অনেক বিষয়ে মানিয়া খাতির করিয়া চলিলেও যেগুলি তাহার আন্তরিক নিজস্ব তাহাতে ধরা ছোঁয়া দিবার মত গাঢ়তা, তাহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে এখনও আসে নাই।—মালতীর রাগ ছিল, রাগের মাত্রা কখনও কখনও তাহাকে মুখরা করিয়া তুলিতে উদ্যত হইলেও নিঃশঙ্কচিত্ত রাজু সরল ভাবে এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিত বা এমন কিছু করিয়া বসিত যাহাতে মালতীর রাগ নিমেষের মধ্যে জল হইয়া যাইত। স্ত্রীর প্রাপ্য বা দাবী যে মর্য্যাদা তাহা স্বতঃ-প্রবৃত্ত আহুতিতে পরিতুষ্ট।

মালতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজু তাহার খোকা বাবু জমিদার পুত্র ললিতের ভাবী পত্নীর কথা ভাবিল, সে কেমন হইবে, মালতীর মত কি? হাঁ৷ সেইরূপই, কিন্তু বেশী সুন্দর। কিন্তু মালতীর অপেক্ষা অনেক সুন্দর মুখের চিত্র অঙ্কনে তাহার কল্পনা বহু আয়াসেও পরাভূত হইয়া শেষ অবধি সেই কল্পিতা মূর্ত্তির সাজসজ্জা পূজার সময় দেবী-মূর্ত্তির সাজসজ্জা যেরূপ জমকাল হয়, সেইরূপ হইবে এইরূপ একটা আভাষ দিয়া বিরত হইল। 'গরমের ছুটি আগতপ্রায় খোকাবাবু এবার একটা পাশ দিবে। মালতী নিত্য তৈয়ারী ঘি জমাইতেছে। বড় ভাঁড়ের যে ঘিটা এবার কলিকাতা যাইবার সময় পাল্কীতে তুলিয়া দিতে হইবে—মালতী দিবে না? খুব দিবে।' এইরূপ নানা চিন্তা, খেয়াল ও চিত্র রাজুর অবসরকে পূর্ণ করিয়া তাহার আলস্যকে আরও ঘন করিতেছিল। 'সুরো বাগদীর ভাইপো সার্কাসে চাকরী করিয়া অদ্ভুত নূতন কসরৎ শিখিয়া আসিয়াছে তাহা তাহা-কেই শিখিতে হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে রাজুর দেহে শোণিত-প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই পশ্চাতে মনুষ্য-কণ্ঠে ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিষণ্ণ বদন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাছা, তুমি কি শ্রীনগর যাবে?"

ব্রাহ্মণের দেহ স্বাভাবিক গৌরবর্ণ হইলেও কেমন যেন কালী মাখান, তনু দীর্ঘায়তন না হইলেও ক্ষীণতার জন্য খাটো রূপ দেখায়; ভাবভঙ্গী ভদ্রোচিত কিন্তু আর্থিক অবস্থার হীনতার ইঙ্গিত লক্ষিত হয়—'দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী' কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। পরণে একটা অর্দ্ধমলিন দশ হাতী ধুতি, পরিষ্কার উত্তরীয়, পায়ে চটি জুতা, সৌখীন ধরণের ছাতাছড়ি, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

রাজু হেঁট হইয়া প্রণামান্তর বলিল, "আজ্ঞে হাঁ৷ ঠাকুর, তবে বেলা পড়ুক গাইগুলো গোছ করে তবে যাওয়া হবে।" ব্রাহ্মণ আড়চোখে রাজুকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পোষাকী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা বেশ আমিও একটু জিরিয়ে নিই; এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে—কি বল বাছা, তোমার নামটি কি? তোমরা?" রাজু—"আজ্ঞে, গয়লা ওই গাঁয়েরই, রাজু গোপ, আপনার নিবাস?" ব্রাহ্মণ ইত্যবসরে বসিয়াছিলেন, ছাতা ছড়ি উত্তরীয় সাবধানে বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বনে রক্ষা করিয়া অনভ্যস্ত সুপুষ্ট কোঁচাটিকে বগলদাবা করিয়া তিনি বসিয়া বলিলেন, "তা রাজু তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বস বস—হাঁ৷, আমি—আমি এই গিরবেড়া থেকে আসছি; গিরবেড়া জানো? গিরবেড়ার ভট্টাচার্য্য?" রাজু বলিল, "তা আর জানিনা, আমাদের মাষ্টার মশায়ের বেয়াই বাড়ী।"—"হাঁ৷, আমিই তোমাদের বৌমার বাপ—গিরীন ভটচাজ্।" রাজু আর একবার ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া হস্ত প্রসারণে গাভীদলকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তা হ'লে আমি ওদের গুছিয়ে নিই, বেলাবেলি যাওয়া যাক্ কুটুমবাড়ী;—সঙ্গে কি কেউ পেছনে আসছে?" ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, কুটুম্ব দর্শনে যাত্রীকে শূন্যহস্ত দেখিয়া প্রশ্নকারী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছে। সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "বাঃ তোমার দিব্বি চেহারা, কলকাতায় দারওয়ানী কাজ কর, যদি, যেমন মাইনে মোটা তেমনি আয়েস তোফা।" রাজু ততক্ষণে কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়াছে।

গিরীন ভট্টাচার্য্যকে হঠাৎ প্রথম দর্শনে অধ্যাপক শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়, একটু পরে মনে সন্দেহ হয়,—বুঝি বা তাহা নয়, পুরোহিত গোছের কিছু হইবে—আলাপে আরও নিম্ন স্তরের লোক বলিয়া ধারণা জন্মে। গিরীন ভট্টাচার্য্য বৃক্ষতলে একাকী চিন্তায় নিমগ্ন, সে চিন্তায় দুঃখ। বৈবাহিক পুত্রবধূকে ত্যাগ করিয়াছেন, ঘরে রাইতে অসম্মত,

তাহারই মিটমাট উদ্দেশ্যে আজ তাঁহার আগমন।—কিন্তু আসন্ন কর্ত্তব্যে কর্ম্মপ্রণালীর কোন সুস্পষ্ট কল্পনা নির্দ্ধারিত না করিতে পারিয়া, নিতান্ত অসহায় ভাবে—জগদম্বা কি করিলি, কি হইবে, তুই রক্ষা কর ইত্যাদি কাকুতি মিনতি দ্বারা নিজের চিন্তাশক্তিকে অধিকতর আচ্ছন্ন করিতেছেন। এমন সময় রাজু বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠকে একত্রিত করিয়া ডাকিল, "উঠুন, বেলা থাকতে পৌঁছুতে হবে।" চিন্তা-ধারা ছিন্ন হইল, তাঁহার বদনে একটা অকস্মাৎ আশার দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, "ঠিক হয়েছে, একেই সঙ্গে রাখা যাবে, লোকটাও মন্দ নয়, তার পর অদৃষ্ট, মা জগদম্বা যখন পাঠিয়েছেন।"

অগ্রে গাভীদল, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য নানারূপে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে পশ্চাতে রাজু ও গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত, তবে জগদম্বা-প্রেরিত এই গোয়ালাকে প্রস্তাব করিবার সুযোগ-অন্বেষণে সতর্ক—আর রাজু, সে যদি জানিত তাহা হইলে তাহার গতি ভঙ্গী এরূপ সরল স্বাভাবিক কথনই হইত না।

রাজু বেশী কথা কহে না, এই বধূবর্জ্জন কাহিনী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে, কিন্তু সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায় লইয়া সে আগে কখনও ভাবে নাই, সেইজন্য কোন কথাই এখন তাহার মুখে আসিতেছে না। গিরীন ভট্টাচার্য্য কিন্তু মুখর—যেন রাজু তাঁহার মকদ্দমার বিচারক, রাজুর মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া আশার কুটীর রচনা আরম্ভ হইয়াছে। রাজু মনোযোগের সহিত যাহা শুনিতেছিল তাহার মর্ম্ম এই :—

পিতার মৃত্যুর পর দুই কাকা পৃথক হওয়াতে যজমান সংখ্যা কমিয়া গেল, দেশে আর চলে না। স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী ও দুইটী শিশু লইয়া বিব্রত হইয়া পড়াতে জগদম্বার চরণ স্মরণ করিয়া দেশের সামান্য জমিজমার যথারীতি ব্যবস্থা করণান্তর ঠাকুর মহাশয় কলিকাতা মুখো হইলেন। সেখানে একজন যজমান ব্যবসা উপলক্ষে গিয়া অধুনা সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরে সপরিবারে সাড়ম্বরে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-পুত্র ধনী যজমানের সংসারে অবলীলায় আশ্রয় পাইলেন, ভাত কাপড় বিদায় দক্ষিণাদি হইলই, উপরন্তু সময়ে বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য নগদ সাহায্য প্রাপ্তিও হইতে লাগিল। সময় কাটিতেছিল পরিবারস্থ যুবকবৃন্দের আড্ডায়, পরিচারক-রূপেও কতকটা, বাড়ীর সরকারের অবৈতনিক সহায়করূপে অন্দর মহলের ফাইফরমাসও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিত। ফলে, বাবা মাতার পূজাপদ্ধতি আয়ত্ব ছিল তাহা ভুলিয়া, সুচারু মন্ত্রন-ক্রিয়া, বাজার হাট তথ্য, আর বড়-লোকের মন যোগান ইহাই শিক্ষা করিলেন, দেশের যজমান কয়েক ঘর হস্তচ্যুত হইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই,—মা জগদম্বা চালাইতেছেন।

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধিল, আশ্রয়দাতা অতি লোভী তন্তুবায়ের দশা প্রাপ্ত হইয়া বসতবাড়ী ব্যতীত অন্য সমস্ত হারাইয়া শোকে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বাড়ীর যুবকবৃন্দ এতকালের অভ্যস্ত ইচ্ছামত বিহরণ ছাড়িয়া সরকারী ও সওদাগরী অফিসে গুটি বাঁধিতে ছুটিল, দারিদ্র্য-হীন পতঙ্গ-লীলার উপর যবনিকা পড়িল। ব্রাহ্মণ আদিষ্ট হইলেন 'পথ দেখ'। রোরুদ্যমানা, সদ্যবিধবা গিন্নীমা ডাকিয়া বলিলেন, 'বাছা যে ঘরে তুমি আছ, সেইখানে যত-দিন অন্য সুবিধা না হয় থাকতে পার, তবে একটা চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখ বাবা—দেখছ সব, এখন আমাদের ভাত ছুমুঠো জোটে কোথা থেকে তবে এই মাসটা এইখানেই খেও চারটি।" তখন মাস কাবারের আর চারিটি দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

মা জগদম্বা কিন্তু ভক্ত বাৎসল্যের জন্য চির বিখ্যাত। চাকরী জুটিল অচিরাৎ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভোল ফিরিল—ভটচাজ্ হইলেন 'গিরীন ঠাকুর', সংক্ষেপে কেবল 'ঠাকুর'। প্রাপ্তি প্রথমে দশ টাকা মাসে অতি কষ্টে হইত, এখন মাস গেলে পঁচিশটি টাকা আর দেখিতে হয় না। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যয়ই নাই; তাহার পর গত বৎসর কন্যাটির বিবাহ দিলেন, নগদ সাত শত টাকা খরচ, কিন্তু এক পয়সাও ধার হয় নাই। দেশে কিঞ্চিৎ ধার খোরও দেওয়া আছে। কর্ম্মস্থলে, বৃহৎ ছাত্রাবাসে অনেক পাচক ভৃত্যের উপর তাঁহার প্রভুত্ব। উচ্চবংশজাত বাবুদের কলেজে পড়ে তাহারা,—তিনি প্রিয় পাত্র, তিনি 'head cook'—এই ইংরাজী কথাটি উচ্চারণ করিয়া গিরীন ঠাকুর গর্ব্ব-প্রফুল্ল-নেত্রে রাজুর মনোভাব বুঝিতে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বেয়াই

করেন কিসে, পান তো কুড়িটি টাকা, বাবাজির পড়া খরচ তো ব্রজ বাবুর দান চলে—মমরা কি খবর পাই না; কিন্তু রসুয়ে বামনের মেয়ে বলে আমার নতু'কে পরিত্যাগ করা কি ধর্ম্ম হ'ল? রসুয়ে বামন রান্না করে, চুরি করে না, ভিক্ষা করে না, তবে কি দোষ; আর মেয়ের তাতে কি অপরাধ বল দিকি?"

মোটামুটি কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও রাজু এ কথার সহসা কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া অস্বচ্ছন্দতাসূচক বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি ও মস্তক কণ্ডুয়ন সুরু করিল—সম্মুখস্থ একটি নিরীহ শান্ত গাভী-কন্যার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কতকগুলি এমন স্নেহ-অনুযোগ-ভর্ৎসনা মিশ্রিত শব্দের উচ্চারণ করিল, যাহার সংলগ্ন অর্থ গাভী-ভাষায় থাকিলেও বঙ্গ ভাষায় নাই। এই উপায়ে উত্তরদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে গতি ক্ষিপ্রতর করিল, গিরীন ঠাকুর কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চলিলেন। উত্তর না দিলেও কথাটা রাজুর মনে তোলপাড় করিতে ছাড়িল না।

গ্রাম অতি সন্নিকট, সূর্য্যদেবও অবকাশ লইবার আয়োজনে স্বভাব-প্রাখর্য্য সংহত করিয়াছেন, অফিস কোট এখনও দেহে আছে, অস্তকালীন লোহিত দেখা দেয় নাই। পথে ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া সঙ্গী জুটিতে লাগিল; আকারে, ইঙ্গিতে, মৃদুস্বরে রাজুকে সকলেই প্রশ্ন করিতেছে, 'সঙ্গের লোকটি কে' রাজু উত্তর দিতেছে 'মাষ্টার বাবুর বেয়াই।'—গ্রামের সীমানায় ঘাটের কাছে আসিয়া রাজু বলিল, "এই রাস্তা দিয়ে সোজা, আগে দোকানে জিজ্ঞেস কল্লে দেখিয়ে দেবে বাড়ী।" গিরীন ঠাকুর এতক্ষণে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পাইয়া প্রস্তাব করিলেন, রাজুকে তাঁহার সহিত যাইতে হইবে—এমন কি উপস্থিত থাকিয়া মিটমাটের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার অঙ্গীকার সে না করিলে তিনি ধূলা পায়ে সেই অবেলায়, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, বুঝিবেন মেয়ের অদৃষ্ট—বলিলেন, "বুঝলে কিনা, মা জগদম্বা তোমায় পাঠিয়েছেন, তুমি ছাড়া আমি এক পা যাচ্ছি না—কি বলছ? বেহাই তোমায় দেখলে অসন্তোষ হবেন? তুমি কথা কইতেই পারবে না? সেখানে ভদ্রলোক মধ্যস্থ নিয়ে যাওয়া ঠিক? ও সব বুঝি—কিন্তু তোমাকে বাছা যেতে হবে, তুমিই আমার ভরসা, এইটুকু কথা দাও, সাধ্যমত করবে, বলবে,—বাকী দায়িত্ব আমার। মা জগদম্বা আমার ভেতর থেকে বলে দিচ্ছেন তাই তোমায় এত করে ধরছি। হিতে বিপরীত? সে আমার, আমি বুঝি—আমিই জিদ্ করে তোমায় সঙ্গে নিচ্ছি—তোমার কি দোষ হবে? চল, চল তারপর মা জগদম্বার ইচ্ছা আর 'নতু'র কপাল।" রাজু চতুর্দ্দিক হইতে এইভাবে আক্রান্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিল; আর যুক্তিতর্কে সেখানে কালক্ষেপ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। অদূরে ঘাটের সোপান বাহিয়া মালতী উঠিতেছে—তাহার চক্ষে পড়িয়াছে, আর মানস-চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কৌতূহল-দীপ্ত প্রশ্নময় চক্ষু দু'টি। রাজু "একটু অপেক্ষা করুন, গরু তুলে আসি" এই বলিয়া সেস্থান ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে হইল। গিরীন ঠাকুর আশ্বস্ত হইলেন।

রাজুর অধিক বিলম্ব হইল না, স্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে কার্য্য সমাধা করিয়া গিরীন ঠাকুরের ক্রমবর্দ্ধনশীল অসহিষ্ণুতার অবসান করিতে দ্রুতপদে সে ঘাটের ধারে দর্শন দিল, "ঠাকুর, চলুন।"

দুই জনে চলিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ কোন্ বাড়ী কার, সে কে, ইত্যাদি পরিচয় লইতে উৎসুক একজন, অন্যজন চিন্তামগ্ন অন্যমনস্ক ভাবে সঙ্গীর কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছে। জমিদার বাড়ীর দেউড়ী পার হইয়া যখন তাহারা চন্দ্র পাঠকের দোকানের সম্মুখীন, তখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্তমিত, দিবার ম্লান বদন, সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যে রূপান্তরিত হইতেছে। গিরীন ঠাকুর বলিলেন, "আমি এইখানে একটু দাঁড়াই, তুমি একটু এগিয়ে দেখে এসো, বেহাই কি কচ্ছেন।" উদ্‌গ্রীব দোকানী ও দুই একটি উপস্থিত ক্রেতার সহিত তিনি কথোপকথনে নিরত হইলেন। অগত্যা রাজু অগ্রগামী হইল। গিরীন ঠাকুর এখন কেবল অবশ্যম্ভাবীকে যতটা দেরী করাইতে পারেন তাহারই জন্য সচেষ্ট, আর দোকানাদির প্রতি তাঁহার স্বভাবগত পক্ষপাতিত্ব এমন যে দুই দণ্ড সেখানে না দাঁড়াইয়া যাইতে পারেন না—রাজু ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "কাকা বাবু দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন"—গিরীন ঠাকুরকে যাইতে হইল; উপস্থিত দু' একজন ব্যাপার কেমন দাঁড়ায় দেখিবার প্রবল বাসনায় অতর্কিতে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত হইল।

যখন দুইজনে জ্ঞান বাবুর বাসার দাওয়ায় গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল তখন তাঁহার ধুম্রপান সমাপ্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার ঘোরে তাঁহার কালো মুখ ঘোর কালো দেখাইতেছে, টাকের চারি ধারে অতি শুভ্র কেশরাজি মুখের ঘোরতাকে আরও গাঢ় করিয়াছে—শুভ্রতর গুম্ফযুগল ভৎসনা রাণীর সজ্জিত সৈন্যদলের উদ্যত সঙ্গীনের মত প্রতীয়মান।

হুঁকাটি পার্শ্বস্থ একটি অতি ক্ষুদ্রকায় বালকের হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেগা, ভর সন্ধ্যা বেলায় ?" বালকটি অবৈতনিক ছাত্র সুতরাং গতানুগতিক অনুসারে বিবিধ কর্ত্তব্যভারে পীড়িত। রাজু উত্তর দিল, "কাকা বাবু, বেয়াই মশাই যে নিজে এসেছেন।" "কার বেয়াই রে গয়লার পো ?" বলিতে বলিতে জ্ঞান বাবু ত্বরিতে দণ্ডায়মান ও উপানহী হইলেন। দাওয়া হইতে তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, একটা দমকা কান্নার সহিত গিরীন ঠাকুর তাঁহার পা দুটী জড়াইয়া সশব্দে দাওয়ার উপর ধূলিশায়ী হইলেন। পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতির ফল, কোনও মতে বেগের টাল সামলাইয়া জ্ঞান বাবু কহিলেন, "এ আবার কি আপদ! খুন কর্ব্বে নাকি ?" বৈবাহিকের উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনধ্বনি সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্যকে বিপর্য্যস্ত করিল। ক্রন্দনের বেগ একটু প্রশমিত হয় অমনি জ্ঞানবাবু বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের সুরের পর্দ্দা আবার সপ্তমে চড়ে। বাড়ীর পশ্চাতে বাঁশ ঝাড়ের আসরে আগত শিবাকুল, শব্দরাজ্যে প্রবলতর অধিপতির অভ্যুদয় দর্শনে ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া রহিল।—জ্ঞানবাবু বিপত্নীক, নচেৎ এরূপ একাধিপত্য-ঘটিত ব্যাপার বেশীদূর গড়াইত না।

অলক্ষ্যে দর্শকবৃন্দের সমাগম হইতেছে। জ্ঞানবাবু নির্ব্বাক হইলেও নীরব নহেন, গুরুশ্রমজনিত নানাভঙ্গীর শব্দ-তরঙ্গ তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিয়া গমকে গমকে উঠিতেছে। আর ভট্টাচার্য্য সন্তান মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ও অস্ফুট বিলাপধ্বনির মধ্যে "চরণ, পরাণ, ফাঁসী, দাসী" এইরূপ কতকগুলি অসংলগ্ন বাক্যাংশ উচ্চারণ করিতেছেন; উচ্চারিত শব্দমালার মধ্যে একটা ছিন্ন সুরের আভাষ পাওয়া যাইতেছে।—তিনি বোধ হয় তখন মধুসূদনের বিপদ ভঞ্জন ও মান-ভঞ্জনের মধ্যে একটা গোল করিয়া বসিয়াছেন।

বিপুল উদ্যমে জ্ঞান বাবু চরণদ্বয় বেহায়ের ভুজবন্ধন মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার সে ভীম ভৈরব স্ফীত মূর্ত্তি বোধ করি ইতিপূর্ব্বে কখন ছাত্রশালেও প্রকট হয় নাই। সমবেত'দের মধ্যে দুই এক জনের বুক সে দীপ্তি দর্শনে গুরু গুরু করিয়া উঠিল।—একবার, দুইবার, তিনবার! বৃথা চেষ্টা, চরণ-সংলগ্ন বেহাই সহিত বিক্রমাবেগে দাওয়ার এক ধার হইতে অন্যধারে উপনীত হইয়া জ্ঞান বাবু ভাবিলেন, কি করি, প্রাচ্য পণ্ডিতদের পরামর্শ মত কোমর হইতে আপদ-সংযুক্ত অধোভাগ কাটিয়া বাদ দেওয়া ঠিক্, না প্রাণীবিজ্ঞান-অনুমোদিত পন্থায় বৈবাহিকের দেহাংশে লবণ প্রয়োগে ফল পাওয়া যাইবে—তখন সত্য কিন্তু তাঁহার কান্না আসিতেছিল, গিরীন ঠাকুরের হাহাকার কান্না নয়, নিরুপায়ের মরমের কান্না। একজন উৎসাহের বেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল, "মাষ্টার বাবু, ঘাড় চেপে ধরে মারুন ধোবিয়া প্যাঁচ—বাঁ থেকে ডাইনে।"—রাজুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পরামর্শ-দাতার বাক্‌রোধ করিল।

বহু চেষ্টায় জ্ঞান বাবু একবার রুদ্র শক্তিতে মহারবে একটি চরণ স্বাধিকারে আনিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই, রাজু হাঁ হাঁ করিয়া আসিতে আসিতে, দুই বেয়াই দাওয়া-চ্যুত হইয়া জড়াজড়ি অবস্থায় প্রাঙ্গণশায়ী হইলেন। এইবার লোকে উঠাইতে গেল, কিন্তু তখন দশটি জ্ঞান বাবু ও দশটি গিরীন ঠাকুর, প্রত্যেকে নিজেকে সরীসৃপভ্রমে প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতেছে। সেখানে থাকে কাহার সাধ্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দেহে পা' লাগিবার পাপ-ভয়—তখন কেবল উৎকট চীৎকার —ব্রহ্মহত্যা, গোরক্ত, পাষণ্ড, এই জাতীয় শব্দ প্রাঙ্গণ-বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে!—

চন্দ্রপাঠক গোলগাল মানুষটি, দাঁড়াইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের স্থান বিশেষ সুরে আবৃত্তি করিতে করিতে থামিয়া গিয়াছে। অবৈতনিক ছাত্র রেড়ীর প্রদীপ উস্কাইয়া জ্ঞান বাবুর মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "এ-ক ঠোঁট কেটে যে দুখানা হয়ে গেছে।" অমনি অঙ্গনের কোণে উপবিষ্ট গিরীন ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমার হাত ভেঙ্গে গেছে।" উভয় পক্ষের হতাহতের সংবাদে জ্ঞানবাবুর রণ-পিপাসা আবার জাগ্রত হইল, তিনি "মার, মার, বাঁধ, পাইক ডাক্" হুঙ্কার করিতে লাগিলেন—গিরীন ঠাকুরের পক্ষ হইতে কেবল শোনা গেল "থানা, থানা"।

রাজু একঘটি জল ও ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া জ্ঞান বাবুর সম্মুখীন হইল। প্রদীপের তৈলে বস্ত্র সিক্ত করিল, জ্ঞানবাবু দু একবার 'যত নষ্টের গোড়া' বলিয়া রাজুর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। ওষ্ঠে বস্ত্রাংশ ন্যস্ত, ভাষাশক্তি অপহৃত, সুবিধা বুঝিয়া রাজু বলিল, "কাকা রাগ করে কি হবে, যা হবার হয়েছে—আমি কালই পাল্কী বেহারা আর নাপিত মাসীকে সঙ্গে করে বৌ নিয়ে আসব, আপনি ঠাণ্ডা হ'ন গে—।" চন্দ্রপাঠক বলিলেন, "এই ঠিক কথা, যেওতো রাজু আর আমার দোকান হয়ে যেও অমনি, কুটুম বাড়ী কি শুধু হাতে যায়।" যাত্রাদলের জনৈক অক্ষয় ভক্ত, মাথা হাত নাড়িয়া বলিল, "নিয়ে এসো এখনই, বৌদি এলে দেখি কোন বেটা তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে পারে আর কুটুম্ না নরাধম।"

রাজু গিরীন ঠাকুরকে একরূপ কোলপাঁজা করিয়া বাড়ীর বাহির হইল। অমনি জ্ঞান বাবু কাপড়ের ফালি সরাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "নির্ব্বংশের বেটা, বড় তেল হয়েছে, দেখাচ্ছি তোকে—সে খুনে রসুয়ে বামনের মেয়েকে আমি ঘুঁটে দিতেও বাড়ীতে স্থান দেব না, মাথায় ঘোল ঢেলে—।" অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিলেন,—অগ্রে স্বয়ং ব্রজকিশোর। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া জ্ঞান বাবুকে স্তুতি সান্ত্বনায় অর্দ্ধপরিতুষ্ট করিয়া, ঘটনার আলোচনা করিতে করিতে যখন তাঁহারা বিদায় হইলেন, তখন রাত্রি দশটা। জ্ঞান বাবু ভাত চড়াইয়াছেন; পূর্ব্বোক্ত বালক সদ্য বেত্রাঘাতস্মৃতিতে সাশ্রুলোচন হইয়া নুন গুঁড়া করিতেছে।

গিরীন ঠাকুর রাজুর বাড়ীতে পাকাদি উদ্যোগ করিতেছেন। রাজু ও মালতীকে ভিন্ন রন্ধন করিতে তিনি দেন নাই; তাঁহার বিদ্যার পরিচয়ে তাহারা ধন্য হইবে।

শিবাকুল এইবার স্বচ্ছন্দ চিত্তে ডাকিল,—কেয়া হুয়া হো—। (ক্রমশঃ)

"ভালবাসি"

[শ্রীশিশির ঘোষ]

ভালবাসি সেই মোর পুণ্য অহঙ্কার,
চাহিনাকো ভালবাসা,—হীন প্রতিদান।
ক্ষতি নাই, হাসে যদি পঙ্কিল সংসার,—
কামাতুর কেন দিবে প্রেমের সম্মান!
দেহের ধূপতি জ্বালি কামনার ধূমে
পূজা করে মদভরে, হিংস্র বনপশু,
আমি ধন্য হইয়াছি প্রেমপদ চুমে
স্বর্গ হতে নেমে-আসা ক্ষুদ্র দেবশিশু।
থাক দূরে, আসিওনা—আসিওনা কাছে
অনল-আধার হতে ফুটাও না হাসি,
বাসনা লুকায়ে আছে মিলনের পাছে
তুমি ভাল নাহি বাস, আমি ভালবাসি।

অসীমের কবিতার বৈশিষ্ট্য

[শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়]

বাংলা কবিতার ছন্দ ও রূপ নিয়ে সাহিত্যে আজ বহু চল্‌ছে। তাতে দুটো জিনিষ সাধারণতঃ লক্ষ্য করেছি, যে প্রথমতঃ একদল লেখক আছেন, এবং তাঁদের সংখ্যাই বেশী কিনা এখানে আমি সাহস করে বল্‌তে চাইনে,—যাঁরা কবিতাকে ছন্দের চাতুর্য্য ব'লে মনে করেন এবং ছন্দের অভিনবত্ব ও কৌশলকেই নিজেদের কবি-প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ ভেবে থাকেন। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে অনেক দিন ধ'রে যে একই ছন্দ ও রূপের অনুকরণ লেখকেরা করে আস্‌ছিলেন, তার তুলনায় এই অভিনবত্ব বাড়াবাড়ি হ'লেও সাহিত্যের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দৃঢ় করেছে এবং বহু কবিযশ-প্রার্থীকে উৎসাহী ক'রে তুলেছে। আর একদল আছেন, যাঁদের সংখ্যা কম বললেই চলে, যাঁরা কবিতার formএর চাইতে, এর অন্তর্গূঢ় যে ভাব তাকে প্রকাশ করাকেই বড় ব'লে মনে করেন, কোন্ ছন্দে বা রূপে সেই ভাবগুলি গঠিত হয়ে উঠ্‌বে, সেটা তাঁদের কাছে বড় কথা নয়। কখনও খুব প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার ছন্দে, কখনও সংস্কৃত কবিতার নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ কোনো বিশেষ ছন্দে, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দগুলির ভিতর দিয়াও এই সমস্ত লেখকেরা সত্যিকার কবিতার আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছেন, পাঠককে কবিতার সেই কল্পলোকের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছেন, যেখানে ছন্দের ঝঙ্কার ও শব্দের সঙ্গীতই সম্বল নয়, কেবল গৌণ কথা মাত্র। কবিতার বিচার যদি সকল কালের রসবোধ দিয়ে করতে হয়, তা' হলে এই কল্প-লোক সৃষ্টি করার সাফল্যই হয় একমাত্র মাপকারী এবং কবি কাব্যে কতখানি সেই রস-জগতের সৃষ্টি করেছেন, যেখানে বর্ণ ও রূপের ঔজ্জ্বল্য কেবল মাত্র একটী অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে,—তার উপরেই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও কবিত্ব নির্ভর করে।

দুঃখের বিষয়, আমরা বর্ত্তমানে যে সকল কবিতা অহরহ পাঠ করি, তার মধ্যে প্রকাশ করার নূতন নূতন ভঙ্গীর বাহুল্যই বেশী চোখে পড়ে কিন্তু কবিতা যে অভাবনীয় জগৎ পাঠকের মনে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় তার সন্ধান সেখানে পাওয়া কঠিন হ'য়ে ওঠে। আধুনিক বাঙ্গালী মন, আজ কেবল সাহিত্য নয়, জীবনের সকল বিভাগেই নূতনের সন্ধানী, এই বাংলা সাহিত্যে যে অগণিত কবি-যশাভিলাষী লেখক, কেবল মাত্র অভিনবত্বের অজুহাতে সাহিত্যের মন্দির-দ্বারে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাতে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নাই, আশ্চর্য্য হওয়ারও কোনো কারণ এতে ঘটে নাই। এই যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যেও এই ধরণের 'experimenter'এর অভাব মোটেই নাই, এবং তাদের আবির্ভাব যে ইংরেজী সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথরোধ করে দেয় নাই, একথা সহজেই বলা চলে। মানুষের জীবনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও বিপুলতর হ'য়ে ওঠে, সাহিত্যের রাজপুরীও তার সহস্র দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়, এবং সকল দিক হ'তে আলো এবং বাতাসকে আবাহন ক'রে আনে। আলো বিকীরণ করার সঙ্গতি যে সাহিত্যের আছে, অন্ধকারকে গ্রহণ ও বর্জ্জন করার অধিকারও সেই সাহিত্যকে দিতে হবে এবং দেওয়া চাই। বাংলা সাহিত্য আজ বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লেই, অনেক অধম লেখকের রচনার কলঙ্কও তাকে বইতে হবে। আজ বাংলা সাহিত্যের দীনতা ঘুচেছে ব'লেই তার অঙ্গনে এত ভিখারীর ভীড়ও ক্রমশঃ জম্‌লো। এ ভীড় ঠেলার অনাবশ্যক ব্যস্ততা যার মধ্যে উগ্র হয়েছে, তাকে সাহিত্যিক না ব'লে রাজনৈতিক বল্‌তে হয়, কেননা, সাহিত্যে যে আবর্জ্জনা জমে ওঠে তা কালের প্রভাবে কখনও বা সুন্দর হ'য়ে ওঠে কখনও বা আপনিই লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা সাফ্ করার কাজই হ'ল চব্বিশ ঘণ্টার, কেননা, এখানে আবর্জ্জনা যখন জমে তখন হৃদয়ের প্রশান্তি দিয়ে তাকে অবহেলা করা যায় না, কোদাল নিয়ে তখনই পরিষ্কার করতে হয়।

এই জন্যই যাঁরা বাংলা কবিতার নূতন রূপ দান করেছেন, তাদের ভালোমন্দের কথা এই আলোচনা হতে বাইরে রেখে

এম. একটি কবির লেখা আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই, যিনি বাংলা কবিতার বহু পুরাতন পথটী দিয়েই বাংলা সাহিত্যে নূতন রস ও আনন্দের প্রবাহ ঘটাতে পেরেছেন। জসীমউদ্দিনের কবিতা যখন প্রথমে পড়েছিলুম—সে আজ চার পাঁচ বছর আগের কথা, তখনই তার প্রতিভা অনন্য-সাধারণ ব'লে মনে হয়েছিল এবং এই কথা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনাও অনেক ক'রেছিলুম। আমার সেই বিশ্বাস জসীমউদ্দিন দৃঢ় ক'রেছেন, তাঁর যে শক্তি বহুদিন আগে বিদ্যুৎ-ঝলার মত আমার চোখে একদিন প্রতিভাত হ'য়েছিল, সেই শক্তিরই ক্রমশঃ পূর্ণতর বিকাশ এই কয় বছরে লক্ষ্য ক'রেছি এবং উৎসাহের সঙ্গে তাঁর রচনার খবর রেখেছি। সম্প্রতি তাঁর কবিতার বই দুখানি হাতে পড়ে এবং এ-সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়ে, কিছুদিন আগে Advanceএ 'নক্সী কাঁথার মাঠ' বইখানার একটু ছোট সমালোচনা লিখেছিলুম। আমি সে প্রসঙ্গে এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলুম, যে বাংলা দেশের পল্লীর যে মাধুর্য্য, যে আদিম সারল্য কতকাল ধ'রে বাংলার কল্প-দৃষ্টিকে বারবার ঐ দিকে সশ্রদ্ধান্তঃকরণে আকর্ষণ করেছে, আমরা আধুনিক কালে তার প্রতি যেন উদাসীন হয়ে উঠ্‌ছি—বাংলার নদনদী বৃক্ষ পল্লব যেন আগেকার মত আমাদের প্রাণে বাঁশী বাজায় না, বাংলার যে রাখাল ও চাষী বংশীবটে ক্লান্ত অপরাহ্নে ধেনু চরায়, তার সঙ্গে আমাদের সহুরে সাহিত্যের চরিত্রের যেন সাদৃশ্য থাকে না। বাংলা সাহিত্য যেন বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির জীবন ধারণ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সকল প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'তে চলেছে।

এই অভিযোগের সত্যই কারণ আছে। একথা নিশ্চয়ই ঠিক, যে আধুনিক সভ্যতার দীপ্তচ্ছটা সাহিত্যকে তুমুল ভাবে আলোকিত আজ করবেই, কিন্তু তা হ'লেও যখন তুলনা করে দেখি সর্ব্বতোভাবে আধুনিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত দেশেও সাহিত্যে পল্লীর স্থান অনেক উপরে, সেখানেও পল্লীর ছোটখাটো সুখ দুঃখ নানা রঙে বিচিত্র, তখন আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যের অভাবনীয় কৃত্রিমতা ও বাস্তব-হীনতার কথা মনে ক'রে বিস্মিত হতে হয়। নরওয়ে-জীয়ান্ সাহিত্য শুন্‌তে পাই, আধুনিক বাঙালী লেখকদের নাকি অনেক প্রেরণা দিয়ে থাকে, কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভীয়ান্ সাহিত্যে যে সুরটী আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে পল্লী-জীবনের খুঁটিনাটি ও দারিদ্র্যের সুর, এবং তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে কেন ক্ষমতাশীল লেখকেরা সেই বিশেষ সুরটীকে মূর্ত্ত করার চেষ্টা করেননি, তা বোঝা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

জসীমউদ্দিনের কবিতা বাংলা সাহিত্যকে এই অপরিসীম লজ্জা ও কৃত্রিমতা হ'তে বাঁচিয়েছে। জসীম সেইজন্য সকল বাঙালী সাহিত্য-রসিকের কাছে চিরদিনই সমাদরের পাত্র ব'লে গণ্য হবেন। তাঁর কবিতায় আমাদের অতি আপনার বাংলা দেশের যে চিত্রটী পরিস্ফুট হয়েছে তার তুলনা আমাদের সাহিত্যে সত্যিই বোধহয় নাই। আমি এইজন্য অনেকবার মনে করেছি, যে ইংরেজী সাহিত্যে চিন্তা কল্পনা ও ভাবের দিক দিয়ে যেমন Burns এর চাইতে হয়ত অনেক ইংরেজ কবি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন, কিন্তু খাঁটী স্কটীস স্বাদেশিকতা ও আসল স্কচ মনটীকে এমন গ্রাম্য আবেষ্টনের মধ্যে আর কোনো কবি অথবা লেখকই গানে ও আনন্দে প্রকাশ করতে বোধ হয় পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে ত তেমনি ছন্দে, চিন্তায়, ভাব-মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ত অনেক লেখকই লিখেছেন, কিন্তু এমনিতরো পুরোপুরি গ্রাম্য ছাঁচে, ষোলো আনা গ্রাম্য আবহাওয়ায়, আমাদের দেশের পল্লীর চাষীদের মতন সবল ও সরস ক'রে সুখ দুঃখের কথা এমন ভাবে কেউ ব'লেছেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তা ছাড়া Burnsএর কবিতার সঙ্গে জসীমের লেখার আর এক জায়গায়ও মিল আছে, লক্ষ্য ক'রেছি। Burns সাধারণ স্কচ্ জীবনের অনুরাগ ও বিরাগের যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন, তার গভীরতা অত্যন্ত ভাবে মনকে স্পর্শ করে। ভালবাসা ও বিদ্বেষের বর্ণণায় এমন একটা অপূর্ব্ব ঐকান্তিকতা তার রচনায় লক্ষ্য করা যায় যে সেই দিক থেকে Shelley বা Keatsএর রচনাও অনেকাংশে শাসন-সংযত ব'লে মনে হয়। Jean কবিতায় Burns এর এই কয়টী লাইন, যেমন ;—

Of a' the airts the wind can blow
I dearly like the west
For there the bonnie lassie lives
The lassie I lo'e best.
There wild woods grow and rivers row
And monie a hill between
But day and night my fancy's flight
Is ever wi' my Jean.

এইখানে অথবা 'The Cotter's Saturday Night' এ অনুরাগ ও বিষাদের যে একটী সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা ব্রীড়া-সঙ্কোচে প্রচ্ছন্ন নয়, পরিপূর্ণতার দ্বারা সুপ্রকাশিত ও সুস্পষ্ট। জসীমের 'নক্সী কাঁথার মাঠে' রূপাই ও সাজুর গ্রাম্য ভালবাসার যে অনাড়ম্বর ছবি বাংলা সাহিত্যে কবি দান করেছেন, তার মধ্যেও ভালবাসার, বিরহের, মিলনের ও আকাঙ্ক্ষার এমন একটী সরল ইচ্ছার পরিচয় রচনায় ফুটে উঠেছে যে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না। প্রিয়বিরহের যে উন্মাদ বেদনা, যে মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-বিধ্বংসী হতাশা, তাকে ভাষায় ঠিক তেমনি বাস্তব ক'রে তোলার কৃতিত্ব সামান্য কৃতিত্ব না। জসীম এই কৃতিত্বের দাবী অতি নিঃসঙ্কোচে করতে পারেন এবং বাংলার পাঠকসমাজকে সেই দাবী স্বীকার ক'রে নিতে হবে। আমি জানি না, প্রথম মিলন-মুগ্ধ দুইটী গ্রাম্য তরুণ তরুণীর ভালবাসার গভীরতা জসীম যেমন কয়েকটী লাইনে প্রকাশ করেছেন, আর কেউ তা কোনো দিন ঠিক এমনি অনাড়ম্বর মহিমায় পারবেন কিনা। 'নক্সী কাঁথার মাঠে' কবি রূপাই ও সাজুর বিবাহের পর তাঁদের দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্যটুকু কি সুন্দর ভাবে এখানে ব'লেছেন—

"মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়াবউ গেহ-কাজে
দুইখান হ'তে দুটী সুর যেন এ উহারে ডেকে বাজে,
ঘর চেয়ে থাকে কেন মাঠ পানে, মাঠ কেন ঘর পানে
দুইখানে রহি দুইজন আজি বুঝিছে ইহার মানে।"

তা ছাড়া, ভাষায়, উপমায় এমন একটী অকৃত্রিম গ্রাম্য আমেজ জসীমের রচনায় আছে, যা কবির পক্ষেই একমাত্র স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। রূপাই চলিয়া যাওয়ার পরে সাজুর বিরহ-দীর্ঘ দিনগুলি যেরকম দুঃখের মধ্য দিয়ে কেটেছে, তার বর্ণনাটী অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সত্য হ'য়ে উঠেছে। গ্রামের আবহাওয়ায় প্রিয়বিচ্ছেদ ঠিক যে রূপ গ্রহণ করে, কবি ঠিক সেই ছবিই আঁকতে চেষ্টা করেছেন এবং এতে তাঁর সফলতা হয়েছে অপরিসীম। তেরোর পরিচ্ছেদে সাজুর মনের আশঙ্কাগুলির এমন একটী unconventional এবং truly pastoral বর্ণনা আছে, যা কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যটুকুকে সপ্রমাণ ক'রে দেয়। রূপাইয়ের বিরহে সাজু ভাবছে—

"কোন্ জালুয়ার মাছ সে খেয়েছে, নাহি দিয়ে তার কড়ি
তারি অভিশাপ ফিরিছে কি তার সকল পরাণ ভরি'!
কাহার গাছের জালি কুমড়া সে ছিঁড়েছিল নিজ হাতে
তারি ছোঁয়া কিগো লাগিয়াছে আজ তার জীবনের পাতে!

একটী অত্যন্ত unsophisticated পল্লী তরুণীর কি অভূতপূর্ব্ব সত্য ও স্বাভাবিক মর্ম্মোদ্ঘাটন এই লাইন-গুলিতেই না হ'য়েছে।

কবি জসীম উদ্দীনের সম্বন্ধে শুধু আর একটী কথা ব'লে আমি এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। ইদানীং মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে তাঁর যে দু একটী রচনা চোখে পড়েছে, তাতে তাঁর লেখায় যেন একটু affectation এর ভাব এসেছে ব'লে মনে হয়েছে এবং সেই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দ-প্রবাহ যেন সহরের বিবিধ বিক্ষিপ্ততায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে ব'লে সন্দেহ হয়। কবি Burns এরও একদিন খ্যাতির শাস্তি স্বরূপ সহরের আলোকে ফরমায়েসী রচনা লিখতে হয়েছিল। আজিকার Burns-ভক্তেরা সেই রচনাগুলোর কোনো সমাদরই করেন না। জসীমউদ্দীন এই ঘটনাটি মনে রাখলে ভাল করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।
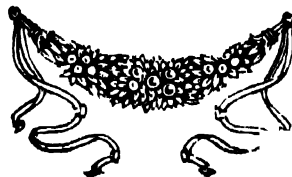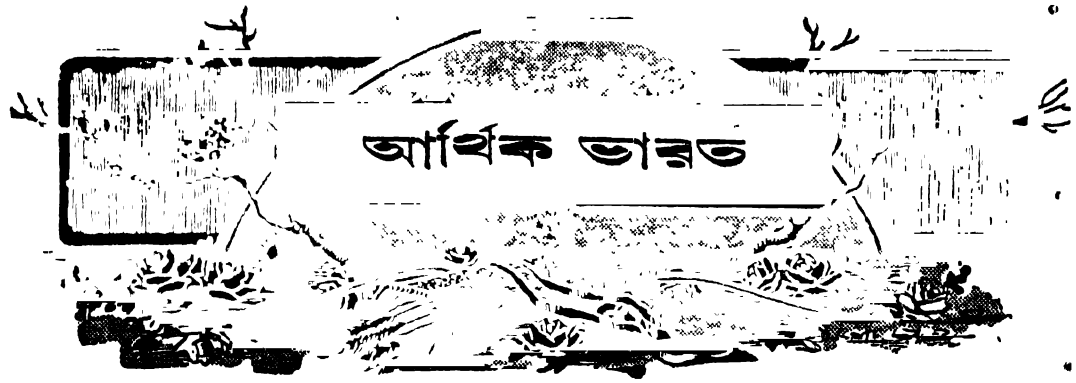
ওরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জীবন-বীমা কোং, লিঃ

ওরিয়েণ্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর নূতন বৎসরের উদ্বৃত্ত-পত্র আমরা আলোচনার্থ পাইয়াছি। গত বৎসরে এই কোম্পানীর উদ্বৃত্ত-পত্র আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে ভবিষ্যতের অনেক কাল ধরিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল প্রতি বৎসরই ব্যবসায়বৃদ্ধির পরিচয় সাধারণের সম্মুখে সগৌরবে ধরিবেন—দেখিতেছি, আমাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে।

১৯২৯ সনের ব্যবসায়-বিবরণে দেখিতেছি, কোম্পানী এই বৎসরে ৪৩,৬৬৯ সহস্র বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন,—একত্রে তাহার মূল্য ৯,০৬,৩৭,৫৮০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৩১,১২৮ সহস্র বীমা-পত্র দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ মোট ৬,৫০,০৪,৫৩৯ কোটি টাকার কাজ আসিয়াছে। এই বৎসরে এক ব্যক্তি একই সময়ে এক লক্ষ টাকার অবধি বীমা করিয়াছেন।

এ বৎসরে কোম্পানীকে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২,৫৩,৬৬০ টাকার দাবী রক্ষা করিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৭,৭২,৯৮৬ টাকা মৃত্যু জনিত এবং ৩৬,৫৭,৩৫১ টাকা দাবীর কাল পূর্ণ হওয়ার জন্য। নীচে কোম্পানীর বিভিন্ন জাতির বীমাকারীদের সংখ্যা দেওয়া হইল —

হিন্দু	১,৩১৩ বীমাপত্র ;	১২১১ জন ;	২৪,১৮,৮৪৬ টাকা
ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	২১৯ „	১৯৭ „	৪,৫৩,২০৪ „
পার্শী	২০২ „	১৪৮ „	৫,৫৩,০৬৪ „
মুসলমান	৮৪ „	৭৯ „	২,০১,৭৪১ „
মোট	১৮১৮	১৬৩৫	৩৬,২৬,৮৫৬ „

আলোচ্য বৎসরে আদায় হইয়াছে মোট ২,০৮,৪২,৭৪৩ টাকা, ইহার মধ্যে ১,৬০,৯২,২৬২ টাকা প্রিমিয়ামের বাবদ। গত বৎসরের প্রিমিয়াম আদায় অপেক্ষা এবৎসর ২১,৭৮,৫৫৭ লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ১,২১,৯২,৩৩১ টাকা—আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের অপেক্ষা ৮৬,৫০,৪১১ টাকা অধিক হইয়াছে। এই টাকা কোম্পানীর তহবিলে মজুত হইয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বৎসর অবধি জমার অঙ্ক হইতেছে, ৯,৫৯,৭৬,২০৪ টাকা।

কোম্পানীর হিসাব পত্রে লগ্নী টাকার মূল্যের সহিত বাজার দরের ওঠা নামার সঙ্গতি রাখার জন্য পরিচালকগণ এই বৎসরে একটি নূতন ফাণ্ড খুলিয়াছেন—এজন্য বীমাফাণ্ড হইতে ২৫ লক্ষ টাকা নেওয়া হইয়াছে।

গত দুই বৎসরে বাড়তি টাকার সুদের পরিমাণ প্রচলিত হিসাব হইতে বেশী হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের লাভ অনেক অধিক হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৃত্যু জনিত দাবীর পরিমাণ এ দুই বৎসরে কম হওয়ায় লাভের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে।

সর্ব্বসমেত কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য (Assets) আলোচ্য বৎসরে দাঁড়াইয়াছে দশ কোটী টাকা।

আর্থিক স্বচ্ছলতা হিসাবে ওরিয়েণ্টাল ভারতবর্ষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীবন-বীমা কোম্পানী এবং এই পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া কোম্পানী ক্রমাগতই পরিচালন-কার্য্যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ওরিয়েণ্ট্যালের কার্য্যকে বিপুল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না,—এই কার্য্যকে বিপুলতর করিবার সমস্ত প্রকার সুবিধা পরিচালকবর্গের আছে এবং আমরা আশা করি আগামী কয়েক বৎসরে কোম্পানী অনেক কোটী টাকার কাজ বাড়াইতে পারিবেন।

টিপ্পনী

সহযোগী "ইন্সেওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ" 'উপাসনা'র নিকট হইতে "মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র"এর একখানি ব্লক ছাপাইবার জন্য লইয়া যান। নিজস্ব সম্পত্তি না হইলে ইত্যাকার ব্যাপারে সৌজন্য স্বীকার করিবার একটা রীতি আছে—। যে সব ধুরন্ধর লোকের হাতে কাগজখানির ভার আছে—তাহাতে সাধারণ ভব্যতা অনুযায়ী 'সৌজন্য' স্বীকার করিয়া ব্লকখানি ছাপা হইবে এ আশা রাখিয়া আমরা অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই বর্ব্বর দেশেও যাহা সাধারণ ভব্যতা বলিয়া স্বীকৃত, বিলাত প্রত্যাগত ডাঃ সম্পাদকও যে তাহা বেমালুম হজম করিয়া যাইবেন—আমাদের মত অশিক্ষিতের চিন্তাও অতদূর অগ্রসর হইতে পারে না। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন বন্ধু বলিতেছিলেন—অমন একখানা কাগজ তোমাদের ব্লক ছাপাইতে লইয়াছে ইহাই ত যথেষ্ট—স্বীকার করিতে হয়, তোমরাই এবার উপাসনায় 'কৃতার্থ হইয়াছ' স্বীকার করিয়া ফেল—সব গোল চুকিয়া যাইবে।

—০—

স্বার্থে যাঁহাদের আঘাত লাগিয়াছে তাঁহারা বলিতেছেন—Blackmailing করিয়া উপাসনা অর্থ উপার্জ্জন করিতে চায়,—'হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক' এবং 'গ্রেট ইন্ডিয়ান' বিজ্ঞাপন দেয় নাই বলিয়া উপাসনার চৈত্র সংখ্যায় ঐরূপ কটু মন্তব্য বাহির হইয়াছিল,—মুখ বন্ধ করিবার একমাত্র ঔষধ বিজ্ঞাপন দেওয়া। গালিগালাজ করিয়া পয়সা রোজকার করা যে যায় না তাহা নহে—তাহার কিছু কিছু প্রমাণ জীবন-বীমা ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কঠিন অথচ সত্য কথা লিখিবার পরই পাওয়া গিয়াছে—কপাল খুলিতে খুলিতে খোলে নাই। বামুনের দারিদ্র্য কায়স্থ ত দূরের কথা বৈদ্যেরও অসাধ্য ব্যাধি। ঘুঁটি পাকিতে পাকিতে কাঁচিয়া গেল!

—০—

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে—বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন—এই গুজব রটিতেছে। এক 'সুন্দর প্রভাতে' দেখা গেল, দেশবাসীর মুখ হইতে সিগারেট খসিয়া পড়িয়াছে—পরিবর্ত্তে বিড়ি বা চুরুট আরামে ধোঁয়া ছাড়িতেছে। সেই ভাবে বিলাতি বীমা-কোম্পানীর পলিসিগুলি ক্রমান্বয়ে খসিতে থাকিলে—আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ভারতীয় জীবন-বীমার বাজারেও যে আশানুরূপ গ্রাহকের সমাগম হইতেছে না, একথাটাও কেহ কেহ বলিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এদেশীয় বীমা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে বটে—কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে এই সকারণ উল্লাসেও আজ আমাদের অধিকার নাই। সংবাদ পত্র বন্ধ হওয়াতে দেশের মধ্যে নিত্য নূতন গুজব রটিতেছে—মহাত্মা গান্ধীর নাম করিয়া যে সব হৃৎ-কম্পকারী কথার হুজুগ উঠিতেছে—তাহাতে সাধারণ লোকের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে ইহা ত স্বাভাবিক। জীবন-বীমা ত দূরের কথা, চলতি কারবারের সাধারণ কথাও লোকে আজকাল মনোযোগ সহকারে শুনিতে চায় না—ফলে জীবন-বীমার অফিসগুলিতে আসল কাজের ব্যস্ততা অপেক্ষা 'মফঃস্বল' চিঠিপত্রের আদান প্রদানের মাত্রাটা কিছু অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন একমাত্র নির্ভর করে শাসক সম্প্রদায়ের মতি-পরিবর্ত্তনের উপর। হাতে না মরিয়া ভাতে মরিবার আশঙ্কা হইয়াছে সকলেরই, পর্ব্বত-পরিমাণ নৈরাশ্যের মধ্যে এইটুকুই যা ভরসা!

—০—

'লাইট্ অফ্ এশিয়া'র সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক তারিখ-বিহীন পত্রে আমাদের জানাইয়াছেন যে আমরা চৈত্র সংখ্যায় যে সব কথা তাঁহাদের কোম্পানী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—তাহা নির্ভুল নহে। "ভুলগুলি অসংশোধিত রাখবেন না" এই বলিয়া অনুরোধ জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"'লাইট্ অফ্ এশিয়া' শীঘ্রই দরজা বন্ধ করবে এরূপ সম্ভাবনা আজও নেই, পূর্ব্বেও কোনও দিন ছিলো না। একচুয়ারি শ্রীযুক্ত এইচ্, এল্, হমৃফ্রিজ সম্প্রতি আমাদের "ভ্যালুয়েশন" শেষ করেছেন। তার ফলে দেখা গেছে যে

আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা খুব আশাপ্রদ। ...আমরা আমাদের "শেয়ার ক্যাপিটল্" বাড়িয়েছি, সরকারী সিকিউরিটির সম্পূর্ণটা জমা দিয়েছি এবং নূতন ব্যবস্থা ও নূতন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছি। আমাদের ব্যয়ের তালিকাও এ বৎসরে সংক্ষিপ্ত হবে। এই সমস্ত নূতন বন্দোবস্তের কল্যাণে ডাইরেক্টরগণ এবারে প্রচুর কাজের আশা রাখেন।"

সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—বীমা কোম্পানীর 'সেয়ার ক্যাপিট'ল্' বাড়ানর অর্থ কি? আমরা জানি, সেয়ার ক্যাপিটাল্ বাড়ান কোনও বীমা কোম্পানীর পক্ষেই 'আশাপ্রদ' নহে। বর্ত্তমান ক্যাপিটালের অনুপাতে কোম্পানীর 'ডিফিসিট' (ক্ষতি) অধিক হইয়াছে—একচুয়ারীর ভ্যালুয়েশনে প্রকাশ পাইলে—ক্যাপিটাল বাড়াইবার কথা উঠে। 'লাইট অফ্ এশিয়া' তবে কি অপরিমিত ক্ষতি সাম্‌লাইতে গিয়া সেই অনুপাতে 'সেয়ার ক্যাপিটাল্' বাড়াইয়াছেন?

সম্পাদক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—যে ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহাও ঠিক নহে, বর্ত্তমান উন্নতির জন্য নাকি ঘোষ মহাশয়ই ধন্যবাদার্হ এবং "অজিত বাবু বিলেত গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর যাওয়াতে কোম্পানীর অবস্থান্তর ঘটেনি।" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে 'লাইট অফ এসিয়া'র বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। পাঠকবর্গকেও আশ্বস্ত হইতে বলিতেছি। কিন্তু একটা কথা এখানে আমাদের বলিতে হইতেছে,—সম্পাদক মহাশয় কোম্পানী সম্বন্ধে যে সুখবর গুলি দিয়াছেন তাহা ত অজিত বাবুর আমলের নহে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদেরই সম্বন্ধ—সুতরাং ধন্যবাদ ত পাওয়া উচিত তাঁহাদেরই—অজিত বাবুরই যদি সবখানি ধন্যবাদ পাওনা হইবে, তাহা হইলে অজিত বাবুর মত অমন একজন কর্ম্মীর বিলাত গমনে কোম্পানীর 'অবস্থান্তর' ঘটিল না কেন?—কথাগুলি আমরা যুক্তির দিক দিয়া বলিলেও, কোম্পানী দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই আমরা চাই।

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যা উপাসনায় স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় শীর্ষক লেখাটিতে একটী ভুল আছে। যজ্ঞেশ্বর বাবু ১২৬৬ সালে ৯ই ভাদ্র জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ভুলক্রমে ১২২৬ সাল ছাপা হইয়াছে।

গত সংখ্যার উপাসনায় "কবিবর হাফেজ" প্রবন্ধের ২১ পৃষ্ঠায় ২০ লাইনে "হ'য়েছে" স্থলে "হয় নাই" হইবে।—উঃ সঃ

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

১। 'ডাল'-দরওয়াজা।

২। 'ডাল'এর মুখে।

৩। শ্রীনগরের গণ্ডোলা-'শিকারা'

৪। তখৎ-ই সুলেমানের মন্দির।

৫। হাউস-বোট।

"রবি"র সৌজন্যে।

১। 'ডাল'এর একাংশ। ৩। বিতস্তার সপ্তম সেতু, শ্রীনগর
২। আপেল-খাল, শ্রীনগর। ৪। বিতস্তায়, শ্রীনগর।
৫। চিনার বাগ, শ্রীনগর।

"রবি"র সৌজন্যে।
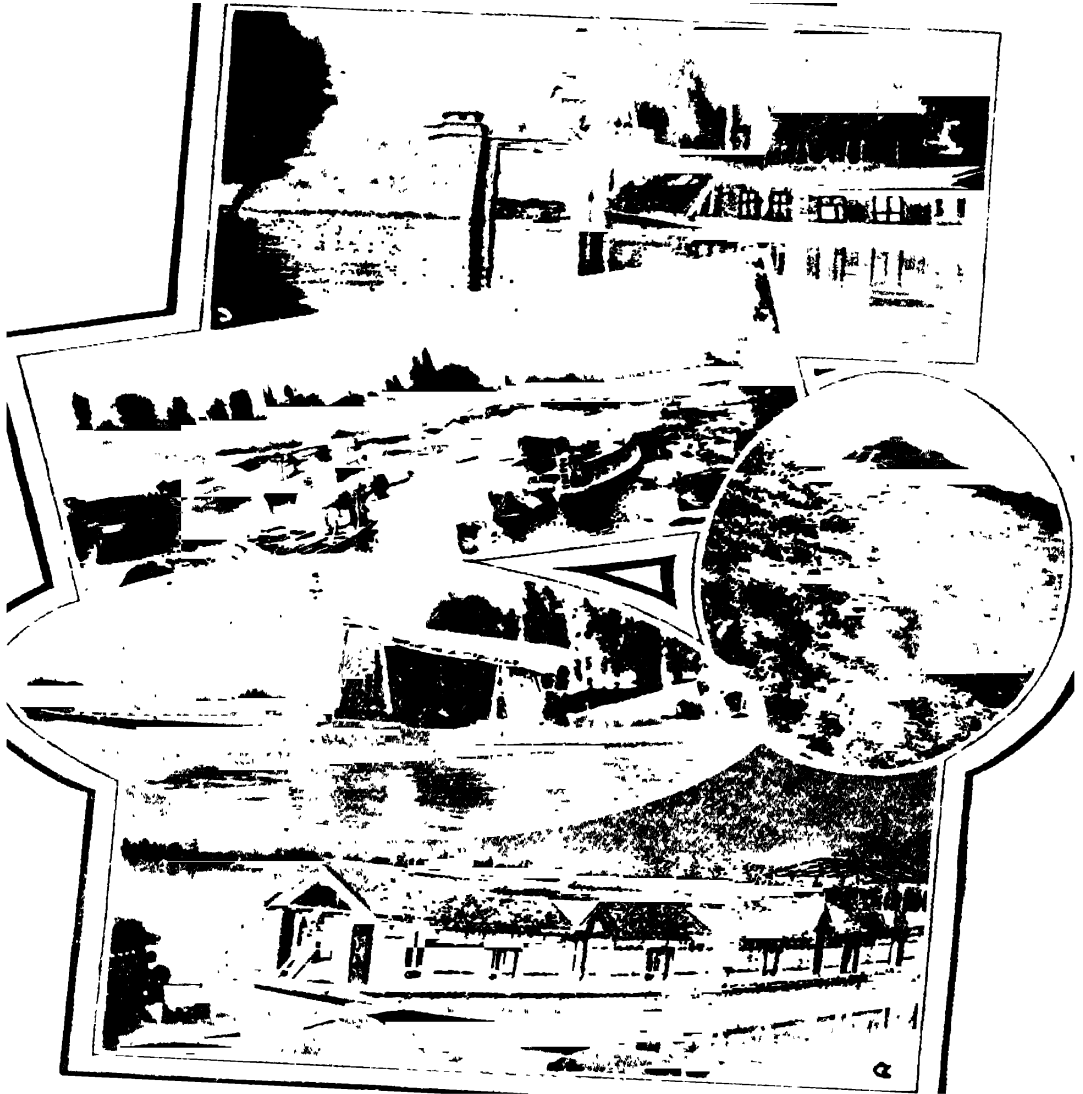
২৩শ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৩৭ ৩য় সংখ্যা

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তোমার জীবন বরণ করে'
ভুঁইচাঁপা আজ ফুট্‌ছে ভুঁয়ে
তোমার কথা জানিয়ে গেল
ঝুম্‌কোলতা নুয়ে নুয়ে।

বাদলের আজ নাইক' মাতন,
বেণু বনের অরূপ রতন
ফুটিয়ে গেল থরে থরে
চাঁপার কলি বকুল জুঁয়ে।

নধর কচি কাঁচা পাতায় নবীন হয়ে উঠেছে প্রাণ
এই লগনে ভোর গগনে উতলা যে তোমারি গান!

ক্ষতি যে আজ দেয় না ব্যথা
ভাব্‌ছি কেবল লাভের কথা,
আজ বিরহের মলিন স্মৃতি
নেব নয়ন জলে ধুয়ে।

তুমি যে আজ ছড়িয়ে প'লে কিশলয়ে ফুলে ফলে
ওগো আমার চিরন্তনী এই ধরণীর জলে স্থলে ;—

মেঘ-ভাঙ্গা এই উজল দিনে
কী সুর ওঠে হৃদয়-বীণে
আজ দেখি তা'র সকল তারে
পরশ তোমার গেল ছুঁয়ে।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

৫

বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর অবারিত অনুরাগের মাঝে একটি স্বচ্ছ অন্তরাল রচনা করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিবার জন্য যে তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনীয়, সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে ত্যাগ করিয়া সহসা স্বামী যদি অন্তর্হিত হয়, তবে ব্যাপারটা সত্যই বিসদৃশ হইয়া উঠে। সুধী-কে পাশে না দেখিয়া প্রদীপের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইল। কিছু একটা কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শালবীথিকে বেষ্টন করিয়া প্রশান্ত ধ্যান গাম্ভীর্য্যের মত যে-সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য ও সাধারণ কথা বলিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিবার দুঃসাহস প্রদীপের হইল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। অদূরে নমিতা সঙ্কোচে, ভীরুতায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেছে। নিজের বসিবার ভঙ্গীটি হইতে সুরু করিয়া এই অর্থহীন নিস্তব্ধতা পর্য্যন্ত তাহার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিল। অপরিচয়ের লজ্জার কুজ্ঝটিকা দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু যতই হাসিবে ভাবে, ততই অন্যায় কুণ্ঠায় তাহার ঘোমটা আরও নামিয়া আসিতে চায়।

এমন মুস্কিলে কে কবে পড়িয়াছে! এত নিকটবর্ত্তী হইয়া ও এমন অনুচ্চারিত পরিচয় লইয়া কাহারা মুহূর্ত্ত গুণিয়াছে! শালের বনে সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় হৃদয়ের ভাষায় আলাপ করিবার জন্য মানুষের মুখের ভাষা যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় নাই কেন? ইহার চেয়ে যদি প্রদীপদের মেসের কাছে গ্যাস্‌পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়ি উল্টাইয়া পড়িত, তাহা হইলে গাড়ির মধ্য হইতে আহত সুধী ও নমিতাকে নামাইয়া তাহার ঘরের ষ্টোভে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া আলাপ জমাইতে বেগ পাইতে হইত না। কিম্বা, কল্পনা করা যাক্, সুধী ও নমিতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে হাওয়া খাইতে গিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় ছোরা-হস্তে এক গুণ্ডার আবির্ভাব হইল, অমনি পেছন হইতে যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কসিয়া নিমেষে প্রদীপ ব্যাপারটাকে ইন্দ্রজালের চেয়েও রোমাঞ্চময় করিয়া তুলিল—এমন সাহসিক কীর্ত্তি যে সে দুই একটা করে নাই তাহা নয়। তাহা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করিবার ভার পড়িত নমিতারই (ধরা যাক্ সুধী উপস্থিত ছিল না), প্রদীপকে তাহা হইলে এমন ঘামিতে হইত না। কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে আলাপটা কথা না কওয়ার মতই সহজ হইয়া উঠিত। এই সময় শুক্‌নো পাতার ভিড় সরাইয়া একটা সাপ আসিয়া দেখা দিলেও অসঙ্গত হইত না—হিংস্র সাপ অনায়াসে কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারিত। কথা কহিতে পারিবে না, অথচ এই অতলস্পর্শ স্তব্ধতায় আত্মার গভীরতম পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের ভাষাকে বিধাতা এত অসম্পূর্ণ ও নিস্তেজ করিয়াছেন কেন? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই ত জ্ঞানের একমাত্র মূল নয়; কিন্তু যাহা প্রকাশের অতীত হইয়াও অনুভবের অগোচর নয়, সেই চেতনাকে নমিতার প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপায় কোথায়? এই নীরব আকাশকে ব্যঙ্গ না করিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে অকৃত্রিম সঙ্গতি রাখিয়া এই হৃদয়চাঞ্চল্যটিকে প্রকাশিত করিবার অমিত শক্তি বাঙলা ভাষা কবে লাভ করিবে?

সুখ নিদ্রার মত অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে, অথচ সুধী-র ফিরিবার নাম নাই। অবশেষে প্রদীপের মুখে অজ্ঞাতসারে ভাষা আসিল, 'আর বসে' কাজ নেই, চল।' এবং এই একটি মাত্র আহ্বানে নমিতা উঠিয়া পড়িল দেখিয়া প্রদীপের খেয়াল হইল সে কথা বলিতে পারিয়াছে। এবং একবার যখন ব্যূহদ্বারের বিপুল বাধা পরাভূত হইয়াছে তখন প্রদীপকে আর পায় কে? মাঠটুকু পার হইয়া রাস্তায় নামিয়াই প্রদীপের রসনায় ভাষা অনর্গল হইয়া উঠিল, 'দেখ, আমাদের দেশে মেয়ে পুরুষে সহজ পরিচয়ের বাধা বিস্তর.

কিছুতেই আমরা সামঞ্জস্য রাখতে পারি না। তোমরা আমাদের কর সন্দেহ, আমরা তোমাদের করি অশ্রদ্ধা। তাই আমরা মধুর সখ্যতার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মাকে খর্ব্ব ও কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু ক'রে রেখেছি। আমরা কিছুতেই সহজ হ'তে পারি না—সে আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য সাধনা। জড়িমার আবরণ রচনা করে' আমরা আত্মরক্ষা করি—তোমরা হও সতী, আমরা হই সাধু। কিন্তু তা'যে কত অসার, তার মূল্য যে কত অল্প তা আমরা বুঝি যখন একে-অন্যের বন্ধুতায় নতুন করে' আবার আমরা আবিষ্কৃত হই, যখন আমাদের জীবন প্রসারিত আয়তন লাভ করে। —দেখো, হোঁচট খেয়ো না—"

এই সব কথার উত্তর দিতে হইলে বড়ো-বড়ো কথা না কহিলে বেমানান্ হইবে, তাহার জন্য নমিতা এখনো প্রস্তুত হয় নাই; তাই হোঁচট খাইবার কথায় সামান্য একটু হাসিয়া নমিতা চুপ করিয়া রহিল। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল, "সুধী হঠাৎ আমাকে ডেকেছে কেন বলতে পারো?"

নমিতা কহিল,—কাশ্মীর বেড়াতে যাবেন, আপনি সঙ্গী হবেন তাঁর।

প্রদীপ। কাশ্মীর? হঠাৎ? পৃথিবীতে এত লোক থাকতে কাশ্মীরের শীত সইতে আমি তার সঙ্গী হ'ব, আমার অপরাধ?

নমিতা। জানি না, কিন্তু তাঁর অপরাধ আরো গুরুতর আমাকে সঙ্গে নেবেন না বলুন তো এটা তাঁর অত্যাচার নয়?

প্রদীপ। তোমাকে সঙ্গে নেবে না কেন?

নমিতা। সে-প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছিলাম তিনি বল্লেন, আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, সম্ভব হয় তো প্রদীপের সঙ্গে উপন্যাসটা শেষ করে' ফেলবো।

প্রদীপ। তুমি গেলে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে কেন?

নমিতা। প্রথমত, আমি গেলে অনৈক্য ঘটবে, দ্বিতীয়ত তাঁর সাহিত্য সাধনা সিদ্ধ হ'বে না।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই নমিতা বুঝিল তাহাদের গোপন মনোমালিন্যের এই ইতিহাসটুকু ব্যক্ত না করিলেই ভালো হইত। কিন্তু তাহার উত্তরে প্রদীপ যাহা বলিয়া বসিল তাহাতেও তাঁহার লজ্জা কম হইল না। প্রদীপ কহিল,—"তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি ওর সঙ্গী হ'ব আমাকে ও এত বোকা ভাবলে কিসে? তোমার সান্নিধ্যে ও যদি শ্রান্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ওর নৈকট্যে আমাকে সন্ন্যাসী হ'তে হবে নিশ্চয়।" বলিয়া কথাটাকে লঘু করিবার চেষ্টায় সে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু নমিতা আর কোন কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের দুর্লক্ষ্য গোপন বেদনাটী প্রদীপের চোখে ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার কথায় এমন স্পষ্টতা আসিয়াছে। ইহা নমিতার অভিপ্রেত ছিল না। স্বামীর কাছে কবে ও কেমন করিয়া যে সে তাহার রহস্য-মাধুর্য্য হারাইয়াছে, এমন নিবিড় মিলনে কবে যে অবসান ঘটিয়া অবসাদ আসিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মত জ্যোতির্বিবদ্যা নমিতার জানা ছিল না। নমিতাকে সুধী যে পরিমাণ স্নেহ করে তাহার বিশেষণ দিতে গেলে অপর্য্যাপ্ত বলিতে হয়, অথচ নমিতাকে তাহার ভাল লাগে না—এই মনস্তত্ত্ব বুঝিবার মন তাহার নাই। এই বেদনাটি মনে-মনে লালন করিবার অবকাশে নমিতার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে একদিন স্বামীর চক্ষে সে এত মহিমা ও মর্য্যাদা লইয়া উদ্ভাসিত হইবে যাহার তুলনায় তাঁহার কল্পনাকায়া সাহিত্য-লক্ষ্মী নিষ্প্রভ, নিরাভরণ। তাহারই জন্য সে স্বামীর কাছে মনে-মনে একটি শিশু কামনা করিয়াছে। এবং এই কামনার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া স্বামী তাহাকে ভাবিয়াছেন গ্রাম্য, স্থূল। স্বামী তাহাকে বলিতেন;—"তুমি যে আমার স্ত্রী এই কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয় বলে' আমার ভালো লাগে না।" অথচ, এই প্রকার কৃত্রিম বিবাহজাত মিলনকে মাধুর্য্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যে বিবাহের পরেও দীর্ঘকালস্থায়ী প্রণয়োপাসনার প্রয়োজন আছে তাহা প্রথমে স্বামীই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রেমকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে অনন্যপরায়ণ প্রতীক্ষা দরকার তাহার ধৈর্য্য হারাইতে স্বামীই দ্বিধা করেন নাই। আজ সহসা নমিতা তাঁহার কাছে আবিষ্কৃত হইয়া গেছে!

বাড়ী আসিবার পথটুকু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। সুধী তখনো ফিরিয়া আসে নাই। নমিতা আসিয়া শুধাইল,—"মা বল্লেন, আপনার চা এখন নিয়ে আস্‌বো?"

প্রদীপ কহিল,—"মাকে বোলো, এখন চা খেলে আমার ক্ষুধার অকাল মৃত্যু ঘট্‌বে।"

নমিতা হাসিয়া বলিল,—"রাতের খাওয়া হ'তে আমাদের বাড়িতে বেশ দেরি হয়, অতএব চা খেলে আপনার ক্ষুধা মরে' গিয়েও ফের নবজীবন লাভ করবার সময় থাক্‌বে।"

প্রদীপ কহিল,—"যদিও ক্ষুধাকে বাঁচিয়ে রাখবার ধৈর্য্য আমার আছে, তবু যখন বল্‌ছো, নিয়ে এস। দেখো, অতি মাত্রায় অতিথিপরায়ণ হ'য়ো না। অসুখ করিয়ে শেষে সেবার বেলায় ছুটি নেবে সেটা আতিথ্যের বড়ো নিদর্শন নয়।"

রাত্রের খাওয়ায় দেরি হয় বটে, কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া খায়—একই চতুষ্কোণ টেবিলের চারধারে চেয়ার পাতিয়া। দৃশ্যটা দেখিয়া প্রদীপ মুগ্ধ হইয়া গেল। পারিবারিক প্রীতির এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে সে নরনারীর সমানাধিকারের সঙ্কেত পাইল। এত আনন্দ করিয়া এত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কোনোদিন আহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। আহার্য্য বস্তুগুলি অরুণাই বাঁটিয়া দিতেছিলেন, স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা সরাইয়া বধূ নমিতাও তাহার অভিভাবকদের সম্মুখে সামান্য প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে, কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে উমার কলহাস্য বিরাম মানিতেছে না। নানা বিষয় নিয়া কথা হইতেছে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা হইতে সুরু করিয়া গো-মাংসের উপকারিতা পর্য্যন্ত; সবাই সাধ্যমত টিপ্পনী কাটিতেছে, এবং অবনীবাবু তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মুখোস্‌ খুলিয়া যেই একটু রসিকতা করিতেছেন, অমনি সবাই সমস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া নিজের নিজের পরিপাক-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে। প্রদীপ যে এই বাড়িতে একজন আগন্তুক অতিথিমাত্র তাহা তাহাকে কে মনে করাইয়া দিবে? সামান্য খাইবার মধ্যে যে এত সুখ ছিল, মানুষের হাসি যে সত্যই আনন্দজনক,—এই সব স্বতঃসিদ্ধ তথ্যগুলি সম্বন্ধে সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। অরুণা প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সব আমার নিজের হাতের রাঁধা, তোমার মুখে রুচ্‌ছে ত'?" দাঁতের ফাঁক হইতে মাছের কাঁটা খসাইতে খসাইতে অবনীবাবু কহিলেন,—"তুমি কি আশা কর তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ বলবে যে রুচ্‌ছে না, স্বাকার কর্‌ছে? প্রদীপের সত্যবাদিতায় নিশ্চয়ই তুমি সুখী হ'বে না। ভদ্র হবার জন্যে কেন যে এ-সব মামুলি কথা বল তোমরা, ভেবে পাইনে।"

উমা টিপ্পনি কাটিল,—"আর প্রদীপবাবু যদি ভদ্রতর হ'বার জন্যে বলেন যে স্বর্গসভায় সুধা খাচ্ছি, তা' হ'লে তাঁর সেই অতিশয়োক্তিকে তুমি সন্দেহ করবে; তা'তেও তুমি সুখী হ'বে না।" প্রদীপ কহিল,—"অতএব কোনো বাক্‌বিস্তার না করে' নিঃশব্দে খেয়ে-চলাই আমার পক্ষে ভদ্রতম হ'বে।"

খাওয়ার পরে শুইবার ঘরে আসিয়া সুধী নমিতাকে কহিল,—"তুমি মা'র কাছে আজ শোও গে; প্রদীপের সঙ্গে রাত্রে আমার ঢের পরামর্শ আছে।"

প্রদীপ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,—"না বৌদি, অত আড়ম্বরের কাজ নেই। খেয়ে-দেয়ে পরামর্শ করবার মতো ধৈর্য্য ও অনিদ্রা বিধাতা আমাকে দেন্‌নি। বুঝ্‌লে সুধী, স্ত্রীকে ত্যাগ করে' বন্ধুকে শয্যার পার্শ্ব দেওয়ার আতিথ্য এ-যুগে অচল হ'য়ে গেছে। তোমাদের ঘরের পাশেই যে ছোট বারান্দাটুকু আছে তাতেই একটা মাদুর বিছিয়ে দাও,—আমি এত প্রচুর পরিমাণে নাক ডাকাবো যে জান্‌লাটা খুলে রাখ্‌লেও তোমাদের প্রেমগুঞ্জন শুন্‌তে পাবো না। ভয় পাবার কিছুই নেই, সুধী। তা ছাড়া না-ঘুমিয়ে বসে' বসে' কলম কাম্‌ড়াবো আমি আজো তত বড়ো সাহিত্যিক হইনি।"

মাথা নাড়িয়া সুধী কহিল,—"না, এ-ঘরে আজ নমিতার শোওয়া হ'বে না, তোমার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে।"

প্রদীপ। কী গোপন কথা? কাশ্মীর যাওয়ার কথা তো? তোকে সোজাসুজি বলে' রাখ্‌ছি সুধী, বৌদি না গেলে আমি যাব না কক্‌খনো।

সুধী। অত দূরে যাবার নমিতার কোনো দরকার নেই।

প্রদীপ। আর, আমারই জন্যে যেন কাশ্মীরের সিংহাসন খালি পড়ে' আছে! বৌদির সান্নিধ্যে সাত মাস থেকে তোর যদি হাঁপানি উঠে থাকে, তবে তোর সঙ্গে একদিন থেকে আমার হ'বে ব্রঙ্কাইটিস্‌।

নমিতাকে ঘর হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া সুধী গম্ভীর হইয়া কহিল,—সত্যি প্রদীপ, বিয়ের পর এই একঘেয়েমি আমাকে ক্লান্ত করে' তুলেছে। আমি দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রাম চাই, চাই বৈচিত্র্য!

প্রদীপ জোর দিয়া কহিল,—এ তোর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, সুধী। বিয়ে এত ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠ্‌বে এই যদি তোর ধারণা ছিল তবে বিয়ে করা তোর পক্ষে নিদারুণ পাপ হ'য়েছে।

সুধী। ধারণা আমার আগে ছিলো না। তাই বলে' ভুলকে সংশোধন কর্‌বো না—আমি তত ভীরু নই। নমিতা আমাকে তৃপ্ত করতে পারে নি।

প্রদীপ। কিন্তু বিয়ের আগে এই নমিতার রূপ ও তার বাপের টাকা তোর নয়নতৃপ্তিকর হ'য়ে উঠেছিল—তুই লোভী। বিয়ে করে' ফেলে নমিতার ওপর বীতরাগ হওয়া নীতিতে তো বটেই, আইনেও দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

সুধী। তা আমি বুঝি। তাই প্রকাশ্যে আমি আমার এই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতে সব সময়েই ক্লেশ বোধ করেছি। আমি নমিতাকে ভালোবাসি না এমন নয়, কিন্তু ভালো লাগে না। আমার রুচির সঙ্গে ওর মিল্ নেই।

প্রদীপ। সে-জন্যে নমিতাকে দায়ী করলে অন্যায় হ'বে। তোর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওর ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে' রাখার চেয়ে তাকে একটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিত মনে করি। মোট কথা জানিস্ কি সুধী, এই সব জায়গায় স্বামীকে তার অহঙ্কারের চূড়া থেকে নেমে আসতে হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক সমতল ভূমিতে,—নইলে সঙ্গতির আর আশা নেই। তুই যেমন আপ্‌শোষ করছিস্, নমিতাও তেম্‌নি হয় তো তার ভাগ্যকে ভৎর্সনা কর্‌ছে। ভাব্‌ছে, কেন সাহিত্যিককে বিয়ে কর্‌লাম—এর চেয়ে একটি গৃহস্থ কেরাণী শতগুণে লোভনীয় ছিল। বিয়ের অপর নামই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক একটা রফা। সন্ধির সর্ত্ত ভাঙ্‌তে গেলেই আসে সামাজিক অশান্তি; আমরা সভ্য লোক, ওটাকে এই জন্যেই এড়িয়ে যেতে চাই যে অশান্তিটা কালক্রমে মনেও সংক্রামিত হয়। ভুল সংশোধন করার অর্থ আরেকটা ভুল করে' বসা নয়। বিয়েটা দুইটা জীবনের সঙ্গে সমাজকে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তাকে ভাঙার চাইতে জোড়া-তালি দিতে গেলে অগৌরব হয় না। ডিভোর্সের আমি পক্ষপাতী,—কিন্তু 'ভালো লাগে না' এই ওজুহাতকেই যদি বিবাহচ্ছেদের প্রধান কারণ ব'লে স্বীকার করা যায়—তা হ'লে পৃথিবীতে আত্মহত্যাও অত্যন্ত সুলভ হ'য়ে উঠ্‌বে। নমিতা তেমন লেখা-পড়া শেখেনি, রাজধানীর আবহাওয়ায় তার অঙ্গসজ্জা রাজসংস্করণ লাভ করেনি বা সে স্নায়ুহীন কবিপ্রিয়া না হ'য়ে সংসারকর্ম্মক্ষমা গৃহিণী হ'তে চায়—এই যদি তার ত্রুটির নমুনা হয়, তবে বিয়ের আগে তোরই সাবধান হওয়া উচিত ছিলো, এখন তোর কাজ হচ্ছে নমিতাকে তোর উপযুক্ত করে' তোল।

সুধী। যে-কাজে আনন্দ নেই সে-কাজে আমার মন ওঠে না। আচ্ছা এক কাজ করা যায় না? বাঙ্‌লা সমাজ আঁৎকে উঠ্‌বে হয় তো।

প্রদীপ। কি?

সুধী। ধর্ আমি যদি আজ নমিতাকে ত্যাগ করি—হাঁা, অন্য কোনো কারণে নয়, খালি তাকে আমার ভালো লাগে না বলে'—এবং তার বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটতে না কাট্‌তেই যদি তুই ওকে লুফে নিস্—ব্যাপারটা কেমন হয়?

এমন একটা গুরুতর কথার উত্তরে কেহ যে এত জোরে হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ করিবার সাহস দেখাইতে পারে তাহা সুধী-র জানা ছিল না। তাহার মনে হইল কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন কি একটা অপরাধ করিয়াছে। নমিতা কি একটা কাজে বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ ডাকিয়া উঠিল, "সঙ্গে তুমি কি কি জিনিস নেবে তা'র একটা ফর্দ্দ আজ এক্ষুনই ক'রে ফেল্‌তে হ'বে। লেপ দু'খানা হ'লেই চল্‌বে—লেপ গায়ে দিয়ে ট্রেনে ট্র্যাভেল্ করার মত সুখ আর নেই। শুনে যাও, বৌদি।"

"আস্‌চি"—বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইতেই প্রদীপ কহিল,—"কাশ্মীর ছেড়ে কাঁকে গেলেই ভালো করতিস্ সুধী।"

অল্পক্ষণ পরেই নমিতা আসিল, তাহার সংসারের সব কাজ সমাধা হইয়াছে। প্রদীপ কহিল,—"যাবে তো, কিন্তু তোমার অনেক কাজ করতে হ'বে, মনে থাকে যেন। চা করে' দেবে, গাড়ি ধর্‌বার সময় প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হ'বে, ভুলে লাগেজের গাড়ীতে উঠে পড়বে না, গাড়ির ঝাঁকুনির টাল্ সাম্‌লাতে গিয়ে শেকল টেনে দেবে না, কলিশান্ হ'লে বাড়ির জন্যে মন কেমন করলে জরিমানা দেবে।"

নমিতা হাসিয়া উঠিল। ভারতের ভূস্বর্গে সশরীরে আরোহণ করিতে পারিবে ভাবিয়া আরেকটু হইলে সে ছোট খুকির মত হাততালি দিয়া উঠিত। স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—"কবে যাচ্ছি?"

সুধী-র উৎসাহ যেন উবিয়া গেছে। বিরস কণ্ঠে কহিল,—"যেদিন সুবিধে হ'বে। পরে প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার আমার উদ্দেশ্যই ছিল আমার মনের এই সমস্যাকে পরিষ্কার করে' তুলতে। যখন এ সম্বন্ধে তোমার কোনো সহানুভূতি নেই, তখন কাশ্মীর যাওয়া বন্ধ রইলো। বাকি জীবনটা এখানেই যা হোক্ করে' কাটিয়ে দেব 'খন।"

"জীবন সম্বন্ধে তোমার এই দিব্যজ্ঞান দেখে বাধিত হ'লাম।" কিন্তু চাহিয়া দেখিল নমিতার মুখ চুণ হইয়া গেছে। আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা করিবার জন্য মুখে হাসি আনিয়া প্রদীপ কহিল,—"সুবিধে আমার কাল-ই হচ্ছে। কালকেই আমি সকালের ট্রেণে কল্‌কাতা গিয়ে গাড়ি-টাড়ি সব রিজার্ভ করে' আস্‌ছি। কাগজ পেন্সিল নিয়ে এস বৌদি, কি কি জিনিস কিনে নিতে হ'বে তা'র একটা হিসেব করে' নেওয়া দরকার। আমরা তীর্থ করতে যাচ্ছি না যে, পথের কষ্ট ভোগকে আমরা স্বর্গারোহণের দাম বলে' মেনে নেব। আমরা যাচ্ছি বেড়াতে—পান থেকে চুণ খসলেই আমাদের মুস্কিল। রেলের কামরাটাকে আমরা একটা অতি আধুনিক ড্রয়িং-রুম করে' ছাড়বো।"

নমিতার মুখ তবুও প্রসন্ন হইল না। একান্তে প্রদীপকে বলিবার জন্যই সে একটু নিম্ন স্বরেই কহিল,—"মুখ থেকে কথা যখন একবার বেরিয়েছে তখন আর তার নড়চড় হ'বে না, দেখবেন।"

প্রদীপ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল; "বেশ তো, নাই বা গেল সুধী—তুমি আর আমি যাবো। তুমি তার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর না হোক, লিলুয়া পর্য্যন্ত আমরা যাবোই,—আমি আর তুমি।"

দেখিতে দেখিতে তাহাদের দুই জনের আলাপ এত জমিয়া উঠিল যে তাহারা এক সময়ে টাইম্ টেবিল খুলিয়া বম্বে মেইল ও লাহোর এক্‌সপ্রেসের স্পীড্-এর তারতম্য বাহির করিতে অঙ্ক কষিতে বসিল। সুধী কখন চেয়ার ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াছে তাহা নমিতা লক্ষ্য করিলেও প্রদীপের খেয়াল ছিল না; সে গল্প নিয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে। নমিতা তন্ময় হইয়া কথা শুনিতেছিল, শ্রোত্রী হিসাবে তাহাকে কেহ কোনো দিন এত প্রাধান্য দেয় নাই—এই ক্ষণ-বন্ধুতাটি তাহার কাছে এত রমণীয় লাগিতেছিল যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া নিজের কথা কিছু বলিতে পারিলে তাহার তৃপ্তির শেষ থাকিত না।

সেই সুযোগ আসিল। প্রদীপ হঠাৎ সচেতন হইয়া কহিল,—"নিজের কথাই পাঁচ কাহণ বলে' যাচ্ছি—আমার জীবন ইতিহাসের অন্ত্যোপান্ত নেই, বৌদি। আমি একটা চলমান গ্রহ—কখনো কখনো বা কারো অচল উপগ্রহ হ'য়ে থাকি। তোমার বাপের বাড়ির কোনো বৃত্তান্তই জানা হ'ল না। বর্ত্তমানের বন্ধুতাকে অতীত কালেও বিস্তৃত ক'রে দিতে হয়; এই কথা মনে রাখা চাই বৌদি যে, বহু আগেই আমাদের সখ্যতা হ'বার কথা ছিল—হয় নি সে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না। তবু কথা কহিবার অদম্য উচ্ছ্বাসে অসংলগ্ন ভাষায় যাহা সে বলিয়া চলিল, তাহা গুছাইয়া সঙ্ক্ষেপে এই:—

নমিতার বাবা রঙ্‌পুরে ওকালতি করিতেন। তাহার এক দাদা ছিল, বছর দুই আগে স্বদেশী করিতে গিয়া পুলিশের হাতে যে মার খাইয়াছিলেন তাহাতেই মারা গিয়াছেন। সেই শোকেই বাবা ভাঙিয়া পড়িলেন; সমস্ত সংসার ছত্রখান হইয়া গেল। বাবা ওকালতি করিয়া ঢের পয়সা জমাইয়াছিলেন, খুড়া মহাশয় চালাকি করিয়া তাহাতে হাত দিলেন। মা ও তাহার ছোট বোনটি এখন তাহার কাকারই আশ্রিত। কাকা কলিকাতায় দালালি করেন, অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়—তবে বাবার জমানো পয়সা হাত্‌ড়াইয়া এখন একটু সুরাহা করিতে পারিয়াছেন। কাকার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ, কাকিমা তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। সম্পর্কের দাবীতে গুরুজন হইলে কি হইবে, কাকার প্রতি নমিতার মন মোটেই প্রসন্ন নয়। মা'র প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার ঠিক গুরুভক্তির পরিচায়ক হইয়া উঠে নাই। মা বিষয় বুদ্ধি হীন—এমন কেহ নাই যে তাহাদের এই সম্পত্তি সঙ্কটের সময় সাহায্য করে; মা যে কাকার আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র

সা করিবেন, তদারক করিবার জন্য তেমন আত্মীয় অভিভাবকও তাহাদের নাই। নমিতাকে ভালো ঘরে বিবাহ দেবার জন্য তাহার বাবার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেই জন্য যথেষ্ট টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে বটে, (এখানে নমিতা একটু হাসিল) কিন্তু পণের টাকা দিয়া বিবাহের যাবতীয় খরচেই নাকি বাবার বিত্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাকা যে মা ও তাঁহার ছোট মেয়েকে এতদিন ভরণ পোষণ করিতেছেন, তাহার টাকা নিশ্চয়ই ছাত ফুঁড়িয়া পড়িতেছে না। নমিতা মেয়ে হইয়া জন্মিয়া মা ও ছোট বোন্‌টির কাছে অপরাধী হইয়া আছে। এমন সুযোগ্য জামাই পাইয়া মা যে আত্মীয় গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সামান্য দিবাস্বপ্ন মাত্র।

রাত্রির সেই গভীর নিস্তব্ধতায় প্রদীপকে নমিতার পর মনে হইল না, তাহার সঙ্গে এই কৃত্রিম ঘনিষ্ঠতার অন্তরালে সুমধুর একটি অন্তরঙ্গতার স্বাদ পাইয়া নমিতা কৃতার্থ বোধ করিল। সমস্ত কথা এত অসঙ্কোচে খুলিয়া বলা সমীচীন হইল কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। যেন খুলিয়া না বলিলেই নিজের সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর বঞ্চনা করা হইত। বলিয়া ফেলিয়া নমিতা মনে গভীর একটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কথা সাঙ্গ হওয়ার পর ঘরের মধ্যে যে স্তব্ধতাটি পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল তাহারই মাঝে প্রদীপের সহানুভূতি-স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া নমিতার কী যে ভালো লাগিল বলা যায় না।

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া নমিতা বলিল, "যান্, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন গে। আমি মা'র ঘরে যাচ্ছি। মা আবার এত রাত পর্য্যন্ত গল্প করেছি টের পেলে বক্‌বেন হয় তো।" বলিয়া নমিতা বারান্দার দরজা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ তাহাকে বাধা দিল; কহিল,—"তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? মা'র বকুনি খাবার লোভে তুমি তোমার এই উত্তপ্ত সুখশয্যা অতিথিকে ছেড়ে দিয়ে যাবে, এতে সতীধর্ম্মের অবমাননা হবে, বৌদি। বারান্দায় একটা ডেক্-চেয়ার দেখা যাচ্ছে না? দাঁড়াও।"

নমিতাকে এক পাও নড়িবার অবকাশ না দিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়িতে তাহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া পেছন হইতে দরজাটা টানিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

ডেক্-চেয়ারটায় বসিল বটে, কিন্তু ঘুম আসিবার নাম নাই। তাই বলিয়া অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অস্তমান চাঁদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত দৌর্ব্বল্য প্রদীপের ছিল না। চক্ষুর পাতা দুইটাকে জোরে চাপিয়াও নিদ্রাকে বন্দী করা যাইতেছে না—নানা পারম্পর্য্য-হীন ছবি অন্তরচক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। নমিতাদের ঘরের আলো কখন নিবিয়া গেল তাহা টের পাওয়া মাত্রই প্রদীপের কেমন একটা বিশ্বাস হইল যে নমিতারো দুই চোখে শুষ্ক, বেদনাহীন বিনিদ্রতা বিরাজ করিতেছে। প্রাচীরের ব্যবধানের অন্তরাল হইতে প্রদীপের আত্মা যেন নমিতার আত্মার স্পর্শ পাইল, সেই স্পর্শরসে স্নান করিতে করিতে অতলস্পর্শ নিদ্রার সমুদ্রে সে ডুবিয়া গেল।

সকালে চায়ের টেবিলে সুধী বলিল,—"কাল রাতে একটু জরভাব হয়েছে; গাড়ি ইত্যাদি ঠিক করতে—আজকেই তোমার কল্‌কাতা গিয়ে কাজ নেই, প্রদীপ। চায়ের সঙ্গে এই দুটো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্ খাচ্ছি—বিকেলেই মাথাটা ছাড়্‌বে হয় ত। রাত্রের ট্রেণে যেয়ো।"

সেই জ্বরই সতেরো দিন পরে যখন ছাড়িল তখন সুধী কাশ্মীর উত্তীর্ণ হইয়া যে-পথে পাড়ি জমাইয়াছে সে-পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া সমাপ্ত হয় নাই। আবার এই ধূলার ধরণীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে—এমন একটা বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুন্যতে অভিসারিক আত্মা অমর্য্যাদা বোধ করে। সুধী আর এই মৃত্তিকায় ফিরিয়া আসিবে না, আকাশের অগণন তারার মধ্য হইতে সে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইস্থানে অবতীর্ণ হইবে; সেখানে নবজন্মের নবতর আস্বাদ পাইবে, নরদেহ লইয়া তাহা কল্পনা করিবারও তাহার সাধ্য ছিল না।

-- মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অবনীবাবু উন্মত্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থায়ই প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, আর নমিতা বোধহীন বেদনার মূর্ত্তি লইয়া মূক, জীবন্মৃত হইয়া বসিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

সহজ পাওয়া

সহজ পাওয়ার মধ্যে তুমি
সহজ হয়ে আস,
নিশিদিনের দণ্ড পলে
আমায় ভালবাস—
আমি তোমায় চাই কি না চাই হায়
বুকের মাঝে তোমায় রেখে বুঝতে পারা দায়।

দৃষ্টি তোমার মিষ্টি লাগে
আড়াল হ'তে
এই সুদূরে মধুর লাগে
তোমার মুখের বাণী।
সারা বেলার হেলা ফেলার অটুট আলিঙ্গন
আজকে দেখি নিবিড় হয়ে জড়ায় দেহমন।

এক নিমেষের সঙ্গ লাভের
সেই যে অনুরোধ,
দূর পথের ঐ হাতছানি তার
নেয় যে প্রতিশোধ।
মুখের ছোট একটি কথা
অধর কোণের হাসি
বিনিময়ে নাম কিনেছ
হায় রে সর্ব্বনাশী!

আজকে দেখি তারায় তারায় লক্ষ যোজন ব্যেপে
নয়ন তারার চাউনিটুকু উঠছে কেঁপে কেপে!
অধর কোণের হাসিতে আজ জ্যোৎস্না ছড়ায় ফুল
কথার গাঙের জোয়ার জলে উঠল ভরে কূল।

হায় গো রাণী, অভিমানী
মনকে করে চুরি,
দূরের বঁধুর আপশোষে আজ
কিনবে বাহাদুরি?

অঙ্গরাগ

[শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা]

না সহর—না পল্লী—দুয়ের মাঝামাঝি। ওরই কোল ঘেঁসিয়া নদীর বুকে জল। বৎসরে বারমাসের ন'টি মাস বেশ কাটে, জলের তখন অভাব নাই, কিন্তু কষ্ট যা—সে কেবল ঐ তিনটি মাস, নদীর তখন বুক শুখাইয়া উঠে, দুধারে ধূ ধূ করে শুধু সাদা বালির চর, আর ওরই মাঝখানে নদীর ক্ষীণ ধারাটা, সে ঠিক একটা মুমূর্ষু তরুণীরই পাণ্ডুর মুখ; নদীর এ মূর্ত্তি করুণই বটে।

নদীর বুক হইতে রাস্তা উঠিয়াছে গ্রামের দিকে, ওটা গ্রামে ঢুকিবারই পথ। নদী পার হইয়া যারা গ্রামে ঢোকে তা'দের প্রথম দৃষ্টিতেই পড়ে খড়ের ছাউনি-করা ছোট্ট একখানা ঘর…ঘরখানা পরিপাটি, বিশৃঙ্খলতার এতটুকু আভাসও এতে নাই।

বারান্দার উপরে কাঠের একটা আলমারী, ভিতরে সারি বসানো খাবারের থালা…রসগোল্লা, পানতুয়া, হরেক রকমের খাবার। এক ধারে তৈল-বিবর্ণ ছেঁড়া একখানা থ'লে—তারই উপর গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে পাঁচকড়ি—দোকানের মালিক…।

পাঁচকড়ির বয়স হইয়াছে অনুমান তিন কুড়ি, তবে ঢের আগেই চ'খে চশমা উঠিয়াছে…এঁয়া পুরু পাথরের চশমা।

চশমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, বলে—সাধে কি আর খারাপ হ'ল, সারারাত ধ'রে আগুনের পাশে ভিয়েন…বলি মানুষের চ'খই ত না আর কিছু…কাঁহাতক আর বরদাস্ত করে, তোমরাই বল।

পাঁচকড়ির উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তা আপাততঃ নিরস্ত হয়…

…নদী পার হইয়া বিদেশী লোক গ্রামে ঢোকে, তা'দের হাতে বোঁচকা কাহারও বা মাথায়। পরিচিত লোক হইলে ত কথাই নাই, পাঁচকড়ি হুঁকা হাতে ছুটিয়া আসে, অপরিচিত হইলে পাঁচকড়ির দরাজ গলার সাড়া পাওয়া যায়…

পাঁচকড়ি ডাকে—'আসুন কর্ত্তারা এ ধারে আসুন, সব আছে, মনোহরা রাজভোগ যা' চাইবেন।'

ডাক শুনিয়া পাঁচকড়ির দোকানটার দিকে সবাই এক একবার দৃষ্টি ফিরায়, তারপর কেউ সিধা চলে, কেউ বা গুটি গুটি করিয়া আসিয়া দোকান ঘরের ভাঙা টুলটাকেই দখল করিয়া লয়…

দূরদেশের পান্থ হইলে ত কথাই নাই…আলাপের সঙ্গে সঙ্গে নিজের গুণকীর্ত্তনটিও বাদ থাকে না…

পাঁচকড়ি শুধায়…'মনোহরাটা কেমন খেলেন কর্ত্তা'।

'বেশ'।

উত্তর শুনিয়া পাঁচকড়ির মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে…চশমা উঁচু করিয়া বলে—সব্বাইকেই এটা স্বীকার ক'র্ত্তে হবে কর্ত্তা, না ক'রে যাবে কোথা? জগু ময়রার নাম শুনেছেন তো…জগু ময়রা? গোয়াড়ীর? ওরই ত সাক্‌রেদ কর্ত্তা—পাঁচকড়ি দাঁত বাহির করিয়া হাসে…

খরিদ্দারেরও মুখে হাসি—ভাবে পাঁচকড়ি কারিগর বটে।

…খাবার খাইয়া তল্পী গুছাইয়া খরিদ্দার লোকটি উঠিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু উঠিতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়ির মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা আবার ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে…

'…তামাকটা সেবন ক'রে গেলেন না কর্ত্তা?'

মধুর আপ্যায়িত, খরিদ্দার বেচারা গলিয়া যায়—আবার টুলে বসিয়া তামাক চালায়…

পাঁচকড়ি বলে—মনোহরা খানিকটা নিয়ে যান কর্ত্তা, বাড়ীতে একটু চাখনাই কর্ত্তে দেবেন…

পাঁচকড়ির ঠোঁট দুখানি হাসির রেখায় উজ্জ্বল…

খ'দ্দের লোকটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চায়, অস্বীকার করিবারই বা আর উপায় কি?

পাঁচকড়ি ততক্ষণে ওজন-করা সামগ্রীটা শালপত্রের কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে, বলে, বেশী ত আর নয় কর্ত্তা, মানে এই আধসের টেক, হামেশা ত আর দর্শন মেলে না কর্ত্তার, তাই এটুকু…কিন্তু ফের আসতে হবে কর্ত্তা এ আমি ঠিকই ব'লে দিলাম।

ট্যাক হইতে নগদ একটি মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া ঠোঙা হাতে খদ্দের বেচারা বিদায় লয়। পাঁচকড়ি সিদ্ধিদাতা গজাননের তিন তিনবার নাম লইয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে বসে।

…দোকানের বাঁ দিকে কঞ্চি দিয়া ঘেরা ছোট্ট এক ফালি জায়গা—সাদা ধপধপে। মাঝে মাঝে বর্ষার মসৃণ কয়েকটা ঘাস গজাইয়াছে। এক পাশে একটা 'বান'—তাতে পুঁই শাক ও লাউ চারা প্রাচীরের চালাটুকুকে আশ্রয় করিবার জন্য উন্মুখ, বেড়ার কোল ঘেঁসিয়া গোটাকয়েক দোপাটি ফুলের চারা, ওদের তাজা ডগায় টাট্‌কা ক'টা ফুল ফুটিয়াছে…

সকালের খদ্দের বিদায় করিয়া পাঁচকড়ি সে দিন উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল 'পদ্ম, পদ্মকলি'…

ভেতর হইতে উত্তর আসিল—'এখন তো যেতে পার্‌বনা বাবা'

'…যেতে পারবনা কিরে শীগ্‌গীর আয়, ঘাসে তোর বাগানটা যে একেবারে পূরে গেছে, নিড়েনটা নিয়ে শীগ্‌গির আয়…'

সঙ্গে সঙ্গে পাচকড়ি বাগানের ভিতর নামিয়া পড়ে, কিন্তু পাঁচ মিনিট ধরিয়া পায়চারী করিয়াও পদ্মকলির সাক্ষাৎ নাই।

পাঁচকড়ি ঝাঁঝালো সুরে ডাকে—'এলি…'

'আসি…'

নীড়ানি হাতে এগারো বছরের মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে বাগানের ভিতর আসিয়া হাঁপ ছাড়ে—পরনে গিরিমাটির রঙে ছোপানো ছোট্ট একখানা শাড়ী, মাথায় ছোট এক ঝাড় চুল, তেলের ভাঁজ নাই – আশপাশ দিয়া কয়েক গাছা গুনের মত শাদা চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে বিশৃঙ্খলভাবে, মুখখানা শীর্ণ, এই কচি বয়সেই সাংসারিক অভিজ্ঞতার মস্ত বড় একটা ছাপ সেখানে পড়িয়াছে, মেয়েটির গলায় ঝুলানো গোটাকয়েক ঘুন্‌সি তখনও দুলিতেছিল।

"বলি এত যে ডাক্‌ছি তা বুঝি গেরাহ্যি হচ্ছেনা, না?"

পদ্মকলির মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল—

কাপড়ের আঁচলটা মুখের কাছে দুহাত দিয়া টান করিয়া ধরিয়া বলে, 'মার যে মাথার অসুখ বেড়েছে বাবা একটু টিপে দিচ্ছিলাম…'

'দিচ্ছিলে খুব কচ্ছিলে, আমার কথাটা শুনে গিয়ে দিলে বুঝি চলতনা আর, না?'

কথার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়ি মুখখানা যা করে, তা যেমনই ভয়ঙ্কর তেমনই আবার নিষ্করুণ…

নীড়ানিটা বাপের হাতে তুলিয়া দিয়া পদ্মকলি পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকে, কথা কয় না…

পাঁচকড়ি মুখ ভার করিয়া বাগান নীড়ায়…

…ভেতরের অবস্থাটা আজ কিছুদিন হইতেই একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে…উপায়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে বই কমে নাই…কিন্তু স্বস্তির মাত্রা দিন দিন একটু একটু করিয়া উপিয়া যাইতেছে। এর একমাত্র হেতুই হইতেছে—কুসুম…পদ্মকলির মা! কোলের ছেলেটির মৃত্যুর পর হইতেই এই অবস্থা; শীর্ণ নদীর বালুচরের দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে কুসুমের চ'খে অশ্রু ছুটিত…নদীর ঐ শীর্ণবুকেই ত ও একদিন নিজের হাতে… কুসুম আর ভাবিতে পারিত না, নদীপারের বীভৎস শ্মশান বিকট হাসিতে ওর বুকখানিকে কাঁপাইয়া তুলিত,—কুসুম মূর্চ্ছা যাইত।

কুসুমের অসুখ সারাইবার জন্য পাঁচকড়িরও চেষ্টার অন্ত ছিল না…পাড়ার নরেন ডাক্তার হইতে কবিরাজ হরিভক্তরও পাঁচনের ব্যবস্থা চলিয়াছে…কিন্তু ফল হয় নাই…

সব ছাড়িয়া কুসুম এখন ভৈরবীদত্ত তামার কবচই সার করিয়াছে…অসুখ কিছু নরম পড়িয়াছে…কিন্তু একেবারে আরোগ্য হয় নাই—মাঝে মাঝে ওটা বেখাপ রকমের বাড়িয়া ওঠে…তখন সবাই শশব্যস্ত!

সহিয়া সহিয়া ইদানীং কিছুদিন হইতেই পাচকড়ি বেশ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে…ধৈর্য্যধারণের আর তিলমাত্রও সামর্থ্য নাই!

মুখ ফিরাইয়া পাঁচকড়ি দেখিল—পদ্মকলি তখনও ঠাই দাঁড়াইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—'হাবাকাটার মত দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়…বলি দোকানে গিয়ে বস্‌তে কি হ'চ্ছে…'

পদ্মকলি তেম্‌নি অনড়—বোধ করি, বলিবার কিছু আছে—কিন্তু বাপের ঐ নিষ্করুণ মুখখানার দিকে চাহিয়া একটি কথাও ওর মুখ দিয়া বাহির হয় না—মুখখানা একান্ত করুণ করিয়া ও প্রস্থানের উপক্রম করিল…

'রোগ···রোগ, খালি রোগ···একটু কি বিরাম আছে কি হ'ল আজ য্যাঁ ?'—পাঁচকড়ি মুখ ফিরাইয়া শুধায়—

মুখ নীচু করিয়া পদ্মকলি উত্তর দেয়—'সেই যা' হয়··· মাথা ফেটে যাচ্ছে···এসনা একবার···'

'না···মরলেও ত পারে ছাই, আমার হাড়েও বাতাস লাগে'—চ'খদুটি ব্যথাতুর করিয়া পদ্মকলি সত্যই এবার পা বাড়াইয়া দেয়—কিন্তু কয়েক পা চলিতে না চলিতেই পাঁচকড়ি একেবারে ওর পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'চ' আমি গেলেই যদি উপায় হয়—'

পাঁচকড়ি নিজেই রাঁধে—পদ্মকলি যোগান দেয়। কুসুম রান্নাঘরে আসিয়া কোন দিন হয়ত চুপ করিয়া বসে।

পদ্মকলি বলে—'তুই এখেনে আসিস্ নে মা···যে বিশ্রী ধমো···যা' ও ঘরে গিয়ে ব'স্'···

···'থাক্ একটু বসিই না মা··'

···'আবার থাক্···বলি মাথার অসুখ আবার যে বাড়বে' মেয়েটির মুখে চ'খে যে কী উৎকণ্ঠা!

কুসুমকে অগত্যা উঠিতে হয়—

থালা পাতিয়া জল ঢালিয়া পদ্মকলি বাপের খাবারের যোগাড় করিয়া দেয়···নিজেরও করে···

কুসুম বিছানার উপর হইতে সবই দেখে··দেখে তার ছোট্ট মেয়েটি সুনিপুণ গৃহিণীর মত প্রতিটি কাজই সমাধা করিয়া চলিয়াছে—মেয়েসুলভ কোন আব্দার নাই···কোন খেয়ালই নাই!

আচম্বিতে কুসুমের দু চ'খ ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে···

সে রাত্তিরেও খাওয়া শেষ হইতে বাকী রহিল না···

পাঁচকড়ি গুড়ুক্ টানিয়া বিছানা করিল, দোকান-বন্ধ করিল···তারপর সংসারের তুচ্ছতম বস্তুটিরও উপর বারকয়েক সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিছানায় আসিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল···

কুসুম ডাকিল—'ঘুমুলে ?'

'না, কেন বলত ?'

'শুনে যাওনা এদিকে একবার'

'কি কথা শুনি···ওখেন থেকেই ব'লে ফেল না···'

পাঁচকড়ি উৎসুক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চায়; বিছানা বেশী দূরে নয়··দোরের কাছেই···মা ও মেয়ে প্রতিদিন ঐখানেই শোয়···

কুসুম আর দ্বিধা করেনা—বলে 'পদ্মর আমি বিয়ে ঠিক ক'রেছি এই আস্‌ছে মাসে···এটা যাতে চ'খে দেখে মর্ত্তে পারি···'

···স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের কথা আজ নূতন নয়··· হামেশাই চলে, বিবাহ কবে হইয়া যাইত, কিন্তু পাত্রটি ঠিক কুসুমের মনের মত জোটে নাই।···আসলে পাঁচকড়ির অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ, পাঁচকড়ি বলিত—ময়রার ঘরে ছেলের আবার অভাব, কথা পাড়িলে একশো জন আসিয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া ধন্না দিবে, তখন দুই এক শো টাকা দাঁও মারিয়া মেয়েটিকে পছন্দ মত একটার ঘাড়ে গুঁজিয়া দিলেই চলিবে···কিন্তু কুসুমের তা ইচ্ছা নয়। কুসুম বলিত— মেয়ের বাপের বুঝি টাকা নিতে আছে···শাস্ত্রে অমন নজীর আছে কোথাও, মেয়ে যে বেচে সে তো নরকে পচে··· মুস্কিল যত এইখানে। কথা শুনিয়া পাঁচকড়িকে চুপ করিতে হয়, একটা কল্পিত নরকের বীভৎস দৃশ্য ওর চ'খের সুমুখে ভাসিয়া উঠে—কিন্তু সে আর কতক্ষণই বা···পরক্ষণেই যে পাঁচকড়ি আবার সেই পাঁচকড়িই···

···মুখ ফিরাইয়া পাঁচকড়ি বলিল,—'বেশ, কিন্তু পাত্রটি কে শুনি···'কুসুম চুপ করিয়া থাকে, কথা কয়না···যেন বলিতে ওর বাধা আছে, কিন্তু পরক্ষণেই পাঁচকড়ি বলিয়া ফেলে— 'বুঝেছি হাজারী ত ?'···পাঁচকড়ির অনুমান মিথ্যা নয়, কথাটা আজ কদিন হইতেই কানাঘুসো চলিয়াছে···একটী বর্ষীয়সী রমণীর দিন কয়েক হইতেই ঘন ঘন যাতায়াত সুরু হইয়াছিল।

কুসুম বলে—'হাঁ, ওকে ছাড়া ত আর কাউকে দেখ্‌ছিনে রূপে গুণে'···পাঁচকড়ি চুপ করিয়া শোনে···কুসুম ফের বলে—'কেন, ছেলে কি তোমার অপছন্দ ? অমন ঘর, বাপ মা···'

পাঁচকড়ি একটা হাই তোলে, কথাটা যেন ওর শুনিবারও ইচ্ছা নাই। অবস্থার কথা পাঁচকড়ি ভালই জানে, গাঁয়ের সঙ্গে পরিচয়ও ত ওর আজ নূতন নয়। গম্ভীর গলায় বলে— 'পছন্দ অপছন্দ আমার কি ? টাকা খরচ ক'র্ত্তে পারলেই হ'ল।'

'টাকা . টাকা কিসের ··টাকা ত ওরা নেবেনা···'

'বেশ তাহলেই ভাল' পাঁচকড়ি পাশ ফিরিয়া শোয়··· অন্তরের মাঝখানে বেদনার একটা কাঁটা কোথায় বুঝি ওর খচ্ খচ্ করিয়া উঠে, কিন্তু এ বেদনার দাহটুকু কুসুমকে স্পর্শ করিতে পারে না—আসন্ন ভবিষ্যের স্মৃতি-সৌরভে ওর অন্তর যে তখন একেবারেই মস্‌গুল !

বিবাহের বার্ত্তাটা পাড়ায় পাড়ায় রটিয়া গিয়াছিল—পাড়াঘরের কথা এম্‌নিই রটে !

ভোরে দোকান খুলিয়া নীড়ানি লইয়া পাঁচকড়ি ওর বাগানের কাজে লাগিয়া গেছে···খদ্দের পত্তরের তখনও পাত্তা নাই !

'পাঁচকড়ি আছ হে' · খড়মের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে অদ্বৈত আসিয়া দোকানে ঢুকিল···

অদ্বৈত স্বজাতি, প্রতিবেশী··

নীড়ানি ফেলিয়া চ'খে মুখে হাসি ফুটাইয়া পাঁচকড়ি উঠিয়া দাঁড়ায়

বলে—'আরে দাদা যে, হঠাৎ পথ ভুলে নাকি ?'

অদ্বৈত টুলের উপর গ্যাট হইয়া বসিয়া তখন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে—'কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ, কানু হেরইতে এবে ঘটে দেখি পরমাদ···'

'এ ক'টা দিন আস্‌তে পারিনে ভায়া···ইচ্ছে ছিল আস্‌বার কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি ··আরে ভায়ার বাগানটা ত খাসা হ'য়েছে· দেখ্‌ছি···'

চক্‌মকি হাতে পাঁচকড়ি ততক্ষণে সোলা ধরাইতে বসিয়া গেছে, ঘাড় তুলিয়া বলে—'হ্যাঁ···দাদা···সময় পেলেই ওটাতে লেগে থাকি কিনা তাই···বেশ হ'য়েছে না ?···'

অদ্বৈত বাগানটুকুর শত মুখে তারিফ করে···বলে 'হবে না ? দেখতে হবে ত ভায়াটি আমার কে ?'

পাঁচকড়ি আর কথা কয় না—সাজা হুঁকাটি নীরবে অদ্বৈতের হাতে তুলিয়া দেয়। অদ্বৈত হুঁকার রন্ধ্রে চুঁ কসিয়া পুড়ুক্ পুড়ুক্ করিয়া টান ধরে,—ওর ঐ টানের সঙ্গে সঙ্গে কোটরে-বসা স্তিমিত দুটি চ'খ হঠাৎ বিদ্যুতের মতই ঝলক্ মারিয়া ওঠে···সহসা পাঁচকড়ির মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে—'কথাটা শেষ পর্য্যন্ত খেলাপ করলে পাঁচকড়ি।'

পাঁচকড়ির মুখখানা ঠিক এতটুকু—

বলে—'বৌর মত হ'ল ওথেনে···নইলে কি আর···'

অদ্বৈতের মুখখানা গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর—হাতের হুঁকাটা পাঁচকড়িকে দিয়া চ'থ ঘুরইয়া বলে—'অমন মেয়ে তিনশোটি টাকায় যে সে লুফে নিত পাঁচকড়ি ··তারপর আমি ত ছিলামই···'

অদ্বৈতের সে কী ভঙ্গী—

পাঁচকড়ির সুপ্ত মনটা হঠাৎ ওর ঐ একটা কথাতেই সজাগ হইয়া ওঠে, এক রাশ টাকা পাঁচকড়ির চ'খের সমুখে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠে···

কিন্তু টাকার কথা ও মুখে আনে কেমন করিয়া···এখনও ত কুসুম বাঁচিয়া···

অদ্বৈত নরম হইয়া বলে—'দেখনা···এখনও ত সময় আছে ভায়া · ' পাঁচকড়ি ঠিক কাঠগড়ার আসামীর মত শুষ্ক-মুখে বলে—'আমি ত আর. না জেনে শুনে বল্‌তে পারিনে দাদা···বৌর মত না হ'লে···'

অদ্বৈত কাণের কাছে মুখ লইয়া যায়···বেশ ঝাঁঝালো সুরে বলে—'ওঃ বড্ড মতরে, সব তা'তেই বৌর মত···বৌর একবারে···বলি এ বুঝি বামুন কায়েতের ঘর, না ? বড্ড দান শিখেছেন, আপনি বাঁচলে···'

কথাটা আর শেষ হয় না, ঘরের ভিতর নিঃশব্দে আসিয়া যে দাঁড়ায় সে কুসুম, এবং এরপর যা' ঘটে···তা' আর বলিয়া কাজ নাই।

···অদ্বৈতের খড়মের শব্দ কেবল দূরের পথে শব্দ তুলিয়া আস্তে আস্তে মিলাইয়া যায়···

আর পাঁচকড়ি···পাঁচকড়ি তখন ঠাই দাঁড়াইয়া। মুখের ভাষা ওর কোথায় তখন···

অগ্রহায়ণের প্রথমেই পদ্মকলির সহিত হাজারীলালের বিবাহ হইতে বিলম্ব ঘটিল না...

ছোট, মেয়ে, বরটিও তদনুরূপ···

পাড়ার লোকে প্রশংসার গুঞ্জন তোলে—বলে—'না, বেশ মানিয়েছে'···

কথাটা কুসুমের কাণে ওঠে—বহুদিনের অবসাদজীর্ণ প্রাণে ও একটা শক্তি অনুভব করে,—চ'খে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্তির একটা ভাব ফুটিয়া উঠে···

কুসুম চলাফেরা সুরু করিল—সংসারের তুচ্ছতম ত্রুটিটাও ওর আর চ'খ এড়ায় না।

প্রাঙ্গণতল—পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার—কুয়াতলার ঘাসগুলিরও মুখে শ্যামল শ্রী—তুলসী-মন্দিরটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে···চারিদিক হইতেই সংসারে লক্ষ্মীর অপার্থিব হাস্যধারা বুঝি ঝরিয়া পড়ে···

পাঁচকড়ি রান্নার দায় হইতে মুক্তি পাইল···

সকাল-সন্ধ্যা কুসুমই এখন রাঁধে।—পদ্মকলির আশ্চর্য্যের সীমা নাই···

পদ্ম বলে—'আবার যে অসুখ বাড়্‌বে মা···'

কুসুম গভীরকণ্ঠে উত্তর দেয়—'বাড়্‌লেই হ'ল বুঝি···না রে···বলি এটা যাবে কোথায়?'···বলার সঙ্গে সঙ্গেই কুসুম গলায় ঝুলানো তামার মাদুলীটা পদ্মকে একবার দেখাইয়া লয়···

পদ্মকলি ওর মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবে কে জানে?

কুসুম বলে—'চিরকালই ত তোদের কষ্ট দিতে পারিনে··· মা,···তোকেও ত একদিন পরের ঘরে যেতে হবে তখন···'

কুসুমের চ'খ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠে—

মায়ের বেদনাটা যে কোন খানে পদ্মকলিরও তা বুঝিতে বাকী থাকে না, বলে—'পরের ঘরে আমি যদি না যাই মা···'

'দূর পাগলী, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে·

খিল্ খিল্ করিয়া পদ্মকলি হাসিয়া উঠিল ··

মা ও মেয়ের স্নেহের অভিনয় এম্‌নি চলে···

পদ্মকলির বিবাহের পর হইতে এদিকে একজনের মনটা একেবারে ভাঙিয়া গেছে···সে পাঁচকড়ির, পাঁচকড়ির মুখে সে হাসি নাই, সে আনন্দ নাই—একটা নিষ্ক্রিয় ঔদাস্য আসিয়া ওর সমস্ত উৎসাহটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

পাঁচকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—কেবল তামাক টানে, দোকানে খদ্দের আসিয়া হাঁকে—'পাঁচু, পাঁচকড়ি'···

পাঁচকড়ির সে খেয়াল নাই, ডাকের তাড়া ওর কাণে আসিবে কেমন করিয়া···?

পদ্মকলি কাছে আসিয়া বলে—'ডাকছে যে···বাবা'

ডাকুক, তোর তাতে কি শুনি'

পাঁচকড়ির সে স্বর যেমনি কঠোর, তেম্‌নি রুক্ষ···

মুখখানা রুক্ষ করিয়া পদ্মকলি মায়ের কাছে আসিয়া হাঁফ ছাড়ে, শীর্ণ মুখখানায় বেদনার যে ছায়াটি ওর ফুটিয়া উঠে কুসুমের তা' দৃষ্টি এড়ায় না···

একটা অজ্ঞাত অশুভকে মনে মনে কল্পনা করিয়া কুসুমের অন্তরটা নিমেষে হাঁপাইয়া উঠিল···

পূজার দেরী ছিল না, নব জামাতার কাছে তত্ত্ব পাঠাইবার তাড়াটা বেশী করিয়া কুসুমের মধ্যেই দেখা গেল···

পাড়ার যত চাটুর্য্যের তত্ত্বের ফর্দ্দটা কুসুম সেদিন কেমন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল···

রাত্রিতে পাঁচকড়ি খাইতে বসিলে কুসুম অভিপ্রায়টা ব্যক্ত না করিয়া ছাড়িল না।

বলিল—'দেরী তো আর নেই···পূজোত দশ দিন··· এর মধ্যে কাপড় চোপড় যা কিছু সবই ত কিন্‌তে হবে···'

পাঁচকড়ি মাথা হেঁট করিয়া খাইতেছিল, কথা কহিল না···যেন কুসুমের কথাটা ওর কাণেই যায় নাই।

কুসুম ফের বলে—'শুন্‌ছ'···

'শুন্‌ছি···কিন্তু আমার যদি ক্ষমতায় না কুলোয়।' কুসুম আকাশ হইতে পড়িল।

বলে—ওমা, সে কি কথা গো···মান-ইজ্জতের কাজ।

'হ'ক্···কিন্তু আমি না পার্‌লে ত আর···বলি পেটের ভাত কি জুট্‌ছে আর···'

গেলাসের জলটুকু ঢক্ ঢক্ করিয়া নিঃশেষ করিয়া পাঁচকড়ি উঠিয়া দাঁড়ায়···

কুসুম তখন স্থাণুর মতই অচল—একথা কাটিকে প্রতিবাদ করার মত এতটুকু শক্তিও যে ওর নাই···

কণ্ঠ পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ওর ঠেলিয়া উঠে···

···কুসুম তবু দমিল না—নিজের চক্ষুলজ্জাও ত আছে, গহনা বন্ধক দিয়া কিছু টাকা আনিল এবং স্বামীর একান্ত অজ্ঞাতসারেই জামাইএর কাছে ও একদিন তত্ত্ব পৌঁছাইয়া দিল···

শেষে হাজারীলালেরও এ গৃহে একদিন শুভাগমন হইতে বাদ রহিল না।

মেয়ে জামাইকে আঁচল আড়ালে পাইয়া কুসুমের অন্তর আনন্দ-সৌরভে ভরিয়া উঠিল বহুদিনেরই পথ চাওয়া কামন,

আজ যে সার্থক হইয়াছে ওর, কুসুম ভাবে বাঁচিয়া থাকা তার নিষ্ফল হয় নাই।

অবাধ আনন্দের মধ্যে ক'টা দিন বেশ কাটিয়া যায়—তারপরই আসে বিদায়ের তাড়া—

হাজারীলাল বলিল—'কাল যে বাড়ী যাব মা'

কুসুমের চ'খদুটি ছল্ ছল্ করিয়া ওঠে—বলে 'সে কি বাবা'।

'…হ্যাঁ আমার যে বড় পড়ার ক্ষতি হচ্ছে মা'।

হাজারী থার্ড ক্লাশে পড়ে, পড়ার ক্ষতি কুসুম নিজেও বোঝে—তাই আর আপত্তি তোলে না…

বলে—'আচ্ছা বাবা আবার যখন লোক পাঠাব তখন আসবে ত?' 'আস্‌ব' এবং পরদিন ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া যায়।

আনন্দের অভিব্যক্তিটা কেবল পাঁচকড়ির মুখেই ব্যক্ত হয় না, মনে হয় এ আবহাওয়ার মাঝখানে ও বুঝি একটা স্বতন্ত্র জীব, কারোর সঙ্গে কোথাও ওর এতটুকু মিল পর্য্যন্ত নাই…

কুসুম বলে—'জামাইএর জামাটা যেমন মানিয়েছে, কাপড়টাও যদি ঠিক তেমনি মানাতো?'

পাঁচকড়ি ভিয়ান চড়াইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুসুমের আনন্দের মাত্রাটা সেদিন অপরিমিত—নিজেই বলে, 'তা না মানাক্, নিন্দে ত কেউ কর্ত্তে পারবে না এ আমি ঠিকই জানি'…

পাঁচকড়ির এবার মুখ খুলিয়া গেল—

বলে, 'তা' জানবে বৈকি, এ দিকে বুকের রক্ত জল ক'রে যে দানা যোগাচ্ছি তা' যদি বুঝতে ত আর…'

পাঁচকড়ি এক রকম কাঁদিয়াই ফেলে,—নিরুদ্ধ অভিমানের দুর্ব্বার বেগটি ওর অন্তরের কুহর হইতে শতধারায় বুঝি ঝরিয়া পড়ে, যেন বাধা মানিবার নয়।

আত্মসম্মানে ঘা খাইয়া কুসুমও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে…বলে 'তোমার টাকা খসাচ্ছ এই তো বলতে চাও, বেশ আর যদি দেখতে পাও ত অন্য কথা…'

ঝড়ের মতই কুসুম সরিয়া পড়ে ।

নিজের নির্ব্বিষ আস্ফালনে বিক্ষত হওয়াই বুঝি ওর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!

…তিনটি মাস কাটিয়া গেছে। স্বামীর কাছে কুসুম আর হাজারীলালের কথা মুখে আনে নাই। নির্জ্জনে বসিয়া কুসুম কেবল চিন্তা-সাগরে পাড়ি দেয়…ভাবে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি অন্যায়ই না করিয়াছে ও, বুঝি মরণেও এর প্রায়শ্চিত্ত নাই। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কুসুমের অন্তর একটা অনাগত আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে—একজনের শুভ-আশীর্ব্বাদ হইতে এ মেয়েটি যে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রহিয়া গেল…

শ্বশুর-দত্ত বেনারসী শাড়ীখানা লইয়া পদ্মকলি সেদিন নাড়াচাড়া করিতেছিল—

কুসুম ডাকিল—'পদ্ম…'

'ডাকৃছ মা' পদ্মকলি অমনি কাছে আসিয়া দাঁড়ায় মেয়ের আপাদ মস্তক কুসুম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে…

বলে 'সিঁদুরটা যে মুছে গেছেরে'।

'তা' যাক্' পদ্মকলি সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

'না না বড় অলক্ষুণে রে, কৌটোটা নিয়ে আয়।'

মায়ের আদেশ পদ্মকলি কোন দিনই অমান্য করে না—কৌটা হাতে ও মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়…

সিঁদুরের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রেখাটা কুসুম ওর সিঁথির উপরে টানিয়া দেয়।

…দিন কাটে—

সেদিন অতর্কিতে এক দুঃসংবাদ আসিয়া হাজির…

হাজারীলালের জ্বর, সঙ্গে নিউমোনিয়া, এমন কি গ্রামের নরেন ডাক্তারের কয়দিন হইতে যাতায়াতও সুরু হইয়াছে…

পাড়াঘরের কথা, কিন্তু চাপা থাকিবার কারণ কি?

…কুসুম বড় ক্ষুণ্ণ হইল—

পদ্মকলি আশ্বাস দিল—'অসুখ হ'য়েছে তা'তে কি মা… অসুখ ত মানুষের হ'য়েই থাকে…'

…কথাটা অভিমানের, কুসুম না বোঝে এমন নয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিমান করিয়া লাভ কি?

কুসুম চুপ করিয়া যায়.. সহসা গত রাত্রের একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের ছায়া ওর চ'খের উপরে ভাসিয়া ওঠে। শীর্ণ নদীর বীভৎস শ্মশানে যেন মরণের উৎসব চলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ নর নারী ঐ উৎসবেরই দিকে হাসিমুখে ছুটিয়া চলিতেছে…কি জানি কি অজ্ঞাত কারণে কুসুমের বুকটা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কুসুম চলিয়া গেল।

···কিন্তু কটা দিনেরই বা ব্যবধান, যে আশঙ্কাকে বুকে করিয়া কুসুম হাজারীলালকে দেখিতে গেল—দিন কয়েক পরে তাহারই একটা উৎকট পরিণাম হাতে লইয়া কুসুম আবার ঘরে ফিরিল, গিয়া কোন ফল হইল না।

গৃহ প্রত্যাগতা স্ত্রীর মুখের দিকে পাঁচকড়ি একবার মাত্র চাহিল, দেখিল সে মুখ মৃত্যুর মতই ভয়ানক—দাবানলের মতই সর্ব্বধ্বংসা।

পাঁচকড়ি দৃষ্টি নত করিল ..

মুখের ভাষা ওর কণ্ঠে আসিয়াই থামিয়া গেল .

···কুসুম আবার শয্যা আশ্রয় করিয়াছে—পূর্ব্বের সেই মাথার অসুখ।

পদ্মকলি কাছে আসিয়া বসে, দিনরাত্রি ঔষধ চড়ায়।

ইচ্ছা হইলে শুধায়—'আজ একটু কমেছে মা' ?

প্রশ্ন শুনিয়া কুসুম চ'খ খোলে, উন্মাদের মত হাসিয়া উঠিয়া বলে, 'কি কমেছে অসুখ ?' 'অসুখ তো ঢের আগেই কমেছে মা', সঙ্গে সঙ্গে নিজের শীর্ণ দু'খানি হাত দিয়া পদ্মকলিকে ও বুকের মাঝে টানিয়া নেয়·· চ'খের কোনে দু'বিন্দু জল ওর ফটিকের মতই ঝিক্ ঝিক্ করে—ঝরিতে পায় না !

···নিশীথ রাত্রের ভরা সুষুপ্তির মাঝখানে ছ্যাঁৎ করিয়া কুসুমের ঘুম ভাঙিয়া যায়···

···কি ভাবিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, দেখে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আকাশ বাতাস এক হইয়া গেছে, পথ চিনিবার উপায় নাই। কুসুম ফিরিয়া আসে !

···বিছানায় পড়িয়া পাঁচকড়ি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল, কুসুম ডাকিল, 'ঘুমুলে ?'

পাঁচকড়ির পাতলা ঘুম—এক ডাকেই ওর ঘুম ভাঙিয়া যায়। চ'খ খুলিয়া দেখে, কুসুম বলে—'তুমি এত রাত্তিরে' !

'হ্যাঁ এত রাত্তিরেই, তবে ভয় নেই মাথার অসুখ বাড়েনিকো, শুধু একটা কথা বলতে এসেছি···'

পাঁচকড়ি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চায় –

কুসুম বলে—'কথাটা কিছু নয়, পদ্মর বিয়েটা এবার অদ্বৈতের ছেলের সঙ্গেই দিয়ে ফেল, কারোর কোন অমত নেই বুঝেছ, আর হ্যাঁ দেরী ক'রে লাভ কি ··পর তারিখে দিন আছে, ঐটিই ঠিক ক'রে ফেল না'।

তীরের মতই কুসুম উঠিয়া দাঁড়ায়।

পাঁচকড়ি হতবুদ্ধি, ভাবে এ স্বপ্ন না সত্য ; নিজের চ'খ দুটিকে ওর বিশ্বাস হয় না। দুহাত দিয়া চ'খ দুটীকে ও বার বার করিয়া রগ্ড়ায়, তারপর ঠাহর করিয়া দেখে—পদ্মকলিকে বুকের মধ্যে সাপ্টিয়া ধরিয়া বিছানার এক পাশে কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে কুসুম—আর জমাট অন্ধকারের মাঝখান হইতে গুমরিয়া উঠিতেছে ওর একটা ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ।···

কাল সে নিশুতি রাতে

[শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ]

কাল কিছুতেই ঘুম আসিল না ; তখন নিশুতি রাতি
চেয়ে দেখি চাঁদ আকাশে জাগিছে আমার জাগার সাথী।
ডাগর নয়নে পড়েছে তাহার কাহার মোহন ছায়া ?
ওরি প্রণয়িণী এই অবনীর নবীন-কোমল কায়া,
হারাইতে ভয় তাই জেগে রয় কিছুতে যাবে না দূরে।
প্রিয়া অঙ্গের লাবণি ছানিয়া নিতেছে দু'চোখ পূরে।
ওরি পানে চেয়ে কী যে হ'ল মনে—কাল সে নিশুতি রাতে
গিয়েছিনু সখি তোমার ঘরের দখিনের জানালাতে।

উতলা পাগল বায়
ভাঙিবে আগল এতদিন পরে ভেবেছিল কেবা তায়।

জানিতাম তুমি অনুরোধ মোর রেখেছ, ক'রেছ ক্ষমা।
সময়-সাগরে ডুবে গেছি আমি—ভুলে গেছ মনোরমা।
তবু হ'ল সাধ ভুলের মালিকা গেঁথেছ কেমন-রূপে,
নিশুতি রাতের আধো-ছায়ে-ছায়ে দেখে আসি চুপে চুপে।
গোলাপের বন ভাঙিয়া ভাঙিয়া জানালার তলে আসি'
দাঁড়াইনু যবে ঝরিতেছে নভে তখনো জ্যোৎস্না-রাশি !
অদূরে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জে কোয়েলার ডাক শুনি'
পুলক-বীণাটি বেজে উঠেছিল নিজ মনে গুনগুনি'।
জানালার 'পাখী' চাপিয়া ধরিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখি,—
নিভ' নিভ' করে শেজের বাতিটি, এতখানি কাছে—এ কি !
তুমি ঘুমাইছ ; সাথে ঘুমাইছে তোমার সোণার দেহ।
ঘরের মেঝেটি বিছায়েছে যেন 'নিশীথ-শীতল-স্নেহ'।
স্তূপাকার হ'তে কালো চুলগুলি শিথান রচেছে নিজে।
অমানিশি শেষে উষসীর মতো মু'খানি শিশির ভিজে।
বাম করতলে ঘুমায়ে রয়েছে দখিন হাতের মুঠি।
নিশ্বাস ভরে সরম-গ্রন্থি ঈষৎ পড়েছে টুটি'।

তুমি যেন তুমি নয়
তোমার মাঝারে আমার মনের অপরূপ বিস্ময় !

জানালার এত কাছে যেন আমি হাত দিলে ছোঁয়া পাই।
সেখানে দাঁড়ায়ে হেরিনু যে-রূপ সে-রূপের সীমা নাই।
দুটি ভ্রমরের মতো
গুণ গুণ রবে দৃষ্টি আমার কাঁদিয়া ফিরিল কত।

ফিরে যাব কিনা ভাবিতেছি মনে, দেখিনু পায়ের কাছে
স্মৃতি-মালিকার ফুলদল গুলি ছিঁড়িয়া পড়িয়া আছে।
মোর হাতে লেখা পুরাতন চিঠি চিনিলাম নিমিষেতে।
বুঝিনু তখন এতদিন পরে আমারে ফিরিয়া পেতে
রহিল না কেহ আর।
সহসা ফাল্গুন পবন কাঁদিল বুকভাঙা হাহাকার!
না, না, আমি নয়; কেঁদেছিল বায়ু, কাঁদিল আরো যে কত!
আমি হাসিমুখে ভাবিলাম শুধু সময় যে হ'ল গত।
মনে পড়িয়াছে আরো ভেবেছিনু দু'একটি ছোট কথা ;—
চিঠিগুলি যবে ছিঁড়েছিলে তুমি—আঙুলে বাজেনি ব্যথা?
তুলে রাখিলেও ক্ষতি ছিল নাকো—তবু ভালো! এই ভালো।
কি জানি যদি বা তব রাঙা-রাতি ক'রে দেয় কভু কালো।
তার পরে সখি চেয়ে দেখেছিনু তোমার মুখের 'পরে,—
মনে হয়েছিল দুচোখের কোলে তখনো অশ্রু ঝরে।
মনে হয়েছিল কান্নার বেগ তখনো থামে নি রামা;
দ্রুততালে যেন রয়েছে তখনো বক্ষের ওঠা নামা।
তারো সাথে সাথে আরো দেখেছিনু—বুকের আঁচল তলে
মোর কাব্যের পাণ্ডুলিপিটি—সিক্ত চোখের জলে।
চিঠিগুলি ছিঁড়ে করেছ প্রমাণ ভুলেছ প্রণয়ী জনে;
কবিরে ভুলিতে পারিলে না—তাই ভরেছ' কবির ধনে,
এতটা রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া আপন শূন্য হিয়া!
প্রিয় ফিরে পেলে কবির মাঝারে প্রিয়রে ভুলিতে গিয়া!
তব রাত্রির এপারে জ্বলিছে রবির অস্ত-চিতা।
ও পারে ধ্বনিছে উদয়-অচলে তারি নবারুণ-গীতা।

অগোচরে তব এ গোপন ছবি কাল সে-নিশুতি রাতে
দেখিয়া এসেছি তোমার ঘরের দখিণের জানালাতে।

সংসারে ও সমাজে বঙ্গনারীর কর্ত্তব্য

[কুমারী শোভনা ঘোষ]

সংসারে ও সমাজে বঙ্গনারীর যে কত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজিকার এই দুর্দ্দিনে পড়িয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নারীকে আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন তাহাদের দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সংসারের সমাজের উন্নতি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গলার সমাজ ও সংসার আজ নানাপ্রকার কলুষে কলুষিত, ব্যাধিতে অস্থি-চর্ম্মসার। এই ব্যাধিক্লিষ্ট, কলুষিত সমাজকে উদ্ধার করিতে না পারিলে, আমাদের দেশ কখনও স্বাধীন কিম্বা উন্নত হইতে পারে না; কারণ সংসার ও সমাজেই দেশের উন্নতি, অবনতি নির্ভর করে। যে দেশের সমাজ যত উচ্চ, সেই দেশ তত উচ্চ। কাজেই আমাদের বাঙ্গলার এই দুষ্ট সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমাদের এই সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন রূপে এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যাহাতে সমাজে কোনরূপ কুসংস্কার না থাকে। আর এই সমাজের ও সংসারের সংস্কার সম্ভব কাহাদের দ্বারা? নারীর দ্বারাই সমাজ-সংস্কার সম্ভব; কারণ নারী জাতির জননী। জাতির মুক্তি-সংগ্রামে নারীর স্থান সবার উচ্চে। নারীর স্নেহে, প্রেমে, শিক্ষা, দীক্ষায় জাতির ভবিষ্যৎ সন্তান গড়িয়া উঠিবে। নারীকে উপেক্ষা করিলে গোটা জাতির জাগরণ সেখানে সম্ভব হইবে না। নারী জাতির একটা অংশ; জাতি-দেহের একটা অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইলে, অন্য অংশ ধীরে ধীরে অচল হইয়া পড়ে। আজ জাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলনে জাতির জননী, ভগিনীকে সাথে সাথে যাইতে হইবে, তবেই আন্দোলন সফল ও সার্থক হইবে। সংসারে ও সমাজেই জাতির জীবন গঠিত হয়, কাজেই সংসারে ও সমাজে নারীর যে কত কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নারীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; কাজেই নারীকেই সংসারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। সংসারে নারীর দয়া, মায়া, ধৈর্য্য লজ্জা, বিনয়, গৃহকার্য্যে নিপুণতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ থাকা চাই; নতুবা নারী তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থা হইতে পারে না। করণীয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করার নাম কর্ত্তব্য। শিক্ষিতা ব্যতীত সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা চাই। সংসার চালান কেবল মুখের কথা নয়; তার জন্যও শিক্ষার দরকার। সংসার অনভিজ্ঞা নারীর নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কত সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। নারীর দ্বারাই সংসার চালিত হয়। মেয়ের গুণাগুণের জন্য মাতাই দায়ী; সুতরাং আমরা যত অনুসন্ধান আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব যে নারীই সংসারের মূল। নারীর হাতের উপরই সংসারের ভিত্তি স্থাপিত। কাজেই মায়ের জাতি যতদিনে গড়িয়া না উঠিবে, ততদিন কল্যাণ নাই। মায়ের জাতি যেদিন কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া সংসারে ও সমাজে তাহার কল্যাণ হস্ত প্রদান করিবে, সেদিন আমাদের বাঙ্গলার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আজকাল মাতৃজাতির হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন; তজ্জন্য জ্ঞানালোক চাই, তৎসঙ্গে গৃহে সুশৃঙ্খলা যাহাতে আসে তদনুরূপ শিক্ষাও চাই। সংসারে ও সমাজে নারীকে পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণীরূপে দাঁড়াইতে হইবে। নারীকে তাহার আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করিতে হইলে শিক্ষিতা হইবার নিতান্ত প্রয়োজন। নারীকে পতির সখা স্বরূপ ও সৎকর্ম্মের সহায়, তাঁহার সচিব ও পরামর্শদাত্রী, আপদকালের বন্ধু, রোগশয্যার শুশ্রূষাকারিণী এবং গৃহের শ্রীবর্দ্ধনকারিণী, সংসারের সকলের প্রতি স্নেহশীলা এবং জননীরূপে সন্তানপালনকুশলা, সুশিক্ষাদায়িনী এবং গৃহের কর্ত্রীরূপে পরিবার পরিজনের স্বাস্থ্যসুখবিধায়িনী হইতে হইবে; তাহা হইলে সংসারে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন হইবে।

সাংসারিক অর্থাৎ পারিবারিক জীবন নারী ব্যতীত চলে না। সংসারে নারীর নানাপ্রকার কর্ত্তব্য। শ্বশুর, শাশুড়ী

দাসদাসী প্রভৃতি সকলের উপরই একটা কর্ত্তব্য আছে; আর সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য নারীরই চেষ্টা করা প্রয়োজন কারণ কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় নারীই সে সকল জানে বেশী। শশুর শাশুড়ী এবং অন্যান্য গুরুজন যাঁহারা সংসারে আছেন তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয় এবং তাঁহাদের সেবা, যত্ন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন; কারণ মাতাপিতা, শশুর শাশুড়ী প্রভৃতি দেবতুল্য। শাস্ত্রে আছে, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারা যায়; যে মানব কায়মনোবাক্যে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের সেবা করে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে নারীর মাতাপিতার প্রতি এবং ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি অন্যান্যদের প্রতিই কর্ত্তব্য থাকে। সে সময়ে যাহাতে মাতাপিতা প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট রাখা যায় তাহা করা কর্ত্তব্য। মা'র যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তজ্জন্য মায়ের কার্য্যের সাহায্য করা প্রত্যেক মেয়েরই কর্ত্তব্য। বিবাহের পর নারীর মাতাপিতা শশুর শাশুড়ী প্রভৃতি সকলের উপরেই কর্ত্তব্য বিদ্যমান থাকে। আজকাল দেখা যায় অধিকাংশ নারীই শশুর শাশুড়ীর প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শশুর শাশুড়ী গুরুজন, তাঁহারা কোন কষ্ট পাইলে তাহা অভিশাপ সৃষ্টি করে, কাজেই তাঁহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে হয়। তারপর ভাই, ভগিনী, ননদ, দেবর প্রভৃতির প্রতি স্নেহপ্রদর্শন কর্ত্তব্য। তাহারা কোন দোষ করিলে তাহাদিগকে তিরস্কার না করিয়া তাহাদের দোষ তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা উচিত, যেন তাহারা তাহাদের নিজেদের দোষ বুঝিতে পারে এবং ভবিষ্যতে আর না করে। তারপর দাসদাসী যাহারা থাকে তাহাদের প্রতিও স্নেহ, মমতা রাখা প্রয়োজন; কারণ তাহারাও ঈশ্বর-সৃষ্ট মানব। তাহারা যদি কোন ক্লেশ পায়, তাহা গৃহস্থের অমঙ্গল সাধন করে। তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় কাজ করাইতে হয়। কথায় বলে "মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট"; বাস্তবিকই মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে যত কাজ হয়, ক্রোধের দ্বারা ততটা হয় না। যে নারী বিলাস ব্যসনে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায়, রোগে মাতার ন্যায়, আপদকালে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার পতির সহিত করে, সংসারে সেই পতিব্রতা ভার্য্যা। সংসারের সকলের যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তদ্বিষয়ে নারীর সতর্ক দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য; কারণ স্বাস্থ্যই পরম ধন ও সকল সুখের মূল।

পুরুষ সকল সময়ে গৃহে থাকে না, নারীকেই এ সকল করিতে হয়। গৃহের সমুদয় সামগ্রী, বাটীর চতুষ্পার্শ, গৃহ প্রভৃতি যাহাতে উত্তমরূপে পরিষ্কার থাকে; কোনরূপ ময়লা আবর্জ্জনা না থাকে সেবিষয়ে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যাদি যাহাতে পরিষ্কার থাকে এবং নিয়মিত ভাবে পান ভোজনাদি সম্পূর্ণ হয় ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর বিষয়গুলির দিকেও উত্তমরূপে যত্ন নারীই নিবে। পরিবারের কাহারও অসুখ হইলে, যাহাতে সেই রোগ আর কাহাকেও আক্রমণ না করে সেজন্য সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক এবং রোগীর সেবা ও শুশ্রূষার জন্যও নারীর দায়িত্ব বেশী এবং রোগীর সেবা শুশ্রূষাও নারীরই করা কর্ত্তব্য; কারণ নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল, প্রকৃতি ধীর, শান্ত, কাজেই এসব বিষয়ে নারী যেমন দক্ষা, পুরুষ তেমন নয়। খুবই ধৈর্য্যসহকারে রোগীর শুশ্রূষার প্রয়োজন তাহাও নারীতেই অধিক বিদ্যমান। রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা নারীর স্বাভাবিক গুণ।

অতিথি সৎকার করাও প্রত্যেক সংসারের নারীর উপরই নির্ভর করে। অতিথি যাহাতে বিমুখ না হয় তদ্বিষয়ে নারীরই উদ্যোগী থাকা প্রয়োজন। অতিথি সৎকার ভারতীয়ের একটী প্রধান গুণ এবং এই গুণটী অত্যাবশ্যকীয়। অতিথি সৎকারে নারায়ণ সেবার ফল পাওয়া যায়। অতিথির যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহার যত্নের ত্রুটী না হয় সেদিকে গৃহের কর্ত্রীরই দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। শত গরীব হইলেও অতিথির সেবা উত্তম রূপে করা প্রয়োজন। পুরাকালে রমণীরা আপনারা না খাইয়াও অম্লানবদনে অতিথিকে তাঁহাদের অংশ দিয়া দিতেন, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আর তাঁহারা এরূপ করিতেন বলিয়াই তাহার ফল পরে পাইতেন। ভিক্ষুক যাহাতে গৃহস্থের দ্বার হইতে শুধু হাতে ফিরিয়া না যায়, তাহাও গৃহের নারীদেরই দেখা উচিত। ভিক্ষুকদের কিছু দান করিলে উহাদের আশীর্ব্বাদও প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ধর্ম্মকার্য্যও হয়। তারপর শিশুপালনই সংসারে নারীর

প্রধান কর্ত্তব্য। শিশুকে গড়িয়া তোলা নারীর সাহায্য ব্যতীত কখনও সম্ভবপর হয় না। শিশুকালে মা-ই শিশুর প্রধান রক্ষক। দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ অসুস্থ হইলে প্রসূতির উপবাস ও ঔষধ সেবন সকলেরই সুবিদিত; অতএব শিশুর কল্যাণের নিমিত্ত মায়ের সর্ব্বদাই তাহার নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে সেজন্য জননীরই যত্ন নিতে হয়। কারণ শিশুর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে চলিবে কিরূপে? শিশুই সংসারের আশা ভরসা, শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পিতামাতা। এই শিশুর দ্বারাই ভবিষ্যতে আমাদের জাতি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে শিশুপালনই নারীর প্রধান কর্ত্তব্য শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই জননীর উপর নির্ভর করে। শৈশবেই যদি স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা কোন কাজের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব শারীরিক, মানসিক উভয় দিকেই শিশুকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলা, মানুষের মত মানুষ গড়িয়া তোলা জননীর কর্ত্তব্য। পিতা সকল সময়ে গৃহে থাকেন না, শিশু সর্ব্বদা মাতার কাছেই অবস্থিতি করে, কাজেই মাতার কাছেই তাহার শিক্ষা হয়। অতএব শিশুর নিকটে খুব সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতি কাজ করিতে হয়, যেন মাতার কার্য্য হইতে শিশু কোন কুশিক্ষা না পায়। কারণ শিশুরা বড় অনুকরণপ্রিয়; তাহারা অপরকে যেরূপ করিতে দেখে সেইরূপই করিয়া থাকে। শিশুকে এমন শিক্ষা দিতে হয়, যে শিক্ষা তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে সৎপথে চালিত করিয়া দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ করে। যে শিক্ষা দ্বারা কোনরূপ সৎকার্য্য করিতে, যত বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন, তথাপি তাহার হৃদয় অচল, অটল, ধীর থাকে এবং কর্ত্তব্য পালনে তৎপর করে। বাল্যাবধি শিশুকে সাহসের কার্য্যে প্রণোদিত করা প্রয়োজন। উপাহাসচ্ছলেও কোনপ্রকার ভয় দেখান কর্ত্তব্য নয়। শিশু কোন দোষ করিলে তাহাকে প্রহার কিম্বা রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়; তাহার দোষ তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া সে যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ না করে, সেইরূপ ভাবে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য; তবেই শিশুকে প্রকৃত শাসন করা হয়। ধর্ম্মের দিকে তাহার মন আকৃষ্ট করা বাল্যকাল হইতেই কর্ত্তব্য। কেবল সন্তান প্রসব করিলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ হয়না বা মা নামের যোগ্যা হওয়া যায় না। যিনি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, সন্তানের দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন তিনিই মাতৃ নামের যোগ্যা। অনেক স্থলে দেখা যায় সন্তান কোন দোষ করিলেও মা তাহাকে কোনরূপ শাসন করেন না; ইহাতে কোন ফল হয় না, মায়ের কর্ত্তব্যও সম্পন্ন হয় না। ক্রমে ক্রমে সন্তান আরও দুর্দান্ত হইয়া উঠে। যে মা সন্তানের হিতৈষিণী তিনি কখনও ছেলের দোষ দেখিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য আজীবন বর্ত্তমান থাকে। যাহা হউক শিশুপালনই সংসারে নারীর প্রধান কর্ত্তব্য; কারণ শিশুই ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল, শিশুর উপরই ভবিষ্যৎ সমাজ, সংসার ও দেশ নির্ভর করে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে নারীদের সংসারে আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, চারিদিকে যেরূপ অর্থাভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহাতে নারীদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাহাদিগকে পুরুষদের সাহায্য করিতে হইবে। দারিদ্র্য সৎপ্রবৃত্তির বিনাশক ও পাপের প্রণোদক, সুতরাং ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দরিদ্র ব্যক্তি উপযুক্তরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না, সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হয়, কাজেই সন্তানগণ মূর্খ, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং বংশপরম্পরায় দারিদ্র্যের আশ্রয়দাতা ও পরিপোষক স্বরূপ হইয়া থাকে। অর্থহীন ব্যক্তি সমাজেও আদৃত হয় না। দরিদ্র পরোপকারী ও ধার্ম্মিক হইলেও সমাজ তাহাকে অযথা অবজ্ঞা করে, বিশেষতঃ আজকালকার সমাজ। আধুনিক সামাজিক অবস্থা ও অর্থাভাবজনিত দুর্গতি সমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া, যাহাতে উপযুক্ত উপায় দ্বারা দারিদ্র্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা কি পুরুষ কি নারী সকলেরই কর্ত্তব্য।

নারীরা চরকা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। নারী যদি সংসারের কার্য্য করিয়া অবসর সময় নষ্ট না করিয়া চরকায় সূতা কাটেন এবং তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করেন তাহা হইলে আর্থিক অনেক লাভ হয়। এ ছাড়া আরও অন্যান্য কাজ আছে যাহা নারীগণ করিতে পারে, সে সকল করিয়াও সাহায্য করিতে পারেন। নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও চরকা এবং অন্যান্য শিল্পাদি সামান্য কাজ যাহা উহারা করিতে পারে, তাহা উহাদের দ্বারা করাইতে পারিলে অনেক উপকার হয় এবং নারিগণ নিজেরাও অন্যান্য শিল্পাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। আজকাল আমাদের নারী-সমাজে বিলাসিতার এবং অলসতার ঝোঁক বেশী। তাঁহারা আয়ের অধিকাংশই বিলাসিতায় ব্যয় করেন; অবশ্য যাঁহাদের অবস্থা সেরূপ উন্নত, যাঁহারা ধনী তাহাদের কিছু আসে যায় না। তথাপি তাঁহারা যদি অযথা বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় না করিয়া, সেগুলি দরিদ্রের সাহায্যের জন্য ব্যয় করেন তবে দরিদ্রের অনেক উপকার হয়। এরূপও অনেক দেখিয়াছি যে, তেমন আয় নাই তথাপি রান্নার জন্য ঠাকুর না হইলে চলে না। ঠাকুর না রাখিয়া মহিলারা নিজেরাই যদি রান্না এবং ঝি না রাখিয়া ঘরকন্নার অন্যান্য কাজ করেন তবে অনেক সুবিধা হয়। আমাদের বাঙ্গালী আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না। আমাদের বাঙ্গালীর দুরবস্থার ইহাও একটী কারণ। মোট কথা সংসারের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল হয় তাহা করাই নারীর কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীর সংসারে সাধারণতঃ নারীদের হস্তেই খরচের ভার অর্পিত থাকে, কাজেই এবিষয়ে নারীদেরই সতর্ক থাকা এবং মিতব্যয়ী থাকা কর্ত্তব্য। এই সমুদয় বিষয় যদি নারী উত্তমরূপে পালন করিতে পারে তবেই সংসারে নারীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়।

তারপর আমাদের সমাজে নানাপ্রকার অবিচার অত্যাচার প্রবেশ করিয়া সমাজকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দ্দাপ্রথা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমাদের এই মৃতপ্রায় সমাজেও নারীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ আবশ্যক। নারীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে সকল দোষ বিদূরিত হইয়া সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। অস্পৃশ্যতা আমাদের বঙ্গ সমাজের একটী প্রধান দোষ। আর এই অস্পৃশ্যতা নারীদের ভিতরেই অধিক পরিলক্ষিত হয়; তাই বলিয়া পুরুষদের যে নাই তাহা নয়। নারী যদি অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দেয় তবে পুরুষ কখনও রাখিতে পারে না। পল্লীগ্রামে দেখা যায় ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এক কূপ হইতে জল নিতে পর্য্যন্ত পারে না; কারণ চণ্ডাল যদি ব্রাহ্মণের কূপ স্পর্শ করে তাহা হইলে কূপটী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অসহায়, নিরাশ্রয় নিম্নজাতীয় লোক, একটু জল দিবারও লোক নাই তথাপি কেউ একটু জলও দেয় না। এমন কি ডাক্তার পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হয় না; কারণ কোন অর্থও পাইবে না, অথচ তাহার জাতিও যাইবে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ যে সমাজ সে সমাজের উন্নতি কি সম্ভবপর? সমাজ কি কেবল ধনীর জন্যই গঠিত? সমাজে কি কেবল ধনী ও উন্নত সম্প্রদায়েরই স্থান? দরিদ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কি সমাজে এতটুকু স্থানও নাই? আমাদের বঙ্গ সমাজে আজকাল দরিদ্রের প্রতি এতটুকু সহানুভূতিও নাই। নারীদের কর্ত্তব্য এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে সমাজের সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেইরূপ কাজ করা। সমাজ কি কতকগুলি জড় পদার্থের সমষ্টি না, কয়েকজন মানবেরই সমষ্টি? সমাজ যাহা বিধান করে জনসাধারণ সেই বিধানানুসারেই চলিয়া থাকে; অতএব সমাজের কর্ত্তব্য দরিদ্রের, অনুন্নত সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা। আর এ বিষয়ে নারীদেরই কর্ত্তব্য অধিক; কারণ মাতৃজাতি নারী। মা যদি ছেলেকে আদর করিয়া কোলে নেয়, তবে অন্য কেউ কি ছেলেকে মায়ের কোল হইতে লইয়া যাইতে পারে? মা যদি ছেলেকে তাঁহার নির্ম্মল স্নেহমাখা অঙ্কে ধারণ করেন, তবে আসুক না কেন শত ঝঞ্ঝাবাত, মা জীবিতা থাকা পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য নাই যে ছেলেকে মাতৃকোল হইতে বিচ্ছিন্ন করে। তাই বলি মাতৃজাতি যদি অনুন্নত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে। অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং অনুন্নত সম্প্রদায় যাহাতে অবাধে সকল উৎসবে যোগদান করিতে পারে ও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে

পারে সেজন্য নারীগণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নারী যদি চণ্ডালকে সাদরে গৃহে তুলিয়া লয় তবে পুরুষ কিছু করিতে পারে না।

এই অস্পৃশ্যতা তুলিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভেরও অনেক সুবিধা হয়। দেব-মন্দিরে প্রবেশাধিকারের জন্যই মুন্সীগঞ্জ কালী মন্দিরে সত্যাগ্রহ চলিতেছে এবং কতিপয় দেশভক্ত নির্য্যাতিত হইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নারী এই ডাকে সাড়া দেয় নাই। যাহা হউক, অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দেওয়ার জন্য এবং দরিদ্র ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার নিমিত্ত নারীদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভিতরে যাহাতে বাল্যবিবাহ না হয় (উহাদের ভিতরেই বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ অধিক প্রচলিত) সেজন্য তাহাদিগকে বাল্যবিবাহের অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যবিবাহের জন্য বাঙ্গলায় এত বাল-বিধবা। নারী যদি অপর নারীকে এসকল বুঝাইয়া দিয়া বাল্যবিবাহ দিতে নিষেধ করে তবে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হয়; কারণ মেয়ে বড় হইলে মেয়ের বিবাহের জন্য মা-ই পিতাকে অস্থির করিয়া তোলে। তবে এবিষয়ে নারী কম করে নাই, তাহাদে ঐকান্তিক চেষ্টা ও দেশ-সেবকদের চেষ্টার ফলেই সরদার বিবাহ বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বাল্যবিবাহ নিবারণ করিতে ভবিষ্যতে নারীদের আর পরিশ্রম করিতে হইবে না; তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভিতর এই বিলের নিয়মাবলী প্রচার করা কর্ত্তব্য, যেন তারা সকল বিষয় বুঝিতে পারে এবং বিপদে না পড়ে। তারপর সমাজে একটা ব্যবস্থা করা দরকার যেন জনসমাজ বিলাতী দ্রব্য বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার না করে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। এবিষয়েও নারীদেরই যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ মাতা, ভগ্নী, পত্নী যদি বিলাতী দ্রব্য গৃহে না আনিতে দেয় তবে সাধ্য কি যে পুত্র, ভ্রাতা, পতি বিলাতী দ্রব্য আনয়ন করে। আর অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভিতরেই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহৃত হয় বেশী, বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র। এই বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের পথ কতক সুগম হইবার আশা। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নারী-দিগকে যদি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারের অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করা যায় এবং তাহাদের সন্তানগণ যাহাতে আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না করে সেজন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করা যায়; তবে অনুন্নত সম্প্রদায় যে সে অনুরোধ রক্ষা না করে এমন মনে হয় না। সমাজ যাহাতে এ সকল বিষয়ে একটা নিয়ম করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নারীদের কর্ত্তব্য। নারী যদি সমাজকে এ বিষয়ে অনুরোধ করে তবে সমাজ কিছুতেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তারপর নারীদের সমাজে আর একটী কর্ত্তব্য বিদ্যমান আছে। মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণ করা কর্ত্তব্য। মাদক দ্রব্য সেবনের ফলেও আমাদের দেশ হইতে কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যাহার দৈনিক চার আনা আয়, সেও দৈনিক এক আনাই মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে। মাদক দ্রব্যের ভিতরে বিলাতী সিগারেটই বাঙ্গালীর প্রিয় বেশী; বিলাতী সুরা ইত্যাদিও কম নয়। বাঙ্গালী যাহাতে মাদক দ্রব্য সেবন না করে সেজন্য সামাজিক একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। তবে আমাদের ভাইদের সিগারেট্ না হইলে চলেই না; অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং বিলাতী সিগারেট্ও বর্জ্জন করিয়া কেবল দেশী সিগারেট্ ব্যবহার করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু একেবারে সমস্ত মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিতে পরিলেই ভাল হয়।

ছোট ছোট ৮।১০ বৎসরের ছেলের পর্য্যন্ত সিগারেট্ না হইলে চলে না। এই সিগারেট ও মাদক দ্রব্যের পিছনে এত টাকা না ফেলিয়া সেই টাকা যদি দেশের কার্য্যে ব্যয় হইত, তবে কেমন আনন্দ ও সুখের বিষয় হইত। তাই আমাদের মা বোনদের অনুরোধ করি তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে মাদক দ্রব্য সেবন করিতে নিষেধ করেন। অন্ততঃ বিলাতী মাদক দ্রব্য। এই মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণ করিতে পারিলে আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকে কাজেই আর্থিক অনেক উন্নতি হয়; কেবল আর্থিক নয়, নৈতিক উন্নতিও হয়। প্রতি গৃহের নারী যদি পুত্র, ভ্রাতা ও পতিকে মাদক দ্রব্য সেবনে বাধা দেন এবং সমাজেও এজন্য একটা নিয়ম

প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে যত্নবতী হন, তবে কার্য্যোদ্ধার হওয়ার খুব সম্ভব। কারণ মা ভগিনীর কথা পুত্র, ভ্রাতা কখনও অবহেলা করিতে পারে না। নারী যদি মাদক দ্রব্য সেবন নিবারণে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাদের সংসারে ও সমাজে উভয় দিকেই একটা কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়। পুত্র ভ্রাতাকে মাদক দ্রব্য সেবনে বাধা দিলে, প্রথমে হয়ত তাঁহারা কুপিত হইতে পারেন; কিন্তু পরে যখন তাঁহারা ইহার ফলাফল বুঝিতে পারিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপরাধ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতঃপর যে সমস্ত বালবিধবা আছে তাহাদের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করাও নারীর কর্ত্তব্য। অনুন্নত সম্প্রদায়ে অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার ফল ও না দেওয়ার ফল বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন এবং নারীর নিকটেই এ বিষয়ে অধিক প্রচার আবশ্যক। মেয়ের বিবাহ দেওয়া না দেওয়ায় হাত মায়েরই বেশী। আবার অনুন্নত সম্প্রদায়েই বালবিধবা বেশী। কাজেই তাহাদের নিকটেই এবিষয়ে বেশী প্রচার আবশ্যক। পণপ্রথা নিবারণের জন্যও নারী আন্দোলন চাই। নারী যদি পুরুষকে পণ নিতে নিষেধ করে, তবে পুরুষ কখনই পণ নিতে পারে না। পণপ্রথা নারী জাতিকে হীনা করিয়া ফেলিতেছে। গৃহস্থের কন্যা হইলে মুখ অন্ধকার হইয়া যায়। মেয়েকে বিবাহ দিতে হইবে ভাবিয়া মেয়ে হইলেই মেয়ের বাপ মায়ের যেন চিন্তায় ঘুম হয় না। তারপর মেয়ে একটু বড় হইলেই বাপ মা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান; মেয়ে যেন তখন চক্ষু-শূল হইয়া দাঁড়ায়। শুধু এই পণপ্রথার জন্যই মেয়েদের এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে হয়। অতএব এই পণপ্রথা তুলিয়া দিবার জন্য নারীদেরই আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। নারী যদি নারীর দুঃখ দূর না করে তবে কে করিবে? নারী ব্যতীত কেই বা নারীর দুঃখ বুঝিবে? সমাজ যাহাতে এবিষয়ে কোন ব্যবস্থা করে সেবিষয়ে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে কোনও নিয়মের আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা, কি নারী কি নর সকলেরই কর্ত্তব্য, তবে প্রেরণা দিবে নারীই। অস্পৃশ্যতা, মাদক দ্রব্য সেবন, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার, পণপ্রথা এইগুলি পরিহারের জন্য সামাজিক একটা নিয়ম দরকার। এইগুলি যাহারা করিবে তাহারা সমাজের বিচারানুসারে দণ্ডনীয় হইবে, সমাজে যদি এইরূপ একটা ব্যবস্থা হয় তবে অনেকেই হয়ত এইগুলি পরিহার করিবে। যদি কোন নারীকে কোন দুর্ব্বৃত্ত হরণ করে তবে সমাজ চিরদিনের জন্য তাহাকে একঘরে করিয়া রাখে। তাহার কোন অপরাধ না থাকিলেও সমাজে তাহার স্থান থাকে না। এমন কি সমাজের ভয়ে তাহার আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করে। আমাদের বাঙ্গলার সমাজ নির্য্যাতিতের উপর নির্য্যাতন করিতে পারে, লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনা করিতে পারে, নিরপরাধকে শাস্তি দিতে পারে কিন্তু অপরাধীর শাস্তি দিতে তাহারা পারে না, দুর্ব্বৃত্তের শাসন করিতে পারে না নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দিতে পারে না, এমনি দুর্ভাগা সমাজ আমাদের। নারীদের কর্ত্তব্য নির্য্যাতিতা নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা; তাহারা যাহাতে অসহায় ভাবে অতলে ভাসিয়া না যায় সেজন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং তাহাদের যাহাতে খাইবার পরিবার কষ্ট না হয় তাহা করা।

তারপর তুলিতে হইবে আমাদের পর্দ্দা প্রথা। অবরোধের অন্তরালে রাখা হইয়াছে নারীকে, কিনা, তাহারই মঙ্গলের জন্য! ননীর পুতুলী নারী, সোহাগের ডালি নারী; পাছে নারীর গায়ে আঁচড় লাগে, কুদৃষ্টির আগুনের আঁচ লাগে তাই তো এত পর্দ্দা, এত বন্ধ দুয়ার, এত প্রাচীর, এত অবগুণ্ঠন! জড় হইয়া পড়ে নারী, চলিতে গেল পায়ে পায়ে বাধে, পথে ঘাটে নিতান্ত নিরুপায়, অসহায়, সঙ্গীর বিরক্তি ও উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়ে; তবু মানুষের মত চলিবার আগ্রহ তাহার নাই। কিন্তু এত করিয়াও নারী রক্ষা পায় কি? প্রতিদিনের সংবাদ-পত্র যে সমস্ত নির্ম্মম কাহিনী আমাদের দ্বারে বহন করিয়া আনে, সেইগুলিই প্রমাণ নয় কি? যাহাতে নারী এই দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে সেজন্য ছুরিকা চালনা, যুযুৎসু ইত্যাদি ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা করিয়া আমাদের নিজেদের মনে সাহস সঞ্চয় করিতে হইবে। নারিগণ নিজেরা শক্তিমতী হইলে সেই শক্তি তাহাদের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা ইত্যাদির মধ্যে সহজে সঞ্চারিত হইবে। সমাজ নারীকে মানবের সহচারিণী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায় নাই; চাহিয়াছে শুধু ব্রততীর মত সদা আশ্রয় ভিখারিণী, দুঃসহ লজ্জাভারে অবনতা, ভীরু প্রকৃতি করিয়া গড়িয়া তুলিতে। কিন্তু নারীর মত

৮

আত্মরক্ষার অসমর্থাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। কিন্তু বিপদ যখন নারীদের আগে, অনিচ্ছায়ও যখন তাহারা পশুবলের দ্বারা নির্য্যাতিতা হইয়াছে; তখন তাহাকে সমাজ রক্ষা করিতে পারে নাই এবং তাহার আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও সহস্র বিধি নিষেধ দ্বারা কাড়িয়া নিয়াছে। তাহাকে নিতান্ত অসহায়া ও নিরুপায়া জানিয়াও কোল হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, বিমুখ হইয়া দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের চরম সীমায় আনিয়া দিয়াছে। ইহার প্রতিকার আজ নারীকেই করিতে হইবে, বলিতে হইবে "নওরোজের দিনে বাদশাহের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিয়াছে, সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ওগো! সেই ছুরিকাই আজ আমরা চাই; যদি তুমি তা না দাও তাহা হইলে পশুবলে নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা আমাকে নিরপরাধে তুমি ত্যাগ করিতে পারিবে না। যাহাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি তোমার নাই, করিতে পার নাই; তাহাকে দণ্ড দিবার অধিকারও তোমার নাই।" এই যুগে যে সমস্ত অহল্যা পাষাণী, অশুচি স্পর্শ জনিত দুঃখে কাঁদিয়া মরিতেছে, পাষাণ-কারা ভেদ করিয়া আবার মানবী মূর্ত্তিতে নর সমাজে বাস করিতে চাহিতেছে, তাহাদিগকে পূর্ণ স্পর্শ দিয়া ধন্য করিবে কে? ওগো! তাদের মুক্তি দিবে কে? তাহাদিগকে সেই শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শ দিতে পারিবে শুধু এই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ মহিলা সমাজ। নারী ভবিষ্যত জাতির জনয়িত্রী হিসাবে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠন করেন। আমাদের এই শৃঙ্খলিতা দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্তা দেশ-জননী আজ নারীর কাছে এমন সন্তান ভিক্ষা করিতেছেন, যে সন্তান পূর্ণাবয়ব, স্বাস্থ্য সম্পন্ন, সুগঠিত দেহ; বলশালী ও অকুতোভয়; মৃত্যুকে সে ভয় করে না, যে বিশ্ব-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করিয়া আনিতে পারে। কোথায় আজ তাঁহারা, যাঁহাদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাগরের কূলে কূলে ঘুরিয়া সাগরপারের বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিত; কোথায় বিজয়সিংহ প্রভৃতি, যাঁহারা সুদূর সিংহল প্রভৃতি দেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল! তাহার পরিবর্ত্তে আজ আসিয়াছে দৃষ্টিক্ষীণ, নির্ব্বীর্য্য বাহু, দীন সন্তান; যাহাদিগকে আপন অঞ্চল তলে না রাখিলে মা স্বস্তি বোধ করেন না, যাহাদিগকে চোখের আড়ালে দূরে গৌরবময় বিপদের মুখে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাই কবি গভীর দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"সাতকোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি।"

ওগো! আর কতকাল এমন ভাবে চলিবে? আজ ঘরে ঘরে আগত ও অনাগত সন্তানের জননীদের তারক-বিজয়ী কার্ত্তিকেয়ের মত অন্যায়বিধ্বংসী, শ্রেয়-আনয়নকারী সন্তানকে জন্ম দিবার ও লালন পালন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। নারী যাহাতে এসকল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে, সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। নারীদিগকে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করিতে পারে। শিক্ষা বলিতে কেবল শব্দ শিক্ষা নহে। মানবের বৃত্তিগুলির, শক্তি সমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শুধু বইয়ের শিক্ষায় কিছু হইবে না। সেই শিক্ষা চাই, যে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হইবে, মনের শক্তি বাড়িবে, বুদ্ধির প্রসার হইবে, আর নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা, নির্ভীক হৃদয়া মহীয়সী রমণীদের অভ্যুদয় হইবে। মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলিতে হইবে। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। আর নারীকেই এসকল করিতে হইবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক শিক্ষা দিতে হইবে। নারীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। কালে যাহাতে তাহারা গিন্নী তৈয়ারী হয় তাহাই করিতে হইবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না শিক্ষা দিতে হইবে; গৃহ কর্ম্মের যাবতীয় বিধান ও শিশু-পালনের সমস্ত স্থূল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, যেন তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে সমর্থা হয়। মেয়েরা মানুষ হইলে, তবে তো তাহাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি, দেশে জাগিয়া উঠিবে। সমগ্র ভারতেই এইরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন; বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গলার

নারী সমাজ অধিক তিমিরে অবস্থিতা। তাই আজ বঙ্গের জননী, ভগিনী, বধূ ও কন্যা সকলেরই ডাক আসিয়াছে। তোমাদেরই সন্তান, ভ্রাতা, পতি ও পিতা কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য ও উৎসাহ ভিক্ষা করিতেছেন। বলিতেছেন "ও গো কল্যাণি! তুমি এসো, তোমার হাতে অমৃতের পাত্র নিয়ে সেই শুভ দিনের উদ্দেশ্যে। আমাদের যাত্রায় চল তুমিও আমাদের সঙ্গিনী ও সহায় হয়ে। তুমিই যে রাজশ্রী। এসো, তোমার সঙ্গে আমরা দেশসেবার মহান্ ব্রত একত্রে উদ্‌যাপিত করি।" আজ বঙ্গজননী তোমাদের ডাক দিয়া বলিতেছেন, "ওগো নারী! তোমার কোমল হৃদয় আর্ত্ত-নিপীড়িতের দুঃখে কাঁদে, তোমারি দেশমায়ের সন্তান ক্ষুধায় পীড়িত হ'য়ে আজ তোমার কাছে অন্নভিক্ষা করছে, তুমি তার মুখে অন্ন দাও। বিদেশী দ্রব্য, বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কর দরিদ্রের দুঃখ ঘুচুক, অনাহার-কাতরের মুখে অন্ন উঠুক।" দেশের দীন, দরিদ্র আজ আমাদের মুখ পানে চাহিয়া আছে। শুনিয়াছি আত্মত্যাগ ও আত্ম-বর্জ্জন আমাদের মায়ের জাতির সহজ প্রকৃতি। আজ কি দেশমানবের জন্য দরিদ্র অন্নহীন আমাদেরই দেশ মায়ের হাজার হাজার পুত্রকন্যার জন্য আমরা খদ্দর ও দেশীশিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিব না? নারী মায়ের জাতি, কিন্তু মাতৃহৃদয় নিয়াও আমরা দেশের অনেক সন্তানকে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছি। যাহার কাছে বিশ্ব সহজ প্রেমের দাবী করে, সেই নারী কি আজ তাহার প্রসারিত মাতৃকোলে সবাইকে টানিয়া নিবে না? মহাজাতির উদয়-সম্ভাবনাকে নারীকেই সর্ব্বাগ্রে বরণ করিয়া নিতে হইবে; তাহাকে ছুঁৎমার্গ পরিহার করিয়া দুই হাতে স্নেহ ভালবাসা বিলাইতে হইবে। শত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করিয়া তাহারই বলে মৃত দেশে প্রাণ আনিতে হইবে; হৃত সম্পদকে উদ্ধার করিতে হইবে। এ সকল কাজ করিতে অনেক আঘাত, বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। সেজন্য বিরত হইলে চলিবে না। নারী সংসারে মাতৃস্বরূপিণী। যাহারা সংসারে পবিত্রতার সাধক, যাহাদের সহায়তা ব্যতীত গৃহস্থ মানব ধর্ম্মকার্য্য করিতেও অধিকারী নহেন, সেই নারীর সাহায্য না পাইলে সংসারের পক্ষে, সমাজের পক্ষে ঘোর অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে, যে গৃহে, যে দেশে নারীর অসম্মান হয়, নারী দুঃখ পায়, সেই দেশের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। এই কথা স্মরণ করিয়া নারীকে তাহার সন্তানদের শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারা যেন মাতৃজাতির প্রতি সম্মান করিতে শিখে। আমাদের দেশে আজকাল মাতৃজাতির প্রতি তেমন সম্মান প্রদর্শন হয় না; ইহাই আমাদের দেশের নারীদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কাজেই এ বিষয়ে সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়াও নারীর কর্ত্তব্য। নারী মহাশক্তির অংশ-রূপিণী, সে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুক না কেন কখনও সে বিফল মনোরথ হয় না। তাই বলি হে শক্তিস্বরূপিণিগণ! তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য সাধনে প্রস্তুত হও। নারীর কর্ত্তব্য শুধু গৃহস্থালীর অন্তরালেই সীমাবদ্ধ নয়। সংসারে সমুদয় কার্য্যে ও সমাজে তাহার কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। আর এই সমাজ-শক্তির অর্দ্ধাংশ নারী দাবী করিতে পারে। সমাজে নারী ও পুরুষ এই দুই প্রকার আবেষ্টন। দুইয়ে মিলিয়া মিত্রতা করিয়া চলিতে হয়। নারী যদি শুধু রন্ধনশালা বা সূতিকাগৃহেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্যই বা পূর্ণ হয় কেমন করিয়া? তাই আমাদের বাঙ্গলার মেয়েরা এত অপরিপুষ্ট, আর জাতি এত দুর্ব্বল। অতএব হে বাঙ্গলার নারি! তোমরা নিজেরা এ বিষয়ে যত্নবতী হইয়া তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর। বাঙ্গলার অধিকাংশ নারী শিক্ষাহীন, তাই সমাজে তাহার দায়িত্বের সংখ্যা অল্প, কার্য্যও স্বল্প। তাহার জীবনের অভিজ্ঞতাও ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, কিন্তু যে নারী শিক্ষা পাইয়াছে, সে এক বৃহৎ সমাজের বিশালতার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। সেখানে সম্পদের প্রাচুর্য্যে নারী বিস্মিতা। নারীর মর্য্যাদা হইতেই বোঝা যায় সমাজ কতখানি উন্নত। নারীর ক্রমোন্নতির ইতিহাসই সর্ব্বসমাজের উন্নতির ইতিহাস বলিলেও চলে।

যেখানে নারী প্রেমময়ী বধূ, সন্তানবৎসলা, সেবা পরায়ণা, শিক্ষাদাত্রী, লোকহিতৈষিণী, সেখানেই নারীর নারীত্বের প্রকাশ। যে শক্তিতে সমাজ চলে তাহার অর্দ্ধেক নারীশক্তি। যে সমাজে এইরূপ শিক্ষিতা নারী, সে সমাজ ধন্য। আমাদের বাঙ্গলা এখন পরাধীন, বাঙ্গলার সন্তান আজি কারাগারে, বঙ্গজননীদের কি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে? আর তাহাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কি সাজে? যতদূর সম্ভব কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কর্ত্তব্য পালনের জন্যই তো এই মানব জন্ম; কর্ত্তব্য পালনই যে জীবনের প্রধান ও একমাত্র কর্ম্ম।

হে আমার বঙ্গজননিগণ! একবার জাগো, একবার প্রাণপণ চেষ্টা কর, তোমাদের দেশকে স্বাধীন করিতে, তোমাদের সমাজ সংস্কার করিতে। তোমার সন্তানদিগের স্বাধীনতা বীজমন্ত্রে দীক্ষা দাও। তোমার দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য সংসার ও সমাজে তোমার যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্পাদনে চেষ্টা কর। বঙ্গলক্ষ্মীর গৌরবে, যশে ভারত বিখ্যাত হউক, বিশ্ব ভরিয়া উঠুক। *

* শান্তি ইনষ্টিটিউট রচনা প্রতিযোগিতায় রসমঞ্জরী দাসী স্মৃতি পদক প্রাপ্ত

আসঙ্গ

[আব্‌দুল কাদের]

(১)

পথশ্রান্তি চলি' গেছে, দেহে লাগে দক্ষিণ বাতাস ;
আমার এ পান-পাত্রে মিশে আসি বনের নিশ্বাস !
পুরাতন গৃহ হ'তে আছি বহু দূরে—
বিরহের ছায়া দোলে মর্ম্মের মুকুরে ;
তবু যেন আছি সুখে, আছি স্বপ্নপুরে
পলাতকা প্রেয়সীর কোলে।
মঞ্জীর-গুঞ্জন যার শুনেছিনু কবে মোর রক্ত-কলরোলে !

(২)

মনের প্রান্তর ঘিরে নামিয়াছে স্নিগ্ধ অবকাশ ;
প্রিয়ার আঁখির প্রান্তে জাগিয়াছে স্বপ্নের আভাষ।
দোঁহে হাসি দোঁহে কাঁদি বাহুর বন্ধনে
লোধ্ররেণু মুছে' যায় অজস্র চুম্বনে।
মোরা যেন জাগিয়াছি একটী স্বপ্নের—
চিনিয়াছি: স্বপ্নে পরস্পরে !
দোঁহার হৃদয়-রন্ধ্রে—ক্ষীণ আলো-রেখা সম প্রণয় সঞ্চরে।

(৩)

আমার নয়নে জ্বলে জ্যোতিঃগর্ভ কাব্যের আরতি ;
প্রেয়সীর বক্ষে কাঁপে সদ্য-জাগা বিহ্বলিতা রতি।
আমি গাহি রূপসীর অরূপ-বন্দনা—
দেহ-দ্বারে করে সে যে আমারে কামনা !
লীলা-বসন্তের রাগে শুভ্র নিরঞ্জনা
অঙ্গে মাখে আবীর কুঙ্কুম।
আমার পূজার যজ্ঞে ঝরি' পড়ে প্রেয়সীর কুন্তল-কুসুম ॥

বাঙ্গালা বার-ব্রতের ছড়া ও বাঙ্গালী-জীবনের আদর্শ

[শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত]

প্রত্যেক জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলে কতক গুলি বিশেষ বিশেষ ideal (আদর্শ) থাকে, এই ideal অলক্ষ্যে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে তাহার শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য সমস্ত কিছু অনুষ্ঠানকে আপনার রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তোলে। হিন্দু-সন্তান পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্য বা ইতিহাসের সহিত যত ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত হউক না কেন, সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত দিতে সে রাম লক্ষ্মণেরই উল্লেখ করিবে, গ্রীক্ সাহিত্যের দ্বারে ধন্না দিবে না ; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিরাও পেনীলোপী বা এণ্ড্রমেকীকে ছাড়িয়া সীতা-সাবিত্রীর সতীত্বের জয়-গান করিবে না। এইখানেই প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব আদর্শগত স্বাতন্ত্র্য ; এই আদর্শ যে জাতির যত উন্নত, সামাজিক ও নৈতিক হিসাবেও সে জাতি তত শ্রেষ্ঠ।

ভারতের—ভারতের কেন, কেবলমাত্র বাঙ্গালারই সামাজিক ও নৈতিক জীবনের আদর্শ কি ছিল? পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় পর, সকলকে লইয়া একটি নিরবচ্ছিন্ন শান্তিময় মিলন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ; রোগ শোক, অধীনতা, ঋণদায়, অকাল-মৃত্যু, বিবাদ-বিসম্বাদ ও স্বার্থ-সঙ্কুল হেয় আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে মুক্ত সেবা পাতিব্রত্য এবং নৈতিক ও পারমার্থিক সর্ব্ববিধ কল্যাণে অমূর্ত্ত জীবন যাপন—ইহাই ছিল বাঙ্গালার আদর্শ। এই জন্য বাঙ্গালী সীতার মত পত্নী, লক্ষ্মণের মত ভাই, দশরথের মত পিতাকে দুস্তর জীবন সমুদ্রের পথে ধ্রুব-তারা করিয়া দেখিয়াছে—এই আদর্শ-প্রীতি কি ভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার প্রত্যেক ছোটবড় চিন্তা ও কার্য্যকে প্রবল ভাবে অধিকার করিয়াছে, তাহাই দেখান' অংশতঃ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র বাঙ্গালা গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা হইতেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—বাঙ্গালা গ্রাম্য-সাহিত্য বলিতে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যকে বুঝায় ?

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ('ময়নামতীর গান', 'মহুয়া' প্রভৃতি), অধ্যাপক ক্ষিতি মোহন সেন সম্পাদিত 'বাউল গান' এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীকে আমরা বাঙ্গালা গ্রাম্য সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে পারি। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত কীর্ত্তন-গাথা, মনসার ভাসান, জাগ্ গান বালা, ছঁদ, ভাটিয়াল, বেঁউড়, জারীগান, গ্রাম্য দেবতার পাঁচালী, বারব্রতের ছড়া, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিও বাঙ্গালা গ্রাম্য সাহিত্যের অন্তর্গত।

'সাহিত্য' শব্দটিকে আমরা সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে না লইয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি বলিয়াই এই সকল রচনা অদ্যাবধি শ্লীল সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই। আমরা নাগরিক জীবনের আভিজাত্যকেই সাহিত্যের দরবারে বড় করিয়া দেখি—কিন্তু লোক-লোচনের অন্তরালে বাঙ্গালার এই যে এত বড় একটা সাহিত্য ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালী-জীবনের কত অলিখিত ইতিবৃত্ত আজিও ইহার বক্ষে লুকাইয়া আছে সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখি না। আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিকতা আমাদের চোখ ঝল্সাইয়া দিয়াছে তাই আমরা প্রাচীনদের সরল ও স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রণালীর উপর বীতশ্রদ্ধ! আমরা পল্লীচিত্র অঙ্কন করি নগরে বসিয়া, প্রকৃতিকে দেখি সংবাদ-পত্রের ছাপা হরফের ভিতর দিয়া—এই জন্য ডাক্তার দীনেশ চন্দ্রের মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকও 'বউ কথা কও' পাখীকে 'পাপিয়া' বলিয়া ভুল করেন, কামিনীলতাকে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত করিয়া অঙ্কিত করেন* কিন্তু সত্যকার বাঙ্গালী জীবন যা তাহা এই সকল রচনাতেই

* 'মৈমনসিংহ গীতিকা' দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়; বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খা, কল্পনা, অভাব-অভিযোগ, আদর্শ সমস্ত কিছু মূর্ত্ত হইয়াছে এই গ্রাম্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলান ছড়া' প্রবন্ধে একথা অতি সুন্দর রূপেই বুঝাইয়াছেন—

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চাপ মানুষের ঘাড়ে শনি গ্রহের মত ঝাঁকিয়া বসিবার পূর্ব্বে আমাদের জীবন যাপন প্রণালী কত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক এবং আড়ম্বররহিত ছিল তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে এই সকল গ্রাম্য কবিতা, যাহা সাহিত্য সমাজে আজিও অচল ও অপাংক্তেয়—তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের কতখানি সত্য সত্য বাঙ্গালার সাহিত্য, এ প্রশ্ন উঠিলে খুব বেখাপ্পা শোনায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ প্রশ্ন আদৌ অসমীচীন নহে।

আজ আমরা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চশমার ভিতর দিয়া আমাদের সমাজকে দেখি, ফ্রয়েডের Psycho-analysis (মনো বিশ্লেষণ) লইয়া মাথা ফাটাফাটি করি, কোম্‌টের Positivism (আদর্শবাদ) এর সমাধান করিতে বসি—যে সমস্যা আমাদের জীবন-পথে কখনও উদিত হয় নাই, কখনও হইবেও না, তাহাই আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপজীব্য হইতে বসিয়াছে—তাই বলিতেছিলাম এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকখানি সত্যকার বাঙ্গালা সাহিত্য নয়। * কিন্তু যে গ্রাম্য গাথা-সাহিত্যের কথা বলিতেছি তাহার প্রত্যেকটী অক্ষরে, প্রত্যেকটী কথায় খাঁটী বাঙ্গালী জীবনের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়, এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই বাঙ্গালার সত্যকার জাতীয় সাহিত্য।

কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সমগ্র বাঙ্গালা গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়, প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার উল্লেখ করা হইল মাত্র—প্রকৃত পক্ষে আমরা বলিতে চাহি বাঙ্গালা মেয়েলী বারব্রতের ছড়া ও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শের কথা।

বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই লক্ষ্য ও আদর্শ কত অনায়াসে ও কেমন সহজে বাঙ্গালীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে তাহাই এবার দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আগে এদেশের মেয়েরা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে নানা রকম বার ব্রত উদ্‌যাপন করিত। সেই উপলক্ষে তাহারা তুলসী গাছের উদ্দেশে নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিত—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ।
তুমি তুলসী বৃন্দাবন॥
তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিম কালে দিও স্থল॥"

তুলসী তলায় গোবর দিয়া বলিত—

"তুলসী নাড়ি, তুলসী চাড়ি, তুলসী ক'রলাম সার।
দিলে গোবর তুলসী তলায় জনম হয় না আর॥"

আবার সন্ধ্যার সময় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়া বলিত—

"তুলসী তলায় দিলাম বাতি।
তার সাক্ষী থেক' ভগবতী॥
সাক্ষী থেক' সব দেবগণ।
দেখ' চেয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
প্রদীপ দিনু তোমায় সন্ধ্যা কালে।
যেন তোমার বরে তিন কুল উজলে॥
করযোড়ে করি নতি গলায় দিয়ে বাস।
অন্তিমকালে দিও স্থান ওহে শ্রীনিবাস॥"

কি সহজ, সংক্ষিপ্ত আত্ম-সমর্পণ এই কয়টী কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্র না, তর্ক না—সরল বিশ্বাসে এই গাছটীকে হিন্দু বালিকা আপনার উপাস্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, তাহার মাতা-মাতামহী হাতে ধরিয়া তাহাকে এই কথা শিখাইয়াছেন, সে সেই কথা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছে—ইহাই ছিল বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক জীবনের ideal.

আজ আমরা সর্ব্বহারা লক্ষ্মীছাড়ার দল, নিজেদের বিশৃঙ্খল সামাজিকতা লইয়া ব্যতিব্যস্ত; ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি, পত্নীর মন যোগাইতে পিতামাতা পরিত্যাগ—ইহাই আমাদের সামাজিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কাহার দোষে এমন হইয়াছে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না;—সমস্ত দোষ চাপাই নিরপরাধ

* প্রবন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলো

জীবনাত্তির ঘরে। কিন্তু এই বাঙ্গালায় যেদিনও ব্রত প্রচলিত ছিল, তখন ত' বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন এমন বিরোধের আগুনে ছারেখারে যায় নাই! তখনকার মেয়েরা ছোট বেলায় 'পুণ্যি পুকুর' ব্রত উদ্‌যাপন করিত। এই ব্রতের মন্ত্রে তাহারা বলিত—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্প মালা।
কে পূজেরে সকাল বেলা॥
আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী॥
এ ভজ্‌লে কি হয়?
নির্ধনীর ধন হয়॥
সাবিত্রী সমান হয়।
স্বামী আদরিণী হয়॥
হবে পুত্র ম'রবে না।
যমের জ্বালা পাবে না॥
পুত্র রেখে স্বামীর কোলে।
মরণ হবে এক গলা গঙ্গা জলে॥"—

স্ত্রীলোকের কাছে ইহা অপেক্ষা কাম্য আর কি থাকিতে পারে? এই সমস্ত ছড়া অবশ্যই কোন বর্ষীয়সী হিন্দু-মহিলার রচনা। সেই অজ্ঞাতনাম্না বিধান-দাত্রীর উদ্দেশে আমরা নমস্কার করি। এই স্বপ্নের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিত বলিয়াই সেকালের মেয়েরা প্রকৃত গৃহিণী হইতে পারিত, কাজে কাজেই সেকালে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে সুখ-শান্তিও ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন এই সকল আচার আচরণ দেশ হইতে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।—

নারী জীবনের এই আদর্শ আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে 'হরির চরণ' ব্রতের মন্ত্রটিতে। আমরা মন্ত্রটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হরির চরণ হরির পা।
হরি বলেন ওগো মা॥
আজ কেন গো শীতল পা।
কোন্ যুবতী পূজে পা॥
সে যুবতী কি চায়।
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়॥
অলঙ্কার-জোড়া প্যাটরা চায়।
সভা-সুন্দর জামাই চায়॥
ঘরণী রমণী বউ চায়॥
আল্‌নায় কাপড় ঝল মল করে।
ঘরের বাসন ঝক্ মক্ করে॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান!
বৎসর অন্তর পুত্র চান্॥
সিঁথীতে সিঁদুর মুখে পান।
জন্ম এয়োতে থাকতে চান্॥
না দেখেন স্বামী পুত্রের মরণ।
না দেখেন বন্ধু বান্ধবের মরণ॥
এক হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে।
থাকেন সুখে হরির চরণ তলে॥"

ছড়াটীর শেষের দিকটা পড়িতে পড়িতে একখানি শান্তিপূর্ণ পল্লী-জীবনের চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—গোলা বোঝাই ধান, পুকুর ভর্ত্তি মাছ, বাসন-কুসন অলঙ্কারে ভরা সিন্দুক, গোয়ালে গরু, মন্দিরে ঠাকুর সেবা, সলাজ-অবগুণ্ঠিতা কল্যাণী বধূর কলধ্বনিতে মুখরিত গৃহ প্রাঙ্গণ, রোগ-শোক শূন্য নিরুপদ্রব দিনাতিপাত প্রণালী—কি দিনই ছিল, আর কি দিনই আসিয়াছে! এক একবার মনে হয় কি করিলে এই ইঁট, কাঠ, প্রস্তরে গড়া, কলের ধোঁয়ায় ধূ ধূ করা বস্তুতান্ত্রিক কারখানার জগৎটা ছাড়িয়া আবার সেই 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে' ফিরিয়া যাওয়া যায়। আবার পাঁচজনকে লইয়া সেইরূপে অবাধ মিলনের মহাকেন্দ্র গড়িয়া তোলা যায়। কিন্তু থাক্ সে কথা—জাগিয়া স্বপ্ন দেখার সার্থকতা নাই!

সেকালে গো-সেবাও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। এই গো সেবা ছেলে বেলা হইতেই মেয়েরা নিজের হাতে লইত; আজ দেশে গো-চারণ ভূমি নাই, গৃহস্থের গো-সেবাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে;—তৎ-পরিবর্ত্তে আজ আমরা শিখিয়াছি গো-পেষণ। জানি না ইহা বিদেশীয় শাসকের শোষণ-নীতির প্রতিক্রিয়া কি না! কিন্তু যেদিন এদেশের মেয়েরা 'গো-কল্প' ব্রত উদ্‌যাপন করিত, তাহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতে—

"গো-কুল গো কুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে ঘাস।
আমার যেন হয় বৈকুণ্ঠে বাস॥"

এই ব্রতের মন্ত্রটী খুব কৌতুক-প্রদ—

"রোগ শোক দূর হ'ক্।
কীট পতঙ্গ দূর হ'ক্॥
তোমায় ঘুরিয়ে পাখা।
আমার হ'ক্ সোণার শাঁখা॥
তোমারে বাতাস করি।
সতীন্ মেরে ঘর করি॥"

সর্ব্বশেষ প্রার্থনাটী সেকালকার বধূদের মনোমত ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু 'সরলা অবলারা' বাস্তবিকই 'সতীন মারিয়া ঘর করিতে' পারিতেন কিনা সন্দেহ! কারণ মারামারিটার অবশ্যই এক তরফা নিষ্পত্তি হইত না!

এই স্বস্তি-বচনটি বাল্যকালে আমরাও ছোট ছোট মেয়েদের সহিত আবৃত্তি করিয়াছি। আমার একটি পর-লোকগতা বান্ধবী তার 'হবু' সতীনের উদ্দেশে বড় সুন্দর ভাবে আপনার ছোট্ট কীলটী উঁচাইয়া নাচিয়া নাচিয়া এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিত—সে কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।—

এই সকল ছড়ার কতকগুলির স্পষ্টতর অর্থ বোধ হয় না। কিন্তু শিশু সাহিত্যের 'আগডুম্ বাগডুমের' মত এই দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী গুলির আবৃত্তিতে বেশ একটা মাদকতা আছে। শিব ব্রতের পূজা-মন্ত্রে আছে—

"শিল শিলাটন শেলে বাটন, শিল অঝঝর ঝরে।
স্বর্গ হ'তে হর বলেন গৌরী ওরা কি ব্রত করে॥
নড়ে আশা, নড়ে পাশা, নড়ে সিংহাসন।
হর গৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন॥"

কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! আপনারা হয়ত বলিবেন ইহার কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। বাস্তবিকই তাহা আছে কিনা তাহা লইয়া কেহ কোন দিন মাথা ঘামাইবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। পট্ট বস্ত্র পরিয়া বর্ত্তমানের গৃহিণী পদ বাচ্যারা অনেকেই বাল্যে ভক্তি সহকারে এই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে মন্ত্র আওড়াইয়া গিয়াছেন—আমরা তাঁহাদের ভক্তি-আনত গম্ভীর মুখচ্ছবি কল্পনা করিয়া কোন সাহসে বলিব—'ইহার অর্থ নাই!' 'যম-পুকুর' ব্রতের স্নান-মন্ত্রে আছে—

"শুষনী কলমী ল' ল' করে।
রাজার ব্যাটা পক্ষী মারে॥
মারণ পক্ষী সুকোর বিল।
সোণার কৌটা রূপার খিল॥
খিল খুল্‌তে লাগ্‌ল ছড়্।
আমার বাপ ভাই হ'ক লক্ষেশ্বর॥"

শুষনী কল্‌মী 'ল'ল' করার সঙ্গে রাজার বেটার পক্ষী মারার কোন গূঢ় সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সুকোর বিলের ধারে রূপার খিলওয়ালা সোনার কৌটা আম্‌দানী করার মধ্যে বেশ একটু মৌলিকতা আছে সন্দেহ নাই! কিন্তু প্রথমাংশ যত খাপ্‌ছাড়াই হউক না কেন শেষ কথাটী বেশ স্পষ্ট এবং বক্তার উদ্দেশ্যের মধ্যেও কিছুমাত্র 'ঘুরপ্যাঁচ' নাই! উদ্‌যাপনের মন্ত্রটীতে আরও স্পষ্ট করিয়া এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

"এক ঘটী জল দিনু বাপ্ মার।
এক ঘটী জল দিনু শ্বশুর-শাশুড়ীর॥
এক ঘটী জল দিনু পাড়া পড়্‌শীর।
শেষ ঘটীটী দিনু স্বামীর আর আমার॥
সাত ভায়ের বোন আমি ভাগ্যবতী।
যম পুকুর পূজি আমি সাক্ষী জগৎপতি॥"

এত বড় বিশ্ব প্রেমের ভাব (Cosmopolitan view) এত সহজ কথায় ব্যক্ত করা গিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অথচ যিনি ইহার রচয়িত্রী তিনি সম্ভবতঃ কোন অল্পশিক্ষিতা, হয়ত বা একেবারেই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা! বাঙ্গালার গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শই ছিল এই সার্ব্বজনীনতা, এই আত্মীয় পর সকলের ভিতর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা—এই আদর্শের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে সত্য-কার জীবনের উপর দিয়া।

আর একটী ছড়ার আমরা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। উহা 'অশ্বত্থ পাতা' ব্রতের মন্ত্র—

"অশ্বত্থ পাতা পুণ্যলতা শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।" এই শ্যাম পণ্ডিতটী কে? আচার্য্য বসুর সহিত ইঁহার পরিচয়

থাকা সম্ভব, তবে আমরা আপাততঃ ইঁহাকে 'Laboratory of green leaf' বলিয়াই জানিলাম। এই ব্রতের পারণ মন্ত্র হইতেছে—

"পাকা পাতাটী মাথায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটী মাথায় দিলে সোণার বরণ হয়॥
কচি পাতাটী মাথায় দিলে নব-কুমার কোলে হয়।
শুকনো পাতাটী মাথায় দিলে সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়॥
ঝর্‌ঝরে পাতাটী মাথায় দিলে হীর-মুক্তার ঝুরি পায়ে।
উজাইতে পারিলে ইন্দ্রের শচী হয়।
না পারিলে ভগবানের দাসী হয়॥
সুখ হয়, সম্পদ হয়, স্বস্তি হয়, সাত ভায়ের বোন হয়॥"

সেই এক কথা – সেই জন্ম-এয়োস্ত্রী থাকিয়া স্বামী-পুত্র লইয়া সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার কামনা, সেই লৌকিকতা যথাবিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারত্রিক মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা!

আরও একটী ছড়া আমরা ছেলে বেলায় শুনিতে পাইতাম, সম্ভবতঃ সেটী 'সন্ধ্যামণি' ব্রত সংক্রান্ত।—

"সন্ধ্যামণি কনক তারা।
সন্ধ্যামণি জলের ঝারা॥
সন্ধ্যামণি কবে কে।
সাত ভায়ের বোন যে॥
আলো ধানে কাল পুঁতে।
জন্ম যায় যেন এয়োতে॥"

এই ছড়াটী আমাদের এখনও বেশ লাগে, আমাদের বিশ্বাস সবগুলির মধ্যে এইটীই সমধিক কবিত্বপূর্ণ;—বেশ একটা শুচি-শুভ্র কমনীয়তা ইহার প্রত্যেকটী বর্ণ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু উপস্থিত এই পর্য্যন্ত···প্রবন্ধের কলেবর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই খানেই ইহার উপসংহার দেওয়া কর্ত্তব্য।—

আজিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতি নীতির অনুকরণে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এখনকার মেয়েরা কারম্‌, লুডো, তাস খেলে, টি-পার্টি দেয়, পিয়ানো বাজাইয়া গান করে—বারব্রত নিয়ম ও সামাজিক ক্রিয়া করণ কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করে না। কাজেই তাহাদের জীবন যাপন প্রণালীও আজিকে একান্ত সামঞ্জস্যরহিত হইয়া উঠিতেছে। এজন্য তাহারা যত দায়ী, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী দায়ী আমরা। আমরা নিজেদের আদর্শ হারাইয়া অপরের আদর্শে গড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়াই তাহারাও এই দুষ্কর্ম্মে আমাদের সহযোগিনী হইতেছে।

অথচ সে বেশী দিনের কথা নহে। বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এই সব বার-ব্রত নিয়ম-লক্ষণ সারা বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত এবং এই পবিত্র আব্‌হাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া এদেশের ছেলে মেয়েরা সত্যকার বাঙ্গালী হইত। আধ্যাত্মিকতা বা নৈতিকতা হিসাবে এই সব বারব্রতের ছড়া বা হেঁয়ালীর প্রত্যক্ষ ভাবে বিশেষ দাম থাক বা না থাক, পরোক্ষ ভাবে অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া একটা জাতির চরিত্র গঠন বিষয়ে ইহারা যে 'মনুসংহিতা' অপেক্ষা ঢের বেশী সহায়তা করিয়াছে সে কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই সকল ক্রিয়া করণ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত ছড়াও লোকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। অতিকষ্টে আমরা এই কয়টী ছড়া সংগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে আসন্ন অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। নীচে কতকগুলি সাঁওতালী গান ও এই উদ্দেশ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে কোন শ্রদ্ধেয়া হিন্দু-মহিলা এই সমস্ত ছড়া ও পূজা পদ্ধতির নিয়মাবলী ধারাবাহিক সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। তাহা একাধারে সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হইবে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজিকার জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী Percy's Reliques of Old English Poetry ছাড়িয়া এই পুস্তক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবে, যেমন ভাবে তাহারা 'মহুয়া' বা 'ময়নামতীর গান' পড়িতেছে।

সাঁওতাল নাচ

না

(যখন) আকাশ ওঠে জেগে
মাদল-ছন্দে—
বাতাস মেতে যায়
মহুয়া-গন্ধে;

শালের ফুল ফোটে,
বনের ঘুম টোটে,
(তখন) আমরা নাচি গাই
মন আনন্দে।
ধাস্ রং ধাঁ, ধাস্ রং ধাঁ,
ধাঁ !

পুরুষগণ

কোদালী কাঁধে ল'য়ে আমরা মাঠে যাই,
সাঁঝেতে ফিরে আসি ঘর ;
বিলের পার হ'তে চোলাই-করা মদ
বহিয়া আনি থরে থর—
তোদের মুখ পানে চেয়ে,
আমরা নাচি গান গেয়ে,
বুকের যত আশা রঙীন্ আঁখি দিয়ে
উছলি পড়ে দর দর !
ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝম্,
ঝম্ !

নারীগণ

কুড়াতে কুর্‌চির ফুল,
উড়ায়ে দিয়ে কালো চুল,—
কোমর ধরাধরি সোহাগে জড়াজড়ি
আমরা যাই মস্‌গুল্ !
ছোবান শাড়ী গুলি,
কখন্ পড়ে খুলি,
সে কথা হ'য়ে যায় ভুল।
রিমিক্ ঝিম্, ঝিমিক্ ঝিম্,
ঝিম্ !

পুরুষগণ

চাঁদের বাঁকা আলো
পিয়াল তাল বন ঘেঁসে,
যখন নামে ধীরে
সোণার মত হাসি হেসে —
ভালুক ছাড়ে হাঁক,
মহুয়া ঝরে ;
বাঁধের কালো বাঁক,
আঁধারে ভরে ;
তোদের মুখে থাই চুম্,
চোখেতে নাহি পায় ঘুম্,
বাঁশীর মিঠে সুর মাদল ডিমি ডিমি
বাতাসে যায় ভেসে ভেসে !
তাধিন্ ধিন্, তাধিন্ ধিন্,
ধিন্।

নারীগণ

দাঁড়ায়ে এক সারি
কোমর ধ'রে,
ঝুমুর প'রে পায়
নাচি গো জোরে,
মোরগ যদি ডাকে ডাকুক সে—
মরণ যদি থাকে থাকুক সে—
চলুক নাচ গান বাঁশীর মিঠে তান
মহুয়া-মদির ভোরে।
নাটিং টিং, নাটিং টিং,
টিং

পুরুষ ও নারী

আয় গো ধরা ধরি করিয়ে হাত,
আমরা নাচি গাই সারাটা রাত,
কেবল নাচি গাই সারাটা রাত !
ঝিমিক্ ঝিম্ ঝিমিক্ ঝিম্—ঝিম্
ডিমিক্ ডিম্ ডিমিক্ ডিম্—ডিম্ !
তাধিন্ ধিন্ তাধিন্ ধিন্—ধিন্ !
নাটিং টিং নাটিং টিং—টিং !

ভাগুন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অক্ষয় বাড়ী আসিয়াছে—যে সংবাদ সে লইয়া আসিয়াছে.. অন্য সময় হইলে পিতাপুত্রে গজকচ্ছপ হইয়া যাইত, কিন্তু বেহাই-ঘটিত ব্যাপারে এখন গৃহ-বিবাদ ধামাচাপা হইয়া রহিল। অক্ষয় এল্-এ পরীক্ষার জন্য কলেজ হইতে নির্ব্বাচিতই হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ অসময়ে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা দুঃসংবাদ জাহির না করিয়া, মনের আগুন বুকে চাপিয়া তিন মাস কাল বহরমপুরেই কাটাইয়াছে। কলহের সংবাদ পিতৃ-পত্রে অবগত হইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে; সপ্তাহান্তে এল্-এ পরীক্ষা—জ্ঞান বাবু পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

অক্ষয় আসিয়াছে—তাহার আগমনে লোকের কি অনুমান সে বিষয়ে সে দৃক্‌পাতহীন; সমস্ত ঘটনা নানা মুখে শুনিয়া সেও একটা ধারণা করিয়াছে। যথাযথ স্থান পাত্র বিশেষে, কোথাও বা তর্জ্জন গর্জ্জনে গ্রামে প্রকৃত পুরুষ সংখ্যার অভাব ঘোষণা, কোথাও বা বিষণ্ণ বদনে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দান, কোথাও বা আস্ফালন পূর্ব্বক স্বীয় ভাবী কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বীরত্ব বাহুল্যের চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া সে গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিয়াছে।

সান্ধ্য রণক্ষেত্র সেই দাওয়ায় বসিয়া পিতা পুত্রে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা উপভোগ করিতেছিলেন, জ্ঞান বাবুর ক্ষতচিহ্ন তখনও বর্ত্তমান। রাজু ও গিরীন ঠাকুর ঘটনার পরদিন প্রভাত হইতেই অদৃশ্য, লোকমুখে আরও দুই একটি বিশদ অলঙ্কারযুক্ত এই সংবাদে গ্রাম মুখরিত। যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, তাই পিতা পুত্রে উভয়েই বিমর্ষচিত্ত, আসন্ন সংগ্রাম-চিন্তা অতি বড় যোদ্ধারও চপলতা নিমেষে ইন্দ্রজালে হরণ করিতে সমর্থ। শত্রু আক্রমণব্যর্থকারী প্রতিব্যূহ কি কৌশলে রচিত হইবে, এই চিন্তার মধ্যে সম্মুখে শত্রুহস্তের উদ্যত প্রহরণের অপেক্ষা না করিয়া মহাবিক্রমে পূর্ব্বেই তাহাকে বিধ্বস্ত করার ইচ্ছা জাগিতেছিল; সমস্ত কথোপকথন ও পরামর্শ ইহারই মীমাংসা লইয়া। বস্তুতঃ যতই তাহাদের স্বার্থ এক নবীনের মধ্যে পরামর্শ চলে না; তর্কযুদ্ধে পরামর্শের চূড়ান্তীকরণে কায়িক ক্লান্তিহীনতা ও ধৈর্য্য প্রাচীনের প্রধান সহায়; হইলও তাহাই, আহারান্তে শয়নের পূর্ব্বে ও অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া অবশেষে নিদ্রাবেশে অক্ষয় পিতার মতে মত দিল—'দেখা যাক্ না উহারা কতদূর অগ্রসর হয়, তখন যথাবিহিত ব্যবস্থা; উহারা মূর্খ ছোট লোক, কিন্তু আগে হইতে গায়ে পড়িয়া কিছু করিতে গেলে সকলে উহাদের দিকে টানিবে।' ক্রমশঃ দুইজনে নিদ্রিত হইলে কক্ষে চির বিখ্যাত ছলনাময়ী শুষ্ক নিশ্চিন্ত শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

প্রভাতে যে শব্দে দুইজনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহা আরোহী ভারাক্রান্ত শিবিকাবাহী বেহারাদের কণ্ঠ নিঃসৃত, কিন্তু দুইজনেরই স্বপ্নপ্রবাহ তখন এমন প্রণালীতে চলিয়াছিল যে বাস্তব কল্পনার ধাঁধায় উত্থান-শক্তি রহিত, তাই বেহারা ও সহচরবর্গ পাল্কী দ্বারদেশে বিনা বাধায় নামাইতে পারিল—প্রথম পর্য্যায় এইরূপে সমাপ্ত। অভদ্র বর্ব্বর শত্রু ইহারা, নচেৎ যুদ্ধের সময় নিরূপণে কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তবে ভদ্রলোক পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হন। পিতা পুত্রে তখন নীরব কথোপকথন চলিতেছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

পিতা—'বাইরে গিয়ে ব্যাপার কি দেখ না?' পুত্র—'ব্যাপার কি বোঝাই যাচ্ছে আপনি বেরিয়ে কথা কন।'—'তুমি যাও।'—'আমার গরজ নেই, এই জন্যে আগেই বলেছিলাম।'—'এখন কি করা যায়।'—'আগেই বলেছিলাম।'—'এমন জানলে—।'—'আগেই বলেছিলাম।'

পূর্ব্বোক্ত বালক বাহিরের ঘরে শয়ন করিত, মনুষ্য কোলাহলে জাগ্রত হইয়া হাঁকাহাঁকিতে দরজা খুলিয়া দিল, জ্ঞান বাবুও নির্গত হইলেন, কিঞ্চিৎ পশ্চাতে আত্মগোপনপ্রয়াসী অথচ উৎকণ্ঠা-জর্জ্জরিত-অন্তর অক্ষয়।

তখনও স্পষ্ট দিন হয় নাই, আনাচে কানাচে আলো অন্ধকারের বিক্ষিপ্ত সেনারাজির মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে, একটি

[illegible] ও অপরিচিত পাল্কী দরজার সম্মুখে রাস্তার উপর নামান

বাহক ও সঙ্গীগণ অস্পষ্ট আলোকে ঝাপসা, একজনকে কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝা যাইতেছে।—সেই স্ত্রীমূর্ত্তি এইবার অতি পরিচিত নাপিত মাসীর পরুষ কণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, "ঠাকুর, রাস্তা আগলে দাঁড়ালে কেন? নাও, বেটার বৌ ঘরে তোল; বেয়ান কি ছাড়তে চায়—মেয়েও খুব কেঁদেছে; সর, আমি বৌমাকে থিতু করে তবে যাব, ঘরে তো শাশুড়ী ননদ বলতে কেউ নেই। ঘরে লক্ষ্মী না থাকলে কোন দিকে জুত নেই ঠাকুর—।" এইবার প্রলয় বিষাণ বাজিল, জ্ঞান বাবু যদি মানুষ না হইয়া একটি বোমা হইতেন আর সেইখানে বিদীর্ণ হইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় এত জ্বালা উদগীরণ করিতে পারিতেন না; সে ভাষা মার্জ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে গেলে কাগজ সাদা থাকিয়া যাইবে, অক্ষরে অক্ষরে লিখিতে গেলে তাহার তাপে কাগজ পুড়িয়া ছাই না হউক—ক্ষত বিক্ষত হইবে। জ্ঞান বাবু একবার তাণ্ডবের অনুকরণ করিলেন, নাপিত মাসী 'শত হস্তেন' পন্থাবলম্বন প্রয়াসী না হইলে জ্ঞান বাবু এদেশে 'ট্যাঙ্গো'র প্রথম প্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন। চীৎকারের পর্দ্দায় পর্দ্দায়, শক্তি সম্পন্ন অর্থযুক্ত অলৌকিক শব্দমালার অনর্গল প্রবাহ মহাপ্লাবনে ভাসিয়া চলিল; দুই মিনিটের মধ্যে নাপিত মাসীর লেশমাত্র সে স্থানে রহিল না, বেহারাদলের পদচিহ্ন মাত্র রহিয়া গেল; কেবল পাল্কীর দরজার সম্মুখে একটী স্থির পুরুষ মূর্ত্তি এখনও দণ্ডায়মান, সে বোধ হয় বিরাট পেষণে পাথর হইয়া গিয়াছিল, সে রাজু।

পিতার পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক কার্য্যে ব্রতী পুত্র এইবার অগ্রগামী হইল। রাজু জ্ঞান বাবুর উদ্দেশে বলিল, "কাকাবাবু আর রাগ কেন? বৌমার কি দোষ, সে কি পরের বাড়ী ভাত রাঁধতে কলকাতা গেছলো—সমস্ত রাত কষ্ট পেয়েছে এখন ঘরে নিতে অনুমতি করুন—।" জ্ঞান বাবু হাত দু'টি দিয়া আপন মনে জ্যামিতির চিত্রাঙ্কন করিতেছিলেন—মুখে বলিলেন, "এখনও পেট ভরেনি বুঝি তোর—এর পর তোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব—যা, গ্রামে আর মুখ দেখাস্ নি, মানে মানে সব শুদ্ধ বিদায় হ'য়ে যা, তোর চোদ্দ পুরুষ এলেও আমি ও রসুয়ের মেয়েকে বাড়ীতে স্থান দেব না—থাক্ ওখানে।"—"আজ্ঞে সেটা কি ভাল দেখাবে—তবে আপনার ইচ্ছে।" এই বলিয়া রাজু চতুঃপার্শ্বস্থ লোকসমাগমের মধ্যে মিশিয়া গেল।—

চারিদিকে পরিচিত মুখ, কিন্তু সকলেই "হতভম্ব—এইরূপ প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ব্যাপার সুঠাম জীবনে অভ্যস্ত তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর। জ্ঞান বাবুর রণলিপ্সা তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে নিস্ফল রোষে গর্জ্জায়মান—অক্ষয় ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল—অস্বচ্ছন্দতা পীড়াদায়ক হইতেছে দেখিয়া জ্ঞান বাবুও পুত্রের অনুগামী হইলেন—দর্শকবৃন্দ সংখ্যায় পাতলা হইতেছিল রাজুর প্রস্থানের পর মাতব্বর আর কেহ সেখানে ছিল না—বাদ বাকী কেবল প্রস্থানের কৌশল অবগত না থাকায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারা নগণ্য লোক, এখন তাহারাও যে যাহার মত চলিয়া গেল।—

কিয়ৎ পরেই জ্ঞান বাবুর গৃহদ্বার সশব্দে অর্গলবদ্ধ হইল। ভিতর হইতে অবৈতনিক ছাত্রের একটা আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ক্রমশঃ শান্ত হইয়া গেল।—পথের উপর প্রথম রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে—পাল্কী একটা প্রাণহীন জীবের মত রাস্তায় পড়িয়া আছে।—

গৃহ অভ্যন্তরে জ্ঞান বাবু স্থিরসংকল্প, অক্ষয়ের মনে নানা বিচিত্র ভাবের স্তূপাকার মিশ্রণ। জ্ঞান বাবু পুত্রকে আদেশ করিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব বেহারা যোগাড় করিয়া আনিতে হইবে ও পাল্কী ফেরৎ রওনা করিয়া দিতে হইবে।—"হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়, পাল্কী রওনা ক'রে তবে জল গ্রহণ, খরচা কিছু লাগে কি করা যাবে, অদৃষ্টের লিখন না হয় খণ্ডন। সদর দরজা যেন খবরদার খোলা না হয়—আমি যাচ্ছি বড় বাবুর কাছে বিহিত করে আসব। দে মোটা লাঠিটা সঙ্গে নেই, সেই গিন্নিটাকে দেখলে মাথা ফাটিয়ে দেব"—

খিড়কীর দরজা দিয়া প্রথমে পিতা ও অল্পক্ষণ পরে পুত্র বাহির হইলেন। অক্ষয় বাগ্দীপাড়া অভিমুখে চলিল।—

জ্ঞান বাবু দেখিলেন ব্রজকিশোর সানুচর তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, সুতরাং তিনি সোজাসুজি ছোট লোকের আস্পর্দ্ধার কথা পাড়িলেন; রাজুর বেয়াদপি যে সহের মাত্রা ছাড়িয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করাতেই ব্রজকিশোর রাজুর বুঝিবার ভুল করিতে তৎপরতার নিদর্শন দিয়া একটি গল্প শেষ করিয়া আর একটি আরম্ভ করিতে যাইবেন, জ্ঞান বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তবে আমি

কি করব, গলায় দড়ি দিয়ে মরব কি? ভদ্রতা রইল না, মুখ দেখাব কি করে ছোট লোকের মুখ নাড়া খেয়ে?" ব্রজকিশোর যেন সে কথায় কান না দিয়াই বলিলেন, "রাজুটা একেবারে ক্ষ্যাপা, তবে মনটা ভাল।" জ্ঞান বাবুর উচ্ছ্বসিত বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া ওস্তাদজী বংশীধর মিশ্র বলিলেন, "গড়বড় যা হবার সে হয়েছে এখন অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করলে কি ভাল হবে, কেবল লোক হাসবে; আপনি লেখাপড়া-বালা লোক, কুটুম্ব সম্বন্ধ কি চিরকাল দুষমন রাখতে আছে—যান, ঘরের কথা ঘরে রেখে বহুকে সোয়ারী থেকে ঘরে নামিয়ে নিন্।" ব্রজকিশোর বলিলেন, —"সেই ঠিক কথা, আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারী আরও গড়াবে, আপনি ঘরে ডেকে নিন্—।" ইন্দ্র সরকার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আর তা ছাড়া দেশে আইন কানুন আছে, আমরা আর কতটা ঠেকাতে পারি—সরকারী রাস্তা, পাল্কীর মধ্যে আপনার পুত্র-বধূ, শেষে একটা জরিমানার ধাক্কা না সামলাতে হয়—কেউ একবার সদরে চুগলি করে এলেই ব্যস্, তখন সামাল সামাল, এখানকার দারোগা আমাদের মানে বটে কিন্তু চাকরী খোয়াবে না—।" জ্ঞান বাবু মরিয়া হইয়া বলিলেন, "রায় মহাশয়, আমার অপমানের কি ব্যবস্থা হবে, বুড়ো বয়সে গ্রাম ছাড়া করবেন?" ব্রজকিশোর বলিলেন, "অমন কথা মুখে আনবেন না, ছিঃ—আপনি কাছারী বাড়ী থেকে হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে যান্—যে বেহারা বেটাদের এত স্পর্দ্ধা পাল্কী এনেছে, তাদের দিয়েই ফেরৎ পাঠাব—আপনি তাদের চিনে বার করুন; কিন্তু একটা কথা, যত শীঘ্র পারেন। দুপুর পর্য্যন্ত যদি না পারেন তবে বৌমাকে ঘরে তুলে নিতে হবে; প্রাণী হত্যা হতে দিতে পারব না আর একটা নালিশ ফ্যাসাদেও যেতে পারব না—জরিমানা হয় সেও আপনাকে দিতে হবে।" জ্ঞান বাবু আর কাল বিলম্ব করিলেন না, কাছারী বাড়ী হইতে আহুত হইয়া হরিহর তাঁহার অনুগামী হইল।

নাপিতমাসী ঘরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেছিল, জ্ঞান বাবুকে দর্শন মাত্রেই ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভ্যন্তরে ছুটিল, ঝণাৎ শব্দে দরজা বন্ধ করিয়া পা ছড়াইয়া উচ্চরোলে কাঁদিতে বসিল। মৃত স্বামীকে পুনঃপুনঃ পরলোক হইতে বিস্মৃত পত্নীর দুঃখ দর্শন ও তাহার নশ্বর দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আহ্বান কিয়ৎকাল শ্রবণ করিয়া জ্ঞান বাবু ত্বরিত পদে কামার বাড়ী, চন্দ্রপাঠকের দোকান ইত্যাদি ঘুরিয়া বুঝিলেন, সেদিনকার বেহারাদের পরিচয় বাহির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অগত্যা অক্ষয় বেহারা যোগাড় করিয়া আনে কি না জানিবার জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা করাই সমীচীন বোধে হরিহরকে বিদায় দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।—অক্ষয় তখনও আসে নাই, জ্ঞান বাবু স্নান সমাপন করিলেন, রন্ধনের প্রবৃত্তি ছিল না, ঘর দাওয়া করিয়া অক্ষয়ের অপেক্ষায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

অক্ষয় বাগ্দীপাড়ায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, যাহারা বেহারার কাজ করে কতক বা বাতরোগে ব্যবসা ছাড়িয়াছে, কতক বা কর্ম্মান্তরে অনুপস্থিত; অক্ষয় অনুনয়ের পালা শেষ করিয়া কড়া সুর ভাঁজিল, একজন প্রবীণ উত্তর দিল, "বাবাজী, তোমাদের রাজায় রাজায় যুদ্ধ, শেষটা উলুখড়ের কেন প্রাণ যাবে, তুমি পাল্কীর সঙ্গে যেতে পার তাহ'লে বেহারা হতে পারে, না হ'লে কে কোথায় ফ্যাসাদে পড়তে যাবে!" অক্ষয়ের আর ঘাঁটাঘাঁটিতে স্পৃহা ছিল না। নিজের বন্ধু যাহারা তাহাদের নিকটও এ সময় যাইতে, এই পরাজিত দুর্ব্বল লাঞ্ছিত বেশে—তাহার মন চাহিল না; বিষণ্ণ বদনে সে ফিরিল।

চন্দ্রপাঠকের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহার সাগ্রহ আহ্বানে অক্ষয়কে দোকানের রোয়াকে উঠিতে হইল। চন্দ্র-পাঠক হাত নাড়িয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "বুড়োর না হয় ভীমরতি ধরেছে, তোমার চুপ করে থাকা কেন? সাতপাক দিয়ে গিন্নী করেছ এখন তাকে নিয়ে ঘর করতে ভয়; এসময় পিতৃভক্তির বহর একটু কম কর বাবা; এ রামচন্দ্রের ত্রেতা নয়, ভীষ্মেরও দ্বাপর নয়—কলিকাল।" অক্ষয় যেন কি একটা খুঁজিয়া পাইয়াছে এই ভাবে হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এই কথাটা তাহার এতক্ষণ মনে আসে নাই কেন? পিতৃভক্তির দোহাই দিয়া তাহার হৃত গৌরব সহজেই পুনরুদ্ধার হইবে, বন্ধু মহলে আর বাধ বাধ লাগিবে না—সে কি স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে অপমান করিতে গিয়াছে? এরূপ নীতিগর্হিত কার্য্য তাহার উচ্চশিক্ষার অনুযায়ী নহে, কেবল বাপের খাতিরেই এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আছে; কিন্তু আর নয়, এখন নিজমত ব্যক্ত ও চালিত করিতে হইবে। এইরূপে সে গ্লানিকর পরাজয়ের বদনামের হাত;

এড়াইবে। পিতৃভক্তিতে সংযত আচরণ ও সংহতবাক্ নিরপেক্ষ দর্শকের আসনে নিজেকে বসাইবে; সে কল্পনা-তেই আত্মাভামার দীপ্তি মুখে ফুটিয়া উঠিল। সকলে নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে অক্ষয় ইচ্ছা করিলে ও অন্যায় বুঝিলে সেই বেহারাদের কাণ ধরিয়া পাল্কী ফেরৎ পাঠাইতে পারিত; কেবল পিতাকে অসম্মান করা হয় জানিয়াই সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু অন্যায় সে কিছুতেই নিজে করিতে পারে না, বাপের জন্যও না। এইরূপ ভাবিয়া অক্ষয় চন্দ্র পাঠকের কথায় বলিল, "ঠিক কথা, আর চুপ করে থাকা গর্হিত হবে—পিতৃভক্তির একটা সীমা আছে—তাঁর চিঠি পেয়ে পরীক্ষা না দিয়েই চলে এলাম, একটু অন্যায় হয়েছে বুঝছি—কিন্তু আর অন্যায় কর্ব্ব না; একে নিজের ক্ষতি ত' করেইছি—এলে পাশ এবার আমার আট্‌কাত কে? আর বাবার কথায় পড়ে সবার ক্ষতি কর্ত্তে পার্ব্ব না।—আমি চল্লাম।"

অক্ষয় বাড়ী পৌছিল, পিতা পুত্রের মুখ দেখিয়া সব বুঝিলেন—উভয়ের আর বাক্য বিনিময় হইল না। খিড়কীর দরজা দিয়া তিনি অভুক্ত ইস্কুলে চলিয়া গেলেন; বালক সদর দরজা খুলিয়া, অক্ষয়ের আদেশ মত গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে তুলিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আহারে বসিয়া জ্ঞানবাবু রন্ধনে বামুন-কন্যার উপকারিতা উপলব্ধি করিলেন, ব্যাপার আপাততঃ আর গড়াইল না! গভীর নিশীথে দুইজন পুরুষ নিঃশব্দে শূন্য পাল্কী স্থানান্তরিত করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্র পাঠকের দোকান বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার গল্প-প্রিয়তা চরিতার্থ করিবার জন্য, গল্পামোদী দুই একজন নিয়ত হাজির থাকিত, ক্রেতাদের অল্প বিস্তর ভিড় তো লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যার সময় গুলজার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, আলোচনা, সংবাদ আদান প্রদান, মন্তব্যাদি প্রকাশ এই সকল সামাজিক জীব, মানুষ মাত্রেরই প্রয়োজন, তাহার সহিত ব্যক্তিগত বিষয় কর্ম্মাদির নিষ্পত্তি এই সমস্তই, এই মজলিসের নিত্যনৈমিত্তিক ধারা। বোধ হয় এই ধরণের [illegible] পর্য্যবেক্ষণেই দৈনিক সংবাদপত্রের আদি প্রতিষ্ঠাতাগণ উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

দোকানে সন্ধ্যার ধূনা দিয়া 'পাঠক' যখন অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনে নিবিষ্ট হইতেন, তখন হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কেহ নুন, কেহ দেশলাই, কেহ বা কচিৎ কেরোসিন ইত্যাদি ক্রয় করিতে আসিয়া অথবা একাদশী কবে, পূর্ণিমা কখন ছাড়িবে ইত্যাদি তথ্য জানিতে আসিয়া দুই এক দণ্ড কাটাইয়া যাইত। মাঝে মাঝে সংযোগ বিশেষে সুর দীপকে উঠিলে দোকানদার শশব্যস্তে গভীর মল্লারে সে সুর শীতল করিতেন; কখন বা বাছা বাছা অল্প সংখ্যক লোক থাকিলে চাপা গলায় আলোচনা চলিত, সে সকল প্রকাশ করিলে গ্রামে সতীর অভাব জানিয়া লোকে চমকিত হইত।

নীলমণির গাঁজার আড্ডায় কে নূতন সভ্য হইল, কংসের পালায় এবার কাহার কি সাজা উচিত, ললিতকিশোর পিতার দোষগুণ কতটা পাইয়াছে, বর্ষা উপস্থিত মাসে হওয়া সম্ভব কি না, খেয়াঘাটে যে পশ্চিম দেশীয় মাড়োয়ারী আড্ডা গাড়িয়াছে তাহার এত খন্দকুটা খরিদ করিবার মতলব কি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কেমন লোক, মেম তাঁহার স্ত্রী না ভগ্নী—এইগুলি অবধার্য্য বিষয় সকলের অন্যতম।

চন্দ্র পাঠকের দোকান যে ভূরি ভূরি দ্রব্য সরবরাহ করিত তাহা নহে, কারণ গ্রামে ক্ষেত্রজাত সকল আবশ্যকীয় শস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা পাড়া বিশেষের নিকট সর্ব্বদাই মজুত; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপকরণের অভাব ততটা তীক্ষ্ণ হয় নাই, নূতন ধরণের কলিকাতার আমদানি তৈজসাদির ব্যবহারও ততটা সড়গড় হয় নাই। তবে চন্দ্রপাঠকের দোকান ছিল, হোয়াইটওয়ে ও বেজল ব্যাঙ্কের সংমিশ্রিত গ্রাম্য সংস্করণ, উপসংহারে ষ্টেট্‌সম্যান্ অধিকন্তু ফাউ; চীনা সিঁদুর হইতে নয়হাতি বিলাতী ধুতি, বিবিধ শাড়ী; টেঁপি আলোকাধার হইতে কোদাল কুড়ুল; শীল নোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কাগজ, মসলা প্রয়োজনমত নিমেষে সরবরাহ হইতে পারিত। চলতির মধ্যে নুন, দেশলাই কেরাসিন আবার আধখানা হইতে দশবিশখানা নগদ ধারও পাওয়া যাইত।

বহির্বাণিজ্যের ধারা তখনও শ্রীনগরের জীবনকে সমস্যা-ময় করে নাই, পুরাতন কেনা বেচার শৃঙ্খল অটুট আছে, গ্রামসমৃদ্ধি একই অবস্থায় রহিয়াছে। গ্রামে গরু বলদের

সংখ্যা অধিক হইলেও গরুর গাড়ী অল্পই ছিল, স্থায়ী ভাবে মোটে দুইটী, একটি চন্দ্রপাঠকের সম্পত্তি অন্যটি ধীরেন মণ্ডলের, সে নিজে চালাইত।

আজ সপ্তাহখানেক হইল 'দুই বেহাই সংবাদ' সকলেরই মুখ ও শ্রুতিরোচক আলোচনা হইয়াছে—তিনু সেখ লোহার কাঁটা কিনিতে আসিয়া কলরবে যোগ দিয়া বলিল, "বেহারাদের তল্লাস আজ পর্য্যন্ত মিলল না, গাঁয়ের মধ্যে আটটা মনিষ্যি তাদের সন্ধান কেউ জানে না, ধন্যি গয়লার পো—ওস্তাদ বটে।" মধু বাগদী গামছায় নুন বাঁধিতে বাঁধিতে ঝাঁকাইয়া উঠিল, "গয়লার পো কি কর্ব্বে আবার, সেই বামুনের কারসাজি, সব ভিন্ গাঁয়ের লোক, যেমন এল তেম্নি গেল—" গজ্ গজ্ করিতে করিতে মধু চলিয়া গেলে উমা নাপিত একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "যাই বল, ছোট লোকের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়; তেনারা ভদ্দর, আমাদের কোমর বেঁধে মুখোমুখী হওয়া ধর্ম্মে সইবে কি?" তিনু সেখ—"বাবা যেমনটি তার তেমনটি হয়েছে, আর বছর সে ছেলেটা পড়া বলতে পারেনি বলে তাকে কি মার মেরেছিল মাষ্টারবাবু—ভারী বদরাগী।" উমা—"তাই বলে রাজু তাঁকে অপমান কর্ব্বে, এর সঙ্গে তার কি, আমাদের অক্ষয় কিন্তু রাজুকে সহজে ছাড়বে না, রাণীমাও গয়লাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না—বলে কুকুরকে নেই দিলে মাথায় ওঠে।" এই সময় অক্ষয়ের পাশের প্রসঙ্গ উঠাতে চন্দ্র পাঠক বক্তৃতার সুযোগ পাইলেন, "আরে শোন নি আমাদের অক্ষয় পাশ দিতে যাচ্ছে এমন সময় বাপের চিঠি—শ্বশুর মারপিট করবার ভয় দেখাচ্ছে বাড়ী চলে এসো—পত্রপাঠ বেচারীর মাথা থেকে পাশ আর ছাই পাঁশ, মাষ্টারেরা কত সাধাসাধি কল্লে, বন্ধুরা পায়ে পর্য্যন্ত ধরলে; বলে কি, তুমি পাশ না দিলে আমরা কেউ দেব না, কিন্তু—'পিতৃসত্য পালিবারে বনে যান রাম'—অক্ষয় সে ছেলেই নয়, সোজা চলে এল; এখানে এসেও আমায় বল্লে, বাবা অন্যায় কর্চ্ছেন কিন্তু কি করি আমায় চুপ করে থাকতে হবে, বাবার বিরুদ্ধেও যাব না, অন্যায় কাজে যোগও দেব না—শেষটায়—আমার একটু মানে কিনা, আমি অনেক বোঝাতে তবে বাপকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা কল্লে।"

একটা ষেয়াড়া লম্বা পুরুষ, হাত পা বাঁশের লাঠির মত, মাথার চুল আধ-পাকা, দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চঞ্চল চক্ষু যেন সদাই আততায়ীকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, আক্রমণের অপেক্ষায় সতর্কতা ও নির্ভীকতা জানাইতেছে। সে ধীরেন মণ্ডল—খৃষ্টান।

তিনু সেখকে দেখিয়া মণ্ডল গর্জ্জিয়া উঠিল, "আচ্ছা শেঠো লোক তুমি—ছোঁড়াটা রোগে পড়েছিল, আর তুমিও যাই ধরলে—আমি কদ্দিক সামলাব? তোমায় গাছ কটা কাটতে দিলাম তা গুড়টা আজ পর্য্যন্ত দিলে না; দুদিন বাদে, দুদিন বাদে, করে ফেলে রেখেছ—তোমার দোরে বেলান্ত কাজ ফেলে কত হাঁটাহাটি করব—সাফ্ জবাব দাও, দেবে কি দেবে না?"

তিনুসেখও কম পাত্র নহে, সে সমান জোরে হাঁকিল, "আরে নাও ভারি তোমার দুপয়সার গুড়, যাদের এক ভান্ গাছ কাটলুম্ তারাও এত চোখ রাঙায় না; ফেলে দেবো, ফেলে দেবো।" ধীরেন তিনুর দিকে আগাইয়া গেল, "ফেলে দিবি? দে, এখুনি দে; দিয়ে তবে বাড়ী যা।" "কেন? মারবি নাকি, ভারি তেজ।" সকলে মিলে উভয় পক্ষকে শান্ত করিল; তিনুসেখ লোহার কাঁটা লইয়া চলিয়া গেলে ধীরেন কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া পাঠককে বলিল, "আরও কিছু দিতে হবে, না হলে চলে না।" পাঠক—"তা বেশ, যা দরকার নে; কিন্তু আমি বলি এদিকে হলোও ঢের, তুই আমায় গাড়ী গরু জোড়াটা বেচে ফেল না।" ধীরেন—"ঢের হলেও তোমার কাছে মাল রয়েছে, তোমার ভাবনা কি? আমি কি আর সবার মত শুধু হাতে পাচ্ছি—গাড়ী গরু আমি বেচব না। বাড়ীতে সব পড়ে, একটু চট্‌পট্ দাও।"

ধীরেন মণ্ডল পথের মোড়ে অদৃশ্য হইলে কে একজন ক্রেতাদের মধ্যে বলিয়া উঠিল, "আরে হবেই তো ওর যত দুঃখ কষ্ট; বলে ধর্ম্মকে তুচ্ছ করলি, বাপদাদার জাত জলে দিলি—তিনি কি চুপ করে বসে আছেন?"

ধীরেন মণ্ডল কাহারও নিকট পাওনা থাকিলে সহজে আদায় করিতে পারিত না, আবার সর্ব্বস্থলে তাহাকে অগ্রিম মূল্য দিয়া ঈপ্সিত দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হইয়াছিল চন্দ্রপাঠকের নিকট, সেখানে অলক্ষ্য ধীর শোষণ-প্রণালীর প্রয়োগ চলিতেছিল। তাহার

চাষ বাগান গাড়ী গরু পুত্রাদি থাকা স্বত্ত্বেও তাহার সংসার যাত্রা সুখকর ছিল না, ঋণ ভারে অবসন্ন না হইলেও ক্ষুদ্র বিস্ফোটকের টাটানির মত ঋণ সর্ব্বদাই তাহাকে ব্যাকুল রাখিত। ধীরেনের বয়স ষাটের দ্বার দেশে, স্ত্রী চির রুগ্না, বড় ছেলেটি সহরে মিশনারি স্কুলে দারওয়ানী করে—বাকী দুই পুত্র পিতার নিকট থাকে, ছোটটি হাবা ধরণের, তাহার বিবাহ হয় নাই; মধ্যমের বিবাহ জ্যেষ্ঠেই দিয়াছে। তিন পুত্র ছাড়া ধীরেনের এক কন্যা ছিল, তাহাকে লইয়াই মণ্ডলের জীবন ইতিহাস, সে অনেক কথা। ধীরেন নিবিষ্ট চিত্তে সেই পুরাতন কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে; তাহার জীবনের প্রথম শিশু এই কন্যা, তখন গ্রামে ধীরেনের সমকক্ষ কে ছিল? চাষ আবাদ, দৈহিক শক্তি, পরাক্রমের খ্যাতি সকল বিষয়েই সে সেরা, সেই সময়ের এই কন্যা, তাহার জন্য মাতা পিতার কত আনন্দ, তাহার মধ্যে কত নব লক্ষণের নিত্য প্রকাশ, কত নবীন গুণের নিত্য আবিষ্কার, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া দাম্পত্য-জীবনের সার্থকতা কত নব নব রূপে কত অভিনব অনুভূতিতে নিত্য সার্থক, পিতা মাতা বিভোর; সেই কন্যা কত সাধের কত ঘটার বিবাহান্তে বৎসর না ঘুরিতে হইল বিধবা; তা হউক সরল ভাগ্যহীনা তাহাদেরই কাছে, তাহাদেরই আদরে ছিল; কিন্তু কীট কুসুমের সৌন্দর্য্য ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিতে কাতর নহে—স্মৃতি মাত্র মণ্ডলের শ্লথ শিরাগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, মন্থর গতি অজ্ঞাতসারে ক্ষণিকের জন্য দ্রুত হইল—আবার চিন্তা, অতীত, কুসুম—তাহার পর সে কি অপমান! গ্রামব্যাপী আন্দোলন, ছিছিকার, বাহিরে এই আর অন্তরে দারুণ মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ, ব্যর্থ রোষ, প্রতিকারহীন অন্যায়ের উৎকট জ্বালা—অগ্নির যদি কোনও স্থায়ী কঠিন অবস্থা থাকে তবে তাই বক্ষে সেই সময় সে অনুভব করিয়াছিল; আর সকলের সঙ্গে মাতার অবিরাম আর্ত্তনাদ, গলাচেরা, বুক ফাটান অনর্গল হাহাকার, বোধহীন আত্মহারা যেন এক দুরন্ত পিশাচের স্বাধীন সত্তা; পথে ঘাটে এমন কি বাড়ী বহিয়া আসিয়া লোকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছে, কুশল প্রশ্ন, গাল গল্পের অন্তরালে বিষের পিচকারী উন্মাদকারী ঐক্যতানের জোর সঙ্গত।

ধীরেন কন্যাকে প্রহার করিল, স্ত্রীকে মারিল, পথে দুই এক জনের সঙ্গে বচসা হওয়ায় তাহাদের ঠেঙ্গাইয়া দিল, তারপর রোগে শয্যাশায়ী হইল। উত্থান-শক্তি ফিরিয়া আসিবার পর দেখিল কন্যা নিরুদ্দেশ; স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে চির জীবনের জন্য শয্যাশায়ী; অন্য সন্তানগুলি ক্ষুধায় ছটফট করিতেছে—পথে ঘাটে সম্ভাষণ-শূন্য আক্রোশপূর্ণ দৃষ্টি, সম্বৎসরের সঞ্চিত শস্য, মাঠের ফসল সমস্ত লণ্ডভণ্ড, জাতের পাঁচজন মাতব্বর আসিয়া গম্ভীর ভাবে পরমর্শ দিল প্রায়শ্চিত্ত করিতে, সে পরামর্শের আড়ালে আদেশ ছিল, শাসনের ইঙ্গিত ছিল—ধীরেন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া তাহাদের অপমান করিয়া খেদাইয়া দিল, ধোপা নাপিত বন্ধ, জীবিকা নির্ব্বাহ উৎপাত সঙ্কুল—সে দিন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, যেদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনের আগুন টানিতে টানিতে বিরামহীন পথের শেষে সহরে উপস্থিত হইয়াছিল—রাস্তার মোড়ে পাদ্রী সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ, জনতা, বক্তৃতা—তাহার কল্পনা-চক্ষু যেন পষ্ট দেখিতেছে। ধীরেন একটু থতমত ভাবে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইল—সে বহু কালের কথা—ধীরেন আবার চলিল।

চলিতে আরম্ভ করিতেই আবার অতীতের কাহিনী চলচ্চিত্রের ন্যায় সম্মুখে প্রকট হইল। সে আজ আঠারো বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, সহরে পঁহুছিয়া ধীরেন ঠিক করিল সে খৃষ্টান হইবে; তখন বঙ্গে মিশনারীদের প্রচার কাণ্ডের অপরাহ্ন-পর্য্যায়, উৎসাহ তখনও মন্দীভূত হয় নাই—গ্রাম হইতে পরিবারস্থ সকলকে আনিয়া ধীরেন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল—শিশুরা বাদ প্রতিবাদের ধার ধারে না, কেবল অসহায় চিররুগ্না স্ত্রীর মনের ব্যথা প্রকাশ না পাইলেও ধীরেনের অজ্ঞাত রহিল না।

পাদ্রী সাহেব তাহাদের সহরে রাখিবার চেষ্টা করিলেন, এমন একটা পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক দুইই; কিন্তু ভিটে বাগান ক্ষেতের মায়া ধীরেন কাটাইতে পারিল না,—এক মাসের সহর বাসের পর আবার স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল; পাদ্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক ক্ষতিরই পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন—কেবল দুইটী ক্ষতির উপায়ান্তর ছিল না, একটি তাহার কন্যার কলঙ্ক আর একটি গ্রামব্যাপী শত্রুতা-প্রবৃত্তি; এমন কি গ্রামের জমিদারেরও বিষ দৃষ্টি তাহাকে

খুঁজিয়া বেড়াইত; পাদ্রী ও ম্যাজিষ্ট্রেট এক জাতির এক ধর্ম্মের লোক না হইলে, ধীরেনকে গ্রাম হইতে সবংশে উচ্ছেদের চেষ্টা প্রকাশ্যেই করা হইত। তদবধি কেবল মাসে একবার সপরিবারে সহরে রবিবারের গির্জ্জা করিতে যাওয়া ও জ্যেষ্ঠ পুত্রটির চাকরি উপলক্ষে সহরেই অবস্থান ছাড়া তাহাদের গ্রাম্য-জীবন অব্যাহতই আছে। দিনের পর দিন জীবনের নূতন নূতন ঝড় ঝঞ্ঝার পরিচয় ও সঙ্গে সঙ্গে তৎ সকলের প্রতি অবজ্ঞার মাত্রা বৃদ্ধি হইতে হইতে তাহার সমস্ত অভ্যাস সরল হইয়া আসিতেছে, এমন সময় নিয়তি আর এক মহা অস্ত্র প্রয়োগ করিল—তের বৎসর পরে নিরুদ্দিষ্ট কন্যা দেশে ফিরিল—শুধু কি তাই; তিলক ফোঁটার বাহারে বৈষ্ণবী বেশের চূড়ান্ত আর সঙ্গে রূপে ঝলমল কন্যারত্ন। হরিমতী তাহার মৃত স্বামীর দরুণ পরিত্যক্ত জীর্ণ ভিটায় আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পর দীর্ঘ কতিপয় ঘণ্টা-ব্যাপী ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা ও মনের বিদ্রোহ দমনে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়া ধীরেন গভীর রাত্রে নিভৃতে সন্তর্পণে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, কিন্তু হরিমতী তাহাকে খৃষ্টান বলিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিতে নিষেধ করিল—ধীরেন তাহাকে অনেক বুঝাইল; খৃষ্টান ধর্ম্মের মোটামুটি যে দুইটি গৎ তাহার বুদ্ধির আয়ত্ত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না—অনুতপ্ত চিত্তে পিতার আশ্রয়ে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ছায়ায় আহ্বান—হরিমতী ঘৃণায় উপেক্ষা করিল, এমন কি চীৎকারে লোক জড় করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিল।

সেই দিন হইতে ধীরেনের অন্তরে যেন অচেনা একজন আশ্রয় লইয়াছে—তাড়াইলেও সে যাইতে চাহে না, 'বিদে'র 'জো'না হইতেই কেবল জিদের বশে, জানিয়া শুনিয়াও ছেলে দুইটাকে ভিজে মাঠে সে বিদে দিতে পাঠায়; সেই দিন হইতে কাজে কর্ম্মে বিশৃঙ্খলায় অলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ সুরু হইল—কিছুতেই এই নাছোড়বান্দা অচেনাকে স্থানচ্যুত করা গেল না, দিনের পর দিন তাহার প্রতাপ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। —হরিমতীর সুকণ্ঠ ও নূতন গানের পসার গ্রামের অন্দর মহলে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে, তাহার কন্যার উন্মেষোন্মুখ যৌবনও রূপলুব্ধ গ্রাম্য যুবকবৃন্দের তরল হৃদয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাস আনিয়াছে।—ইহাদেরই মধ্যে একজনের আজি চারি বৎসর হইতে হরিমতীর কুটির নৈশ অভিসারের কুঞ্জ হইয়াছে—ধীরেন তাহার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে পারে নাই। হরিমতী অভিজ্ঞ কাণ্ডারী, নিরাপদে এই গোপন প্রণয়ের তরণী তর তর করিয়া চলিতেছে মধ্যে হরিমতী-কন্যা খুদীর একটি শিশুপুত্রও হইয়াছে

তাহার পর এক বৎসর হইল একদিন হরিমতীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল 'মরছি, বাবা একবার এসো।' চন্দ্র পাঠকের দোকানে ধীরেন এই সংবাদ পাইল। এত লোক থাকিতে চন্দ্রপাঠক কোন্ সূত্রে কেন এই সংবাদবাহক তাহা ধীরেনের জিজ্ঞাসা করিবার বুদ্ধি ছিল না। বোধ হয় মৃত্যু-কালে কন্যা ও দৌহিত্রকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিবার হরিমতীর ইচ্ছা হইয়াছিল। চন্দ্রপাঠক কেবল সংবাদ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, এ ইঙ্গিতও করিয়াছিল, হরিমতীর অনেক লুকান টাকা আছে, শিশুর পিতার পরিচয় পাইলে লাভের পন্থা উন্মুক্ত হইতে পারে, এই আশায় ধীরেনকে উৎসাহিত করিতে গিয়া চন্দ্রপাঠক নিজের জীবন প্রায় বিপন্ন করিয়াছিল, কারণ ধীরেণের চক্ষে যাহা মূহুর্ত্তের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা খুনের আগুণ।—

চিন্তা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় ধীরেন ঘরের দাওয়ায় উঠিতে গিয়া চালের কাঠে ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া ফেলিল—তাহার মুখে কোনও শব্দ বাহির হইল না—একবার আকাশের দিকে নীরবে তাকাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল—সে দৃষ্টি কাহাকে যেন বলিতেছিল—মার, কত মারিবে, মার—আমি কিছু বলিব না—।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজু গোপের সহিত গিরীন ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের পর পনরটি দিন কাটিয়া গিয়াছে। গিরীন ঠাকুর রাজুর বাড়ীতে পুনরায় আজ অতিথি—এবার উদ্দেশ্য জ্ঞান বাবুকে কিছু নজর দেওয়া (অবশ্য দূত হস্তে) কারণ তাহাতে কন্যার আদর বাড়িবে; এ উৎকোচ-দান কন্যার পিতাদের চিরকালের অভ্যাস। আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল, রাজুর গৃহে একটি ছোটখাট ভোজের আয়োজন করিয়া তাহার বিগত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও যৎকিঞ্চিৎ

প্রতিদান—গিরীন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার গ্রামের ৩।৪ জন বাহক ছিল, তাহারা জল পান করিয়া বিদায় হইল। রাজু এই আকস্মিক অতিথির আগমনে আজ প্রফুল্ল নহে, কারণ আজ ললিত আসিবে—তথাপি মনের অসন্তোষ দমন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রীত্যর্থ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল;—মালতীর উৎসাহ কিন্তু আন্তরিক। স্বামীর বিরক্তি সে বুঝিল, তাহার কারণও তাহার অজ্ঞাত নহে, সেই জন্যই যেন তাহার উৎসাহ বেশী; স্বামীর তিরস্কারে মালতীর লোভ ছিল, কারণ এইটি তাহার পক্ষে আজ পর্য্যন্ত দুর্ল্লভ রহিয়াছে—। রাজু ধরা ছোঁয়া দেয় না, প্রকাশ্যে তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে চেষ্টা করা স্ত্রী-প্রকৃতির বিরুদ্ধ, সেই জন্য সেই স্ত্রী-প্রকৃতিই মালতীকে শত লঘু অত্যাচারে রাজুর লজ্জার বর্ম্ম ভেদ করিতে, বিরক্তি কলহ তিরস্কারের পথে ঘনিষ্ঠতাকে কৌশলে টানিয়া আনিতে প্ররোচিত করিত। তাই রাজুর বিরক্তি উপলব্ধি করিয়া মালতীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল—আর এরূপ একটা ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না,—বাড়ীতে ভোজ, একজন কলিকাতার নামজাদা পাচক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা—এমন মেয়ে মানুষ নাই।

দুই চারিজন মাতৃস্থানীয়া প্রতিবেশিনী মালতীকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, মালতীর ক্ষুদ্র সংসারে স্বচ্ছলতা জাজ্বল্যমান—ঘরে বাড়তি জিনিষ নিত্য। সখী স্থানীয়দিগের মনে মনে হিংসা, নানা ক্ষুদ্র উৎপীড়নেও তাহা প্রকাশ করিত। মোটের উপর কতক খাতির, কতক বিদ্রূপ এই সকলের মধ্যে কোন্দল ও আপ্যায়িত করিতে করিতে মালতীর সময় কাটিত। গিরীন ঠাকুর সংক্রান্ত ব্যাপারে সে চতুর্দ্দিক হইতে প্রশ্ন জালে বিব্রত হইলেও হটেনাই, কিছু না জানিয়াও কল্পিতা কল্পিত অবতারণায় লোকের মন ও নিজের মান বজায় রাখিয়াছে—কিন্তু সে বিষয়ে রাজুর উপর একটা রাগ, কেন আপনা হইতে রাজু সমস্ত সংবাদ স্ত্রীর গোচর করে না—সে কি জানে না, মালতী এখনও নূতন বৌ, তাহার অজাত প্রশ্নাধিকার!—সেই গ্রামের কৌতূহলের কেন্দ্র তাহাদের গৃহে অতিথি—অতি সরল সহজ ভাবে প্রতিবেশিনীদের চোখে মালতী একবার নিজেকে দেখিয়া লইল—উৎসাহের সীমা নাই। সকালে আহারাদি শেষ করিতে বেলা গেল—বাগ্দীপাড়ার ত' কয়েক জন আসিয়া পাত পাড়িয়া খাইয়া গেল। অন্তরঙ্গ কয়েক জন, যাহারা মালতীর স্বতঃ নিয়োজিত অভিভাবিকা তাহাদের বিদায়কাল আসিয়াছে, গিরীন ঠাকুর গর্ব্বোৎফুল্লচিত্তে 'কলকাতার রান্নার' সুখ্যাতি আদান প্রদানে রত, পুঁটুর মা এক কলসী জল দাওয়ায় রাখিয়া বলিল, "তবে আসি এবার গয়লা বৌ, আর জল লাগবে না তো—হাঁ মা, বলি তোমার কাছে আবার লজ্জা কি—এই আমার পুঁটু পূজোর সময় অসুখ করে থেকে বড় অরুচি অরুচি করে—এই চান করে যাচ্ছে দেখে এলাম, তাই মনে পড়ল, বল্লুম, কলকাতার রান্না খাবি? কখন কিছু খেতে চায় না—না না করে শেষে ওই মাছ দই দিয়ে রান্না গো—শুনে বল্লে, তা না হয় মা একটু আনিস্, তা আমার যে ছেলে মা, আবার পই পই করে চাইতে বারণ কল্লে—মাথার দিব্বি দিলে, যদি নিজে থেকে দেয় বুঝলি, মা, হাঁাংলার মত চাসনি যেন, আমি বল্লাম—বেঁচে থাক এয়োস্ত্রী হয়ে আমার বৌ মা, চাইতে হবে কেন, পর নাকি?" মালতী একটা বাটি করিয়া তাহাকে তরকারি দিল। ইহার পর কালীপদর বিধবা মামীর ভাগিনেয়স্নেহ উথলিয়া উঠিল—বক্তৃতা ও মৎস্য দানের পুনরাভিনয় হইতেও বিলম্ব হইল না।

গিরীন ঠাকুরের মিষ্ট স্বভাব, তাহার লঘু গল্প আজ রাজুকে কেবল বিরক্তই করিতেছে—অন্যবারে আজ সে বদলী বেহারার দল লইয়া অর্দ্ধ পথে পুলের নিকট অপেক্ষা করিত, ললিত সেইখানে স্নান ও জলযোগ করিয়া আবার পাল্কীতে উঠিলে রাজু এই দশ মাইল পথ পাল্কীর পাশে ছুটিয়াই আসিত, সে সময় কত গল্প, পথ ফুরাইলেও গল্প ফুরাইত না।—আজ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ অতিথি, রাজু সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত। পাল্কী হইতে নামিয়া পুলের কাছে ললিত নিশ্চয় প্রশ্ন করিবে, "রাজুদা কই?"—গিরীন ঠাকুর রাজুকে বেসুরা অনুমান করিয়া অবেলায় দিবা-নিদ্রার বৃথা শরণপ্রার্থী হইলেও তাঁহার মনে জামাতাকে সঙ্গে কলিকাতা লইয়া যাইবার একটা ইচ্ছা ছিল—তাঁহার রন্ধন-মুগ্ধ বহু ছাত্র এখন শাসনের বিবিধ মসনদে প্রতিষ্ঠিত অক্ষমের একটা কিনারা করা কঠিন হইবে না—কিন্তু সে প্রস্তাবের উত্তর অক্ষম [illegible], "যদি পারি আমি উঁার সঙ্গে দেখা করব, এর পর কলকাতায়।" সুতরাং প্রাথমীর

ভবিষ্যতের একটা সুচারু ব্যবস্থা অচিরে গড়িয়া তুলিবার আশা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

ললিতের আসিবার সময় হইয়াছে—রাজু বেহারাদের দূর শ্রুত চীৎকার শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে।—

সহরে তাহাদের কাছারী-বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া বেলা আটটা আন্দাজ ললিত পাল্কীতে শ্রীনগর যাত্রা করিয়াছে—সঙ্গে একজন পাইক, সে অর্দ্ধ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, বেহারাদলও ফিরিবে

পাল্কীতে শয়ন করিয়া ললিত একটি পুস্তক খুলিল, কিন্তু পাল্কীর দোলনে অক্ষরগুলি দৃষ্টির সহিত লুকোচুরি খেলিতে লাগিল—ক্লান্ত দৃষ্টি ধীরে শূন্য হইয়া আসিল—স্মৃতি ও কল্পনা তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে বাড়ীর পথে লইয়া চলিল।—

বাড়ী তাহার ভাল লাগিত, কিন্তু বাড়ীর স্মৃতি তাহাকে বিহ্বল করিত না—সেখানে তাহার সকল বাসনার অবাধে তৃপ্ত হইবার সুযোগের প্রাচুর্য্য ছিল, ছিল না স্নেহ প্রীতির ছোট ছোট নিদর্শন গুলি, যাহা আমাদের অন্তরকে সহস্র করুণ আবেশে দ্রব করে, স্মৃতির কাঁচে যাহারা শতগুণ আকারে প্রতিফলিত হয়, যাহাদের মোহন-হস্তের আকর্ষণ-শক্তি প্রচণ্ড। মাতা নাই, পিতার ব্যবহার নিয়ম-বদ্ধ, দূরত্বব্যঞ্জক, বিমাতার সদা সতর্ক সংযত ভদ্রতা। শ্রীনগর গ্রাম তাহার বাল্যের শত স্মৃতি-জড়িত, কিন্তু বয়স-ধর্ম্মের স্বভাবানুযায়ী এখন মত ও ভাবধারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তন-শীল হওয়ায় কখনও তাহার মন গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আবার কখন বা শত ত্রুটীর জাজ্বল্য তাহাকে বিতৃষ্ণায় ক্লান্ত করে। এই সময়ে তাহার জ্ঞান-পিপাসা, সহানুকম্পী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংযোগে ও অবলম্বনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, কলিকাতার ছাত্রাবাসে স্বীয় অধিকৃত কক্ষে রাশিকৃত পুস্তকরাজি তাহারই নিদর্শন—যাহা পায় তাহা পড়ে, তাহার বিষয়ে এই সময় সত্য ছিল—। ধীরে ধীরে কৈশোরের অবগুণ্ঠন সরাইয়া তাহার মধ্যে এই সময় পুরুষ আত্ম প্রকাশ করিতেছিল।—

শিবিকামধ্যে ললিত ভাবিতেছে—পরীক্ষায় সে নিশ্চয় কৃতিত্বের সহিত পাশ করিবে, আর চারিটী বৎসরের মধ্যে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাহাকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে, কারণ তাহার জীবনের কেন্দ্র নিরূপিত হইয়া গিয়াছে, ক্ষমতা পূর্ণ বিকশিত হইলে সে আর পরাধীন থাকিবে না; জীবন-সঙ্গীনীকে লইয়া সে সমাজ পিতাকে উপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় থাকিবে। তাহার আশা ও বিশ্বাস হরিমতীর কন্যা ও সাহিত্য এই উভয়ে তাহার স্বাধীন জীবনকে পূর্ণ, সরস ও শোভাময় করিবে। হরিমতীর কন্যাকে সে প্রথম পরিচয়ের সময় অপরিপক্ক বুদ্ধিতে প্রিয়া নাম দিয়াছিল, আজ Shelley, Byron, Keatsএর সুরে সেই নামকেই সে মনের মধ্যে বাঁধিয়া লইয়াছে। যাহা অপরিণত বয়সে প্রলোভনের সম্মুখে দুর্ব্বল আত্ম সমর্পণ ছিল আজ পরিবর্ত্তনশীল বয়সের সন্ধিক্ষণে তাহা সদ্য আস্বাদিত বিচিত্র অভিনব কাব্যরসে সিঞ্চিত হইয়া কল্পনার আধারস্থল তাজা যৌবনের রচিত ভবিষ্যতের কুহক হইয়াছে।—প্রথম পতনের পর তাহার মনে একবার অনুতাপ আসিয়াছিল, অস্বচ্ছন্দ ধিক্কারের দৌরাত্ম্যে সে যখন অতিষ্ঠ, সেই সময়ে কাব্য-রাজ্যের দ্বার তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, সেখানে যুগপৎ পতনের সমর্থন ও অনুশোচনার বিরাম পাইয়া সে সাদরে কাব্যকে জীবনে বরণ করিল; তাহার পর বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের একটি কবিত্বময় ও আত্ম-প্রসাদ-পোষক ধারাবাহিক খসড়া প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইয়াছে—প্রিয়া আর পতিতা বৈষ্ণবীর ভ্রষ্টা কন্যা মাত্র নহে—এখন সে জীবনের ধ্রুবতারা, প্রেম, একাধারে কাব্যবর্ণিতা নায়িকা ও সেবাময়ী গৃহলক্ষ্মী—তাহার নিজের মহত্ব ও গৌরবের অদূর ভবিষ্যতে জীবন্ত সাক্ষীরূপিণী।

আগে যেখানে প্রিয়ার চিন্তায় লজ্জা ও ভয়ের ব্যথা জাগিত, আজ সেই প্রিয়ার কথা অর্দ্ধনীমিলিত নেত্রে ভাবিতে ভাবিতে সে বিভোর হইল, বিন্দুমাত্র গ্লানিও মনের কোণে উঁকি মারিল না।

মানব-স্বভাবের বৈশিষ্টই এইরূপ, দেহ মন যখন দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়কে তখন সে কিছুতেই ফিরাইতে পারে না, তখন এমন একটা শ্লাঘাজনক ব্যাখ্যায় নিজেকে সে সম্মোহিত করে ও প্রসঙ্গের সহিত এমন একটা গৌরবময় কল্পনা গাঁথিয়া লয়, যাহাতে ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হয় না। সভ্যতা সম্পূর্ণ অটুট ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিবার অবিরাম চেষ্টায় কেবল এইরূপ নব নব ব্যাখ্যা ও কল্পনার স্তূপাকার করিতেছে—তাই আঁচড়

কাটিলে সভ্যতার পাৎলা আবরণ ছিন্ন হইয়া আদিম মানব বাহির হইয়া পড়ে।—মানব-স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, হয় সমূহ মানবকে হেটমুণ্ডে জীবন যাপন কিংবা জগৎ হইতে ভ্রম ও অসংযমের চিরনির্ব্বাসন, এই দুইয়ের মধ্যে একটা হইত।

ললিত প্রিয়ার সহিত অচিবে পুনর্মিলন দৃশ্যের একটা কবিত্বময় পরিকল্পনায় নিবিষ্টচিত্ত—পুলের নিকট পাল্কী আসিয়া থামিল; রাজুর প্রত্যাশিত প্রফুল্ল মুখ না দেখিয়া ললিত বিরক্ত হইল—একটা খণ্ডতা, বৈষম্যের ক্ষীণ অনুভূতি তাহার মনে হারমোনিয়মের বিকল রীডের ক্ষীণ বেসুরার মত নিবৃত্তিহীন হইয়া রহিল।—

ললিতের প্রিয়ার একটি মাতৃ প্রদত্ত নাম ছিল তাহা খুদী, কিন্তু সে নাম গ্রামের কেহ জানিত না, সাধারণতঃ 'ওই ছুঁড়িটা' এইরূপেই সে আখ্যাত। জীবিতকাল পর্য্যন্ত হরিমতী দোকান হাট নিজে করিত, কন্যাকে সময়ে সময়ে সঙ্গে লইত, ললিত প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া পর, সন্তান-সম্ভাবনা জানিয়া হরিমতী শেষটা কন্যার লোকচক্ষুর সম্মুখে আসাই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে হরিমতী একটি বুনো জাতের বুড়ী তাহার পরিচর্য্যার জন্য বাড়ীতে রাখিয়াছিল—এই বুনোরা বৎসরে দুই তিন বার দল বাঁধিয়া গ্রামে শিকে, ঝাঁটা, মাটি বিক্রয় করিতে দেখা দিত। হরিমতী যখন রোগের প্রবল অতর্কিত আক্রমণে চারি মাসের মধ্যে শুকাইয়া মারা গেল, সেই হইতে এই বুনো বুড়াই একাধারে রক্ষক ও পরিচারকের স্থান গ্রহণ করিয়া ললিত ও তাহার প্রিয়াকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়াছিল। হরিমতীকে বুড়ীই বাগানের এক কোণে কবর দিয়াছিল। বুড়ী দোকান হাট করে, ছেলেটিকে খেলা দেয়, জল আনে আর শত প্রশ্নেরও উত্তর দিতে জানে না। খুদীর সকল বিষয়েই উপযুক্ত এই চেড়ী। ললিত বুড়ীকে পছন্দ করিত। বুড়ীকে তাহার পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া বোধ হয়, কৌতূহলে পোষণের উপযুক্ত উচ্চ স্তরে তাহার মানসিক বিকাশ পৌঁছে নাই।

চন্দ্র পাঠক চারি পাঁচ দিন ধরিয়া বুড়ীকে কিছু বিমর্ষ লক্ষ করিতেছিল, কি যেন বলি বলি করিয়া বলিতে পারে না, বোধ হয় ভাষার উপর তেমন দখল থাকিলে বলিত—আসল কথা, গত পূজার পর হইতে মাতার রোগের লক্ষণ কন্যার দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল—পূজার ছুটির অবসানে ললিত বিদায় লইলে দুর্দ্দান্ত যক্ষা তাহার প্রিয়াকে আপন করিয়া লইয়াছে—এই কয়দিন হইতে সে একেবারে শয্যাশায়ী। বহুদিন পূর্ব্বে নৈশ অভিসার লুব্ধ দুই একজন যুবক ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া রটাইয়াছিল, বৈষ্ণবীর আস্তানার চারিদিকে দৈত্যের মত কে একজন পাহারা দেয়, তাহার লাঠি হইতে বহু কষ্টে তাহারা প্রাণ লইয়া আসিতে পারিয়াছে—সেই হইতে বড় কেহ সে দিক মাড়াইত না—সুতরাং সকলের অজ্ঞাতসারে খুদীর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায়—সে ভাবিতেছে, ললিত কবে আসিবে—তাহার এই ব্যাধি কি মারাত্মক, দেখা হইবার পূর্ব্বেই কি তাহাকে সকল ছাড়িয়া চলিতে হইবে?

এদিকে রাজুর চঞ্চলতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছিল—ঘর বাহির করিয়া সে শান্ত হইতে পারিল না; গিরীন ঠাকুর এবেলা রন্ধনাদি করিবেন না, কারণ রাত থাকিতে তাঁহাকে রওনা হইতে হইবে—অবেলায় গুরু আহার, তিনি রাত্রির মত একেবারে দাওয়ায় বিছানা করিয়া লইয়াছেন। সন্ধ্যা ঘোর হইয়াছে; পল্লীর জীবন-কোলাহল বিরামের পূর্ব্বে একবার গা ঝাড়া দিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, দু একটী করিয়া সন্ধ্যাদীপ ঘরে ঘরে দেখা দিতে লাগিল—ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে তাহারা বিগত আলোক-রাজ্যের করুণ স্মৃতিবিন্দু, ক্ষীণ, দুর্ব্বল কিন্তু বিশ্বাসী—রাত্রিব্যাপী আসন্ন জড়তার মধ্যে জীবনের অতি সঙ্কুচিত স্পন্দন। গ্রাম প্রান্তে যে ডোমেদের কয়েকটী কুটীর আছে, পাল্কী এতক্ষণ সেইখানে পৌঁছিয়া থাকিবে,—রাজু আর থাকিতে পারিল না—অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডোমপাড়ার সন্নিকটে বাহকগণ শিবিকা নামাইল, এইখানে তাহারা প্রতি বৎসরই ধুমধাম করিয়া দেহ ও গলা শানাইয়া লয়, কারণ অতঃপর গ্রাম প্রবেশের সময় শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ আস্ফালন প্রদর্শনের পালা; পাল্কী থামিলেই ললিত অস্থির ভাবে বাহির হইয়া পড়িল, বেহারাদের শূন্য পাল্কী লইয়া সদর পথে যাইতে বলিয়া নিজে সে পদব্রজে মেঠো পথ ধরিয়া চলিল; একজন বেহারা অনুসরণ করিতে উদ্যত হইতেছিল, তাহার ইঙ্গিতে নিরস্ত হইল—বেহারারা মুখ

চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ললিতের উদ্দেশ্য প্রিয়ার বাড়ী হইয়া যাইবে—একবার নিমেষের দেখা, দুটী কথা!

রবি-ফসল কাটার সময়—কিন্তু চাষারা এখন আর ক্ষেত্রে নাই, কেবল একটী ছোলার মাঠে কতকগুলি বালক একাগ্র মনে কি যেন করিতেছে—তাহারা ললিতকে লক্ষ্য করিল না; কতকগুলি খরা তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া তীরের গতিতে ছুটিল, ললিত তাহাদের লক্ষ্য করিল না। রাত্রি সবে মাত্র গ্রামটিকে গ্রাস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। ললিত গ্রামের সীমানায় উপস্থিত হইয়াছে—বহুদিন পরে গ্রাম্য আবহাওয়া, অঙ্গে একটা ক্ষণিকের শিহরণ, অদূরে গন্তব্য স্থান। পথ যেখানে বাগ্দীপাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহার একটু আগেই ললিত পার্শ্বস্থ বাগানে প্রবেশ করিল, চাষা পাড়ার পশ্চাৎ দিক দিয়া সে অগ্রসর হইতেছে—অন্তরে ঝটিকা, কিন্তু অতি সাবধান পদ সঞ্চার—ওই প্রিয়ার ঘরের দীপটি ঝলমল করিতেছে—চতুর্দ্দিকে জমাট অন্ধকার, তাহার মধ্য হইতে যেন হাতছানি দিয়া সে দীপশিখা তাহাকে ডাকিতেছে।—

মৃত্যুর দ্বারে, খুদীর মনে পরিবর্তন আসিয়াছিল। প্রহার নির্য্যাতনে ও বেয়াড়া আব্দারে শৈশব হইতে কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার মাতৃস্নেহ ছিল অতি নিম্ন স্তরের; ললিতকেও তাহার কখন ভাল লাগিত না, কারণ ললিতের ব্যক্তিত্ব তাহার সংকীর্ণ বোধশক্তির অতীত; যে সকল কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া তাহার মন গঠিত, তাহার পরিধি সাধ্যমত বিস্তার করিয়াও সে ললিতের মনের নাগাল পায় নাই—তাই ললিতের আচরণে সে অতৃপ্ত, তাহার উপস্থিতিই তাহার নিকট অস্বস্তিজনক। আর এক দিক দিয়া তাহার জীবন ইতিহাস তাহাকে অকাল অভিজ্ঞ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছিল, এ পাখী ভাল বটে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা যাইবে না, তবে যত দিন আছে, দেখিতেও বেশ, পড়িতেও বেশ। একটা ইতর চতুরতা তাহার বুদ্ধির স্বল্পতার স্থান পূরণ করিয়া তাহাকে সহানুভূতির সুনিপুণ অভিনয়ে ও ছলনায়, ললিতের দুর্ব্বোধ্য উচ্ছ্বাস শান্ত ও চরিতার্থ করাইত; এ-সকলে কোনও পরিবর্তন আসিয়াছিল না। পুত্রটির উপর প্রথম হইতে পার্শ্বে শায়িত একটি ভিন্ন জীবের সংজ্ঞার মুহূর্ত্তাবধি তাহার একটা অস্বাভাবিক ঘৃণা ছিল, তাহার ন্যায় জীবের এ বিড়ম্বনা, এ বোঝা মাত্র; কেবল হরিমতী ও বুনো বুড়ীর জন্য ছেলেটি বাঁচিয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতি আজ পরিশোধ লইতে আসিয়াছে—যে সন্তানের উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের সম্মুখে হরিমতী ভর্ৎসনার তাড়নায় স্তন ধরিয়া, প্রকৃতই সে দেহের মধ্যে বিপরীত ধারা অনুভব করিয়া মাতাকে অনুযোগ করিত, "মা ওকে গরুর দুধ খাওয়া—আমার মাই শুকিয়ে যাচ্ছে।" সেই সন্তানের জন্যই আজ মৃত্যুর কালো যবনিকা পতনোন্মুখ দেখিয়া তাহার আদিম বৃত্তিগুলি চিরকালের জন্য একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—অতীতের কন্দরে কন্দরে, শব্দালোকবর্জ্জিত নিভৃতে বিদ্যুৎ শিখা প্রতিফলিত, বজ্রনির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত, আত্ম প্রবঞ্চিত, স্বেচ্ছায় অনশন জর্জ্জরিত বুভুক্ষু হিয়ার গ্যাঙ্গানীর সুর শিরা প্রশিরা ঠেলিয়া উঠিতেছে তাহার বক্ষস্থলের গুরু বেদনা আজ সে কেবল এই শিশুকেই সজোরে চাপিয়া ধরিয়া জুড়াইতে সক্ষম, শিশুর অনিচ্ছুক মুখ শীর্ণ স্তনের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার ব্যথার আজ লাঘব হয়।—সে মরিলে এই অবোধ অসহায় শিশুর কি গতি হইবে—পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পুত্রের জন্য কাতরতায় নবজাগ্রত মাতৃহৃদয় একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হইল, "এর ব্যবস্থা না করে আমি মরব না, যদি দরকার হয় বাবুদের বাড়ী গিয়ে সব কথা বলে এর ব্যবস্থা করাব, যেমন করে হোক্।"

তার পরই দরজা ধীরে সরাইয়া ললিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—চক্ষের চটুল দৃষ্টি চোখেই মরিল, মুখের কথা মুখের বাহিরে আসিল, প্রাণহীন শব্দহীন।—

সৌষ্ঠব, রূপ, স্বাস্থ্যের সঙ্গে অন্তর্হিত; রূপ অরূপের প্রভেদ অল্প অধিকের নহে, ভাল মন্দের নহে, এ একেবারে প্রকারে প্রভেদ, সেখানে তুলনা চলে না, কারণ ভোক্তার অন্তরে তাহাদের বাস, তাহাদের জন্ম; ললিত যাহাকে প্রিয়া বলিয়া জানিত তাহাকে সে আজ দেখিতে পাইল না;—যাহাকে সে—এতো সে নয়, ললিত শিহরিয়া উঠিল—।

খুদীর যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার সহিত ললিত কোনও দিন সম্পর্ক স্থাপিত করে নাই—এ অংশ তাহার অপরিজ্ঞাত, এমন কি ইহার অস্তিত্ব অনুমান অগ্রে করিতে পারিলে ইহার সহিত কোনও রূপ সম্পর্কই ললিত করিত না। ললিত দেখিল, কাঠির মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কাগজে

অজ্ঞান, অযত্ন বিক্ষিপ্ত—জোয়ারের ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস অপসৃত হইয়া নগ্ন বেলাভূমি, তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে বিপদসঙ্কুল একটা দীপ্ত রূঢ় কর্কশতা যেন তাড়া করিতেছে।—

—অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাহাকে অভ্যর্থনা ও নিজের আশ্চর্যান্বিত ভাব একত্রে ব্যক্ত করিল,—কেবল একটি কথা, "বাবু!"—'বাবু' কথার জন্য ললিত তাহার প্রিয়ার সহিত কত কলহ অভিমান করিয়াছে—কত নূতন সম্বোধন শব্দ তাহাকে অভ্যাস করাইয়াছে—আজ 'বাবু', এই শব্দ তাহার কাব্য প্রতিমার উপরে যেন কালা পাহাড়ের লগুড়াঘাত,—সঙ্গে সঙ্গে যেন অপ্রত্যাশিত অকস্মাৎ চপেটাঘাতে তাহার চৈতন্য জাগিয়া উঠিল, বিবাবিষ্টের আচ্ছন্ন ভাব তিরোহিত হইল। ললিত স্তব্ধ হইয়া গেল, কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠস্বর পুনরায় শ্রুতিগোচর হইল, "চুপ করে দেখছ কি বাবু, আমার হয়ে এসেছে; আমায় মজিয়েছ—এখন ছেলেটার গতি কর—তুমি বড় মানুষ সব কর্ত্তে পার—বল তার ভার নিলে? কথা দাও, কথা দাও; কথা দিলে রাখবে জানি, কথা দাও—দেরী করো না।" প্রাণের কার্পণ্য-সঞ্চিত শক্তি খুদী এখন ব্যবহার করিতেছে। প্রাণও বুঝিয়াছে, আর অপব্যয় বলিয়া বাধা দেওয়া বৃথা। খুদী উঠিয়া বসিয়াছে, পার্শ্বে সুপ্ত পুত্রের শিথিল হস্ত ললিতের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিল, "কথা দাও, তোমার পায়ে পড়ি।" স্তব্ধ কণ্ঠে, শূন্য দৃষ্টিতে, এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া ললিত বলিল, "প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—ভার নিলাম।" খুদী বিছানায় পড়িয়া গেল, তখনও মুখে কথা, "তবে কালই, ভোরে কাক পক্ষী জাগার আগে ওকে নিয়ে যাবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়—তবে আমি মরতে পার্ব্ব; মরা পর্য্যন্ত বড় কষ্ট।" "আচ্ছা তাই করব" বলিয়া ললিত গমনোদ্যত হইল, অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমাবেশে তাহার কার্য্যকরী বুদ্ধি তখন সম্পূর্ণ ম্রিয়মাণ।—"ভোরে না নিয়ে গেলে আমি তোমার বাপের কাছে গিয়ে পড়ব, আর তাতেও ছেলের হিল্লে না হয়, পথে পড়ে সবাইকে জানাতে জানাতে মর্ব্ব।" কার্পণ্য-সঞ্চিত শক্তিটুকু নিঃশেষপ্রায়—মানুষের কণ্ঠে যেন উচ্চারিত নহে, সর্পের জিহ্বাতেই এরূপ উচ্চারণ সম্ভব, ভাষা মাত্র মানুষের। পৃষ্ঠে চাবুক পড়িলে মন্থরগামী অশ্ব যেমন চমকিয়া উঠে, ললিত সেইরূপ চমকিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।—

বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে স্খলিতপদে অন্ধকার হাতড়াইতে হাতড়াইতে ললিত চলিয়াছে; নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্য হইতে দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তির আকৃতি, যেন একটুকরা জমাট অন্ধকার পৃথক হইয়া তাহার পাছু লইল; হাতে ক্রূর লাঠি। ললিতের হুঁস ছিল না, আর একটু হইলেই তাহার জীবন না হউক, অবয়বাদির একটা কিছু হানি হইত, কোন পাগলের দায়িত্বহীন অবুঝ আক্রোশে তাহাকে আহুতি হইতে হইত। এমন সময়ে নৈশ ভীষণতা, নীরবতাকে ক্ষুব্ধ সন্ত্রস্ত করিয়া একটা চীৎকার উঠিল,—'রে-রে রে—।' লাঠিয়ালদের পুরাতন গৎ, অমানুষিক চীৎকার পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতে উঠিতে হঠাৎ থামিয়া যায়, লেঠেলের নিকট অর্থসূচক, 'সাবধান হও।' অনুসরণকারী আঘাত সংযত করিয়া অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। ললিত এই চীৎকারে ভয় পায় নাই—কারণ সে বিপদের কথা জানে নাই, আর এই শব্দ সে চিনিয়াছে, সে রাজুর নিকট বাল্যে ক্রীড়াচ্ছলে বহুবার শুনিয়াছে; রাজুর মধ্যে 'বালক' যে এখনও লুপ্ত হয় নাই তাহা সে অনুমানে জানিত; রাজুর ইহা একটা নূতন ধরণের সম্ভাষণ, তাহাকে আগাইয়া আনিতে না যাওয়ায় বিরোধ অভিমতকে হটাইবার এইরূপ পন্থা অবলম্বন রাজুতেই সম্ভব। সন্ধি-প্রার্থীকে উৎফুল্ল কণ্ঠে সে আহ্বান করিল, 'রাজুদা, কোন্ দিকে?' রাজুর নিকট রহস্য প্রকাশ হইবার বিড়ম্বনা-বোধ অপেক্ষা, এই বিপদে তাহার সান্নিধ্য তাহার প্রশ্নহীন অকুণ্ঠিত সহানুভূতির আশা প্রবল।—অনতিবিলম্বে পাতার খস্ খস্ শব্দ থামিল, রাজু তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, "খোকা বাবু, রাত্রে একলা আসে—পাল্কী এতক্ষণ পৌঁছেছে, কর্ত্তাবাবু কত রাগ করবে।" রাজু আর কিছু ভাঙ্গিল না, ললিত কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আজ খাওয়া দাওয়ার পর আমার সঙ্গে দেখা কর্বে, একটা জরুরী কথা আছে।" রাজু বলিল "আচ্ছা।"

যখন তাহারা দেউড়ীতে, তখন পাল্কী নামিয়াছে—কিন্তু কর্ত্তা আরতি দেখিতে গিয়াছেন। পুত্রের শিবিকাত্যাগ অভিযান বিদিত নহেন—বেহারারা গরীব লোক, তাহাদের বিপন্ন করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে?—নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বাভাবিক ভাবে, ললিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল।—

(ক্রমশঃ)

শিশু

[মোতাহের হোসেন]

আকাশ তোরে দেয় যে দোলা
বাতাস তোরে ডাকে,
সুর-পরীরা হাতছানি দেয়
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
বৃষ্টি-ধারা বোনের মত
শোনায় তোরে গীতি,
সূর্য্যি-মামা দেয় যে ঢেলে'
রাঙা আলোর প্রীতি।
শস্য ক্ষেতের সোণার শোভা
ভোলায় যে তোর হিয়া,
ক্ষুদ্র তোর ঐ মনের সাথে
বিশ্ব মনের বিয়া।
আকাশ আলোক দেয় যে তোরে
নবীন প্রাণের বাণী,
তাইত নিতি রেঙে উঠে
বিশ্ব-ভুবন খানি।
নিখিল ধরার হর্ষ-পুলক
অন্তরে তোর আছে,
ছোট্ট তোর ঐ হিয়ার মাঝে
অনন্ত গান নাচে।
আনন্দ তোর মুঠার মাঝে,—
দেয় সে নিজেই ধরা,
হাজার ফুলের হরষ দিয়ে
চিত্ত যে তোর ভরা।

মধুর চাউনি যে তোর
বচন ভাঙা ভাঙা,
ইন্দ্রধনুর সপ্ত রঙে
হৃদয় খানি রাঙা।
কান্না আড়ে লুকাস্ হাসি
হাসির আড়ে কাঁদা,
বর্ষা শরৎ দুইটি ঋতু
চক্ষে যে তোর বাঁধা।
এই যে হাসি, এই যে
এই যে অভিমান,
এই তো আবার গেয়ে উঠিস্
আনন্দেরই গান।
হর্ষ খুশীর প্রতীক ওরে
পাগলা ভোলানাথ,
সকল ভুলে আজকে তোরে
করচি প্রণিপাত।
মাঝে মাঝে ডাকিস্ মোরে
তোর ঐ খেলা ঘরে,—
দিবস নিশি যেথায় সদা
আনন্দ-গান ঝরে।
বিশ্ব ধরায় সুখ নাহি তো
আনন্দ নাই কাজে,
মধুর তোর ঐ খেয়াল-খেলায়
ডাকিস্ মাঝে মাঝে।

খেলার রসে রাঙিয়ে নিয়ে
মর্চ্চে-পড়া প্রাণ,
তোরই সাথে গাইব আমি
কাজ-ভোলান গান॥

সমসাময়িক সাহিত্য

বৈশাখ সংখ্যার "সমসাময়িক সাহিত্য" এর আলোচনায় আমরা বলেছিলাম যে, "সমসাময়িক সাহিত্য হিসাবে যে সব পত্রিকার নাম ছিল—যোগ্যতাও ছিল—সেগুলি একে একে লুপ্ত হয়ে গেল। **কালিকলম, প্রগতি, কল্লোল** প্রভৃতি যে আদর্শ নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন—তার সঙ্গে সকলের মত মিলবে এমন কোনও কথা নাই—মিলেও নি। * * রুচি ও আদর্শের তারতম্যে মানুষের প্রবৃত্তির দিকটাকে বড় করে দেখাবার মধ্যে সাহিত্যে নূতনত্ব সৃষ্টির চেষ্টাকে আমরা চিরদিন নিন্দা করে এসেছি, কিন্তু প্রগতি প্রমুখ এই শ্রেণীর কাগজ যাঁরা চালাতেন তাঁদের এবং তাঁদের লেখকগণের শক্তি সম্বন্ধে আমরা কোনও দিনই সন্দেহ প্রকাশ করিনি।"

* * *

"সত্য শিব ও সুন্দরের মন্দিরে কুলুপ লাগিয়ে যাঁরা সাহিত্য নিয়ে হাট বসাতে চেয়েছেন তাঁদের এই নিদারুণ লজ্জাকর আচরণের জন্য আমরাও লজ্জিত হয়েছি।"

* * *

"একান্ত সাধনাতেই হোক আর গোষ্ঠি-জীবনের প্রভাবেই হোক, মনুষ্যত্বের কাছে সাহিত্য-জীবনের বলিদান কখনই প্রশংসনীয় নয়।"

উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি সম্বন্ধে কালিকলম-সম্পাদক আপত্তি জানিয়েছেন এবং আমাদের মন্তব্যে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন এ কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে পুনরায় এগুলি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত মনে হ'ল।

কালিকলম-সম্পাদক বলেন, প্রগতি কল্লোল প্রভৃতি মাসিকের সঙ্গে তাঁর পত্রিকাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করে আমরা সুবিচার করিনি।

কালিকলম-সম্পাদকের সাহিত্যের প্রতি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, দরদ আছে একথা আমরা বিশেষ করে জানি বলেই তাঁর এ কথার পর আমরা সমস্ত আলোচনা ভাল করে পড়ে দেখেছি—কিন্তু তা'তে আমাদের দিকের কোনও ত্রুটিই আমরা দেখতে পেলাম না।

কল্লোল বা প্রগতির আদর্শ থেকে কালিকলমের আদর্শ হয়ত অল্পাধিক পৃথক ছিল—কিন্তু তা' সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে কোনও দিন কেহ ধরতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই—তরুণ সাহিত্যিকদের নিয়ে যাঁরা কাগজ বের করেছিলেন—কালিকলমও তাদের অন্যতম—সুতরাং সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়াতে কালিকলমের কি যে মর্য্যাদাহানি হয়েছে জানি না। রিরংসার ইন্ধন যাঁরা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসে বাঙ্গালী সমাজকে যোগাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের যোগানের পরিমাণের তারতম্য থাকলেও আজ সে দায়িত্ব কালিকলম ঝেড়ে ফেলতে চান কেন?—"ভেলী" "নারী" "খোকা আয় খোকা আয়" "চিত্রবহ" প্রভৃতির সম্বন্ধে কালিকলম-সম্পাদক কি বলেন?

তরুণ সাহিত্যিকদের শক্তি কোনও দিনই আমরা অস্বীকার করিনি—উচ্চ প্রশংসাও আমরা যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে কার্পণ্য করেছি বলে মনে হয় না।

সত্য শিব সুন্দরকে যাঁরা আমোল না দিয়ে যৌন-দেবতার অষ্টপ্রহর সংকীর্ত্তন চালিয়ে আসর জমাতে চেয়েছেন এবং যাঁরা মনুষ্যত্বের কাছে সাহিত্য-জীবনকে বলিদান দিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছেন, আমরা সেই সব সাহিত্যিকদেরই নিন্দা করেছি—এখনও করে থাকি, ভবিষ্যতেও করব—কারণ অন্যায়, নীতি-ধর্ম্মের অবমাননা, যে কোনও অজুহাতেই হোক না কেন, সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা নিন্দার্হ।—তা'তে বিশেষ

করে কালিকলম-সম্পাদক কেন ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হলেন বুঝতে পারলাম না। কোনও মাসিক পত্র বিশেষকে লক্ষ্য করে আমাদের উপরের উদ্ধৃত কথাগুলি লেখা হয় নাই—কোনও সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক গোষ্ঠিকে উপলক্ষ্য করেই আমাদের বক্তব্য আমরা বলেছি। অতএব কালিকলম সম্পাদক যেন আর একবার তৃতীয় ব্যক্তির মন নিয়ে আমাদের আলোচনাটা পড়েন—আমরা আশা করি, বিশেষ কোনও কারণ না থাক্‌লে তিনিই নিজের অভিমত বদলাতে পারবেন।

সৃষ্টির অহঙ্কার না থাকলে—সাহিত্যিকের হাতে সাহিত্য-সৃষ্টি হ'তে পারে না—বিকাশের বেদনা যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মের দলে দলে চিহ্ন এঁকে রাখে—তেমনি সার্থক কাব্যও প্রকাশের পর্য্যায়ে কবি-মনের অসহ বিকাশ-ব্যথাকে জাগিয়ে রাখে।—সেই সঙ্গে সৃষ্টি করবার শক্তি সম্বন্ধে পূরা মাত্রায় বিশ্বাস থাকে;—নিজের উপর এই অবিকৃত বিশ্বাসই সৃষ্টির অহঙ্কার।—কিন্তু তাই বলে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রত্যেক স্তরেই যদি আত্মাভিমান প্রবল হয়ে পড়ে, তা'হলে উত্তাপই প্রকাশ পায় বেশী, আগুনের সন্ধান পাই না।—কে কি দিতে পারলে এই কথাটাই বড়—সত্যিকার যা দান তা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে—তার জন্য বিজ্ঞাপনেরও দরকার নেই—সমালোচকরূপী দালালেরও প্রয়োজন নেই।—আপনার শক্তিতে যে দান নিজের মূল্য যাচাই করাতে পারলে না—তার পিছনে দাতার যত বড় আত্মাভিমানই থাক্ না কেন—কোনও কালেই তার মর্য্যাদা হবে না।

আসল জিনিস মেকীর তালিকাভুক্ত হলেও গুণীর চোখে তার উপযুক্ত মূল্য ধরা পড়ে যাবেই যাবে।

বিজলী সাপ্তাহিক হলেও মুখ্যতঃ সাহিত্য পত্রিকা একথা বোধ হয় বিজলী-সম্পাদক অস্বীকার করবেন না;—উপাসনা সাহিত্য-পত্রিকা হ'লেও রাজনৈতিক আলোচনা করলে ধর্ম্মে পতিত হ'বে এমন কথাও বোধ হয় কেও মনে করবেন না।—

জেলে গিয়েও যুগান্তরকারী বারীণ ঘোষের হাত থেকে মহাত্মা গান্ধীর নিস্তার নেই। গান্ধীর রাজনৈতিক মতামত ও কার্য্যপদ্ধতি নিয়ে বিজলী-সম্পাদক যে লজ্জাকর আলোচনা সুরু করেছেন—তাতে আর যাই হোক—আদর্শ তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না একথা জেনে রাখুন।—বারীন্দ্র বাবু বোকা নন বলেই আমরা জানি—কিন্তু বিজলী চালাতে বসে তিনি যে Experiment সুরু করেছেন—তাতে ব্যবসায় বুদ্ধিরও যে তিনি বিশেষ পরিচয় দিচ্ছেন এমন ত মনে হয় না। দেশপ্রীতির বিনিময়ে তিনি বাঙলা দেশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিস্ময় অর্জ্জন করেছিলেন—পণ্ডীচারীতে কয়েক বৎসর আধ্যাত্ম জীবন যাপন করাতে আমাদের মনে আর এক রকমের বিস্ময় জেগেছিল—কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে, তিনি যদি বোমার মূল্যে দেশের গান্ধী-বিদ্বেষ অর্জ্জন করতে চান তা হলে তাঁর ঠিকে ভুল হয়েছে বলতে হবে।

দেশের একমাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে তিনি মানেন কিনা জানি না—বোমার যুগের নয় বলে তিনি বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা পোষণ করেন কি না তাও আমরা জানিনা, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে তিনি ত তাঁর কাগজের মার্ফতে (কার্য্যতঃ না হোক) বিশিষ্ট কোনও রাজনৈতিক মতামতের পরিচয় দেন নাই—কি Programme অনুসারে কাজ আরম্ভ করলে দেশ স্বাধীন হবে তারও কোন হদিশ তিনি এপর্য্যন্ত দিলেন না। কথার আতসবাজি, বড় বড় বুক্‌নীর পট্‌কা, ন্যায় ও নীতির ফুলঝুরি, এসব নিয়ে জৌলুস দেখাবার লোক দেশে অনেক আছে—সে ভারটা দ্বীপান্তরের বারীন্দ্রকুমার না নিলেও চলবে। যদি সত্যকার বলবার কিছু থাকে, দেশকে শোনাবার কিছু থাকে, Programme কিছু উপস্থিত করবার থাকে—তিনি সোজাসুজি আসুন—গান্ধী-ভক্তের সংখ্যা দেশে শতকরা ৯৯ জন থাক্‌লেও তাঁর প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এখনও না হয় কিছু দিনের মত তাঁর Programme নিয়েই আমরা কাজ আরম্ভ করি।

—'উনপঞ্চাশী'র কথা আগেও বলেছি এখনও বলছি—ওটার ভার কি বারীণ বাবু নিজে নিয়েছেন—?

উনপঞ্চাশ বায়ু এতই উগ্র হয়ে পড়েছে যে শেষে মিনার্ভা থিয়েটারের 'চারী'র খোঁজে বেওয়া হয়ে ধাওয়া

করেছে। বন্ধু উপেন্দ্রনাথের 'উনপঞ্চাশী'র শিরোনামায় ফুট-পাথের রসিকতা আর কতদিন চল্‌বে?

—

জয়ন্তীর প্রথম সংখ্যা আমরা পেয়েছি, বন্ধুবর আবদুল কাদের এই মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদনের ভার নিয়েছেন জেনে আমরা সুখী হয়েছি,—বন্ধুজনের কাগজ বলে আরও আশ্বস্ত হয়েছি—মুসলমান হয়েও তাঁর পরধর্ম্মের প্রতি উদারতা ও সহানুভূতি আছে বলে। মাসিক পত্রিকায় মুখ্যতঃ সাহিত্যের আলোচনা হয়ে থাকে, গল্প উপন্যাস কবিতা ও প্রবন্ধের সম্ভারে যে যার মত পত্রিকা সাজিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি কোনও কোনও মাসিকপত্র, বিশেষ করে মুসলমান-সম্পাদিত মাসিকে দেশের এই দুর্দ্দিনেও হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে জাগাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। জয়ন্তী সম্পাদকের কাছ থেকে তেমন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই—তিনি হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে যে উদার দৃষ্টি ও গভীর মমতার সঙ্গে দেখে থাকেন, তাতে আশা করা যায় তাঁর লেখার সাহায্যে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ভ্রাতাদের প্রতি সকলের প্রীতির ভাব জেগে উঠ্‌বে।

আলোচ্য মাসিকখানির কবিতাগুলি বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—।

—

পঞ্চপুষ্প—হাত বদল হয়ে এবার অমূল্য বিদ্যাভূষণ ম'শায়ের শ্রীহস্তে এসে ফুটেছে—বাণীপুজা সার্থক হোক এই আমরা চাই। কিন্তু এক দিকে তাঁর এই মাসিক-সাহিত্য প্রকাশের ভার নেওয়ায় আমরা যেমন আনন্দিত, তেমনি কয়েকটি বিষয়ে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ না করেও পেরে উঠ্‌ছি না—। তাতে বিদ্যাভূষণ ম'শায় রাগ করলে আমরা নাচার।

সিগারেট বর্জ্জনের দিনে পঞ্চপুষ্পের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় "ইম্পিরিয়াল স্পেশালস্" সিগারেটের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে "বিশুদ্ধ ভার্জিনিয়া সিগারেটের ধূমপান করুন" বলে দেশবাসীকে আহ্বান করার মধ্যে বেশ একটু নূতনত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

আর একটি নূতনত্ব লক্ষ্য করে যুগপৎ আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হয়েছি। সে ত্রুটি সম্পাদকের কি লেখকের তা তাঁরাই বল্‌তে পারেন। "আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি উপাসনার ১৩৩৫ পৌষ সংখ্যায় হুবহু "আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য" এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি একই লেখকের লেখা—যদি না শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি এই দুই নামে ব্যক্তিরও বিভিন্নতা ঘটে থাকে। লেখক প্রথম কয় লাইনে একটু হের ফের করার চেষ্টা করেছেন—তার মধ্যে ইচ্ছা করলে এই প্রবন্ধটি যে পূর্ব্বে উপাসনায় প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ করতে পারতেন—এবং একথাও বল্‌তে পারতেন এবং বলা উচিত ছিল যে, পুনরায় এ প্রবন্ধটি কেন মুদ্রিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।—সাহিত্য, বিশেষতঃ মাসিক সাহিত্য যে ওয়ারিশ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে—যত কিছু অভব্যতা, যা কিছু স্বেচ্ছাচারিতা যতদূর সম্ভব দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বিনা শাস্তিতে আমরা মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় চালাতে পারি।

সম্প্রতি সাহিত্যের শ্লীলতাহানিকর আলাপ আলোচনার জন্য রুচিবাগীষ ও রুচিহীন উভয় পক্ষের দ্বারা সমপরিমাণ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে সুপঠিত অধুনালুপ্ত কোনও একখানি মাসিকের সম্পাদক মহাশয়কে 'ওয়াকিব হালের' জন্য কিঞ্চিৎ মূল্য জরিমানা স্বরূপ ধর্ম্মাধিকরণে দিতে হয়েছে। কিন্তু একই প্রবন্ধ বা কবিতা ইচ্ছাকৃত ভুলক্রমে বা সাহিত্যিক অহঙ্কার প্রযুক্ত সাধারণ ভব্যতা অতিক্রম করে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দরুণ তৎ তৎ মাসিকের সম্পাদকদের যে মর্য্যাদাহানি হয়—তার জন্য কেহ কখনও কোনও 'আক্কেল সেলামী' দিয়েছেন কিনা অবগত নহি। তবে একই লেখা ঘটনাক্রমে একই সময় বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হয়ে পড়লে ঘটনাচক্রের দোহাই পাড়া চলে বটে, তবে সুদীর্ঘ দেড় বৎসর পরে হুবহু একটি প্রবন্ধ অন্য একখানি মাসিকে প্রকাশ করার মধ্যে না আছে সাহিত্যিক নীতিজ্ঞানের পরিচয়, না আছে শিষ্টাচারের অবশ্য প্রতিপাল্য প্রাথমিক শিক্ষার নিদর্শন। বাহোবাটা পাওয়া উচিত বিদ্যাভূষণ ম'শায়েরও কম নয়—তিনি একজন সত্যকারের বড় কবি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা পত্রান্তরে

প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভূয়োদর্শনের যুগল দৃষ্টিতে সে ঘটনা ধরা পড়ল না—এতখানি অনবধানতার বাহাদুরী তাঁকে আমাদের দিতেই হ'বে।

আলোচ্য সংখ্যায় অনেকগুলি কবিতা আছে—কিন্তু কাব্য-সম্পদে সেগুলি একেবারেই উল্লেখযোগ্য নহে। সবগুলি সুচিন্তিত না হোক—চিন্তার আড়ম্বর পূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। গল্প ও উপন্যাসের সমালোচনা না করেও একথা বলা যায় যে সম্পাদক ম'শায় এই ভাবে গল্প উপন্যাস দিয়ে কাগজের গহ্বর পূর্ণ করতে পারলে - গ্রাহক শ্রেণীর কৃপাদৃষ্টি অচিরে আকর্ষণ করিতে পারবেন।

জ্যৈষ্ঠের **প্রবাসী**তে উল্লেখযোগ্য কবিতা কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "যুগাবতার"—মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে লিখিত। যতীন্দ্রমোহনের মধুর রচনা ভঙ্গীটি এতে সুস্পষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু 'যুগাবতার' বলে যে কবিতার নামকরণ করা হয়েছে - তা'র মধ্যে বর্ত্তমান যুগের "অন্তর-শক্তি" মৃত্তপণের দৃঢ়তা, ঝঙ্কার ও উন্মাদনার তেমন পরিচয় না পেয়ে আমরা ভাবছি "পাশার বাজী"র যে "কড় কড়" শব্দ তা' কি কবি ভুলে গেছেন ? কবি হয়ত বল্‌বেন যে অহিংস-ব্রতী মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ-সাধনাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুভব করলে উন্মাদনা স্থির হয়ে আসে, তেজ সংহত হয়ে যায়, ঝঙ্কার স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা বল্‌তে চাই—দিনরাত্রির ব্যবধান অতিক্রম ক'রে—বাহ্যাড়ম্বর পরিহার করে—তীর্থের সুদীর্ঘ পথ যিনি মৃদুমন্দ পদক্ষেপে অতিবাহন করে গেলেন—তাঁর সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে উন্মাদনা, যে ঝঙ্কার ভারতবর্ষের প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে তার পরিমাণ কি সামান্য ? কবির লেখনীতে শুধু যে 'নাগকেশর', 'অপরাজিতা' ফোটে তা' নয়, 'জাগরণী'র অভয়মন্ত্রও ধ্বনিত হয়। তাই আমাদের এই অনুযোগ।

যতীন্দ্রমোহন সত্যই বলেছেন—

"মাটির মানুষ বাহিরিল পথে মাটিতে চরণ ফেলি,
বাতাসে বাতাসে ধ্বনি উঠে ত'র আকাশের দ্বার ঠেলি'
এপারে ওপারে লাগে কানাকানি
ভূর্ভবস্ব মন জানা জানি
জগতের আঁখি উঠিছে চমকি তারায় নয়ন মেলি।"

এতবড় একটা দেশব্যাপী জাগরণ—যা'র তুলনা জগতে পাওয়া যায় না—অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যার মত একটা ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যায় না, যার মহিমায় স্বরাজ-সাধনার নূতন সংহিতা প্রণীত হয়ে গেল—তার স্পর্শও কি আজ তরুণ কবিদের মনে লাগল না ? ঘুমন্ত প্রাণকে যে ডাক জাগিয়ে দিয়ে পাগল করে দিয়ে গেল—তা'র সাড়ায় আজ চিরজাগ্রত নবীন প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল না ?—এতে দেশের দুর্ভাগ্যই সূচিত হয়েছে।

সাহিত্য-সমালোচক হয়ত বল্‌বেন—আসলে যারা কবি তারা ত তোমার যুগ-লক্ষণের ধার ধারে না—তারা তাদের অমর লেখনী দিয়ে শুধু মাত্র চিরন্তনের কাব্যই রচনা করে—সে ত কোনও বিশেষ যুগের সম্পদ নয়, সে অনন্ত কালের অক্ষয় রচনা। কিন্তু হায়! আকাশ বাতাসের আজিকার এই অবিরাম বিপুল ছন্দের গতিকে যে কাব্যের বাঁধনে বাঁধতে না পারল—প্রাণের অফুরন্ত লীলাকে যে আজ কবি-প্রাণের নিবিড় অনুভূতিতে একান্ত করে ধরতেই না পারল—তার হাতে নিত্যকালের জন্য রচিত কাব্যের অর্ঘ্য উপচার পাবার আশায় কাব্য-লক্ষ্মী যে বসে থাক্‌বেন না একথা সুনিশ্চিত।

* * * *

শুধু ছন্দ মিলাতে পারলে—অর্থ ও ভাব বর্জ্জন করে ধোঁয়াটে (Mystic) কবিতা লিখে যে সম্পাদক ঠকান যায়—তার প্রমান এই সংখ্যার দু'টি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। পড়তে বেশ লাগে,—ছন্দ আছে, ঝঙ্কার আছে, মাঝে মাঝে একটু আধটু ভাবাবেশও আছে—কিন্তু অর্থের সামঞ্জস্য বা ভাবের সঙ্গতি নাই।—এই রকম কবিতা আজকাল অনেক মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়ে সম্পাদকের লজ্জাকে বাড়িয়ে চলেছে। অথচ শুন্‌তে পাওয়া যায় প্রবাসীর বিষয়-নির্ব্বাচনে একটু এদিক ওদিক হ'বার জো নাই। মুখ চেয়ে খাতির সেখানে চলে না। খাতিরে ছাপান বুঝতে পারি কিন্তু অনুকল্পে বা পাদ-পূরণে কবিতা ছাপানতে কাগজের গৌরব বাড়ে কি ?

ভারতবর্ষ এই আষাঢ়ে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করল।—আঠার বছর স্থূল দেহ ধারণ করে—বর্দ্ধিত

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় পরিপুষ্ট হয়ে যে কাগজ বেঁচে আছে, আর্থিক উন্নতির দিক থেকে তার শ্লাঘা করবার যথেষ্ট কারণ আছে এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে।

তাই বলে সাহিত্যিক গৌরব যে ভারতবর্ষের নাই এমন কথা আমরা বল্‌ছি না। কিন্তু যে সাহিত্য সত্যকার আনন্দের বার্ত্তা বহন করে আনে—তেমন সাহিত্যকে ভারতবর্ষে কায়েমী স্থান দিবার আন্তরিক চেষ্টা হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ দিয়ে মাসিকের পাতা সবাই আমরা যেমন নিরুপায় হয়ে পূর্ণ করে থাকি—ভারতবর্ষের আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্বেও বিষয়গুণে কাগজখানাকে উঁচু ধরণের না করে গতানুগতিক পথই অবলম্বন করা হয়েছে। তা'তে আর্থিক ক্ষতি স্বত্বাধিকারীর কিছু হয় নি সত্য, কারণ গল্প-উপন্যাস-ভোজী বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার সংখ্যা এদেশে যথেষ্ঠ। গভীর চিন্তা বা উচ্চস্তরের আনন্দকে বরদাস্ত করার মত মানসিক শক্তির অভাবই এর একমাত্র কারণ। কিন্তু যথেষ্ঠ সুযোগ ও সুবিধা থাকা সত্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ঠ মর্য্যাদা "ভারতবর্ষ" রেখেছেন কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতির অনেক লেখাই বের হয়েছে—ইদানিং তরুণ সাহিত্যের হিড়িকে অভাবিতরূপে শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধকুমার, বুদ্ধদেব প্রভৃতিও ভারতবর্ষের আসরে প্রবেশপত্র পেয়েছেন—কিন্তু কাব্য-সম্পদ বল্‌তে যা' বুঝি তার কথা ছেড়ে দিলেও—সুখপাঠ্য কবিতার সংখ্যা ভারতবর্ষে থাকে না বল্‌লেই হয়। কবিতার স্থান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নাই সে কথা সত্য—কিন্তু দু'একজন কবির ভারতবর্ষের গন্ধ-সম্পাদকের * কাছে যাতায়াত আছে শুনতে পাই—দেখতেও পাই; কাব্য-সরস্বতীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাও কি শুধু ছন্দ মিলানর মধ্যেই পর্য্যবসিত?

অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যার বহু পৃষ্ঠা হরেক রকম রঙে ছাপান হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লে প্রথম পৃষ্ঠার জন্য একটা ভাল কবিতা কি পাওয়া যেত না? যাদের কবি-প্রতিষ্ঠা আছে যাদের কবিতা সকলে সাগ্রহে পড়ে থাকে—তাদের কাছে কখনও কোনও দিন 'ভারতবর্ষ' কোনও কবিতা চেয়েছেন কি? —না চান, তবুও যাচিতই হোক আর অযাচিতই হোক সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় "নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী"র সঙ্গে মুদ্রিত শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্র-মোহন বাগচীর "বাঁশীর ব্যথা" কবিতাটিও কি প্রথম পৃষ্ঠায় "ভৌগলিক তথ্য"এর প্রথম ১২ লাইনের স্থানে ছাপান চলত না? যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিষ্ঠা আছে—তাঁর মিষ্টি হাতের জন্য তাঁর লেখা পাঠকসমাজে সমাদৃত—এবং আলোচ্য সংখ্যার সাহিত্য-সম্পদ হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের এই কবিতাটি তাচ্ছিল্য করবার নয়।

"গানের মধু ভরে তোদের প্রাণ,
বাঁশীতে মোর পরাণ পরবাসী!
গানের শেষে তোরা ফিরিস ঘরে—
বাঁশী আমায় ঘরের বাহির করে!"

* * * *

"কাছে তোরা থাকিস সারাক্ষণ,
আমি থাকি দূরে—অনেক দূরে;
গীতের মোহ টানে তোদের মন,
উদাস হয়ে যাই যে আমি সুরে।
শুনতে তোরা চাহিস জীবন ভোর,
বারেক শোনা চিরদিনের মোর।"

—সুন্দর নহে কি? যতীন্দ্রমোহন কি মনে করেন তাঁর কবিতা যোগ্য স্থানেই মুদ্রিত করা হয়েছে? কবিতার আভিজাত্য-জ্ঞান যে যতীন্দ্রমোহনের নাই একথা মনে করতেও কষ্ট হয়।

------

* শুনেছি জলধরবাবু নিজে বলে থাকেন আমি বড় গন্ধ-মানুষ

জীবন বীমার কথা

[শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র চৌধুরী]

মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি যে নিয়তির সহিত বেশ জয়যুক্ত হইয়াই লড়িতে পারে জীবন বীমা তাহার পরিচয়। মানুষের জীবন ত নিয়তির রাজ্যে নিতান্তই মূল্যহীন—এই আছে, এই নাই। এই যে মূল্যহীন মানব জীবন, জীবন বীমা তাহার একটা মূল্য স্থির করিয়াছে—অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তার মোহন বেশে সাজাইয়াছে, দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যের গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে এবং নৈরাশ্যের মধ্যে আশার ধ্রুব রশ্মির রেখাপাত করিয়াছে। এক কথায় বর্ত্তমান যুগের ধনবিজ্ঞানশাস্ত্র জীবন বীমার উদ্ভাবন দ্বারা ব্যক্তির জীবনের দায়িত্বভার সমষ্টির স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মানব জাতিকে এক অখণ্ড শান্তিময় কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছে। তাই আজ আমেরিকায় দীন দরিদ্র আবাল বৃদ্ধের মধ্যে যে কেহ মরিলেই তাহার জীবনের ন্যূন মূল্য ১৫০০৲ টাকা।

যাহারা দৈবের উপর সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার সুখ ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকাল মরণ যখন অতিথি হইল, তাহাদের প্রিয়জনেরা কপালে করাঘাত করিয়া হাহাকার ভিন্ন আর কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু যাহারা ধনবিজ্ঞানের এই নবীন বরটি বুঝিয়া জীবনবীমার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের স্নেহ পুত্তলিগণ শোকাভিভূত হইল বটে, কিন্তু ভিখারীর বেশে পরের গলগ্রহ হইল না। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসকে ফুটিয়া উঠিতে দিল না।

আমাদের দেশের লোকে আজও জীবন বীমার উপকারিতা বুঝিতে পারে নাই। তাই সরল ভাবে তাহাদের বুঝিবার মত করিয়া ২।১টি কথা বলিব। কোন ব্যক্তি যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া জমা দেয়, তবে ২০ বৎসর পরে তাহাকে ঐ টাকার কিঞ্চিৎ সুদ সহ ১০০০৲ টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভবপর বটে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি এরূপ দায়িত্ব লইতে পারি না যে এই ২০ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারীকে ১০০০৲ টাকা ফেরত দিব। কিন্তু জীবন বীমা কোম্পানী কি করিয়া ঐরূপ দায়িত্ব লইতে পারে? জীবন বীমা কোম্পানী সহস্র সহস্র লোকের নিকট ঐরূপ বাৎসরিক ৫০৲ টাকা লইয়া যে কোন মুহূর্ত্তে মরণ হইলে ১০০০৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। কারণ মৃত্যু তালিকার হার (M. Table) লইয়া তাহারা দেখিয়াছে যে এই সহস্র সহস্র লোক কখনই একদিনে মরিবে না—কেহ আজ মরিতে পারে এবং কেহ ২০ বৎসর পরেও মরিতে পারে। সুতরাং ঐ সকল লোকের নিকট ক্রমশঃ টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ চুক্তি পূরণ ক্রমশঃ করিতে পারা যায়। আমরা জানিনা কবে কাহার দ্বারে মৃত্যু আসিয়া অতিথি হইবে; কিন্তু জীবন বীমা কোম্পানী মৃত্যু তালিকার বিশেষ জ্ঞানে জানে যে, মৃত্যু আসিলেও একদিনে সকলের দ্বারে উপস্থিত হইবে না তাই প্রকৃষ্ট ধনবিজ্ঞানের বলে বীমা কোম্পানী মৃত্যুঞ্জয়ীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে এবং মৃত্যুর প্রহেলিকায়ও এক বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ব্যবসা (business in risk) চালাইতে পারিতেছে। তাই জীবন বীমা একটা নিছক ফাঁকী বা কুহক নহে।

জীবন বীমার অনুষ্ঠান সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডেই গড়িয়া উঠে। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী Amicable Society for Perpetual Assurance স্থাপিত হয় এবং এই কোম্পানী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান Norwich Union Life Assurance Societyর সহিত মিলিত হইয়া আজও ঐ নামে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই কোম্পানীর ১২ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-বীমা করিতে বাৎসরিক প্রিমিয়াম ছিল বীমার টাকার শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে—এবং সকল বয়সেই সমান প্রিমিয়াম ছিল। কিন্তু ধনবিজ্ঞানসম্মত ইংলণ্ডের প্রথম কোম্পানী হইতেছে Society for Equitable Assurance এবং তাহার প্রিমিয়ামের তালিকা বয়সের কমি বেশী অনুসারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈয়ারী হইয়া কোম্পানী ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কোম্পানী আজও Old Equitable নামে বর্ত্তমান আছে। ইংলণ্ডের দেখাদেখি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও জীবন বীমার প্রবর্ত্তন হয়। হল্যাণ্ডের সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়; ফ্রান্সে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এবং জার্ম্মানীতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী স্থাপিত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটস অব্ আমেরিকার সর্ব্ব প্রথম কোম্পানী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এবং কানাডার ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইংলণ্ড জীবন বীমার বাল্য লীলাভূমি হইলেও আমেরিকাই জীবন বীমায় পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর যাবতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর ধন সম্ভার একত্রিত করিলেও আমেরিকার জীবন বীমার ধন ভাণ্ডারের তুল্য হয় না, অনেক কম থাকিয়া যায়।

নিউ ইয়র্কের একটি জীবন বীমা কোম্পানীর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই কোম্পানীর নাম Metropolitan Assurance Company. বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পাঁচটী ব্যাঙ্কের ধন স্থিত (assets) একত্র করিলেও Metropolitanএর স্থিতের (assets) সমান হইবে না। Metropolitanএর ধন স্থিত তদপেক্ষা অনেক বেশী। গত ১৯২৯ সালে এই কোম্পানীর স্থিত (assets) ছিল ৬০০ শত মিলিয়ান পাউণ্ড অর্থাৎ ৯০০ কোটি টাকা। এই কোম্পানীর কার্য্যের বৃহত্তমতার একটা ধারণা করিবার জন্য আরও কয়েকটী কথা বলিব। এই কোম্পানী দৈনিক ২২৩৩টি ক্লেমের উপর ৬১ লক্ষ টাকা ক্লেম পরিশোধ করে; দৈনিক ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পলিসি বিলি করে এবং দৈনিক ৩১ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা করে। কোম্পানীর আফিসে ১৫০০০ কেরাণী কার্য্য করে। আমেরিকায় এই প্রকার রাক্ষসী কোম্পানী আরও আছে কিন্তু এইটিই হইল পৃথিবীর সর্ব্ব বৃহৎ বীমা কোম্পানী।

ভারতের বীমার কথা আলোচনা করিতে হইলে Hindu Family Annuity Fund এর কথা বলিতে হয়। সিমলাতে একবার ভারতীয় রাজ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। তাহাতে বহু রাজ কর্ম্মচারী মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায় ঐ সকল ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র পথের ভিখারী হয়। তাহাদের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Hindu Family Annuity Fund স্থাপন করেন। ইহাতে যে কোন হিন্দু সভ্য হইয়া নিয়মিত চাঁদা দিতে থাকিলে তাহার অকাল মৃত্যুতে পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাসহারা পায় অথবা নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে নিজেই ঐ মাসহারা ভোগ করে। Annuity Fund এর দ্বারা যে কত অনাথা বিধবার ভরণ পোষণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ আরও অনেক গুলি Annuity Fund ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে স্থাপিত হইয়া কথিত প্রকার লোকহিত সাধন করিতেছে। কিন্তু ভারতে সর্ব্ব প্রথম জীবন-বীমা কোম্পানী Bombay Mutual Life Assurance Society. এই কোম্পানী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বে সহরের কতিপয় পার্শী ও ইংরাজ সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা স্থাপিত হইয়া আজও অংশীদার বিহীনভাবে জীবন বীমার কার্য্য করিতেছে। এই কোম্পানীর প্রত্যেক বীমাকারীই মালিক বা অংশীদার বাংলায় এইরূপ অংশীদারহীন প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী Hindu Mutual Life Assurance ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশীদার কোম্পানী Oriental Government Security Life Assurance Co ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

হয় ভারতীয় কোম্পানী যত টাকার জীবন বীমা গ্রহণ করে তাহার ও এক তৃতীয়াংশের অধিক Oriental পাইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য বড় জীবন বীমা কোম্পানীর নাম করিতে হইলে Empire, Bharat, Hindusthan এবং National এর নাম করিতে হয়।

ভারত ইংলণ্ডের ধন সম্ভারের ½ এক পঞ্চমাংশ যোগাইলেও বড়ই দরিদ্র—রাজনৈতিক পরাধীনতা কোন জাতিকে উন্নতির সোপানে উঠিতে দেয় না। এত বড় বিস্তীর্ণ মহাদেশ সদৃশ দেশ এবং জ্ঞান গরিমার কূজন কাকলী এখানে সর্ব্ব প্রথমে শ্রুত হয়, তথাপি আজ ভারত ধন-বিজ্ঞানের দিক দিয়া অতি নিম্নে পড়িয়া আছে। আমরা নিম্নে দেশ ও অধিবাসী হিসাবে একটী তুলনামূলক হিসাব দিতেছি :—(১৯২৫)

দেশ	লোক সংখ্যা	জীবন বীমা টাকা
ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা	১১½ কোটি	২৪০০০ কোটি
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৪½ "	৩০০০ "
কানাডা	৯০ লক্ষ	১২০০ "
জাপান	৫½ কোটি	৯০০ "
অষ্ট্রেলিয়া	৩০½ লক্ষ	৬০০ "
ভারতবর্ষ	৩৩ কোটি	৬০ "

ইহা হইতে সহজেই অনুমান হইতে পারে আমরা কত নিম্নে পড়িয়া আছি। আমেরিকায় ১১½ কোটি লোকের মধ্যে ২৪০০০ কোটি টাকার জীবন বীমা আছে আর ভারতের ৩৩ কোটি লোকের মাত্র ৬০ কোটি টাকার জীবন বীমা আছে। আবার এই জীবন বীমার মধ্যে অনেকাংশ ভারত প্রবাসী ধনী ইংরাজ বা বৈদেশিকগণের জীবনের উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে জীবন বীমা বিষয়ে ভারতের এখনও কত কাজ করিবার আছে। সান লাইফ অব্ কানাডা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সার ফিরোজ সেথনা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে দেশীয় এবং বৈদেশিক একত্র গড় করিয়া মাথা প্রতি ভারতে ৫৲ টাকার জীবন বীমা আছে। অর্থাৎ একজন ভারতবাসী মরিলে তাহার জীবনের মূল্য গড়ে ৫৲ টাকা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আমেরিকায় একজন লোক মরিলে তাহার জীবনের মূল্য ন্যূন কল্পে ১৫০০৲ টাকা ধরা হইয়া থাকে।

গত ১০ বৎসর মধ্যে ভারতে জীবনবীমার কার্য্য অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বদেশবাসীর দেশীয় কোম্পানীর উপর বিশেষ আকর্ষণ জন্মে নাই। তাহারা জীবন বীমা করিলেই খুঁজিয়া বৈদেশিক কোম্পানী ঠিক করিয়া লন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ই এই দোষে অধিক দুষ্ট। তাঁহারা ভারতের জাতীয় লাভালাভ বুঝা সত্বেও বৈদেশিক কোম্পানীতে জীবন বীমা করেন, অপর লোকের কথা ত' ধর্ত্তব্যই নহে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী গুলি মোট ১২ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার নূতন জীবন বীমা করিয়াছে ইহার অধিকাংশ ভাগই অল্প শিক্ষিতের জীবনের উপর। কারণ উচ্চ শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় অধিকাংশ স্থলেই বৈদেশিক কোম্পানীতে জীবন বীমা করিয়া থাকেন। কাজেই ভারতীয় কোম্পানী উন্নতির পথে দ্রুত ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভারতে বর্ত্তমানে প্রায় ৬০টি জীবন বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে, ভারতের লোক সংখ্যা হিসাবে ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক কোম্পানীরও ভারতে কার্য্য করিবার ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বৈদেশিক কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় এই সকল কোম্পানী পারিয়া উঠে না এবং তাহাদের কার্য্যের অনেক ভুল ত্রুটি থাকিয়া যায়। আশা হয় ভারতীয় কোম্পানীগুলি তাহাদের ভুল ত্রুটী সারিয়া লইয়া ভাল ভাবে agency organisation গড়িয়া তুলিয়া সাধুতা এবং সরলতার আলোকবর্ত্তিকা লইয়া জাতির ধন ভাণ্ডার পরি-পূরণে মনোযোগ দিবে।

বিগত মহাযুদ্ধে মিত্র-পক্ষ এবং শত্রু পক্ষের মিলিত ভাবে যত না লোকক্ষয় হইয়াছিল তাহার অধিক লোক ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভারতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন মহামারীর দেশে জীবন বীমা যে কত প্রয়োজনীয় বিষয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই বলি, মানুষের মত হইয়া আমাদিগকে আগে চলিতে হইবে। ইংলণ্ডে আমেরিকায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবন বীমা আরম্ভ করিলেও আমেরিকা ৯০ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবন বীমা-কারী জাতি হইয়াছে। উন্নতির পথে চলিতে থাকিলে ভারতেরই বা ভয়ের কারণ কি?

"Life Insurance is an agreement between men by which they so distribute among themselves the misfortune of life and calamity of early death, that is, the full force of misfortune and some of the worst cause. Chances of premature death are minimised for the individual, because they are shared by all, but in such small proportions that the burden and loss are scarcely paid by any." (জাগরণ)

হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ এসিওরেন্স, লিমিটেড্

বাঙ্গালার প্রাচীনতম ও আদর্শ জীবন বীমা কোম্পানী "হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ এসিওরেন্স, লিমিটেড"এর গত ১৯২৯ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। মূলধনের সাহায্যে বীমার ব্যবসায় পরিচালন করিয়া লাভবান হওয়ার চেষ্টা আজকাল সর্ব্বত্র প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এরূপ চেষ্টা যখন কল্পনারও বহির্ভূত ছিল সেই সময়ে—১৮৯১ সালে কেবলমাত্র দুঃস্থ ও বিপন্ন হিন্দু পরিবার বর্গের সাহায্যের জন্য কয়েকজন দূরদর্শী বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যমে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কোম্পানী যে ভাবে জনসেবা করিয়া আসিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অনেক বৃহত্তম কোম্পানীর (giants) পক্ষেও যে আদর্শ স্বরূপ-আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৯২৯ সালে "হিন্দু মিউচুয়্যাল" মোট ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার জীবন বীমার জন্য ৬২২টী আবেদন পত্র পাইয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরে কোম্পানী মোট ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৫ শত টাকার জীবন বীমার জন্য ৩৩৮ খানি আবেদন পাইয়াছিলেন। সে হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর কোম্পানীর কার্য্য প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

গত বৎসর কোম্পানীর চাঁদার বাবদে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২ শত ৬৭ টাকা ও সুদের বাবদে ১৮ হাজার ৯ শত ৯১ টাকা আয় হইয়াছিল। কোম্পানী দাবীর দরুণ ৭০ হাজার ৮ শত ৬৬ টাকা, কার্য্য সংগ্রহের জন্য ২০ হাজার ৮ শত ২৩ টাকা ও কার্য্য পরিচালনের জন্য ২৩ হাজার ৬ শত ৪৯ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সমগ্র বৎসরের কার্য্যফলে জীবন বীমার মোট তহবিল প্রায় ছয় হাজার টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৎসরের শেষে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত ৩৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। কোম্পানীর মোট জন্য সম্পত্তির পরিমাণ গত বৎসরের শেষে ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ২৩ টাকা।

কেহ কেহ মনে করেন যে "হিন্দু মিউচুয়্যাল"এর ন্যায় পুরাতন কোম্পানীর বীমা তহবিলের পরিমাণ ও বার্ষিক বীমার কাজের পরিমাণ অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, বীমার তহবিল ও নূতন কাজের পরিমাণের উপর বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন কাজ যোগাড় করা মূলধনীদের (Proprietary) কোম্পানীর পক্ষে যত সহজ বীমাকারীদের (mutual) কোম্পানীর পক্ষে তত সহজ নহে। এই কারণে "হিন্দু মিউচুয়্যালের" কাজের পরিমাণ কম হইলেও এই কোম্পানী সর্ব্বাংশে একটী শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

"হিন্দু মিউচুয়্যাল" সম্প্রতি বীমাকারীদিগকে নিশ্চিত বোনাস্ বা লভ্যাংশ দিবার একটী নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে যাহারা বীমা করিবেন তাহাদিগকে বীমার প্রথম বৎসর হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর বোনাস্ দেওয়া হইবে—এবং প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর সেই বোনাসের হার বৃদ্ধি করা হইবে। বিষয়টার মধ্যে অনিশ্চিত কিছুই নাই—অঙ্কশাস্ত্র বা য়্যাকচুয়ারীর গণনার উপর কাহাকে নির্ভর করিতে হইবে না—নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা দিলেই বীমাকারী এই বোনাসের অধিকারী হইতে পারিবেন। যে সমস্ত বীমা গ্রহণেচ্ছু নিশ্চিত বোনাসের জন্য উৎসুক আমরা তাঁহাদিগকে "হিন্দু মিউচুয়্যাল"এর নূতন প্রণালীর বীমাপত্র গ্রহণ করিতে বলি।

কোম্পানীর কার্য্য পরিচালন প্রসঙ্গে দুই ব্যক্তির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না—কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ও অন্যতম ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু। স্পষ্ট বক্তা ও অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের আপ্রাণ ও একনিষ্ঠ সেবার ফলে এবং মিষ্টভাষী ও যত্নপরায়ণ শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর একান্ত চেষ্টায় "হিন্দু মিউচুয়্যাল" আজ সকল প্রতিকূল সমালোচনার অতীত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে—সে ভিত্তিমূল স্বার্থান্বেষীর হীন আক্রমণে শিথিল হইতে পারে না। স্বার্থান্ধ দালালের বাক্যের উপর একান্ত নির্ভর যাঁহারা করেন না—জীবন-বীমার মূল নীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য ধারণাও আছে, বুঝিবার অল্প মাত্রও শক্তি আছে—তাঁহারা "হিন্দু মিউচুয়্যাল"এর ন্যায় জীবন-বীমা কোম্পানীর শ্রেষ্ঠত্ব অতি অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

টিপ্পনী

এইবার একজন বড় দরের কবি বাঙ্গালা দেশে দেখা দিয়াছেন। "জীবন বীমা" নামক মাসিকের মারফতে মাসের পর মাস তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্যপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ একেবারে থ' বনিয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি এই কবি "জীবন-বীমার" সহিত উর্ব্বশীর তুলনা করিয়া জীবন বীমার দ্বারা কিরূপে "বেকারের সমাধান" (!) হয় অনুপম ভাষায় তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন :-

কে তুমি উর্ব্বশী!
প্রৌঢ়ত্বেও তব সাধনায়
মহোৎসব দরিদ্রের গৃহে?
তুমি কি হে স্বরাজের প্রথম সুচনা?
শত প্রতিষ্ঠানে উড়িতেছে বিজয় নিশান,—
এ দুর্দ্দিনে শত বেকারের করি সমাধান।
জয় মহিয়ান্; জয় ভগবান॥

—এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়িলে হয়ত তিনি আর দেশে ফিরিতে চাহিবেন না।

ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের যে সমস্ত বীমাকারী রাজনৈতিক অপরাধে কারারুদ্ধ হইবেন তাঁহাদের বীমা-পত্র চাঁদা না দিলেও অবস্থা বিশেষে ৩ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত বজায় রাখা হইবে।

ঢাকা নিবাসী জনৈক জাপানী ভদ্রলোক কলিকাতার কোন দৈনিক সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, সেদিন তাঁহার ভৃত্যের মাথায় গান্ধী টুপী দেখিয়া জনৈক শ্বেতাঙ্গ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার টুপীটি কাড়িয়া পদদলিত ও ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এই শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবটী নাকি সান লাইফ অব্ কেনাডার ঢাকা অফিসের কর্ম্মচারী মিষ্টার সিম্সন্। আমরা ইহার অসীম ঔদ্ধত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। জীবন বীমার সহিত সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির ইহাকে ও ইহার কোম্পানীকে চিনিয়া রাখা উচিত।

সম্প্রতি "অষ্ট্রেলিয়ান্ ফেডারেল" নামক একটী বীমা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং এই সম্পর্কে কোম্পানীর কয়েকজন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। যাঁহারা দেশী কোম্পানীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অযথা সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁহারা "অষ্ট্রেলিয়ান্ ফেডারেল" এর ন্যায় ফেল-পড়া কোম্পানীগুলির সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর লইলে নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন।

কলিকাতায় আজকাল ব্যাঙ্ক জাতীয় কতকগুলি নূতন কোম্পানী দেখা দিয়াছে। ইহাঁরা চাকরীর প্রলোভন দেখাইয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে লোক ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক দেখা দিয়াছে যাঁহারা কোম্পানী আইনের বিধি মান্য করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। পিপ্‌ল্‌স্ লোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও ম্যানেজার মিষ্টার এচ, ডি, গাঙ্গুলী তন্মধ্যে একজন। সম্প্রতি রেজেষ্ট্রী না করিয়া অনুষ্ঠান পত্র ছাপাইবার অপরাধে ইহাঁর ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

সম্প্রতি "জীবন বীমা" নামক মাসিক পত্রে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। গত বৈশাখ মাসে উক্ত পত্রিকার প্রিন্টার ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত ভূপতিমোহন সেন ভারতের জীবন বীমা কোম্পানিগুলির সমিতিকে অযথা আক্রমণ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় ভূপতি বাবুর এই কাগজেরই সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "ভূপতি বাবুর এই মন্তব্যে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়

আপত্তি (!!) করিয়া তাঁহার নিকট একখানা চিঠি দিয়াছেন এবং তাঁহার মন্তব্যকে inaccurate, sweeping, far from being correct ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই চিঠির উত্তরে ভূপতি বাবু শ্রীযুত পূর্ণ বাবুর নিকট হইতে উক্ত সমিতি কি কাজ করিতেছেন তাহা জানিতে চাহেন এবং পূর্ণবাবু উত্তর দিলে সাদরে তাহা জীবনবীমায় প্রকাশিত হইবে ইহা জানান। তদুত্তরে পূর্ণ বাবু যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে সমিতি যে বিশেষ কোন কাজ করিতেছেন তাহা বুঝা যায় না।"—কিন্তু সাদরে "জীবন বীমায়" হইবে বলিয়া পূর্ণ বাবুর নিকট হইতে যে উত্তর আদায় করা হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে না ছাপাইয়া তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা মাত্র প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রিণ্টার-মনিবের মতের পোষকতা করিয়া সম্পাদকীয় নীতি-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিলেন কোন হিসাবে? পূর্ণ বাবুর চিঠিখানি প্রতিশ্রুতি অনুসারে যথারীতি প্রকাশ করিলেই পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত গঠন করিতে পারিতেন—এ জন্য কোন সম্পাদক "ডেনিয়েল"এর বিচার বুদ্ধির উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত না।

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, "হিন্দু মিউচুয়ালের" চীফ এজেণ্ট ও 'উপাসনার' অন্যতম লেখক শ্রীযুত প্রাণবন্ধু মুখোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। গত আট মাস যাবৎ রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করার পর মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে গত ১লা জুলাই প্রাণবন্ধুর জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিবিয়া গিয়াছে। প্রাণবন্ধুর ন্যায় স্বাস্থ্যবান্, চরিত্রবান্ মহাপ্রাণ যুবক শুধু বীমা ব্যবসায়ীদের মধ্যে নহে—কোন ক্ষেত্রেই আর দেখি নাই। তাহার ন্যায় সদা হাস্যমুখ, উদার চরিত্র বন্ধু এ জীবনে আর আমরা লাভ করিব বলিয়া মনে হয় না। ভগবান তাহার আত্মার কল্যাণ করুন—তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পরিজনবর্গের গভীর শোকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী

স্বরাজ-সংগ্রামে

৩০শ বর্ষ — শ্রাবণ, ১৩৩৭ — ৪র্থ সংখ্যা
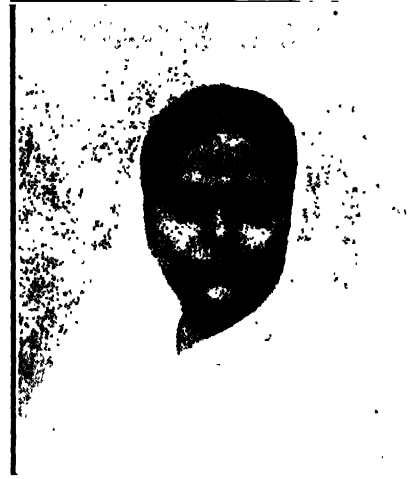
ধন্যবাদ

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

এনেছিলে মোর তরে চারু করপুটে বহি' জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ,
বিষতিক্ত দুঃখদংশ ; আনন্দ—সিন্ধুর মত অগাধ, অবাধ—
তোমারে জানাই ধন্যবাদ ॥

ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মে মোর বাজিয়াছে যত সুর, নব অনুভূতি,
সবি তব উপহার, তুমি তা'র দূতী।
এ-জীবনে যত বর্ণ, যত রূপ ফুটে' ওঠে মানুষের চোখে,
সব দেখিয়াছি তব নয়ন-আলোকে।
পৃথিবীতে যত পথ এঁকে বেঁকে দূর থেকে চলে দূরান্তরে,
সকলি ভ্রমেছি তব বাম হাত ধরে'।
আমারে দিয়েছো সব, কিছু বাকি রাখো নাই—মিটায়ে দিয়েছো সব সাধ,
আত্মার অপার তৃপ্তি, ইন্দ্রিয়ের অনিন্দ্য আহ্লাদ—
তোমারে জানাই ধন্যবাদ ॥

প্রথম দিয়েছো দেখা ব্রীড়া-অবনত নেত্রা কুণ্ঠিতা কুমারী,
নিশীথ-নক্ষত্র-চোখে ক্ষণিক-ঈক্ষণচ্ছটা দেখেছি তোমারি ;
ম্লানমুখী, অশ্রুমতী—চেয়েছিলে ত্রস্তদৃষ্টি মেলি'
সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া ছিলো লজ্জার কুহেলি।
সেই অৰ্দ্ধ-অন্ধকারে দেখা দিলে দেবী-সম অনন্য-উপমা,
মোর আত্ম-আবেদন তবু তুমি হাসিমুখে করেছিলে ক্ষমা।
নির্ব্বোধ বাত্যার মত প্রকাশ করিয়াছিনু নির্ব্বিচারে সর্ব্ব ব্যাকুলতা,
তবু তুমি কয়েছিলে দু'টি ছোট কথা।

রেখেছিলে আপনারে করি' মোর মনের স্বপন,
ছিলো তা নেশার ঘোর—রাত-ভোর বিভোর, গোপন।
আমার প্রাণের পূজা নীরবে তোমার প্রাণে করেছো গ্রহণ,
ব্যথায় কেঁদেছ, হায়,—কী অসহ, অসহায় অশ্রু বিসর্জ্জন !
দূর থেকে করে' গেছি শুভ্র নমস্কার,
উথলি' উঠেছে চিত্তে ব্যথার উৎসার ;—
দিয়েছ হৃদয়-ভরা বিধুর বিরহবহ মধুর বিষাদ,
ললাটে দিয়েছো এঁকে বন্ধুর কল্যাণ-স্পর্শ শুভ্র-আশীর্ব্বাদ,
তোমারে জানাই ধন্যবাদ ॥

তারপর কবে কোন্ ক্ষণে—
আমার পরশে তব রোমাঞ্চি' উঠিল তনু চঞ্চল যৌবনে।
বরাঙ্গে ফুটিল তব সুন্দর সরোজ,
অপাঙ্গে খেলিয়া গেল মন্দার মনোজ ;—
লীলায়িত লতা সম দু'টি বাহু মেলি',
কুহেলি-গুণ্ঠণ-জাল দূরে দিলে ঠেলি'।
ধূপ-ধূম্র-ধূসরিত মন্দিরের অন্ধকার ছাড়ি'
বাসনা-সোণার আলো হাতে নিয়ে এলে তুমি, নারী।
খুলে' দিলে কেশপাশ, বেশবাস শিথিল, বিবশ,
চক্ষে আর অশ্রু নয়, আনন্দের উন্মাদনা-রস !
দেহ ভরি' নিয়ে এলে পরশ-কামনা,
বাহুতলে সুশীতল, স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা।
রোমাঞ্চিত শিহরণ স্তনাগ্রচূড়ায়,
প্রবল চুম্বনতৃষ্ণা অধর-সীমায়।
আপনারে ঢেলে দিলে মোর মুখে—একখানি পরিপূর্ণ নিবিড় চুম্বনে,
ঝরিলে আমার অঙ্গে শ্রাবণ-মেঘের মত শীতল বর্ষণে—
কী একান্ত আত্ম-সমর্পণে !

যাহা আশা করেছিনু, যাহা আশা করি নাই, সবি তব করিয়াছি লাভ,
আমার জীবনে আজ পরিপূর্ণ তব আবির্ভাব।
আমার সৌভাগ্য এই, নাহি জানি, বহিব কেমনে !
তোমারে লভেছি দেহে, লভিয়াছি মনে—
সকল ব্যর্থতা ছাপি' এই মোর অহঙ্কার—এ-কথা কখনো ভুলিব না,
জীবনের সব শোকে এই মোর একমাত্র, সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা !
আর-কিছু চাহে নাকো কেহ কভু, লভিলে যে-সুধার আস্বাদ,
তুমি এনেছিলে বহে' মোর তরে মৃত্যুহীন সেই পরসাদ—
তোমারে জানাই ধন্যবাদ ॥

মানব, দানব ও দেব

[শ্রীউমাশশী দেবী]

শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ কহেন, পৃথিবীতে চতুরশিতি লক্ষ প্রকার জীব আছে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়। মানব যোনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ঐ চতুরশিতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব অবশেষে মানব যোনি প্রাপ্ত হয়। মানব যোনি অপেক্ষা দুইটী উর্দ্ধতর, অর্থাৎ অধিকতর সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষমতা সম্পন্ন যোনি আছে, যথা দেব ও দানব। দানব যোনি, দেব যোনির নিম্ন স্থানীয়। দেব ও দানব, মানবের দুষ্প্রাপ্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র তাঁহাদের গম্য। দেবতার আবাস স্বর্গ। দানবের আবাস পাতাল। মানবের আবাস মর্ত্ত্য।

দেব ও দানবের পার্থক্য এই যে, দেবে সত্ত্বগুণের আধিক্য, দানবে রজ ও তমগুণের আধিক্য। স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে দেব ও দানব, স্বর্গে ও পাতালে বসবাস করে স্বর্গ সুখশান্তির ধাম, যাহা মনুষ্য কল্পনার অতীত। কিন্তু স্বর্গ,—"স্বরতি ইতি স্বর্গ"—অর্থাৎ যাহা সরিয়া যায় তাহাই স্বর্গ, চিরকাল তথায় কেহ থাকিতে পায় না। গুণ কর্ম্মানুসারেই স্বর্গে বসবাস। সত্ত্বগুণের আধিক্য কমিলেই, অর্থাৎ রজ ও তমগুণের বৃদ্ধি হইলেই, স্বর্গবাসে আর অধিকার থাকে না। দানবও সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা স্বর্গ অধিকার করে। মানবও স্বকর্ম্ম ফলে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বলে, স্বর্গ ধাম প্রাপ্ত হয়। বিধাতার এই নিয়ম।

দেবতায় সাধারণতঃ সত্ত্বগুণের আধিক্য, কিন্তু যখন রজ তমগুণের আধিক্য আসে, তখন দেবতা স্বর্গচ্যুত হন। পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ও উপাখ্যান আছে। এক সময়ে দেবগণ সত্ত্বগুণের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে নিম্নস্তন রজ তমগুণের খাদে পতিত হন.। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিক্ষানুসারে তৎকালে দানবেরা রজ তমগুণ দলিত করিয়া সত্ত্বগুণের শিখরে উঠিল। দানবরাজ মহিষাসুর স্বর্গ অধিকার করিল, দেবগণ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া মানবের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ধৈর্য্য ও তপস্যার ফলে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায়, অতঃপর বহুকাল পরে পুনরায় দেবগণ স্বর্গারোহণ করেন। শুম্ভ নিশুম্ভ আদি দানবেরা স্বকর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গ অধিকার করে, পুনরায় স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে দেবতার স্বর্গারোহণ ও দানবের পতন হয়।

মানব জাতি, দেব ও দানবের মধ্য কেন্দ্রে স্থাপিত। ধ্যান, ধারণা, তপস্যা প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রসূত কর্ম্ম দ্বারা মানবেরও স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর্য্য ভূমিতে মানব এইরূপ সত্ত্বগুণের চরম সীমায় উঠিতেন যে দেবতারাও মানব জীবন প্রার্থনা করিতেন।

বিধাতা জীবদেহ ত্রিগুণাত্মক করিয়াছেন, এক গুণে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ বা তমগুণের মধ্যে এৈকৈক গুণে গুণাত্মক করেন নাই। মানবে কেবল মাত্র সত্ত্বগুণ থাকিলেই ভাল হইত, এই স্থূল ধারণা আমাদের সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে বিধাতার সৃজিত সকল বস্তুই প্রয়োজনীয়। সর্প মুখ নিঃসৃত হলাহলেরও উপকারিতা আছে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে সকল দ্রব্যেরই সদ্ব্যবহার আছে। উত্তম দ্রব্যও অহিতকর হয়, রোগীর পক্ষে যেমন মিষ্টান্ন। আবার সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্তকে বিষ প্রয়োগ আরোগ্যের কারণ হয়। মানবে সেইরূপ সর্ব্বাবস্থায় কেবল মাত্র সত্ত্বগুণ শুভকরী হয় না। তপস্বী ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ ছাড়িয়া রজ তম গুণের বৃদ্ধি করিলে, তাঁহার তপস্যাহানি অবশ্যম্ভাবী। ক্ষত্রিয় দেশরক্ষায় দেশাক্রমণকারীর বিরুদ্ধে রণ মত্ত হইয়া রজ তমগুণ পরিত্যাগ করিলে তাহার দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী। ধন বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত কালে বৈশ্য বা শূদ্রের একমাত্র সত্ত্বগুণের আশ্রয় লওয়া অবিধি। সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের যথাযথ যথাকালে যথা স্থানে প্রয়োগ অভাবে জাতির পতন হয়।

আজ ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ ঐ ত্রিগুণের যথাযথ প্রয়োগের অভাব। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রসূত সদ্বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্মকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইল, তাহার ফলে ব্রাহ্মণে না রহিল সত্ত্বগুণের প্রভাব, না রহিল রজ তমগুণের যথা প্রয়োগ। দেশে ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন

বিভাগে কোন উপকার হইল না। ক্ষত্রিয় তাঁহার বর্ণোচিত ত্রিগুণৈক গুণাশ্রয় না করার কারণে আজ ভারতবর্ষ হইতে বলবীর্য্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কাযেই বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। বৈশ্য শূদ্র আজ কাল আর আপন বর্ণাশ্রিত বিভাগে থাকিতে চাহে না, ব্রাহ্মণের মত বাহ্যিক উপবীত গ্রহণ করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে যত্নবান, তাহাদের ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ যতটুকু থাকা কর্ত্তব্য তাহাও হারাইয়া ফেলিয়া রজ তম গুণের অতি বৃদ্ধি সাধন করে। তাহার ফলে না হয় তাহাদের যথার্থ জ্ঞান বৃদ্ধি, না হয় তাহাদের ও দেশের পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি।

আজ ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ ঐ ত্রিগুণের মর্ম্ম জ্ঞানের অভাব। সাধারণ লোক ভাবেন ঐ ত্রিগুণের একৈক গুণ প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র, কোনটীর সঙ্গে কোনটীর সম্পর্ক নাই। এই ধারণা একেবারে ভ্রমাত্মক। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে হইলে, রজতমগুণ একেবারে বিদূরিত করিলে চলিবে না। রজ তমগুণ প্রসূত উপকারিতা পাইতে হইলে সত্ত্বগুণ একেবারে ছাড়িলে কোন কার্য্যকারিতা সম্ভব নয়। সত্ত্বগুণের স্থিতি, রজ তমগুণের উপরে বিকশিত পদ্মের স্থিতি, সমল সলিল ও মৃত্তিকার উপরে। রজ তমগুণ একেবারে ছাড়িয়া কখন সত্ত্বগুণের স্থিতি হইতে পারে না, কেবল মাত্র দ্রষ্টব্য এই যে সত্ত্বগুণের আবশ্যক হইলে উহাকে রজ তমগুণের উর্দ্ধে রাখিতে হইবে। যাজ্ঞিক্ তপস্বী ধ্যান ধারণার সময়ে সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যজ্ঞের বলিদান সময়ে তাঁহাকে রজ তম ভাবাপন্ন হইতে হয়, নতুবা যজ্ঞ সম্পাদন হয় না। এ ক্ষেত্রে মূলে সত্ত্বগুণ রহিল, দেব-কার্য্য করণের ইচ্ছা রহিল, আর কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত রজতম-গুণের বহির্বিকাশ হইল। মোট ত্রিগুণের আশ্রয় না লইলে কোন কার্য্য হয় না।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য রজতম গুণের আধিক্য আশ্রয় করিতেন কিন্তু সত্ত্বগুণই রজতমগুণের মূলে না থাকিলে ফলাফল শুভকরী হয় না। নর বধের জন্য ক্ষত্রিয় তরবারি উত্তোলন করিলেন ; এই নরবধ যদি তাঁহার স্বার্থের কারণে, ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ কারণে প্রযুক্ত হয়, তাহার ফলে ক্ষত্রিয়ের পতন, কেন না একমাত্র তমভাবাপন্ন হইয়া ঐ কার্য্য হইল। আর যদি নরবধ দেশ রক্ষার্থে আবশ্যক হয়, তবে ক্ষত্রিয়ের যশবৃদ্ধি সুনিশ্চিত, কারণ ঐ কার্য্যের মূলে সত্ত্বগুণ, দেশহিত, স্বার্থ ত্যাগ। বৈশ্য ও শূদ্র, কৃষি, ব্যবসা ও বাণিজ্য দ্বারা আপনার ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি কারণে রজতম গুণের আশ্রয় লইতেই হইবে কিন্তু সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সত্য-পরায়ণতা, বিশ্বাস, সততা, অঙ্গীকার পালন না থাকিলে অবনতি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার কারণে অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত। যিনি সত্ত্বগুণের দাম্ভিক সাজিলেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় দেশের একটী অকর্ম্মণ্য জন্তু। ভগবানে নির্ভর করার ভাণ করিয়া চুপ চাপ, অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে যে ভগবানের আজ্ঞা তাহা তাঁহার প্রতিপাল্য বোধ করেন না। আর যিনি রজতমগুণের গুণী সাজিলেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে দেশের ও সমাজের একটী স্বেচ্ছাচারী অপকারক। ভারতবাসী! এই অন্ন সমস্যা, জীবন সমস্যার দিনে সত্ত্বগুণ ভিত্তি করিয়া, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় তোমার রজতমগুণ দ্বারা ভারত আকাশ ছাইয়া ফেল, নিশ্চয়ই একদিন বিধাতার প্রসাদে ভারত ভূমিতে সুশীতল শান্তি বারি পতিত হইবে।
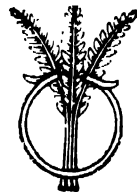
নেশা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

ব্যাণ্ডো কোম্পানীর এফ্‌ বি ব্যাণ্ডো ওরফে ফকীর বাঁড়ুয্যে হালে আমীর হয়েচেন। পার্ক ষ্ট্রীটে চার তলা বাড়ী, তিন খানা হাওয়া গাড়ী, বাড়ীর পুরুষদের অঙ্গে হ্যাট-কোট-বুট, মেয়েদের হাই-হিল জুতার ওপর কাদা খোঁচার মত পা ফেলে চলা ইত্যাদি কোন আধুনিক অনুষ্ঠানের ত্রুটি-ই এ পরিবারে আছে, অতি বড় শত্রুতেও একথা এখন বল্‌তে পারবে না। আর শুধু তাই নয়, বাঁড়ুয্যে সাহেবের আতিথেয়তা—অবশ্য ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে, তো কলকাতা সহরে প্রবাদ বচনের সামিল হয়ে গেছে। তাঁর বাড়ীর ডিনার পার্টিতে নিষিদ্ধ মাংস চর্ব্বণ না করেচেন এমন অ্যারিষ্টোক্রাট ক'লকাতায় মেলা ভার। এহেন বাঁড়ুয্যে সাহেব কিছুদিন হল—লোকে বলে—ক্ষেপে গেছেন। পার্ক সার্কাস থেকে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত চলতে হ'লেও তিনি নাকি আজকাল মোটর বিদায় করে হেঁটে যান! প্রায় তিন মাস হ'ল একটিও ডিনার পার্টি বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে হয় নি। বাড়ীর কর্ত্তা কথাবার্ত্তা বড় একটা কওয়া ছেড়েই দিয়েচেন। কোম্পানীর অফিসে যান আসেন, কাজ কর্ম্ম নিজে বড় একটা দেখেন না, অবশ্য দেখার প্রয়োজনও হয় না, অফিসের সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মচক্র ঠিক ঘুরে চলেচে—সেও বাঁড়ুয্যে সাহেবেরই প্রথম যৌবনের কীর্ত্তি। এখন আর তাঁর খাট্‌বার প্রয়োজন না থাকলেও তিন মাস পূর্ব্বেও তিনি সে কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিজে দেখতেন। র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীর দামী সুটগুলিতে এখন আর সময় মত ইস্ত্রী পড়ে না, আর তাই শুধু নয়—এমন কি বাঁড়ুয্যে সাহেবের গায়ের পোষাকেও প্রায়ই ধূলার প্রক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়। ত্রুটিটা অবশ্য মিসেস্ বাঁড়ুয্যের নয়, কেননা পার্ক ষ্ট্রীটে বাড়ী হবার পর থেকে তিনি মহিলা জাগরণের সভাসমিতি নিয়েই থাকেন, এসব তুচ্ছ কাজ করবার ফুর্স‌ৎ পান না, তবে এসব বিষয়ে বাঁড়ুয্যে সাহেব নিজেই অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সাহেবিয়ানায় ফিটফাট থাকা তাঁর জীবনের মহাব্রতের অন্যতম ছিল। এবম্বিধ বাঁড়ুয্যে সাহেবের এতাদৃশ উদাসীনতার কৈফিয়ৎ লোকের কাছে একটাই মাত্র হতে পারে এবং তা হচ্চে যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। বন্ধুরা বলেন, "হ্যালো ব্যাণ্ডো, তোমার হ'ল কি ?—মহাত্মা গান্ধী হবে নাকি হে ?" বাঁড়ুয্যে সাহেব জবাব দেন না, শুধু একটু করুণ হাসি হাসেন। কেউ কেউ বলে, এ ফ্যাশানী বিমর্ষতা। ধূলো ছুঁলে যার বরাতে কড়ি হয় তারই এমন melanoholia সাজে বটে!

সেদিন মিষ্টার ব্যাণ্ডো দপ্তর থেকে ফিরে দোতলার পশ্চিমের বারান্দাটার একখানি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে চষে-ফেলা বরফের ক্ষেতের মত টুক্‌রো টুক্‌রো আকাশ ছাওয়া সাদা মেঘ পুঞ্জকে লাল রং এ রঙিয়ে অস্ত যাচ্চে। তার এক ঝলক সোণালী আলো সাম্‌নের আমগাছটাতে পড়েচে। তার ডালের ওপর ঐ যে কাঠবেরালীটা লেজ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারও মাথার ওপরে যে এক ফালি আলো ঠিক্‌রে পড়েচে, তাও বাঁড়ুয্যে সাহেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। বাঁড়ুয্যে সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পৃথিবী যে এত সুন্দর, কত কাল তিনি তা অনুভব করেন নি! সূর্য্যাস্তলেখায়, সান্ধ্য বাতাসে, নীড়গামী পাখীর সঞ্চরণে, এমন কি অদূরে মাঠের মধ্যে রোমন্থনরত গাভীটার অলস চলনভঙ্গিমায় এত সুন্দরের আভাস কি করে এত দিন পরে তাঁর চোখে ধরা পড়ল? এসব ভাল লাগত, সে যে অনেক দিনের কথা,—তখন চোখে কৈশোরের মোহাঞ্জন, দুনিয়াটা চোখে পড়ত একটা বিচিত্র রোমান্সের চশমার ভেতর দিয়ে—কিন্তু তখন লাখে লাখে টাকা ছিল না, চারতলা অট্টালিকা ছিল না, রোলস্ রয়েস গাড়ী ছিল না,

আরো কত কি ছিল না। কিন্তু ছিল কিশোর বয়সের স্বপ্ন, যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, ছিল বালিকা বধূর সপ্রেম আত্ম-নিবেদন, ছিল কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষে একখানি মিষ্টি মুখের টোল পড়া গালদুটি ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে যাওয়া, যেখানে বাড়ীতে নিয়মিত সময়ের চাইতে ফিরতে একটু দেরী হলে একজোড়া ডাগর চোখ সোৎকণ্ঠায় অর্দ্ধভগ্ন আকাঠার জানালায় বারবার গিয়ে হানা দিত। সে স্বপ্ন ভেঙেচে, সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েচে, সে বালিকা-বধূ প্রৌঢ়া কর্ত্রী হয়ে এখন একের কাজ ছেড়ে দশের কাজে মন দিয়েচেন!

বেয়ারা পুরুষোত্তম বিকেলের মেইলের একখানা চিঠি ট্রেতে করে বাঁড়ুয্যে সাহেবের কাছে নিয়ে এলো। অলস ভাবে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা তুলে শিরোনামা পড়তেই বুকটা যেন তাঁর একবার ধক্ করে উঠলো! হস্তাক্ষর যেন পরিচিত, সুস্পষ্ট মেয়েলি ছাঁদে যেন সেই লেখা, যার চিঠি হপ্তায় একখানা করে না পেলে সহরে স্কুলের বোর্ডিংএ বালক ফকিরচন্দ্র হাঁপিয়ে উঠতেন। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে পত্রখানার ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি দেখে নিলেন—হাঁ সেই বটে—তাঁর বড় আদরের বড় দিদি—যিনি তাকে নিজের কলিজার মত ভালোবাসতেন। কত না শুব্ধ দুপুরে দু' ভাইবোনে তাঁরা চুরি করে তেঁতুল কাসুন্দী খেয়েচেন, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে যে দিদি তাঁকে কত দিন আম কুড়িয়ে গোপনে কোঁচড় ভরে উপহার দিয়েচেন, বর্ষার ভাঙনে যে দিদির তৈরী করা কাগজের নৌকো জলে ভাসিয়ে তাঁর শৈশব ক্রীড়ার সখ মিটত, এ তাঁর সেই দিদি যমুনা। ব্যগ্র দৃষ্টিতে ফকিরচন্দ্র চিঠিখানিকে পড়ে যেতে লাগলেন। পড়া শেষে হয়ে গেলে খোলা চিঠি শুদ্ধ ডান হাতখানি কোলের ওপর ফেলে তিনি ভাবতে লাগলেন এবং ভাবতে ভাবতে সুদূর অতীত জীবনের কত টুক্‌রা টুক্‌রা ছবি তাঁর মনশ্চক্ষের সাম্‌নে বায়োস্কোপের ছবির মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। পত্রখানা কোনো কোনো জায়গায় তাঁর দু'বার তিনবার চারবার পড়েও তৃপ্তি হচ্ছিল না। দিদি লিখেচেন, "কত কাল বুদ্ধু তোমায় দেখি না, শুধু দেখি না নয় পত্র লিখেও জবাব খুব কমই পাই। পর্শু ভাইফোঁটা গেল, আজ প্রায় পঁচিশ বছর হ'ল তোমায় ফোঁটা দেবার সুযোগ হয় নি, তবু প্রতি বৎসর এ দিনটিতে তোমার কথা ভাবি—যদি তুমি কাছে থাকতে।" এতটুকু পড়ে বাঁড়ুযো সাহেব থামেন, ভাবতে থাকেন দিদি কি লক্ষ্মী, এখনো সেই ডাক 'বুদ্ধু' তিনি ভোলেন নি, তাকে ফোঁটা দেবার জন্য তার প্রাণ বছর বছর আকুলি বিকুলি করে। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো সম্মানিত লোকটিকে 'বুদ্ধু' বলে ডাকবার লোক অন্ততঃ একটিও তাহলে বেঁচে আছে। মনে পড়ে এই নামের ইতিহাস। ফকিরচন্দ্রের জন্মের সময় তার আট বছরের প্রবীণ বড়দা সবে মাত্র "ঠাকুরমার ঝুলি" পড়েচেন, তার মধ্যেকার বাঁদরবেশী রাজপুত্রের 'বুদ্ধু' নামটা তার ভারী ভালো লেগেচে। সে বায়না ধরল নতুন ভাইটির নাম 'বুদ্ধু' হবে; বোধ হয় আশা—যে একদিন তার ঐ ক্ষুদে ভাইটিও হয়ত গল্পের 'বুদ্ধু'র মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারের পাঁচ মহলা ঘুমন্ত পুরীর মেঘবরণ চুল কুচবরণ রাজকন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে। সেই বড়দা আজ স্বর্গে।

বাঁড়ুযো সাহেব পড়তে লাগলেন, "কতদিন তো তুমি দেশ ছাড়া, একটি বারও তোমার কি গাঁয়ের জন্য মন পোড়ে না? তোমাদের আজ কত ধনমান—সহরে গিয়ে বাসা বেঁধেচ, কিন্তু এদিকে এ সোণার গাঁ যে ছারেখারে যাচ্ছে—জলের কষ্টে, ম্যালেরিয়ায়, শিক্ষার অভাবে। বড়দা মারা গেছেন আজ সাত বছর, সেই থেকে তোমাদের বাড়ীতে তালা বন্ধ। ভাগ্যে আমার গাঁয়েই বে হয়েছিল, তাই আমার কাছে বাড়ীর চাবি রয়েচে, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে ঘর বাড়ীর ওপর চোখ বুলিয়ে আসি। সেদিন গেছলুম, দেখলুম দরোজা জানালা গুলাতে ঘুণ ধরেচে। তোমার পড়বার ঘরটায় দেয়ালের আলমারীতে যেখানে তখন সব মোটা মোটা বই থাকত এখন উড়ে মালীটার তামাক পানের সরঞ্জাম থাকে। বড়দার শোবার ঘরে সেগুনের চৌকীখানা এখনো তেমনি পাতা আছে; বৌদিদিও তো দাদা মরার পর সেই যে বাপের বাড়ী গেছেন আর ফেরেন নি। তোমার ছেলে বেলাকার রংকরা কাঠের সেই ঘোড়াটা দেখলুম চৌকীখানার ওপর

চিৎ হ'য়ে আছে। মনে পড়ে পিশিমা সেবার অর্দ্ধোদয় স্নানে প্রয়াগ গিয়ে তোমার জন্য ওটা এনেছিলেন। ঘোড়া পেয়ে তুমি চার রাত ওটাকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছিলে—একদণ্ড কাছ ছাড়া করতে না। ঘোড়াটার একটা ঠ্যাং ও লেজ ভেঙ্গে গেছে চোখে পড়ল।

"বাগানে বারোমাসী কাঁঠালের গাছ দুটো তো সেবার ঝড়ে পড়ে গেল। ও কাঁঠাল খেতে তুমি খুব ভালোবাসতে। তালের গাছটা এখন বেশ বড় হয়েচে, ফল ধরে। সেদিন আমাদের জগা চাকরটা বলছিল ওটার মাথা থেকে আমাদের বাড়ীর চিলেকোঠা নাকি বেশ দেখা যায়। তোমাদের বাড়ী থেকে এবাড়ী আস্‌তে সেই যে চাটুয্যেদের আঙ্গন পেরিয়ে মৌলিক বাড়ীর বেল তলা দিয়ে, তাঁতী বাড়ীর বেতবনের পাশ কাটিয়ে, বারোয়ারী কালীতলার বটগাছের নীচ দিয়ে কালিদহের তীরে তীরে এসে তবে আমাদের বাড়ী পৌঁছুতে হত, সে হাঙ্গামা এখন আর নেই। সোজা পথে যে ঘন বনটার জন্য অত ঘুরে আস্‌তে হত সেটা সাফ করা হয়েচে, রাস্তাঘাট বসেচে, দু' এক খানা কোঠাবাড়ীও সেথায় উঠেচে। এত দিনে গাঁয়ে কত অদল বদল হয়ে গেল,—এলে সে সব দেখে নিশ্চয় বলচি তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। একবার এসো না ?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানা কতবার পড়ে বাঁড়ুয্যে সাহেব তন্ময় হয়ে অতীতের স্মৃতিসাগরে অনেকক্ষণ ডুবে রইলেন ;—সম্বিৎ হোলো তখন যখন ক্রোড়ন্যস্ত হাতের ওপর ঝাপসা-হয়ে-আসা চোখ থেকে টপ করে একফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল। ধীরে তখন উঠে তিনি পড়বার ঘরে গিয়ে তক্ষুনি চিঠির জবাব লিখতে বসে গেলেন। অন্যান্য কাজের চিঠি গুলি সেদিন বাঁড়ুয্যে সাহেবের মতো পরম কেজো লোকের কাছেও কি অদ্ভুত কারণে যেন অকিঞ্চিৎকর প্রয়োজনহীন মনে হতে লাগল।

বাঁড়ুয্যে সাহেব লিখলেন,—"দিদি গো, তোমার বুদ্ধু সাম্‌নের হপ্তায় বাড়ী যাচ্ছে। আজ ২২শে, আমি বোধ হয় দিন দশের জন্য কায থেকে রেহাই নিতে পারব। সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে রেলগাড়ীতে চড়ে ছুটব তোমার কোলে ; আবার তেমনি ছেলেবেলাকার মত তোমার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে চুলে বিলি দিতে দিতে গল্প বল্‌তে হবে কিন্তু। পঞ্চা, মেঠো, জগা ওরা সব কে কি কচ্চে কিছু লেখনি কেন ?—ওরা আমায় কত ভালোবাসত তা ত তুমি জানতে। জানো দিদি আজ মনে হচ্চে কি করে গাঁ ছেড়ে এই ক'লকাতার হট্টগোলের মধ্যে সারা জীবন কাটালুম। আমি ঠিক বুঝচি আমার সোণার গাঁয়ের রাঙামাটির পথের বাঁশী আমায় 'আয় আয়' বলে ডাকছিল, তাই কিছু দিন থেকে আমার কোনো কাযে মন বসত না। যশ মান প্রতিপত্তি অর্থ সবই বিধাতা আমায় হয়ত পাওনার অতিরিক্ত দিয়েচেন ; আজ মনে হচ্চে এত পেয়েও কিছুই পাই নি—এসবের পসরা বয়ে বয়ে আমি আসল বেসাতির বেচা কেনায় ফাঁকিতে পড়ে গেছি। জানচ দিদি—" এ পর্য্যন্ত লিখতেই ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। বিরক্ত মুখে ভ্রূকুঞ্চিত করে বাঁড়ুয্যে সাহেব কলমটা রেখে ফোনের রিসিভার কাণে দিয়ে দাঁড়ালেন। শুন্‌লেন আসানসোলের কালিহাটি ষ্টেটের ম্যানেজার ফোন কচ্চে। এই কালিহাটির ষ্টেটটির পেছনে তাঁর প্রায় পঁচাশী হাজার টাকা লোকসান গেছে। একটি অতি উৎকৃষ্ট কয়লার খনি হিসাবে তিনি এ জায়গাটা কিনে-ছিলেন ; কিন্তু সমস্ত জীবনের এই একটা ব্যাপারেই তাঁর লোকসান বরাতে লেখা ছিল। খনিতে কায আরম্ভ হবার পরে প্রথম শ্রেণীর কয়লা ওপরের স্তরে কিছু পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার পরে যা পাওয়া যেতে লাগল তা একেবারে অচল। আশায় আশায় বাঁড়ুয্যে সাহেব অনেক টাকা খরচ করে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় অনেকটা দূর পর্য্যন্ত খোঁড়ালেন বটে, কিন্তু ফল কিছুই পেলেন না। সেই থেকে ও ষ্টেটটাতে ব্যয়ই কেবল আছে, 'আয় নেই। কেউ কিন্‌তেও চায় না : জেনে শুনে কে ক্ষতির বোঝা ঘাড়ে নেবে ?

কালিহাটির ম্যানেজার বল্লেন—"একটা বিশেষ জরুরী সংবাদ আছে।"

বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে বাঁড়ুয্যে সাহেব শুধোলেন—"কি ?"

ম্যানেজারের স্বর অত্যন্ত উত্তেজিত, তিনি দ্রুত বলে যেতে লাগলেন—"আমার পরিচিত একটি সাহেব—একজন কোটিপতি কালিহাটির ষ্টেটটা আপনার ডবল দামে কিনে নিতে চাইছেন। তিনি একজন experienced miner। বল্‌ছেন এ জমিটার অনেক স্থানে খুব rich manganese deposit আছে। তা work করালে লক্ষ লক্ষ টাকা আস্‌তে পারে। আপনার সঙ্গে তিনি একবার এক্ষুনি দেখা করে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে চান। তিনি গ্রেট্ ইষ্টার্ণে আছেন এবং আমায় আপনাকে ফোন করে বল্‌তে বল্লেন যে তাঁর আজ একটু জ্বর হওয়াতে ঘর থেকে বার হওয়া উচিত না বলে আপনার ওখানে যেতে পাল্লেন না। আপনি যদি দয়া করে তাঁর সঙ্গে আজ রাত আটটায় হোটেলে দেখা করতে পারেন তো ভালো হয়। তার্প তিনি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একবার কালিহাটি যেতে চান। আমি আমার হোটেল থেকে ফোন কচ্চি, আপনি বল্লে আমিও আটটায় গ্রেট ইষ্টার্ণে পৌছুতে পারি। আর এক-বার ঘণ্টা দুই আগে আপনাকে ring করে পাইনি।"

ম্যানেজারের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে বাঁড়ুয্যে সাহেবের মুখে অখণ্ড মনোযোগের আভাস এবং সুগভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠ্‌ল। চোখ দুইটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলে উঠ্‌ল। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যি তাঁর সৌভাগ্য ক্ষুণ্ণ হবার নয়। যদি সম্ভব হয় এই সাহেবের সঙ্গে একত্র কারবার করে লোকসান ৮৫ হাজার টাকার দশগুণ হয় ত তাঁর পকেটে ফিরে আস্‌বে। হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর নির্ব্বিরোধ শান্তির ক্লান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার একটা সুযোগ তবু এতদিন পরে ফের উঠ্‌ল। অর্থে তাঁর অরুচি ধরে গেছে বটে কিন্তু এতবড় একটা লোকসানকে সুপ্রচুর লাভে রূপান্তরিত করে তোলা—সে আলাদা কথা। সে শুধু অর্থলালসার নয়, তাতে পৌরুষ আছে, আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে। অসহিষ্ণু ভাবে চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে মিনিট খানেক থেমে বাঁড়ুয্যে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"সাহেবটির নাম?"

"আজ্ঞে মার্টিন—H. B. Martin—1st floor Great Eastern Hotel।"

"বেশ—আমি আটটায় সেখানে পৌছুচ্চি, তুমিও এসো।"

রিসিভারটা রেখে বাঁড়ুয্যে সাহেব প্রকাণ্ড ওয়াল ক্লকটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন আটটা বাজতে ষোল মিনিট বাকি। কলিং বেল্‌এর বোতামটা টিপতেই বেয়ারা এসে হাজির হ'লে তা'কে হুকুম দিলেন—"মোটর তৈরী করতে বলে দে, এক্ষুণি বেরুতে হ'বে। সর্দ্দি লেগেছে, শরীরটা ভালো নেই—Sedan bodyর গাড়ীখানা যেন আনে।" আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"মেঘও দেখচি বেশ জমেছে।"

অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিখানা টেবিলের ওপরে অমনি খোলা রেখে এসে বেশ পরিবর্ত্তন করবার জন্য বাঁড়ুয্যে সাহেব ড্রেসিং রুমে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে বাঁড়ুয্যে সাহেবের রোলসরয়েস খানা হুস্ করে বাড়ীর গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দমকা হাওয়ায় বেচারী যমুনা দিদির চিঠির সঙ্গে বাঁড়ুয্যে সাহেবের অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠিখানা টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে ঘরের কোণায় আশ্রয় নিলে। পরদিন ঐ ঘরে মার্টিন আর ব্যাণ্ডো বসে যখন Kali-haty Manganese Works Ltd. এর বিধিব্যবস্থার খসড়া কচ্ছিলেন ততক্ষণ বেয়ারা ঘর ঝাঁট দিয়ে আগের দিনের যত আবর্জ্জনা রাস্তার dustbinএ ফেলে দিচ্ছিল। দিদির কাছে লেখা ছেলে মানুষী চিঠিখানা সেদিন নজরে পড়লে হয়ত ব্যাণ্ডো সাহেবের লজ্জা হ'ত।

কাঁটা

[শ্রীনিখিলেশ রাহা]

তুমি আজো বল মোরে—
মোর ভালবাসা আজিও ভোলোনি
দীর্ঘ দিনের পরে
তুমি নাকি আজো অতীতের স্মৃতি
রাখিয়া গোপন করি'
দিবস-রজনী বরষ ভুলেছ মোর স্নেহ-মুখ স্মরি',
এতদিন পরে আজ আসিয়াছি—
তুমি কি গিয়াছ ভুলে
সেই আগেকার দিনগুলি হায় মিলন লগন কূলে?
—এই কথা তুমি শুধাইলে আজ
আমি কি বলিব বল
য' বলিতে চাই বলিতে পারি না
আঁখি করে ছল ছল!

—মিলন-লগন—মিলন-লগন—পাঁচটি বছর পরে
তুমি আসিয়াছ, তুমি ভোলো নাই,
ভালবাস আজো মোরে!
একটি ক্ষণের দাবী মিটাইতে
মানুষ পারে না হায়
নিমেষ নিমেষ প্রতি পলে পলে
কত কিছু ভেঙ্গে যায়,
মহাকাল পথে কত রাত চলে—
চলে দিন তারি পিছে
বরষের স্মৃতি ঢাকা পড়ে যায়
নব বরষের নীচে!
চলে রবি শশী—চলে গ্রহ তারা
তারো আগে ছুটে চলে
এই ধরণীর মানব মানবী আর আসিবে না ব'লে;
—এমনি দিবস এমনি রজনী আমার কথায় স্মরি
তুমি রাখিয়াছ যতন করিয়া বুকের আঁচলে ধরি'?
স্বপ্নের মাঝে ভুলিয়াই বুঝি বলেছিনু—ভালবাসি
সে মিছা কথারে কেন তুমি আজ
বহিতেছ এত হাসি?

কেন বল তুমি 'বন্ধু আমার, সকলি ভুলেছি আমি—
তোমারেই শুধু ভুলিতে পারি না
ভাবিতেছি নিশি যামী!'
—এই সব কথা তুমি আজ বল মোর শুধু মনে হয়
আমি যারে আজ ভালবাসিতেছি
সে ত' বুঝি তুমি নয়!
তোমারি মতন হয়ত সে ছিল হয় ত আজিও বুঝি—
তোমারই মাঝারে লুকাইয়া আছে
তাহারে পাই না খুঁজি',
—তুমি বুঝি আজ মেঘের মতন
মেলিয়া শ্যামল মায়া
আকাশেরে মোর ঢাকিয়া রেখেছ
বিছায়ে কঠিন ছায়া!
মাঝে মাঝে এই ছায়া কেন সরে—
কেন মোর হয় মনে
তুমি বুঝি তার হাতখানি ধরি' আনিয়াছ তব সনে!
আমি যারে আগে ভালবাসিতাম
আজো যারে ভালবাসি
যার কথা ভাবি সবারে ভুলিয়া
নয়নের জলে ভাসি,—
স্মরণে আসে না সে কখনো মোরে
বলেছে প্রেমের কথা—
কখনো বলেছে যাহা ব'লে আজ
তুমি মোরে দাও ব্যথা!
আমি যারে আগে ভালবাসিতাম তাহার অধর 'পরে
যে হাসি ফুটিত ফুলের মতন সরল শোভায় ভরে'
সে হাসি ত' তুমি ভুলিয়া গিয়াছ—
আজ তব এত হাসি
তার মাঝে তব সেই হাসি কই
আমি যারে ভালবাসি?

আজ কই তব নয়নের জল—কোথা তব অভিমান
সব কিছু তুমি হারায়ে ফেলিয়া
মাগিতেছ পাশে স্থান !
আজ আমি মোর দু' চোখ মেলিয়া
তোমারে চাহিয়া দেখি
পলকও ফেলিনা পাছে তার মাঝে
কিছু চোখে যায় ফাঁকি,
এত খুঁজি তবু তারে কোথা পাই—
হায় রে নদীর তীর
গত বরষার স্মৃতি পড়ে' আছে কোথা উচ্ছল নীর ?
—বর্ষা আজিকে চলিয়া গিয়াছে
পাষাণের ঘাটে বুঝি
দু' একটি তার শ্যাওলার দাগ
মরিতেছি আমি খুঁজি !
আজ তব গায়ে ভরা যৌবন—নব সম্ভার বেশ
নয়নের কোণে কামনা-বহ্নি মাথায় দীঘল কেশ ;
সকলেই বলে সুন্দর তুমি—যৌবন আজ তব
তনু দেহখানি জড়ায়ে জড়ায়ে ফুটেছে মধুতে নব ,—
তুমিও আজিকে জান মনে মনে কত ধনে ধনী আজ
আমি তবু কাঁদি তব ধন আজ
এত মোরে দেয় লাজ !
আমি শুধু ভাবি সেই এক কথা—
সেই যে প্রাচীন কালে
গল্পে শুনেছি গ্রামের প্রান্তে চলে নদী দ্রুততালে ;
তারি এক তীরে পিপাসিত কবি—
ওপারে কিশোরী মেয়ে
রাতদিন নাই কবি শুধু থাকে
ও মেয়ের মুখ চেয়ে ;—
একদিন কবি ঘুমায়ে পড়েছে ;—
রাতের আকাশতলে
নির্ম্মল নীল স্বচ্ছ নদীটি হীরকের মত জ্বলে,—
দেখিতে দেখিতে বাড়ে তার জল
বাড়ে তার পরিসর
ওপারের কূল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলে জল দ্রুততর,
—এপারের কবি ঘুমাইয়া রয়—নয়নে ঘুমের ঘোর
ওপারের সেই কিশোরী মেয়ের
স্মৃতিতে পরাণ ভোর ;
দেখে সেই কবি সে মেয়েটি যেন ওপার হইতে এসে
এপারে তাহার বক্ষের পাশে বসিয়াছে ভালবেসে—
কবির কণ্ঠে তার হাতখানি—মুখখানি মুখ পাশে
ঘুম ভুলে কবি দু'হাত বাড়াল
তাহারে পাবার আশে !
নাই নাই সেথা আর কেহ নাই—
ওপারেতে শুধু জল
মাথার উপর নীলাকাশ হাসে নিষ্ঠুর খলখল—
চীৎকার করি ঝাঁপাইয়া কবি পড়িল গহীন নীরে
আর আসিল না এই জীবনের
সেই তীরটিতে ফিরে !

তোমারে দেখিয়া আমারও আজিকে
তেমনি বেদনা লাগে
যাহা ছিল মোর তাহা যেন নাই
এই কথা বুকে জাগে ;-
আমি আজ কাঁদি—
মাধবীর লতা উঠানে ধরে না আর
বাড়িয়া বাড়িয়া চলে শুধু চলে
কে রাখে হিসাব তার ?
আজ আর সে যে নহে ছোট লতা—
লোটে আজ ফুল ভ'রে
আজ তার বোঝা কি করিয়া আমি
রাখিব বক্ষে ধ'রে ?
—কি করিয়া বলি—সে যখন বলে
এতই প্রেমের কথা
তব ভালবাসা আজ সখি মোরে
দিয়ে যায় শুধু ব্যথা,
তুমি যবে বল ভুলিতে পারি না—
আমি কাঁদি বেদনায়
কি করিলে আজ জীবন হইতে
স্মৃতি তব মোছা যায় ?

বৈষ্ণব-কবি বসন্তকুমার

[শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত]

[বাঙ্গালা ১২৮১ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কড়চা-ডাঙ্গা গ্রামে বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ যাদবচন্দ্র সেনগুপ্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। বসন্ত-কুমার প্রথমে মাচদিহায় পরে রাণাঘাটে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বহুদিন যাবৎ ইনি সরকারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বিভাগে চাকুরি করিয়া আসিতেছেন। আজিও ইনি আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন্ নাই। 'পল্লীবাসী', 'সরস্বতী', 'বান্ধব', 'অবসর', 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার অনেক কবিতা, গান ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি 'কবিতা-কুঞ্জ' নামক কাব্যের রচয়িতা।]

ইতিহাসে কিছু সকলেরই স্থান হয় না। লোক-লোচনের অন্তরালে, দৃশ্য-যবনিকার নেপথ্য-নাট্যে, যাহারা আপনার শ্রম ও চেষ্টার অক্লান্ত বিনিময়ে অভিনয়ের কল্পনাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তোলে, দর্শক তাহাদের খোঁজ লইবার প্রয়োজন বোধ করে না। শা-জাহান প্রেয়সী মম্‌তাজের স্মৃতি বুকে করিয়া তাজমহল আজি যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া আছে—শা-জাহানকে আমরা চিনি, মম্‌তাজকে আরও ভাল করিয়া চিনি। কিন্তু যে অগণ্য দরিদ্র শ্রম-জীবী ইঁট, কাঠ ও প্রস্তর যোগাইয়া শা-জাহানের এই 'মর্ম্মর-স্বপ্ন'কে বাস্তবের ছায়া দিয়াছে, ইতিহাসে তাহাদের নামগন্ধও নাই। সেক্সপিয়ারের বিজয়-রথ আমাদের মর্ম্মের বাঁধা-পথ বাহিয়া চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু কীড, ন্যাস্, পীল্, মারলো যাঁরা সেক্সপিয়ারের এই জয়-যাত্রার অগ্রদূত, তাঁদের কয়জনের সহিত আমাদের পরিচয় আছে? এই জন্যই বোধ করি কার্লাইল বলিয়াছেন, 'মহতেরা অতিরিক্ত মহৎ বলিয়াই তাঁহাদের মহত্ত্বের আওতায় পড়িয়া ছোটরা বড় হইতে পারে না।' বস্তুতঃ আমরা অতি-মানবের দাবী পূরণ করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই মানবকে ছোট করিয়া ফেলি। আজ আমরা যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেইরূপ একজন অল্পখ্যাত কবি—যদিও আধুনিক ভাব-বিবর্ত্তনের মূলে ইনি গোপনে গোপনে অনেকখানি রস যোগাইয়াছেন।

কবি হিসাবে বসন্তকুমারের প্রধান বিশেষত্ব এই যে রবীন্দ্রনাথের যুগে ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে অবশ্য ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহেন—'এষা'র কবি অক্ষয়কুমার এবং 'অশোক-গুচ্ছে'র কবি দেবেন্দ্রনাথও রবি-প্রভাব হইতে মুক্ত এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করা সঙ্গত যে তাঁহাদের সহিত বসন্তকুমারের তুলনা হয় না। তবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা-মণ্ডপের এক প্রান্তে তাঁহার যে নিভৃত স্থানটুকু আছে, সে টুকুতে অবশ্য কোন আধুনিকের প্রবেশাধিকার নাই।—

কীট্‌সের সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্র্যাডলে বলিয়াছেন, "He is an Elizabethan born out of time." বসন্তকুমার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, "He is a Vaisnab born out of time." তাঁহার রচিত কবিতাবলী পড়িয়া একটী জিনিস প্রথমতঃই চোখে পড়ে—ইহাদের ভাব-ভাষা, রচনা প্রণালী, কোনটাই যেন বর্ত্তমান সময়ের মত নয়; কেমন একটা সেকেলে গন্ধ ইহাদের সারা অবয়ব বেড়িয়া মাথান! চ্যাটারটন্ চসারের অনুকরণ করিয়া তাঁহার সমকালবর্ত্তীয়দের বিস্মিত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও 'ভানুসিংহ' লিখিয়া ডাক্তার নিশিকান্তকে ভড়্‌কাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের 'ধাপ্পা' পাকা জহুরীর চোখ এড়াইতে পারে নাই। বসন্ত-কুমারের রচনা সেরূপ ইচ্ছাকৃত অনুকরণের ফল নয়। প্রাচীনেদের রচনাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিবন্ধন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কবিতাবলী প্রাচীনেদের 'ছাঁচে' ঢালা হইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে ইংরাজী লেখক চার্লস্ ল্যাম্বের রচনা-পদ্ধতির সহিত তাঁহার কতকটা মিল দেখিতে পাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার সহিত রবীন্দ্র-কবিতার তুলনা করিয়া স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণবেরা নিষ্ফল

মোহের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কি উদার আশার বাণী, কি বিপুল স্বাতন্ত্র্যের কথা শুনাইয়াছেন।" অজিত বাবুর মত রসবেত্তা ব্যক্তিও বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন দেখিয়া দুঃখ হয়। 'সোণার তরী'র 'বৈষ্ণব-কবিতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীর প্রেম-কাব্যের মানুষী বা ব্যবহারিক দিকটীর প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা হইতেই সম্ভবতঃ এই ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে বৈষ্ণব-কবিতা ও রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—রবীন্দ্রনাথের সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর সকল ভাবের কবিতা লইয়াই তিনি আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে দেখাইয়াছেন যে রবীন্দ্র কাব্যের প্রাণ হইতেছে intellect (জ্ঞান) এবং বৈষ্ণব-কাব্যের প্রাণ হইতেছে sentiment (অনুরাগ)। একথা আরও স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক রজনীকান্তের পারমার্থিক গানের সহিত কবি-গুরুর পারমার্থিক গানের তুলনা করিলে। রজনীকান্ত তাঁহার উপাস্যের চরণে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন –

"আমি অকৃতী অধম ব'লেও ত মোরে,
কম ক'রে কিছু দাওনি"।

রবীন্দ্রনাথের আত্ম-নিবেদনের ভিতরেও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই—

"আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে।"

এই জন্যই রজনীকান্তকে আমরা বলি ভক্ত আর রবীন্দ্রনাথকে বলি সাধক। বৈষ্ণব-কবিরাও ছিলেন ভক্ত; তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি ছিল আন্তরিক বিশ্বাস-প্রবলতার গূঢ় ইঙ্গিত লব্ধ, কাজেই তাঁহারা প্রেমকে অখণ্ড ভাবে লইয়াছেন, তাহার আদ্যন্ত খুঁটি নাটি করিয়া তলাইয়া দেখেন নাই। আর প্রেম যে রাজ্যের ব্যাপার, সেখানে intellect নিতান্তই বাহিরের বস্তু, sentimentই তাহার সব। এই জন্যই চণ্ডীদাসের—

"আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া" বা জ্ঞানদাসের—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥" প্রভৃতি কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের—

"আমরা দু'জনে এসেছি ভাসিয়া যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।" অথবা

"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো।" প্রভৃতি কবিতাকে আমরা এক পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, যেহেতু ইহারা এক ধাতের (school) রচনাই নয়। একথায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গৌরবের তিল মাত্র হানি করা হয় না বা আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নয়, আমরা তাঁহার যাদুকরী প্রতিভায় মুগ্ধ—তাঁহার কবিতার দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, সে চেষ্টাও আমরা করি নাই। আমরা দেখাইতে চাহিতেছি আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার সহিত প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার ভাব ও প্রকৃতিগত পার্থক্য কোন্‌খানে!

বসন্তকুমারের রচনায় কিন্তু আধুনিক যুগের অনুরূপ এই intellectuality দেখিতে পাই না। আধুনিকদের যুক্তির আবর্ত্তে স্বভাবতঃই মানুষের সত্যকার স্বরূপটী ঢাকা পড়িয়া যায়; সমুদয় লৌকিক সামাজিক কাল্পনিকতা হইতে মুক্ত অন্তরের আসল মানুষটীকে আমরা আধুনিক কাব্যে কোথায় পাই? এইটী পাই প্রাচীন কাব্যে, পাই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসে! বসন্তকুমারের কবিতায় যদি লক্ষ্য করিবার কিছু থাকে ত' এই জিনিসটী। তাঁহার কবিতার অবলম্বিত বিষয়ও যেমন প্রাচীন, তাহার উপযোগী পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়াকে তিনি তেমনি প্রাচীন ঢংএ গড়িয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মান' শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"নিকুঞ্জ কাননে, কুসুম আসনে, বসিয়া আছেন রাই।
বিবিধভূষণে, যত সখিগণে যতনে সাজাল তাঁই॥
নিরমিয়া সবে শ্যামল পল্লবে অপূর্ব্ব তোরণ দ্বার।
কুসুম শয়ন মনের মতন রচিল শোভার সার॥
অস্তে দিনমণি, মুদিল নলিনী, সমুদিত শশধর।
বিথারি কিরণ কুমুদ-জীবন করে ধরা শুভ্রতর॥"

কোন্ হারান' দিনের বৃন্দাবন-লীলা যেন এই কয়টী কথায় সহসা চোখের সম্মুখে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে!

বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ পর্যান্ত প্রেম-বিরহ লইয়া বহু কবিতা রচনা হইয়া গিয়াছে। এমন কি বাঙ্গালা কাব্যে প্রেমের হা-হুতাশ এখন একরূপ মামুলী ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই একটানা একঘেঁয়েমিতে না আছে আন্তরিকতা (intensity), না আছে রসোপলব্ধি (realisation)। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে যে টুকু নিতান্ত স্থূল ও বস্তুগত, জড়দেহের চরিতার্থতাতেই বা অসম্ভাবিত যৌন-লালসাতেই যাহার পরিসমাপ্তি, তাই আজ-কাল প্রেমের নামে বিকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের উপজীব্য যে প্রেম তাহা সাধনা-সাপেক্ষ ; দুঃখের দীর্ণ ও কৃচ্ছ্র কঠোরতাতেই তাহার পূর্ণ বিকাশ—এই জন্যই বৈষ্ণবের রাধা চির-বিরহিণী! রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—চণ্ডীদাস দুঃখের কবি মিলনের মধ্যেও তিনি আসল বিরহের ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন—

"দুঁহু কাঁদে দুঁহু কোরে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

বসন্তকুমারের কবিতা পাঠ করিলেও ইহাই প্রতীতি জন্মে যে তিনিও একজন দুঃখের কবি। তাঁহার ভাবোন্মাদিনী রাধা কখনও বর্ষার ঘন মেঘমালা দেখিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিতেছেন—

"ওহে জলধর, বরণ সম্বর,
ব্রজে কালো রূপ ধ'র'না।
দেখিলে তোমারে, শ্যাম-জলধরে,
মনে পড়ে তাকি বোঝ'না?"

কখনও বা বিরহ-বেদনায় অধীরা হইয়া যমুনার কূলে কূলে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন—

"কত জন আসে যায়
না হেরি সে নটবরে।
সেই তরু মূল, যমুনার তীর,
নীরবে র'য়েছে প'ড়ে॥
শূন্য হৃদয়েতে মোর
ফোটে না আশার রেখা।
কোন দিকে নাহি দেখি
তার চরণের লেখা॥"

কখনও যমুনা-তীরের চিরপরিচিত পথটী দেখিয়া আবেগে সখীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছেন—

"আজিও ত সেই পথ, সেই বৃন্দাবন—
সেই যমুনার জল, সেই ফুল সেই ফল,
সেই বন-উপবন র'য়েছে তেমন।
কেবল নাহিক সখি রাধিকা-রমণ॥"

কখনও বা অভিমান ভরে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

"হেরিব না কালো-রূপ আর এ জীবনে,
না হেরিব কালো জল বৃক্ষপত্র সুশ্যামল
কালো মেঘ যবে সখি উদিবে গগনে
ঢাকিব নয়নদ্বয় বস্ত্র আবরণে॥
হেরিব না কালো রূপ আর এ জীবনে—
মুড়াইব কেশ পাশ, ত্যজিব' লো নীলবাস,
নয়ন-অঞ্জন-রাগ মুছিব যতনে।"

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা ভক্তও নহি, সাধকও নহি। কাজেই 'শ্রীশ্রীভক্তমাল' গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুযায়ী খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, এই সমস্তের লক্ষণই বা কি এবং কোথায় হ্লাদিনী-শক্তির নিত্য-স্বরূপিনী ভাবের কিরূপ প্রকট, সে সব গুরু-গম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। আমরা এই সকল কবিতার কেবল মাত্র ভাবের দিক, রসের দিক, সাহিত্যের দিকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি এবং আমাদের বিশ্বাস উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা যথাসম্ভব পরিস্ফুট হইয়াছে।—

মিলনের ব্যাপারে বসন্তকুমার কি ভাবে লেখনী চালনা করেন তাহা অনেকের জানিবার কৌতূহল থাকিতে পারে। তজ্জন্য নিম্নে 'পল্লীবাসী' হইতে সেই শ্রেণীর রচনাও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"জলধর কোলে যেন খেলিল বিজুরীরে
শোভার আকর!
কনক-বরণী রাই শ্যাম পাশে শোভা পায়
মরি কি সুন্দর—"

অথবা 'মানে'র পালায়—

"বৃথা কেন মোরে প্রবঞ্চনা করে সে শঠের শিরোমণি?
ব'ল' সখি তারে মম নাম ধ'রে না করে বাঁশীর ধ্বনি!
চন্দ্রাবলী তার, জীবনের সার, রাখুক তাহার মান—
বাঁশীতে ডাকিয়া আমারে আনিয়া কেন করে অপমান?"

পাঠক সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন যে বসন্তকুমারের বিরহের কবিতা যেমন 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' গিয়া প্রবেশ করে, মিলনের তেমন হয় না ;—যেন এ দু'য়ের মধ্যে

বস্তুতঃ কোন সম্বন্ধগত ঐক্য নাই! এই জন্যই বলিতেছিলাম তিনি দুঃখের কবি এবং সে বিষয়ে চণ্ডীদাসের দোসর!

সর্ব্বশেষে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বসন্তকুমার কি কবি-হিসাবে একান্তই মৌলিক? পূর্ণ তিনশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান লইয়া কবিতা রচনা চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তিনি আর নূতন জিনিস কি সৃষ্টি করিয়াছেন? এ সম্বন্ধে Prof. Mair একটী বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন, "The poet must speak in the language that has been used by other men, but he will use the language in a new way and with a new significance, and it is just in proportion to the freshness and the air of personal conviction and sincerity which he imparts to it, that he is fresh."—English Literature p. 39. বিষয়ের দিক দিয়া তাঁহার মৌলিকতা নাই একথা সত্য, এমন কি তাঁহার অনেক কবিতায় জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাব-ভাষার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যেমন—

চণ্ডীদাসে—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?"

এবং বসন্তকুমারে—

"প্রাণসই! কেন শুনাইলি শ্যাম নাম!
সে নাম শুনিলে কাণে, পূর্ব্বস্মৃতি জাগে প্রাণে,
পুলকে অপাঙ্গ কোণে সদা আসে জল,
শ্যাম গেছে নাম মোর র'য়েছে সম্বল।"

চণ্ডীদাসে—

"আমি সাগরে ডুবিয়া সাধনা করিব, সাধিব প্রাণের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন তোমারে করিব রাধা॥"

বসন্তকুমারে—

"আমি কৃষ্ণ হব'।
শ্যাম বঁধু হবে নারী
আমি যে দয়িত তারি
বিরহ-বারিধি মাঝে তাহারে ডুবাব'—"

জয়দেব—

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জ-কুটীরে॥"

বসন্তকুমারে—

"সাজিল তরুরাজি
পরি নব ফুল দুল্।
গুঞ্জরি চলি তাহে
পড়িল অলিকুল॥
ক'য়েলা তরুশাখে
তুলিছে কুহু তান।
বিরহ-ব্যথিতের
দহিয়া মন প্রাণ॥"

বিদ্যাপতিতে—

"আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক বেলা॥"

বসন্তকুমারে—

"নতুবা কেন সে রাজার বালিকা,
যমুনা সিনানে আসে নিতি একা?
বারেক চাহিয়া তৃষিত চাহনী"—ইত্যাদি।

তথাপি তাঁহার অভিব্যক্তির (Expression) এমন একটী নিজস্ব সহজ ভঙ্গী আছে যে জন্য তিনি পুরাতন হইয়াও নূতন, অনুকারী হইয়াও মৌলিক!

সাহিত্যের ক্ষেত্রে absolute originality (পরিপূর্ণ মৌলিকত্ব)—বিষয়ের দিক দিয়াও বটে, ভাবের দিক দিয়াও বটে—বড় দুর্লভ পদার্থ। অন্যে পরে কি কথা স্বয়ং সেক্সপিয়ারেরই যখন তা নাই! সুতরাং বসন্তকুমারের কাছে তাহা প্রত্যাশা করা শোভন হয় না। এই আধুনিক যুক্তি-কঠোর realism (বস্তুতান্ত্রিকতা) এর যুগে তিনি বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যে যেটুকু প্রাণের পাথেয় দান করিয়াছেন, সেই জন্যই আমাদের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূল-মন্ত্রটী হইতেছে—

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কথন নাহিক হয়",

এই অপরূপের সোণালী ইন্দ্রজালে তিনি রূপকে বাঁধিয়াছেন; অন্তরের অনবদ্য আকাঙ্খা তাঁহার লেখনী-মুখে বাস্তবের রস-রক্তে মূর্ত্ত হইয়াছে—এইখানেই তাঁহার art (সৃষ্টি), এইখানেই তাঁহার originality!

সময় ও সুযোগের অভাবে আমরা ইঁহার প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-কবিতা (Satire) ও চৈতন্য-লীলা সংক্রান্ত রচনাবলী লইয়া আলোচনা করিতে পারিলাম না। ইনি আজিও জীবিত আছেন এবং দারিদ্র্য ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সহিত ক্রমাগত যুঝিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে বাঙ্গালার এই শেষ বৈষ্ণব কবির খোঁজ অনেকেই রাখে না! সত্যই—

"Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness to the desert air!"

ক্ষণেক

[শ্রীপ্রণব রায়]

একটি মুহূর্ত্ত শুধু—অমূল্য দুর্লভ এক ক্ষীণ-আয়ু ক্ষণ
আজ আমি করিব হরণ
তব দিন-রজনীর শোভাযাত্রা হ'তে !
ক্ষণপরে জীবনের জোয়ারের স্রোতে
আমরা ভাসিয়া যাবো দুনিবার বেগে
বিস্মৃতিবারিধিপারে,—অন্ধকার বিপরীত কূলে।
তারপর ধূলিরুক্ষ পথে পথে জনতার মেঘে
হে মোর বিদ্যুৎ-লতা, তোমার ক্ষণিক দীপ্তি
উঠিবে না আর কভু দুলে !

চন্দ্রের বাসর-শেজে এখনো জাগিয়া আছে অতন্দ্র চন্দ্রিকা,
বধূর বুকের মতো কাঁপে দীপশিখা ;—
আজি রাত্রিশেষলগ্নে বকুলবীথির ছায়ে করো অভিসার,
দু'দণ্ডের এ-পান্থশালার
দুয়ারে বাজুক্ তব মৃদুচ্ছন্দা মেখলার গান।
তোমার জীবন হ'তে একটি মুহূর্ত্ত করো দান !
আমার ওষ্ঠের কাছে শুধু একবার আনো তব বিম্বাধর
চুম্বন নাই বা দিলে—তুমি কাছে সেই ত মধুর !
ওই তব মধুগন্ধী নিঃশ্বাস-প্রবাহ
অতর্কিতে মোর মুখ হয় যদি সৌরভ-আতুর !
সরায়ে নিও না তা'রে তুলে।
আমার এ-বুক রাখি' পল্লবপেলব তব বক্ষের উপর
শুনাব এ-মর্ম্মরিত হৃদয়ের ভাষা ;
হোক্ মিথ্যা,—তবু ব'লো একবার 'তোমারেই দিনু ভালবাসা'
লজ্জার লাবণ্য ভরি' ওই দু'টি আনমিত চোখে।

তারপর রূঢ় রৌদ্রালোকে
এ-রাত্রি মিলায়ে যাবে কাল একেবারে ;
ক্ষণিক মিলন-মায়া মুছে যাবে ও-হৃদয় হ'তে !
আর কভু পারিবে না স্মরণ করিতে
অনুরাগী কোন্ পান্থ দিয়েছিলো একটি কুসুম তব শ্লথ কবরাতে!
জীবনের জোয়ারের স্রোতে
আমরা ভাসিয়া যাবো দুনিবার বেগে বিস্মৃতির বারিধির পারে॥

নির্ব্বাপিত খদ্যোৎ

[শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত]

"হুং·

হুঙ্কারে ব্যোমে মহেশ্বর দেবদেব ত্রিলোচন···হুং"...

খুব বড় তালে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসুদেব আচার্য্য নিশিকান্ত কবিরাজের "অকৃত্রিম" ঔষধালয় এবং বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিলেন। বাসুদেবের দিনের প্রধান কাজ ঐ সুর ভাঁজা।

বছর দেড়েক আগেকার কথা···তানপুরা কাঁধে ফেলিয়া এক কালোয়াৎ আসিয়া উঠিলেন—

রঙে, দাড়িতে, গোঁফে, ভুঁড়িতে এবং সদালাপে, তারপর সুরে, তালে, মীড়ে, গমকে, ঝঙ্কারে, এবং তদুপরি শাস্ত্রজ্ঞানে এমন দিব্য ভক্তির পাত্র তিনি, যে বাসুদেবের মনে হইল, ইঁহার পদধূলি যে-কেহ লইতে পারে, তিনি ত' পারেনই—তাহাতে অপরাধ হয় না।

সভার সর্ব্বাগ্রে গিয়া বসিলেন বাসুদেব—গান যেন অষ্টাঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া গিলিতে লাগিলেন—

কালোয়াৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া, আর কাহারো দিকে না চাহিয়া কেবল যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন তিনিই বিগলিত-প্রাণ বিবশ-তনু বাসুদেব আচার্য্য···

"বুঝিতে পারিয়াছেন"—ভাবিয়া বাসুদেব পুলকে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেছেন,—এমন সময় গান শেষ হইয়া গেল ·· এবং বাসুদেব বাহবা দিয়াই অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলেন···

কালোয়াৎ হাসিয়া বলিলেন,—একটু দেরী হ'য়ে গেছে।

লোকের হাসির শব্দ থামিলে বৈদ্যনাথ বলিল,—আচায্যি একটা গাওনা হে···উনি একটু বিশ্রাম করুন।

বাসুদেব কালোয়াতের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন অভয় চাহিয়া। কালোয়াৎ হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত' গান না।

...বাসুদেব তখন যে গানটি গাহিয়াছিলেন, এবং তাঁর প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সেই গানটির আদি অক্ষর ঐ হুং।··· গানটি কালোয়াৎ যত্ন করিয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন সভায় বসিয়াই, কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই।···বাসুদেব ভাবিয়া লইলেন, লোকটা বড় দাম্ভিক; আমার কাছে গান শিখিয়া গেল, কিন্তু প্রকাশ্যে ঋণ-স্বীকার করিয়া গেল না—তবু তিনি কালোয়াৎকে ক্ষমা করিলেন...

না করুক ঋণ-স্বীকার...ঐ গানটি সম্পর্কে আমি তার গুরু···কিন্তু গুরু-দক্ষিণা চাই না।

এবং মেজাজ খুস্ হইল সেইদিন হইতে; গায়ের কুর্ত্তাটির মত, ঐ গানটিকে তিনি ক্বচিৎ ছুটি দেন; সুরটি তাঁর ঠোঁটের উপর দিনরাত নাচে ···অন্য কাজও অবশ্য তাঁর আছে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

—কব্‌রেজ কোথা' হে? বলিয়া বাসুদেব বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র রণজিৎ ফরাসে বসিয়া পড়িতেছে; বলিলেন,—ওহে, তোমার কব্‌রেজ কোথা'? প্রশ্ন করিয়া বাসুদেব বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া কুর্ত্তার সর্ব্বনিম্নের তিনটি বোতাম খুলিয়া দিলেন···পেটে বাতাস লাগিল।

রণজিৎ বলিল,—ভেতরে আছেন।

বাসুদেব দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন,—ভেতরে আছেন! ভেতরে সে কি করে দিন রাত? তবু যদি···হুং!···তামাক দিতে বলো, আর ডাকো কব্‌রেজকে।

রণজিৎ পুঁথিখানা বন্ধ করিয়া তাহাকে কপালে ছুঁয়াইয়া পাশের কুলুঙ্গীতে তুলিয়া অতিশয় আলস্যভরে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় ঐটুকু বিলম্বেই বাসুদেব অসহিষ্ণু হইয়া পুনরায় জানালায় মুখ দিলেন; বলিলেন,—কই হে, উঠ্‌লে?

—আজ্ঞে এই উঠ্‌ছি।

—হ্যাঁ ওঠো; তুলে' ধর্‌বো?···কি ছেলে সব হয়েছ বাবা আজকাল! বসে' উঠ্‌তে এক ঘণ্টা!···ক'দিন থাওনা?···ছিলাম আমরা, হুট্ কর্‌তেই অম্‌নি হাজির,

ছুট্ বল্‌তেই অম্‌নি ছুট্।···গা নড়াতে আমাদের এত সময় লাগ্‌ত না।···তোমার নামটা কি ?···মনে থাকে না।

কিন্তু নাম শোনা তাঁর হইল না—

কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পড়িলেন।

—কি বক্‌ছ' হে! ভেতর থেকেই তোমার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।···স্ত্রী বল্‌ছিলেন, তোমার সঙ্গীতা—মানে গাইয়ে বন্ধু এসেছেন। বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিশিকান্ত বসিলেন।

বাসুদেবের সম্মুখে সঙ্গীতাচার্য্য শব্দটা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ···তিনি নিজেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন···তিনি ভাবেন ওটা ঠাট্টা···কেন তা' ভাবেন সে একটা স্বতন্ত্র কাহিনী—

কে একটা ছেলে পথে তাঁহার গায়ে ধাক্কা দিয়াছিল··· তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বে-আদপ্··আর ছেলেটি বলিয়াছিল, ক্ষমা কর্ব্বেন, সঙ্গীতাচার্য্য···

'ঘটনা মাত্র এই; কিন্তু তার উপর আর একটু রং এই যে, ছেলেটির প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি তাহাকে মারিতে ছুটিয়াছিলেন...

যারা বাসুদেবকে মানে, সেই দিন হইতে ঐ কথাটা তারা তাঁর সাক্ষাতে বলে না···

"সঙ্গীতা—" বলিয়াই নিশিকান্ত তাই থামিয়া গেলেন—

বাসুদেব বলিলেন,—যেমন গুরু তেম্‌নি শিষ্য···গুরু আছেন স্ত্রীর মুখের কাছে কাণ পেতে, বন্ধুর খবর শুন্‌ছেন ···আর এদিকে শিষ্যকে উঠ্‌তে বলে' আমি বেকুব—উঠে' দাঁড়াতেই বেলা কাবার; উঠ্‌তে ওর অত কষ্ট হবে তা' কি আমি জানি!···স্ত্রী!...স্ত্রী বলে' গৌরব কর্‌লে হবে কি?··· পদার্থ সব একই।···কি হচ্ছিল স্ত্রীর কাছে বসে বৈঠকখানা ফেলে ?

নিশিকান্ত বলিলেন,—তোমার কি ভাই, সুর ভেঁজে বেড়াচ্ছ, আর হাত তুলে' খাচ্ছ; কত ধানে কত চা'ল সে খোঁজ তোমার রাখ্‌তে হয় না।...কি ক'রে যে আমরা চলি তা' আমরাই জানি।··সাম্‌নেই পূজো; কাপড় চোপড়ের ফর্দ্দ এখন থেকেই ক'রে তা'র টাকার যোগাড়টা এখন থেকেই কর্‌তে হবে যে!

—পূজো সাম্‌নেই বটে, পেছনে নয়; কিন্তু···থাক্‌গে, তোমার গরজ তুমিই বোঝো ভাল...এখন, তামাক টামাক দিতে ব'ল্‌বে, না সেটারও সাশ্রয় করছ সাম্‌নে পূজো বলে' ?

—সাধু তামাক দে···রণজিৎ পান আনো গোটা চারেক।

—গোটা চারেক কেন? সংখ্যাটা বলে' দেবার কি দরকার!···তোমার স্ত্রী দু'টো কি দেড়টাও ত' দিতে পার্‌তেন!

বাসুদেবের আত্মীয়তা করিয়া কথা বলার রকমই ঐ—

নিশিকান্ত হাসিতে লাগিলেন···

বাসুদেব সুর ফুটাইলেন।

দু'টি মানুষ মিলিয়া যায় দৈবাৎ, কিন্তু গায়ে গায়ে লাগালাগি হইয়া যায় যে কারণে তাহাতে আঠা থাকা চাই···আঠা নাই, তবু বাসুদেব আর নিশিকান্ত পরস্পর লাগিয়াই আছেন—খুলিয়া যান্ না···

নিশিকান্ত ভাবেন, লোকটা ক্ষ্যাপা—

বাসুদেব ভাবেন বন্ধুর বুদ্ধি কম—

আর দু'জনেই ভাবেন, ওকে একটু আস্কারা দিয়া আমল দিয়া আগ্‌লাইয়া সাম্‌লাইয়া বজায় রাখা দরকার; কিন্তু কেন দরকার তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয় দু'জনেই আপন মনেই হাসিয়া উঠিবেন।

রণজিৎ ডিবায় করিয়া পান লইয়া আসিয়া বাসুদেবের সম্মুখে দাঁড়াইল—

বাসুদেব সুরের আলাপ বন্ধ করিলেন, কিন্তু পান লইবার উদ্যোগ না করিয়া মাথাটা একটু হেলাইয়া দূরে লইয়া রণজিতকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন···

রণজিৎ লাল হইয়া উঠিল; বলিল,—পান নিন্।

—নিই।...তোমার চেহারা এমন কেন হে...এই জন্যেই উঠ্‌তে তোমার মনে হচ্ছিল, মাথার উপর পর্ব্বত চাপান' আছে।·· অসুখ কি তোমার?—বলিয়া পান একটি তুলিয়া লইয়া আল্‌গোছে মুখের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন···এবং রণজিৎ তাঁহার কথার উত্তর না দিয়াই চলিয়া যায় দেখিয়া বলিলেন,—অসুখ কি তোমার বল্‌লে না ?

রণজিৎ আসিয়া ফিরিয়া বলিল,—অসুখ কিছু নেই।

রণজিতের অগ্রাহ্যের ভাবে বাসুদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তার সত্য গোপনের ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমায় কি ন্যাকা পেলে হে?…অসুখ কিছু নেই, তবে শরীরের অমন ছিরি কিসে হ'ল…ভূতে চাটছে?

রণজিৎ মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল—

বাসুদেব সেইদিকে খানিক্ ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন,—ওহে কব্‌রেজ, তোমার এই ছাত্রটিই তোমার প্রধান শনি।…ওই চেহারা তোমার নিজের বাড়ীতে দেখে' রুগী ভাগ্‌তে একটু দেরী হবে না। বলিয়া বাসুদেব চক্‌চক্ শব্দ করিয়া পান চিবাইতে লাগিলেন…

কবিরাজ বলিলেন,—দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপই হ'চ্ছে। মন্মথরস—রণজিৎ, খাচ্ছ' ত' ওষুদ? বলিয়া ঘরের ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

রণজিৎ ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিল; বলিল,—আজ্ঞে, খাচ্ছি।

বাসুদেব পিক্ ফেলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; মন্মথরসের নাম শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিতেই একগাল পিক্ তাঁর গলা দিয়া নামিয়া গেল…বলিলেন,—মন্মথরস? মন্মথ নামটাই শুন্‌তে যে কেমন হে! মন্মথরস কিসের ওষুদ?

নিশিকান্ত বলিলেন,—সে শুনে তোমার কাজ নেই।

—নেই নাকি!…ভাল, কিন্তু শুধু মন্মথরসে চেহারা ফির্‌বে না…মুর্গিশাবক চাই।…বামুনের হুঁকাটা? এই যে রয়েছে। বলিয়া বাসুদেব সাধুর হাত হইতে কলিকা লইয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় পুড়ুক্ পুড়ুক্ করিয়া তামাক্ টানিতে লাগিলেন

কিন্তু রণজিৎ মন্মথরস খায় না।

রণজিতের বয়স অনুমান করা শক্ত; তার বয়স একুশ, কিন্তু সে বাড়ে নাই। তার দেশের লোকে বলিত, বিমাতার অবহেলায় তার মন যেমন ক্ষুধাতুর, বিমাতারই বিষদৃষ্টি লাগিয়া লাগিয়া তার তেজ নাই, বুদ্ধি নাই।…ডাঁসা ডাঁসা মুখখানায় তার গোঁফের রেখা কেবল দেখা দিয়াছে, কিন্তু যৌবনোদ্গমের এই লক্ষণে তার শ্রী ফোটে নাই, বরং কেমন যেন অপরিচ্ছন্ন দেখায়।

তবে এত শুষ্ক সে কোনদিনই ছিল না; পেট্‌টাও এত ডাগর তার ছ'মাস আগে কেহ দেখে নাই।…তিনমাস আগেও তাহাকে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সে এখন তাহাকে দেখিলে কাঁপিয়া উঠিবে।…সর্ব্বোপরি তার মুখের পাণ্ডুরতাই আরো ভয়াবহ।

শরীর কেন এমন হইল তাহা জানিয়াও রণজিৎ শরীরের কথাই তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল…কখন গল্প শেষ করিয়া বাসুদেব আচার্য্য সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে উঠিয়া গেছেন এবং তাহার পাশেই হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া কবিরাজ মহাশয় পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা সে জানিতেই পারে নাই।

দরজাটা হঠাৎ হড়্‌মড়্ করিয়া নড়িয়া ওঠার শব্দে রণজিৎ চম্‌কিয়া চোখ তুলিয়া দেখিল, কেতকী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।…তাহাকে চোখ তুলিতে দেখিয়া কেতকী বলিল,—বা-বা, তিন তিন্‌বার তোমাকে জিৎদা জিৎদা করে' ডেকেছি এখানে দাঁড়িয়ে…তুমি শুন্‌তে পাওনি।…কি, ভাব্‌ছ কি অমন করে?…নাইতে যাও।

তিন তিন্‌বার ডাকিয়া কেতকী তাহার সাড়া পায় নাই শুনিয়া রণজিৎ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; আনত মুখে বলিল,—আমি শুন্‌তে পাইনি।…যাই, নাইতে যাই, উঠি—

—যাও। বলিয়া কেতকী চলিয়া গেল।

কেতকী রণজিতের দিকে চাহিয়া হাসে—অতিশয় অনাবিল কৌতুকহাস্য।…প্রথম দিন কেতকী বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিল…চমকপ্রদ অতর্কিত সেই হাস্যরেখাটি অস্ত্রের ফলার মত এখনো তার কোথায় যেন বিদ্ধ হইয়া আছে…

তখন তার আকার খর্ব্বই ছিল, কিন্তু শুকাইয়া এমন কুৎসিত কাঠের মত নীরস বর্ণহীন হইয়া যায় নাই।

বর্ষার প্রকৃতির মত কেতকীর দেহ—দেহের তেম্‌নি বর্ণের উজ্জ্বলতা।…দেহ এম্‌নি পরিপূর্ণ নিটোল যে দেখিলে

দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়...মনে হয়, আর একটু অগ্রসর হইলে সে যে কেমন বস্তুতে দাঁড়াইবে তাহা কেউ জানে না, ভাবিতেও বুঝি পারে না।

কোঁচার খুঁট্‌টি গায়ে জড়াইয়া রণজিৎ দাঁড়াইয়া ছিল—

কেতকী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—মা, ওটি কে?—ওঁর ছাত্তর।

শুনিয়া কেতকী আবার হাসিয়াছিল, যেন তার বাবার ছাত্র হওয়াও ওর মানায় না।

কিন্তু কেতকী ডাকে তাকে জিৎদা বলিয়া। একেবারে নিজেদের লোকের মত তার ব্যবহার।

রণজিৎ সেই একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছিল, আর সেদিকে চোখ্ তোলে নাই···

আর একদিন মাত্র সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, সে-দিন যে লজ্জা সে পাইয়াছিল, তার জীবনের তা' অভিশাপ।

কবিরাজ মহাশয় স্নান সারিয়া ঘরের ভিতর আহারে বসিয়াছেন···বারান্দায় রান্না হয়···কেতকীর মা গরম গরম বড়া ভাজিয়া তুলিতেছেন...কেতকী গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া হাওয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিতেছে···

রণজিৎ উঠানে স্নান করিতেছিল—স্নান করিতে করিতে হঠাৎ একবার চোখ্ তুলিয়া সে যেন বাজের আলোয় ঝল্‌সিয়া অসাড় হইয়া গেল—

কেতকীর ডান হাতখানা ধীরে ধীরে স্বর্ণলতার মত দক্ষিণে বামে দুলিতেছে···মুখের যতটা দেখা যাইতেছে তাহাই যথেষ্ট···

কিন্তু রণজিতের অদৃষ্ট মন্দ—

কেতকী অকস্মাৎ তাহার দিকে চাহিয়াই মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা দেখ।

—কি লা? বলিয়া কমলা মুখ ফিরাইতেই রণজিতের উপরেই তাঁর চোখ পড়িয়া গেল—

রণজিৎ তাড়াতাড়ি চোখ্ নামাইল—

কেতকী বলিল,—দেখ্‌লে?

কমলা বলিলেন,—হুঁ। ও কিছু নয়। কথা ক'টি স্পষ্ট রণজিতের কাণে গেল···যখন চোখ ফিরান উচিত ছিল তখন সে ফিরাইতে পারে নাই, তার ক্ষমতাই ছিল না···যে দুর্ব্বার আকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের গোলকগুলি একটি কেন্দ্রে পরস্পর সংলিপ্ত হইয়া আছে, তখন সে সেই আকর্ষণের বশে হতচেতন···

কিন্তু পরক্ষণেই জ্বলিয়া জ্বলিয়া তার মনে হইতে লাগিল, বাল্‌তির জল জল না হইয়া যদি গোখ্‌রো সাপের বিষ হইত তবে তার খানিকটা পান করিয়া ঠাণ্ডা হওয়া যাইত। বিষের অভাবে একটা আথালি-পাথালি কাণ্ড বাধিয়া গেল, হৃদ্‌পিণ্ড এমন করিয়া লাফাইতে লাগিল যেন তাহাকেও নাচাইতে চায়...সারা গায়ের রোঁয়ার গোড়ায় ঘাম ফুটিল... নিঃশ্বাস অসহ দ্রুত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল···মাথা এমন ঘুরিতে লাগিল যে তার দুর্গতির শেষ রহিল না—যেন রাগ করিয়া কেউ তাহাকে দু'হাতে ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কূপের ধারে তখনই বসাইয়া দিয়া গেছে...গায়ের জল বাষ্প হইয়া গিয়াছিল বহু পূর্ব্বেই···

সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু ভুলিবার নয়···সেদিন তখন তার মনে হইয়াছিল, নির্ঘাৎ এ যমের তাড়না, লইতে আসিয়াছে। তাহার পর নিজের অবাধ্য হইয়া আর সেদিকে সে চাহে নাই।—

রণজিৎ গাম্‌ছাখানা হাতে করিয়া স্নান করিতে আসিল। বাড়ীর ভিতর সে কেবল স্নানাহার করিতে যায়; খাইয়া চলিয়া আসে; কেহ ডাকিয়া না পাঠাইলে আর যায় না।

আজ কমলা বলিলেন,—কি ভাব তুমি এত!···কেতকী বল্‌ছিল, তার তিন ডাকে তুমি রা দাওনি।...অত ভেব' না...তোমার আবার ভাবনা কিসের এত! বলিয়া তিনি ছেলেটির শীর্ণ অবয়বের দিকে অতিশয় মমতার চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

রণজিৎ মুখ নামাইয়া ছিল, নামাইয়াই রহিল, কথা কহিল না; কিন্তু কমলা লক্ষ্য করিলেন, যেন ব্যথা পাইয়া তার মুখখানা মলিন হইয়া উঠিয়াছে।...বলিলেন,—মন খুব বাড়ী বাড়ী করে, নয়?...সৎমা আবাগী স্বামীর ঘরে থাক্‌তেই ত পার্‌ত তোমায় নিয়ে, ধান কলাই দুধের ত' কিছু অভাব নেই তোমাদের ..মা-পোয়ের দু'টি পেট স্বচ্ছন্দে চল্‌ত...

রণজিৎ তেল মাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

কমলা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু আমাদের তুমি পর ভেব' না।···ভাল থেকে মন ভাল রেখে' পড়াটা শেষ করে' ঘরে গিয়ে বস্‌বে···তখন আমাদের কথা মনে থাকবে ত'? বলিয়া কমলা সস্নেহে হাসিতে লাগিলেন।

রণজিৎ বলিল,—আমি আর যা-ই হই, মা, নিমক্ হারাম নই; আপনার কথায় আমার পাপ হ'ল।

কমলা বিস্মিত হইলেন; এমন উচ্ছ্বসিত হইয়া কথা বলিতে এই ছোট মানুষটিকে কোনোদিন তিনি দেখেন নাই।···বলিলেন, ভেব' না। খালি ভাব্‌লে কিছুর দিশে হয় না, তা' ত' তুমি জানো।

—তা' জানি, মা।···বাড়ীর কথা আমি মোটেই ভাবিনে।

—নিমাই ঠাকুরের চিঠি পেলে?

—পেয়েছি।

তিনি খুব উপকার করছেন কিন্তু; জমি-জায়গা ঘর বাড়ী তিনিই ত' ধরে' রেখেছেন···নইলে এত দিনে ছত্রাকার হ'য়ে যেত'।

রণজিৎ বলিল,—হ্যাঁ।

—তবে নিশ্চিন্দি থাকো।...ধান বেচে তিনি টাকা পাঠিয়েছেন?

—শীগ্‌গিরি পাঠাবেন লিখেছেন।

—বেশ।···চান্ করে' দু'টি খেয়ে নাও এখন···আমার আবার কাজ আছে।—বলিয়া নিজের উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়া কমলা প্রস্থান করিলেন, যেন স্নেহ-বুভুক্ষু গৃহবঞ্চিত ছেলেটিকে তৃপ্ত করিয়া তাহাকে তিনি যথেষ্ট সুখ সান্ত্বনা দিয়াছেন।

৩

রব পড়িয়া গেল, জামাই আসিবে।

শুনিয়াই রণজিতের বুকের ভিতরটা আচম্‌কা মুচ্‌ড়াইয়া উঠিয়া যেন কেমন করিতে লাগিল···এতদিন মাটির পৃথিবীতে নয়, মনেরও দুর্গম স্থানে অন্তরীক্ষ পথে কোথায় যেন একটু স্পর্শ-প্রবাহ ছিল, জামাই আসিবার সংবাদে সেইটাই হঠাৎ অবরুদ্ধ হইয়া যেন রণজিতের আবহাওয়ার আবাস উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

রণজিতের ক্ষয় সুরু হইয়া গিয়াছিল প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই···একটা মহাক্ষুধা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল··· পরিণাম ভাবে নাই···তার অবসান আসে নাই, সে আনিতে পারে নাই···সেই আদি অন্তহীন নির্নিমেষ ক্ষুধার জ্বালা তাহাকে টানিয়া আনিয়া জগতের বাহিরে ফেলিয়াছে··· আর অবিশ্রান্ত লেহন করিয়া করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া আনিতেছে ··

এমনটি যে ঘটিতে পারে জীবনে কেহ তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছে কিনা কে জানে—এ যেন দ্বাদশ সূর্য্যের অখণ্ড একত্র উদয়, তেম্‌নি নির্ম্মম, আর তেম্‌নি দাহ, সে তেম্‌নি দুনিরীক্ষ্য, সৃষ্টির কোথাও আর কিছু নাই···সবুজ নীল সব রং ছাই করিয়া দিয়া একটি রক্তবর্ণ দাহ কেবল জ্বলিতেছে—তাহার তুলনা নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পরিহার করিয়া দৃষ্টি ফেলিবার স্থান নাই, চোখ বুজিবার সাধ্য নাই···

মনের ভাবনা আর সব পথ হারাইয়া কেবল ঐ একটি দিকেই দুর্নিবার হইয়া পুড়িয়া মরিতে ছুটিতেছে।···

মাঝে মাঝে মনে হয়, কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুকোমল স্নিগ্ধ তনু দিয়া ছাইয়া রহিয়াছে...স্পর্শে সর্ব্বাবয়ব শীতল শিথিল হইয়া গেছে; কিন্তু বুকের বায়ু বাহির হইতে না পারিয়া ভিতরেই একটা ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে···

ছাঁৎ করিয়া রণজিতের ঘুম ভাঙিয়া যায়—

দেখে, হৃদ্‌পিণ্ড ধড়্‌ফড়্ করিতেছে...আর তার ঘুম আসে না।

নিশিকান্ত রণজিতকে পড়াইতে বসেন—

রণজিৎ পড়িতে বসে; কিন্তু তার মনে হয়, শ্লোকের পর শ্লোকে আর সূত্রের পর সূত্রে যে-জ্ঞান গ্রথিত হইয়া আছে তার মূল্য নাই, সার্থকতা, প্রয়োজন নাই···ভারবাহী জীবের মত সে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বোঝা পৃষ্ঠের উপর গ্রহণ করিতেছে।···মানুষকে সে ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিবে; কিন্তু সব ব্যাধির কথা কি শাস্ত্রে আছে!···অগ্নিশিখা যখন মানুষের ভিতরটাকে ছাই করে তখন সে ক্ষয়

আর মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কি নাড়ীতে ধরা পড়ে! তার কি ঔষধ আছে!

নিশিকান্ত শ্লোকগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মনেই অনর্গল বকিয়া যান্...রণজিৎ হা করিয়া থাকে... ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিশিকান্ত মুখ তুলিয়া স্পষ্টই দেখেন ছাত্রের মন কোন্ বিদেশে বিচরণ করিতেছে তাহার উদ্দেশ নাই; বলেন,—অধ্যয়নে তোমার মন নাই। কিছুদিন বিশ্রাম করো।

রণজিৎ বলে,—যে আজ্ঞে।

'মাধবনিদানম্' তোলা আছে; রণজিৎ বিশ্রাম করিতেছে...

এমন সময় সংবাদ পৌঁছিল, জামাই আসিতেছে।

জামাই আসিল।

রণজিৎ চোখ দিয়া তাহাকে একবার দেখিয়া সমগ্র মন দিয়া যেন তাহাকে সম্পূর্ণ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না...ইহারই নাম মানুষ!...নিজের অপ্রচুর অপরিসর কলেবরটাকে রণজিৎ একবার ধ্যান করিয়া লইল।... সে যে এত ক্ষুদ্র, এত নগণ্য, এত কুৎসিত তাহা এমন করিয়া আলো জ্বালিয়া কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় নাই...রণজিতের মনে হইল, সে কোথাও নাই—সূর্য্যালোকে দীপশিখার মত সে অনাবশ্যক...রূপের এই ঐশ্বর্য্যের পাশে সে লুপ্ত হইয়া গেছে...যৌবনের এই উদ্দামতার নিম্নে সে তলাইয়া গেছে।...রণজিতের একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

নিশিকান্তের জামাই গণেন বাস্তবিকই রূপবান, স্বাস্থ্যবান...চাহিয়া চাহিয়া তার চেহারা দেখিতে যার তারই ইচ্ছা করে।

খবর পাইয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাসুদেব আসিয়া পড়িলেন।

—বাবাজী এসেছ, কেমন আছ?

বাবাজীর সঙ্গে বাসুদেবের আর একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে কালোয়াৎ আসিবার পূর্ব্বে।

গণেন বলিল,—ভালই আছি।

—কাজ কর্ম্ম?

—ভালই চল্‌ছে।

—বড় গরম। বলিয়া বাসুদেব কুর্ত্তার বোতাম সব ক'টিই খুলিয়া দিয়া হাঁকিলেন,—কই হে সন্—উঁ হুঁ, রণজিৎ, পানটান্ কি এ-বাড়ীতে নেই নাকি?

কবিরাজ বলিলেন,—রণজিৎ পান আনো।

বাসুদেব বলিলেন,—কব্‌রেজ খালি প্রতিধ্বনি করতে জানে।...পান আমি অন্য কোথাও চেয়ে খাইনে; কিন্তু কেপ্পণ আর বেহায়ার কাছে চক্ষুলজ্জা করলে ঠকতে হয় বলেই কেবল এই বাড়ীতেই চেয়ে নি'।...রণজিৎ, পান আনো—চারটে কি ছ'টা কি দুটো কি তিন্‌টে তা' আমি কিছু বল্‌ছিনে কিন্তু।

রণজিৎ ঘরের ভিতর নির্জ্জনে বসিয়া ছিল—

লুকাইবার স্থান নাই; মনে মনে সে ছট্‌ফট্ করিয়া যেন এই রূপলোলুপ অনুসন্ধিৎসু পৃথিবীর একান্তে বসিয়া একটু মুখ লুকাইবার স্থানের সন্ধান করিতেছিল...

—যাই। বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল।

কেতকী সম্মুখেই ছিল—

কেতকীর দিকে চাহিতে রণজিতের নিজেরই বারণ; কিন্তু আজ একটা অসাধারণ উপলক্ষ বড় জাঁক-জমকে সমারোহ করিয়া সাজিয়া আসিয়াছে...

সাহস করিয়া একবার কেতকীর দিকে সে চাহিল; দেখিল, অপরূপ আনন্দ যেন তার শরীরের বাহিরে আসিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতেছে—পাত্রে যেন তা' ধরা যায়...

মুখ নামাইয়া বলিল,—পান চাইছেন বাইরে।

কেতকী বলিল,—দিই।...তারপর সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল, বলিল,—জিৎদা, তুমি বড় বিশ্রী হ'য়ে গেছ ত'!... এতদিন ভাল করে' দেখিনি'।...কেন বল ত'?

রণজিৎ বলিল,—পান চাইছেন।

কেতকী বিস্মিত হইল—একটা কথাই লোকে অকারণে দু'বার বলে না; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই...

কেতকী পান আনিতে গেল; বলিয়া গেল,—দাঁড়াও, পান আন্‌ছি।

কিন্তু রণজিৎ দাঁড়াইতে পারিল না...পান আনিয়া হাতে দিবে না মাটিতে রাখিবে। তারপর, আজ তার শরীরের

দিকে কেতকীর ভাগ করিয়া দৃষ্টি গেছে'···তার কারণও রণজিতের জানা হইয়া গেছে···স্বামীর সঙ্গে সত্য সত্যই তুলনা না করুক, সুপুরুষের পার্শ্বে সে সম্পূর্ণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে...তাহার ক্ষুদ্রতা বিশ্রী হইয়া আজ কেতকীর চোখে পড়িয়াছে···

রণজিৎ পলায়ন করিল।

কেতকী পান লইয়া আসিয়া দেখিল, রণজিৎ নাই।··· রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে পানের ডিবাটি লইয়া সে বৈঠকখানার ভিতর দিক্‌কার দরজার কাছে ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া গুম্‌গুম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেল—

রণজিৎ সেদিকে পিছন্ ফিরিয়া বসিয়া ছিল···শব্দ শুনিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, মানুষ কেহ নাই, পানের ডিবাটি রহিয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় একখানা মোটা বই লইয়া তৃতীয় ব্যক্তির মত নিঃশব্দে ফারাকে বসিয়া আছেন; গণেন বাসুদেবের গল্প শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেছে···বাসুদেব বলিতেছেন,—গান নিয়েই আছি, বুঝ্‌লে' বাবাজী, গান নিয়েই আছি···কালোয়াতের গুরুগিরিও মাঝে মাঝে করি···আমার "হুঙ্কারে ব্যোমে মহেশ্বর দেবদেব ত্রিলোচন" গানটা দিয়েছি এক কালোয়াতকে···বড় তালের গান, বড় ঝাঁপতাল ··এই দেখ মাত্রা।—

বলিয়া বড় ঝাঁপতালের তাল ফাঁক দেখাইতে তিনি গোল চোখ আরো গোল করিয়া হাত পাতিয়া সেই হাতের উপর অপর হাত উদ্যত করিয়াছেন এমন সময় রণজিৎ পান লইয়া তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—

বাসুদেব পানের দিকে চাহিলেনও না—

—হুং—এই তহাই।···এই দেখ। বলিয়া সুর ভাঁজিয়া আনিয়া যথস্থানে সেই উদ্যত হাত পাতা হাতের উপর চটাস্ করিয়া ফেলিয়া গণেনের মুখের দিকে চাহিয়া সঙ্গীতাচার্য্য মুখ বিস্ফারিত করিয়া রাখিলেন···

গণেন বলিল,—বেশ। বলিয়া সে বাসুদেবের বিস্ফারিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

চোখে চোখে চাহিয়া মনে মনে উঁহারা কি পাঠ করিলেন তাহা জানিলেন কেবল অন্তর্য্যামী।

রণজিৎ বলিল,—পান এনেছি।

বাসুদেব বলিলেন, তা' দেখেছি···তুমি বড় তালকানা হে···অমন সময় ব্যাঘাত দেয়!—বলিয়া দু'টি পান তুলিয়া লইয়া একসঙ্গে মুখে পুরিয়া বলিতে লাগিলেন,—এই যে দেখ্‌ছ ছেলেটি···বাবাজী, পান নেও একটা।

রণজিৎ গণেনের সম্মুখে ডিবা ধরিয়াছিল—

গণেন বলিল,—পান আর আমি খাব না এখন। বলিয়া রণজিতের মুখের দিকে চাহিল।

রণজিৎ চলিয়া গেল—

বাসুদেব বলিতে লাগিলেন,—তোমার শ্বশুরের ছাত্র। তোমার শ্বশুরকে বলি, ভাই, ছাত্রটিকে সুস্থ সবল করে' তোলো আগে, তারপর বাইরের রুগী দেখ'। ঘরের লোকের ঐ চেহারা দেখ্‌লে' বাইরের লোক যে আঁৎকে' পিছিয়ে যাবে!···আমাদেরই মনে হয়, ছোঁয়াচ্ লাগ্‌ল' বুঝি।

গণেন বলিল,—ছেলেটির বাড়ী কোথায়?

বাড়ী ওর চাঁপাগাছি।···নাঃ, নেহাতই উঠ্‌তে হ'ল দেখ্‌ছি···তামাকের ধোঁয়া যার বিশ্রী লাগে সে তামাক দিতে বলে' উঠে' গেলেই পারে··

নিশিকান্ত হাসিয়া ডাকিলেন,—সাধু, তামাক দেরে।

—এতক্ষণে তামাক দেরে!···তারপর শোনো, বাবাজি।···তোমার শ্বশুর গিয়েছিলেন রুগী দেখ্‌তে; গিয়ে উটিকে লাভ করেন।·· বাপ্ নাই, মা আছে, বিমাতা। বাপ্ জীবিতকালেই ছেলেকে তেমন দেখ্‌ত' শুন্‌ত' না, বিমাতা দূর দূর ছাই কর্‌ত।···বাপ্ মারা গেল, সৎমাটা পালিয়ে গেল তার বাপের বাড়ী; ছেলেটি রইল একা।··· সেই গাঁয়ের নিমাই ঠাকুর ওর বাপের পাঠশালার গুরু··· সে-ই ছেলেটিকে—নিয়ে এসে তোমার শ্বশুরের হাতে ধরে বল্‌লে, আপনি নিয়ে যান্ ছেলেটিকে—বড় ভাল ছেলে, ঠাণ্ডা ছেলে, স্বজাতিও বটে; কিছু জাতীয় বিদ্যে যদি ওকে শিখিয়ে দেন কাজ চলা মত, তবে করে' খেতে' পার্‌বে। বলে দিব্যি গছিয়ে দিলে—তোমার শ্বশুর ওকে সঙ্গে করে' নিয়ে এলেন।···বলে, কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।—বলিয়া বাসুদেব হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন; তারপর ঢোক্ গিলিয়া পানের ছিব্‌ড়ি'

নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—তোমাদের পশ্চিমের জলে নাকি লোহার মটর হজম হ'য়ে যায়!···একবার নিয়ে যাও ওকে।

গণেন বলিল,—যদি যেতে চান্ উনি তবে অক্লেশে নিয়ে যেতে' পারি।

—আমি হ'লে জোর করে' নিয়ে যেতাম।···বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়েছিলি? বলিয়া সাধুর হাত হইতে হুঁকা লইয়া বাসুদেব হুঁকার গাত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সাধু বলিল,—ফিরিয়ে ছিনু, বাবু।—বিশ্বেস নেই বাবা, বামুনের ওপর বদ্যির খুব আক্রোশ দেখা যাচ্ছে আজকাল···শর্ম্মা হচ্ছেন সব···তুমি কিছু মনে করোনা বাবাজি। বলিয়া বাসুদেব হাসিয়া হুঁকায় মুখ দিলেন।

গণেন বলিল,—উনি ওষুধ খাচ্ছেন ত'?

শুনিয়া বাসুদেব প্রথমে টান থামাইয়া হুঁকাটা বাঁ হাতে করিলেন···তারপর কবিরাজের দিকে চাহিয়া এমন একটু সূক্ষ্ম চটুল হাসি ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট টিপিয়া সম্মিলিত ঠোঁটের ডগায় ফুটাইয়া তুলিলেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবিরাজের মনে মনে ছটফটানি ওঠ্‌বস্ লাগিয়া গেল—

বাসুদেবকে তিনি চোখ্ টিপিয়া নিষেধ করিলেন; কিন্তু বাসুদেব কবিরাজের এয়ার, কবিরাজের চোখের টিপুনি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; বলিলেন,—হ্যাঁ, ওষুদ উনি খাচ্ছেন, তোমার শ্বশুরই দিচ্ছেন, মন্—

কবিরাজের হাতে বই ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল; কিন্তু, সেই শব্দে ঔষধের নামটি ঢাকা পড়িল কি না কবিরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না।—

এ দিক্‌কার কথাগুলি কানে লইয়া রণজিৎ স্তব্ধ হইয়া তার নিজের স্থানটিতে বসিয়া ছিল···অনুভব করিতেছিল, চতুর্দ্দিক হইতে ধাক্কা আসিয়া তার বুকে লাগিতেছে··· তাহার দেহ শীর্ণ কদাকার বলিয়া লোকে যেন অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহাদের ভিতর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চায়...

পৃথিবীতে এত লোক; সম্মুখ দিয়া দিবারাত্র তাহাদের চলাচলের অন্ত নাই, কিন্তু কেউ তাহার মত নহে। তবু তাহাদের সঙ্গে নিজের খর্ব্বতা ক্ষুদ্রতা কদর্য্যতার তুলনা সে কোনোদিন করে নাই—সে স্বতন্ত্র ছিল···

আজ এই জামাইটিকে দেখিয়া সে যেন ব্যগ্র হইয়া পৃথিবীর বহির্দ্দেশ ছাড়িয়া মানবের অন্তর-লোকে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হইয়াই কঠিন আঘাত পাইয়াছে—দেখিতে পাইয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিবার পথ তার নাই।

রণজিতের মনে হইতে লাগিল, এ কেন আমাকে দেখিল···

দেখায় ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই, বুঝিয়াও রণজিৎ তাহা বুঝিল না···কোথাও যেন রন্ধ্রপথ ছিল—পর্ব্বতের মত আসিয়া পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গেছে ঐ লোকটি·· ইহাকে অস্বীকার করা যাইতেছে না।···

বাসুদেব আচার্য্য রণজিতের ইতিহাস বলিয়া গেলেন, জামাই দরদ দিয়া তাহা শুনিল—

রণজিতের মনে হইতে লাগিল, সে একেবারেই কাঙাল হইয়া গেছে···তার অবলম্বনকে সরাইয়া লইয়াছে···সে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

গণেন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আলাপ করিল; সকরুণ চক্ষে এবং অতিশয় ভদ্রভাবে তাহার রুগ্ন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনার অসুখ কতদিনের?

রণজিৎ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—মাস তিনেকের; আগে ভাল ছিলাম।

মাস তিনেক আগে একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশের রং যখন রাঙা আর সেইদিকে চাহিয়া সুখমগ্ন পৃথিবীর হাসির শেষ নাই, তখন হইতে···

গণেন বলিল,—অসুখ সারাবার কি কর্চ্ছেন?

—কিছুই কর্চ্ছিনে।···এখানে থাকতে আমার অসুখ ভাল হবে না।—বলিয়া ফেলিয়া রণজিৎ চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তারপরই নিজের এ কথাটারই সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটা আলোকে তার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।···নিজের কথাটাই অস্বীকার করিয়া সে পুলকিত কণ্ঠে বলিল,—আমার অসুখ কিছু নেই, জামাই বাবু। এখান থেকেই ভাল হ'য়ে যাব।···সহসা তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, এমনি করিয়া সাধনা করিয়া মৃত্যুর স্পৃহা

জাগাইয়া লইয়া ক্ষয় হইতে হইতে একদিন একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ার চেয়ে বড় সার্থকতা তার জীবনের আর কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু গণেন অবাক্ হইয়া গেল—

এখানে যত্ন তেমন নাই বলিয়া অসুখ সারিবে না, রণজিতের কথার অর্থ করিতে যাইয়া গণেন এই ভুলই করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী উদ্দীপনার সঙ্গে এই অর্থের ভাবসঙ্গতি না পাইয়া সে রণজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

খাইতে বসিয়া গণেন বোধ হয় অন্য কথার অভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,—যাবেন আমাদের ওদিকে? আমার কাছে বেশ থাক্‌বেন; পনর দিনে আপনার শরীর ভাল হ'য়ে যাবে। যাবেন?

তাহারই সম্বন্ধে চেনা অচেনা আত্মীয় পর সবারই অহরহ এই উৎকণ্ঠা গায়ের মাংসে সূচ ফুটিবার মত অসহ্য হইয়া উঠিলেও রণজিৎ ঘুণাক্ষরেও কখনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে নাই···আগে হইলে কি হইত কে জানে, কিন্তু এখন এই অন্তঃপুরে বসিয়া জামাতার মুখের এই প্রশ্ন তাহাকে যেন আরো উদ্ঘাটিত অনাবৃত করিয়া দিতেছে···

উত্তপ্ত মুখে সে নীরব রহিল—

গণেন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—যাবেন?

রণজিৎ বলিল,—না।

কেতকীর মা সেখানে ছিলেন; জামাতৃ ভোজনের তদ্বির করিতেছিলেন; তিনিও করুণা করিয়া বলিলেন,—যাও না, থেকে' এস কিছুদিন···তোমার শরীর আগে না পড়া আগে!

রণজিৎ মরিয়া হইয়া বলিল,—যাব। আপনারা না বল্‌লেও যেতাম।

—এই যে বল্‌লে 'যাব না'। বলিয়া তাহার উল্টা-পাল্টা কথায় কমলা হাসিয়া উঠিলেন···গণেনও মুখ টিপিয়া একটু হাসিল···অন্তরালে কেতকীও বোধ হয় হাসিল···

গণেন বলিল,—আপনি আপন, আমি পর; তাই—

কিন্তু কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না—আমি উঠি। বলিয়াই সহভোজীকে ত্যাগ করিয়া এবং নিজের আহার অসমাপ্ত রাখিয়া রণজিৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল।—গণেন বিস্মিত হইয়া রহিল।

কমলা ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—আমি ত' অন্যায় কিছু বলিনি, বাবা!···কিন্তু সে কথা কানে গেল কিনা সন্দেহ।

বৈকালে গণেন বলিল,—আসুন, বেড়িয়ে আসি।

রণজিৎ বলিল,—আপনি যান আমি যাব না।

···শরীর ভাল নাই বলিয়া রাত্রে সে কিছু খাইল না··· নিশিকান্ত কুশল প্রশ্ন করিলেন, সাধিলেন; কমলা বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভাল ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, বেচারা খাইতে পাইল না, ওবেলাও ভাল করিয়া খায় নাই···রাগের ত' কোনো কথাই হয় নাই···হাওয়া বদল করিতে যাইতে বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে ত' উহারই ভালর জন্য··· তাহাতেই কিছু যদি ও মনে করিয়া থাকে তবে বড়ই অন্যায় হইয়াছে···ইত্যাদি।

জামাই রণজিতের হাত ধরিয়া টানিল,—একটিবার আসনে বসে' যান্।

কিন্তু রণজিৎ অটল নির্ব্বিকার রহিল, যেন এতগুলি লোকের এতগুলি কথায় তার কিছু যায় আসে না।

রাত্রে অন্ধকার ঘরে শুইয়া রণজিৎ কান পাতিয়া রাখিল—যেখানে কোনো শব্দ যায় না সেই ঊর্দ্ধতম শূন্যের মাঝে···সেখানে শুধু অচেতন গ্রহে গ্রহে অগ্নিমরু ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে···

রণজিৎ স্থির নিশ্চল হইয়া শুইয়া ছিল—

একটি একটি করিয়া দীপ নিবিয়া গৃহ অন্ধকার হইয়া তারপর ক্রমে নিঃশব্দ হইয়া যাইতেই সে অস্থির হইয়া উঠিল, পিঠের নীচে শয্যা যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে···

কে বলে আমি মানুষ! এ ভয়ঙ্কর মিথ্যা আমাকে কে শিখাইয়াছে—কেন শিখাইয়াছে! এই মিথ্যার বশীভূত আমি কেন হইয়াছি!···

একবার উপুড় হইয়া, একবার চিৎ হইয়া, একবার এ-পাশে ফিরিয়া, একবার ও-পাশে ঘুরিয়া বিছানায় সে গড়াইতে লাগিল···তার শুষ্ক অস্থি ক'খানা ভাঙিয়া দুমড়াইয়া বেঁকিয়া চুরিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রাণান্তকর আক্ষেপে

শয্যার চারিপ্রান্ত জুড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুরিতে লাগিল—যেন জীবনবাহী যন্ত্রগুলি জীবনপ্রবাহ বাহির করিয়া দিয়া চুপ্‌সিয়া ক্রমান্বয়ে ছোট হইয়া আসিতেছে...শিরা ধমনী সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে টানিয়া জড়ো করিয়া আনিতেছে, প্রসারিত করিয়া ছুড়িয়া দিতেছে···

তাহার তন্দ্রাহীন অপলক চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিল, দু'টি অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃপিণ্ডের মত জ্বলন্ত দু'টি মূর্ত্তি · তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিয়াছে···তাহারা যে রক্তমাংসের মানুষ সে জ্ঞান তাহাদের নাই

কি রূপ সেই যুগলমূর্ত্তির !...তাহাদের কাহারো পদনখর স্পর্শের যোগ্য সে নয়...

রণজিৎ সহসা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দশ অঙ্গুলির নখ দিয়া নিজের কুরূপ দেহখানাকেই চিরিয়া চিরিয়া রক্তাক্ত করিয়া অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ..

ভোর না হইতেই রণজিৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল... উদ্‌ভ্রান্তের মত বহুক্ষণ পথে পথে মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া যখন সে ফিরিল তখন বেলা হইয়াছে, আর সে এম্‌নি বদ্‌লাইয়া গেছে যে তাহাকে চেনা যায় না...চিবুক হইতে ললাট পর্য্যন্ত কে যেন ছুরি দিয়া ঝুরিয়া তার উপর কালি লেপিয়া দিয়াছে···নাক ঝুলিয়া গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে···কোটরপ্রবিষ্ট চোখে অস্বাভাবিক নির্জ্জীবতা আর ক্লান্তি।···

খালি গা, কোঁচার কাপড় পাকাইয়া গলার সঙ্গে জড়ান, বাড়ী ফিরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রণজিৎ উঠান্ হইতে ডাকিল,—মা, একগ্লাস জল খাবো।

—চা খাবিনে? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? বলিতে বলিতে কমলা বাহিরে আসিয়া ভয় পাইয়া গেলেন।—কি হয়েছে রে তোর? অমন করছিস্ যে?

রণজিৎ টলিতেছিল।

—কি, মা? বলিয়া কেতকী আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল···এবং পর মুহূর্ত্তেই যাহা ঘটিয়া গেল রণজিৎ যে তেমন ক্ষ্যাপামি করিতে পারে তাহা কেহ কখন ভাবে নাই···

রণজিৎ হয় তো জল খাইতেই আসিয়াছিল—

কিন্তু কেতকীর কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই সে তার মুখের দিকে না চাহিয়া চাহিল তার পায়ের দিকে; দেখিল, রক্তবর্ণ বসনপ্রান্ত তার চরণতল চুম্বন করিয়া আছে···আর তরুণ রৌদ্র তাহা স্পর্শ করিয়া আছে···

দেখিয়াই রণজিতের কি অদ্ভুত লালসা জন্মিল কে জানে···তাহার জ্ঞান যেন ঘুলাইয়া ঘূর্ণীত হইয়া উঠিল··· চক্ষের নিমেষে সে বসিয়া পড়িয়া কেতকীর পায়ের দশটা আঙ্গুল দুই হাতের দশটা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর হইয়া গেল।

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

অনাদি যুগের সে কোন প্রভাতে
এ জনমে কভু নয়,
হয়ত কখনও দেখেছি তোমারে
ছিল নাক' পরিচয়!

আনত নয়নে দাঁড়াইলে হেসে
বুকে টেনে নিলে কত ভালবেসে,
চুম্বন-ক্ষণে চাহিয়া নয়নে
লাগিল কি বিস্ময়?

অভাবিতা চির বাঞ্ছিতা সাথী
সাথে নিয়ে এলে মধুর প্রভাতী,
পরশ হাতের বিরহ রাতের
আঁধার করিয়া জয়!

বর্ষা-সুন্দরী

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

নিরব নিঝুম রাতে হে বরষা কাঁদ তুমি
কাঁদ কাঁদ কাঁদ—
নিঙ্গাড়ি' সকল জ্বালা তোমার বীণার তারে
বিশ্বসুর বাঁধ !
আমি একা শূন্যঘরে
ক্লান্ত অশ্রু ঝরে' ঝরে'
রিক্ত শয্যা সিক্ত করে'
বিরামবিহীন,
একটি দোসর আশে
অবরুদ্ধ কারাবাসে
বুকভরা দীর্ঘশ্বাসে
যাপি' রাত্রিদিন।
পেয়েছি তোমার মাঝে দুঃখে দুখী একজন
কাঁদ সখি কাঁদ—
তব অই বেণীমুক্ত কেশজালে হে সুন্দরি
বাঁধ মোরে বাঁধ !

আমার আকাশ হ'তে সূর্য্য চন্দ্র মু'ছে গেছে
ধ্রুব শুকতারা
মাথার উপরে শুধু তিমির পাথার জাগে
গতিমুক্তিহারা !
এ শীতল অন্ধকারে
আপন হৃদয়-ভারে
পীড়িত জর্জ্জর,
কেহ কি দেখেছে খুঁজি'
একেলা নয়ন বুঁজি'
নিয়ত কাহারে পূজি'
প্রাণের ভিতর ?

তুমি কি ব্যথার ব্যথী লক্ষ বাহু ল'য়ে এলে
দিতে আলিঙ্গন—
সার্থক হ'য়েছে কি গো সমগ্র সাধনা মোর
তৃষার্ত্ত ক্রন্দন ?

এসেছ কি লো বরষা তাপদগ্ধা ধরণীরে
নব শ্যাম করি' ?—
খুলিতে এ রুদ্ধদ্বার তোমার অঞ্চল-বায়
ওগো সুরেশ্বরি !
ফুলে ফুলে ভরি' ভরি'
বর্ণে গন্ধে পূর্ণ করি'
অধরে বাঁশরী ধরি'
কাজল নয়নে,
মত্তা নটিনীর মত
হাস্যে লাস্যে অবিরত
করি' বিশ্ব চমকিত
নূপুর নিক্বণে ;—
এসেছ কি শ্যামাঙ্গিনী প্রাণের বারতা ল'য়ে
অথবা এ ছল,—
মর্ম্মহীন রাশি রাশি উপহাস অট্টহাস
বৃথা অশ্রুজল ?

কিম্বা কোন সুরবালা আপন বিরহ ল'য়ে
পাগলিনী-পারা—
রচিয়াছে চক্ষে বক্ষে শাপভ্রষ্টা হাহাকার
মন্দাকিনী-ধারা ?
স্বর্গের হিমাদ্রি টুটি'
আকুল হইয়া ছুটি'
মহা আর্ত্তনাদে লুটি'
ব্যাকুলা বিধুরা,

কখনো উল্লাসে মাতি'
দামিনী সোহাগে ভাতি
বিকট দশন পাতি
ভীমা ভয়ঙ্করা।
জীমূতের মহামন্দ্রে প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে চড়ি'
নাচি' তালে তালে—
থমকি দাঁড়ালে আসি আমার দুয়ার পাশে
এই নিশাকালে ?
এসো তবে এসো ওগো ক্লান্ত ক্লিষ্ট ব্যাথাতুরা
—প্রিয় সাথী মোর
দুজনে একত্রে বসি রচিব নূতন মালা
বিশ্ব-প্রেম-ডোর।
সমগ্র এ বিভাবরী
দু'খানি হৃদয়ে ধরি'
দুজনে সৃজন করি'
—সার্থক মিলন।
আঁখিজলে সিক্ত করা অনাদৃত শয্যাখানি
আসনের তলে—
আবেগে বিছায়ে দোঁহে শুনিব দোঁহার কথা
মর্ম্মে-মর্ম্মে গলে!

আমার অন্তরে যাহা তোমাতে প্রকাশ তাহা
—পাইয়াছে আজ
অন্তর-বাহির মোর এক হয়ে তোমা সনে
করিছে বিরাজ।
আমিও তোমার মত
নিশিদিন অবিরত
ভাঙ্গি আর গড়ি কত
সহস্র স্বপন।
কত রূপে কত রঙ্গে
কত রাগে কত ভঙ্গে
নিভৃত মনের সঙ্গে
করি সন্তরণ।
এসো এসো হে সুন্দরি ভুজবন্ধ আলিঙ্গনে
বাঁধ মোরে বাঁধ—
আপন কটাক্ষে তুমি আপনি জ্বলিয়া সখি,
কাঁদ কাঁদ কাঁদ!

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

৬
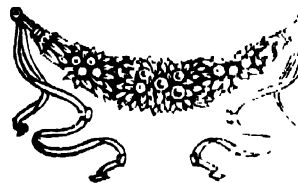
সুধী-র তিরোধানে সমস্ত সংসার ওলোটপালট হইয়া গেল। না আছে শৃঙ্খলা না আছে শ্রী। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, মানুষগুলিও তাহাদের মুখের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মনের চেহারাও বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারের এই অবস্থা দেখিলে সুধী নিশ্চয়ই বনবাসী হইত।

নমিতা এখন এই সংসারে কায়াহীন ছায়ামাত্র—এখানে তাহার আর প্রয়োজন নাই, সে যেন তাহার জীবনের সার্থকতা হারাইয়া বসিয়াছে। নমিতা যেন একটা নির্ব্বাপিত প্রদীপ—অন্ধকারে তাহার নির্ব্বাসন। বিকাল বেলা নমিতা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পিঠের উপর ঘন চুল নামিয়া আসিয়াছে, বসিবার ভঙ্গীটিতে একটি অসহায় ক্লান্তি। এইবার নমিতা কি করিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিতেছে না। এই সংসারে উপবাসী ভিক্ষুকের মত কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া তাহাকে কাল কাটাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার অসহায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অথচ এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়া তাহার পা ফেলিবার স্থানই বা কোথায়? স্বামীর কাছে অপ্রতিবাদ আত্মদানের ফাঁকে সে স্বামীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রেম সন্তানস্নেহ দ্বারা রঞ্জিত হয় নাই। তাই সুধী-র মৃত্যুতে অরুণা শোক করিয়াছেন সুধী-রই জন্য, নমিতা শোক করিয়াছে তাহার নিজের জন্য, তাহার এই অবাঞ্ছিত নিরুপায় বৈধব্যের ক্লেশ ভাবিয়া। এই বৈধব্যপালনে সে না পাইবে আনন্দ, না বা তৃপ্তি। কিন্তু ইহাকে লঙ্ঘন করিবার বিদ্রোহাচরণের উদ্দাম শক্তিও তাহার নাই। তাহাকে মাথা পাতিয়া এই কৃত্রিম অনুশাসনের অত্যাচার সহিতে হইবে।

প্রদীপ কখন যে নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নমিতা টের পাইলে নিশ্চয়ই মাথার উপর ঘোম্‌টা টানিয়া দিত। সে দুই হাতে জানালার শিক্ ধরিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। যেন দুই হাতে দুইটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য সে সংগ্রাম করিতেছে। নমিতার মূর্ত্তিতে এই প্রতিকারহীন বেদনার আভাস দেখিয়া প্রদীপের মন ম্লান হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া সে কহিল,—নমিতা, আমি চল্লাম।

নমিতা চমকিয়া উঠিল। বেশবাস তাড়াতাড়ি পরিপাটি করিয়া প্রদীপের মুখে তাহার নামোচ্চারণ শুনিয়া সে একটি ক্ষীণ রোমাঞ্চ অনুভব করিতে করিতে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আজ সুধী-র অবর্ত্তমানে নমিতার পরিচয়—সে একমাত্র নমিতা-ই; প্রদীপ তাহাকে সম্বোধন করিবার আর কোনো সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাইল না। নমিতার ইচ্ছা হইল অনেক কিছু কথা বলিয়া নিজেকে একেবারে হাল্‌কা করিয়া তোলে—এই অপরিমেয় স্তব্ধতার সমুদ্রে পড়িয়া সে একা-একা আর সাঁতার কাটিতে পারিতেছে না। প্রদীপ ও তাহার মধ্যে যে-পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহার মধ্যে অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাই নমিতা কোনো কথাই বলিতে পারিল না,—স্বামী-র অবর্ত্তমানে প্রদীপের কাছে নমিতার পরিচয়—আর বন্ধু নয়, মৃত বন্ধুর বিধবা-বধূ মাত্র,—দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকেও তাহার আজ নিমীলিত অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইবে। জগতে তাহার সত্তাহীনতাই এখন প্রধান সত্য।

নমিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ কহিল,—পারিবারিক সম্পর্কে তোমার নিকটে না থাক্‌লেও আমি তোমার আত্মীয়, নমিতা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংসার আজকাল পরিবারকে ছাড়িয়ে উঠেছে, সেখানে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের বাধা নেই। অতএব প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে কাজে লাগাতে কুণ্ঠা কোরো না। আমি আপাতত তোমাদের ছেড়ে চল্লাম বটে, কিন্তু হয়তো আবার আমাকে ফিরে আস্‌তে হ'বে। ট্রেণের সময় বেশি নেই;

আচ্ছা আসি। নমস্কার! বলিয়া প্রদীপ দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

এইরূপ অনড় জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকাটা অস্বস্তিকর মনে হওয়াতে নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যে-নমিতা একরাত্রে হৃদ্যতার আবেগে অত্যন্ত প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছিল, সে আজ নীরবে সামান্য নমস্কারটুকু পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে পারিল না। সুধী যেন তাহার ব্যক্তিত্বকে লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে; ভাঙা চশমার খাপের মতই সে আজ অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক।

নমিতাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রদীপ ফিরিল। নিভৃতে বলিবার জন্যই সে নমিতার কাছাকাছি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—সংসারের খরচের খাতায় তুমি নাম লেখাবে—এই আত্ম-অপমান থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা কোরো। তোমার মূল্য খালি সুধী-র স্বামিত্বই নির্দ্ধারণ করেনি। স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তোমার বড়ো পরিচয় আছে—তুমি নারী, তুমি স্বপ্রধান। একজনের মৃত্যুর শাস্তি তোমাকেই সারা জীবন সয়ে' বিড়ম্বিত হ'তে হ'বে—তা নয়, নমিতা। মৃত্যু যদি সুধী-র পক্ষে রোগমুক্তি হয়, তোমার পক্ষে দায়িত্বমুক্তি। সে-কথা ভুল্‌লে তোমার পাপ হ'বে। বলিয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে প্রদীপ রেলিঙের উপর নমিতার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

সেই দৃশ্যটি দূর হইতে অবনীবাবু দেখিলেন। তিনি নীচে নামিতেছিলেন, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্যটা তাঁহার চোখে মোটেই ভাল লাগিল না; ভাল লাগিল না নয়, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রদীপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। অবনীবাবু জানিতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার পথে সুধী প্রদীপের জন্য কোনো বাধাই রাখে নাই; এই পরিবারে প্রদীপ অবারিত অভ্যর্থনাই লাভ করিয়াছে। সুধী বাঁচিয়া থাকিলে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের এই সান্নিধ্য হয়তো অবনীবাবুর চোখে বিসদৃশ বা অসঙ্গত ঠেকিত না, কিন্তু সুধী-র অবর্ত্তমানে প্রদীপের এই সৌহার্দ্দ্য তাঁহার কাছে শুধু অন্যায় নয়, অনধিকারজনিত অপরাধ বলিয়া মনে হইল। নিমেষে পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত উদারতা বিসর্জ্জন দিয়া অবনীবাবুর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেই নমিতা আবার তেমনি রেলিঙ ধরিয়া বসিয়াছে। আন্দোলিত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টায় সে তাহার মা'র মুখ স্মরণ করিতেছিল, এমন সময় পেছন হইতে অবনীবাবু ডাকিলেন,—বৌমা! সহসা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর-দোর দুলিয়া উঠিলেও নমিতা এত চম্‌কাইত না। শ্বশুরের মুখে এমন কর্কশ ডাক শুনিতে সে অভ্যস্ত ছিল না। সংশয়ে তাহার মন ছোট হইয়া গেল। দুই চোখে নীরব কাকুতি নিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবনীবাবু কণ্ঠস্বর একটুও স্নিগ্ধ করিলেন না, কহিলেন,—প্রদীপ চলে' গেল বুঝি? তোমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অত ঘটা করে' থিয়েটারি ঢঙে কী বল্‌ছিল ও?

নমিতার মন শত রসনায় ছি ছি করিয়া উঠিল। তাহার দেবতুল্য শ্বশুর এত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন ভাবিয়া নিদারুণ অপমানে নমিতার আত্মা ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। এ যুগে মাতা বসুন্ধরার কাছে আশ্রয় চাহিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, তাই নমিতা তেম্‌নি অচল নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। কিন্তু কিছু একটা তাহার বলা দরকার,—শ্বশুর ঠাকুরের মুখ সন্দেহে ও ঘৃণায় কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর ফুটিতে চাহিল না, তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় ভয়কে দমন করিয়া সে কহিল,—আমাদের খোঁজ নিতে আবার আস্‌বেন্ বলে' গেলেন।

—আবার আস্‌বে? অবনীবাবু এত চেঁচাইয়া উঠিলেন যে পাশের ঘর হইতে অরুণাও আসিয়া দাঁড়াইলেন।—এবার এলে রীতিমত তাকে অপমানিত হ'তে হ'বে। পরস্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাবে আলাপ করতে হয় সে-সৌজন্য পর্য্যন্ত শেখেনি, ছোটলোক অভদ্র কোথাকার! আবার আসবে! কিসের জন্য আবার আসা হ'বে শুনি? তোমাকে সাবধান করে' দিচ্ছি বৌমা—

মুখ পাংশু করিয়া অরুণা বলিয়া উঠিলেন,—কি, কি হয়েছে?

কথাটার সোজা উত্তর না দিয়া অবনীবাবু কহিলেন,—মুখ দেখে লোক চেনা যায় না, যত সব মুখোস-পরা জানোয়ার। বিশ্বাসের সম্মান যে রাখ্‌তে না পারে তার মত হীনচরিত্র আর কেউ নেই। আবার আস্‌বে সে! আসুক

না। বলিয়া রাগে ফুলিতে-ফুলিতে অবনীবাবু ফিরিলেন ; ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বুঝিতে অরুণাও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে দেরী করিলেন না।

কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল নমিতা কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না। বজ্রাহত লোক যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল। লক্ষ্য করিল তাহার পা কাঁপিতেছে ; সে রেলিঙ্‌ ধরিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মন কাচের বাসনের মত ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাতে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে ; শরীরের এই অমানুষিক ক্লেশভোগের সঙ্গে মনেরও এই জঘন্য লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে ইহা সে তাহার নিরানন্দ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়াও কোনোদিন কল্পনা করে নাই।

অথচ, পরস্ত্রীর প্রতি প্রদীপের এই অসৌজন্যকে সে মনে মনে তিরস্কার করিতে বিবেকের সায় পাইল না। প্রদীপ যদি তাহার দুইটি হাতে অনাবিল বন্ধুতা-রস উৎসারিত করিয়া দিতে চায়, হাত পাতিয়া সে তাহা গ্রহণ করিবে না — নমিতার মন এত কঠিন বা অনুদার নয়। ইহা ভাবিতেই তাহার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না যে, যে-প্রদীপ এতদিন তাহার বন্ধুর রোগশয্যার পার্শ্বে না-ঘুমাইয়া অক্লান্ত সেবা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল সে সহসা এক মুহূর্ত্তের আচরণে এমন কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অথচ সেই আচরণটিতে নমিতা কোনো অন্যায় স্বীকার করিতে পারিল না। মানুষের যখন দৃষ্টিভ্রম হয় তখন সে দড়িকেও সাপ ভাবে, এবং দড়ি হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাপের গর্ত্তেই পা ফেলে। আজ নমিতার হৃদয়ের সকল শুষ্কতা ঠেলিয়া শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সেই অশ্রু তাহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে নয়, নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগের জন্য নয়— একটি অপমানিত অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি।

নমিতা তাহার কাকার কাছে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নবীন কুণ্ডুর লেনে ছোট একখানা দোতলা বাড়িতে নমিতার কাকা গিরিশ বাবু তখন প্রকাণ্ড একটী সংসারের ভার কাঁধে লইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কাচ্চাবাচ্চা লইয়াই তিনি এই ছোট বাড়িতে কুলাইতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ বৌঠান ও তাঁহার ছোট মেয়েটি নিরাশ্রয় অবস্থায় ভাসিয়া আসিল। গিরিশবাবুর এক শ্যালক অজয় পাটনা হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় ল' পড়িতে আসিয়াছে ; পাটনা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া আইন-পাঠে বেশি এক বৎসর অযথা নষ্ট করিলেও তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। অজয় প্রথমে একটা মেসে গিয়াই উঠিয়াছিল, কিন্তু এক দিন ডালের বাটিতে আরশুলা মরিয়া আছে দেখিতে পাইয়া বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়াই সেই যে দিদির বাড়িতে চড়াও হইয়াছে আর তাহার গাত্রোত্থান করিবার নাম নাই। নীচের একটা অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে একটা তক্তপোষ টানিয়া অজয় চুপ করিয়া অবরুদ্ধ বন্দী গলিটার দিকে চাহিয়া থাকে আর আইন-পাঠের নাম করিয়া যে-সব বই অধ্যয়ন করে তাহারা আইনের চোখে মার্জ্জনীয় নয়।

এমন সময় সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া আবার নমিতা আসিল। এইবার গিরিশবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। অবশ্য তাঁহার দাদা মৃত হরিশ বাবু যত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাটির সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে নমিতার জীবিকানির্ব্বাহের খরচটা ধরা ছিল না। নাবালিকা কন্যাটিকে অবাঞ্ছিত মার্জ্জার শিশুর মত অন্যত্র পার করিয়া দিবার জন্য গিরিশবাবু তোড়জোড় করিতেছিলেন ও শোকবিধুরা ভ্রাতৃজায়া হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রয়াণ করিয়া বাকি টাকাগুলি দেবরের হস্তেই সমর্পণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে নীরবে আশ্বাস দিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্রার্থিত অশুভ আশঙ্কা লইয়া নমিতার আবির্ভাব হইল। গিরিশবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা অব্যক্ত অভিশাপ আওড়াইলেন ; তাঁহার স্ত্রী কমলমণি মুখখানাকে হাঁড়ির মত ফুলাইয়া রহিল।

চারিপাশে এতগুলি বান্ধব লইয়াও নমিতার একাকীত্ব তবু ঘুচিতে চায় না। এই নিরানন্দ সংসারে সে যেন নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের আগে উঠিয়া সে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করিয়া চলে—তবু তৃপ্তি পায়

না। এত কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও সে তাহার অন্তরের নির্জ্জনতাকে ভরিয়া তুলিতে পারিল না, তাই সুখ নিদ্রার আবেশে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সে ধীরে ধীরে গলির ধারের সরু বারান্দাটিতে আসিয়া বসে। কি যে ভাবে বা কি যে সে ভাবিতে পারিলে শান্তি পাইত তাহা খুঁজিতে গিয়া সে বারে বারে হাঁপাইয়া উঠে, তবু রাত্রির সেই নিস্তব্ধ গভীর স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া নিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, কখনো সেইখানেই মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়ে। মা টের পাইয়া কখনো তিরস্কার করিলেই নমিতা ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া শোয়, কিন্তু চোখ ভরিয়া ঘুমাইতে পারে না। উহার হাতের সমস্ত কাজ যেন এক নিঃশ্বাসে ফুরাইয়া গেছে। হয়তো উহাকে অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কিন্তু এমনি করিয়াই চিরকাল পরপ্রত্যাশিনী হইয়া নত নেত্রে লাঞ্ছনা সহিয়া-সহিয়া জীবন ধারণের লজ্জা বহন করিবে ভাবিতে তাহার ভয় করিতে থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর পথই বা কোথায়? এক জনের মৃত্যুতে আরেকজনকে অযথা এমনি জীবন্মৃত থাকিতে হইবে এমন একটা রীতির মাঝে কোথায় কল্যাণকরতা আছে তাহা নমিতা তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরিতে পারিত না। কিন্তু এই পঙ্গুতা বা বন্ধ্যাত্ব হইতে উদ্ধার পাইবারও যে কোনো উপায় নাই সে সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চয় ছিল। তাহার এই বেদনাময় ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্যভাবটি যে তাহার স্বামী-বিরহেরই একটা উজ্জ্বল অভিব্যক্তি এই বিশ্বাস এই সংসারের সকলের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়া নমিতা স্বস্তি পাইত বটে, কিন্তু তাহার এই অপরিমেয় দুঃখ যেন উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিত না। কোনো ব্যক্তি বিশেষ হইতে সম্পর্কচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই যদি সে তপশ্চারিণী হইতে পারিত তাহা হইলে তাহার তৃপ্তির অবধি থাকিত না, কিন্তু এই নামহীন অকারণ দুঃখ তাহাকে কেন যে বহন করিতে হইবে মনে মনে তাহার একটা বোধগম্য মীমাংসা করিতে গিয়াই সে আর কূল পাইতেছে না।

সেদিন রবিবার, দুপুর বেলা; তাহার ছোট বোন সুমিতা একখানা বই তাহার কোলে ফেলিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল,—বইখানি তুলিয়া দেখিল, আয়র্ল্যাণ্ড কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহারই বাঙলা ইতিহাস। এই বই সুমিতা কোথা থেকে পাইল মনে মনে তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছে, হঠাৎ সেইখানে গিরিশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন এবং নমিতাকে বই পড়িতে দেখিয়া কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া কহিলেন,—কি পড়ছিস্ ওটা? নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া বইটা কাকাবাবুর হাতে তুলিয়া দিল। গিরিশবাবু বইটার নাম দেখিয়া অর্থ হয়তো সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, রাগিয়া কহিলেন,—বাঙলা উপন্যাস পড়া হচ্ছে কেন? বইটা বাঙলা না হইয়া ইংরাজি হইলেই হয় তো তাহার জাত যাইত না: কিন্তু ইংরাজি নমিতা তেমন ভাল করিয়া জানে না, এ-জন্মে শিখিবার সাধ তাহার খুব ভালো করিয়াই মিটিয়াছে। নমিতা গিরিশবাবুর কথার কোনো উত্তর দিল না, বইটা যে উপন্যাস নয় সেটুকু মুখ ফুটিয়া বলা পর্য্যন্ত তাহার কাছে অবিনয় মনে হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত হেঁট হইয়া সে বসিয়া রহিল। গিরিশবাবু পুনরায় কহিলেন,—এসব বাজে বই না পড়ে' গীতা মুখস্ত করবি, বুঝলি? নমিতা সুশীলা ছাত্রীর মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে পর্য্যন্ত সাহস হইল না যে গীতার বাংলা অনুবাদ পর্য্যন্ত সে বুঝিবে না। যেহেতু সে বিধবা, তাহাকে গীতা পড়িতে হইবে, কবিতা বা উপন্যাস পড়িলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য আর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু বিরোধ করিয়া কিছু বলা বা করা নমিতা ভাবিতেও পারে না, পাছে কাকাবাবু অসন্তুষ্ট হন্ ও পারিবারিক শান্তি একটুও আহত হয় এই ভয়ে নমিতা সেই বইখানির একটি পৃষ্ঠাও আর উল্‌টায় নাই, বরং এমন একটা লোভ যে দমন করিতে পারিয়াছে সেই গর্ব্বে সে একটি পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম বা কর্ম্মে একটু শৈথিল্য দেখিলে মা অপ্রসন্ন হ'ন, কারণ পরের সংসারে তাঁহারা পরগাছা বই আর কিছুই নন, অতএব যতই কেন না নিরানন্দ ও রুক্ষ হোক্ এই কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাদের চলিবে না। নমিতার আসার পর হইতে ছোট

চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, দোতলার তিনটা ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হয়—বিছানা পাতা থেকে সুরু করিয়া ঝাঁট দেওয়া, কাকাবাবুর তামাক সাজা পর্যান্ত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া কাকাবাবুর জুতায় কালি লাগাইতে হয়, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় ক্রমান্বয়ে কাকিমার দুই হাঁটুতে বাতের ব্যথা হইলে কাকিমা না ঘুমাইয়া পড়া পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচর্য্যায় ক্ষান্ত হওয়ার নাম করা যাইত না; তাহার পর কখনো কখনো কাকিমার কোলের মেয়েটা মাঝ রাতে হঠাৎ চেঁচাইতে আরম্ভ করিলে নমিতাকেই আসিয়া ধরিতে হয়, অবাধ্য মেয়েটাকে শান্ত করিবার জন্য বুকে ফেলিয়া বারান্দায় সেই থেকে পাইচারি করিতে থাকে। এত বড় পৃথিবীতে এই স্বল্পায়তন বারান্দাটিই নমিতার তীর্থস্থান, গভীর রাত্রে এখানে বসিয়াই সে মহামৌনী আকাশের সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় আত্মীয়তা লাভ করে। তাহার চিন্তাগুলি বুদ্ধি দ্বারা উজ্জীবিত নয়, ভারি অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—তবু নমিতা তাহার জীবনের চতুর্দ্দিকে একটা প্রকাশহীন প্রকাণ্ড অসীমতা অনুভব করে, তাহা তাহার এই নিঃসঙ্গতার মতই প্রগাঢ়। রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া সে তাহারই মত বাক্যহারা হইয়া বসিয়া থাকে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, সে এক ফোঁটা চোখের জল পর্যান্ত ফেলিতে পারে না। মাঝে মাঝে তাহার সরমার কথা মনে পড়ে। সে নমিতার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়াও সে আর সবায়ের মত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, কোনো কিছু একটা আয়ত্তাতীত অভিলাষের অভাববোধ তাহাকে অধীর উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে নাই। একটি সন্তান পাইলে নমিতার অন্তরের সমস্ত নিঃশব্দতা হয়তো মুখর হইয়া উঠিত—এমন করিয়া দুরপনেয় ব্যর্থতার সঙ্গে তাহার দিনরাত্রি ধরিয়া মিথ্যা বন্ধুতা পাতাইতে হইত না। একটি সন্তান পাইলে নমিতা তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিত, তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিতে যতগুলি মহামানবের পদচিহ্ন পড়িয়াছে তাহাদের সকলের চেয়ে মহীয়ান সকলের চেয়ে বরেণ্য—তাহা হইলে এত কাজের মধ্যেও সব কিছু তাহার এমন শূন্য ও অসার্থক মনে হইত না। সঙ্গোপনে একটি স্বল্পায়ু স্বপ্ন লালন করিবে নমিতার সেই আশাটুকুও অস্তমিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম এত গভীর ও সত্য হইয়া উঠে নাই যে এই ক্লেশকর কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্যে তাঁহার স্মৃতিতে সে আনন্দ উপভোগ করিবে কিন্তু স্বামী যদি তাহাকে একটি সন্তান উপহার দিতে এমন অমানুষিক কৃপণতা না করিতেন, তাহা হইলে হয় তো সেই অনাগত শিশুর মুখ চাহিয়া সে স্বামীর পূজা করিতে পারিত। বারান্দায় বসিয়া বা কখনো কখনো কাকিমার ছোট মেয়েটাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইবার অবকাশে সে এই চিন্তাগুলিই নির্ভয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করে, নিজের এই অকৃতার্থতার অতিরিক্ত আর কোনো চিন্তার অস্তিত্ব সে কল্পনাই করিতে পারে না।

নমিতার আসার পর হইতেই এ সংসারে যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা অজয় লক্ষ্য করিয়াছিল। ছোট চাকরটাকে বিড়ি খাইতে কালে-ভদ্রে দুয়েকটা পয়সা দিলেই সে পরম আপ্যায়িত হইয়া কুঁজোয় জল ভরিয়া টেবিল সাফ করিয়া বিছানাটা তক্‌তকে করিয়া তুলিত। ইদানিং টের পাইল, চাকরটা অন্তর্হিত হইয়াছে; এবং দিদি হুকুম দিয়াছেন যে এ-সব কাজ অজয়কে নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে। গূঢ় কারণটার মর্ম্মার্থ সুমি-ই এক সময়ে অজয়কে জানাইয়া দিয়া গেল। অজয় বুঝিল, তাহার পরিচর্য্যা করিবার জন্যই চাকরটাকে রাখা হয় নাই এবং উপরের ঘর করণা করিবার জন্য যখন নমিতার শুভাগমন হইয়াছে তখন চাকরটার জন্য বাহুল্য খরচ করা সমীচীন হইবে না। নমিতার যে নীচে নামা বারণ তাহাও সুমি অনুচ্চ কণ্ঠে অজয়ের কাণে বলিয়া ফেলিল; তাই তাহার ঘর-দোরের শ্রী ফিরিবার আর কোনই আশা রহিল না। তবু ছেলেটা এমন অকেজো ও অলস যে নিজের বিছানাটা গুছাইয়া লইবে তাহাতে পর্য্যন্ত তাহার হাত উঠিল না; স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতার মাঝে সে দিন কাটাইতে লাগিল। নমিতাকে সে চোখে এখনও দেখে নাই, তবু সংসারের আবহাওয়ায় যে একটা মাধুর্য্য সঞ্চারিত হইতেছে তাহা সে প্রতিনিয়ত অনুভব করে। নমিতার কাজে হাজার রকম ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাহার দিদি সর্ব্বদাই কর্কশ কথা বলিয়া চলিয়াছেন, আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও যে শিষ্টাচার আমরা প্রত্যাশা করি

কখনো কখনো তাঁহার কথাগুলি সেই ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে—অজয় মনে মনে একটু পীড়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া দিদির অশিক্ষাজনিত এই অসৌজন্যকে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই সব নিষ্ঠুর গালিগালাজের প্রতিবাদে নমিতা আত্মরক্ষা করিতে একটিও কথা কহে না, তাহার এই নীরব উপেক্ষাটি অজয়ের বড় ভালো লাগে। অজয়ের উপরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু পাছে তাহার অযাচিত সান্নিধ্যে একটি নিঃশব্দচারিণী নির্ব্বাককুণ্ঠিতা মেয়ে অকারণে সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয় সেই ভয়েই সে তাহার ছোট ঘরটিতেই রহিয়া গেছে—নমিতাকে উঁকি মারিয়া দেখিবার অন্যায় কৌতূহল তাহার নাই।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই অজয়ের ঘুম আসিতেছিল না, পাশের নর্দ্দমা হইতে মশককুল দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে আলমারির মাথা হইতে বহুদিনের অব্যবহৃত মশারিটা নামাইল, কিন্তু প্রসারিত করিয়া দেখিল সেটার সাহায্যে বংশানুক্রমে ইঁদুরগুলি ভূরিভোজন করিয়া আসিতেছে। অগত্যা নিদ্রাদেবীকে তালাক্ দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। গলিটুকু পার হইয়া হ্যারিসন্ রোডে পড়িবে, বাঁক নিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহাদের দোতলার বারান্দায় একটী মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অজয় থামিল, বুঝিল ইনিই নমিতা, নিদ্রাহীনা। স্তম্ভিত হইয়া কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল খেয়াল নাই, সে যেন তাহার চোখের সম্মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক আবির্ভাব দেখিতেছে। রাত্রির এই অপরিমেয় স্তব্ধতা যদি কোনো কবির কল্পনাস্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আকার নিতে পারিত তবে এই পবিত্র সমাহিত সুগম্ভীর নারীমূর্ত্তিই সে গ্রহণ করিত হয় তো। মুহূর্ত্তে অজয়ের হৃদয়ে বেদনার বাষ্প পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। এত বড় সৃষ্টি হইতে সম্পর্কহীন এমন একটি একাকিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে যেন চলিবার শক্তিটুকুও সে হারাইয়া বসিয়াছে। চরিতার্থতাহীনতার এমন একটা সুস্পষ্ট ছবি সে ইহার আগে কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারিত না।

পরের দিন রাত্রেও আবার সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল নমিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন এই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে বিলীন হইয়া গেছে। আজ হঠাৎ কেন জানি না নমিতাকে দেখিয়া তাহার মনে নূতন আশা-সঞ্চার হইল, নমিতা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটি সুস্পষ্ট সহজ সঙ্কেত। এই নমিতাকে তাহাদের দলে লইতে হইবে। কৃত্রিম সংসারের গণ্ডীতে জন্মান্ধ কূপমণ্ডুকের মত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া দিনযাপন করিলে তাহার চলিবে না, কর্ম্মে শিক্ষায় চরিত্রমাধুর্য্যে তাকে বলশালিনী হইতে হইবে। সেই সুষুপ্ত মধ্যরাত্রিতে অবারিত আকাশের নীচে নমিতার প্রতি অজয় এমন একটি সুদূরবিস্তৃত সহানুভূতি অনুভব করিল যে, যদি তাহার শক্তিতে কুলাইত, এখনি তাহাকে ঐ অবরোধের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত বিদ্রোহিনীর বেশে পথের প্রান্তে নামাইয়া আনিত। কিন্তু অজয় তাহার ভাবোচ্ছ্বাসের প্রথম উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দিদির মেয়েটা যথারীতি চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে। নমিতা ছুটিয়া গিয়া যথাপূর্ব্ব মেয়েটাকে কোলে নিয়া প্রবোধ চেষ্টায় পাইচারি আরম্ভ করিল। নমিতা যে সামান্য সংসারকর্ত্তব্যসাধিকা এই সত্যটি অজয়ের চোখে এখন সহসা উদ্ঘাটিত হইল দেখিয়া তাহার চমক ভাঙিল। তুচ্ছ সন্তান পালন কি তাহাকে মানায়? বাঙলা দেশে তাহার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে আছে। নমিতা সর্ব্ববন্ধনমুক্তা সর্ব্বদায়িত্বহীনা বিজয়িনী! নমিতা মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাবের চেয়ে সুন্দর!

তাহার পর দিন অজয় সুমিতাকে নিয়া পড়িল। নমিতা কিছু পড়াশুনা করে কি না এইটুকু জানিতেই তাহার প্রবল ঔৎসুক্য হইয়াছে—সুমি ইহার যাহা উত্তর দিল তাহা স্বীকার করিতে গেলে তাহার দিদিকে কালিদাসের চেয়েও বড় পণ্ডিত বলিতে হয়, কিন্তু দিদির প্রতি সুমির এই প্রশংসমান পক্ষপাতিত্বে অজয় বিশ্বাস করিল না। আল্‌মারি হইতে একখানা বই বাহির করিয়া বলিল,—এ বইখানা তোমার দিদিকে পড়তে দিয়ে এসো, কেমন?

সুমি ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—দিদি আমার মতো বানান করে' পড়ে না, এক নাগাড়ে পড়তে পারে। আমি যাচ্ছি এখুনি।

অজয় সুমিকে ডাক দিয়া ফিরাইল, প্রায় কানে কানে কহিবার মত করিয়া বলিল,—বইটা কে দিয়েছে ব'লো না যেন, বুঝলে?

(ক্রমশঃ)

প্রতিদান

[মোতাহের হোসেন চৌধুরী]

তুমি তব ভাণ্ডারের সর্ব্ব সুধা আনি'
দিয়েছ আমারে সদা পান-পাত্র ভরি ;
বুভুক্ষুর মতো আমি নিয়েছি তা টানি'
হৃদয়ের শত মুখে সকল পাসরি'।

দস্যু সম লুটে' নিছি রাত্রি দিবা নিতি
গন্ধ-রূপ-রস-প্রীতি, পুলক-কম্পন ;
বৈচিত্র্য-বিলাস আর অর্থহীন গীতি
চিত্ত তলে সৃজিয়াছে নন্দন-কানন।

তোমার প্রণয় লভি' হে সুন্দরী ধরা
প্রাণে মোর জাগিতেছে কি মহা উল্লাস ;
সুরের তরঙ্গাঘাতে মরিয়াছে জ্বরা,
সুন্দরের দীপ্ত বিভা পেয়েছে প্রকাশ।

তুমি নিত্য দিলে মোরে আনন্দ মহান,
কি তোমারে দিব আমি ? লহ ক'টি গান॥

স্বপ্ন-অভিসারিকা

(সনেট)

[রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী]

নিদ্রার আড়ালে ঢাকি' চারু দেহ খানি
কে বালা পাঠালে তব দেহের নকল ?
···প্রাণ খুঁজে কার এত স্নিগ্ধ পরিমল
পেলব পল্লব ঘেরা কোথা ফুল-রাণী !
অনঙ্গ পরশে করি' অন্তর বিকল
খেলে যাও ছায়া-নটি—যেন জ্যোতির্ল্লতা।
আকাশ-কুসুম মেলে বরণের দল
লঘু-পক্ষ বলাকার তা'তে চঞ্চলতা !

নিদ্রার সঙ্গিনী তুমি···মৃত্যুর মমতা···
স্বল্প সুখ স্বল্প আয়ু—যেন অক্ষমতা।

পদ্মগন্ধা রমণীর দেহ-গন্ধে স্মরি'
লুক্কায়িত ব্রীড়ানত তোমার আভাস।
বিস্মিত নয়নে হেরি দিবা বিভাবরী
অঙ্গে তার যেন তব অনঙ্গ প্রকাশ।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম

[শ্রীসতীশ রায়]

পক্ষীতত্ত্বাবদদের কাছে শুনিতে পাই কোকিল যে এমন সুর তরঙ্গে আকাশ ভাসাইয়া দেয়, তাহা নাকি কেবল কোকিলার মনোহরণের অভিপ্রায়ে। কপোতের কল কূজনের উদ্দেশ্যও তাই। কবি এই গানকারী পাখীর জাতি। তিনিও গান করেন তাঁর চিরন্তন প্রিয়ার উদ্দেশে—তাঁর গানের প্রথম এবং প্রধান বিষয় প্রেম।

কবিদের এই প্রেমের গান বস্তুগত হইতে পারে, ভাবগত হইতে পারে, আবার বস্তুকে অবলম্বন করিয়া "ভাবের মাঝারে ছাড়া" পাওয়ার সাধনাও হইতে দেখা যায়।

মোটের উপর দুইয়ের অভাবে এক যেখানে সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না, সেই অসম্পূর্ণের বিরহ-বেদনা কাব্যের প্রধান বিষয়। এই প্রেম বা আকর্ষণ একের প্রতি অপরের কিংবা পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে কোনো নামে অভিহিত করা যাইতে পারে—কিন্তু মূলকথা এক থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ "বৈষ্ণব কবিতা"য় বলেন, নরনারীর মিলন-মেলায় যে পুষ্পমালা গাঁথা হয় তাহা কেহ "বঁধু"র গলায় দেয় আর কেহ বা "তাঁহার" গলায় দেয়, তা'তে তাঁর অসন্তোষ নাই। কারণ,

"আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !"

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এবং গানে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে যে প্রেম না আসিলে প্রাণে গান জাগে না, কোনো প্রকার কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

"তুমি না দাঁড়ালে আসি
পরাণে বাজে না বাঁশী !"

বাস্তবিক প্রেমই কবির দৃষ্টি, যেমন বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টি বুদ্ধি। হৃদয় দিয়াই কবি দেখেন, চোখ দিয়া নয়। অন্তরের অনুভূতি দিয়াই তিনি সব কিছুকে স্পর্শ করেন, —সব কিছুর স্পর্শ পান। বুদ্ধি বিবেচনা দিয়া তিনি কিছু বোঝেন না, তিনি বোঝেন অন্তরের আবেগে, প্রাণের প্রেরণায়,—তাই তাঁর দেখা পূর্ণতার ছবি দেখা, সত্য-রূপ দর্শন। সেইজন্য সহসা তাঁর মুখ দিয়া পরম সত্য বাহির হইয়া আসে, "আনন্দেন জাতানি খল্বিমানি"। আনন্দ হইতে এই বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভব। আনন্দের মূলে আবার প্রেম। ভগবান ভালবাসেন, তাই সৃষ্টি করেন। আবার বিশ্বকবির অনুসরণ করিয়াই কবির জীবন। তাই জীবনের কাব্যই প্রেম, প্রেম ছাড়া কাব্যের দ্বিতীয় বিষয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মতে একলা একলা কখনো গান জমে না—কাব্যসৃষ্টি নিরর্থক হয়। তিনি বলেন,—

"জগতে আছে যত গানের সভা
যুগল মিলিয়াছে আগে
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা
সেখানে গান নাহি জাগে।"

ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রেমের সহিত কত ঘনিষ্ঠ রূপে সম্পর্কিত তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। আমাদের শাস্ত্রে প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাটি চমৎকার,

সম্যক্, মসৃনিতঃ শান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈরেব নিগদ্যতে।

যাহা দ্বারা চিত্ত সম্যকরূপে নির্ম্মল হয়, যাহা মমতার একশেষ এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত গাঢ়, সেই ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেম কহেন। প্রেমই সেই সৎচিৎ আনন্দের "আনন্দ", অস্তিভাতিপ্রিয়ের "প্রিয়", সত্যং শিবং সুন্দরমের "সুন্দর"। "মদন ভস্ম" না হইলে প্রেম অনুভব সীমান্তে আসে না।

প্রেমের এই সত্যরূপ কবিরা দেখিতে পান, কল্পনার দিব্য দৃষ্টি দ্বারা। সেই জন্য কবি রবার্ট ব্রাউনিংকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে শুনি,

"Brightest truth, Purest trust in the Universe
—all were for me
in the kiss of one girl !"

চণ্ডীদাসের—

"একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভবানী ভাবের দেহা !"

ইহা আমাদের দেশের প্রেম-সাধনার একটি বিশিষ্ট রূপ ! রবীন্দ্রনাথের "অন্ধ বালিকা" নামে ছোট অথচ আশ্চর্য্য

সুন্দর কবিতাটি দেখুন। প্রেম কবির কাছে একটু মহা-মূল্য রত্ন—যে তাহা দিতেছে, সেই বালিকা তার দান সম্বন্ধে অন্ধ, কিন্তু যিনি পাইলেন সেই কবি দানের মহার্ঘ্যতা বোঝেন এবং তার সমাদর করেন।

"কহিনু তারে অন্ধকারে দাঁড়ায়ে রমণী
কী ধন তুমি করিছ দান জাননা আপনি!"

প্রেমের আর এক নাম নাকি মরণ: অন্ততঃ রবীন্দ্র-কাব্যে এই ভাবটি আমরা পাই। প্রেমেই আমরা

"মরণ যে কত মধুরতাময়
আগে হ'তে পাই তার স্বাদ!" (বিসর্জ্জন)

আবার মরণ আছে বলিয়াই প্রেম এত মধুর। এই সকলে এক সঙ্গে আছি, খানিকপরে কে কোথায় চলিয়া যাইব!—"ফিরে দেখা হ'বে না ত আর" সেই জন্যই জগতে এত ভালবাসা!

কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনকে যে দীক্ষাদানে উদ্বোধিত করেন তাহা প্রেমের দীক্ষা, তাহা রসের দীক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের দীক্ষা। ভগবান যে রসস্বরূপ, তাঁর এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে আনন্দ আছে, প্রেমেই যে বিশ্বজগৎ বিধৃত এযুগে এ সত্য আমরা তাঁর কাছেই শিখি। সর্ব্ব প্রকার সৌন্দর্য্যই আমাদের জীবনকে প্রেমের মধ্যে উপনীত করিতে পারে—তাঁর বর্ণিত প্রেম কোনো সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

"আকাশ, জল, বাতাস, আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো।"

এই সব-কিছুকে ভালবাসিতে বলে। তাঁর প্রেম এই ভালবাসার মতই উদার। বাস্তবিক কোনো সত্য প্রেমেই আমাদের মনকে সঙ্কীর্ণ করে না—মোহে আবদ্ধ করিতে পারে না—তাহা কেবল আমাদের মনের প্রসারকে বাড়াইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি প্রেমের,

"ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
ব্যাপ্ত করি ফেলিয়াছে সমস্ত সংসার!
গৃহের বণিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।"

কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রেম সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার মহান অস্তিত্ব অনুভব করাইয়াছে—তাঁর "প্রেমের অভিষেক" কবিতায় এই ভাবটি আমরা পাই। "বৈরাগ্য-বিলাসী" সাধু সন্ন্যাসীরা যাহাকে মায়ামোহ বলিয়া উড়াইয়া দেন সেই প্রেমকেই কবি সম্মানের আসন দিয়াছেন, এই প্রেমময়ই তাঁর জীবন-দেবতা। তিনি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা "নৈবেদ্য" কাব্যে বলিয়াছেন,

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি। সে আমার নয়!"

এবং

"প্রেম মোর ভক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়া!"

বিদেশের কবিকে বলিতে শুনি,

"He prayeth best who loveth best
All things both great and small!"

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন,

"পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার পরাণ তার?"

কারণ জীবনের সকল বড় প্রেমের সত্য অনুভূতিই সেই অসীমে গিয়া মেলে যেমন "বিরাম-হারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে!" রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রেম ছোটে সত্য, কিন্তু সে সকল সীমার বেড়া ভাঙিয়া অপরূপ করিয়া দেখিবার জন্য। ফরাসী কবি আনাতোল ফ্রান্সের Thais উপন্যাসের নায়ক সন্ন্যাসীকে চির জীবন আত্ম-বঞ্চনা করিয়া অবশেষে বলিতে শুনি, "In this world there is nothing true but this human life and human affection!" রবীন্দ্রনাথের

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

সব হিসাবে সত্য। এক যেদিন একলা থাকিতে পারেন নাই, বহুর মধ্যে আপনাকে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে বিশ্ব-সৃষ্টিতে প্রেমের আরম্ভ। সেই দিন হইতে অনুসন্ধান ও আকর্ষণে তার সাধনা—মিলনে তার সিদ্ধি যাহারা এককালে কাছাকাছি ছিল—সৃষ্টি স্রোতে ভাসিয়া দূরে গিয়াছে—সেই বিরহ-বোধেই প্রেমের জন্ম। এই আকর্ষণ জগতে আছে বলিয়াই গ্রহ উপগ্রহ, কক্ষচ্যুত হইয়া বিনাশ পায় না। সূর্য্য সকলকে হারাইয়াছে—সকলকে ফিরিয়া চায়। নক্ষত্র নক্ষত্রের আকর্ষণে অনন্ত শূন্যে চির বিধৃত। প্রেমের আবর্ত্তনে বিশ্ব জগৎ অবস্থান করিতেছে।

মনে ভাব না জাগিলে গায়কের গান আসে না, আসিলেও তাহা কলের গান হয়, তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কবি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং কোন শিল্পীর পক্ষে যথার্থ রস সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই ভাবের এক নামই প্রেম।

বিশ্বকবি পৃথিবীতে যে এত সৌন্দর্য্যের খেলা খেলিয়া এই ভোলানন্দরূপে দিক আলো করেন, তাহা কেবল মর্ত্ত্যবাসীদের মনে প্রেম জাগাইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমাদের হৃদয় পাইবার জন্য তাঁহার হৃদয়েও ক্ষুধা জাগে তাই কবি রবীন্দ্রনাথকে গাহিতে শুনি,

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে ?
কেন তারার মালা গাঁথা
কেন ফুলের শয়ন পাতা
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে ?"

জগতের এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ভগবান মানুষের মনে প্রেম দিয়াছেন বলিয়াই সার্থক।

জগতের আর সব কিছু চঞ্চল, প্রবহমান, কিন্তু প্রেমের মধ্যে মানুষের একটি পরম আশ্রয় আছে—সেখানে সে এই বিশ্ব জগতের চির চঞ্চলতার মধ্যেও একটি "স্থিরতার নীড়" বাঁধিতে পারে। কবির মতে প্রেমই মনের ঘরে বাসা দেয়—মাটিতে বাসা বাঁধায় এবং জগতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকে চাহিয়া দেখিবার, উপলব্ধি করিবার অবসর দেয়। এই সীমার সৌন্দর্য্য-দর্পণে অসীমকে প্রতিফলিত করে।

তাই কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলেন,

"হে প্রেম! হে ধ্রুব সুন্দর!
স্থিরতার নীড় রচিয়াছ তুমি ঘূর্ণার পাকে খরতর!
দীপগুলি তব গীত মুখরিত, ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির চরমশান্তি নিমেষের মাঝে মনে আসে।"

বাস্তবিক প্রেমের সাধনাই কবির সাধনা। প্রেমের পূর্ণ রূপ দেখিবার জন্য তাঁকে ত্যাগের তপস্যাকে বরণ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের প্রেম বস্তুকে অবলম্বন করে বটে কিন্তু বস্তুকেই একান্ত করিয়া দেখে না, যেন বোঁটার উপর ফুলের আশ্রয়। ফুলটিই তার আসল জিনিষ—বোঁটাটি তার অবলম্বন মাত্র। মনে রস জাগায় বলিয়া তাঁর রূপকে চাই, আপন প্রয়োজন মিটাইয়া, কবির মনে মাধুর্য্য জাগাইয়া সৌন্দর্য্য কোথায় অদৃশ্য হয় তার সন্ধান মিলে না। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিরহেই স্ফূর্ত্তি পায় ভাল—লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাঁর অধিকাংশ ভালো কবিতা জাগাজে লেখা। বাহির যখন কৃপণ, অন্তর তখন আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

কাছের পাওয়া জীব জগতের পাওয়া—দূরের পাওয়াই কবির পাওয়া—বেদনার অনুভূতিই কাব্যের বিষয়। তাই তাঁর শেষ জীবনের কাব্য "পূরবী"তে দেখি, প্রেম যদি দূরে যায়, কবির তাহাতে পরম লাভ। কারণ তাহা হইলে কবির চিত্ত "বেদনা বিদ্যুত গানে নিত্য জ্বলিয়া" উঠিবে এবং তখনই তাঁর পক্ষে "দীপ্ত গীতে স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করা" সম্ভবপর হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ মনের প্রেম দিয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, তাঁর মতে কোনো বিশ্ববস্তুতে রূপ নাই।

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি, তুমি আমারি"

বস্তুতঃ প্রেমই বিশ্বকবির সৃষ্টিমন্ত্র। মুাট হামসুন বলেন, "Love is the first word of God, the first thought that sailed through his brain. He said, "Let there be light! and then Love was."

"পুরস্কার" কবিতায় কবির কাজ কি তাহা সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে দেখি,

"সুখীরা হেসেছে দুখীরা কেঁদেছে
প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে
আজি আমাদের মত!"

ভালবাসাই কবির প্রধান কাজ—যাঁর হৃদয়ে প্রেমের প্রসার যত বেশী তিনি তত বড় কবি, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বলিয়াই তিনি বিশ্বপ্রেমিক।

মুনি ঋষিরা লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জন গিরিগুহায় চোখ বুঁজিয়া বসিয়া মোক্ষ মাগিয়া তপস্যা করিতেছেন।

কিন্তু সৌন্দর্য্য-সন্ন্যাসী কবি প্রেমের তপস্যা করেন—তাই লোকালয়ে তাঁর স্থান, তিনি,

"আঁখি না মুদই, কান না রুধই
সুন্দর রূপ হস হস দেখই।"

তাঁর পরিপূর্ণতা লাভের তপস্যায় চোখ বুঁজিবার দরকার নাই, কাণ বন্ধ করিতে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার!
যা' কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তা'রি মাঝখানে।"

কবির মতে জীবনকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে প্রেম। তাইত' 'বিসর্জ্জন' কাব্যে জয়সিংহের মুখে কবিকে বলিতে শুনি,

"শুধু তাই বল, যা' শুনিলে মনে হবে
চারিদিকে আর কিছু নাই; শুধু ভালবাসা
ভাসিতেছে, পূর্ণিমার সুপ্তরাত্রে
রজনী গন্ধার গন্ধসম।"

একলার বর্ণনাটিও চমৎকার!

"ঘরে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই।"

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মূর্ত্তি কবির মানসীই কবির দেবতা। তবে কবির জীবনে এই দেবতার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কারণ কবির মন বড় কোমল। সেই জন্যই সুখ দুঃখ, মান, অভিমান, স্নেহ ভালবাসা তাহাদের এত সহজে বিচলিত করিতে পারে—অনায়াসে ছাপ রাখিয়া যায়। যদিও তাহা জলে দাগ দেওয়ার মতই অস্থায়ী—কারণ তাহা শীঘ্রই "ঢাকা পড়ে নবনবজীবনের জালে।" কবির চঞ্চল মন চিরপরিবর্ত্তনশীল—যেন শ্লেটের লেখা, মুছিয়া দিলেই পরিষ্কার। রবীন্দ্র কাব্যে আমরা যে মানব-জীবনের বিচিত্র অনুভূতির সুতীব্র প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা ক্ষণিক বলিয়াই সম্ভব। জলের আল্‌পনা না হইয়া পাষাণের দাগ হইলে কবি-মনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমরা পাইতাম না। সেই জন্য বিদেশী কবিদের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের প্রেম কখনো একনিষ্ঠ বা স্থায়ী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের "অনন্ত-প্রেম" কবিতায় কবির প্রেমই অনন্ত, বাঞ্ছিতা তাহা জন্মে জন্মে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া কবির সেই প্রেম নিবেদন গ্রহণ করিয়াছেন।

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার;
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার;
কত রূপ ধরে, পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।"

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম প্রায় সময়ই ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়াছে বটে কিন্তু তাহা একান্তভাবে ব্যক্তিতে আবদ্ধ হয় নাই—তাহা অবশেষে সেই অনন্তে গিয়া মিশিয়াছে। সকল শ্রেষ্ঠ প্রেমের পরিণতিই তাই।

তাঁহার ব্যক্তিপ্রেমের ধারা কেমন করিয়া বিশ্বপ্রেম ও ভগবতপ্রেমের সমুদ্রে পৌঁছিয়াছে তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাত্রি বিদায়-ক্ষণের চিন্তা করিতেছে, ক্রোড়ে সুপ্ত ধরণী এখন নিশ্চিন্ত স্বপ্ন ঘোরে নিমগ্ন। রাজু ও ললিত দুইজনে অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিল; রাজুর হাতে তাহার প্রিয় লাঠি, ললিত চাপা গলায় কথা কহিতেছে··· দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছে—ললিতের কথা শেষ হইলে রাজু প্রশ্ন করিল, "ছেলেটা আমার বাড়ীতেই রাখতে হবে না অন্য কোথাও পাঠাতে হবে?" ললিত চিন্তা করিয়া উত্তর দিল—"তোমার বাড়ীতেই থাকবে, তোমাদের বাড়ীর মত মানুষ কর্ব্বে। তিনটে বছর গেলে, আমি ওকে নিয়ে যেতে পারব, এখন আমি বাবার অধীন, কি কর্ত্তে পারি। তবে তুমি যদি মনে কষ্ট কর তাহলে নয় থাক্—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তৈরী হয়ে আসি, ছেলেটাকে নিয়ে জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যাব, যা থাকে অদৃষ্টে।" শেষের কথাগুলি বলিবার সময় স্বর অভিমানে ভারী হইল—ললিত সেইখানে দাঁড়াইল, "তাহ'লে রাজুদা, আমি চল্লাম"—বহুদিনের পর বাল্যকালের অভ্যাস মত রাজু ললিতের দুইটি হাত একত্রে নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—অবশ্য বাল্যকালের মত "ছাড়াও দেখি কত জোর" একথা বলিল না, অন্ধকারের মধ্যে রাজুর মুখভাব লক্ষ্য করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ললিত নিরস্ত হইল, রাজু তখন কথা কহিতে পারিয়াছে, "খোকাবাবু, আমি তা বলি না; তুমি নিশ্চিন্ত থাক—আমার কাছে থাকবে, তোমার হুকুম না পেলে তাকে কাছছাড়া কর্ব্ব না; কোন কথা কেউ টের পাবে না।"

ললিতের একটি হাত রাজুর হাতে ইচ্ছাবন্দী, এবার তাহারা নীরবে অগ্রসর হইতেছে।

দেউড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উভয়ে সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ করিল। বাগানের পথ দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহারা দ্রুতগতিতে চলিল। গত সন্ধ্যার ঘটনা স্থলের নিকট আসিয়া ললিতের অগোচরে রাজুর দৃষ্টি সতর্ক ও তাহার লাঠির মুষ্টি দৃঢ় হইয়াছিল—কিন্তু নিরাপদে তাহারা খুদীর কুটির সান্নিধ্যে পৌছিল।

তিন চারিটী কুঠুরির মধ্যে বড়টিতে আলো জ্বলিতেছিল; বুনোবুড়ী দ্বারের নিকট দেওয়াল আশ্রয় করিয়া তন্দ্রাতুর, দ্বার অর্গল বদ্ধ নহে, নিঃশব্দে উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, খুদী একটা তক্তপোষের উপর অর্দ্ধ মলিন শয্যায় পড়িয়া আছে তাহার দেহের বিশেষ কিছুই লক্ষ্য গোচর নহে, কেবল যেখানে শীর্ণ মাথাটি বালিশের উপর এক ধারে অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ন্যস্ত—তাহার মধ্য হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু দুটি যেন জগতকে বিঁধিতেছে—রোগে শুষ্ক বদনমণ্ডলে পূর্ণ বিস্ফারিত চক্ষু অতি বৃহৎ মনে হইতেছিল। মাত্র ক্ষীণ একটি করে প্রাণের লক্ষণ বর্ত্তমান—সে করতল পার্শ্বে সুপ্ত পুত্রের দেহকে চুম্বন আশীষ করিয়া ফিরিতেছে। ললিত অগ্রে, রাজু পশ্চাতে; খুদীর দৃষ্টি ললিতকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সোৎসুকে রাজুর দীর্ঘ দেহের উপর স্থাপিত হইল। তাহার দীর্ঘ দেহ ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে দীর্ঘতর প্রতীয়মান হইতেছিল—খুদীর চক্ষুতে যেন কক্ষখানি রাজুতে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বুড়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পাথরের বাটি হইতে এক ঝিনুক জল খুদীর মুখে ঢালিয়া দিলে খুদী কথা বলিতে পারিল "কে ও? বাবুর ভাই?" ললিত নিরুত্তর, রাজু বলিল, "না, আমি গোয়ালা; কই ছেলে কই?"

খুদী একবার ক্রন্দনের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে শক্তি তাহার পূর্ব্বগামী হইয়াছে, ক্রন্দনের একটা উদ্ভট অভিনয় হইল মাত্র। বালক জাগ্রত হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আগন্তুকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছিল—খুদী ইঙ্গিতে ললিতকে নিকটে, পরে আরও নিকটে আসিতে আহ্বান করিল; ললিতের ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, কাসিতে কাসিতে কষ্টে বলিল "বিছানায় এসে বোসো, আজ আবার এ কি ঢং; আমার হয়ে এসেছে, দেখছো না? ন্যাকামি রাখ।" কাসির বেগে অল্প রক্ত চিবুক বহিয়া শয্যার উপর ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে—ললিত জড়সড়

হইয়া শয্যার এক পার্শ্বে অগত্যা বসিল—তাহার খেলার সামগ্রী পুতুল রূপে বেশ ছিল, আজ যেন প্রাণ পাইয়া বীভৎস হইয়াছে। খুদী ক্ষান্ত হইল না, কাসির বেগ যথাসাধ্য দমন করিয়া, থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল "খোকাকে কোলে নাও—ও খোকা বাবার কোলে যা—মা মরে যাবে—এই তোর বাবা—বল্ বাবা, বাবা এই আমার বাবা, বল্—আর ওই গয়লা জেঠা, বল্ নাও বাবু এবার ছেলেকে কোলে নিয়ে ওর কোলে দাও।"

এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের পুরোহিতও অদ্ভুত। লোকে যেমন পুরোহিতের নির্দ্দেশে দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আবৃত্তি করে, ললিতও সেইরূপ অক্ষরে অক্ষরে খুদীর আদেশ পালন করিয়া রাজুর মুখের দিকে তাকাইল—তখন রাজু ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে আর ছেলেটিকে যতদূর সম্ভব নিজের দেহ হইতে দূরে করিয়া ধরিয়া আছে। খুদীর নয়ন শ্রান্তি ও তৃপ্তি জনিত মুদ্রিত। ললিতের ইসারায় রাজু নিঃশব্দপদ সঞ্চারে ঘরের বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছেলেটি এই বয়সেই নিজের অবস্থা কতকটা অনুমান করিতে শিখিয়াছে; বাহকের মুখের উপর বড় বড় চক্ষুর অকাল পক্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "গয়লা জেঠা!" কথাটির মধ্যে প্রশ্নের সুর ছিল, কতকটা আবৃত্তির ভাব ছিল, আর কতকটা সেই নবীন মানুষের চরিত্র পরিচয় পাইবার কৌতূহল, বালোচিত সন্ধি-প্রস্তাব; রজু ধমকাইয়া উঠিল, "খবর্দ্দার;—বলবি বাবা, আমি বাবা—।" শিশু স্থির নির্ব্বাক হইয়া রহিল—তাহার বয়স তখন প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম, বদ্ধ বাতাস ও রোগের সান্নিধ্য-জনিত দূষিত গুরুত্ব, শ্বাসরোধক হইয়া উঠিয়াছে; খুদী নিস্তব্ধ, নিমীলিত-নেত্র, গলার মধ্যে নানা জাতীয় শব্দ জীবনের অস্তিত্ব পরিচয় দিতেছে—অনেকক্ষণ পরে খুদী আবার কথা কহিল, আপন মনে যেন বলিতেছে, "হারাধন—ছেলের নাম হারাধন রেখ—হারিয়ে গেল কিনা—।" আবার চুপ; ললিত একবার বাহিরে গেল। রাজু সেই হইতে একভাবে দাঁড়াইয়া আছে; মৃদুস্বরে বলিল, "ছেলেটাকে হারাধন ব'লে ডেকো; আমার একটু—কতটা বলতে পারি না—দেরী হবে; হাঁ আর একটু অপেক্ষা ক যদি দাঁড়িও না—সাবধান্ যেন এখানে কেউ না দেখে।" উপদেশ দিবার জন্য প্রয়োজন যতটা ছিল তদপেক্ষা ললিতের মনে একটা স্বাভাবিকতা আনিতে এই কথাগুলি অনেকটা সাহায্য করিল, ঘরের মধ্যে আবার ঢুকিতেই একটা অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরিবর্ত্তন ললিত অনুভব করিল; খুদীর এখনও সেই আচ্ছন্ন ভাব, মাথা বালিশ হইতে নীচে পড়িয়াছে, এক একবার শ্বাস প্রশ্বাসের ঝাঁকানিতে দেহ ক্ষীণভাবে অলোড়িত; ললিত শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।—

ঊষারাণীর ধূসর পোষাক পরা খোকাখুকীগুলি—সমস্ত রাত্রের আলোক দানে ম্লান, আকাশ-প্রাঙ্গণের দীপ-গুলিকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিতে করিতে, মৃদুমন্দ্র আনন্দের লহর তুলিয়া চলিয়া গেল; অরুণ আসিয়া আকাশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল—চটুল হাস্য-কুঞ্চিত অধরোষ্ঠের উপর সঙ্কেত-ভঙ্গীতে তর্জ্জনী ন্যস্ত, চতুর্দ্দিক বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল, রাত্রির কোন চর কোথাও আছে কি না, তাহার পর অরুণ হাস্যের জীবন্ত লহরী তুলিয়া ইসারা করিল, আর অমনি সূর্য্যের আলোক-ধেনুর দল বন্ধন মুক্ত হইয়া কাতারে কাতারে গগন ছাইয়া ফেলিল। রাজু আর অপেক্ষা না করিয়া বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইল, এখনই তাহাকে অতি সন্তর্পণে যাইতে হইবে, কেবল গিরীন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভাবনা তাহার পূর্ব্বেই সে স্থান ত্যাগের অন্তরায় ছিল—ব্রাহ্মণ এতক্ষণে বহুদূরে।—

ললিত কিন্তু উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, আর কিছুক্ষণ না দেখিয়া সম্ভব হইলে শেষ পর্য্যন্ত, এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া চলিয়া যাইতে তাহার পা উঠিতেছে না।

ঈষদুন্মুক্ত দ্বার-পথে ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস সঞ্চালন মুমূর্ষুকে চেতন করিল। মৃত্যুর স্পর্শে উত্তেজিত ইন্দ্রিয়-গ্রামের সাহয্যে, মুদিত নেত্রেই ললিতের উপস্থিতি অনুমান করিয়া, খুদী বলিল, "বাবু এখনও আছো—ভদ্রলোক, থাকবে বই কি!—আমাকে মনে রেখো—ওই কাঠের সিন্দুকে টাকা আছে, বার করে নাও—আমার বাবার টাকা তাকেই দিও, তারিণী বৈষ্ণব, দোতলায় বাঁদিকের ঘর—পক্ষাঘাত রোগী বলে খোঁজ করলে লোকে ঠিক দেখিয়ে দেবে—মা পালিয়ে এল, টাকা তাকে দিও।—হারাধনকে

দেখো—।" প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে এই কয়টি কথা খুদী উচ্চারণ করিল, শেষের কথাগুলি বেশ স্পষ্ট সহজ পরিচিতের মত—তাই হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে ললিত চমকিয়া, ধীরে মাথা নত করিয়া ভাল করিয়া দেখিল,—বুঝিল খুদী আর কথা বলিবে না। মনে হইল, মৃত্যু কি সহজ।

বুড়ী জাগিয়াছে, ললিত চলিয়া গেল। তারিণী বৈষ্ণব ইত্যাদি তাহার মনেও আসিল না।—তখন আলোক-ধেনুর রাখাল, কিরণের দীর্ঘ পাঁচন হাতে, গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছেন—ললিত গন্তব্যের বিপরীত অভিমুখে বেগে চলিতেছে।

খুদীর মৃত্যু সংবাদ লোকমুখে যথাসময়ে গ্রামময় ছড়াইয়া ব্রজকিশোরের বৈঠকখানায় পৌছিল। ব্রজকিশোর গভীর চিন্তাযুক্ত বদনে মৌন; ইন্দ্র সরকার শুনিয়াই বলিলেন, "ফোড়াটা নিজে থেকে ফাটল, অস্ত্র কর্ত্তে হলো না আর।" ওস্তাদজীকে সেইদিন প্রায়ই গুণ গুণ করিতে শোনা গেল, "কাঁহাসে আয়ি, কাঁহাসে গয়ি—কোই না পুছত বাত।"—পাঁচ সাত জন, যাহারা চাক্ষুষ সাক্ষী, বন্ধুদের নিকট জানাইল—বাক্স সিন্দুক সব খোলা, বুনো বুড়ীটা অন্তর্হিত, মৃত দেহ পড়িয়া আছে ঘর তাহারা শিকলী বন্ধ করিয়া আসিয়াছে—ইন্দ্র সরকার ডোমেদের ডাকাইবার জন্য আদেশ দিলেন—তাহারা লাস পুড়াইয়া ফেলিবে—যাহা পাইবে তাহাদেরই—গ্রামের কেহ, অন্ততঃ প্রকাশ্যে, সে সব স্পর্শ করিতে পারে না। খুদী এসব জানিল কি না; জানিলেও কি ভাবিল কে জানে?

এই ঘটনার পর হইতেই ধীরেন মণ্ডলের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহে ভাটা দেখা দিল।—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যেদিন খুদী মরিল সেইদিন সন্ধ্যায় চন্দ্রপাঠক দোকানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অভিনব বেশধারী এক নাতি-দীর্ঘ, নাতিথর্ব্ব আগন্তুক, দোকানের রোয়াকে পাঁচসেরী নাগরা জুতার ধুলা সজোরে ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাঁহাকে অভিবাদন করিল "রাম্ রাম্ বাবু, রোজগার কেমন?" মাথায় পাগড়ী, সুপুষ্ট উদরের উপর আঁটা কুর্ত্তি, ধুতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, স্কন্ধে উত্তরীয়ের প্যাঁচ, বগলে একখানি দেশী কম্বল জড়ান বোঁচকা—বিশ হাত লম্বা পাকান শনের দড়ীর নাগপাশে ভূষিত—তাহা হইতে দোদুল্যমান একটি পিতলের ঘটি, অন্য হস্তে সুদৃশ্য বিলাতী ছাতা। "নমস্কার, নমস্কার আসুন, আসুন" চন্দ্রপাঠক অতিথির সমাদর করিতে বিপণী-সম্ভার বেষ্টিত তক্তাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। আগন্তুক মারোয়াড়ী মহাজন, গত দুই বৎসর হইল খেয়াঘাটের গঞ্জে একটি ডেরা করিয়াছেন, ধান, ছোলা ইত্যাদি খরিদ করিয়া নৌকাপথে কলিকাতা চালান দিয়া থাকেন; অদ্য চন্দ্র পাঠকের সহিত এক সময়ের ক্ষণিকের পরিচয়কে ঘনিষ্টতর করিতে সুদীর্ঘ পথের ধূলি ও কার্পণ্যহীন স্বেদ-প্রবাহ লইয়া, পাঠকের দ্বারে অতিথি।—

দোকানে সে সময় লোকসমাগম ছিল না, তাই দুই জনের আলোচনা গভীর ও চিত্তাকর্ষক ও বহুক্ষণব্যাপী হইয়া, ব্যবসায়ীদের স্বভাবগত পরস্পরের ওজন হইয়া গেল। মারোয়াড়ী বলিল, "দাদা, আপনার রকম আপনার কাছে থাকিবে, আমি বিয়াজ দেবে, ঘর ভাড়া খরচা দেবে, যেমন যেমন চালান কলকাতা যাবে, আপনার ছেলে সঙ্গে থাকবে, আমি টাকা ভরে দেবে, আপনার কুছু ডর নহি, সুদ হবে—টাকাকে আর বেটিকে ঘর বৈঠে রাখালে লোকসান আছে—আর সাঝামে কাজ কর, খুসী আমি হিসা রেখে দেবে, আধা হিসা সুদ নই।" বলাবাহুল্য চন্দ্র পাঠক প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন—কল্য প্রাতেই তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিবেন ঠিক হইল—ছোলা এখন বেশ সুবিধা আছে।—

সেদিন রাত্রে চন্দ্রপাঠক অনেক স্বপ্ন দেখিলেন; সারি সারি ছবির মত, একটী স্পষ্ট হইবার আগে আর একটি তাহার অন্তরালে জাগিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়; সারি সারি গুদাম—দাঁড়ি পাল্লায় সোনা-রূপার ওজন—তাহারই নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী ব্রজকিশোর মলিনমুখে দণ্ডায়মান—বোঝা বোঝা টাকা গণিতে রত মারোয়াড়ী—তিনি নিজে প্রত্যেক টাকাটি বাজাইয়া লইতে-ছেন—এ সকল তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—প্রভাতে মারোয়াড়ী সহ চন্দ্রপাঠক চাষা পাড়ার উদ্দেশে,

ছেলেকে দোকানে বসাইয়া রওনা হইলেন। স্বরূপ মণ্ডলের ভিটার সম্মুখে একপাল ছেয়ে মেয়ে প্রত্যুষের আহৃত কাঁচা আমের ভাগ বাঁটোয়ারা করিতেছিল; অভিনব সজ্জার বিদেশী আগন্তুক দেখিয়া তাহারা হাতের কাজ ভুলিয়া গেল; সাহসীরা চন্দ্র কাকা—পাঠকদা, ইত্যাদি নানা সম্বোধন করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সে কৌতূহল-বেষ্টনী ভেদ করিয়া, স্বরূপ যেখানে ছোলা মাড়াই করিতেছে, উভয়ে সেইখানে উপস্থিত হইল—দরদস্তুর হইতেছে, এমন সময় স্বরূপের বিধবা দিদি নিত্য পাড়া বেড়ান একবাজি সারিয়া সেইখানে দর্শন দিলেন, "হ্যাঁগা শুনেছ—রাজু গয়লা এক পরীর বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়েছে; কত লোক দেখতে যাচ্ছে গাঁয়ে হৈ হৈ পড়ে গেছে—কড়া কড়া দুধ এক এক চুমুকে শেষ করে দিচ্চে।" স্বরূপ বৃদ্ধার কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল; ছোলার দরদস্তুর অতি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার—"পরীর বাচ্চা না হাতীর বাচ্চা—যাঃ, বাজে কথা।" বুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিল, ক্ষুব্ধ আত্ম সম্মান কে সহ্য করে—? "যাও, দেখে এসো না, নিজের চোখে—এই দেখে আসছি আমি, বলে বাজে কথা—রাজুর কাছে চুপ করে বসে আছে—দরজা জানালা সব বন্ধ, ঘরের মধ্যে ছাড়া রয়েছে তাই; ঠিক মানুষের মত বড় বড় চুল; বৌটাকে জিগ্‌গেস্ করলাম ঠ্যাকারে ছুঁড়ী কথাই কইলে না।" চন্দ্র পাঠক বুড়ীকে অপ্রস্তুত করিবার ভঙ্গীতে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সদরের কাছারীতে মামলা ইত্যাদি তাঁহার কিছু কিছু দেখা ছিল, "দিদি, যদি দরজা জানালা সব বন্ধ, তবে দেখলে কেমন করে?" বুড়ী আদর্শ অভিজ্ঞ সাক্ষীর অনুকরণোচিত ভঙ্গীতে উত্তর দিল "সকাল বেলায় বাসি মুখে মিথ্যে বলছি নাকি? আক্কেল দেখ; দেখলুম যেমন করে সব দেখছে আর তুমিও গিয়ে দেখবে এখুনি—দরজার ফাটল দিয়ে গো, দরজার ফাটল দিয়ে—।" সহসা মারোয়াড়ীকে প্রথম লক্ষ্য করিয়া—"ওমা—এ মিন্সে আবার কোথাকার মানুষ গো? গাঁয়ে যে সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে—।" দুই একবার হারাণ মোসাটার পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধা সরিয়া পড়িল।—মারোয়াড়ী বোধ হয় নিজের মনুষ্যত্বের বিষয়ে অন্যেও সন্দিহান হইতে পারে এই ভাবিয়া অথবা তাহারও এক্ষেত্রে কিছু বলা দরকার জ্ঞানে বলিল, "আরে—কোন্ নয়া জাতকা বান্দর লন্দর হবে—কলকত্তা যাদু ঘরমে হরেক কিসিমকা আছে।"

বাধাপ্রাপ্ত প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত, এমন সময় পথের উপর হারাণ ডাকিল, "পাঠকদা ও পাঠকদা, বলি খবর শুনেছ?" চন্দ্র পাঠক বিরক্ত হইয়া একবার বলিলেন, 'কি খবর?' কিন্তু হারাণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে অগত্যা যাইতে হইল। হারাণ জমিদারী কাছারীতে মুহুরির কাজ করে, বেচারীকে এত সকালেই ডোমপাড়া ছুটিতে হইয়াছে, তাই পথে যতটা বিলম্ব করা যাইতে পারে সে চেষ্টা বেশী—চন্দ্র পাঠকের সহিত গল্প মন্দ জমিল না কারণ পাঠকের কৌতূহল সহজে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইবার নহে, কখন মরিল, কে প্রথম জানিল, এখন সেখানে কে আছে, জিনিষ পত্রই বা কি হইবে—এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার যেটি আসল জ্ঞাতব্য বিষয় তাহার কোন কিনারা হইল না। হারাণ বিদায় হইলে চন্দ্র পাঠকের মাথা খুলিল, "ঠিক হয়েছে—সেই পরীর বাচ্চা এখন বুঝছি. খুদার ছেলেটাকে তাহ'লে রাজু হাতিয়েছে—টাকা গুলো কি আর ছেড়েছে, ছোঁড়ার এতখানি বিদ্যে আছে টের পেতে দেয়নি কোনদিন—কলিকাল—তবে আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না বাছাধন। নাঃ যেতে হল এখুনি, এর পর মিইয়ে যাবে, আবার কেউ বুদ্ধিদাতা জুটে গেলে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বার করে নেওয়াও হয়ে উঠবে না—থাক হাতের কাজ—" মনে মনে এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে, মারোয়াড়ী ও স্বরূপের নিকট চন্দ্র পাঠক ফিরিয়া আসিলেন। মারোয়াড়ীকে ইসারা করিয়া স্বরূপকে বলিলেন, "গদার ওখানে একবার দাম যাচাই করে কাল আমরা তোমার ছোলা নেব।" মারোয়াড়ীকে বলিলেন, "আপনি যান্ আমার একটু জরুরী কাজ আছে—দেরী হবে, ছেলে আছে যা দরকার নিজের বাড়ী মনে করবেন।" মারোয়াড়ী চলিয়া গেল, তখন চন্দ্র পাঠক এক প্রকার ছুটিয়াই চলিলেন—রাজুর বাড়ীর দিকে।—

সদর রাস্তা হইতে নামিয়া গলির মধ্যে অল্পদূর গেলেই রাজুর বাড়ী—সম্মুখে খানিকটা বাগান তারপর বাঁশের বেড়া দিয়া সযত্নে ঘেরা—সামনে উঁচু রোয়াক ও দুইটা মাটির ঘর, পিছনে দুইখানি পাকা কুঠুরি আছে, এক পার্শ্বে

সমস্তটা রান্নাঘর আর গোয়াল, পাশাপাশি অন্য দিকটা ফাঁকা তবে মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সেই দিকে খিড়কীর দরজা—সেই দরজার বাহিরে জটলা হইতেছে—দরজা দিয়া দুই একজন প্রবেশ করিতেছে, আবার দুই একজন বাহিরে আসিতেছে।—চারিদিকে একটা কলরব, ঠিক হট্টগোল নহে, চেঁচামেচি, ছুটাছুটি নাই- বহু চাপা গলার আওয়াজ সমষ্টিতে যেন চারিদিক ভারি হইয়া রহিয়াছে—চন্দ্র পাঠক বুঝিলেন, বুড়ী নিছক কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কথা বলে নাই। দুএকজন পুরুষ কিয়ৎ দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে।

চন্দ্র পাঠক প্রথমে সদর দিকে যাইতেই তাঁহার গাটা একটু ছমছম করিয়া উঠিল; সব কেমন বন্ধ সন্ধ, সাধারণ হইতে বিপরীত; তাঁহার অশেষ গুণবাজির মধ্যে সাহস স্থান পায় নাই, মনে হইল একটা বধির রাক্ষস ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তখন ধীরে ধীরে খিড়কীর দরজার দিকটায় বামাকুলের নিকট হইতে একটা কেবল শীলোচিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া আকুল নয়ন, আকুল শ্রবণ, হইয়া দাঁড়াইলেন; বামাদল কলরব তাঁহার অভ্যুদয়ে কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিল না। রমণীর লজ্জা অনেক রকমের আছে, যাহাকে গেছো লজ্জা বলে সেটা কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য নহে; গেছো লজ্জার লক্ষ্য যাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিতে হইবে—তাহার মনে লজ্জার (বিরক্তির) উদ্রেক করা।—

প্রথম আগত কয়েকজন প্রশ্নময়ীকে মালতী "কোথাকার এক কুড়োনো ছেলে" এই টুকু বলিয়া ছিল; প্রথম সংবাদ অবশ্য তাহার মুখ হইতে জনৈক সখীর কর্ণগোচর হয়—সে ঘাটে। তার পর দুই এক জন করিয়া যাহারা আসিতে আরম্ভ করিল তাহারাও কতকটা সংলগ্নভাবে মালতীর নিকট ব্যাপার শুনিল, কতক অবিশ্বাস করিল—মালতী দরজার ফাটল দিয়া রুদ্ধ ঘরে রাজু ও বালককে দেখাইল; অনেকে সেই আলো অন্ধকারের রহস্যময় সংস্থাপনের মধ্যে অশরীরী ছায়ার মত উলঙ্গ শিশু মূর্ত্তিকে দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করিল, "ও পরীর বাচ্চা" কেহ সৌভাগ্যের কেহ দুর্ভাগ্যের সূচনা নির্দ্দেশ করিয়া শেষে তর্ক আরম্ভ করিল।—ভিড় বাড়িতেছে; পুরুষেরা নানা অছিলায়, নানা 'বিশেষ দরকারের' বাহানায় আসিয়া বাহিরে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া গেল। রাজুর কোন সাড়া শব্দ নাই।—মালতী আর একবার ফাটলে চক্ষু যোজনা করিয়া কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না; রাজু একভাবে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়, দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, মাথা সম্মুখ দিকে বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—বক্ষস্থল এক একবার আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে, যেন নিঃশ্বাস অনেকক্ষণ চাপা থাকিয়া থাকিয়া একবার বাহির হইতেছে—; রাজুর কোন ভ্রূক্ষেপ নাই; নির্ম্মম কৌতূহল ও সহানুভূতিলেশশূন্য সমালোচনায় তাহার বড় একাকী ও অসহায় ঠেকিতে লাগিল। এতক্ষণ সে গৃহ-কর্ম্মাদির অভিনয় করিয়া কতকটা ঠাট বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু এবার হাল ছাড়িয়া দিয়া একপাশে কাঁদিতে বসিয়া গেল, অমনি বহ্নির গন্ধ পাইয়া সমবেদনার প্রভঞ্জন চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। অনেকে চাপা গলায় রাজুকে গালমন্দ দিতেছে, অধিক পরার্থপর দুই একজন কিয়ৎ কাল দরজায় ঠেলাঠেলি করিতেছে—মালতী অঘোরে কাঁদিতেছে। আলোচনা তখন পরী প্রসঙ্গ লইয়া চলিতেছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কল্পনার ফুৎকারে আয়ত্ব হইতেছে—একজন প্রতিভাশালিনী রাজু-পরী-সংবাদ রচনায় আত্ম-হারা, সেই সময় চন্দ্র পাঠকের আগমন।—গরু বাছুরগুলি লোক সমাগমে বিড়ম্বিত ও চিরাভ্যস্ত শুশ্রূষাদির কোন লক্ষণ এতবেলা পর্য্যন্ত না দেখিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া ছিট-কাইয়া পড়িল।—

ওদিকে চন্দ্র পাঠকের মনে একটি মাত্র কথা আবৃত্তির ন্যায়—"ছেলেটা যখন এখানে তখন টাকাও এখানে।"

বেলা হইয়া আসিল, ভিড় একবার প্রায় লোপ পাইয়া আবার নূতন উদ্যমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চন্দ্র পাঠক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান; মালতীর কান্না আর নাই সে একবারে স্থানুর মত বসিয়া। এবার যাহারা আসিল তাহারা গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছে—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন একটু অন্য প্রকৃতিরও ছিল—মালতীকে দেখিয়া কেহ বলিল, "ওঠ বাছা, ছাড়াকাজ শেষ করে নাও; পেটটাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে—ওঠ, রাঁধা বড়া কর।" মালতী নড়িল না; একজন একটু কাছে ঘেঁসিয়া বলিল "অত করে

ভাবছিস্ কেন লা গয়লার বৌ ? চল আমাদের বাড়ী, অমনি নদীতে একটা ডুব দিয়ে যাবি, আমাদের বাড়ীতে যাবি, বামন বাড়ীর পেসাদ—কি বল ; আমি ওঁদের বলব গাঁয়ের পাঁচজনকে জড় করে গয়লা পোকে দরজা ভেঙ্গে বার কর্ব্বে, ওকে নিশ্চয় কিছু পেয়েছে—তারও ব্যবস্থা হবে—ভয় কি !" দীর্ঘ বক্তৃতার একটা কথাও মালতীর কানে গেল না। কায়েত বৌ, বয়সে গিন্নী, ঝাঁঝের স্বরে বলিল "আরে ওর আবার খাওয়া দাওয়া কি আর এখন ভাল লাগে—পবীর বাচ্চা টাচ্চা নয়, সতীন পো ; এঁড়ে এসেছে আগে এবার গাই আসবে—ওর কপাল পুড়েছে।" এবার মালতী কাঁদিল, নাপিত মাসী রাজুর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী, তাই বলিল, "রাজু আমার সে ছেলেই নয় ; ওঠ মা রান্না বান্না কর, আমি গুছিয়ে এগিয়ে দেব এখন চল ; পুরুষ মানুষ খিদে পেলেই বেরিয়ে আসবে এখন, কিছু চিন্তা নেই।" মালতীকে হাত ধরিয়া নাপিত মাসী রান্নাঘরে লইয়া গেল—বামাদলের সুরের মাত্রা চড়িল, এতক্ষণ বাদানুবাদ ছিল, এইবার খণ্ড খণ্ড তর্কযুদ্ধ সৃষ্টি হইল।

বেলা যথেষ্ট হইয়াছে, তবে ঠিক অনুমান হইতেছে না ; বহুক্ষণ হইতে গাঢ় মেঘের স্তূপ অর্দ্ধ আকাশ ঘেরিয়া পুঞ্জীভূত, ধারে ধারে কেন্দ্রাভিমুখে অভিযান করিতেছে—সূর্য্য অনেক পূর্ব্বেই তাহাদের অন্তরালে মুখ ঢাকিয়াছেন ; বায়ুর গতি উচ্ছৃঙ্খল, আবার উদাসীন ; এক একবার চপল উদ্দাম ভাবে সমস্ত দোলাইয়া চকিতে আত্মগোপন প্রয়াসী—আর এক একবার ফোঁপান কান্নার মত বহুক্ষণ ব্যাপিয়া গুমরাইতেছে। আকাশ স্তব্ধ তথাপি যেন কোলাহল পূর্ণ মনে হইতেছে—আসন্ন ঝঞ্ঝার বার্ত্তায় দিগাঙ্গন শব্দহীন, কেবল ভাবময়।

মানুষের ধৈর্য্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, সীমাবদ্ধ, বিশেষতঃ কার্য্যান্তরের পশ্চাৎ আকর্ষণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া দেখিলে চন্দ্র পাঠককে বাহবা দিতে হয়—এইবার ক্ষমতার প্রান্তে উপনীত হইয়া পাঠক দর্শক-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ; দুই একবার গলা পরিষ্কারের জোর আওয়াজ—(সাহস বর্দ্ধক ও মনোযোগ আকর্ষক) অনন্তর খিড়কীর দ্বার পথে ক্রম প্রবেশ ও আবির্ভাব—সঙ্গে নারী সমষ্টির সঙ্কোচ প্রাপ্তি ও আঙিনার এক কোণে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গীতে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যূহ সংগঠন—এলোমেলো যাহারা ছিল তাহারা গেছো লজ্জার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া হুড়মুড় করিয়া ব্যূহের মধ্যে আত্মরক্ষা করিল। সম্মুখে পরিষ্কার পথ, অতএব চন্দ্রপাঠককে সরল গতি অবলম্বনে অন্য কোন গন্তব্য স্থানের অভাবে, সেই রুদ্ধদ্বারের সম্মুখীন হইতে হইল— ; একটু 'কিন্তু' ভাব, তথাপি বুকে ভয়, মুখে সাহস, পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা এত অবলার মধ্যে আজ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে।—তিনি হাঁকিলেন "ও রাজু -দরজা খোলনা—ব্যাপার কি ?" প্রথমে ধীরে পরে জোরে দ্বারে করাঘাত করিয়া পুনরায় আপন মনে বলিতে লাগিলেন, পুনরায় নিজেকেই যেন সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "নাঃ লোক ডেকে দরজা ভাঙ্গতে হবে দেখছি—ছোঁড়াটা মল কি বাঁচল দেখতে হচ্ছে—শেষে একটা পুলিশের হাঙ্গামা না দাঁড়ায়।"—দ্বার সশব্দে সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত, সম্মুখে রাজু গোপ, রুক্ষ মূর্ত্তি, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—সমস্ত চুপ কেবল বাতাসের মৃদু কাতরানি।—অবশেষে চন্দ্রপাঠকের শুষ্ক কণ্ঠ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইল, "ও ছেলেটা খুদীর ?" পাঠক কি যেন কেন বেতপাতার মত কাঁপিতেছিল ; রাজুর দৃষ্টি চন্দ্রপাঠকের মাথার উপর দিয়া চারিদিকে একজনকে অন্বেষণ করিতেছে, সে প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। সাহসে ভর করিয়া চন্দ্রপাঠক একটু প্রাধান্যের স্বরে বলিলেন, "খুদীর ছেলে তুমি আনলে কেন ?—টাকা কোথায় ?" রাজু নিরুত্তর তবে দৃষ্টি এখন প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর নিবদ্ধ। পাঠক এবার অতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "কত টাকা সত্য করে বল ; আমায় আর্দ্ধেক দিলে আর ঘাঁটাই না।" রাজু বলিল, "এক পয়সা না।" রাজু প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দিল চন্দ্র পাঠক বুঝিলেন শেষ ভাগের উত্তর ; মানুষে নিজের প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় নিজেই দিয়া থাকে, প্রত্যক্ষ উত্তরদাতা কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র, চন্দ্রপাঠকের ভ্রম সে তুলনায় কিছুই নহে। চন্দ্র পাঠকের রাগ হইল, রাগ চাপিয়া রাখা দায় অথচ রাগ প্রকাশে ভয়—বহুক্ষণ অপেক্ষায় স্বাভাবিকতার অভাবও কিছু ঘটিয়া থাকিবে ; তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সন্নিবদ্ধ বহু দৃষ্টি-

বাণের অনুভূতি, সম্মুখে একটা বলবান্ আধপাগলা লোক—আর অন্তরে লোভের প্রবল তাড়না, "হাতের সামনে এসে এতদিনকার আঁচ করা টাকা ফস্কে যাবে—আর টেক্কা মেরে যাবে ওই গয়লা ছোঁড়া।"—পাঠক চীৎকার করিয়া উঠিলেন "খুদীর ছেলে, তুই আনলি কেন? তুই আনবার কে?" রাজু চক্ষু মুদ্রিত করিল, ওষ্ঠাধর যেন একবার উচ্চারণের ব্যর্থ প্রয়াসে কম্পিত, তাহার পর সহজ স্পষ্ট গলায় বলিল, "ও আমারই ছেলে।"—অন্য দিকের ঘর হইতে একটা সংক্ষিপ্ত মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শোনা গেল, "ও মাগো" তারপর সব চুপ চাপ্।—

কিছুক্ষণ ধরিয়া মন্থর অস্বচ্ছন্দ গতির শব্দ; অনন্তর গৃহ প্রাঙ্গন লোকশূন্য।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজু সেই ভোরে ছেলেটিকে লইয়া খুদীর বাড়ী হইতে যাত্রা করা অবধি এখন পর্য্যন্ত সমানে তাহার মন এক ঝড়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। বাড়ীর নিকট আসিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, দাওয়া শূন্য; গিরীন ঠাকুর বিদায় গ্রহণ ঘটা অপেক্ষা, সময়ে ট্রেণ ধরিবার আগ্রহ সমধিক জ্ঞানে, গৃহস্থকে উপরন্তু ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি দিয়া গিয়'-ছেন। সম্মুখের দুইটী ঘরের মধ্যে বড়টি ভাঁড়ার, ছোটটি বসিবার উঠিবার ঘর, বিচালি কাটা বঁটি, চাষের গাতিয়ার মায় লাঙ্গলখানা পর্য্যন্ত এক কোণে দাঁড় করান; দরজা ভেজানই থাকে। রাজু ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত শিশুকে কোল হইতে একটি মাদুরের উপর নামাইল; ভিতর দিকের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল, মালতী বড় গরুটির দোহন কার্য্যে নিরত, ধীরে নিঃশব্দে অপরাধীর ন্যায় স্ত্রীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।—মালতী মাথার কাপড় ঠিক করিয়া পুনরায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, চঞ্চল হস্তে কার্য্য সমাপন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর মুখের উপর ব্রীড়া ভর্ৎসনা মিশ্রিত চক্ষু একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছে—রাজুর অন্তরে তখন পূর্ণ অসহায় বোধ, যে বোঝা সে ঘাড়ে লইয়াছে, তাহার অংশ লইবার একটা নীরব মিনতি তাহার প্রতি অবয়ব হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে চায়।—মালতী দুধের ঘটি লইয়া রান্নাঘরে রাখিতে গেল। রাজু স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, মালতীকে কি বলিবে, কেমন করিয়া বা কথারম্ভ করিবে, তাহার মনের কৌতুহল, বেদনা না দিয়া কেমন করিয়া প্রশমিত করিতে হইবে অথচ সম্পূর্ণ কথাটা বলা হইবে না—এই চিন্তার বিড়ম্বনা এতক্ষণে সে অনুভব করিয়াছে। সম্মুখ দিয়া মালতী সম্মার্জ্জনী হস্তে সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, রাজু স্ত্রীর অনুসরণ করিল—অদৃষ্টপূর্ব্ব শিশুকে নিশ্চিন্ত নিদ্রামগ্ন দেখিয়া মালতী একটু থমকিয়া দাঁড়াইল; ছেলেটি দেখিতে বেশ—মালতী বুকের মধ্যে একটা যেন মৃদু অথচ বেশ স্পষ্ট আকর্ষণ অনুভুব করিল—তাহার পর ভিতরটা যেন অকস্মাৎ লঘু শিথিল, বিহ্বল হইয়া গেল; স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল "কোথা থেকে পেলে? কাদের ছেলে? বেশ দেখতে তো।" রাজুকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল, "তোমার খোকাবাবু কলকাতা থেকে এনে দিলে বুঝি"—কথাগুলির মধ্যে রঙ্গ ছিল না, প্রকৃত ঘটনা, অবশ্য মালতীর কল্পনাগোচর নহে—কিন্তু রাজুর মনের মধ্যে যে তারগুলি সেই সময় অতি কড়া বাঁধনের বেদনায় টন্‌টনে হইয়াছিল, সেই গুলিতেই আঘাত লাগাতে রাজু আত্মবিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "খবরদার ছোট মুখে বড় কথা আনবি তা'হ'লে দেখবি, খোকাবাবু ওর কিছু জানে না—।" ক্ষুদ্র চিমটিতে বিবাহিত জীবনে এই প্রথম রাজুকে অভিভূত করিতে পারিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে সঙ্কোচ-গণ্ডীর বাহিরে টানিয়া আনিতে পারায়, মালতীর কারণ বিশেষে, বর্ত্তমান বিগলিত ভাবের উপর দিয়া একটা পুলক-তরঙ্গ খেলিয়া গেল—সে আর কিছু ভাবিল না, এমন কি স্বাভাবিক কৌতূহল পর্য্যন্ত তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে।—অন্তরাত্মা সন্ধিস্থাপন আগ্রহে ব্যাকুল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবনে প্রগাঢ়তার আশু প্রথম আস্বাদনের আশায় মুগ্ধ—মালতী স্বামীর দৃষ্টি সহাস্য স্নেহ দৃষ্টি পাশে বাঁধিতে প্রয়াসী—রাজুর মুখ হইতে ধীরে ক্রোধের ভাব অপসৃত হইয়া একটা জড়সড় ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মালতী বলিল, "একবার কোলে নিই—রেখে দিতে হবে এ ছেলেটাকে—তুমি ফিরিয়ে দিতে পার্ব্বে না কিন্তু।" আব্দারের স্বর যেন ঘনিষ্ঠতার লোভে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। 'খুদীর ক্রোড়ে এই বালক' এখনও রাজুর

চক্ষে জীবন্ত চিত্র, মালতী সেই বালককে ক্রোড়ে লইবে, মালতীর অঙ্গ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে ধারণাই রাজুর সহনাতীত, তাহার অন্তরাত্মা ঘৃণার শিহরণে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল; ক্ষিপ্র পদক্ষেপে, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শায়িত বালক ও স্ত্রীর প্রসারিত হস্তের মধ্যে একটা প্রাচীরের মত গিয়া দাঁড়াইল; অসাবধানে তাহার পা মালতীর দেহে সজোরে লাগাতে, মালতী ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—অকারণ স্বামী লাথি মারিল, রুদ্ধ অভিমান, নির্ব্বাক ক্রোধ তাহার ভঙ্গীকে এক অপূর্ব্ব মহিমায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে—রাজু অপ্রস্তুত, তাড়াতাড়ি বলিল "একটু দুধ জাল দিয়ে আনো শীগ্‌গির—আর ভাঁড়ার থেকে দুটি মুড়কী"; ইহাতে ব্যাপারটা সহজ ও এইখানেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে সেই দুরাশা। মালতী গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল ও অবিলম্বে দুধের কড়াটা ও মুড়কীর হাঁড়ি আনিয়া সজোরে মেজের উপর রাখিয়া আবার তখনই চলিয়া গেল; রাজু দেখিল কড়া ভর্ত্তি দুধ কিন্তু জ্বাল দেওয়া নহে, কিন্তু আবার মালতীকে ডাকিয়া বলা তখন তাহার ক্ষমতার অতীত। রন্ধনশালায় গৃহস্থালী কর্ম্মাদির ঝমাঝম্‌ শব্দ শোনা যায়—রাজু কৌতূহল পরায়ণ মালতীকে পরাস্ত করিতে পারিত, অত্যাচার প্রিয় মালতীকে তাহার ভালই লাগিত কিন্তু ক্রুদ্ধ মালতী তাহার নিকট অপরিচিত। সে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার অর্গল বন্ধ করিল; তাহার পরে ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে জানলা দুইটী বন্ধ করিয়া সুপ্তোত্থিত বালককে খাইতে দিল। হারাধন একবার চোখ রগড়ায় আর একবার সেই অর্দ্ধ আলোকে রাজুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল্‌ করিয়া তাকায়, স্মৃতিকে যেন কষ্টে নিঙ্গাড়িয়া বলিল, "গয়লা জেঠা!" রাজু ধমক দিল, "ফের গয়লা জেঠা বলবি তো মাথা ফাটিয়ে দেব, বলবি বাবা, বাবা, বাবা।" কণ্ঠস্বর হইতে নিমেষে নিষেধের ওজন করিয়া লওয়া হারাধনের এযাবৎ বাল্য শিক্ষার মধ্যে প্রধানতম, সে অবিলম্বে বলিল "বাবা"—রাজুর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ঘৃণায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল; দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করিয়া আত্মসংবরণে পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে তাহার অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল, অনন্তর যেন অবশ ক্লান্ত হইয়া হতাশ ভঙ্গীতে সে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িল।

অবরোধ-জীবন-প্রথা বালকের অভ্যস্ত—সে যে ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র নিজেকে ব্যাপৃত ও চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসারিত করিতে সিদ্ধ হস্ত তাহারই পরিচয় দিতেছে। রাজুর উভয় সঙ্কট, এই দায়িত্ব মালতীর সহায়তা ভিন্ন বহন করা অসম্ভব, আবার মালতীর ন্যায্য ক্রোধের উপশম করিবার পন্থা আবিষ্কার তাহার শক্তির অতীত—ইহার পরই সেই ডাকাডাকির ঘটা তাহার বুদ্ধিকে আরও যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে—রুদ্ধ ঘরে, অপরাধী বন্দী তস্করের মত সে নিরুত্তর—এক একটা জন্তুও নিরুপায় হইয়া গর্ত্তে মধ্যে এমনি 'থ' মারিয়া যায়—ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বাহির হইতে চাহে না।

বাড়ীর ভিতরের দিকে অস্ফুট কলরবের অর্থ তাহার বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই—বেলা এইভাবে কাটিয়া গেল; ভয় লজ্জা সঙ্কোচ, আচ্ছন্ন বুদ্ধি একদিকে আর অন্যদিকে বুকভরা অশান্তি, অনভ্যস্ত আলস্যের পীড়ন, স্বভাবের বিপরীত এই জড়তা—মনে কোন চিন্তা অধিকক্ষণ স্থান পাইতেছে না; আবার চিন্তার আগমনেরও বিরাম নাই; বুদ্ধি ম্রিয়মাণ, আত্মা বিদ্রোহী, শক্তি জড়বৎ।

চন্দ্রপাঠক যখন দ্বারে করাঘাত করিলেন তখন যেন তাহার বিবেচনা-শক্তি দ্বার উন্মোচনের একটা কারণ খুঁজিয়া পাইল; নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস ক্ষীণ, অধিক কার্য্যকরী বুদ্ধি শক্তির সামীপ্য অনুভব করিয়া সে কার্য্যশক্তি ফিরিয়া পাইল—জান্তব জগতে শ্রেয়স্কর বুদ্ধি যে একটা সম্মোহন শক্তি বিশিষ্ট—প্ররোচনা মাত্রেই যাহার বিকাশ—তাহা অস্বীকার করা যায় না।

চন্দ্রপাঠকের হীনতা নিজেকে ধরা দিয়া রাজুকে কতকটা চেতন করিল—তাহার ব্যক্তিত্ব যেন দীনতার আবরণ কতকটা ছিন্ন করিয়াছে—মালতীর আর্ত্তনাদের শব্দ যেন সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে যে যার গন্তব্য অভিমুখে গতিশীল—রাজু কাহাকেও লক্ষ্য করিল না। নাপিত মাসী সকলের শেষে যাইবার সময়, রাজুকে কি একটা বলি-বলি করিয়া সাহস অভাবে বিফল মনোরথে প্রস্থান করিল।

আকাশ তখন মেঘের কালো পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তাণ্ডবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; প্রকৃতির উন্মত্ত লীলার আসন্নকাল অনুমান করিয়া, সমস্ত দিনের দুর্ব্বোধ্য উপেক্ষায়

ম্লান মুখ পশুগুলি আঙিনায় সমবেত—তাহাদের চপলতা স্তম্ভিত—তাগাদার হাম্বারব আজ নাই—রাজুর চোখে জল আসিল; যন্ত্র চালিতবৎ সে ভাষাহীন পশুদের গোয়ালে তুলিল—বৎস ও মাতার দড়ি ছোট করিতে ভুলিয়া সে কোন রকমে কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধন শালে প্রবেশ করিল, সেখানে কেহ নাই।—শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইতে তাহার চোখে পড়িল, মালতীর আঁচলের চাবির থোকাটা চৌকাটের উপর পড়িয়া আছে, আলুথালু বেশে মালতী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, যেন মুখখানি জগতের চক্ষু হইতে ঢাকিবার প্রচণ্ড চেষ্টায় দুই হাত মাথাটিকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়াছে—উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ঘন ঘন সকল দেহ আলোড়িত, খোঁপা খুলিয়া বেণীর আকারে পার্শ্বে লুণ্ঠিত, সমবেদনায় যেন নড়িতেছে।

স্নেহ সহানুভূতির ব্যথায় অন্তরের সকল বৃত্তি বিগলিত, উচ্ছ্বাসের আবেগে রাজু যেমন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি দরজার কাঠে মাথা ঠুকিয়া কপাল কাটিয়া গেল; শব্দে চমকিয়া মালতী মাথা তুলিল, দেখিল, সম্মুখে স্বামী উন্মাদের মত—কপালে রক্তের তিলক—চীৎকার করিয়া সে রাজুকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; রাজু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়; সেই সময়ে আকাশ তলের কোটি ছিদ্র পথ উন্মুক্ত করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি ধরণীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, একটা গাঢ় বাষ্পে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।—

উদ্‌ভ্রান্ত ভাব উপনীত হইলে রাজু ক্ষীণস্বরে ডাকিল, "বৌ ও বৌ"—কোনও সাড়া নাই, পলকের মধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া, অজস্র স্রোতস্বিনীর ধারা গাত্র বাহিয়া ত্বকা চুম্বন করিতে লাগিল; এবার জোরে রাজু ডাকিল, "বৌ, ও নতুন বৌ।" বর্ষার একটানা ঝমঝম ভিন্ন কোনও শব্দ নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে প্রদীপ জ্বালিল, কুলার আড়ালে কষ্টে প্রজ্জ্বলিত আলোক রক্ষা করিয়া সে তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাড়ীখানি বৃথা অন্বেষণ করিল; হারাধন নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইতেছে—সে ঘর রাজু শিকল টানিয়া বন্ধ করিল, আর একবার মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল "কোথায় গেলে, নতুন বৌ ও নতুন বৌ—কথা কইছ না কেন?" অজস্র স্ফুলিঙ্গময় বিদ্যুতের অসি ধরণীর সর্ব্বাঙ্গকে পলকে পলকে শাসাইয়া নাচিতেছে, বজ্রের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন দূরশ্রুত রণ দামামার মত মনে হইতেছে।

বিদ্যুৎ ঝলকে দৃষ্ট উন্মুক্ত খিড়কীর দ্বার যেন রাজুকে পুনঃ পুনঃ অর্থহীন আবাহন করিতেছিল—আকাশের বিদ্যুতের মত সে একটা চকিত চিন্তায় রাজুর মন দীপ্ত করিয়া দিল—মালতী নিশ্চয় বাপের বাড়ীর দিকে গিয়াছে—। বিদ্যুতের গতিতে সে এক লম্ফে দ্বার অতিক্রম করিয়া ছুটিল—লজ্জার আবর্জ্জনা রাশি, সঙ্কোচের দৃঢ় বাঁধ, মহাপ্লাবনে সব ধৌত একাকার হইয়া গিয়াছে।—নগ্ন মূর্ত্তিতে তাহার আত্মা এক আদিম আবেগের সরল তাড়নায় ক্ষিপ্তপ্রায়। বর্ষধারা বজ্রকে চমকাইয়া এক অমানুষিক চীৎকার তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল—উল্কাবেগে সে মাঠের দিকে, মাঠের পারে খেয়াঘাট লক্ষ্য করিয়া তিলটের পথ ধরিয়া ছুটিয়াছে।

তীক্ষ্ণ ধারায় দৃষ্টি জর্জ্জরিত, পিচ্ছিল পথে স্খলিত চরণ, সিক্ত ক্লান্ত অবয়ব বিমূঢ়—অন্তরের প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পুড়িতে পুড়িতে রাজু ছুটিয়াছে; এই ধরণী গগনের বিচ্ছেদান্তের রাত্রে, তাহার মিলনাভিষেকের সরস সিঞ্চিত ক্ষণে তাহার অন্তরে অন্তরে আসন্ন চির বিরহের আশঙ্কায় হাহাকার; এই দুর্দ্দান্ত লীলার মধ্যে অসহায় মালতী কোথায়, এতক্ষণে কতদূরে সে গিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে কত অজানা নির্ম্মম আপদ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে।—চতুর্দ্দিক যেন তাহার আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত।—

বুড়া বটের কাছে আসিয়া রাজু প্রথম থামিল, মনে সন্দেহ, মালতী কি এতটা পথ আসিতে পারিয়াছে—এই পথেই কি সে আসিয়াছে, বাড়ীতে, প্রতিবেশী কাহারও আশ্রয়ে লুকাইয়া থাকে নাইত!—ক্ষীণ আশা ক্ষণিক, অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল—না, না, মালতী এই দিকেই আছে।—

বৃষ্টির জোর মন্দ হইয়া আসিতেছে, এইবার ঝড় দেখা দিল; দুর্দ্দান্ত বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষার গাম্ভীর্য্যকে মথিত করিয়া, মেঘের জমাট আসরকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঝটিকার শিশুরা পতাকা উড়াইয়া ধাবমান; আকাশে যেন আগুন লাগিয়াছে, মুহুর্মুহু বিদ্যুজ্জ্যোতি, ব্যাপ্ত অন্ধকারের সহিত যুযুৎসু দুইপক্ষই অবসন্ন, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই; বিদ্যুৎ

অন্ধকারকে পর্য্যস্ত করা দূরে থাকুক কেবল তাহার আক্রোশ উত্তেজিত করিতেছে, ঝঞ্ঝা বিরাট অজগরের ন্যায় গর্জ্জিতেছে—অশনির হুঙ্কার প্রাণের লোপ, জড়ের প্রতিষ্ঠা লীলার প্রত্যক্ষতা ঘোষণা করিতেছে—কিম্বা বোধ হয় অতি মানুষিক জগতে একের উপর আক্রোশের চরিতার্থ তার প্রমাণ দিতেছে। অদূরে চিরসুহৃদ বুড়া বট আগত বিপদে উচ্চৈস্বরে রোরুদ্যমান সখার বিপদে কাতর সহানুভূতি জানাইতেছে। বহুদর্শী বিচক্ষণ বুড়া বট বোধ হয় মালতীর নির্দ্দেশ বলিয়া দিতেছে, কিন্তু তাহার ভাষা বুঝিবে কে? শুষ্ক কঠোর দীপ্তি পূর্ণ রাজুর চক্ষু চতুর্দ্দিকে বিঁধিয়া ফিরিতেছে—আকাশের বিজলীর অনুরূপ। বুড়া বটের তলায় ভূলুন্ঠিত মালতী পড়িয়া—রাজুর দৃষ্টি সেইখানেই আটকাইয়া গেল—অন্তর দেহ ছাড়িয়া লুটিয়া ওই দেহের পার্শ্বে পড়িল।

অজানিত অথচ নিশ্চিন্ত আশঙ্কায় শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে, কাঁপুনির মাত্রা এত অধিক যে উচ্চারণ করা কষ্টকর; দন্তে দন্ত চাপিয়া, অতি সন্তর্পণে মুখের কাছে মুখ লইয়া রাজু ডাকিল, "বৌ ও বৌ!" সেই তুষারশীতল, প্রাণহীন দেহ, সাড়া নাই শব্দ নাই, রাজুর সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম—স্ত্রীর মাথাটি কখন সে কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছে আর উপরে ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ বুড়া বটের দেহ বাহিয়া জলধারা তাহার মাথায় পিঠে ঝরিতেছে—তাহারও চক্ষু ফাটিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল মালতীর মুখের উপর পড়িতেছে। অন্তরের মধ্যে গভীর, অতি গভীর প্রদেশে ভীম আবর্ত্ত ঘূর্ণী পাকাইতেছে।

রাজুর বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি এইটুকু সংলগ্ন করিতে পারিয়াছে—যে মালতীর আর সংজ্ঞা হইবে না; প্রকৃতি কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে সে স্ত্রীর দেহখানি সযত্নে, সন্তর্পণে, কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ চলিয়া সম্মুখে চমকিয়া দেখিল, খেয়াঘাট। কোনদিকে আসিলাম ভাবিয়া রাজু আবার ফিরিয়া চলিতে লাগিল, চিন্তার স্রোতও চলিয়াছে—প্রলাপের মত অর্থহীন, স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। মালতীর দেহের এই ঘনিষ্ঠতম অনুভূতি তাহার প্রাণের একটা তারকে আকুল, বিহ্বল করিতেছিল?

রাত্রি অবসান প্রায়, পরিশ্রান্ত মেঘদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সুদূর যাত্রার আয়োজনে রত, বাতাস বহুপূর্ব্বেই কোনও গোপনে অভীষ্ট সিদ্ধিতে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া কাহার অঙ্কে যেন সুপ্তিমগ্ন। রাজু বাড়ী পৌঁছিল, শয়ন কক্ষের মেঝেতে মালতীকে ধীরে শোয়াইতে, পরিত্যক্ত বালকের উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ধ্বনি দারুণ তীরের মত কাণে আসিয়া বাজিল। রজনীর অবশিষ্ট সময়টুকু রাজু মালতীর দেহের পার্শ্বে বসিয়া কাটাইল, কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপও করিল না একটু নড়িলও না।

প্রভাতের সঙ্গে তাহার উদ্ভ্রান্তভাব অনেকটা প্রশমিত হইল: মালতীর দক্ষিণ পদের গোড়ালির উপর পাশা-পাশি, দুইটী ক্ষতচিহ্ন, অস্পষ্ট আলোকে ঈষৎ অনুমেয় বর্ণবিকৃতি, যাহা জানিতে বাকী ছিল তাহা গোচর করিল; একখণ্ড শুষ্ক কাপড়ে তাহার শীতল অসাড় দেহ আদরে মুছাইয়া, শাড়ীখানি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার জীবনের একটা অংশের মৃত্যুশ্বাস সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথী।

ক্ষুদ্র শিশু তাহার উপরই নির্ভরশীল, দুঃখ রাজুর, অসহায় হারাধনের অপরাধ নাই, গরুগুলি পশু তাহারই বা দোষে দুখী। যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতীকার রাজুর আয়ত্ব নহে, বুদ্ধিরও গোচর নহে; রাজুর চিন্তা ক্রমে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে—হৃদয়ের যে কোন আবে-গের প্রতিক্রিয়া আসিবেই। রাজু গাভীগুলির পরিচর্য্যা করিল, হারাধনকে খাওয়াইল, নিজেও কিছু খাইল, তাহার মধ্যে যেটুকু জীবন্ত পশু সে কাল হইতে সমস্ত দিন উপবাসী আছে, তাহার অভাব আর সে চুপ করিয়া সহ্য করিতে চাহে না। একটা মানুষের মধ্যে কত মানুষ যে আছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, নিয়ত, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বন্ধুদের মধ্যে নব নব মানুষের সন্ধান পাইতেছি—এই সব বিভিন্ন মানুষ, একই মানুষের মধ্যে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি পাশাপাশি হইয়া আছে—অগ্রে পশ্চাতে, সংঘর্ষণে, আনুকূল্যে অবিরাম গতি বিধি লইয়া তাহারা এই প্রত্যক্ষ এক ব্যক্তির মধ্যে একটা সমূহ মানব জগৎ; একটা প্রবল বাহ্যিক কারণে কতকটা সময় তাহাদের উদ্দেশ্য, কার্য্য ও চিন্তাধারায়;—

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ—এ ঐক্য আসিলেও অবিলম্বে প্রত্যেকে পুনরায় নিজত্ব লইয়া জাগিয়া উঠে। যাহার ব্যথায় সকলে অভিভূত হইয়াছিল তাহারই মধ্যে ব্যথা তলাইয়া যায়, অন্য সকলে স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে, কেবল সেই ব্যথাতুরকে নাড়াচাড়া দিলেই ক্ষণিকের জন্য আবার সকলে প্রতিবাদ করিয়া উঠে।

হারাধনকে ঘরে বন্ধ রাখিয়া রাজু যখন পাড়ায় খবর দিতে বাহির হইল তখন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ, শোকের বাহ্যিক লক্ষণ ঢাকা পড়িয়াছে। পাড়া প্রতিবেশীতে বাড়ী ছাইয়া গেল, স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যা সমান, জ্ঞাতি স্বজাতিও উপস্থিত; গত দিবস হইতে ভাবান্তর সহজেই লক্ষ্যগোচর; মৃত্যুর ছায়া যেন সমস্ত কটুতা, হৃদয়হীন স্বার্থপর কৌতূহলকে কমনীয় করিয়া দিয়াছে, সকলেই সাহায্য করিতে অগ্রসর; আন্তরিক সহানুভূতি, উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হইয়া আছে রাজু মুরুব্বিদের সময়োপযোগী পরামর্শ ও আদেশ পালনের অবসরে হারাধনের দেখাশুনা মাঝে মাঝে করিতেছিল, অন্য কেহ সেদিকে ঘেঁসিল না। রাজুর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ক্ষীণ, চক্ষু আশ্চর্য্য রকমের শুষ্ক, গতিবিধি ও ভাবভঙ্গী অতি অধিক মাত্রায় সংযত ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশক, আর কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত নহে।

একটা নিয়ম রক্ষার মত দুই একজন ওঝা আনান হইল; তার পর শশ্মান যাত্রার আয়োজন; মুরুব্বিরা সমস্ত ভার লইয়া রাজুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উৎপাত হইতে অব্যাহতি দিল—তিনটে খবর দিতে লোক গেল, জমিদার বাড়ী খবর পৌছিল—হারাধনকে আবার কক্ষে, এবার তালা চাবী দিয়া, বন্দী করিয়া রাজু তাহার এই অল্পদিনের সঙ্গিনীর শেষ যাত্রার অনুগামী হইয়া শশ্মানে চলিল, সেখানেও যে তাহার কর্ত্তব্য আছে।

ললিত শুনিল। দুই দিনের অবিরাম সমস্যা, সন্দেহের উপর এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল। বুদ্ধি ও অন্তরের শত প্ররোচনাতেও তাহার দেহ কার্য্য করিতে অপারগ—একবার ছুটিয়া রাজুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসা—তাহা আর হইল না। (ক্রমশঃ)

"আজো প্রিয়া ভুলি নাই"

[শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়]

আজও প্রিয়া ভুলি নাই—
নয়নের জলে আজও যে ভিজাই তোমার চিতার ছাই;
যে ধূলির কোলে মলিন হ'য়েছে কজ্জ্বলোজল আঁখি—
সেথাকার সোণা কুড়ায়ে দু'হাতে মোর সারা গায়ে মাখি!
মোর জীবনের সজীবতা যেন সেথায় মিশায়ে আছে—
নিতি চলি তাই নয়নের জলে ঐ শ্মশানের কাছে!
নীলিমার তলে নিরালায় কত মনে মনে হাসি কাঁদি—
সবহারা মোর মনখানি নিয়া পথে মোর মন বাঁধি!

*　　*　　*

লো প্রেয়সী মোর, নয়নের কোণে হেরনাকি আঁখিজল—
চিরদিন তরে ভুলিলি কি সখি, মোরে আজ তুই বল্?
আমার বক্ষ পঞ্জরখানি সবই আজ প্রিয়াময়—
মৃত্যু নিয়াছে কাড়িয়া ও তনু, তুমি আছ অক্ষয়!
আমার মনের পরে—
মরণে লভিয়া অমর হইলে চির জনমের তরে॥

জীবন বীমার জন্ম কথা

[শ্রীশরদিন্দু সাহা]

আজকাল পথে ঘাটে চা-এর দোকানে বাবুর বৈঠক খানায়—প্রায় সকল মজলিসেই জীবন বীমার কথা নিয়ে বেশ আগ্রহশীল আলোচনা হ'তে দেখা যায়। ছু চার বছর আগেও দেখা যেত যে বীমার দালাল বা জীবন বীমার নাম পর্য্যন্ত শুন্‌লেও লোকের কান যেন অশুচি হ'য়ে উঠত এবং সাথে নাকও যে কুচকে না উঠত এমন নয়। দেশে আজ সব দিক দিয়েই একটা নূতন হাওয়া ও সজীবতার সুরধুনী বইতে সুরু করেচে। জীবন বীমার মত একটা কবিত্ববিহীন কাটখোট্টা রকম বিষয়ের প্রতিও একটা সহানুভূতি পূর্ণ আবহাওয়ার স্বষ্টি হয়ে উঠচে বলেই মনে হয়। কাগজে কলমেও এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে দেখতে পাই। এ সব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। কারণ জাতির সম্পদ বৃদ্ধি ও স্থিতি সংস্থানের জন্য ছনিয়ার বড় বড় মাথাওয়ালা অর্থনীতিবিদ্ পাণ্ডারা অর্থনৈতিক জগতে এযাবৎ যত কিছু পথ বাৎলিয়ে দিয়েচেন তার মধ্যে জীবন বীমাই যে তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, একথা সভ্য জগতের প্রধানগণ, যাঁরা বিশ্ব মানবের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করেচেন, তাঁরা সবাই হলফ্ করে একবাক্যে স্বীকার করেন। সেদিন আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন্ কুলিজ (Calvin Coolidge) বলেচেন—"It is the greatest manifestation of practical idealism in the modern world." আজকাল কোন জাতির বা দেশের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপনে সেই জাতির বা দেশের লোকের জীবন বীমার পরিমাণের সাথে অন্য দেশের উক্ত বিষয়ের তুলনা মূলক বিচার সিদ্ধান্তই তার সঠিক মাপকাঠী বলে অর্থনৈতিক জগতে অনেক স্থলে গ্রাহ্য হয়। ছনিয়ার ধনশালী দেশ সমূহের আর্থিক বিষয় আলোচনায় দেখা যায় যে জীবন বীমার পরিমাণের অনুপাতে যে জাতি বা দেশ যত বেশী উন্নত সে দেশ আর্থিক উন্নতি জাতীয় ধনবৃদ্ধি ও স্থিতি সংস্থানে তত বেশী সফলতা লাভ করেচে। এরূপ জটীল অথচ মানব মঙ্গলকর বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ থাকা উচিত না, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশের অধিবাসীদের মাথা প্রতি জীবন বীমার পরিমাণের একটা তালিকা দেওয়া গেল। এতে উপরে উক্ত কথাগুলো বুঝতে আরো সহজ হবে।

দেশের নাম	মাথা প্রতি জীবন বীমার পরিমাণ
আমেরিকা—	৩০০০৲
কানাডা—	১৯০০৲
অষ্ট্রেলিয়া—	১৩০০৲
নিউজিলাণ্ড—	১১০০৲
ইংলণ্ড—	৭৫০৲
	৭০০৲
নরওয়ে—	৫০০৲
সুইডেন—	৪৫০৲
হলাণ্ড—	৪০০৲
ডেনমার্ক—	৩৫০৲
জাপান—	২০০৲
ভারত—	৩৸০

জগতের ক্রমবিকাশমান সভ্যতার আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিক পথে যা কিছু পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণের জন্য আবিষ্কৃত হয়েচে তার সব কিছুরই একটা না ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান। জীবন বীমারও যে সেরূপ কিছু নেই এমন নয়। তবে সকল দেশে তাহা এখনও সমভাবে প্রকাশের আলো পায়নি তাই আমাদের দেশের শতকরা প্রায় একশ জনের কাছেই জীবন বীমার ইতিহাস আজও অন্ধকারের কুহেলীর অন্তরালেই গা ঢাকা দিয়েই আছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমার এই জীবন বীমার জন্ম কথা বাংলা ভাষার পাদ্রিদের "মথি লিখিত সুসমাচারের" মতই সাধারণ পাঠক সমাজে অপাঠ্য বোধে উপেক্ষিত হ'তে পারে। তবে আধুনিক বাঙ্গালী যাঁরা সনাতন ভারতের চিরন্তন অদৃষ্টবাদের মোহপাশ মুক্ত হয়ে কর্ম্মবহুল দুনিয়ার সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ লাভ করে পুরুষকারকেই বড় ক'রে দেখতে অভ্যাস করেচেন, তাঁদের কাছে আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান "জীবন বীমার" জন্মকথা সম্বন্ধে কিছু বল্‌লে তা নেহাৎ অরুচিকর হবে না এ বিশ্বাস লেখকের আছে।

যে কোনরূপ বীমার জন্মকথা বলতে গেলে ইতালীর লোম্বার্দ্দি জাতির কথাই সবার আগে মনে পড়ে। এরাই এককালে সারা ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়ী জাতি বলে খ্যাত ছিল। খ্রীষ্টিয় তের ও চৌদ্দ-শতকে লোম্বার্দ্দি বণিকগণই ইংলণ্ডের মহাজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে সমগ্র ইয়োরোপের মহাজনী ও সামুদ্রিক বাণিজ্য (Banking and Oversea trade) এদেরই আয়ত্বাধীনে পরিচালিত হ'ত। বীমা প্রথা আবিষ্কারের পূর্ব্বে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দৈব দুর্ঘটনায় সর্ব্বস্বান্ত হ'লে নিরীহ বণিকগণ নিরুপায় বোধে দৈবরূপ কল্পিত দানবের পূজা দিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেই ধন্য বোধ করত। আমাদের দেশেও এরূপ নজীর আজ পর্য্যন্ত মেলে। পাড়াগাঁয়ের মাঝি, জেলে প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে গাওয়ালী পূজা, পীর বদরের পূজা, মনসা লখীন্দরের উপাখ্যান তার সাক্ষ্য দেয়। খেয়ালী দৈবের নির্ম্মম বিধানকে মেনে নিয়ে সর্ব্বহারা পথের ভিখারী হ'তে এই লোম্বার্দ্দি জাতীয় বীর বণিকগণই জগতে সর্ব্ব প্রথম অস্বীকার করে। তারা প্রকৃতির উদ্দাম ধ্বংসলীলাকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এমন উপায় আবিষ্কার করেছিল যাহা আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী লব্ধ অভিজ্ঞতায় ঘাত প্রতিঘাতে বীমারূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠেচে।

সে প্রায় বার শ বৎসর আগের কথা যখন দৈব দুর্ঘটনায় পতিত সর্ব্বস্বান্ত নিরুপায় সতীর্থ বণিকগণের দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে এই লোম্বার্দ্দি বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চাঁদা তুলে এক তহবিল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ আয়োজন করে। জগতের কোন মহৎ প্রচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠানই যেমন সমসাময়িক বদ্ধমূল কুসংস্কারের অচলায়তনকে অগ্রাহ্য করে বিনা ধারায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, লোম্বার্দ্দি জাতীয় বণিকগণের এরূপ জনহিতকর প্রচেষ্টাও তেমনি অনায়াসে সফলতার গৌরব নিয়ে গড়ে উঠেনি। তাদের এই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য ইটালীর তথা সারা ইয়োরোপের তৎকালীন একচ্ছত্র সম্রাট সার্লেমান (Charlemagne) এর দিগ্বিজয়ী রাজদণ্ড নির্ম্মম মূর্ত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়। দৈবরূপ চির খেয়ালী দানব পাছে চটে গিয়ে দিগ্বিজয়ী সম্রাট তথা তাঁর নিজ হাতে অর্জ্জিত বিরাট সাম্রাজ্যের ওপর চড়াও করে, সেজন্য রাজাদেশে এরূপ সমবায় তহবিল প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডাদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারপর ইতিহাসে এসম্বন্ধে ধারাবাহিক কোন তথ্য এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃতই পড়ে আছে। তবে এর অনেক দিন পরে, পনেরো শতকের প্রথম ভাগে, ইটালীর জেনোয়া সহরে বীমা ঘটিত একটা ব্যাপার ঘটে। সেখানে কোন ভদ্রলোক একটী প্রতিষ্ঠানে এই সর্ত্তে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিল যে তার স্ত্রীর যদি সন্তান প্রসব কালে মৃত্যু হয়, তাহ'লে উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা মোটা টাকা ভদ্রলোককে দিতে বাধ্য থাক্‌বে। অসম্বদ্ধ ভাবে ঘট্‌লেও এটা জীবন বীমার ইতিহাসে সর্ব্ব প্রথম ঘটনা বলে স্মরণীয়।

যাঁরা জীবন বীমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা জানেন যে সভ্য জগতেও মাত্র খৃষ্টীয় বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই জীবন বীমার ব্যবসায়ের সবিশেষ উন্নতি ও প্রতিপত্তি হয়েচে। তবে একথাও ঠিক নয় যে জীবন বীমার

জন্ম কথাও নিতান্ত সে দিনের ব্যাপার। দুই শত বছরেরও আগে থেকেই লোকের জীবন বীমা সম্বন্ধে মাথা ব্যথা ছিল তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় বর্ত্তমান। বস্তু বীমা বিশেষতঃ সাগরিক বীমা (Marine Insurance) ও অগ্নি বীমার ইতিহাস আরো পুরাতন। মধ্য যুগে ব্যবসায় উপলক্ষে আগত ইতালীর লোম্বার্দ্দ জাতীয় বণিক্‌দের হাতেই ইংলণ্ডেরও বীমা বিষয়ে হাতে খড়ি হয়েছিল সর্ব্ব প্রথম। এসম্বন্ধে পরে কিছু বলার ইচ্ছা রইল। জগতের ইতিহাসে মান্ধাতার আমল থেকেই প্রক্ষিপ্ত ভাবে নানা দেশে বস্তু বীমার আদর্শে নানারূপ প্রতিষ্ঠান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও একথা নিছক সত্য যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বীমার চাঁদার হার নির্ণয় করে বিধান-মত যে কোন রূপ বীমা-প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল ইংলণ্ডেই সর্ব্ব প্রথম। উন্নত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে জীবন বীমার ব্যবসায়েরও গোড়া পত্তন হয় ইংলণ্ডেই সবার আগে। তবে একথাও মিথ্যা নয় যে নিয়মানুগ জীবন বীমার জন্ম স্থানের গৌরব একমাত্র ইংলণ্ডের প্রাপ্য হলেও ইহাকে সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি দানের দায়ীত্ব ইংলণ্ড সম্পূর্ণ বহন করতে পারেনি। জীবন বীমার চুক্তিপত্রে (Life Assurance Policy) যে আজ নানারূপ সুবিধাজনক সর্ত্ত সমূহ দেখা যায় তার বেশীর ভাগই অন্যান্য দেশের মাথাওয়ালা বীমাবিদ্‌ ও অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের শ্রান্তিহীন গবেষণা লব্ধ আবিষ্ক্রিয়ার ফল। এ বিষয় নিয়েও পরে বিস্তৃত আলোচনা করার বাসনা রইল।

যদিও খৃষ্টিয় ষোল শতকেও বিলাতের কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের মধ্যে জীবন বীমার আদর্শের সাথে কিছু কিছু পরিচয় ছিল এরূপ জানা যায় কিন্তু সতের শতকের শেষের দিকে অনেকটা আজকালকার এমুইটী ব্যবস্থার মত আদর্শে "মার্কার্স কোম্পানী" (Mercers Company) নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এদের তহবিলে চাঁদাদানকারী ব্যক্তিদিগের অনাথা বিধবা ও বাল বাচ্চাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন চাঁদা দেওয়ার বিনিময়ে চাঁদা দানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন নির্দ্দিষ্ট টাকা তার ওয়ারিশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন হয় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে "The Amicable Society for Perpetul Assurance" নামক বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এই কোম্পানীর বীমা গ্রহণের সর্ত্তগুলি আজকালকার জীবন বীমা চুক্তি পত্রের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ছিল। নীচে তুলে দেওয়া অংশ থেকে সেকালের জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ও বীমা চুক্তির ধারা অনেকটা জানা যায়

—The membership was to be 2000, each of whom had to pay 10 sh. as entrance fee and an annual subscription of £ 6. 4 sh. During the first year one sixth of the contribution was to be divided amongst those died, one-third in the second year, and so on, until in the fifth and following years five-sixth were to be so divided, the remainder being allowed to accumulate to create a reserve fund. এই পদ্ধতিতে Amicableএর কাজ হত এবং আজকালকার Provident Company বা Benifit Society গুলোর সাথে এর কাজের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। ঐরূপ জীবন বীমা চুক্তিতে প্রত্যেক বীমাকারীকেই সমান টাকা চাঁদা (premium) দিতে হ'ত। বয়সের তারতম্যের জন্য কাকেও মাথা ঘামাতে হত'না। নীচে বার থেকে ওপরে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের যে কোন ব্যক্তি একই হারে চাঁদা দিয়ে বীমা করার সুযোগ পেত। দাবীর টাকার শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে চাঁদা দিতে হ'ত এবং প্রতি বার মাস অন্তর বীমাকারীকে নূতন বীমা চুক্তি নিতে হ'ত। তারপর দাবীর টাকাও কম বেশী হ'ত কারণ কোন বছরের দাবীর টাকার পরিমাণ নির্ভর করত সেই বছরে প্রতিষ্ঠানে বীমাকারীদের মৃত্যু সংখ্যার উপর। এই ব্যবস্থা মোটেই বিজ্ঞান অনুমোদিত ছিল না।

জগতে সর্ব্ব প্রথম যে ব্যক্তি বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বীমার চাঁদার হার ঠিক করেন তাঁর নাম জেম্‌স্‌ ডড্‌সন (James Dodson)। এই ব্যক্তি "Amicable"-এ বীমা করতে গিয়ে তাড়া খান কারণ এঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতার বেদনা ডড্‌-গণের বুকে বীমা জগতে নূতন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা জাগিয়ে দেয় এবং তারই অবিরাম চেষ্টা ও গবেষণার ফলে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে টমাস সিম্পসন্‌ (Thomas Simpson)

নামে আরেক ব্যক্তির সহযোগে "The Society for Equitable Assurance for Lives and Survivorship প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জগতে সর্ব্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক বিধান মতে স্থাপিত বীমা প্রতিষ্ঠান।

জীবন বীমার ইতিহাসে ১৭২১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল একটী মহাস্মরণীয় দিন। ঐ দিন ইংলণ্ডের ২টী কোম্পানী ইংলণ্ড তথা পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম সাধারণ ভাবে মানব জীবন বীমা করার জন্য রাজা প্রথম জর্জ্জের কাছে থেকে অতিরিক্ত সনদ (Supplimentary Charter) লাভ করে। কোম্পানী ২টীর নাম যথাক্রমে "রয়েল এক্সচেঞ্জ এসিওরেন্স" ও "লণ্ডন এসিওরেন্স কর্পোরেশন"। এরা ১৭২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে সাগরিক ও অগ্নি বীমার কাজ আরম্ভ করে। পর বৎসর পূর্ব্বোক্তরূপে জীবন বীমার ব্যবসা করার সুযোগ লাভ করে। Royal Exchange জীবন বীমা গ্রহণ করার সনদ লাভ করার পর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জীবন বীমা সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে প্রচার পত্র প্রকাশ করেছিল তার কথাগুলি বেশ প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী। নীচে তার নমুনা দেওয়া গেল।

—And whereas Assurances on lives hath, by experience, been found to be of benefit and advantage for persons having offices, Imployments, Estates or other Incomes, determinable upon the life or lives or themselves or other, to make Assurances of the Life or Lives, upon which such offices Imployments, Estates or Incomes are determinable; His Majesty hath been likewise graciously pleased to grant to this Corporation full power and authority to assure the Life or Lives of any person or persons: which they are ready to do on reasonable terms."

ইহাই জীবন বীমা জগতে সর্ব্ব প্রথম বিজ্ঞপ্তি পত্র (Advertisement)। এই বিজ্ঞাপনটী এমন সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত যে আজ ২০০ শত বৎসর পরেও অননুকরণীয় বলে মনে হয়।

এরূপ হৃদয়গ্রাহী বিজ্ঞাপন প্রচারের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন বীমা সম্বন্ধে বিলাতের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কোন সমাজের লোকের মধ্যেই বিশেষ কোনরূপ সাড়া বা উৎকর্ষ দেখা যায়নি। তখন বিলাতের ব্যবসায়ী মহলে জাহাজে স্থানান্তরে প্রেরিত পণ্যসমূহের ওপর সাগরিক বীমা (Marine Insurance) চুক্তি করার দিকেই বিশেষ ঝোক ছিল। বাড়ী ঘরের মূল্যবান আসবাব পত্রের ওপর অগ্নি বীমা চুক্তি গ্রহণ করাতেও ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যেত। কিন্তু জীবন বীমা সম্বন্ধে Royal Exchange কর্ত্তৃক রাজাদেশ পাওয়া এবং উক্তরূপ ঘোষণা পত্র প্রচারের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে একরূপ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। আমাদের দেশের আজকালকার অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা তথা কথিত শিক্ষিত ভদ্র আখ্যাধারী লোক বিশেষের মতই তথাকার জনসাধারণও জীবন বীমা করাটাকে অনেকটা ফাট্‌কা বাজী মনে করে হেসে উড়িয়ে দিতে লজ্জা বোধ করত না। তাই বিলাতে জীবন বীমার কাজ সুরু হওয়ার প্রথম ৩০ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ইংলণ্ডে যে পরিমাণ জীবন বীমার কাজ হয়েছিল তাহা নিতান্তই নগণ্য এবং Royal Exchange কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগে প্রথম চল্লিশ বছরে জীবন বীমার চুক্তি দিয়ে যে চাঁদা (premium) আদায় হয়েছিল তার মোট পরিমাণ মাত্র দশ হাজার পাউণ্ড। তার মানে গড়ে মাত্র ২৫০ শত পাউণ্ড হিসাবে বার্ষিক চাঁদা কোম্পানীর আয় হয়েছিল।

বিলাতের তখনকার লোকদের জীবন বীমা সম্বন্ধে এরূপ উদাসীনতার পক্ষে যে মোটেই কোন কারণ বর্ত্তমান ছিল না তা নয়। বিলাতে যে সময় জীবন বীমা ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন হয় বিশেষতঃ Royal Exchange ও London Assurance যে বছর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেবার ইংলণ্ডের আর্থিক গগনে যে কালবোশেখীর তাণ্ডব চলে তাতে জনসাধারণের ভিতর যে আর্থিক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তার ফলে যে কোনরূপ নয়া অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকেই লোকে পরে বহুদিন পর্য্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখ্‌ত। বিলাতের এই অর্থনৈতিক সঙ্ঘটির কাহিনীটী বেশ চমকপ্রদ বলে এখানে উল্লেখ না করলে লেখাটা অপূর্ণ থেকে যাবে কারণ আর্থিক জগতে ইহা একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা আর বাংলা ভাষায় আজ পর্য্যন্তও ব্যাপারটা ধামা চাপাই আছে। (ক্রমশঃ)

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড

আজমীরের সুপরিচালিত বীমা কোম্পানী—জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেডের গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী একখানি আমরা যথাকালে প্রাপ্ত হইয়াছি।

উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ, গত বৎসর কোম্পানী ৮৫ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৫০ টাকার মোট জীবনবীমার জন্য ৫২৮৮ খানি আবেদন পত্র পাইয়াছিলেন এবং মোট ৬৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শত টাকার ৪০০৩ খানি বীমাপত্র দান করিয়াছিলেন। নূতন জীবনবীমার জন্য কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯ শত ২০ টাকা এবং মোট জীবন বীমার জন্য ১০ লক্ষ ২১ হাজার ১ শত ৯১ টাকা আয় হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর জীবনবীমার চাঁদা বাবদে আয় ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৯২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জীবনবীমার চাঁদা ও অন্যান্য বাবদে গত বৎসর কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৫২ হাজার ২ শত ৭১ টাকা। দাবীর টাকা, কর্ম্মচারীদের বেতন, কমিশন, অংশীদারদের লভাংশ, ইনকাম ট্যাক্স প্রভৃতি সমস্ত বাবদে কোম্পানীর মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ১৬ টাকা। উদ্বৃত্ত ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪ টাকা জীবন বীমার তহবিলে মজুত করা হয়। ফলে বীমা তহবিলের মোট টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৎসরান্তে ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শত ৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

মৃত্যু বাবদে ১১২ খানি পলিসির দরুণ কোম্পানীর গত বৎসর ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪ শত ৫৮ টাকা ও মেয়াদী বীমার বাবদে ৭৫ হাজার ২ শত ২৬ টাকা মোট ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৮৫ টাকা দেয় হইয়াছিল।

অংশীদারগণকে প্রদত্ত মূলধনের উপরে কোম্পানী শতকরা ১৯২৮ সালের হিসাবে গত বৎসর ৬ হাজার ৩৮ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের জন্যও শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা ডাইরেক্টরগণ অনুমোদন করিয়াছেন।

গত বৎসরের শেষভাগে কোম্পানীর ন্যস্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত ৪২ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই টাকার অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় ট্রাষ্ট আইনের অনুমোদিত বিভিন্ন সিকিউরিটি, বণ্ড ও ঋণের বাবদে খাটানো হইয়াছিল। কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ অত্যধিক লাভের আশায় কোনরূপ ফটকাবাজী খেলিয়া কোম্পানির ন্যস্ত সম্পত্তির কোন অংশ কোন প্রকারে বিপন্ন করেন নাই। এ হিসাবে কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পত্রকে অনাবিল—স্বচ্ছ—ও সকল সন্দেহের অতীত বলিতে হইবে।

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও
জেনারেল ম্যানেজার
মিঃ পি, ডি, ভার্গব

কোম্পানীর পরিচালকগণ সকল প্রকারে কোম্পানীর ব্যয়সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা যে শুধু প্রশংসনীয় তাহা নহে, কোম্পানীর মঙ্গল, উন্নতি, এমন কি ভাবী অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যয়নির্ব্বাহ করার উপর একান্ত নির্ভর করে। যে ভাবে এক্ষণে জেনারেল ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমাদের মনে হয়—জেনারেল শীঘ্রই ভারতের একটী আদর্শ কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ প্রেরণায় আজমীরের মিষ্টার পি, ডি, ভার্গব জেনারেলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আজ জেনারেলের উন্নতি, বিস্তৃতি ও সুদৃঢ়
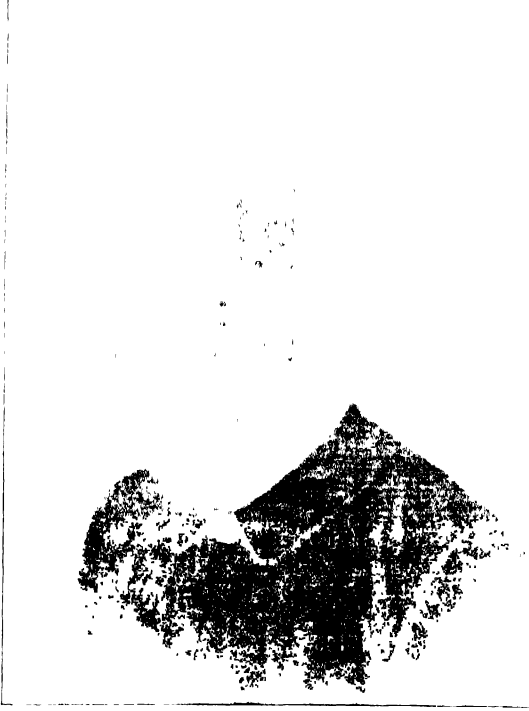
জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ বি, রায়

ভিত্তি দেখিয়া মনে হয়, ভার্গবের সকল স্বপ্ন ও সকল সাধনা সার্থকতায় ও সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। আর যাঁহাদের চেষ্টা ও অক্লান্ত শ্রমের উপর 'জেনারেলে'র ভিত্তি-মূল রচিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজন শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায়। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বিনোদ বাবু ছিলেন কোম্পানীর বাঙ্গালার চীফ এজেন্ট—তখন ধূতি চাদর পরিহিত বিনোদবিহারী হোমিওপ্যাথির প্র্যাক্‌টিস ছাড়িয়া জেনারেলের পাঁজিপুথি বগলে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 'জেনারেলে'র জন্য কাজ সংগ্রহ করিতেন। তখন সম্বৎসরে লাখ টাকার কাজ হওয়াও যেন ছিল স্বপ্ন। তার পর কঠিন পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এখন বাঙ্গালায় কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকার কাজ হয়, ভারতের আর কোনও প্রদেশে এত কাজ হয় না। ফলে তখনকার চীফ এজেন্ট বিনোদবাবু এক্ষণে কোম্পানীর ইষ্টার্ণ ডিভিজনের ম্যানেজার মিষ্টার বি, রায় হইয়াছেন। তাঁহার এই সার্থকতা কাহারও কৃপাকণার ভিখারী হইয়া তিনি লাভ করেন নাই—অসাধারণ চেষ্টা ও শ্রমের ফলে তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন। খুড়া মহাশয় কোন কালে জীবনবীমার এজেন্সী করিয়াছিলেন—এই সম্পর্কে যাহারা রাতারাতি জীবনবীমা কোম্পানীর ম্যানেজার হইবার স্বপ্ন দেখেন, মিষ্টার রায়ের কার্য্য ও সাধনা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের স্বপ্ন একদিন সার্থক হইবে।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী, লিমিটেড

জীবন বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ট কোম্পানী—এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। একটু অবস্থাপন্ন লোক যাহারা মাসিক অন্ততঃ ৪।৫ টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন কেবল তাহারাই জীবন বীমা করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যাহারা মাসিক এক টাকা বা আট আনার অধিক সঞ্চয় করিতে পারেন না অথচ সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর পলিসি গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে হিসাবে এদেশে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর প্রয়োজন ও সার্থকতা অবশ্যই আছে।

বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালা কেন সমগ্র ভারতে যতগুলি প্রভিডেণ্ট কোম্পানী আছে তাহার মধ্যে ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী স্থায়িত্ব, প্রসার ও আর্থিক স্বচ্ছলতার হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে শতাধিক প্রভিডেণ্ট কোম্পানী

আছে, তন্মধ্যে ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোম্পানীর ন্যস্ত সম্পত্তির পরিমাণ অন্য সকলগুলির ন্যস্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ অপেক্ষাও বহুগুণ বেশী।

ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোম্পানীর সেক্রেটারী
মিঃ আই, বি, সেন

গত ১৯২৯ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, গত বৎসর এই কোম্পানীর বীমার চাঁদা বাবদে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ১ শত ৯৪ টাকা আয় হইয়াছিল। দাবী বাবদে কোম্পানী ১০ হাজার ২ শত ১১ টাকা দিয়াছিলেন এবং কোম্পানীর কার্য্য পরিচালন জন্য ৫৫ হাজার ৩ শত ৮৯ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কোম্পানীর মোট তহবিল ১ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত ৫০ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৎসরান্তে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ৫০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। গত বৎসরের শেষভাগে কোম্পানীর মোট ন্যস্ত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত ৫ টাকা।

ভারতে জীবনবীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে "ওরিয়েণ্টাল"-এর যে স্থান, প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির মধ্যে "ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী"রও সেইরূপ স্থান। সাধুতা, বিচক্ষণতা ও অসাধারণ গঠন ক্ষমতা ব্যতীত এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। এজন্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনের দূরদর্শিতা, একনিষ্ঠ সাধনা ও ব্যবসায়নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমরা তাঁহার অধিকতর সাফল্য কামনা করি এবং কোম্পানীর যাহাতে আরও উন্নতি ও বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

মহাত্মা গান্ধী

স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু

শ্রীযুত জয়াকর

শান্তি-বৈঠক

["স্বায়ত্ত-শাসন"এর সৌজন্যে]

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
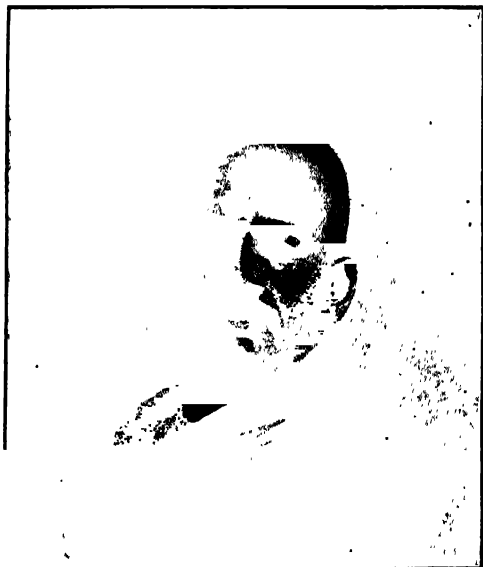
শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

শান্তি-বৈঠক

["স্বায়ত্ত-শাসন" এর সৌজন্যে

"কে লবে প্রসন্নমুখে নিগ্রহের ফল অনুগ্রহ?
তাচ্ছিল্যের মৃদুহাসি সহ
বর্ব্বর প্রভুর হাতে দাসত্বের তুচ্ছ পুরস্কার?
দাবী যদি না থাকে আমার,—
দাক্ষিণ্যের সিংহাসনতলে
আমার মুক্তির দান মেগে ল'ব নয়নের জলে?"

২৩শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৭ | ৫ম সংখ্যা

মহানন্দ মঠ

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

গৃহে যার অগ্নি লাগে, সে যদি চাহিয়া শূন্যপানে
নির্ব্বাণের ভার তা'র বাহু তুলি' সঁপি' ভগবানে
উর্দ্ধপানে চেয়ে থাকে রোদনের অশ্রু অন্তরালে,
সে ভিক্ষার কাম্যফল ভগবান কভু কোন কালে
অর্পিতে অক্ষম নিজে, এত স্থান নাহি সে দয়ায়!
কাপুরুষ যে নাস্তিক আত্মার জঘন্য দীনতায়
অস্বীকার করে নিজ বীর্য্যবান প্রাণের ঠাকুরে,
তার সে নির্লজ্জ মূঢ় প্রার্থনার আত্মঘাতী সুরে
ঘৃণায় ফিরান মুখ, কোথাও থাকেন যদি তিনি—
সৃজনবৈচিত্র্যমাঝে অবাঞ্ছিত বিষাঙ্কুর চিনি'।

দারিদ্র্যে নাহিক ভয়, নাহি খেদ জরাজীর্ণতায়
মূঢ়তায় নাহি লজ্জা, নাহি ক্ষোভ বুদ্ধিহীনতায়,
হোক্‌না মানুষ হীন স্বার্থ-অন্ধ বান্ধব-বিমুখ,
ভাগ্যে তার নাই থাক্ সর্ব্ব-সমবেদনার সুখ—
দেহে যদি বাহু থাকে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত যাহা নয়,
মর্ম্মমাঝে যদি তার অস্তিত্বের রক্তবিন্দু বয়,
আপন সন্তানে যদি কখনো সে বেসে থাকে ভালো
মাতৃস্নেহ-নেত্রপাতে জ্বেলে থাকে অন্তরের আলো,
তার সেই কৃপাভিক্ষা অক্ষমের নহে অপরাধ,
পাপের প্রমূর্ত্তি সে যে, ধর্ম্মের ধিক্কৃত প্রতিবাদ !

আগুন লেগেছে ঘরে ;—তবু যারা পূর্ণ শান্তিভরে,
তন্দ্রিত তমিস্রা তলে নেমে চলে সুষুপ্তির স্তরে
তাদের জাগাতে হবে, মেঘাচ্ছন্ন কালরাত্রিক্ষণে—
কঠোর বজ্রের রবে,—যুগধ্বংসী ঝঞ্ঝার তাড়নে !

হা মুগ্ধ ভারতবর্ষ ! ত্রিশকোটি-সন্তানজননি !
দীর্ঘ শতাব্দীর ঘুমে আজও কি মা রবে অচেতনই !

শক্তি তব সুপ্ত, জানি, আত্মহারা বিস্মৃতির জলে,
ধর্ম্ম অবরুদ্ধশ্বাস সংস্কারের পঙ্কিল পল্বলে,
ক্ষয়খিন্ন আত্মগোত্র, ভেদভিন্ন গৃহ পরিজন,
বাহিরের গুরুভারে মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্নবন্ধন,
নিজগৃহে পরবাসী তোমারি কর্তৃত্বহীনতায়,
অভ্যাসের নাগপাশে বাড়ে যারা চিন্তাদীনতায়
তোমারি স্নেহান্ধ ক্রোড়ে,—শাসনগম্ভীর কণ্ঠ তুলি'
তুমিই কি তাহাদের কোনদিন ডাকিয়াছ ভুলি ?

সে দোষের শাস্তি বুঝি দিতেছেন নিজে ভগবান,
ঈর্ষার কন্টকে হের শরশয্যা সারা হিন্দুস্থান ;
লক্ষ্মীর আবাসভূমি লক্ষ্মীছাড়া তাই পরগেহ,
খণ্ডিত দুর্ব্বলদলে পদাঘাত করিছে যে কেহ !

তস্কর ফুকারি' ফিরে, হাসে দস্যু পূর্ণযোগ জানি',
ঘরে ঘরে মহামারী নিরন্নে করিছে টানাটানি—
সেও লেখা ছিল ভাগ্যে! সেও সহ্য হইয়াছে প্রাণে
বৈধব্যের মহা শোকে মাতা যথা দুষ্কৃত সন্তানে
দেখিয়া না দেখে চক্ষে অভিমানে ফিরাইয়া মুখ,
নিরাশার নির্য্যাতনে যতই ফাটুক তার বুক!

আজ যবে ঘরে ঘরে আগুন লেগেছে রাজ্যমাঝে,
শত্রু মিত্রে ভেদ নাই, দিশিদিশি আর্ত্তধ্বনি বাজে,
বিগ্রহ খসিয়া পড়ে, ধূলিসাৎ মন্দিরের চূড়া,
অট্টালিকা ভস্মস্তূপে মাটির কুটীরে করে গুঁড়া,
বিদীর্ণ মণ্ডপ ছাড়ি' আশ্রিতেরা পালায় শ্মশানে,
এখনো কি রুদ্ধবাক্ রহিবে মা পূর্ব্ব অভিমানে?
আজ তুমি জাগো মা গো! নাই আর সময় যে নাই,
মুহূর্ত্তের দ্বিধামাঝে মহাবংশ পুড়ে' হ'ল ছাই!
লুপ্ত আজি ভাগীরথী, পারিবে না কোনো ভগীরথ
উদ্ধারিতে ত্রিশকোটি সন্তানের ভস্মের পর্ব্বত!

ঐ যারা অবশিষ্ট মোহাবিষ্ট কাপুরুষদল—
শ্মশানের বহ্নিধূমে মুছে আঁখি বেদনাবিহ্বল,
আজিকার দুর্গতির সর্ব্বশেষ সোপানের তলে—
তাহাদের ডাকো উচ্চে মিলনের মহামন্ত্রবলে
আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠায়; ভগ্ন বক্ষে দাও নব আশা,
নির্ব্বাক্ বিমুগ্ধ মুখে জাগাও মা জাগরণী ভাষা;
শান্তির সান্ত্বনা দাও কলহের কুরুক্ষেত্রপারে,
ঐক্যসূত্রে গাঁথি' তোলো বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্রতারে;
দাও শক্তি দাও ভক্তি দাও প্রীতি দুর্ব্বলের বুকে,
ফুটাও প্রাণের দীপ্তি লাঞ্ছিতের মৃত্যুপাংশু মুখে।

কহ:ডাকি' বজ্রকণ্ঠে—'উত্তিষ্ঠত নিবোধত মূঢ়',
ছিন্নমস্তা বিচ্ছেদের আত্মঘাতী বেদনা নিগূঢ়
জেনেছিস্ দিনশেষে; আর কেন, ঘরে ফিরে আয়,
আপন: তুষাগ্নি বক্ষে জ্বেলেছিস্ যাদের হিংসায়—
তারা তোরি জ্ঞাতিগোত্র; যে রক্ত তাদের বক্ষোমাঝে
স্তব্ধ হ'য়ে শোন্ দেখি, মর্ম্মে তোর সেই ধ্বনি বাজে!
অন্তরে বাহিরে তোর সর্ব্বনাশা যে আগুন জ্বলে,
আপনি রুধিতে হবে কল্যাণভূয়িষ্ঠ বাহুবলে,
একত্রে বাঁধিয়া বুক—সর্ব্বহারা এই শুভক্ষণে;
প্রসন্ন করিতে হবে রিষ্টিহরা দেব হুতাশনে।

বিশ্বজিৎ ত্যাগযজ্ঞে ঐ দেখ্ আমারি বংশজ
বসিয়াছে তপস্যায়—সে যে ওরে, তোদেরি অগ্রজ!
ত্রিশকোটিশাপমুক্তি একা সে করিয়া দৃঢ় পণ,
একে একে অর্ঘ্য রচি' সর্ব্বস্ব করিছে সমর্পণ
সর্ব্ব নিখিলের তরে, সর্ব্বনিয়ন্তার পদতলে।
প্রেম ও পৌরুষে বাঁধি' বজ্রবক্ষে নিজ চিত্তবলে,
ডাকিছে তোদের আজি—আয়, আয়, ওরে তোরা আয়,
এখনো সময় আছে, আয় ওরে, লগ্ন বয়ে যায়;
বিশ্বেরে আশ্রয় দিবে মিলনের যে অক্ষয় বট
তারি পাদমূলে আজি গাঁথিছে সে মহানন্দমঠ।

মাইকেল

[শ্রীঅবনীনাথ রায়]

আজ কবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী ; সুতরাং কবির মৃত্যুর কথা থেকে সুরু করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

আজ থেকে ৫৭ বৎসর আগে ঠিক আজকের তারিখে রবিবারে বেলা দুটোর সময় কবির দেহান্ত হয়। আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে অত্যন্ত দারিদ্র্য এবং দুঃখের মধ্যে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশের এরকম ঘটনা বিরল নয়। আর এরকম ঘটনায় লজ্জার তীব্রতা অনুভব করতেও আমরা ভুলে গেছি। প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয়নি—না সাগরদাঁড়ীতে, না অন্যত্র।

মধুসূদন যখন হাঁসপাতালে মারা যান তখন তিনি শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন। মৃত্যুর সময় আত্মীয় স্বজন কেউ তাঁর কাছে ছিল না। সুখের এবং দুঃখের অংশীদার পত্নী হেন্‌রিয়েটা তাঁর ৭০ ঘণ্টা আগে মারা যান। এ সংবাদও তাঁকে শোনান হয়েছিল। কবির বন্ধুদের অর্থানুকূল্যে হেন্‌রিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুত্র নেপোলিয়ান আলবার্ট দত্তের শিক্ষার এবং ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থাই তিনি করে যেতে পারেন নি। কেবল বন্ধু মনোমোহন ঘোষের হাতে তাকে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। নিজের সমস্ত দেনাও তিনি শোধ করে যেতে পারেন নি।

কি কারণে তাঁর এ রকম দুর্দ্দশা হয়েছিল জানতে স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়। বিশেষ যখন আমরা জানি যে মধুসূদনের পিতা নিঃস্ব ছিলেন না এবং তিনি নিজেও বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার ছিলেন। মধুসূদনের অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাক এর কারণ নির্দ্দেশ করেছেন, তিনি বলেন যে মধুসূদন 'was improvident, unworldly and unbusiness-like in the extreme.' য়ুরোপ যাওয়া, থাকা এবং সেখান থেকে ফিরে আসা প্রভৃতি খরচ বাবদ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি হ'য়ে গিয়েছিল। আর ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাঁর যথেষ্ট অর্থাগম হয়নি। হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকা তার সত্য কারণ দেখিছিলেন—'nursed on the lap of poesy, he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law.'

অর্থাগম সম্বন্ধে মধুসূদন কি রকম improvident ছিলেন একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। তিনি যখন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করেন তখন বন্ধু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের ছোট ভাই হরিমোহন বন্দোপাধ্যায় তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোককে মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত পরামর্শ নেবার জন্যে মাইকেলের কাছে নিয়ে আসেন। পরামর্শ নেওয়ার পর উক্ত ভদ্রলোক নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন কিন্তু মধুসূদন এক পয়সাও নিলেন না। পরে হরিমোহনকে নিভৃতে ডেকে বল্লেন যে আহার্য্য প্রস্তুত হতে পারে এরকম একটি পয়সাও আজ আমার ঘরে নেই। তোমার কাছে যদি টাকা থাকে আমার স্ত্রীকে পাঁচটি টাকা ধার দিয়ে এস।

যে বস্তুর সদ্ভাব থাকলে এই ধরণের মনোবৃত্তি হয় তার নাম heart. মাইকেল মধুসূদনে heart এবং head এই দুয়ের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে বিদ্বৎ সমাজে আজ আর মতদ্বৈধ নেই। তিনি সংস্কৃত, পারসীক, ল্যাটিন, গ্রীক্, ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ এবং ইটালিয়ান্ এই আটটি ভাষা জানতেন। এর মধ্যে ফ্রেঞ্চ এবং ইটালিয়ান্ এত ভাল জানতেন যে তাতে কবিতা রচনা করতে বাধ্‌ত না। এ ছাড়া মান্দ্রাজ প্রবাস কালে তামিল, তেলেগু এবং হিব্রুও শিখেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মাইকেল সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই।" যাঁরা পরিমিতবাক্ এবং nonsentimental ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে জানেন তাঁরাই বলতে পারবেন এ প্রশংসার মূল্য কত।

এ হেন প্রতিভা যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বছর আরো একটি মহানুভব ব্যক্তি জন্মেছিলেন—তাঁর নাম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালী সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদ পত্রের জগতে ইনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মধুসূদন বাপমায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন—সুতরাং অত্যন্ত আদুরে ছিলেন। অতিরিক্ত আদরে তাঁর যে মাথা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর থেকেই তাঁর স্বভাবের অনেকগুলি দোষের উদ্ভব হয়েছিল। গৌরদাস বাবু বলেন 'no sooner thought than done was Modhu's motto.' বলা বাহুল্য হঠকারিতার মূল ঐ অতিরিক্ত আদরের মাত্রা বোঝাবার জন্যে একটি ছোট্ট অভ্যাসের উল্লেখ করি, মধুসূদন যখন স্নান করতে যেতেন তখন ৫।৭টি হাঁড়িতে ভাত চড়ান হ'ত—ফিরে এসে যে হাঁড়ির ভাত সব চেয়ে সুসিদ্ধ হ'ত সেই ভাত তিনি খেতেন।

তের বছর বয়সে কলকাতায় 'হিন্দু কলেজে' মধুসূদন ভর্ত্তি হন। হিন্দু কলেজের বাংলা নাম ছিল 'মহাবিদ্যালয়'। ঐ কলেজ সিনিয়ার এবং জুনিয়ার নামে দুই ডিপার্টমেণ্টে বিভক্ত ছিল এবং দুই-এ মিলিয়ে এখনকার বি, এ বা তার চেয়ে কিছু উঁচু ষ্টাণ্ডার্ডের শিক্ষা সেখানে দেওয়া হত। সেই সময়ের অধিকাংশ খ্যাতনামা লোকই হিন্দু কলেজের ছাত্র। * মধুসূদন কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্র—ডিরোজিয়ো সাহেব তখন চলে গেছেন।

এই হিন্দু কলেজী শিক্ষায় একটি দারুণ কুফল ফলেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ছাত্রদের একটা প্রগাঢ় নেশা ধরে গিয়েছিল। ইংরাজি শিক্ষার তখন প্রাক্কাল বল্লেই হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তখন সবেমাত্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে ইংরাজিই ভারতবর্ষে শিক্ষার বাহন হবে। তার উপর মেকলে সাহেবের ছিল হিন্দুজাতি এবং হিন্দু শাস্ত্রের উপর দারুণ অবজ্ঞা। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন তখন "ইয়ং বেঙ্গল"এর মাথায় গজ গজ করচে। ফলে তাঁদের এই ধারণা দাঁড়িয়ে গেল যে স্বাধীনতা মানে হচ্চে স্বেচ্ছাচার এবং সংস্কার মানে হচ্চে সমূলোৎপাটন, বলা বাহুল্য মধুসূদন এসব ধারণা খুব বেশি মাত্রায় ধাতস্থ করেছিলেন এবং তার দেনা জীবন ভোর তাঁকে শুধতে হয়েচে।

আঠার বছর বয়সে ছাত্রজীবনে মধুসূদন ইংরাজিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। এ গুলি তখনকার Literary Gleaner নামক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

উনিশ বছর বয়সে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতামাতার মতানুযায়ী হিন্দু বিবাহের হাত থেকে অব্যাহতি লাভই তাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের উদ্দেশ্য। বিলাত যাওয়ার উপরও তাঁর একটা দারুণ লোভ ছিল। কেউ কেউ আন্দাজ করেন এই বিষয়ে তাঁকে আশা দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল।

খৃষ্টান হওয়ার পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শিবপুরে বিশপ্স কলেজে পড়েন। তার পরের বছর কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি হঠাৎ বাংলা দেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে যান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আট বছর তিনি মাদ্রাজে ছিলেন।

মাদ্রাজ প্রবাসের সময় পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম ইংরাজি কাব্য Captive Lady প্রকাশিত হয়। এই বইখানি তিনি মাদ্রাজের তদানীন্তন আড্ভোকেট জেনারেল জর্জ্জ নর্টনের নামে উৎসর্গ করেন। Atheneum পত্রিকায় তাঁর কাব্যের যে সমালোচনা বেরোয় তার থেকে এর মূল্য নিরূপিত হতে পারে। একজন ইংরাজ পত্র-প্রেরক লিখেছিলেন, 'what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own.'

মধুসূদন একখণ্ড উক্ত গ্রন্থ কলকাতায় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবকে উপহার পাঠান। বেথুন সাহেব বই পেয়ে যে চিঠি লেখেন তার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্চি। কারণ এই চিঠির ফলে এবং গৌরদাস বাবুর প্ররোচনায় সাহিত্য জগতে যশোলাভ সম্বন্ধে মধুসূদনের ধারণা একেবারে উল্টে গিয়েছিল। বেথুন লিখেছিলেন, "But you could render far greater service to your country and have a better chance of

---

* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ রায়, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি।

achieving a lasting reputation for yourself, if you will employ the taste and talents which you have cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of your own language, if poetry at all events you must write."

আট বছর পরে মধুসূদন যখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তাঁর মা এবং বাবা দুজনেই লোকান্তরিত হয়েচেন। বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও ইতিমধ্যে বদলেচে। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের উপর তখন আর লোকের অশ্রদ্ধা নেই। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভা গুণে বাংলা ভাষার তখন অনেক উন্নতি হয়েচে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" "জীবন চরিত শকুন্তলা" তারাশঙ্কর শর্ম্মার "কাদম্বরী" রঙ্গলালের "পদ্মিনী-উপাখ্যান" তখন বেরিয়েছে। সাময়িক সংবাদ পত্রের মধ্যে অক্ষয়কুমারের "তত্ত্ববোধিনী" এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পাঠক সমাজে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেচে। এই রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর মীরাট সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে বলেছিলেন যে আজকাল যেমন ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল man of encyclopædic learning, তেমনি ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র হচ্চেন founder of antiquarian research.

কাব্যের জগতে তখন ঈশ্বর গুপ্তের রাজত্ব কাল। ইনি ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরের আদিরস প্রধান কাব্যকে অনেকটা সুসংহত করে এনেছিলেন কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা একেবারে এ দোষ থেকে মুক্তি পায় নি, বিশেষ তিনি ইংরাজি জানতেন না। সুতরাং তখনকার ইংরাজি শিক্ষিত পাঠক সমাজ তাঁর কবিতা পড়ে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি। এইখানে মধুসূদনের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পক্ষে ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ছিল।

কিন্তু প্রথমেই মধুসূদনকে কবিতা লিখতে হয় নি—নাটক লিখতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য তখন মধুসূদন একেবারে বাংলা জানতেন না বল্লেই হয়। মাদ্রাজে যখন তাঁর একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে তখন সেই সংবাদ জানিয়ে তিনি বাপকে বাংলায় চিঠি লিখতে পারেন নি—বন্ধু গৌর দাসকে অনুরোধ করেছিলেন, বাবাকে এ সংবাদ জানিও।

কবির নাটক লেখার ইতিহাস বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষায় তখন ভাল নাটক ছিল না বল্লেই হয়। "নাটুকে নারাণ" রাম নারায়ণ তর্করত্ন "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" লিখেছিলেন এবং তিনিই বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বন করে 'রত্নাবলী' নাটক লেখেন।

একটা জিদের বশবর্ত্তী হয়ে মধুসূদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'রত্নাবলী'র মহলা দেখতে গিয়ে তিনি বলেন যে বইখানি অকিঞ্চিৎকর। শুনে বন্ধু গৌর দাস বলেন, সে ত আমরা জানি কিন্তু উপায় কি—তুমি কি চাও আমরা 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করি? এর উত্তরে কবি বল্লেন, "আমি নাটক রচনা করব"—এবং কয়েক হপ্তা পরেই "শর্ম্মিষ্ঠা" লিখে এঁদের হাতে দিলেন। বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্ণধার তখন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং পাথুরেঘাটার মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বর চন্দ্র স্বনামধন্য লালা বাবুর বংশধর। এঁদের এবং যতীন্দ্র মোহনের নাম জাতীয় নাট্য-শালার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইংরাজীনবিশ মধুসূদনের বাংলা নাটক পড়ে এঁরা চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এর থেকে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁদের যে সখ্যতা হয়ে গেল জীবন ভোর তা অক্ষুণ্ণ ছিল। জাতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের স্মৃতি স্বরূপ মধুসূদন তাঁর প্রথম মেয়ের নাম "শর্ম্মিষ্ঠা" রেখেছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "শর্ম্মিষ্ঠা" অভিনীত হ'ল। তারপরই তিনি "পদ্মাবতী" নাটক লেখেন—এখানি নানা কারণে অভিনীত হয় নি।

এর পরই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করলেন যার জন্য তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। দেবী সরস্বতীর পায়ের মিত্রাক্ষর পয়ারের যে বেড়ি তিনি ভেঙ্গে ছিলেন সে-ও জিদের বশে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন, "বাংলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হতে পারে না; কেননা ফরাসী ভাষায় blank verse নেই, যদিও সে ভাষা আমাদের

ভাষার চেয়ে ঢের উন্নত।" ফলে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য হাতে করে মধুসূদনের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ। এ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা।

মধুসূদন যে কি রকম সব্যসাচী ছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর "তিলোত্তমা-সম্ভবের" গোড়ার প্রথম কয়েক লাইন এবং তারই পাশাপাশি তার ইংরাজি উদ্ধৃত করচিঃ—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্দ্ধ বাহু সদা, শুভ্র বেশধারী,
নিমগ্ন তপ-সাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুল ধ্যেয় যোগী !" * *

"Dhabala by name, a peak
On Himalaya's kingly brow –
Swelling high into the heavens,
Ever robed in virgin snow ;
And endued with soul divine.
Vast and moveless like the Lord
Siva, mightiest of the gods,
By holiest anchorites adored,
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immersed in prayer.
With his arms uplifted high,
His towering head hid in the air."

"তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য পড়ে রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লিখেছিলেন যে উক্ত কাব্যে মিল্টনের grandeur এবং sublimity আছে। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন একে first blank verse Epic বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাইকেলের "তিলোত্তমা সম্ভব" অমিত্রচ্ছন্দের রাজ্যে একটা experiment মাত্র। এ ছন্দের পূর্ণ পরিণতি "মেঘনাদ বধ"এ।

"শর্ম্মিষ্ঠা"র পরে এবং "তিলোত্তমা সম্ভবে"র আগে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেছিলেন। তাদের নাম "একেই কি বলে সভ্যতা", আর "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"। এর পূর্ব্বে ইংরাজিতে যাকে বলে Farce, অভিনয়োপযোগী এমন কোন নাটক বাংলা ভাষায় ছিল না।

পরের বছর মাইকেলের "মেঘনাদ বধ" প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করবার স্থান এ নয়। এক কথায় বলা যায় যে উক্ত কাব্যে মধুসূদনের কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। নয়টি সর্গ সম্বলিত এই বিরাট কাব্যগ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে এই গ্রন্থে কবি কি রকম করে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, কালিদাস, হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে, ট্যাসো এবং মিল্টন থেকে যুগপৎ অনুপ্রাণনা সংগ্রহ করেছেন।

"মেঘনাদ বধে"র সঙ্গে সঙ্গেই কবি "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য (Odes) রচনা করেন, এটি বড় আশ্চর্য্য। "ব্রজাঙ্গনা" মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এবং দুটির মূলগত সুর একেবারে বিভিন্ন। রাধিকাকে ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ায় রাধিকার উন্মাদ অবস্থা বর্ণনাই "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের উপজীব্য। মাত্র ৪টি লাইন উদ্ধৃত করচি :—

"ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যাম-দাসী।"

এর থেকে চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত লাইন কয়টি কি মনে পড়ে না ?

"গোকুল নগর মাঝে আর কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুল মানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রা-ধা রা-ধা।"

"ব্রজাঙ্গনা"র সঙ্গে সঙ্গেই কবি "কৃষ্ণ কুমারী" নাটক লেখেন। এ নাটকের আখ্যানভাগ টড্ সাহেবের রাজস্থানের ইতিহাস থেকে নেওয়া। এখানি বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বারণ করে গিয়েছিলেন বলে এর পূর্ব্বে কেউ ট্র্যাজেডি লেখেন নি।

"বীরাঙ্গনা" কাব্য মধুসূদনের প্রতিভার শেষ দান। রোমক কবি Ovid এর Heroic Epistles এর আদর্শে

এ কাব্য রচিত। এ কাব্যের স্থানও বাংলা সাহিত্যে খুব উঁচুতে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে এ গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হয়েছিল।

এর পরই মধুসূদন ব্যারিষ্টারি পড়তে য়ুরোপ যাত্রা করেন। এই ঘটনায় বাগ্দেবী একজন শক্তিশালী ভক্তের পূজা থেকে বঞ্চিত হন। য়ুরোপ প্রবাসকালে তিনি অনেক গুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন। বঙ্গ ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতার (Sonnets) তিনিই প্রবর্ত্তক

য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি "হেক্‌টর বধ" এবং "মায়াকানন" আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তখন তাঁর প্রতিভার শেষ অবস্থা এবং দারুণ অর্থ কষ্টে তিনি অবসন্ন।

উপরে মাইকেলের জীবন এবং তাঁর সাহিত্যিক দানের কিছু আভাষ দেওয়া হল। তাঁর জীবন এমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তাঁর কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এত কথা বলবার আছে যে সে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা অসম্ভব। তবে উপরে যতটা বলেচি তার থে.ক তাঁর জীবনের এবং কাব্যগ্রন্থের একটা মূল নীতি ধরা পড়বে—সেটি হচ্চে এই যে চির আচরিত প্রথা তাঁকে কোন দিন বাঁধতে পারে নি। হিন্দু পিতা মাতার সন্তান হয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং খ্রীষ্টীয় বালিকার পাণিপীড়ন এর প্রমাণ। এ ভাল কি মন্দ তা বলচি নে—শুধু এর থেকে এই প্রমাণ হয় বলিচি যে তিনি প্রচলিত প্রথার বহু উর্দ্ধে ছিলেন। কবি হিসাবে তিনি বিদ্রোহের কবি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যকে challenge করে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব দান দিয়ে যাবেন এই ছিল তাঁর পণ। এই জন্যই পাশ্চাত্য সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ পর্য্যন্ত তিনি পৌছুতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বলা বাহুল্য সফলও হয়েছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের যে basis তিনি সৃষ্ট করে গেছেন সে বাস্তবিকই অমূল্য। তাঁর জীবনের প্রতি একটু নিবিষ্ট হয়ে দৃষ্টিপাত করলে একটি স্বতঃবিরোধ চোখে পড়বে। আহারে, ব্যবহারে, পোষাকে, পরিচ্ছদে তিনি বিদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি হিন্দু। রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুইখানি মহাকাব্যকে তিনি প্রাণের মত ভালবাসতেন। এ প্রীতি তিনি ছোট বেলায় তাঁর মায়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা সত্বেও তাঁর বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র বিরোধ হয় নি। আর্থার হ্যালামের নাম যেমন টেনিসনের নামের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে, গৌরদাস বসাকের নামও তেমনি মাইকেলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। জীবন যাপনের প্রণালীতে বায়রণের সঙ্গে মাইকেলের সাদৃশ্য আছে। আর তাঁর সাহিত্যের আদর্শ ছিলেন মিল্টন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যুগ প্রবর্ত্তক—মাত্র বছর পাঁচেক তিনি পরিপূর্ণভাবে বাণীর সেবা করিতে পেরেছিলেন কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অমিত্রচ্ছন্দ, প্রহসন, ট্র্যাজেডি এবং সনেট সৃষ্টি করে গেছেন। প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা কেবল এই টুকুই বলতে পারি যে 'his name will live so long as the Bengali language and the Bengali race will live.' *

* মীরাট স্মৃতি-বাসরে পঠিত।

মায়ের দান

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

৬

পিতার মোটর খানা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই লেখা ছুটিয়া আসিল। হাতখানা কালি মাখা, মুখেও কতকটা কালি লাগিয়াছে; সে যে তখন লেখাপড়া করিতেছিল তাহার হাত মুখের কালি সে প্রমাণ দিতেছিল।

সুধীশ বাবু নামিতে নামিতে প্রশ্ন করিলেন, "ভাল আছিস তো লেখা?"

লেখা উত্তর দিল "হাঁ বাবা, তুমি কতদিন আস নি কেন? আমরা কত ভাবছি তোমার জন্য—"

সুধীশ বাবু কন্যাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার ললাটোপরি পতিত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আমার জন্যে বুঝি খুব ভেবেছিলি লেখা? তোর বাবা কি ছেলে মানুষ নাকি যে হারিয়ে যাবে? ভয় নেই রে, তোর বাবা হারায় নি, দেখ্‌ আবার ফিরে এসেছে।"

লেখা পিতার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা?"

পিতা তাহার শুভ্র ললাটে একটা স্নেহ-চুম্বন দিয়া বলিলেন, "আমি দেশে গিয়েছিলুম মা, কাল সবে ফিরে এসেছি, আজ তাই তাড়াতাড়ি তোকে দেখতে এলুম।"

বলিতে বলিতে কন্যার হাত মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "লেখাপড়া করছিলি বুঝি? হাতে মুখে কি কালিই মেখেছিস লেখা—এত কালি মাখলি কি করে বল দেখি?"

লেখা হাতের পানে তাকাইয়া একটু অবহেলার ভাবে বলিল, "দোয়াতটা উল্টে কালি পড়ে গেছে বাবা,—তা যাক গিয়ে। তুমি এসো, আমি মাকে বলি গিয়ে যে তুমি এসেছ।"

পিতার বাহুবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সুধীশ বাবু খানিক তাহার গমন-পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

পথেই দেখা হইয়া গেল অপর্ণার সহিত।

হাস্যমুখী অপর্ণা বলিল, "এই যে তুমি এসেছ। খুকি আমায় খবর দিয়ে বাড়ীর আর সকলকে খবর দিতে দৌড়েছে। আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন তোমায় দেখতে পায় নি কিনা, ওর ছটফটানি দেখে কে?

সুধীশ বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, রুমালে ললাটের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "সাত দিনের জায়গায় অনেক দেরী হয়ে গেছে। দিদি মোটে ছাড়তে চান না; বলেন অনেক কাল আস নি—এসেছ যখন কিছুদিন থাকো। তবু জোর করে চলে এসেছি।"

অপর্ণার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, সে খানিক অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "খুকির কথা কিছু বললেন?"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "তিনি পত্রেই বার বার বলছেন খুকিকে আমার কাছে রেখে যাও, আমায় পেয়ে সে কথা আর বলেন নি তাই ভাবছ?"

শুষ্ক কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "তুমি কি বললে যে খুকিকে দেবে?"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "ভয় নেই অপর্ণা, আমি ওকে তোমার বুক হতে ছিঁড়ে নিয়ে যাব না। খুকি তোমাকেই মা বলে জানে, তাই জেনে থাক্‌, আমি ওকে তোমার কাছ হতে নিয়ে গিয়ে তোমায় কষ্ট দেব না, ওকেও কোন কথা জানবার অবকাশ দেব না।"

অপর্ণার দুচোখ ভরিয়া খানিকটা জল আসিয়া দাঁড়াইল, কৃতজ্ঞ নেত্রে সে সুধীশ বাবুর পানে তাকাইয়া রহিল।

সুধীশ বাবু বলিলেন, "দিদি কিছুতেই ছাড়তে চান না, বলেন নিজে যেখানে থাকবে থাকো, মেয়েটাকে আমার কাছে এনে দাও। বললুম—আর দু বছর যাক্‌—এনে দেব।"

অপর্ণা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দু বছর বাদে তুমি খুকিকে নিয়ে যাবে সেখানে?"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "ছ বছরের এখনও ঢের দেরী আছে অপর্ণা, এর মধ্যে অনেক কিছু কাণ্ড ঘটে যেতে পারে যাতে করে ওকে তোমায় মোটেই ছাড়তে হবে না।"

শিহরিয়া অপর্ণা বলিল, "না না অনেক কিছু কাণ্ড হয়ে দরকার নেই, আমার যেমন চলছে তাই ভালো।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "না গো, আমি ভেবে দেখছি খুকিকে আমার কাছে রাখা উচিত নয়, ওকে ওর পিসীমার কাছে রাখাই ভাল। আমি ওকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি বলেই ওর মঙ্গল দেখতে চাই, ওর ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করতে চাই নে। মায়ায় জড়িয়ে পড়লেও বুঝতে তো পারি—আমার সংস্রবে থাকলে ওর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে, দুনিয়ায় ওর স্থান কোথাও থাকবে না; আমি যে বিশ্বের পরিত্যক্তা গো, দুনিয়ায় কোথাও যে আমার স্থান নেই, আমার মুখ দেখাবার যো নেই।"

অপর্ণার দুই চোখ দিয়া হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সুধীশ বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মুস্কিল, তুমি যে কাঁদিতে সুরু করলে অপর্ণা। কোথায় কি তার ঠিক নেই—"

অপর্ণা নিজেকে সামলাইয়া লইল, চোখ মুছিল কিন্তু মুখে আর হাসি ফুটিল না।

২

অপর্ণা একদিন ছিল প্রসিদ্ধা বাইজি। তাহাকে না চিনিত এমন লোক খুব কম ছিল। সেদিন তাহার নাম ছিল মুন্না বাইজি। সেদিন সে ছিল বিলাসিনী রূপ-গর্ব্বিতা একটী সাধারণ নারী, আজ সে মুন্না বাইজির মৃত্যু হইয়াছে, আজ সে গৃহস্থ বধূ অপর্ণা।

মুন্না বাইজির মৃত্যু ঘটিয়াছে সেইদিন—যেদিন মাতৃহীনা শিশু লেখাকে সে নিজের বুকে পাইয়াছিল।

লেখা সুধীশ বাবুর কন্যা। গৃহের প্রতি আকর্ষণ এ লোকটীর কোন দিনই ছিল না, মুন্না বাইজি কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার আশ্রয়ে ছিল। সুধীশ বাবু উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী, বেতন যথেষ্ট পাইতেন, বিলাসিনী মুন্নার বিলাস বাসনা সহজেই তৃপ্ত হইত।

সুধীশ বাবুর পত্নী যেদিন মারা যান সেদিন তিনি মুন্নার গৃহে ছিলেন। পত্নীর শেষ সময় জানিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কন্যাটিকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সাত মাসের মেয়েটীকে লইয়া সুধীশ বাবু বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ভগিনী তখন সুদূর রেঙ্গুনে থাকিতেন, এইটুকু মেয়ের ভার কাহার উপর তিনি দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ কর্ম্ম করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন।

ঠিক সেই সময় মুন্না আসিয়া তাঁহার কোল হইতে মেয়েটীকে নিজের কোলে তুলিয়া লইল, পিতার অনভ্যস্ত কোলে শিশু কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, মুন্নার কোলে গিয়াই চুপ করিল, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া তাহার মুখের উপর মুখখানা দিয়া পড়িয়া রহিল।

সুধীশবাবু নিস্তব্ধদৃষ্টিতে মুন্নার পানে তাকাইয়া রহিলেন। তিরস্কারের সুরে মুন্না বলিল, "মেয়েটাকে নাকি বিলিয়ে দিতে চাও? অবহেলা করে এর মাকে বিদায় দিয়েছ, মেয়েটাকেও বিদায় দেবে? আমায় দাও, আমি একে নেব।"

"নেবে,—তুমি নেবে মুন্না— ?"

সুধীশ বাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। চির বিলাসিনী মুন্না যে একটী শিশুর ভার লইতে চাহিবে তাহা তিনি আশা করেন নাই।

মেয়েটীকে বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে চাপড়াইতে মুন্না ধীর কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আমিই নেব আর কাউকে দেব না। তুমিও কিন্তু মেয়ে পাবে না, প্রতিজ্ঞা কর।"

সুধীশ বাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ওকে নাও মুন্না, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে ওকে তোমায় দিচ্ছি।"

মুন্না সেদিন ভবিষ্যতের পানে চায় নাই, সুধীশ বাবুও চান নাই, চাহিলে কন্যার ভার পতিতার হস্তে অর্পণ করিতেন না।

ইহার পর হইতে মুন্নার চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সুধীশ বাবু আর সহজে মুন্নার নাগাল পান নাই, মুন্না তখন যে মা, সে তো বিলাসিনী নর্ত্তকী নয়।

কোথা দিয়া কেমন করিয়া দিন গুলি যে কাটিয়া যাইতে লাগিল তাহা মুন্না জানিতে পারে নাই। আগে এই দিন গুলিই না কত দীর্ঘ ছিল,—সমস্ত দিন কেবল আপনার দেহের দিকে চাহিয়া গিয়াছে। কোন পোষাকটী পরিলে ভাল দেখায়, কোন অলঙ্কারটী কোথায় পরিলে মানায়, এই সব করিতে দিন গিয়াছে। নিত্য দশ বার রকমে চুল ফিরাইয়া তাহার তৃপ্তি হইত না, এখন একদিন দুইদিন সেই চুলে চিরুণীও পড়ে না। গন্ধ দ্রব্য, অলঙ্কার পত্র, পোষাক বাক্স আলমারীতে ঠাসা রহিল, মুন্না এক নূতন খেলায় উন্মত্ত হইল।

সুধীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি হচ্ছে মুন্না?"

মুন্না ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমায় মুন্না বলো না, মুন্না বাইজি মরে গেছে, তার জায়গায় জেগে উঠেছে লেখার মা অপর্ণা ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমায় আর মুন্না বলো না জগতের আর সবাই আমায় ভুলে যাক, খুকুর সামনে আমার তার মা হয়েই ফুটে উঠতে দাও গো।"

সে খুকুর মা হইয়াই রহিল। মুন্না বাইজীর নাম এই কয়টা বৎসরে লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে—সে এখন অপর্ণা—খুকুর মা ছাড়া আর কেহ নয়।

সুধীশ বাবু তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছেন, তাহাকে লোকে সুধীশ বাবুর পরিবার বলিয়াই জানে।—

৩

ভগিনীর নিতান্ত জেদে পড়িয়া অগত্যা সুধীশ বাবুকে স্বীকার করিতে হইল তিনি দুই দিনের জন্য লেখাকে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আনিবেন।

অপর্ণার নিকট কথাটা তুলিবামাত্র সে আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া উঠিল, চোখ দুইটী সে অন্য দিকে ফিরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধীশ বাবু বলিলেন, "তুমি যদি মত দাও অপর্ণা তবেই ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি, নচেৎ ওকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আমার নেই।"

অপর্ণার মুখে শুষ্ক হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তখনই তাহা মিলাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "কয়দিনের জন্য যাবে?"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "মাত্র পাঁচ দিনের জন্য।"

"ঠিক বলছো—?" অপর্ণার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল।

সুধীশ বাবু বলিলেন, 'মিথ্যা বলছিনে অপি, আমার কথায় বিশ্বাস কর।"

অপর্ণা গোপনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যদি আর ওরা ওকে না আসতে দেয়?"

হাসিয়া উঠিয়া সুধীশ বাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছ অপি, আমার মেয়ে,—তারা আটক করতে পারে কখনও?"

অপর্ণা মাথা দুলাইয়া বলিল, "তোমায় শুদ্ধ যদি আটক করে?"

সুধীশ বাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, অপর্ণার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সে ভয় মোটেই ক'রো না অপর্ণা, আমায় আটক করবার ক্ষমতা কারও নেই। দিদিকে বড় ভালবাসি, শুধু সেই জন্যই তাঁর কথা রাখছি। পনের বছর পরে দেশে ফিরেছেন; এখন একবার লেখাকে দেখতে চান সে কত বড়টি হয়েছে। ভয় কি অপর্ণা, আমি পাঁচ দিন পরে ঠিক লেখাকে ফিরিয়ে এনে তোমার কোলে দেব।"

মাত্র পাঁচ দিন!

কিন্তু এই পাঁচটা দিনই যে অপর্ণার কাছে পাঁচটি যুগ। যে দিন গুলি এত শীঘ্র—কোথা দিয়া কেমন করিয়া ফুরাইয়া যায় জানা যাইতেছে না, সেইদিন একটা নয়, দুইটী নয়, পাঁচটি,—উঃ, কতখানি দীর্ঘ হইয়াই না আসিবে? এ দিন কি সহজে কাটিবে?

সাত মাসের এতটুকু মেয়েটাকে সে কোলে তুলিয়া লইয়াছে, আজ সে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা। এই বারটা বছর কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে তাহা তো ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

পিসীমার কাছে যাইবে শুনিয়া লেখা আনন্দে নাচিতে লাগিল। মা যাইবে না শুনিয়া ঠিক তখখানি বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। মায়ের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া মায়ের চোখে জল দেখিয়া পিছাইয়া গেল। পিতাকে গিয়া ধরিল,—"বাবা, মা কেন যাবে না আমাদের সঙ্গে? মা না গেলে আমি যাব কি করে বাবা?"

সুধীশ বাবু কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে আদরের সুরে বলিলেন, "এবারটা তোমার মা এখানেই থাকবে মা, এর পরের বারে আমাদের সঙ্গে ওখানে যাবে।"

লেখার মুখ বড় বিমর্ষ হইয়া গেল।

অপর্ণা চোখের জল চোখে চাপিয়া লেখাকে বিদায় দিল। তাহার মনে একটা অমঙ্গলাশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল—হয় তো লেখাকে বড় দেখিয়া তাহার পিসীমা পতিতার নিকটে তাহাকে আর থাকিতে দিবেন না। তিনি তো জানেন মা—অপর্ণা এককালে পতিতা থাকিলেও আজ সে—

অপর্ণা চমকাইয়া উঠিল,—আজ সে কি? যাহাই কেন হোক না, যত পুণ্য কাজই সে করুক না, তবু সে যে পতিতা সেই পতিতাই আছে।

উত্তর বঙ্গের ক্ষুদ্র একটী পল্লীগ্রাম—

লেখা পিতার সহিত এখানে আসিল বটে, তাহার আনন্দ উৎসাহ কিছুই ছিল না। জনৈকা বৃদ্ধা বিধবা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া চুম্বন দিয়া বলিলেন, "এসো মা, নিজের ঘরে এসো।"

তাহার পর সুধীশ বাবুর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে কি ক্যাগানই শিখিয়েছিস্ সুধীশ, বেশ্যার কাছে মানুষ, হাল চাল তারই মত শিখবে তো, ভদ্র সহবৎ সেখানে কোথায় মিলবে? মেয়ে যে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিয়ে ফেললেই ভাল হয়। আর সে মাগীর কাছে রাখিস নে বাপু, আমার কাছে থাক।"

লেখা বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ব্যস্ত সুধীশ বাবু বলিলেন, "না না দিদি, সে তেমন মেয়েই নয় যে—"

মুখ বিকৃত করিয়া ভগিনী বলিলেন, "তুমি থামো বাপু, চিরকাল শুনে আসছি মুন্না বাইজি, আজ সে হয়ে গেল সতী সাবিত্রী, আজ সে ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে বউ। শুনলে যে গা জলে যায়।"

আর্তকণ্ঠে লেখা বলিয়া উঠিল, "বাবা, কলকাতায় চল, আমি এখানে থাকব না,—থাকতে পারব না। আমার প্রাণ এখানে হাঁপিয়ে উঠছে—"

বলিতে বলিতে সে পিতার বুকে মুখ লুকাইল।

তাহার মায়ের নামে এ অপবাদ সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। হোক না কেন পিসীমা, তাহার মায়ের সমান তো কেহ নয়।

কিন্তু মুন্না বাইজি,—সে কে? তাহার মা, তিনি যে অপর্ণা দেবী, তিনি যে তাহার মা, আর তো কিছুই নহেন।

পিতা গোপনে কন্যাকে বুঝাইলেন, "আর দুদিন বই তো না মা; কোন রকমে এ দুটো দিন কাটিয়েই তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব।"

যে কয়দিন লেখা রহিল সেই কয়দিনই সে পিসীমার মুখে অনবরত মায়ের কুৎসা শুনিতে পাইত, পিসীমা স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যাহাকে সে মা বলিয়া ডাকে সে তাহার মা নয়, তাহার পিতার রক্ষিতা একটী পতিতা নারী মাত্র। প্রথম যৌবনে সে বাইজি ছিল—মুন্না বাইজি।

লেখা অভিভূতার ন্যায় পিসীমার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া গেল। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র, সংসারের কোন কিছু আজও সে জানে না, অপর্ণা তাহাকে এতটুকু কোন বার্তা জানায় নাই, এখনও সে পাঁচ বছরের মেয়েটীর মত পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। পিসীমা গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন এত বড় মেয়ের এখনও ফ্রক পরিয়া খুকির মত বেড়ানো উচিত নয়, বাপের কোলে অমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া দেখিতেও বড় বিশ্রী ঠেকে।

দেখিয়া শুনিয়া লেখার চোখে জল আসিতে লাগিল, মা কেন জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে এখানে পাঠাইল? কলিকাতায় ফিরিয়া সে যদি ইহার শোধ না লয় তাহার নাম লেখাই নয়।

৪

পাঁচ দিনের স্থানে দশ দিন কাটাইয়া সুধীশ বাবু কন্যা সহ কলিকাতায় ফিরিলেন।

অপর্ণার তিলমাত্র শান্তি ছিল না। তাহার আশঙ্কা বুঝি সত্য হয়, সুধীশ বাবু বুঝি লেখাকে আর তাহার সংস্পর্শে সত্যই রাখিতে চান না। যতদিন উপায়ান্তর ছিল না ততদিন বাধ্য হইয়া তাহার কাছে লেখাকে রাখিয়াছিলেন, এখন ভগিনী আসিয়াছেন, লেখাও বয়স্থা হইয়াছে।

লেখা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অপর্ণা তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া লেখার মাথায় পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ দিয়া একটী শব্দ বাহির হইল না।

এ দৃশ্য সুধীশ বাবুকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল; খানিক নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কাঁদছ কেন অপর্ণা? তোমার লেখা তো তোমার কাছেই ফিরে এসেছে, তবে দুদিন দেরী হ'য়ে গেছে এই মাত্র—"

অঞ্চলে অশ্রু জল মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "তা হোক দুদিন দেরী, আমি তার জন্যে এতটুকুও ভাবি নি। আমি ভাবছিলুম কেবল—যদি তাঁরা লেখাকে আর না আসতে দেন,—"

সুধীশ বাবু বিষণ্ণ ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি হতে পারে অপর্ণা?"

অপর্ণা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "খুব হতে পারে গো, খুব হতে পারে। মেয়ে যে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, আর দুদিন বাদে ওর বিয়ে দিতে হবে যে।"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "ও চিরকাল লেখাপড়া করুক অপর্ণা, আমি ওর বিয়ে দেব না। কি হবে বিয়ে দিয়ে,—আজকাল যে অনেক মেয়েই বিয়ে করে না, লেখাপড়া করে জীবন কাটায়।"

অপর্ণা শিহরিয়া উঠিল—তাহার জন্য লেখার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে?

ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "না না, তাও কি কখনও হতে পারে, আমার কাছ ছাড়া হবে বলে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না?"

পর মুহূর্ত্তে শুধু হাসির একটু রেখা মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "তুমি আমায় এমনি মেয়ে ভেবো না গো যে নিজের কাছে রাখব বলে মেয়েটার ভবিষ্যৎ এমন করে নষ্ট করে ফেলব, আমি এমন স্বার্থপর নই। ওকে না হয় গর্ভেই ধরি নি, মানুষ করেছি তো মায়ের মতই, ও তো আমায় মা বলেই জানে। ওর জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, ওর মুখে হাসি ফুটাতে আমি মরতে পারি। তুমি ও কুচিন্তা আমার মনে জাগিয়ে তুলো না, আমার মনে জাগাও—আমি ওর মা, ওর মঙ্গলের জন্যে আমার সবই করতে হবে।"

হায় পতিতা নারী!

সুধীশ বাবুর চোখ দুইটী জ্বালা করিতে লাগিল।

লেখা এবারে একটু যেন গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে, অপর্ণার চোখে সে ভাব চট করিয়া ধরা পড়িয়া গেল।

নিজের কাছে মেয়েটাকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অপর্ণা বলিল, "তোর কি হয়েছে লেখা, এমন মন মরা হয়ে আছিস কেন?"

লেখা উত্তর দিল না, দুই হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।

জোর করিয়া তাহার মুখখানা তুলিবার চেষ্টা করিয়া অপর্ণা বলিল, "এমন করে পড়ে রইলি কেন লেখা, ওঠ্, মুখ তোল্।"

লেখা মুখ তুলিল, তাহার চোখে অশ্রুধারা।—

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া অপর্ণা বলিল, "একি, তুই কাঁদছিস লেখা? তোর কি হয়েছে মা, কেউ কিছু বলেছে?"

রুদ্ধকণ্ঠে লেখা বলিল, "হ্যাঁ মা, ওরা বলেছে—"

সে থামিয়া গেল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কারা, তোর পিসীমারা? কি বলেছে বল দেখি?"

"ওরা বলে মা—যে তুমি নাকি বাইজি ছিলে, তোমার নাম ছিল মুন্না। তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে নও, বাবা তোমায়—"

রুদ্ধকণ্ঠে সে মায়েব বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল। হ্যাঁ,—এতটুকু মেয়ে, সংসারের কি জানে সে, তাহার কানেও ঐ কথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে? হায়রে, জগতে মানুষ না পারে কি? বার বছরের মেয়ে, তাহার হৃদয়খানা স্বচ্ছ দর্পণের মত, এই মনের উপরও তাহারা কালি লেপিতে চায়।

জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অপর্ণা বলিল, "পাগল মেয়ে, সেই কথা শুনে মন তোর খারাপ হয়ে গেছে? মুন্না বাইজি কি আর আছে মা? সে একজন ছিল, অনেক কাল হলো মরে গেছে। আমি যে তোর মা লেখা, আমায় কি বাইজির মত দেখায়? ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে?"

লেখা চোখ মুছিয়া চাহিল। অপর্ণার সীমন্তে সিন্দুর জ্বলিতেছে, দুটি হাতে শুধু লাল শাঁখা, মুখে শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী।

লেখার মন ভক্তি শ্রদ্ধায় আর্দ্র হইয়া উঠিল, সে দুই হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর মুখখানা রাখিয়া বলিল, "না না মা, ওরা মিছে কথা বলেছে। তুমি যে আমার মা, তুমি যে কেবল আমার মা, আর কিছু নও।"

অপর্ণার চোখ দিয়া জল গলাইয়া পড়িল।

দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বৎসরের পর বৎসরও কাটিয়া যাইতে লাগিল; লেখা ক্রমেই বড় হইয়া উঠিল, সপ্তদশ বর্ষীয়া লেখা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে আই-এ পড়িতে আরম্ভ করিল।

অপর্ণা সুধীশ বাবুকে বলিল, "ওর বিয়ে দেবে কিনা, তোমার ইচ্ছেটা কি বল দেখি শুনি?"

সুধীশ বাবু বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

অপর্ণা বলিল, "সতের আঠার বছরের হল, আরও কি আইবুড়ো করে রাখতে চাও?"

সুধীশ বাবু নিঃস্তব্ধে তামাক টানিতে লাগিলেন। অপর্ণা রাগ করিয়া বলিল, "দেখ, শুধু নিজেদের সুবিধে বুঝলেই তো চলে না, মেয়ের দিকেও চাইতে হয়।"

সোজা হইয়া বসিয়া সুধীশ বাবু বলিলেন, "কিন্তু তোমায় কি রকম অপমান সইতে হবে তা কোনদিন ভেবে দেখেছ অপর্ণা?"

অপর্ণার মুখখানা সাদা হইয়া গেল,—"অপমান?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুধীশ বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ অপমান। আমার মেয়ের বিয়ে আটকাবে না অপর্ণা, আমার মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা, তারপরে প্রচুর অর্থশালিনী। যে কোন পাত্র আমার লেখাকে সানন্দে বরণ করে নিয়ে যাবে, কিন্তু তুমি,—তোমার কি হবে অপর্ণা?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া অপর্ণা বলিল, "লেখাকে ছেড়ে থাকার কথা বলছ? ওঃ, তা আমি খুব থাকতে পারব? দুনিয়ার মেয়ে জন্মালেই তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে, মা বাপকে তাকে ছেড়ে দিতেই হয়, এতে বিচিত্রতা কি? মেয়ে সুখে থাকবে সেই কথাটুকুই যে মা বাপের সান্ত্বনা।"

সুধীশ বাবু মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "সেটা পরের কথা, কিন্তু বিয়ের সময় তোমায় কতখানি অপমান সইতে হবে তা জানো অপর্ণা? তুমি লেখার মা, কিন্তু জগৎ তাতো জানে না, জগৎ জানে তুমি মুন্না বাইজি, তুমি আমার রক্ষিতা মাত্র। বিয়ের সময় সে বাড়ীতেও থাকবার অধিকার তোমার তো নেই অপর্ণা, মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকারও তো তোমার নেই। নিম্পরের মত দূর হ'তে দেখে তুমি চলে যেতে পারবে মাত্র, কাছে আসতে পারবে না।"

অপর্ণা বদ্ধ নেত্রে সুধীশ বাবুর পানে তাকাইয়া রহিল। এই বুঝি তাহার প্রথম মনে হইল—এই কথাই সত্য, যথার্থই তাহার কোন অধিকার নাই। রুক্ষ-প্রকৃতি পিসীমা—যিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর পানে কোন দিন ফিরিয়াও চাহেন নাই, তবু সব কিছুতে তাঁহারই অধিকার আছে, আর সে? সে নিজের বুকের সমস্ত ভালবাসার স্নেহ রস নিংড়াইয়া লেখাকে পান করাইয়াও কোন অধিকার পায় নাই। কত বিনিদ্র রাত্রি লেখাকে বুকে ধরিয়া সে অতিবাহিত করিয়াছে, লেখার অসুখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, লেখাকে কেহ নিন্দা করিলে কাঁদিয়াছে, প্রশংসা করিলে তাহার বুক দশ হাত হইয়াছে, তথাপি—তথাপি লেখার উপর তাহার কোন অধিকার নাই; অধিকার আছে পিসীমার।

গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অপর্ণা চলিয়া গেল।

ইহারই মাস তিনেক পরে গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষে লেখার পিসীমা আরও দু-চার জন কুটুম্ব লইয়া যখন ভাইয়ের বাসায় আসিয়া উঠিলেন, তখন অপর্ণার অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এই পতিতা ঘৃণিতা নারীর পানে পিসীমা ফিরিয়াও চাহিলেন না, সে যে বাড়ীতে আছে তাহা যেন তাঁহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। অপর্ণা তাঁহার ঘৃণা বুঝিল, সঙ্কোচে তাহার সারা অন্তরটা ভরিয়া উঠিল, সে সব ছাড়িয়া নিজের ঘরটি আশ্রয় করিল।

ভগিনী ভাইয়ের বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "হাঁরে, একি চেহারা হয়েছে তোর, একেবারে যে কাঠখানা হয়ে গেছিস। যে ডাইনি ঘরে রয়েছে, হবে না,—ওকে চুষে খাচ্ছে।"

বলিতে বলিতে সক্রোধে তিনি অপর্ণার ঘরের পানে তাকাইলেন। একটু ভাবিলেন না এই ডাইনি তাঁহার ভ্রাতার স্কন্ধে আজ কুড়ি বাইশ বৎসর ভর করিয়া আছে।

তাহার পর লেখাকে লইয়া পড়িলেন।

"করছিস কি সুধী, সতের আঠার বছরের মেয়ে হল, আজও বিয়ে দিস নি,—আর কি ও মেয়ের বিয়ে হবে? ওই পতিতার কাছে এই সোমত্ত মেয়ে রাখা—কোন বাপে পারে? তোর যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে, ওসব মাগীরা না পারে এমন কাজ আছে? যাক গিয়ে, আমাদের রমেন ভঞ্চায জমীদার, তিনি তাঁর ছেলে প্রতীশের সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দিতে চান। তিনি নাকি আগেই মেয়ে দেখেছেন, তাঁদের সবারই ঝোঁক। তোর যদি মত হয়, এই সামনের অগ্রাণে ৩রা তারিখে যে দিনটা আছে ওই দিনে বিয়ে দিয়ে ফেলি। বিয়ে করে রেখে ছেলে বিলেতে যাবে, মেয়ে স্বচ্ছন্দে এখানে তোর কাছে পড়তে পারবে। তোর অমত আছে কিছু—বল?"

রমেন্দ্রনাথের পুত্র প্রতীশ,—কতবার সুধীশ বাবু মনে করিয়াছিলেন যদি এই ঘরে মেয়েটাকে দিতে পারেন। এমন পাত্র পাওয়া দুর্ল্লভ।

আনন্দোৎফুল্ল মুখে তিনি বলিলেন, "এতো আমার সৌভাগ্য দিদি, আমার লেখা এমন কি সৌভাগ্য করেছে যে সে রমেন বাবুর পুত্রবধূ হতে পারবে?"

দিদি বলিলেন, "তবে তেসরা অগ্রাণই দিন ঠিক হোক। আমার তো বাপু এত বড় মেয়ে দেখে গায় জ্বর আসছে। যাক, সু-ভালভালি বিয়েটা হয়ে গেলে বুঝব মেয়েটার কপালের জোর আছে। কিন্তু একটা কথা, বুঝলি সুধী, ও মাগীকে বিয়ের অনেক আগেই এ বাড়ী হতে দূর করে দিতে হবে। রমেন বাবু যে রকম লোক, তাতে যদি শুনতে পান এক মেম্বের কাছে মেয়ে মানুষ হয়েছে, সে মেম্বে এখনও এ বাড়ীতে গিন্নি হয়ে আছে, তা হলে কক্ষনো বিয়ে দেবেন না।"

সুধীশ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন

উত্তেজিত ভাবে ভগিনী বলিলেন, "তুই ভাবছিস কি বল দেখি? নিজে অধঃপাতে গেছিস,—যা, মেয়েটার ভবিষ্যৎ এমনি করে নষ্ট করবি, ওকে সংসারী হতে দিবি নে? কোন ভদ্রলোক এমন আছে কে এ রকম কথা শুনেও এ মেয়েকে নিজের ঘরে নিতে চায়? চারদিকে এখনও এ কথা ছড়ায় নি, কিন্তু ছড়াতে কতক্ষণ বল দেখি?"

মাথা চুলকাইয়া সুধীশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দেখি, কতদূর কি করতে পারি?"

অপর্ণার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে একটা বাক্সে কাপড় গুছাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিল, "আমি আজ চলে যাচ্ছি।"

"চলে যাচ্ছো,—কোথায় যাচ্ছো অপর্ণা?"

সুধীশ বাবু বসিয়া পড়িলেন।

অপর্ণা তেমনি হাসিমুখেই বলিল, "আমার বাড়ী যাচ্ছি রামদীনকে পাঠিয়েছি তেতালার ঘরটা ঠিক করে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে আসবে।"

"অপর্ণা—" সুধীশ বাবুর মুখে আর কথা ফুটিল না। ধীর পদে অপর্ণা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাঁহার কাঁধের উপর হাতখানা রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আর কোন কারণে হ'লে যেতুম না, কারও ক্ষমতা হতো না যে আমার জায়গা হতে আমায় তাড়ায়। কিন্তু এ যে লেখার শুভ, আমায় যে যেতেই হবে, লেখার অমঙ্গল আমি তো সইতে পারব না। বাস্তবিকই তো, আমি যাই হই,—আমি যে পতিতা, আমি যে মুন্না বাইজি। একদিন আমি যে রূপের ব্যবসা করেছি একথা আমি আজ ভুলতে গেলেও লোকে ভুলবে কেন? পতিতা,—সে এককালে ভুল করে তার পরে যদি ধর্ম্মপথেও চলে, তবু যে সে পতিতাই থাকে গো, আজ তুমি তা ভুলে যাচ্ছো কেন?"

সুধীশ বাবু নতমুখে বসিয়া রহিলেন, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি লেখার বিয়ে দেব না অপর্ণা।"

সান্ত্বনার সুরে অপর্ণা বলিল, "পাগলামী ক'র না, নিজেদের স্বার্থের দিকে চেয়ে মেয়েটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবে, তা আমি সইতে পারব না। লেখা কলেজে গেছে, আমি এর মধ্যেই চলে যাব। সে যখন ফিরবে তখন—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে কাঁদিয়া ফেলিল।

রামদীন আসিয়া জানাইল ট্যাক্সি আসিয়াছে।

চোখ মুছিয়া অপর্ণা বলিল, "বাক্সটা নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি।"

প্রণাম করিতে গিয়া সে সুধীশ বাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

৬

শূন্ত ঘরে পড়িয়া থাকিয়া অপর্ণার দিন কাটে।

উঃ, কি অন্ধকার, কি অন্ধকার! অপর্ণা হাঁপাইয়া উঠে। আলো কই,—আলো?

কোনক্রমে এই অন্ধকারের জাল ছিঁড়িয়া সেই উজ্জ্বল আলোর মধ্যে যাওয়া যায় কি?

না না, এ কি কল্পনা সে করিতেছে, সেখানে তাহার অধিকার কই? সে যে পতিতা, ঘৃণিতা, বিশ্বের পরিত্যক্তা, সে তো উহাদের কেহ নয়। সে যে অন্ধকারের জীব, অন্ধকারেই তাহাকে থাকিতে হইবে।

মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া অপর্ণা ডাকিল, "নারায়ণ, আমি যে আঁধারের জীব, আঁধারেই থাকব, তাই তো জানতুম; তবে কেন আমায় আলোর মাঝে টেনে নিয়ে গেলে, আবার সে আলো হতে আঁধারে এনে ফেললেই বা কেন? আমি যা চাইনি তা কেন আমায় দিলে, দিয়ে আবার কেড়ে নিলে কেন প্রভু?"

বিবাহের দিন তেসরা অগ্রহায়ণ, আজ আটাশে কার্ত্তিক। মাঝে আর কয়টা দিন আছে? অপর্ণা হিসাব করিয়া দেখিল মাঝে আর তিন চার দিন আছে মাত্র, বিবাহের জিনিস পত্র তাহাকে এই বেলাই কিনিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে।

অভাগিনী অপর্ণা!

এ কয়দিন আহারে বসিয়া সে কাঁদিয়া উঠিয়া গিয়াছে, রাত্রে শুইয়া কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়াছে। বুকের কাছে লেখা কই, বুক যে শূন্ত!

রামদীনকে সঙ্গে লইয়া সে বিবাহের উপহার দ্রব্য কিনিতে বাহির হইল।

পছন্দ করিয়া এক রাশ জিনিসপত্র কিনিয়া সে বাড়ীতে ফিরিল যখন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অপর্ণার কিছু অলঙ্কার নাই থাক, বাইজি মুন্নার অলঙ্কার বড় কম ছিল না। এই তিন প্রস্থ অলঙ্কার সে গুছাইল, কাপড় জামা প্রভৃতি গুছাইল, তাহার পর গাত্র হরিদ্রার দিনে রামদীনের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

অধিকার নাই, তাহার কিছুতেই অধিকার নাই। এতক্ষণ সে বাড়ীতে গাত্র হরিদ্রার আয়োজন চলিয়াছে, আজ সন্ধ্যায় বিবাহ। সকলেই দেখিতে পাইবে, দেখিবার অধিকার নাই শুধু তাহার,—কেন না সে পতিতা—সে ঘৃণ্যা।

দুই হাতে মুখখানা চাপিয়া সে পড়িয়া রহিল। সেদিন সে উঠিল না, আহার করিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল, অপর্ণার কাণে ঘড়ির শব্দ আসিতেছিল, —আসিতেছিল মাত্রই।

"মা—"

প্রবল ঝড়ের মতই কে আসিয়া পড়িল, একেবারে তাহার পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

"কে রে, কে তুই—লেখা?"

অপর্ণা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কতক্ষণ উভয়ের কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

অনেকক্ষণ পরে আত্ম সম্বরণ করিয়া অপর্ণা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এ কি করলি লেখা, কার সঙ্গে তুই এখানে এলি? যে জন্যে আমি সব ছেড়ে চলে এলুম, শেষে তুই তাই করলি হতভাগি? তাঁরা যদি জানতে পারেন—"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লেখা বলিয়া উঠিল, "তা জানুক মা, বিয়ে দেবে না! সে তো আমারই ভাল হবে, আমায় মা ছাড়া হয়ে থাকতে হবে না। তুমি আমায় কিছু না বলে লুকিয়ে চলে এসেছ, সকলকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেউ বললে না তুমি কোথায় গেছ? আজ রামদীনের কাছে খবর পেয়ে আমি ছুটে এসেছি। তুমি আমায় এতটুকু ভালবাসনা মা, যদি ভাল বাসতে তা হলে কি আমায় না বলে—

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে অপর্ণার বুকে মুখ লুকাইল।

অপর্ণা স্তব্ধ হইয়া বলিল, "তোমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে লেখা, আমি তোমার মা নই তা শুনেছ কি?"

লেখা নীরবে পড়িয়া রহিল।

অপর্ণা বলিল, "আমি কে—সে পরিচয় দিতে গেলে আমারই মাথা আজ নুয়ে পড়ে। আমি কে, আমি এক পতিতা স্ত্রীলোক, যার ইহকাল আছে পরকাল নেই, যার —যার জীবনে কেবল রাশি রাশি পাপই অর্জ্জন করতে হয়, পুণ্য এতটুকু সঞ্চয় করতে পারি নি। না লেখা, আমি তোমার মা নই, তোমায় মানুষ করেছি এই মাত্র। আমি তোমায় আমার কাছে আর রাখতে পারব না, আমার হাওয়ায় তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিতে পারব না। আজ তোমার বিয়ে, তুমি বাড়ী হতে চলে এসেছ,—এতক্ষণ বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেছে। তোমার সন্ধানে এতক্ষণ লোক ছুটেছে, কেউ এসে যদি তোমায় এই বাড়ীতে দেখতে পায়, জানো তোমার অদৃষ্টে কি ঘটবে? ওঠো, তোমায় এখনি ফিরে যেতে হবে, ওঠো, আর দেরি করো না, ওদের আসার আগেই তোমার বাড়ী যাওয়া চাই।"

লেখা উঠিল না, মুখ তুলিয়া অপর্ণার পানে চাহিল, কাঁদিয়া বলিল, "আমি বিয়ে করব না মা—"

রুদ্ধস্বরে অপর্ণা বলিল, "সে কথা আমার কাছে কেন, আমি তোমার কে—কেউ নই। তোমার বাপের কাছে সে কথা বল গিয়ে, যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার কাছে বলে কি ফল হয়ে লেখা? ওঠো, আমি এখনি তোমায় পাঠিয়ে দেব, এ বাড়ীতে তোমায় আর এক মিনিট থাকতে দেব না।"

লেখার চোখ দিয়া শুধু জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, অপর্ণা সে দিকে চাহিল। তখনই রামদীনকে দিয়া একখানা ট্যাক্সি আনাইয়া তাহাতে লেখাকে তুলিয়া দিল।

লেখা দুই হাতে মুখ চাপিয়া বসিয়া রহিল। অপর্ণা রামদীনকে বলিয়া দিল, "পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে, বলো না যেন আমার এখানে এসেছিল।"

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

টলিতে টলিতে অপর্ণা নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

অন্তরের উচ্ছ্বাস আর বাধা মানে না।

লেখা লেখা—; সে যে তাহাকে বড় ভাল বাসে, তাহাকেই মা বলিয়া জানে। আজ সন্ধান পাইয়া কোন দিকে চায় নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে।

এই জন্মের মত দেখা: আজও লেখা অপর্ণার ছিল, কাল হইতে সে অপরের, তাহার উপর আর কাহারও অধিকার নাই।—

লেখা—লেখা—

অপর্ণা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দিনের পরে দিন যায়, মাসের পরে মাস যায়, বৎসরের পর বৎসর আসিল, গেল।

লেখা সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ।

শিক্ষিত রূপবান স্বামী তাহার, দেবতার মত শ্বশুর, দেবীর মত শাশুড়ি।

মায়ের স্নেহ মনে প'ড়ে লেখার চোখ ছল ছল করে।

মা শব্দটা মুখে আসিতেই লেখা চমকাইয়া উঠে। মা,—কে তাহার মা? তাহার মা কেহ নাই, যাহাকে সে চিরকাল মা বলিয়া ভাবিয়াছে, সে তাহার মা নয়।

সুধীণ বাবু লেখার বিবাহের পর ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন, লেখা আর সেদিককার কোন খবর পায় না।

সেদিন প্রভাতে সে স্নানান্তে টেবিলটা গুছাইতে ছিল, স্বামী একখানা পত্র আনিয়া সম্মুখে ফেলিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমায় কে পত্র দিয়েছে।"

"আমার পত্র—"

লেখা সচকিত ভাবে পত্রখানা তুলিয়া লইল। তাড়াতাড়ি কভারটা ছিঁড়িতেই পত্রখানা বাহির হইয়া পড়িল।

পত্রের নীচে নাম নাই, তথাপি হাতের লেখা দেখিয়াই লেখা চিনিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে পত্রের পানে তাকাইয়া রহিল।

পত্রে লেখা আছে—

লেখা, অনেকদিন পরে পত্র দিচ্ছি। মা আমার, সেদিন তোকে ভুল বুঝিয়েছিলুম আমি তোর মা নই, ওরে, তাই কি হতে পারে? আমি ছাড়া আর কে তোর মা হতে

পারবে ? আমি তোর মা, সেই জন্মেই তোর জীবনটাকে ব্যর্থ হতে দিতে পারি নি, তোর জীবনকে সফলতায় ভরিয়ে দিতে তোকে অমন ভাবে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

মা আমার, আমার দিন শেষ হয়ে গেছে, আমার যা কিছু সব তোকে দিয়ে গেছি, উইল হয়ে গেছে, আমার উকিলের কাছে পাবি। তিনি তোর মামা শ্বশুর,—আজকালই তোকে সব বুঝিয়ে দেবেন।

পতিতার জিনিস নয় মা, এ তোর মায়ের দান ঘৃণা করে ফিরিয়ে দিস নে, হাত পেতে নিস। আমার জন্যে প্রার্থনা করিস্ লেখা, যেন পর জন্মে তোকে গর্ভে ধরবার যোগ্যতা নিয়ে জন্মাই। এ জন্মে আমার বড় কষ্ট থেকে গেছে, আমি মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি নি। আমার মরণ-শয্যার পাশে তোকে পেলুম না, এ কি আমার কম কষ্ট মা। আশীর্ব্বাদ করে যাই—তুই সুখী হ'।

লেখা পত্রখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, আর্ত্তকণ্ঠ চিরিয়া একটা মাত্র শব্দ ফুটিয়া উঠিল—মা, আমার মা—

চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল্।

নিমতলার শ্মশানে তখন অভাগিনী অপর্ণার শব চিতায় দিয়া তাহার মুখে অগ্নি দিবার ব্যবস্থা চলিতেছিল।

গান

[শ্রীঅরুণকুমার সেন]

কোন্ সুদূরের পথিক তোমার অধর দীপ্তিময় ?
একদা প্রভাতে তব সাথে মোর ক্ষণিকের পরিচয় !
মনের গোপন-পুর
সুধারসে ভরপূর !
তব সনে করি পরশনে কত আলাপন অনুনয়,
আননে তোমার খেলা করে হেরি দয়া-দান-লাজ-ভয়।

আয়োজনহীন উৎসবে মোর তোমার নিমন্ত্রণ ;
সুদূর অতিথি কি দিয়ে পূজিব তাই ভাবি সারাক্ষণ।
সঙ্কোচে হই ক্ষীণ
পূজা যে পুষ্পহীন !
সকলি আমার ভীরু উপহার কি দিয়ে বা রাখি মন ?
শেফালি-মাল্য পরাই তোমার কণ্ঠের আভরণ।

অবহেলে তুমি ফিরাও সে মালা ছিঁড়ে তারে ফেলে দাও।
নয়নে তোমার অপমান-রেখা মনে যেন ব্যথা পাও।
লজ্জায় আমি মরি !
তুমি কহ সুরে ভরি :—
"চাহিনাক মালা, চাহি না অর্ঘ্য, চাহিনাক মান তাও,
আপন হিয়ার অরূপ-রতন পার যদি তাই দাও।"

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনী

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত]

মহাপুরুষদিগের জীবনে এইটী দেখিতে পাই যে কাহারও শক্তি জীবনের প্রথমেই প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হয়। অল্প দিনের মধ্যে নিজের প্রতিভাবলে নানাবিধ কার্য্য করিয়া জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান। ইহাকে বলে early development বা জীবনের প্রথমাবস্থায় শক্তির বিকাশ। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে ভিতরে মহতী শক্তি থাকিলেও বাহ্যিক নানা কারণ বশতঃ সেই শক্তি প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হইবার কোন উপায় থাকে না। জীবনের প্রথম অবস্থাটা সাধারণ লোকের ন্যায় নগণ্য হইয়া থাকে। কেবল মাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল লোকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশংসা করিয়া যান। তবে সাধারণ লোকের নিকট নগণ্য হীন লোক বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু কালক্রমে যখন সময় আসে, নানাবিধ অন্তরায় কিঞ্চিৎ বিদূরিত হয় সেই সময় অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত শক্তি প্রজ্জ্বালিত হইয়া সকলকে বিমোহিত করে।

ঠিক্ যেন পূর্ব্ব দিনে অৰ্দ্ধ সুপ্ত ছিলেন, প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গের পর জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ইহাকে বলে late development বা পরবর্ত্তী কালে শক্তির বিকাশ। বহু মহাপুরুষেরই জীবনের শেষভাগে শক্তি বিকশিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র জীবন পর্য্যালোচন করিলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বা পরে শক্তি বিকশিত হওয়ায় কিছুই আসিয়া যায় না। শুধু লক্ষ্যের বিষয় এই যে অন্তরাত্মা সেই বিশিষ্ট দেহ হইতে জগতের কল্যাণের জন্য কিরূপ শক্তি বিকাশ করিয়াছে। এই জীবনীতে ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

প্রথম সাক্ষাৎ—১৮৭৬

ইং ১৮৭৬ সালে কলিকাতা ৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটে একটী যুবক বাবু আসিতেন। আমার ছোট কাকা তারকনাথ দত্তের কাছে ওকালতীর কাগজপত্র লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া মামলা মোকর্দ্দমার কথা কহিয়া নীচে আসিয়া সাধারণ ভাবে সকলের সহিত কথা বার্ত্তা করিতেন। চেহারা হ্রস্বও নয়, দীর্ঘও নয়, মাঝামাঝি। শরীর সুগঠিত ও সৌম্যমূর্ত্তি, রং সুন্দর, বিশিষ্ট ভাবে উজ্জ্বল, পরণে কোচান ধুতি এবং বাম স্কন্ধে কোচান উড়ানি, বক্ষের উপর উপবীত। গ্রীষ্মকাল, এইজন্য গায়ে পিরান বা অন্য কিছু আবরণ থাকিত না। লোকটীকে দেখিলেই সকলের তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িত। কথাবার্ত্তা সব সময় হাসিমুখে এবং সকলের সহিত যেন আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা।

এইজন্য আমরা সকলেই লোকটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সরকারদিগের ঘর হইতে কখনও কখনও তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিত, তিনি হুকা টানিতেন এবং দালানে তক্তপোষে বসিয়া প্রায়ই নাকে নস্য লইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নস্য লইতে শিখাইতেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত উকিল এবং ছোট কাকা তারকনাথ দত্ত উকিল, বাড়ীতে সর্ব্বদাই বহু লোক আসিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের কারু বড় ঘনিষ্ঠতা বা মেশামিশি কিছুই হইত না। কিন্তু এই ব্যক্তির সহিত আমাদের বেশ একটা আত্মীয়তা হইল। তখন আমার বয়স অল্প। ৭।৮ বৎসরের অধিক হইবে না। পরে জানিলাম এই ব্যক্তির নাম দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফের কর্ম্মচারী এবং জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া আসিয়া মামলার পরামর্শ লন। কিন্তু লোকটীকে দেখিতাম বাহিরে যেন জমিদারের কর্ম্মচারী মামলা মোকদ্দমা নিয়া আসিয়াছে। এবং কার্য্য বশতঃ সেই সংক্রান্ত কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু ভিতরটা দেখিলাম ভালবাসায় ভরিয়া রহিয়াছে। কাহারও প্রতি বিশিষ্ট ভাবে নহে, সকলের প্রতি সেই ভালবাসা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে সেই ভালবাসা বিকশিত হইতে পারিতেছে না। লোকটা যেন

মরমে মরিয়া রহিয়াছে। ছোট শিশু এই সকল ভাব অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারে। অন্তর শুষ্ক হইলে শিশু তাহার কাছে যায় না। অন্তর স্নেহপূর্ণ হইলে শিশু সেই ব্যক্তির কাছে যায়। এইটী হইতেছে মানুষ পরীক্ষা করিবার বিশেষ যন্ত্র। দেবেন বাবুর এই আকর্ষণী শক্তি আমরা অতি শৈশবেই অনুভব করিতাম। কখন তিনি ছোট কাকার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিবেন তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতাম। এবং হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া নস্য লইতাম। আবশ্যক অনাবশ্যক কোন কারণ নয়, একটা আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য একটু নস্য লইতাম। তাঁহাকে আমাদের খুব ভাল লাগিত। এই হইল আমাদের শৈশবের কথা। এইরূপ ভাবে কয়েক বৎসর চলিল। ক্রমে লোকটীকে বাড়ীর লোক বলিয়া গণ্য করিলাম।

ভক্তবীর ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে দেখা ১৮৮৩।

রাম দাদার বাড়ীতে ১৮৮৩ সালে গর্ম্মীকালে পরমহংস মশাই আসেন। আমি সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখি, বাড়ীর অনেকেই আগে গিয়াছেন। রাম দাদার বাড়ীতে ঢুকিয়াই ডান দিকের বড় ঘরটীতে তৃতীয় দরজার সম্মুখে ঢালা তক্তাপোষের উপর পরমহংস মহাশয়ের বসিবার স্থান হইয়াছে। তিনি পিছনে তাকিয়া করিয়া বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে একটী বেটুয়া হইতে একটু মশলা লইতেছেন। চোখ পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেছেন। অর্থাৎ চোখের পাতা শীঘ্র শীঘ্র পড়িতেছে। কথা জড়ান ভাষা কলিকাতার নহে রাঢ় দেশীয় অর্থাৎ উচ্চারণে কলিকাতার ভাষার সহিত বিশেষ পার্থক্য। আমি ত দরজার দিকে তক্তাপোষের উপর অর্থাৎ পরমহংস মহাশয়ের পায়ের দিকে প্রণাম করিয়া দরজার নিকটে বসিলাম। দেখিলাম, দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থলে দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া আমাদের সেই পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিটী বসিয়া আছেন। তখন তিনি যুবা নহেন প্রৌঢ় হইয়াছেন।

লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য আছে তবে যুবাকালের সেইরূপ অঙ্গ সৌষ্ঠব বা কান্তি নাই। লোকটী দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়া পরমহংস মহাশয়ের দিকে মুখ করিয়া অতি স্থির, সংযতভাবে বসিয়া আছেন। কোন কথা বার্ত্তা নাই, কোন প্রশ্ন নাই, যেন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু উন্মীলিত কিন্তু দৃষ্টি অন্তর্মুখী, যেন লোকটীর অন্তর আত্মা বা মন দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র; মুখে খুব ভক্তির ভাব, গভীর ধ্যানের আভা বিকাশ পাইতেছে। দেখিয়া বড় মধুর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া এক এক বার পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিতে লাগিলাম এবং এক এক বার সেই ধ্যানমগ্ন লোকটীর দিকে চাহিলাম এবং যত দেখিতে লাগিলাম তত ফিরিয়া ফিরিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ঘরে অপর সকলে বসিয়া, কেহ কিছু কথা বলিতেছেন, কেহ পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন, কেহ বা ফাই ফরমাইস করিতেছেন। সকলেরই চঞ্চল ভাব, কিন্তু এই লোকটীর দেখিলাম গভীর তন্ময় ভাব, কোন ফাই ফর্ম্মাইস হুকুম হাকামের ভিতরে নাই। নিজের অন্তরের ভিতর যেন ডুবিয়া গিয়াছেন। এবং নিঃস্পন্দ মোমের পুতুলটীর মত পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই উপর আমার বিশেষ নজর। তাঁহার সেই চেহারা অতি সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত আমার চক্ষে স্পষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে। কোচান চাদর খানি উভয় উরুতের উপর রাখিয়াছেন। গলায় শুধু পৈতা গাছটী। চাদর কাপড় বেশ ফর্সা এবং পরিষ্কার ভাবে কোচান।

পরিহিত কোচান কাপড় চাদরে কেমন একটা শিল্পনৈপুণ্য ছিল। তাহার পর পরমহংস মহাশয় আহার করিলে উপরকার ছাদের উপর সকলকার খাইবার ঠাই হইল। এবং আমরা সকলে গিয়া আহারাদি করিলাম। এইরূপে রামদাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় যখন আসিতেন দেবেন বাবুকেও দেখিতাম। তখন হইতে বুঝিলাম যদিও তিনি গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জমিদারীতে কর্ম্ম করিতেন কিন্তু পরমহংস মহাশয়ের বিশেষ অনুগত। এবং সেইজন্য রামদাদার বাটীতে বিশেষ লোক সমাগম হইলে তিনিও আসিতেন।

দেবেন বাবুর তখন আন্দাজ ৪০ বৎসর বয়স। ১৮৮৪ সালে সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে আসা।

ইং ১৮৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বরাবর ৺বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথের সংসার একেবারে

বিপন্ন হইয়া পড়িল। চাকর সরকার লোকজন পূর্ব্বদিনও ছিল। কিন্তু পরদিন একমুষ্টি অন্নের কোন সংস্থান ছিল না।

নরেন্দ্রনাথ একেবারে এত বিষন্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িল যে তাহার শিরঃপীড়া দেখা দিল। সব সময় মাথার ভিতর আগুনের হল্কা জ্বলিতেছে। বাহিরের বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া কর্পূরের নস্য নিতেন। ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু ধ্যান হইত না। একবারের অন্ন জুটে ত আরেকবারের কিছুই হইত না। অনেক সময় প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন যে বাহিরের একজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত অনাহারে থাকিতেন। এই সব পাঁচ কারণে শিরঃপীড়া জন্মে।

গর্মীকাল, শনিবার ; রামদাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় আসিয়াছেন। অনেক লোক, বিকাল থেকেই ভিড় হইয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্র নাথ কিছুতেই গেলেন না। প্রথমে দুই এক জন ডাকিতে আসিল কিন্তু নরেন্দ্র নাথ বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ ভাব, কাহারও কথা শুনিল না বা যাইল না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় দেবেন বাবু আসিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন বাবু কোথায় ?' আমি পাশের ঘর দেখাইয়া দিলাম। দরজা বন্ধ, দেবেন বাবু অনেকবার ধাক্কা দিয়া দরজা খোলাইলেন কিন্তু কথাবার্ত্তা এমন স্নেহপূর্ণ মিষ্ট ভাবে বলিতে লাগিলেন যে নরেন্দ্রনাথের ক্রোধ অভিমান সব গেল। এবং আর কিছু কথা বার্ত্তা না কহিয়াই কোচার কাপড় গায় দিয়া চটী জুতা পায় দিয়াই রামদাদার বাড়ী গেলেন। দেবেন বাবুও হর্ষিত মনে সঙ্গে চলিলেন।

নরেন্দ্রনাথ গিয়া পরমহংস মহাশয় ঢালা তক্তাপোষের উপর যেখানে বসিয়া ছিলেন সেই দরজার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া মুখ গোজ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকেই চারিদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন এবং একটু অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করিলেন যে এত লোক বসিয়া আছে তাহাদের বিষয় পরমহংস মহাশয় কিছুই বলিতেছেন না কিন্তু আসার পর হইতেই 'নরেন নরেন' করিয়া অস্থির হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ যাইতেই পরমহংস মহাশয় বলিলেন, 'আমরা যে নর তুমি যে নরের ইন্দ্র, তুমি না থাকিলে কি আসর জমে ?' এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং পিঠে স্নেহপূর্ণ ভাবে হাত বুলাইলেন। আমি সেই সময় দেবেন বাবুর একটু পরেই গিয়াছিলাম এবং তথায় গিয়া প্রথম দরজার কাছেতে বসিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ মিনিট ৪।৫ ঘরের ভিতর থাকিয়া গরম বোধ করায় রাস্তার বেঞ্চির উপর আসিয়া বসিল এবং সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। দেবেন বাবু কিন্তু তাঁহার নিজেরই অভ্যস্ত স্থানটীতে বসিয়া রহিলেন এবং তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন এই জন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এই ডাকিয়া আনিবার কথাটা পরে অনেকবার বলিয়াছিলেন।

আন্দাজ ৪৩ বৎসর বয়স ১৮৮৭ সালে গিরিশ বাবুর বাটীতে দেখা।

১৮৮৭ থেকে গিরিশবাবুর বাড়ীতে দেবেনবাবুকে সর্ব্বদাই দেখিতাম। লোকটীর ভিতর যেন একটা ভালবাসা আত্মীয়তা ও আকর্ষণী-শক্তি বেশ বাড়িতেছিল কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে সেটা যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না বা ইচ্ছা করিয়া মনটাকে চাপিতে ছিলেন। অনেক লোকের সঙ্গে তখন মিশিতাম, সকলের সঙ্গে ভক্ত হিসাবে এক হইতাম কিন্তু মনের কথার ব্যথার ব্যথী এরূপ লোক সকলে ছিলেন না। যোগেন মহারাজের ভিতর যেমন একটা অমায়িক ভালবাসা আত্মীয়তার ভাব ছিল, দেবেন বাবুর ভিতরও ঠিক সেই রকম ভাব ছিল। দেবেন বাবু সুবিধা পাইলেই অর্থাৎ যখন ভিড়ভার নেই, একটু নিরিবিলি স্থানে গিয়া বাড়ীতে প্রত্যেকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কি করা উচিত ও অনুচিত এসব বিষয় স্নেহপূর্ণভাবে কথা কহিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার বুকে যে ভালবাসার উৎস উঠিয়াছিল আমরা ৮৭।৮৮ সাল হইতে সেটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবে পেটের দায়ে থিয়েটারে চাকুরী করেন, সেটা যেন তাঁর ধাতস্থ নয় এবং প্রবৃত্তিরও বিপরীত। যেন নাচার হইয়া ঐ কাজ করিতেন কিন্তু গিরিশ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া যখন আপোষে কথা হইত তখন থিয়েটারের কথার নাম গন্ধ থাকিত না।

একজন অতি ভক্তিমান লোক ও বুকে ভালবাসা পূর্ণ। কিন্তু হাত পা বান্ধা, অতি নাচার অবস্থা। এই সময়টা দেবেন বাবুর অতি খারাপ অবস্থাও বলা যাইতে বা খুব ভাল অবস্থাও বলা যাইতে পারে। বিপরীত স্রোত দুই দিকে টানিতেছিল। কোন দিক স্থির করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। বড় সংসার। টাকা চাই সেও এক কথা। আবার একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানকে ডাকিব সেও এক কথা। এই দুই টানায় পড়িয়া তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু বিশেষ একটী ভাব দেখিতাম যে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট এবং অতি শৈশব হইতে সিমলার বাড়ীতে জানাশুনা কিন্তু তাহা হইলেও তীক্ষ্ণ মনোবৃত্তিতে মোহিত হইয়া তিনি গুণের প্রশংসা করিতেন। মহত্ত্বের শক্তি উপলব্ধি করিতেন এবং পরমহংস মহাশয়ের পরেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। অতি বিনীত ও সংযত হইয়া কথা কহিতেন। বাল্যকালের ভাব সে চক্ষে আর দেখিতেন না। কিন্তু মহাশক্তিমান পুরুষের কাছে বসিয়া আছেন ইহা প্রকাশ করিতেন। সমকক্ষ বা মুরুব্বিয়ানা ভাবে কখনও কথা ক'ন নাই। যেন কিছু শিখিতে চান ইহাই তাঁহার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কড়া জ্ঞানের ভাব বা দর্শন শাস্ত্রের কথা দেবেন বাবু তত হৃদয়ঙ্গম করিতেন না। বুদ্ধের মতামত লইয়া যখন কথা হইত দেবেন বাবু সেটা তত ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু যখন উপাখ্যান সুরু হইত, দয়ার ভাবে সর্ব্ব-জীবের জন্য বুদ্ধের প্রাণ কাঁদিয়াছে শুনিতেন, তখন দেবেন বাবুর বড় ভাল লাগিত তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কিন্তু প্রচলিত ন্যাদ ন্যেদে বষ্টুমী ভাবটা অর্থাৎ কথা বলিবার আগেই যে কান্না, নাক দিয়া শিকনী পড়া, দেবেন বাবু সেরূপ ভাবটা ভালবাসিতেন না। জগৎ ত্যাগ করিয়া শুধু ভক্তি, সেটাও তিনি বড় পছন্দ করিতেন না। শুষ্ক জ্ঞানও তাঁহার ধাতে ছিল না। সকল লোককে ভালবাসা দিয়ে ভক্তি বা জ্ঞান বা ধর্ম্ম বা যাহাই হউক না সেইটা তাঁর মনের স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল। আটু পাটু করিয়া সকলকে যেন আপনার করা এইটাই তাঁর বিশেষ ভাব ছিল। ভাল-জন্যই ভালবাসা, এইটা তাঁর ভিতর স্পষ্ট দেখিতাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি দেবেন বাবুর এই কয়েক বৎসর জীবনটা অতি কষ্টময় হইয়াছিল এবং সুখময়ও হইয়াছিল। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনটন হইত। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে তাঁহার মুখ শুষ্ক কাহারও কাছে মুখ ফুটিতেছে না। বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। অবশেষে যোগেন মহারাজ ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন বাবু, মুখটা আজ শুষ্ক কেন?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না কিছু নয়, বিশেষ কিছু কারণ নয়।" যোগেন মহারাজ একটা অছিলা করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন এবং দেবেন বাবুকে তথায় ডাকিলেন, উভয়ে যেন কত হাসি তামাসা করিতেছেন বাহ্যিক এই ভাব দেখাইয়া তিনি এই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ব্যাপারটা কি?" দেবেন বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হরিমটর ভাজা," অর্থাৎ আজ হাড়ি চড়ে নাই। যোগেন মহারাজ তখনই কাহারও কাছ হইতে কিছু আনিয়া দেবেন বাবুর হাতে দিলেন এবং অপর কেহ জানিতে না পারে এমন ভাবে দেবেন বাবু একটা ছুতা করিয়া চলিয়া গেলেন। এইত একদিকে সংসারের কষ্ট! ভদ্রলোক, বড় পরিবার, অর্থের অনটন। কিন্তু অপর দিকে বোধ হয় এইটা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা গিয়াছে। ইটালী অবস্থানকালে তিনি যে শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলে তাঁহার মধ্যে যে শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল সেই শক্তি তিনি এই সময় সঞ্চয় করেন। পরমহংস মহাশয়ের ত্যাগী শিষ্যরা যেমন গৃহত্যাগ করিয়া নগ্নপদে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতেন, ভূমিপৃষ্ঠে শুইয়া থাকিতেন কোন দিন আহার জুটিত কোন দিন জুটিত না, তিনিও তেমনই সর্ব্বপ্রকার মহাকঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা উচ্চ ভাবরাশির কথোপকথন চর্চ্চা ও উপলব্ধির আশায় উন্মত্তের ন্যায় জীবন-স্রোত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তেরা যদিও বাহ্যিক চিহ্ন গৈরিক বসন, নগ্নপদ, মস্তক মুণ্ডন গৃহত্যাগ আদি করিলেন না কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয় শ্রেণীর শিষ্যরা আপন আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ও পন্থানুরূপ কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই পরমহংস মহাশয়ের কথা চর্চ্চা করা বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের নানা মত শ্রবণ করা ও সর্ব্বদা সেই বিষয়ে চিন্তা করা ও তর্ক বিতর্কে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ হইয়া বিচার করা সকলকেই সমান ভাবে করিতে হইয়াছিল। তখনকার

দিনে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের ভিতর কোনই পার্থক্য ছিল না। সকলেই পরমহংস মহাশয়ের ভক্ত, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে এবং সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ প্রাণপণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই জন্য বিকাল হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত গিরিশ বাবু বা বলরাম বাবুর বাটীতে সকলেই একত্রিত হইত তখন সাংসারিক বা দুনিয়াদারী কোন কথাই থাকিত না। নিয়ত উচ্চ অঙ্গের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কথা চলিত। এবং সকলে মিলিয়া একটি চাপা জমাট সমষ্টি হইয়া থাকিত। রাত্রি ৯।১০টা হইলে অনিচ্ছায় যে যার নিজের স্থানে যাইতেন। ভক্ত সমাগম যে একটা আনন্দের জিনিস তাহা আমরা বিশেষ অনুভব করিতাম, এই দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা সেই আনন্দস্মৃতি জ্বলন্ত ভাবে চিরদিন অন্তরে পোষণ করিবেন ইহাকেই বলে ঈশ্বর সান্নিধ্য জ্ঞান।

দেবেন বাবু যদিও বাহ্যিক মালা জপ করিতেন না বা বাহ্যিক অন্য কোন চিহ্ন রাখিতেন না ও ভাব বিকাশ করিতেন না, কিন্তু যখন নরেন্দ্রনাথ উচ্চ ভাবের কথা কহিতেন এবং গিরিশ বাবু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন বা যখন পরমহংস মহাশয়ের একটা কথা লইয়া পরস্পর আলোচনা করিতেন, দেবেন বাবু তখন সেই কথায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ভাবটী ও তাহার ধারণা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইতেন। কখনও বা দেওয়ালের দিকে ঠেস দিয়া বসিয়া স্থির নেত্রে থাকিতেন। চক্ষু যেন অন্তর দৃষ্টিতে চলিয়া গিয়াছে, মন যেন দেহ ছাড়া। তখন তাঁহার মুখের ভাব অন্য রকম হইত। আনন্দ যেন তখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। কণ্ঠস্বর অতি মৃদু ও কোমল হইত এবং হৃদয় যেন মানুষের প্রতি ভালবাসাতে উচ্ছলিত হইত। সকল ভক্তকে সকল লোককে তিনি ভালবাসিবেন, আপনার করিয়া লইবেন, আপনার বুকের ভিতর রাখিবেন এইটাই যেন তাঁহার চোখের চাউনি ও কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইত। একটা তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখিতাম, যখন তাঁহার মন এইরূপ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে তখন তাঁহার হাত সঞ্চালন ও অঙ্গুলী সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাব প্রকাশ করা অতীব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁহার এই অঙ্গুলি সঞ্চালন কবিত্ব পূর্ণ ছিল। যেন জীবন্ত কবিত্ব শক্তি অব্যক্ত ভাষায় তাঁহার হস্ত সঞ্চালন ও অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা বিকাশ পাইত।

নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী, বক্রাকার গ্রীবাদেশ, চক্ষের জ্যোতিঃ ও খর দৃষ্টি এবং অঙ্গুলি সঞ্চালন বীরত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিত। যেন সমস্ত জগৎকে জয় করিব। সমস্ত লোকের মস্তিষ্ক যেন নিজ করতলের মধ্যে রাখিয়া নিষ্পেষিত করিব। যদি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তাহাকে চূর্ণ করিব। যতক্ষণ লোক প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে ততক্ষণ তাহাকে ক্ষমা করা নয় তাহাকে নিষ্পেষণ ও বিমর্দ্দন করাই একমাত্র পথ। কিন্তু পরে যখন সে বিধ্বস্ত ও শরণাগত হইবে এবং বশ্যতা স্বীকার করিবে তখন তাহাকে দয়া করিব এবং পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিব। কিন্তু যতক্ষণ সে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে সিংহ বিক্রমে চূর্ণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গীতে ও অঙ্গসঞ্চালনে এই ভাব বিকাশ করিত। ইহাই হইল জ্ঞানমার্গী ও বিজয়ীর ভাব। নেপোলিয়নের ছবিতে তাঁহার মুখভঙ্গীর এই ভাব পাওয়া যায়। কিন্তু দেবেন বাবুর মুখভঙ্গী ও হস্ত সঞ্চালন অন্য প্রকার ছিল। তাঁহার "কমনীয় কোমল কর পল্লব" সঞ্চালন, মুখের ভঙ্গিমা, গ্রীবা বাঁকাইবার ভাব, চক্ষুর দৃষ্টি, কণ্ঠের স্বর যেন প্রত্যক্ষ 'কবিতা'কে সম্মুখে আনয়ন করিত। কবিতা, ভালবাসা, আপনার করিয়া নেওয়া এই ভাবটা যেন হঠাৎ তাঁহার মাংসের দেহের ভিতর হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহাতে এই একটা মাধুর্য্য ছিল যে মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দিত। আমি শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজের সহিত সর্ব্বদা তর্ক করিতাম ঝগড়া ও গালমন্দ করিতাম। আপোষে যেমন হইয়া থাকে। গিরিশ বাবুর সহিতও করিতাম। বেশ দুই হাত চলিত। কিন্তু দেবেন বাবুর সহিত কখনও তর্ক করিতে সাহস হইত না। এমন কি যোগেন মহারাজ ও শরৎ মহারাজেরও দেবেন বাবুর সহিত তর্ক করা চলিত না। যোগেন মহারাজের গিরিশ বাবুর সহিত তর্ক লাঠালাঠি সর্ব্বদাই চলিত। শরৎ মহারাজও গিরিশ বাবুর সহিত তর্ক লাঠালাঠি করিত। গিরিশ বাবুও তর্কপ্রিয় ছিলেন। তর্কে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলে ভারি খুসী হইতেন। অর্থাৎ লাঠালাঠি করিবার

একটা সঙ্গী জুটিলে নিজের খেলটা একবার দেখাইতে পারেন। কিন্তু এই সব কাজে হাসি ও আনন্দ খুব হইত, হার জিত হইলে খুব হাসি চলিত। কিন্তু দেবেন বাবুর সহিত আমরা কখনও তর্ক করি নাই। নরেন্দ্রনাথ হাস্য করিয়া বলিতেন দেবেন্দ্রনাথের হইতেছে সখীভাব, উনি হইতেছেন সখী। কিন্তু আপনার করিয়া নেওয়া যে কত বড় একটা শক্তি তাহা আমরা তখন বিশেষ অনুভব করিতাম এবং কবিত্ব-শক্তির ভিতর দিয়া মন যে উচ্চ স্তরে উঠে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়া যে জগৎকে কেনা যায় এবং উভয়ের সাহায্যেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য-জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়, অস্পষ্ট ভাবে আমরা এটা অনুভব করিতাম। এই জন্যে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই সময়টা দেবেন বাবুর জীবনে অতি কষ্টের সময় এবং এইটাই তাঁহার জীবনের অতি শ্রেষ্ঠ সময়। অলক্ষিত অজ্ঞাত ভাবে তিনি এই সময়টা কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পরমহংস মহাশয় যেন হাতে মকমলের দস্তানা দিয়া দেবেন বাবুর ঘাড়টী ধরিয়া কঠোর তপস্যার অনেকটা পথ চালাইয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কঠোরতা কিছু জানিতে দেন নাই। তাঁহার সে মুখভঙ্গী, চেহারা, চক্ষের দৃষ্টি, হস্ত সঞ্চালন এত মধুর স্পষ্টভাবে ভাবব্যঞ্জক হইত যে ভাষা না জানিলেও, ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলেও হৃদয়স্থিত ভাবসকল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত। ইহাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। সাধারণ লোকের ভিতর ইহা কম দেখিতে পাই।

দেবেন বাবুর সকলকে আপনার করিয়া নেওয়া এবং সকলের প্রতি সমান ভাবে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলার একটা বিশেষত্ব ছিল। যাহাকে সকলে তিরস্কার করিতেছে তাহার হইয়াও তিনি ওকালতী করিতেন, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয় তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। এই সকল কার্য্য আমি অনেকবার দেখিয়াছি। ইহার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী গল্প নিয়ে বলিতেছি। বরাহনগরের মঠে অবস্থানের শেষভাগে দক্ষ মহারাজ হরিদ্বার হৃষীকেশে গিয়া পাগল হইয়া যান; লোকটী আগে বেশ ভাল ছিলেন এবং বেদান্তের অধ্যয়ন ও চর্চ্চা সর্ব্বদা করিতেন। তর্ক বিষয়ে খুব নিপুণ ছিলেন। এবং এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়া পায়ে পায়ে গাঁট দিয়া চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া হস্ত সঞ্চালন করিয়া গিরিশ বাবু ও দেবেন বাবুর সহিত দক্ষ মহারাজ অনেক সময় বেদান্তের তর্ক করিতেন। নরেন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়া সকলেই তাহাকে যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। দেবেন বাবুর কিন্তু শুষ্ক তর্ক ভাল লাগিত না এই জন্যই তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। দেবেন বাবুর মজা ছিল, শুধু বসিতে পারিতেন না। পিঠে একটা ঠেস দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল।

দক্ষ যখন পাগল হয় তখন সে আমাদের ৭নং রামতনু বোসের বাটীতে আসিয়া আড্ডা করিল। পিচাশ-পাওয়া পাগল হইয়াছিল। প্রথমতঃ রাস্তার কতকগুলি নেকড়া কুড়াইয়া পুটুলী করিল। তাহার নাম দিল বিশ্বভাণ্ডার। পরে দুইটা বড় বড় পুটুলী করিল। এমন কি পায়খানায় গিয়া নিজের মল নিজে মাখিত। পূর্ব্বে ঘোর বেদান্তী অদ্বৈতবাদী ছিল, পাগল অবস্থায় সবই ব্রহ্ম দেখিতে লাগিল। সেইজন্য পাগলামী অবস্থায় এইরূপ করিয়াছিল। আমি উত্যক্ত হইয়া বিকাল বেলা গিরিশ বাবুর বাড়ী গেলাম এবং নিরঞ্জন মহারাজকে ও গুপ্ত মহারাজকে সব কথা বলিলাম। উভয়ে শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষকে আমাদের বাড়ী হইতে সরাইয়া দিবার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। দেবেন বাবু চুপ করিয়া বসিয়া সব শুনিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি ত দক্ষকে তাড়িয়ে দেবার কথা বল্‌ছ, দক্ষ ত' পাগল হয়েছে, যাহ'ক তোমাদের পুরাণ লোক এখন সে যায় কোথা বল দেখি। গুতুতে ত সকলেই চাচ্ছ কিন্তু লোকটার দিকে ত কেউ একবার চাইছ না। লোকটা থাকে কোথা, তার চিকিৎসাই বা কিরূপে হবে সেই বিষয় তো কেউ কিছু কথা কইছ না। শুধু গুতুতেই মজবুত দেখছি। তার একটা ডাক্তার কবিরাজের বন্দোবস্ত কর। নইলে লোকটা যায় কোথা?"

দেবেন বাবু এই কথাগুলি এমন স্নেহপূর্ণভাবে মিষ্ট আওয়াজ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি ত নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। নিরঞ্জন মহারাজও শান্ত হইয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আর যেন কেউ কথা বলিতে পারিল না। তখন কথা হইল, দক্ষের জন্য কি বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু দেবেন বাবু আরও বলিলেন, যে দক্ষ মহিমের বাড়ীতে গিয়া মহিমকে বড় উত্যক্ত করিতেছে সেটাও দেখা আবশ্যক। ওখান থেকে সরাইয়া আনা সেটাও দরকার এবং বাগবাজারের নিকটে দক্ষকে রাখা উচিত। উভয় দিক সামঞ্জস্য করিয়া দেবেন বাবু মিষ্টভাবে এমন কথা বলিতে লাগিলেন যে আমি মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম যে এই লোকটার সকলের প্রতি কেমন ভালবাসা—কথার চেয়ে মুখের ভাবভঙ্গিটা খুব যুক্তিপূর্ণ (impressive) হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দশম পরিচ্ছেদ

লাটের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, ব্রজকিশোর এই সময় প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কাছারীতে বসিতেন। ঝণাৎ ঝণাৎ করিয়া টাকার আমদানী নাড়াচাড়া বড় শ্রুতিমধুর। ব্যস্ত আমলাদের গুণ গুণ, থাকিয়া থাকিয়া ইন্দ্র সরকারের দাপাদাপি, বিক্রম প্রকাশ, আবার মাঝে মাঝে অক্ষমের কাছে পূজিতপাদ হইয়া দয়া অনুগ্রহ বিতরণে আত্মপ্রসাদ—এই সকলের একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। যেখানে প্রতি বায়ুকণা তাঁহার অপ্রতিহত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভরপুর, যেখানে তিনি উপস্থিত ও আগত সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, স্তব্ধ স্তুতিরত প্রজাবৃন্দের ভাগ্যনিয়ন্তা, মেজাজ অনুযায়ী কখন বাপ কখন মা বা বিচারক হাকিম সেখানে—বিশেষতঃ এই গুলজারের সময়—এই আকর্ষণ স্বাভাবিক।

এই স্থানে হাজির থাকিয়া এই সময়ের খাস্ কর্ত্তব্য, বৈশাখ মাসে যে পনর দিন ব্যাপী নানা আমোদ উৎসবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়, সেই সম্পর্কে নানা যুক্তি পরামর্শ ও বায়না ইত্যাদির বন্দোবস্ত; বৃদ্ধ নবীন মুখুয্যের পরামর্শ, নবীন দলের আবেদন, ওস্তাদজীর মন্ত্রণা ইত্যাদির মধ্যে হাঁক ডাক জটিলতার রচনা করিয়া, তিনি লঘু ক্রিয়ার আরাম উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে গুরু শ্রমজনিত সুনিদ্রার দাবী খাড়া করিয়া লইতেন।

কিন্তু এ বৎসর সকলেই লক্ষ্য করিল, ব্রজকিশোর যেন কিছু অন্যমনস্ক, বিমর্ষভাব। সকল কর্ম্মের মধ্যে যেন খেই হারাইয়া যাইতেছে; রাজুকে অনেকবার ডাকাইলেও সে আসে নাই। এ প্রকাশ্য বিদ্রোহে রাগ হয় নাই, অশান্তি বাড়িয়াছে; ললিতের আচরণ এবার আরও যেন স্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরও বিচলিত করিতেছে—তাহার উদ্ভ্রান্ত ভাবের একটা অর্থ তিনি ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছেন না, বৃথা নিজের জীবন-ইতিহাস হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি প্রাপ্ত দুইখানি চিঠি আজ সকাল হইতেই তাঁহার কাছে আছে—সে দুটি যে কতবার তিনি পাঠ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই—এই পত্র দুইটির মর্ম্ম তাঁহাকে দুশ্চিন্তার নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। শেষটায় মুখ রক্ষা করা এত কঠিন হইয়া উঠিল যে আসর ভঙ্গ করিয়া তিনি কাছারি বাড়ী ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিলেন; এই স্থানটি তাঁহার নিজস্ব আশ্রয়, অন্দর-মহলের দাসত্ব ও কাছারি বাড়ীর প্রভুত্ব বিবর্জ্জিত, নিরালা আলস্যের নিশ্চিন্ত আশ্রম; এখানে অনুমতি বিনা প্রবেশাধিকার আছে কেবল স্বল্পভাষী ওস্তাদজির।

বড় বড় তাকিয়া, বিস্তীর্ণ ফরাস, উপরে টানাপাখা, সেবা-তৎপর পেয়ারের চাকর যুধিষ্ঠির, তাঁহাকে যেন সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া সদা প্রস্তুত। সদর বাড়ীটি চকমিলান, মধ্যে প্রাঙ্গণ, এইখানে যাত্রাদি হইয়া থাকে; চারিদিকে দালান তাহার পর ঘর; উত্তর দিক সমস্তটা জুড়িয়া প্রকাণ্ড হল ঘর, সাজ সজ্জায় গুরু গম্ভীর, তেমন উপলক্ষ ভিন্ন বার মাসই চাবী বন্ধ থাকে, পূর্ব্বদিকে মধ্যে প্রবেশ-পথ, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী ঘর অতিথি, আমন্ত্রিতের জন্য নির্দ্দিষ্ট, দক্ষিণ দিকে প্রথম ঘরটি বাবুর খাস খানসামা যুধি-ষ্ঠিরের দখলেই প্রায় থাকে, মধ্যেরটি কর্ত্তার বৈঠকখানা, আর শেষেরটি তাঁহারই বসিবার ঘর, বৈঠকখানা অপেক্ষা অনেক ছোট, প্রায়ই শয়ন কক্ষ রূপে ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া একধারে সুদৃশ্য একখানি পালঙ্ক, কয়েকটি চেয়ার, আলমারি, ছবি, নানাবিধ ব্যক্তিগত ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ—পশ্চিমদিক সমস্তটা দালান, ঘর নাই, সারি সারি স্তম্ভ সুশোভিত দালান, দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া শেষে মণ্ডপে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। এইখানেই প্রতিমা বসেন; পূর্ব্ব দিক হইতে সোজা টানা কাছারী বাড়ীও আসিয়া এইখানে মিশিয়াছে। কাছারী বাড়ী ও ব্রজকিশোরের বৈঠকখানার মধ্যে উদ্যান, সেইখানে রাধা-মাধবের মন্দির। সুতরাং দালানের পূর্ব্বে এই উদ্যান ও মন্দির, আবার পশ্চিমে বোধ হয়, ওজন রাখিবার জন্যই বৃহৎ

দীঘি। সদর বাড়ীর প্রবেশের বিপরীত দিকে দালান পার হইয়া দাঁড়াইলে খিড়কীর ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়, দীঘির উত্তর পাড় জুড়িয়া ও সদর মহলের দ্বিতল অংশ লইয়া অন্দর মহল। সদর মহলের উপর অংশটাই কেবল দ্বিতল। সমস্ত ঘেরিয়া মাথার সমান উঁচু প্রাচীর, একদিকে টোল, ডাক্তারখানা, অতিথিশালা আর মাঝে মাঝে বাগান, অধিকাংশই ফলের গাছ—মন্দির ঘেরিয়া যে ফুলের বাগান আছে তাহা উল্লেখযোগ্য।—দেউড়ীর কাছে একদিকে বরকন্দাজদের থাকিবার কুঠুরীর সারি আর একদিকে শূন্য আস্তাবল, দুই পুরুষ হইতে ঘোড়ার জ্বালা নাই; এখন সেখানে পাল্কী থাকে আর বাড়ীর কুকুর ও বিড়ালেরা পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে পুরুষানুক্রমে বাচ্চা মানুষ করিয়া থাকে। কাছারী বাড়ীর সম্মুখ দিকটা, দক্ষিণ দিকে মাঠ; আর উত্তর দিকে প্রাচীরাবৃত দ্বিতীয় পুকুর। সীমানার উত্তর পশ্চিম কোণে আর একটি ছোট পুকুর আছে তাহারই পূর্ব্ব দিকে টোল ইত্যাদি আর দক্ষিণ দিকে গোয়াল।

ব্রজকিশোর কাছারী বাড়ী হইতে দালান দিয়া আসিতে ললিত সম্মুখে পড়িল। ছায়ার ন্যায় মিশিয়া সঙ্কোচে সন্তর্পণে চলিতেছে—; অন্য সময় হইলে পিতা পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া অবান্তর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লইয়া তবে ছাড়িতেন, আজ উদ্যমের লেশমাত্র নাই; কোন মতে বৈঠকখানায় গিয়া একটা বৃহৎ তাকিয়া আশ্রয় করিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। দক্ষিণ পশ্চিম কোণের শার্সীবদ্ধ সুবৃহৎ গবাক্ষ-পথে নানা বর্ণের কাচের মধ্যে দিয়া প্রতিফলিত তির্য্যক সূর্য্য-কিরণ ম্লান দেখাইতেছে; শুভ্র ফরাসের উপর আলো ছায়া সেখানে এক অভিনব দাবার ছক আঁকিয়াছে, তাহারই প্রতি নিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া ব্রজকিশোর ভাবিতে লাগিলেন; তাম্বুলাধার ও আলবোলার নল উপস্থিত হইল, ব্রজকিশোর চিঠি দুইখানি আর একবার পড়িবার মানসে খাম হইতে বাহির করিলেন। প্রথমপত্র কলিকাতা হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক লিখিতেছেন, তাহার বিবরণ এই :—

বিশেষ শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদন,

রায় মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম; আপনাদের শারীরিক মঙ্গল সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ করিলাম—এখানকার সংবাদ কুশল জানিবেন, পিতাঠাকুর এখনও কাশীতে আছেন, শীঘ্র ফিরিবেন তাহার সম্ভাবনাও নাই, বিরাট সংসারের ভার এখন এই হতভাগ্যের দুর্ব্বল স্কন্ধে। শ্রীমান ললিত এবার পরীক্ষা কেমন দিল জানাইবেন—একটি শুভ সংবাদ আপনাকে দিব, মেলা বাঁধার রাজা নাম শুনিয়াছেন নিশ্চয়, আমার ভূতপূর্ব্ব শ্বশুর বাড়ীরই জ্ঞাতি ঘর। তাঁহাদের মেজ বাবুর একমাত্র কন্যার সহিত ললিতের বিবাহ প্রস্তাব আসিয়াছে—আমার উপর সকল ভার—তাঁহাদের পক্ষ হইতে কেহ আমার সঙ্গে শ্রীনগরে যাইবেন এইরূপ প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছি—কারণ এবিষয়ে আপনার অমত হইবার কিছু নাই। আমি আগেই আপনাদের ওখানে যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—ভগ্নীকেও বহুদিন যাবৎ দেখি নাই, এখানে সংসারের কোলাহল সব সময় ভাল লাগে না, আপনার সহবাসে কিঞ্চিৎ আমোদ ও শান্তি আসে। তাহা ছাড়া কতকগুলি জরুরী বিষয়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ পরামর্শ প্রয়োজন। আমার ভগ্নীর নামে বাদায় যে এলাকা কেনা হইয়াছে তাহার সুবন্দোবস্ত রীতিমত না করিলে মুনফার পথ হইবে না, দত্ত বাবুদের পাওনা টাকার সুদ এইবারে না দিলে তাহারা টাকার জন্য তাগাদা আরম্ভ করিবে। বুঝিতেছি এ ঋণ আমারই জন্য আপনাকে করিতে হইয়াছে—আমি জামিনও আছি, আমি টাকাটা অন্য কাজে না লাগাইয়া ফেলিলে আপনার এলাকা ক্রয় করিতে কর্জ্জ করিতে হইত না। আপনি টাকা দিয়াই রাখিয়াছিলেন—আমিই হতভাগা, বিনয়ের অমন মুচ্ছদ্দীর কাজটা হাত ছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া, তাহার জন্য জামিন রাখিলাম। কি করি ছোট ভাই—তখন কে জানিত বাদার এলাকা খরিদের সঙ্গে সঙ্গে সব টাকাটা ফেলিয়া দিতে হইবে। যাহাই হউক আমি আপনাকে তাহার জন্য রীতিমত দলিল দিয়াছি আর আপনার ঋণের টাকার জন্য জামিনও আছি। আমাদের সম্পত্তির মূল্য অবশ্য আপনার প্রাপ্য তিন লক্ষের ন্যূন হইবে না। সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমার এখনকার অনুরোধ যে সুদের টাকাটা আমি এখন দিতে পারিতেছি না, মহাজনের

টাকা ছড়ান রহিয়াছে আদায় হইতেছে না। দত্তদের সুদের টাকাটা কিন্তু আর ফেলিয়া রাখা যায় না। আমাদের পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতির ফলে আপনা হেন মহানুভব অবিভাবক পাইয়াছি, আপনার অনুগ্রহ হইতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না। আশা করি আমি শ্রীনগর হইতে আসিবার সময় এই সুদের ও বাদার খরচ পত্রের জন্য কিছু টাকা সঙ্গে আনিতে পারিব, কেবল সময়ে একটু কষ্ট স্বীকার আপনাকে করিতে হইবে। এবার আদায়পত্র কেমন, সাক্ষাতে সে সকল বিবেচনা করিয়া এবছর আমোদের একটা বড় রকম ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি সলিমা বিবিকে একরকম রাজী করিয়া রাখিয়াছি আমার জবাব বিনা অন্য কোথাও বায়না লইবে না। পূজার সময় মহারাজদের ওখানে প্রথম ওর নাম বাহির হয়। তারপর এই কয়মাস রাজা মহারাজারা ওকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। মরিয়াম, মালকা সব কানা। আমাদের সৌভাগ্য, রূপ নাচ গান কোনটি ফেলিয়া কোনটি দেখিব। আমার ইচ্ছা আমি এবার শ্রীনগর একাই ঘুরিয়া আসি, পরে বৈশাখমাসে আমোদ আহ্লাদের সময় কন্যাপক্ষীয়দের লইয়া গেলে সকল দিকেই সুবিধা। তাহারাও বুঝিবে যে মেয়ে নেহাৎ খেলোঘরে পড়িতেছে না, যেমন সুবিধা বুঝি সেইরূপ করিব।

আপনার নিজের শরীর এখন আশা করি ভাল আছে। ভাল জিনিষ সঙ্গে লইয়া যাইবে; গতবারের মত অসুখের অছিলায় নিয়মরক্ষা করিলে চলিবে না, এবার ফাঁকি দিতে দিব না। ওস্তাদজী কি এখনও আছে?...

—ইতি শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসুধীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুধীর কুমার এটর্ণি, বয়সে ব্রজকিশোরের কম হইলেও কূটবুদ্ধিতে ভগ্নীপতিকে বশে রাখিয়াছেন, অবশ্য সোদরা সহায়ে।—ব্রজকিশোরের দ্বিতীয় পত্র, অনুজের হস্ত লিখিত তাহার মর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ:— "—কয়েক বৎসর হইতে রোগে বড় কষ্ট পাইতেছি—ছুটির পর ছুটি, শেষে এই এক বৎসর হাঁপানির কষ্ট অসহ্য হওয়ায় বিনা বেতনে দীর্ঘ অনিশ্চিত কালের জন্য অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছি। ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারি নাই বরং বাড়িয়াছে; কুক্ষণে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উচ্চ শিক্ষার প্রলোভনে বিলাত পাঠাইয়াছিলাম, এখন যে পৈত্রিক বাটিতে গিয়া বাস করিব, তাহার উপায় নাই কেবল আপনাদের অনর্থক বিড়ম্বিত করা। এদিকে সে হতভাগ্য ব্যারিষ্টারি পাশটাও করিয়া আসিতে পারিল না, একটা মেম বিবাহ করিয়া আসিয়াছে—একটা চাকরী, খোট্টা এক রাজার কাছে করিয়া দিয়াছি, কতদিন টিকিয়া থাকে অনিশ্চিত। পবিত্র কুলে কালি দিল, নিজেও মজিল। 'নব' এই রকম আবার শ্যামের উপর রাগও করা যায় না, সে যেন কেমন কেমন, পড়া নিয়াই পাগলের মত আছে। আমার পীড়া মর্ম্মান্তিক, এ যাত্রা অব্যাহতি নাই বুঝিতেছি। আপনাকে এতদিন লিখি নাই সে আমার দোষ, আমি চিরকাল আপনার অবাধ্য, কিন্তু আপনি জ্যেষ্ঠ, পিতৃস্থানীয়, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—ইহাদের আপনার হাতেই দিয়া যাইতেছি আর কোথায় তাহাদের আশ্রয়? এই সময় বড় ইচ্ছা আপনাকে একবার দেখিব, আপনার হাতে হাতে ইহাদের সঁপিয়া যাইব; একবার সেই বাল্যকালের কথা, আপনি দাদা আমি নন্দ, মনে করিয়া আসিবেন কি?

আমি জানি আপনার হাতে বিশেষ নগদ টাকা না থাকিবার কথা, কর্ত্তাদের আমলের বাড়ীটা রাজার যোগ্য করার ঝোঁক। তারপর আবার বাবার সুদীর্ঘ কলিকাতা প্রবাসে যে দেনা তাহারই কিস্তীবন্দীতে কত টাকা যে দিতে হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার খরচের জন্য আমি এক পয়সাও লই নাই। আর আশী নব্বই হাজার টাকা দেওয়া কোন অসুবিধার ব্যাপার নহে। আমার এ সরিকদারের দাবী নহে ছোট ভাইয়ের আব্দার, আপনি সঙ্গে আনিবেন। এই সামান্য টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব জ্ঞানে আপনাকে লিখিতেছি। আমি আজ কুড়ি বৎসর আগেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমি অভাব পড়িলে আপনাকে বলিব, আপনি যাহা হাতে করিয়া দিবেন তাহাই লইব, আমার জীবিতকালে ইহার অন্যথা করি নাই। এখন এখানে কিছু দেনা হইয়াছে হাতও একেবারে খালি আর আমিও বুঝিতেছি আমার সময় ফুরাইয়াছে। ছেলেদের ঘাড়ে এই দেনা এখন চাপান যায় না, সেইজন্য আপনার কাছে চাহিতেছি, খুব কম হইলেও ইহার

পাঁচ শুণ টাকা অন্ততঃ এখন থাকিবার কথা, অন্য কিছু মনে করিবেন না।·· দাদা নিশ্চয় এসো—ইতি প্রণত সেবক নন্দ।

চিঠি দুটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুখ তুলিতেই ব্রজকিশোর দেখিলেন, অদূরে ওস্তাদজী উপবিষ্ট।—পত্র দুটির উপর তাঁহার কৌতূহলময় স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টির উত্তরে, চিঠি দুটি ভাঁজ করিতে করিতে সংক্ষেপে ব্রজকিশোর বলিলেন, "খোকার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।" ওস্তাদজী সোৎসাহে প্রশ্ন করিলেন "কবে? আষাঢ় মাস?"

"সুধীরের সঙ্গে তারা আসছে—সেই লিখেছে, এলে একটা পাকাপাকি হবে।"

"না বাবু, তাদের দেশ আগে লোক পাঠিয়ে খপর লিতে হবে তবে পাকাপাকি। আর কোন সংস্কারে, বিবাহ সংস্কারের মত দুপক্ষ নেই, মুস্কিলভি নাই এত।"

"তা নিশ্চয়, তবে সুধীর আছে মাঝখানে। আর আমার ভাগ্যে কি এ সব শুভকাজ করা আছে? ফ্যাসাদ লেগেই আছে—নন্দ! ছোট বাবু জোর তাগাদা করেছে একলাখ টাকা এখুনি দিতে হবে, কোথায় পাব জানিনা অথচ না দিলেও গোলমাল বাধাবে। সাহেবী মেজাজ, অসুখ বিসুখ সব ভুয়ো, কেবল বোঝে পৈতৃক বিষয়ের ভাগ, লাট সাহেবের মত বেফিকির আছে—বুঝ্‌ত যদি এই ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হত, বিষয় রক্ষা ছেলেখেলা কিনা, হুট্‌ বল্লেই টাকা!"

"বাবুজী, খোকার সাদি দেরী ভাল নয়, সেয়ানা হয়েছে আমীর বংশের ছেলে; দিন কাল কলকাত্তা উলকত্তা সব মুস্কিল লট্‌খট্‌কা স্থান আছে, সব কাজ আগে এই কাজ, আর ছোট বাবুকে আপনি আসতে লিখে দিন, খাতাপত্তর দেখে যদি থাকে তবে নেবে, না হয় ঝুটমুট ঝগড়া কর্ত্তে পার্ব্বে না; আর আমার দিল বলছে আপনার ভাই ঝুটা লিখে নাই; ব্যামারি হয়ে থাকবে, আপনি একবার গেলে, সে জায়গা বড় ভাল, আমি শুনেছি কাজভি হবে আরামভি হবে।" ব্রজকিশোর সংক্ষেপে "দেখি" এই মন্তব্যমাত্র প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, নিত্য অন্দরে যাইবার এই সময়, দুই এক ঘণ্টা সেইখানে বিশ্রাম করিয়া আহারান্তে পুনরায় সদরে আসিতেন, ততক্ষণ পারিষদবর্গও হাজির হইত। এই বিদেশী গায়ক দুর্ব্বলচিত্ত আশ্রয়দাতার দোষগুণ ঘনিষ্ঠরূপে জানিয়াও তাঁহার প্রকৃত হিতাকাঙ্খী; আজ ব্রজকিশোরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন একটা অজানিত অশুভের আশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। কি যেন একটা বিপদের সূত্রপাত হইল, মানসিক উদ্বেগ দমন করা যাইতেছে না—ওস্তাদজী গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন

বাগানের মধ্য দিয়া যাইতে মন্দিরের রোয়াক নির্জ্জন দেখিয়া ললিত সেই স্থানে বসিয়াছে। তাহার প্রপিতামহের কীর্ত্তি এই মন্দির, পিতামহের সময় বহু অর্থব্যয়ে সংস্কার হইয়াছে, ক্ষুদ্র হইলেও অতি মনোরম ও সুন্দর, সমস্ত রোয়াক ও মেজে শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে ছক্‌ কাটা। আরতির তখন দুই তিন ঘণ্টা দেরী আছে, রুদ্ধ কবাটের লোহার শিকের মধ্য দিয়া বিগ্রহ যুগলের মোহন ভাবদীপ্ত চক্ষু ললিতকে যেন আশ্বাস দিতেছে।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারকে অপ্রতিভ করিয়া জ্যোৎস্না দিকে দিকে তাহার লাস্যময় অধিকার অবলীলায় দৃঢ় করিতে ব্যাপৃত। স্থানে স্থানে তাহার সন্ধ্যার এই মোহন লীলার মধুর অনুষ্ঠান শান্ত সংযত সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব ও ধীর স্থায়িত্ব সূচনা করিতেছে। কিন্তু স্থান ও কালের অন্তর্নিহিত সান্ত্বনা ললিত এখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাহার কৃতকর্ম্ম বর্ত্তমানে নিজস্বরূপে, হেয় নগ্ন পাপের মুর্ত্তিতে তাহার চক্ষে ধরা দিয়াছে। কাব্যের ইন্দ্রজাল, যৌবনাবেগের মোহাঞ্জন আজ অপসৃত; কল্পনার আবেশ, আলিঙ্গন, আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার কুহক দলিত মথিত করিয়া বাস্তবের স্পষ্ট দুরন্ত পরিচয় তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে,—কিগো কবি, তুমি শেষে লালসাগ্নির আহুতি-মুষ্টিমাত্রে পরিণত হইলে, কিগো প্রচণ্ড নবীন, প্রখর সাধু সংকল্পের পরিণাম কি এই? এত আত্মগ্লানি, লজ্জা, অনুতাপ আসিল কেন, কোথা হইতে? দুর্ব্বল আত্মপ্রতারক অপরাধী, আজ বুঝি নিজের কাছে ধরা পড়িয়াছ? ব্যক্তিত্ব শত-শত বিরুদ্ধ সমর্থক যুক্তির জাল বুনিয়াও পারিয়া উঠে নাই। প্রত্যেকটিই অশোভন লাগিয়াছে; নিভৃত আত্মা জাগ্রত হইয়া ব্যক্তিত্বের এই সামঞ্জস্য বা আত্মসম্মান রক্ষার

প্রতিটি চেষ্টা প্রতিহত করিয়াছে। তখন ব্যক্তিত্ব ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিপরীত সুর ধরিল, নিজের আগুনে নিজেকে পুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্তের পথে, অপরাধস্খলনের চেষ্টা দেখিল। পূর্ব্ব জীবন একটা পর্য্যায়ের মত, খুদীর মৃত্যুতে তাহার উপর যবনিকা পড়িয়াছে। সে বিষয়ে কোনও ত্যাগ, কোনও মহদনুষ্ঠানের গৌরব তাহার জীবনে আর নাই। কেবল ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করিতে হইবে অতীতের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কাঠামের উপর, অতীতের ঋণভারের জের ভবিষ্যতের নূতন খাতায় টানিয়া লাভ নাই। তাহাতে ঋণ পরিশোধ হয় না উপরন্তু অতৃপ্তি। প্রায়শ্চিত্তের পথেও ব্যক্তিত্ব নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও উপায় দেখিল না। হারাধনের কথা একবার সে ভাবিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ সফল হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব এত নিরুপায় হইয়াও হারাধনকে ততটা ঘনিষ্ঠ ভাবে জীবনে বরণ করা সমর্থন করিল না। হারাধনের ভার, দায়িত্ব সে নিতে পারে কিন্তু তাহার সহিত জীবনকে জড়িত করা অসম্ভব। সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন রূপ ধরিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে প্রতিবাদের কল্লোলে বধির করিয়া দিতেছে। নিভৃত আত্মা স্থির জয়ের আশায় হাসিতেছে, 'হয় ব্যক্তিত্ব তুমি মর, আমাকে লইয়া মর, এত দিনের সাধের গড়া আত্মধারণাকে ছাড়, চিরকালের জন্য আত্মসম্মান ভুলিয়া যাও আর না হয় দাম্ভিক ব্যক্তিত্ব, তুমি এই বিষাক্ত সর্পের হার বক্ষে ধারণা কর, হারাধন—হারাধন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'

তাহার পর রাজু,—সরল, স্নেহমুগ্ধ, একান্ত আপন রাজুদা, সদা-পাগল তাহার রাজু দা, তাহারই কৃতকর্ম্মের প্রতিফল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া বিপদের কি ভীম আবর্ত্তে পড়িয়াছে—ললিতের দুষ্কৃতির ফল তাহাকে নীরবে ভোগ করিতে হইবে। তার উপর আবার এই ভাগ্য বিপর্য্যয়, মালতীর মৃত্যুর মূলে হারাধন কতটা আছে তাহা সে উপলব্ধি করিয়াছে। প্রকৃত বিবরণ তাহার অজ্ঞাত; হারাধন যেন একটি জীবন্ত অমঙ্গল, আর সে রাজুর স্কন্ধে এই অমঙ্গল নিজে চাপাইয়া দিয়াছে। রাজুর চিন্তা তাহার ব্যক্তিত্বকে ধূলিশায়ী করিল। একবার মনে হইতেছে সে ছুটিয়া যায় রাজুর কাছে, বোঝা নামাইয়া লয়, কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, প্রতীকারের জন্য ভবিষ্যৎ পড়িয়া আছে, অতীতের উপায় নাই, মরা তো বাঁচিবেই না, বর্ত্তমানের জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। এই সকল যুক্তির অবতারণায় কোনও মতে আত্মরক্ষা হইল বটে কিন্তু নিজের কাছে কিছুই গোপন রহিল না। ব্যক্তিত্ব স্বভাবের দোহাই দিল, বৃথা,—একবার দেখিয়া আসা, দুইটী সমবেদনায়, সান্ত্বনার ক্ষমাভিক্ষার কথা বলিয়া আসা, সেই শক্তিই যখন নাই তখন আর কি আছে? তাহার কর্ণে যেন রাজুরই কণ্ঠস্বর কোথা হইতে আসিতেছে, "খোকাবাবু, খোকাবাবু"—রাজু একটু সহানুভূতির বেশী কিছুই চাহিবে না, ললিত ইহা স্থির জানে। তবে? এইবার চিন্তা বিশৃঙ্খল হইয়া আসিল, জর্জ্জরিত মন যখন ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিতে ব্যর্থ-প্রয়াস, তখন দেহ আসিয়া তাহার পক্ষে যোগ দিল, কাতর প্রাণে সে দেবতার নিকট মরণ প্রার্থনা করিল। দেবতার আস্থা, দেবতার অস্তিত্ব-স্বীকার তাহার জীবনে আজ প্রথম। বিশ্বের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিবার ইচ্ছা, উদাসীন যোগী বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ানো হইতে সুরু করিয়া সমস্ত এলোমেলো ভাব পীড়িত মস্তিষ্কের পক্ষে রোগ যন্ত্রণায় অহিফেণের ব্যবস্থার মত তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

যেখানে মন্দিরের সোপানাবলীর উপর বৃক্ষশাখায় প্রতিহত জ্যোৎস্নারাশি সান্ধ্যসমীরণের সহিত জটলা করিয়া ছায়ানটের সৃষ্টি করিতেছে সেইখানে তাহার দৃষ্টি লুণ্ঠিত,—এমন সময় তাহার শিরায় শিরায় ঝলকে ঝলকে উত্তাল তরঙ্গ ছুটাইয়া এক ছায়া সেইখানে দেখা দিল; ধীরপদক্ষেপে এক মনুষ্য মূর্ত্তি তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, সে অনুভূতি ললিত পাইল, তাহার পরিচয় সে জানিয়াছে; কিন্তু সেই ব্যথাকাতর অভিমান-ম্লান, বিষাদময় চক্ষু দুটি কল্পনা করিয়াও তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিতে সে পারিল না। সেই চক্ষু দুটিতে ন্যায্য ভর্ৎসনার একান্ত অভাব জানিয়াও, সে মাথা তুলিতে পারিল না। ইচ্ছা একটি পেশীকেও ঈষৎ কুঞ্চিত করিবার সামর্থ্য হারাইয়া বসিয়াছে। যে নীরবে আসিয়াছিল, সে নীরবেই চলিয়া গেল, কেবল তাহার বিশাল বক্ষ মন্থন করিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ললিতকে একত্রে সম্ভাষণ ও বিদায় জানাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বের যত হাহাকার ললিতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল।

আরতির পূর্ব্বে ঠাকুর আসেন, ললিতকে তিনিই প্রথম দেখিলেন—তাহার পর একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ব্রজকিশোর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, পালঙ্কের একপার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গিনী উপবিষ্ট, চিঠি দুইটা অর্দ্ধ উন্মুক্ত অবস্থায় তাঁহার নিকট পড়িয়া আছে। ঝড় বর্ষার পালা শেষ, এখন ক্লান্ত স্বামী স্রোতে গা ভাসাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন; পত্নী বলিতেছেন,—"ঠাকুরপো সারা-জীবন তোমাকে জ্বালালে আর জ্বালাবেও; এখন একটা বদনাম দেবারও চেষ্টা কচ্ছে; বাদায় যে এলাকা কেনা হয়েছে আমার নামে তার খোঁজ কোথা থেকে পেয়েই এই সব 'ধার ধোর' 'অসুখ বিসুখ', কিছু নয় কেবল হিংসা; আমার নামে কেনা হ'ল বলে আমার দাদা এত কষ্ট করে দেখাশুনা, লেখাপড়া এমন কি টাকার পর্য্যন্ত যোগাড় করে দিলে—এতে তোমার ভাইয়ের কি দাবী শুনি? জমিদারী দেখাশুনা হাড় মাস কালী করা, এসব কর তুমি আর আমি তোফা সাহেব সেজে ঘুরে বেড়াই আর অর্দ্ধেক ভাগ নিই ঠিক সময়ে—কেন, কত মাইনে দিচ্ছে? হাঁফানি অসুখ মারাত্মক আবার কবে হয়? ভোগান্তি বটে; উনি একটু লেখাপড়া শিখেছেন কিনা তাই মূর্খ বলে তোমায় ওই রকম বুঝিয়েছেন— "ব্রজকিশোর পাশ ফিরিয়া বলিলেন,—"সে আমি করব এখন; কিন্তু কথা হচ্ছে চারদিক সামলাই কেমন করে; বাদায় এলাকা কেনা হয়েছে তার কাছে গোপন রাখলে টাকা পাঠাতে হয়; তোমার দাদা টাকা যোগাড় করে দিয়েছে বটে কিন্তু আমি যে টাকা তাকে দিয়ে রেখেছি প্রায় তিন লাখ, সেটা যে আটকে গেছে; আর এদিকে ধার করা টাকার সুদ গুণতে হচ্ছে কত তা জান না—বাদার এলাকা তো ভারি আয় এক পয়সা নেই আবার খরচের বহর সামনে শুনলে—; কি যে করি?" "হ্যাঁ এখন সব দোষ আমার দাদার ওপর দাও, আর আমি রাগ করে বলি, চাই না তোমার বাদার জমিদারী—দাও তোমার লক্ষণ ভাইয়ের হাতে তুলে, আর এদিকে আবার শুনিয়ে রাখছ—আয় টায় কিছু নেই—কি চালাক তুমি, কিন্তু আমিও এতদিন ধরে তোমার কাছে শিখছি—তোমার কূট বুদ্ধি আমার কাছে চলবে না—আমি রাগ করব না মোটে, একেবারে চুপ ক'রে থাকব; বাদার এলাকা আমায়—আমি আর কিছু বুঝি না। আমার চটিয়ে মতলব হাঁসিল কর্ব্বে সেটি হচ্চে না।" স্বামীর প্রসারিত দক্ষিণ পদের তলদেশে একটি ছোট চিমটি কাটিয়া চারুবালা সহাস্য মুখে যুক্তির চূড়ান্ত ও সমাধান করিলেন। ব্রজকিশোর শুষ্ক জীবনে, দাম্পত্য রসাস্বাদ মানসে শিথিল দেহকে একটু নাড়া দিয়া লইলেন, মুখে একটা অর্দ্ধ চটুল অর্দ্ধ কষ্ট হাসি, তরল কঠিনের দ্বন্দ্বযুক্ত সবে মাত্র দেখা দিয়াছে, এমন সময় গিরি ঝি আসিয়া নিবেদন করিল "খোকা বাবু মন্দিরের রোয়াকে ভিরমী গেছে।" চারুবালা বিরক্তভাবে বলিলেন, "নেশাটেশা করেনি তো?" ব্রজকিশোরের কর্ণে আর অধিক কিছু প্রবেশ করিল না; স্থান কাল পাত্রোচিত গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া তখন তিনি একপ্রকার ছুটিয়াই চলিয়াছেন। মন্দির সন্নিকটে জনতা দেখিয়া গতি কিঞ্চিৎ মন্থর হইল; সেখানে গিয়া জানিলেন, ললিতের জ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে দু একজনের সাহায্যে অন্দরের দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানে নাই, জনতা কেবল ঘটনার জন্য। অন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যস্ত পরিচারকবৃন্দের নিকট প্রশ্নে ব্রজকিশোর এইটুকু বুঝিলেন, ললিত তাহার ঘরে একাকী অর্গল বদ্ধ করিয়া আছে। তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে, বলিয়াছে "এখন আমায় কেউ বিরক্ত কোরো না।" ব্রজকিশোরের একবার ইচ্ছা হইল ললিতকে ডাকেন, তাহার কক্ষ দ্বারে গিয়া একটু দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই আবার নীরবে চলিয়া আসিলেন। ললিত কক্ষমধ্য হইতে পিতার পদশব্দ শুনিল, মনে বাসনা পিতা যেন ব্যাকুল হইয়া একবার আসেন। দ্বারের নিকট তিনি দাঁড়াইয়াছেন বুঝিয়া মনে একবার আশার সঞ্চার হইল কিন্তু পরক্ষণেই আশঙ্কা হইল যদি সত্যই পিতা কক্ষমধ্যে আসিতে অভিলাষী হন সে কি কথা বলিবে? সুতরাং পিতার প্রস্থান বুঝিয়া সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু আবার, মাতৃহারা স্নেহ-বঞ্চিত অন্তরে বিষাদের আধিপত্য দেখা দিল।

আহারে বসিয়া ব্রজকিশোর শুনিলেন, আজ ললিত আগেই আহার করিয়া গিয়াছে, তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মালতীকে দাহ করিয়া আসা অবধি রাজু অভিভূতের মত দিন কাটাইতেছিল; নির্ব্বাক, নিরপেক্ষ,—তাহার দৃষ্টি শূন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল—। গ্রামের লোকেরা এমন কি বন্ধুরা পর্য্যন্ত তাহাকে পরিহার করিয়া চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই; তাহার সে দিকটা মরিয়া গিয়াছে—একটা গাঢ় ঔদাসীন্যে তাহার জীবন পরিবৃত। এই সুদৃঢ় ব্যবধানের উপাদান ছিল দুইটা, যাহাতে বন্ধুরা তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আকস্মিক শোক তাহাকে অপরিচিত রাজ্যে লইয়া গিয়াছে, সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মানুষের ন্যায় সকলের সন্দেহের স্থল হইয়াছে, 'বউ মরলেই কি এমন করে থাকতে হয়—'। নিত্য পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এক নূতন জীব প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অনেকে পাশ কাটাইতে চাহে, কেহ বা দৈব অভিশাপের লক্ষ্যস্থল জনের সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় নহে ইহাই মনে করে, কাহারও বা মনের ভাব, রাজু আসিয়া আগে নিজে ধরা দিক্—সান্ত্বনা ভিক্ষার বাণী তাহার চক্ষে দেখিলেও তাহারা যথেষ্ট মনে করিবে। কিন্তু ব্যবধান ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে লাগিল। ক্ষণিক ইচ্ছা ক্রমে সুযোগ পাইয়া নির্ব্বিবাদে অভ্যাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রমাদ বাড়িয়াই চলিল; রাজু আজন্ম পরিচিত গ্রামের আবাল বৃদ্ধের মধ্যে প্রেতের মত আসিতে যাইতে লাগিল, সে আসা যাওয়াও কচিৎ কদাপি। রাজুর যেন আর চলাফেরার স্পৃহা নাই। যে পেশী সর্ব্বদা লীলা চঞ্চল হইতে ব্যাকুল থাকিত তাহারা যেন ঘোর মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাজুর দৈনিক জীবন-পথ বর্ত্তমানে অতি সংকীর্ণ; সে জীবনের অভ্যস্ত বহু কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া যেটুকু না করিলেই নয়, সেইটুকু কোনওরূপে সমাধা করিয়া চলিতেছে। জমীদার বাড়ীর কাজে আর যায় না, লাঠি কুস্তির আড্ডা, যেখানে সে তাহার নিতান্ত ভক্তদের উৎসাহের রূপ, সেখানে তাহার পা পড়ে না। সামান্য রকমের রান্না বাড়া করিয়া হারাধনকে খাওয়াইত, নিজে খাইত। তবে গৃহস্থালীর কাজে তাহার উৎসাহ বাড়িয়াছে; সে পূর্ব্বে কখনও যে সব লক্ষ্য করে নাই এখন কেমন করিয়া সেই সব, মালতী কেমন করিয়া কোন জিনিষটি কোথায় রাখিত, কোনটিকে বেশী পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করিতে ভালবাসিত, কোন কাজে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল—স্পষ্ট তাহার চক্ষুর সামনে ভাসিতে লাগিল। ঠিক মালতীর মত সেইভাবে সেই কাজটি করিবার চেষ্টা সে অবিরাম করিত, তাহার এই সময়ের কালযাপনের রহস্য যতক্ষণ ঠিক না মনঃপূত হইত ততক্ষণ বিরক্তিহীন চেষ্টা, তাহাতে কত ধৈর্য্য কত মনোযোগ আবার ক্ষণিকের জন্য একবার তৃপ্তি আসিলে সে তৃপ্তি কত গাঢ় কত আবেশময় কত চৈতন্যময়—অন্যমনস্ক ভাবে সে থালা বাটি হাতা কড়া লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকিত। তাহার অন্তরের আত্মা এইরূপে এক অতি নিভৃত অভিসারে বিভোর, সে বার্ত্তা তাহার নিজের নিকটও গুপ্ত রহস্যময়। আপনার অজ্ঞাতসারে সে তখন আপনি মালতীর অপহৃত সত্তাকে নিজের মধ্যে পুনর্জ্জীবিত করিতে তন্ময়; বাস্তবের ক্ষুদ্র বঞ্চনাকে উপেক্ষা করিয়া অতীন্দ্রিয় বিলাপে সে মগ্ন।

রাজুর অন্ধ ভক্তেরা বাধা পাইল অভিমানে, সংকোচে। আর তাহাদের প্রধান প্রতিবন্ধক হইল হারাধন, 'এ একটা আপদ আবার কেন জুটল'—সে যে কুলটা বৈষ্ণবী কন্যার সন্তান তাহা সকলেই জানিয়াছে, মালতীর মৃত্যু কাহিনীও কথকের রুচি অনুযায়ী রঞ্জিত হইয়া নানা অদ্ভুত বিকৃতরূপে গ্রামময় রাষ্ট্র—এ সকল তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিত না—তাহারা যে রাজুর দল, তাহাকে পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে, আমোদে, বিপদে মাথায় রাখিতে পারে তবে রাজু কেন সহজভাবে সত্য মিথ্যা যাহা তাহার মন চায় একটা বিবরণ, এই সকলের নির্দ্দেশ, তাহাদের কাছে বলে না – সেটুকুও কি তাহাদের প্রাপ্য নহে; কুলটার পুত্র লইয়া সে এত ব্যস্ত যে তাহাদের ধরা ছোঁয়াই দিতে চাহে না—এই ভাবে তাহারা দূরে রহিল, অযাচিত সহানুভূতি ভ্রান্তি বশতঃই দেওয়া যায়—উন্মীলিত চক্ষে, উন্মুক্ত দিবালোকে কি তাহা সম্ভবে? আশ্চর্য্যের বিষয় রাজুর এই নিরালা জীবনের সাক্ষ্য হারাধনের সহিত তাহার কোনও সংঘর্ষ হইল না; হারাধনকে দেখিলেই যদিও প্রথম প্রথম তাহার চক্ষুর ভিতর যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু ক্রমে সে ভাব মন্দ হইয়া আসিল, তাহার প্রতি রাজুর স্নেহ বা সেইজাতীয় কোন ভাবের আরোপ করা বাতুলতা হইবে সত্য, কিন্তু অনভ্যস্ত

তাহার পক্ষে এই শিশুর পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধান প্রশংসার যোগ্য। হারাধন স্নেহের ক্ষুধা কি জানে না, রাজুর বিড়ম্বিত হইবার কিছু নাই—তাহার ক্ষুধা ছিল জঠরের, সেইটুকু পরিতৃপ্ত করা রাজুর আয়ত্তাধীন। জন্মাবধি হারাধনের স্নেহের বালাই নাই; মমতা বিবেক বিবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খলতার নীড়ে সে চক্ষু মেলিয়াছে, মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়াছে উপেক্ষায় অনাদরে, অযথা অকস্মাৎ নির্য্যাতনে তাহার পুষ্টি; যে বৃত্তিগুলিকে আমরা জীবনধারা রক্ষার অনুকূল বলিয়া পিতা মাতা প্রতিবেশীর মনে প্রকৃতি রোপণ করিয়াছে বলিয়া মনে করি, যাহা আমাদের সামাজিক জীবন অব্যাহত রাখিবার জন্য সংস্কারগত মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই সকলের বিপক্ষে সাক্ষ্য এই বালক হারাধন; স্নেহ আদরের অপেক্ষা সে করে না, তাহাদের বিহনে সে ম্রিয়মাণ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন; প্রাণ রক্ষা ও দেহ পুষ্টির আবশ্যক শক্তির তাহার মধ্যে এত শীঘ্রই উন্মেষ হইয়াছে—আহার্য্য দ্রব্য কোথায় আছে, কি উপায়ে লইতে হইবে, তাহা সে চট্ করিয়া বুঝিতে পারে, বড় বড় স্বজাতিদের কেমন করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে হয়, ভ্রুকুটি দৃষ্টির অন্তরালে, সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেও কেমন করিয়া নিজের অস্তিত্ব স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন ভাবে বজায় রাখিতে হয়, সে শিক্ষা যেন তাহার জন্মায়ত্ত—শিশু স্বাস্থ্যের অনুকূল ব্যায়াম বিস্তায় তাহার সাধনা দেখিলে দৈবদত্ত বলিয়া মনে হইবে। এই অভিনব ঘটনা সমাবেশের আবর্ত্তে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহে, তাই সে রাজুর অতিরিক্ত অশান্তির কারণ নহে। রাজু ও হারাধন পাশাপাশি থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন জগতে বিচরণ করিতেছে—উভয়েই আপন আপন জগতে তন্ময়।

চন্দ্রপাঠক নিরলস পুরুষ, কমলার কৃপালাভ কি এমনিই হয়!—কিন্তু তাঁহার প্রৌঢ়ের কর্ম্মবাহুল্য অতীত জীবনকে যেন ম্লান করিয়াছে--। ব্যবসাক্ষেত্রে নূতন উদ্যম—মহা-বিক্রমে মারোয়াড়ীর প্রদর্শিত পথে গ্রামের মধ্যে সারি সারি কতকগুলি দরমার বেড়া দেওয়া আটচালা ছোলা ও অড়হরে পূর্ণ করা হইয়াছে; সম্প্রতি মারোয়াড়ী দূর 'পূব' হইতে কতকগুলি নৌকা ক্রয় করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছে—মাল নিজ নৌকায় বোঝাই হইয়া আপন ইচ্ছামত কলিকাতা যাইবে। মারোয়াড়ী পাঠকের বড় অনুরক্ত আর সে যাহা বলে সব অকাট্য। সপ্তাহব্যাপী দৈত্যের মত পরিশ্রমে তাহারা চাষাপাড়া মন্থন করিয়াছে, গ্রামের অনেক চাষী, গৃহস্থ দোহনক্লান্ত হইয়া কতকটা বিস্ময় আবার কতকটা আরামও অনুভব করিতেছে, সংশয় বিস্ময় প্রশংসা সর্ব্বত্রই বিরাজিত, দূরের কয়েকটি গ্রামও আলোড়িত। আজ মারোয়াড়ী অল্পকালের জন্য বিদায় লইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিতে, পাঠক রাজুর সহিত সেই থেই-হারান কলহের সূত্র পুনরায় নিপুণ হস্তে তুলিয়া লইলেন। অবসর কি শূন্য? সেও ভরাট হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, অবসরেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, কিছু একটা করে; বিশেষতঃ মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে মহৎ কার্য্য করিবার সময় নির্ব্বাচনে অবসরের প্রতিই একটা পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়—যেমন নিউটন, ষ্টিভেন্সন্ ইত্যাদি; আমাদের গান্ধীও অবসর সময়ে চরকা কাটিয়া দেশ উদ্ধার করিতে বলেন।

ধীরেন মণ্ডলের বাড়ী পর্য্যন্ত হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হইল; তাহার ছোলার দাম, গাড়ীর ভাড়া সব নগদ মিটিয়া গেল। ভবিষ্যতে গাড়ী ভাড়ার জন্য যায় না, ফসলের জন্য দাদন লইতে তাহাকে পাঠক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; ধীরেন ভিজিল, তাহার অভাব প্রচণ্ড। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধরম কাহিনী—হরিমতী ও খুদীর পরিত্যক্ত বহু নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদির অস্তিত্বের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই চতুর পাঠক বুঝিলেন, এই একরোখা পাগলের বিষয়-বুদ্ধি মোটেই নাই, প্রকৃষ্ট বিষয়নৈতিক বন্ধুর অবয়বাদির প্রতি তাহার আক্রোশ হঠাৎ প্রবল হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ আছে। বখরাদার সে হইবে না, কিন্তু প্রতারিত হইতে পারে।

অক্ষয় এই সময়টা বেকার বসিয়াছিল; তবে যদি নব দাম্পত্য জীবন সড়গড় করিয়া লওয়া কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহার পরিশ্রমের অবধি নাই। পাঠকের দোকানে তাম্রকূট ধ্বংস ও নানা ইংরাজী গল্পে তাহার বুদ্ধি, ভ্রংশ এ অবশ্য তাহার নিত্য কর্ত্তব্যেরই অন্তর্গত। পাঠক তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিল, কর্ম্মী যুবক সানন্দে সহায় হইল।—রাজুর উপর অক্ষয়েরও

একটা আক্রোশ আছে, তাহা অধিক পুরাতন হইলেও পাঠকের অপেক্ষা জ্বালায় ন্যূন নহে। জ্ঞান বাবুর সহিত একবার পরামর্শের বৈঠকও বসিল, সহানুভূতি প্রবল কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির অভাব, জ্ঞান বাবুর নিকট হইতে ওজস্বিনী ভাষা ছাড়া বিশেষ কিছু লভ্য হইল না।

পাঠক প্রথমে কৌশল স্থির করিয়াছিলেন, রাজুর বিপক্ষে ধীরেনের মত একজন গোঁয়ার লোককে উত্তেজিত করিতে পারিলে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ কিছুকাল পূর্ব্বেও ধীরেনের ভাল লাঠিয়াল বলিয়া একটা খ্যাতি ছিল, রাজুর খ্যাতিতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এ কৌশল অক্ষয়ের মনঃপূত হইল না; যদিও মণ্ডলকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার শারীরিক শৌর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ না থাকিলেও, কেবলমাত্র লাঠি বাজি ও গোঁয়ারতুমির উপর নির্ভর করা উচিত নহে, পুলিশের শক্তিকে স্বপক্ষে আনা তাহার বিবেচনায় প্রকৃষ্ট পন্থা। যতই হউক ধীরেন হরিমতীর পিতা; হরিমতীর দৌহিত্র ও হরিমতীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তাহার একটা দাবী আছে; কন্যার দৌহিত্রের জন্য তাহাকে উত্তেজিত করা, অর্থ লোভে উৎসাহিত করা অপেক্ষা নিরাপদ ও সহজ হইবে অক্ষয়ের এই মীমাংসা পাঠকের প্রশংসায় ধন্য হইল; তখন বাকী রহিল কেবল মণ্ডলকে পথে আনা; টাকা অলঙ্কারের প্রলোভন ধীরেনের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে অক্ষয় আগেই শুনিয়াছে, সে এই বিষয়ের ভার লইল। পাঠকের দোকানেই অক্ষয় ধীরেনের সহিত আলাপ করিল, এই জীবনে তাহার সহিত প্রথম বাক্য বিনিময়; অক্ষয় মিশনারী স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে; বাইবেল লইয়া কথা পাড়িল, সমবেদনার সুরে বাইবেলের বাছা বাছা কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে ধীরেনকে চমকিত ত' করিলই অধিকন্তু তাহার অন্তর রাজ্যে প্রবেশের পথও অনেকটা সুগম করিল, খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে হারাধনের প্রসঙ্গ উঠিল; এ বালক হিন্দু সমাজে কখন স্থান পাইবে না, কদর্য্যভাবে কুৎসিৎ চরিত্র লইয়া বড় হইয়া উঠিবে আর খৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় পাইলে পক্ষান্তরে শিক্ষার সুযোগ পাইবে, পিতামাতার পাপের বোঝায় তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া থাকিবে না—এ কথা স্মরিতে শেষ করিয়া সে ধীরেনের ভাবী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অথচ সুস্পষ্ট চিত্র আঁকিতে মনোনিবেশ করিল—বালকের আর কে আছে? ক্ষুদ্র অসহায় শিশু ধীরেনের মুখ চাহিয়া আছে—রাজু তাহাকে বড় করিয়া বিক্রয় করিবে বৈতো নয়—আর একদিকে যীশু ধীরেনের মুখের দিকে সোৎসাহে চাহিয়া আছেন, এই ক্ষুদ্র আত্মাকে আমার পথ দেখাও, তাহার উদ্ধারের কারণ তুমি হও। ধীরেনের মুখভঙ্গীর উপর বক্র দৃষ্টি রাখিয়া বয়সে নবীন অক্ষয় প্রবীণ খেলোয়াড়ের মত একে একে পরে পরে এই সমস্ত অবতারণা যখন সমাপ্ত করিল তখন ধীরেনের চক্ষু বহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। ভারি গলায় ধীরেন কহিল, "এখন করি কি? আমার নিজের ব'লে তুলে নেবার মুখ আর রাখল কৈ? এখন সে রেজো ছোঁড়া, ছাড়বে কেন? আমার হয়ে দুকথা বলবার এ গ্রামে কেউ নেই।"

তখন অক্ষয় পরামর্শ-দাতার আসন গ্রহণ করিল; কর্ত্তা বাবু রাজুকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন, সেখানে কোন ফল অবশ্য হইবে না কিন্তু সরকার আছে, দারোগা বাবুর হাজার হইলেও চোখের চামড়া আছে, রাজার একটা ন্যায় বিচার আছেই—এই সব পরামর্শ ধীরেন নীরবে অনুমোদন করিল; অক্ষয়ের ইঙ্গিতে এই সময় চন্দ্রপাঠক আসিয়া যোগ দিলেন, অক্ষয়ের সৎপরামর্শ দান ও বিদ্যা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অবশেষে অক্ষয়ের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিতে ধীরেন যখন সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইল, তখন পাঠক ও অক্ষয় উভয়ে পৃষ্ঠপোষকরূপে তাহার সহিত থানায় দারোগা বাবুর নিকট দরবার করিবার ভরসা দিলেন—আগামী কল্য একটু গা ঢাকা অন্ধকারের সময় প্রশস্ত নির্ব্বাচিত হইলে ধীরেন বিদায় লইল।

সন্ধ্যার সময়, চাঁদ উঠিতে তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। থানার ছোট রোয়াকে একটি চৌকির উপর দারোগা বাবু আসীন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কিন্তু শ্মশ্রু গুম্ফের আড়ম্বর মৌলবী দর্প-চূর্ণকারী, হাতে আলবোলার নল, তাম্রকূট সুন্দরী অল্পক্ষণ হইল সেবা কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন, মশকেরা গুণ গুণ রবে দাড়ি গোঁফের উপবনে নৈশ বিশ্রাম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বদ্ধপরিকর, পাগড়ী ছাড়া সরকারী পোষাকে দেহ

গৌরব মণ্ডিত, বেসরকারী পরিচ্ছদ দারোগা বাবু প্রায়ই পারিতেন না; অফিস ঘরের উন্মুক্ত দ্বার পথে একটি বড় টেবিল সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রাত্রে নিদ্রামগ্ন দারোগা দেহের সঙ্গীতগর্ভ বাহন—এখন বক্ষে কতকগুলি খাতা ও একটি বড় আলো লইয়া বিরাজমান—অন্যান্য আসবাবের মধ্যে কয়েকটি টুল, একটি বেঞ্চি, ব্যাগ্ ইত্যাদি। একজন কনষ্টেবল দারোগা বাবুর জন্য রন্ধন করিতেছে, অন্যটি অদূরে গোয়ালে তাঁহারই গরুকে দোহন করিতেছে। দারোগা বাবু একাকী নীরবে আসীন, এমন সময়ে পথের উপর তিনটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল—দর্শন মাত্রেই দারোগা হৃদয়ে দারুণ বাসনা সঞ্জাত হইল—যেই হউক তাহাদের ডাকিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিবেন; শরীরের যে স্থানটা কথা দেবের খাসকামরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, দারোগা বাবুর সেই-খানে ধমক জাতীয় অনেকগুলি কথা সদাই ঠাসা থাকিত।

তিনি দারোগা পদোচিত কণ্ঠস্বর আয়ত্বে আছে কিনা পরীক্ষা করিতে একবার মাত্র গলা ঝাড়িয়াছেন, এমন সময় আগন্তুকেরা থানার রোয়াকেই উঠিয়া আসিল; একজন ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল, একজন স্থির দাঁড়াইয়া রহিল আর একজন ইংরাজীতে সুসন্ধ্যা জ্ঞাপনে দারোগা বাবুকে আপ্যায়িত করিল। আর একটি টুল আনান হইল। অক্ষয় আসন গ্রহণ করিয়াছে, পাঠক দাঁড়াইয়া রহিল, আর ধীরেন মাটির উপর একটা থাম হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল।

দারোগা—তারপর শরীর গতিক সব ভাল (আলবোলায় পোষাকী মৃদু টান) মাষ্টার মশাই ভাল আছেন?

অক্ষয়—সব মঙ্গল আপনার আশীর্ব্বাদে—আপনার বাড়ীর খবর সব কুশল?

দারোগা—নাঃ, সব ভাল আর কই—দেশে বড় অসুখ বিসুখ হচ্ছে—তারপর এরা সঙ্গে? কোনও কাজ আছে বুঝি?

অক্ষয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু পরামর্শ নিতে এসেছি।

অতঃপর ঈষৎ নিম্ন সুরে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা দারোগার নিকট বিবৃত করিয়া, অক্ষয়, পাঠক ও ধীরেনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এই কথাই তো না আর কিছু?" পাঠক ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন, ধীরেন বলিল, "ছেলেটাকে আমি পাই এইটুকু করে দিন—নাড়ীর সম্পর্ক চোখের সামনে অপঘাত হবে, সহ্য হবে না, আমি তাকে নিয়ে বড় করে তুলব।" দারোগা বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া অক্ষয়কে জানাইলেন, ব্যাপার বড় জটিল, কেস্ কি ভাবে হাতে লইলে সুবিধা হয় তাহা এখন বুঝা যাইতেছে না, তাহার পর অক্ষয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, বাদী কে হইবে, খরচ পত্র করিবার সামর্থ্য কিরূপ, কারণ বর্ত্তমান কেস—পরিশ্রম ও সদর দারোগার পরামর্শ সাপেক্ষ—ছেলে চুরি বলিয়া কেস্ দাঁড় করান বড় কষ্টকর, তবে টাকা কড়ি সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিযোগ আনিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে—তাহার পর অন্তরালে গিয়া দুইজনে আবার পরামর্শের মহল্লা চলিল, পাঠকও সেই পরামর্শে যোগ দিতে অবশেষে আহূত হইল; ধীরেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "যাই করুন আমার ওই ছেলে পেলেই হোলো, কারুর সাজা হওয়া চাই না, টাকার কথা জানিও না, চাইও না।" দারোগা বাবু উত্তর দিলেন, "আইন যেরকম আছে সেই রকম কর্ত্তে হবে, তোমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু আসে যায় না—চল ডায়েরী করাবে।" অক্ষয়ের সঙ্গে দারোগা বাবু আফিস ঘরে প্রবেশ করিলে চন্দ্রপাঠক বলিল,—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, যেমন করে হোক ছেলেকে বাঁচাতে হবেই।" এই বলিতে বলিতে ধীরেনকে সম্মুখে করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল।—

(ক্রমশঃ)

দীওয়ান-এ-হাফেজ

[কাদের নওয়াজ]

(মূল ফার্সিতে এই গজলটী সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের। ইহার প্রথম চরণ ফার্সি ও দ্বিতীয় চরণ আরবী ভাষায় লিখিত। এম্‌নি ক'রে পর পর একটী চরণ ফার্সি এবং অপরটী আরবী এইরূপ ভাবে শেষ পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছে। কেবল ষষ্ঠ চরণটী অন্য রকমের। কিন্তু তা' হ'লেও একথা সত্যি যে সব চরণগুলিরই ধ্বনি এক রকমের, পড়্‌তে সুরু কর্‌লে মনে হয় যেন তালে তালে পা থুয়ে উটের সারি ছু'লে ছু'লে চলেছে। আরবী সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন না হ'য়ে কেবল ফার্সি-জানা বিদ্যা নিয়ে এই সব কবিতার ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়)।

"আজ্‌ খুন্‌ নভাশ্‌তম্‌ নজ্‌দীক্‌ ইয়ার নামা"

বক্ষ চিরি' রক্ত দিয়ে লিখ্‌ছি চিঠি প্রিয়ায় মম ।
বিচ্ছেদে তার বিশ্ব-ভুবন লাগ্‌ছে চোখে প্রলয় সম ॥
পরীক্ষিয়া হৃদয় যাহার পেলাম ফিরি' নিষ্ফলতাই
আবার তা'রে কর্‌ব পরখ—লজ্জা দারুণ, আমায় ক্ষম।
মোর নয়নে তোর বিরহের চিহ্ন কতই রয় প্রেয়সী
নেই শুধু হায় অশ্রুকণা, চিহ্ন এ যে ভীষণতম।
জিজ্ঞাসিলে ভিষক্‌ সে এক ব'ল্ল "রে তুই প্রিয়ার থেকে
থাক্‌লে দূরে দুখের কাঁটা বিঁধবে বুকে সায়কসম।
আর যদি তার থাকিস্‌ কাছে দেখ্‌বি তবে প্রেমিক কবি
অনুতাপের দাব্‌দাহে সে পুড়িয়ে দিবে পরাণ মন'।"
উত্তরে তার কইনু আমি "মোর প্রেয়সীর আঘাত ছাড়া
প্রেম কি কভু যায় গো পাওয়া হয় কি ব্যথার উপশম ?
আহত এই প্রাণের ক্ষত কেউ জানে না ধরার 'পরে
মোর লেখনীর অশ্রুতে সব হবেই প্রকাশ প্রিয়তম।
আস্‌লে প্রভাতে মেঘ্‌-আবরণ সরায় যেমন উষার রবি
ভোরের হাওয়া তেম্‌নি আমার সরায় দুখের পর্দ্দা ঘন।
তুই হাফেজের বাঞ্ছিত ধন দিল্‌-পিয়ারী তন্বী সাকী
দিস্‌ মিলনের পান-পেয়ালা প্রাণ ল'য়ে মোর শারাব সম।

আজ প্রভাতে পাত্র সুরার পূর্ণ কর' হে মোর সাকি !
লও ঝটিতি কার্য্য সারি' নশ্বর এই বিশ্বে থাকি'।
ধরার লীলা সাঙ্গ হ'বার আগেই প্রিয়ে আমার হাতে
দাও মদিরার লাল পেয়ালা পড়ুক ঢুলি' অলস আঁখি।
পূব্‌ গগনের পান্‌-পেয়ালায় সুরার মতই লোহিৎ বরণ
উঠ্‌ছে অরুণ, কইরে তরুণ ! উঠ্‌ জেগে আজ সুপ্তি রাখি।

মাটীর দেহ যে দিন এ মোর মাটির সাথেই মিশিয়ে যাবে
সেই মাটিতে অন্য মানুষ গড়বে বিধি স্বর্গে থাকি—
সেদিন মাথার 'খুলি'টি মোর পান্-পেয়ালার মতই প্রিয়ে
লাগাও যেন সুরার কাজে,—এই অনুরোধ রাখ্‌বে নাকি ?
ধার্ম্মিক নই, কিম্বা আমি পাপ ত্যজিতে প্রতিশ্রুতি,
দিইনি কভু, কিন্তু জানি লোক-দেখানো ধর্ম্মটা কি !
তাই ত' আজি বিনয় করি, বন্ধু প্রিয়ে তরুণ সাকী
সুরার রঙীণ পাত্র-পানে বারেক মোরে লও গো ডাকি'।
ক্ষণিক জলবিম্ব সম, দৃষ্টি রাখি, পান্-পেয়ালায়
দেখ্ প্রেয়সী বিশ্ব-ভুবন সলিলকণার মতই ফাঁকী।
ক্ষণস্থায়ী জীবন মোদের বসন্তেরি ঋতুর সম
চালাও সুরা গেলাস্ গেলাস্ আর বেশী দিন নাই যে বাকী।
মিষ্টি শারাব পানের চেয়ে পুণ্য কিছুই নাই এ ধরায়
. পান্ ক'রে চল্ সেই সুরা তুই সাকীর ছবি বক্ষে আঁকি। *

ভাবাদর্শে সর্ব্ব জাতির ঐক্যসাধন

[স্বামী বাসুদেবানন্দ]

সভ্যতা জিনিষটা যে কী—তার সঠিক নির্ণয় বড় কঠিন, কারণ প্রত্যেক জাতির সভ্যতার আদর্শ বিভিন্ন এবং সকলেই স্ব স্ব আদর্শে সন্তুষ্ট। কিন্তু সভ্যতার রূপ, বিশেষতঃ ভারতীয় সভ্যতার যে কি রূপ সেটা আলোচনা না করে, তার মূল উৎস কী, সেইটে নির্ণয় করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইউরোপী সভ্যতাই এখন সর্ব্বপ্রধান এবং বহুলোকের মতে সেটা ধ্বংস মুখী, তার হেতুই বা কী,—ভারতীয় সভ্যতাকে উজ্জীবিত রাখবার জন্য সেটাও প্রণিধান যোগ্য। প্রতি সভ্যতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সহজাত বুদ্ধি (instinct), বিচার-বুদ্ধি (intellect) ও ভাবুকতা (emotion) সহায়েই তারা গড়ে উঠেচে। প্রথম বুদ্ধি মানুষকে খাওয়া পরার সংস্থান করায়, দ্বিতীয় বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে, তার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করে এবং তৃতীয় ভাবুকতা প্রথম ও দ্বিতীয়ের কার্কশ্য দূর করে, অপ্রাপ্ত-আদর্শ ও একতার বোধ জাগিয়ে তোলে। কেউ কেউ বলেন, সভ্যতা জিনিষটা মানুষের বিচার বুদ্ধির ফল, কেউ কেউ বলেন, বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান এবং আবহাওয়ায় বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রথম ও দ্বিতীয়টা যে একেবারে অকেজো তা আমরা বল্‌তে চাই না। দেহের ধর্ম্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নাই, সহজাত-বুদ্ধিকে সে অভাব মেটাবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টা রেখেচে। পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ সর্ব্বত্রই এই সহজাত বুদ্ধির প্রভাব। কিন্তু অভাবের তাড়না যা জীবনকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়, সেটাই যে সভ্যতার একমাত্র হেতু তা বলতে পারি না। কারণ মানবের অতি নিম্নস্তরে এই অভাব বোধ থাকলেও তারা এত পিছিয়ে পড়ে থাকে কেন ? আবার বিচার-বুদ্ধি সভ্যতার প্রগতির

* আগামী সংখ্যায় হাফেজের 'তাজা বতাজা নওবানও' এই বিখ্যাত গজলের অনুবাদ বাহির হইবে।

সহায়ক হলেও তা বেশীদূর অগ্রসর হলেই নিষ্ঠুর ও অতৃপ্তিকর হয়েই বা দাঁড়ায় কেন? বিচার-বুদ্ধি, খাওয়াপরা প্রভৃতি সকল বিষয়ের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে, ভোগের উপকরণের সংস্থানের সহায়কও হতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তার কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হলেই সে দেখতে পায় যে হীরা ও কয়লার মূল্য এক, বৃদ্ধ পিতা বা সংযম পবিত্রতার মূল্য নেই, ওগুলো মানবের মন গড়া। ঐ ভাবে যদি মানুষ চলে তবে ব্যবহারিক রাজ্যে তার স্থান ঐ পশুত্বেই নির্দ্দিষ্ট হবে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো যুক্তিহীন সংবৃত জ্ঞান (Convention) অতি নিম্নস্তর থেকে আরম্ভ করে অতি সুসভ্য মানবে পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই অকারণে গৃহীত, আচরিত, প্রীতিকর এবং উন্নতির সোপান। এই সব পদ্ধতিগত-জ্ঞান, ধর্ম্ম, রসবোধ, সৌন্দর্য্য-প্রীতি প্রভৃতি অনেক অকারণ ভাব, মানবের কৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়ে সহজাত ও বিচার-বুদ্ধিকে মানব-ধর্ম্মে সিক্ত করে, প্রগতির উত্তেজক কারণে পরিণত হয়। এইটিই দেখান হবে।

বহুলোক যদি সমাজ-বদ্ধ না হয় তা হলে সভ্যতার কোনও রূপই গড়ে উঠতে পারে না। সমাজ-বদ্ধ হওয়ার হেতু একতাবোধ। এই যে ভারতবর্ষে অপরূপ কারুকার্য্য ভূষিত বিরাট মন্দির সকল রয়েচে—এ সব অসম্ভব হত যদি ভারতবাসী রেড্‌ইনের জীবন যাপন করিত। রোম বা গ্রীসের এত বড় সভ্যতা গড়ে উঠতে পারত না যদি তারা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মত নিরন্তর দ্বন্দ্ব নিয়ে দিন কাটাত। বহু লোকের সম্পদ ও পরিশ্রম একীভূত হয়ে উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনে, কুশলী দক্ষ লোকের মনের মধ্যে, কৃষ্টির মাধুরী সভ্যতা রূপে বাস্তবতায় ফুটে ওঠে। সেই জন্য যে জাতি যত সংঘবদ্ধ তারা তত সৃজনশীল এবং তুলনায় অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে জাতির এক গ্রাম তার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিরোধী তারাই থাকে পিছিয়ে পড়ে, অসভ্য হয়ে, যেমন ঐ প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের বাসীরা। আবার সেই অসভ্যরা একটু সংঘবদ্ধ হলেই কিছু না কিছু নতুন সৃষ্টি বা সভ্যতা তাদের মধ্যে রূপ নিয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। তা হলে বলতে হবে একতারই ওপর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। একতা আবার বহুযুগে বহু রাজশক্তি তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেচেন, যেমন আলেকজেণ্ডার, সিরাজ, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক প্রভৃতি। তবুও এ সব একতা কেন যে ক্ষণভঙ্গুর হয়ে রইল, তার কারণ পশুবল বা ভয় একতার কারণ নয়, যেখানেই একতা দৃঢ়বদ্ধ সেখানেই দেখা যায় কৃষ্টিহেতু হৃদয়ের আদান প্রদান। ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে দেখি, একটা মস্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হল কিন্তু যেই সেই রাজবংশ একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন বা কোনও সুযোগ উপস্থিত হল অমনি বিভিন্ন প্রদেশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে পরস্পর তরবারি উদ্যত করে রক্তেচ্ছু হয়ে দাঁড়াল। উদাহরণ, মধ্য ইউরোপ—প্রকাণ্ড অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজ্য স্থাপিত হল, কিন্তু সেই তথাকথিত একতার মধ্যে রইল অসংখ্য মনস্তাত্ত্বিক গোলযোগ; কেন না জেক ও জার্ম্মান, জার্ম্মান ও হাঙ্গেরিয়ান ও সার্ভ, সার্ভ ও রুমেনিয়ান, রুমেনিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান এবং জার্ম্মানে পরস্পর আন্তরিক অসদ্ভাব ও অবিশ্বাস চিরন্তনী হয়ে রয়েচে। ঠিক আমাদের দেশের পাঠান ও মোগল রাজত্ব খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার মধ্যে একই কারণ অঙ্কুররূপে বিদ্যমান ছিল।

এই সকল ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয়—মানবের একতা রাজনৈতিক-শাসন, বাণিজ্যের অদানপ্রদান, ভৌগলিক সীমা বা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বিসদৃশতার উপর খুব কমই নির্ভর করে, আসলে নির্ভর করে মনোবৃত্তির সাদৃশ্য আছে কি নেই। কিন্তু এত কাল একতা স্থাপনের জন্য মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করে তরবারি এবং ভৌগলিক সীমানার ওপর সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে জগতে কেবল সংঘর্ষের পর সংঘর্ষই চলে আসছে। কিন্তু এক একটা বিশেষ মানব গোষ্ঠির মধ্যে যে বিশেষ কোন ভাব বা ধারণার অনুশীলন অনাদি কাল থেকে আচরিত হয়ে আসছে, এই সকলের ওপর যদি জাতীয় সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহলে ভৌগলিক রাজনৈতিক সীমানা প্রতিষ্ঠার পরিশ্রম এবং রক্তপাতাপেক্ষা অনেক সুলভে শান্তি ও একতার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। অশোকের পরবর্ত্তী জীবনের সাম্রাজ্য-গঠন যদি আমরা বিশ্লেষণ করে

দেখি তা হ'লে সে গঠনে এই মনস্তত্ত্বই উপাদান বলে গৃহীত হয়েছিল বেশ স্পষ্ট অনুমিত হয়। এমনি শান্তির বিশাল রাজ্য প্রাচীন চীন প্রভৃতি বহুদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেই সব ধর্ম্মাশোকদের মনস্তত্ত্ব পরবর্ত্তী কালে তাঁদের উত্তরাধিকারীরা বুঝতে না পারায় ভাবের অখণ্ড সীমানা অসংখ্য খণ্ডে পরিণত হয়েছে। কত দেশের কত ইতিহাস লেখা হ'ল কিন্তু কেউ কখন অর্থনীতি বা রাজনীতিকে বাদ দিয়ে ভাবের দিক থেকে কি করে বিরাট সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টা কখন করেন নি। কতকগুলো কাটি এক সঙ্গে সূতো দিয়ে বাঁধলে তারা এক সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু সূতোটা ছিঁড়ে গেলেই তারা চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে; কারণ তাদের অন্তর্নিহিত সংহতি শক্তি নেই। কিন্তু একটা গাছ যখন তার ফুল পাতা ফল নিয়ে বেড়ে ওঠে তাদের সংহতি কোনও বাইরের শক্তির দ্বারা সাধিত নয়. তরুর অন্তর্নিহিত শক্তিতেই তার অঙ্গ সকল সংঘবদ্ধ। রাজনীতি বলপূর্ব্বক একটা একতা মধ্য ইউরোপে স্থাপন করেছিল বটে কিন্তু তার প্রতি ব্যক্তি সে একতায় সায় দিতে পারে নি, কারণ তারা অন্তর্নিহিত সংহতি-বোধ সে কৃত্রিম একতার মধ্যে খুঁজে পাই নি। দাঁতের কনকনানির মত সকল কার্য্যের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই দুঃখ অনুভব করত যে তারা এক জাত নয়, বাইরের একটা কৃত্রিম শৃঙ্খলে তাদের একত্রে বেঁধে রাখা হয়েচে।

মানব প্রকৃতির মধ্যে একত্ব বোধের অনুভব তার পারিবারিক জীবনের প্রারম্ভের সঙ্গে। এমন কি পশুদের মধ্যেও এই পারিবারিক জীবনের কিছু কিছু আভাস আমরা পাই—তারা দল বেঁধে থাকে, একজন আর একজনকে সাহায্য করে, দল রক্ষার জন্য এমন কি অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়, বহিঃ শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে এক হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং সুযোগ পেলেই নির্য্যাতন করে। পারিবারিক জীবনে একত্ব বোধ মানে, একই পিতামাতা থেকে জাত বলে একই রক্ত সকলের মধ্যে প্রবাহিত—এই ধারণা; তারপর বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এবং পরস্পরের সাহায্যে খাদ্য সংস্থান। এই হল সভ্যতার আদি বীজ-কোষ (Primal cell) এরই উপচয়ের দ্বারা পরিবার, সমাজ, শাসন, জাতি, সভ্যতা সব গড়ে উঠেচে। এই কল্পনাটা খুব দুঃসাহস বলে মনে হলেও ইতিহাসের ক্রম এর সাক্ষ্য দেয়। দেখা যায়, সকলের আগে পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল মাত্র জন্মের, শিশু পালনের সম্পূর্ণ ভার ছিল মার ওপর। এই মাতৃকেন্দ্র (Matriarchal) পরিবার খুব অস্থায়ী, কারণ গর্ভ কারণ বিচ্ছিন্ন। তারপর উদ্ভব হল পিতৃকেন্দ্র (Patriarchal) পরিবার। ব্যাধি ও জরা প্রথম মানুষকে নারীর উপকারিতা বুঝিয়ে দিলে, তাই নর নারীর সেবায় আসক্ত হয়ে পরিবারের সৃষ্টি করলে। সেখানে পিতা মতলব আঁটেন, আইন করেন, শাস্তি দেন। দীর্ঘায়ু নর তিন চার পুরুষ বংশ বৃদ্ধি পর্য্যন্ত বেঁচে থাকায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়তেন এবং পরে মৃত্যুর পর "পিতৃদেব" বলে উপাসিত হতেন। আইজাক (Isaac) মরে গেলেন, তাঁর এক পুত্র ইসা (Esau) ইডোমাইট (Edomite) বংশ স্থাপন করলেন, অপর পুত্র জ্যাকব (Jacob) ইসরাইল বংশ স্থাপন করলেন, কিন্তু আইজাক উভয় বংশের সাধারণ পিতৃদেবরূপে উপাসিত হতে লাগলেন এবং সমস্ত গোষ্ঠির (Race) মধ্যে একটা একতার সূত্র রয়ে গেল। স্বামিজীও ধর্ম্মের প্রথম সোপান যে পিতৃ উপাসনা তা স্বীকার করে গ্যাছেন। (১) তিনি আরও স্বীকার করে গ্যাছেন, অলৌকিক ধর্ম্ম-সূত্রই হচ্চে মানব সমষ্টির একতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। সহোদর ভাইয়ের চাইতেও এতে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্টি করে থাকে। (২)

(১) Man wants to keep up the memory of his dead relatives, and thinks they are living even when the body is dissolved, and he wants to place food for them and, in a certain sense, to worship them. Out of that, came the growth we call religion. Studying the ancient religions of the Egyptians, Babylonians, Chinese, and many other races in America and elsewhere, we find very clear traces of this ancestor-worship being the beginning of religion.—A Study of Religion, P. 14

(২) It is a well-known fact that persons worshipping the same God, believing in the same religion, have stood by each other, with much greater strength and constancy, than people of merely the same descent, or even than brothers.—A Study of Religion, P. 13

অতএব যাঁরা ধর্ম্মটাকে একটা মস্ত বিভাজক-শক্তি (separative force) বলে ত্যাগ করতে বলেন, তাঁরা জাতির মনস্তত্ত্ব একেবারেই বোঝেন না। আধুনিক ভাব-তাত্ত্বিকেরা (Emotionalists) এ সত্যের চমৎকার নির্দ্দেশ করেচেন। (৩)

যা হোক, এখন আমরা বলতে চাই, যে পিতৃ উপাসনাই হোক বা টোটেম (totem) উপাসনাই হোক (কোন কোন গোষ্টি তাদের পূর্ব্বপুরুষ কচ্ছপ, নেকড়ে প্রভৃতি বলে। এই সব জানোয়ারদের টোটেম বলে), মানবের মধ্যে যে একতার সৃষ্টি করেছে তা যুক্তি বা অপর কোনও উপায়ে নয়, ভাবের (emotion) ওপর। যখনই কোনও একটা সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েচে তখনই দেখা গ্যাছে যে কতকগুলো ভাব-সংহতির কৃষ্টি বহু লক্ষকে একত্রিত করেছে এবং তাদের শাসক তাদের কাছে সেই ভাব সংহতির আবিষ্কর্ত্তার প্রতিনিধি স্বরূপ:—যেমন হিন্দুর রাজা বিষ্ণুর প্রতিনিধি, পোপ খৃষ্টের প্রতিনিধি, খলিফা মহম্মদের প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিনিধি, অবতার ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রতিনিধির মধ্যে আদর্শের যেই অভাব ঘটে অথবা কোন উচ্চ আদর্শ এসে উপস্থিত হয় আর অমনি সে সংহতি ও সভ্যতা ভাঙ্গতে থাকে। লক্ষ এই আদর্শ ধরে—ভাবের মধ্য দিয়ে, যুক্তির মধ্যে দিয়ে নয়। বুদ্ধ বা খৃষ্ট তার কাছে ভাবের বস্তু, তাঁদের দার্শনিকতার দিকটা তারা একেবারেই বোঝে না। কিন্তু তাদের ভাব তাদের কাছে একটা নিরেট সত্য, তোমার আমার অনুমিতির চাইতে অনেক সহজ ও সরল জ্ঞান—তাই তারা আদর্শের জন্য যুগে যুগে প্রাণ দিয়ে এসেছে, জাতি ও ধর্ম্মের জন্য এমন ত্যাগ করেছে যা দার্শনিক কখন পারে না।

তা হলে দেখা যাচ্চে সভ্যতা গড়ে উঠতে গেলে একতার প্রয়োজন, আর এই একতা ঘনীভূত হয় ভাবের দিক দিয়ে—পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধে, পরস্পরকে সাহায্য করায়, বিজাতির বিরুদ্ধে পরস্পরকে সমবেত করে। এখন এই ভাবের কেন্দ্র প্রথম পিতৃগত ভাবে (Patriarchal) প্রকাশিত হয়, তারপর যখন মানুষ আদর্শকে ধরতে শেখে এবং সেই আদর্শানুযায়ী সমাজ গড়তে চেষ্টা করে তখন সেটা ভ্রাতৃগত ভাবে (Fratriarchal) প্রকাশিত হতে থাকে। এই দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের প্রথম ভাবে পরস্পর ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধবোধ না করলেও এক আদিম পিতার বংশজাত বলে একটা একতার অনুভব করে। এর ক্রমটা নিয়ে দেখান গেল –

আর দ্বিতীয় ভাবে পিতৃগত ভাব থাকলেও খুব ক্ষীণ। আদিম কালের আইনকানুন তারা মানতে চায় না, তবে তারা যে সংহত ভাবে অবস্থান করে তার হেতু—একটা আদর্শ সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে ভাব রূপে থাকা এবং সেইটা জীবনে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। এর ক্রম সমান্তরাল ভাবে থাকে। যেমন—

```
o—o—o—o—o— o—o আদর্শ
|  |  |  |  |  |  |
o - o—o—o—o—o—o সাধারণ
```

প্রথমটাতে জন সাধারণ নেতাকে মানে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মিল নাও থাকতে পারে। এখানে নেতার দোষ-গুণ সাধারণে বিচার না করেই তাঁর অনুসরণ করে, কারণ তাঁর রক্ত আদিম পিতার নিকটবর্ত্তী। এই পিতৃগত ভাব থেকেই দৈবী-সত্ব, জন্মগত সত্ব সমাজে রূপ নিলে এবং পরে তা আইন হয়ে উঠল, 'King can do no wrong'—রাজা কোনও দোষ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যখন আদর্শানুযায়ী সমাজ গড়তে আরম্ভ করলে, তখন প্রাচীন আইনকানুন শিথিল হয়ে এলো—দৈবী-সত্ব, জন্মগত-সত্বের

(৩) Both the ancestor-worship and the totem ceremonial dramatized the fact that their common ancestor still lived, and it caused them to feel that they were still united in subjection to his authority.—Emotion as the Basis of Civilization P. 7., by J. H. Denison.

জায়গায় ব্যক্তিগত সত্ত্ব সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল, অর্থাৎ ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের যুগ আবির্ভূত হতে লাগল। পিতৃগত ভাব শাসনের দিক থেকে গড়ে তুললে প্রথমে রাজা, তারপর সামন্ত, তারপর জমিদার, তালুকদার, প্রজা ; আর ধর্ম্মের দিক থেকে গড়ে তুললে জন্মগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। অপর দিকে ভ্রাতৃগত ভাব শাসনের দিক দিয়ে গড়ে তুললে প্রথম জাতীয় মহাসভা, পরে প্রাদেশিক সভা, গ্রাম্য সভা, সর্ব্বশেষ জনসাধারণ ; আর ধর্ম্মের দিক দিয়ে বললে ঐ চারটে স্তর জন্মগত হতে পারে না, গুণ-কর্ম্মগত।

মানুষ যখন এই সব সৃষ্টি করতে থাকে, তখন দেখা যায় তার ভাব জিনিষটা আপেক্ষিক বা মিথ্যা হলেও তার কাছে সেটা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আর যখনই এই ভাব তার কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় তখন আমরা তাকে বলি বিশ্বাস। এই বিশ্বাস একবার মনের মধ্যে জাগ্রত হ'য়ে উঠলে তখন তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে দূর করা খুব কঠিন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যুক্তি দিয়ে হয়ত আমরা একটা সত্যে উপস্থিত হলুম কিন্তু সেটা যে আমাদের বিশ্বাসে পরিণত হবে তা বলা বড় কঠিন। যুক্তি তর্কের ওপর বিশ্বাস মানুষ গড়তে খুম কমই পারে। অথচ বিশ্বাস মূর্ত্ত না হলে কোন Theory বা বাদ দিয়ে কোনও কিছু সৃষ্টি করা যায় না। একটা উদাহরণ দিচ্চি—কতকগুলি শিক্ষিত যুবক মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করছিল। মীমাংসা মতে শব্দ ও ধ্বনি পৃথক। শব্দ নিত্য এবং ধ্বনি অনিত্য। এ সম্বন্ধে নানা যুক্তি দেখান হল। তারপর একজন বললে, 'দেখুন শব্দ ও ধ্বনি দুটি একই জিনিষ, বহুকাল থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গ্যাছে, (যদিও সেটা কোনও যুক্তির ওপর নয়), যে সেটাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন।' 'কিন্তু শব্দ যদি অনিত্য হয় তা হলে বেদ অনিত্য হয়ে পড়ে, এটা তুমি স্বীকার কর?' 'না ওটাও স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে বড় কঠিন, ঐ ভাব নিয়ে আমরা এতকাল চলে আসচি।' সকল বিষয়েই এমনি। যুক্তি চিরকালই মানুষের একটা প্রধান সহায় হলেও, ভাবের অধীনে তাকে চিরকালই থাকতে হয়, ভাবই সভ্যতার প্রেরক, বুদ্ধি তার নিয়ামক মাত্র। এই যে আজ সমগ্র ভারতব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলন চলেচে, সম্পূর্ণ দেশিকতার ভাবের (patriotism) ওপর, অর্থনীতি বা রাজনীতির প্রভাব ব্যক্তির ওপর খুব কমই আছে। ভাব (emotion) থেকেই মানুষের প্রেরণা (impulse) আসে। এই প্রেরণাই সৃষ্টিমুখ কর্ম্মের নিকটতম, কারণ, বুদ্ধি সেই কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে সৃষ্টির পদ্ম ফুটিয়ে তোলে। (৪)

তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্চে ভাবের অনুশীলন ছাড়া বিশৃঙ্খলার মধ্যে একতা আনা অসম্ভব। এখন এই ভাবের অনুশীলন ধর্ম্মের মধ্যে যেমন হয় এমন কিছুতেই হয় না। ধর্ম্ম চায় পশুকে মানুষ করতে, মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে। ধর্ম্ম হল অনন্তের পথে অভিযান—তার প্রগতি উর্দ্ধে উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য সেই ভাবের সৃষ্টি এবং সহায়ক। উচ্চভাবের অনুভূতি যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য না হয় তা হলে তার আবিষ্কারের ফলভোগের দ্বারা মানুষ কী উপকৃত হল? বিজ্ঞান মানুষকে আকাশে ওড়াচ্চে, পাখীও ত ওড়ে? উচ্চ ভাবের অনুশীলনই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই মানুষের প্রগতি এবং একতার সহায়।

ভাবাদর্শই হচ্চে মানব সভ্যতার বিদ্যুদাধার। এখান থেকেই ঘনঘন কার্য্যকরী শক্তি স্ফুরিত হয়ে মানবের আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া দাওয়া ভাষা ও ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করে। ক্রমে ঐগুলি যখন স্থায়ী ভাবে গঠিত হয়ে ওঠে তখন সেই গুলি পরবর্ত্তীদের নিকট একতার নানা গৌণ উপাদানে পরিণত হয়। আমরা যে বাঙ্গালী তার নির্দ্দেশ করি আমাদের ভাষা, পোষাক প্রভৃতির দ্বারা। বাঙ্গালীও কাপড় পরে মারাঠীও কাপড় পরে, কিন্তু পরবার ঢঙে তাদের দেশ-ভেদ বোঝা যায়। তেমনি ভাষা, খাদ্য প্রভৃতিও পরা ও অপরা জাতির নিদর্শন সৃষ্টি করে। এর মধ্যে ভাষাটা গোষ্ঠিভেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেইজন্য

(৪) An emotion is, however, a transitory thing by nature, and where society depends on the permanent action of any one emotion, it is necessary to create a background which will act as a continual sitmulus to that feeling or to provide some sort of a dynamo to recharge men's minds when the emotional current is exhausted. Such a background we will term an emotional culture.—Emotion as the Basis of Clvilization—P. 21., by J. H. Denison.

বিভিন্ন ভাষীর রাজনৈতিক একতাটাকে প্রজারা এত সন্দেহ, ভয় এবং ঘৃণার চক্ষে দেখে। পরন্তু বিদেশেও স্বদেশী ভাষা শুনলে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ দ্বেষ্য ভাব ভুলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত সহানুভূতি বোধ করে। ভাষাটা যে একত্বের প্রধান কারণ তার হেতু হচ্চে ভাষা একের কৃষ্টি অপরের সহজ বোধগম্য করে দেয়, একের ভাব অপরে শীঘ্র সঞ্চারিত করে বলে। তা ছাড়া আচার ব্যবহারের দ্বারাও মানব একত্ব বোধ করে থাকে। একই গোষ্ঠির আচরিত আচার-ব্যবহার ব্যক্তির মধ্যে অভাব হলেই তাকে তারা অনার্য্য, বর্ব্বর প্রভৃতি বলবে। শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাতে হলে আমাদের দেশে পাগড়ি না খুললেও চলে কিন্তু জুতো খোলা চাই, পাশ্চাত্য দেশে ঠিক এর বিপরীত। পশ্চিম দেশীয়েরা অনেক সময় আমাদের বলেন যে আমরা manners, আদপ কায়দা জানি না, আমরা বিজিত বলে অনেক সময় সেটাকে স্বীকার করে নিলেও আমাদের দিক থেকে তাঁরাও শীল সম্বন্ধে অশিক্ষিত। একবার একটা কামরায় একজন সাহেব বসেছিল। তখন রাত্রি কাল। তাড়াতাড়ি একজন সস্ত্রীক ভদ্রলোক সেই কামরায় উঠতেই সাহেব বললে, "আপনি অন্য কামরায় যান, আমার শরীর অসুস্থ।" কথাটির তাৎপর্য্য না বুঝে বাঙ্গালী ভদ্রলোক বললেন, "যথেষ্ট জায়গা রয়েচে, সময় নেই, আমরা এখানেই বসব।" সাহেবটি উত্তেজিত হয়ে বললে, "তুমি থাকতে পার, কিন্তু আমি কেন তোমার স্ত্রীকে রাত্রে অপরিচিতের সঙ্গে এক গাড়িতে থাকতে দেব।" বলে সাহেবটি উঠে গেল। পক্ষান্তরে একটি মেম একদিন ফেরি জাহাজ থেকে নামবার সময় একজন বললেন, "দেখতে পাচ্ছ না ভদ্র মহিলা, হাত ধরে নামাও।" সে ভদ্রলোকটি বললেন, "ষ্টিমার ভাল করে লাগুক উনি আপনিই নামবেন। আমি ওঁর হাত ধরব কেন?"

এই রকম কোন জাতি, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্ব বোধ আনতে গেলে আচার ব্যবহার, আইন কানুন, বিবাহাদির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুশীলন এবং সেটা যাতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং সকলের সম্মতি থাকে সেটাও দেখা দরকার। মানবধর্ম্মে বা বিশ্বজনীনতায় এ সকলের মূল্য খুব অল্প বটে কিন্তু ক্ষুদ্র সমষ্টির মধ্যে একত্ব বোধ আনতে গেলে এ সকলের প্রয়োজন খুব অধিক। বিশ্বজনীন ধর্ম্মে বেদ বা মন্দিরের স্থান গৌণ বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট বেদ একটা কতবড় একতার বস্তু, যা এতগুলো হিন্দু সম্প্রদায়কে এক এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেচে। একটা জগন্নাথের মন্দির, একটা বিশ্বনাথের মন্দির, একটা রামকৃষ্ণ মন্দির, কত বিভিন্ন ভঙ্গী, ভাষা, পরিচ্ছদ, খাদ্য, আচার, ব্যবহার, আইন, সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্য্যবোধ, দর্শনসম্পন্ন বহু ব্যক্তির ভাবাদর্শের অফুরন্ত খনি একবার ভাব দেখি। সর্ব্বাত্মার সমকক্ষ হওয়াই ত বেদান্তের আদর্শ। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। স্বামিজী বলচেন সমষ্টির মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি। এখন এই অজ্ঞান সমষ্টিকে যাকিছু একত্বের দিকে পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যাচ্চে তাই গ্রহণীয় অবলম্বনীয়। ঠাকুর বলতেন, "খোসার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু শুদ্ধ চাল পুঁতলে গাছ হয় না।" সেইজন্য বহিরাঙ্গ ভাব এবং একত্ব উপেক্ষার বস্তু নয়। আদিম কালে যৌন সম্বন্ধের তীব্রতা হেতু যখন দুটো অপরিচিত বিভিন্ন শরীর সৃষ্টির জন্য এক হল, যাকে অবলম্বন করে পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে, এমন কি শত্রু গোষ্ঠির মধ্যেও একত্ব ও শান্তি স্থাপিত হতে লাগল, তখন থেকে সুসভ্য মানবের বিশ্বাত্মবোধ পর্য্যন্ত সবই জীবের পূর্ণত্বের সাধক। (৫)

কৃষ্টি যত ব্যাপক, সংহতি তত দৃঢ়, প্রগতি তত ঊর্দ্ধ। এই যে প্রগতি, এই যে জাত্যন্তর এর কারণ পতঞ্জলি বলেচেন প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা ঘটে। (৬) অনন্ত শক্তি

(৫) Since the days of Helen of Troy it has been thought of as more likely to produce strife and warfare than peace and unity. Yet, properly controlled and regulated by society, it has proved a most effective means of uniting men and has even brought antagonistic nations together in a manner that would seem incredible, were one unacquainted with the way in which emotion can be brought to bear on the mind of the masses through ceremonials of unification.—Emotion as the Basis of Civilization, p 40—by J. H. Denison.

(৬) পাতঞ্জল সূত্র, কৈবল্যপাদ ॥ ২ ॥ বাচস্পতি মিশ্র কৃত টীকা দেখ।

প্রকৃতির শক্তি ক্রীড়ার প্রতিবাধা কৃষ্টির দ্বারা যত দূর হবে ততই ব্যক্তির ও জাতির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে নূতনতর হয়ে উঠবে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের স্বধর্ম্ম প্রকাশে, একজন Over-intellectual (Tieck's), Over-holy (Friedrich Schlegel's), Over-power (Fichte's) Superman (Nietzsche's), পয়গম্বর (মুসলমানের), বোধিসত্ব (বৌদ্ধের), মহাপুরুষ (হিন্দুর) উদ্ভব হতে পারে, অথবা একটা সম্প্রদায়ের অনুশীলনে ব্রাহ্মণ বা Genius cult (৭) গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু আমরা চাই সমগ্র বিশ্বের একতা ও মুক্তি, প্রতি ব্যক্তির সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—বেদান্তের সর্ব্বাত্মবাদের ওপর এক ব্যাপক কৃষ্টির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ইউরোপ অমৃতত্বের সন্ধান না পেয়ে প্রাণ প্রাণ করে ক্ষেপে উঠেচে,—যার সন্ধান আছে উপনিষদে—যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা (৮)—যাকে কেন্দ্র করে এই সংসার চক্র চলেছে, যাকে উপেক্ষা করায় মারি করেলি প্রতীচ্যকে কত ভৎ'সনাই করেচেন। (৯) যার জন্য রোমা রোলা, কাউণ্ট কাইসারলিংএর মতন লোকও তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। (১০)

শেষ কথা হচ্ছে একটা ভাবাদর্শকে নিয়েই মানুষের শিক্ষা সভ্যতা গড়ে ওঠে। যেমন একজন স্নেহশীলা বালিকা-মাতার শিক্ষা, দীক্ষা, প্রয়োজন ও আয়োজন তার শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শরীর পালন, খাদ্য-বিজ্ঞান যা কিছু জ্ঞান সব ঐ শিশুর মঙ্গলকে উপলক্ষ্য করে, তেমনি ভাবাদর্শই বর্ত্তমান যুগের উন্নতির অগ্রগতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তেজক কারণ। শিশুটি মরে গেলে মায়ের যেমন ভগ্নাবস্থা আসে, শিল্পী, সাহিত্যিক বা দার্শনিকের ভাবের বস্তু কেড়ে নিলে যেমন তার আসন্ন মৃত্যু, (১১) ঠিক তেমনি ভাবাদর্শ হারিয়ে গেলে জাতির একতার নাশ ও সংঘর্ষের উৎপত্তি হবেই, যদি না নূতন আদর্শ তার স্থান অধিকার করে নেয়।

(৭) From Romanticism a new aristocracy springs into life, an intellectual, æsthetic genius-aristocracy.—Die Anfonge der Menschlichen Kultur (The beginnings of Human culture). Schopenhæur, Wagner, George Brandes, Nietzsche, Chamberlain প্রভৃতি Romanticist সম্প্রদায়ের লোক।

(৮) ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৭।৫।১।

(৯) Your ways of living are trivial and unsatisfactory—your so-called pleasant vices lead you into unforeseen, painful perplexities—your ideals of what may be best for your own enjoyment and advancement fall far short of your dreams—your amusements pall on your over-wearied sense,—your youth hurries away like a puff of thistle down on the wind,—and you spend all your time feverishly in trying to live without understanding Life. Life the first of all things, the essence of all things * * * The serious and real things of life are now a days made subjects for derision rather than reverence;—then, again, there is unhappily an alarmingly increasing majority of weak minded and degenerate persons, born of drunken, diseased or vicous parents, who are mentally unfit for the loftier forms of study, and in whom the mere act of thought-concentration would be dangerous and likely to upset their mental balance altogether; while by far the longer half of the social community seek to avoid the consideration of anything that is not exactly suited to their tastes.—The Life Everlasting, Prol. P. 3, 31, 32 by Marie Corelli.

(১০) A certain number of us in Europe for whom the civilisation of Europe no longer suffices—Roman Rolland.

Europe does not stimulate me any longer.—Count Kyserling.

(১১) It must be pointed out in passing that not only persons and places and material things may become the objects of sentiments, but also highly abstract and general objects such as moral qualities, power, wealh art. Of some men it is no mere figure of speech to say that they love virtue or power or the Church, that they hate vice or dirt disorder. In respect of their growth and constitution, such sentiments seem to be subjedt to essentially the same principles as those directed to more cencrete objects. They constitute a most important part of the structure of the mind, since on them depends all that part of behaviour, which we call moral conduct.—Psychology, The Study of Behaviour P. 121. by William Mc Dougall, M B. F. R. S.

সংস্কার

[শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ]

—এক—

সে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। নাম তার অরুণা। বার বছরের মেয়ে সে। তখনও তার সিঁথিতে সিঁদুর—হাতে নোয়া আর শাঁখা জল্-জল্ কর্‌ছিল। ছোট্ট মেয়ে—কিছুই সে জানে না—কি তার হোয়ে গেল।

চোখের কোণে তখনও তার জলের দাগ। সে খুব কেঁদেছে। যদিও সে জানে না তার এ কান্নার ব্যথা কতখানি, তবু সে কেঁদেছে। কারণ সে দেখ্‌ল, যে তার মা কাঁদ্‌ছে—পাড়া-পড়শীরা কাঁদ্‌ছে—তবে সে কাঁদ্‌বে না কেন?

আমি জানি—সবাই জানে। কিন্তু?—সকলেই ভার দিয়ে রেখেছি—সেই বিধাতা পুরুষের উপর;—যাঁর আমরা কিছুই জানি নে। শুধু তাঁর কর্ম্মফল দেখতে পাই—কিন্তু তাও ঠিক বুঝতে পারি নে। কি বিচিত্রতা এর ভিতরে আছে।

সে আমায় ডেকেছিল—বাবা বলে। আর চেয়েছিল—উপদেশ। একটি বার বছরের মেয়ে! হয় ত' বিধাতার খেয়ালে—নয় ত' বিধিলিপির বিড়ম্বনায়—অথবা কি জন্যে তা' ঠিক জানি নে—সিঁথির সিঁদুর—হাতের শাঁখা, মুছে আর ভেঙে এসে দাঁড়িয়েছে—সে আমার সাম্‌নে। কি উপদেশ দেব আমি তারে? তাই শুধু ভাবি।

উপদেশ দিতে চাই। কিন্তু পারি কই?

ব্যথায় বুক টাটিয়ে উঠ্‌ল। মনটা গুম্‌রে মর্‌তে চাইল,—কি স্বার্থ সেই বিশ্ব-বিধাতার জগতের বুকে এই বিষম বিপত্তি সৃষ্টি করে।

বুক ভেঙে বার হয়ে এল—'আমার কাছেই বা আসে কেন?'—কে যেন উত্তর কর্‌ল—'পরের হাঙ্গামায় থাক বলে।' কিন্তু সত্যিই কি আমি পরের হাঙ্গামাতেই থাকি? কে বল্‌বে? যাক্।

কিছুই তারে বল্‌তে পার্‌লাম না। একটি কথাও না। উপদেশ ত' দূরের বিষয়। কেবল ক্ষুব্ধ মন নিজের অক্ষমতায় গুম্‌রে মর্‌তে চাইল। এই শুধু।

—দুই—

"আজ আবার সে এসেছিল"—উমা বল্‌ল।

"আবার!" অসাবধানেই মুখ থেকে বার হয়ে এল।

উমা হাস্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—"এসেছিল—আবার আস্‌বে বলে নিমন্ত্রণও করে গেল।"

"কেন?"

হাসি-মাখা মুখে উমা বল্‌ল—"আমাদের মেয়ে হয়েছে যে?"

"ওহ্? আমি কিন্তু ভাব্‌চি"—

"কি ভাব্‌ছ? এ টুকু বিশ্বাস কি তোমার নিজের নেই?"

কথাটা বুকে সবলে আঘাত কর্‌ল। একেবারে মনের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখে নিলাম। কই, কলুষ কামনা ত' কোনখান থেকে উঁকি মার্‌ছে না। ওতে ভয় কিসের? লোক-লজ্জার?—নিছক কলঙ্কের?

ঠিক তা' নয়। ঐ যে মেয়েটি উপদেশ চায়—তাকে কি উপদেশ দেব? নিজেরা বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে পরকে সংযমের—ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতে যাওয়া খুব হাস্যকর।

অথচ তা'কে উপদেশ তাই-ই দিতে হবে। হোক সে তার অনুপযুক্ত—তবে করুক্ না সে কেন যা' তা'—। উমার কথার কোনও উত্তরই দিলাম না।

উমা জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি? উত্তর দিলে না যে?"

বল্‌লাম—"কি আর বল্‌বো? তোমার ও কথার উত্তর নেই। তবে যে বলেছিলাম—'ভাব্‌চি।' তার মানে আমাদের চিত্তবৃত্তিও ভাল নয়—আর মানুষের জিভও বড় বিষাক্ত। তা' ছাড়া লোকের কথাকেও ঠিক ঝেড়ে ফেল্‌তে পারি নে'।"

উমা বল্‌ল—"তা' হোক্। যার যা' খুসি—তাই বলুক্। তা'তে আমাদের কি?"

উমার কথায় আমারও মনটা ভরে উঠ্‌ল।

—তিন—

সে জিজ্ঞাসা করল—"কাল একাদশী।"

উদাস কণ্ঠে বল্‌লাম - "হাঁ"

ছোট্ট এই একাক্ষরী উত্তরে সে তুষ্ট হ'তে পার্‌ল না। বার কতক ঢোক গিলল। বুঝলাম—তার কিছু বলার আছে। প্রশ্ন কর্‌লাম – "কিছু বল্‌তে চাও?"

উত্তরে ঘাড় নেড়ে জানাল—"হাঁ"।

আমি মিষ্ট সুরেই বল্‌লাম—"বলো।"

বার কতক হাঁ-না করে ছল্ ছল্ চোখে আমার পানে চেয়ে বল্‌ল—"কাল একাদশী? আমি কি কর্‌বো?"

চট্ করে মনে পড়্‌ল—সে বিধবা। তার বিধবা হওয়ার পর এই প্রথম একাদশী এসেছে। তার বাড়ীতে নিশ্চয়ই কথা উঠেছে—সে এদিনে কি করবে? সেই প্রশ্নই সে আমাকে কর্‌ল—হয় ত' স্বতঃপরতঃ, নয় ত' বা কারও উপদেশে—কি জানি? কিন্তু উত্তরটা অম্‌নি অম্‌নি মুখে যোগা'ল না।

উমা বল্‌ল—"তুমি একাদশী কোরো।"

"কি খেয়ে মা?" হাসিমুখেই সে প্রশ্ন কর্‌ল। হত-ভাগীর মুখখানা আবার সদাই হাসিতে ভরা।

বিধবা আমাদের দেশে একাদশী কর্‌বে—কি খেয়ে? এর কি উত্তর আমি দিতে পারি? শাস্ত্রের অনুকল্প ব্যবস্থাও জানি—আমাদের দেশের প্রচলিত রীতিও জানি।

কাণে এল—উমা বল্‌ছে—"কাল আর কিছু খেয়ো না। একদিন না খেলে আর কি হয়? মেয়ে মানুষকে অমন মাঝে মাঝে উপবাস দিতে হয়।"

সে বল্‌ল—"কিছুই খাবো না, জলও না? তা' কি থাক্‌তে পার্‌বো মা? কোনদিন ত' তা' থাকি নি'।"

আমার প্রাণ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল –"না-না, এতটা যেন একেবারে বাড়াবাড়ি। পুরুষের অনুকল্প যদি চলে—একাদশীর দিনে দিস্তে দিস্তে লুচি উড়োনোতেই যদি বাধা না থাকে—তবে এই দুধের মেয়ের জল খেতেই যত দোষ। না, আমি অনুকল্পের ব্যবস্থা দেব।—"না, তোমায় নির্জ্জলা একাদশী কর্‌তে হবে না। তুমি কাল জল খেয়ো। খাঁটি দুধ ডাব—কলাও অল্প করে কিছু খেতে পারো।"

সে কিন্তু হেসে—যেন একেবারে গলে পড়েই উমাকে বল্‌ল—"কিন্তু মা, জানো? আমাদের পাড়ার লোকেরা বলে—আমার একাদশী কর্‌তে হবে না। আমি কচি মেয়ে – আমার ও সব না কর্‌লে কোনও পাপ হয় না।"

এবার আমি একটু কড়া হ'লাম। ঠিক ওদের পাড়ার কথাটা মনে হ'ল। সে যেন বিলাস-মন্দির। সংযম বুঝি একটা কথার মাত্র। গম্ভীর হোয়ে বল্‌লাম—"কিন্তু তোমার ত' ভুললে চল্‌বে না—তোমার পাড়ার লোকেরা আর তুমি ঠিক এক শ্রেণীর মানুষ নও। তুমি বামুনের মেয়ে—তারা যা' কর্‌বে—তোমার ত' তা' ভাল দেখায় না।"

সে আর কিছু বল্‌ল না। মাটীর দিকে চেয়ে থাক্‌ল মাত্র।

—চার—

খেতে বসেছি। কিছু খাওয়াও হয়েছে। এমন সময় সে এল। তার অধরে একটি হাসির রেখা ফুটে আছে বটে!—কিন্তু বড় ক্লান্ত—বড় ম্লান: হয় ত' আমার অনু-মান—অথবা সত্যিও হ'তে পারে। সন্দেহ দূর করার জন্যে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"খাওয়া হয়েছে?"

একটি ক্ষীণ হাসির রেখা তার অধরের কোণে মিলিয়ে গেল—বল্‌ল—"আজ একাদশী!"

সমস্ত খাদ্য যেন আমার তিত হয়ে গেল। হাত বুঝি আর মুখে উঠ্‌তে চায় না। পেটের ভিতর থেকে খাবার কে যেন ঠেলে বার করে দিতে চায়।

উমা প্রশ্ন কর্‌ল—"কি খেয়েছ?"

সে বলে গেল—"কিছুই খাই নি'। মা অবিশ্যি খাওয়ার জন্যে খুবই সেধেছিলেন। কিন্তু কাল যে বাবা বলে দিয়ে-ছেন"—বলেই সে একটু' হাস্‌ল। তারপর ম্লান-মুখে তার কথা চালিয়ে গেল—"আমার এ-বাড়ীর বাবা যে বলেছেন—আমি আমার পাড়ার লোকদের চাইতে একটু' উঁচু। তারা একাদশীর দিনে জল খায়—তা' হ'লে আমি তা' খাব কেন? খাই নি'। তা' তেমন কষ্ট হয় নি'। একটু' যা'—তা' হবে বৈ কি?—অনভ্যেস?"

আর পার্‌লাম না। গণ্ডূষ করে উঠে পড়লাম। উমা হৈ-হৈ করে উঠ্‌ল—"ও কি? কিছুই যে খাওয়া হ'ল না।"

শুধু উত্তর দিলাম—"পেট ভরে গেছে।"

সে কিন্তু হেসে উত্তর দিল—"না মা, আমার কষ্টের কথা শুনে খেতে পার্‌লেন না। কিন্তু আমার বরাতই যে এই। দুঃখ ক'রে কি হ'বে? দুঃখ অদেষ্টে না থাক্‌লে কি এমন হয়?"

সে আরও কত কি বলে গেল। বাল-বিধবার ব্যথায় আমার মন টাটিয়ে উঠেছে। ভাষার সব শব্দ আমার কাণে গেলেও অর্থ বোঝার ধীরতা তখন আর ছিল না।

চেয়ে দেখি—উমা আমার পাতে মাছ ভাত নিচ্ছে। মনে পড়্‌ল-হোক্‌ একাদশী—থাক্‌ সাম্‌নে বালবিধবা উপবাসী। উমার যে আজ দু'টো মাছ-ভাত খেতেই হবে। নইলে আমার অকল্যাণ হ'তে পারে।

হায় নারী! তুমি একটি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

—পাঁচ—

সে আর উমা গল্প কর্‌ছে।

রোজই আসে—গল্প করে—সেই একই কথা—দুঃখের অফুরন্ত গাথা—যেন সুরে বাঁধা মূর্ত্তিমতী ব্যথা। সেই বিধবা! বিধবার কি কর্‌তে আছে না আছে।

আজও তাই চল্‌ছিল।

সে বল্‌ছে—"বিধবার হাতে নোয়া—আর সীঁথের সিঁদুর ভারি দোষের—না মা?"

উমা ছোট্ট করে বল্‌ল—"হাঁ"। শুধু এই একটি কথা। আমি খাটে শুয়ে পড়ে আছি। জাঁজও দিতে ইচ্ছা কর্‌ল না যে, জেগে আছি। এ ব্যথার-সাগরের ভিতর দিয়ে পাড়ি দিতে পার্‌বো না।

সে ফের বল্‌ল—"বিধবার হাতে নোয়া ও সীঁথের সিঁদুর দেখলে কি হয়?"

উমা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—"কি আর হবে? তবে ওর থেকে বাবুগিরি আস্‌তে পারে। বাবুগিরির বিলাস থেকে পতন সম্ভব।"

"তবে যে ওরা সব বলে"—বলেই সে চুপ কর্‌ল।

উমা জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি বলে?"

সে উত্তর দিল—"আমার সীঁথের সিঁদুর আর হাতে নোয়া দেখে নাকি নাপিত পাড়ার কৈলাসের বৌ বিধবা হয়েছে?"

আমি শুয়ে শুয়ে আঁতকে উঠলাম। কাওকে বল্‌তে হ'লে—কারও লাঞ্ছনা করতে হ'লে বুঝি এই রকম করেই কর্‌তে হয়। কাণে গেল—উমার কথা—"তাই কি হয়? সে ভোগ করে তার পাপের ফল—আর তুমি ভোগ্‌ করছ—তোমার জন্মান্তরের পাপের গ্লানি। তোমার হাতে নোয়া সীঁথের সিঁদুর দেখে কৈলাসের বৌ বিধবা হবে কেন?"

ইচ্ছে কর্‌ল—বলি—তুমি সিঁদুরও পরো নোয়াও রেখ। কিন্তু বলতে পারলাম না। মনে পড়ল ও আমার কাছে এসেছে সৎ-উপদেশ নিতে—সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরামর্শ নিতে নয়।

নিজের অক্ষমতায় নিজের মনই গুম্‌রে উঠল।

—ছয়—

অরুণার মামা এসেছে—অরুণার বিধবা হওয়ার সংবাদ পেয়ে। দেখা হ'ল—বললাম—অরুণার ফের বিয়ে দাও।

সে তার চোখ দু'টি টেনে আমার মুখের পানে চাইল। বুঝি বা একটু চম্‌কেও উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কি সাহস হয় না?"

উত্তর দিল—"বোধ হয় তাই। কিন্তু ইচ্ছে করে। তবে এখান থেকে পারি নে'। আমাদের সমাজ ত' তেমন সংস্কৃত নয়। চাকরি স্থানে বোধ হয় পারি।—কিন্তু—"

হেসে তার কথার পিঠ পিঠই বলে ফেলি—"আমি মত দিচ্ছি—কেমন করে—এই ত'? আমিও তাই ভাবি—"

কথাটার ওখানেই শেষ হল না। অনেকেই শোনে;—শুনে বিরক্তও হয়। বলাবলি করে—এ ওঁর অন্যায় মতবাদ। উনি কি সমাজের বুকে বসে তার দাড়ী গোঁফ উপড়াতে চান।

অতি সাহসী যারা, আমার কাছ পর্য্যন্ত এসে এ সব কথা জানাল—তাদের উত্তর দিলাম—"কেন বিধবার বিয়ে কি সহ্য করে উঠতে পারো না?"

চারি পাশ যেন কলরব করে বলে ওঠে—"না—না; এ সহ্য করা যায় না।"

আমি ছাড়িনে'। আমার মনে তখন অবিজ্ঞাত-যৌবনা কুমারীর ঘুমন্ত কামনা ঝড় তুলে দিয়েছে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে—বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যথা—অভাবের তাড়না—

অক্ষমতার হাহাকার। বলে ফেলি—"বিধবার ব্যাভিচারটা ত' বেশ সহ্য করতে পারো ?"

তারা চীৎকার করে—"না—তাও সহ্য করি নে'।" কিন্তু সে কলরবে জোর হয় না। ক্ষুধাতুরের চিঁ চিঁ শব্দের মত শোনায়—।

আমার ব্যথিত অন্তরাত্মা নিষ্ঠুর ভাষায় জানায়—"খুব সহ্য করো। নীরেন বাবুর ব্যাভিচার-স্রোতে বাধা দিতে চাও না। হারু বাবু ও লতা দেবীর প্রকাশ্য ব্যাভিচার হেসে উপভোগ করো। গগন ডাক্তারের মেয়ে যখন ক্ষিতীশ বাবুর বাগান বাড়ীতে যেত—তখনও কথা কও নি'।"

সকলে একজোটে বলে ওঠে—"ও কেও চোখে দেখে নি'। শোনা কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

ঝাঁঝাল সুরে বলি—"ও মিথ্যা কৈফিয়ৎ! ওসময় তোমরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে থাক। চেঁচাও শুধু অবৈধকে বৈধ করে নেওয়ার বেলায়। ওসব দেখেও দেখ না। শোনা কথা বিশ্বাস করা যায় না সত্য। কিন্তু এ ব্যাভিচারের গল্প তোমরা বিশ্বাস করো। আর বেশ উপভোগ করেই শোন।"

—সাত—

অরুণা চলে গেছে—মাস দুই হ'ল। তার কাকা না পিসে কি—কে একজন দূর পশ্চিমের রেল আপিসে চাকরি করে—তারই বাসায়।

তার কথা ঠিক তেমন মনেও পড়ে না। ভুলি-ভুলিই করছি। ঠিক না ভুললেও একটা আবরণ পড়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না।

এমন সময় একদিন পুকুর ঘাটে শুনি—তার নাকি আবার বিয়ে হয়ে গেছে।

'ধক্' করে বুকে একটা 'সক্' লাগল। মনে হল—জলটা যেন অন্য দিনের চেয়ে বড় বেশী ঠাণ্ডা। যেন একটা কাঁপুনি আসচে। কেন এ দুর্ব্বলতা। আমি ত' ওই চাই।

সংস্কার কাণে কাণে বলে—মিথ্যে কথা! ও তুমি চাও না। ও তোমার তর্কের রূপ!—অনবস্থিত মতির বিলাস! বলার সময় কেবল জোর গলায় বলো। কাজের বেলায় পারো না!

তাই কি ?

উঠে এলাম। বাড়ী ঢুকচি—কাণে গেল—হাজুর মা বলচে—"আপনার মেয়ের নাকি আবার বিয়ে হয়ে গেল ?"

বিরক্ত হয়ে উমা উত্তর দিল—"আপনারা আমাকে অমন করেন কেন ? আমি কি তার সত্যিকারের মা ? আমি কি তাকে পেটে ধরেছি ? তার উপর আমার দাবীই বা কতটুকু ? তার মা যা' ভাল বুঝেছে—তাই করেছে—তার জন্যে আমার কাছে কেন ?"

আমার মন ফুলে উঠ্‌তে লাগল—নিজের অক্ষমতার জন্য। সে আমার কাছে যার জন্য এসেছিল—হয় ত' আমি তাকে তা' দিতে পারি নি। যা দিয়েছি—তারই এই ফল। জানি নে'—আয়তি তার ভালোয়-ভালোয় কাছে কিনা!

সমসাময়িক সাহিত্য

সমসাময়িক সাহিত্যের প্রধান খবর—দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনকে সে গ্রাহ্য না কোরে নিজেকে অসাময়িক প্রমাণ কোরে তুলেছে, অর্থাৎ এ যুগের সমসাময়িক সাহিত্য আজকে অগ্রাহ্য করে, কালকে অতিক্রম কোরে, একেবারে 'গত পরশ্বের' মালমসলা নিয়ে বাজার খুলেছে, তা কাট্‌ছে কিনা দেখবার বাসনা খাঁটি সাহিত্যের লক্ষণ নয়—এই তার সান্ত্বনা। ২।১ জন মাসিকের সম্পাদক কোন রকমে আইন বাঁচিয়ে টীকা টিপ্পনি লিখ্‌ছেন বটে কিন্তু সে সব ত আর সাহিত্য নয়। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, বর্ত্তমান আন্দোলনের ছোঁয়াচও লাগে নি।

সাহিত্যিক যখন যা লেখেন তাই সমসাময়িক সাহিত্য। সুতরাং এ সাহিত্যের কথায় সাহিত্যিকের কথা জড়িয়ে আসে। ভাল ভাল লোক জেলে যাওয়াতে অনেক ভাল ভাল কাজ বন্ধ হ'য়েচে বা মন্দা চল্‌চে। সুতরাং সন্দেহ হ'তে পারে কবিরা ও লেখকেরা বোধ হয় অনেকে জেলে গিয়েচেন, তাই সে রকম সাহিত্য রচিত হচ্চে না। কিন্তু দৈনিক কাগজের পাঠকেরা ও মাসিকের সম্পাদকেরা জানেন সে ঘটনা মোটেই ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সন্ন্যাসী-গৃহী, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, ইতর-ভদ্র, দাতা-ভিক্ষুক, উকিল-ডাক্তার, ব্যবসাদার-জোচ্চোর, গেঁজেল, মাতাল—সব জাত থেকে জেলে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে, কেবল কবির দল আপনাদের নিজেদের জাত বাঁচিয়ে আস্‌চেন। সরোজিনী নাইডু জেলে গিয়েচেন বাংলাভাষা ভুলে গিয়ে, ইংরাজী কবিতা লিখতেন বোলে; এখানে বাংলা সাহিত্যের কথাই হচ্চে।

কিছুদিন থেকে বাংলা সাহিত্যের খবর যাঁরা রাখছিলেন তাঁরা বেশ বুঝতে পারবেন যে বর্ত্তমান আন্দোলনও সে সাহিত্যকে মোটেই গ্রাহ্য না কোরে এসে হাজির হয়েচে। যৌবনের যে দিকটা এই সাহিত্যের খোরাক হয়েছিল, বর্ত্তমান আন্দোলন তার সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করচে না। সুতরাং এই পরস্পর অসহযোগের কারণটা বোঝা যাচ্চে।

ভারতব্যাপী এই আন্দোলনের যিনি আগা ও গোড়া তাঁর সঙ্গে কাব্যের যোগ কোন কালে নেই। বরঞ্চ তিনি বিশ্বকবির সঙ্গে একবার বেরসিকের মত কথা কাটাকাটি করেছিলেন বলেই জানা আছে। বুদ্ধ নিমাই গৃহত্যাগ কোরেছিলেন তার মধ্যে কাব্য ছিল, কারণ তখন তাঁদের যৌবন ছিল। যৌবনের যে অংশ আধুনিক (মাত্রাভেদে চিরন্তন) কাব্যের বিষয়-বস্তু, বুদ্ধ নিমাইয়ের গৃহত্যাগ ব্যাপারে তার অভাব ছিল না। কিন্তু এক দন্তহীন বৃদ্ধ বাঁশের লাঠি হাতে একটা শুকনো আশ্রম থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে নুন তৈয়ারি করতে চল্‌ল, এর মধ্যে কাব্য কোথায়? পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু সে ফাটা পাকে 'চরণ' ইত্যাদি বলা যায় না। কুশাঙ্কুর ইত্যাদিতে তার কিছুই হয় না। সুতরাং সেদিক থেকে কাব্য রচনা চল্‌ল না।

এ ব্যাপারে যে আর একটা সুমহৎ রসের দিক ছিল না তা নয়, কিন্তু সেদিকের গুড়ে অর্ডিন্যান্সের বালি! শেষে কি জেল খাট্‌বে! কবিরা কোন কালেই এত বোকা নয়। যাদের উপর দেশাতীত কালাতীত সৃষ্টির পবিত্র ধারা ন্যস্ত হয়েচে, তারা কি সাময়িক হুজুকে মেতে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর একটা মহতী ক্ষতি ঘটিয়ে যাবে? কদাপি নহে।

তবু কবিরাও ত মানুষ! সিগারেটের ধোঁয়ার চেয়ে কবিত্বের ধোঁয়া কি এতই বেশী ভারী যে হাওয়ায় প্রথমটা

নিঃশেষে উড়ে গেল, তবে কবিত্ব ধূমের স্থানিক অপসারণ ঘটিয়েও মানুষটাকে একবার প্রকাশ হ'তে দিল না! যৌবনই যাদের চির আরাধনার বস্তু, পৌরুষ তাদের কাছ থেকে যেন চির বিদায় গ্রহণ করল! চাকরীর আবরণ ভেদ কোরেও মানুষ উঁকি মারচে,—কিন্তু কাব্যের আবরণ মানুষটাকে এমন কোরে ঢেকে রাখল কেন? কাপুরুষেই কবি হয়, না কবি হ'লে মানুষ কাপুরুষ হয়? যৌন ধর্ম্মের আলোচনাই চিন্তার প্রধান খোরাক কোরে তুলল যৌবন কি এতই নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়ে যে, প্রকৃত লম্পট অপেক্ষাও তার কর্ম্মশক্তি ক্ষয় পায়। ভাবার ঝাঁকা মাথায় তুলে ভাবের ফেরি ক'রে বেড়ালে চক্ষুলজ্জার কি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? কল্পিত নরনারীর মিলন বিরহ সম্ভোগ বিলাসের জন্য নিজের হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ ভাগ দিলে আত্মার অধঃপতন কি এমনই অনিবার্য্য? এই সব কথা কিছুদিন থেকে নিজেকে ও বন্ধুবর্গকে প্রতিনিয়ত গোপনে জিজ্ঞাসা করচি, উত্তর মিলচে না। ওদিকে সমান চলচে—

উপাসনা—বৈশাখ

প্রেমের লাগি দেশ ছেড়েছি শোন বন্ধুবর,
প্রিয়ার সাথে বেঁধেছি ভাই সুন্দর বনে ঘর।
—যতীন্দ্রনাথ

উপাসনা—আষাঢ়

তোমার কথা জানিয়ে গেল
ঝুমকো লতা নুয়ে নুয়ে।
—সাবিত্রীপ্রসন্ন

কাল সে নিশুতি রাতে—
গিয়াছিনু সখি তোমায় ঘরের দখিনের জানালাতে।
—সন্ন্যাসী সাধুখাঁ

তবু যেন আছ সুখে, আছি স্বপ্নপুরে
পলাতক প্রেয়সীর কোলে।
—আবদুল কাদের

বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ (শ্রাবণে বাহির হইয়াছে)

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়
ফুটায়াছে ফুল;

* * *

তুমি বাসিয়াছ ভালো—তুমি ভাল বাসিয়াছ বঁধু
—রাধারাণী দত্ত

বলেছিনু "ভালোবাসি"—শুনেছিলে ওই ছোট কথা,
—প্রণব রায়

তাই বলি প্রিয়ে, মন্দ কয়ো না, তোমারেই ভালবাসি
দু'বছর পরে দেখা হবে ঠিক—আপাতত আজ আসি।
—সুবোধ দাশগুপ্ত

অচিন্ত্য বাবুও কবি, তাঁর বহু প্রেম-কবিতা মাসিকে পড়িয়াছি।—এই সংখ্যায় তাঁহার নাটিকা আই-সি-এস পড়িয়া ভাবিতেছি 'পিরিতি' অলাবুকে এমন করিয়া দুই হাতে চটকাইয়া তিনি সাহিত্যিক জনোচিত আনন্দ পাইয়াছেন ত?

পড়িবার কালে আমাদের মনে হইতেছিল, বুঝি বা বিদেশী ভাষায় লেখা 'Two Sisters' নামে কোনও নাটিকা পড়িতেছি।

পঞ্চপুষ্প—শ্রাবণ

প্রথম পৃষ্ঠায় কবি প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাক্ষী গোপাল"—গাথা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ফুলমালা হায়—ধূলাতে লুটায় দলিত হয়েছে দল
কুসুম-শূন্য মালার সূতায় কাহার চোখের জল!
—রামেন্দু দত্ত

ফুলের বুকে জাগায় মধু অলির তৃষা ক্ষুধা
বঁধুর তৃষা জাগায় বধূর অধর পুটে সুধা।
—কালিদাস রায়

ললিত যৌবন-পাত্রে যত ছিল রসপূর্ণ মধু,
লইয়াছ, হে দেবতা মোর।
—করুণাময় বসু

লিপিকার সাথে পাঠালে যে প্রিয়া
দুই ফোঁটা আঁখিজল—
—অখিল নিয়োগী

বিরহ-বিমথিত হইল সুমিলিত যক্ষ
আর তার প্রিয়া কাতর;
অশেষ-ভোগ-সুখে ভুলিল ঘোর দুখে,
পুলক স্রোতে ভাসি নিরন্তর।
—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

উত্তরা—আষাঢ়

তোমার নূপুর আমার চরণে
আপনি সাধিয়া পরালে কালা।
—নজরুল ইসলাম

প্রবাসী—আষাঢ়

আম্র মুকুল ঘন সুগন্ধ-ধূপে সন্ধ্যার ছায়া
ভরিয়া তুলেছি পুলকোৎসবে রচিয়া রঙীন মায়া।
—জীবনময় রায়

প্রবাসী—শ্রাবণ

চলে মুসাফীর গাহি

এ জীবনে তা'র ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাহি মুছাবার
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলী কেহ নাহি শুনিবার।

—জসীম উদ্দীন

সাধ যায় মনে অমনি তারার মত হয়ে থাকি
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই, স্বপ্নরাজ্যে খুলে যায় আঁখি।

—প্রিয়ম্বদা দেবী

প্রবাসী—ভাদ্র

ফুলের বুকে সুখে দু'জনে মধু খায়
ফুলেরই বাসে পাশে দুজনে ঘুম যায়,—
ভুলাতে দু'জনারে দু'জনে গান গায়
দু'জনে ব'সে তাই শোনে।

—যতীন্দ্রমোহন

তবে যতীন্দ্র মোহনের প্রাণ উতলা হইয়াছে, সাড়া জাগিয়াছে; পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের মাঝে আশার সঞ্চার হয় তাঁহার বর্ত্তমান সংখ্যা 'উপাসনা'য় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'মহানন্দ মঠ' দেখিয়া।

গোলাপ শুন গো, গোলাপ আমার প্রাণের ফুল,
রূপের তলায় কেন গো জ্বালায় কাঁটার হুল?

—জগৎ মিত্র

চিরপ্রিয় ওগো বধূ এবার হেরিনু সব,
আজি শেষ ক্ষণে
গুণ্ঠনের যবনিকা অপসারি দেখাও ও
মুখানি অতুল!

—নীলিমা দাস

প্রবাসীর এই সংখ্যার প্রকাশিত "মাতৃভূমির সেবা" কবিতার লেখক শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগশঙ্খের আহ্বান ইহাতে ধ্বনিত হইতেছে। প্রাণের দরদ দিয়া লেখা—কবির সম্মান রাখিয়াছে—

দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।

আদেশ আসিয়াছে,—"ঘুচাতে হ'বে—
যে পাপ যুগে যুগে হয়েছে জমা;
যাহারা অপমানে 'নিয়তি' বলি মানে—
নিয়তি তাহাদের করে না ক্ষমা।"

*   *   *

বাঁচার মত যারা বাঁচিতে জানে
মরার অধিকার তাদেরি আছে
মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা?

*   *   *

সবার বুকে আছে পূজার ফুল—
সবার দেহে হয় হোমের হবি;

*   *   *

নিজেরে না ভুলিলে নাহিক ত্রাণ,
উজল হ'তে হয় অনল স্নানে
নিখিল নরলোক আজিকে সুখী হোক
মোদের ক'জনার জীবন দানে।

*   *   *

মোদের সেনাপতি আজি অখিলপতি
মোদের গুরু আজ জগদ্‌গুরু

*   *   *

যদি না ফিরি আর নাইক ক্ষোভ
যদি না দেখে যাই কাজের শেষ;
কিছুরই পরে মোর রবে না দ্বেষ।
আঘাত যদি হয় কঠিন বড়,
মোদের হতে হ'বে কোমলতর,
মরিতে হ'বে যা'র—তা'র কি আসে যায়—
কে তারে দিল গালি কে দিল ক্লেশ।
মেটেনি যত আশা মিটিবে নাক—
বাকী যা আছে কাজ রাখো তা' তুলে,
রহি বা নাহি রহি—সকল ব্যথা সহি
আঘাত দিয়ে যাব পাপের মূলে।

*   *   *

দেউলে দিবালোকে যে পূজা হ'বে,
জগৎ জুটিবে সে মহোৎসবে।

—আগাগোড়া চমৎকার। শরীর মন অব্যক্ত অনুভূতিতে ভরিয়া উঠে, মনে হয় এই ত চাই। এমনি সুরে ঝঙ্কারে, ছন্দে গাথায় কবির অমর বীণায় এমনি আশা ও আনন্দের কথা বাজিয়া উঠুক।

কবিতাটি ২০শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সালে মহিষবাথান হইতে লিখিত। ভাবাবেগ ও নিষ্ঠা দেখিয়া মনে হয়—ছন্দে গাঁথা কবিতা এ শুধু কবির নয়—এ প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ়ব্রত কর্ম্মীর নিজের অন্তরের কথা।

এমনি করিয়া যদি গানে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে সমসাময়িক সাহিত্য পরিপূর্ণ ও শক্তিশালিনী হইয়া উঠে—প্রতি ভাব, অনুভূতি ও প্রেরণা একবারে অন্তরের সহস্র তার ঝঙ্কৃত করিয়া দেয় তবেই বুঝিব বঙ্গ-ভারতীর অঙ্কমণি কবিগণের লেখনী-ধারণ সার্থক—যুগের দুকূলপ্লাবী ভাব ধারায় আজ যে শুচিস্নান করিতে পারিবে, সেইত পরম ভাগ্যবান।

জীবন বীমার জন্মকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশরদিন্দু সাহা]

রবার্ট হার্লে (Robert Harley, Earl of Oxford) তখন ইংলণ্ডের অর্থমন্ত্রী। তাঁর সময় ইংলণ্ডের রাজ সরকারের জাতীয় ঋণের (National Debt) পরিমাণ ৩,০০,০০,০০০ তিন কোটী পাউণ্ড বা ৪৫,০০,০০,০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকায় দাঁড়ায়। আজ কালকার দিনে অবশ্য এই পরিমাণ জাতীয় ঋণ যে কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের কাছেই নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হ'লেও সে যুগে ইংলণ্ডের মত দেশেও ইহা পর্ব্বত প্রমাণ মনে হ'ত। এই ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ-মন্ত্রী হার্লের মাথা ব্যথার অন্ত ছিল না। এমন সময় ১৭১০ খৃষ্টাব্দে অনেকটা তৎকালীন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্গ অনুকরণে গঠিত হয়ে South Sea Company নামে একটা বিরাট ফাট্‌কাবাজ প্রতিষ্ঠান বিলাতে ভূমিষ্ঠ হয়। হার্লে এই কোম্পানীর সাহচর্য্যে জাতীয় ঋণ পরিশোধ করার (Redemption of National Debt) জন্য এক মতলব এঁটে এদের সাথে এক চুক্তি করেন যে ২৬ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে এরা গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করবে এবং তার বিনিময়ে দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলের যাবতীয় ব্যবসায় এর ওপর এই কোম্পানী একাধিপত্য সত্ব ভোগ করবে। তখন ইংলণ্ডের দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলের বন্দর গুলোতেই বিলাতের সকল প্রকার বহির্ব্বাণিজ্য (Oversea Trade) পরিচালিত হ'ত। এই পরিকল্পনাটীর ভাবী লাভ সম্বন্ধে লোকের মনে অসম্ভব রূপ অলীক ধারণা গজিয়ে উঠে। তার ফলে বাজারে এই কোম্পানীর অংশ গুলোর এত চাহিদা বেড়ে যায় যে ১০০ একশত পাউণ্ডের অংশের দাম হাজার পাউণ্ডের ওপর চড়ে যায়। লাভ বাটার আগেই অংশের দাম নিয়ে এরূপ ফাট্‌কাবাজী খেলার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে এই প্রথম এবং আজ পর্য্যন্তও এরূপ নজীর জগতের ব্যবসায়ের ইতিহাসে হামেসা মেলে না। ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকই যে যেমন ভাবে পারল লোটা কম্বল বেচেও এই জুয়ারী প্রতিষ্ঠানের অংশ কিনে অসম্ভবরূপ মোটা লাভের অলীক আশার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভাবী ধনের নেশায় আল্‌নাস্কারী মেজাজে—কল্পনা-রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাস্তবিক পক্ষে কোম্পানীটি যে মূলে একটা ধড়ীবাজ প্রতিষ্ঠান তা তখন কারো মাথায়ই ঢোকেনি। ভাগ্যচক্রে এর কয়েক বছর পরেই ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক আকাশের ঘোর কুহেলীর আবরণ ভেদ করে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফুটে উঠে। ইনি জগতের অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে চিরস্মরণীয় সার রবার্ট ওয়ালপোল (Sir Robert Walpole)। অর্থনৈতিক জগতের এই মহাবিচক্ষণ ব্যক্তিই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন এবং

১৯২০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত South Sea Companyর জাতীয় ঋণ পরিশোধের ধাপ্পা বাজ পরিকল্পনার সকল রহস্যের জাল গুটিয়ে তাঁর পূর্ব্বতন অর্থমন্ত্রী হার্লের কৃত চুক্তি বাতিল করে দেন। এতে কোম্পানীটি গণেশ উল্টিয়ে দেয়। South Sea Companyর পতনের সাথে সাথেই বিলাতের আর্থিক জগতে ভীষণ ঝড় ঝাপ্টা ও আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এমন কি এতে রাজ সরকারও এরূপ বিব্রত হয়ে পড়ে যে তাল সামলাতে অশেষ বেগ পায়। হাজার হাজার লোক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অতর্কিত ভাবে এমন বিপন্ন হয়ে পড়ে যে অসংখ্য লোক সর্ব্বহারা পথের ভিখারী হয় এবং বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে কর্পূরের মতই উড়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ আর্থিক আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তাতে যে কোন নয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপরই লোকের বীতশ্রদ্ধ ভাব জন্মে। বিশেষতঃ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তারা সব চাইতে বেশী খাপ্পা হয়ে উঠে। কারণ South Sea Company অনেকটা তৎকালীন বীমার আদর্শেই গঠিত ছিল এবং তা'ছাড়া ব্যাঙের ছাতার মতই বিলাতের ব্যবসা ক্ষেত্রে হঠাৎ-গজিয়ে-উঠা ছোট বড় যতগুলো জীবনবীমা কোম্পানী "Amicable"এর ব্যর্থ অনুকরণে স্থাপিত হয়ে তারই আদর্শে গড়ে উঠে পয়সা লুট্‌বার ফন্দীতে ছিল, তার সবগুলোকেই সেই জাতীয় আর্থিক বিপদের ঘূর্ণীপাকে পড়ে পাত্তাড়ি গুটিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করতে বাধ্য হ'তে হয়। সকলেই এই ব্যাপারের পর জীবন বীমা করাটাকেও নিঃসঙ্কোচে জুয়া কিম্বা ফাট্‌কা বাজী বলে মনে করতে লাগল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে জীবন বীমার জন্মই হয়েছে "South Sea Bubble"এর মধ্যে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে "South Sea Company"র পতনের ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও জগতে "South Sea Bubble" বা দক্ষিণ-সাগরের বুদ্‌বুদ্ আখ্যায় পরিচিত হয়েই আছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এরূপ একটা ভীষণ অর্থনৈতিক চাঞ্চল্যের আওতায় যে প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতি জনসাধারণের মনে যে একটা সত্যিকারের দরদহীন আতঙ্কপূর্ণ উদাসীনতার ভাব বদ্ধমূল হ'য়ে উঠ্‌বে তাতে আঁৎকে উঠ্‌বার এমন কিছুই নেই। এ ছাড়া বিলাতের সে কালের লোকদের জীবনবীমার উপকারিতাকে উপেক্ষা করে চলার পক্ষে অবশ্য যথেষ্ঠ কারণ বর্ত্তমান ছিল। কেননা আজকালকার মত বিজ্ঞান সম্মত ভাবে জীবন বীমার ব্যবসা পরিচালন করার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা তখনকার দিনের বীমা প্রতিষ্ঠান গুলোর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। জীবন বীমার চাঁদার হার (Rate of premium) সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর একটা ধার্য্য করা হত। বিজ্ঞান অনুমোদিত মৃত্যু হারের তালিকার (Mortality Table) সাহায্য চাঁদার হার নির্ণয় করার সুযোগও তখন ছিল না। অল্পকাল স্থায়ী দায়িত্বে কোম্পানী কর্তৃক জীবন বীমার চুক্তি বা "পলিসি" দেওয়া হ'ত। সাধারণতঃ সাগরিক বীমা বা অগ্নি বীমার মতই এক বৎসরের দায়িত্বে কোম্পানী জীবন বীমার চুক্তি দিত। জীবন বীমার চাঁদার হারও আজকার তুলনায় চার গুণেরও বেশী ছিল। যে ব্যক্তি বিলাতে তথা পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম প্রণালীবদ্ধ কোম্পানী থেকে বীমা চুক্তিপত্র নিয়ে জীবন বীমা করছিল তাকে বীমার দাবীর প্রতি হাজার করা ৮০৲ আশী টাকা হিসেবে চাঁদা দিতে হয়েছিল। আজকাল ১৫৲।১৬৲ পনের ষোল টাকা বার্ষিক চাঁদা দিয়ে বহু প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠান থেকেই অনুরূপ পলিসি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্তরূপে যে ব্যক্তি জগতে সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমা করার গৌরব লাভ ক'রে ইতিহাসের বুকে চিরস্মরণীয় হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর নাম উইলিয়ম গিবথন্স (William Gibthons)। এর বাড়ী ঘরের ঠিকানা সঠিক নির্ণীত না হয়ে থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের অনুমান সিদ্ধান্ত মত ইনি স্কটলাণ্ডের লোক ছিলেন বলে জানা যায়। জীবন বীমার দিক দিয়ে বিচার করলে এই ব্যক্তির জীবন ও বীমা চুক্তির দাবী মিটান সংক্রান্ত ঘটনা যারা জীবন বীমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান তাদের কাছে একটা আদর্শঃ স্মরণীয় ঘটনা। এটা একটা মস্ত বড় সাফল্যপ্রদ কাহিনী (Successful event) কারণ জীবন বীমার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা এই একটীমাত্র জীবনের ওপর দিয়েই কাৰ্য্য-

পাথরে সোনা কষে পরখ করে দেখার মতই সফল হ'য়ে উঠেছিল। তার উপর আরো মজার কথা এই যে পৃথিবীর এই সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমাকারীর বীমা চুক্তির দাবী নিষ্পত্তি করাও আদালতের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি।

গিবথন্স জীবন বীমা করার এগার মাস এগার দিন পরই ইহলীলা সাঙ্গ করে। তার মানে সেকালের বীমা কোম্পানী গুলোর বিধান মত বীমা চুক্তি বাতিল হ'বার মাত্র ২০ বিশ দিন থাকৃতে তার মৃত্যু হয়। কোম্পানী বিলাতের তৎকালীন প্রচলিত আইনের খুৎ ধরে উক্ত বীমাকারীর দাবী মিটাতে অস্বীকার করে। কারণ তখন বিলাতে আইনানুসারে ২৮ দিনে মাস ধরা হত এবং ২৮ দিনের ১২ বার গুণ সময়কেই পূরা বৎসর গণনা করা হ'ত। এরূপ আইনের ফলে বীমাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বেই বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে বলে কোম্পানীর পক্ষ থেকে আদালতে আপত্তি জানান হয়। আদালত কিন্তু কোম্পানীর এই আপত্তি অগ্রাহ্য করে বীমাকারীর ওয়ারিশকে বীমা চুক্তির সম্পূর্ণ দাবী মিটিয়ে দিতে কোম্পানীর ওপর আদেশ জারী করেন। শোনা যায় আজ পর্য্যন্তও জীবন বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে বীমা চুক্তির দাবী নিয়ে চুক্তি পত্রের ছুতোনাতা খুঁত ধরে গোলযোগের উৎপত্তি হলে উক্তরূপ রায়ই নজীররূপে খাটান হয়। এই ঘটনাটীও বীমা-জগতে একটা বিশেষরূপ স্মরণীয় ঘটনা।

সর্ব্বপ্রথম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান Caledonian Insurance Co. ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। হলাণ্ডে সর্ব্ব প্রথম জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান-এর বনিয়াদ স্থাপিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ফরাসী জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এবং জার্ম্মানীতে সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমা কোম্পানীর গোড়া পত্তন হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। তারপরই ভারতের পালা। জীবন বীমা সাগরে ভারত যদিও আজ পর্য্যন্তও কূলে উঠ্‌তে পারে নি তবু একথা সত্য নয় যে জীবন বীমার সাথে ভারতের পরিচয় নিতান্ত সে দিনের ঘটনা। একশ' বছরেরও আগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে মাদ্রাজ প্রদেশে "Madras Equitable" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহাই সারা ভারতের সর্ব্ব প্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী "The Mutual Life Assurance Company of New York" ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কানাডার "Canada Life" কোম্পানীই তথাকার প্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম লাভ করে। জাপানে সর্ব্ব প্রথম জাপানী কোম্পানী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এথেকে আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকা, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ যদিও আজ বীমা-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেচে তবু ভারতের সৌভাগ্য যে সে এদের বহু আগেই জীবন বীমার সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ লাভ করেছিল। এটা বাস্তবিক ভারতের পক্ষে কতকটা গৌরবের কাহিনী।

দেশীয় জীবন বীমা

সমৃদ্ধির অন্তরায়

স্বদেশের ভাবনা দেশবাসীকে স্বদেশী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সহরে, নগরে, এমন কি সুদূর পল্লীর অবজ্ঞাত প্রান্তেও স্বদেশী পণ্যের চাহিদার অন্ত নাই। কিন্তু এখনও ব্যবসায়ের বাষ্পরথে চড়িয়া অবহেলার ছিদ্রপথে ভারতের কত অর্থ যে বিদেশী বাণিজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার সন্ধান রাখে কয় জনে?

বাণিজ্য সম্পদের প্রধান শক্তি অর্থ। অর্থবল যাহার যত অধিক, ব্যবসায়ে প্রাধান্য তত বেশী। কিন্তু আমাদের অর্থ সম্পদ শূন্য হইতে চলিয়াছে—কোন সুড়ঙ্গ-পথে অজ্ঞাত অন্ধকারে?

জীবনবীমার কথা ধরা যাউক। ভারতবর্ষে দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানীর অভাব নাই, তথাপি বিলাতী ও বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিই এখানে ঐশ্বর্য্যের জাঁকে ফাঁপিয়া উঠিতেছে। অথচ ইহারই পার্শ্বে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ভারতীয় সাহায্যের অভাবেই আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিলাতী বীমা কোম্পানীগুলির অর্থ সাহায্যে বিলাতী ব্যবসায় ভারতের বাজারে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বীমা কোম্পানী অর্থাভাবে দেশীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে পারে না। বীমা কোম্পানীর মূলধনে বিলাতী মহাজন কোটিপতি আর স্বদেশী শিল্প পরিচালনে মূলধনের অভাবে দেশী ব্যবসায়ী পরমুখাপেক্ষী!

ইহার কি প্রতিকার নাই? প্রতিকার আছে। দুই প্রকারে তাহা সম্ভব, এক রাজশক্তির সহায়তায়, দ্বিতীয় জনসাধারণের দেশাত্মবোধ জাগরণে। মেক্সিকো, চিলি, ব্রেজিল, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশে আইনের বাধায় বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলিকে সংযত রাখা হয় কিন্তু আমাদের বিদেশীশাসিত এই ভারতবর্ষে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দ্বিতীয় উপায়, দেশবাসীর সাহায্য ও সাহচর্য্য, বর্ত্তমান ভারতে সেই দেশাত্মবোধের মূলধনেই বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের ব্যবসা পরিচালন করিতেছে। তথাপি এই বীমা কোম্পানীগুলির অধিকাংশ অর্থ খাটানো হয় দেশীয় প্রতিষ্ঠানে, তাহাতে আমাদের সাহায্য কতটুকু?

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর বার্ষিক খতিয়ানে দেখা যায় ৫,৬৪,০০০ ব্যক্তি মোট ১২৪ কোটি টাকার বীমা করিয়াছে অর্থাৎ জনপ্রতি বীমার পরিমাণ মাত্র চারি টাকা, আর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০৲ ও ৬০০৲ টাকা। ভারতবর্ষে প্রতি ৫০০ শত জনের মধ্যেও একজন বীমা করে না। পলিসি হিসাবে বিদেশী কোম্পানী প্রতি পলিসিতে যেখানে বীমার পরিমাণ পাইয়াছে ৩৫০০৲ টাকা, ভারতীয় কোম্পানী সেখানে পাইয়াছে ১৭০০৲। আমাদের দেশীয় ধনবানগণের বিদেশী কোম্পানীর প্রতি অহৈতুকী প্রীতিই ইহার মূল কারণ।

অথচ ইহার প্রতিকার কত সহজ! ব্রিটীশ প্রদর্শনীতে একটী অ-ব্রিটীশ টাইপ রাইটারে একজন ইংরেজকে টাইপ করিতে দেখিয়া রাজা জর্জ্জ বলিয়াছেন, "ছি! ছি!" সেদিনও সম্রাজ্ঞী মেরী ব্রিটীশ রমণীদিগকে একমাত্র ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবহারের নিমিত্ত নিজেই অনুরোধ জানাইলেন—প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী রমণী একমাত্র ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবহার করুক। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর এই দেশপ্রীতিতেও কি ভারতবাসীর স্বদেশী-প্রীতি জাগ্রত হইবে না? পোষ্ট অফিসের পোষ্টমার্কে কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন—Support Indian Industries—স্বদেশী শিল্পের সহায় হও। কিন্তু কোন্ উপায়ে? স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে যেমন প্রত্যেক দেশ কায়মনোবাক্যে সাহায্যদান করিয়া বিশ্বের বিপণীতে তাহার শ্রেষ্ঠ আসন রচনা করে, আমাদের দেশাত্মবোধও তদ্রূপ স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া জগতের পণ্যশালায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সহায় হউক।

(বঙ্গবাণী)

টিপ্পনী

স্বরাজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং এজেণ্ট যামিনী মোহন ঘোষের প্রতি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রবঞ্চনার অপরাধে ৯ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াও কোন স্ফল ফলে নাই।—স্বরাজ ব্যাঙ্কের মত আরও কয়েকটী ব্যাঙ্ক কলিকাতায় দেখা দিয়াছে। জনসাধারণ ইহাদের বিষয়ে সাবধান হইলে ভাল হয়।

"ইণ্ডিয়ান্ ইন্সিওরেন্স ক্লাবের" নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্সটিটুট" রাখা হইয়াছে। সেদিন "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্শের" একটী কামরায় এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগীদের চেষ্টায় একটী সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়। সভার সভাপতি হইয়াছিলেন ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী। ব্যানার্জ্জী সাহেব সেদিন সভার কার্য্য যে ভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন 'ডেমক্রাশি'র ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত আর একটী নিশ্চয়ই মিলিবে না। সাধারণ সভায় যাহাদিগকে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সভার গৃহীতব্য নিয়মকানুন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু ব্যানার্জ্জী সাহেব তাহারা সভার মেম্বর নহেন অজুহাতে তাহাদিগকে কিছু বলিতে দেন নাই। সভা যথারীতি গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে কিরূপে মেম্বর হওয়া চলে ইহা বোধ করি একমাত্র তিনিই নির্দ্দেশ করিতে পারেন। অথচ পরে যাহারা সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন বা কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আজ পর্য্যন্ত সভার সদস্য হন নাই। শুধু তাহাই নহে, বীমাজগতে সুপরিচিত ও নিমন্ত্রিত কোন ভদ্রলোক কয়েকটী কথা বলিবার জন্য সভাপতির অনুমতি চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনাকে বলিতে দেওয়া হইবে না।" তিনি উত্তর করেন, "আমি তাহা হইলে এখানে থাকিয়া কি করিব?" ভদ্র সভাপতি মহাশয় উত্তর করেন, "আপনি চলিয়া যাইতে পারেন" (you can see the door)—আমরা ইন্সটিটুটের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোন অন্যায় হইতে দেখিলে তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করি, এইজন্যই এসব কথা বলিলাম। যাহা হউক সেই সভায় ব্যানার্জ্জী সাহেবের স্থানে বর্ষীয়ান, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন প্রভৃতি কৃতী ও মান্য ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় অতঃপর এই অনুষ্ঠানে দাম্ভিকের ঔদ্ধত্য প্রকাশের আর অবকাশ থাকিবে না, যোগ্য ব্যক্তির পরিচালনায় ইহা উত্তরোত্তর উন্নতি ও গৌরব লাভ করিবে।

'সান্ লাইফ অব্ কেনাডা' এদেশে প্রতিবৎসর বহু কোটী টাকার জীবনবীমার কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের যথার্থ মঙ্গল যাহারা চাহেন তাহাদের কর্ত্তব্য, এই শোষণে সকল প্রকার বৈধ উপায়ে বাধা দেওয়া। এজন্য দেশব্যাপী প্রচার ও অন্যবিধ চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই সকল প্রবন্ধ এরূপভাবে লিখিত হওয়া উচিত যাহা পাঠ করিয়া কেবলমাত্র হাস্যরসেরই উদ্রেক না হয়!—সম্প্রতি "এসিয়্যান এসিওরেন্স কোম্পানী"র ভূতপূর্ব্ব চীফ এজেণ্ট ও "ব্যবসা ও বাণিজ্য" নামক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু মহাশয় তৎসম্পাদিত পত্রে সান্ লাইফ সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিখিতে গিয়া যে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া এই কথাই আমাদের মনে হইল। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" লিখিয়াছেন:—

"কিছুদিন আগে আমরা দেখিয়াছিলাম যে Sun Lifeএর Life Fund ১,০৬,৩১,১৫,৬৩৫ টাকা; কোটী অঙ্কটা পড়িলেই আমাদের দেশের Insuranceএ অনভিজ্ঞ লোকেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যায় এবং চোখ কপালে তুলিয়া বলে—আরে বাপরে! দেখেছ, এ যেন টাকার একেবারে দরিয়া—অপার—অথৈ—অতল; কিন্তু এই সঙ্গে

যদি দেখাইয়া দেওয়া হয় যে Sun Lifeএর এই যে Life Fund দেখিতেছ ইহার বাঁয়ে আবার এইরূপ এক অপার, অথৈ, অতল এক দেনার দরিয়া আছে তাহার পরিমাণ এই Life Fund অপেক্ষা অনেক বেশী। অর্থাৎ Sun Life সকলের নিকট পলিশি বিক্রয় করিয়া যে দেনা করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ৪,০৭,৬৬,৮৬,৭৯৪ কোটী টাকা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে যে Sun Lifeএর Life Fund অপেক্ষা পলিসি কণ্ট্রাক্ট বাবদ Liability বা দেনার পরিমাণ চারিগুণ বেশী।"— অর্থাৎ "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদকের মতে Life Fund অপেক্ষা পলিশি কণ্ট্রাক্ট বাবদ Liability চারিগুণ বেশী হওয়া সাংঘাতিক 'ব্যাপার! সম্পাদক মহাশয়ের দেশী কোম্পানীর পক্ষ লইয়া ওকালতী করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু তিনি "ইন্‌সিওরেন্স সম্বন্ধে একেবারে নীরেট!"

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

OCTOBER] UPASANA 1930.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

[illegible] সংখ্যা } সম্পাদক
শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় { আশ্বিন, ১৩৩৭

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲] কার্য্যালয় :—৯৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলি ১৬২২ [প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

সুকেশিনীর শিরশোভা

সকল ঋতুতে সমভাবে ব্যবহার ও সমান হিতকর

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

মেঘের সভা

"সর্ব্বহারা সন্তানের অবরুদ্ধ কণ্ঠের রোদন
মাতার সকল গর্ব্ব, সর্ব্ব গৌরবের অপচয়
দেবত্বের মহিমারে পায়ে দলি' ঘোষে পরাজয়।"

২৫শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মুক্তি-ঘুম

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

দূর দুর্গম দুর্গের আড়ে সূর্য্য অস্তে নামে,—
বন্ধুর সাথে দেখা হ'ল পথে শ্রীচৌরঙ্গীধামে।
ভরা দখিণায় ভেসে চ'লে যায় বৈশাখী শনিবার,
সন্ধ্যাবিহারী শ্বেত নরনারী, হাওয়াগাড়ি অনিবার।
দখিণার ঝড়ে নুয়ে নুয়ে পড়ে শ্যাম পথতরুদল,
চলে তলে তলে রূপবিলাসিনী যৌবনবিহ্বল।
ইষ্টসিদ্ধ অকৃটর্লোনি ইষ্টকযোনি পেয়ে—
অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে উদাস র'য়েছে চেয়ে।
মাঠঘেরা বাড়ী, একপাশে তারি ডালছাটা অশ্বত্থ,
পথভোলা এক বেহায়া কোকিল তাহে পঞ্চমমত্ত।
বাঁকাচোরা বুড়া বলরামচূড়া ফুলে ফুলে লালে লাল,
শ্যামল আঁধারে লম্পট হাওয়া লুটে বকুলের ডাল।
দমকা দখিণা বহি' আনে শত গন্ধের সন্দেহ;—
পাষাণ-চাপা এ সহরেরও বুকে কত বসন্ত-স্নেহ।

বৈশাখী সাঁঝে জনতার মাঝে তড়িৎ-দীপ্ত পথে
আমারে দেখিয়া থামিল বন্ধু, নামি' এল রথ হ'তে।
"এমন সময় এদিকে কোথায় ?" কহে বিস্ময় মেনে
"তোমার ডেরা ত চিরকাল জানি ছকু-খানসামা লেনে।"
আমি কহিলাম—"চলেছিনু ভাই তোমারই যে সন্ধানে,
আজ সন্ধ্যায় মোর সাথে চল আমার বাসার পানে।"

রাত্রি তখন অধিক হ'য়েছে ছকু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে।
আমি ও বন্ধু নির্জ্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে' গিয়ে রাতের দখিণা ঘুরে' মরে অলিগলি।
পৌঁছি' বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি' কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
'বল বল ভাই মুক্তি কোথায় ? চরকা না বন্দুকে ?'
হাসিয়া বন্ধু পরম যতনে অঙ্গে বুলায় কর,
কানে কানে কথা কহে অতি মৃদু গোপন গভীরতর।
স্নেহের পরশে আঁখি মুদে' আসে,—গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
সাগরের হাওয়া কাঁপায় কোণের কেরোসিন শিখাটাকে।—
তন্দ্রা আসিলে বুঝিনু—বন্ধু কহিতেছে কানে কানে,—
"চরকাও বুঝি বন্দুকও বুঝি, মুক্তিরই নেই মানে।

"ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
"জীবনে মরণে কোনখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
"ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
"মুক্তি না পেয়ে ভোলাশঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে'।

"জল হ'তে তুলে' শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
"দল বেঁধে তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে ঝুলিয়া রয়।
"রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
"ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
"ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা,—
"চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
"সৃষ্টি ত' শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে পাক,—
"এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক!
"বন্দুক হ'তে যে মুক্তিস্রোতে জড় কন্দুক ছুটে,
"সেই মুক্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে তুলো সুতো হ'য়ে উঠে।
"আসল মুক্তি এতে ওতে তাতে নেই যে তা নিঃসন্দ,
"নকলের তরে চরকা এবং বন্দুকে বৃথা দ্বন্দ্ব!

"যতেক মুক্তিপন্থী,—

"পুরাণো গ্রন্থি শিথিল করিতে কসে দৃঢ় নবগ্রন্থি।
"প্রোথিত দণ্ডে বসনখণ্ডে রঙিন্ বাঁধনে বাঁধি'
"মিলি' তারই তলে ভাবে দলে দলে মুক্তিসাধন সাধি।
"মাটীর কারায় যে তপস্যায় বীজেরা বক্ষ চিরে,
"তারি ফলে উড়ে মুক্তির ধ্বজা দীঘল তালের শিরে।
"সেই মুক্তির আনন্দ তার আকণ্ঠ ভরে রসে,
"ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি' মাতাল হইয়া বসে।
"কে ত্থাখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
"ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।

"একক বীজের মুক্তি

"সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
"রসমাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
"একজন কাটে তালের আগা ও আরজন কাটে গোড়া।

"যুগ যুগ ধরি' এই বিশ্বের যতেক মুক্তিকামী
"তপ্ত তাওয়ার কাটা কই হেন বিফলে উঠিছে ঘামি'।
"তার মাঝে যার বেদনা অসহ, সেই ছট্‌ফট্‌ করে,
"তেলের নুনের আইন না মেনে আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে।

"ঘোর্‌ ঘর্ঘর ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌ দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম দ্রুম্‌!
"মোর বরে তোর কানের ভিতর সমান ঢালুক ঘুম,
"ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
"শুনিস্‌নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
"ও কাঁদনে যদি কাঁদন মিলাস্‌ থামিবে না ক্রন্দন ;
"দুটি ক্ষীণ বাহু, কত কাটিবিরে বন্ধনে বন্ধন ?
"নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি'
"তারায় তারায় জাল বুনে' দিল বাঁধনের রসারসি !
"মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
"সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে মন।
"তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পাড়াই নিবিড় ঘুম,
"ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও নয়নে দিলাম চুম !
"যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,
"যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহাহিত,—
"সেই ঘুম হ'তে এনে'
"তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে।
"যখন ঘটিবে যে রঙ্গ চৌরঙ্গীর মোড়ে মোড়ে—
"গোপনে গোপনে আপনি আসিয়া স্বপনে শোনাব তোরে।
"মোর 'পরে তুই বিরূপ হ'লেও ভালবাসি তোরে ভাই,
"ঘুমের পাতালে গুম্‌ কোরে তোরে দ্বারে আমি জাগি তাই।"

যোগেন্দ্র চন্দ্র

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী]

আজ আমরা যাঁহার স্মৃতি-সভায় সমবেত হইয়াছি, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তিরোধান হইয়াছিল। মধুসূদন বলিয়াছেন :—

"জন্মিলে মরিতে হ'বে অমর কে কোথা কবে ?
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে ?"

কিন্তু আমাদের এই "শ্যামা জন্মদা" বঙ্গভূমি তাঁহার যে সন্তানকে মনে রাখেন, তিনি মরিতে ভয় করেন না—"মক্ষিকাও লভে নাক ডুবিলে অমৃত হ্রদে,"—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু যে কীর্ত্তির অমৃত-হ্রদে ডুবিয়াছেন, তাহার প্রমাণ—আজ তাঁহার মৃত্যুর পর যখন ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাঁহার সমসাময়িক ও সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে অনেকেই যখন লোকান্তরিত, তখনও তাঁহার গুণানুরক্ত ব্যক্তিরা সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। যে দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রম হয়, বিশেষ যে দেশে সাহিত্যিকের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কবি হেমচন্দ্রের কথা স্মরণীয় :—

"হায় মা ভারত, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ;
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই সে দরিদ্র হবে।"

সে দেশে মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি সভায় এইরূপ সজ্জন সমাগম বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই—তাহা যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুণাধিক্যেরই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। তিনি আরও ছিলেন—বাঙ্গালী। তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে সাহিত্য সেবায় শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হয় নাই—এসিয়াটিক সোসাইটী বাঙ্গালার বাহিরের ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত, তখন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘনরাম প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালী কবিদিগের কাব্য যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সব কাব্যে তিনি বাঙ্গালার স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি কিরূপ সাহিত্য-রসিক ছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার "চিনিবাস চরিতামৃত" হইতে "রাজলক্ষ্মী" পর্য্যন্ত উপন্যাসগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। এক হিসাবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি খাঁটী ভালবাসিতেন, মেকীর উপর বড় বিরক্ত ছিলেন। সেই বিরক্তি তাঁহার রচনায় তীব্রভাবেই ব্যক্ত হইত। মেকী সমাজসংস্কারক, মেকী ধর্ম্মপ্রচারক, মেকী সভ্যতাভিমানী—কেহই তাঁহার কশাঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার উপন্যাস গুলিতে তাঁহার সেই মেকীর উপর রাগ প্রকাশ পাইয়াছে। যে সময় প্রতীচ্য সভ্যতা যোগেন্দ্রচন্দ্রের জন্মভূমির দামোদরের বন্যার মত প্রবল প্রবাহে আমাদিগের পুরাতন সভ্যতার শেষ খড়-কুটা ভাসাইয়া লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিল, তখন যোগেন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালীকে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিয়া তাহা রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তখন "বাবু" বলিতে যাহা বুঝাইত, তিনি তাহার উপর চটা ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি মনে পড়িল :—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষ কাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচি বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারান্দায় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরাজী

যোগেন্দ্র-স্মৃতি-সভায় সভাপতি মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এম্-এ কর্ত্তৃক পঠিত।

কবিতায় তাহা হইল না—ইংরাজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বহিতে বহিতে গাহিতেছে :—

"সাধ আছে, মা, মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবীজীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আবেগ শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবীজীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ তাজিবারই বটে. তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সবই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় তেমনই বাঙ্গালীর মনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র সুরসিক ও সুযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন কিন্তু তিনি যে জাতীয়তার প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, উপন্যাস তাহার প্রচার-বেদী হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি সংবাদ পত্রের সাহায্যে ভাব প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল—"বঙ্গবাসী"। কয় বৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিসভার সভাপতি তাঁহাকে বিলাতের সংবাদপত্রাধিকারী লর্ড ক্লিফের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বিলাতের সংবাদপত্র পরিচালনকে লর্ড ক্লিফ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে সংবাদ পত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, "সোমপ্রকাশ", অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত সাহিত্যাচার্য্য "সাধারণী" এবং কেশবচন্দ্রের মত দেশ-বিশ্রুতকীর্ত্তি ব্যক্তি "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন পত্রই স্থায়ী হয় নাই; কেহই সমাজের যে স্তরে সংবাদ পত্রের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন সে স্তরে উপনীত হইতে পারেন নাই। সে সকলের পরবর্ত্তী—"সুরভী", "পতাক প্রভৃতিও স্থায়ী হয় নাই। "বঙ্গবাসী"ই প্রথম বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কাছে আদৃত বাঙ্গালা সংবাদ পত্র। আর "বঙ্গবাসী"র পাঠকগণ উপহার পাইতে লাগিলেন—শাস্ত্রগ্রন্থ ও বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ কাব্য। ভগীরথ যেমন সাধনা করিয়া গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র তেমনি সাধনা করিয়া নূতন ভাব এ দেশে আনয়ন করিলেন। "বঙ্গবাসী" অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় ভাবের ভাবুক শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকদিগের ভাব-প্রকাশ-কেন্দ্রে পরিণত হয়। "পঞ্চানন্দ" —অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সুলেখকের সুচিন্তিত রচনায় "বঙ্গবাসী" অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গবাসীর আদর লাভ করিল। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র কর্ণধার রূপে বিরাজিত না থাকিলে বঙ্গবাসীর কি হইত বলা যায় না। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যবসা-বুদ্ধি "বঙ্গবাসী"কে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিল বলিয়াই "বঙ্গবাসী" দেশের ও দশের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

যখন এ দেশের লোক কেন্দ্রচ্যুত হইতেছিল সেই সময় এ দেশে প্রথম আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা হইয়াছিল। কিন্তু সে আন্দোলনেও বিদেশী আদর্শ ও বিদেশী প্রভাব ছিল। তাহার পরবর্ত্তী আন্দোলন হিন্দুর পুনরুত্থানের আন্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয় চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি। তাহার ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। তখন বাঙ্গালী সে আন্দোলনে অগ্রণী। বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে তখন পৌরাণিক নাটকের অভিনয় চলিতেছে—গিরিশ চন্দ্র, অতুল কৃষ্ণ প্রভৃতি সে দিকে দিকপাল। বাঙ্গলার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন "কৃষ্ণচরিত্র" রচনা করিয়া মানুষের আদর্শ দেশবাসীকে দেখাইলেন ও অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইলেন। "নবজীবন" ও "প্রচার" তখন এই নূতন ভাব বুঝাইতে লাগিল। আর সর্ব্বোপরি "বঙ্গবাসী" সমগ্র দেশে এই নূতন ভাব ছড়াইয়া ছিল। সে ভাব ধর্ম্মের ও জাতীয়তার। তখন "বঙ্গবাসী"র প্রভাব, প্রতাপ ও প্রচার অতুলনীয়। তখন "বঙ্গবাসী"র অনুকরণে কাব্য বিশারদের "হিতবাদী"—তাহার পূর্ব্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতন হয় নাই, তখনও উপেন্দ্র নাথের

"বসুমতী" বিবেকানন্দের "বাণী" লইয়া অবতীর্ণ হয় নাই। সার এণ্ড্রু স্কোবল যখন সম্মতি আইন রচনা করেন, তখনই "বঙ্গবাসী"র প্রভাব বিশেষ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে কখন তেমন আন্দোলন—তেমন সভা হয় নাই। তাহার পর স্বদেশী আন্দোলনই কেবল তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে। শশধর তর্ক চূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের বক্তৃতায় বাঙ্গালী তখন যেন আপনার হারান বৈশিষ্ট্য ফিরিয়া পাইয়াছিল। সে যেন নব জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"বঙ্গবাসী" বাঙ্গালীর আশাকে মূর্ত্তি দিয়াছিল। সেই বঙ্গবাসীর সর্ব্বস্ব যোগেন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালীর কত বড় আদরের ও কত বড় শ্রদ্ধার পাত্র তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

যে বাঙ্গালা বহুদিন দেশের সর্ব্ববিধ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী ছিল, যে বাঙ্গালার গোমুখী হইতে স্বদেশীর গঙ্গাপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, যে বাঙ্গালা বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্ম্মীর জন্মভূমি, সেই বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের অগ্রদূত "বঙ্গবাসী"। "বঙ্গবাসী" যদি জাতির নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত—যে স্তর হইতে জাতির শক্তির উৎস উদ্গত হয় সেই স্তরে জাতীয় ভাব বিস্তার করিতে না পারিত, তবে হয়ত বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণ" সেবাধর্ম্মের উপদেশ এমন ফলপ্রসূ হইত না। হয়ত সুরেন্দ্রনাথের কলকণ্ঠোত্থিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রার্থনা জাতির নিকট তূর্য্যনিনাদবৎ প্রতীয়মান না হইয়া অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইত।

যিনি দেশের অবস্থা বিবেকানন্দের ও সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করিয়াছিলেন, সেই যোগেন্দ্র নাথের দেশপ্রেম কিরূপ প্রগাঢ় ছিল তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। জাতিকে বাদ দিয়া স্বদেশ প্রেম হয় না, স্বদেশকে চিন্ময়ী মার মৃণ্ময়ী বিকাশ মনে করিতে না পারিলে দেশ-প্রেম স্ফূরিত হয় না। তাই আমাদের মত অবস্থাপন্ন জাতির পক্ষে বিশ্ব-প্রেম অপেক্ষা দেশ-প্রেম প্রয়োজন অধিক। এ বিষয়েও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। গুপ্ত কবি লিখিয়াছিলেন :—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

তিনি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া দেশের কুকুরকেও আদর করিবার শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা যোগেন্দ্রচন্দ্রে সফল হইয়াছিল। তিনি দেশের লোককে দেশের বৈশিষ্ট্যানুসারে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে বলিয়াছিলেন। এমন কি কংগ্রেসে যখন বিদেশী আদর্শের আদর হয় তখন তিনি তাহার উপরও বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে বিরত হয়েন নাই। সে বিষয়ে তিনি নির্ভীক ছিলেন। তিনি যখন দেশের সমাজে পুরাতন আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে কম বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ ইউরোপে

মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম্-এ

ভারতের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আশা, তাহাতে সমাজে বিক্ষোভের স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তিকে সমাজের ভিত্তি না ধরিয়া পরিবারকে ভিত্তি ধরিবার আদর্শ হইতে ভারতে পল্লীসমাজ প্রভৃতির উদ্ভব। আজ ইউরোপে ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতির স্বার্থে তাহার স্বার্থ ডুবাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইউরোপে বিপ্লব ও রক্তপাতের, হিংসা ও বিশৃঙ্খলার মজ্জ

দিয়া আবার প্রাচীন ভারতের সামাজিক আদর্শকে বরণ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে যোগেন্দ্রচন্দ্রের শাস্ত্র প্রকাশের উল্লেখ করিয়াছি। শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ পূর্ব্বে পুঁথিতেই ছিল। যখন শাস্ত্র চর্চ্চা ব্রাহ্মণদিগের এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তখন সে ব্যবস্থায় শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর যখন সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল—বিশেষ যখন অজ্ঞতাই ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবার পক্ষে সহায়তা করিল, তখন শাস্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচারেরই প্রয়োজন হইল। সেই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ বঙ্গানুবাদ সহ প্রচার করিয়া সে সব সুলভ করিয়া দিলেন—শাস্ত্রজ্ঞান দেশে পরিব্যাপ্ত হইল। তাহার এই কার্য্যের উপযোগিতা ও উপকারিতা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

এই শাস্ত্র প্রচারেও তিনি দেশসেবার আগ্রহেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দেশাত্মবোধ ও দেশ-সেবার আগ্রহ হইতেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের কার্য্যের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল।

কবি নবীনচন্দ্রের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি—তাঁহার "ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।" তাঁহার যে সব আশা সফল হইয়াছে, সে সকলের উল্লেখ আমি পূর্ব্বে করিয়াছি। সে সকলের মধ্যে বঙ্গবাসী সর্ব্ব প্রধান।

তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুলভ দৈনিকপত্র প্রচার করিয়া সাফল্য লাভের আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। 'দৈনিক' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'টেলিগ্রাফ' তিনি বহুদিন বহু অর্থব্যয়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই বাঙ্গালা দৈনিক বন্ধ করিতে হয়। তাঁহার লোকান্তরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ইংরাজী দৈনিক 'টেলিগ্রাফ'কে সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। কিন্তু তিনি পথ রচিত করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ সেই পথে অগ্রসর হইয়া একাধিক বাঙ্গালা দৈনিক পত্র পরিচালন সম্ভব হইয়াছে। এ দেশে সুলভ দৈনিক ইংরাজী পত্র প্রচার সম্ভব কি না তাহা এখনও পরীক্ষাধীন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ত্যাগের উপর আজ সুলভ দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত।

যাঁহার এত গুণ, এত কীর্ত্তি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা আজ এই সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। আর এই সভার উদ্যোগীরা আমাকে এই সভার সভাপতি পদে বৃত করিয়া স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার সুযোগ দিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কেন করিনি আদর
যৌবন টলমল এ ভরা ভাদর।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, আমারি বুকের কাছে
নয়ন ঝরায়ে ঝরে অঝোরে বাদর।
ঘনাইয়া আসে দেয়া গন্ধে আকুল কেয়া
আমারি দুয়ার হ'তে ফিরিল নাগর।

আর্ট—বর্ত্তমান ও অতীত

[স্বামী বাসুদেবানন্দ]

প্রশ্নটা হোল পুরাতনকে নূতনের পরিচ্ছদে সাজান যায় কি না? আমরা বলি, একদিক দিয়ে সেটা অসম্ভব হলেও আর একদিক দিয়ে সেটা সম্ভব। অতি আদিম কালে ব্রহ্মা একটা সত্য নির্ণয় করে তাঁর শিষ্যদের বল্লেন; অসুর তার ভাবানুযায়ী একটা ব্যাখ্যা করে সন্তুষ্ট রইল এবং সেইটে সমাজে বেশ চল্ল। কিন্তু ইন্দ্র শতবর্ষ ধরে সে বিষয় চিন্তা করে তার আর একটা নূতন অর্থ আবিষ্কার করলেন। (১) আমরা এখন বলতে পারি পুরাতন কথাই নূতন কলেবরে প্রকাশ পেলো। আবার আর একদিক দিয়ে ভন্ ইডের (Von Uhde) কথায় সায় দিয়ে বলতে হয়, সেণ্ট জোসেফ্‌কে কি নাবিকের বেশে বা ভার্জ্জিন মেরীকে কি শাল মুড়ে রূপায়তনে চিত্রিত করা যায়? (২) তবুও প্রাচীনেরা বাইবেলের গল্পগুলো তাঁদের সময়কার পরিচ্ছদে সাজিয়েছেন। কিন্তু অনেক সময় তা ভাল না দেখালেও সেদিন এক খানা বই পড়ছিলুম, তাতে খৃষ্টকে নিছক কর্ম্মীর পরিচ্ছদে সাজান হলেও, বড় মধুর আনন্দরস পাওয়া গেল। (৩) আমরা বলি একই সত্য মানবের সমস্ত চিন্তা ও ভাবধারার মধ্য দিয়ে বিভিন্নরূপ নেওয়ায় বোধ হচ্চে যেন প্রাচীন হতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং এই বিচ্ছিত্তির হেতু, চঞ্চলা প্রকৃতির স্বাধীন লীলা-বিলাস শিল্পীদের কোন স্থির ও স্থায়ী বা সংবৃত ধারাকে (Convention) শিরোধার্য্য করে নিতে দিচ্ছে না। প্রতি শিল্পীই ভাবেন, আমি শেষ সন্ধান পেয়েছি; আনন্দ ও রূপ প্রগতির অঙ্গবাসের অর্দ্ধউন্মোচন-মুগ্ধ শিল্পীর চক্ষুতে স্বপ্নের আবেশ তুলে দিয়ে শেষ শায়িতীর মত তাকে যোগ নিদ্রায় অভিভূত করে ফেলে। স্বামিজী বলেছিলেন, "প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখেছিলাম। মূর্ত্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা লেখা—Art unveiling Nature—অর্থাৎ শিল্প প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভিতরের রূপ সৌন্দর্য্য দেখছে। মূর্ত্তিটি এমন ভাবে তৈরী করেচে, যেন প্রকৃতি দেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গ্যাছে। (৪)

মূল সত্যকে যারা জানতে চায় তারা পরিণাম গুলোকে বাদ দিয়ে "নেতি"-মার্গ অবলম্বন করবেই। আর যারা ভাবে সেই সত্যই এই পরিণামের মধ্যে লীলায়িত হয়ে রয়েচেন, সীমার মধ্যে সেই অসীমই খেলা করচেন তারা প্রতি পরিবর্ত্তনকে সেই চিরন্তনীর নূতন দান মনে করে তাকে বরণ করে নেবে--এ হল "ইতি"মার্গ। একই মহা-প্রাণের যখন শীর্ণকায়া 'তাপসী' এবং বিলাসোজ্জ্বল 'রাধা'র মধ্যে বিকাশ, 'জ্ঞান'-পথ এবং 'আনন্দ'-পথ যখন একই সত্যকে ধরবার চেষ্টা, তখন তপস্যা ও বিলাসের মধ্যে উপাসনার বিরোধ কোথায়? শিল্প-সাহিত্যের ভাব ধারা পিরামিড থেকে তাজমহল পর্য্যন্ত চলে এসেছে। তারই একটা যুগে খৃষ্টীয় আর্টের জরাজীর্ণ type (পদ্ধতি) প্রকাশ পায়; কেন না তারা 'নেতি'-মার্গী ছিল বলে মনে করত দেহটা একটা পাপের আসন, একটা মৃত্যুর ছায়া। তার পরেই এল 'ইতি'-মার্গী গথিক আর্ট। তারা দেখালে শিল্পে অপরূপের মূর্ত্ত রূপ, প্রাণ-বেদীতে মহাপ্রাণের লীলা ভঙ্গী। সত্যকে অবলম্বন করে জ্ঞান ও আনন্দের তরঙ্গ চলেছে—কখনও উঠচে, কখনও নামচে। একটা তরঙ্গ

---

(১) ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮।৭॥

(২) Could you imagine a sacred story with modern costume, a St. Joseph in a coat of pilot cloth, a virgin in a dress with a Turkish shawl thrown over her head?...And yet the old painters represented all biblical and sacred stories with the costume of their own time.—Von Uhde.

(৩) The man No Body knows—Bruce Burton.

(৪) স্বামি-শিষ্য সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, একাদশ বল্লী।

শীর্ষে লেখা—"এ দেহটা মৃত. পাপে পূর্ণ, আত্মাই অমর ও সত্য"। (৫) তখনই আবার ছায়া চিত্রের মত সেটা বদলে গিয়ে আর একটা তরঙ্গের আবির্ভাব হলো যার ওপরে লেখা, "খ্রীষ্টধর্ম্ম মানব ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট করেছে, যার জন্য তার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি পাপপূর্ণ হয়ে পড়েছে।" (৬)

এই দুটো ভাব নিয়ে মানব চরিত্র, কেউ কাকেও একেবারে নিঃশেষ করে মুছে ফেলতে পারবে না, তা করতে গেলেই আর একদিক দিয়ে তা নূতন রূপে ফুটে উঠবেই। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে, নেতি ও ইতির আলোছায়ার লুকোচুরির মধ্যেই নূতনের আগমন। উদ্ধব গোপীদের জ্ঞানোপদেশ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন, "চিত্ত বৃত্তির নিরোধ করব কি করে, চিত্ত যে আগেই আমরা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করেছি। বিলাস ত্যাগই বা করি কি করে, আমরা যে বিলাস দিয়েই তাঁর সেবা করি।"

খৃষ্টীয় আর্টিষ্টরা আবার এককালে বৌদ্ধ, মিশরীয়, পারসিক ও যবন শিল্পের স্বাভাবিকতার সমালোচনা করে তাকে অচল করে দেন। তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান করে বললেন যে, সব সৌন্দর্য্য-সুখপ্রিয়তা, কোমলতা ও সৌকমার্য্য সন্দেহের বস্তু, কারণ সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব ভোগ জীবনের দিকে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দিকেই দেহীকে প্রলুব্ধ করে। তাই তাঁদের আর্টে স্বেচ্ছাকৃত শ্রীহীনতাই স্পষ্ট।

এর প্রতিবাদ হলো গথিক আর্টে—অসম্পূর্ণ প্রাণের কি গভীর যাতনা তা চিত্র কলায় ফুটিয়ে তুলে। ইতিহাসটাকে যদি একটা গোটা বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে—জাগরণ ও স্বপ্নের মত, শ্রম ও বিশ্রামের মত, নেতি ও ইতির সামঞ্জস্য করে অন্তরের পথে মানুষকে চলতে হবে। আর তা যদি না পার, প্রাচীনকে যদি একেবারে উপেক্ষা কর, তবে তোমার গর্ব্বের বস্তু যে রিণেসাঁস (Renascence) যা এককালে খৃষ্টীয় বিধান ধ্বংস করে প্রোটেষ্টাণ্টিজিম্, ইভাঞ্জেলিজিমের সৃষ্টি করেছিল তাই আজ ঐহিক জীবনকে একমাত্র সত্যবস্তু বলে গ্রহণ করে, সমাজ সভ্যতা ব্যক্তি ও সমষ্টির মূল্য ও দায়িত্ব একেবারে রুশোর (Rousseau) আদিম নগ্নতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে' ইভ্ ও লট্ দুহিতার সৃষ্টি করতে চায় কেন?

ঠিক এমনি ঘটেছিল ভারতে। যজ্ঞীয় সোম ও সহধর্ম্মিণী, প্রজাপতি ব্রত ও অশ্বমেধের অশ্লীলতার চাবুক হয়ে এলেন তথাগত। সে কঠোরতার বিপরীত পেষণে "ধর্ম্ম" নবকলেবর ধারণ করলেন মহাযানীদের "প্রজ্ঞা" রূপে। এই প্রজ্ঞারই শক্তি আজও শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মণীষার পরিচয় দিচ্চে। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতার ফলে কলুষের আবিলতায় তা নিজের মৃত্যু নিজে বরণ করে নিলে। কিন্তু তার যেটা সত্য সেটাত অবিনাশী। সেটার গলা টিপে মারবার জন্য ব্রাহ্মণরা যখন চেষ্টা করলেন তখন তা নিরুপায় হয়ে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আকার ধরে ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে বন্দীর প্রতি বিজেতার নিষ্ঠুরতা এমন চরম হয়ে দাঁড়াল যে আজ তার বিদ্রোহিতা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শূদ্রের বেদাচার্য্যত্ব ও অসূর্য্যম্পর্শার অভিনেতৃত্বের কঠোর দাবী।

প্রকৃতির সুষমা মানুষের হৃদয়কে এত স্পর্শ করে কেন? কেন কবি দুঃখ করে বল্লেন, "The world is too much with us, getting and spending." "প্রকৃতির সঙ্গে অনেক দিন মানুষের সম্বন্ধ ছিল না হঠাৎ ঐতিহাসিক কারণে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তারা প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল"—কিন্তু সিলারের (Schieller) ঐ "হঠাৎ ঐতিহাসিক কারণটা" কি?—স্বার্থপর সভ্যতার পেষণ, ভেদনীতি, অত্যাচার, অবিচার, বিধি নিষেধ, Convention, bluffing, drawing, concocting, mask, hypocracy, treachery, espionage আজ মানুষকে তার

(৫) This body is dead because of sin but the spirit is life because of righteousness. If ye live after the flesh ye shall die; but if ye, through the spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.—Romans VIII.

(৬) Christianity disturbed the harmony between man and nature and introduced a sense of discordance by proclaiming to man a higher spiritual law, in the light of which his inborn nature becomes a sinful thing which he has to overcome. Leubeck.

সমাজের ওপর অশ্রদ্ধা এনে দিয়েচে। পক্ষান্তরে স্বাধীন রস বোধ একদিকে যেমন আনন্দ দেয়, অপরদিকে তেমনি নরকের সৃষ্টি করে। তাই আজ মানুষ ক্লান্ত হয়ে তার আরণ্য প্রকৃতির অনাঘ্রাত কুসুমের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। Do not steal প্রভৃতি negative ধর্ম্ম ত্যাগ করে অরণ্য, উষা, সূর্য্য, সমুদ্র, সোমের সুষমায় পূর্ণ বৈদিক গীতির আশ্রয় নিতে চায়।

যবন শিল্প-সাহিত্যই আজ ইউরোপী শিল্প-সাহিত্যের রূপ নিয়েচে। তারা বাস করত একটা ছোট অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য দেশে, তাই তাদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ, দেহ ছাড়া অপর কিছুতে সৌন্দর্য্য খুঁজে পাইনি। পেশী বা মুখের ভাবের ভেতর দিয়ে না হলে গ্রীক্ চিত্ত কোনও সৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট হত না। তারা প্রকৃতিকে বস্তুর সৌন্দর্য্যসত্তার রূপে কখনও গ্রহণ করে নি বা চেতন বলে কখনও তাকে ভাবে নি। তাই তার সব ধর্ম্ম-কলা সমাজ গড়বার জন্যই পাগল। কিন্তু দুহাজার বছর পর আজ সে হয়রান হয়ে প্রাকৃতিক আহ্বানের আকর্ষণ অনুভব করচে। মানুষের কাছে মানুষ যখন শঠতা ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু পেলে না, তখন তার কাছে "শকুন্তলা" কত মধুর বল দিকি? পতি গৃহে গমনা শকুন্তলাকে দেখে শোকে ময়ূরী নৃত্য ছেড়েচে, লতার অশ্রু গড়িয়ে পড়চে (৭) এমন প্রকৃতি প্রেম আর কোনও দেশের কাব্যে আছে কি? ইউরোপ আজ বুঝতে পারচে কেন সাধু সন্ন্যাসী বনে ঘুরে বেড়াতে ভাল বাসেন। ফ্রিডল্যাণ্ডার (Fried Lander) স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেচেন, "It would be difficult to find evidence of travellers going to mountain country in quest of beauty before the eighteenth century."

এই প্রকৃতি-রসের আসক্তির হেতু সমাজে অত্যধিক কৃত্রিমতার প্রসার। এই কৃত্রিমতার ওপর রুশোর অজস্র আক্রমণ ও প্রতিবাদই দেখিয়ে দিলে আদিম প্রকৃতির সরলতা। প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হয়ে দূরে মানুষ গ্যাছে বলেই আজ তার ভেতর আনন্দের এত অনুসন্ধান। মানুষ মানুষের ওপর কি করে শ্রদ্ধা হারাল তা জোলা, ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় সমাজের মুখোস খুলে দেখিয়ে দিয়েচেন। আমাদের দেশের নব-রসিকরাও অজ্ঞাতসারে সেই একই কাজ করচে। তারা যেটাকে প্রতিপন্ন করতে চাইচে সেটাই সেটার বীভৎসতা প্রকাশ করে দিচ্ছে।

কিন্তু বৈদিক প্রকৃতিবাদ ও আধুনিক স্বভাববাদে (Naturalism) ঢের তফাৎ। তারা অন্তরের সৌন্দর্য্যই বাহিরে দেখেছিল। তারা জানত, "তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁরই আলোকে জগৎ আলোকিত। পতি পত্নীর নিকট, পত্নী পতির নিকট এত সুন্দর কেন? তিনি তাদের মধ্যে আছেন বলে। কিন্তু আধুনিক জড়-প্রাণ স্বভাববাদ জড়ের সৌন্দর্য্যে নিজের মনকে ভোলাবার চেষ্টা করায় সে ভ্রম শীঘ্রই তার দূর হবে। অসতের দিকটা বিশ্লেষণ করে ভদ্রবেশী সমাজের বর্ব্বরতাকে লোকচক্ষুর সামনে ধরার শ্রম তাঁদের শীঘ্রই ব্যর্থতায় পরিণত হবে। অসংযমী হয়ে তথাকথিত শালীনতার ধ্বংস করতে গিয়ে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হবে, তাতে জুলিয়েট বা মোপাসাঁর 'উনভি'ও হার মেনে যাবে। শিলার যাকে নীতিগত বলেচেন, বাস্তবিক সেটাও ইন্দ্রিয়জ, কেন না সে রূপ বা রসের উৎস কোনও অরূপ বা "রসোবৈস" নয়। ফলে দাঁড়াচ্ছে, ইবসেনের Ghosts, হাপটম্যানের Friedensfest, ষ্ট্রীণ্ডবার্গের Ranch, গোর্কির Lower Depths, ডেলেড্ডার Mother (La madre), ওয়েলসের Passionate Friends প্রভৃতি প্রতি শিল্পে ও কাব্যে কেবল যন্ত্রণা ও অস্থিরতা, কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনা ও পীড়াকেই স্পষ্ট করে তুলচে। আর্টের কাজ কী?—বর্ত্তমানের মধ্য দিয়ে মানুষকে ভবিষ্যতের উন্নত আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া। আর্টের পুষ্প হবে অনাঘ্রাত কিন্তু বড়ই মধুর, আর্টের বিহগ কণ্ঠ হবে নূতন কিন্তু বিনোদী—যা মানুষের মনে ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বড় জিনিষ পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়—সে এমন একটা প্রামাণ্য মূর্ত্তি চোখের সামনে ধরবে, যার কাছে আর সব নকল।

(৭) উদ্গলিত দর্ভকবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্ত নর্ত্তনাঃ ময়ূরা।
অপসৃত পাণ্ডু পত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণি ইব লতাঃ॥

বেদান্ত যেমন সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভেঙে, বিজ্ঞান যেমন পাহাড় সমুদ্রের ব্যবধানটাকে ছোট করে দিয়ে, বিশ্ব-মানব গড়বার চেষ্টা করচে, তেমনি আর্টের মধ্য দিয়ে যে বর্ত্তমানে একটা সার্ব্বজনীন সামাজিকতার সৃষ্টি হচ্চে, এ ঋণ স্বীকার সকল জাতই করতে বাধ্য। আজ যে বাংলায় বসে জাপানী, চৈনিক ও ইউরোপী আর্টের আস্বাদ করচি তার হেতু বিজ্ঞানের উদারতা।—প্রাচীন ইউরোপ ও আসিয়ায় প্রত্যেক মন্দির ও প্রাসাদকে কেন্দ্র করে শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষিত কারিগর সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল; কিন্তু সে রেখা, বর্ণ, শব্দ ও সুরে যে চিত্র, কাব্য, মূর্ত্তি, নাট্য ও গীতি সৃষ্টি হয়েছিল তা কেবল জাতীয়তার দৃষ্টান্ত; সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা ব্যাপক সর্ব্বব্যাপী যোগ ও সমন্বয়, যাকে ওয়াগনার Stylisation and synthesis বলেচেন তার রেখাপাত তখনও হয় নি। এক শ্রীবুদ্ধ এবং খৃষ্টের model ছাড়া যা শিল্প সাহিত্যে গৃহীত হয়েছিল, সবই কেবল দেশচর্য্যা, প্রতিহিংসা, বিচার বা শাস্তিরই প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাও কেবল ভাবের ঐক্যের মধ্যেই ঐক্যের সৃষ্টি (one-man—system) করা হয়েছিল, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার মণি-সূত্রের নির্দ্দেশ (art of Ensemble) ভারতীয় দর্শন ছাড়া আর কোনও প্রাচীন শিল্প সাহিত্যে দেখা যায় নি।

কিন্তু ইউরোপে আর এক শ্রেণীর কর্ম্মী আছেন, তাঁরা চির-পরিবর্ত্তনের উপাসক বলে, সেকালের সকল আচার বিচারকে প্রত্নতত্ত্বের যাদু ঘরে লুপ্ত জীবের কঙ্কালের মত স্তূপীকৃত করে রাখতে চান তাঁরা বলেন সৃষ্টিকে যন্ত্রবদ্ধ করা বা বজ্র মুষ্টির আয়ত্তে রাখা সম্ভব নয় বার্গসোঁর উপদেশ, "সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্ত্তনটাই একটা মুখ্য সত্য। (৮) হুস্কার বিদ্রূপ করে বললেন, "প্রকৃতিকে পেরেক মেরে যদি গেঁথে রাখা যায় তা হলে প্রি-র‍্যাফেলাইটরা অপরি-বর্ত্তনকে তুলিকার স্পর্শ দিতে পারবে। দেখ, রাস্কিনের শত চেষ্টাও প্রি-র‍্যাফেলাইটদের ধরে রাখতে পারে নি

সত্য কথা। এ নগ্ন সত্য যে এই ভাঙার যুগে প্রাচীন বা অতীতের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে এটাও সত্য যে ভাঙার একটা আনন্দ আছে। ইবসেন বা ভেম্বার-লেইন, জীবনের কোন দিক থেকে ভাঙার বিপ্লব সৃষ্টি করেচেন, ভাঙাটা বিপ্লব না শৃঙ্খলার চেষ্টা (৯) কেন ভাঙার আনন্দ আজ আর্টে উচ্ছলিত, জানা না থাকলে সে আর্ট কেবল অল্পবুদ্ধি নরনারীর ইন্দ্রিয়ের বিলাসই বাড়িয়ে দেবে। বোসান্ কোয়ের কথা আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি, "রম্য পরীরাজ্য ছেড়ে সরল ও সহজ কল্পনা বহির্মুখী না করে আত্মাভিমুখী করতে হবে। পরীরাজ্য থেকে লোকের মন ঘরে ছুটে আসছে"—কিন্তু বাহিরের ঘরে বসে থাকলে চলবে না, অন্দরে ঢুক্‌তে হবে। যদিও বর্ত্তমানকে ছোট করবার উৎসাহ আমাদের একেবারেই নেই বা প্রাচীনতার অস্পষ্ট ইতিহাসকে স্পষ্ট করে, বর্ত্তমানকে অস্পষ্ট করে তোলবার রুচির আমাদের একান্ত অভাব, তবুও আত্মম্ভরিতার স্বাধীন চেষ্টাকে আমরা তুচ্ছ করি, কারণ জানি অতীতকে বাদ দিয়ে, খণ্ড সৌন্দর্য্যের উপাসক সম্প্রদায়ের নিকট অখণ্ড সৌন্দর্য্যের সিংহদ্বার চিরকালই অর্গলাবদ্ধ থাকবে। খণ্ড-ধর্ম্ম যেমন নির্ব্বাণের রাজ্যে আগুন জ্বালিয়েছে, খণ্ড-সামাজিকতা যেমন সম্পূর্ণ মানবতাকে অবহেলার চাপনে পিষে মারলে, তেমনি খণ্ড আনন্দ-বিজ্ঞান (Æsthetics) আনুশীলনিক একতার (cultural unity) পরিবর্ত্তে আনুশীলনিক বিরোধিতাই (cultural conflict) সৃষ্টি করবে। তাই বলি স্বাধীন মনন এবং স্বচ্ছন্দরস গ্রহণ করবার পূর্ব্বে পদ্ধতি-গত (conventional) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক (archæological) আর্ট বোঝা বিশেষ দরকার।

আজ শিক্ষার ব্যাভিচারই আদর্শ বা আচার্য্যের নিকট বিনীত আত্মসমর্পণ মানা করেছে। সকলকে অবজ্ঞা করা একটা যেন মস্ত বড় মনুষ্যত্ব। বর্ণ পরিচয়েরও যখন গুরু দরকার, তখন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার স্থান কোথায়! প্রাচীন নইলে নবীন জন্মান কিরূপে? এ সত্য বুঝতে না পারায়, নতুনের অবজ্ঞায় অতীতের কত কোমল শিল্প-

(৮) Creative Evolution.
(৯) My mother thought that Order prevailed, and that disorder was just incidental and foredoomed rebellion; I feel and have always felt that order rebels against and struggles against disorder.—H. G. Wells, The New Machiavelli, P. 100.

সাহিত্য আগত-ঐশ্বর্য্যের কঠিন স্পর্শে চূর্ণ হয়ে হারিয়ে গ্যাছে—যেমন প্রতীচ্যের সংঘর্ষে ভারতের সকল শিল্প-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞান হারিয়ে যেতে বসেছিল। কারণ স্বদেশীরা বুঝতে পারে নি, জামালপুরের কঠিন মাটি ভেদ করে টনেল তৈরী করা বা পদ্মার উর্ম্মি-ভঙ্গকে স্তম্ভিত করে সেতু নির্ম্মাণ অপেক্ষা ভাব-রাজ্যের একটা পদ্মকে ফুটিয়ে তুলা অনেক কঠিন।

ক্রোশে স্বীকার করেছেন, "ইতিহাস বা অতীত হচ্চে অনন্ত বর্ত্তমান (Eternal present), বর্ত্তমানকে তা অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে আছে, ব্যক্তিগত মনের দিক দিয়েও তা অপরিহার্য্য।"—রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ছন্দে প্রকাশ করেছেন—"কত কি যে আসে কত কি যে যায়

বহিয়া চেতনা-বাহিনী
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তার পড়ে থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী"

অতীতই "অবগাহিনী স্মৃতি" রূপে বর্ত্তমান। আচার্য্য শঙ্কর তাই সংস্কার অনাদি বলেচেন। নইলে জন্মগত মনটা যদি লকের (Locke) একখানা সাদা বোর্ডের (*Tabula-rasa*) (১০) মত হত, তা হলে চিত্তের বিকাশ অব্যক্তই থেকে যেত। আর দেখাও যাচ্ছে অ-কাল্পনিক বাস্তবতার দ্বিপ্রহরে রাজপথেও অতীতের রাহাজানি। নইলে হুইটম্যান দুঃখ করে বলতেন, "এ যুগে আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার সীমার ভেতর যে সমস্ত ভাব এসেছে ও আসছে, তার কোনটাই আমাদের নয়, সব বাহিরের। নানা রকমের কাজের লোক আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু খাঁটি ভাবে জাতির হৃদয় কষে দেখতে গেলে তাদের চেষ্টার সার্থকতা এক মুহূর্ত্তও টেঁকে না। আমি বলছি, আমি এমন আর্টিষ্ট, লেখক বা বক্তাকে দেখিনি যিনি এ যুগের গভীর স্তরে প্রবাহিত অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও কল্পনাকে অনুকূল ভাব ও পরিচ্ছদে সাজিয়ে বর্ত্তমান আর্টের ভেতর তা'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।"

বর্ত্তমানকে বুঝতে গেলে অতীতের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনই অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেচে। তাই প্রতি কল্পের, প্রতি যুগের মৃত্যু-স্নানে অতীতই নবীন জীবনে দেখা দিচ্ছে। "ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ।" (১১) মনস্তাত্ত্বিকেরাই স্মৃতির মূল্য জানেন। স্মৃতি যে অতীতকে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে অমর করে রেখেচে। "সময় যে সৌন্দর্য্যে ভুলে রূপহীন মরণকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রাখচে।" (১২) স্মৃতির সহস্রদল যে অতীতের অসংখ্য জীবনীর বেদনার ভেতর দিয়েই যে নিজেকে পরাগে পূর্ণ করেছে। কত জ্যোৎস্না ধারা, কত তারকিত অমালোক, কত ধূসরে পরিবসনা গোধূলি লগ্ন, আবার কত অসহ্য সংস্কার নতুন কবির চিত্ত-নীড়ে চিরন্তন আসন রচনা করেচে তা সে নিজেও জানে না।

যে বর্ত্তমান-বাস্তবতা ও তার পরিণাম, উড়ো জাহাজ ও বম্ শেলের নজির দেখিয়ে লড়াই বাধিয়েছে, তার সার্থকতা কোথায়? প্রকৃতিকে নিয়েইত তোমার বাস্তবতা। কিন্তু সেই প্রকৃতির গর্ভে আত্মা জন্মায় নি, আত্মাই প্রকৃতির জীবন দান করচে—সৃষ্টি জন্ম নিলে অসৃষ্টিতে। দ্রষ্টা আছেন বলেই দৃশ্য আছে। বাহ্য অন্তরেরই বহিঃ প্রকাশ। অন্তরই বাহ্য ক্রমের এক একটা বিশেষ ধর্ম্ম দান করেছে। চিত্ত-মৃণালেই ত সৃষ্টির শতদল ফুটে ওঠে, আবার তাইতেই ত বীজরূপে আপনাকে লুকিয়ে রাখে; কল্পান্তে তাই আবার রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয়। নিট্জে (Nietzche) এই বৈদিক সত্য বুঝতে পেরে ঠিক স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি করে বলচেন, মানুষ ভাবচে, দুনিয়ায় সৌন্দর্য্য ওতপ্রোত হয়ে আছে, কিন্তু সে ভুলে যায়, যে তার কারণ সে নিজেই। সে নিজেই তাকে সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করেছে…বাস্তবিক মানুষ সৃষ্টি পর্য্যায়ে নিজের ছবিই দেখে, নিজের অনুরূপ হলেই তাকে সুন্দর মনে করে। সংসার কি বাস্তবিকই সুন্দর?—মানুষ মনে করে বলেই তা সুন্দর। মানুষ তাকে মানব রসে পূর্ণ করেছে—এই হচ্চে কথা।" (১৩)

মানব-প্রগতির কোন স্তরেই পৌত্তলিকতা বলে কোনও জিনিষ ছিল না। যত বড়ই কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিই হোক না কেন, একটা ভাব ছিল তার প্রাণ। কারলাইল ঠিকই বলেচেন, "মরুভূমির মধ্যে আরবেরা যে ভাবে নক্ষত্র গুলোকে দেখতো, আমরা কি সেই চোখে তা এখন দেখতে পারি?" (১৪) পড়ে শুনে ও দেখে বোধ হয়, যে পৌত্তলিকতার স্রষ্টা আদিম যুগে আহুদী মুসা, আর আধুনিক বাঙালী রাজা রাম মোহন রায়! পৌত্তলিক কথাটার অর্থ অনুধাবন হিন্দুর কাছে পূর্ব্বে ত' অজ্ঞাত ছিলই এখনও দুর্ব্বোধ্য। কেন না প্রতিমা বা প্রতীক উপাসনা যদি পৌত্তলিকতা হয়, তা হলে আর্ট জিনিষটাই পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হয় এবং এমন কে নিষ্ঠুর সভ্য আছে যে সু-চিত্রিত পটভূমে বা রূপায়ত মর্ম্মরে শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা মানসপূজা না করে?

(১০) Locke's Human understanding দেখ। (১১) ঋগ্বেদ। (১২) তাজমহল—রবীন্দ্রনাথ। (১৩) The Twilight of the Idols—Nietzsche. (১৪) Hero-Worship.

বিদুর-বাণী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

ভগবান! হোক পরিবর্ত্তন দুর্য্যোধনের মন
পাপ-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হোক, থামুক নিষ্পেষণ।
এত অনাচার এত অবিচার চক্ষে কি দেখা যায়,
পাণ্ডবদের নির্ব্বাসনেই দিতে হবে মোরে সায়।
বীর পাণ্ডব সাধু পাণ্ডব সহে অজ্ঞাতবাস,
বিদ্যুৎভরা মেঘে যে ঢাকিছে দম্ভীর নীলাকাশ!
দেখিয়াও হায় দেখে না দর্পী, আসিছে সন্ধিখণ
অহঙ্কার যে দর্পহারীরে করিছে নিমন্ত্রণ।

পাণ্ডব-বধূ পরাধীনা আজ, নারীরও মুক্তি নাই,
শকুনির পালা নূতন পাপের রচিয়াছে গড়খাই।
জতু গৃহের জ্বালানি ভুলেনি, কত বড় হীন কাজ,
হা মোর কপাল! কাহারে বলিব?—বধির অন্ধরাজ।
পাণ্ডবে রাজ্য দেবে না ভূমি যে সূচাগ্র পরিমিত
মর্য্যাদা তাঁর হীন হবে তা'তে ভাল রাজনীতি এত!
সকল মাটীর মালিক যেজন, যেজন বিশ্বনাথ,
আড়াল হইতে মৃদুল হাস্যে করিছে দৃষ্টিপাত।

ফল কি ইহার? ভাবিয়া না পাই ধ্বংসই পরিণাম
শক্তির অপপ্রয়োগে নিতুই আদ্যাশক্তি বাম।
যেথায় ধর্ম্ম, জয় যে সেথায়, সত্য দুর্ণিবার,
দুর্ব্বল কাছে এমনি করিয়া প্রবল মেনেছে হার।
শশকের তেজে হারায়েছে প্রাণ সিংহ সে ভাসুরক,
শিশু পাঠ্যের গল্প হউক, শঙ্কা-উদ্দীপক।
দীন বিদুরের মরম-বেদনা নিবারো নিরঞ্জন
শঙ্কা আশার দোলায় সবার নিয়ত দুলিছে মন।

স্বপ্নেতে শুনি পাঞ্চজন্য ধ্বনিছে ভয়ঙ্কর,
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি, স্বপ্নেতে পাই ডর।
সুদর্শনের বিদ্যুৎ দেখি, প্রতাপ গাণ্ডীবির,
ভাবী শ্মশানের চিত্র নেহারি চক্ষেতে বহে নীর।
নিভায়ে সকল চিতার বহ্নি, বেদনা করিয়া নাশ,
ক্ষণে বুকে পাই পদ্মনাভের গীতার পূর্ব্বাভাস।
রণ-পয়োধির প্রলয়-প্লাবনে মজ্জিত ধন জন
হেরি ভাসে তায় জনার্দ্দনের অটল পদ্মাসন।

কুপুত্র

[শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোলপুরের রাস্তায় একদিন একটি বিদেশী বালককে দেখা গেল। পৌষের দিনের বেলা তখন ন'টা! মিঠা রৌদ্র ভোগ করিতে অনেকেই তখন ঘর ছাড়িয়া উঠানে নামিয়াছেন। ছেলেটির বয়স এগার কি বারো হইবে—পোষাক দৃষ্টে তাহাকে দরিদ্র মনে হয়; কালো একটি কোট গায়ে আছে, কিন্তু সুতার কালো রঙের আবরণে ময়লা ঢাকা পড়ে নাই, কাপড়খানা খাট'; জুতার ব্যবহার নাই তাহা ফাটা পা দেখিয়াই বুঝা যায়; গায়ে একখানা র‍্যাপারও ছিল, কিন্তু তাহাকে উদ্ঘাটিত না করাই ভাল; মুখের চেহারাও তেমন সুশ্রী নয়—নাকটা চাপা, ভুরু সামান্য; চোখের পাতা ভারি; চুলগুলি খাট' করিয়া ছাঁটা; মুখের রং ফর্সাই।

ছেলেটি রাস্তার দুই দিকের বাড়ীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিতে চলিতে অনেকগুলি বাড়ী পার হইয়া গেল; নিজের কাজে ব্যস্ত, দেহের আরামে তৃপ্ত অনেকগুলি লোক তাহার চোখে পড়িল···

এবং চলিতে চলিতেই তাহার চোখে পড়িল একখানা কাষ্ঠফলক, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

শ্রীরাইরাখাল ঘোষ এম্-এ, বি, এল্,
উকিল, বোলপুর।

ছেলেটি ঐ নামটির দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে, কাষ্ঠফলকের ঐ নামটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপরিচয়ের পরিধি হ্রস্ব হইয়া কিছু একটার সন্ধান যেন তার মিলিয়া গেল—

তবু যাইয়া দাঁড়ান' যাইবে।

ছেলেটি রাস্তার ধারের ছোট উঠানটা পার হইয়া ভয়ে ভয়ে বারান্দায় গিয়া উঠিল; বারান্দায় কাঠের বৈঠকে চার পাঁচটি বিভিন্ন জাতীয় হুঁকা রাখা আছে; হুঁকার সেই আসনটির দিকে একবার চাহিয়া ছেলেটি ঘরে ঢুকিবার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

ফরাসে গোঁফ কামান যে বাবুটি আলস্য ভরে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলেন তিনিই রাইরাখাল। ছেলেটিকে দেখিতে পাইয়া রাইরাখাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হে?

ছেলেটি কিছু জবাব বোধ হয় দিত—

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রাইরাখাল অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেলেন; অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন,—খাওয়া দাওয়া করে' সাক্ষী সাবুদ নিয়ে সকাল সকাল কাছারী যাও। বাচ্চা একটা হাকিম এসেছে নতুন—বাঙাল; দশটা না বাজ্‌তেই এজ্‌লাসে এসে বসে' থাকে।

যাহাকে এ কথা বলা হইল সে ব্যক্তি ছেলেটির অদৃশ্য স্থান হইতে বলিল,—তাই যাব সকাল সকাল···সাক্ষীদের আর একবার—

—না না, কি দরকার!···মনে আছ ত?

অদৃশ্য স্থানেই একাধিক ব্যক্তি সুপ্রচুর শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল,—আছে, বাবু···শুন্‌তে শুন্‌তেই কি ভুলে' যাব!

তারপর খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর চার পাঁচটি লোক সারি বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাইরাখালের তখন এ-দিকে মন দিবার অবসর ঘটিল; জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দরকার তোমার ছোক্‌রা?

ছোকরা মৃদুকণ্ঠে যে জবাব দিল তাহা রাইরাখালের কর্ণ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না; বলিলেন,—এগিয়ে এসে বল, কি চাই তোমার?

ছেলেটি ফরাসের ধারে গিয়া দাঁড়াইল; মুখ নামাইয়া বিষণ্ণস্বরে বলিল বলিল,—কিছু ভিক্ষে চাই।

শুনিয়াই রাইরাখাল চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন—পিছ্‌লাইয়া জলে পড়িলে হাতের মাছ যেমন করে তেম্‌নি; পিছন্ দিকে তিনি একটু হেলিয়া গিয়াছিলেন—দ্রুতগতি খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন,—তাই নাকি? ভিক্ষে? এই বয়সেই? নাম কি তোমার?

—শ্রীকুলদাকান্ত বন্দোপাধ্যায়।

—ব্রাহ্মণ! তা' ভিক্ষের বেশটি বেশ হয়েছে; দেখলে মায়া হয়। বোনের বিয়ে বুঝি?

—আজ্ঞে না।

—বাপ আছে?

—না, মারা গেছেন।

—শ্রাদ্ধ শান্তি বেরিয়ে গেছে?

—তিনি অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন!

—মা আছেন?

—আছেন।

—তিনি বুঝি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?

—আজ্ঞে না, তিনি দেশে আছেন।

—ছোট্ট ছেলেটিকে একা বিদেশে পাঠিয়ে তিনি দেশে আছেন!

—তিনি আমাকে পাঠান্‌নি, আমিই জোর করে' এসেছি।

শুনিয়া রাইরাখালের গাম্ভীর্য্য টুটিয়া গেল; হাসিয়া বলিলেন,—বা রে বাহাদুর! কতদিন থেকে এমন জোর করে' ভিক্ষেয় বেরচ্ছ?

—এই প্রথম।

—তাই লজ্জা লজ্জা করছে!...যাক্, কত ভিক্ষে চাই তোমার?

—যা' হয় দিন্।

—কি করবে?

—বই কিনব।

—শুনতে মধুর, কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

—এবার আমি সিক্স্‌থ্ ক্লাস থেকে ফিফ্‌থ্ ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি; কিন্তু বই কেনবার পয়সা নেই।

—তোমার মা কি করেন?

—দেশের বাবুদের বাড়ীতে রাঁধেন।

—বাবা কি করতেন?

—মুহুরির কাজ করতেন।

—উকিলের?

—আজ্ঞে না, দোকানের।

—দোকানের মালিক কেন বই ক'খনা কিনে দেন না?

—ক'বার কিছু কিছু দিয়েছিলেন; কিন্তু এবার তাঁরা দোকান তুলে' দিয়েছেন।

—সেই বাবুরা?

—তাঁরা খেতে' দেন, আর মাঝে মাঝে কাপড় জামা দেন।

—আচ্ছা, দাঁড়াও।...কি রে, বাজার করে' এলি এত বেলায়? রান্না হবে কখন, খাব কখন!

ভৃত্য কথা কহিল না—

রাইরাখাল বলিলেন,—হিসেব দে। বলিয়া দোয়াতে কলম ডুবাইয়া লইয়া কুলদাকে ফরমাস্ করিলেন,—কাগজ-খানা রয়েছে বেঞ্চির ওপর, দাও ত' হে।

কুলদা দিল; রাইরাখাল হিসাব লইতে লাগিলেন—মাছ, দশ আনা...কি মাছ?...ইলিশ।...ইত্যাদি।

হিসাব লইয়া ঠিক দিয়া এক টাকা সাত আনা খরচ দাঁড়াইল; রাইরাখাল বলিলেন,—ফেরৎ এক আনা এই ছেলেটিকে দে।...উঠি এখন।...পেয়েছ ত কিছু? বলিয়া রাইরাখাল কুলদাকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া উঠিতে গিয়াই থামিলেন—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা মোজার ফুটা দিয়া উঁকি মারিতেছিল—মোজা টানিয়া কুলদার অলক্ষ্যে তাহাকে ঢাকা দিয়া উঠিয়া গেলেন।

কুলদার এক আনা ভিক্ষালাভ হইল।

কোথাও সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের ধাক্কা খাইয়া, কোথাও অনন্তকাল সবুর করিয়া শেষে ভ্রূভঙ্গীর প্রহার খাইয়া, কোথাও বিদ্রূপের ও দরদের সবিমিশ্র প্রশ্নের পর প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিয়া সমস্ত দিনে কুলদার ন' সিকা আদায় হইল, কিন্তু তাহা অপ্রচুর—প্রয়োজন তার আরো প্রায় এগারো টাকার।

কুলদা দু'পয়সার মুড়ি খাইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে বর্দ্ধমান গেল।

সেখানে কথোপকথন যাহা হইল তাহাও ঐ প্রকারই—

কিন্তু শীতের দিনে পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া এবং রাত্রি অনাচ্ছাদিত স্থানে যাপন করিয়া কুলদা টাকা সংগ্রহ করিয়া যখন মায়ের কাছে ফিরিল তখন পেটের ছেলে বলিয়াই কুলদার মা তাহাকে চিনিতে পারিল।

"তরুণ বাঙ্গলা"

…অসংখ্য রেখায় ঠোঁট ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে; কে যেন গালের উপর কাঁটা গাছের ডাল আছড়াইয়াছে, এমনি তার ক্ষতবিক্ষত চেহারা; ভুলিয়া একবার হা করিয়াছিল—ফাটা ঠোঁটে চাড় লাগিয়া কোণের দিকটা রক্তাক্ত হইয়াছিল; রক্তটুকু শুকাইয়া আছে। কিন্তু শৈবলিনী ইহার উপরোক্ত কি লক্ষণ ছেলের মুখে চোখে দেখিয়াছিল তাহা সেই জানে; কিন্তু দু'জনার কেহ কথা বলিবার পূর্ব্বেই শৈবলিনী ছুটিয়া গিয়া ছেলের কপালে হাত দিয়া ভীত হইয়া উঠিল—জ্বরের উত্তাপ সামান্য নয়।

কুলদা হাসিয়া বলিল,—জ্বর হয়েছে, মা। সাতদিন শয্যায় পড়িয়া জ্বরের উত্তাপে আর যন্ত্রণায় কুলদার শরীর শুকাইয়া গেল, কিন্তু মুখের হাসিটি মিলাইল না—

বই কিনিবার টাকা ক'টি সংগ্রহ হইয়াছে—এই আনন্দ তাহার চোখে সারাক্ষণ ঝক্ ঝক্ করে।…জ্বরের ভিতরেই সে "ক্লাস ফ্রেণ্ড"কে ধরিয়া বই আনাইল—

কিন্তু শৈবলিনী তাহাকে ধমক্ দিয়া বই সরাইয়া লইল; বলিল,—প'ড়ো পরে, জ্বরটা সারুক্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এম্‌নি করিয়া ক্লাসের পর ক্লাস উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার পর সহসা একদিন এই পরম সহিষ্ণু ছেলেটি কাঁদিয়া আসিয়া মায়ের কাছে পড়িল; বলিল,—আমি আর প'ড়ব না, মা।

—কি হয়েছে? কাঁদছিস্ কেন?

কুলদার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—

তারপর মায়ের নিষ্পলক চোখের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—আজ ক্লাসের একটা ছেলে আমায় ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে।

—কেন?

ঘটনা সবিস্তারে বলার দরকার ছিল না; কুলদা কেবল বলিল,—তুমি পরের বাড়ীতে রাঁধ' বলে'।

শুনিয়া শৈবলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—

তারপর সে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ধ্যানস্থ হইয়া গেল…জগন্মাতা স্বহস্তে আজ সন্তানের কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছিল।…শৈবলিনী যখন চোখ খুলিল তখন চক্ষু শুষ্কই; কিন্তু যে একটি নিঃশ্বাস তার নাভিমূল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া বুক কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল, তাহার রূপ অবয়ব আর উত্তাপ যেন কুলদার চোখে পড়িল…

শৈবলিনী ছেলের মাথার উপর হাত রাখিল।

কুলদা বলিল,—চাক্‌রী ক'রব, মা।

—কোথায় পাবি?

—আমাদের ইস্কুলের বুড়ো কেরাণী মারা গেছে। বলিতে বলিতেই কুলদা বাহির হইয়া গেল!…উমেদার যে সর্ব্বাগ্রে হওয়া চাই।

হেড্ মাষ্টার কুলদাকে আশা দিয়াছেন; সেক্রেটারী বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন…

শুনিয়া শৈবলিনীর চতুর্দ্দিকের জটিল আর নিবিড় ছায়ার ভিতর গৃহের একটি সরল উজ্জ্বল মূর্ত্তি গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল—যাহা নিত্যকার সজীব সচল সুখময় সংসারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান নয়, তার সঙ্গে একাকার, যাহা পুলকে সিঞ্চিত, যাহা আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত।

শৈবলিনী শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—

নির্ব্বাপিত দীপ যেমন দুর্গন্ধ বাষ্প ত্যাগ করে, প্রতিদিনের সূর্য্যাস্ত যেন তেমনি এক রাশি নিস্পৃহার দূষিত দুঃসহ বাষ্পে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া যায়…

ছেলের চাকরী হইবে এই আশাটুকু লাভ করিতেই তার মনে বিস্ময় জন্মিল, এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে এতদিন টিকিয়া আছে কেমন করিয়া!

শৈবলিনী বলিল,—আমি যাব তোদের হেড্ মাষ্টারের স্ত্রীর কাছে? ধরি গিয়ে?

কুলদা বলিল,—আমি দেখি আগে।

কিন্তু সে অন্ধকার দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তার মায়ের দেখাতেই কাজ হইল—

শৈবলিনী সন্ধ্যার পর অবগুণ্ঠন টানিয়া রাস্তায় আসিল…গিয়া হেড্‌মাষ্টারের স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল।

কুলদা চাক্‌রী পাইল—

মাহিনা পনর', বৎসরে আট আনা হারে বাড়িয়া

আকাশ স্পর্শ করিবে না—একুশ টাকা হইবে, এবং তার নিস্তেজ বৃদ্ধির ঐখানেই শেষ।

চাল ডাল তেল তরকারী সস্তা ছিল—হিসাব করিয়া শৈবলিনীর মনে হইল, বেশ চলিয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের জন্য পাখী নীড় বাঁধে; তার আকুল তৃণ সংগ্রহ, দিনের পর দিন সহিষ্ণু নিবিষ্টতা দেখিলে মনে হয়, মায়ের বুকে স্নেহ আছে, ভীতি আছে, তাই পৃথিবী অক্ষয়, জীবশূন্য হইয়া যায় নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই মায়ের দেওয়া আবরণে রক্ষা হয় না—প্রচ্ছদ ত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া অব্যর্থ আঘাত বহুদূর আসিয়া পৌঁছায়।

ভাঙ্গা সংসার পুনর্গঠিত করিয়া সংসারের দেয় আর সংসারীর প্রাপ্য সমুদায় সুখ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় শৈবলিনী যেন দিক্ ভ্রান্ত হইয়া উঠিল—

জোর করিয়া ছেলের বিবাহ দিল—

এবং তখন তার মুখে যে হাসিটি ফুটিল তাহাই যথার্থ, তাহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা নাই।

শৈবলিনীর এদিকে বৌমা, ওদিকে কুলদা—ঐ দু'টিকে বেষ্টন করিয়া বিচরণ করিতে করিতে তার শুক্লপক্ষের সুহসিত সুন্দর জগৎ অকূলের দিকে বিস্তৃত হইয়া যায়··· তাহাকে ঘিরিয়া পৌত্র পৌত্রীরা হাসির মেলা বসায়।···

কিন্তু অনির্ব্বচনীয় এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। হঠাৎ একদিন পৃথিবী জুড়িয়া যে কাণ্ড বাধিয়া গেল তাহা ওদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, এদিকে তেমনি দুর্ব্বহ। সমগ্র বিশ্বের খাদ্য পেয় পরিধেয় যেখানে যে উপকরণ ছিল সব সেই ধ্বংসযজ্ঞের ধূমাবর্ত্তে গিয়া পড়িতে লাগিল।

সংসার আর চলে না।

গুরুভার চক্রের নিম্নে পড়িয়া তিনটি প্রাণী অবিরাম নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।···

মাসের প্রথম দিন দশেক ঘরে আলো জ্বলে, তারপর আর চলে না—সন্ধ্যা-বন্দনার পর কল্যাণকর মৃৎপ্রদীপটি গৃহস্থ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দেয়···

কিন্তু এ সঙ্কটও চরম নহে—

ধোপা রতন আসিয়া একদিন তাহাদের চরম সঙ্কট কি তাহা বুঝিয়া গেল।

শৈবলিনী দাওয়ায় বসিয়া ছিল—

—কাপড় এনেছি, মা। বলিয়া রতন বাহিরের দরজা হইতে সাড়া দিতেই শৈবলিনী ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

রতন দু'খানা ধোয়া কাপড় দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া পুত্রের মত অপেক্ষা করিতে লাগিল...

রতন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এদিক্ ওদিক চাহিয়া ডাকিল, মা কোথায়? কাপড় দাও।

বলা বাহুল্য, শৈবলিনী লুকাইয়া ছিল—আড়াল হইতেই বলিল,—কাপড় দেব না, রতন।

—কেন, মা?

'কেন'র উত্তর ছিল না; শৈবলিনী কথা কহিল না···

—কাপড় দু'খানা রইল। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।··· শৈবলিনী বধূর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

পরণের কাপড়ের উপর ছেঁড়া আলোয়ান জড়াইয়া শৈবলিনীকে ছেলের সম্মুখে বাহির হইতে হয়।

—বড় মুস্কিলে পড়া গেল, মা। বলিয়া কুলদা আসিয়া দাঁড়াইল।

মুস্কিলের সংবাদে কাঁপিয়া উঠিবার দিন গেছে—

শৈবলিনী কাপড়ের সেলাইয়ের উপর সেলাই করিতেছিল; মুখ না তুলিয়াই বলিল,—নতুন কি হ'ল?

—একটা ছেলে পড়ান' ঠিক করেছিলাম; কা'ল থেকে লাগার কথা। একজন বি, এ, পাশ খবর পেয়ে তাকে দখল করে' বসেছে। ছেলের বাবা বললেন, ঐ টাকাতেই গ্র্যাজুয়েট পেয়ে গেছি হে! বলিয়া কুলদা যেন দুনিয়ার কাছে অবসর লইয়া সেখানেই বিশ্রাম করিতে বসিল।

ঐ পাঁচটি টাকার মূল্য কত তাহা কেবল ইহাদের অন্তর্য্যামী জানেন; কিন্তু এই মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়ায় শৈবলিনী বি, এ, পাশ ছেলেটিকে তিলমাত্র অপরাধী করিতে পারিল না; বলিল,—সবার দশাই সমান যে!

বাঁধা-মার ক্রমশঃ ইহাদের সহিয়া আসিতেছে এমন সময় শৈবলিনী একদিন রোগশয্যায় শয়ন করিল···চোখ বুঁজিয়া বলিল,—ভগবান আমার ডাক শুনেছেন কি না জানিনে।

কথাটার মর্ম্মার্থ বুকে বাজিয়া কুলদা শিহরিয়া উঠিল; বলিল,—সে কি কথা বল্‌ছ', মা! বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মা ম্লান একটু হাসিয়া বলিল,—আমার যাওয়া ছাড়া নিষ্কৃতির আর উপায় কৈ তোর!

কুলদার কর্ণকুহর মাতৃমুখনিঃসৃত শব্দের দাহে পূর্ণ হইয়া গেল—

কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদ নাই; কুলদা স্তব্ধ হইয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রহিল…

জননী সন্তানকে অর্থসঙ্কটে নিষ্কৃতি দিবার জন্য অহরহ নিজের মৃত্যুকামনা করিয়াছেন।…পুরুষ হইয়া সন্তান হইয়া এমন অক্ষম সে যে, তাহাকে নিশ্চিন্ত করিতে নিজের নিষ্ঠুরতম অভিলাষের সাক্ষী জননী তাহাকেই করিলেন।

কুলদা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শৈবলিনী বলিল,—কাঁদিস্ নে, বাইরে যা।

কুলদা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—

মানকুমারী তার গয়না একখানা হাতে করিয়া দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল; কুলদা গহনাখানা লইয়া বাহির হইয়া গেল…

ডাক্তার আসিল, ঔষধও আসিল—

কিন্তু শৈবলিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, একবিন্দু ঔষধ গলাধঃকরণ করিল না…

কুলদা মায়ের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল; বলিল,—কার ওপর অভিমান ক'র্‌ছ, মা, আমার ওপর না বিধাতার ওপর!

—কারো ওপর নয়, বাবা। লোকসান দিলাম সারা জীবন, এইবার লাভের দিকে চলেছি—আমায় তোরা ডাকিসনে। বলিয়া শৈবলিনী সন্তানের মুখের দিকে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না—চোখ ফিরাইল।

কুলদা বলিল,—আমি যে মা, মহাপাপের দায়ী হলাম…

শৈবলিনী অন্য দিকে চাহিয়াই বলিল,—আমি কি তোকে শাপ দিয়ে যাচ্ছি রে, পাগল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়াছে—

এবং ছুটির ক'দিনের বেতন ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণই কাটিবেন কি পুরাই দিবেন ইহাই লইয়া বহু বিতণ্ডার পর অর্দ্ধেক বেতন মঞ্জুর হইয়াছে।

কিছুদিন পরের কথা—

নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে, যজ্ঞের ফল বণ্টন করিয়া লওয়া হইয়াছে…পৃথিবী পুনরায় "জীবনের নিত্যস্রোতে" ভাসিয়া চলিয়াছে…

আরো কিছুদিন পরের কথা—

ভারত স্বাধীন হইবে—স্বাধীন হইবার ইচ্ছা তার সকল ইচ্ছার অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে; ভারতের ভাবোত্তম যাঁরা বিচলিত ও চালিত করেন তাঁরা সবাই স্বাধীনতাপন্থী—

আর আমরা যে গার্হস্থ্য ঘটনার বিষয় বলিতেছিলাম তাহার বিশেষ পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে এই যে মানকুমারী স্বামীকে পাঁচটি সন্তান উপর্য্যপরি উপহার দিয়াছে…সুতরাং অর্থসঙ্কট পূর্ব্ববৎ আছে।

কুলদার মাহিনা অবশ্য তিনটি টাকা বাড়িয়াছে; ছেলে পড়াইয়াও সাতটি টাকা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু লক্ষ্মী বোধ হয় তৈলাক্ত ব্যক্তিকে তৈলসিক্ত করিতেছিলেন; ইহাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই—ধার না করিলে মাসের শেষ দিক্‌টায় কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা নিম্নলিখিত *কথোপকথন হইতেই উপলব্ধি হইবে।*

সাড়ে চারিটার গাড়ীটা গেল—

কুলদা এই সময়েই ফেরে। কুলদার বড় ছেলে বামাচরণ বেলা সাড়ে এগারটা হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতেছিল; গাড়ী চলিয়া যাইতেই সে একটা খবর লইয়া বাড়ীতে ঢুকিবার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল…দুইবার পিছন্ ফিরিয়া দেখিল, মা তাকে টানিয়া সরাইয়া দিতে আসিতেছে কি না…সে চেষ্টা দেখিলেই সে পালাইবে…

কুলদাকে দেখিতে পাইয়াই বামাচরণ দরজা ধরিয়া লাফাইতে লাগিল, হাঁকিয়া বলিল,—মা বাবা আস্‌ছে।

মানকুমারী বলিল,—মেরে ফেল্‌ব বল্‌ছি…

বলিতে বলিতে কুলদা হাস্যমুখে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তার শুষ্কমুখের হাসিটাকে হত্যা করিতেই বামাচরণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল; বলিয়া দিল,—বাবা, মা আজ খায়নি।

কুলদা চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—কেন ?

— ভাত ছিল না।

মানকুমারী ছেলেদের কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বড়টা হঠাৎ জানিয়া ফেলে··· মানকুমারী তাহাকে ধমক্ দিয়া প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল; সেই ধমক্ খাওয়ার রাগেই একগুঁয়ে ছেলে অতিশয় অসময়েই তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

—চল্। বলিয়া কুলদা ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু মানকুমারী লজ্জা পাইয়া তখন কোথায় লুকাইয়াছে তার ঠিক নাই।

মাঝ-উঠানে দাঁড়াইয়া কুলদা বলিল,—এ তোমার ভারি অন্যায়। ধার ত' আমাদের করতেই হয়—দু'দিন আগে কি পরে। চা'লে কম পড়বে এ-কথা আমাকে সকালবেলা বললে না কেন ?

মানকুমারী একবাটি মুড়ি লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—তাতে হয়েছে কি! একবেলা না খেলে' মানুষ মরে' যায় না।···দাঁড়িয়ে থেক' না; কাপড় ছাড়, হাত মুখ ধোও···

অন্যমনস্ক ভাবে কুলদা বলিল,—থুই। বলিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—কোথায় চল্‌লে ?

কুলদা জবাব দিল না—বাহির হইয়া গেল।

তিনটি টাকা ধার মিলিয়াছে।

দূরে একটা তুমুল কলরব শুনিয়া কুলদা গলি দিয়া বড় রাস্তার দিকে চলিতেছিল···

কে যেন ডাকিল,—ও মশাই, ও ঠাকুর! তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া কুলদা ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিতে পাইল, তাহাকেই বটে। যে ডাকিতেছিল সে দোকানী—দোকান হইতে নামিয়া দ্রুতপদে তাহারই দিকে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই কুলদার মনে পড়িয়া গেল, মাস দুই পূর্ব্বে ইহার কাছ হইতে এক কৌটা বার্লি লইয়াছিল, কিন্তু স্মৃতি এমন দুর্ব্বল যে ঋণটা আজও শোধ করা হয় নাই।

হরকুমার যখন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, কুলদা ততক্ষণে পকেটে হাত দিয়া টাকা একটি বাহির করিয়াছে···

টাকাটা হাতে দিতেই হরকুমার বলিল,—ভাগিস্ চোখে প'লেন, তাই আদায় হল। দু'টি মাস ত' এড়িয়ে বেড়ালেন।···আসুন, ফেরৎ পয়সা চোদ্দটা নিয়ে যান্···না, থাক্‌বে এখন ?

কুলদা তখনও ঘাড় তুলিতে পারে নাই, আস্তে আস্তে বলিল,—নিয়েই যাই।

—নিয়েই যান্।··· বটেই ত'—ছোটলোককে বিশ্বেস্ কি!

বড় রাস্তায় উঠিয়াই কুলদা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল··· প্রকাণ্ড মিছিল চলিয়াছে...পতাকায় 'স্বাধীনতা', টুপীতে 'স্বাধীনতা'···মাঝে মাঝে মাতৃ-বন্দনার তুমুল ধ্বনি উঠিতেছে—তাহাতে 'দিগন্ত কম্পিত' হইতেছে কি না কে জানে, কিন্তু কুলদার বিষণ্ণ চক্ষু দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···

কুলদা মিছিলের পশ্চাতে গিয়া উঠিয়াছিল; একটি স্বেচ্ছাসেবককে সম্মুখে পাইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি, ভাই ?

স্বেচ্ছাসেবক পাল্টা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিল,—কোন্ জগতের মানুষ মশায় ?

নীরস কথায় কুলদার মুখ ছোট হইয়া গেল···

স্বেচ্ছাসেবক বলিতে লাগিল,—কুন্তলিনীপুরের ন' আনীর বড়বাবু দেবীবল্লভবাবুর নাম শুনেছেন বোধ হয়—সাতপুরুষে বিরাট্ ধনী,' ধুলো দেখ্‌লে' শিউরে উঠতেন··· তিনি জেলে গিয়েছিলেন, একুশ দিন পরে আজ মুক্তি পেয়েছেন···

—কি করেছিলেন ?

—নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ।···বেরিয়ে আসুন; তাকিয়া আর তামাক নিয়ে ঘরের আরাম ভোগ করলেন ত' বহুকাল—এইবার বেরিয়ে আসুন।···

ডাকা যার কাজ সে ডাক দিয়া গেল—

কুলদার বুকের ভিতর ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল; কিন্তু ঘরের টান কাটাইয়া সে নড়িতে পারিল না।

আদি নর

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

নাহি জ্যোতি নাহি আলো নাহি সৃষ্টি নাহি স্থিতি,
নাহি দিক নাহি চরাচর ;
অনন্তের মহাগর্ভে বিরাট সে অন্ধকার,
কাঁপিতেছে করি' থরথর।
আঁধারের বক্ষে জ্বলে অপরূপ কোটি সূর্য্য-জ্যোতি,
দেহ-শূন্য মূর্ত্তি-মাঝে অ-মূর্ত্তের লীলানন্দ-রতি—
ব্যাকুল হইয়া উঠে। অকস্মাৎ ভেদি' অন্ধকার,
ব্রহ্মের সে লীলামূর্ত্তি ধরিলেন অপূর্ব্ব আকার !
ব্রহ্ম-লীলানন্দ-রসে, কামনার নাভিপদ্মে,
জাগিলেন আদি ভগবান ;
ব্রহ্ম হ'তে বিকশিত, সৃষ্টিগুরু ব্রহ্মা নাম,
আদি নর গাহিলেন গান !

মধুর মোহন-কণ্ঠে প্রণব ঝঙ্কারি' ওঠে
সৃষ্টির সে আদিম প্রভাতে :
অনন্ত গগন-বুক স্পন্দিত হইয়া কাঁপে,
সে আনন্দ-ঘাত-প্রতিঘাতে— .
অপূর্ব্ব গন্ধে ও রসে খু'লে গেল রূপ প্রস্রবণ,
ব্যোমগর্ভে গ্রহকুল ছন্দে ছন্দে করিল নর্ত্তন।
পুঞ্জে পুঞ্জে তারকায় গেঁথে দিল সৌন্দর্য্যের হার,
আদি নরে বন্দনায় রবি শশী ঢালে স্তুতি-ভার।
এত শোভা এত হর্ষ ধরিল না ব্রহ্মা-বুকে
এ সৌন্দর্য্য কে করিবে পান ?
ভুবন রচিয়া তাই, অনন্ত মানব রূপে
মূর্ত্তি নিলা আদি ভগবান।

অনন্ত সে মানবের অনন্ত সে রূপে রূপে,
খণ্ড খণ্ড করি' আপনারে ;
এক সে আদিম নর, হইলেন বহুরূপী,
একই সুর বাঁধা কোটি তারে।
অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি হেরি, রূপ-কান্তি হেরিয়া নবীন,
সারা সৃষ্টি ভক্তি-ভয়ে নরমূর্ত্তি করে প্রদক্ষিণ,
আজ্ঞাকারী দেবশক্তি জলআলো দিল ভারে ভার,
অনন্ত সে মহাকাল পরমায়ু বহিল তাহার।
তারি লাগি' এ নিখিলে, ওঠে নিতি রবি শশী,
বহিল রে মলয় পবন ;
প্রকৃতির মহারাজ্যে, অমৃত-সম্পদ লভি'
নর হ'ল রাজা চিরন্তন।

হে মর্ত্ত্যের মহারাজ, তোমা' লাগি' বসুন্ধরা—
মধুভরা শস্য করে দান,
তোমা' লাগি' ফুটে ফুল, বহে নদী কুল কুল
তোমা' লাগি' পাখী গাহে গান।
তব রাজ্যে নাহি ধনী, নাহি দীন, নাহি ভেদাভেদ,
তোমার সে লীলাভূমে নাহি দৈন্য নাহি কোনো খেদ।
বাতাস-আলোক-মাটী ভুঞ্জ তুমি সম অংশ তার,
সারা বিশ্বে এক তুমি ভিন্ন রূপে হইলে বিস্তার।
নিখিলের সব সুখ, সব আনন্দের মধু,
বাঁটো তুমি করিয়া সমান ;
কে'বা কা'রে করে ভয় কে'বা কা'রে করে জয়,
খণ্ড খণ্ড তুমি ভগবান।

কন্যা রাশি

[শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

রমণীমোহনের বয়স আঠারো উনিশ, বর্দ্ধমান কলেজে ফাষ্ট´ ইয়ারে পড়ে। পূজার ছুটিতে বাড়ী চলিয়াছে। গাড়ী আসিতে অনেক দেরি, তাই অগত্যা পাশের প্লাটফর্মে মেয়ে কামরার সুমুখ দিয়া নির্ব্বিকার গম্ভীর ভাবে পায়চারী করিতেছিল। একটি সন্ন্যাসী-দর্শন লোক অদূরে বসিয়া রমণীকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল, এবার নিকটে আসিয়া, একেবারে তাহার গতিরোধ করিয়া একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমণী থমকিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী আরো কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ইংরাজি করিয়া কহিল, আমায় অনুসরণ কর। ষ্টেষনের একটা জনবিরল স্থানে পৌছিয়া রমণীর একটা হাত নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল, "কন্যারাশিতে অতীব শুভ মুহূর্ত্তে তোমার জন্ম। তুমি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে রমণী-জন-প্রিয় হ'বে"—বলিতে বলিতেই একটি ভিখারী সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া হাত পাতিল। সন্ন্যাসী কহিল, "আমি দীন সন্ন্যাসী, অর্থ কোথায় পাবো? এঁর কাছে চাও। ইনি ভাগ্যবান্।" রমণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পকেটে যাহা ছিল, ভিখারীর হাতে তুলিয়া দিল, এবং ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী পৌছিল।

নিজের নাম সম্বন্ধে রমণীমোহন লজ্জিতই ছিল। কিন্তু সেইদিন হইতে ইহার মধ্যে একটা বিশেষ সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। মনে হইল, যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীচক্ষু তাহার দিকে একটি বিশেষভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। গ্রামের সেই পুকুরের ঘাটটিতে বসিয়া আজ সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, প্রত্যেকটি বধূ কলসী কাঁখে ফিরিবার পথে ঘোমটার আড়াল হইতে একবার তাহাকে দেখিয়া গেল। এই যে বস্তুটি ইহাকে তো নিছক কৌতূহল-দৃষ্টি বলা যায় না।

অধ্যাপক বিরাজ বাবুর বাড়ীতে রমণীর যাতায়াত ছিল। ছুটির পরে ফিরিয়া বিজয়ার প্রণাম করিতে গেলে, তাঁহার তেরো বছরের কন্যা বিভা আসিয়া কহিল, "কই, মোয়রবা কই? বাবার চিঠি পাননি?"

তাইত? রমণী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইল। বিভা হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, আমাদের কথা কি আর মনে ছিল?" বলিয়া মাথা ঘুবাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া রমণীর মাথাটাও আজ ঘুরিয়া গেল। "আমাদের কথা!" রমণী বুঝিল, এই বহুবচনটা নিতান্তই বাহুল্য। নিজেকে চাপিয়া রাখাই যে নারী জাতির স্বভাব। একটু পরেই বিভা তেমনি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল "দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না। মা বললে, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। জানেন, আমি সন্দেশ করতে শিখেছি। খেয়ে বলবেন, কেমন হ'য়েছে।"

খাইতে বসিয়া রমণীর মনে হইল, এ সন্দেশ শুধু ঐ নারীর হাতের নয়, ইহাই তাহার স্ফুটনোন্মুখ অন্তরের সন্দেশ।

বিভা 'কথামালা' পড়িত এবং কোনস্থানে বুঝিতে না পারিলে রমণী দাদার কাছে বুঝাইয়া লইত। সেদিন রমণী আসিতেই পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া কহিল, "একবারটি এ ঘরে আসুন না রমণীদাদা।" রমণী ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ধীরে ধীরে ঢুকিয়া বিভার পুঁথি পত্তর ছড়ানো তক্তপোশের একান্তে বসিয়া কহিল, "তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, নেবে বিভা?"

বিভা খুসী হইয়া কহিল, "কি জিনিষ?"

—"বলতো কি?"

—"রঙীন পেন্সিল?"

রমণী মনে মনে কহিল, "হ্যাঁ রঙীনই বটে, তবে পেন্সিল নয়, হৃদয়।"

—"বলুন না!"

রমণী পকেট হইতে একখানি সুরঞ্জিত কাগজ বাহির করিল। চারি পাশে নানাপ্রকার ছবি, মাঝখানে একটা কবিতা। বিভা ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "বিয়ের পদ্য বুঝি? কার বিয়ে রমণী দাদা?"

রমণীর বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট অক্ষর। বিভা বানান করিয়া করিয়া পড়িল।

"জানি সখি, অই তব সুনীল নয়নে
কি কথা লুকায়ে আছে অতি সঙ্গোপনে
তোমার অধর-প্রান্তে—"

—"এ কাকে লিখেছেন ?"

রমণী একবার ইতস্ততঃ করিল এবং পরক্ষণেই বিভার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমাকে বিভা।"

বিভার মুখখানা সহসা লাল এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানা চাপা দিয়া পড়িতে সুরু করিয়া দিল—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। একদা এক আর—রমণী সেই হাতখানা আর একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই, 'মা ডাকছে' বলিয়া বিভা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রমণী আহত হইল। বিভা এত নিষ্ঠুর! এতদিনের ঘনিষ্ঠতা, তাহার কোন মূল্যই রহিল না? দুখে ক্ষোভে অভিমানে তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া আসিল। স্থির করিল, নাঃ—বিভাকে শাস্তি দিতে হইবে। আর কখনো না ডাকিলে যাইবে না। মেসের ছেলেরা তখন বার্ষিক পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত। রমণী তাহার এক সিটের ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া দীর্ণ হৃদয় গালিয়া গালিয়া কবিতা-কুসুম রচনা করিতে লাগিল। এক সময়ে সে অবাক হইয়া গেল, এই কাব্যশক্তি তাহার কোথায় ছিল? ইস্কুলে থাকিতে জনৈক প্রিয়দর্শন সহপাঠীর উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বাসভরে দুই একটা কবিতা লিখিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ জিনিষটা তাহার বড়দার চোখে পড়ে এবং তরুণ কবির পিঠের উপরে তাহার অসামান্য কাব্য-প্রতিভার যে পুরস্কার তিনি দিয়াছিলেন, তাহার পরে আর দ্বিতীয় উদ্যম সম্ভব হয় নাই। সেই নিরুদ্ধ কাব্যস্রোত আজ দুই কূল ছাপাইয়া উঠিল। কিন্তু বিভার ডাক আসিল না। অগত্যা রমণী বিভাদের বাড়ীর সুমুখ দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। একদিন সেই নিষ্ঠুরাকে উপরে দেখাও গেল, কিন্তু চোখোচোখী হইবার পূর্ব্বেই সে অন্তর্ধান করিল। ক্রমশঃ রমণীর মনে হইল হয়তো সে ভুল করিয়াছে। বিভাও হয়তো তাহারি জন্য এমনি করিয়াই পথ চাহিয়া আছে। তাহারও তো অভিমান হইতে পারে। ভোর হইতে না হইতেই সে ছুটিয়া বিরাজ বাবুর বাড়ী আসিয়া দেখিল, দুয়ারে রসুনচোকীর শানাই বাজিতেছে এবং পাড়ার যত ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া শুনিতেছে। রমণীর বুকের ভিতরটা চমকাইয়া উঠিল। ভিতরে যাইতেই বিরাজ বাবু কহিলেন, "এই যে রমণী এসেছ? তোমাদের ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। বিভার বিয়ে। দু'চার দিনের মধ্যেই হঠাৎ ঠিক করে ফেলতে হ'ল। তোমরা যে ক'জন আছ, এসে খেটে খুটে ব্যাপারটা উদ্ধার করে দাও। জানতো আমার আত্মীয় স্বজন আর কেউ নাই। যা কিছু তোমরাই—"

—রমণী দেখিল, তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত বাড়ীটা ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে। তাহারি মধ্যে সহসা চোখে পড়িল, বিভা একদল বালিকার সঙ্গে এই দিক দিয়াই যাইতেছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া চোখ ফিরাইয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। রমণী আর দাঁড়াইতে পারিল না, কোন রকমে মেসে আসিল এবং একটা জামা টানিয়া লইয়া ষ্টেশনে ছুটিল।

সেইরাত্রে রমণীদের বাড়ীতে যে ব্যাপারটা ঘটিল, বলিতে গেলে অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না, হয়তো বলিয়া বসিবেন, ওটা বাবু তুমি বানাইয়াছ। একটু আধটু বানানো অভ্যাস যে আমার নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু হলপ করিয়া বলিতে পারি এ ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গভীর রাত্রি—সম্ভবতঃ বিভা তখন বাসর ঘরে—রমণীর ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল। মায়ের সতর্ক নিদ্রা ভাঙ্গিতেই তিনি তাহার মেজ ছেলেকে ডাকিয়া তুলিলেন। তারপর অনেক কষ্টে দরজা ভাঙিবার পর দেখা গেল, রমণীর মুখ দিয়া ফেণা উঠিতেছে এবং তাহার বাবার আফিনের কৌটাটা বিছানার পাশে পড়িয়া আছে। বাড়ীময় কান্নার রোল উঠিল। পাশের বাড়ীতেই ডাক্তার ছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন এবং বমি করাইবার জন্য এমন একটা জিনিষ রোগীকে খাইতে দিলেন, যাহা ওক্ষেত্রে যতই জরুরি হউক কোন কালেই মনুষ্যখাদ্য নয়। যাহা হউক অনেক কষ্টে রমণীমোহন সে যাত্রায় রক্ষা পাইল। তবে সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া রাখিতে

বড়দা তাহার দেহের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার কাছে রমণীর প্রচণ্ড হৃদয়-সংঘাতটাও বোধ হয় নিতান্তই তুচ্ছ।

"বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়! দেশ মাতৃকার আহ্বান, মহাত্মাজির আদেশ, বেরিয়ে পড়!"—নন্-কো-অপারেশনের বিপুল কণ্ঠে সমস্ত দেশ তখন টলমল। গোলামখানা উজাড় করিয়া ছেলেরা দলে দলে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রমণীমোহন তাহার গ্রাম্য-গৃহের একান্তে বসিয়া কাব্য-সূত্রে আপনার ছিন্ন হৃদয় নূতন করিয়া বাঁধিবার চেষ্টায় ছিল, দেশের ডাক যথাসময়ে তাহার কানেও গিয়া পৌঁছিল। ভাবুক প্রাণ; এক মুহূর্ত্তেই সাড়া দিয়া উঠিল। সেই রাত্রে 'সমাপ্তি' কবিতায় কাব্যলক্ষ্মী এবং বিগত জীবনের কাছে বিদায় মাগিয়া রমণীমোহন দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিল। সেই ওজস্বিনী কবিতার প্রথম আড়াই লাইন আজও মনে আছে—

> "তুচ্ছ নারী, তুচ্ছ তব মিথ্যা রূপজাল,
> অই শোন ডাকিতেছে দীপ্ত মহাকাল,
> ডাকিতেছে দেশমাতা।—"

পরদিন আগাগোড়া খদ্দরাবৃত রমণীমোহন যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে, মা আসিয়া কহিলেন, "বর্দ্ধমানে যাচ্ছিস বুঝি?"

রমণী গম্ভীর ভাবে কহিল, "না, কোলকাতায়।"

"কেন, কোলকাতায় কেন?"

"যাচ্ছি আমার ইচ্ছা; তাতে তোমার কি?"

"আর পড়বি না?"

"না";—বলিয়া রমণীমোহন বাহির হইয়া গেল, রমণীমোহনের বাক্যে, চিন্তায় এবং বিশেষ করিয়া গতিতে এমন একটা প্রচণ্ড, দ্রুত, একরোখা ভাব ছিল, যে কলেজে বন্ধুরা তাহার নাম দিয়াছিল, তৃতীয় অবতার। নামটার সার্থকতা তাহার জীবনে একদিনের জন্যও অমান্য হয় নাই।

রমণীমোহনের কণ্ঠে মিষ্টত্বের অভাব থাকিলেও উচ্চতার অভাব ছিল না। সুতরাং নেতৃবৃন্দের নজরে পড়িতে দেরি হইল না। ভলাণ্টিয়ার দলে সে শীঘ্রই অগ্রণী হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে আপনার অজ্ঞাতসারেই দেখিতে পাইল, কখন সে একেবারে মহিলা বিভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। মহিলাদিগকে গাড়ী করিয়া লইয়া আসা এবং পৌঁছাইয়া দেওয়া—এই ছিল তাহার কাজ। এই কঠোর দেশসেবার মধ্যে কখনো কখনো তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিত, মন চঞ্চল হইয়া পড়িত। কিন্তু দেশমন্ত্রের রক্ষা-কবচ ছিল মস্ত বাধা। তারপর একদিন ভবানীপুরে একটা বাড়ীর সুমুখে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটিল। রমণীমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, একটি সুন্দরী তরুণীর প্রতি নিছক শ্রদ্ধা-নিবেদন। কিন্তু তাঁহার মাতা জিনিষটাকে ভুল বুঝিলেন, এবং তাহার নামে অযথা দোষারোপ করিলেন। ফলে মহিলা-বিভাগ হইতে এতবড় একটা ত্যাগী ভলাণ্টিয়ারের অপসারণ আদেশ হইয়া গেল। তখন অকস্মাৎ একদিন তাহার দুই কাণ ভরিয়া তুমুল রবে বাজিয়া উঠিল, বাংলার শত শত নিরন্ন পল্লীর নীরব ক্রন্দন—অবলা পল্লীবধূদের কাতর কণ্ঠ। রমণী কহিল, এসব armchair politicsএর দিন আর নেই। দেশের যেটা সত্যিকার মেরুদণ্ড সেইখানেই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র।

অতএব, একটা চরকা ঘাড়ে করিয়া মলিনবেশ-রুক্ষকেশ তরুণ দেশসেবক পল্লীসংস্কারে বাহির হইয়া পড়িল।

এই নূতন কর্ম্মজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসের এখানে প্রয়োজন নাই, সেটা সম্ভবও নয়। কেমন করিয়া সহসা একদিন ইহার উপসংহার হইল, সেই কথাটাই শুধু বলিব। বর্দ্ধমান ষ্টেষনের সন্ন্যাসীকে রমণী ভুলিতে পারে নাই। সমস্ত দিনের পর্য্যটনের পরে যেন পল্লীগৃহের দুয়ারে আতিথ্য-গ্রহণ করিতে গিয়া যখন শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িত, হয়ত কোন অন্তঃপুরচারিণী তরুণী বধূর একটি মাত্র সলাজ-দৃষ্টি তাহাকে আবার নূতন প্রেরণা দিয়া যাইত। সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই চরকা-ইস্কুল এবং ভলাণ্টিয়ার-সংগ্রহ সুরু হইত, এবং গৃহস্থের সরব-আপত্তি-জ্ঞাপনের পূর্ব্বে সে স্থান সে ত্যাগ করিত না। এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে বীরভূমের একটি গ্রামে একজন ইস্কুল-মাষ্টারের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। ভদ্রলোক এই দেশকর্ম্মীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত তাহার অপূর্ব্ব বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

পরদিন হইতে রমণীর কাজ হইল বাড়ীর বধূকে চরকা শেখানো এবং দেশমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলা।

দিন পনেরো পরে দুপুর বেলা নির্জ্জন ঘরে বসিয়া মেয়েটি সূতা কাটিতেছিল। স্বামী বাড়ী নাই, শাশুড়ী অন্য ঘরে ঘুমাইতেছেন। রমণী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অদূরে বসিল, এবং একদৃষ্টে সেই অনিপুণ অঙ্গুলি চালনার দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটি হাসিয়া কহিল, "কি দেখছেন? আজ আর দোষ দিতে পারবেন না। এই দেখুন না সূতো আজ অনেক সরু হয়েছে।"

রমণী কহিল "সে শুধু আপনার গুণে নয়।"

"তবে কার গুণে শুনি?"

"আপনার আঙুলেরও।"

মেয়েটির মুখের উপর একটি লজ্জার আভা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণকাল নিজের আঙুলের দিকে চাহিয়া আবার চরকা ঘুরাইতে লাগিল। রমণী কহিল, "সূতোটা উল্টো ক'রে ধরেছেন কেন? এমনি করে ধরুন।—এঃ আরো ভুল হ'ল; এই এমনি ক'রে"—বলিয়া উঠিয়া আঙুল ধরিয়া টানিয়া দেখাইয়া দিল মেয়েটি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা দিল না।

রমণী কহিল, "এ দিয়ে কি আর সূতো কাটা চলে? চলে বড় জোর ফুলের মালা গাঁথা।"

মেয়েটি বলিয়া ফেলিল, "তা' হলে দেখছি ওটাও আপনার কাছে শিখে নিতে হ'বে। শেখাতে পারবেন তো?" বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমণী ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু এই বলিবার ভঙ্গী এবং সেই সঙ্গে এই চম্পক অঙ্গুলি, এই মধুর হাসি—সকল জুড়িয়া কিসের একটা গূঢ় ইঙ্গিত তাহার সমস্ত চেতনাকে কেমন অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। একটু পরেই বধূটি সহসা হাত টানিয়া নিয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "বেলা গেছে, যাই আপনার খাবার করি গে।"

রমণী যেন ধ্যানে ছিল, চমকাইয়া উঠিল, "সে কি উঠলেন যে? রাগ করলেন?"

"না, রাগ করবো কেন?"

"নিশ্চয়ই আপনি রাগ করেছেন। আপনি চটে যাবেন জানলে আমি—আমাকে মাপ করবেন বলিয়া বোধ হয় তাহার পা-ই ধরিতে গেল।

"ও কি করছেন? ছিঃ ছিঃ! আচ্ছা, এই আবার বসেছি,"—বলিয়া সে রমণীর চোখের দিকে চাহিয়া কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই শুষ্ক, ভীত, পাণ্ডুর মুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন হইতে কি জানি কেন হঠাৎ মেয়েটির সূতা কাটিবার সমস্ত উৎসাহ একেবারেই নিবিয়া গেল। স্বামী এবং শাশুড়ীর বারংবার অনুরোধেও সে একটিবার রমণীর সুমুখে বাহির হইল না। দুই একদিন পরে গ্রামের লোক আসিয়া দেখিল, তাহাদের তরুণ দেশসেবক কাহাকেও কিছু না বলিয়া কখন চলিয়া গিয়াছেন।

আর একখানা কাপড় পড়িয়া আছে।

৩

নন্-কো-অপারেশনের ঝড় যেমন বেগে আসিয়াছিল, তেমনি বেগেই চলিয়া গেল। এখানে ওখানে দুই একটি ভগ্ন চিহ্ন ছাড়া তাহার আর কোন অস্তিত্বের লক্ষণই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইস্কুল কলেজের ছেলেরা যেমন দলে দলে বাহির হইয়াছিল, তেমনি দলে দলেই প্রবেশ করিতে লাগিল। রমণীমোহন যথাসময়ে আই, এ পাশ করিয়া বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং বি-এটাও পাশ করিয়া ফেলিল। সম্প্রতি তাহার কাজ অনেক। সকালে ল' ক্লাস, দুপুরে চাকরি, এবং সন্ধ্যায় টিউসন। ইতিমধ্যে মায়ের উপর রাগ করিয়া তাঁহার একটি পুত্রবধূর সংস্থান করিয়া দিয়াছে, কিন্তু কাজের ভিড়ে সেই মূর্খ গ্রাম্য বালিকার কথা স্মরণ করিবার সময় রমণীমোহনের হয় না। শুধু মাঝে মাঝে যেদিন ব্রাহ্ম-বন্ধু নরেশচন্দ্রের অনূঢ়া ভগিনীর গান শোনা যায়, সেইদিন সেই নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, ঘোমটা জড়ানো জড়পুত্তলীর হাজার রকম দোষত্রুটি স্মরণ করিয়া রাগে, ক্ষোভে তাহার সমস্ত রাত ঘুম হয় না। অথচ এই একটি রাতের মারাত্মক ভুলকে কি করিয়া যে মুছিয়া ফেলা যায়, তাহারও কোন কিনারা মাথায় আসে না। মেসের রুমমেট নীরদ নব বিবাহিত যুবক, রমণীর সমবয়স্ক। তিনদিন অন্তর রাত জাগিয়া স্ত্রীকে চিঠি লেখে। রমণী

তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকায়, হাসিয়া বলে, "আপনাকে ধন্য বলতে হবে, মশাই। ভগবান আপনাকে দয়া করেছেন। বেশ আছেন।"

নীরদ বিরক্ত হইয়া বলে, "কিন্তু আপনাকে তো কেউ 'বেশ থাকতে' নিষেধ করছে না।"

—"নিষেধ করে বৈ কি? নিষেধ করে এই—" বলিয়া মাথাটা দেখাইয়া দেয়। —"কি জানেন, জ্ঞান-বৃক্ষের ফলটা একবার যার ভাগে একটু বেশি রকম পড়ে তার চোখে আর ঘোর থাকে না।' চিঠি লিখবো কেমন করে বলুন।"

নীরদ শ্লেষের সঙ্গে বলে, "তাতো বটেই, আপনারা সব ইনটেলেকচুয়াল জায়েণ্ট! বৌকে চিঠি লিখবেন কি, পাড়ায় পাড়ায় বান্ধবীর খোঁজ করে ফিরবেন। আমরা বোকা লোক। বিয়ে যখন করেছি, তখন বৌ-ই সব।"

সেদিন এমনি একটা তর্কই চলিতেছিল। এমন সময় নরেশ আসিয়া কহিল, "একটা টিউসন ক'রবেন?"

রমণী কহিল, "কি পড়াতে হ'বে?"

—"আই, এ পরীক্ষা দিচ্ছেন। ছাত্র নয়, স্ত্রীয়াম্ ঈপ্। একটু বয়স্ক লোক চেয়েছিল, তবে আমি বললে আর বাধা হ'বে না।"

রমণীর মনে পড়িল বর্দ্ধমান ষ্টেষনের জ্যোতিষী, কিন্তু ভিতরের ভাব গোপন রাখিয়া তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, "তা বেশ, আপনি যখন বলছেন, ক'রবো।"

কথা দিল বটে। কিন্তু সময় কোথায়? সন্ধ্যাবেলায় যাহাকে পড়াইত, রমণী সোজা তাহার বাবার কাছে গিয়া কহিল, "আমাকে বিদায় দিন, আমি আর পড়াতে পারবো না।"

ছাত্রের বাবা আকাশ থেকে পড়লেন, "সে কি? পরীক্ষার যে আর দেরি নাই।"

—"আমাকে মাপ করুন। এরকম দুর্বিনীত ছেলে,—এখনো জানে না manners কাকে বলে—ও আমার পোষাবে না।"

ছাত্রের বাবা হাসিলেন, বলিলেন, "বুঝেছি; আচ্ছা আসছে মাস থেকে পাঁচ টাকা বেশি করে দেবো

রমণী কহিল, "আজ্ঞে না। নমস্কার।"

ছাত্রটি কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটি নিতান্তই বেচারা। জীবনে কাহারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নাই।

আগের চাইতে টাকা দশটা কম; খাটুনি অনেক বেশি। কি করা যায়? তাই বলিয়া বন্ধুর অনুরোধ তো অমান্য করা যায় না। ছাত্রীটী নরেশের সম্পর্কে বৌদিদি কিনা। স্বামী দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরী করেন। শ্বশুর একটি সাদাসিদে ভোলানাথ লোক, খাশুড়ি রুগ্না। রমণীর বেশভূষার দিকে কোন কালেই লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, তাহার ভেলভেট-দেওয়া শ্লিপার, সিল্কের পাঞ্জাবি, পাউডার, হেয়ার ক্রীম্, স্নো ইত্যাদি। আকৃতির দিক দিয়া ভগবান রমণীকে দয়া করেন নাই। সেই দেব ভুলকে মানব চেষ্টায় যতটা শোধরানো যায়, তাহার কোন ত্রুটিই হইল না। নীরদ কহিল, "জ্ঞান বৃক্ষের ফলটা কি একটু বেশি হজম হয়ে গেল রমণী বাবু?" রমণী চুল আঁচড়াইতেছিল, জবাব দিল না। এই কাজটিতে তাহার অনেক সময় এবং শ্রম ব্যয় হইত। দীর্ঘকাল পরে অবাধ্য কেশরাশিকে বশীভূত করিয়া পাউডার ইত্যাদি সহযোগে বেশ ভূষা শেষ করিয়া চশমা চোখে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধ রামবাবু মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে পুত্র-বধূর পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, "এঁর কাছে কোন লজ্জা নেই মা। গুরু যেই তোন্ পিতৃতুল্য।" তারপর রমণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর। যেমন করে হোক মাকে আমার উৎরে দিতে হবে।" রমণী অন্যমনস্ক ছিল। বৃদ্ধের কথায় সহসা থতমত খাইয়া অস্পষ্ট ভাবে কি বলিল বোঝা গেল না। ছাত্রীটির দেহে সৌন্দর্য্য যাহাই থাক, স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অভাবই ছিল। বন্ধু মহলে তাহার নাম ছিল 'দেহলতা'. আত্মীয় স্বজনেরাও রোগা বলিয়া তাহাকে কৃপার চোখেই দেখিত। রমণীর চোখে কিন্তু এই জিনিষটাই একটি বিশেষ গুণ হইয়া দেখা দিল। নারীর রূপ সম্পর্কে রমণীর মনে এমনি একটি ঔদার্য্য ছিল। জীবনে যত স্ত্রীলোক তাহার চোখে পড়িয়াছে, প্রত্যেকের মধ্যে কোন না কোন দিক হইতে একটা কিছু আকর্ষণ সে চিরদিন অনুভব করিয়াছে। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। সে তাহার বাপমায়ের অদৃষ্টের দোষ। যাক্ সে কথা। ছাত্রীর দিকে চাহিয়া

রমণীর মনে হইল, ইহাই সত্যিকার রূপ, রক্ত নয়, মাংস নয়, একটি মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা। গতির মধ্যে কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নাই। সহজ বিনয়ে নমস্কার করিয়া একেবারেই পড়াশুনা সম্বন্ধে কথা পাড়িল। রমণীর বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। কোন রকমে হাঁ, না বলিয়া সেদিনকার মত উদ্ধার পাইল।

দিন পাঁচ ছয় পরে তাহার দাদা আসিলেন এবং তাহাকে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে যাইতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াও সময় পাওয়া গেল না। নীরদ বেড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল, রমণী অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বসিয়া আছে।

—"কি রকম আজ যে যাননি ?"

—"কি করে যাবো বলুন। দাদা আজ পনেরো বছর কোলকাতা আসছেন, তবু একা ষ্টেশনে যেতে পারলেন না। আমি বললাম, আমার কাজ রয়েছে ; না তবু চল। এক সপ্তাহ না যেতেই কামাই –"

নীরদ হাসি চাপিয়া কহিল, "দাদাদের বিবেচনাই এই রকম।"

পরদিন যাইতেই ছাত্রী কহিল, "কাল আসেননি যে! আমি রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনার আশায় বসে রইলাম।" একটা কথার মধ্যেও যে এতখানি মাধুর্য্য থাকিতে পারে একথা রমণী এমন করিয়া কোনদিন বোঝে নাই। মনে হইল, একথা যে বলিল, সে তাহার ছাত্রী নয়, বেথুন কলেজের আই এ ক্লাসের একটি তুচ্ছ মেয়ে নয়, এ যেন কোন চিরন্তনী নারী যুগযুগান্তের ওপার হইতে জানাইল, 'আমি তোমারি আশায় বসিয়া আছি।' সেই অলক্ষ্য প্রতীক্ষা রমণীকে কিছুকালের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলিল।

Wordsworthএর কবিতা পড়াইতে গিয়া Romanticism এবং সেই সূত্রে ঐ periodএর বড় বড় কবিদের প্রেম কবিতার কথা চলিয়া আসিল। বক্তা মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু শ্রোত্রী নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়া করিয়া শুনিয়া লইল। অনেক রাত্রে উঠিবার সময় কহিল "আজ তো কিছুই হ'ল না। তা' আপনি এক কাজ করুন না? দয়া করে এই কবিতাটার দরকারী জায়গা গুলোর explanation (ব্যাখ্যা) লিখে আনবেন। আমি খাতা দিচ্ছি।"

—না না, থাক্, খাতা লাগবেনা।

রমণী সেদিন সমস্ত কলিকাতার ষ্টেষনারী দোকান ঘাটিয়াও মনোমত খাতা জুটাইতে পারিল না। অবশেষে হগ্ সাহেবের বাজার থেকে একটা সংগ্রহ করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। এমনি করিয়া প্রতিদিন কাজ বাড়ে এবং রাত দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়াও রমণী তাহা শেষ করিতে পারে না।

সেদিন পড়ান হইতেছে। এমন সময় ছাত্রীর জনৈক যুবক আত্মীয় দরজার সুমুখে আসিয়া কহিলেন, "কিরে মীনু, কেমন তৈরি হ'ল ?"

"হ'ল এক রকম।"

তারপর পড়াশুনা থেকে কলেজের এবং অন্যান্য দুই একটা কথাও উঠিল। মিনিট পাঁচেক। সহসা রমণী বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যদি আর আমার আসবার প্রয়োজন হয়, কাল খবর পাঠাবেন—" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তোর মাষ্টার ক্ষ্যাপা নাকি রে ?"

—"আছে একটু ছিট্।"

—"আর তাই বুঝি বেচারাকে নিয়ে একটু রগড় টগড় হ'চ্ছে ?"

মীনু হাসিয়া কহিল, "রগড় আবার কি হচ্ছে ?"

—"তা বুঝেছি ; তোমার মত ঝানু—সে যাক, ভদ্র লোক যখন রেগেছে, একটা খবর পাঠাস্। তা নৈলে হয়তো আসবেনা।"

মীনু কহিল, "কিছু দরকার হবে না।"

পরদিন যথাসময়েই মাষ্টার মহাশয়ের দেখা পাওয়া গেল। তাহার বসিবার আসনের পাশেই একথালা খাবার। কিন্তু রমণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গম্ভীর ভাবে বই খুলিয়া একেবারে পড়াইতে সুরু করিল। মীনু বইখানা কাড়িয়া নিয়া কহিল, "আগে খেয়ে নিন্। তা না হ'লে পড়বো না।"

রমণী তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি তো এখানে খেতে আসি না।"

—"আমি নিজে হাতে খাবার করেছি, তবুও খাবেন না ?"

রমণী মুখখানাকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ দেখিল মীনু মাথা নীচু করিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে। রমণী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "একি আপনি—না, না, এই আমি খাচ্ছি।" বলিয়া খাইতে সুরু করিল। মীনুর মাথাটা আরো ঝুঁকিয়া পড়িল এবং শরীরটা নড়িতে লাগিল, বোধ হইল সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। নারীর অশ্রুজল! ইহার চেয়ে বড় সম্পদ পুরুষের জীবনে আর কি আছে ? রমণীর মনে হইল পৃথিবীতে আর কিছুই তাহার কামনীয় প্রার্থনীয় নাই। জন্ম জন্মান্তর এইখানে সে এমনি করিয়াই বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এ কান্নার যে আর শেষ নাই। রমণী বিব্রত হইয়া পড়িল, পাছে কেউ আসিয়া দেখিয়া ফেলে। ইচ্ছা হইল, মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া নিজের হাতে ঐ চোখের জল মুছাইয়া দেয়, কিন্তু সাহস হইল না। বার বার বলিতে লাগিল, "আপনি আমাকে মাপ করবেন আমি আপনাকে অযথা বেদনা দিয়েছি…।" মীনু উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া থালার দিকে চাহিয়া প্রসন্ন হাসিতে সমস্ত ঘর ভরিয়া তুলিয়া কহিল, —"তাই বলুন।"

রমণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনাকে ক্ষমা না করবার শক্তি আমার নেই।"

"—তাই বলুন।"

সেদিন আর পড়া অগ্রসর হইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া রমণী কেমন উন্মনা হইয়া পড়িতে লাগিল। মানু লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আজ যে আমাকে এতটা কষ্ট দিয়েছেন, তার জন্য আপনার রাত্রের task অনেকটা বেড়ে যাবে কিন্তু। আচ্ছা, আপনাকে এত খাটিয়ে নিই বলে কেউ কিছু মনে করেন না ?"

—"কে আবার কি মনে করবে ?"

—"এই যেমন ধরুন আপনার—আপনার স্ত্রী। আপনি বিয়ে করেছেন ?"

—"কেন বলুন তো ?"

—"এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিল। পরে কহিল, "না।

মীনু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, এমনি ভাবে কহিল, "যাক্ মস্ত একটা দুশ্চিন্তা গেল। এবার আপনাকে আরো বেশি করে খাটিয়ে নেবো।"

রমণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনি কি জানেন না ? আপনার কাজ আমার task নয়, আনন্দ।"

বাড়ী ফিরিবার পথে একটা কথাই বারংবার তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল—'মস্ত একটা দুশ্চিন্তা গেল।'

ফাঁসির দিন যতই ঘনাইয়া আসে মৃত্যু-দণ্ডিত কয়েদি যেমন ততই শুকাইয়া যায়, আই, এ পরীক্ষার কাছাকাছি রমণীও তেমনি শুকাইতে লাগিল। দিন নাই, রাত নাই, কোথায় গেল বেশভূষা, পড়াশুনা আর ল' ক্লাস ? কোন রকমে আফিস হইতে ফিরিয়া ফুটপাথ হইতে 'নিধে' বলিয়া এক হাঁক, তারপর পাঁচমিনিটের মধ্যে নাকে মুখে কিছু একটা গুঁজিয়াই, ছুটিয়া ছাত্রীর বাড়ী। অবশেষে সেই ভীষণ দিন আসিল। পরীক্ষার শেষ দিন। রমণী অনেক রাত্রে টলিতে টলিতে ফিরিয়া বিছানায় ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। নীরদ কহিল, "কি খবর রমণী বাবু, একেবারে পপাত ধরণীতলে ?" রমণীবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সব ফুরিয়ে গেল নীরদবাবু, Othello's occupation is gone !"

সে রাত্রে নীরদের ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া একটি আর্ত্ত-হৃদয়ের দীর্ঘ বেদনার কাহিনী নিঃশেষে শুনিতে হইল।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন একখানা চিঠি আসিল, "দয়া ক'রে একবার দেখা করবেন।" রমণী ছুটিয়া গিয়া শুনিল, ছাত্রী বাপের বাড়ীতে আছে। চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাই বটে, দর্জ্জিপাড়ার ঠিকানাই রহিয়াছে সন্ধ্যাবেলা সেখানে পৌঁছিতেই মীনু নিজে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। পরণে রক্তরঙের সাড়ী ব্লাউজ, পায়ে জরিপাড় লাল মখমলের নাগরাই। গায়ের ফর্সা রঙ্ যেন দপ্দপ্

করিতেছে। রমণী স্থান, কাল ভুলিয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। মীনু ক্ষণেকের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া, পরক্ষণেই নমস্কার করিয়া কহিল, "আসুন।" বাবার সঙ্গে দুই একটা কথার পরে মীনু রমণীকে লইয়া নিজের ঘরে গেল, কহিল, "আমরা কাল রাঁচী যাচ্ছি। আপনি যাবেন কিন্তু। সামনে তো ছুটি আছে।"

রমণী একটু করুণ হাসিয়া কহিল, "ছুটি থাকলেই যেতে হ'বে এমন তো কোন কথা নেই। তা ছাড়া রাঁচীতে উঠবার মত জায়গা আমার নেই।"

"কেন, আমাদের ওখানে? আমার মামা মামী সবাই খুব খুসী হ'বেন।"

"আপনাদের ওখানে! আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক?"

"কেন? সম্পর্ক কি নেই?"

রমণী উন্মুখ জিজ্ঞাসু চোখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল, "কি আছে বলুন?"

মীনু শুষ্ক নত মুখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, "বেশ। আপনি যদি মনে করেন নেই, তবে নেই।"

একটা দুর্দ্দম্য ইচ্ছাকে অতি কষ্টে দমন করিয়া রমণী কহিল, "আমি মনে করি, নেই! আপনি কি জানেন না সে ক্ষমতা আমি অনেকদিন হারিয়েছি?"

কিছুক্ষণ থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক্। যদি কোনদিন কোন বিষয়ে প্রয়োজন হয়, ডেকে পাঠাতে সঙ্কোচ করবেন না, এবং ভুলবেন না, এই আমার শেষ অনুরোধ।"

মীনু কহিল, "আপনিও যেন আমাদের ভুলবেন না। রোলটা পকেটে রেখেছেন তো?"

রমণী ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিয়া কহিল, "আপনাকে তো আগেই বলেছি, আপনাকে ভুলবার উপায় আমার নেই।"...বলিয়া অগ্রসর হইয়া মীনুর একটা হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল, "আমার অনুরোধটা মনে রাখবেন।" পরক্ষণেই অপ্রস্তুত ছাত্রীকে কোন কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় আসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল মীনু জানালায় দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্না আসিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া ফিরিয়া যায়। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বাড়ী পৌঁছিল।

নীরদ কহিল, "কিন্তু এটা কি করলেন, বলুন তো? হ্যাণ্ডসেকটা তো নেহাৎ বিলিতি হ'য়ে গেল।"

রমণী উত্তর দিল না, গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,

"যদি হ'ল যাবার ক্ষণ
তবে যাও নিয়ে যাও আমার শেষের পরশন।"

নীরদ কহিল, "এটা শেষের পরশন নাও হ'তে পারে।"

রমণী যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, এমনি ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অ্যাঁ কি বললেন?"

পরদিন আফিসে যাইবে, এমন সময় স্ত্রীর চিঠি আসিল। লিখিয়াছে,

শ্রীচরণেষু, তোমাকে পাঁচখানা চিঠি লিখিলাম। একখানারও উত্তর দিলে না। তোমার পায়ে এমন কি অপরাধ করিয়াছি? মা অসুখে পড়িয়া কতবার তোমাকে আসিতে লিখিলেন, তবুও একবার আসিলে না! সকলে বলে আমার জন্যই তুমি দেশান্তরী হইয়াছ। তবে আমার এ পোড়া জীবন রাখিয়া লাভ কি? তুমি নাকি ওখানে কাকে পড়াও! তাই নিয়া যত সব বিশ্রী কথা উঠিয়াছে। সকলে তাই বলিয়া আমাকে ঠাট্টা করে। তোমার পায় পড়ি একবারটি এসো। নইলে আমি যেদিকে চক্ষু যায় চলে যাবো। লক্ষ্মীটি আমার, একবার এসো।

ইতি তোমার হতভাগিনী রাণু।

হৃদয় যখন ভারাক্রান্ত তখন এমনি ধারা ঘ্যান্ ঘ্যান্ সহ্য হইবার কথা নয়। রমণী অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং তাড়াতাড়ি চিঠিখানা একটা বইএর মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাঁচী যাইবার জন্য আফিসে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, মঞ্জুর হয় নাই। সুতরাং যাওয়া হইল না। কিন্তু নিদ্রায়, জাগরণে সমস্ত সময় মনটা কেবল সেই অজানা দেশের লাল মাটির পথ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে অনেক রাত্রে আলো জ্বালিয়া রমণী চিঠি লিখিতে বসিল। দীর্ঘ পত্রে হৃদয়ের সমস্ত অকথিত কথা শেষ করিয়া অবশেষে লিখিল,—আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি আমার পক্ষে এ জীবনে আপনি অপ্রাপনীয়া। এ শুধু 'desire

of the moth for the star.' তবু যদি কোন দিন ক্ষণেকের তরেও এ হতভাগ্যের একটুখানি দুরস্মৃতি দুরস্বপ্ন-সম পাইন্ গাছের পত্রমর্ম্মরের মধ্য দিয়ে ঐ নীল হ্রদের ধারে ঐ দুটি নীল নয়নে একবিন্দু ছায়াপাত করে, তবে আমি ধন্য, আমি ধন্য। ইত্যাদি··।

অনেক রাতে যখন চিঠি শেষ হইল, নীরদ কহিল, "কি খবর রমণী বাবু? জ্ঞানবৃক্ষ বুঝি এবার একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

তিন দিন, চার দিন, এক সপ্তাহ গেল। উত্তর আসিল না। রমণী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাইত কি হইল? চিঠিখানা আর কাহারো হাতে পড়ে নাই ত? দিন দশেক পরে দর্জ্জিপাড়া থেকে এক লাইন চিঠি আসিল, 'দয়া করিয়া দেখা করিবেন'। নীরদ কহিল "কি লিখলেন, একবারটি দেখতে পাইনে।"

রমণী রাগিয়া কহিল, "আপনাদের এরকম প্রবৃত্তি কেন বলুনতো?" নীরদ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল

সন্ধ্যাবেলায় সাক্ষাৎ মিলিল। কহিল "আপনাকে না জানিয়ে ছোট ভাইকে দিয়ে আপনার টেবিল থেকে এই ব্রাউনিংখানা আনিয়েছিলাম, সেজন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। কই, আপনি বলেছিলেন, ব্রাউনিং এর প্রেম-কবিতাগুলো আমাকে একদিন বুঝিয়ে দেবেন, এবার দিন না?

রমণী হাসিয়া কহিল, "ও সব বিএ টিয়ে না হ'লে বোঝানো যায় না।"

—কি বললেন, "বিয়ে না হ'লে বোঝানো যায় না। ও আপনার কথা, রাণু কে বলুন তো?" মুহূর্ত্ত মধ্যে রমণীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া ব্রাউনিংখানার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

—"কে হয় বলুন না?"

রমণী শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "কে হয়, সে আপনি জানেন!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মীনু কহিল, "ওকি উঠলেন যে? বসুন, বসুন। আমার স্বামী আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। আপনার চিঠিখানা আমরা দুজনে মিলেই পড়েছি।"

রমণী তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত মাথাটা একবার তুলিয়া আবার নীচু করিল।

মীনু একটু সরিয়া আসিয়া হাতের মুঠোর ভিতর থেকে একখানা চিঠি বাহির করিয়া কহিল, "আপনি আমাকে যেরকম ভয়ানক ভালবাসেন, তাতে ক'রে আমার একটা কথা নিশ্চয়ই রাখবেন।"

রমণী পাণ্ডুর মুখে ছাত্রীর দিকে তাকাইল। মীনু কহিল, "আপনার চিঠিখানা নিয়ে যান। বাড়ী গিয়ে পড়বেন। যতদিন রাণুকে এরকম লিখিতে না পারেন, কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবেন না। ও শিক্ষা তো আপনার হয়নি। নিন্ চিঠি নিন।"

রমণী যন্ত্র-চালিতের মত চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। মীনু কহিল, "যাবেন না। আমার স্বামী এখুনি এসে পড়বেন।"

রমণী, যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাবে চলিতে [illegible] আসিয়া বলিল, "তা' হলে একটু বসে কিছু খেয়ে যান।"

শরতে

[সুফী মোতাহের হোসেন]

শরৎ আসিল বুঝি, দূরে হেরি নীলে নীল
নির্ম্মেঘ আকাশ।
চঞ্চল বায়ুর স্রোতে ভেসে আসে শেফালির
সুরভি নিঃশ্বাস।
ভাদ্রের ভরন্ত নদী দু'কূল আছাড়ি চলে
আপনার বেগে।
মাটির নিগূঢ় বাণী রোমাঞ্চিত তৃণে তৃণে
হর্ষে ওঠে জেগে।

সুনীল নয়ন তা'র মেলিছে কলমী ফুল,
ফুটিছে কমল;
ঝিঙের অজস্র সারে হরিৎ অঞ্চল খানি
করে ঝলমল।
ধান্যের মঞ্জরী দোলে, সবুজের সমারোহ
শোভিছে অঙ্গনে,—
মেঘ ও রৌদ্রের খেলা সারাদিন দিবাস্বপ্ন
রচিছে নির্জ্জনে।

কাশের উদাস হাসি, অনামা ফুলের গন্ধে
অন্তর উন্মনা;
হৃদয়ে বাজিছে বাঁশী, তরুণী আপন মনে
আঁকে আলিপনা।
অঞ্চল উড়িছে কার! জলে থলে নভতলে
হেরি ছায়া তারি;
তাহারি গোপন ছোঁয়া ফুলে ফলে কিশলয়ে
ফিরিছে সঞ্চারি'।

তাইত' ফুলের হিয়া রূপে রসে বর্ণে গন্ধে
মেলিয়াছে দল।
তাইত' অন্তর-লোকে ভৈরবীর শান্ত সুরে
টুটিছে অর্গল।
আজিকার শ্যাম স্বর্ণে বাদল-ব্যথিত পৃথ্বী
নব জন্ম লভি'
আলোকের বর্ণে বর্ণে বহিয়া এনেছে কা'র
অপরূপ ছবি।
শারদ অতিথি ওগো, হে ক্ষণিকা, জ্যোতির্ম্ময়ী
চঞ্চল অঞ্চলা!
তোমারে বরিয়া নিতে নিখিল-মানব-চিত্ত
আজিকে উতলা।

রামদা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া, সেকালে আমরা মেস করিয়া থাকিতাম। কলেজের সহিত সম্পর্ক বড় একটা থাকিত না। মাসে মাসে বেতন দিয়া গেলেই হইল। প্রত্যহ কলেজ না যাইলেও চলিত। মেসের একজন গিয়া ক্লাশে খবর দিলেই হইল, ওরে নং ৬২ আস্‌তে পারবে না, জ্বর হয়েছে; বুঝেছিস্?

একসঙ্গে হয়ত' পাঁচ সাত জন বলিয়া উঠিবে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে ঠিক হ'য়ে যাবে।

নং ৬২ হয়ত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—তাহার জ্বর ভোগ করিতে লাগিল, কি বাড়ী গেল, কি অন্য কোন কাজ করিতে লাগিল; এদিকে কলেজে দিনের পর দিন, সে একটি করিয়া "পি" পাইয়া গেল। "পি"র মানে 'প্রেজেণ্ট' - অর্থাৎ কিনা সে উপস্থিত আছে।

বিনা টিকিটে দেশ ভ্রমণের মত, সেকালে এই রকম 'পি' অর্জ্জন করাটা ছাত্রদিগের মধ্যে একটা গৌরব এবং বাহাদুরি করিবার বিষয় ছিল।

রেল কোম্পানি "ক্রু" ভর্ত্তি করিয়াছেন দেখি; কিন্তু কলেজ কোম্পানি কি করিয়াছেন তাহা অবগত নহি।

আমাদের রামদা ছিলেন এই ধরণের একটি মার্কা মারা ছাত্র। কেমন করিয়া জানিনা, তিনি 'এলে'র বেড়া ডিঙ্গাইয়া 'বি-এ'তে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু 'বি এ'তে গিয়া তিনি বাবা বৈদ্যনাথের মত, শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই তিনি চতুর্ব্বর্গে ফেল করিতেন; কি ইংরাজি সাহিত্যে, কি দর্শনশাস্ত্রে, কি সংস্কৃত কাব্যে; ফলে টোটালেও তাঁহার পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন থাকিত।

রামদা হাসিয়া বলিতেন, স্কোয়ার, একেবারে চৌকস! আমরা লজ্জিত হইতাম; কিন্তু রামদা'র ও সম্বন্ধে লজ্জা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল।

পরীক্ষায় ফেল হইতে তিনি হয়ত চৌকস ছিলেন, কিন্তু মানুষের সহিত ব্যবহারে তিনি গোলকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, নদীর আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে শালগ্রাম শিলাও গোল হয়; তেমনি কলিকাতা মহানগরীর বিচিত্র আবর্ত্তে আমাদের রামদার চরিত্রের স্বরূপটিও গোল আলুর আকার ধারণ করিয়াছিল।

পাড়াগাঁয়ে কলিকাতা গেজেট একটা মহা বিস্ময়ের জিনিষ। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মামা একখানি গেজেটে আমার নামটি লাল কালিতে দাগাইয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখানি বহু পোষ্টাপিস এবং বহু হাত ঘুরিয়া যখন বাবার হাতে গিয়া পড়িল—তখন তিনি যে আমাকে লইয়া কি করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গৃহে সকলকে প্রণাম করিয়া দীর্ঘায়ু এবং 'সুখে থাকিয়া রাজা হইবার' আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিলাম বটে; কিন্তু তাহার পর কি, তাহা বাবাও স্থির করিতে পারিলেন না।

কলেজে পড়া? আমাদের মত অবস্থার লোক আকাশ হইতে সহজে চাঁদ পাড়িয়া আনিতে পারে, কিন্তু কলেজে পড়া ত'...

এমন সময়ে মামার এক পত্র আসিল। তাহাতে তিনি পৃথিবীর সমস্ত অসম্ভব এবং আকাশ কুসুমকে এক করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বড় বড় জমিদার আছেন, আর আমার মত শিক্ষিত এবং কুল-মর্য্যাদা-বিশিষ্ট পাত্র পাইলে লুফিয়া লইবেন। অতএব আমি যদি কোন ক্রমে মাস কয়েক কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারি তো—মামা লিখিয়াছিলেন—আমার একটা "হিল্লা" করিয়া দিবেন।

পত্রের শেষে তিনি জানাইয়াছেন যে তাঁহার বাড়ীতে স্থানাভাব, দুই চারি দিনের বেশী থাকা চলিতে পারে না। থাকিতে মেসেই হইবে; কারণ বাড়ীর খরচ পত্রে মেসে থাকিয়া কলেজে পড়ে, ইহার অধিক সুপারিশ আর কি হইতে পারে?

বাবা বলিলেন, যা থাকে কপালে, জমি জমা বন্ধক দিয়ে বাঁটুলকে পাঠিয়ে দেবই দেব···

তারপর মার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ।

ফলে, একদিন বোঁচ্‌কা বুচ্‌কি বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাড়ীর সকলের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, এত দূরে, এবং এমন অসম্ভব স্থানে চলিয়াছি যে তাঁহারা আমার বড় একটা আশা রাখেন না। কারণ তাঁহারা স্থির জানিতেন যে আমার অধিক বিদ্যালাভ হউক আর না হউক, একজন জমিদারের ঘর-জামাই ত' নিশ্চয় হইব। আর, ঘর-জামাই-এর উপর অধিক আশা রাখার মত নির্ব্বোধ বাঙ্গালী কোন কালেই ছিল না।

ইষ্টিশানে মামা দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাথায় একটি কাঁচা এবং পাকা চুল, কে যেন সাজাইয়া বসাইয়া দিয়াছে! সে গুলিকে কদম ফুলের মত করিয়া সমান ভাবে কলিকাতার আর্টিষ্ট নাপিত ছাঁটিয়াছে এবং তার উপর পিছনে সর্ফাস টিকি!

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

চায়্‌না কোট, পাকান চাদর এবং পায়ে পেনেলার জুতা!

ভ্যাবাচেকায় মামাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ইষ্টিশানেই, কুলি এবং মানুষের ভিড়ের মধ্যে মামা তাহা কাণ মলিয়া আদায় করিয়া লইলেন। বলিলেন, ওই তো দোষ ইংরিজি পড়ার···ছোঁড়ারা একদম উদ্ধত হয়ে উঠে।

মামার বাড়ীতে স্থান ছিল। কিন্তু মামীর মনটি কচ্ছপের পিঠের মতই; তাহাতে একটি সরিষা দানারও তিষ্ঠিবার উপায় নাই।

ভর্ত্তি হওয়ার পালা সাঙ্গ হইল কোনক্রমে; কিন্তু থাকি কোথায়? মামী দিন দুই উত্তীর্ণ না হইতেই, রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মামাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

পটলাকে সঙ্গে দিয়া মামা বলিলেন, ঐ কলেজ ষ্ট্রীটের আশ-পাশে খুঁজ্‌লে পাবিরে পটলা, ছেলেদের মেসে ভরা ওখেন্‌টা; বুঝেচিস্‌?

পটলের কলের জল এবং বালাম চালের মহিমায় বুদ্ধি অকালেই পক্কতা লাভ করিয়াছিল। সে পড়িত থার্ড ক্লাশে; কিন্তু কথা কহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত।

পটল আমাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল। সে গোলদীঘির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ সিনেট, ওখেন থেকে তোমাকে পাশ দিয়েছে।

চাহিয়া দেখিলাম বড় বড় থাম, যেন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা বিকশিত দন্তে গোলদীঘিকে গিলিতে চায়। মনে মনে হাসিলাম; অতবড় থামের দরকার কি ছিল? মানুষ কি কোন কালে অত লম্বা হ'তে পারে?

পটল বলিল, সায়েবরা যে খুব লম্বা হয়, তোমার মত বাঁটুল নয়তো!

আমরা ডান দিকের ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়াছিলাম, এক জায়গায় পটল আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এটা বোধ হয় মেস্‌। বাড়ীর দুয়ারের উপর লেখা ছিল, দি নেষ্ট।

সে বলিল, চল ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

ভিতরে গিয়া দেখি, এক বুড়ী ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

পটল বলিল, ওগো এটা কি মেস?

বুড়ী কথার উত্তর না দিয়া যেন দাঁত খিঁচাইল। সেই সঙ্গে উপর হইতে এক বাবু বজ্র গর্জ্জনে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ফাজিল, বয়াটে ছোঁড়ার দল, মেস্‌ খুঁজতে ঢুকেছ গেরস্তর বাড়ীর মধ্যে? চল তো দেখি, থানায়···

পটল বলিল, পালাও, ধ'রবে···বলিয়া সে নিমেষে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল, আমি কোনক্রমে তাহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। জনারণ্যের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখিলাম। কোথায় যাইব, কি করিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এতক্ষণে বাবুটিও ফুটপাথে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিলেন, এই, ভেতরে ঢুকেছিলে কেন?

—জানতুম না।

—কচি খোকা! আর সে কোথায় গেল?

—পালিয়েছে!

আচ্ছা, এবার ছেড়ে দিলুম, খবরদার! বলিয়া বাবু চলিয়া গেলেন।

দেখি, ওপারের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া পটল হাসিতেছে, আর আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

তাহার কাছে গেলে সে বলিল, অত বোকা হ'লে এখেনে চ'লবে না। কোনদিন থানায় পাঠিয়ে দেবে তোমায়। জাননা ক'লকেতার লোক সহজে ছাড়ে না।

আমি নির্ব্বোধের মত চুপ করিয়া গেলাম।

২

বহু অন্বেষণের পর সেদিন দ্বিপ্রহরে পটল সংবাদ আনিল যে একটা মেসের সিট খালি আছে। আমার কলিকাতায় আসিতে দেরি হইয়াছিল, তাই সকল মেস পূর্ণ।

তৎক্ষণাৎ আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। কি জানি, দেরি করিলে এটিও বা হাতছাড়া হইয়া যায়!

চাঁপাতলার জটিল গলির গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা একটি বাড়ীর কাছে আসিলাম। দুয়ারের উপর একটা ভাঙ্গা টিনের টুক্‌রার উপর লেখা আছে! Students' Mess, Member Wanted.

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় আমরা হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে সাহস করিলাম না। পটল ধীরে ধীরে কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে শব্দ আসিল, কে? কে? কে কড়া নাড়ে, ঝি, দেখ্‌তো।

আমরা বাহিরে ঝির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন দু'মিনিট পর পাঁচ মিনিট যায়, ঝি আর আসে না।

পটল আবার সাহস করিল।

এবার—বাবু নিজে আসিয়া কপাট খুলিলেন। তাঁহার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, কি চান্, আপনারা?

—সীট খালি আছে?

—কোন কলেজে পড়েন?

—বঙ্গবাসী।

—কোন্ ইয়ার?

—ফার্ষ্ট।

—বাড়ী কোথায়?

বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাবুটি ভিতরে চলিয়া গিয়া সজোরে ডাকিলেন, আপনারা ভিতরে আসুন, বাইরে কেন?

আমার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল।

ভিতরে গিয়া দেখিলাম, যে ঘর হইতে আহ্বান হইয়াছে, তাহার মাথার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ম্যানেজারের ঘর।

ঘরের ভিতরে ঢুকিতে একখানি বেঞ্চ আগাইয়া দিয়া বাবুটি বলিলেন, কিন্তু দুটো খালি নেই; আছে একটি সীট খালি। সেইটেই বেষ্ট সীট্—একটাকা বেশী পড়বে—তেতালায়, দক্ষিণ খোলা; উত্তরে বারান্দা আছে, টু-সীটেড্, দক্ষিণের সীট-টা খালি, তাই একটাকা বেশী।

কত আন্দাজ খরচ পড়বে? আমি প্রশ্ন করিলাম।

সে তো মেম্বারদের ইচ্ছে; যদি ভাল ষ্টাইলে থাকে বেশী খরচ পড়বে।...আমার মনে হয়, এটাতে বাঁকুড়ো বর্দ্ধমান বেশী হ'য়েছে এবছরে, বেশী খরচ হবে না; লাষ্ট ইয়ারে—সিট রেণ্ট আর এস্‌ট্যাব্‌লিস্‌মেণ্ট নিয়ে—গড়ে টাকা প'নের ক'রে প'ড়েছে...মডারেট চার্জ্জ!

বলিলাম, আমি আস্‌তে চাই।

—কবে?

—আজই।

বাবু বলিলেন, এটা ফিল্‌ড আপ্ (filled up) হবার কথা ছিল; কিন্তু ভদ্রলোক এসে পৌঁছ্‌তে পারলেন না।...দুটাকা অ্যাড্‌ভান্স দিয়ে গেলে পেতে পারেন, নইলে বলে দিচ্চি—ডাউটফুল্।

দুই টাকা দিয়া আমরা জিনিষ পত্র আনিতে রওনা হইয়া গেলাম।

পথে পটল বলিল, টাকা তো দিলে রসিদ নিলে না, তার ওপর যে ঘরে থাক্‌বে সে ঘরও দেখ্‌লে না...আমি বলে দিচ্চি, এই ক'লকেতা সহরে পিক্ পকেটে তোমার যদি না পকেট কেটেচে তো আমার নাম পটল নয়, ছুঁচো!

পটলের তর্জ্জনীর কম্পন আজিও যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই!

৩

এই ব্যক্তিই রামদা।

মেসের ছেলেরা কেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ঐ নামেই ডাকিত। মেসের ঠাকুর চাকর কেবল বলিত, মেন্‌জার বাবু; আর ঝি ডাকিত, আমাদের বাবু।

এই মেস্‌টি ছিল রামদার অখণ্ড প্রতিপত্তির লীলা-ভূমি। ঠাকুর চাকর তাঁহার ইঙ্গিতে উঠিত বসিত। শুধু ঝি-টিকে তিনি কতকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

রামদার কলেজ যাইতে হইত না। যদি কোন দিন মর্জ্জি হয়ত' আহারের পূর্ব্বে ঘুরিয়া আসিতেন। বেলা বারোটার পরই তাঁহার আহারের অভ্যাস এবং তাহার পর একটি সুমধুর নিদ্রা দিয়া উঠিয়া তিনি চা-পান করিতেন।

বৈকালে রামদা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া বোধ হয় তাহার সহিত তরল কিঞ্চিৎও পান করিয়া রাত্রে ফিরিতেন। খাবার তাঁহার ঘরে ঢাকা থাকিত। ভাত নহে রুটি। আসিবার সময় রামদা কিঞ্চিৎ রাব্‌ড়ি এবং মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন শুনা যায়

এই সবই তাঁহার নিজস্ব ব্যবস্থা ; মেসের আদি পত্তন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মেসের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, হর্ত্তা কর্ত্তা তিনি, আমাদের অভিভাবক তিনি। মাসান্তে প'নেরো ষোল টাকা দিয়াই আমরা খালাস।

গোড়ায় গোড়ায় মেসের ব্যবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু মাসের পর মাস ক্রমেই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। সে কথার গোপনে আলোচনা হয় ; কিন্তু আমাদের জন কুড়ির মধ্যে কাহারো এমন সাহস হয় না যে, রামদাকে একথা বলে।

খাওয়ার পর তেতালা ঘরে গিয়া আলোচনা চলিত রাত্রে। গোবর্দ্ধন বলিত, আরে মেস চালানর ঝুঁকি কম নয় বাবা, কে চালাবে যদি রামদা ছেড়ে দেয় ?

গঙ্গানন্দ বেঁটে-খাট মানুষটি ; কিন্তু কথায় সে ছোট নয়, সে বলিত, কেন, একজনেই বা করতে যাব কেন ? সবাই মিলে, কাজের ভাগ ক'রে নিলে কি হয় ?

অতুল, ছিপ্‌ছিপে রোগা , চক্‌চকে তার চোখ দুইটি তুলিয়া বলিত, তা হয় না গঙ্গা বাবু, ডিভাইডেড্‌ রেসপন্‌-সিবিলিটি—ভাগের মা শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গা পাবে না। তারিণী শঙ্কর সর্ব্বদাই যেন ওজন করিয়া কথা কহে, সে বলিত, মুস্কিল যে বাড়ীর লিজ্‌টা যে ওর নামে ; যে দিন ইচ্ছে, আমাদের তুলে

গোবর্দ্ধন পি-এল পড়িত, সে একেবারে দাপাইয়া উঠিয়া বলিত, ছেলের হাতের মোয়া কিনা, ইচ্ছে ক'রলেই তুলে দেবে ? এক সেসনের কনট্রাক, পারে না তুলতে বলে দিচ্ছি আমি।

গঙ্গানন্দ বলিত, অত আইনের মারপ্যাচে যাই বা কেন ? আরে সকলে একজোট হয়ে কাজ যদি করি ত', পারে আম'দের সঙ্গে ? উনিশ জন যদি এক সঙ্গে উঠে গিয়ে অন্য মেস খুলি ?

অতুল দুলিয়া দুলিয়া বলিত, আমি বলি ফণ্ড ! ফিনান্স নিয়ে নাও আমাদের হাতে ; বাবা, যদি ওইটি চেপে ধরতে পার তো, শর্ম্মা চিঁচি রব ছাড়বে।

কিন্তু, তারিণীশঙ্কর বলিত, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা, বাঁধে কে ? জান ? ও যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে, আমরা এই জটলা করছি তো ধাঁ ক'রে বামুন চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে আমাদের মহা মুস্কিলে ফেলে দেবে।

গঙ্গানন্দ উত্তরে বলিল, মুস্কিল কিসের মুস্কিল ? সকলে এক জোটে কাজ করলে, কতক্ষণ লাগে বেঁধে নিতে ?

অতুল বলিত, বাবা ! আমায় ক্ষমা কর, ওই নোংরা কাজে আমি নামতে পারব না !

সকলের চেয়ে বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আমিই ছিলাম ছোট, তাই আমি শ্রোতা হিসাবেই থাকতুম। একটা কথা কিন্তু আমার মনে হ'তো ; যদি টাকা কড়ি নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া হয় ত' রামদার চ'লবে কি করে ?

কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার আমার সাহস ছিল না।

একদিন আমাদের রামদা-দলন সভায় অতুল বলিল, আমাদের ফাইট করতে হ'লে ফাণ্ড চাই ! এ দুনিয়ায় ফাণ্ড নইলে কিছুই হয় না।

গঙ্গানন্দ মিটি মিটি হাসিয়া বলিল, আমি এ কথার পূর্ণ অনুমোদন করি, কেননা, ফাণ্ড মানেই হচ্ছে, আর্থিক-একতা !

গোবর্দ্ধন বলিল, আচ্ছা ঐ টাকায় হবে কি ? মাঝে ঝ ভোজ ? যেদিন খাওয়ার জুৎ থাকবে না, সেদিন রাব্‌ড়ী ?

অতুল বলিল, না, প্রথমে একটি নোটিশ-বোর্ড কিনে সেটা ওই ম্যানেজারের ঘরের সাম্‌নে এমনি ক'রে এঁটে দিতে হবে যে সরিয়ে ফেল্‌তে না পারে।···

গঙ্গানন্দ। তাতে লাভ ?

অতুল। ওটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ কিনা রামদাকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করা হবে।

গোবর্দ্ধন। কি রকম ?

অতুল। যেমন, মনে কর, আমরা এক জোটে একটা নোটিশ দেব ম্যানেজারকে যে, মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে আমাদের টাকার হিসেব না দিলে আমরা টাকা দেব না ওর হাতে।

তারিণী। হিসেবও দেবে না ; কি করবে তোমরা ?

অতুল। অন্য একজনকে ম্যানেজার ক'রে, আমরা তার কাছে টাকা জমা দেব···

গোবর্দ্ধন হাততালি দিয়া বলিল, Really, that is a fine idea. I do strongly support Atul.

সেই রাত্রেই চাঁদা উঠিল।

পরের দিন রামদা সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া গেলে একটা কাল রং করা টিনের উপর বড় বড় অক্ষরে নোটিশ-বোর্ড লেখা—নোটিশ বোর্ডটি ম্যানেজারের ঘরের সাম্‌নে কাঁটি দিয়া দেওয়ালে এমন করিয়া মারিয়া দেওয়া হইল যে সহজে কেহ যেন খুলিয়া লইতে না পাবে।

সেই রাত্রে আবার যথা সময়ে মিটিং বসিল।

রাত্রের মিটিং-এ ঠিক হইল যে প্রথমেই নোটিশ-বোর্ডে কোন গুরুতর ব্যাপারের কথা না লেখাই ভাল। আগে দেখা উচিত যে রামদা বাস্তবিক আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কি না।

প্রথম দিনের নোটিশে রামদা ছাড়া আর সকল মেম্বর দস্তখত করিল। নোটিশের মর্ম্ম এই :—

আমাদের বালাম্ চাল খাওয়া অভ্যাস নয়। এই বিষয় আলোচনা ক'রে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করার জন্য আজ রাত্র ৯টার সময় ৯নং ঘরে মিটিং ব'সবে।

সকল মেম্বরের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আমরা জানিতাম যে রামদার পক্ষে সেই সময়ে আসা অসম্ভব না হউক্, অসুবিধাজনক বটে।

কিন্তু ঠিক নয়টার সময় রামদা আসিয়া উপস্থিত। বোঝা গেল যে যত সহজে কার্য্যোদ্ধার করিবার কল্পনা হইতেছিল, তাহা আর হইবে না।

রামদা বসিয়া বলিলেন, আমি ভারি আনন্দ বোধ করছি যে তোমরা এই মেস্‌টাকে একটা নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা ক'রছ। নোটিশ-বোর্ড কিন্‌তে কত টাকা লেগেছে ? ওটা তো এস্‌ট্যাবলিশমেণ্ট থেকেই দেওয়া উচিত।

আমরা আকাশ থেকে পড়িলাম, মনে মনে বলিলাম ; যে রামদাকে আমরা রাবণের মত লড়িয়ে মনে ক'রেছিলুম, সেই রামদাই কিনা এসে বলেন, নোটিশ-বোর্ডের টাকা দেব···না, না, আমরা অন্যায় অবিচার করেছি লোকটার উপর !

অতুল বলিল, আজ আমরা একটা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গড়ে নিতে চাইচি রামদা; কি বলেন আপনি ?

রামদা বলিলেন, নিতে পার কিন্তু সেটা লিগাল, কিনা, আইনসঙ্গত হবে না।

—কেন ? অতুল জিজ্ঞাসা করিল।

রামদা। নোটিশে তো ও-কাজের উল্লেখ নেই। আজ শুধু বালাম চালের আলোচনা চল্‌তে পারে।

অতুল বলিল, বেশ তবে তাই চলুক।

গঙ্গানন্দ বলিল, আমরা মনে করছি, বালাম চালের বদলে দেশী চাল করা উচিত।

রামদা। কেন ?

গঙ্গানন্দ। আমাদের বেলা একটার সময় ক্ষিদে পায়···

রামদা। তাই একটা থেকে দুটোর মধ্যে টিফিন খাওয়ার নিয়ম।

গঙ্গা। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের এরকম ক্ষিদে পেত না।

রামদা। তার কারণ একেবারে অন্য।

অতুল। কি রকম ?

রামদা। বাড়ীতে তোমরা কোন ভেজাল খেতে না, এখেনে তেলে ভেজাল, দুধে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল। এই

ভেজালের সঙ্গে যদি শুরুপাক দেশী চাল চালাও ত' বেলা একটার সময় বুক জ্বালা ক'রে, চোঁয়া ঢেকুর হবে... ক'লকেতায় এসব আমার বহু পরীক্ষার পর পাওয়া অভিজ্ঞতা।...বেশ, তোমাদের ক্ষিদে পায়; আর, আর-কারুর যদি পেট নামে, সে কি করবে?...শাস্ত্রে ব'লেছে যস্মিন্ দেশে যদাচার...চট্ করে এই যে বালাম চাল খাওয়ার ব্যবস্থা, ওটা উল্টে দেওয়া কি ঠিক হবে? দু-একদিন ভেবেই দেখা যাক্ না। তা ছাড়া দিশি চালের দাম বেশী, মেসের খরচ অনেক বেশী প'ড়ে যাবে।...সেটাও ত'...

বলিয়া রামদা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, আজ ছিল কি বার? শুক্র; বেশ, আবার শুক্রবারে মিটিং হবে; আমি নোটিশ বোর্ডে তার নোটিশ দেব;...এ সাতদিন ভেবে দেখা যাক্ না, অগ্র-পশ্চাৎ।

রামদা চলিয়া গেলেন। আমরা অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

তারিণী শুধু হাসিয়া বলিল, রামদা আমাদের গভীর জলের মাছ। বাবা ওকে কাবু করতে হলে হুইল চাই, ভাল বঁড়শী চাই; একি আলপিন বেঁকিয়ে ট্যাংবা ধরা।

৫

পরের রাত্রে রামদার বক্তৃতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের পর দেখা গেল যে, আগা-গোড়াই চাল-বাজি।

অতুল বলিল, তা হচ্চে না, আজই নোটিশে দস্তখত ক'রে কাল ফের মিটিং ডাক। অচিরে ম্যানেজিং কমিটি চাই। বালাম চাল তুলে দিতেই হবে; যদি ওঁর পেট নামে তো তার ব্যবস্থা পরে হবে। এঃ! এতগুলো লোককে ডাহা বোকা বানিয়ে দিলে! খরচ বেশী হয় ত' তার প্রতিবিধানও আছে।

গঙ্গানন্দ। আছেই তো, পালা ক'রে নিজেরা বাজার ক'রবো। ঐ ঝি-বেটি কি কম চুরি করে? আলাদা ভাঁড়ার করতে হবে। রোজ উঠ্‌নো কেনায় লাভ?

গোবর্দ্ধন। আর, কালকের মিটিংএ ঠিক ক'রে নিতে হবে যে, মেসের হিসেব যখন যার খুশী সে চেক্ করতে পারবে। বাঃ, বাঃ, টাকা দেব, আর তার হিসেব পাব না? অত ভয় কিসের? খুঁজলে ক'লকেতা সহরে এক-খানা বাড়ী পাওয়া যাবে না?

গঙ্গানন্দ বলি এ আল্‌বৎ পাওয়া যাবে।

তারিণী বসিয়া হাসে, অত সোজা নয়, অত সহজে রামদাকে কাবু করতে পারা যাবে না ব'লে দিচ্ছি।

অতুল বলিল, তা ব'লে ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাক্‌লেও, রামদা গুড্ বয়ের মত ধরা দেবে না।

নোটিশ লিখে সকলের দস্তখত দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হ'লো।

বিকেলে রামদা ঠাকুরের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে স'রে প'ড়েছেন। তার মর্ম্মটি বড় চমৎকার।

শুক্রবারে মিটিং করায় আপনাদের সেদিন অমত ছিল না। হঠাৎ বিনা খবরে কেন তারিখ বদলে গেল, বুঝতে পারি নে। সে যা হোক্; আজ রাতে মিটিংএ আমি থাক্‌তে পারছিনে, কেন না আগে থেকেই আমার অন্য জায়গায় এন্‌গেজ্‌মেণ্ট। অতএব অনুরোধ মিটিং আজকের জন্যে বন্ধ রাখলেই বড় ভাল হয়।

চিঠি পড়িয়া সবাই বুঝিতে পারিল যে রামদা যে কথা লিখিয়াছেন সেটা খুব অযৌক্তিক নয়। অতএব সেদিন আমাদের আবার বৃথা আস্ফালনেই রাত কাটিল।

তারিণী বলিল, তোমাদের একটা কথা বলি শোন। রাতের মিটিংএ ও খেলওয়াড় লোককে তোমরা কাবু করতে পারবে না, কাল সকালে মিটিংএর টাইম দাও। আর ওঁকে একটা আলাদা নোটিশ দাও,—রাতে এলে ওঁর হাতে দিতে হবে।

তারিণীর কথা ফলে দেখিয়া তাহার পরামর্শ মত কাজ হইল। রাত্রে অতুল এবং গঙ্গানন্দ নোটিশ রামদার হাতে দিতে রাজি হইল।

সকালে দুই রক্তবর্ণ চক্ষু লইয়া রামদা আমার ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মিটিং বসিলে রামদা বলিলেন, তোমরা কি চাও আমি জান্‌তে চাই, তা' বল্‌তে কি কোন আপত্তি আছে?

অতুল কথার উত্তর দিল, আমরা যা হওয়া উচিত তাই চাই...একজনের মত, কি দু'জনের মত, কি কোন ব্যক্তির মতবিশেষে মেস না চলে, সকলের মতামতে মেস চলুক এই আমরা চাই।

রামদা। কিন্তু অবশেষে একজনের হাতেই ত' কর্তৃত্ব এসে প'ড়তে বাধ্য।

গোবর্দ্ধন। তা না'ও হ'তে পারে।

রামদা। সবাই তো আর একজোটে ম্যানেজার হবে না। তা ছাড়া, আর একটা বড় বিচারের কথা আপনি এসে পড়ে···মেস চালাবার যোগ্যতা নাও থাকতে পারে সকলের। মনে কর (রামদা আমার দিকে চাহিয়া বলি-লেন) কি হে? তোমার উপর ভার দিলে চালাতে পার?

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, না বোধ হয়।

গঙ্গানন্দ বলিল, আমি পারি।

রামদা। আমি বল্‌ছি, তা'র চেয়ে, আমি ঢের ভাল পারি।

গোবর্দ্ধন। যেহেতু?

রামদা। আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা। এ মেসের আমি প্রতিষ্ঠাতা; আমি ইচ্ছে করলে এ মেস উঠিয়ে দিতে পারি। নোটিশ দিয়ে তোমাদের সরিয়ে দিয়ে আমি আমার ফ্যামিলি এনে থাক্‌ব এই বাড়ীতে। এ বাড়ী তো আমার হাতে, তোমরা কে?

অতুল কি বলিতে চাহিতেছিল, রামদা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, শুনে নাও আমার যা বলার আছে। আমি বলে দিচ্ছি যে, মেস যেমন চ'লছে যদি চলে ত' চলুক্‌, আপত্তি নেই। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমার হাতেই থাক্‌বে। আর যদি তার বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় কেউ ত' সবাইকে উঠে যেতে হবে। আজ মাসের পনরই, পয়লা থেকে মেস ডিজল্‌ভ ক'রে দেব।···

রামদা আর তিলমাত্র দেরি না করিয়া গর্ব্বিত পদ-ভরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কেবল তারিণী মিটি মিটি হাসিয়া বলিল, আমি তো আগেই ব'লেছিলুম!

৬

মাস কাবার হইতে বড় বেশী দেরি নাই। অতুল এবং গঙ্গানন্দ বাড়ী খুঁজিয়া হায়রাণ হইয়া গেল। সকালে বিকালে দুইজনে শুষ্ক মুখে আসিয়া বলে, বাড়ী পাওয়া গেল না। গোবর্দ্ধন বলে, আমি বলি তোমরা এ বাড়ী ছেড় না, হাতাহাতি করতে আমি প্রস্তুত। দেখি না, কত বড় ওর সাধ্যি; আইন কই? আমি দু'একজন উকিলকে জিজ্ঞেসা করেছি।···তাঁরা বলেন তোমরা কচ্ছপের মত চেপে ব'সে থাক।.. সবাই হাসে গোবর্দ্ধনের কথা শুনিয়া!

কিন্তু গোবর্দ্ধন তলে তলে আর এক কাজ করিয়াছিল। সে বাড়ীওয়ালার সন্ধান করিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলে। বাড়ীওয়ালা বলে, গত বৎসরের একশো টাকা বাকি আছে, যদি এই টাকা শোধ করার ভার নেন তো আমি আপনাদের নামে বাড়ীর লিজ্‌ ক'রে দিতে পারি।

গোবর্দ্ধন এ কথা আমাদের রামদা-দলন-নৈশ-সভায় পেশ করিলে সকলের চক্ষু উঠিল চড়ক গাছে। এক-শো টাকা!

আরে! গোবর্দ্ধন বলিল,—কুড়ি জন মেম্বর আছি, মাসে এক টাকা ক'রে যদি বেশী দি'তো পাঁচ মাসে যে ক্লীয়ার হ'য়ে যায়।

তা বটে! কিন্তু রামদার দেয় টাকা, গত বৎসরের টাকা আমরা শুধে মরি কেন! এমন একটা প্রশ্ন সকলেরই মনে যেন মাথা উঁচু করিয়া উঠে! লোকটা সারা বৎসর পেজুমি করিল, আর তাহার দণ্ড আমাদের ঘাড়ে!

ইতিমধ্যে নোটিশ বোর্ডে আমাদের ঘন ঘন নোটিশ চলিয়াছে। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে হিসাব চাই। নতুবা ছয় তারিখে অন্য ম্যানেজার বাহাল হইবে···ইত্যাদি ইত্যাদি···

রামদা সেদিকে ফিরিয়াও চাহিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না।

কিন্তু পাঁচ তারিখ অবধিও যাইতে হইল না।

পয়লার সু-প্রভাতে দেখা গেল বামুন চাকর ঝি পলাতক এবং রামদার ঘরের কপাট দুটা হাঁ করিয়া খোলা—যেন প্রাণবায়ু দীর্ঘকাল আগেই নির্গত হইয়া গেছে!

বিস্ময়ের চেয়ে বিব্রত হইয়াছিলাম সকলেই; শুধু গঙ্গানন্দ ছাড়া। সে বলিল, যাক্‌ বাঁচা গেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল

গোবর্দ্ধন রাগে নাক ফুলাইয়া বলিল, তারপর পথ্যের ব্যবস্থাটা করলেই ত' ভাল হয়, কবরেজ মশাই!

গঙ্গানন্দ বলিল, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভাল নয়, আজ হরিমটর!

অতুল উত্তেজিত হইয়া বলিল, কিন্তু চোরটাকে ত' ধরতে হবে···একটা খবর দিলে হয় না?

তারিণী বলিল, রামঃ—ওকাজ করতে আছে? তারপর, হুগলী ঘর করতে করতে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে!··· তোমাদের রামদাকে চিনতে দেরি আছে···

এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে বড় বেশী দেরী হইল না। প্রথম নম্বর আসিলেন বাড়ীওয়ালা, তাঁহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল, রামদার অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি ওসব কিছু জানিনে, আপনাদের আমি বাড়ী দখল ক'রে থাকতে দেখছি, টাকা আদায় আপনাদের কাছেই ক'রবো; উকিল আছে, আদালত আছে···

গোবর্দ্ধন ছিল আইনজ্ঞ, সে বলিল, আদালত কিছু আপনার কেনা নয়; বিচার কেমন ক'রে পেতে হয় তা' আমরা জানি।···

বাড়ীওয়ালা চলিয়া যাইতে না যাইতে আর এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি নোট বইয়ে আমাদের নাম বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া লইবার প্রস্তাব জানাইলেন।

কেন? গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল।

বাবুটি বলিলেন, ওপরের হুকুম।

ওপরটা কে শুনি?

তিনি বলিলেন, সে কথা শুনে একটুও মনে সুখ পাবেন না।···মনে করলে ও খবর জোগাড় ক'রে নিতে আমার দেরী লাগবে না।···কেন মিছে একটা শত্রুতা হবে? দেখছি, আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক!

তার গম্ভীর মুখ আর রাশ-ভারি ধরণ দেখিয়া আমাদের মনে ভীষণ সন্দেহ হইল; মনে হইল, একটা নূতনতর বিপদের মধ্যেই বুঝিবা পড়িয়া গেলাম।

উঠিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, রামচন্দ্র চাটুয্যে কে? চেনেন?

চিনি বই কি মশাই। আমাদের সাত বাঁশ জলের তলায় ফেলে, কাল রাত্রে চম্পট দিয়েছেন, রামদা!

বটে! তিনি বলিলেন, আপনারা বেশ সাবধানে থাকবেন। এর বেশী আর এখন আমি কিছু ব'লতে পারিনে। কলকেতা জায়গা খারাপ। অচেনা, অজানা ছেলেদের সঙ্গে মেলা মেশা করবেন না।

তিনি চলিয়া গেলে সকলের মুখ কালো হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন কাপড় চোপড় পরিতে পরিতে বলিল, আচ্ছা কিন্তু ধোঁকা দিয়ে—আমাদের—নাম ধাম জেনে গেল··· আমি একা হ'লে একটা ফাইট করতুম...

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেলে আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে রামদার তত্ত্বটা অবিলম্বে সংগ্রহ করার প্রয়োজন; কিন্তু তাহা কোন উপায়ে হয়?

তারিণীশঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, অসম্ভব।

অতুল বলিল, হোপলেস হ'লে চ'লবে কেন? আছে উপায় আছে; চল আমরা গিয়ে সেই বেটা বামুন চাকরের খোঁজ ক'রে তাদেরকে ধরিগে···তাদের কাছে সব সন্ধান পাওয়া যাবে···

তারিণী বলিল, কিন্তু ঝিটা বোধ হয়, খুব কাছাকাছি কোথাও থাকে···প্রায়ই তাকে এই ছুতোর পাড়ায় দেখতে পাই।

গঙ্গানন্দ বলিল, ওরা কিছু ব'সে পায়ের উপর পা দিয়ে খাবে না, ওরা কোথাও চাকরি জুটিয়েছেই। এই সময় বাজারে গেলে ঝির সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।

কথা অতি সু-যুক্তি পূর্ণ। আমরা বাজারের দিকে অগ্রসর হইবার পথেই দেখি, একটি খোলার ঘর হইতে কে বাহির হইতে হইতে আমাদের দেখিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

গঙ্গানন্দ গিয়া দোরে ঠেলা দিয়া ডাকিল, ঝি, ও-ঝি!

দরজা খুলিয়া গেল, একটী ছিন্ন খাটিয়ার উপর ঠাকুর বসিয়া! হাতে একটী থেলো হুঁকো!

আমাদের দেখিয়া ঠাকুর আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল।

অতুল বলিল, এখুনি পুলিশ ডেকে বেটাকে বাঁধাও, ওকে ছাড়া নয়···ওই বেটাই সকল নষ্টের গোড়ায় আছে···

ঠাকুর কাছে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার কি দোষ বাবু? রাম বাবু বলে, ওখানে কাজ করলে আমার পেছনে গুণ্ডা লাগাবে···

গঙ্গানন্দ। একথা তুমি আমাদের ব'লে এলেই পারতে···

ঠাকুর। ওটা আমার ভুল হয়েচে।

অতুল বলিল, ভুল, ঠিক, সবই পুলিশ বুঝে নেবে··· নৈলে বল কোথায় আছে তোমার রামবাবু; না বল্লে আমরা তোমায় ছাড়চিনে।

ঝি বলিল, চল বাবু আমি তোমাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আসিগে। যাইবার সময় ঝি একটা কি ইসারা করিল, বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইল। অতুল বলিল, তোমরা দুজনে যাও···আমি থাকৃচি···নৈলে বেটা ইতিমধ্যে খ'সে যাবে।

বাড়ীটার সন্ধান মিলিল বটে কিন্তু তালা দিয়া রামদা কোথায় গিয়াছেন। সেটাও মেস, কেহ বলিল, বাড়ী গেছে; কেহ বলিল, আজ সকালেই ত' দেখেছি।

গঙ্গানন্দ আমার কাণে কাণে বলিল, ধাঁ ক'রে গিয়ে সবাইকে ডেকে আন, আমি আছি।

মেসের সকলে একত্রিত হইলে, প্রথমে দুই মেসের ছাত্রদের মধ্যে বহু বচসা হইল; কিন্তু একে একে অবশেষে সকলেই বুঝিল যে রামদা একটা ভীষণ ধাপ্পাবাজির চাল চালিয়াছে। আমাদের নির্ব্বোধ পাইয়া পথে বসাইয়াছে!

সন্ধ্যার সময় আমরা জিনিষপত্র সমেত আমাদের মেসের তেতালায় তুলিলাম রামদাকে।

রামদা তখন একেবারে নরম হইয়া গেছেন। বলিলেন, আমি মেসের ভার তোমাদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি আছি···তবে একশো টাকা বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে দিতে হবে।

এবার গোবর্দ্ধন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, তোমার বদ্‌খেয়ালির আক্কেল দেব আমরা—রামদা-খুড়ো?

হো হো শব্দে হাসি উঠিল।

তা হচ্চে না।

তবে? তবে? রামদা বলিলেন—তবে,—আমাকে ম্যানেজারির জন্যে মাসে দশ টাকা ক'রে মাইনে দাও। আমি মাসে মাসে হিসেব দেব।

অতুল বলিল, আর তোমার চার্জ্জ? খাই খরচ? সিট রেণ্ট?

ও আমি কোনদিন কোন মেসে দিইনে! রামদা অম্লান বদনে বলিলেন।

জোচ্চোর! তারিণী চেঁচ'ইয়া উঠিল, শয়তান!

তোমার জিনিষপত্তর কোথায় গেল, ঘরে ত' কিছুই নেই! গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল। না বল ত' সকালে পুলিশে খবর দেব···

সকালে ঠাকুরের ঘর হইতে রামদার জিনিষপত্র বাহির হইল। যথা:—

(১) একটা বক্স-হারমোনিয়াম।
(২) রামদার মৃতা স্ত্রীর এক জোড়া বালা।
(৩) একটা আংটি।
(৪) একটা কুর্‌ভাইজার ঘড়ি আর চেন।

সেগুলো বন্ধক দিয়া আশী টাকা আদায় হইল। বাকি কুড়ি আমাদের মাথায় পড়িল।

রামদাকে ইহার উপর টিকিট করিয়া দিয়া বাড়ী রওনা করিতেও আরো কিঞ্চিৎ খরচ হইয়াছিল।

রামদা-দলন সভার অধিবেশন হইল সেরাত্রে অতিশয় জুৎমত ভাবে।

অতুল একটি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত লেক্‌চার ঝাড়িল। তাহাতে সে দেখাইল যে দুনিয়াতে ভাল মানুষীটা একটা বোকামি মাত্র! পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ সভ্য হইয়া পড়ে। তাহারা উচিত কথা কহিতে জানে না। মনে করে, অসভ্যতা হইবে। টাকা দিয়া টাকার হিসাব না লওয়ার মধ্যে চোরকে আস্‌কারা দেওয়া হয় এবং নিজের আলস্য বাড়ান হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে বক্তৃতার মর্ম্ম সকলে গ্রহণ করিতে পারে নাই নিশ্চয়। কারণ অতুল তাহাতে নিজের পাণ্ডিত্যই দেখাইয়াছিল।

আমরা প্রায় ঘুমাইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় দরজায় কে ঘন ঘন কড়া নাড়িল।

সেই বাবুটি আসিয়া বলিলেন, ভাল কথা, কাল রাম চাটুর্য্যের ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি—জানেন আপনারা?

সকলে বলিল, ইস্! সেটা আমাদের মনে ছিল না তো…ভারি…ভু…

—কেন? তাঁকে পেয়েছেন নাকি?

—তিনি আজকেই বাড়ী গেছেন ..

—বাড়ী কোথায়?…

আমরা বলিলাম,—বোধ হয়…ফরিদপুর…কি, না, না বরিশাল বোধ হয়…

বাবুটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, লোকটা ভীষণ জোচ্চোর, একটা দোকান থেকে পাঁচশ' টাকার মাল উঠিয়ে নিয়েছে—আঃ ভারি ফস্‌কে গেল তো? আচ্ছা, যাবে কোথায়, আমার হাত থেকে!

কয়েকদিন পরে গঙ্গানন্দ আসিয়া সংবাদ দিল, জানিস্? রামদা বাড়ী যায় নি…

—তবে? তবে?

সে বলিল, সেই বাবুটি তার…ভায়রা!

দুৎ!—যত বাজে খবর…

মাথা নাড়িয়া গঙ্গানন্দ বলিল, একটুও না; স্বচক্ষে দেখেছি…কেষ্টা এখন ওদের বাড়ীতেই কাজ করছে; সেই বল্লে।…আমিও দেখ্‌লুম, দুজনে ব'সে বেড়ে চা খাচ্ছে!

কেষ্টা ছিল আমাদের মেসের চাকর;—রামদার প্রিয়তম সাগ্‌রেদ্।

তারিণী এবার কোন কথা কহিল না; কিন্তু তাহার দুই চক্ষু এমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল—যে তাহার দীপ্তিতে আমরা বুঝিলাম, রামদাকে বুঝিবার শক্তি বাস্তবিকই আমাদের ছিল না।

তাজ-স্বপ্নে

[শ্রীগোপাললাল দে]

ম্লান কক্ষ, স্রস্ত শোভা, ত্রস্তপদে সঞ্চরে মরণ
দীপ ধূপ পুষ্পাসব বিপর্য্যস্ত, গললগ্না প্রিয়া,
কহিছে কাতর কণ্ঠে, 'শ্যামা ধরা, হায় কতক্ষণ;
এখনি চলিব ছাড়ি! সে ব্যথাও রয়েছি সহিয়া;

তোমারে ছাড়িয়া যাব, ভুলে যাবে মোরে প্রিয়তম,
এ ব্যথার কোথা তুলা?' 'মিথ্যা, মিথ্যা, প্রেমময়ী অয়ি,
সত্তারে হারাই যদি মিলায় সে সন্ধ্যারাগসম,
জন্মান্তেও ভুলিব না আঁখি দু'টি চিরস্বপ্নময়ী।'

আর এক শেষ নিশি; পরপারে যমুনা-সৈকতে,
কে ঘুমায় শুচিবাসে? বীজন করিছে বনবায়;
কে গায় বন্দনা-গান? পুষ্পরাশি ঝরে কোথা হ'তে?
স্বপ্নালোক-ম্লান, তবু মুখখানি যেন চেনা যায়।

অকস্মাৎ সে সঙ্গীত পরশিয়া স্বর্গদ্বারোপরি,
মূরছি রহিল স্থির স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ করি।

নখ-দর্পণ

[শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল]

মেয়েদের জটলা বসে—।

সভার উদ্বোধন পিসিমাই করেন। নতুন দিদি হন বক্তা।

বিষয়-বস্তুটা আরম্ভ হয় প্রথম সমাজ-নীতি থেকে। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েলি তুক্‌তাকে এবং বৈরাগী-সন্ন্যাসীর কাছে 'মন্তর' নেওয়ায়।

রান্না বান্না সম্বন্ধে আলোচনা করেন সাধারণতঃ ও-বাড়ীর মেজ গিন্নী

মেয়েরা সবাই সাগ্রহে কাণ পেতে শুনে যায়, সমবয়সী-দের সঙ্গে কানাকানি করে, অলক্ষ্যে গা টেপাটিপি করে' হাসি চেপে থাকে। নতুন দিদির কথা শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল্ ধরে' যায় ছোট ছেলেমেয়ের মাথা খাবার তিনি ওস্তাদ।

—ধন্যি আমাদের খগেন মিত্তির! বেটার বিয়েতে একেবারে দুয়ে দুয়ে নিলে গা? পোড়া দেশ থেকে মেয়ের বিয়েতে টাকা নেওয়াটা কবে উঠবে না?

কে একটা মুখরা মেয়ে ওপাশ থেকে বল্‌ল—তুমি আর বলো না নতুন দি'—নিজের বেলায় তুমিও সাত কাহন! ছোট ছেলের বিয়েতে তুমিই বা কি কম নিয়েছ শুনি? বলে অমন সবাই!

আ পোড়ারমুখি, আমাকে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা কচ্ছিস। কই বলুক দেখি কেউ এখানে, একটি পয়সা কেমন আমি ঘরে তুলেছি? তবে হ্যাঁ, গয়নাগাঁটি না দিলে বউকে বার করব কেমন করে' লোকের কাছে! মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে হবে ত?

সঙ্গিনীকে থামিয়ে দিয়ে বিমলা একটুখানি দুষ্ট হাসি হেসে বল্‌ল—একই কথা! টাকা নাওনি, গা-ভোর গয়না নিয়েছ,—তুমিই আসল ব্যবসাদার!

নতুন দিদি এবার গেল একটু দমে, কিন্তু পরক্ষণেই বল্‌ল- লোকের মেয়ে বলে' তোকে রেহাই দেবো না বিম্‌লি। বিয়ের ব্যবসা বরং চলে কিন্তু বিয়ের আগে তুই যা দেখাচ্ছিস তা আর এখানে কায়ো জান্‌তে বাকি নেই। কি ভাগ্যি যে পাকা ব্যবসাদার তুই ন'স্।

হঠাৎ এই আকস্মিক দংশনে বিমলা বজ্রাহত হয়ে চুপ করে' গেল। সুমুখে একঘর মেয়ে, যথাসম্ভব আত্মগোপন করতে গিয়েও তার মুখখানা ফ্যাকাসে ও কালীবর্ণ হয়ে এল।

নতুন দিদি নতুন প্রসঙ্গ তুলে আবার অন্য পথে চলে' গেল। কিন্তু বিমলার প্রতি তার এই কদর্য্য ইঙ্গিতটা ঘুরে ঘুরে সবার কাণেই কেমন যেন বিসদৃশ হয়ে বাজতে লাগল।

হাওয়াটা ধীরে ধীরে হাল্‌কা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ এড়িয়ে বিমলা যে কোন্ এক সময় উঠে চলে' গেছে তা তখনকার মত কেউ জানতেও পারল না।

এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যেতে হলে রাস্তা পার হয়ে আসতে হয়। বিমলা এসে ফটকের মধ্যে ঢুকল। দুধারে লাল ও শাদা পাঁচ-পাপড়ি এবং দোপাটি ফুলের কেয়ারি-করা বাগান। বিমলা অকারণেই তার মধ্যে ঢকে খানিক ক্ষণ টহল্ দিয়ে বেড়ালো। চোখের জল সে আর সামলাতে পারছিল না: কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ী ঢুকে সরাসর ওপরে নিজের ঘরে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে দেখল, মা মোহনভোগ তৈরী করছেন আর তারই সুমুখে মেঝের ওপর বসে অবনীদা গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানি বিলাতী মাসিকপত্রের চিত্র-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছে।

ছেলেটির সঙ্গে একবার তার চোখচোখি হল, তারপর বিমলা মুখ ফিরিয়ে ওপরে উঠে গেল।

—হ্যাঁ তারপর? ছবির চর্চ্চা ওদের দেশে খুব, কেমন সেদিন কোথায় যেন পড়ছিলাম, ওদেশে সাহিত্যের চেয়ে চিত্রেই বেশি উন্নতি হয়েছে! ছবির রাজ্যে অনেক ওলোট পালটই ওদের হয়েছে, কেমন?

হুঁ!

মা বললেন—মুখপোড়া মেয়ের মোহনভোগ পড়ে রইল, কোথা গেল কে জানে

অবনী বল্‌ল—ওপরে গেল যে এইমাত্র!

—দেখলি নাকি?

—হুঁ।

তবে বাছা এইটে দিয়ে আয় ওকে একবারটি। দশবার ডাকলে তবে ও-মেয়ে নামবে। যা বাছা।

আমাকে দিয়ে তোমার মেয়ের সেবা করাবে মাসিমা? বরং এ বাড়ীতে যখন এসেছি তখন আমাকেই ওর এনে দেওয়া উচিত।

মাসিমা হাসতে হাসতে বললেন—হাওয়া বদ্‌লে গেছে।

মোহনভোগের রেকাবিটা হাতে নিয়ে অবনী ওপরে উঠে গেল।

গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে বিমলা বিছানার ওপর শুয়ে ছিল। অবনী ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো। পায়ের কাছে এসে একটু হেসে বিমলার পায়ের তলায় সে সুড়সুড়ি দিল। পা শক্ত করে' বিমলা পড়ে রইল কাঠের মত।

অবনী বল্‌ল—মাসিমা বলছিলেন তুমি মুখ ফুটে কাউকে কিছু বল না। কেন বল ত শুনি?

বিমলা তবু রইল চুপ করে'। অবনী হঠাৎ বল্‌ল—তা বলে তোমার অসুখ বিসুখ যে কিছু হয়নি এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি বিমলা।

বিমলা এবার মাথা তুল্‌ল। বল্‌ল—আমার শরীর কি পাথরে গড়া?

অবনী হেসে বল্‌ল—শরীরটা নয়, মনটা।

বিমলাও এবার না হেসে থাকতে পার্‌ল না। আস্তে আস্তে উঠে বসে বল্‌ল—তোমার জন্যে আজকাল লোকের কাছে আমায় যা তা শুনতে হচ্ছে। এসব আমার ভাল লাগে না কিন্তু। বাঃ আজ যে একেবারে চক্‌চকে হয়ে আসা হয়েছে! হঠাৎ? বিয়ে করতে যাওয়া হচ্ছে নাকি?

ইঙ্গিতটা অবনী বুঝে একটুখানি হাসল। তারপর নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—কি করব বল, বড়লোকের বাড়ী আসতে গেলে—

—থাক্ হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে থাকা কেন হুকুমের অপেক্ষায়। বসো না ওই চেয়ারটায়।

অবনী বল্‌ল—মহারাণীর জয় হোক্।

অবনীর হাত ধরে' বিমলা একটু হেসে মচ্‌কে দিল। টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে বল্‌ল—আজ এত রাজভক্তি যে?

মুখ টিপে অবনী বল্‌ল—রাণী প্রীতি!

বিমলাকে সে যে সত্যিই ভালবাসে এ আর না বললেও চলে। প্রতিদিনই সে প্রেম গভীর হতে গভীরতর রূপ নিয়েছিল। বিমলাকে দেখলে তার মুখের কথা যেত থতিয়ে, বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করত। একাকী ঘরের মধ্যে বসে বিমলাকে স্ত্রীর মত ক'রে নিয়ে মনে মনে সে ঘর বাঁধত, সংসার করত; কল্পনায় তাকে নিয়ে সে বহু দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে' বেড়াত।

অবনী সৎপাত্র সন্দেহ নেই। চারটে পাশ, পরিচয়ে কুলীন, স্বভাব চরিত্র বয়স-ধর্ম্ম অনুযায়ী আল্‌গা নয়, ঔদ্ধত্য-হীন তারুণ্যে বিনম্র—ছেলে সে ভালই। কিন্তু তার আর্থিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। একটা যা হোক অর্থকরী কাজ জুটিয়ে নেবার জন্য সে অনেকদিন থেকে চেষ্টা কচ্ছিল।

বিমলা বল্‌ল—বাবা আজ সকালে তোমার কথা বলছিলেন। কিছু সুবিধে হল?

অবনী বল্‌ল—সুবিধে হলে নিজেই বলব। আমি কি করি এ-কথা জিজ্ঞেস করলে মাথা আমার কাটা যায় বিমলা। এতকাল ধ'রে একই প্রশ্নের উত্তর আর দেওয়া যায় না।

—বাবাকে তাহলে কি বলব?

অবনী তার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকালো। তারপর বল্‌ল—ব'লো যে অবনীদা দিন কয়েকের জন্যে একটা কাজ পেয়েছিল, কিন্তু সে কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

—মিথ্যে কথা বলব?

—হ্যাঁ ব'লো, আমি কিছুদিন চাকরি করে' যে কিছু রোজগার করতে পেরেছিলাম, এটা অন্ততঃ লোককে জানিয়ে আমার মান রেখো বিমলা।

বিমলা করুণ চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অবনীর দিকে চেয়ে থাকতে তার ক্লান্তি আসত না। তার চোখের চাহনিটা বিমলার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। অবনী কেমন ক'রে চুল আঁচড়ায়, তার ঈষৎ তামার রঙের গোঁফ, মুখের দু তিনটে দাগ, জামার গলার বোতামটা সে লাগায় কি না—এক দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে এগুলি সে পর্য্যবেক্ষণ করত!

মনে হতো বিমলার চোখের ভেতর দিয়ে মনটা যেন ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অবনীর জন্ম লোকনিন্দাকে সে গৌরব মনে করে।

মা-বাপ ছিলেন উদার। অবনী যে বিমলাকে ভালবাসে, একথা তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছিলেন। বাঙালী ঘরের চল্‌তি রীতি নীতিকে তাঁরা তেমন আমল দিতেন না। এ দুটি তরুণ-তরুণীর সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় একটু হেসে তাঁরা চুপ ক'রে যেতেন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমা হচ্ছিল। আস্তে আস্তে বিমলার মাথাটি নিজের কাঁধের ওপর থেকে দু'হাতে তুলে ধ'রে অবনী বল্‌ল—চল বাইরে যাই, মাসীমা ডাকছেন।

বিমলা ধড়মড়িয়ে উঠে বল্‌ল—চল।

ছাদের আল্‌সেয় ঠেস দিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু আগে গল্প ক'রে মা নীচে নেমে গেছেন। বাবা আছেন বৈঠকখানায় গড়গড়া হাতে নিয়ে।

বোধ করি পঞ্চমী তিথি। পশ্চিম দিকে মৃদু চাঁদের আলো একটি আব্‌ছায়া তৈরী করেছিল। সব বোঝা যায় কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। শরৎকালের হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

অবনী বল্‌ল—আর আমার চলে না বিমলা।

বিমলা বল্‌ল—কেন?

—না, আর চলে না। নিজেকে বয়ে আর বেড়াতে পাচ্ছিনে, এবার পরের বোঝা বইতে ইচ্ছে হচ্ছে। অন্যের নিঃশ্বাসের হাওয়ায় কবে নিজে নিঃশ্বাস নেবো সেই দিনটির কথা ভাবছি। আর আমার দিন চলে না!

বাঁ হাতে বিমলা তার কোমরটা বেড়ে ধরেছিল, অবনীর গলার আওয়াজ শুনে চোখে তার জল এসে পড়ল। ঢোক গিলে বল্‌ল—বিয়ে করতে চাও?

—হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোনো উপায়ে নিজের অবস্থার সঙ্গে বোঝা পড়া করতে পাচ্ছিনে।

—বিয়ে ক'রে চালাবে কেমন করে? শ্বশুর বাড়ী থেকে টাকার আশা ক'রে থাকবে?

—না, আমি শুধু ভিক্ষে করবার শক্তিটুকু চাই। স্ত্রী না থাকলে ভিক্ষে ক'রে তৃপ্তি নেই!

বিমলা বল্‌ল—আর কেউ হলে এ কথা শুনে তোমায় পাগল ঠাওরাতো। বিয়ে করবে তুমি ভিক্ষে করবার জন্যে?—না হেসে সে আর থাকতে পারল না।

কথাবার্ত্তা এবং আলোচনা তাদের এমনি করেই হয়। প্রথম প্রেমের প্রলাপ এবং বিকার তাদের মাথার ভেতর থেকে কেটে গিয়েছিল। ইতিপূর্ব্বেই তারা যেন স্বামী-স্ত্রীর মত হয়ে গেছে। তাই পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে মাদকতার চেয়ে শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির ভাবই ছিল কিছু বেশী।

অবনী ডাক্‌ল—বিমলা?

বিমলা মুখ তুল্‌ল।

—কি ভাব্‌চ?

—তুমি যা বলছিলে এতক্ষণ। তুমিও পিছিয়ে রইলে, আমিও এগোতে পাচ্ছিনে। যদি তিরিশ টাকা আন্দাজ আয়ও করতে তুমি, তাহলেও আমি সকল দিকের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারতাম।

কানে কানে অবনী বল্‌ল—আর তার আগে যদি তোমায় বিয়ে করি?

—সে কি! বেকার অবস্থায় পরের দান নিলে যে আমার মাথা হেঁট হবে! যৌতুকের টাকা নিয়ে ঘর বাঁধার চেয়ে গাছতলায় দাঁড়ানো ভাল!

অবনী বল্‌ল—মূর্খ নই, আত্ম সম্মান সম্বন্ধে দুজনেই আমরা সচেতন, কিন্তু অবস্থা মানুষকে সব চেয়ে বেশি অপমান করে।—যাক্‌ ও কথা, দারিদ্র্যের কথা ব'লে আজকের এমন সন্ধ্যাটাকে আমরা নষ্ট করব না, এসো।

দুজনে এক জায়গায় এসে বসল। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত কেটে যাবার পর বিমলা একটু হেসে বল্‌ল—মেয়েগুলো ভারি জ্বালাতন করছে।

অবনী বল্‌ল—আর তোমাদের নতুন দিদি?

—ওর কথা আর ব'লো না। মানুষকে অপমান করেই ওর খ্যাতি!

ঘণ্টাখানেক পরে নীচে থেকে মায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল—অবনী আজ খেয়ে দেয়ে যেও, নেমন্তন্ন কচ্ছি। বিমলা, নেমে আয় মা!

দিন পনেরো পরে অবনী একদিন নিজেই এসে খবর দিল, তার একটি মাষ্টারি জুটে গেছে।

বিমলার বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন—ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে ত ?

অবনীও হেসে জবাব দিল—সত্যি মেসোমশাই, বিশ্বাস না হয় আপনি ছাত্র সেজে আমাদের ইস্কুলে যান, আমি আপনাকে পড়াতে যাবো।

মা খুসী হয়ে বললেন—ঘরটা এবার ফিট্ ফাট্ করে' গুছিয়ে ফেলগে।

অবনী বল্‌ল—দোরে আল্‌পনা দেবো নাকি মাসিমা ?

দূর থেকে চোখ পাকিয়ে বিমলা তাকে শাসন করে' দিল।

মা বললেন—মঙ্গল-ঘট বসাতে সবুর সইছে না ? সবাই হাসতে লাগল।

আড়ালে ডেকে বিমলা বল্‌ল—মাইনে কত, জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছে।

অবনী বল্‌ল—দুজনের মন্দ চলবে না, আবার একটা টিউশনি পাবার কথা আছে। সময়টা বোধ হয় একটু ভাল পড়েছে বিমলা।

বিমলা বল্‌ল—ভবিষ্যতের উন্নতির আশা ?

—সে অনেক দূর। তোমরা একটা সম্ভাবনা নৈলে থাকতে পারো না দেখছি।

তারপর বিমলাকে কাছে টেনে এনে বল্‌ল—আজকে আর লজ্জা নয়! সবাই জানুক যে তুমিই আমার স্ত্রী!

বাবা আড়ালে ডেকে মাকে বললেন—শাঁখ বাজাতে আর কতদিন করবে ?

—মাস দুই। ছেলেরা রয়েছে বিদেশে, এত সব করবে কে ? একটি মাত্র মেয়ে, আমি ঘটা করে' বে' দেবো।

কর্ত্তা বললেন—শতকরা নিরেনব্বই জনের মত হুজুগে তুমি নও জানি কিন্তু—না, বিয়েটা তুমি সেরেই দাও সরোজিনী। ছ'মাস আগেই আমি ওদের বিয়ে দিতাম, কিন্তু তোমার জন্যেই—

সরোজিনী চোখ পাকিয়ে মুখে হাসি এনে স্বামীর কাছ থেকে উঠে যাবার সময় বললেন—বুড়ো বয়সে তোমার এ অস্থিরতা কেন ? মেয়েরও অধম!

কর্ত্তা হাসলেন। বললেন—কাছের দৃষ্টিতে চাল্‌সে ধরে' দূরের দৃষ্টি গেছে বেড়ে। অতীতের দিক থেকে ভবিষ্যতের দিকে ফিরেছি। বুঝলে ? চেয়ে এখন ফলাফলের দিকেই বেশি নজর। তুমি চোখ খুলে থাকো তাই অনেকটা দেখতে পাও, আমি চোখ বুজে থাকি তাই দেখতে পাই সমস্তটা।

মা ভেতরে চলে গেলেন। হেঁয়ালী তিনি ভাল বাসেন না! বলে গেলেন—তুমি বেশী বুদ্ধিমান!

—আত্মীয় স্বজন অবনীর বিশেষ কেউ ছিল না, সুতরাং হঠাৎ একদিন এক পিসিমা আবিষ্কৃত হয়ে এলেন। অনেক ভাঙাচোরা ছিল অবনীর জীবনে, সেগুলি একে একে মেরামত করা চলতে লাগল। সময়ের হিসাব, নিয়মের আনুগত্য—ঘড়ির কাঁটা ধ'রে চলতে লাগল। রাত করে' বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ দিতে তার আনন্দ হতো। ছোট ছোট তিরস্কারকে সে হেসে হেসে মাথা পেতে নিতে লাগল। পিসিমার মায়া মা'র চেয়েও কিছু বেশি।

একদিন বিবাহের ঠিক হলো।

বাজারে ঘুরে ঘুরে অবনী নানা রকম সৌখীন জিনিসপত্র কিনতে বেরোলো। বন্ধু বান্ধবদের শুভ সংবাদ দিয়ে এল। গৃহ সজ্জার নানা উপকরণ এসে জমা হতে লাগল—বিমলা এসে যখন সমস্ত গুছিয়ে রাখবে, অবনী তখন অনাহূত মধুর সমালোচনা সুরু করে' দেবে। এবং বিমলা যে কেমন করে' চোখ রাঙিয়ে তাকে তিরস্কার করবে সেই কথা ভেবে সে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মালা-বদলের দিনটি আসন্ন হয়ে এসেছে। অবনী তার একটি বন্ধুকে দিয়ে সরোজিনীকে চিঠি লিখে পাঠালো—'মাসিমা, নিজে যেতে ইচ্ছে হ'ল না কারণ উৎসবের বাঁশী আমাকে লক্ষ্য করে' বাজতে সুরু করায় নিজেকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হচ্ছে। দূত পাঠালাম, টোপর মাথায় দিতে হ'লে আর কি কি প্রয়োজন হয় লিখে পাঠাবেন। পিসিমার মমত্ববোধ আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই।'

আধঘণ্টা খানেক পরে বন্ধুটি আবার ফিরে এল। মুখ তার পাংশু, শুষ্ক। মাথা হেঁট করে' এসে দাঁড়াল।

—কই দেখি কি লিখলেন মাসিমা ? বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলি অমরেশ ?

অমরেশ জীবনে বুদ্ধির কাজ করেনি। বোকার মত বল্ল—হুঁ, তারপর বাইরে দাঁড়াতে বল্লেন।

—বাইরে? আমার বন্ধুকে—প্রথমে চিন্‌তে পারেনি বুঝি? চিঠি দিয়েছিলি?

—হুঁ, না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

অবনী হঠাৎ দু'তিনবার কাশ্‌ল। তারপর অবিশ্বাসের সুরে হাসবার চেষ্টা করে' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্ল—কেন? অপরাধ?

অমরেশ চুপ করে' রইল।

অবনী অধীর হয়ে বল্ল—কি বললেন কি শুনি?

অমরেশ একবার এদিক ও'দিক তাকালো। পরে বল্ল—আমাকে এসে অপমান করে' তাড়িয়ে দিল।

গায়ে জামাটা চড়িয়ে অবনী পথে নেমে পড়ল। মিনিট পনেরোর রাস্তা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সদর দরজায় ঢুকে দালানের কাছে এসে ডাকল—মেসোমশাই?

উত্তর নেই। আরো খানিকটা এগিয়ে এসে—এই যে মাসিমা, আমি এলাম—ব'লে সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কয়েকটি অবরুদ্ধ মুহূর্ত্ত, তারপরই সরোজিনী ফেটে চৌচির হয়ে উঠলেন—লজ্জা করে না? ও-মুখ নিয়ে সদর দরজার কাছ থেকে এ-পর্য্যন্ত আসতে পা কাঁপ্‌লো না?

অবনী কি একটা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করতেই তিনি আবার চীৎকার করে' উঠলেন—স্বাধীনতাকে এমনি করে' পায়ে থেঁৎলাতে হয়? তুমি না লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে?

মনে হলো এতদিনকার সমস্ত স্নেহ-মমতা মাসিমার নিঃশেষে মুছে গেছে।

—যাও, গোবর-জল দিয়ে এ-বাড়ী থেকে তোমার পায়ের দাগ মুছে ফেল্‌বো—চলে' যাও।

অবনী মাথা হেঁট করে' বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে কয়েক পা সে যখন এগিয়েছে এমন সময় তার পায়ের কাছে সুতো-বাঁধা একটি গুলি-পাকানো কাগজ এসে পড়ল। হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে ওপর দিকে তাকাতেই জানালার কাছ থেকে বিমলা তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে ভেতর চলে' গেল।

এই প্রকাণ্ড শহরের আনাচে কানাচে উন্মাদের মত অবনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কে যেন তাকে চাবুক মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। চোখে তার নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, আহার ছিল না। বিবাহের এত বড় আয়োজন তার মাথা থেকে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গিয়েছে। লক্ষ টাকা দিলেও জনসমাজে মুখ দেখাবার তার আর উপায় নেই। সে সমাজদ্রোহী, নীতিজ্ঞানহীন, প্রেমকে সে চিরদিনের মত অপমান করেছে। রাস্তায় চলতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছি ছি করে' যাবে। কোথাও বসে কিছু ভাবতে তার ভয় করে। পিসিমা কিছুই জানেন না, তবুও তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার মাথা কাটা যেত।

অনেক রাত্তে লুকিয়ে সে ঘরে এসে ঢোকে। অন্ধকারে বসে থাকলে শত শত দৈত্য-দানব যেন তাকে তাড়া করে' আসে। আলো জ্বেলে নিজের মুখ প্রকাশ করতেও তার ভয় করে। ঘরের মধ্যে সে তিষ্ঠতে পারে না, মনে হয় ঘরখানা ক্রমশঃ ছোট হয়ে তাকে যেন চেপে মেরে ফেলতে চাইছে; বাইরে গিয়ে মনে হয় কুৎসিত রাক্ষসীর মত সেই ভয়াবহ চিন্তাটা ধারালো নখে তাকে আঁচড়াবার জন্য এগিয়ে আসছে। তার মুক্তি নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই—সমস্ত জীবন তার কাছে ব্যর্থ, রুক্ষ, মরুভূমির মত হয়ে দেখা দিল।

একদিন অবনী স্থির করল, সে আত্মহত্যা করবে।

গঙ্গার জলে গিয়ে ডুবতে তার ইচ্ছা হল না, লোকে তুলে বাঁচাতে পারে। আগুনে পুড়তে গেলে ধোঁয়ার গন্ধে লোক ছুটে আসবে। গাড়ী চাপা গেলে হাঁসপাতাল থেকে বাঁচিয়ে আনবে। ছাত এমন কিছু উঁচু নয় যে, মাটীতে পড়লে মৃত্যু হবেই। হয়ত হাত-পা ভেঙে বেঁচে উঠবে! সে তখন ঠিক করল, বিষ খাবে।

বাস্, অমনি সে পয়সা নিয়ে বাজারে ছুটলো। আফিং আন্‌লো, তার সঙ্গে কিছু দড়ি। বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে' থাকবে।

বাড়ী এসে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে অবনী দরজাটা বন্ধ করে' দিল। তেলের সঙ্গে সে প্রথমে

আফিং গুললো। তারপর একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কড়িকাঠের আংটায় বেশ করে' পাকিয়ে দড়ি বাঁধলো। আর মৃত্যুর এমন চমৎকার পন্থা যে সে এত সহজে আবিষ্কার করতে পেরেছে এজন্যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে' উঠ্‌ল। তারপর টুলের ওপর বসে বিষের পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে তার মনে হলো—বিমলা!

সর্পাহতের মত উঠে তাড়াতাড়ি বিষের বাটিটা নিয়ে সে জান্‌লা গলিয়ে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। এ কাপুরুষতাকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল কেমন করে'?

জানলা দরজা খুলে দিতেই বাইরের হাওয়া ঢুক্‌লো। সে তখন আলো জ্বেলে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। চিঠি শেষ করে' খামে পুরে ঠিকানা লিখে সে যখন রাস্তায় নেমে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে বাড়ী ফিরে এল, রাত তখন আড়াইটে।

সে রাতে ঘুমিয়েছিল সে নিশ্চিন্তমনে।

যথা সময়ে সে পত্র বিমলার হাতে গিয়ে পড়লো। খোলা একখানি বেয়ারিং চিঠি।

তিনটি দিন এবং তিনটি রাতের পর—

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে আকাশ সেদিন ভেঙে পড়েছিল। অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার আর বিরাম ছিল না। জলো হাওয়া বইছে হু হু করে'—তার সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন।

খান দুই কাপড় পুঁটলির মত করে' পাকিয়ে হাতে নিয়ে বিমলা চোরের মত নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়ীর সবাই তখন ঘুমে অচেতন। মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে সে একবার তাকালো,—রাস্তা ঘাট জলে জলে চক্‌চক্‌ করছে। গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে সে একবার দেখল, পথে জন মানবের চিহ্নমাত্র নেই। বর্ষায় চারিদিক ধূ ধূ করছে। না, আর দেরি নয়। পিছন দিকে একবারটি তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল।

অলি গলি পার হয়ে সে বড় রাস্তায় এল। সামনেই ডাকঘর, তারপর ছেলেদের ইস্কুল, সেটা পার হয়ে খানিকটা গিয়ে কালীবাড়ী, তারপর আর খানিক এগোলেই বাজার। বাজারের পর ট্রামডিপো, সেটা পার হয়ে বড় বাগানটার দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে সে এসে দাঁড়াল।

অবনী ভূতের মত কোথায় অপেক্ষা করছিল, এগিয়ে এসে বিমলাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে প্রায় চীৎকার করে' উঠেছিল আর কি! বল্‌ল—অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। রাত দেড়টার গাড়ী, এসো। ওই যে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে!

দুজনে খানিক এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে সাড়া এল—দাঁড়াও হে, একটু দাঁড়াও অবনী।

ভয়ানক চম্‌কে উঠে ফিরে তাকিয়ে অবনী দেখলো মেসোমশাই!

মেসোমশাই এগিয়ে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—আগে ক্ষমা চেয়ে নিই, তোমাদের চিঠিখানা খুলে' আমাকে পড়তে হয়েছিল অবনী, কারণ ওটা একবারটি পড়া দরকার। আমি আসছিলাম এতক্ষণ তোমার স্ত্রীর পেছনে পেছনে। দেখলাম, পথ সে হারালো না!

অবনী কম্পিত কণ্ঠে বল্‌ল—মেসোমশাই—

তিনি বললেন—কিন্তু তুমি একটু ভুল করলে। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা তেমন ভাল নয় নৈলে একটা ভাল পথ বাৎলে দিতাম—যাক্‌। তবু চাকরিটা ছাড়বার আগেই ভবিষ্যতটা ভাবলে পারতে। আমি শুধুই বুড়ো নই, বার্দ্ধক্যটা পার হয়ে এ-কালেও অনেকটা এগিয়ে এসেছি। যে ঘটনাটা তোমাকে নিয়ে আমার পরিবারের মধ্যে ঘটে গেল এটা অত্যন্ত পুরোনো। পুরোনো বলেই এটা নতুন। এর গতিতে বাধা দিলে চলবে না, সাহায্য করতে হবে। ভালবাসাকে সইবো অথচ তার ফলাফলটাকে বাদ দেবো এত বড় অবিবেচনা আমার নেই। এই নাও, হাত পাতো—এই যা দিচ্ছি, এর সুদেই আপাতত তোমাদের চলবে। কাজ একটা কিছু ক'রো নৈলে তোমাদের সম্বন্ধের ভেতর থেকে ফেনা উঠবে!

রুদ্ধকণ্ঠে বিমলা বলল—বাবা!

—চুপ কর মা, তোমার সঙ্গে কথা বলবার দিন আমার চলে' গেছে।—না না, প্রণাম চাইনে, আমি পুরোনো দলের লোক, অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রণাম নিয়ে ন্যায়রত্নদের অপমান করবো না!—এবার তোমরা এসো গে। কোথায় চললে এ আমি আর জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু যতদূরেই যাও, আমার আশীর্ব্বাদ থাকবে তোমাদের পাশে পাশে—আসি তবে।

পিছন ফিরে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। শ্রাবণ-রাত্রির আকাশ থেকে তখন আবার ঝর ঝর করে' বৃষ্টি নেমে এসেছে!

আকাঙখা

[শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ]

তোমার চলার সাথে ছায়া হ'য়ে চলিয়াছি আমি,
হৃদয়ের শূন্যতায় তোমার আসন দিছি পেতে ;
শিথিল বুকের মাঝে তোমারে ধরিতে চাই বেগে,
মরণের স্বপ্ন হ'তে আবার জীবনে আসি' নামি।

আমার জীবন আমি পৃথিবীতে দিয়েছি এলায়ে,
পৃথিবীর সাথে আমি করেছি নিবিড় পরিচয় :
আকাশের সাথে আর আকাশের তারাদের সাথে,
জেগে জেগে আমি শুধু জীবনেরে রয়েছি জড়ায়ে।

সাধ করে' পৃথিবীতে আমি ব'য়ে এনেছি যৌবন,
যৌবনের স্বপ্ন দিয়ে আকাঙ্খারে করায়েছি স্নান ;
আকাশের মত মোর জীবনের প্রশান্ত বিস্তার,
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাতে ফুটে' ছিল তারার মতন।

জীবনে বাড়িল বেলা হৃদয়ের আকাশের তলে,
আবার জ্বলিয়া ওঠে কামনার উত্তপ্ত উত্তাপ ;
হৃদয়ের ধারা শুষে' রস চাই রস চাই শুধু,
হৃদয়ের তীরে তীরে আমার পিপাসা শুধু জ্বলে।

শুনেছি অনেক গল্প রূপকথা রাজ-কুমারীর,
যা'দের হৃদয় শুধু আলো দিয়ে গড়েছে বিধাতা ;
রাতের তারার মত আঁখি যা'র প্রশান্ত সুন্দর
এলায়িত কেশ যার কুয়াশার মতন গভীর।

সময়ের সাথে সাথে আমিও চলেছি থেমে' থেমে',
তুমি তো ফুরায়ে গেলে তবু মোর কথা কি ফুরায় ;
পৃথিবীর মাঝে আমি খুঁজেছি স্বপ্নের ইতিহাস,
রাজ কুমারীর স্বপ্ন তবু মোর চোখে আসে নেমে'।

তবুও হৃদয় ঘিরে কেন মোর জীবনের পারে,
অসময়ে নিয়ে এলে মরণের নিশ্চয়তা শুধু ?
জীবনের গাঢ় স্বপ্ন ম্লান হ'য়ে মিথ্যা হ'য়ে আসে,
যে স্বপ্নের গাঢ়তায় এতদিন গড়েছি আমারে।

আমার কপালে আজ পরাজয় কেন দিলে এঁকে ?
তোমার উৎসাহ দিয়ে কেন মোরে করিলেনা গাঢ় ?
সাধ করে' কেন মোরে সাধিলে না দু'টি হাত ধরে ?
তোমার আকাঙ্খা দিয়ে কেন মোরে রাখিলেনা ঢেকে ?

বিজয়িনী

[শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়]

১

সেদিন সেই অত্যাচারিত মেয়েটি সমাজের দ্বার থেকে তাড়িত হ'য়ে যখন পথে এসে দাঁড়াতেই বাধ্য হল, তখন তার মনে হ'ল যে তার মাথার মধ্যে কে যেন অসংখ্য মশালের আলো জেলে দিয়েছে। চোখে তার একবিন্দু জল ছিল না, দাঁতে দাঁতে একবার শুধু খট খট ক'রে শব্দ হচ্ছিল,—আর চোখে তার বিদ্যুতের মত কী একটা দীপ্তি।

কি ভাবছিল সে কে জানে! মধ্যে মধ্যে যাঁরা সমাজের মাথা, যাঁরা তার পরম আত্মীয়, যাঁরা তাকে অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন নি—কিন্তু আজ চরম শাস্তি দিয়ে, পথে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন—তাঁদের বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

তারপর সে বেশ সহজ ভাবেই চলে এসে—গ্রামের শেষ সীমায় যে একটা নিরালা জলার মত ছিল সেখানে এসে নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে রইল।

রাত্রি এগারটায় গ্রামের শেষ ট্রেণ কলিকাতার দিকে যায়; সে কিছুক্ষণ আগে এসে ষ্টেষনে দাঁড়াল, একটু কি ভাবলে,—তারপর হাতের সোণার রুলী দুগাছির দিকে চেয়ে দেখলে, সে দুটী খুলে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে সে টিকিট ঘরের সমুখে এসে দাঁড়াল, বেশ স্পষ্ট স্বরে বল্লে, "বাবু আমি বড় গরীব, নগদ টাকা আমার কাছে নেই, আমার বাপের বড় অসুখ,—এখনি এই গাড়িতে আমায় কলকাতা যেতে হবে, আমার এই রুলী ভরি তিন চারের হবে—আপনি দেখুন এ প্রায় নূতনই আছে,—নিয়ে আপনি আমায় টাকা প'নের কুড়ি যা হয় দিন্ না; আর একটা কল্কাতার টিকিট।"

টিকিট আর যে ক'টি টাকা সে পেলে, হাতের মুঠায় নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল—চেয়েও দেখলে না সে কত পেয়েছে। তারপর ট্রেণ এল, কত লোক উঠল-নামল, সেও সেই সময়ে সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে, হাতের মুঠায় শেষ সম্বল কয়টি মাত্র টাকা ও টিকিটখানি নিয়ে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে—অনন্ত পথের যাত্রী হ'য়ে চলে গেল।

২

"আপনি কি জানেন না যে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। কেন তবে এমন ক'রে আমায় ব্যস্ত ক'রে তুলেছেন? থিয়েটারের অভিনেত্রী আমি—সংসার এইখানে আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—কিন্তু আমি···"

"সে আমি জানি, আজ তিন বছর ধ'রে আমি এই খোঁজ নিয়ে চ'লেছি। আমি আসি আবার কাজের মধ্যে ফিরে যাই—আবার আসি; এ আপনার পথ নয়—অনুপায়ে এ পথ আপনি ধ'রেছেন; আমার দুঃখ দেখে ধৈর্য্য দেখে, ম্যানেজার বাবু এ টুকু আমায় বলেছেন, আমার কাতরতা দেখে আপনাকেও অনেক ক'রে অনুরোধ ক'রেছেন—দয়া করুন, একবার বুঝতে চেষ্টা করুন এ শুধু আমার লালসা নয়, আমি···"

"দেখুন, আমি যাই হই তবু সংসারের আবর্জ্জনা মাত্র। এত বড় ভার, এত বড় বোঝা মাথায় তুলে নেবেন না; আপনার মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি সব যাবে। নিঃস্ব হ'য়ে দানপত্র বরে সর্ব্বস্ব আপনার আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন—জানিনা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে কত দিয়েছেন, তবে তার পরিমাণ যে অনেক বেশী—তা অনুমানেই আমি বুঝতে পাচ্ছি,—না হলে থিয়েটারের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে তাঁরা ছেড়ে দিতে চাইতেন না, বিশেষ ম্যানেজার বাবু আমায় সেই প্রথম দিন থেকেই বাপের মতই স্নেহ করেন। তবু আপনি ভেবে দেখুন—বিবাহ আমার হতে পারে না—আমি বিবাহিতা, হয় ত সে স্বামী আমার বর্ত্তমান···"

"থাকুন বর্ত্তমান, তবু আপনি তাঁর কেউ নন; যে স্বামী এমন···"

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক—তিনি আর আমার কেউ নন, তবু বিবাহ ত আর হ'তে পারে না। আপনার জাতি আপনার সমাজ···"

"থাক, আর নয়, জাতি সমাজ আমার! মুখ তুলে চেয়ে দেখুন, শুনে সহ্য করতে পারবেন ত? আমি হীন জাতি আপনি জানেন,—তবু—কতখানি হীন জানেন কি আপনি?

আমি,...আমি জাতিতে রজক তাও হীন শ্রেণীর, কোলিয়ারীর আয় আমার কোটী কোটী টাকা হলেও সমাজের নিম্নস্তরে আমার স্থান, সমাজ আমায় লজ্জিত ঘৃণিত ক'রে ছেড়ে রেখেছে; বিয়ে আমি করিনি—আমার আর এ ভার বাড়াতে ইচ্ছা ছিল না, বিশ্বের পায়ের তলায় আমায় ফেলে রেখে—সমস্ত সংসার দিন রাত আমায় দেখিয়ে বলছে ওটা চাষাধোপা..."

"থামুন-থামুন, আর নয়, আমায় মার্জ্জনা করুন এই দুঃখ দেওয়ার জন্যে। অনন্ত বাবু, আমি জানতুম না আমার চেয়েও দুর্ভাগ্য সংসারে আছে! আর আমার আপত্তি নেই, আসুন আমায় এই ফেণিল উচ্ছ্বাসের মধ্য থেকে তুলে নিন্, আমায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিন, আমি ক্লান্ত অবসন্ন, ও দানপত্র আমি চাই না—কিছু চাইনা, চাই আপনার সবল বাহুপাশ। প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে রক্ষা করতে করতে আমি ক্লান্ত, আর পারি না; মানুষ আপনি—আপনার বড় হওয়ার সমস্ত ইতিহাস আমি শুনেছি, মানুষ আপনি, আপনাকেই আমি চাই—আমি আপনার সংসার গড়ে তুলব।"

"এস রমা, আজ এই হার তোমার গলায় দিয়ে তোমায় বরণ করে নিই, এই আমাদের বিবাহ; এস, হাত ধর, আমায় তুমি পথ দেখাও।

"এস, তোমায় প্রণাম করি, বিলেতের জাহাজ কবে ছাড়বে? আমাদের বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত কর।"

৩

উনিশ বছর পরে কোথাকার জমিদার, সেই নন্দীগ্রামের জলার ধারের প'ড়ো জমিটা কিনে প্রকাণ্ড এক বাড়ী তৈরী করাচ্ছেন; সে যেন ইন্দ্রপুরী প্রস্তুত হচ্ছে, জলাটাও দীঘিতে পরিণত হয়েছে, চারিপাশে তার বাগান তৈরী হচ্ছে; গ্রামের সমস্ত লোক, বিস্ময় পুলকে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখত, এত যার সম্পদ, এমন যার বাসস্থান না জানি তারা কেমন! কর্ম্মচারী যারা এ সব করাচ্ছে তারাও বিশেষ কিছু জানে না, একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধানে আসেন। তিনি নাকি কিছু কিছু জানেন; তিনি বলেন—তাঁর বাবুর এমনি বাড়ী কত স্থানেই আছে, তবে সে সব বড় বড় সহরে, এখানে এই ক্ষুদ্র গ্রামে কেন যে বাবুর আবার বাড়ী করার সখ হ'ল কে জানে! তবে বড় লোকের খেয়াল, ওত আর বলা যায় না, পল্লীগ্রামেও নাকি একটা চাই।

কল্পনা আর কল্পনা, সমস্ত গ্রামবাসী দিন রাত ওই এক জমিদারের বিষয় নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বাস করছে।

ক্রমে বাড়ী তৈরী শেষ হ'য়ে গেল, প্রকাণ্ড ঘোড়া জুড়ি গাড়ি তাও এসে গেল, চাকর দাসী নিযুক্ত হ'ল; আজ কতক জিনিসপত্র কতক লোকজন এসে গেছে, কাল গৃহস্বামী সপরিবারে আস্‌বেন, সমস্ত লোক উন্মুখ-উৎসুক ভাবে পথ চেয়ে আছে।...

ওই—ওই ট্রেণ এসে গেল, ওই তাঁরা এসেছেন। একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একটি সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক ও একটি তেমনি সৌম্যমূর্ত্তি মহিলা নেমে দাঁড়ালেন, সমস্ত লোকজন ষ্টেষনে অপেক্ষা কচ্ছিল,—সকলেই সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলে।

বাড়ী ষ্টেষনের খুব নিকটে, তাই গাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে বাড়ীর দিকে নিয়ে চল্‌ল,—দুজনেরই কি সৌম্য-শ্রী! মুখে কি মিষ্ট হাসি, সমস্ত গ্রাম প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল।...

সপ্তাহ মধ্যে নূতন জমিদারের বাড়ীতে সমস্ত গ্রামবাসীর নিমন্ত্রণ। তাঁরা নূতন গৃহ-প্রবেশ ক'রছেন সেই জন্যে এই আয়োজন। সহর থেকে ভারে ভারে নানা জিনিস আস্‌ছে, সমস্ত গ্রামবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করছে, আবার নাকি একটা নাচেরও বন্দোবস্ত হয়েছে।

এম্‌নি সুবন্দোবস্ত যে, বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, সমস্ত লোকের বিরাট আহারের ব্যাপার সমাধা হয়ে গেল। দীন দুঃখী অন্ন-বস্ত্র দুই পেলে, ধন্য ধন্য রবে সমস্ত গ্রাম মুখর হয়ে উঠেছে, বাহির বাড়ী আলোকমালায় সজ্জিত হচ্ছে, নাচ হবে। এখন পণ্ডিত-বিদায় শুধু বাকী, এ গ্রামে পণ্ডিত ত' আর বেশী নেই—বেশী সময় লাগবে না।

গৃহস্বামী সস্ত্রীক সমস্ত তত্ত্বাবধান করছেন, এমন কি অত বড় ধনীর গৃহিণী কার কি চাই ব্যস্ত হ'য়ে নিজে দিয়ে দিয়ে বেড়িয়েছেন; মিষ্টান্ন-জল-পান প্রভৃতি, আর কি মিষ্ট কথা মিষ্ট হাসি! তাঁর সুদৃশ্য চওড়া লাল পাড় শাড়ীর অঞ্চলটুকু, যেন বিদ্যুৎপ্রভায় সর্ব্বত্র এখনও চমকে

ফির্‌ছে, সুগৌর কপালে ঘর্ম্ম বিন্দু মুক্তার মত স্তরে স্তরে কে যেন নিপুণ হস্তে সাজিয়ে দিয়েছে।

তাঁদের একটি মেয়ে কল্‌কাতা থেকে আজই ভোরে এখানে এসেছে, আর দু'তিনটি গৃহস্বামীর বন্ধুও সেই সঙ্গে; মেয়েটির বয়স তের চৌদ্দ হবে, লোকে দেখছিল এরা কি সুন্দর! কিন্তু লজ্জা যেন এদের বড় কম, এরা যেন একটু নূতন ধরণের লোক—বিশেষ ক'রে তাদের গ্রাম্য সমাজে।

"আচ্ছা মিষ্টার দাস্, আপনি কি ভেবেছেন বলুন ত? এ অসহ্য। মিসেস্ দাস্ একে কিছুদিন একটু সেরেছেন, না হয় পরিশ্রম কর্‌তে ভালই বাসেন—তা ব'লে একি! আমি আপনার ফ্যামিলি ডাক্তার, সেই অধিকারে শুধু বল্‌ছি এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে আপনাদের। এত পরিশ্রম—"

"কি করি বলুন না? কিছুতে কি শুন্‌বে, রমা, লক্ষ্মীটি আর নয়, তুমি এইবার ব'স।"

হাসিতে সমস্ত ঘরটি উজ্জ্বল ক'রে মেয়েটি ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধর্‌লে, "মা মা, এইবার তুমি ব'স, বল আমায় কি কর্‌তে হবে, আমি করি—"

মায়ের মুখও স্মিত হাস্যে ভরিয়া গেল, "তাই কর যূথি, আজ যদি অমৃত এখানে থাক্‌ত—সেই এ ভার নিত; সেও বিলেতে, তুইই নে, পণ্ডিতমণ্ডলীকে টাকা দিয়ে তুই সম্মান দেখা, দেখ, যূথির হাত দিয়েই ওঁদের প্রণামী দিয়ে দাও—"

"দেখ মা, প্রণাম কি আমি কর্‌তে পার্‌ব? আমি ত জানি না সে…"

পিতা, মাতা, ডাক্তার, পিতৃবন্ধু কয়জন সকলে হাসিয়া অস্থির; সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ত অবাক্! এ আবার কি, এত বড় মেয়ে প্রণাম করতে জানে না!

ডাক্তার সস্নেহে ডাকিলেন, "দেখ যূথি, তোমার মাকেই দাও ওসব কর্‌তে, তুমি আমার কাছে পালিয়ে এস।"

"দেখুন ত ডাক্তার কাকা, সবাই হাসছেন। মা যে বল্‌লেন অমৃত করত, না না দাদামণি কক্ষণও পার্‌ত না—সেই কি কখনও করেছে—"

গৃহস্বামী আদর ক'রে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন, স্নেহভরা কণ্ঠে পত্নীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "রমা, ওরা যে সত্যিই এসব জানে না, আমার ছেলে মেয়ে দুটীই যে আমারি মত পাগল।"

"তুমি আরও আদরে আদরে পাগল কর্‌ছ ওদের, আর যূথি, প্রণাম কর্‌তে হবে না রে প্রণাম করতে হবে না, শুধু গিনিটা রেখে হাত তুলে নমস্কার করবি, বুঝলি? দেখুন আপনারা কিছু মনে করবেন না, তা করবেন না যে তা আমি আগেই বুঝেছি, তা না হ'লে বিলেত ফেরতের বাড়ীতে আপনারা ব'সে পান। আর প্রায় সব আমাদেরি দেওয়া। অমৃত থাক্‌লে মহাখুসী হ'ত, সে সমাজের এই উদারতা বড় বেশী প্রচার ক'রে বেড়ায়; সে বলে, হিন্দুর আগের জড়তা আর নেই—"

সমস্ত লোক সভয়ে, বিস্ময়ে, ব'লে উঠ্‌ল, "বিলাত? বিলাত ফেরৎ?"

দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে, রমা সহজ সুরে উত্তর দিলেন "হ্যাঁ তাইত, আমরা অনেক দিন সেখানে ছিলুম কি না। আমার ছেলে-মেয়ে ওরা সেখানেই জন্মেছে, আমার ছেলে অমৃত সে আঠার বছরের, সে সেখানেই পড়ছে, মেয়েও সেখানেই পড়ছিল, এই দেড়মাস হ'ল ও এসেছে, প্রথম ত আমরা বোধ হয় আট দশ বছর সেখানেই ছিলাম, তারপর মধ্যে মধ্যে আমরা এ দেশে এসে বেড়িয়ে গেছি। বছর তিন হ'ল আমরা বেশীর ভাগ এদিকেই আছি। যাক, দেখুন রাত হ'য়ে গেল,—এখন এসব কথা থাক; আমার যূথি-রাণী, এইবার দাও ত মা, ওই ওঁকে—ওঁকে আগে দাও—"

প্রৌঢ় পণ্ডিত শ্যামলাল বিদ্যারত্ন মূর্চ্ছিত হয়ে হঠাৎ প'ড়ে গেলেন। সে কি শুধু বিলাত ফেরতের বাড়ী প্রণামী নেওয়ার ভয়ে? কে জানে!

গান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আজ শরতের মেঘভাঙা ওই রৌদ্র-ঝলমল!
অর্ঘ্যডালায় কে সাজাল ব্যথার শতদল?

কা'র আঙুলের ছোঁয়া লেগে
দলগুলি তা'র উঠ্‌ল জেগে?
না চাহিতেই বিলিয়ে দিল
বুকের পরিমল?

শউলি বনের মনের কথা ধরায় লুটালো,
রঙীন ভোরের সোনার স্বপন মন যে ভুলালো।

কাঁচা রোদের অনুরাগে
আগমনীর সুর যে জাগে,
ঘরের মায়ায় উদাসী মন
উতলা চঞ্চল!

ধানের ক্ষেতের ঢেউ লেগেছে মনের কিনারায়,
পথ-ভুলান বাঁশীর সুরে ডাক্‌লে কে আমায়?

ফেরার পথে দেখ্‌রে চেয়ে
হারান সুর কে যায় গেয়ে,
বুকের কাঁপন জাগ্‌ল আবার
চক্ষে আসে জল।

"ফটিক জল"

[শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়]

ঠিক দু'পহর বেলা
খর বৈশাখে কাঠফাটা রোদ
আগুনের হোলি খেলা!
বিশুষ্ক লতা, ঝ'রে পড়ে ফুল
আতপ্ত ধরা তলে,
বনের পাখীরা কুলায় আড়ালে
দেহ লুকাইতে চলে।
আকুল পিয়াসে আকাশ ভেদিয়া
উঠে গো কাহার বাণী—
দে 'ফটিক জল' দে 'ফটিক জল'
কোথা জল নাহি জানি।
আকাশের পানে চাহিয়া ফুকারে
নাহিক মেঘের লেশ
এ দারুণ তৃষা কে মেটাবে তোর
যাতনার কোথা শেষ?
শ্রাবণ-ধারায় রহিয়া রহিয়া
ঝরিবে অমৃত ধারা
আন বারি তাই নাহি চাও ধনি
অসীমে আপনা হারা।
মহাজন-বাণী মরমে মরমে
গাঁথা বুঝি তব বামা
"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা।"

শারদীয় পল্লী-পূজা

[শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়]

বিদায় লইবার পূর্ব্বে বর্ষা তাহার বিজয়বার্ত্তা হাটুরিয়া গ্রামখানিতে ঘোষণা করিয়া গেল। জলে পথ ঘাট ডুবিয়া গিয়াছে, চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাজারে যাইবার আঁকাবাঁকা রাস্তাটিতে একখানি দীর্ঘ বাঁশ হেলিয়া পড়িয়াছে এবং এইখানে স্রোতা-বেগের জন্য নৌকা যাতায়াতের অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু কেহই উহা কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে নাই। বাজারও বর্ষার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই—রমণী পালের ঘরে চোরের মত জল প্রবেশ করিয়া উঁকি মারিতেছে। বাজারের অপর পার্শ্বে ঘোষেদের বাড়ী এবং মধ্য দিয়া রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া 'মরাগাঙে' পড়িয়াছে। জল স্রোতে ঘোষেদের মাটির বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম নৌকাযাত্রীদের করুণার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। দূরে 'মরাগাঙে' মাল বোঝাই বহু বিদেশী নৌকা নোঙর করিয়া রহিয়াছে—সন্ধ্যার আগমনে এই সমস্ত মহাজনী নৌকা হইতে দীপালোক জলের উপর সোনার রেখা টানিয়া দেয় এবং বিদেশী মাঝির পরুষকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি পরিচিত নদীটির স্বচ্ছ হাসির কল্লোলের সহিত মিশ্রিত হইয়া দীপখচিত সন্ধ্যাকে ব্যগ্র আনন্দে অধীর করিয়া তোলে।

হাটুরিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস। এখানে দশ এগার বাড়ীতে পূজা হয়—তন্মধ্যে রায়দের প্রতিমাখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং অধিক সমা-রোহের সহিত পূজা নির্ব্বাহ হয়।

একদিন অতি প্রত্যূষে দেওড়িরা পাঁচ জন একখানি ডিঙ্গি নৌকা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে আসিল। রায়দের বৃদ্ধ গোমস্তা অনাথ সরকার চণ্ডীমণ্ডপের দরজা খুলিয়া দিল—দেওড়ি কাঠামের ওপর শনের সাহায্যে 'জরা' বাঁধিতে লাগিল। গ্রামের ছেলে মেয়েরা রায়বাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং গতবারে কাহাদের প্রতিমা বড় হইয়াছিল, পাঁঠাকাটার সময় কে দড়ি ধরিয়াছিল তাহাই লইয়া বিপুল তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। অজিত সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ সুতরাং বালখিল্যের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারি প্রাধান্য বেশী—সুলেখার সম্মুখে হাত নাড়িয়া সে বলিল "জান সুশীলদা বলেছে ভোগের সময় এবার আমি ঘণ্টা বাজাব"—সুলেখা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। রণর দূর সম্পর্কীয়া মাসী আসিয়া বলিলেন "ইস্কুলে যাবি না—তাড়াতাড়ি আয়" কিন্তু এ আহ্বান তাহার কর্ণে পৌছাইল না—বৃদ্ধ দেওড়ি গুরুচরণের জন্য সে তখন তামাক সাজিতে তৎপর ছিল এবং পরক্ষণেই যে দেওড়িদা তাহাকে গনেশের জড়ার দড়ি রাঁধিতে বলিবে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেওড়িরা জরা তৈয়ারী করিয়া এবং উহা মাটি দিয়া লেপিয়া কয়েক দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

রৌদ্রতাপে জরা শুষ্ক হইলে দেউড়িরা প্রতিমা চিত্রিত করিতে আসিল। 'রায় বাড়ীতে রঙ দিতে আসিয়াছে' এই সংবাদ নিমিষে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রণ তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতেই বৃদ্ধ কর্ত্তার ঘাড়ে পড়িল। কর্ত্তা অত্যন্ত রাশভারী লোক, কেবল প্রাতঃরাশ করিয়া ফিরিতেছিলেন—সরোষে বলিয়া উঠিলেন "চোখের মাথা খেয়েছিস্?" বুধা নৌকাভাবে কাপড় মাথায় করিয়া সাঁতরাইয়া গলি অতিক্রম করিয়া আসিল। দেওড়িদিগকে অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকখানি প্রতিমা চিত্রিত করিতে হইবে সুতরাং তাহারা সমস্ত রাত্রি কার্য্য করিতে মনস্থ করিল—শুনা যায় রণ বাড়ীর কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া জেঠামহাশয়ের অম্বুরি তামাক দেওড়িদাদিগকে সাজিয়া দিয়াছিল। প্রতিমা চিত্রিত হইবার পর চণ্ডীমণ্ডপের দরজা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হইল, তথাপি ঠাকুরের শারীরিক কুশল জানিবার জন্য গ্রামের ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সকল সন্ধ্যায় উঁকি মারিতে কসুর করিত না।

পূজার আর এক সপ্তাহ বাকী। অনাথ সরকার ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সাহায্যে চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দায় নারিকেল, আক, কলা এবং ছোট ছোট মাটির হাঁড়ীতে ভারে ভারে সজ্জিত খাবার বাঁধিয়া রাখিতেছে—ইহা রায়দের

কতকগুলি অনুগত প্রজার বাৎসরিক প্রাপ্য। বিজয়ার পরের দিনে ইহারা আসিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে এবং সরকার মহাশয় খাতায় লিখিত নাম অনুযায়ী প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিবেন।

মরাগাঙের তীরে পূজার প্রকাণ্ড হাট বসিয়াছে—সেইখান হইতে ঠাকুরের টিনের খড়্গ ও তরোয়াল, সরস্বতীর হাতের বীণা, অসুরের ঢাল ও গদা প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম আসিল। শরতের এই মুখরতা ও সজীবতা স্থলে জলে ও গগনে আজ আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল।

আজ পঞ্চমী। সন্ধ্যার পর মৃদু জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে। প্রবাসীদের নৌকা একে একে ঘাটে আসিতেছে। চক্রবর্ত্তীদের নরেনবাবু বহুদিন বাড়ী আসেন নাই, এবার পূজায় সপরিবারে আসিতেছেন। ছোট মেয়ে সেবা নৌকার সম্মুখে বাবার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা মরাগাঙ ছাড়িয়া গ্রামের ভিতরে ঢুকিল। জলপ্লাবিত গ্রামখানির উপর জ্যোৎস্না যেন হাসির লহরী ছুটাইয়াছে। তরুতলে ঝিল্লিধ্বনি অনন্তগগন বক্ষঃচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছিল। সেবা অবাক হইয়া দেখিতেছিল, তাহারা কলিকাতায় থাকে—বর্ষার আক্রমণে পল্লীর এরূপ সন্ত্রস্ত অবস্থা তো দেখে নাই। তাহাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় জল উঠিয়াছে, গোয়ালের পশ্চাৎবর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং অদূরবর্ত্তী পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিদের ঘনবাষ্প চারিদিকে প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অধিবাসের বাজনা ষষ্ঠী নিশিশেষের বারতা নিদ্রিত গ্রামবাসীর কর্ণে মধুর হইয়া বাজিয়া উঠিল। অন্ধকার তখনও পরিষ্কার হয় নাই—রায়দের অজিত, সুলেখা, সুনীল প্রভৃতি একটি লণ্ঠন ও কয়েকটি ফুলের সাজি লইয়া বাহির হইল—এবার চক্রবর্ত্তীদের পাগলাকে হারাইতেই হইবে। গতবারের সমস্ত ফুল সে একাই সকলের আগে তুলিয়া লইয়াছিল। বামুন পিসির বাগানের সম্মুখে আসিয়া অজিত লণ্ঠনের আলো মৃদু করিয়া দিল—জানিতে পারিলে যে রক্ষা নাই। বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঘের-দেওয়া ছোট বাগানটি শরতের অপর্য্যাপ্ত শিশিরে যেন স্নাত হইয়া উঠিয়াছে—ফুলভারে সজ্জিত শিউলি গাছটি যেন আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া সকলে যখন বাড়ী ফিরিল তখন উৎসব-হাস্যরঞ্জিত রৌদ্র দেখা দিয়াছে এবং স্নানান্তে পট্টবাস পরিধান করিয়া সকলেই ব্যস্তভাবে পূজার কার্য্যে লাগিয়াছে।

নামাবলীপরিহিত দীর্ঘশিখা ঋজুদেহ পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন—ভারে ভারে সজ্জিত নৈবেদ্যর থালা, পুষ্পদূর্ব্বা সাজি ও রাশি রাশি বেলের পাতা সজ্জিত রহিয়াছে। অতুল পুরোহিতের নিকট বসিয়া, অজিত সুলেখা প্রভৃতি বারান্দায় কাঁশর বাজাইতেছে, তাহাদের পৈতা হয় নাই, ভিতরে প্রবেশাধিকার নাই। গ্রাম্য বালক-বালিকাগণ নূতন কাপড় পরিয়া দলে দলে হাসিমুখে পূজা দেখিতে আসিতেছে। অন্তঃপুরে গ্রাম্যলক্ষ্মীগণ কোমরে কাপড় জড়াইয়া রন্ধনে ব্যস্ত আছেন—আর একদিকে গ্রাম্য যুবকগণ ময়দা ডলিতেছে ও পুকুর হইতে কলসী ভরিয়া জল আনিতেছে—পূজার এই কয়েকটি দিনে তাহারা যেন ঘরের ছেলে।

মহাস্নান ও আরতিঅন্তে সপ্তমীপূজা সমাপ্ত হইল। মণ্ডপের বারান্দায় গ্রাম্যবৃদ্ধের সমাগম হইয়াছিল—তথায় আচারবিমুখ গ্রাম্যযুবকগণের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইতেছিল। নারিকেলের নাড়ু, খেজুর, আতা প্রভৃতি ফলমূলসমেত মায়ের প্রসাদ পাইয়া ইঁহারা গৃহাভিমুখে চলিলেন।

বহুবেলায় ভোগ সমাপ্ত হইল। নিমন্ত্রিতগণ ভোগের বাদ্য শুনিয়া একে একে আসিতে লাগিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণগণ আহারে বসিয়াছেন,—বৃদ্ধ কর্ত্তা এতক্ষণ উপবাসে ছিলেন, এখন আসিয়া প্রত্যেকের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুবকেরা উৎসাহের সহিত পরিবেশন-কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল। সুধীর ও মণি পাল্লা দিয়া আহার করিতেছিল—উভয়েই সমবয়স্ক, কিন্তু সুধীর মণি অপেক্ষা গোলাকৃতিতে প্রায় অর্দ্ধেক হইলেও তাহার তৈলচিক্কণ উদরপ্রবরটি ক্ষমতা ও অসম্ভব স্ফীতিশক্তিতে সকলকে অভিভূত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণদের আহারান্তে রায়দের প্রজারা অঙ্গন জুড়িয়া আহারে বসিল,—তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উলঙ্গ অবস্থায়

আসিয়াছে—মায়ের প্রসাদ পাইবে ভাবিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই।

সন্ধ্যা প্রায় গাঢ় হইয়া আসিল। মণ্ডপের সম্মুখে অনাথ সরকার কলিকাতা হইতে আনীত একটি শক্তিশালী আলো ঝুলাইতেছে···তাহাকে একপাল ছেলে মেয়ে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ক্রমে আরতির আয়োজন হইল—অন্তঃপুরিকাগণ স্নানান্তে নূতন কাপড় পরিয়া ভক্তিবিমিশ্রিতচিত্তে আরতি দেখিতেছেন। পুরোহিত প্রথমে ধূপ দিয়া বহুক্ষণ আরতি করিলেন, পরে পঞ্চপ্রদীপ এবং সিক্ত পাথার দ্বারা আরতি কার্য্য সমাপন করিলেন। আরতির পর গ্রাম্য ভাসানযাত্রার দল আসরে দেখা দিল। তাহারা একহস্তে উড়ানির অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া, অপর হস্ত ঘুরাইতে ঘুরাইতে গ্রাম্যভাষায় গান ধরিল—

"ঈষাণী কহ শুনি শশীমুখের বাণী
কেমন ছিলে হরভবনেরে
সে তো ভোলা ভালবাসে তোমারে—"

ভগবতীর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকের নীচে পরুষকণ্ঠের এই সঙ্গীতে শ্রোতাবর্গ যেন প্রথম অনুভব করিল শরতের এ আগমনী তনয়ার পিতৃগৃহে আগমন বিশেষ। আসর প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল—কলেজে পড়া কয়েকটি ছেলে নিকটস্থ একটি বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, সেখান হইতে উচ্ছ্বসিত কলহাস্য মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল—কয়েকটি কুকুর সারাদিন উচ্ছিষ্ট কলার পাতা লইয়া বিবাদ করিয়া ক্লান্ত হইয়া কুণ্ডলাকারে শুইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর সমস্ত নীরব হইল, কেবল প্রবাসীর আকণ্ঠপূর্ণ মিলনের উচ্ছ্বাস লইয়া জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত গ্রাম খানির শিয়রে বসিয়া রহিল।

আনন্দের এই কর্ম্মস্রোতের মধ্যে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যা নদীর জলে উৎসর্গ করা বিকশিত পুষ্পের মত ভাসিয়া গেল। আজ রাত্রিতে রায় বাড়ীতে "ধূপভাঙ্গা" হইবে—আশে পাশের সমস্ত গ্রামের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিয়াছে, অঙ্গনে আর লোক ধরে না। দশজন সবল জেলে দুই হস্তে দুইখানি বড় ধূপতি লইয়া বৃত্তাকার ভাবে নাচিতে আরম্ভ করিল—শ্যামা বিষয়ক বিজ্ঞান সম্মত অপূর্ব্ব সঙ্গীতও সমস্বরে আরম্ভ হইল। অর্দ্ধঘণ্টা এই নর্ত্তন চলিল, ধূপের ধোঁয়ায় অনেকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল! জেলেদের মধ্যে খোকা সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ—তাহার ধূপতি হইতে মাঝে মাঝে আগুণ ছিটকিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকে একটা 'সর সর' রব পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পর নাচের ঝোঁক সামালাইতে না পারিয়া খোকা ধূপতি সমেত আগুনের মধ্যেই পড়িয়া গেল।

আজ বিজয়া।

এই তিনটি দিনে কি বেদনার তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া কৈলাস কানন যে ভাসাইয়া দিয়াছে তাহা কি কেহ ভাবিয়াছে! পাষাণীর আনন্দ-দুলালী হইয়াও তাঁহার পথ নিরীক্ষণকারী ভিখারীর মনের কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই মায়ের নিষেধে ও পূর্ব্ব বিরহে পার্ব্বতীর মন টলাইতে পারে নাই। চিত্তবিকারের কথা উমা আজও ভুলিয়া যান নাই তাই বিজয়ার দিনে মায়ের ঘর আঁধার করিয়া কৈলাস ভবনে চলিতেছেন।

অন্তঃপুরিকাগণ সিঁদুর রঞ্জিত লক্ষ্মীর কৌটা এবং ছেলে মেয়েগণ পুঁথিপত্র প্রতিমা স্পর্শ করিয়া পবিত্র করাইয়া লইতেছে। আজ ব্যস্ততা থামিয়া গিয়াছে। সকলের আহারান্তে প্রতিমা একখানি বৃহৎ নৌকার উপর তোলা হইল—গ্রামের প্রান্তবাহিনী মরাগাঙে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা। প্রতিমার নৌকার পশ্চাতে বহু নৌকা করিয়া সকলে বিসর্জ্জন দেখিতে চলিয়াছে। ডোঙার উভয় পার্শ্বে পল্লীবধূগণ ছেলে কোলে করিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে—প্রতিমার নৌকা হইতে বিসর্জ্জনের বাদ্য যেন পল্লীর পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে বাজিয়া উঠিতেছে। মরাগাঙে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতিমা ডুবাইয়া দেওয়া হইল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী যেন পল্লীর উদ্বেলিত অশ্রুরাশির ন্যায় ছল্ ছল্ করিতেছিল। জল স্থলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দগুলি যেন নিদ্রাকাতর জননীর ঘুম-পাড়ান গানের মত অতিশয় মৃদু হইয়া উঠিল।

ম্লান শোকার্ত্ত বাড়ীগুলি যাত্রীদিগকে দূর হইতে বিষাদের আহ্বান জানাইল। প্রবাসীর নিকট প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা ও কর্ম্মস্থলের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। নৌকা ঘাটে লাগিলে "ভড়ার আলো" দেখিয়া সকলে পাড়ায় পাড়ায় প্রণাম করিতে বাহির হইলে। গৃহলক্ষ্মীগণ ধানদূর্ব্বা লইয়া বসিয়া আছেন—প্রণতদের মস্তক স্নেহমণ্ডিত ধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আজিকার দিনে কেহই আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত রহিল না।

শরতের অবারিত জ্যোৎস্না গভীর হইয়া ব্যাপ্ত হইল এবং দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় কাহার কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল—

"চলিলে মা আনন্দময়ী
করি নিরানন্দ এ ধরা।"

চৈতী-হাওয়া

[শ্রীহাসিরাশি দেবী]

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী ভাড়া লইয়া যেদিন দুই বন্ধু সস্ত্রীক আসিয়া উঠিয়াছিল সে বহুদিনের কথা, বোধ হয় ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রবোধ উকিল এবং শিবনাথ ডাক্তার; দুই জনেই একসঙ্গে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিল। দুইজনের আলাপ পরিচয়ও অল্পদিনের নয়, বহুদিনের,—যখন তাহারা স্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে। প্রবোধ বিবাহ করিয়াছিল সুন্দরী এবং শিক্ষিতা দীপাকে এবং মায়ের ইচ্ছায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিবনাথকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল সতীকে; সতী পল্লীগ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া চলনসই শিখিয়াছিল, এবং সুন্দরীও ছিল না। তাই যখন শিবনাথ দীপাকে অনুরোধ করিল, "যত্ন ক'রে সতীকে মানুষ করে' গড়ে' তুলবার ভার আপনার হাতেই দিলাম বৌদি—"

তখন দীপার ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটি ভাসিয়া উঠিল, তাহা যে সহানুভূতিপূর্ণ নহে, তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ, তাহা শিবনাথ না বুঝিলেও সতীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সে তখন নীরবে রহিল বটে, কিন্তু রাত্রে শিবনাথকে জানাইল—

"আমি লেখাপড়া, গানবাজনা বা কেতাদুরস্ত চাল চলন জানিনে বটে, কিন্তু মানুষের মনের কতকটা ভাব আমি বুঝতে পারি। সেইজন্যেই বলছি তোমার বন্ধুর স্ত্রীর কাছে আমি কিছু শিখতে পারব না, যাবও না।"

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—"কেন?"

সতী উত্তর দিল—"ইচ্ছে নেই, তাই।"

উষ্ণস্বরে শিবনাথ কহিল—"ইচ্ছে যদি সমস্ত কাজেই না থাকে তবে কোনও কাজই করতে হবে না বল—কেমন এই না?—"

সতীও কি একটা জবাব দিতে গেল কিন্তু পারিল না, মুখ নত করিয়া উচ্ছ্বসিত রোদনটাকে গোপন করিয়া গেল।

কঠিন স্বরে শিবনাথ কহিল—"যাই হোক্ এইটুকু ঠিক জেনে রাখ যে আমি তোমায় শুধু পুতুল করে আলমারীতে সাজিয়ে রাখব বলে বিয়ে করে আনিনি,—নিয়ে এসেছি আমারই ইচ্ছামত কাজে লাগাবার জন্যে। সুতরাং—" মাঝখানে কথাটাকে থামাইয়া দিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনেক দূর হইতে একটা ডাক আসিয়াছিল, সে আর বিলম্ব করিল না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, আর সেই খানেই বসিয়া মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিয়া ফেলিল সতী।

দীপার সমস্ত কাজ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া গর্ব্বটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া সতীর সম্মুখে ধরা দেয়, কিন্তু সতী সে হাসি সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়ে।

প্রত্যহ রাত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঐ বিষয় ছাড়া আর কোনও কথা হয় না, যদিই বা অপর কথাবার্ত্তা হয় তাহাও অল্প, যেন নিয়ম পালন; তাহার মধ্যে না আছে মাধুর্য্য না আছে নূতনত্ব।

দুই জনেই দুই পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রাত কাটায়, আর মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করে উতল হাওয়া।

স্বামীর ইচ্ছায় নিজের অনিচ্ছা চাপা দিয়াও সতী প্রত্যহ শিক্ষার্থিনীরূপে দীপার নিকটে গিয়া হাজির হয়, কিন্তু কিছুতেই যেন মন বসে না।

দীপা হাসে, বলে "এ আবার কি হ'ল তোমার, শুনি—"

সতী এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না, নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া থাকে। শেষে সে একদিন এই শিক্ষার জবাব দিয়া মাতৃত্বের পদলাভ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে দীপার বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল, কোনও কথা সে কাহাকেও জানিতে দিল না।

কিন্তু যেদিন প্রবোধ তাহার সংসার ও সুন্দরী স্ত্রীর সকল ভাবনার ভার শিবনাথের হাতে দিয়া অনন্ত-পথের পথিক হইল, সেদিন দীপা আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে
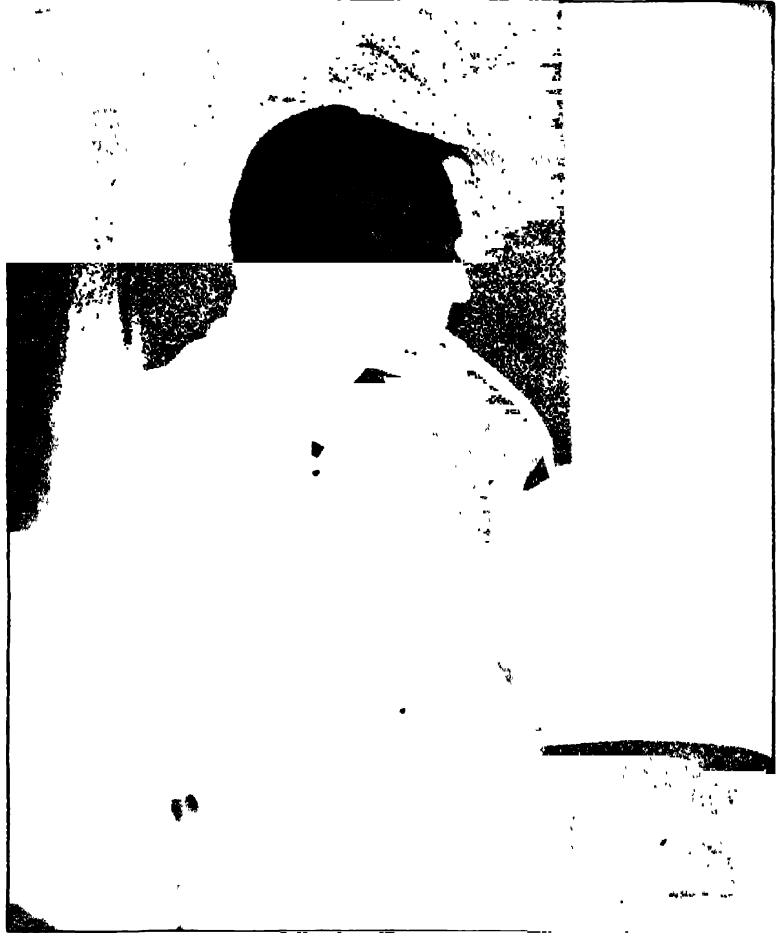
শরৎচন্দ্র

[জন্মতিথি — ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৭

“ওগো, ব্যথার পূজারী, বন্ধু সবার,
আজ এ প্রভাতে খোল খোল দ্বার
বুকে ক'রে আজ এনেছি বহিয়া
তোমা'রই পূজার মালা।”

পারিল না ; শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আমার এ কি হ'ল ঠাকুর পো ?"

শিবনাথ তাহার এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না, নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক এমনি সময়ে আপনার শিশু পুত্রকে আনিয়া সতী দীপার কোলে বসাইয়া দিল, সমবেদনাপূর্ণ স্বরে ডাকিল—

"দিদি—"

দীপা একবার সজল নেত্রে শিশুর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পরে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া লুটাইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

দীর্ঘ চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বৎসর কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে দীপারও যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

তাহার কথার খোঁচায় হৃদয়ে আর আঘাত লাগে না, হাসির মধ্য দিয়া গর্ব্ব ভাসিয়া উঠে না, দৃষ্টিতে অবহেলা প্রকাশ পায় না। এ যেন পূর্ব্বের সে দীপা নহে, অন্য মানুষ।

খোকার সমস্ত কাজের মধ্য হইতে সতীর ছুটির পালা আসিয়াছে। খোকা থাকে দীপার কাছে, মা বলিয়াও জানে তাহাকেই, সতী তাহাতে কোনও বাধা দেয় না।

দীপাও হাসে—বলে, "ছেলে মানুষ কিনা—তাই। বড় হ'লে ও সমস্ত বুঝবে, এখনও বোঝেনি।" কিন্তু "মা" ডাক শুনিয়া দীপার মুখের উপরে যে অরুণিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা আর কেহ না লক্ষ্য করিলেও সতীর দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিসের একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার সমস্ত অন্তর দুলিয়া উঠে, কিন্তু হেতু সে খুঁজিয়া পায় না।

কাজ সারিয়া শিবনাথ দিনে যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে, তখন হয়তো দিনের বিদায়-বার্ত্তা দিকে দিকে ছড়াইয়া যায়,—বাতাস কাঁদিয়া বিদায়-গীতি গাহে।

সেদিনও শিবনাথ যখন দূরের ডাক হইতে বাড়ী ফিরিল তখন ভাদ্রের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

শরীরের অসুস্থতার জন্য সতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, দুয়ারের উপরে দাঁড়াইয়া শিবনাথ ডাকিল—

"সতী—"

সতীর ঘুম ভাঙ্গিল না, সে উঠিলও না, কিন্তু পাশের ঘর হইতে উঠিয়া আসিল আর একজন, সে দীপা।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবনাথ চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে একখানা হাতপাখা টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইতেই দীপা তাহাতে বাধা দিল—

"থাক্‌না ঠাকুর পো, ও কাজটা না হয় আমিই একটু করি, তুমিতো এই খেটে ঘুরে এলে—।"

শিবনাথের হাত হইতে পাখাটাকে লইয়া বাতাস করিতে করিতে নিজের মনেই সে বলিয়া চলিল—

"উঃ,—আর গরমও যা পড়েছে, এ একেবারে কাল-বোশেখীর দুপুর যেন, আগুনের গোলা ছুটছে—"

শিবনাথ কোনও উত্তর দিল না,—শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল ; দীপাও আর যেন কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। এই নীরবতা দুইজনের পক্ষেই যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। নিদ্রিতা সতীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়া দীপা ডাকিল—

"ছোট বৌ, ওঠনা ভাই, ঠাকুরপো বাড়ী এসেছেন যে।"

স্ত্রীর জন্য প্রবোধ যাহা জমাইয়া রাখিয়াছিল তাহা দীপার জীবন চালাইবার হিসাবে যথেষ্টই ; এমন আর একজনের জীবনও হয়তো তাহাতে সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত।

দীপার প্রকৃতি ছিল একটু অন্য ধরণের।—বিধবা হইয়াও সে যখন তাহার পূর্ব্বেকার হাল চাল ছাড়িতে পারিল না, তখন লোকে তাহার চরিত্রের উপরে সন্দেহ করিয়া কথা বলিতে লাগিল অনেকেই, কিন্তু সে গায়ে মাখিল খুব কমই।

সেদিন সে জানালার নিকটে বসিয়া মৃদুস্বরে গাহিতেছিল—

—"একলা ঘরে বসে' বসে' কি সুর বাজালে—
প্রভু, আমার জীবনে—"

শুক্লা ত্রয়োদশীর তিথি, কক্ষমধ্যে আলো ছিল না।

খোলা জানালা দিয়া জ্যোছনা আসিয়া তাহার মুখে চোখে ও সমস্ত অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাতাসে বাজিয়া উঠিতেছিল যেন কিসের একটা অজানা ছন্দ।

একটা দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢুকিয়া শিবনাথ ডাকিল—

"বৌদি—"

দীপা চমকিয়া গান থামাইল। উত্তর দিল—

"কেন ঠাকুর পো!—"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া শিবনাথ বসিয়া পড়িল। কহিল—

"শান্তি সুখ—কখনও কারও একচেটিয়া সম্পত্তি হ'তে পারে না, নয় বৌদি?—"

দীপা বিস্মিতা হইল, প্রশ্ন করিল—

"আজ হঠাৎ একথা কেন?—"

শিবনাথ যেন কথাটাকে ঘুরাইয়া লইল। ম্লান হাসিয়া কহিল—

"তোমার সঙ্গে একবার দেখাটা করে যেতে এলাম, যেতে হ'বে কিনা, তাই;—"

দীপা চমকিয়া উঠিল—

"সে কি? কোথায় যাবে?—"

শিবনাথ উত্তর দিল।

"অনেক দূরে, দেশে মার বড় অসুখের খবর আজ এসেছে, যেতেই হবে আজ এই রাত্রে. হয়তো কিছু দিনের জন্তে আর ফিরব না। কিন্তু—"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল।

কি ভাবিয়া দীপা কহিল—

"আমাকেও নিয়ে চল না ঠাকুর পো, মাকে আমিও একবার দেখে আসি।" তাহার কণ্ঠস্বরে যেন কি একটা সুর বাজিয়া উঠিল। শিবনাথ জবাব দিল—

"তা যে হয় না বৌদি"—

দীপা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু শিবনাথের কথার প্রতিবাদ করিল না।

মুখ তুলিয়া শিবনাথ ডাকিল—"বৌদি—"

চাপা স্বরে দীপা উত্তর দিল, "কেন?—"

শিবনাথ কহিল, "আমার এ কথায় মনে দুঃখ পেলে, নয়?—"

"দুঃখ?"—মলিন হাসিয়া দীপা জবাব দিল, "না ভাই, —দুঃখ করবার দিন আমার অনেক আগেই কেটে গেছে,—এখন মন আর দুঃখ সুখের অনুভব বেশী করতে পারে না।"

শিবনাথ ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিল, পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দীপার পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "যাই, যাবার তো সবই গুছিয়ে নিতে হবে, কিন্তু—"

কি একটা কথা বলি বলি করিয়া বলিতে গিয়াও কেন থামিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিয়া দীপা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু আলো অন্ধকারের মধ্যে ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, শুধু মনে হইল, শিবনাথও যেন একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া দীপা প্রশ্ন করিল, "কিছু বলবার আছে কি ঠাকুর পো?—"

"বলবার?"—শিবনাথ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তাহার পরে উত্তর দিল—"না।"

"না? তবে—"

একটা অস্পষ্ট প্রশ্ন শিবনাথের কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিমেষের জন্ত তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু দীপা তাহা দেখিতে পাইল না, সে উত্তর শুনিবার আশায় শিবনাথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু শিবনাথের তরফ হইতে একটা কথাও শোনা গেল না, সেও নীরবে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এমনি নীরবে যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিল না, হিসাবও রাখিল না, কিন্তু বাহির হইতে একজন তাহার হিসাব রাখিল, সে সতী।

বহুক্ষণ পরে, শিবনাথ যখন ধীরে ধীরে দীপার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল তখন যে দীপার নয়নের কোনে দুই বিন্দু অশ্রু টল টল করিতেছিল, তাহা কেহ জানিল না।

স্বামীকে দেখিয়া সতী একটু হাসিল, বিদ্রূপ পূর্ণ স্বরে কহিল, "প্রণাম করে এলে? কিছু বললে নাকি দিদি?—"

শিবনাথ সে কথার কোনও উত্তর দিল না, ধীরপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

দূরদেশের একখানি গ্রাম হইতে দীপার নামে সতীর যে পত্র আসিত, তাহাতে শিবনাথের সম্বন্ধে কোনও কথাই লেখা থাকিত না, বেশীর ভাগ থাকিত দীপার জীবনযাত্রার আলোচনা, আর সেই আলোচনার মধ্যেই বিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন কাঁটা!

দীপা এ কাঁটার অর্থ বুঝিত। কিন্তু সতীর এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিত না, করিবার মত প্রবৃত্তিও যেন তাহার আর ছিল না। সেদিন সতীর যে পত্র আসিয়াছিল তাহাতে লেখা ছিল তাহারা দুই তিন দিনের মধ্যেই বাসায় ফিরিবে।

পত্রখানার উপরে দুই তিনবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া দীপা তাহা সযত্নে মুড়িয়া বালিশের উপর রাখিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আশাও তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

সতী ফিরিয়া আসিবে, তাহার খোকা আসিবে, আর আসিবে একজন, সে শিবনাথ।

আবার তেমনি ভাবে সময় কাটান,—সেই হাসি, সেই গান, গল্প···কিন্তু,—না, না, না—আর উহাদের সংশ্রবে না থাকাই যেন সব চাইতে ভাল, সব দিক দিয়াই ভাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার সমস্ত বুকখানাকে কাঁপাইয়া দিয়া বাহিরের শীতল বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

যেদিন আসিবার কথা, সেদিনে কেহ না আসিয়া পর-দিন সন্ধ্যায় যখন শিবনাথ আসিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন দীপা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। প্রশ্ন করিল—

"তুমি একা যে? ওরা কই?—"

শিবনাথ কহিল—

"সতীর অসুখ তাই তোমায় নিয়ে [illegible] সছি, দেরী ক'রোনা বৌদি, সব গুছিয়ে নাও, সকালের ট্রেণে—"

দীপার সমস্ত মুখখানা নিমেষের জন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল—

"খুব অসুখ?—"

শিবনাথ উত্তর দিল—

"না, কিন্তু তবু তোমায় যেতে হবে।"

চমকিয়া দীপা একবার শিবনাথের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার কোনও ভাবান্তর সে দেখিতে পাইল না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—

"আচ্ছা এখন একটু বিশ্রাম করে' হাত পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও তো, তার পরে—আজকের রাতটা ভেবে কালকে তোমায় যাবার কথা জানাব।" দীপা জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেল, কিন্তু শিবনাথ নড়িল না, সেইখানেই নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন ভোরের আলো আসিয়া পৃথিবীর বক্ষ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের রুদ্ধ দুয়ারে বাহির হইতে করাঘাত করিয়া দীপা ডাকিল—

"ঠাকুর পো—"

সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটাইয়া ভোরের দিকটায় শিব-নাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাক শুনিয়া উঠিয়া, দুয়ার খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়াই দীপা স্বাভাবিক স্বরে কহিল—

"আমি তো যেতে পারব না—"

শিবনাথ লক্ষ্য করিল—দীপার পরিধানে মোটা থান, গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়ান; সে যেন কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে। বিস্মিত হইয়া শিবনাথ কহিল—

"কেন?—"

স্পষ্টস্বরে দীপা উত্তর দিল—

"না যাওয়ার কোনও কারণই নেই ভাই, তবু আজ গোপন করব না, আমি যাব না। আমায় তুমি ক্ষমা কর, সতীকে ক্ষমা ক'রতে বলো—।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিল।

"তবে কোথায় যাচ্ছ?"

মলিন হাসিয়া দীপা উত্তর দিল—

"অনেক দূরে—"

শিবনাথ কহিল, "তীর্থে?—"

দীপা উত্তর দিল—

"না, তীর্থ আমার নেই, তবে অনেক দূরে বটে। হয়তো আর না ফিরতেও পারি—তাই শেষ দেখা করতে এলাম—"

"এখনই?—"

দীপা উত্তর দিল "হ্যাঁ—"

শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সহসা দীপার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, কহিল—

"তবে আমায় ক্ষমা করে যাও বৌদি—ওমনি চলে যেওনা—।" তাহার কণ্ঠে আর্তস্বর বাজিয়া উঠিল। দীপা তাহার কোনও জবাব দিল না, শুধু তাহার চোখের দুই কোন বহিয়া কয় ফোটা অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল।

মা ও ছেলে

[শ্রীনিখিলেশ রাহা]

অর্দ্ধেক রাত পার হ'য়ে গেছে চাঁদ ওই পড়ে ঢ'লে
জ্যোস্নার জাল দু'হাতে টানিয়া বিদায়-পথের কোলে,
—গাছের শাখায় পাখীরা নীরব পাখায় বাঁধিয়া পাখা
মহাজগতের প্রতি অঙ্গনে সুপ্তির বাণী আঁকা!
তোর চোখে আজ ঘুম নাই কেন ওরে ও দুষ্টু ছেলে
অবোধ সুখেতে হাসিস্ শুধু যে দুইটি নয়ন মেলে,
শূন্যে তুলিয়া রাঙা মুঠি দু'টি এধার ওধার করি'
নাড়িয়া নাড়িয়া রাঙা পায়ে তোর
একি খেলা নিশি ভরি'!
—লক্ষ্মী খোকন ঘুমাও ঘুমাও বর্গী আসিবে দেশে
মাণিক খোকার ঘুম আসে ওই
সোণার পাখায় ভেসে!
তবু হাসি ওরে দুষ্টু খোকন ঘুমাতে দিবি না আজ
দিনেও জ্বালাবি রাতেও জাগাবি
এই কি হয়েছে কাজ?
—ওকিরে খোকন, ঠোঁট ফোলা কেন,
কি আবার হ'ল তোর
থাক্ থাক্, আয়, ঘুমাতে হবে না,
জেগে করি নিশি ভোর!

শোন্‌রে খোকন্, আজ তোরে কই
আমার যতেক কথা
জীবনের মোর রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝার যত ব্যথা!
অবোধ যে তুই ভাষা নাই মুখে বুঝিবার জ্ঞান নাই,
তোর কাছে আজ কহি অকপটে
মোর যত কথা তাই;
শোন্ শোন্ বাছা আজিকে রাত্রে
ব্যথা যে জাগিল প্রাণে
কূলের বাঁধন ভাঙ্গিয়া যে তাহা
মাতিল ভাঙার গানে,—

শোন্ তোরে কই মোর যত কথা, কত কথা মনে হয়
কিছু কিছু তার তোরে বলা আজ হয় ত' উচিত নয়!
তবু রে খোকন্ এই আশা প্রাণে
আজিকে রাতের সনে,
প্রলাপী মাতার কোন কথা কভু
পড়িবে না তোর মনে!

সকলে আজিকে কলঙ্কী কয় ঘৃণাভরে দূরে যায়
—শুধু দেখিলনা এ কালিমা মোর
কে মাখাল সারা গায়;
থাক্ থাক্ মোর এ কালিমা ঘোর
সারা দেহে থাক্ ভরি'
অন্তরে মোর তুই যে দেবতা জাগিস্ প্রদীপ ধরি'!
তারা ত' বোঝে না এ মোর ব্যথার
অতল পাথার তলে
সুধার পাত্র পূর্ণ করিয়া কোন্ সে মাণিকজ্বলে—
তারা ত' জানে না তোর এ হাসির একটু পরশ লভি'
কত পাষাণের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কত নর হয় কবি!
—তুই যেরে মোর আঁধার হৃদয়ে
শত মাণিকের আলা
শত জীবনের কুসুম-চয়নে গাঁথা মন্দার মালা।

আমারো জীবনে একদিন ছিল যেদিন ভোরের পাখী
কানে ঢেলে দিত সুধা সঙ্গীত বনের আড়ালে থাকি;—
একদিন ছিল যেদিন আমার হাতের কুসুম রাশি
পাষাণ-দেবের ঘুম ভাঙ্গাইয়া মুখেতে ফুটাত' হাসি,
সেদিন আমার চরণের ঘায়ে কমল উঠিত ফুটি'
সেদিন আমার আঁখিজল দেখি' তারকা পড়িত টুটি';
তার পর মোর কিশোর-জীবনে আসিল রঙীন সাথী
আমারে বসাল প্রেমের আসনে নবীন হৃদয় পাতি,

স্বপ্নে কাটিল দুইটি বছর সে নব সুখের স্রোতে
জীবনের যত অভাবের ব্যথা মুছে গেল মন হ'তে,—
তারপর তোরে পাইলাম কোলে স্বামীর সে স্নেহদান
জীবনের ভোরে আর একটি পাখী
গাহিল মধুর গান !

শোন্ শোন্ খোকা, নয়নে কি তোর
নামিল ঘুমের ঘোর
একটি রজনী জাগিয়া র'বিনা মায়ের ব্যথায় তোর ?
শোন্ শোন্ মোর দুঃখের কথা কিছুই হয়নি বলা
সে ব্যথা-পথের এই যেরে সবে
করিয়াছি সুরু চলা ;—
স্বামী চলে গেল, জীবন-প্রভাতে আসিল আঁধার নিশা
আঁধারে আঁধারে হ'ল একাকার মুছিল সকল দিশা—
সে মহা আঁধারে ভুলিলাম পথ ভুলিলাম যত কিছু
ভুলিলাম আমি আমার আমারে
আমার আগু ও পিছু ;
—ওরে খোকা মোর, সোণার মাণিক
তোরে বাঁচাবার তরে
জীবনের সব ধাপগুলি ক্রমে নামিলাম পরে পরে !

—শুনিস্ না মোর কলঙ্ক-কথা আমার কালিমা শত
আমারে জ্বালায়ে নিভে যায় যেন
আমারে করিয়া ক্ষত ;
তুই যেরে মোর ভোরের শিশির, রঙীন মেঘের হাসি,
প্রভাতের মত অমনি সরল শুভ্র আলোর রাশি !
জননীরে তোর সবে ঘৃণা করে' সরে' যায় দূরে সরে
পথের কুকুরে দেখিয়া যেমন দূরে সরে ঘৃণাভরে,
—তোর জননীর ছায়া আজ আনে অকল্যাণের বাণী
মার হাসি নাকি নিভায় সাঁঝের কল্যাণ-দীপখানি,—
তবু রে খোকন্ এই অভাগিনী তোর যে জননী হয়
তোর সাথে এই রাঙা পৃথিবীর যে করাল পরিচয় !

সকলের ঘৃণা সয়ে' কেন আমি
আজো হেথা বেঁচে আছি
কিসের আশায় পদাঘাত স'য়ে এতকাল ছিনু বাঁচি' ?
এই কথা যদি মনে হয় কভু ওরে ও বিচারী মোর,
ভুলিস্ না কভু সে শুধু মায়ায় ক্ষুদ্র বাহুর তোর,
—ওই বাহু তোর ওই আধ কথা মরণের পথে বসি'
মরণের সাথে বিবাদ করিয়া জীবনে মাখাল মসী,
মোর যত পাপ মোর যত ব্যথা
সকলি যে তোর লাগি'
তোর শুভাশুভ ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন হইল দাগী !

ঘুমায়ে পড়িলি সোনার খোকন ?
থাক থাক ঘুমা ঘুমা,
তোর রাঙা ঠোঁটে আয় এঁকে দিই জননীর স্নেহ চুমা,
আজ ওই ঠোঁট মোর চুমা পেয়ে হেসে ওঠে মহাসুখে
আজ ব্যথা পেলে মুখটি লুকায়ে
কাঁদিস্ আমার বুকে—
—আজ তুই মোর একটুকু শিশু
শুধু মোর একেলার
সংসার তোরে চেনে নাক আজ
বলে নাক' আপনার ;
আমি তাই কাঁদি—এতটুকু তুই
কেহ নাই আমি ছাড়া
আকাশের এক বিন্দু আলোক
এসেছে কি পথহারা ?
আরো দিন যাবে সংসারপথে চলিবি জ্যোতির্ম্ময়
নীড় ছাড়ি' যথা ক্ষুদ্র শাবক আলোকে বাহির হয় ;
—মায়ের আঁচল তোরে বাঁধিবেনা জননী রবেনা কাছে
তোর জীবনের আলোকের দিন সম্মুখে পড়ে আছে।

যদি কোন দিন তোর এ জীবনে জননীরে মনে পড়ে,
অভাগী জননী বলিয়া কখনো বিন্দু অশ্রু ঝরে—

আমার সমাধি শয়নের পাশে সেদিন দাঁড়াস্ আসি,
মহা ঘুমঘোর ত্যজিয়া সেদিন জননী দাঁড়াবে হাসি ;
—সে জননী কভু করে নাই পাপ—
সে শুধু জননী তোর,
সন্তান তার মায়েরে ডাকিছে এই পরিচয়-ডোর।
আমার শ্যামল সমাধির পাশে তোর সে নয়নজল
জীবন-জ্বালানো বহ্নি নিভায়ে ফুটাইবে শতদল !

এ জীবনে আমি যদি কোনদিন
ভাল কিছু করে' থাকি
প্রতিদানে তার যাহা কিছু শুভ—
তোর তরে দিনু রাখি,
—প্রতি কর্ম্মের আছে প্রতিদান,
পুণ্যের আছে ফল,
পুণ্যের ফল তুই নিস্ বাছা, আমি পাপ-হলাহল !
আমি যদি পচি গভীর নরকে কোন ক্ষেদ নাহি মোর
তুই যেন হেথা মানুষের মত কাটাস্ জীবন তোর ;
—জননী তোর যে কলঙ্কী নয়—অপরাধী কভু নয়
সন্তান তুই—এই কথা যেন তোরে না বুঝাতে হয় !
অশুভ যা কিছু করিয়াছি আমি সেইদিন যাবে চলে'
সংসারমাঝে তুই যা করিবি তাহারি পুণ্যফলে ;

—সেই আশা নিয়ে ওরে রে খোকন,
ওরে রে মাণিক মোর,
শত দুঃখের সব কথা আজ কহিল জননী তোর।
—মা বলিয়া কভু ভাবিতে আমারে
যদি তোর ঘৃণা হয়,
অভাগী বলিয়া ক্ষমা করিতেও হইবে কি দ্বিধা ভয় ?
যত কিছু পাপ করিয়াছি আমি বিচারক হবি তার
জননীরে তোর আরো দিবি লাজ
বাড়াবি ব্যথার ভার ?
মাণিক আমার, লক্ষ্মী আমার, ওরে রে বুকের ধন,
জাগ জাগ তুই আজিকে
মায়ের বেদনার কথা শোন্ !
—কাঁদছিস্ তুই—থাক থাক
তবে বলিবনা কিছু আর,
প্রভাত জাগিছে পার হ'য়ে ওই রাত্রির পারাবার
পূরবে উঠিছে আলোর কমল রাঙা মেঘে ভর করি'
এমন শুভ্র প্রভাত-আলোকে
আমি কেন কেঁদে মরি ?
—ঘুমা ঘুমা খোকা জননীর বুকে এমনি ঘুমায়ে থাক্—
আজি প্রভাতের সাথে আঁধারের
সব ব্যথা মুছে যাক্ !
জননী ডাকিছে তার দেবতারে তোর কল্যাণ লাগি—
তোর দেবতারে এমনি ডাকিস্ জননীর শুভ মাগি !

সন্দেহ-ভঞ্জন

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

বর্ষার সজল শীতল মধ্যাহ্নে বিছানায় শুইয়া 'বিশ্ব-বিজয়া'র "কবির প্রিয়া" কবিতাটি বার বার পড়িতেছিলাম। কবিতার প্রতি শব্দ প্রতি কথা আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। ঐ সুর, ছন্দ ছাড়া আমার জগতে আর কিছুই ছিল না।

এ 'কবির প্রিয়া' আর কেহ নহে, আমি। আমিই আমার বিশ্ববিশ্রুত কবি-স্বামীর একমাত্র প্রিয়া, মানসী। নারী-জীবন লইয়া এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী কয়জনা হইতে পারিয়াছে, জানি না, জানিবার ইচ্ছাও নাই। নিজে যাহা পাইয়াছি তাহারি আনন্দে চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে।

স্বামী গৃহে ছিলেন না, কলেজে গিয়াছিলেন। তিনি কলেজের অধ্যাপক। সমস্ত দ্বিপ্রহর তাঁহারি কবিতা ও স্মৃতি লইয়া আমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইত। আজও তাহাই করিতেছিলাম।

কিয়ৎকাল পর ঝি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা চিঠি।"

কহিলাম, "দিয়ে যাও।"

ঝি পর্দ্দা সরাইয়া খামে আবদ্ধ চিঠিখানা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিল।

বিস্মিত নেত্রে শিরোনামাটির পানে চাহিয়া রহিলাম, আমার সোণার বাংলা হইতে কি বার্ত্তা বহন করিয়া এ বার্ত্তাবহ সুদূর লাহোরে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে? জানি আমাকে লিখিবার বড় একটা কেহ নাই, যে ছিল কিছুকাল হইল তাহাকে কালের অতল গর্ভে হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন থাকিবার মধ্যে দাদা আর পিসিমা। বাল্যকালেই বাবা, মা আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য দুঃখ নাই। দুঃখ কেবলি তাহারি নিমিত্ত যে মার শ্রীহীন সংসারে লক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া আমাকে ভগিনীর স্নেহে, সখীর প্রীতিতে বাঁধিয়াছিল, আমার সেই প্রাণের সাথীটি আজ অজানা পথের যাত্রী।

বিহ্বল হৃদয়ে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম, পিসিমা জানাইতেছেন, বৌদিদির মৃত্যুর পর দাদা ধীরে ধীরে অধঃপতনের নিম্ন সোপানে নামিতেছেন, বিষয় অনেক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। জলের ন্যায় অর্থের অপব্যয় হইতেছে। যে দাদা পান তামাকটি পর্য্যন্ত খাইতেন না, এখন তিনি নেশা করার অভ্যাস করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের একবার তাঁহার নিকটে যাওয়া প্রয়োজন। দাদার আপনার বলিতে কেহ নাই, আমি একমাত্র বোন, উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সাম্‌নে থাকিলে লজ্জায় সঙ্কোচে দাদা বোধ হয় শোধরাইয়া যাইবেন। পত্রের অক্ষর গুলি চোখের জলে না ভিজাইয়া সুরটি অশ্রুজলে পরিসিক্ত করিয়া পিসিমা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি না গেলে তিনি অবিলম্বে কাশীবাসিনী হইবার ভয় দেখাইতেও ক্রটী করেন নাই।

পিসিমার চিঠি পড়িয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। আর কেহ নহে, আমার সেই দাদা, তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন, ইহা বিশ্বাস করিতে যে প্রবৃত্তি হয় না।

তিনি কলেজ হইতে ফিরিলে আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি মুচকিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বর্ষার মেঘে কেবল বাইরেই আঁধার হয় নি, আমার ঘরেও মেঘের ঘটা দেখচি। মুখ এত ভারী কেন লীলা?"

কহিলাম, "ভারী আবার কোথায়? কবির চোখে মেঘের ঘোর লেগেই থাকে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে আগে জল খাও, পরে তোমায় একখানা চিঠি দেখাব; পিসিমা লিখেছেন।"

"পিসিমার চিঠি, তাঁরা ভাল আছেন ত? জল খাওয়া পরেই হবে, আগে মেঘোদয়ের কারণটাই দেখাও না। চিত্ত প্রসন্ন না হলে খাবারে স্বাদ থাকে না। তোমার হাসিটিই যে আমার বড় খোরাক, তাতে বঞ্চিত করে কতক গুলো মিষ্টির ঢেলা মুখে পুরলে আমার ক্ষিধে যাবে না।"

তাঁহার সরস বাক্যালাপে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া গেল। আমি পিসিমার চিঠিখানা তাঁহার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম।

তিনি মনোযোগ সহকারে পত্রখানি পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় কক্ষ ভরিয়া তুলিলেন। যাহাতে আমার এত যন্ত্রণা, এত ব্যথা তাহাতেই তাঁহার এ কৌতুক আমার ভাল লাগিল না।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "হাসবে বৈ কি, দাদা তো তোমার নয় আমার, তার ভাল মন্দে তোমার লাগবে কেন? লাগলে হাসতে পারতে না।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তিনি আমার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হাসির কথায় হেসেচি বলে তোমার চোখে জল এল, সাধে কি মেঘের সাথে উপমা দিয়েচি? আজকাল তোমার বুদ্ধি খুলেচে দেখচি, তোমার দাদার ভাল মন্দে আমার কিছু লাগে না, বেশ সুন্দর কথা। কিন্তু দাদার ত কিছু হয় নি, এ বয়সে অমন লক্ষ্মীছাড়া হলে আমিও পুলিন বাবুর চেয়ে অনেক বেশী লক্ষ্যহারা হ'য়ে যেতাম। অর্দ্ধাঙ্গিনীকে হারানর নামই অধঃপতন, তা ছাড়া অন্য অধঃপাত পুলিন বাবুর হতে পারে, আমি তা বিশ্বাস করি না।"

কহিলাম, "বিশ্বাস না করে উপায় কি? সময়ে অবিশ্বাসের জিনিসকে বিশ্বাস করতে হয়, তুমি কলেজে গিয়ে কালই ছুটী নেবার চেষ্টা কর, দাদার কথা শুনে এখানে আমি আর থাকতে পারচি না।"

ক্ষণকাল ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "ছুটীর দরবার করে এখন লাভ নেই, এখন ছুটী পাওয়া যাবে না। কিন্তু না পেলে তোমার যাবারই বা কি করবো? তবে একটা উপায় আছে অবিনাশ বাবু সস্ত্রীক দেশে যাচ্ছেন, তুই এই সাথে গেলে পূজার ছুটীতে আমি গিয়ে আনতে পারবো।"

মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাবে তখনই সম্মত হইলাম।

২

সুদীর্ঘ দুইটি বছর পর শস্য-শ্যামলা মলয়জ শীতলা আমার সোণার বাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল কিন্তু হৃদয় জুড়াইল না।

দাদা আমাকে লইতে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সুন্দর স্বাস্থ্যবান দাদা কি হইয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বল বর্ণে তামাটে ছাপ পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরগত, সুঠাম শরীর শীর্ণ হইয়া ঈষৎ হেলিয়া গিয়াছে। মুখের কোথায়ও সেই সদাপ্রফুল্ল প্রসন্ন হাসিটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দাদা চিরদিনই বেশভূষার পক্ষপাতী ছিলেন, এখন সে দিকেও কি পরিবর্ত্তন। দাদার পরিধানে আধ ময়লা একখানা খদ্দরের ধুতি, পিরাণের উপর খদ্দরের ময়লা উড়ানি, পায়ে তালতলার চটী। বাবার একমাত্র বংশ দুলাল, সব দিকেই সে আজ এমন বদলাইয়া গিয়াছে।

দাদার সহিত বাড়ী ঢুকিতেই পিসিমা ছুটিয়া আসিলেন, আমাকে বক্ষে বাঁধিয়া বধূর উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিলেন— "তুই এলি নীলা, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলি না, পোড়ারমুখী আমার সোণার সংসার ছারে খারে দিয়ে, সোণার ছেলেকে রসাতলে ভাসিয়ে চলে গেছেরে।"

পিসিমার আকুল ক্রন্দনে দাদা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার অবাধ্য অশ্রুজল আর বাধা মানিল না, আজ আবার নূতনরূপে আমার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। চারিদিকের শ্রীহীনতা, বিশৃঙ্খলতা আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

অশ্রুর প্রথম পসলা বর্ষণের পর আমার অশান্ত হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। যে চলিয়া গিয়াছে—কাঁদিয়া তাহাকে ত' ফিরাইতে পারিব না। কিন্তু তাহারি বিচ্ছেদে যে মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়াছে তাহাকে যে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সেদিন স্বামীর আশ্বাসে দাদার প্রতি আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছিল, কিন্তু দাদাকে দেখামাত্র কোথা হইতে সেই সন্দেহের ক্ষীণ মেঘ-রেখা আমার অন্তরাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কৈ দাদার মুখে ত' স্ত্রীর সম্বন্ধে একটি কথা শুনি না, শোক নাই, দুঃখ নাই, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-লেখকের মত:না হোক রাম, শ্যামের ন্যায় একছত্র লেখা পর্য্যন্ত নাই। স্নেহময়ী প্রেমময়ী পত্নীর স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত কোনও যত্ন

নাই, বিপথের পথিক হইয়া দাদা স্ত্রীর স্মৃতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে। যাহার মনের মধ্যে কিছুই নাই, সে কেন শরীরের অত্যাচারের শত চিহ্ন খদ্দরের আবরণে লুকাইতে এত যত্নবান হইয়াছে?

দাদার ঘরে গিয়া আমি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না, জোড়া খাটের উপর বৌয়ের বিছানাগুলি বেড়-কভারে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের কোথায়ও তাহার হাতের একটি দ্রব্য বা একখানি ফটো চিত্র আমার দৃষ্টিপথে পড়িল না। দাদা দিনান্তে দুই একবার মাত্র বধূর কক্ষে পদার্পণ করিতেন। দুই বেলা আহারের সময় ব্যতীত অন্তঃপুরে আসিতেন না। তাঁহার জলযোগ, চা পান সমস্তই বাহিরে সমাধা হইত।

ক্রমে অনেক কথাই জানিতে পারিলাম। বাবার কত যত্নের লোহার কারখানাটি দাদা জলের দরে বিক্রয় করিয়াছেন। সে অর্থের যে কি গতি হইয়াছে বাড়ীর পুরাতন সরকারও জানে না।

কয়েকদিন পর আমি লক্ষ্য করিলাম—দাদা রাত্রে বাড়ী থাকেন না। আমাদের বাড়ীর শেষ সীমায় দাদা একটি বাগান বানাইয়াছিলেন, অনেক গুলি চারা গাছ ফুটন্ত ফুলে সাজিয়া ক্ষুদ্র বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিত। সেই বাগানের মধ্য দিয়া একটি সোপান উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। সোপানের শেষে দ্বিতলে একখানি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের নিম্নে চত্বর। গৃহখানি বাড়ীর বাহিরে বাগানের ভিতর হইলেও অন্দরের দিকে একটি দ্বার ছিল।

পিসিমার কাছে শুনিয়াছি বধূ অসুস্থ হইয়া ওই নির্জ্জন কক্ষে তাহার শেষ শয্যা পাতিয়াছিল। কত প্রভাত সন্ধ্যায় দাদাকে বাগানের পথে সেই কক্ষদ্বারে দেখা গিয়াছে। সে গৃহে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। দাদার নিকটেই তাহার তালা চাবী থাকিত। বাবার আমলের ভৃত্য হরেদা মাঝে মাঝে দাদাকে মদের বোতল হস্তে সেই ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াছে। একদিন প্রত্যুষে কদম-ঝি বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া মুক্ত গবাক্ষপথে দাদার পাশে একটি স্ত্রীলোককে নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটি জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া মাথায় কাপড় দিয়া বসিয়া ছিল।

সমস্ত শুনিয়া দাদার প্রতি একটা ক্ষমাহীন ধিক্কারে আমার মন বিমুখ হইল। বাল্যকাল হইতে পাপকে বড়ই ঘৃণা করিতাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবেকবুদ্ধির পায়ে যে কুঠারাঘাত করে আমার মতে কোন প্রকারেই তাহারা ক্ষমার যোগ্য নহে। নিমেষের ভুল ভ্রান্তিতে যে পাপ সঞ্চয় হয় সেটাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিলেও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর আর কথা চলে না।

চোখের জলে ভাসিয়া দাদার চরিত্রহীনতার আমূল কাহিনী স্বামীকে লিখিলাম।

পাঁচ ছয় দিন পর পত্রোত্তর আসিল, "নীলা, তোমার পত্রে কিছু বুঝতে পারচি না; তোমরা বোধ হয় আগা গোড়াই ভুল করচ। মানুষের সন্দেহের মতন শত্রু আর নেই, একবার ও বিষ মনের ভেতর ঢুকলে তিলকেও তাল বোধ হয়।

"আমি ভ্রমেও পুলিন বাবুকে অবিশ্বাস করতে পারি না, যারা দেখাতে পারে না, জানাতে পারে না, সকলে তাদের বুঝতে পারে না। তুমি তোমার কবি-স্বামীর কাছ থেকে হৃদয়ের ভাব ভাষা প্রকাশের আস্বাদ পেয়েছ, কিন্তু অপ্রকাশের অন্তরালেও যে ফল্গুর স্নিগ্ধধারা বইতে পারে, এটা তোমার ধারণায় আসে না।

"ওগো কবিরাণী, আর কদিন অপেক্ষা কর, পূজোর ছুটী এসে পড়লো, আমার রওনা হবার বেশী দেরী নেই, তারপর সাক্ষাতে তোমাদের অপূর্ব্ব সন্দেহের, পুলিনবাবুর অদ্ভুত অধঃপতনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস আবিষ্কার করা যাবে।"

চিঠি পড়িয়া রাগ হইল। আমার দাদাকে আমাপেক্ষা তিনি যেন বেশী চেনেন। এ যেন 'মা'র চেয়ে মাসীর দরদ'। রাগ হইলেও তিনি শীঘ্র আসিবেন সংবাদটি আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। হৃদয়ের পুলক-হিল্লোলে দাদার বিরাট অপরাধের বোঝা আমার কাছে অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। আজ প্রথম মনে পড়িল, কৈ আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত একদিনও ত' দাদাকে 'দাদা' বলিয়া কাছে ডাকিয়া তাহার হৃদয়-ব্যথা জানিতে চেষ্টা করি নাই। শৈশবের সেই নির্ম্মল প্রীতি, অক্ষুণ্ণ ভালবাসা, অখণ্ড বিশ্বাস

লইয়া আমি একটিবারও দাদার পার্শ্বে যাই নাই বলিয়াই কি দাদা আমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন? যে দুঃখে সুদূর লাহোর হইতে পিসিমা আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, স্বামী অশেষ অসুবিধা সহ্য করিয়াও আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাহার কি করিতেছি? পিসিমার সহিত গল্প করিয়া, নভেল পড়িয়া, দিবানিদ্রায় দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছি। আমি না নারী, ভাইয়ের বোন, ভাইটি আমারই চোখের সাম্‌নে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, আমি নীরবে বসিয়া আছি। তাহাকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও কি আমার নাই?

সেদিন আমি সমস্ত দ্বিধা সংশয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাদার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িলাম। দাদা তখনি কি একটা কাজে নিজের ঘরে আসিয়াছিলেন, আমি নিঃশব্দে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দাদা পশ্চাৎ ফিরিয়া একটি মখমলের ক্ষুদ্র বাক্স খুলিয়া নিবিষ্ট ভাবে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া উঁকি দিয়া দাদার দর্শনীয় দ্রব্যটি দেখিয়া লইলাম। মখমলের বাক্সে সযত্নে লুক্কায়িত সে দ্রব্য আর কিছুই নহে চুণি পান্নায় খচিত দুই গাছা কঙ্কণ। খাটের উপরে শাড়ীর একটি নূতন বাক্সও দেখা গেল। পূজা আসিতেছে পূজার প্রীতি-উপহার কিনিয়া দাদা এই মুহূর্ত্তে বাড়ী ফিরিয়াছেন। কিন্তু ইহা কাহার জন্য? কাহাকে এই মূল্যবান বসন ভূষণে সাজাইতে দাদার এত ব্যগ্রতা?

ধীরে ধীরে আমার স্মৃতির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, এ সেই দাদা, যাহাকে সোণার প্রতিমা বধূকে সাধ করিয়া কোন জিনিসই দিতে দেখিনাই। পিসিমা যাহা দিতে বলিতেন, দাদা নিরুত্তরে তাঁহার আদেশ পালন করিতেন মাত্র। ইহা লইয়া আমি অনুযোগ অভিযোগ করিলে দাদা সহাস্যে উত্তর করিতেন, "পিসিমা আমাদের সকলের ওপরে, তাঁকে উপেক্ষা করে এখুনি আমি বৌকে উপঢৌকন উপহার দিলে তাঁকে যে ক্ষুণ্ণ করা হয় নীল, নইলে আমার যা কিছু সবই ত তোদের বৌয়ের একথা তোরাও জানিস, সেও জানে। পিসিমা আর ক'দিন, এখন তাঁর [illegible] চলুক।" হায়, সেই পিসিমা, সেই দাদা! আজ কাহার নিমিত্ত এসব আসিয়াছে? বাবার শোণিততুল্য কারখানা বিক্রয়ের অর্থে কাহার পূজা হইবে? প্রসাধন হইবে? হঠাৎ কদম-ক্ষির কথা মনে পড়িল, যাহার সহিত বাগানের নিভৃত কক্ষে অভিসার চলিতেছে এসবই যে তাহারই চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত। লজ্জায় ঘৃণায় আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। ছুটিয়া পালাইয়া আসিলাম।

আমার পদশব্দে দাদা বোধ হয় আমার উপস্থিতি জানিতে পারিয়াছিলেন, পশ্চাৎ হইতে দুইটিবার স্নেহস্নিগ্ধ-কণ্ঠের 'নীল' ডাক আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি ফিরিলাম না, ফিরিব কাহার কাছে? রক্ষিতার সন্তুষ্টির নিমিত্ত আয়োজনে যে ব্যাপৃত, তাহারি কাছে?

৩

পিসিমা ধরিয়া বসিয়াছেন দাদাকে পুনর্ব্বার বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া স্কন্ধের ভূত আমাকেই ছাড়াইয়া দিতে হইবে। পিসিমার দূর সম্পর্কীয় বিধবা ননদের মেয়েটির প্রতি তাঁহার লক্ষ্যও ছিল। দাদার পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গে আমার অন্তঃস্থল বেদনায় বিদীর্ণ হইতেছিল। আমার ভয় হইতেছিল, আমি দাদার অধঃপতন সহ্য করিতেছি বটে কিন্তু আমার আদরের বধূর স্থানে আর কাহারো অচল আসন পাতা আমি বোধ হয় সহিতে পারিব না। কে আসিবে? কাহার আড়ালে তাহার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? কিন্তু আমার ইচ্ছাই ত' চূড়ান্ত নহে, বাবার বংশরক্ষা, দাদার মঙ্গলের কাজ যে আমাকেই করিতে হইবে। পিসিমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, মরণসাগর-কূলে বসিয়া ঢেউ গণিতেছেন। এ সংসারের যাহা ধ্রুব যাহা শুভ তাহা যে আমাকেই করিতে হইবে।

পিসিমার সাধ তাঁহাদের জামাতা আসিলে পূজার ছুটীর মধ্যেই দাদার বিবাহ হইয়া যায়। এ প্রথম বারের ধুম ধামের আনন্দের বিবাহ নহে, সংসার-ধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত দ্বিতীয় বার একটা অনুষ্ঠান মাত্র। ইহার আবার দিন কাল কি? বিশেষতঃ তাঁহার ভাগিনেয়ীটী অরক্ষণীয়া।

পিসিমার ব্যস্ততার সীমা নাই, বিবাহের প্রস্তাব হইতে না হইতেই তাঁহার ননদকে সংবাদ পাঠাইলেন।

বিধবা নিকটেই থাকিতেন, পিসিমার আশ্বাসে আশাপূর্ণ হৃদয়ে মেয়ে সাজাইয়া পিসিমার ননদ সেদিন মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিলেন।

মেয়েটি ডাগর, দেখিতে ভাল, খুব চালাক চতুর, ফিট ফাট, নাম ইন্দু। দাদাকে চালনা করিতে ইহাপেক্ষা ধারাল অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না।

পিসিমা নানা কৌশলে দাদাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া ইন্দুকে তাঁহার নয়নপথে দাঁড় করাইয়া দিলেন। ছলনায় মেয়েরা যত পটু, পুরুষ তাহা নহে। দাদা ভদ্রতার খাতিরে ইন্দুকে দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। ইন্দুর মা'র সহিত কয়েকটি অবান্তর কথাও কহিলেন। এ মায়াজালে আমি যোগ দিতে পারিলাম না। আমার বুক হইতে কণ্ঠ অবধি অশ্রুজল ভরিয়া উঠিল। বার বার তাহারই সুন্দর শান্তিপূর্ণ মুখখানি প্রাণের পাতে পাতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে বয়সে আমার একমাসের ছোট ছিল, সেই হিসাবে তাহাকে বৌদিদি বলিতে আমার ভাল লাগিত না। তাহার মন্দাকিনী নাম আমি সংক্ষিপ্ত করিয়া আদরের 'মন্দ' বলিয়া ডাকিতাম, ঠাকুরঝির পরিবর্ত্তে সে আমাকে 'ভালো' বলিয়া ডাকিত। আমার মন্দ আজ লোকলোচনের অন্তরালে জন্মের মত অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু 'ভালো'র বুকে যে স্মৃতির মালা গাঁথা রহিয়াছে। সে মালার ফুলে ঢাকা কণ্টক আমার বক্ষে বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় আকুল করিতেছে, সে জ্বালা যে আমি সহিতে পারি না।

ইন্দুরা প্রস্থান করিলে আমি নীরবে আমার মন্দর অন্ধকার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িলাম। যে গৃহ একদিন হাস্য-কলরবে মুখরিত হইয়া থাকিত, সেই আনন্দ-আলয় এখন নির্জ্জনতার রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দাস দাসীরা এদিকে আসে না, সন্ধ্যায় তাহার প্রসন্ন হাসিটুকুর মত প্রদীপটা পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয় না।

অন্ধকারে দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম, "মন্দ, তুই কোথায় গেছিস, একবার ফিরে আয়।"

কিয়ৎকাল পর পদশব্দের সহিত আমার মস্তকে একটি স্নেহের স্পর্শ হইল। এ স্পর্শ আমার অজানা নহে, আঃ! কত কাল পর দাদাকে কাছে পাইলাম। কাছে পাইয়াও কথা বলিতে পারিলাম না। আমি না পারিলেও দাদা চুপ করিয়া রহিলেন না।

আমার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে আস্তে আস্তে ডাকিলেন, "নীল, কান্না কেন দিদি? কাঁদলে কি সে আর ফিরে আসবে?"

কোনরূপে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আমি ধরা গলায় কহিলাম, "সে যে ফিরে আসবে না, তা আমি জানি দাদা, তবুও তোমার হৃদয়হীনতা আমি সইতে পারি না। তার অত যত্ন, ভালবাসা তুমি কি করে ভুলে গেলে? তাকে মনে রেখে, তুমি কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে গেলেও যে আমার দুঃখ ছিল না। তাকে ভুলে রসাতলের পথে গেলে কেন দাদা"?

—"রসাতলের পথে,—নীল, তুইও আমায় অবিশ্বাস করিস্? আমি যাব কোথায়?"

কহিলাম, "কোথাও তোমার যেতে হবে না দাদা, যে যাবার সেই গেছে, তার জায়গা ইন্দু পূর্ণ করতে আস্‌ছে। পিসিমা সেই জন্যেই তাদের আনিয়েছিলেন।"

দাদা শিহরিয়া উঠিলেন। আমার চুলের মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলিগুলি অচল হইয়া গেল। মিনিট দুই বসিয়া দাদা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

৪

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর হরেদার 'ডাক্তার,' 'জল', 'বাতাস' চীৎকারে আমি চমকিত হইলাম। বাগানের দিক হইতে কলরব আসিতেছিল। একটা অজানা আশঙ্কায় আমি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া পাগলের ন্যায় সেইদিকে ছুটিয়া চলিলাম।

ত্রিতলের সিঁড়ি বাহিয়া অন্দরের দ্বার খুলিয়া কেমন করিয়া যে আমি বাগানের ঘরে আসিয়াছিলাম তাহা জানি না।

ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল, নিদ্রা না জাগরণ! প্রশস্ত হল-গৃহের চতুর্দ্দিকে আমার মন্দর শত চিত্র। দক্ষিণের বাতায়নের নিম্নে বেদীর উপর মন্দর অবিকল মৃণ্ময় মূর্ত্তি, মাথায় আধ-ঘোমটা, কপালে সিন্দুরবিন্দু, পরিধানে নূতন বেণারসী হাতে সেই দুইটি চুণি পান্নার কঙ্কণ।

পূজার উপহারে আমার মন্দ সুসজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কে বলিবে এ মাটীর মূর্ত্তি প্রকৃত মন্দ নহে। সেই হাসি, বসিবার ভঙ্গিমা, বামগণ্ডে কৃষ্ণ তিল। কদম-ঝি আমার এই মন্দকেই দেখিয়াছিল, আমি মুগ্ধ নেত্রে মন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, মূর্ত্তির পদনিম্নে চক্ষু নত হইতেই দাদার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, দাদা নিমীলিত নয়নে মন্দর অদূরে শুইয়া ছিলেন। আমাদের প্রতিবেশী ডাক্তার বিনয়বাবু লৌহশলাকা দ্বারা দাদার শরীরে ঔষধ বিদ্ধ করিয়া দিতেছেন। শিয়রে বসিয়া হরেদা বাতাস করিতে করিতে কাঁদিতেছে, "এ ঘরের এত কলকারখানা আমি কি আগে জানি গো, এই মুখে দাদাবাবুর কত অপবাদ দিইচি সেই পাপে আমাকে সশরীরে নরকে থাক্‌তে হবে। ভাগ্যে বাগানের গাছে জল দিতে এসেছিলাম, নইলে দাদাবাবুর এমন মাথা ঘুরানি কেউ জান্‌তে পারতো না।"

পিসিমা তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

আমি ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিতেই তিনি চুপে চুপে বলিলেন, "ভয় নেই, মাঝে মাঝে এমনি হয়। স্ত্রী মরবার পর বড্ড shock পেয়েছেন কিনা, তাই সাম্‌লে উঠতে পারেন না। মুখে কিছু না বল্লেও তাঁর প্রসঙ্গে অস্থির হয়ে পড়েন। আমি বোতলে একটা টনিক দিয়েচি তাই খেয়ে ভালই ত ছিলেন, আজ বোধ হয় কোন উত্তেজক কথা বার্ত্তা হয়ে ছিল?"

—আমি কি বলিব? বলিবার আমার কি আছে, মানুষ যে মানুষের বাহ্যিক আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বিচারকের আসনে বসিয়া থাকে, হৃদয়ের খবর কে জানিতে পারে, কে জানিতে চাহে। আবাল্য যাহারা এক সাথে প্রতিপালিত হইয়া প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গিয়াছে, বিচারের বেলায় তাহাদেরই আগ্রহ সাধারণ হইতে বেশী দেখা যায়। যাহার সহিত অল্প পরিচয়, সামান্য সম্বন্ধ, তাহারাও ভুল করে না। স্বামী দাদাকে ভ্রমেও অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি পর আমি আপনি।

আমাকে নীরবে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ডাক্তার বাবু পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্যে এই বাড়ীটা আপনার নামে রেখে পুলিন বাবুর সর্ব্বস্ব দেশের কাজে দান করেছেন। স্ত্রীর মূর্ত্তি তৈরি করাতে কত পরিশ্রম অর্থ ব্যয় হয়েছে। এমন পত্নী, প্রেমিক-দেশভক্ত একালে দুর্ল্ল‌ভ। শরীর খারাপ বলে আমিই জোর করে ধ'রে রেখেচি, নইলে এতদিন কোথায় চলে যেতেন। এঁর যা কিছু সবই নীরবে, কারুর জানবার ক্ষমতা নাই।"

দাদা চোখ বুঁজিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "কার কাছে আমার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে ডাক্তার বাবু? আমার কথা অন্যকে জানাতে আমি না বারণ করেছিলাম? এই বুঝি আপনার কথা রাখা?"

আমি আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলাম না। দাদার দুটি পায়ে মাথা রাখিয়া কহিলাম, "আমি তোমায় চিনতে পারিনি দাদা, ডাক্তার বাবু চিনিয়ে দিলেন, ভুল সকলেরি হয়, আমারো হয়েচে। তুমি কি আমায় মাপ করতে পারবে? সে নাই এখনো আমি আছি, তুমি কোথায় যাবে? আমি তোমায় যেতে দেব না দাদা।"

"দাদা ত তোর অবাধ্য নয় নীল, আমার কাছে তোর অপরাধ কি? মাপ কিসের? তুই যে তার কত ভালবাসার ছিলি, তোর দাদা এখনো সেটা ভোলেনি দিদি।" বলিয়া দাদা স্নেহভরে আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

প্রেম

[শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ]

তখনো আসে নি প্রেম ; প্রেমের স্বপন
এল তার রাঙা অনুরাগে।
দুয়ার কি দিল খুলে ফাগুন-পবন ?
লাল আলো দুনয়নে লাগে।
ভাঙিল উষার ঘুম ; ব'সে বাঁধে চুল :
আলোর শাড়িতে ঢাকে আধ-ফোটা ফুল।

আধখানি আলো আর আধখানি ছায়া,
এ উষার মুখপানে চায়।
হাল্‌কা হাওয়ায় ওড়ে পরীদের কায়া।
মন দোলে স্বপন-দোলায়।
সহসা চুড়ির স্বর বাজে রিণ ঠিনি।
আর বাজে মন মোর—'এ মেয়েরে চিনি ?'

চেনার আলোকে আসে একটি ভোমর,
সারা'খন করে গুণ গুণ।
'এ ফুল ফোটে নি আজো।'—ও-ফুলটি মোর ?
'পাপড়িতে ঢেকেছে আগুন।'
আগুন কি করে জানো ? 'জানি হাত ছাড়'।'
আকাশের ফিকে-নীল হ'য়ে আসে গাঢ়।

কখন কে যেন এসে বসিয়াছে কাছে ;—
ভালো ক'রে দেখি চেয়ে চেয়ে।
এ কি সেই ?—বাহিরেতে বেলা বাড়িয়াছে—
আর এই অচেনা সে মেয়ে।
সবুজ ঘাসের 'পরে সকালের রোদ
শিশির-কণারে চুমি' করিছে আমোদ।

ঠোঁটে ভাঙে মিঠে-রাঙা হাসিটির আলো ;—
দুচোখে চাহিলে ?—তাহা নীল।
সে আলো ভোমরা-চুলে দেখায় যে কালো।
মন টানে চিবুকের তিল।
উছলি' উঠিচে দেহ সীমানা ছাড়ায়ে !
গায়ের সুরভি ভাসে প্রভাতের বায়ে।

মনে কি পড়িছে সেই পরিচয়-ক্ষণ ?
চোখে চোখে চাওয়ার আলোক ?
সোণার স্বপন ভেঙে রবির কিরণ
দেখাইল কোন নব-লোক ?
নাহি জানি ; কেই বা তা' জানে বল মনে ?
সে দিন কাঁদিনু কেন প্রথম গোপনে ?

এ জগতে যত ফুল ফুটে থাকে রোজ,
ঘিরে রয় কাঁটার পাহারা।
আপন আবেগে তাই যবে করি খোঁজ,
বুকে বয় শোণিতের ধারা।
প্রভাত পুড়িয়া হয় তপ্ত দুপুর।
অমৃত ? মদিরা ; তাই গানে এত সুর।

সে-গানে যে ফেলে ছায়া সাঁঝের পূরবী।
ম্লান হয় আলোর কুসুম ;
আপন চিতায় পুড়ে নিবে যায় রবি।
চোখে নামে রজনীর ঘুম।
ঘুমে যে দু-চোখ ছাওয়া ; কেন জাগ আর ?
তোমার চুলের মতো ঘনালো আঁধার।

থাক্ থাক্ রাঙা-বাস রেখে দাও ছাড়ি'।
রঙে কি ভুলাবে বারোমাস ?
আয়নায় দেখ চেয়ে ওই রাঙা-শাড়ি
কতখানি করে উপহাস।
তুমি যে ফুরায়ে গেছ, সে কি দোষ তব ?
তুমি মোর মাঝে আছ হ'য়ে অভিনব।

দুটি চোখ ঢুলে আসে—ঘুমাও ঘুমাও।
মেঘে ঢাকা রজনী গভীর !
নাই বা রহিল তারা ! (এই চুমা নাও),
সীমা-হীন নিবিড় তিমির।
তোমার প্রেমের গানে ভরিয়া দিব-যে।
জানো কি ? আসিবে নব-উষা তার খোঁজে !

পুঁথি-পত্র

[শ্রীকালিদাস রায়]

চীন তিব্বত ও মধ্য আসিয়াতে এমন সব সংস্কৃত গ্রন্থের আবিষ্কার হইয়াছে—সমস্ত ভারতবর্ষে তাহাদের একটি পৃষ্ঠাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—ভারতবর্ষের পুঁথিপত্র বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণে বিধর্ম্মী রাজার শাসনে ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন—এ দেশের জল বায়ু পুঁথি রক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে—লেখ্যপত্র (তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র, তুলোট ইত্যাদি) এদেশের বিরুদ্ধ জলবায়ুর প্রভাবে শীঘ্র নষ্ট ও কীট দষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হয়। এ সকল কথার মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সব চেয়ে যাহা প্রধান হেতু তাহা অনুমানসাপেক্ষ হইলেও প্রত্যক্ষেরই মত।

এই ভারতবর্ষের জনসমাজে জনপদ-বিধ্বংসি উপদ্রবের অভাব নাই। নানাবিধ রোগ আছে--দারিদ্র্য আছে—প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে—আধিভৌতিক আক্রমণ আছে—যুগে যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদেশী আক্রমণ চলিয়া আসিতেছে। তবু ভারতবাসীর সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া বাড়িতেছে কেন? ভারতবর্ষের উপর যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা আঘাত উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে তাহাতে জনসমাজ লুপ্ত হইতে ত' পারিত। দেশের মানুষ নানা উপদ্রবে অকালে মরিয়াছে—জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে পারে নাই—কিন্তু শত উপদ্রব সত্ত্বেও সন্ততি রাখিয়া গিয়াছে—তাহারাই পিতৃপুরুষের ধারা বজায় রাখিয়াছে ও তাহাদের ব্রত পালন ও উদ্‌যাপনের চেষ্টা করিয়াছে। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের জন-পরম্পরায় বংশধারা অব্যাহত ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান হইয়াই চলিয়া আসিয়াছে।

পুঁথিও তেমনি করিয়াই বাঁচিতে পারিত। পুঁথিও বাঁচিতে পারিত তাহার সন্ততির সংখ্যাধিক্যে—বাঁচিতে পারিত শ্রুতি ও স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া। একখানি পুঁথির আক্ষরিক জীবন যদি ৫০ বৎসর মাত্র হয়—তবে সে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিবার আগে অন্ততঃ ৫।৭ শত সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারিত। সেই ৫।৭ শতের প্রত্যেক খানি আবার ৫।৭ শত করিয়া সন্ততি রাখিতে পারিত। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে কোন উপদ্রবই দেশে পুঁথির নির্ব্বংশ সাধন করিতে পারিত না। বহু লোকের স্মৃতি ও শ্রুতিকে আশ্রয় করিলেও তাহার নির্ব্বংশ সম্ভব হইত না—গ্রন্থকে ধ্বংস করা যায় কিন্তু মনের সঙ্গে তাহার যে গ্রন্থি তাহা ত' ছিন্ন করা যায় না। একখানি পুঁথি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে স্মৃতি হইতে তাহার পুনরুদ্ধার করা যায়—পাঁচ জনে মিলিয়া স্মৃতি-ভাণ্ডারের চাঁদা তুলিয়াও তাহাকে পুনর্লিখিত করা যায়।

যে কোন রাজা, যে কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যে কোন বিদ্যানুরাগী প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি—জ্ঞান প্রচারের পৃষ্ঠপোষণ, গ্রন্থের শতসহস্র অনুলিপি প্রতিলিপি করানর জন্য দেশ-বাসীকে আহ্বান করিতে পারিতেন, মঠে মঠে, চৈত্যে চৈত্যে, বিহারে বিহারে, চতুষ্পাঠীতে চতুষ্পাঠীতে, এমন কি গৃহে গৃহে প্রত্যেক গ্রন্থের প্রতিলিপি থাকিতে পারিত। যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই তখন এই উপায় মাথায় আসা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হয় নাই।

দেশের শতকরা ৯৮ জন লোকের যদি গ্রন্থস্থ জ্ঞানে অধিকারই না থাকে—তবে গ্রন্থের সন্ধান কয়জন রাখিবে?—সন্ধান পাইলেও কয়জনের আগ্রহ জন্মিবে?—অনুলিপির জন্য আমন্ত্রণ প্রচারিত হইলেই বা কয়জন তাহাতে সাড়া দিবে? জনকতক অধিকারী সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া থাকিলে আমন্ত্রণ দ্বারে দ্বারে পৌঁছিবেই বা কি করিয়া?

সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা থাকা এক—দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার থাকা স্বতন্ত্র কথা। কোন দেশের আপামরসাধারণ সকলেই—দেশের জ্ঞানসম্পদের অধিকারী হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না,—তবে যত বেশী লোকের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার হইবে—জ্ঞানের বাহন ও আশ্রয়ের স্থায়িত্বও তত বাড়িবে—

সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ভারতবর্ষ অন্য যে বিষয়েই বদান্য হউক—জ্ঞান দানে যে তাহার কার্পণ্য ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।—শিক্ষার্থিবিচারে জ্ঞানিগণ বড়ই কঠোর ছিলেন। যে কতকটা শিখিতে পারে তাহাকে শিক্ষার্থীর মর্য্যাদা দেওয়া হইত না—সম্পূর্ণ যে অধিগত করিতে পারিবে সে ছাড়া আর কাহারো শিক্ষার সুযোগই হইত কিনা সন্দেহ। এমনও শুনা গিয়াছে—কোন এক যুগে হয় ত এক ব্যক্তিই বিদ্যা বিশেষের পারদর্শী ছিলেন—তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচর্য্যা পরিশ্রম ইত্যাদিতে পরিতুষ্ট হইয়া হয়ত আর একজনকে মাত্র দিয়া গেলেন। বড় বড় গুণী জ্ঞানী মন্ত্রগুপ্তিকে জীবনের ব্রতস্বরূপ মনে করিয়া আমরণ বিদ্যাকে আত্মস্থ রাখিয়া মৃত্যু শয্যায় হয়ত কাহাকেও দিয়া গেলেন। এই মনোভাবটি যে ভারতবর্ষের মজ্জাগত তাহার উদাহরণ পুরাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই মনোভাব হইতেই পুঁথি সহজে কেহ ছাড়িত না, তাহার অনুলিপি প্রতিলিপি করিতে দিত না। অপর লোকে পাছে নিজের নামে চালায় এ ভাবনাও বোধ হয় ছিল। তাহা ছাড়া প্রাপ্ত গ্রন্থাধিকারী ব্যক্তি মাত্রই গ্রন্থকে পরম সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন দুর্লভ বলিয়াই যাহা অমূল্য সম্পদ তাহাকে সুলভ করিয়া দিলে সে সম্পদের মূল্য কমিয়া যায়। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ইউরোপের সংগ্রাহকগণও এই মনোভাব পোষণ করেন। মিথিলা হইতে রঘুনাথকে যে ন্যায়শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া আনিতে হইয়াছিল—তাহা হইতে গ্রন্থসম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদের কিরূপ সতর্কতা ছিল তাহা কতকটা বোঝা যায়।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। যে দেশে যে শাস্ত্রের প্রভাব ঘটিয়াছিল সে দেশের পণ্ডিতগণ সেই শাস্ত্রকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে—তাহারও অনেক অংশ সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় যুগবিপর্য্যয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

জীবিকার জন্য বা ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য যে সব শাস্ত্র অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ধ্বংস হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রায় যে সব গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ জাতির বহু লোক তাহা রক্ষা করিয়াছে। তবু বহু স্মৃতি গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে—একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ইহার একটি কারণ যাহা বলিয়াছেন তাহা বড়ই সমীচীন—রঘুনন্দনাদির স্মৃতিনিবন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতি শাস্ত্রগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার পাইয়া পণ্ডিতসমাজ সেগুলির আর আদর করেন নাই।

—বৈদ্যগণ আয়ুঃশাস্ত্র সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। জ্যোতিষীরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের পুঁথিগুলি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পশুপালন শাস্ত্র, গোবিদ্যা, কৃষিশাস্ত্র রক্ষা করিবে কে? এ সকল শাস্ত্র যাহারা রচনা করিয়াছিল তাহাদের বংশধরগণের সেগুলিতে কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই। যাহাদের ঐ সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহারা অক্ষরজ্ঞানের মর্য্যাদাও লাভ করেন নাই। জানি না, বৈশ্যজাতি বলিয়া স্বতন্ত্র বর্ণ কত দিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রাধিকার লাভ করিয়া এদেশে বিদ্যমান ছিল। রঘুনন্দনের মতে তাঁহার অনেক আগে হইতেই বৈশ্যগণ শূদ্রত্ব পাইয়াছিল। মোট কথা ঐ সকল শাস্ত্র যাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার কথা—ঐ সকল শাস্ত্রের দ্বারা যাহাদের সাহায্য পাইবার কথা তাহারা সে সকল শাস্ত্রে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায় নাই।

জ্ঞানের সহিত জ্ঞানপ্রয়োগের এরূপ বিচ্ছেদ হইলে জ্ঞানের ধারা-বজায় রাখা কঠিন। **Faraday, Kelvin, Dalton, Nobel** ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত জ্ঞান যদি বিশ্বের কল্যাণসাধনে ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে প্রযুক্ত না হইয়া তাঁহাদের যন্ত্রশালায় সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানধারার আয়ু ঢের বেশি কমিয়া যাইত।

জ্ঞানের সহিত প্রয়োগের এই বিচ্ছেদের ফলে ভারতের ব্যবহারিক শাস্ত্রগুলি ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। যে বাংলা দেশে কৃষি, শিল্প, পশুরক্ষা ও পশু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োগ হইবার কথা—সে দেশে ঐ সকল শাস্ত্রের একখানি পুঁথিও পাওয়া যায় নাই। জার্ম্মানী হইতে ঐ সকল পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—এ জন্য দায়ী কে?

জয়-পরাজয়

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

কলিঙ্গরাজ পড়িয়াছে রণে
শত্রুর অসিঘাতে ;
আহত কুমার শক্রাদিত্য—
সেও ধরাশয্যাতে !
বাঙ্গলার বীর বীরসেন ছাড়া
বীর নাহি কেহ বাকী,
পড়িতে পড়িতে রয়ে গেছে যেন
শেষরক্ষার রাখী !
গরজি' উঠিল মগধসৈন্য—
জয়, অশোকের জয় !
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিল সে ধ্বনি
ঊর্দ্ধে আকাশময়।
বীরসেন শুধু বারেক চাহিয়া
দুর্গপ্রাকারপারে,
বজ্রের মতো পড়িল আসিয়া
মৃত্যুর পারাবারে !
কলিঙ্গসুতা কুমারী প্রজ্ঞা
বঙ্গের ভাবী বধূ—
শত্রুর মুখে কালকূট যেবা,
মিত্রের বুকে মধু—
পঞ্চ হাজার সখী সঙ্গিনী
রণরঙ্গিনী সাজি'
দুর্গ হইতে দৃষ্টি-পুষ্পে
বীরেরে বরিল আজি !

শক্তির সীমা আছে রণভূমে ;
সহস্র অরি নাশি',
সেই বীরসেন বর্ষাআঘাতে
প্রাণ দিল শেষে হাসি' !

গর্জ্জি' উঠিল আবার মগধ—
জয়, অশোকের জয়।
রমণীকণ্ঠে ঢাকিল সে ধ্বনি—
নয় নয়, কভু নয় !
নয় নয় নয়—ঝঙ্কারে ফিরে'
পঞ্চ হাজার নারী !—
নহি পরাজিত করিনা স্বীকার
শত্রুর তরবারী !
চণ্ড অশোক ভণ্ড অশোক,
মিথ্যা জয়ের রাজা,
লহ আজি শিরে ভ্রাতৃহন্তা,
নারীহস্তের সাজা !—
—বলিতে বলিতে মুক্ত দুয়ারে
দৃপ্ত কৃপাণ ল'য়ে,
অশ্বারোহণে কুমারী প্রজ্ঞা
আসিল বাহির হ'য়ে।
সঙ্গে তাহার পঞ্চ হাজার
কলিঙ্গ পুরবালা—
পঞ্চ হাজার নাগিনীর মতো
উগারে' গরল জ্বালা !

যে বজ্র-হিয়া টলেনি কখনো
বিপদ-ঝঞ্ঝামাঝে,
সিন্ধু হইতে শৈলে যাহার
বিজয়-দামামা বাজে ;
ভুলায়নি যারে রমণীর প্রেম,
ভুলায় নি যারে ভাই,
জয় ছাড়া যার চক্ষের আগে
দ্বিতীয় দৃষ্টি নাই ;

সেই সম্রাট হেরি' এই নব
　　রণরঙ্গিনী রূপ
চমকি' উঠিল বিস্ময়ে ভয়ে—
　　স্তম্ভিত নিশ্চুপ।
পলকের মাঝে সম্বরি' স্বীয়
　　প্রমত্ত সেনাদলে,
রণভঙ্গীতে বাহু-ইঙ্গিতে
　　উচ্চে ফুকারি' বলে—
সাঙ্গ এ রণ হে সৈন্যগণ।
　　ত্যাগ কর তরবারী;
অশোকের অসি যুদ্ধে কখনো
　　বিদ্ধ করেনা নারী!
চিরজয়ী রণে আজি যে জীবনে
　　প্রথম মানিল হার,
অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ জানি এ
　　নারীর তিরস্কার!
এত কহি বীর, অশ্ববাহিনী
　　প্রজ্ঞার সম্মুখে,
ত্যাগ করি' অসি নিরস্ত্র হাতে
　　দাঁড়াইল হাসিমুখে।

পঞ্চমে তার হাঁকিলা প্রজ্ঞা—
　　কাপুরুষ, অসি লহ,
রমণীর প্রতি হেন অবজ্ঞা
　　দশগুণ দুঃসহ।

পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা,
　　নৃশংস, জেনো তবু—
নিরস্ত্র জনে কলিঙ্গ নারী
　　অস্ত্র হানেনা কভু।
দস্যু, তোমার দুঃসহ অসি
　　তুলি' লহ শেষবার;
নারীর হস্তে হোক সমাপ্তি
　　স্পর্দ্ধিত হিংসার।
প্রতিজ্ঞা করি' ছেড়েছি যে অসি,
　　আর না লইব তুলি'
কহিল অশোক—লভিতে দণ্ড
　　হেলিবে না অঙ্গুলি!
ধূর্ত্ত অশোক, ভাবিয়াছ মনে
　　উদার কথার ছলে,
বিনা রণে জিনি' রুদ্ধ এ পুরী
　　ধ্বংসিবে পলে পলে?
নিজহাতে দিনু উঘারি' বক্ষ
　　হান তব তরবার;
দম্ভী অশোক সত্যই চাহে
　　কঠিন দণ্ড তার।
হউক সে পাপী, মানুষ তবু সে—
　　দেখাবে বিশ্বে আজ,
বাক্য তাহার তেমনি কঠিন,
　　যেমন কঠোর কাজ!

পুরীঅবরোধ আজই লব তুলি'—
　　কথার ছল এ নহে;
অশোক আজিকে হারিয়া বাঁচিল,—
　　মগধ-নৃপতি কহে।
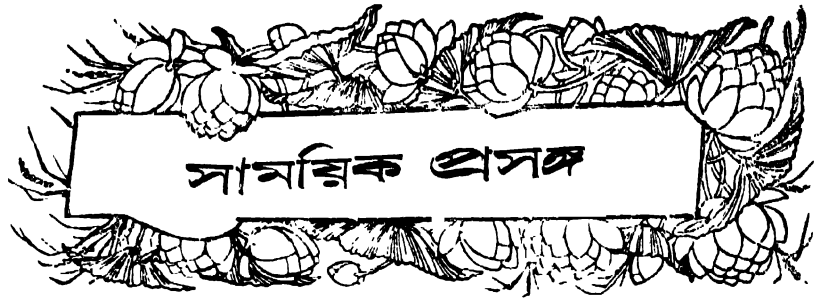
কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন কাঁঠালপাড়ায় (নৈহাটী) তাঁহার স্মৃতিপূজা উপলক্ষ্যে একটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই বোধ হয় এই পবিত্র উৎসব জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই—এমন কি মাসিক পত্রি-

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
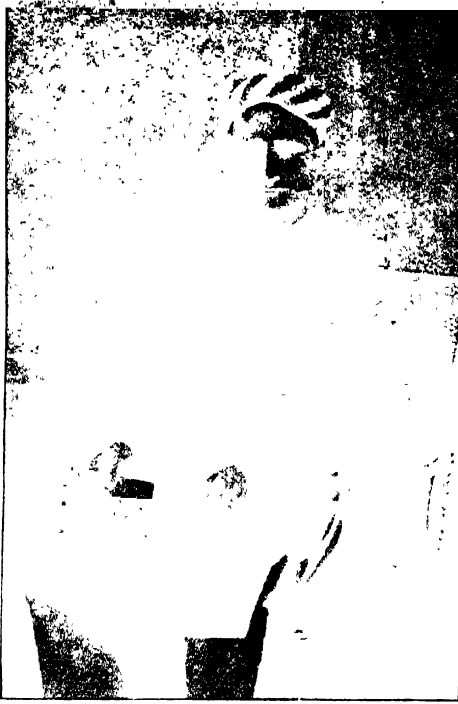
কার সম্পাদকবৃন্দও সাময়িক প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাটের জন্য বিন্দুমাত্র স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান উৎকর্ষের দিনে বঙ্কিমের অবদানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতে হইবে।

সেকালের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন আপনার সমস্ত অনুরাগ ও শিক্ষা লইয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বাঙালীর অনাদর উপেক্ষার স্পর্শ হইতে মাতৃভাষাকে মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সেদিন বঙ্গবাণীর উটজ প্রাঙ্গনে মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বঙ্গভাষার মধ্যে যে বিরাট সৌন্দর্য্যের সত্তা সুপ্ত ছিল বঙ্কিমের "জিয়ন কাঠি"র স্পর্শে তাহা সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে প্রথম বাঙালী গ্রাজুয়েট হইয়াও তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া ঘরে ফিরিয়াছিলেন এবং ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন। তুষারশুভ্র হিমাচলের পাদমূলে গঙ্গাযমুনাবিধৌত পুণ্যকোমল মৃত্তিকার উপর সুবিস্তৃত শ্যামল সিংহাসনে উপেক্ষিতা দেশমাতৃকার যে বিগ্রহ বিরাজিত, তাহা এই দরদী শিল্পীর ধ্যাননেত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, তাই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে মঙ্গলাচরণের স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি উদ্যান-রক্ষকের ন্যায় এক হস্তে বীজ বপন করিতেন ও অপর হস্তে আগাছা সমূলে বিনষ্ট করিতেন। উপযুক্ত সমালোচকের অভাবে অধুনা বঙ্গসাহিত্যে আগাছার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু তখনকার দিনে বঙ্কিমের কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে কোনও প্রকার হীন প্রগলভতা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইত না। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে তিনি বঙ্গসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন—রচনার মধ্যে তিনি যে মৌলিক চিন্তাশক্তি ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ।

বাণী-সাধনার তিনি যেমন আজীবন উত্তর-সাধকের কাজ করিয়া গিয়াছেন—তেমনি আজ তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অনুরূপ সৃষ্টির প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি। আপনার কীর্ত্তিতে যিনি অমর হইয়া আছেন- তাঁহারই অক্ষয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশন

নবনির্ব্বাচিত মেয়র, রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি—গৌরবময় নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াও তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিতে

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। আজ মনে পড়ে মান্দালয়-প্রত্যাগত সুভাষ-চন্দ্রকে! সেদিন বিজয়ী স্বর্গগত দেশবন্ধুর অন্যতম সহসেনা-পতি, উন্নতমনা, আদর্শচরিত্র, সর্ব্বত্যাগী এই যুবক বাঙলার মুক্তিকামী 'তরুণের স্বপ্ন' দেখিয়াছিলেন—আর আজ! সুভাষচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ভেদনীতিসৃষ্টির চক্রান্ত হইয়া গেল তাহা একান্ত শোচনীয়। সুভাষচন্দ্র যদি তাঁহার এই অতিমাত্রায় শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও অনুরক্ত পার্শ্বচরগণের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন তবেই তাঁহার 'তরুণের স্বপ্ন' সফল হইবে। নতুবা অধিক সম্মান ও প্রীতি দেখাইতে গিয়া যাহারা প্রতিপদে তাঁহার গ্লানি বাড়াইয়া স্পর্দ্ধিত অহঙ্কার প্রকাশ করে তাহাদের কলঙ্ক সুভাষচন্দ্রকেও স্পর্শ করিবে। কে জানে আর কত-কাল বাঙলার এই চির অশান্ত-যৌবন অন্তরের মণি-কোঠায় দেশ-দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে?

বর্ত্তমান ছাত্র-আন্দোলন ও শিক্ষাপদ্ধতি

কিছুদিন পূর্ব্বে নিখিল-বঙ্গ-ছাত্র-সম্মিলনী হইতে স্কুল কলেজ বয়কটমূলক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্কুল কলেজে পিকেটিং হইয়াছিল। পিকেটিং রদ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্থানে স্থানে কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অ-প্ররোচিত অত্যাচারের সুবিশদ কাহিনী সকলেই সংবাদ পত্র পাঠে অবগত আছেন। আমাদের মনে হয় স্কুল কলেজে পিকেটিং করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না বা এখনও নাই—দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহারা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছে তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না, অন্তরের প্রেরণাতেই দেশের কাজ হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইবে—উপরোধ অনুরোধের অপেক্ষা রাখিবে না। অধিকন্তু ছাত্রদের দ্বারা যে কার্য্য করা সম্ভব তাহার অনেকটা স্কুল কলেজে থাকিয়াও সুসম্পন্ন হইতে পারে সুতরাং দলবদ্ধ হইয়া পিকেটিং করিয়া হুজুকে বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। আমরা জিজ্ঞাসা করি স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া কয়জন ছাত্র এযাবৎ দেশের গঠন-মূলক কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন? দেশের কাজও করিব না, পড়াশুনাও এই হুজুগের দোহাই দিয়া সিকায় তুলিয়া রাখিব, এই মনোভাব লইয়া যে সব ছাত্র শিক্ষাগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের কোনও মর্য্যাদাই রাখিতে পারেন নাই। অধিকন্তু দু'একদিন হুজুকে মাতামাতি করিয়া পুনরায় স্কুল কলেজে প্রবেশ করিতে যাহাদের লজ্জা হয় না তাহাদের কথা আলোচনারও অযোগ্য। অধিকাংশ মেরুদণ্ডহীন যুবকের উন্মাদনা আছে কিন্তু প্রাণের প্রেরণা নাই—আজ যে সকল ছাত্র কারাগারে

বন্দী তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকিলে—পিকেটিং বা পুলিশ পাহারা কোনও কিছুরই প্রয়োজন হইত না।

আধুনিক যুগে যে শিক্ষা আমাদের দেশে বিপুল শাখা প্রশাখা লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহা পাশ্চাত্যের হীন অনুকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা প্রাণহীন এবং তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই—এইরূপ ধারণা আমাদের হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান শিক্ষাকে প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিয়া, প্রহরীর দ্বারা সন্ত্রাসিত করিয়া, পরীক্ষার নাগপাশে অর্দ্ধমৃত করিয়া যে নিরানন্দময় ছাত্র-জীবনের সৃষ্টি করা হয় তাহা সভ্য জগতের মধ্যে কুত্রাপিও দেখা যায় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যে শিক্ষায় আমরা অতিবাহিত করি তাহা উত্তরকালে আমাদের জীবনের সহিত কোনও যোগাযোগ রাখিতে পারে না; বাঙলার যুবকগণ তাই অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে আশাহীন উদ্যমহীন জীবনের অবসান করিতেছে। শিক্ষা-আয়তনে বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হইতেছে শিক্ষার সহিত আমাদের বাস্তব জীবনের যোগসাধন করা।

প্রাথমিক শিক্ষা-বিল

আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক নহে সুতরাং দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় তাহার প্রচেষ্টা আবশ্যক এবং যাঁহারা এই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগী তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শিক্ষা প্রচলন করিতে যাইয়া যদি দারিদ্র্যনিপীড়িত নিরন্ন দেশকে নূতন কর জোগাইতে হয় তবে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের এই বিলের প্রতি গভীর মমতা ও স্নেহপ্রকাশ পাইয়াছে—পুনরায় বিচারের জন্য তিনি সিলেক্ট কমিটিতেও বিলটি দিতে নারাজ! প্রত্যেক সভ্য দেশেই জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে সরকার অর্থদ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন কিন্তু বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিলের জন্য সরকার বাহাদুরের অর্থাভাব আমরা চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি। এইরূপ অন্যায় পদ্ধতিকে কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। মন্ত্রী মহাশয় জনমতের বিরুদ্ধে এই প্রকার বিল পাশ করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিবেন?

বীর যুবক প্রফুল্লকুমার

সুবিখ্যাত সন্তরণকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ হেদুয়ার জলে একাদিক্রমে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। নিদ্রা এবং বিশ্রামবিমুখ হইয়া সুদীর্ঘকাল এইরূপ সন্তরণ ইতিপূর্ব্বে কোন ভারত-বাসী সম্পন্ন করিতে পারেন নাই—এই নূতন গৌরব ও সম্মানের জন্য আমরা প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিতেছি।
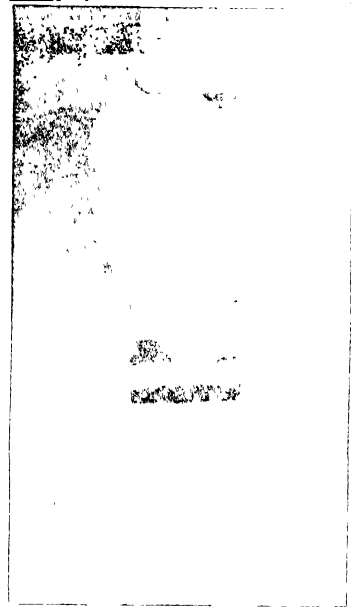
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ

পুরাকালে শারীরিক উৎকর্ষ সাধন আমাদের জাতির একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল---পরাধীনতার সহিত আমাদের শারীরিক শক্তি ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছিল এবং অবশেষে বৈরাগ্যের অছিলায় পরমুখাপেক্ষিতামূলক ক্রিয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছিল। জাতির এই অবনতির দিনে বীর যুবক প্রফুল্লকুমারের এই কৃতিত্ব দেশের নিকট আদর্শ হিসাবে সমাদর লাভ করুক।

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

পল্লীগ্রামে একটী প্রবাদ আছে—"যা বলবে পরে, তাই আসবে ঘরে"। অর্থাৎ প্রকৃত নিন্দার্হ ব্যাপারের নিন্দা করিলেও তোমায় পাপভাগী হইতে হয় এবং সেই নিন্দা-পঙ্কে তোমার ললাট সুশোভিত করিবার জন্য বিধাতাপুরুষ নিয়ত ব্যগ্র থাকেন। ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের রামু ময়রার শ্লীপদের সম্যক আলোচনা করায় পাড়ায় ঐ রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল; যৌবনে গোলাপী বৈষ্ণবীকে একঘোরে করার পাপে পরম সাত্বিক মাধব ভট্টাচার্য্যকে বৃদ্ধবয়সে একঘোরে হইতে হইয়াছিল। মাসিক পত্রিকা সম্পাদনসম্পর্কে সমালোচনাজনিত যে পাপ অর্জ্জিত হয় তাহার ফল ত অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উপাসনায় ১৩৩৫ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৩৩৭এর পঞ্চপুষ্পে সেটী নূতন প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না বিধাতাপুরুষ গ্রাম্য বচনটি স্মরণ করিয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছিলেন। আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'আদি নর' ও 'বিদুরের বাণী' নামে দুইটি কবিতা হুবহু আশ্বিন সংখ্যা উপাসনাতেও প্রকাশিত হইয়া গেল। যা বলিয়াছিলাম পরে তা আমাদের অদৃষ্ট-দোষে দুনো হইয়া আসিল ঘরে। উপাসনার মুদ্রাঙ্কন শেষ হইয়া গেলে ভারতবর্ষে আমরা ঐ দুটি কবিতা দেখিতে পাইলাম, সুতরাং এখন ক্রটী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু ক্রটি কাহার? কুমুদ দাদার নিকট শারদীয়া সংখ্যা উপাসনার জন্য একটী কবিতা চাহিয়াছিলাম। তিনি পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং ছোট ভাইএর অনুরোধ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি 'বিদুরের বাণী' উপাসনায় প্রকাশিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পরে বা পূর্ব্বে সে কবিতা কিরূপে ভারতবর্ষে পৌছিল আমরা তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। আশ্বিন মাস; 'দুর্গাস্তোত্র' বা 'মহিম্নস্তব' হইলে তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় ছিল; কিন্তু এ সময় 'বিদুর'এর কি কারণে পত্রে পত্রে 'বাণী' প্রচার করিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল বুঝিতে পারিলাম না। শৌরীন দাদার 'আদি-নর'ও তাঁহারই অনুরোধ ও অনুমতিক্রমে শারদীয়া সংখ্যা উপাসনায় প্রথম আবির্ভূত হইবে এইরূপ কথা ছিল। এখন দেখিতেছি যে 'ভারতবর্ষে'ও যুগপৎ তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আরও স্থানে স্থানে তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে কিনা এখনও জানি না। যুগধর্ম্মে কিছুই আর অসম্ভব মনে হইতেছে না। তথাপি অগ্রজপ্রতিম কবি-দ্বয়ের এ বিষয়ে কি বলিবার আছে না জানিয়া বলিবার সাহস হয় না যে এ ক্রটি তাঁহাদের। উপস্থিত ধরিয়া রাখিলাম ক্রটি সম্পাদকের,—এই কবিতা দুইটি উপাসনায় প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়া নহে;—পরন্তু প্রবাদরূপ বেদ বাক্যের অবহেলনপূর্ব্বক তিনি গত আষাঢ়ের উপাসনায় 'পঞ্চপুষ্প'এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন "সাহিত্য, বিশেষতঃ মাসিক সাহিত্য বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়িয়েছে—যত কিছু অভব্যতা, যা কিছু স্বেচ্ছাচারিতা, যতদূর সম্ভব দায়ীত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় বিনা শাস্তিতে আমরা মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় চালাতে পারি",—এই সত্য কথনের পাপই তাঁহার আসল ক্রটি!
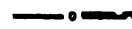
ভাদ্রে বিজ্ঞাপিত যে কয়জন লেখকের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারা গেল না তাঁহাদের ও পাঠকগণের নিকট ক্রটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি আগামী সংখ্যায় লেখাগুলি প্রকাশ করিতে পারিব।

নাট্য-কথা

[শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী]

সম্পাদক ভায়া,—

নাটক! নাটক! নাটক! চারিদিকেই নাটক! রাস্তায় নাটক, ঘাটে নাটক, চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, বার লাইব্রেরীতে, এজলাসে নাটক—শেষে শনৈঃ শনৈঃ এই নাটক আমেরিকার পথে ধাবিত হয়েছে—এ যেন এক নাটকেরই যুগ এসেছে। রাত্রির পর রাত্রি নাটক অভিনয় কোরে তো চলেইছি, তারপর রাস্তায় যদি কারো সঙ্গে দেখা হ'ল—সেও প্রশ্ন করবে ঐ—"অমুক বই কেমন চলছে," "অমুক অভিনেতা কি এখন আপনাদের থিয়েটারে," নূতন কি বই খুলছেন" ইত্যাদি। বাড়ীতে ৫ মিনিট অন্তর দোরের কড়া নাড়া; দোর খুললেই দেখবে ঐ কড়া-নাড়ক হয় নাটক লিখে এনেছেন অভিনয় করাবার জন্যে,—না হয় এসেছেন অভিনয় শিক্ষা করবার জন্যে, কারণ, 'ছেলেবেলা থেকেই taste' না হয় নাটক-অভিনয় দেখবার সুযোগটুকু প্রার্থনা করতে। এইতো অবস্থা! তার ওপর সেদিন দেখি বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণটি তার দেশে চিঠি লিখছে, "হয় ধ্বংস না হয় সৃষ্টি"—রীতিমত নাটকীয়! আর চাকরটা, সেদিন 'গৈরিক পতাকা' দেখে এসে পর্য্যন্ত প্রায়ই শুনতে পাই বলছে, "বিজাপুর জয় করব", এম্নি মহা ফাঁপরে পড়া গিয়েছে! নাটকের জ্বালায় অস্থির! অন্য উপায় না দেখে নাট্যজগত থেকে দিনকতক অবসর নেওয়াই সঙ্গত বলে যখন সব বন্দোবস্ত ঠিক করছি এমন সময় তুমিও কিনা—তুমি—যার মহৎ—বিশেষ কোরে কোমল অন্তঃ-করণের কথা আমি পাঁচজনের কাছে বাড়িয়ে বই কমিয়ে বলিনি—সেই তুমিও শেষে এই কুলিশ-কঠোর অনুরোধ কোরে পাঠালে—যে ৺পূজার সংখ্যার জন্যে কিছু লিখতে হবে নাটক সম্বন্ধে!!! হায় অদৃষ্টের পরিহাস! পরিহাস? না না পরিহাস নয়—এ সত্য, অতি কঠোর নির্ম্মম সত্য! এ আমার অতি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-লিপি! লিপি? অদৃষ্ট-লিপি? না না তাওতো নয়, এ লিপি নয়—লিপি নয়—এ আমার নাট্য-চর্চ্চা হতে পলায়নের মুখে এক মস্ত বড় air-tight ছিপি! তুমিও শেষে এই বাদ সাধলে? যাক্ গে, আর কথা বাড়াব না। তুমি বোধ হয় ভাবছ—যে "লোকটা কি অকৃতজ্ঞ! এই জীবনে মাত্র একবার—" জানি ভাই—জানি, কি বলতে যাচ্ছ তুমি জানি। বলব? তুমি তো বলবে—যে একবার না হয় একটু নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েছ; কিন্তু শত শত দৃষ্টান্ত তো এখনও চোখের সাম্নে জল্ জল্ কোরছে, যখন এই হৃদয়হীনেরই স্নেহ কোমল উদার বক্ষের অমৃত পরশ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন,—যখন এই বান্ধবহীন—" হ্যাঁ ভাই, আমি সে সব কথা ভুলিনি, ভুলতে পারি নে—এত অকৃতজ্ঞ আমি নই। আমি তো স্বীকার কচ্ছি। আর তুমি তো দেখে গিয়েছ যে আমার মন-আলমারির তাকে তাকে সেই স্মরণ-মধুর দৃষ্টান্তগুলি কেমন একটির পর একটি সাজিয়ে রেখেছি—আর পাছে কালের ধূলো সে গুলোকে আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে অস্পষ্ট কোরে তোলে—সেই ভয়েই তো স্মৃতির ঝাড়ন দিয়ে রোজই তাদের ঝাড়ি। যাক ভাই, এখন ঠাণ্ডা হয়েছ তো? আমি লিখ্‌ছি, এখুনি লিখতে আরম্ভ কচ্ছি। কিন্তু কি লিখি বল দেখি—? নাটক? নাটক সম্বন্ধে? তাই তো! দেখ, নাটক আজকাল অনেকেই লিখছেন কিন্তু কেন লিখ্‌ছেন বলতে পার? লেখা মানে তো দান। আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচার ও কল্পনা-শক্তির সাহায্যে আমি একটা কিছু সৃষ্টি করেছি—যা আমি জগৎকে উপহার দিতে অগ্রসর হচ্ছি। এখন তা হ'লেই প্রথমে আমাকে দেখতে হবে যে আমি সত্যই কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি কি না। যদি কিছু সৃষ্টিই করতে না পেরে থাকি তা হ'লে কি দান করতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি? দান করতে হলেই আমাকে সর্ব্ব-প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে আমার সঞ্চিত সম্পদের দিকে—সেখানে দেখতে হবে আমি কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছি কিনা—তা না হলে কি দান করতে যাচ্ছি আমি? খ্যাতি-লাভের দুর্ব্বলতা আমাদের প্রায় সকলেরই মধ্যে কিছু না কিছু আছে। এই দুর্ব্বলতার একটু বেশী মাত্রায় বশবর্ত্তী হয়েই আমরা অনেক সময়ে দানের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠি—আমাদের ভিতরের সম্পদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, কারণ সঞ্চয়ের চেয়ে দানই খ্যাতি অর্জ্জনে বেশী

সহায়তা করে। আর তারই ফলে সুধীসমাজে নিজেদের একদিকে যেমন অনুকম্পার পাত্র করে তুলি, অন্যদিকে হতাশাপীড়িত অন্তরে সংসারের বিরুদ্ধে সহানুভূতি-হীনতা ও অগুণগ্রাহিতার অভিযোগ করে বসি। আমার professionএর খাতিরে বহু in embryo, unfledged, half-fledged নাট্যকারের সংশ্রবে আসতে হয় এবং যখনই এই রকম কেহ নাটক লিখে আনেন তখনই আমি প্রায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি—(অবশ্য যথাসম্ভব ভদ্রভাবে) "মহাশয়ের পড়াশুনা কতদূর হয়েছে?" আশ্চর্য্য! দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ নয় জনের উত্তর হয় Matric না হয় Intermediate. এ কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি নিজেকে একজন মহা পণ্ডিত বলে জাহির করছি—মোটেই নয়। তা যদি হোত—তা হলে তো আমিই নাটক লিখতাম। আমি শুধু জানতে চাই এই যে নাট্যকার হবার দাবী তাঁর কতখানি, তিনি কোন্ অধিকারে নাটক লিখতে সাহসী হয়েছেন। কেহ হয়তো এইস্থলে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে প্রশ্ন তুলবেন যে কেন, Universityর degree না থাকলে কি আর পণ্ডিত হওয়া যায় না! নিশ্চয় যায়। সুতরাং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, "মহাশয়ের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ চর্চ্চা করা হয়েছে?" তারও উত্তরে জানা গেল, Greek, Latin, Russian, French, German এ সব তো দূরের কথা—Shakespeareও পড়া হয় নি—সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যেও সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তিহীন। তবেই হ'ল জ্ঞান আহরণের চেষ্টা নেই, আছে কেবল দানের দ্বারা খ্যাতি-লাভের ব্যাকুলতা। নাট্যকার কি অমনি হলেই হল? কতগুলো মহৎ মহৎ গুণ একাধারে থাকলে তবে নাট্যকার হওয়া যায়! প্রকৃত নাট্যকার হতে হলে তাঁকে প্রথমেই হতে হবে উচ্চদরের কবি, কারণ তিনি যে স্রষ্টা—নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা, কল্পনার পাখা মেলে কাব্যা-কাশের বহু উর্দ্ধে তিনি যে সুরের জাল বুনবেন—অসীম আনন্দে; এত উর্দ্ধে যে মর্ত্ত্যবাসী আমরা তাঁকে অনেক সময়ে দেখতেই পাব না, শুধু তার বিচিত্র সঙ্গীতের এক একটি মূর্চ্ছনা বাতাসের স্তর ভেদ করে এসে আমাদের পাগল করে দেবে—রোমাঞ্চিত কলেবরে পুলকবিস্মিত হয়ে উর্দ্ধপানে চেয়ে তখন বলব, "কবি, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি কত উর্দ্ধে।"

তারপর স্রষ্টার সঙ্গে নাট্যকারকে হতে হবে দ্রষ্টা। মানব চরিত্রের সূক্ষ্মতম ভাব-বৈচিত্র্যের দ্রষ্টা তাঁকে হতে হবে। মানবের ক্ষুদ্রতম দুর্ব্বলতা বা সূক্ষ্মতম অনুভূতিটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে চলবে না।

তারপর সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর ভাল রকম পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই নাট্য-যশলোভী নবীন উৎসাহীদের মধ্যে আর একটা জিনিষের বড়ই অভাব দেখা যায়—সেটা হচ্ছে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব। নাটক রচনায় সফলতা অর্জ্জন করতে হলে রঙ্গমঞ্চের সহিত পরিচয় প্রয়োজন। কোথায় যেন পড়েছিলাম Shakespeare wrote with one eye focussed on the stage. নাটক লেখবার সঙ্গে সঙ্গে মানস-চক্ষে, তা' যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে—এম্‌নি কোরে দেখতে হবে এবং নিজেই দর্শক সেজে তা' দর্শকের উপর কি রকম ছাপ (impression) রেখে যাচ্ছে—কি ভাবে তাকে অনু-প্রাণিত কচ্ছে—এক কথায় তার ওপর কিরকম effect হচ্ছে তাও লক্ষ্য করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই পরিচয় ছিল বলেই আমাদের দেশের গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল এত সফলতা অর্জ্জন করে গিয়েছেন। নাট্য-কারকে তা হলে এমন কি রঙ্গমঞ্চের কোন্ অংশ তাহার প্রবেশ-পথ নির্গমন-পথ—এ সব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানের অভাববশতঃই অনেক নবীন নাট্য-কার এমন ভাবে দৃশ্য-বিন্যাস বা সংযোজনা করে থাকেন যা কার্য্যকালীন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, রঙ্গমঞ্চের উপর এক চক্ষু নিবদ্ধ থাকে না বলেই অনেক সময়ে দেখা যায় যে একটি দৃশ্যে চার পাঁচটি চরিত্রের অবতারণা করা হয় বটে, কিন্তু একটি কি দুইটি চরিত্রেই লেখকের সমস্ত লক্ষ্য আবদ্ধ রয়ে গিয়েছে—অন্যান্য উপস্থিত চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিই নেই—এমন কি এই যে একটি কি দুইটি চরিত্রের কথাবার্ত্তা বা কার্য্য-কলাপের effect তাদের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদের ওপর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মনে মনে দর্শকের স্থানে নিজেকে বসিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর যে কাল্পনিক অভিনয় চলছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই সকল দোষ ত্রুটি ধরা পড়ে যায়।

নাটক লিখতে হলে দর্শক বা শ্রোতাকে কিছুতেই ভুল করলে চলে না। কেন না তাহলে নাটক-লেখকের চেষ্টার ফল নাটক রচনা হিসাবে অনেকটা ব্যর্থ হয়ে শুধু literary exercise এই পরিণত হবে।

আসছে বার নাটক কাকে বলে এবং কবিত্ব, পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও নাটক রচনায় কৃতকার্য্য হতে হলে আর কি কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাবে। এবারকার মত বিদায়।

নাগপুর পাইওনিয়র ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড্

মাণ্যবর রাও বাহাদুর ডি, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাও বাহাদুর এম, জি, দেশপাণ্ডে, শ্রীমন্ত রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁশলে প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেষ্টায় ১৯২১ সালে নাগপুরে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানী যে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইতেছে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—প্রথম ভ্যালুয়েশনের ফলেই দেখা যায় কোম্পানীর বীমা-তহবিলে যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ফলে বীমাকারীগণকে হাজার করা ৫৲ পাঁচ টাকা বোনাস্ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ", "ন্যাশন্যাল", "ভারত" প্রভৃতি যে সমস্ত কোম্পানী Big Five বা বৃহত্তম পাঁচটীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন তাহাদের ঠিকুজী কোষ্ঠী খুঁজিয়াও আমরা এরূপ কৃতিত্বের নিদর্শন কোনদিন দেখিতে পাই নাই।

গত ১৯২৯ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, কোম্পানী এই বৎসর ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৫০ টাকার জীবন বীমার জন্য মোট ৪৪৮টি আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৭ শত ৫০ টাকার ৩৯০ খানি আবেদন মঞ্জুর হয় এবং ফলে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ২ শত ৫০ টাকার জন্য ২৯৭ খানি বীমাপত্র দেওয়া হয়। কোম্পানীর বীমার চাঁদা বাবদে ৬৬ হাজার ৮ শত ২৯ টাকা এবং সুদের বাবদে ৬ হাজার ৭ শত ৫২ টাকা আয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বাড়ী ও জমির ভাড়া বাবদেও কোম্পানী ১ হাজার ৫ শত ৭০ টাকা পাইয়াছিলেন।

মৃত্যুর বাবদে ১৬ হাজার ৫ শত টাকা এবং বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ২ হাজার টাকা দাবী উপস্থিত হয়। এজেন্টদের কমিশন ও অন্যান্য বাবদে কোম্পানীর মোট ৩৫ হাজার ৬ শত ৭৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বৎসরান্তে বীমা-তহবিলে মোট ১ লক্ষ ১৮ হাজার ১ শত ৯১ টাকা মজুত ছিল। কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ঐ সময়ে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩ শত ৭৮ টাকা কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত ছিল।

১৯২৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পুণার প্রসিদ্ধ এ্যাক্‌চুয়ারী মিষ্টার মারাঠে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রথম ভেলুয়েশন রিপোর্ট দেন তাহাতে দেখা যায় কোম্পানীর বীমা-তহবিলে ১০ হাজার ৮ শত ৬০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ হাজার ৮ শত ৫২ টাকা বীমাকারীগণকে বোনাস্ বাবদে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, ৫ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হয় এবং বক্রী ২ হাজার ৮ টাকা উদ্বৃত্ত রাখা হয়। যাঁহারা জীবন বীমার মূল নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন, কোটী কোটী টাকা তহবিলে মজুদ থাকিলেই কোন জীবন বীমা কোম্পানীকে ভাল বলা চলে না। যত টাকার বীমাপত্র দেওয়া হয়, তাহার দায়িত্বের তুলনায় বীমা-তহবিলে যথেষ্ট টাকা থাকিলে তবেই কোম্পানীকে নিরাপদ বা স্বচ্ছল বলা চলে। যে কোম্পানীর তহবিলে তদপেক্ষা অধিক টাকা আছে সেই কোম্পানী সেই পরিমাণে তত অধিক বোনাস্ দিতে পারেন এবং তাহাকে তত অধিক ভাল বলা চলে। এই হিসাবে "নাগপুর পাইওনিয়র" কোম্পানী বীমার চুক্তির টাকা দিতে সমর্থ ত' নিশ্চয়ই, উপরন্তু আরও অধিক দিতে সমর্থ, সুতরাং উহাকে নিরাপদ ও প্রকৃত উৎকৃষ্ট কোম্পানী বলা চলে।

"নাগপুর পাইওনিয়র" কোম্পানীর বর্ত্তমান সেক্রেটারী মিষ্টার এ, ভি, নাবারকে আমরা বিশেষরূপে জানি, তাঁহার

ন্যায় বিচক্ষণ ও কর্ম্মকুশল বীমাবিদ্ বড় বেশী নাই। তাঁহার পরিচালনাধীনে এই কোম্পানী অচিরে ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মেসার্স এ, কে, সেন এণ্ড সন্ "নাগপুর পাইওনিয়র"এর বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশের চীফ এজেন্ট। ২৫ নং বীডন ষ্ট্রীট কলিকাতায় ইঁহাদের অফিষ, রেঙ্গুণেও ইহাদের অফিষ আছে। এই কোম্পানীর প্রধান পরিচালক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন অক্লান্তকর্ম্মা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এজেন্টদের জন্য "প্রভিডেন্ট ফণ্ড"এর ব্যবস্থা বোধ করি ইনিই প্রথম করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আছে এবং কাজ করিবারও যে ক্ষমতা আছে, সে পরিচয় আমরা গত এক বৎসরে যথেষ্ট পাইয়াছি। আশা করি, তাঁহার চেষ্টার ফলে "নাগপুর পাইওনিয়র" শীঘ্রই বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে জনপ্রিয় কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে।

হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ এসিওরেন্স, লিমিটেড্

গত আষাঢ় সংখ্যার "উপাসনা"য় "হিন্দু মিউচুয়্যাল" সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এবার অতি সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলিয়া এই কোম্পানীর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

হিন্দু মিউচুয়্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার
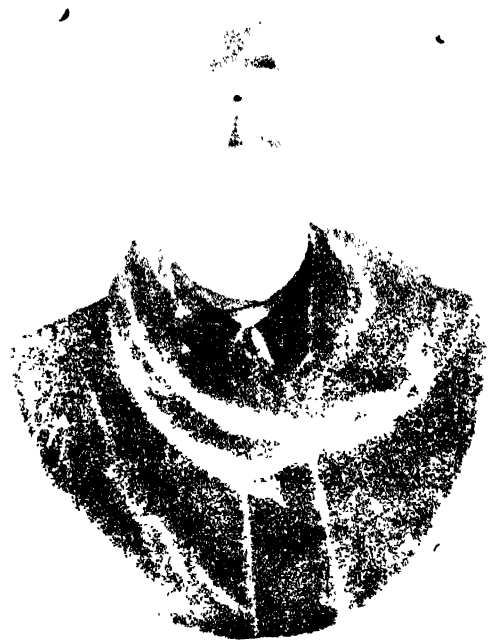
হিন্দু মিউচুয়্যালের অন্যতম ডাইরেক্টর
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

১৮৯০ সালে সিমলায় ইনফ্লুয়েঞ্জা অতি ভীষণ ভাবে দেখা দেয় এবং তাহার ফলে অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অকালমৃত্যু ঘটে। এই সমস্ত ভদ্রলোকের অধিকাংশেরই এমন সংস্থান ছিল না, যদ্বারা রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা চলিতে পারে অথবা রোগীর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গের কোনপ্রকার সংস্থান হইতে পারে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কামশনারের অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

মজুমদার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং এইরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৮৯১ সালের ২৩শে আগষ্ট "হিন্দু ফাণ্ড" স্থাপন করেন। প্রথমে সিমলার কালী-

হিন্দু মিউচুয়্যালের সেক্রেটারী
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়।

বাড়ীতে একটী সাধারণ সভায় এই ফাণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, পরে কলিকাতার আলবার্ট হলে তৎকালীন জন-নায়ক ৺ রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে আহূত একটী জন-সভায় ইহার বিষয়ে ঘোষণা করা হয়।

প্রথমে ব্যবস্থা করা হয়, কোন সভ্যের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সভ্যদের তাঁহার পরিবারবর্গকে একটী নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে হইবে। পরে সে ব্যবস্থা রদ করিয়া ১৮৯৭ সালে আজীবন বীমার জন্য যথারীতি বীমার চাঁদার হার প্রবর্ত্তন করা হয়। তৎপরে কিছু টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে মজুত হইলে পর ১৯০১ সালে যথারীতি দলিল সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অফিসিয়াল ট্রাষ্টিকে এই কোম্পানীর ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হয়। পরে এণ্ডাউমেণ্ট বীমার জন্যও যথারীতি চাঁদার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া এইরূপ বীমা গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়।

কোম্পানীর পরিচালকগণ এ কাল পর্য্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতেন, এমন কি এজেণ্টদিগকেও কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইত না। পরে ১৯০৬ সালে অন্যান্য কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে এই কোম্পানীর এজেণ্টগণকে কমিশন দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হয়। পরে বিগত যুদ্ধের পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড জাতীয় কোম্পানীগুলির সহিত ইহার পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য ইহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "হিন্দু মিউচুয়্যাল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেড" রাখা হয়।

"হিন্দু মিউচুয়্যালের" বীমার হার অত্যন্ত কম, বীমার সর্ত্তসমূহ অত্যন্ত উদার, বীমাকারীগণই কোম্পানীর ডাইরেক্টর নিযুক্ত হ'ন এবং সর্ব্বপ্রকারে কোম্পানীর পরিচালনা করেন, সমস্ত লভ্যাংশের অধিকারীও তাঁহারাই। এক কথায় বলিতে হয়, "হিন্দু মিউচুয়্যাল"এর বীমাকারীগণ জীবনবীমার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বরাজ উপভোগ করেন—এ স্বরাজ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড্

যথার্থ স্বদেশী উচ্চশ্রেণীর জীবন বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর স্থান বহু উচ্চে। ১৯০৮ সালে বোম্বাই নগরে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। বোম্বাইএর স্বনামধন্য ব্যবসায়ী সার লালুভাই শ্যামল দাস, কে-টি, সি-আই-ই, জে-পি ইহার চেয়ারম্যান।

'বোম্বে লাইফ'এর চেয়ারম্যান
স্যর লালুভাই শ্যামল দাস কে-টি

১৯২৯ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, কোম্পানী গত বৎসর ৬১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার জীবন-বীমার জন্য ৩৪১৬ খানি আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন এবং ৫১ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত টাকার মোট জীবন বীমার বাবদে ৩০২৫ খানি বীমাপত্র দান করিয়াছিলেন। চাঁদা বাবদে কোম্পানীর ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯ শত ১৫ টাকা ও সুদ এবং বাড়ী ভাড়া বাবদে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৪ টাকা আয় হইয়াছিল। দাবীর জন্য কোম্পানীর ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শত ৯৬ টাকা দেয় হইয়াছিল এবং কার্য্য পরিচালনের জন্য ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৮ শত ৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বৎসরান্তে বীমা-তহবিলে ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৭

'বোম্বে লাইফ'এর চীফ এজেন্ট
মিঃ আই, বি, সেন

শত ৫৫ টাকা মজুদ ছিল। মোট সম্পত্তির পরিমাণ তখন ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬ শত ৫০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

১৯২৫ সালের কোম্পানীর যে হিসাব নিকাশ হয় তাহার ফলে বীমাকারীগণ হাজারকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের শেষে কোম্পানীর পুনরায় হিসাব নিকাশ হইবে এবং যে ভাবে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আমাদের মনে হয়

বীমাকারীগণ এবার আরও অধিক লভ্যাংশ পাইবেন। কোম্পানী সম্প্রতি বীমাকারীগণের স্থায়ী অক্ষমতার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক কারণে বন্দী বীমাকারীগণের বীমাপত্র অক্ষুণ্ণ রাখারও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটের মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানী "বোম্বে লাইফ"এর বাঙ্গালা, বিহার ও আসামের চীফ এজেণ্টস্। এই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন বাঙ্গালার ব্যবসায়ী-সমাজে একজন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ও কৃতী পুরুষ বলিয়া গণ্য। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভিডেণ্ট কোম্পানী "ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, "কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের" অন্যতম ডাইরেক্টর এবং অনেকগুলি চা বাগানের পরিচালক। এরূপ কৃতী ব্যক্তির পবিচালনাধীনে বাঙ্গালায় "বোম্বে লাইফ"এর কার্য্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।
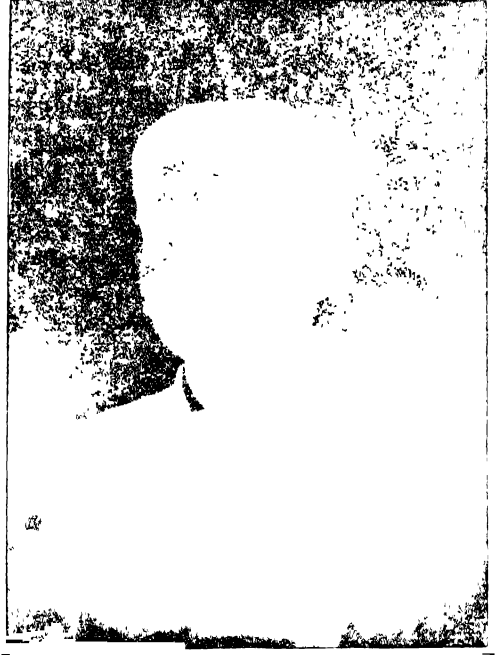
'বোম্বে লাইফ'এর ম্যানেজার
মিঃ জে, এল, মেহতা

কমনওয়েল্থ্ এসিওরেন্স, কোম্পানী, লিমিটেড

গত দুই বৎসরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কম পক্ষে দুই ডজন জীবন বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের সকল গুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের কর্ম্মকেন্দ্র পুণা নগরে প্রতিষ্ঠিত "কমন্‌ওয়েল্থ্ এসিওরেন্স কোম্পানী" আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

প্রথমতঃ, মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নেতা ও কর্ম্মীগণ এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলকের সহকর্ম্মী "কেশরী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন, সি, কেলকার এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান। ইহা ছাড়া সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত জি, কে, দেবধর, কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য অধ্যাপক ভি, জে, কেল, কৃষি কমিশনের সদস্য শ্রীযুত বি, এস, কামাত প্রভৃতি পুণার শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার পরিচালক।

দ্বিতীয়তঃ, জীবন বীমার ব্যবসায়ে এদেশে আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করা হইয়াছে, এই কোম্পানীর বীমাকারীদের তাহার সমস্তই দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, উপরন্তু আরও অনেকগুলি নূতন সুবিধাও দেওয়া হইতেছে। যথারীতি চাঁদা না দেওয়া সত্ত্বেও বীমা পত্র বজায় রাখা, বাজেয়াপ্ত বীমাপত্র উদ্ধারের সুব্যবস্থা, স্থায়ী অক্ষমতার জন্য ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হইলে দাবীর দ্বিগুণ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা, তিন বৎসর চাঁদা দেওয়ার পর আর চাঁদা না দিয়াও সম্পূর্ণ দাবীর টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা, মহিলাগণের জীবন বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবস্থা সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দাবীর টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে কোম্পানী একেবারে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মৃত্যুর সংবাদ পাইবামাত্র

কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ স্বয়ং উপস্থিত দাবী সম্পর্কিত কাগজ পত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে মৃত বীমাকারীর উত্তরাধিকারীদের সাহায্য করিয়া যাহাতে অবিলম্বে দাবীর টাকা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা আর কোন কোম্পানী করেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

এই সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু কোম্পানীর চাঁদার হার খুব কম। বীমাকারীদের সুবিধার জন্য নানা প্রকারের বীমা যথা পুত্র কন্যার শিক্ষার সুবিধার জন্য বিশেষ বীমা, বার্দ্ধক্যে মাসিক বৃত্তির জন্য বীমা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বীমার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

কোম্পানীর "প্রস্পেক্টাস"খানি পাঠ করিলেই মনে হয়, বীমাকারীদের যথার্থ মঙ্গলসাধনের সদুদ্দেশ্য লইয়াই যেন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। প্রথম বৎসরে কোম্পানী ৭ লক্ষ টাকার কাজ করিয়াছেন। কাজ অবশ্য খুব বেশী হয় নাই, যথার্থ ভাল কোম্পানীর কাজ এদেশে খুব বেশী হয়ও না, কিন্তু প্রথম বৎসরেই কোম্পানী সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও যে ৪৪২ টাকা উদ্বৃত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানীর অজস্র প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জীবন বীমা বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন প্রথম বৎরের কার্য্য ফলে টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বড় বেশী দেখা যায় না।

মেসার্স ইণ্টারন্যাশন্যাল এজেন্সীজ্ বাঙ্গালায় এই কোম্পানীর চীফ এজেণ্টস্। ৯৬, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডে তাহাদের অফিস। শুনিলাম, ইঁহারাও কাজ ভাল করিতেছেন। কোম্পানীর সম্বন্ধে বিস্তারিত যাঁহারা অবগত হইতে চাহেন উঁহাদিগকে পত্র লিখিলেই তাঁহারা তাহা অবগত হইবেন।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স, কোম্পানী, লিমিটেড্

জীবন বীমা কোম্পানীর গুণাগুণ বিচারের যতগুলি মানদণ্ড আছে তাহার যে কোন একটী প্রয়োগ করিলেও দেখা যাইবে যে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী" ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানী। ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গত ২৪ বৎসর যাবৎ বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

গত ১৯২৮ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, কোম্পানী এই বৎসর ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকার জীবন বীমার জন্য ২৩৬১খানি আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন এবং ২৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫০ টাকার ১৮৮১ খানি পলিশি প্রদান করিয়াছিলেন। বীমার চাঁদা বাবদে কোম্পানীর এই বৎসর ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬ শত ৯ টাকা এবং সুদ ও ভাড়া বাবদে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা আয় হইয়াছিল। বীমাকারীদের মৃত্যুর বাবদে ও বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানী মোট ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫ শত ৪৫ টাকার দাবী মিটাইয়াছিলেন। কোম্পানী পরিচালনের জন্য মোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২ শত ৫৯ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ বীমা তহবিলে জমা করার ফলে উক্ত তহবিলে বৎসরান্তে ২৭ লক্ষ ৯১ হাজার ২ শত ১০ টাকা মজুত দেখা যায়। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩১ লক্ষ ১ হাজার ২৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

১৯২৬ সালের কোম্পানীর কার্য্যের যে হিসাব নিকাশ (valuation) করা হয় তাহার ফলে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মজুদ রাখিয়া অবশিষ্ট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বীমাকারী ও অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ফলে বীমাকারীগণকে হাজার করা এণ্ডাউমেণ্ট বীমার জন্য বার্ষিক ১৮ টাকা ও আজীবন বীমার জন্য বার্ষিক ২২॥০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

"ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া"র বীমার হার উচ্চ নহে, পলিশির সর্ত্ত সমূহও উৎকৃষ্ট, অথচ বীমাকারীদের লভ্যাংশের হারও অত্যন্ত লোভনীয়। সম্প্রতি মাদ্রাজের অফিশিয়াল ট্রাষ্টীকে কোম্পানীর ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া যে নূতন ব্যবস্থা করা

হইয়াছে তাহাতে বীমাকারীদের অবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ করা হইয়াছে বলিতে হইবে।

মেসার্স চৌধুরী দত্ত এণ্ড কোম্পানী "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া"র বাঙ্গালার চীফ এজেণ্টস্। ২, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা ও ৯নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ঢাকায় ইঁহাদের অফিস। ফরিদপুরের জনপ্রিয় জমিদার চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন ও উৎসাহশীল কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এই কোম্পানীর পরিচালক। মণীন্দ্র বাবুকে জীবন বীমার ক্ষেত্রে কর্ম্মকুশল ব্যক্তি বলিয়াই আমরা জানি। আর চৌধুরী সাহেব দেশ-প্রেমের অপরাধে সেদিন কারাবরণ করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধাণের আরও প্রিয় হইয়াছেন।—ইঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গলায় কোম্পানীর কাজ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'র চীফ এজেণ্ট
চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স, কোম্পানী, লিমিটেড্

ভারতের সর্ব্ব বৃহৎ বীমা কোম্পানী কোন্‌টী এ প্রশ্নের দিতে হইলে অসঙ্কোচে বোম্বাইএর "নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী"র নাম করা যাইতে পারে।

বোম্বাইএর ব্যবসায়ী সমাজের শ্রেষ্ঠতম নায়কগণ এই কোম্পানীর পরিচালক। ১৯১৯ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। ইহার মোট মূলধন ছয় কোটী টাকা, তন্মধ্যে ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ৭৫ টাকার অংশ বিক্রীত হইয়াছে ও ফলে ৭১ লক্ষ ২২ হাজার ৫৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মোট বর্ত্তমান সম্পত্তির মূল্য ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকারও উপর এবং গত বৎসর চাঁদা বাবদে এই কোম্পানী ৭৬ লক্ষ্য ৭১ হাজার টাকার অধিক পাইয়াছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর শাখা ও এজেন্সী আছে।

১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কোম্পানীর কলিকাতার শাখা অবস্থিত। কোম্পানীর মান্দ্রাজ শাখার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ এস, জে, এফ, রিভার্স এক্ষণে কলিকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার।

'নিউ ইণ্ডিয়া'র কলিকাতার লাইফ সেক্রেটারী ডাঃ এস্, সি, রায়

গত বৎসর কোম্পানী জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং প্রথম বৎসরেই ৫০ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ ও ৪০ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে এত টাকার জীবন বীমার কাজ আর কোনও কোম্পানী এদেশে কখনও করেন নাই।

জীবন বীমা বিভাগে "নিউ ইণ্ডিয়া" বীমাকারীদের জন্য বহু নূতন ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহাদের বীমাপত্র বাজেয়াপ্ত না হওয়ার ব্যবস্থা, স্থায়ী অক্ষমতার জন্য সুব্যবস্থা, দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হইলে তজ্জন্য ব্যবস্থা ও তিন বৎসর বা ততোধিক কাল চাঁদা দেওয়ার পর আর চাঁদা না দিলেও সম্পূর্ণ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি অভিনব প্রণালীগুলি বীমাকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক। কোম্পানীর চাঁদার হার বেশী নয় এবং ইহার কার্য্যও খুব কম ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হয়। এজন্য আশা করা যায়, প্রথম হিসাব নিকাশের (valuation) ফলেই কোম্পানী বীমাকারী-গণকে বোনাস্ দিতে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতায় এই কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের ভার ডাক্তার এস, সি, রায়ের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ডাক্তার রায় অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ, তাঁহার চেষ্টায় কোম্পানীর কাজ এ প্রদেশেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছে। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার উপর আমাদের গভীর আস্থা আছে এবং আমরা আশা করি, প্রথম বৎসরেই কলিকাতা শাখা হইতে তিনি অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'নিউ ইণ্ডিয়া'র কলিকাতা শাখার ম্যানেজার
মিঃ এস, জে, এফ, রিভার্স

'নিউ ইণ্ডিয়া'র কলিকাতা অফিস

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক
শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৫শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা — কার্ত্তিক, ১৩৩৭

সুকেশিনীর শিরশোভা

অয়েল

সকল ঋতুতে সমভাবে ব্যবহার্য ও সমান হিতকর।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

"সর্ব্বহারা সন্তানের অবরুদ্ধ কণ্ঠের রোদন
মাতার সকল গর্ব্ব, সর্ব্ব গৌরবের অপচয়
দেবত্বের মহিমারে পায়ে দলি' ঘোষে পরাজয়।

২৩শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৭ | ৭ম সংখ্যা

আত্মকাম

[শ্রীজীবনময় রায়]

জাগোরে অন্তর মোর অন্ধ প্রদোষের অন্ধকারে ;
দিনের আলোর মাঝে শুধু বারে বারে,
ব্যর্থ অন্বেষণ তোর নিমেষে তেয়াজি'
নিশীথের অন্ধকার অঞ্জনে নয়ন দুটি মাজি'—
হোক তোর নব দৃষ্টিলাভ,
—তিরোভাব
হোক আজি যত তোর সংশয় সন্দেহ ব্যাকুলতা,
গগনে গগনে হের তারকার ইঙ্গিত-বারতা।

দিবসের মত্ত কোলাহলে !
আপনার স্বরূপেরে ভুলি পলে পলে ;
সুধু তাই,
আপনারে আহরিতে বারে বারে নিজেরে হারাই।
জনতার মাঝে,
তাই শুনি ক্ষণে ক্ষণে বাজে
আমার সে হারানো "আমি"র
নিরুদ্ধ রোদনধ্বনি ;—অন্তরযামীর
অন্তরের গুপ্ত হাহাকার—
অকারণ অন্বেষণে অন্ধ অজানার অভিসার।

ক্ষুব্ধ দিবসের গ্লানি,
সুপ্তি যার 'পরে দিল মায়া আচ্ছাদন তার টানি'
কখন কাটিয়া গেছে আঁধারের শান্তির প্রলেপে।
সমস্ত আকাশখানি ব্যেপে
আজি হের আপনার রূপ,
অনুপম নিখিল স্বরূপ,
পরিব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে সর্ব্বলোকে ;
খণ্ড খণ্ড করি যারে চেয়েছিল দিনের আলোকে।
ক্ষুদ্র তব লোলুপ এ মুঠি,
পারে কি নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশেরে নিতে লুঠি' ?
জাগো আজ সবিস্ময়ে চুপে
বিশ্বের মাঝারে হের আপনারে ওতঃপ্রোত রূপে।

আজি এই নিবিড়তা মাঝে
যে পূর্ণতা আপনি বিরাজে,
তারি স্পর্শ, হে বিরহী, লাগুক অন্তর মাঝখানে।
সুগভীর দানে
সুতৃপ্ত হউক চিত্ত আপনারে লভি'
পরিপূর্ণতার মাঝে বাজুক উদয়াচলে উষার ভৈরবী।

শিলং

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

প্রকৃতির লীলানিকেতন শিলং দেখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই মনের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

আমাদের উভয়ের শরীর ভাল যাইতেছিল না বলিয়া বন্ধুগণ শিলং যাইবার পরামর্শ দিলেন। বন্ধুদের হিতো-পদেশে অসুস্থ শরীর সুস্থ করিতে যতটা না হোক অজানা দেশ দেখার উৎসাহে আমরা উন্মুখ হইলাম।

বৈশাখের মাঝামাঝি বাহির হইবার সংকল্প থাকিলেও চৈত্রের শেষ হইতে সাড়া পড়িয়া গেল। শিলং প্রবাসী এক ভদ্রলোককে একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিতে স্বামী পত্র লিখিলেন 'স্বাস্থ্য-নিবাস'এর নিয়মাবলী পাঠাইতে, স্বাস্থ্য-নিবাসেও চিঠি লেখা হইল।

যথা সময়ে পত্রোত্তর আসিল, "ভাল বাড়ী পাওয়া কঠিন। স্বাস্থ্যকামীদের নিমিত্ত পূর্ব্বেই অনেক বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে। শিলং-এ বাড়ীর সংখ্যা অল্প, অনেক পূর্ব্বে স্থির না করিলে পরে পাওয়া কঠিন।"

স্বাস্থ্য-নিবাসের কর্ম্মকর্ত্তা লিখিলেন, "দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মহিলাদের জন্য ঘর রিজার্ভ না করিলে পরে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না।" স্যানিটেরিয়মে চিঠি লিখিয়াও ঐ ধরণের উত্তর পাওয়া গেল। বাসার গোলযোগে কর্ত্তাটি প্রশান্তভাবে বলিয়া বসিলেন, "এবার শিলং থাকুক, দার্জ্জিলিং-এ যাওয়া হোক।" আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। দার্জ্জিলিং প্রবাস করিয়া তাহার প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। অসুবিধার অজুহাতে অনেকবার অনেক বাধা পাইয়া সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি। কেবল শিলং নহে, পথে কামরূপ দর্শন করিবার আশাও আমার মনের মধ্যে প্রবল হইয়াছিল।

আমার আগ্রহে তিনি পুনর্ব্বার তাগিদ দিয়া পত্র লিখিলেন। কয়েকদিন অতীত হইয়া ক্রমে আমাদের যাত্রার নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্ত্তী হইল; কিন্তু বাসা স্থির হইল না। অবশেষে সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া টেলিগ্রাম যাতায়াত আরম্ভ হইল। বাসা না পাইলেও স্বাস্থ্য-নিবাসে কিংবা স্যানিটেরিয়মে উঠিয়া নিজেরা বাড়ী স্থির করিবার ভরসায় আমি বিপুল উদ্যমে প্রচুর শীত বস্ত্র ও ঘর কন্নার জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিলাম।

১২ই বৈশাখ প্রভাত হইতে সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে, ১১টা ৩০ মিনিটে গাড়ী। "রওনা হইতেছি বাসা ঠিক কর, কামাখ্যায় দুই দিন বিলম্ব হইবে।" তার করিয়া যথা সময়ে লাট বহর লইয়া আমরা বাহির হইলাম। আমার মেয়ে 'বাণী' ও একটি নেপালী ভৃত্য আমাদের সহযাত্রী হইল। নেপালী ভৃত্যের বাসস্থান দার্জ্জিলিং। তাহার বিশ্বাস যে কোন পাহাড় অঞ্চলে গেলেই আত্মীয় বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিবে। এই বিশ্বাসে বেচারীর মহা আনন্দ।

পূর্ব্বেই আমাদের টিকিট করা হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে গাড়ীতে উঠিয়া বসা গেল। একটি কামরায় আমরা মোটে তিনটি প্রাণী, আর কাহারো আবির্ভাব হইল না।

১১টা ৩০ মিনিট বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে দূরের বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণখানি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে সব আত্মীয় বন্ধু আমাদিগকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল, ক্রমে সে প্রিয় মুখ গুলি চোখের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। মুহূর্ত্তে নূতন স্থানে যাইবার আনন্দ উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল। যাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, মনে হইতে লাগিল তাহাদের নিকটে থাকাই বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা শান্তির জীবন। হায় মায়াচ্ছন্ন মানব হৃদয়, হায় মোহ!

কাহাকেও সঙ্গী না পাইয়া বাণীর হৃদয়াকাশে যে মেঘ সঞ্চার এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলাম, সহসা সেই মেঘ হইতে রীতিমত এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল।

আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গাড়ীর জানালায় আশ্রয় লইলাম। বাহিরে বৈশাখের সুতীব্র রোদ খাঁ খাঁ করিতেছে। রেলপথের দুই পার্শ্বে কর্ষিত অকর্ষিত শস্যশূন্য ক্ষেত্র প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। শস্যবিহীন ক্ষেত্রের বুকে বর্দ্ধিত আগাছা ঘাসগুলি পর্য্যন্ত রৌদ্রতাপে পুড়িয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ডোবা নালা শুষ্ক, স্থানে স্থানে শৈবালাচ্ছন্ন পানা পুকুর এক হস্ত পরিমিত কর্দ্দমাক্ত জল বক্ষে লইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। কৃষক-বধূরা অমৃতের ন্যায় সেই জল অঞ্জলি অঞ্জলি তুলিয়া কলসীতে ভরিয়া লইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত গরু বাছুর জলাশয়ের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পল্লীবাসীদের নিদারুণ জল কষ্টের এতটুকু নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়া মনটা দমিয়া গেল। যাঁহাদের অতুল বৈভব, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এ অভাব অনেকটা মোচন করিতে পারেন; কিন্তু চিরসুখীদের হৃদয়-বীণার তারে দুঃখীদের দুঃখের আঘাত লাগিলে সংসার এতদিন স্বর্গ হইয়া যাইত।

বেলা বাড়িবার সাথে সাথেই রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িতেছে, গরমে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেছি। আমাদের সঙ্গের আনীত জল উষ্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা রাস্তার কোন দ্রব্যই খাই না বলিয়া বরফ দ্বারা জল শীতল করিতে পারিলাম না।

অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণে গাড়ী সাঁড়া সেতুর নিকটবর্ত্তী হইল। পদ্মার সজল শীতল বায়ু-হিল্লোলে শরীর জুড়াইয়া গেল। এ নিদাঘে সলিল-বিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী পদ্মা ক্ষীণা হইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পদ্মার স্বচ্ছ বারিরাশি সরিয়া গিয়া দুই তটে দিগন্ত প্রসারিত বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে। শান্ত শুভ্র জলের উপর কত নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। ছেলেরা চড়ায় বসিয়া মাছ ধরিতেছে; মেয়েরা হাসি কলরবে তীরভূমি মুখরিত করিয়া জল লইতে আসিয়াছে। এক স্থানে এক পাল মহিষ সর্ব্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া মুখ বাহির করিয়া রহিয়াছে। নিমজ্জিত নৌকার গলুয়ের উপর বসিয়া রাখাল গান ধরিয়াছে, "তাইরে নারে, নাইরে না।"

পদ্মা পার হইয়া আমরা মিষ্টি সংযোগে চা পান করিলাম। একটা বড় 'ফ্ল্যাস্কে' চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার পর পার্ব্বতীপুরে আসিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পার্ব্বতীপুর বেশ বড় ষ্টেশন, প্ল্যাটফর্ম্মের উপরেই নানা জাতীয় হোটেল। হোটেলওয়ালারা গাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া মস্ত খাতির দেখাইয়া খাদ্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমাদের সঙ্গেই প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ছিল, অতি অল্প মূল্যে এক ছড়ি কলা কিনিয়া লইলাম।

এবার আর আমরা তিনটি প্রাণী রহিলাম না। আরো দুইটী ভদ্রলোক আমাদের কামরায় উঠিলেন।

রাত্রি নয়টার পর কোলের উপর রুমাল বিছাইয়া খাওয়া হইল, আহারের পর শয়নের পালা। ট্রেনে কোন কালেই আমার ঘুম হয় না, না হইলেও বিছানা ঝাড়িয়া শুইতে হইল।

রাত্রিশেষের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল। আমরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া কাঁচের জানালা তুলিয়া দিলাম। জান্‌লার গা বহিয়া বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছিল, সকলেই নিজ নিজ বিছানা বাঁচাইতে ব্যগ্র হইলেন।

প্রভাতসূচনায় চারিদিক পরিষ্কার হইয়া বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল। প্রকৃতি রজনীর নীলবেশ ছাড়িয়া মেঘের ঘোমটা সরাইয়া বর্ষাবারিধৌত স্নিগ্ধ শ্যামরূপে পথিকের নয়নপথে প্রতিভাত হইলেন। এক পার্শ্বে গগনস্পর্শী পত্র পুষ্পে আচ্ছাদিত অগণিত গিরিমালা, অপর পার্শ্বে বৃক্ষ-ছায়ায় আবৃত গৃহস্থের শান্তির কুটীর। বর্ষা ও বৃষ্টির প্লাবনে এ প্রদেশ একেবারে জলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, অন্য প্রদেশ বিন্দুমাত্র জলের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছে,—ইহাও বিধাতার অভিনব খেলা।

১৩ই বৈশাখ—পাণ্ডু ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমরা নামিয়া পড়িলাম। এবার যেদিকে চাই সেইদিকেই

> "ঐ যে গিরির পরে শোভিছে গিরি,
> তমাল পিয়াল বনে রয়েছে ঘিরি;
> উঠে যেন দিক শেষে
> ধোঁয়ার মতন ভেসে
> দ্যুলোক দেশের পথে সাজান সিঁড়ি।"

তখনও ঝুর ঝুর করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে। সঙ্গে একটা ছাতা ও বর্ষাতি আনা হইয়াছিল, তাহাতেই কোনরূপে

মাথা বাঁচাইয়া ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম। ভৃত্য সিং কুলির স্কন্ধে মাল চাপাইয়া আমাদের অনুসরণ করিল।

ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ষ্টীমারের এপারে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। ঘাটের অনতিদূরে ওয়েটিং-রুমে জিনিসপত্র রাখিয়া আমরা সেই টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকে কি অভিনব শোভা! দূরে গৌহাটী শহর চিত্রবৎ সুন্দর। সামনে নিবিড় বনরাজিতে পরিশোভিত কামাখ্যার নীল পর্ব্বত। শ্যামল পাদপভূষিত শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ একেবারে নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মপুত্র উন্মাদ আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের তটে দাঁড়াইয়া আজ কত কথা মনে পড়িতেছে, এ সেই আসাম, সেই ব্রহ্মপুত্র—বাল্যে যাহার স্নিগ্ধ কোলে একবার আসিয়াছিলাম। যিনি আনিয়াছিলেন তিনি আজ কোথায়? আসামের পবিত্র ধূলিকণায় তাঁহার পদধূলি খুঁজিলে পাওয়া যাইবে কি?

আসিবার পূর্ব্বে কামাখ্যার পাণ্ডাকে চিঠি লেখা হইয়াছিল; ঘাটের উপরেই পাণ্ডাপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঝড় জল উপেক্ষা করিয়া এই দুর্য্যোগে পাহাড় হইতে নামিয়া তিনি আমাদের লইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমরা ট্যাক্সিতে গিয়া বসিলাম। এখানকার ট্যাক্সিতে মিটার নাই, ভাড়া ঠিক করিয়া লইতে হয়।

পাণ্ডার নিকটে শুনিলাম, আজ কুড়ি দিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হইয়া পাহাড়ে উঠিবার মেটে পথটি ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে, পাথরের পথও পিচ্ছিল, বিপদসঙ্কুল। আমি হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতে ভালবাসি, এজন্য পূর্ব্বে পাল্কীর ব্যবস্থা হয় নাই; এখন পাল্কী পাওয়া কঠিন। কঠিন হইলেও আমার পাল্কীর প্রয়োজন ছিল না।

ছায়াময় নির্জ্জন পথ বাহিয়া আমরা চলিয়াছি, রাস্তার দুই দিকে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, কৃষক-কুটীর। কোথায়ও বা অনুচ্চ পাহাড়, টিলা, দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

পর্ব্বতের নিম্নেই ধর্ম্মশালা, স্ফটিকস্বচ্ছ জলপূর্ণ 'ইন্দারা'। আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় মাথা তুলিয়া বিরাট ধর্ম্মশালাটি প্রতিষ্ঠাতার অক্ষয় কীর্ত্তির সাক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান।

আমরা মোটর পরিত্যাগ করিয়া কুলিদের পশ্চাতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। স্বল্পপরিসর ঊর্দ্ধগামী পথের দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল, বৃক্ষে বৃক্ষে জড়াজড়ি করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে - গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় সম্মিলিত হইয়া পল্লবের অনন্ত সমুদ্র রচনা করিয়াছে। সেই ঘন অন্ধকার বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নদেশে আলোক প্রবেশের ছিদ্রটুকুও নাই। তাহার ভিতর মানুষ যাইতে পারে না। বনবিহগের কলতান, পাতার মর্ম্মরধ্বনি নিস্তব্ধ অরণ্যকে সচকিত করিয়া রাখে।

অনন্ত অরণ্যানীর সিঁথির ন্যায় বনবিতানের মধ্যদেশ দিয়া আমরা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছি। পথের স্থানে স্থানে অবিরত বারিবর্ষণে শৈবাল জন্মিয়াছে। একবার অসাবধান হইলে রক্ষা নাই। বৃষ্টি থামিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়াছে, সূর্য্যদেব মেঘের বাসরে আত্মগোপন করিলেও প্রকৃতিদেবী আমাদের মুগ্ধ নেত্রপথে সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিলেন। পথের মাঝে মাঝে গুলঞ্চ ফুল ঝরিয়া কঠিন প্রস্তরভূমিকে কুসুমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। শৈলশিখর হইতে প্রভাতের সুমিষ্ট বায়ু ছুটিয়া আসিয়া ধরাচ্যুত গুলঞ্চের সৌরভ বহিয়া পথিকের পথশ্রান্ত শরীর জুড়াইয়া দিতেছে।

অর্দ্ধেক রাস্তায় উঠিয়া আমরা একটি গুলঞ্চ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলাম। বাণী অঞ্চল ভরিয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল। পাণ্ডাপুত্রের কাছে শোনা গেল, পূর্ব্বদিন ১১টার সময় একটি বড় গরু বাঘের কবলে গিয়াছে। অদূরের খাতে এখনও নাকি বাঘ গরুর মাংসে উদর পূর্ণ করিতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে আর একটি দুগ্ধবতী গাভীরও ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। একথা শুনিবার পর আমাদের আর বিশ্রাম করা হইল না। দুই ঘণ্টার রাস্তা এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া আমরা কামাখ্যার দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

দুই দিকে দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির; সন্ন্যাসীরা ধুনী জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিয়া আছে। তোরণের পাশেই শ্মশান।

তোরণ পার হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে চলিলাম। চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার, নানা জাতীয় ফলের ও নারিকেল বৃক্ষের ছায়ায় স্থানটি স্নিগ্ধ ছায়াময়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নাভিরাম হইলেও কামাখ্যার পথ ঘাট অত্যন্ত অপরিষ্কার, গায়ে গায়ে বসতি, অল্পপরিসর পাথরের রাস্তাগুলি আবর্জ্জনায় পূর্ণ। এ অঞ্চলে ঝাড়ুদার মেথর নাই। প্রয়োজন হইলে গৌহাটী হইতে আনাইতে হয়। এখানে বড়ই জলকষ্ট, কয়েকটা ঝর্ণাই ইহাদের প্রাণ স্বরূপ, সম্প্রতি দুই একটি নূতন কূপ প্রস্তুত হইয়াছে। ভারীরা কাঁধে করিয়া গৃহে গৃহে জলের যোগান দিয়া থাকে।

আঁকাবাঁকা অনেক পথ পার হইয়া আমরা এক টীনের দ্বিতল গৃহে আশ্রয় পাইলাম। ভূমিকম্পের আশঙ্কায় এ দিকের প্রায় ঘরবাড়ীগুলিই টীনের, দুই একটির বেশী পাকা বাড়ী চোখে পড়ে না।

টীন ও বালতিতে পূর্ব্বেই আমাদের স্নানের জল রাখা হইয়াছিল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া বারান্দায় কাপড়ের আড়াল দিয়া সংক্ষেপে স্নান সারা গেল।

আমাদের স্নানের পরেই পাণ্ডা আসিয়া হাজির। কামাখ্যার যাত্রীদের নিকটে জুলুম করিয়া টাকা লইবার নিয়ম নাই, কাজেই পূজা ও প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থায় পাণ্ডা আপত্তি করিলেন না। পূজার টাকা দক্ষিণা পাণ্ডার হাতে দিয়া আমরা তাঁহার সহিত মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

পুরীর মধ্যে ঝরণার সহিত যোগ করিয়া একটি খালের সৃষ্টি হইয়াছে, কোমরজলে একদল বালিকা ডুব দিতেছে, জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে, ইহারাই কামাখ্যার কুমারী সম্প্রদায়, বয়সে ইহাদের কেহই দশম বর্ষ অতিক্রম করে নাই। কুমারীদের মধ্যে স্নানরতা কয়েকটি পাণ্ডাবধূকেও দেখা গেল। তাহাদের ভিতর দুই তিনটী অপূর্ব্ব সুন্দরী, যেমন কাঁচা সোনা গায়ের রং তেমনি আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, যুগ্ম ভ্রূ। প্রবাদ, পুরুষজাতি কামাখ্যায় আসিলে ভেড়া হইয়া যায়। কেন যে ভেড়া হইবার অপবাদ তাহার কারণ নিরীক্ষণ করিলাম। কামাখ্যার মেয়েদের—

—বর্ণ জিনি স্বর্ণচাঁপা, তন্বীতনু কোমল কায়
রক্ত রাঙ্গা নখর যেন, অধরদুটি বিম্ব প্রায়।

যেস্থানে এ হেন রূপসীর সমাবেশ সে স্থানে কিন্তু একটিও সুপুরুষ চক্ষে পড়িল না।

খালের জলে পা ধুইয়া আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। দেবীর মন্দির বৃহৎ না হইলেও ক্ষুদ্র নহে। মন্দিরদ্বারে যূপকাষ্ঠে দুইটি ছাগশিশু বাঁধা রহিয়াছে। মন্দিরের আলিসার গায়ে অগণিত পায়রা নাচিয়া নাচিয়া ডাকিতেছে। দেবীর উদ্দেশে পায়রা নিবেদন করিয়া ছাড়িয়া দিবার নিয়ম। প্রাঙ্গণে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। এ সময়ে যাত্রীসংখ্যা বেশী নহে, অম্বুবাচী ও ৺পূজার সময় অসম্ভব যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। পাণ্ডা পূজার ফুল, মালা আনিয়া আমাদিগকে মন্দিরে লইয়া গেলেন, প্রবেশপথেই দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। মহাকালের বক্ষে অষ্টভূজা ক্ষুদ্র স্বর্ণপ্রতিমা। বেদীর উপর একাধিক শালগ্রাম শিলা বিরাজমান। অঞ্জলি দিয়া প্রণামান্তে আমরা পীঠস্থানে চলিলাম।

লোকের ভিড় ঠেলিয়া অন্ধকার সোপান বাহিয়া যে স্থানে আসিয়া থামিলাম, সেস্থান মৃণ্ময় প্রদীপের আলোকে আলোকিত, পুষ্প পরিমল ও ধূপের গন্ধে সৌরভাকুল। চতুর্দ্দিকে ঘৃতের প্রদীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, ব্রাহ্মণগণ সুর-সংযোগে স্তব পাঠ করিতেছেন। বাহিরের আবিলতা কোলাহল এ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে আসিলে অতিবড় নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তির বিমল ধারা বহিয়া যায়। কেবল ভক্তের নিমিত্তই জগৎজননী এ দুর্গম গিরিকান্তারে মন্দিরের অভ্যন্তরে আপনাকে যেন লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অযুত ভক্তের অনন্ত ভক্তির ধারা নির্ঝররূপে ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কি সুন্দর পবিত্র স্থান, এ ক্ষুদ্র ভক্তিহীনা কিরূপে ইহার মহিমা বর্ণনা করিবে!

পূজান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মন্দিরের অপর অংশে কুমারীপূজা হইতেছে। প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য দেব দেবী দর্শন করিয়া আমরা ভুবনেশ্বরীর পথ ধরিলাম। মায়ের মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরীর মন্দির বহুদূরে, কামাখ্যার শেষপ্রান্তের সর্ব্বোচ্চস্থানে।

ভুবনেশ্বরীর রাস্তা খুব অপরিষ্কার, বসতিও কম। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের প্রাসাদ এই অঞ্চলে। ভারতের বহুতীর্থে ধর্ম্মশীল মহারাজের প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কত দেবালয় অট্টালিকা ভ্রমণকারীদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। কামাখ্যার এ ধর্ম্মশালা প্রস্তরময়, পরিষ্কার পথটিও তাঁহারই সহস্র সহস্র ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অন্যতম।

ভুবনেশ্বরীর মন্দির ক্ষুদ্র. এক গহ্বরে শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত পীঠস্থান, প্রণাম ও স্পর্শ করিয়া আমরা মন্দিরের দক্ষিণে এক বৃহৎ শিলাসনে বিশ্রাম করিতে বসিলাম।

স্থানটি নির্জ্জন এবং শান্তিপূর্ণ, বৃক্ষে বৃক্ষে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অজস্র গুলঞ্চ ফুল পাষাণের বুকে সুকোমল আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের নীচেই আবর্ত্তময় ব্রহ্মপুত্র, তটে পাহাড়ের গায়ে কত অজানা ফুল ফুটিয়া চারিদিক আলো করিতেছে, দক্ষিণে সুশোভিত 'গৌহাটী'। দূরে রমণীয় 'বশিষ্ঠাশ্রম', ব্রহ্মপুত্রের মধ্যদেশে শুভ্র মুক্তাহারের মধ্যস্থিত পান্নার ধুকধুকীর ন্যায় শ্যামল উমানন্দ দ্বীপ মানব নয়নে সুধা বিকীরণ করিতেছে। উমানন্দ শৈলে ভৈরব উমানন্দ বিরাজিত।

আমরা দূর হইতেই উমানন্দের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বাসায় ফিরিয়া কাপড় বদলাইয়া, পাণ্ডা গৃহে খাইতে যাওয়া হইল। নিকটেই পাণ্ডার বাড়ী; সেখানে স্থানাভাব বলিয়া আমাদের জন্য পৃথক বাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

পাণ্ডাকুটীরে গিয়া বধূদের অম্লান রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহারা রন্ধনবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শিনী, আমাদের খুবই ক্ষুধা পাইয়াছিল, রান্নাও সুন্দর হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল।

আহারের পর শয়ন-কক্ষে বসিলাম, গৃহিণী ও বধূরা পান লইয়া আসিলেন। প্রথম দর্শনে ইঁহাদিগকে যতটা সরলা অবলা মনে হইয়াছিল, কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল ইঁহারা সেরূপ নহেন। পাণ্ডাদের চাহিবার নিয়ম নাই; কিন্তু মেয়েদের বেলায় সে বিধান উল্টা। যাহাদের গৃহলক্ষ্মীরা যাজ্ঞার ঝোলা খুলিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের পুরুষদের চাহিবার প্রয়োজন কি?

আমরা কুমারীপূজা করি নাই বলিয়া গৃহিণী ও বধূরা অতিশয় দুঃখিত, কারণ পূজার যোগ্য কয়েকটি কুমারী গৃহেই অবস্থান করিতেছে। আমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলাম, "যাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি তাঁহার দর্শন পাইয়াছি, পূজা করিয়াছি। কুমারীপূজায় আমাদের প্রয়োজন নাই, বিশ্বাসও নাই। আমরা কুমারীপূজা না করিলেও আপনারা পূজার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন না।"

গৃহিণী প্রসন্ন হইয়া তখনই প্রার্থনা করিলেন—তাঁহাকে এবং বধূদিগকে এক একখানি সাড়ী দিতে হইবে। তাহাতে সম্মত হওয়া মাত্র পূর্ণ উদ্যমে মেয়ের বিবাহের বেণারসী শাড়ী, হার, চুড়ি চাহিয়া বসিলেন। গৃহিণীর নবম বর্ষীয়া কন্যা ভাগ্যলক্ষ্মীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

আমি সবিনয়ে জানাইলাম "আমরা ধনী নহে, যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" ইহাতে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন না। মেয়েদের যত্ন, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তীরের ফলার ন্যায় বাঁকা চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, হাসির অমিয় প্রবাহ মধুর লাগিলেও চাহিবার নির্লজ্জ ক্ষমতায় মনে মনে বিরক্ত হইলাম। শরীর ভারী ক্লান্ত বোধ হইতেছিল, বেশীক্ষণ বসিতে পারিলাম না।

বাসায় আসিয়া কিছুকাল দিবানিদ্রা উপভোগ করা গেল। ছেলেদের কলরবে ও হৈ হৈ শব্দে উঠিয়া দেখি একদল হনুমান জুটিয়া গৃহস্থের তরিতরকারীর গাছ ভাঙ্গিতেছে। কামাখ্যায় হনুমানের উপদ্রব খুব।

মুখহাত ধুইয়া আমরা বাহিরে যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় পাণ্ডা আমাদের খবর লইতে আসিলেন। অধিক বেলায় আহার করিয়া কাহারও ভাল ক্ষুধা ছিল না। এবেলা আহারের অনিচ্ছা জানাইয়া আমরা পাণ্ডার নিকটে কেবল চা চাহিলাম।

চা আনিতে আনিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল। কুজ্ঝটিকায় হাস্যময়ী ধরণী ঢাকিয়া ফেলিল। প্রকৃতির বিষণ্ণ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া আর বাহির হইতে সাহস হইল না। পাণ্ডার কাছে বসিয়া আমরা কামাখ্যার গল্প শুনিতে লাগিলাম।

১৪ই বৈশাখ—কি বৃষ্টি! ঝম. ঝম, ঝম, টিনের ছাদ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আজ ভোর ছয়টার মধ্যে আমাদের কামাখ্যা পরিত্যাগ করিবার কথা, কিন্তু বৃষ্টির জন্য তাহা

ঘটিল না। বাতায়নে আশ্রয় লইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছি। অপ্রশস্ত পাথরের পথ বাহিয়া বর্ষার জলের ন্যায় বৃষ্টির জল নিম্নে বহিয়া যাইতেছে। মেয়েরা বালতি টীনে জল ধরিয়া রাখিতেছে।

রাস্তা নির্জ্জন, সেই নির্জ্জন রাস্তায় দুইটি বৃদ্ধা ও একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে ঘটী ও পুঁটলি হস্তে অনাবৃত মস্তকে পাণ্ডার বাড়ীর দিকে যাইতে দেখা গেল। না জানি কত দূর হইতে এই দুর্য্যোগে ইহারা আরাধ্যের চরণে ভক্তি উপচার ঢালিতে আসিয়াছে।

বেলা সাতটায় আমাদের পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবেলা যাওয়া হইল না, সুতরাং পাণ্ডার বাড়ীতেই আহারাদির ব্যবস্থা হইল। কথা রহিল আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া আমরা গোহাটীতে রাত্রি যাপন করিব।

দ্বিপ্রহরে বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু নিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। এই সুযোগে আমি বাণীকে লইয়া পাণ্ডার সহিত মন্দির গেলাম। জল কাদার ভিতর কর্ত্তাটি ঘর ছাড়িয়া নড়িলেন না, অগত্যা আমি একাকীই পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।

প্রভাতের সেই বৃদ্ধাদ্বয়কে তাঁহাদের সঙ্গীর সহিত মন্দিরে পূজা করিতে দেখা গেল।

মধ্যাহ্নে পাণ্ডা-গৃহে আহারাদির পর বিদায় লইয়া আসিলাম, আসিবার সময় গৃহিণী ও বধূরা ভাগ্যলক্ষ্মীর বিবাহের কথা পুনশ্চ স্মরণ করাইয়া দিলেন।

যাত্রাকালে আবার বৃষ্টি। মালপত্র সহকারে সিং কুলিদের লইয়া রওনা হইবার পর পাণ্ডার গৃহ হইতে আনীত এক একটি ছাতা মাথায় দিয়া পাণ্ডার সহিত আমরাও বহির হইলাম।

দিবা অবসানের সাথে সাথেই আমাদের গিরিপথ অবতরণ শেষ হইল।

স্নিগ্ধ সন্ধ্যার ম্লান আলোকে ট্যাক্সি আমাদের লইয়া ছুটিয়া চলিল। রাত্রিটা ডাকবাংলায় কাটাইব সংকল্প থাকিলেও ডাকবাংলায় অনেকগুলি সাদামুখ দেখিয়া পাণ্ডা আমাদিগকে ধর্ম্মশালায় লইয়া গেলেন।

গোহাটীর ধর্ম্মশালা প্রকাণ্ড, দুইটি মহল। অন্দর মহলের একটি ক্ষুদ্র ঘর আমরা মনোনীত করিয়া লইলাম। পাশের ঘরের একটি কুড়ি একুশ বছরের ছেলের সহিত আমাদের আলাপ হইল। ছেলেটি বি, এ পরীক্ষার পর কলিকাতা হইতে শিলং যাইতেছে, শিলং-এ ইহাদের বাড়ী, একটি সহযাত্রী পাইয়া খুসী হইলাম। ছেলেটির চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটার জন্য আমার কন্যারত্ন তাহার নাম করিলেন 'নেড়া বাবু'।

পাণ্ডা বিদায় লইলে সিংকে জিনিসপত্রের পাহারায় রাখিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম।

গোহাটী শহরটি যেমন সুন্দর তেমনি পরিস্কার। চারি-দিকে দোকান পসার, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ। মাঝে মাঝে সাদা টীনের বাড়ীগুলি ছবির মত।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, অন্ধকারমাখা জ্যোৎস্নায় গিরি-শিখর বিটপিশ্রেণী হাসিতেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় ব্রহ্মপুত্রের রূপও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—

"দূর হ'তে সে প্রবাহিনীর বিশাল তনু দেখ্‌চি ক্ষীণা,
ঠিক যেন এক মোতির মালা, বসুন্ধরার কণ্ঠে লীনা।"

(ক্রমশঃ)

প্রিয়-পরিচয়

[শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

হলপ্ করে' বলতে পারি—আমরা সবাই সাহিত্যিক,
সকল সভায় হাজির থাকি—বাৎসরিক কি যান্মাসিক।
লিখি—কেউ বা 'যাতুমণি'র ছড়া, তর্জ্জমাতে গল্প গড়া,
কেউ লিখেছি 'বজ্রঘাৎ', কেউ আবার উপন্যাসিক।
'দুধে-আলতা' লিখেছি কেউ, কারুর বিষয় আধ্যাত্মিক,
'অশ্রুপাত'-এর খস্ড়া হাজির,—ছন্দটা অনুনাসিক।
সাইকোলজির সত্ত্ব-কত্ত্ব নিংড়ে লিখি মনঃস্তত্ত্ব,
সত্য বলতে ডরাইনাকো,—এক্সপ্রেসন্ সব হিরোইক্।
লেখায় মরেল্-কারেজ চাই, তা না তো সে সবই ছাই,
নব হুল্লোড় এনেই দেবো,—থ হয়ে সব দেখেনিক্।
হলপ্ করে' বলতে পারি—আমরা সবাই সাহিত্যিক।

সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে—পরিচয়টা হাসিমুখে—
করে দিলেন দলপতি, সেটা কি অনৈস্বর্গিক!
বললেন,—খাপরা-তলার জ্যান্তো শনি—পতিতাদের পেট্রন্ ইনি—
নবোজ্জ্বল নীলমণি,—যা লেখেন তাই আন্তরিক।
আর—ইনি হচ্চেন 'কুঁড়ো'র অথার, 'ঝিনুক'খানি এঁরই প্রচার;
'গোল মরিচে'র স্রষ্টা ইনি,—এঁরই 'ধুচুনী' মাসিক।
'হিড়িম্বা' লিখেছেন ইনি, এঁরই লেখা 'কালনাগিণী',
'গোময় তত্ত্বে'র গর্ব্ব এনার,—অদ্বিতীয় দার্শনিক।
'ডিটেকটিভের দোয়ে হাটা'—এঁরই লেখা 'কচু কাটা'—
পড়লেই—স্বেদ, কম্প, পুলক, সমাধিরই বৈবাহিক,—
পীলে শুকিয়ে 'পিল্' মেরে যায় (এমন) চমক্দার আর
আকস্মিক!
হলপ্ করে' বলতে পারি—আমরা সবাই সাহিত্যিক।

আর—এঁর গুরুত্বেই গৌরদাস—বোঝাই থাকেন বারোমাস,
'ভূত শুদ্ধি' এঁরই লেখা, আর এঁনারই সেই 'সাত মাণিক'
মান্ধাতা যা করতেন পূজা, সেই মা 'সাড়ে বত্রিশ ভূজা'—
ইনিই খুঁড়ে বার করেছেন,—সামর্থ্য অমানুষিক!
এঁরই—'চীনের বাদাম', 'হুড়ুম ভাজা'—যেমন গরম তেমনি তাজা,
পেটে কিঞ্চিৎ পড়েছে কি—একেবারে সাংঘাতিক!
উঃ—আজ মোদের কি সুখের দিন,—এ-ওয়ে দেখি স্পন্দহীন,
হায়,—সবাই সেটা বুঝবে নাকো! লেখেনা যে তাকে ধিক্! *

* প্রীতিভাজনদের সাহিত্যিক বৈঠকে পঠিত

মহামতি বার্‌ট্রাণ্ড রাসেল্‌

[শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়]

ইংরাজী সাহিত্যকে বর্ত্তমানে যাঁহারা গৌরবের শিখরে স্থাপিত করিয়াছেন ও যাঁহাদের লেখনী শুধু ইংরাজী সাহিত্য কেন সমগ্র জগতের চিন্তার ধারাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বার্‌ট্রাণ্ড রাসেলের স্থান সর্ব্বোপরি—এবং তাঁহার সহিত উল্লিখিত হইতে পারেন কেবল এইচ জি ওয়েলস্‌ ও বার্ণার্ড স—।

মহামতি রাসেল স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক - তিনি যুবকদের এই শিক্ষা দিয়াছেন যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং সেই চিন্তা যুক্তি ও ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

যুগ যুগান্তের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বলিয়াই যে তাহা অভ্রান্ত এই ধারণার মূলে রাসেল্‌ কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

রাসেলের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা এই দুই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে বর্ত্তমান।

যুদ্ধের সময় তিনি passivism প্রচার করিয়া কারাবরণ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

রাসেল্‌ যাহা বলেন বা লেখনীর দ্বারা যাহা প্রকাশ করেন তাহা এতই প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য যে তিনি কি বলিতে ইচ্ছুক বা তাহার অর্থ কি এ সম্বন্ধে কাহারো কোন প্রকার দ্বিধা থাকে না এবং তাঁহার লেখার ধারা এরূপ যে তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই—সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতেই হইবে।

তিনি একাধারে বিখ্যাত নৈয়ায়িক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রবিৎ—অবশ্য গণিৎ শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার দান অমূল্য—তবে এ শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা যে খুব সুবোধ্য তাহা নহে, তিনি এ সব বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা জগতে হয় তো অল্পসংখ্যক লোকই বুঝিয়াছেন—একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক রাসেল্‌ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Like most minds of the first order Mr. Russell has a wide sweep of vision On one side he is a mathematical logician whose work has been of epoch-making importance. Not a dozen men in each generation will, I suppose, fully understand the books he has written in this sphere".

তবে গণিৎশাস্ত্রবিৎ হইলেও আমরা আজ দার্শনিক রাসেল সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। যাঁহারা দার্শনিক গবেষণার মূলে কি সত্য নিহিত আছে জানেন এবং সেই সত্যের অনুসন্ধানে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারা রাসেলের সম্মুখে ভক্তিনম্র হৃদয়ে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিরাটত্ব ও চিন্তাশক্তির ক্ষমতায় মুগ্ধ হইবেনই।

দর্শন শাস্ত্রকে এত সুন্দর সহজ ভাবে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করায় রাসেল তাঁহার চিন্তাকে অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে সক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু কেহ যদি অনুমান করেন যে রাসেল তাঁহার চিন্তার ধারাকে popular করিবার জন্য সহজ ভাবে জগৎকে বুঝাইতে তাঁহার গবেষণায় অনেক বড় সমস্যা বর্জ্জন করিয়াছেন—সে অনুমান মহা ভ্রম হইবে—তিনি popular ভাবে লিখিলেও তাহাতে গভীর সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও তাঁহার যে একটা বিরাট creatively critical imagination আছে, তাহার পরিচয় তিনি তাঁহার সর্ব্বলেখার মধ্যেই দিয়াছেন।

রাসেল্‌ জীবনের গতি বা পরিণতি সম্বন্ধে কেবল দার্শনিক অভিব্যক্তি দিয়া সমালোচনা শেষ করেন নাই। তিনি Platoর ন্যায় আমাদের যে সব সমস্যা দৈনন্দিন জীবনকে সর্ব্বদা আন্দোলিত করিতেছে—সেই সব সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সেই সব সমস্যার সমাধান করিতে তিনি যে সব মতামত

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এতই বিদ্রোহীমূলক যে জগত ময় তাঁহার লেখা অনেক অশান্তি ও কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে—কিন্তু এই অশান্তি ও কলরব তাঁহার প্রতিভাকে গৌরবেই মণ্ডিত করিয়াছে।

রাসেল্ ভূমিকা লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন না—তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা সহজ ভাবে অবান্তর কথা বর্জ্জন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে নিজের মন্তব্যে উপনীত হন্—এই গুণ যে Bernard Shaw বা H. G. Wells বা Romain Rolland বা Count Tolstoiএর মধ্যে নাই তাহা বলা যায় না—তবে এ বিষয়ে রাসেল্ তাঁহাদের উপরে।

বিবাহ, সম্পত্তি, জাতীয়তা শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে রাসেলের মতামত যিনি পাঠ করিবেন তিনিই তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইবেন।

রাসেলের অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী তাঁহাকে এই অনুসন্ধানে বাধ্য করিবেই—এই স্থলে রাসেলের লেখার সহিত জগতের অন্যান্য চিন্তাশীল লেখকের পার্থক্য।

জগতে যাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা ও শক্তি ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহারা যে জগতের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর তাহা একেবারেই রাসেল্ বিশ্বাস করেন না এবং সেই কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিকদের বিপদকে তিনি উপেক্ষার বস্তু মনে করেন। রাসেল্ সম্বন্ধে এক সমালোচক বলিয়াছেন, "At bottom he is an aristocratic anarchist."

তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও তীব্র ব্যঙ্গের সাহায্যে traditionএর যে মূল্য কিছু নাই তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন—যাহারা জগতের এই বিরাট দুঃখরাশির মধ্যে বেশ সুখে কালাতিপাত করিতেছে তাহারাই traditionকে পূত পবিত্র মনে করেন এই কথাই মহামতি রাসেল বলেন। রাসেল একথা অবগত আছেন যে তাঁহার মতামত যাহারা ক্ষমতাদৃপ্ত তাহারা কখনই গ্রহণ করিবে না।

রাসেল ইহা অবগত আছেন যে তাঁহার কথা অতি অল্প লোকেই সমর্থন করিবে—কিন্তু এই minorityই যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

ইহা সত্য যে অনেকে রাসেলের প্রতি তাঁহার মতামতের জন্য বিশেষ অসন্তুষ্ট—অনেকে মনে করেন যে তাঁহার প্রতিভা জগতের ক্ষতিই করিতেছে এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের Divorceকে আনিয়া উপস্থিত করেন—কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন বা দৈনন্দিন জীবন স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রতিভাত না হইলেও আমরা রাসেল্কে তাঁহার বাণীর জন্য ঋষি বলিতে পারি। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঅরবিন্দ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রে বলিয়াছেন যে ভগবান জাতির দুর্দ্দিনে জগতের মহাবিপদের সময় কোন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির মুখে বাণী প্রকাশ করেন যাহা জগতকে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তির জীবন মহাপুরুষের ন্যায় দেবজ্যোতিতে মধুর না হইতে পারে তথাপি তিনি ঋষি, তিনি দ্রষ্টা—আমরা সে হিসাবে রাসেলকে ঋষি বলিতে পারি।

অনেকে বলেন রাসেল জগতের এই বিরাট শৃঙ্খলাতে বিশ্বাস করেন না এবং যুক্তিকেই প্রাধান্য দেন, কিন্তু যদি এই অবিশ্বাস ও যুক্তি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে তাহাতে জগৎ লাভবান হইবে—ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই।

রাসেলের জীবনকে, তাঁহার লেখনীকে, তাঁহার দার্শনিক অভিব্যক্তিকে স্বাধীন চিন্তা ও সত্য স্বর্গীয় আলোকে রঞ্জিত করিয়াছে—তিনি সত্যের মন্দিরে উপাসক, তাঁহার বেদী সত্যের অনুসন্ধানে গঠিত, তিনি আজি সত্যের পতাকা লইয়া যে মিথ্যাকে ক্ষমতা সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চায় সেই মিথ্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করিয়া সত্য যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা জীবনে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন—মহামতি Tolstoiকে কি লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাসেলকেও কম কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই।

অনেকে বলেন যে রাসেলের মধ্যে ভক্তির অভাব এবং তাঁহার মতামত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। এ বিষয়ে সমালোচক Prof. Harold Laski বলিয়াছেন—"It is true, also, that he is constantly changing his

mind. No one quite knows what Philosophic position his next book will take. But that is because his mind is too restless and too inquisitive ever to be satisfied with a static intellectual condition.

He can not persuade himself to stop the examination of first principles. What lesser men call his inconsistency are simply his veneration for truth.

রাসেল ও ভারতবর্ষ

রাসেলের নাম আজ ভারতের যুবকদের প্রাণে সাড়া দিয়াছে—তাহাদের হৃদয়ে স্পন্দন আনিয়াছে—তাহাদের চিন্তার ধারাকে নূতন ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Principles of Social Reconstruction, Mysticism and Logic, Roads to Freedom, Problem of China, Education ও বিবাহ, সমাজ সম্বন্ধে পুস্তক অনেকেই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। রাসেলের নাম আমাদের দেশে প্রচার করিবার জন্য যুবকদের মধ্যে শ্রীদিলীপকুমার রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। সে জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

রাসেলের জগৎ যে কোন প্রকার একটা শান্তিতেই সন্তুষ্ট নহে, তিনি জনমতকে সত্যের আদর্শে গঠিত করিতে চাহেন—যে শান্তি বিরাট মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা সত্য নহে—যাহা ক্ষমতার অত্যাচারে বলীয়ান হইয়া এক শান্তি আনিয়াছে তাহা বিরাট অশান্তির বৈজয়ন্তী। Thoreau যখন বলিয়াছিলেন "in a time of injustice the place for a first man is in prison" তখন এই বাণী সকলে হয়তো ভাল করিয়া বুঝে নাই—রাসেলের বাণী আজ হয়তো অনেকেই বুঝিতেছেন না কিন্তু শীঘ্র ভাল ভাবে উপলব্ধি করিবেন—সত্য বেশী দিন গুপ্ত হইয়া থাকে না শীঘ্রই আত্ম প্রকাশ করে।

রাসেলের প্রভাব ভারতের যুব সম্প্রদায়ের উপর খুব বেশী। যুবকদের এই স্বাধীন চিন্তার ধারা যে যাহা আচার ব্যবহারে বহুদিন হইতে পরিণত তাহাই পবিত্র, এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়ায় কোন যুক্তি নাই। প্রত্যেক আচার ব্যবহার সম্যক পরীক্ষা করিয়া বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহা সত্য যে রাসেল অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন করিয়াছেন যাহা ক্ষমতাদৃপ্ত মানব সম্যক উত্তর দিতে পারে নাই—এবং ক্ষমতাকে হাস্যাস্পদ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া যে ক্ষমতাশালী বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এক সমালোচক Valtaireএর সহিত রাসেল এর তুলনা করিয়াছেন—ইহা সত্য যে যাঁহারা চিন্তাশূন্য রক্ষণশীল তাঁহাদের চির শত্রু রাসেল কিন্তু রাসেল বিপ্লববাদী নহেন, তিনি Valtaireএর ন্যায় বিশ্বাস করেন যে বিপ্লব জাতির এক মহা বিপদ—valtaireএর ন্যায় রাসেল বিশ্বাস করেন যে যদি আমাদের সমাজ সত্য ও নিরপেক্ষ বিচারের ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং এই বিপ্লবকে বাধা দিতে একমাত্র বিচার শক্তি ও reason সক্ষম।

রাসেল তাঁহার বিচার বুদ্ধি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এই যুগের সমগ্র চিন্তাশীল লেখকের প্রাণে নব ভাব আনিতে সক্ষম হইয়াছেন—ভারতবর্ষের ও চীনের যুব সম্প্রদায়ের তিনি prophet—তিনি তাহাদের নবভাবে জাগ্রত অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতের ও চীনের মহা হিত-সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল।

কালো মেয়ে

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

কালো মেয়ে তুমি এত আলো কোথা পেলে ?
নীল হীরকের প্রদীপ গড়িয়া কে দিল শিখাটি জ্বেলে !
কালো মেয়ে তুমি এত আলো কোথা পেলে !

শ্যামলী লতার অঙ্গ ভরিয়া অপরাজিতার রাশি ;
নব ঘন ভারে লুটিয়া পড়েছে রবি-কিরণের হাসি ;
নীল যমুনার জ্যোৎস্না-উজল ছলছল চলধারা
তব দেহ ভরি' বহিয়া কি আজি চলে !
কালো মেয়ে তুমি এত আলো কোথা পেলে ?

কালো পাথরের মুরতি গড়িয়া নীল মাণিকের আঁখি
কে দিয়াছে মুখে আঁকি' ?
নীল সিন্ধুর মন্থন-সুধা সেথা হ'তে ঘরে ফিরে ?
আষাঢ়ের নব নীরদপুঞ্জ চূড়া হ'য়ে এল শিরে ;
নীল সাগরের রক্ত-কমল দু'টি ঠোঁটে বুঝি টলে !
কালো মেয়ে, তুমি এত আলো কোথা পেলে ?

আজি বরষায় ঘনধার ঝরে শ্যামা ধরণীর বুকে—
আন্‌মনে হেথা বসে আছি চাহি কালো আকাশের মুখে।
দূরে শ্যামঘন নীপবন হেরি—সেথা কি চরণ মেলে
আজি তুমি ব'সে শুনিতেছ গাথা জলধারা কল্লোলে ?
কালো মেয়ে তুমি এত আলো কোথা পেলে !

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

৮

সুমির সঙ্গে অজয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আত্মরক্ষা করিতে সে এক-এক লাফে তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে, মাঝপথে হঠাৎ নমিতাকে নামিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল,—"আমি এই দরজার আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছি, সুমি খুঁজতে এলে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ো।" বলিয়া অজয় দরজার পিছনে আত্মগোপন করিল। দুইটী দুয়ার যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে তাহারই সামান্য ফাঁক দিয়া সে দেখিতে পাইল নমিতা নীচে না নামিয়া সুমিকে ভুল সংবাদ দিবার জন্য সেইখানে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় মিনিট দুই কাটিল, নমিতার নড়িবার নাম নাই।

সুমি হঠাৎ চীনে-বাদাম-ওলার ডাক শুনিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া ততক্ষণ বাদাম চিবাইতেছে—সে-খবর ইহাদের কাণে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা ছিল না। জয়-দা যে তাহার আক্রমণের ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়াছেন ও তাঁহার দুর্গ-দুয়ারে প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন তাহা জানিলে সুমি নিশ্চয়ই এত অনায়াসে রণে ভঙ্গ দিত না।

আরো কিছুক্ষণ কাটিলে অজয় বাহির হইয়া আসিল। দেখিল নমিতা তখনো কুণ্ঠিতকায়ে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন একটা নিভৃত মুহূর্ত্তে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেই সৌজন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখানো হয় কি না সেই বিষয়ে মনে মনে কোনো প্রশ্ন না তুলিয়াই অজয় আবার কহিল,—"সুমি বোধ হয় কয়লার ঘরে আমাকে খুঁজতে গেছে। সত্যি, সেখানে গিয়ে লুকুলে আমাকে ওর আর এ-জন্মে বা'র করা চল্‌ত না।"

এটা অবশ্য অত্যুক্তি, কেননা বর্ণসম্পদে অজয় এতটা হেয় নয় যে একেবারে কয়লার উপমেয় হইয়া উঠিবে। তবু, অতিশয়োক্তিটার দরুণ একটা প্রত্যুত্তর পাইবার আশা আছে মনে করিয়া অজয় নিজের গায়ের রঙ সম্বন্ধে এমন একটা বিনয় করিয়া বসিল। নমিতা স্বল্প একটু হাসিল, ঘোমটা টানিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে মনে করিয়া এক পা বাড়াইয়া আর যাইতে মন সরিল না।

কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া অজয় নমিতার প্রায় নিকটে আসিয়া কহিল,—"বাড়িটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেক্‌ছে। দিদি ওঁরা কোথায় গেলেন?"

এ-প্রশ্নটা এমন নয় যে ইহার উত্তরে বাক্যস্ফূরণ করিলে নমিতার অঙ্গহানি হইবে, যদিও কড়া শাসনের অত্যাচারে তাহারে আত্মকর্তৃত্বহীনা অবাঙ্‌মুখী হইয়া থাকিবারই কথা ছিল। কিন্তু উত্তরটা এত সহজ ও সময়টি এত নিভৃত যে নমিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্পষ্ট করিয়াই কহিল,—"কাকিমারা সবাই ম্যাটিনিতে থিয়েটার দেখতে গেছেন।"

"ছেলেপিলেরাও গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি গেলে না কেন?"

একটু থামিয়া নমিতা বলিল,—"মা যেতে দিলেন না।"

এই থামিবার অর্থটুকু অজয় বুঝিল। সাহস করিয়া কহিল, "কিন্তু তুমিও বাড়িতে রইলে যে। গেলেই ত' পারতে।"

দৃঢ়নিবদ্ধ ঠোঁট দুইটি ঈষৎ প্রসারিত করিয়া নমিতা আবার একটু হাসিল। কিছু বলিবার আর প্রয়োজন ছিল না। এই হাসিটিতে বিষাদের স্বাদ পাইয়া অজয় বলিল,—"তোমার বুঝি আনন্দ করবার অধিকার নেই?"

নমিতার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, অজয় সিঁড়ির

যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নামিতে হইলে তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে, তাই সচকিত হইয়া নমিতা কহিল,—"সরুন।"

"নীচে কেন যাচ্ছ?"

"মা-র আহ্নিকের জন্যে গঙ্গাজল আন্‌তে।"

"তুমি আহ্নিক কর না?"

অজয় ভাবিয়াছিল ইহার উত্তরে নমিতার মুখে আবার হাসি ফুটিবে। কিন্তু নমিতা সত্যভাষণের উপযুক্ত সহজ ও স্পষ্টস্বরে বলিল,—"পুজোর পরে আমাদের গুরুদেব আস্‌বেন—তাঁর কাছ থেকে আমার মন্ত্র নেবার কথা আছে।"

কথাটা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত গা যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু চিত্তের অসন্তোষ দমন করিয়া সংযত শান্তকণ্ঠে কহিল,—"এই অল্প বয়সেই স্বর্গের জন্যে তোমার এত লোভ?"

উদাসীন কণ্ঠে নমিতা উত্তর দিল,—"এ-ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?" বলিয়া সিঁড়ি দিয়া একটু তাড়াতাড়িই নীচে নামিয়া গেল।

ঘটে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া উপরে উঠিবার সময় নমিতা দেখিতে পাইল অজয় তেমনি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে—যেন তাহারই প্রতীক্ষায়। সঙ্কুচিত হইয়া স্পর্শ বাঁচাইয়া আবার সে উঠিতে যাইতেছে, অজয় বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—অনেক কথা। তোমার সঙ্গে এতদিন এক বাড়িতে বাস ক'রেও যে আলাপ হয় নি তার কারণ আমার সৌজন্যের আতিশয্য আর তোমার ভীরুতা। কিম্বা সত্য কথা বল্‌তে গেলে আমাদের সমাজের অনুশাসন। আজ যখন দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লই, তখন একটু সাবস্তারে তোমার সঙ্গে কথা বলবার অনুমতি আমাকে দেবে না?"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না; যেন তাহার গ্রীবা সম্মতিসূচক সঙ্কেত করিয়া বসিল।

উপরে উঠিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া অজয় আবার কহিল,—"অনুমতি ত' তুমি দেবে, কিন্তু তোমার অভিভাবকরা যে তাতে আহ্লাদে আটখানা হবেন তার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এতদিন এক সঙ্গে থেকে আমি এটুকু যে একেবারেই বুঝিনি তা তুমি মনে কোরো না। আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে—মাকে গঙ্গাজল দিয়ে এস। আজকে বিকেলে অন্ততঃ অভিভাবকদের শুভেচ্ছা তোমাকে স্পর্শ করবে না।"

বলিয়া অজয় চলিয়া যাইতেছিল, নমিতা সোৎসাহে প্রশ্ন করিল,—"কোথায় যাচ্ছেন?"

"এই আস্‌ছি—আমার ঘরের জান্‌লাগুলো খোলা আছে, কী রকম মেঘ করেছে দেখেছ? একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই—বিছানা-বালিশ সব কাদা! অভিজ্ঞতাটা অবশ্যি নতুন হ'তো না, কিন্তু কাল থেকে জ্বর-ভাব হয়েছে বলে' একটু সাবধান হচ্ছি। আমি যাচ্ছি ওপরে—বারান্দায়। ৫' মিনিট্‌।"

বারান্দা বলিতে ঐ দক্ষিণের বারান্দাটিই বুঝায়,—মাকে আহ্নিকে বসাইয়া, দুয়েকটি গৃহকর্ম্ম সারিয়া নমিতা ধীরে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আগেই অজয় রেলিঙ্‌ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথম অজয় নমিতার আবির্ভাবটিকে লক্ষ্য করিল না বলিয়া আর দুয়েক পা অগ্রসর হইয়া আরো একটু কাছে আসিতে নমিতার ভারি লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আরো একটু কাছে না আসিলে আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে না। নমিতা কি করিবে কিছু ভাবিয়া না পাইয়া তেমনি রেলিঙ্‌ ধরিয়া দূরে কালো আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজয়ই হঠাৎ সজাগ হইয়া কাছে সরিয়া আসিল। কোনো রকম ভূমিকার সূচনা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল,—"পুজো-আহ্নিক করা ছাড়া তোমার আর কোনো বড়ো কাজ করবার সত্যিই কি কিছু নেই?"

নমিতা কথা বলিতে জোর পাইল না বটে, কিন্তু তবু কহিল,—"ওঁদের মতে পুজো আহ্নিক করে' বাকি জীবনটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়াই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

"বাকি জীবন?" অজয় যেন আকাশ হইতে পড়িল: "বাকি জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারো?

তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই ছোট সঙ্কীর্ণ আকাশটুকু দেখে সমস্ত পৃথিবীর ছবিটা মনে মনে এঁকে নিতে পারো? বাকি জীবন! অসৌজন্য মাপ করো, তোমার বয়েস কত?"

নমিতা লজ্জায় মুখ নামাইল। অজয় আবার কহিল,—"তোমার মতো বয়সে ফ্রান্সে জোয়ান্ অব্ আর্ক দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছিলো—বাকি জীবনটাকে খরচের ঘরে ফেলে দেউলে হয় নি। সে-সব খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখো না, তাই এমন স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হ'তে পেরেছ। তোমাকে তিরস্কার করছি না, কিন্তু এটা মনুষ্যত্ব নয়।"

নমিতার স্বর ফুটিতেছিল না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিল,—"কিন্তু বিধবার আর অপর কর্ত্তব্য নেই। ভগবৎ ভক্তিই তার একমাত্র ভরসা।"

অজয় হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"তোমাকে এ-সব কথা কে শেখালে? বিধবা তুমি কি ইচ্ছে করে' হয়েছ? তুমি কি সাধ করে' স্বেচ্ছায় এই বৈরাগ্যের বেশ নিয়েছ? নিয়তির বিধানের চেয়েও সমাজের শাসন যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন অন্ধের মতো তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা মানে নিজেকে অপমান করা। তোমার ভগবান তোমাকে ঘরে ব'সে নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করতে উপদেশ দিয়েছেন? এই যে দলে দলে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, দেশ স্বাধীন করতে কারাগারকে তীর্থ করে' তুলছে তারা সব ভগবানের বিরুদ্ধাচারী?"

নমিতা ঘাড় নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু সংসারের শান্তি রাখ্তে হ'লে প্রতি পদে আমাকে তার মুখ চেয়ে চল্তে হ'বে। সংসার চায় আমি বসে' বসে' নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করি।"

অজয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে: "কাদের নিয়ে সংসার? জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরাই তাকে ভাঙ্‌বো। আমাদের ভাঙবার অধিকার না থাক্‌লে আমরা তাকে মান্‌বো কেন? যা তোমাকে তৃপ্তি দেয় না বরং সমস্ত জীবনকে সঙ্কুচিত খর্ব্ব করে' রাখে সেই আচার তোমাকে পাড়ার পাঁচজনকে খুসি করতে অম্লান বদনে পালন করতে হ'বে, সেটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম্ম নয়। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের উপর প্রভুত্ব খাটাতে পারে এমন একটা কৃত্রিম শক্তিকে যদি তুমি মানো তবে সেই হ'বে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু। আমরা এমন মরবার জন্যে জন্মাইনি।"

ঝর ঝর করিয়া শরৎকালের বৃষ্টি নামিয়া আসিল। নমিতা কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া কহিল,—"কিন্তু সংসার বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার আমার শক্তি বা যোগ্যতা কিছুই নেই। যারা দেহে মরবার আগে আত্মায় মরে' থাকে, আমি তাদেরই একজন। আমাকে দিয়ে আমার নিজেরো কোনো আশা নেই।"

কথা শুনিয়া অজয় মুগ্ধ হইয়া গেল,—বৃষ্টির সঙ্গে এই কথা কয়টি মিলিয়া আকাশে ও মনে এমন একটি মাধুর্য্য বিস্তার করিল যে ক্ষণকালের জন্য সে অভিভূত হইয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"ভারতবর্ষ বহু বৎসর ধরে' স্বাধীনতার সাধনা করছে, সে খবর তুমি রাখ?"

একটু হাসিয়া নমিতা বলিল,—"রাখি বৈ কি।"

"কিন্তু কেন সফল হচ্ছে না জান?"

"কেন?"

"আমরা এত সব ছোটখাটো শাসন ও সংস্কারের দাসত্ব করছি যে বড়ো একটা মুক্তির পথে আমাদের পদে পদে বাধা ঘট্‌ছে। আমরা যে মন্দির বেদী গড়্‌তে চাই তার থেকে অস্পৃশ্য বলে' অনেক কাউকে সরিয়ে রাখি। নিজের কাছে মুক্ত, স্বতন্ত্র না হ'তে পারলে বাইরের মুক্তি আমরা কি করে' পেতে পারি বলো? প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুই নিয়মাধীন—আমাদের বেলায়ই তার ব্যতিক্রম ঘট্‌বে সেটা আমাদের প্রকাণ্ড দুরাশা। আমরা সমাজে দু শো ছত্রিশটা দেওয়াল গেঁথে একে অন্যের থেকে পৃথক হ'য়ে কোটি কোটি স্বার্থপরতার সঙ্ঘর্ষ বাধাবো, সমাজ গঠনে সুবিধে না দিয়ে নারীকে রাখ্‌বো পদদলিত, চাষা মজুরকে রাখ্‌বো পায়ের ক্রীতদাস আর হাতের ক্রীড়নক—আমরা কি ক'রে বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবি করতে পারি? তার মানে, সাফল্য আমাদের সেইদিনই অনিবার্য্য নমিতা,

যেদিন আমরা প্রত্যেকে বর্ত্তমানের এই শূন্য না থেকে এক হ'য়ে উঠেছি। আমরা প্রত্যেকে যদি এক হই তবে কেউ আর একাকী থাক্‌বো না। তেত্রিশ কোটি শূন্য যোগ দিলে সেই শূন্যই থেকে যাবে—শত যোগবলেও সেই যোগফল তুমি বদ্‌লাতে পারবে না কথনো।"

খানিক থামিয়া অজয় আবার কহিল,—"হ্যাঁ, বিদ্রোহ করবার যোগ্যতা তোমার নেই—নিজের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তোমার এই জ্ঞানটুকু আছে বলে' তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেলো। কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমাকে অর্জ্জন করতে হ'বে। তুমি চম্‌কে উঠো না। যোগ্য না হ'য়ে আজ যদি তুমি সংসারের বিরুদ্ধাচরণ কর, সেটা তোমাকে শোভা পাবে না বলে'ই লোকের চোখে লাগ্‌বে প্রখর দৃষ্টিকটু, এবং স্বয়ং আমি পর্য্যন্ত বলবো অন্যায়—তোমাকে ধিক্কার দেবো। কিন্তু যেদিন তুমি আত্মার শৌর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে উঠে এই সব তুচ্ছ সংস্কার ও মিথ্যাচারকে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে—সেদিন সব্বারই আগে যার প্রণাম পাবে সে আমার।"

নমিতার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল; ধীর সংযত-কণ্ঠে সে কহিল,—"কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ-টাই কি বড়ো কীর্ত্তি হ'বে?"

"যাকে তোমার এখন মাত্র বিদ্রোহাচরণ মনে হচ্ছে তখন দেখবে সেই তোমার জীবন। তখন যেটা তোমার কাছে একান্ত সহজ, ন্যায্য ও স্বাভাবিক মনে হবে—সেটাই অন্যের মতে হ'বে অন্যায়, কেউ কেউ বা তার সংজ্ঞা দেবে পাপ। পরের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্‌বার জন্যে আমরা হাঁটতে শিখিনি। অনবরত সীমা-রেখা টেনে টেনে জীবনকে আমরা কুণ্ঠিত ও সঙ্কীর্ণ করে' রেখেছি বলে'ই আমরা অহর্নিশ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাদৃশ্য বাঁচিয়ে চলতে চাই। কিন্তু জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করে' দিতে থাক, ব্যক্তিত্বের সাধনায় তুমি ক্রমোন্নতি লাভ কর, দেখবে তুমি অদ্বিতীয় হ'য়ে উঠেছ। তাকে যদি বিদ্রোহ বল, আমরা সেই বিদ্রোহ নিশ্চয়ই করব। তখন বিদ্রোহ না করাটাই হ'বে আত্মহত্যা।"

শরৎকালের বৃষ্টি স্বল্পায়ু—অনেকটা নারীর ভালবাসার মত। বৃষ্টির পরে আকাশ আবার স্নিগ্ধ ও বেদনাতুর চোখের মত ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আবার কথা সুরু করিতে দেরি হইতেছিল। চুপ করিয়া কতক্ষণ কাটিল কাহারো কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ অজয় প্রশ্ন করিল,—"সমস্ত দিন তুমি কি করে' কাটাও?"

নিমেষে নমিতার ঘোর কাটিল বুঝি,—আবার সে তাহার নিরানন্দ পৃথিবীর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কহিল,—"কি করে' আর কাটাই? কাজ কর্ম্ম করি আর ঘুমুই।"

"এ রকম করে' কদিন কাটাবে? তোমার মুখের সেই অসার উত্তরটা আমি শুন্‌তে চাই না। বল্‌তে চাই, এমনি করে' অমূল্য সময় অপব্যয় করে' তোমার কোন্ পরমার্থ লাভ হচ্ছে?"

"কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?"

"তুমি পড় না কেন? সুমিকে দিয়ে তোমাকে যে একটা বই পাঠিয়েছিলুম তা পড়েছিলে?"

নমিতার মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল; কহিল,—"তা পড়া বারণ হ'য়ে গেছে।"

"বারণ হ'য়ে গেছে? কারণ?"

"কারণ, কাকা ও সব উপন্যাস-পড়া নিষেধ করেছেন।"

অজয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; "উপন্যাস? ও ত' একটা ইতিহাস মাত্র—সাদা সত্য ঘটনা। আর, মাছ মাংস মশুর ডালের মত উপন্যাসও তোমাদের নিষিদ্ধ নাকি? মনুর কোন্ অধ্যায়ে তা লেখা আছে?"

নমিতার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল; "আমাকে গীতা পড়তে বলেছিলেন; সংস্কৃত শব্দরূপই জানি না তা তার মাথামুণ্ডু আমি কি বুঝবো ছাই? ওটা আমার চমৎকার ঘুমুবার ওষুধ হয়েছে।"

আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অজয় কহিল,—"এটা তোমার কাছে জুলুম মনে হয় না?"

"জুলুম কিসে?"

"মানুষকে ভালো করার মধ্যেও একটা পরিমাণ জ্ঞান থাকা উচিত। জামাইবাবুকে একখানা ট্রিগোনোমেট্রির বই দিয়ে আঁক কষতে বল না।"

"কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া আর আমাদের পাঠ্য কী হ'তে পারে ?"

"আমাদের আমাদের করে' তুমি নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে ছোট করে' তুলছ কেন ? তুমি কি মানুষ নও ? তোমার কপালে সিঁদুর নেই বলে'ই যে তোমার জীবন ধারণে কোনো সুখ থাকবে না—এ যারা তোমাকে বোঝাতে চায় তারা তোমার আত্মার অত্যাচারী। তাদের তুমি মেনো না। আমি আছি তোমার বন্ধু। কী করে' সময় কাটাবে ? খুব করে' পড়ো। প্রথমত তাই পড়ো যা বুঝতে ব্যাকরণ লাগে না, লাগে শুধু অনুভূতি। যেমন ধরো কবিতা। তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হ'বে।"

নমিতা একটু ভীত হইয়া বলিল,—"কিসের জন্যে ?"

"নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্যে।"

"ও-সব কথার মানে আমি বুঝি না।"

"সে বোঝবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হ'বে। আমি আনছি বই। জীবনকে দেখবার জন্যে বই হচ্ছে বাতায়ন, সে বাতায়ন দিকে দিকে উন্মুক্ত করে' দিতে হ'বে।" বলিয়া দ্রুতপদে অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে নমিতা আবার ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্দার ধারটিতে আসিয়াছে। কয়েকবার বৃষ্টি হইয়া যাইবার পরেও আকাশের স্তম্ভিত ভাবটা এখনো কাটিয়া যায় নাই—সেই নিরানন্দ বিবর্ণ আকাশের তলে সমস্ত সহরটা যেন অবসন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে—পৃথিবী আর চলিতে পারিতেছে না। বিকাল হইতে নমিতার মন-ও রাতের আকাশের মত ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছে—নানা সমস্যা ও সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তগুলি যেন তাহাকে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ফলবান হইবার জন্য তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতিময় আরাম তাহাকে আর পোষাইবে না। কিন্তু এই দুঃখের আরামকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া নবজীবনের ঝড় আসিবে কবে ?

হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল রাস্তায় কে একজন পায়চারি করিতেছে। আজ তাহার চোখ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিল, অজয়। রোজই ত' এই সময় এম্‌নি একটি লোক রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, এমন করিয়া কোন দিনই সে লক্ষ্য করে নাই। এত দিনের সেই লোকটিই যে অজয় ইহার সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহও তাহার মনে রহিল না এবং এই বিশ্বাস টুকুকেই অন্তরে লালন করিতে গিয়া নিমেষে নমিতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আজ দূর হইতে অজয়কে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিল এবং এমন আগ্রহ সহকারে চাহিয়া থাকাটার মধ্যে কোথাও যে এতটুকু অসৌজন্য থাকিতে পারে তাহা তাহার ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না। লোকটিকে অজয় জানিয়া চোখ ফিরাইয়া রাখিলে এই রাত্রি বোধ করি আর কাটিত না। চলিতে চলিতে অজয় যখন মোড়ের গ্যাস্‌-পোস্‌টার কাছে আসিতেছে তখন অনতিস্পষ্ট আলোতে তাহাকে একটু দেখিয়া লইতে না লইতেই অন্ধকার আসিয়া সব কালো করিয়া দিতেছে। তবু যেটুকু সে দেখিতে পাইতেছে না সেইটুকুর জন্যই তাহার মন উচাটন হইয়া উঠিল।

কাকিমার ছোট খুকিটা অভ্যাসমত চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। একটা হাত-পাখা দিয়া কাকিমা তাহাকে খুব পিটাইতেছেন: "মর্ মর্ শুক্‌নি। সারা থিয়েটার জ্বালিয়ে এসে হারামজাদির এখনো কান্না থামে না। কোনো দেবীর কৃপা হ'লেও ত' বেঁচে যাই।"

পাশের খাট হইতে কাকা হাঁকিলেন: "নমি উঠে আসে না কেন ?"

কাকিমার উত্তর শোনা গেল: "ধুমসো হ'য়ে গিলতেই পারে সব। নমি আস্‌বেন! মায়ে-ঝিয়ে দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। পরের পয়সায় খেলে ডোমনিও নবাবের বেটি হ'য়ে ওঠে।"

এইবারে সামনের ঘর হইতে মা'র ডাক আসিল: "নমিতা!"

অজগর সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া বিপুল রাজপথ ঘুমাইয়া রহিয়াছে; আকাশ নির্ব্বাক, অন্ধের চক্ষুর মত

সঙ্কেতহীন গম্ভীর। অজয় আরেকবার মোড় ফিরিয়া গ্যাস-পোস্টের তলা দিয়া ঘুরিয়া আসিল, আবার চলিয়াছে। দেয়ালের প্রান্তটুকু ঘেঁসিয়া বসিয়াও তাহাকে আর দেখা গেল না, ফিরিতে আবার একমিনিট লাগিবে। না, খুকিকে কাঁধে ফেলিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া ঘুম পাড়াইতে হইবে। অজয়ের চোখে কি ঘুম নাই? নাঃ, নমিতাকে উঠিতে হইল।

৯

অজয়কে বুঝিয়া উঠা ভার। সেই যে সেদিন দুই হাতে করিয়া কতগুলি বই পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার পর আর দেখা হয় নাই। অথচ এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া পাওয়া কথনই মুস্কিল হইত না যখন উদ্যত শাসনের উপদ্রব একটু শিথিল ছিল। একদিন এমন করিয়া সমস্ত হৃদয়ে সংশয়ের ঝড় তুলিয়া সহসা নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার কারণ কি, নমিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিজে গিয়া যে অজয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে তাহা ভাবিতেও তাহার সঙ্কোচ করে—সমস্ত সংসারের চোখে সেটা একটা বীভৎস অবিনয় মনে করিয়া সে নিবৃত্ত হয়, দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়া বইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে। সুমিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর জয়-দা কি করছে রে?"

সুমি বলিল,—"কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি। দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা নেই।"

অজয়ের জন্য নমিতার মনে উদ্বেগ ও সহানুভূতি পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সংসারের দৈনন্দিন চলা-ফেরার সঙ্গে তাহার একটুও মিল নাই, দূর হইতে অজয়ের ব্যবহারের এই প্রকাণ্ড অসঙ্গতিটা নমিতা লক্ষ্য করিয়াছে। কখন যে অজয় বাড়ি আসে তাহার ঠিক নাই, দুই দিন হয় ত' আসিলই না, স্নান না করিয়াই হয় ত' ভাতের থালা লইয়া গিলিতে বসে, মধ্যরাতে কল হইতে জল পড়িতেছে শুনিয়া কাকিমার আদেশে কল বন্ধ করিতে আসিয়া দেখিয়াছে অজয় স্নান করিতেছে—আর অগ্রসর হয় নাই। এই সব নিয়মবহির্ভূত আচরণে দিদির মুখে তিরস্কারেরও আর বিরাম ছিল না, তবু এই ছেলেটি সমস্ত অভিযোগ আলোচনায় কান না পাতিয়া দিব্যি আত্মসম্মান লইয়া এই বাড়িতেই কালাতিপাত করিতেছে। অজয়কে নমিতার মনে হয় অসাধারণ,—কোনো অভ্যাস বা নিয়মের সঙ্গেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন কি-এক কঠোর সাধনায় লিপ্ত, একা একা সংগ্রাম করিতে তাহার নিজের শক্তি যেন আর কুলাইতেছে না—তাহার ললাটে প্রতিজ্ঞার তীব্র দীপ্তি থাকিলেও দুই চোখে একটি ঔদাস্যময় ক্লান্তির ভাব আছে। ক্ষণেকের জন্যও সংসারের কাজকর্ম্মের ফাঁকে অজয়কে দেখিতে পাইলে নমিতা যেন তাহার অন্তরের এই অন্তহীন ক্লান্তিকর সংগ্রামের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তেই পড়িয়া নেয়। মনে হয় অজয়কে কোনো কাজে সাহায্য করিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু যে দুই হাতে সবেগে নাড়া দিয়া তাহাকে এমন করিয়া জাগাইয়া দিল সে সহসা আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইবে ইহা ভাবিতে নমিতা চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকিয়া গেলে প্রায় একটার সময় এক মাথা রুক্ষ চুল লইয়া অজয় আসিয়া নীচের উঠানটুকুতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল: "দিদি হাঁড়িতে ভাত আছে?"

দিদি তখন দিবানিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন, তাই এক ডাক যথেষ্ট নয়। অজয় আবার ডাক দিল। পাশের ঘরে নমিতা দেয়ালে পিঠ রাখিয়া অভিধানের সাহায্যে একটা রুষীয় উপন্যাসের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ক্ষুধিত অজয়ের ডাক শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ঘুমন্ত কাকিমার পায়ে নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। এই ব্যবহারটাও যে তাহার নীতিশাস্ত্রের ঠিক অনুযায়ী হয় নাই তাহা সে জানিত, কিন্তু ক্ষুধার সময় অজয় দুইটা ভাত চাহিতে আসিয়াছে এই খবর পাইয়া সে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

কাকিমা উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এই অসময়ে কে তোর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে' থাকবে শুনি? রাতে কোথায় পড়েছিলি? তুই তোর খুসি-মত যা-তা করবি, কখন খাবি

কখন খাবি নে—বসে' বসে' কে তার হিসেব রাখ্‌বে? আমি বাড়িতে বাবাকে লিখে দিচ্ছি এরকম হ'লে তোমার এখানে আর পোষাবে না সংসারের সুবিধে না দেখে নিজের খেয়াল মাফিক চলা ফেরা করতে চাও হোটেল আছে।"

এত কথায়ও অজয়ের স্থৈর্য্য একটুও টলিল না—এ-সব কথা যেন তাহার একেবারেই গ্রাহ্য করিবার নয়। সে পরিষ্কার সহজ গলায় কহিল,—"বেশ ত, নাই পেলুম ভাত, —চৌবাচ্ছায় জল আছে ত'? স্নান করতে পার্‌লেই আমার অর্দ্ধেক খিদে যাবে। যাঃ, জলও নেই। আমি এখন আবার বেরুচ্ছি দিদি। সন্ধ্যের সময় আস্‌তে পারি তখন দু'মুঠো ভাত পেলেই আমার চল্‌বে।" বলিয়া অজয় সেই অভুক্ত অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল।

বিড়বিড় করিতে করিতে কাকিমা জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শয্যা লইলেন, কিন্তু নমিতার মনে কোথায় বা কেন যে ব্যথা করিয়া উঠিল তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কাকিমার এই ব্যবহারে তাহার নিজেরই আর লজ্জার শেষ ছিল না—এ-সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিবার তাহার কোনোই অধিকার নাই। তবু যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সে কহিল,—"না খেয়ে বাড়ি থেকে চলে' গেলেন। সামান্য দু'টো ফুটিয়ে দিলে হ'ত না?"

একে নমিতাই অকারণে তাঁহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহার মুখের উপর অজয়ের হইয়া সে ওকালতি করিতে চায়—কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন: "তোর আবার আদর উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? তুই যে দিন-কে-দিন বড্ড বেহায়া হচ্ছিস্‌।"

নিজের উপর সমস্ত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা নমিতা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া এই হীন বাক্যযন্ত্রণা সে সহিতে পারিল না। তবু স্বভাবসুলভ বিনয় করিয়াই কহিল,—"না খেয়ে বাড়ি থেকে কেউ চলে গেলে বাড়ির মঙ্গল হয় না শুনেছি—সংসারে শ্রী থাকে না।"

কথার তাৎপর্য্য যতটা না হোক্‌, নমিতা যে আবার তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিল এই অশ্রদ্ধা দেখিয়া কাকিমা রাগে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন, সুর চড়াইয়া দিতে হইল: "বাড়ির মঙ্গল হ'বে না মানে? তুই আমার সমস্ত বাড়িকে শাপ দিচ্ছিস্‌ নাকি? নিজে স্বামী খেয়ে শাকচুন্নি সেজে পরের মঙ্গলে তোমার হিংসে হচ্ছে।"

ধীর কণ্ঠে নমিতা কহিল,—"অমন যা-তা বলো না কাকিমা।"

"কেন বল্‌বো না শুনি? সংসারে শ্রী থাক্‌বে না? শ্রী আছে তোমার কপালে!"

গোলমাল শুনিয়া নমিতার মা উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে শুনাইবার জন্য কাকিমা গলায় আরো শান্‌ দিতে লাগিলেন: "আমার ভায়ের জন্য এতই যদি তোর মন পুড়্‌ছিল হতভাগী, নিজে গিয়ে মাছ মাংস রেঁধে দিলি নে কেন? ক্ষীরের পুলি তৈরী করে' দিতিস্‌ বসে' বসে'।"

নমিতা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। শুনিতে পাইল মা-ও কাকিমার পক্ষ লইয়া তাহাকেই মন্দ বলিতেছেন। মা'র এই অসহায় অবস্থায় কাকিমার বিরোধিতা করিবার উপায় ছিল না, তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাকিমার এই কটুবাক্যে সায় দিতে হইতেছে। আর আর দিন তিরস্কৃত হইয়া নমিতা নিজেকে একান্ত ব্যর্থ মনে করিয়া চোখের জল ফেলিত, আজ সে বুঝিল এইভাবে এই অন্যায় বরদাস্ত করা তাহার আত্মসম্মানের অনুকূল হইবে না। নারী এবং পরাবলম্বী হইয়াছে বলিয়াই যে তাহাকে মাথা পাতিয়া চিরকাল এই ঘৃণ্য নির্য্যাতন সহিতে হইবে এবং আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য পর্য্যন্ত ভাষা পাইবে না তাহা ভাবিতে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার কোনো প্রতিকার নাই—তবু মনে মনে এই একটা বিদ্রোহ ভাব পোষণ করিয়া তাহার তৃপ্তির আর অবধি রহিল না।

মা নমিতার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; নমিতাও নিঃশব্দে ব'য়ের উপর মুখ গুঁজিয়া রহিল। এই অবরোধ হইতে তাহারা কবে মুক্তি পাইবে? প্রদীপ সেই যে একটু বন্ধুতার আশ্বাস দিয়া পলাইয়াছে, আর তাহার দেখা নাই। পরের কাছ হইতে আশ্রয় বা সাহায্য নিতে গেলে কত বিপদ, কত

ভয়,—নমিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কত নিন্দা, কত গ্লানি, কত অখ্যাতি—নমিতা শিহরিয়া উঠিল। সংসারে বন্ধুরূপে কাহাকেও স্বীকার বা গ্রহণ করাও বাঙালি মেয়ের নিষিদ্ধ,—স্বামী যদি মরিল তবেই তুমি অব্যবহৃত ছিন্ন জুতার সামিল হইয়া উঠিলে। এক বেলা আলো-চাল খাইয়া তোমাকে ইহজীবন সার্থক করিতে হইবে। কোথায় একটা লোক মরিল আর অমনি তোমার দেহ ও আত্মা একসঙ্গে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া উঠিবে—এই বিধান মাথা পাতিয়া নিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না, অথচ প্রদীপ একটু স্নেহাতিশয্যে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া শ্বশুর মহাশয় তাহাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। এমন কি সেখানে তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিবার সুযোগ আছে বলিয়া তাহাকে কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বাড়ি নিঝুম হইয়া গিয়াছে। নমিতা বই মুড়িয়া রাখিয়া চুলের খোঁপাটা বাঁধিয়া লইয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই তাহার প্রথম বিদ্রোহ। ভয় যে করিতেছিল না তাহা নয়, তবু যে-লোক সামান্য দুইটি ভাত চাহিয়া না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি সে কেন যে একটি মধুর সমবেদনা অনুভব করিতেছে বুঝা কঠিন। সুমি কাকিমার ছেলেপিলেদের সহিত তাস নিয়া ঘর বানানোর খেলাতে মত্ত ছিল, দিদিকে লক্ষ্য করিল না। নমিতা সোজা অজয়ের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দরজা দু'ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, বেশ দেখা গেল ঘরে কেহ নাই। ঘরে কেহ নাই ভাবিয়াই নমিতা আসিতে পারিয়াছে, নচেৎ তক্তপোষের উপর অজয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিলে বিদ্রোহিণী নমিতা লজ্জায় জিভ্ কাটিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত হয় তো।

ঘরের চেহারা দেখিয়া নমিতা ছি ছি করিয়া উঠিল—এই ঘরে মানুষে থাকে! তক্তপোষের উপর ছেঁড়া একটা মাদুর পাতা—তাহার উপর একটা তোষক আছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা কাঁথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়। মশারির তিনটা কোণ ছিঁড়িয়া গিয়া বিছানার উপরই বিস্তৃত হইয়া আছে, ছেঁড়া বালিশের তুলাগুলি মেঝেয় ও বিছানায় এলোমেলো হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। দুমড়ানো কয়েকটা ধুতি মেঝেয় ধুলার উপরই পড়িয়া আছে—ঘরে কতদিন যে ঝাঁট পড়ে নাই তাহার চেয়ে আকাশে কয়টা তারা আছে বলা সহজ। টেবিলটার উপর স্তূপীকৃত বই খাতা, ওষুধের শিশি, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম—যেন একটা প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। নমিতা যেন হঠাৎ একটা কাজ পাইয়া গেল। এই বিশৃঙ্খল ঘরে যে লোকটি বাস করে সে কোন নিয়মের অনুগত নয় বলিয়া তাহার মনে ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ একটি স্নেহ জমিয়া উঠিতে লাগিল!

অতি যত্নে নমিতা এই নোংরা ঘরকে মার্জ্জনা করিতে বসিল। ঝাঁটা কুড়াইয়া আনিয়া ধুলা ঝাড়িল, টেবিলটা ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিল এবং টেবিলের কাছে যে চেয়ার আছে নিজের অলক্ষিতে তাহারই উপর বসিয়া সামনের আয়নায় নিজের মুখ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিছানাটার সংস্কার করিতেছে, বলা-কহা নাই হঠাৎ খোলা দরজা দিয়া সেই এক মাথা রুখু চুল নিয়া অজয় আসিয়া হাজির। ইহার চেয়ে বালিশের তলা হইতে একটা পিস্তল বাহির হইলেও সে এত চমকাইত না।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিতেই অজয় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শ্রান্তকণ্ঠে কহিল,—"যতই কেন না নাস্তিকতা করি, ভগবান বারে বারে প্রমাণ করে' দিচ্ছেন যে তিনি আছেনই আছেন। এখান থেকে ভাত না পেয়ে একবার ভাবছিলুম বেলেঘাটায় যাব, বাস্-এও উঠেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ জ্বর এসে গেল। ভীষণ জ্বর!" বলিয়া নিজেই নিজের কপালে হাত রাখিল। কহিল,—"ভাবছিলুম ঘরে ত' ফিরে যাব, কিন্তু বিছানা-পত্র যে রকম নোংরা হ'য়ে আছে শোব কি করে'? বিছানা গুছোবার প্রবৃত্তি আমার কোনো কালেই ত' নেই

মশারির একটা কোণ্ হাতে ধরিয়া নমিতা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনা মিশাইয়া কহিল,—"জ্বর হ'ল?"

"কত অত্যাচার আর সইবে বল? তখন যে ক্ষুধার সময় ভাত পেলুম না, স্নানও যে করতে পারলুম না—ভালোই হয়েছে। অসুখটা তা হ'লে আরো বাড়ত—

আমার অসুখ বাড়তে দিলে চলবে কেন? আমার যে কত্তো কাজ—কী প্রকাণ্ড দায়িত্ব আমার হাতে।" একটু থামিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল,—"কিন্তু তুমি হঠাৎ এ-ঘরে কেন, নমিতা?"

বিছানাটা ক্ষিপ্রহাতে যথাসম্ভব গুছাইয়া নিতে নিতে নমিতা কহিল,—"আপনিই ত' তার উত্তর দিয়েছেন। আপনাকে নাস্তিকতা থেকে রক্ষা করতে।"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অজয় বলিল,—"হ'বে।"

বিছানাটাকে শুইবার মত উপযুক্ত করিয়া নমিতা কহিল,—"আপনি কাঁপছেন, শিগগির শুয়ে পড়ুন।"

অজয় এক লাফে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় নিল। নমিতা একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—"খুব কষ্ট হচ্ছে?"

অজয় কহিল,—"আমাকে এক গ্লাশ জল দিতে পার? খাব।"

"আন্‌ছি।" নমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে জল নিয়া আসিল।

জল খাইয়া সামান্য একটু সুস্থ হইয়া অজয় বলিল,—"এ ক'দিন রোদ্দুরে ত' আর কম ঘুরিনি। মাথাটা যেন ফেটে পড়ছে। একটু হাওয়া করবে, নমিতা? দেখ, পাখাটা বোধ হয় তক্তপোষের তলায় ঘুমুচ্ছে।

তক্তপোষের তলা হইতে পাখাটা টানিয়া আনিয়া নমিতা শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহাতে বাতাস করিতে লাগিল। কহিল,—"কাকিমাকে ডেকে আনি, কেমন?"

অজয় অস্থির হইয়া কহিল,—"না না, আর কাউকে ডাকতে হ'বে না। চেয়ারটা টেনে এনে এখেনে বসে' তুমিই হাওয়া কর একটু।"

নমিতা না বলিয়া পারিল না: "কিন্তু কেউ দেখতে পেলে কি বলবেন ভাবুন দিকি।"

নমিতার মুখের উপর স্থির দুইটি চক্ষু তুলিয়া অজয় বলিল,—"তোমাকে মন্দ বলবেন? কিন্তু মন্দ তুমি ত' কিছু করছ না। করছ? রোগীর প্রতি যদি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাও তার একটা বড়ো রকম প্রশংসাও আছে।"

"কিন্তু যাঁরা নিন্দা করবেন তাঁরা ত' আমার এই সেবাটুকুকেই দেখবেন না, দেখবেন অন্য কিছু।"

"লোকে যদি ভুল দেখে তার জন্যে তুমি শাস্তি নেবে কেন? তুমি নিজে যদি অন্যায় বা অসঙ্গত বা অশিষ্টাচার মনে কর, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে' যাও—কিন্তু লোকের তুচ্ছ মিথ্যাকে ভয় করে' যদি পালাও তা হ'লে আমার দুঃখ থেকে যাবে। আমাকে একটু হাওয়া করা কি তোমার অন্যায় মনে হচ্ছে?"

তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টানিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া নমিতা কহিল,—"এখন আপনি চুপ করে' একটু শুয়ে থাকুন তো, বিকেলে হয় ত' জ্বরটা নেমে যাবে।"

একান্ত বাধ্য ছেলেটির মত অজয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক মিনিট পাখা চালাইবার পর অজয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া নমিতা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া নিল। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে তাহার ডান হাতখানি অজয়ের কপালের উপর রাখিয়া তাড়াতাড়ি তখুনি আর সরাইতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

মাদকদের আনন্দ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

এখন থেকে সামনে সবার
গরব করে চল,
রাজকৃপাতে আজ আমাদের
মুখ হল উজ্জ্বল।
আয়রে পচাই আয়রে তাড়ি
সোহাগ ভরে দিই গে পাড়ি,
কৃতজ্ঞতায় আজ আমাদের
নয়ন ছলছল।

মদ্য আফিং চণ্ডু চরস
ভাঙ কি গাঁজা সব
সবাই কর জয়ধ্বনি
উচ্চ কলরব।
নিন্দা করে সাধ্য কার আর,
ভয় ত আছে কঠিন কারার,
আইন মোদের মান বাঁচালে
কার হেন কৌশল।

কবি সমাজ-সংস্কারক
দারুণ রুচিবিদ্
নিন্দুকের মুখ বন্ধ এবার
কাঁদুন পড়ে চিৎ।
খেওনা কেউ মদ কি গাঁজা,
বল্লে পরেই দারুণ সাজা,
সাধক-গড়া মাদক মোরা
নইত অসরল।

গাল দিয়েছে অনেক ভায়াই
মায় কাণা মিল্টন,
এতদিনে মোদের হল
কলঙ্ক ভঞ্জন।
সে সব কথা আর কি শুনি,
উঠছে মোদের জয়ধ্বনি,
নির্ব্বিবাদে আমরা এবার
পিয়াই হলাহল।

শত্রু মোদের শত্রু মোদের
গান্ধী সে বন্দী,
মাদকদেরি মান বাঁচাতে
বিধির এ ফন্দী।
আমরা হাসি আমরা নাচি,
আমরা থাকি আমরা বাঁচি,
সাধনারি বৃক্ষে মোদের
আজ ধরেছে ফল

ঠিকে ভুল

[শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী]

১

বেলপুকুর গ্রামের বনেদী জমিদার,—পূর্ব্বের শ্রী এখন আর যদিও দেখিতে পাওয়া যায় না, পালপার্ব্বণের উৎসব যদিও বন্ধ হইয়াছে,—তথাপি বর্ত্তমানেও যতটুকু বর্ত্তমান আছে অন্যের তুলনায় অনেক। এখনো রামরতন গুপ্ত পথে বাহির হইলে লোক সম্ভ্রমের সহিত সামনের পথ ছাড়িয়া দিয়া থাকে।

সদর-অন্দর যা কিছু সেই পূর্ব্বতন কালেরই সব, যাহারা বাড়ীর পাশ দিয়া যাতায়াত করে, তাহাদের দৃষ্টিতে পড়ে—মাঝে মাঝে বালিখসা উঁচু প্রাচীর, কোন জায়গার ফাটলের ফাঁকে চাটাই-এর সযত্ননির্ম্মিত তৃণাচ্ছাদিত নীড়, কোন স্থানে শ্যামল পরগাছার স্নিগ্ধ পল্লবের মাধুর্য্য, বাগানসমেত বাড়ীখানি, আয়তনটা খুবই বড়, দেউড়ীও আছে, কালের প্রভাবে শুধু দরওয়ানেরই অভাব ঘটিয়াছে।

ঘড়ীতে বেলা তখন আটটার কাঁটায় পৌছিয়াছে—রামরতন গুপ্ত বৈঠকখানার রাস্তার ধারের বারান্দায় ঈষৎ চিন্তিত মুখেই পায়চারি করিতেছিলেন।

সেই সময়ে দেউড়ীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল এবং আগন্তুক যাহারা নামিল,—তাহারা তিন জনেই ক্রমশ মৃদুভাবে দুই চারিটি কথা কহিতে কহিতে তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইল।

রামরতন গুপ্ত তখন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বসিত ভাবেই বলিয়া উঠিলেন—"যাক্ তোমরা যে এসেছ এই যথেষ্ট—কাল আসবার কথা অথচ দু' দুটো ট্রেণ ছেড়ে গেলেও তোমাদের না দেখে—"

নত মুখে বিভাস উত্তর দিল—"কি করি, কাল গঙ্গাসাগরফেরতা যাত্রীর ভিড় দেখে এঁরা সব ষ্টেশনে এসেই পিছিয়ে গেলেন

"সে বেশ করেছে—তবে এদিকের ট্রেণে তোমাদের বিশেষ ভীড় হত বলে মনে হয় না", বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

অমরনাথ বলিল "আরো একটু কারণও ছিল, কাল বিজয়ের ভগ্নীপতি হঠাৎ সপরিবারে সন্ধ্যার ট্রেণে এসে উপস্থিত,—নইলে রাত্রের ট্রেণে হয়তো আমাদের আসা সম্ভব হ'ত।"

বিজয় এতক্ষণ নীরবেই ছিল—এইবার সহজ কণ্ঠেই বলিল—"সেটাও তো শোভন হত না—তাঁকে ফেলে রেখে আসাটাই যে একটা অভদ্রতা হয়ে দাঁড়াত।"

"সে কথা খুব ঠিক, তবে আমাকে তোমরা টেলিগ্রামে একটা খবর দিলেই পারতে", বলিয়া রামরতন গুপ্ত তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ভুলোকে ডাক দিয়া যথাবিহিতভাবে আগন্তুকদের হাত মুখ ধোওয়ার জল,—তোয়ালে টুল প্রভৃতি বন্দোবস্তের জন্য অনুমতি দিলেন। তারপর ভিতর হইতে একখানা ধোপদস্ত চাদর আনিয়া ফরাসটা পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিয়া,—বিভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসো, তোমাদের আসার খবরটা একবার বাড়ীতে দিয়ে এসে বসো।"

বাহিরের লম্বা রোয়াকটা একেবারে ভিতরের দরজার কাছে গিয়া থামিয়া পড়িয়াছে। বিভাস পিতার আদেশ মত তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া যখন সেখানে আসিয়া থামিল,—সে সময়ে গৃহিণীর রুক্ষ কণ্ঠের আওয়াজ ভিতর হইতে সেখানে আসিয়াও পৌছাইতে ছিল। কিন্তু বিভাস অথবা রামরতন গুপ্তের নিকট ইহার নূতনত্ব কিছু ছিল না, তাই অবলীলাক্রমেই ভেজান দরজা ঠেলিয়া তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন—সেই পথেই প্রথমেই তাঁহাদের কাণে আসিল।—"মায়ে ঝিয়ের যেখানে দুটো পেট চলে ঠাকরুণ, তাদের লাভ লোকসানের দিক একটু দেখতে হয়। অত বড় মেয়ে রেবা তারও কি একটু হুঁস হয় না দুধটা তুলে রাখতে, আধসের দুধ সবটাই তো কুকুরে নষ্ট করে দিলে,—পরের জিনিষ নষ্ট হয় কাজেই গায়েও লাগে না, অগ্রাহ্যও হয়।"

রাধুনীর উপরেই যে এই রাগটা উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইল না, এবং ঈষৎ গম্ভীর মুখেই সপুত্র কর্ত্তা এই সময়ে ভিতরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অতর্কিত আগমনে ও তাঁহার পিছনে বিভাসকে দেখিয়া বলিলেন—"এক্ষুণি এলে বুঝি? আর যাদের আসবার কথা ছিল?"

মায়ের পায়ের ধূলি তুলিয়া লইয়া বিভাস বলিল—"হাঁ, তারাও এসেছে।" সেই সময়েই কর্ত্তা ঈষৎ গম্ভীর মুখেই বলিলেন—"সেই কথাই তো বলতে আসা—যে, রাণীকে সাজিয়ে রাখ, আর রান্নাবান্নাগুলোর ভাল বন্দোবস্ত কর, কিন্তু যে তোমার"—"কি আমার?" বাধা দিয়াই মানদা সুন্দরী ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে রামরতন গুপ্তের দিকে চাহিলেন, তারপর বলিলেন—"সে বন্দোবস্ত তোমার কোন্ বারই না হচ্ছে, আর এই নিয়ে ক'বার হল ঠিক আছে।"

রামরতন গুপ্ত ঈষৎ চিন্তিত মুখেই বলিলেন, "সে ঠিক আমার আছে—তা' যতবারই হোক যতক্ষণ রাণীর বিয়েটা না হচ্ছে, ততক্ষণই করতে হবে। তুমি যেমন বড় ঘরের পাত্তর খোঁজ—বড় ঘরের পাত্তর আবার তেমনি মেয়েও খোঁজে এটা তো বোঝ।"

ভারী মুখেই গৃহিণী বলিলেন—"তা' রাণী তো আমার মন্দ মেয়ে নয়।"

"না, মন্দ তোমার চোখেও না, মন্দ আমার চোখেও না, তবে এম-এ-পড়া হাকিমের ছেলের চোখে কেমন লাগবে তাতো বলা যায় না,—চোখের উপরই তো রাধুনী ঠাকরুণের মেয়ে রেবাকে দেখছো, তারা যে তোমার আমার চোখ নিয়েই আসে তা'তো নয়"।

গৃহিণী মুহূর্ত্তের জন্য একটু দম ধরিয়া রহিলেন—পরে বলিলেন—"বিয়ে কি আর আমাদের হয় নি—না হয়…"

ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে কর্ত্তা বলিলেন—"না হয়—আর কিছু একালে চলে না, যে কালে না দেখেই আমি তোমাকে পছন্দ করেছিলাম।" বলিয়াই রামরতন গুপ্ত উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

উপযুক্ত পুত্রের সম্মুখে এই মর্ম্মান্তিক অপমানে গৃহিণীর কালো মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু এ যাত্রা কোনো রকমে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তিনি বিভাসকে বলিলেন,—"যাও তুমিও চান করে একটু জলটল খেয়ে নাও বিভু! সারারাত জেগে এসেছ তো।"

অথচ কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা তখনো দূর হয় নাই।

৮

"আলুর চপ এখনো শেষ হয়নি ঠাকরুণ? ঘি-ভাতের জল চড়তে কত দেরী?" কথার শেষ দিকটায় গৃহিণী স্বয়ং আসিয়া রান্না ঘরের ভিতর উপস্থিত হইলেন।

রেবার মা তখন আলুগুলিকে পুর দিবার মত করিয়া গঠন করিতেছিল, তাহারই অনতিদূরে রেবা একখানা ছোট গামলিতে খানিকটা বেশম ফেনাইতে আরম্ভ করিয়াছে। রেবার মা তাঁহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী হঠাৎ সম্মুখের ভাজামাছগুলির দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ও মা! একি কাণ্ড, মাছগুলো এত ধরিয়েছ, আস্বাদটাই মাটী হ'য়ে গেল আর কি!"

ইতিমধ্যে কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর আসিয়া হাঁক দিলেন—"আর কত দেরী।"

জয়দুর্গা-ঠাকরুণ কুণ্ঠিত কণ্ঠে মানদাকে জানাইল—"আর বেশী দেরী হবে না, কুড়ি মিনিট হলেই হবে মা!"

ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে মানদা কর্ত্তাকে জানাইলেন—"শুনছো, এখনো কুড়ি মিনিট! ওদিকে মেয়েটাকে সেই যে সাজিয়ে ঠায় বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেটার গর্ম্মি ধরে গেল। এই সব কাজের লোক দিয়ে কি আর কাজ চলে?" বলিতে বলিতেই তিনি ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

মায়ের সহিত রেবা সকাল হইতে কাজ করিতেছে; উঠিবার অবসর নাই,—বাহিরের সহিত যেন তাহাদের কোন যোগসূত্র নাই,—অথচ বাহিরের কলরবগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই কাণেও আসিতেছে,—এইবার সে বয়সসুলভ উৎসুক ভাবে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু জয়দুর্গার মুখ যেন বড় গম্ভীর, বড় নির্লিপ্ততায় পরিপূর্ণ,—পুনরায় রেবার চোখ নত হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও খানিক দমিয়া পড়িল।

কিন্তু কৌতুহল সহসা যায় না,—তাই মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিল, "একবার আমি ওদিকে যাব মা!"

মুহূর্ত্তের জন্য একবার রেবার মুখের দিকে চাহিয়া,—তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে জয়দুর্গার দেরী হইল না,

উত্তরে শুধু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলিল,—"কি করতে যাবি, কেউ তো ডাকেনি রেবা !"

নতমুখেই রেবা বলিল—"আমরা যে বাড়ীরই মানুষ মা !"

উত্তরে জয়দুর্গা সংক্ষিপ্ত ভাবে একটী বার মাত্র বলিল—"হুঁ।"—ক্ষণকাল বাদেই আবার যেন কি ভাবিয়া বলিল—"তা যাবি যা দেখে আয়।"

রেবা হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িল।

তারপর রান্নাঘরের বারান্দা ছাড়িয়া যখন রাণীর ঘরে উপস্থিত হইল, সে সময়ে রাণীকে রাণীর মতই একখানা ভেলভেট-মোড়া চেয়ারে বসান হইয়াছে! এসেন্সের গন্ধে ঘরের বাতাসও মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত ঘরখানির ভিতর কোথাও একটু ধূলির স্পর্শ নাই। গহনা, কাপড়, জ্যাকেট, সেমিজের অন্তরালে, এবং সাবান পাউডারের সহায়তায় রাণীর সকল শরীরেই বেশ যেন একটা চমক দেওয়ার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিকটে আরো দুইজন প্রতিবেশিনী দাঁড়াইয়া তাহারই আলোচনায় ব্যস্ত! রেবা নিঃশব্দে গিয়া তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইল।

কিন্তু সে কাছে আসিতেই তার রিক্ত সৌন্দর্য্যের কাছে, রাণীর এই আড়ম্বরময় সজ্জা কেমন যেন ম্লান হইয়া উঠিল। মানদাসুন্দরী নিকটেই ছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিয়াই আকস্মিক বিরক্তির সুরেই বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আবার হাতের কাজ ফেলে এখানে কেন?"

রেবা শান্তকণ্ঠে বলিল—"একবার রাণী মাসীকে দেখবার জন্যে—"

বাধা দিয়াই গৃহিণী বলিলেন—"দেখনি কখনো? রথও নয়, দোলও নয়, যাও কাজ দেখগে।" রেবা অপেক্ষা করা সঙ্গত নয় বিবেচনায় বিষণ্ণ মুখে পুনরায় মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, কেবল বুঝিল না তার অপরাধ কি।

পরক্ষণেই মানদাসুন্দরী কটুকণ্ঠেই বড় গলায় বলিলেন—"এই চারদিকে জিনিষপাতি ছিটোনো, এর মধ্যে পাঁচ জনে যাওয়া আসা কি ভাল? কার মনে কি থাকে ঠিক নেই।"

হিতৈষী প্রতিবেশিনীদ্বয় সমস্বরেই উত্তর দিলেন—"সেতো ঠিক কথাই কাকীমা, কথায় বলে—অভাবে স্বভাব নষ্ট।"

রান্নাঘরে বসিয়াই কথাকয়টী জয়দুর্গার কাণে আসিল, সমস্ত মুখই হঠাৎ আগুণের মতই রাঙা হইয়া উঠিল, সহসা সেটুকু সংযত করিয়া লইয়া রেবাকে বলিল—"হলো তো? আমি না তক্ষুনি বলেছিলাম।"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া, আড়ালে গিয়া কয় বিন্দু চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। বুঝিবা তার চোখের জল, তার মায়ের চোখেও জল আনে সেই আশঙ্কায়।

তারপর বন্ধুসমেত পাত্র কখন যে আসিল, কি মতামত প্রকাশ করিল কখন যে ফিরিল, কোন সন্ধানই তাহারা রাখিল না,—কেবল গৃহিণীর হাঁকে এক সময়ে জয়দুর্গা গিয়া দুই থালা ভাত ধরিয়া দিয়া আসিল মাত্র।

কাজের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বেলাও শেষ হইয়া আসিল। পড়ন্ত রৌদ্রের রেখা যখন গাছের শিরে আশ্রয় লইল, সংসারের ভিতরেও যখন কোলাহলনিবৃত্তির পর একটা শান্ত নিস্তব্ধতা আসিল,—সেই সময়ে অবসর বুঝিয়া রেবা ও রেবার মা বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ মানদাসুন্দরীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল—"ওগো ঠাকরুণ শুনছো, ভুলো এসে তোমার খোঁজ করবে, বাইরে ওরা নাকি বকসিসের জন্যে রাঁধুনার খোঁজ করেচে, যাও নিয়ে এস গিয়ে।"

ক্ষণিকের জন্য জয়দুর্গার মুখে ম্লান ছায়া ভাসিয়া উঠিল, নিবিড় দুর্ভাগ্যেও আত্মসম্মানের দিকটা যেন ভুলিতে না পারিয়াই বলিল—"বকসিস্ আমি আর কি করবো, ওরা নিলেই হবে মা!"

"এসেছ তো বাপু রাঁধুনিগিরি করতে,—নাচতে বসে আবার ঘোমটার বাহার। না গেলে আমার নতুন কুটুম্বের অপমান হবে।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গৃহিণীর রুক্ষ আদেশ আসিল।

জয়দুর্গা কি ভাবিয়া উদাসকণ্ঠে বলিল—"তবে রেবা যাক্‌"

রেবা একথায় একবার গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল—তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াও করিলেন না—বলিলেন—"সে তোমরা বোঝগে, জমিদারের মেয়ে তো নয় যে, বাইরে গেলে মানের হানি হবে—তা এখনো আবার দাঁড়িয়ে কিসের?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রেবা ফিরিয়া মায়ের দিকে চাহিল, পরক্ষণে মায়ের মৌন ইঙ্গিতের সঙ্গেই সে স্থান ত্যাগ করিল।

ভৃত্যদের বকসিস্ দেওয়া হইলে, অমরনাথ রাঁধুনীর বকসিস্ লইয়া চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অনতিদূরে বিজয় খাটের উপরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাকিয়া ঠেসান দিয়া, একখানি মাসিক উল্টাইতেছে। নিঃশব্দে মৃদু পদসঞ্চারে রেবা তথায় উপস্থিত হইল,—অনাড়ম্বর একখানি লালপাড় মিলের ধুতি তার লজ্জা-আচ্ছাদন—হাতে দুই গাছি রাঙা আলুর রুলি তার ভূষণ।

নিবিড় বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, যেন একটু কি ভাবিয়া লইয়াই অমরনাথ বলিল—"তুমি—তুমি এবাড়ীর রাঁধুনী! তোমার নাম?"

"আমি ত'নয়, আমার মা—আমার নাম রেবা।" কুণ্ঠিত কম্পিত কণ্ঠে রেবা উত্তর দিল। বিজয় এই সময় চোখ তুলিয়াছিল, অমরনাথ তাহার দিকে চাহিল, এইটুকুর ভিতরে ইঙ্গিতে তাহাদের কিসের যেন একটা মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পর একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া অমরনাথ তাহার হাতে দিতে যাইতেই—রেবা আকস্মিক ভাবে হাত টানিয়া লইল।

বিস্মিত, ক্ষুব্ধ চকিত কণ্ঠে অমরনাথ বলিয়া উঠিল—"এ কি রকম!"

অপমানহত অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে রেবা উত্তর দিল—"যা ন্যায্য, যা সকলে পেয়েছে শুধু তাই নিতে এসেছি,—গরীব বলে দয়া দিয়ে অপমান করবেন না।"

বিজয় ও অমরনাথ স্তম্ভিত অপ্রস্তুত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিল।

৩

"মধ্যস্থ হওয়াটা মানুষের পক্ষে সব চাইতে বিপদজনক, বিজয় যে সত্যিই অমত করে বসবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না।" কথাগুলি বলিতেছিল অমরনাথ।

তখন ভোরের আকাশে প্রভাতসূর্য্যের আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে রামরতন গুপ্ত নীরবে বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন—"তার জন্যে দোষী ত কেউ নয়,—সম্বন্ধ হলেই পাঁচটা ভেঙে থাকে, তবে আবার অন্যত্র চেষ্টা কর!"

"সে কথা আপনি না বললেও হবে, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই অপ্রিয় সত্যের অগ্রদূত করে বিভাস আমাকেই পাঠালে, যা একখান চিঠির মারফতে হতে পারতো; কিন্তু তার বিশ্বাস চিঠির মারফতে নাকি বিষয়টা সুস্পষ্ট প্রকাশ হবে না।"

রামরতন গুপ্ত চিন্তিত মুখে বলিলেন—"সে কথা মিথ্যেও নয়—পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণ জানা চিঠিতে চলে না, তার উপর সে নিজেও পরীক্ষা রেখে আসতে পারে না,—আর তোমারই বা কি এমন দুঃখিত হওয়ার আছে,—একদিন আমাকে জানতেই হতো তো।"

এই সময়ে জয়দুর্গা রেবাকে সঙ্গে লইয়া মনিববাড়ীর দিকে আসিতেছিল। ক্ষণিকের জন্য কথোপকথনরত এই দুইটী মানুষের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, দুই একটী কথাও যে কানে না আসিল এমন নয়, কিন্তু সে দিকে আর মনোযোগ না দিয়া নিঃশব্দে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রান্নাঘরে তখন দুইটী উনান সমান ভাবে জ্বলিয়াছে, তাহা দেখিয়া ব্যস্তভাবে তরকারীর ঝুড়িটা ও বঁটিখানা রেবাকে বাহির করিয়া দিয়া,—জয়দুর্গা অনতিবিলম্বে ডেকচিটা তাক হইতে নামাইল।

ইতিমধ্যে মানদাসুন্দরী রুক্ষ মেজাজেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলেন—"জানো রেবার মা, রোজ এমন বেলা করে আসলে চলে না, কর্ত্তাকে এই নয়টার ট্রেনের ভাত দিতে হবে, ওঁকে মাহাল দেখতে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।"

জয়দুর্গা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল—"নয়টার ট্রেনের ভাত হবে না, সে কি কথা মা, এইত কেবল বেলা সাড়ে ছয় হ'ল!"

"হলেই ভাল, কিন্তু সে উপদেশ তো আমি তোমার কাছে নিতে আসিনি, ঝি রাঁধুনীর কাছে উপদেশ নিয়ে কি শেষে আমাকে চলতে হবে নাকি, যা বলছি তাই শুনতে হবে তোমাকে, তোমার কাছে কিছু শুনতে চাইনি রেবার মা!" ইহার পর গর্ব্বিত ভাবে পদক্ষেপ করিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন।

জয়দুর্গা বিমূঢ় ভাবে উদভ্রান্ত ভাবে একবার শুধু আকাশের দিকে চাহিল, পরে বুকভরা নিশ্বাসটী কোন রকমে চাপিয়া নীরবে কাজে হাত দিল। তথাপি, অন্য দিন সে যেমন ভাবে কাজ সারিয়া যায় আজ যেন তাহা পারিতেছিল না, কাজ করিতে করিতে শরীর যেন ক্রমশঃ শীতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা যত কাটে, শীতের মাত্রাও ততই বাড়িতে থাকে। কোন গতিকে রেবার সাহায্যে সেদিনকার কাজ সে শেষ করিয়া লইল।

তখন বেলা প্রায় একটা। মানদাসুন্দরী আহারের শেষে শয়নঘরের বারান্দায় একখান মাতুরের উপর শুইয়া তন্দ্রার আয়োজন করিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে বসিয়া রাণী কার্পেটের আসনে ফুল তুলিতেছিল, পাশে একটা গৃহপালিত বিড়াল মাঝে মাঝে ঝিমাইতেছে, এবং কৌতূহলের সঙ্গে রাণীও মাঝে মাঝে তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিতে কসুর করিতেছিল না।

মৃদুগতিতে জয়দুর্গা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠেই বলিল,—"ওবেলা বোধ হয় আসতে আর পারবো না মা।"

"কি হল আবার। তোমার তো মাসের ভিতর দশ দিন কামাই ধরা আছে!" বলিয়া আলস্যপূর্ণ চোখ মেলিয়া গৃহিণী জয়দুর্গার মুখের দিকে চাহিলেন।

জয়দুর্গা পূর্ব্বের মতই বলিল—"সব এসেছে মা! তাই—"

বাধা দিয়া গৃহিণী বলিলেন—"জ্বর তার মায়ে ঝিয়ের দুজনের আসেনি, রেবা আর খুকী নয়, একবেলা খুব চালাতে পারবে।"

আর অপেক্ষা করা অসঙ্গত বোধে জয়দুর্গা স্থান ত্যাগ করিল।

তাহার কিছুক্ষণ পরে যখন তাহারা নিজেদের কুটীরে আসিয়া পহুঁছাইল, সে সময়ে জয়দুর্গার পায়ের তলে পৃথিবীর যেন সমস্ত মাটী টলিতেছিল। মায়ের অবস্থা বুঝিয়া কোন রকমে রেবা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইল। জয়দুর্গাও সেই যে চোখ বন্ধ করিল, রেবা কতক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া একবিন্দু জল পর্য্যন্তও খাওয়াইতে পারিল না।

এদিকে ফাগুনের বেলা ক্রমশ শেষ হইয়া আসিতেছিল, আকাশটাও যেন একটু মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, মন্দ বাতাসের সঙ্গে বেশ একটু শীতের আমেজও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সামনের ছোট উঠানটায় গোটা কয়েক শালিক দলবদ্ধ হইয়া আহারান্বেষণে ঘুরিতেছিল।

মায়ের মাথায় পাখার হাওয়া দিতে দিতে রেবা চিন্তিত মুখেই এই অবসন্ন বেলার দিকে চাহিল। এই সময়ে হঠাৎ চোখ মেলিয়া জয়দুর্গা ডাকিল "রেবা!"

রেবা মুখ ফিরাইল, বলিল—"কেন মা!"

"বেলা বোধ হয় শেষ হয়ে এল,—কাজে যে যেতে হবে রেবা।"

রেবা ক্ষুব্ধভাবে বলিল—"কে যাবে মা! তোমাকে এই একা ফেলে, আর আমিও যে একা"—উচ্ছ্বসিত বেদনাভরা কণ্ঠে বিধবা বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁরে আমি একাই থাকব,— আর তোকে একাই যে তেতে হবে রেবা, সে কথা কি আজ বুঝতে পারচিস? অনাথার মেয়ে যে তুই।" কথার শেষের দিকে গলিত অগ্নিস্রোতের মতই অন্তরের সমস্ত আগুন আজ যেন জয়দুর্গার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

রেবা কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না। আসন্ন চোখের জল সংযত করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচেক অতীত হইলে বলিল—"তবে যাই।"

ইহার পর আর বিলম্ব করা সে প্রয়োজন বোধ করিল না। পথটুকু অতিক্রম করিয়া যখন সে মনিববাড়ীতে উপস্থিত হইল,—সেই সময়ে মানদাসুন্দরী একবার বক্র কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া লইলেন, এবং সেই সঙ্গেই বলিলেন—"এসেছতো সেও ভাল, এদিকে রাত লেগে গিয়েছে"—কিন্তু আকস্মিক ভাবে কে ডাকায় এইখানেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

রাত্রি যখন নয়টা, রাঁধা জিনিষগুলি সব সাজাইয়া রাখিয়া রেবা ধীরে ধীরে গৃহিণীকে খবর দিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু, সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রাঁধা বাড়া হল? তা বেশ, অমরের জন্য সব ঠিক করে রেখে দাও, দিয়ে তাকে ডাকতে হবে আর কি।"

রেবা কুষ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—"আমি! আমি ডাকবো দিদিমা!"

"তবে আমি ডাকবো না কি! আমরা কি কোনদিন পুরুষের পিছে পিছে পথে ঘাটে বেড়াই? বাড়ীতে আমরা ছাড়া আজ আর কে আছে? বলতে মুখে বাধে না রাণীর মেয়ের!"

কি জানি হঠাৎ যেন রেবা কিছুক্ষণ দম ধরিয়া দাঁড়াইল, আজ আর তার চোখে জল আসিল না, তারপর নিঃশব্দেই স্থান ত্যাগ করিল।

সে যখন অমরের ঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, অমরনাথ নিবিষ্ট মনে সে সময়ে কি একখান বই পড়িতেছিল। অথচ, তাহার পায়ের শব্দে আকস্মিক ভাবে চোখ তুলিয়াই বলিল—"কি রেবা, খাবার যোগাড় হয়েছে কেমন?"

স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া অনেকখানি বিস্ময়ের সঙ্গে এই প্রথম রেবা অমরনাথের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, পরে ঈষৎ কুষ্ঠিত জড়িত কণ্ঠেই বলিল—"আপনি?" স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমরনাথ বলিল—"হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি রেবা! একটা ভিত্তির আড়াল কোন কথাকেই বিশেষ বাধা দিতে পারে না, নয় কি?"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া, চোখ নত করিয়া বলিল—"তবে চলুন।"

"চল যাই।" বলিয়া অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই সময়ে বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া অমর দেখিল, সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে! কি যেন একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইল, পরে পূর্ব্বের মত কণ্ঠেই বলিল—"তোমার এই রাত্রেই যেতে হবে রেবা।"

উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রেবা উত্তর দিল—"না গেলে কি করে চলবে বলুন।"

বেশী দিন অতীত হইল না,—পনের দিন পরেই, এক মধুর অপরাহ্নে সানাই-এর বাজনার সঙ্গে গাঁয়ের লোকের কাছে সব কথা জানাজানি হইয়া পড়িল, রেবার মায়ের মাটীর কুঁড়ে জমজমায় ভরিয়া উঠিল, রেবার গায়ে স্বর্ণালঙ্কার রহিবার স্থান পাইল না।

যে প্রতিবেশীরা রাণীর নিকটে একদিন দাঁড়াইয়া তাহার সাজ সজ্জার তারিফ করিয়া ছিল, তাহারা আসিয়া এই সময়ে জয়দুর্গাকে বলিল—"কি গো ঠাকরুণ তলে তলে এতটা করেছ,—তা একদিন আভাষেও কি জানাতে নেই?"

অতি মোলায়েম একটু হাসির সঙ্গেই জয়দুর্গা উত্তর দিল—"আমি কি আর করবার মালিক, যিনি অসহায়ের সহায় তিনিই দয়া করেছেন।"

এ উত্তরে কেহ সন্তুষ্ট হইল,—কেহ আড়ালে গিয়া বলিল—"ঠাকরুণ ভিজে বেড়ালের মত থাকে কিন্তু কাজ বাগাতে ওস্তাদ!"

জয়দুর্গার কিন্তু তখন কোন কথাতেই কান দিবার মত অবসর ছিল না। একে চতুর্দ্দিকে কাজের ব্যস্ততা, তার উপর আগতদের অভ্যর্থনা, পরিচিতদের নিমন্ত্রণ প্রভৃতির ভার সকলই তাহাকে একা বহন করিতে হইতেছিল, এবং এই উপলক্ষে সে একবার মনিববাড়ীতে গিয়া যথানিয়মে মানদাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া বলিল—"মা, মনে করে একবার যাবেন। আপনি না গেলে—"

ঈষৎ বিরক্তির সুরেই মানদা উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ আমি না গেলে তোমার সবই আটকে থাকবে কি না, তুমি এখন রতনপুরের জমীদারের ঘরে মেয়ে দিলে, তোমায় আর পায় কে? অত বড় মানী ঘর, কি জানি ছোঁড়ার যে কি মতি হল,—যাক গে,সময় পাইত একবার যাওয়ার চেষ্টা করবো।"

জয়দুর্গা অধিকতর নরম কণ্ঠেই বলিল—"তা হলে মা আমিত' এখন কাজে ব্যস্ত, আর তো আসতে পারবো না, আপনি দয়া করে কাউকে সঙ্গে নিয়ে—"

"যাওয়ার সময়ই যদি হয়, মানুষও আমি পাব, তুমি ছাড়াও ঝি চাকর আমার ঢের আছে, বুঝলে?"

ইহার উপর আর কথা চলে না। জয়দুর্গা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। এদিকে রাত্রি নয়টায় লগ্ন! জনতার গণ্ডগোলের ভিতর দিয়াই সন্ধ্যাও অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; পাত্র আসিবার সময়ও সমাগত, সুতরাং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জয়দুর্গা অনন্যচিত্তে উপস্থিতের জন্য প্রস্তুত হইল।

তারপর কিছুক্ষণের ভিতরে চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে যথাবিহিত ভাবে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল,—এবং আরো প্রায় ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই চর্ব্ব, চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া জনতার দলও ক্রমশ কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল; রাত্রিও নিয়মানুগ গতিতে ক্রমান্বয়ে গভীর হইয়া উঠিল।

পরিশ্রমের শেষে ক্লান্ত শরীরে জয়দুর্গা তখন বিশ্রামের জন্য কেবল দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়াছে। কর্ম্মশেষের বিশৃঙ্খলা সে সময়েও সমস্ত বাড়ীতে বিরাজমান, সহসা মানদাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর—জয়দুর্গার আসন্ন তন্দ্রাকে বিচলিত করিয়াছিল।

"কই গো ঠাকরুণ! বরকণে কোথায়—" বলিতে বলিতেই তিনি দাওয়ায় আসিয়া উঠিলেন।

ক্লান্ত শরীরটাকে বেশ একটু জোর করিয়াই তুলিয়া, জয়দুর্গা তাঁর অভ্যর্থনা করিল, "এই যে মা! আসুন মা আসুন।"

ঈষৎ-ভেজান দরজার ফাঁক দিয়া মানদাসুন্দরী বাসরের উপর দৃষ্টি করিলেন, রেবা ও অমরনাথ সে সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেণারসী জোড়ের মাঙ্গলিক গ্রন্থিটা বিছানার উপরে লুটাইতেছিল, যেন নতুন পথের যাত্রীর এই আনন্দ-মিলনের পরিচয়টা বিশেষ ভাবে জানাইবার জন্যই। হাতের রঙীন রাখী, কপালের চন্দনবিন্দু, সদ্যপ্রস্ফুট বেলফুলের মালা ছুইগাছি, তাহারই যেন নীরব প্রতিধ্বনি করিতেছিল। ঘুমন্ত অমরের মুখে পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা, আর রেবার মুখের একটু মধুর স্নিগ্ধ হাসির রেখা তখনো মাখান রহিয়াছে। যেন একখানি নিপুণ চিত্রকরের চিত্রেরই মত।

মুহূর্ত্তের জন্য মানদাসুন্দরীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ক্ষণকাল পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া জয়দুর্গাকে বলিলেন—"তা বেশ! আমার এখন সংসার আছে যাই।" ইহার পর তিনি জয়দুর্গাকে কোন অনুরোধ অথবা উত্তরের সময় না দিয়াই স্থান ত্যাগ করিলেন।

ওদিকে মানদাসুন্দরী যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, রামরতন গুপ্ত সে সময়ে বিছানার উপরেই সজাগ অবস্থায় শুইয়া ছিলেন—তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ কৌতুক-পূর্ণ কণ্ঠেই বলিলেন—"কি রকম দেখা শোনা হল ?"

মানদাসুন্দরী আকস্মিক ভাবে বিষম বেথাপ্পা মেজাজেই উত্তর দিলেন—"বলি, তোমাদের হল কি? তোমরা যে আর দেশে তিষ্ঠুতে দেবে না গো! জাননা, অতি কিছুই ভাল নয়—কথায় বলে অতি দর্পে হত লঙ্কা আর অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী……"

রামরতন গুপ্তের মুখে একটু করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল. বলিলেন—"থাক্, থাক্! জানি যত কিছু সব, তবে বিধাতাই যে কি ঠিকে ভুল করেছিলেন সেইটে তুমিই জানতে না গিন্নি।"

অশান্ত সানাই-এর বাজনা তখনো থাকিয়া থাকিয়া প্রতিবেশীর সুখস্বপ্নের ব্যাঘাত করিতেছিল।

ভালবাসা

[সুফী মোতাহার হোসেন]

ভালবাসি ভালবাসা, ভালবাসা জীবনে মরণে।
ধরণীর রূপ-রস, রমণীর সুমধুর হাসি,
নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-মধু, সব ভালবাসি,
জীবন অনন্ত হোক্, ভালবাসা অনন্ত জীবনে।

জীবনেরে ভালবাসি,—সুখ দুঃখ বেদনা আকুল,
সফল বিফল আশা হাসি কান্না মুখর মধুর;
ভালবাসি চিত্তদোলা স্বপ্নকায়া কল্পনা বধূর;—
হৃদয়-যমুনাতীরে ভালবাসা ব্যাকুল বাউল!

জানি, তবু একদিন ম্লান হেসে করুণ মরণ
বিদায়-গোধূলি শেষে ধীরে এসে করিবে বরণ।

কি রহস্য আছে সেথা, সেই দূর মৃত্যু-সিন্ধু পার?
আজিকার রূপ রস, গন্ধ গান, নৃত্য কলরোল—
আঁধার আলোর খেলা গুঞ্জরিয়া মন্ত্রণাবিভোল
জীবন মরণ ঘিরে ভালবাসা দিবে কি আবার?

কল্যাণি

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

এ সুদূর হ'তে তোর আজিকার মিলন-বাসরে
মঙ্গল-কামনা মোর উড়ে যাক্ স্নেহপক্ষভরে;
সুখী যেন হোস্ তোরা চির শুভাশীষে শুভদার,
অটুট বিশ্বাস-পা'লে ভর করি' ক্ষুব্ধ পারাবার
অবহেলি' হোস্ পার যুগল প্রেমের তরী বাহি';
উত্তরিবে সেই তরী মহাসিন্ধু পারে,—যদি চাহি
দীপ্ত ধ্রুবতারা পানে পারিস্ বাহিতে সে-তরণী;
যারে পেয়েছিস তারে সংসার-সম্পদে নাহি গণি
সারাৎসার সম; প্রাপ্তে অন্ধসম না আঁকড়ি রাখি
চলিস অপ্রাপ্তে বরি', উর্দ্ধতরে পিপাসিত থাকি;
তারার অমৃতোৎসবে সার্থক করিয়া তুলি ম্লান
ধূলি-ক্লিন্ন মর্ত্ত্য গীতে।

অমর্ত্ত্য সঙ্গীতে যেন প্রাণ
সদা মুঞ্জরিয়া উঠে। নিত্য যেন রাখিস স্মরণে—
অদৃশ্য, নিশ্চিত যাহা—রহস্যের চিরাবগুণ্ঠনে
আধদীপ্ত শোভনসুন্দর, অধরে ধরিতে পায় লয়,
আকাশ-কুসুম সে যে—স্বপ্ন, কল্পনার অপচয়।

এ জীবনে নেপথ্যের চিরচেনা অচেনা বাঁশরী
অবিশ্রান্ত অবিরাম সেই সুরে সব সুর ভরি'
বাজে না কি অনুক্ষণ? সর্ব্ব প্রেম সেই প্রেমে গলি
হয়না কি উৎসারিত? উঠে নাকি ঝলি'
তুচ্ছতম তৃণে ফুলে ধ্বনিতে যে তারি প্রতিধ্বনি;
নিখিল বসন্তোৎসবে গায় তারি চির আগমনী।
সকল আনন্দ মাখি তারি দীপ্ত আনন্দের কণা
উঠে ধন্য হ'য়ে। অনু-পরমাণু নিত্য উনমনা
তাহারি চুম্বন লাগি'।

সকল প্রাপ্তির পারে তাই
সে অপ্রাপ্তে নিবেদন করি নিত্য সর্ব্ব কামনাই
পারিস চলিতে যেন; জীবনের লক্ষ ঝঞ্ঝাবাতে
ক্ষোভে, আশাভঙ্গে রাখ দৃঢ় মন করুণা-সম্পাতে।
এ-সুদূর হ'তে তোর জীবনের মাহেন্দ্র লগনে
নেহারি' কল্যাণ-ধ্বজা লো কল্যাণি উড়িছে গগনে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আগন্তুকদ্বয় প্রস্থান করিলে দারোগা বাবুর মনে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে তাঁহাকে জমিদারের আনুগতা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়; রাজু বড় কর্ত্তার আশ্রিত, অনুগৃহীত; ইন্দ্র সরকার বড় খিটখিটে লোক, দুর্ব্বলের ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান তাঁহার একটা অভ্যাস তিলকে তালে পরিণত করার আগ্রহ তাঁহার একটা নেশা। তবে যে অক্ষয় প্রমুখ আগন্তুকদের আদর অভ্যর্থনা করা হইল, সেটা অস্ত্র শাণিত করা মাত্র—এইরূপেই ইন্দ্র সরকারের ন্যায় কৃপণকে দাতা করিতে হয়।—এই ঘটনায় যে বেশ একটু জটিলতা আছে তাহা দারোগা বাবু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, নিজের শূন্য কোলের দিকে যে ঝোলের বাটি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তাহা অনুভব করিয়াছেন; কারণ রাজুর বিরুদ্ধে খুদীর পরিত্যক্ত টাকা কড়ির অপহরণেরই অভিযোগ কেবল টিকিতে পারে, অথচ এই টাকা কড়ির অস্তিত্ব, তাহার পরিমাণ, তাহাতে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নাই—ছেলে চুরি অভিযোগ চলে না, অথচ মণ্ডল অন্য কোনও রূপ ডাইরী করাইতে অসম্মত। ডাইরী অবশ্য একরকম দাঁড় করান হইয়াছে; কিন্তু বিশেষ কৌশল অবলম্বনে দারোগা বাবু সে ডাইরী পাকা করেন নাই - ধীরেনের সহি দিন কয়েক পরে করাইতে হইবে, কারণ পাঠক ও অক্ষয়ের পক্ষে সন্তোষজনক পথে চালিত করিতে হইলে, এই কেস্ পূর্ব্বে অনুসন্ধানসাপেক্ষ, অনন্তর প্রয়োজনমত ডাইরী পরিবর্ত্তন করান হইবে. এইরূপ আশ্বাসে তিনি তাহাদের বিদায় দিয়াছেন। এখন দারোগা বাবুর আশা, ডাইরী করাইলে অর্থবান্ পাঠক নিশ্চয় উপুড়হস্ত করিবে, এদিকে বিশেষ নিয়মে তদন্ত চালাইবার পারিশ্রমিক ও জমিদারী সেরেস্তার খাতায় খরচ লেখা হইবে—তদন্ত কবে কোথায় একদিন শেষ হয়—মধ্যে মধ্যে মধ্যে পাঠকও যে উৎসাহ দানের জন্য পয়সা খরচ করিবে, সে জানা কথা; আর তাহাকে বাধা দিবে কে? দারোগা বাবু স্বয়ং? নিশ্চয়ই না। দারোগা বাবু প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন কনষ্টেবলকে রোয়াকে বসিতে বলিয়া, মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তিনি কাছারী-বাড়ীর উদ্দেশে তখনই যাত্রা করিলেন।—

চোর জোচ্চোরের অনুসরণ করিয়া দারোগা বাবুর স্বাভাবিক গতিই, কুটিল ও অন্তরালপ্রিয় হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কাছারী-বাড়ী পৌছিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইল। কাছারী-বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই তিনি শুনিলেন, ইন্দ্র সরকার সেই দিনই কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন, রাত থাকিতে পাল্কী ছাড়িয়াছে—কতদিন পরে ফিরিবেন নিশ্চয়তা নাই, তবে পক্ষাধিক বটে। দারোগা বাবু একটু দমিয়া গেলেন—কার্য্যবিশেষ নিশ্চয়, নচেৎ সম্মুখে লাট, আখেরী অবহেলা করিয়া এই অনুপস্থিতি; ততদিন অপেক্ষা করা চলিবে না, অতএব কম্পিত পদে তিনি খোদ ব্রজকিশোরের সাক্ষাৎ মানসে সদরের দিকে চলিলেন—রাজু ব্রজকিশোরের প্রিয় পাত্র, একথা সর্ব্বজনবিদিত, চিঁড়ে ভিজিতে পাবে, আর ভিজিলে বেশই ভিজিবে।

সদর-মহল স্তব্ধ নীরব। সম্মুখের বড় আলো, বারান্দায় এক একটি ঝাড় জ্বলিতেছে, দক্ষিণ দিকের বৈঠকখানায়, দেওয়ালগিরি সকলগুলিই প্রজ্বলিত—যেন ছোট রকমের একটা উৎসবের আয়োজন—অভাব কেবল উৎসবকারিদের। মানুষ আছে এমন কোন নমুনা পাওয়া যায় না; বৈঠকখানার ফরাসের উপর বড় বড় তাকিয়া, শুভ্র আবরণ মণ্ডিত, অর্থহীন, যেন সারি সারি জড়ের প্রতিমা মূর্ত্তি পূজার অপেক্ষায় বসিয়া আছে; দেয়ালগিরির বাতির আলো সংলগ্ন দর্পণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, যেন অসহিষ্ণু প্রেতের বিদ্রূপ; দারোগা বাবু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। অস্বাভাবিকের একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে, তাহাদের

সামীপ্য যেমন একদিকে অন্তরে একটা অব্যক্ত ভয়ের সঞ্চার করে সেইরূপ আবার মনকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট করিয়া রাখে, যতক্ষণ না একটা স্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ সকলের মতই দারোগা বাবু একটা নবযৌনতত্ত্বে প্রাপ্ত হইলেন। দারোগা বাবু যেমন অলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন, তেমনি অলক্ষ্যে চলিয়া যাইতে পারিলেন না; আর একটু পরে তাঁহার চক্ষে পড়িল, বারান্দার এক কোনে একটা লোক বসিয়া ঢুলিতেছে—পা টিপিয়া নিকটে গিয়া দেখিলেন, কর্ত্তার চাকর যুধিষ্ঠির।

নিকটে যাইতেই যুধিষ্ঠির ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তার পর চিনিতে পারায় তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "দারোগা বাবু, এখানে কেন?" দারোগা —"একটু বিশেষ কাজ আছে; কাছারীতে সরকার মশাই নেই শুনলাম, তাই কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করে যাব, তুই খবর দে।" যুধিষ্ঠির একটা বড় রকমের প্রণাম ঝাড়িয়া বলিল, "কলকাতা থেকে মামাবাবু কাল এয়েছেন যে, দেখা এখন কারুর সঙ্গে হবে না, কাল পরশুও না, অন্দরেই যাবেন না, নাওয়া খাওয়া সব এই সদর মহলে, খোকাবাবুর পর্য্যন্ত এদিকে আসার হুকুম নেই।" যুধিষ্ঠির যেন অন্যমনস্কভাবে, জল খাইবার মত করিয়া হাত নাড়িল। দারোগা বলিলেন— "ওঃ বুঝেছি; তাহলে বড় মুস্কিল হ'ল, কাজটা বড় জরুরী। কর্ত্তা কি একেবারে বেহুঁস নাকি? চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে? বোতলও কম উজড় হয় না দেখছি—। আর শোন্, আমি তোকে বক্‌শিস্ দেবো, থানায় একটা বোতল আমায় লুকিয়ে দিয়ে আসতে পারিস?"

যুধি—আরে বাপ্; মামাবাবুকে চেনো না আপনি, কলকাতা থেকে বাক্স সঙ্গে করে আসে, চোখের সামনে খোলা হয়—সব গুণতি, তারপর আবার পাঁচবার দেখা, কটা আছে কটা খালি, নেশার ওপর মাথাও এমন ঠিক্—মজবুত মাথা কিন্তু; আমাদের কর্ত্তা কেবল ভুল বকেন আর গড়াগড়ি যান।"

দা—আচ্ছা তোদের মামাবাবু চলে গেলে দিস্।

যুধি—মামাবাবু চলে গেলে কি ওসব থাকে, ওঁর সঙ্গে আসে, তখন কর্ত্তা ওসব ছুঁতে পান্। তার পরে নাম পর্য্যন্ত করেন না; বড় লোকের খেয়াল—রাণীমা ভাই চলে গেলে সে সব খালি আধ-খালি ভর্ত্তি বোতল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ফেলিয়ে দেন।

দা—(একটু বিরক্তভাবে) বাকৃগে এখন দেখা করতে হয়—এ জরুরী খবর না শোনালে, শেষে তোর ওপর দোষ আসবে আমি বলে দিচ্ছি তুই খবর দে।

যুধি—আমায় মাপ করুন, আমি পারব না; ওই টোল বাড়ীতে যান্ আপনি, সেখানে ওস্তাদজী রাঁধা বাড়া করে, না হয় ডাক্তারখানার রোয়াকে বসে থাকবে—তাকেই বলুন কি খবর আছে—সে বুঝবে।

ওস্তাদজী টোলসংলগ্ন তাঁহার ছোট ঘরটিতে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ডাক্তারখানার রকে বসিয়াছেন, আমোদের স্রোত সেখানেও অব্যাহত। গ্রামের কয়েকটি প্রৌঢ়, কাছারীবাড়ীর কয়েক জন কর্ম্মচারী, টোলের একমাত্র অলঙ্কার অনন্ত পণ্ডিত, সতরঞ্চী পাতিয়া তাসের আড্ডা জমাইয়াছেন, সরকারী তামাকের ব্যবস্থা, বহ্নিমান কলিকাশীর্ষ হুকাযন্ত্র হস্ত হইতে হস্তে বিচরণ করিতেছে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে তাহার জলীয় আলাপের কম্পিত পরশ—দারোগা বাবু সাদরে আহুত একটি মাত্র বাজীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ হইয়াও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। দর্শকরূপে উপবিষ্ট ওস্তাদজীকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া তাঁহাকে রাজুর বিপদের কথা জানাইলেন; বিপদের মাত্রা বর্ণনার সময় অবশ্য একটু রঞ্জিত হইল, এমন কি বিপদ একেবারে মাথার উপর ঝুলিতেছে এইরূপ আভাষ দিয়া, সদর মহলে উপেক্ষার প্রতিশোধ লইতে তিনি ছাড়িলেন না—বড়লোক বেপরোয়া, একটু দুশ্চিন্তা হওয়া ভাল—তাহার মনের ভাব এইরূপ। ওস্তাদজী ললিতকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; ললিত আসিল। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তাকে বিহিত ব্যবস্থার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব উদ্যোগ করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি বিদায় হইলেন—আশা, রাত্রেই থানায় তাঁহার নিকট লোক আসিবে, ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া—যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন, "যা ভয় দেখিয়েছি—।" নানারূপে, সরকারের কার্পণ্য সমালোচনা ও সংকুলানাক্ষম বেতন দানের সহজতম সংশোধন উপায় চিন্তা করিতে করিতে দারোগা আবার গতিশীল হইলেন; কিন্তু থানা তাঁহা[র] লক্ষ্য নহে—ধীরে গলির পথ ছাড়িয়া রাজুর বাগানে প্র[বেশ] করিলেন।

রাজুর বাড়ী অন্ধকার, সন্ধ্যাদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলে নাই। রাজু দাওয়ার অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; দারোগার আগমনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল; সে সহজ কণ্ঠে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে দারোগা বাবু ধীরে দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন—গৌরচন্দ্রিকার কোন প্রয়োজন ছিল না; কেবল রাজুর আন্তরিক ভক্তি ও স্বীয় আন্তরিক স্নেহ তাঁহার আগমনের হেতু এইরূপ ব্যক্ত করিয়া তিনি এক নাতিদীর্ঘ নাতিসংক্ষিপ্ত বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। রাজুর বিপদ কতটা গভীর ও আসন্ন, রাজুকে রক্ষা করিতে যাওয়া নিজের পক্ষে কতটা বিপদসঙ্কুল, উপরওয়ালা নামক অনির্দ্দিষ্ট, মহাপরাক্রান্ত মনুষ্যগণের নগদ রজত-প্রিয়তার আধিক্য ও দয়া ক্ষমা করুণার স্বল্পতা ও তদানীন্তন ভদ্রগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কত ব্যয়সাপেক্ষ সম্পর্কে বহুক্ষণ বক্তৃতা শুনিয়া রাজুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; পুলিশ ও জেলের নামে কাহার না বুদ্ধি ভ্রংশ হয়?—অবশ্য সেই সময়ে 'স্বদেশী' আস্ফালনে রোমান্টিক্ জেলবরণ, নাট্য-বিক্রমের পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মুক্তির আশু উপায় চিন্তা করিয়া, রাজু দারোগা বাবুর দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিল।

দারোগা তখন আশ্বাসগর্ভ সন্দর্ভের মৌখিক বিন্যাসে প্রবৃত্ত, এ অভিজ্ঞতা তাঁহার নূতন নহে। অবশেষে সিদ্ধান্ত এই হইল যে রাজু রাত্রের মধ্যে তাঁহাকে এক শত রজত মুদ্রা থানায় হাজির করিয়া দিবে; তখনই দিবার প্রতি-বন্ধক, রাজুর নগদ সম্পত্তি কর্ত্তার নিকট গচ্ছিত থাকে এইজন্য।

দারোগাও চলিলেন আর এদিকে যুধিষ্ঠিরও হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাজির হইল—রাজুকে তখনই ব্রজ-কিশোর সদনে যাইতে হইতই, এদিকে ডাকিতেও আসিয়াছে।

দারোগার কথা শুনিয়া ললিত স্থির থাকিতে পারে নাই—পিতার নিকট গিয়া দারোগা-সংবাদ বিবৃত করিল। ব্রজকিশোর তখন অপ্রকৃতিস্থ; স্খলিত বসন, অনায়ত্ত হস্তপদ, জড়িত ভাষা; পিতার এই বেশ আজ সন্তান এত স্পষ্টভাবে, এত নিকট হইতে, প্রথম দেখিল। তাহার অন্তরের কোনে একটা করুণ সহানুভূতি জমাট বাঁধিল, দুর্ব্বলতা দৈন্য ধরা দিয়া যেন স্নেহকে সচেতন করিয়াছে। ব্রজকিশোরের চক্ষে নীরব লজ্জা ও নীরব তিরস্কারের যুগলমূর্ত্তি, রাজুর আসন্ন বিপদবার্ত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি কতকটা সংযত হইলেন, সুধীর বাবু তখন একটি ক্যাম্পখাটে ঘোর নিদ্রামগ্ন। পূর্ণ কাট্গ্লাসের পাত্রস্থ সুরা গবাক্ষপথে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ব্রজকিশোর খাটের উপর সোজা হইয়া বসিলেন, এবং তিন চারি বার সমস্ত কাহিনী পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ললিতকে প্রশ্ন করিলেন, "এ হারাধন ছোঁড়া কে?" ললিত শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল, "জানিনা"।—"ঠিক্ বলছ জানো না, কিছু জানো না?"—ললিত নিজের ভুল বুঝিতে পারিল না, একটু জোরেই বলিল, "না জানি না।" ব্রজ—"সেই বৈষ্ণবী ছুঁড়ীটার গর্ভে ওর জন্ম একথা নিশ্চয় জানো?" ললিতকে অগত্যা বলিতে হইল সে জানে—কিন্তু ছেলের বাপকে না জানায় সে জানিনা বলিয়াছিল।—"বাপের কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি। কেন রাজু কি ওর বাপ্ নয়, তবে কে ওর বাপ?" ললিত আর পারিল না, একটা সংক্ষিপ্ত 'জানিনা' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

ইহার পরই যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে আদেশ হইল, তাহার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজু আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজুর ভীতিবিহ্বল ভাব কতকটা প্রশমিত, ব্রজকিশোর অনেকটা প্রকৃতিস্থ। ব্রজকিশোর রাজুকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "তোকে ক'দিন থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আসতে পারিল্ নি কেন?" "আপনি ডাক্‌ছেন আমায় বলে নি, জিজ্ঞাসা করুন, কাজে যাবি না, আমি বল্লাম, না।"—"তা হবে, লোকও সব জুটেছে বাঁদর, কথার চুপিটি চুরকমের—সে যাক, এখন এ সব ব্যাপার কি শুনছি, কোত্থেকে আপদ জুটিয়েছ, দারোগা পুলিশ সব পেছনে লেগেছে যে এখন করবি কি?" "আজ্ঞে দারোগা আমার ওখানে গেছলো, একশ টাকা চেয়েছে তবে আপনি যা বলবেন তাই করব, তারপর অদৃষ্ট।" ব্রজকিশোর বলিলেন, "ও টাকাফাকা দিয়ে কোন কাজ হবে না, সে দেবার তেমন লোক চাই, নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করিয়ে তবে টাকা দেবে, ইন্দ্র এ সময় থাকলে হত, এখন তুই এক কাজ কর, আমি মুখুজ্জেকে সঙ্গে দিচ্ছি, এখনও তারা সব আছে কাছারীতে, লাটের

কাজ—সে তোকে আর ছোঁড়াকে নিয়ে থানায় যাক্‌, ছোঁড়াকে থানায় জিম্বে করে তোর জামীন হয়ে আসবে—তারপর টাকা খরচের দরকার থাকে সে পরে হবে।" রাজু উত্তরে বলিল, "আজ্ঞে সে ছেলেটাকে আমি ছাড়তে পারব না।" "তোর আবার এ মতি কেন? আপদ বিদায় কর, এই জ্যৈষ্ঠ মাস গেলে তোর একটা ভাল দেখে বিয়ে দেব, তার আগে জঞ্জাল দূর কর্ত্তেই হবে।" তারপর ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, "—আমি বলছি ওকে বিদায় কর; থানায় তুই নিজে না যাস্‌, আমার এখানে এনে দে আমি ব্যবস্থা করছি; তোর পেটে যে এত বিদ্যে তা ভাবিনি; করলি একটা খারাপ কাজ তার ওপর ঢাক পিটিয়ে বেড়ালে তোকে রাখবে কে, এতক্ষণ হাজতে যাস্‌ নি, সে তোর বাপের ভাগ্যি।" রাজু এইবার তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, "আমার জিভ কেটে দিন, হাত পা কেটে নিন্‌, আমি ও ছেলেকে ছাড়তে পারব না।" যুধিষ্ঠিরকে ইসারায় বাহিরে যাইতে বলিয়া ও নিদ্রিত শ্যালকের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্রজকিশোর নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁরে এ ছেলেটা সত্যিই তোর?" রাজু মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল, "আর আবার কার হতে যাবে!"—বৎসের কল্পিত বিপদ নিবারণে গো-মাতার অযথা আস্ফালনের মত রাজুর কণ্ঠস্বর অহেতুক উগ্র। ব্রজকিশোর বলিলেন,—"কেন পাগলামী করিস, ঠিক করে বল—খোকার?" রাজুর মুখ দিয়া বাহির হইল "না!" হাতীর পায়ের তলায় পড়া বাঘের গর্জ্জনের মত আওয়াজ—রাগ নৈরাশ্য যন্ত্রণায় একাকার। ব্রজকিশোর রাজুর মাথার উপর হাত রাখিলেন, "তুই জানিস আমি তোর কে?" "হাঁ"—"কেবলেছে?" "মা মরবার সময়।" ব্রজকিশোরের অন্তরের সহিত চক্ষুর সংকীর্ণ সংযোগ-পথ দিয়া কতকটা তপ্ত অশ্রু ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।—"তবে আমার কাছে সত্য কথা বল্‌।" "আর কিছু বলবার নেই; কি করব তাই বলুন।" "তবে ও ছোঁড়াকে নিয়ে আয়, আমি থানায় পাঠিয়ে দিই; ওকে বাড়ীতে রেখে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করবি!" রাজু উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্রজকিশোরের মুখের উপর সরল দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "ওতে আমাতে তফাৎ কি?" সে কথায় ভৎর্সনা ছিল, তেজ ছিল, আবার অভিমানও ছিল, ব্রজকিশোরের মাথা সম্মুখে আপনা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, কথার পশ্চাতে যেন একটা মিনতি প্রচ্ছন্ন আছে, "তাহলে ইন্দ্র না ফিরে আসা পর্য্যন্ত দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। ও দারোগাকে আমার বিশ্বাস নেই—ও কেবল টাকা খাবে আর শাসাবে, ইন্দ্রর কাছে জব্দ। কি বল্‌ পারবি?" রাজুর মধ্যে যেন হঠাৎ সেই পুরাতন রাজু ফিরিয়া আসিয়াছে—এই কয়দিনের উদ্‌ভ্রান্ত, জড় আগন্তুক অন্তরের কোন গভীর প্রদেশে তলাইয়া গিয়াছে। সে উৎসাহের স্বরে বলিল "খুব পারব।" তারপর দুই জনে যতটা সম্ভব একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপায়গঠনের পরমর্শ আরম্ভ হইল। ব্রজকিশোর যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া সেই সম্বন্ধেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় আদেশ দিলেন। রাজু প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলে ব্রজকিশোর বলিলেন, "তবে মনে থাকে যেন সব; আমাবস্যা আর পূর্ণিমা এইখানে দেখা করবি—তারপর ইন্দ্র এলেই একটা কিনারা হবে—মাসখানেক ভোগ আছে—মেতা পাইক বেশ বিশ্বাসী, আর যুধিষ্ঠির আছে, যখন যা দরকার পৌছে দেবে।" রাজু চলিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া রাজু প্রথমে একটা বড় জালের থলি যোগাড় করিয়া, কতকগুলি আবশ্যক তৈজসপত্র, ভাঁড়ার হইতে মুড়কী, মোয়া, একটি বড় কাটারি, কতকগুলি কাপড় চোপড়ে, ক্ষিপ্র হস্তে সেই থলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তার পর সমস্ত বাড়ীটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া, কাঁধের উপর থলি ঝুলাইয়া, হাতে লাঠি ও অপর স্কন্ধে হারাধনকে বসাইয়া দ্বারে শিকল টানিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। পরিত্যক্ত বাড়ীর ও গরুগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবার বন্দোবস্ত ইতিপূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছে—খোলাপ্রাণে, অজানিতের আহ্বানে সে পথ চলিল। তাহার দেহের সমস্ত পেশী, প্রতি অঙ্গ যেন পুরাতন সাড়া পাইয়া আবার লীলা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের সীমানায় যেখানে পাকারাস্তা উভয় পার্শ্বস্থ বাগানের ধাক্কাধাক্কি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে—সেইখানে মেতা পাইক যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশ মত রাজুর অপেক্ষা করি-

ভেছে। মেতা রাজুর একজন সাকরেদ, একয়দিন সে দূরে দূরে থাকিয়া রাজুর চারিদিকে ঘুরিয়াছে—আজ সে যেন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত স্থানে আনন্দে রাজুকে নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিল। মেতারও কাঁধে একটি ছোট পুঁটলী; হারাধনকে সে নিজের কাঁধে লইলে দুইজনে গল্প করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। এই পথে আরও পাঁচ ছয় মাইল অগ্রসর হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে বিশাল নিবিড় জঙ্গল পড়িবে, বড় নদীর ধার পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে এই অরণ্য বিস্তৃত। ইহার মধ্যে দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী গিয়া বড় নদীতে পড়িয়াছে; ক্ষুদ্র নদীর উপর এই পথে একটি পুল আছে, এই পুলের নিকট আসিয়া রাজু মেতাকে বিদায় দিল—প্রতি মঙ্গলবারে মেতা আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া এই খানে রাজুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আগামী কল্য তাহাকে চাউল ইত্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় এইখানেই রাজুর অপেক্ষা করিতে হইবে; এই বনের মধ্যেই রাজুর এখন বাস নির্দ্দিষ্ট। হারাধন আবার স্কন্ধ পরিবর্ত্তন করিল। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, প্রভাতের অপেক্ষায় রাজু এক বৃক্ষ-তলে সমতল স্থান দেখিয়া মোট ঘাট নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। হারাধন স্কন্ধেই তন্দ্রাসুখ আস্বাদন করিতেছিল। এখন মাটিতে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

ছোট নদীর সহিত যেখানে বড় নদীর সঙ্গম, তাহারই অনতিদূরে রাজু আড্ডা গাড়িবে স্থির করিয়াছে; কারণ জীবন যাত্রায় জল বড় কঠিন সমস্যা। ক্রমশঃ বিহঙ্গমকুলের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তারাখচিত আকাশপটে উর্দ্ধ প্রসারিত বৃক্ষচূড়া সকল স্পষ্টতর হইয়া দিবারম্ভের সূচনা করিলে রাজু আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনের পর আজ তাহার যেন মনে হইতেছে সমস্ত জীবন ধরিয়া চলিলেও চলার আশা মিটিবে না। প্রভাতের বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু ঘন বৃক্ষ সন্নিবেশের মধ্যে দিবালোকের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক সময় অপেক্ষা করিতে হইবে। ছোট নদীর তীরে তীরে সে অগ্রসর হইতেছে—বট অশ্বত্থ নিম জাম কাঁটাল আম, বড় বড় ঝাড়ালো গাছ শাখায় শাখায় জড়াইয়া শ্রেণীবদ্ধ সারির পর সারি দণ্ডায়মান, কোথাও বা কাছাকাছি কয়েকটি খেজুর; আবার নদীর ধারে ধারে বাঁশঝাড়; শাখা হইতে শাখান্তরে লতার দোলনা বিস্তৃত; মাটির উপর ছায়ার আশ্রয়ে ঝোপঝাড়ের অপ্রতিহত প্রাচুর্য্য; রাজুকে সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। একটা আস্‌সেওড়া ভাঙ্গিয়া সে দাঁতন করিয়া লইল, গাছের গায়ে কচি রৌদ্র আসিয়া শিশু পল্লব গুলির সহিত খেলা লাগাইয়াছে—একদল বুনো শুয়োর রাজুর পদশব্দে চমকিত হইয়া ছুটিয়া গেল, দলপতি বরাহ, কিয়ৎকাল রাজুর দিকে তীক্ষ্ণ বড় দাঁত, যুদ্ধং দেহি কায়দাতে উদ্যত করিয়া, মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া পলায়নপর যূথের শীর্ষস্থানে দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনন্তর রাজুর গতি আরও সতর্ক হইল—দৈবাৎ যদি বৃক্ষাদির আশ্রয় পাওয়া যায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হইতেছে। এক স্থানে নদীর ধারে, কয়েক ঝাড় ডুমুর গাছ, নীচে কতকটা সবুজ ঘাসের ফরাস, সেখানে রাজু হাত মুখ ধুইয়া, ঝোলা হইতে ডেলাক্ষীর বাহির করিয়া হারাধনকে খাইতে দিল—নদী হইতে অঞ্জলিবদ্ধ জল আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিতে, সে পূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র রাজুর মুখে স্থাপিত করিয়া বিনা ওজরে জলটুকু পান করিয়া ফেলিল। আরও অল্পদূরে একটি ভগ্নজীর্ণ কুটির, কিন্তু রাজুর এ স্থান পছন্দ হইল না। তাহার পর প্রায় আধ ঘণ্টা স্পষ্ট দিবালোকে দ্রুত চলিয়া সে তাহার মনের মত স্থানে উপনীত হইল; বড় নদী সেখান হইতে বেশী দূরে নহে, একটি বিশাল আম গাছ আর একটি জোয়ান অশ্বত্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, মধ্যে ব্যবধান হাত কুড়ি, পশ্চাতে কতকগুলি বাঁশঝাড়ের অন্তরালে ছোট নদী, এদিনেও এখানে বেশ জল আছে, সম্মুখে একটু খোলা জায়গায় দুইটি ঝাঁকড়া তেঁতুল, দুটি সহোদরের মত, প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটু উচু অল্প ফাঁকা জায়গা। রাজু এইখানে সব বোঝা নামাইয়া ফেলিল।

ঝুলি লইতে অৰ্দ্ধ কাটারী অৰ্দ্ধ ভোজালির ধরণের একটা হাতিয়ার বাছিয়া লইয়া, বাকী সব সেইখানে রাজু উজাড় করিয়া ফেলিল—কতকগুলি সড়কীর ফলা, গামছার পুটলি-বাঁধা শুষ্ক ক্ষীর, আর একটা পুটলিতে—যেটা মেতা আনিয়াছিল, চাল ডাল ইত্যাদি, কাপড় চোপড় সব খামের উপর একাকার লণ্ডভণ্ড করিয়া পুলকিত হারাধনকে চৌকিতে রাখিয়া সে অবিলম্বে কাজে লাগিয়া গেল—নূতন ধরণের

বাস স্থান রচনা তাহার মনে জাগিয়াছে। শাখায় শাখায় ব্যস্ত পক্ষীকুল অভ্যাগতকে সমাদরবাণী জানাইতেছে।

সমস্ত দিন রাজু মধুমক্ষিকার মত অক্লান্ত পরিশ্রম করিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার কল্পনা রূপ লইয়া বাস্তবের মধ্যে ধরা দিল--কতকগুলি দৃঢ়প্রোথিত বাঁশের খুটির উপর জমি হইতে হাত ছয়েক উচ্চ একটি মাচা, আবার চার হাত উপরে আর একটি, পাশে ফাঁকা করিয়া কঞ্চির বেড়া, দেখিতে একটি প্রকাণ্ড খাঁচার মত কিন্তু বেশ মজবুত, এক পাশটা খোলা, সেইটী প্রবেশ-পথ। মাচার নীচে হাঁড়ি ইত্যাদি ঝুলাইয়া রাখা যায়, নীচে মাটি খুঁড়িয়া উনুন প্রস্তুত হইয়াছে, অকস্মাৎ বৃষ্টিতে কোনও অসুবিধা নাই—ইতি-মধ্যে ভাত রান্নাও হইয়াছে—লবণসংযোগ আহারে রাজু ও হারাধন কাহারও উৎসাহ কম নহে। গৃহস্থালী পাতিয়া রাজু একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার মনে হইল যেন মালতীর আয়ত কৌতুকোজ্জ্বল দুটি চক্ষু সমালোচনামুখর হইয়া তাহারই চক্ষু দিয়া দেখিতেছে—বিষাদ নাই। এই অভিনব নূতন রাজ্যে, সেই পুরাতন দেশের মধ্যে হারানো মালতী, ফিরিয়া আসিয়াছে। এবেলা ব্যবস্থা ভেলাক্কীর, হারাধনকে মাচার উপর তুলিয়া রাজু একটি বড় কাঁচা বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়া লম্ফে লম্ফে অদৃশ্য হইয়া গেল—মেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় একটা বিশাল মোট কাঁধে লইয়া সে ফিরিল—হারাধন ঘুমাইতেছে। বন্য জীবনের জাগরণ-নির্দ্দেশক বহুবিধ শব্দে তখন অরণ্য মুখরিত। রাজু ক্লান্ত, ক্ষুধা প্রবল কিন্তু নিদ্রার তাড়না অসহ্য, কোনও মতে মোট নিরাপদ স্থানে রাখিয়া রাজু হারাধনের পাশে শুইয়া পড়িল। সেই সময় ললিত রাজুর শূন্য গৃহ হইতে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিতেছিল, তাহার সংকল্পে বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পথে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজু কোথায়? উত্তর পাইল সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

[শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী]

শ্যামলা ধরিত্রী চির লাবণ্যের লীলা-নিকেতন,
উড়ে শ্রীমন্দিরচূড়ে সৌন্দর্য্যের বিজয়-কেতন
আপন গৌরবে। তাই আসিয়াছে হেথা দলে দলে,
রূপের পূজারী যত এই পুণ্য পূজা-পীঠ তলে।
কেহ শত উপচারে সাজায়েছে বরণের ডালা,
কেহ রচিয়াছে গান, কেহ শুধু গাঁথিয়াছে মালা।
কেহ যাপিয়াছে দিন কবি-কণ্ঠে স্তুতি-গান শুনে
সঁপিয়াছে অর্ঘ্য কেহ পদমূলে প্রাণের প্রসূনে।
আপনারে নিঃস্ব করি' সাজাইয়া রূপ-প্রতিমায়,
হৃদয়শোণিতে কেহ অলক্তক পরায়েছে পায়।

এইরূপে কত কবি মুখরিয়া বন্দনা সঙ্গীতে,
শত সুরে, শত ছন্দে, শত কণ্ঠে বিচিত্র ভঙ্গীতে
আসিয়াছে যুগে যুগে, আসিতেছে আজো দলে দলে,
আরতির দীপশিখা অনির্ব্বাণ আজও তাই জ্বলে;
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আজও তাই বিধি-বিরচিতা
জ্বলিছে জগৎ-বক্ষে রূপতৃষ্ণা-রাবণের-চিতা।
আজও তাই যেথা মধু, যেথা গন্ধ যেথা আছে রূপ,
সেথায় ভ্রমিছে অলি, গুঞ্জরণ করিছে মধুপ।
লেলিহান বহ্নিশিখা রূপমুগ্ধ পতঙ্গেরে টানে,
অন্ধ কীট ধায় গন্ধ অনুসরি' কুসুমের পানে।
প্রখর ভানুর করে দগ্ধ তনু সূর্য্যমুখী, তবু—
বারেক তপন হ'তে আঁখি তার ফিরাবে না কভু।
আজও তাই মহাসিন্ধু পূর্ণ ইন্দু-রূপ-অনুরাগে
প্রসারি' তরঙ্গ-বাহু উন্মাদ আগ্রহে তা'রে মাগে।
সতত সহস্র বিশ্ব সবিতায় করি আবর্ত্তন,
ব্রজাঙ্গনাগণ সম রাসোল্লাসে করিছে নর্ত্তন।

বিন্দু বিন্দু আহরিয়া মাধুরীর মহাসিন্ধু ছানি
রচিতা রমণী তুমি! তিলোত্তমা সুষমার রাণী!
কত কাব্য-তরঙ্গিনী তব পদে অর্ঘ্য বহি' আনে,
কত কবি, কত শিল্পী, আজো মগ্ন তোমার ধেয়ানে,
তোমারে ঘেরিয়া সবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হ'য়ে সারা,
ও রূপ রহস্য-গর্ভে আপনারে হইয়াছে হারা।
ওগো নারী, মহিয়সী, শ্রীমন্দির-অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
কত ভক্ত কত ভাবে ধন্য হ'ল তব পদ সেবি'।
ধনী সঁপিয়াছে ধন, জ্ঞানী জ্ঞান, বীর বাহুবল
যোগী সঁপিয়াছে তার যুগার্জ্জিত তপস্যার ফল।
অঞ্জলি ভরিয়া আনি আশা তৃষা আকাঙ্ক্ষা বেদন,
দীন-ভক্ত তব পদে পূজা-অর্ঘ্য করে নিবেদন।

অগ্নিমুখী

[শ্রীনিখিলেশ রাহা]

কিছুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা হয়েছে। কমল তার মেসের ছোট্ট ঘরটিতে বসে তার গৃহের সঙ্গী অনন্তর জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের আজ বায়োস্কোপে যাওয়ার কথা।

বায়োস্কোপে যাওয়ার যদিও আর সময় ছিল না তবুও অনন্ত এলে বেড়াতে যাওয়া হবে এই আশায় কমল তখনো জামা কাপড় ছাড়েনি কিন্তু ঘড়িতে মৃদু শব্দে আটটা বাজতেই সে জামা কাপড় ছেড়ে আলোটা জ্বলিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো। মিনিট পনের পরে তার বন্ধু অনন্ত প্রফুল্ল মুখে শীস্ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে কমলের বিছানার উপর বসে বইখানা সরিয়ে নিয়ে বললো—ভাই ভয়ানক কাজ পড়েছিল তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে।

কমল বল্লে—কি কাজ?

অনন্ত জুতার ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে—আপিস থেকে বেরুব ঠিক, এমনি সময় দেখি পদ্ম এক চিঠি পাঠিয়েছে—লিখেছে যেন ফেরার পথে নিশ্চয় দেখা করে আসি। কি করবো গেলাম—তাইতেই ত' দেরী হ'য়ে গেল।

কমল বল্লে—দেখি চিঠি।

চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে পড়ে অনন্তকে ফেরৎ দিয়ে কমল একটু হেসে বললো—বাবুর ঠোঁট দুটি ত' খুব লাল দেখছি, পদ্ম বুঝি পান খাওয়ালে—কি বললো এত জরুরী কথা যার জন্য আপিস থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

অনন্ত বললো—দুঃখের কোন কারণ নাই ভাই—তোমার কথাই শুধু জিজ্ঞাসা করেছে—বলেছে আর যাওনা কেন তার উপর রাগ হয়েছে নাকি—এই সব কত কি! আমার ত' এক কথার পঞ্চাশ বার জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত! কাল তোমাকে যেতে বলেছে—যেও হে!—না না ঠাট্টা নয় সত্যি বলেছে। আমাকে ওর গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করিয়েছে যে কাল যেন তোমাকে নিয়ে যাই। আমিত' কথা দিয়ে এসেছি।

কমল বিরক্ত হ'য়ে বললো—কেন কথা দিলে—আমি যাব না।

অনন্ত দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললো—যাবে না কি হে? আমি যে কথা দিয়ে এসেছি।

কমল বললো—কথা দাও আর যাই দাও আমি যাব না।

—কেন—

—কেন আবার কি। আমার ভাল লাগে না আমি যাব না। একদিন গেছি বলে কি রোজই যেতে হবে নাকি। তোমার গল্প শুনে যাওয়ার একটা কৌতূহল হয়েছিল তাই গিয়েছিলাম—ভাল লাগে নাই—আর যাব না। এত সোজা কথা।

অনন্ত মিনতি করে বল্লো—আচ্ছা আর কক্ষণো যাস্‌নে ভাই শুধু কালকের দিনটা চল। আমি আর তোকে কোন দিন অনুরোধ করবো না—শুধু এই অনুরোধটা রাখ ভাই, তা নইলে পদ্মর কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

কমল কোন জবাব দিল না।

তারপর দিন সন্ধ্যায় অনন্ত বললো—কমল ভাই চল।"

কমল হেসে বললো—সত্যি আমি যাব না।

অনন্ত তার দুই হাত নিজের হাতে বন্দী করে বল্লো—সত্যি ভাই তোমার যেতে হবে।

দুই বন্ধু পথে এসে দাঁড়াল। পদ্মর ঘরের সামনে দিয়ে তারা যখন যায় পদ্ম দোতালার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো—অনন্ত বাবু।

অনন্ত বললো—একটু কাজ আছে—এখন না।

পদ্ম উপর হতে বললো—শোন শোন, মাথা খাও—এক মিনিটের জন্য শুনে যাও।

অনন্ত হাস্‌তে হাস্‌তে বললো—হবে না—হবে না।

পদ্ম কঠিন হ'য়ে জবাব দিল—আচ্ছা।...

অনন্ত কমলকে বললো—দেখলে আমার কথা সত্য কিনা ?···

মিনিট পাঁচেক পরে অনন্ত এসে ডাকলো—পদ্ম—এই পদ্ম।

পদ্ম ভেতর থেকে ধরা গলায় উত্তর দিল—কি বল ?

—দরজা খোল।

—খুলবো না।

—খুলবি না ত' ? ঠিক! আচ্ছা চল্লাম--মনে থাকে যেন !—

পদ্ম আচমকা দরজা খুলে দিল ; চোখের কোলে তখনো কান্নার দাগ! অনন্তর জামার খুট ধরে বল্লে—এস—

পথ ছাড়—যাব না।

—তোমার পায়ে পড়ি এস ভাই।

অনন্ত বললো—ওকে ডাক।

পদ্ম লজ্জায় মুখ রাঙা করে কমলের হাত ধরে ডাকলো —আসুন।

তিনজন ঘরে এসে বসলো।

পদ্ম চুপি চুপি অনন্তকে বল্লো—খাবে ?

—কি ?—

—মদ

অনন্ত কমলকে জিজ্ঞাসা করলো।···

কমল শক্ত হয়ে বললো—না।

—পদ্ম গান গাও ত'।

—কি গাব ?

—যা খুসী।

পদ্ম গাইলো—ভালই গায়।

কয়েকটা গান শেষ হলে কমল বল্লো—অনন্ত চল যাই।

পদ্ম দুহাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে মুখের উপর মুখ দিয়ে বললো—যাবে কেন ভাই, বসতে কি হয় ? কমল বিরক্ত হয়ে পদ্মকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ব'ল্লো—এ সমস্ত আমি পছন্দ করি না—ছাড়। এবং পরমুহূর্ত্তে উঠে দাঁড়িয়ে অনন্তকে ডেকে বললো—অনন্ত যাবে ত' এস—না হয় আমি চল্লাম।

পদ্ম পিছন থেকে ডেকে বল্লো—শুনুন।

—কি ?—

তার কঠিন স্বরে থতমত খেয়ে পদ্ম বললো—কালকে যদি দয়া করে' আসেন।

কমল যেতে যেতে বললো—আচ্ছা দেখা যাবে।

* * * *

কমলের ছাত্র পড়াতে হয়। তখন আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পূজার ছুটির আর দেরী নাই। ঘন বর্ষার মেঘ তখন নিঃশেষে আপনাদের বিলিয়ে দিয়ে আকাশকে আলিঙ্গনের বাধন হ'তে মুক্তি দিয়েছে। আকাশ ঘন নীল—স্বচ্ছ দিন—নদী কূলে কূলে তখনো ভরা। কাশের গুচ্ছ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে শরৎ প্রভাতে রৌদ্রের মুকুট পরে হাসছে,—মাঠে মাঠে তারি আলো—ঘরে ঘরেও সেই হাসির আভাষ ফুটে উঠেছে।

এমনি একটি নির্ম্মল মেঘমুক্ত প্রভাতে কমলের ছাত্র বললো—মাষ্টার মশাই—আপনি বাড়ী যাবেন না ? আমরা ত' পরশুদিন মধুপুর যাব।

কমল চমকে উঠে বল্লো—বাড়ী—আমারত' বাড়ীতে কেউ নাই ভাই, কার কাছে যাব।

তার ছাত্র করুণকণ্ঠে বললো—আপনার বাপ মা ভাই বোন কেউ নাই ?

কমল বল্লো—না ভাই—আমার কেউই নাই—কোথায় যাওয়ার মত কেউ নাই। আমি এখানেই থাকবো।

ছাত্র আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল—

কমল বাধা দিয়ে বললো—ট্রানস্লেশন করা হয়েছে —হয়নি ? আচ্ছা এখন কর।

ছাত্র পড়াশুনায় মন দিল। কমল রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে বিপুল জন প্রবাহের উদ্দাম একটানা গতির সঙ্গে আপনার মনটিকে পাঠিয়ে দিল সেইখানে—যেখানে পূজার আগমনীতে উৎসবের সুরে বাঁশী বাজছে।

শরৎ প্রভাতের রৌদ্রের একটা নেশা আছে। তার উপর আকাশ সেদিন ঘন নীল—দিবস রৌদ্রালোকে ঝল মল, পথে পথে আনন্দ কলরব। ঘরের জানলা দিয়ে সারি সারি দোকান দেখা যাচ্ছে। রং বেরঙের কাপড় সাজান—দোকানে দোকানে অসম্ভব ভীড়, বেচাকেনা, তারপর ছোট ছেলে মেয়েদের হাত ধরে পথে পথে অপরিচিত আনন্দিত মুখের দীপ্তি।

কমলের মন উদাস হয়ে পথে পথে ওদেরি সাথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পথের দেওয়ালে দেওয়ালে, দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় রেল কোম্পানীদের ভাড়াহ্রাসের বিজ্ঞাপন এবং দেশবিদেশে ভ্রমণের আমন্ত্রণ—পাঞ্জাব মেল, বোম্বে মেলের নিত্যকার আসা যাওয়ার তালিকা। তার মনও যেন পাঞ্জাব মেলের গতির সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলে যেতে লাগলো—দেশ হ'তে দেশান্তরে। কত অপরিচিত পথ ঘাট, রৌদ্রকরোজ্জল স্বর্ণশীর্ষ ধানের মাঠ, কত খাল বিল, শাস্তিঘেরা নিস্তব্ধ রৌদ্রহীন পুকুর ঘাটে গ্রাম্য বধূদের হাস্যোজ্জ্বল কৌতুহলী দৃষ্টি। তারপর দিনশেষে গ্রামান্তের তরুশ্রেণীর অন্তরালে রক্তবর্ণ পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যের অস্ত যাওয়া। ধীরে ধীরে চাঁদ উঠলো সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীকে রূপের ধারায় প্লাবিত করে। ট্রেন ছুটে চলেছে অস্পষ্ট আঁধার-ঘেরা সম্মুখের রহস্যপুরীর দিকে; কত ছোট ছোট ষ্টেশন চলে যায়—কত পুল পার হ'য়ে ঝম ঝম শব্দ করতে করতে, তারপর এসে থামে একটা ষ্টেশনে—নাম পড়া যায় না। শুধু দেখা যায় যাত্রীদের ওঠানামার কোলাহল, ব্যস্ততা, তারপর ঘণ্টা বাজে, বাঁশী বাজে, নীল আলো নড়ে ওঠে—গাড়ী শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলে।

কমল নিজের বুকের রক্তের তালে সেই গতির স্পন্দন অনুভব করতে লাগলো। তার মনে হ'তে লাগলো তার কোথাও যেতে হবেই, এভাবে থাকা তার অসম্ভব।

চোখের সুমুখে ভাসে ব্যস্ত কোলাহলমুখর য়ুনিভার্সিটির ছবি। ছুটি আসছে···পরিচিত যার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে—কি কবে যাচ্ছেন—বাড়ী?

কমলের মুখ ছোট হ'য়ে আসে, বলে—না, ভাবছি যাব না—পড়াশুনার ক্ষতি...যেন অপরাধীর কুণ্ঠিত কৈফিয়ৎ।

এই স্বজনহীনতার বেদনা তার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে চিরদিনই সুগভী রেখায় অঙ্কিত ছিল এবং আজ এই সরল নয়ন বালকের মুখেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনে তার অন্তরে যেন নূতন করে হাহাকার জেগে উঠলো।...

কত পূজা এসেছে কত চলে গেছে, সামান্য চিঠির ভাষাতেও কেউ কখনও বিজয়ায় উৎসবে তার মঙ্গল কামনায়—তার কথা স্মরণ করে সম্ভাষণ জানায় নাই।···

কমল সেদিন আর পড়াশোনা, ছাত্রকে ছুটি দিয়ে মেসে ফিরে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ে সীমারেখাহীন চিন্তাধারায় আপনাকে বিলুপ্ত করে দিল।···

অনন্ত এসে জিজ্ঞাসা করলো—কি বন্ধু অসময়ে শয্যা আশ্রয় যে? কমল তার জবাব না দিয়ে বল্লো—অনন্ত, তুমি ভাই বাড়ী যাবে কবে?···

অনন্ত বল্লো—২৬শে আফিস বন্ধ হবে—কিন্তু আমি বোধ হয় দু'চার দিন আগেই যাব; বউ লিখেছে বারবার করে'!

বউ! শব্দটা যেন কমলের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হ'তে লাগলো। সে কথাটার অর্থ যত পরিষ্কার রূপে' ধারণা করতে যায় ততই যেন তার গোলমাল হয়ে যায়।···

অনন্ত বললো—যাবে আমার সাথে আমাদের বাড়ী? কমলের অন্তঃকরণ অসহ্য লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌লো।...

—না ভাই আমার যাওয়া এখন অসম্ভব।···

অনন্ত চলে গেল। কমল নিজের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের লুপ্ত ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো; কৈশোর না কাটতেই সে বাপমাকে হারিয়েছে। অনাদরে বিনা স্নেহে দুর আত্মীয়ের বাড়ীতে তার বাল্যজীবনের সে কি কঠোর পরীক্ষা;—দুঃখের হোমানলে—তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, শুধু বাকী আছে তার অসার জড় দেহটা।...তারপর গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে' সেই যে কলকাতার কলেজে একঘেয়ে একটানা জীবন আরম্ভ হয়েছে, আজো তার শেষ হ'লোনা।···

এই ত' তার জীবন!

কমলের বারবার মনে হ'তে লাগলো যে সারাটা জীবন তার অর্থহীন—জীবনের কৈশোর তার বিনা স্নেহে অনাদরে কেটে গেছে, তার যৌবনের আনন্দকে অভিষিক্ত করার জন্য একদিনের জন্যও সে কাউকে পায়নি!

জীবনের কোনখানে সে এমন একটি স্থান খুঁজে পেলনা যেখানে তার বেদনাপীড়িত মন আজ কল্পনাতেও সুখনীড় রচনা করতে পারে।···

যে জননী তার কৈশোরে উপেক্ষা করে চলে গেছে, সেই অর্দ্ধবিস্মৃতা জননীর কথা তার মর্মে গভীর অভিমানের

সাথে জেগে উঠ্‌লো এবং সেই স্নেহমুখ স্মরণ করে' কমলের দুই চোখ প্রতিক্ষণে সজল হয়ে উঠ্‌তে লাগলো !...

সে বারবার ভাবতে লাগলো—কোথায় যাই ? দীর্ঘ পূজার ছুটি তার কলকাতায় কাটাতে হ'বে ভেবে তার যেন জ্বর হ'তে লাগলো।...সংসারে তার পিতা এবং মাতার উভয় দিক যদি খোঁজা হয় তাহ'লে তার এক পিসিমা আজো বর্ত্তমান আছেন—তার অন্ধকারঘেরা জীবনের একটি মাত্র প্রজ্জ্বলিত ম্লান প্রদীপ। তবু সে তার আপন নয়।

অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করলো যে তার পিসীমার কাছেই যাবে। এই পিসীমাকে সে কখনও দেখে নাই—কখনও দেখার চেষ্টাও করে নাই।

পিসীমা মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র লিখতেন যাওয়ার জন্য, কিন্তু সে আহ্বানে কমল কখনও সাড়া দেয় নাই। তার মনে করতেও হাসি পেত যে যাকে সে দেখে নাই, চেনে না তারি দরজায় একদিন হঠাৎ উপস্থিত হয়ে কি করে বলবে যে পিসীমা আমি এলাম।

পিসীমা হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন—"কে বাবা তুমি ?—তখন দীর্ঘ ইতিহাসে পরিচয়ের পালা—তারপর তার স্বর্গগত পিতামাতার জন্য তাঁদের ভগ্নীর সানুনাসিক ক্রন্দন সাদ করে বল্‌তেন ?—তা বাবা এতদিনে পিসীমাকে মনে পড়লো।"

কল্পনার নেত্রে যখনি সে এ দৃশ্য কল্পনা করছে তখনি তার মনে যাওয়ার ইচ্ছা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু আজ সেই অপরিচিতা পিসীমাকেই তার সংসারের মধ্যে সব চেয়ে পরিচিত সব চেয়ে আপন বলে মনে হল। তার কণ্ঠের আহ্বান যেন সমস্ত পৃথিবীর বুকে বুকে ছড়িয়ে পড়ে ডাক্‌ছে। ঐ যে দূরে বাঁশী বাজছে তার সুরের মধ্যেও যেন সেই কণ্ঠেরই আহ্বান কমলের কানে বিচিত্র ভাষা নিয়ে বাজতে লাগলো। কমল ঠিক করলো সে তার পিসীমার কাছেই যাবে।

সে পিসীমাকে চিঠি লিখতে বসলো। অবশেষে একদিন এক সুটকেশ হাতে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে এসে দিল্লীর টিকিট করে' উঠে বসলো। গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করলে কমলের মনে নানা চিন্তা নানা আকার ধরে দেখা দিতে লাগলো। পিসীমা কেমন ব্যবহার করবে, কি করে প্রথম দিনে সে দাঁড়াবে এই সব চিন্তাই তার প্রবল হ'য়ে দাঁড়াল। রওনা হওয়ার আগে তার চিন্তার ধারা ছিল অন্য রকম। সে উন্মাদ হ'য়ে পিসীমার বাড়ীতে তার অল্প কয়েকদিনের আবাসকে কল্পনায় রমণীয় করে তু'লতো। কিন্তু রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উগ্র কল্পনা এখন অন্য পথ ধরলো। জন্মাবধি যাহাকে সে দেখে নাই তার স্নেহের কাঙাল হ'য়ে সে আজ এত দীর্ঘকাল পরে কি করে দাঁড়াবে ?

রাত্রিটা ঘুমে জাগরণে কেটে গেল। প্রভাত হতেই কমল চোখ মুছে উঠে জানলার পাশে এসে বসলো। গাড়ী তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। তার মনও শীঘ্রই অন্য পথ ধরলো। সে কল্পনায় পথের যে ছবি মনে মনে এঁকেছে তারি সাথে চাক্ষুষ পরিচয়ের আনন্দে সে খুসী হ'য়ে উঠলো। উদার দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ধানের পসরা বুকে করে প্রভাত আলোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে, কৃষকেরা মাঠে কাজ করছে আর তাদের ছেলেরা লাইনের পাশে তারের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী যত পশ্চিমের দিকে যেতে লাগলো মাটির শ্যামল রং শ্যামল শোভা তত বদলে যেতে লাগলো—তার শ্যামল বসনের উপর একখানা গৈরিক উত্তরীয় টেনে নিয়ে ধরণী যেন মুখ ফিরিয়ে কঠোর তপস্যায় সমাহিত হল। মাঠের পর মাঠ ধূ ধূ করছে রিক্ত বুকে, এক দিগন্ত হ'তে অন্য দিগন্ত পর্য্যন্ত নয়ন বাধাহীন চলে যায়। মাঝে মাঝে বাঁশ এবং খেজুর গাছের ঝোপ, এক একটা পুকুর তালগাছের সারি দিয়ে ঘেরা কিম্বা কোন ঝিল বেঁকে বেঁকে চলে গেছে একদিক হতে আর একদিকে। কাল পাথরে খোদা মূর্ত্তিগুলি বলিষ্ঠ হাতে মাছ ধরছে, সুউচ্চ তালগাছের মাথা হ'তে তাড়ি আহরণ করে আনছে, নৌকা নিয়ে পারাপার করছে।

কমল দুই চক্ষু মেলে এই দৃশ্য দেখতে লাগলো—কখন কোন জিনিষ তার আঁখি বাদ দিয়ে যায় এই যেন তার ভয়।

তার পূজার ছুটিকে তার সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করা চাই—এই পথের আনন্দকে বাদ দিলে ছুটির মধুসঞ্চয় তার ব্যর্থ হবে।

অবশেষে দিল্লী।

পিসীমার বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াল। পিসীমা দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কমল গিয়ে প্রণাম করতে তাঁর চোখ ছল ছল করে উঠ্‌লো—কমলকে তিনি দুই হাতে ছেলেমানুষের মত বুকে জড়িয়ে মাথায় স্নেহ-চুম্বন দিলেন।

কল্পনার রং বদলে গেল—কমলের চোখও ছল ছল করে —কথা বলতে গলায় বাধে।

পিসীমা বল্লেন—তোর চেহারা ঠিক দাদার মত হয়েছে, তেমনি সুন্দর চোখ তেমনি টানা নাক—সবি তেমনি—তবে দাদা আরো পরিষ্কার ছিলেন—তুই তোর মায়ের শ্যামলা রং পেয়েছিস।

দিল্লীতে এসে কমলের বয়স যেন দশ বছর পেছিয়ে গেছে; সে এখানে যে সব ছেলেমানুষী করে, কল্পনায়ও সে তা' কোন দিন ভাবতে পারে নাই।—তার স্নেহবঞ্চিত ভীরু অন্তঃকরণের মাঝে এ চপল শিশু আজও কি করে বেঁচে আছে, তা ভাবতে তার নিজেরই বিস্ময় লাগে।

পিসীমার মেয়ে রমা তার যত সব ছেলেমানুষী খেলায় সাথী। প্রবাসে প্রবাসে রমা যৌবনের মণি-কোঠায় পা দিলেও মনটি রয়েছে তার একেবারে কাঁচা—এতটুকুও রং ধরেনি।

রমাকে সে কত গল্প বলে—অবশ্য বাড়িয়েই বলে—তার কলেজের কথা—কলকাতার কথা—তার মেসের জীবনের অভিজ্ঞতা, তাদের গ্রামের কথা। দিনের বেলায়ও সেখানে কি রকম বড় বড় বাঘ ঘুরে বেড়ায়—সে একবার একটা বাঘ মেরেছিল ইত্যাদি।

কতবার সে ভাবে তার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের অভাব এবং বেদনা সে রমাকে একটুখানিও জানায় কিন্তু রমার স্বচ্ছ নির্ম্মল শিশুর মত অনাবিল চোখের দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছা সে দমন করে, ভাবে তার হৃদয়ের উগ্র স্নেহক্ষুধা এবং জ্বালার ছবি রেখে পাছে এ ফুলে ব্যথা লাগে—পাছে একটু মলিন হয়!

তাই সে রূপকথার গল্প বলে—বাঘের গল্পে রমাকে পুলকিত করে তোলে। তার সম্ভব অসম্ভব বীরত্বের কথায় রমা বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে, কখনও কমলের হাত চেপে ধরে বলে—সত্যি!...কমলের মিথ্যা ভাষণের উৎসাহ বেড়ে যায়।

পিসীমা এক দিন বল্লেন—কমল আগ্রাটা দেখে যা—এতদূর যখন এলি।

রমা বলে—হাঁা মা যাব, আমি আর কমলদা, কাকার ওখানে থাকবো। কবে যাব মা?

রমা যাবে। কমল আপত্তি করে না; মন তার নেচে ওঠে আনন্দে। কিসের আনন্দ কিসের পুলক সে বোঝে না।

ট্রেনে সারা পথ কমল নীরব। রমা অনর্গল কথা বল্‌তে লাগলো। কত কথা—ওটা জাহাঙ্গীরের সমাধি, ওটা কোন বাদশাহের ঘোড়ার কবর, তার পরক্ষণেই আবার অন্য কথা। তাদের স্কুলে জ্যোৎস্না বলে একটি মেয়ে আছে, সে যা হাসাতে পারে—কথায় কথায় গান গায়। পূজার পর তারা চলে যাবে কলকাতায়, তার বাবা বদলী হয়েছে।

—কাকার বাড়ীতে একটা খুব বড় চমৎকার কুকুর আছে। আমার গানের মাষ্টার চমৎকার হাসির গান গাইতে পারে।

গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামে—রমা জিজ্ঞাসা করে—ওটা কিসের আলো? গাড়ীগুলি এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যায় কেমন করে? কি করে পুল তৈরী হয়? কমলদা রেলগাড়ী চালাতে পার?

কমল কিছু কিছু উত্তর দেয়—বাকী কথার উত্তর শোনার অবকাশ রমার নাই। আবার অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে।

কমল বলে—রমা দেখি তোর হাত দেখি। রমা বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—তুমি হাত দেখতে পার কমলদা...?

—হাঁা পারি কিছু কিছু—দেখি—

রমার হাত নিজের তপ্ত হাতের উপর রাখে—হাত নিয়ে খেলা করে, ছেড়ে দেয় না। ওই একটুখানি ছোট্ট হাতের স্পর্শের মধ্যে ও যেন ওর স্নেহবঞ্চিত বুভুক্ষু হৃদয় সুধায় পূর্ণ করে নেয়, যতটুকু পায় তা কমল তার সমস্ত জীবনের চোখের জলেও মূল্য যাচাই করতে পারে না।

তিনদিন তারা আগ্রায় ছিল—দেখার বাকী আর কিছু নাই। এখানেও তারা দু'জন, দেখার মধ্যে রমার কাকার সেই চমৎকার কুকুরটা।

রমা ক্যামেরা নিয়ে ফটো তোলে—কমলের ফটো অনেক! তাজমহলের সোপানে বসে' রমার ফটোও কমল তুলেছে। আবার তারা ফিরে এলো দিল্লীতে। কমলের মন তখন আবার তার শিশুকাল থেকে গড়ে উঠ্‌ছে। যখন সে ভাবে এ সব তার ছেড়ে যেতে হবে তখন তার ভয় হয়;—ভাবে, ফিরে যাব কি করে? মনে হয় সেই কলিকাতার নিরানন্দ মেসের ছোট একটা ঘর—সেই কলেজ যাওয়া আর ফিরে আসা—ছেলে পড়ানো। অনন্ত—পদ্ম…

সে আর ভাবতে পারে না।

সব চেয়ে তার ভয় হয় সে এতটা পথ একলা কি করে যাবে, মনের এই অবস্থা নিয়ে? ষ্টেশন থেকে যখন গাড়ী ছাড়বে তখন সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে—রমা তখন হয়ত কাঁদবে। গাড়ী ক্রমে দূর হতে দূরে যাবে—সে তখন ঠিক থাকতে পারবে ত'? বুকফাটা কান্নার আভাষ তার চোখের কোনে মুখের ভাবে জানবে না ত'?

কমল যখনি সে কথা ভাবে তখনি তার দু'চোখ ভরে জল আসে। মনে হয় দিল্লী আসাটা তার বড় ভুল হয়েছে। বেশ ছিল সে একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায়; স্নেহ নাই, ভালবাসা নাই, হৃদয় বলে কোন জিনিষের দাবী সে জান্‌তোনা। কিন্তু আজ তার হৃদয় যে একদিনে ফলে ফুলে শাখায় পল্লবিত হয়ে মাটিতে শিকড় গেড়ে আলোকের পানে মুখ তুলে হাস্‌ছে, এই হৃদয়লতাটিকে সে যখন নির্ম্মম হস্তে উৎপাটিত ক'রে নিয়ে কলকাতার মেসের ছোট্ট ঘরটিতে রোপণ করবে, তখন এ লতাটি বাঁচবে ত? আকাশের আলোকের পানে মুখ তুলে তাকাতে তার ত কোন বাধা আসবেনা?

কমল ভাবে, না—না—আমি আর পারি না। কি যে সে পারে না তা বুঝতে পারে না—শুধু গভীর রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় বসে সে অশ্রু ফেলে।

কমলের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। যাবার দিনও এগিয়ে এল। রমা রোজই কমলকে বলে—আমি কিন্তু তোমার সাথে যাব, কমল দা—

কমল বল্লে—কোথায় যাবি—আমার মেসে?

রমা বল্লে—কেন তুমি যে মাকে বলেছিলে যে এখান হ'তে তুমি তোমার দেশের বাড়ীতে যাবে? কমল মাকে রাছে বসিয়ে বল্লে—বাড়ীতেই বা কার কাছে ওকে নিয়ে যাব! আমার কে আছে রে সেখানে?

রমা মাথা নেড়ে বলে—না আমি যাব!—

আচ্ছা পিসিমাকে বল্।

পিসিমা শুনে হাসি চেপে ধমক দিয়ে বল্লেন, যা যা সর্—বিরক্ত করিস্ না।

রমা কাঁদে—ওমা আমি যাব! একটি মেয়ে—মা ব্যস্ত হয়ে বলে, আচ্ছা—আচ্ছা যাস্।

কমল জানে রমার যাওয়া অসম্ভব—তার সে সৌভাগ্য নাই—মাও জানে তাই—তারা হাসে। রমা জানে যাবে, খুসীতে সে বারবার কমলকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

কমল যে কি ভাবে কলকাতা ফিরে এসেছিল তা' সে নিজেই জানে না। সমস্ত পথ সে শুধু ভেবেছে রমার কথা, তার সেই জলে ভরা স্তব্ধ মুখের ছবি এবং ব্যাকুলতা—শুনেছে শুধু তার সেই কাতর কণ্ঠের মিনতি—আমাকে দেবেনা কমলদার সাথে যেতে,—ও মা আমি যাবো।

কলকাতার পথে যখন কমল পা দিল তখন তার গা হাত পা নিস্‌পিস্ করছে—মাথার মধ্যে যে কিসের অপরিচিত অস্পষ্ট কোলাহল তা' সে নিজেই বুঝতে পারছে না। দু'হাতে মাথা চেপে সে দাঁড়ায় আবার পথ চলে।

বেলা দ্বিপ্রহর। ক'লকাতার রাস্তা হ'তে যেন একটা আগুণের ঝলক উঠে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল, তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে বন্য পশুর মত সে খানিকক্ষণ আর্ত্তনাদ ক'রে কাঁদে!

মেসে যখন পৌছুল তখন বেলা দুটো। মেসের দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে জিনিষপত্র নিয়ে সেলাম করে বল্লে—বাবুজী আয়া—অনন্ত বাবুকা ত' বহুৎ ব্যাররাম।

উপরে উঠে কমল দেখলো অনন্ত রুগ্ন শয্যায় পড়ে কাতরোক্তি করছে।

দু'হাত দিয়ে অনন্তকে নাড়া দিয়ে ডাকলো—অনন্ত—অনন্ত—অনন্তর গায়ে তখন জ্বর রয়েছে এবং সর্ব্বাঙ্গে কিসের অস্পষ্ট চাকা চাকা দাগ।

কমলের ডাকে রক্তচক্ষু মেলে অনন্ত বললো—কমল এসেছিস্—তাই আমি আর বাঁচবো না—আমার বসন্ত হয়েছে।

কমল চমকিয়ে উঠলো। বসন্ত—অসময়ে বসন্ত। পরক্ষণে সামলিয়ে নিয়ে অনন্তর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো—ভয় কি সেরে যাবে।

তার তখনও স্নান খাওয়া হয় নাই। তিন দিন পথের কষ্ট—সে সেই অবস্থাতেই অনন্তর হাতখানি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে' রইলো।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করলো—শরীর এত খারাপ কেন, অসুখ হ'য়েছিল!

কমলের চোখে জল এল—বললো—না—

অনন্ত আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে আস্তে আস্তে বললো—কমল ভাই, একটা কথা বলবো, রাগ করবে না—

কমল তার বিষণ্ণ স্তব্ধ চোখ দুটি অনন্তর চোখের উপর রেখে বললো—বলনা, রাগ করবো কেন?

অনন্ত তবু দু'একবার থেমে ঢোক গিলে বললো—পদ্ম—পদ্মকে একবার আন্তে পারিস ভাই—হয়ত বাঁচবোনা ভাই—তার কণ্ঠে কাতরতা ফুটে উঠলো—চোখ দুটি ছল ছল করে—

কমল তার হাতের উপর হাত রেখে বললো—সে আসবে কেন তোমার বসন্ত হয়েছে শুনে,—তাছাড়া মেসে কি বলে আনবো?

অনন্ত কাতর কণ্ঠে উত্তর দিল—আসবে ভাই, আমার অসুখ হয়েছে শুনলে সে নিশ্চয় আসবে তোমাকে দেখার আগে সে একদিন আমাকেও ভাল বাসতো। সে ঝর ঝর করে' কেঁদে ফেললো—পরে মুখ চোখ মুছে বললো—মেসে কেউ জিজ্ঞাসা করলে ব'লো যে আমার সেবার জন্য আমার বোন এসেছে। যাবি ভাই কমল?

বেলা প্রায় তিনটা—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, অনাহারে অস্নাত কমল ছুটে চলেছে মাইল খানিক পথ পাড়ি দিতে—

পদ্ম—পদ্ম—পদ্ম—বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে কমল তার দরজায় আঘাত দিল—

পদ্ম ডাকে—কে—

দরজা খোল—শীগগীর—

পদ্ম শয্যা ছেড়ে চোখ মুছে দেখে কমল—তার বিশ্বাস হয় না। পরক্ষণে তার চেহারা দেখে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কী হয়েছে তোমার—উস্কো খুস্কো চুল—চোখ লাল। এগিয়ে এসে বুকের কাছে হাত দিয়ে বললো—অসুখ হয় নি ত? এস ভিতরে এস।

সব কথা শুনে আঁচলে চোখ মুছে পদ্ম বললো—হাঁ আমি যাব বই কি, কিন্তু অনন্ত—কমল বাবু সে বাঁচবে ত?

কমল আশ্বাস দিয়ে বললো—বাঁচবে না হয়েছে কি? সামান্য অসুখ।

পদ্ম বললো—কমল বাবু চল এক্ষুনি যাব কিন্তু আমার একটা কথা তুমি রাখ—

কমল মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো—কি?

পদ্ম তার কাছে এসে হাত ধরে বললো—তুমি তিনদিন পথে পথে কাটিয়েছ—আজ সারাদিন তোমার স্নান খাওয়া হয় নাই। অনুমতি দাও আমি দুটো তোমাকে রেঁধে দি—এখানে স্নান করে খেয়ে নাও।

পদ্মর চোখে জল দেখে কমলের চোখেও জল আসে। মনে হয় এমনি সজল চোখ এমনি স্নেহকরুণ মিনতি যেন তার অপরিচিত নয়? হয়ত যে তাকে এমন করে বলতো তাকে আজ সে খুঁজে পায় না কিন্তু সে ছিল। কমল ভাবতে চেষ্টা করে—অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

—তা হয় না পদ্ম—দেরী হয়ে যাবে। চল যাই। তোমার কাছে আর একদিন খাব কথা দিলুম। আনন্দে পদ্মর বুক টলমল করে—সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। যে কমল কাছে বসলে দূরে সরে যায়। সে আজ তার কাছে আহারের দাবী জানিয়ে গেল—তার নিষ্ঠুর দেবতা আজ তার পূজা গ্রহণ করেছে—আজ আর সে তাকে ঘৃণা করে না।

নির্লজ্জ পদ্ম নববধূর মত লজ্জায় মুখ রাঙা করে' বললো—আচ্ছা তবে এক গ্লাস সরবৎ শুধু দিই তোমাকে?

কমল হাসে—দাও।

পদ্ম আর কমল যখন অনন্তর শয্যাপাশে ফিরে যেয়ে বসলো তখন সামনের বাড়ীর অন্তরালে সূর্য্য নেমে গেছে। পদ্মকে অনন্তর শয্যাপাশে বসিয়ে কমল স্নানের জন্য নীচে নেমে গেল।

সে রাত্রে কমল আর পদ্ম সমস্তক্ষণ অনন্তর পাশে ব'সে রইলো। জর কমে এসেছে—সর্বাঙ্গে অল্প বিস্তর গুটিকা দেখা দিয়েছে—পদ্ম অক্লান্তভাবে শান্তমুখে অনন্তর সেবা করছে।

প্রায় শেষ রাত্রে পদ্ম জোর করে কমলকে বিছানায় শুইয়ে দিল—ট্রেণে এতটা পথ এসে আবার রাত্রি জেগে আপনিও কি একটা অসুখ বাধাতে চান নাকি ?

কমল আপত্তি না ক'রে শুয়ে পড়লো ; ঘুম আসে না—কত কথা মনে হয়, সারাদিন ব্যস্ত থাকায় সে কোন কথা ভাববার অবসর পায় নাই। শয্যায় শুয়ে শুয়ে তার অবসন্ন পরিশ্রান্ত মন বাতাসের বেগে ভেসে-যাওয়া হাল্কা মেঘের মতন এধারে ওধারে ভেসে বেড়াতে লাগলো। সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারছিলনা যে সে জাগ্রত না নিদ্রিত ; তার অবসন্ন চোখের উপর ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত কত অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল, যার সাথে সে অত্যন্ত পরিচিত অথচ আজ যার সাথে তার কোন সংযোগ নাই ;—সমস্ত দৃশ্য সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে আর একটি ছবি তার চোখের সামনে সমস্তক্ষণ জেগেছিল তা হচ্ছে রমার শুষ্ক বিষণ্ণ মুখ, সে মুখও যেন ছবিতে আঁকা—কোন গতি নাই—কোন সজীবতা অথবা কোন ভাব নাই, যেন এক চিরদুঃখিনী প্রস্তর-মূর্ত্তি তার অনাগত সুস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে আছে

সে রাত্রে কমল স্বপ্নে দেখলো—সে যেন কোথায় এক অপরিচিত স্থানে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে রুগ্ন শয্যায় কাতরোক্তি করছে আর তার মাথার কাছে বসে রমা তার সেবা করছে।

ঘুমের ঘোরে তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগলো। ঘুম ভাঙলো তার যখন পদ্ম এসে তাকে ডেকে তুলে দিল—কমল চোখ মুছে লজ্জিত মুখে উঠে বসলো।

পদ্ম মৃদু হেসে বললো—ডাকতাম না, দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন ভেবে ডেকে দিলাম—কাঁদছিলেন কেন বলুন ত' ?

কমল উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

দিন সবারি যায়—এদেরও যাচ্ছিল। অনন্ত ভাল হয়ে উঠেছে—পদ্মও তার বাড়ীতে ফিরে গেছে। শুধু কমল আর কিছুতেই নিজেকে তার পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারলো না।

কলেজে যায়—পড়াশুনায় মন বসে না। জানালার বাইরে নারিকেল গাছের মাথা পার হয়ে উজ্জ্বল নীল আকাশের স্বচ্ছতার নীচে যেখানে চিলগুলি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে সেই দিকে চেয়ে থাকে, চোখ জ্বালা করে—হাতের উপর মাথা রেখে কত কিছু ভাবে, হয়ত যে ভাবনা তার মনকে রঙীন করে তোলে তা হয়ত' সে তার নিজের জীবনে কোন দিনই সফল করে' তুলতে পারবে না।

কমল চিরদিনই লাজুক প্রকৃতির—সংসারে সে নিজের স্থান কোনদিনই দখল করে নাই—পরবাসীর মত নিজের কাজ এবং লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটিয়েছে। এখন সে আরো গম্ভীর আরো দূরে সরে' যেতে লাগলো। ব্যতিক্রম হয় শুধু যখন সে তার পূজার ছুটির ভ্রমণ বৃত্তান্ত আলোচনা করে। কথায় কথায় রমার কথা উঠে পড়ে—মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তার সরলতা তার গুণের তার স্নেহের প্রশংসা করে বলে—এমন একটি বোন যার নাই সে বুঝবে না যে এমন একটি বোন জীবনের কতখানি।

অনন্ত একদিন হেসে বললো—কমল রমাত' তোর বোন... ?

কমল শঙ্কিত হয়ে জবাব দিল—হ্যাঁ—কেন ? অনন্ত হাসতে হাসতে বললো—কিছু মনে করো না কিন্তু তুমি যেভাবে সারাদিন তার কথা বল শুনে মনে হয় সে যেন তোমার আর কেউ।

কমলের মুখ বিবর্ণ পাংশু আকার ধারণ করলো। শুষ্ক স্বরে জবাব দিল—ভারী অসভ্য ত' তুমি।

* * * *

তখন শুক্লপক্ষ, সমুদ্রও শান্ত, রাত্রিও অনেক। কমল অন্ধকার ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে সমুদ্রের উপর যেখানে সোনার পাতের মত চাঁদের আলো ঝিকমিক করছিল সেইদিকে চেয়ে আছে। মন তার কোথায় সে তা নিজেই জানে না।

আজকাল সে যে সব অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য চিন্তা করে এবং যে অভাব অনুভব করে তার সঙ্গে সে কোন কালে পরিচিত ছিল না। সমস্ত রাত্রি যখন তার বিনিদ্র অবস্থায় কেটে যায় তখন তার শুধু এই কথা মনে হয়, যে সংসারে

তার কোন প্রয়োজন নাই। যাদের কথা মনে হয়, কল্পনার চোখে সে দেখে তারা কত শান্তি কত নির্ভয়ে ঘুমিয়ে আছে আর সে রাতের পর রাতে বিনিদ্র অবস্থায় যেন এক পরিত্যক্ত অভিশপ্ত মহা জগতের দরজায় সঙ্গীহীন জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে—ভিতরে প্রবেশের অধিকার নাই।

কলকাতায় থাকতে সে আপনাকে নিজের পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু মনকে সে বাঁধতে পারে নাই। তার বুভুক্ষিত স্নেহবঞ্চিত মন একবার গৃহ এবং গৃহের অন্তরালে যে মধুর সন্ধান পেয়েছে তার অভাব সে জীবনের সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়েও ভুলতে পারে নাই। তার শুধু মনে হ'ত তার সমস্ত জীবনটা যেন একটা মস্ত ফাঁকী। কি অবলম্বনে কি আশা নিয়ে সে সংসারে বেঁচে আছে? সংসারের অগণ্য মানুষ এবং তাহাদের জীবনের সাথে তার জীবনের মিল কোন খানে? তার পূর্ব্বের সরল শুভ্র জীবন তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে গেছে—আনন্দ যা কিছু পেয়েছি তার কোন চিহ্ন পড়ে নাই—যেটুকু আছে তার স্মৃতিই তাকে পাগল করে তুললো। বৈচিত্র্যহীন একটানা নিয়মবাঁধা অলস অবলম্বনহীন জীবন কাটাতে হ'লে তাকে পাগল হ'য়ে যেতে হত, তাই অনেক চেষ্টা করে সে এই জাহাজ কোম্পানীতে চাকরী জোগাড় করে অজ্ঞাত অন্ধকার ভবিষ্যতে ঝাঁপ দিয়েছি। এই অন্ধকার সাগরের পরপারে কোন মাণিক তার মিলবে তা সে নিজেই জানে না—তবু সে ভেবেছিল যে বিরামহীন কর্ম্ম এবং নূতন জীবনের বৈচিত্র্য তাকে তার পুরানো জীবনের গ্লানি হ'তে মুক্তি দেবে। অন্ততঃ কিছুদিন সে হয়ত আপনাকে ভুলে থাকতে পারবে।

অনন্ত একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল—তোমার কথা শুনে মনে হয়, রমা যে তোমার আর কেউ—এ কথা সে ভোলেনি।

মনে ভাবতো সত্যই কি তাই? কিন্তু তার অন্তর কিছুতেই এ কথায় সায় দিত না, বরঞ্চ ঘৃণায় এবং গভীর পাপের ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো। সে শুধু ভাবতো আমার জীবনে যদি ঐটুকুই শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ হয় এবং তাকে যদি আমি আমার চোখের জলে ধুয়ে মুছে উজ্জ্বল করে রাখি তাহ'লে সংসারের তাতে এত আপত্তি কেন? আমার যে কিছু নাই তাকি ওরা জানে না। আমি ওকে ভালবাসি এবং ওই যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য—সে কথাও আমি অস্বীকার করি না—কিন্তু আমিত তাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সাথী হিসাবে চাই না। আমি চাই আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যে ঘর আমি বাঁধবো তা যেন ওর কল্যাণ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, যে নারী আমার প্রেয়সী হবে সে যেন ওরি মতন শুভ্র ওরি মতন পবিত্র হয়। আমার দুঃখ আমার অভাব আমার বেদনা যেন ওরি মত না বোলতে না চাইতে বুঝতে পারে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]
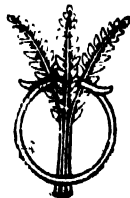
অবগুণ্ঠিতা

[মুখোপাধ্যায়]

তারকা-তীর্থের পথ। তা'রি দূর দিগন্ত-রেখায়,
হেরিনু মূর্চ্ছিত আছে চাহনি তোমার।
রাত্রির পৃথিবী তারে রূপ দিলো পল্লব লেখায়,
গুণ্ঠনে শিহরি' উঠে কাজল-আঁধার।

আজি শুধু একবার খুলে দাও ও-অবগুণ্ঠন—
সঞ্চিত রেখেছে যেথা সৃষ্টির বিস্ময়
আঁখির রহস্য তব ছায়াপথে করিছে গুঞ্জন,
দেহ-সিন্ধু অন্তরালে হাসিছে প্রলয়।

আজি মোর প্রাণ যেন মুক্তি লভি' সঙ্গীতের মতো,
আকাশে জানাতে চাহে নীরব প্রণতি।
পথের পিপাসা তুমি মর্ম্মে মোর করিলে জাগ্রত,
পদপ্রান্তে বাঁধি দিলে দূর বসুমতী।

তোমারে চেনার গান সে-পথের অন্তরে অন্তরে
বাজুক মূর্চ্ছনাহত কুসুম-মঞ্জীরে।
গঙ্গার গৈরিক-ধারা বহি' যাক্ মৃদুমন্দ স্বরে—
প্লাবনে নিমগ্ন করি' দিক্ ধরণীরে।

শিরার শোণিত মোর বাজে যেন অণুতে অণুতে;
মুক্তির কামনা নহে—মৃত্যুর পিপাসা,
জাগাও পরাণে মোর। মর্ম্মরিত অরণ্য-তনুতে,
উর্ম্মি তুমি কহো কাণে সমুদ্রের ভাষা।

দীওয়ান-এ-হাফেজ

[কাদের নওয়াজ]

"মোত্ রেবে খুশ্ নাওয়া বেগো বতাজা নও বা নও
বাদায়ে দিল্ কুশা বেজো তাজা বতাজা নও বা নও।"

তাজা নূতন আশ্‌নায়ী-গান গাওরে গায়ক সুতান ধরি'
নব-নব টাট্‌কা সুরায় লও আজি মোর মানস হরি'
বিজন বনে ছবির সম ছুক্‌রী পিয়ার পার্শ্বে বসি'
দাও গোলাপী চুম্-দানী তার চুমায় চুমায় পূর্ণ করি'।
চাঁদ-পেয়ালায় সূর্য্য-সুরার অভাব হ'ল তন্বী সাকী
নূতন তাজা সরবতে আজ দাও না এ মোর পাত্র ভরি'।
শারাব পিয়ো নিত্য নূতন নইলে সুফল মিল্‌বে না হায়
চালাও গেলাস্ রঙীন পানির, সেই মধুময় নামটী স্মরি'।
মোর মনচোর দিল্-পিয়ারী আমার লাগি পাঠায় নিতি
নব-নব চিত্র এবং রং সুরভি রূপ আহরি।
ভোরের হাওয়া! তুইরে যখন পিয়ার 'গলি'র পাশ দিয়ে যাস্
জানাস্ তারে প্রেম হাফেজের গল্প ছলে নূতন করি'। *

* বিগত শ্রাবণ সংখ্যার 'জয়তী'তে কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবও এই গজলটীর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সত্য উদ্ধারের জন্য আমাকে বল্‌তে বাধ্য হ'তে হচ্চে যে অনেক স্থলেই কাজী সাহেব ঠিকমত অর্থ ধর্‌তে না পেরে ভুল অর্থ ব্যবহার করেছেন। আমি নিম্নে কয়েক স্থলের অর্থ বিভ্রাটের নমুনা দিচ্ছি:—

সব পয়লা চরণে "তাজা-বতাজা নও বা নও"এর অর্থ করেছেন কাজী সাহেব "আরো নূতন নূতনতর"—যাক্, এতটুকু ত্রুটী ধর্ত্তব্য নহে কিন্তু তৃতীয় চরণের অর্থটা এমন হয় কী করে? যথা—"বা 'সনমে' চুলু বতে" এ স্থলে "সনম্" মানে "মাশুক" "প্রতিমা" "প্রিয়া"। সম্পূর্ণ চরণটীর অর্থ "একটি নির্জ্জন স্থানে ছবির ন্যায় প্রেয়সীর সহিত সানন্দে বসিয়া থাক।" কাজী সাহেবের অর্থ—"অকুণ্ঠিত চিতে ব'স নিরালা ভোর হাওয়ার সাথে" এস্থলে "ভোর হাওয়া" তিনি কোথায় পেলেন? 'প্রিয়া' ও "ভোর হাওয়া"তে কি কিছু তফাৎ নেই? ভোর হাওয়া ত প্রিয়ার সন্দেশবাহী দূতী। তা ছাড়া 'প্রিয়া' ও 'ছবি' কথাগুলির কোন উল্লেখই নাই। চতুর্থ চরণের অনুবাদকে ঠিক্ ভাবানুবাদ বলা চলে। ষষ্ঠ চরণে "চাঁদির গেলাস চাঁদের থালা" কবিত্ব পূর্ণ হ'লেও হাফেজের নহে কাজী সাহেবের নিজস্ব। একাদশ চরণের "বাদে সবা চু বুগজরী বর সারে "কুয়ে" আঁপরী—এর "কু" শব্দের অর্থ (কাজী সাহেব লিখেছেন) "ছায়াবীথি", কখনই নয়, প্রকৃত অর্থ—"মহল্লা" "গলি" বা "পাড়া"। দ্বাদশ চরণে "কেস্‌সায়ে হাফেজাশ বগো"—এর "কেস্‌সা" মানে "গান-নিরালা" কী করে হয়! "কেস্‌সা" মানে ত গল্প। দুঃখের বিষয় কাজী সাহেব "বেপরোয়া" ভাবে লিখেছেন। লেখক।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনী

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখিতে আসা

আমার একটা ছোট ভাগিনীর liver এর ব্যাম হয়। আমি মাঝে মাঝে গিয়া গিরিশ বাবুর নিকট সমস্ত বলিতাম এবং তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। যাহা হউক ছোট মেয়েটীর অসুস্থতার নিমিত্ত আমি নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এবং দুই একদিন বাগবাজারে যাই নাই। একদিন সকালে দেবেন বাবু ও মাষ্টার মহাশয় রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে আসিলেন। ছোট মেয়েটীকে দেখিয়া মনে মনে বুঝিলেন যে liver এর ব্যাম, ভাল হইবে না। কিন্তু আমি যে কাতর ও বিমর্ষ হইয়াছিলাম এইজন্য আমার কাছে বসিয়া দেবেন বাবু কত উচ্চ কথা, নির্ভরের ভাব, জগতের প্রতি ভালবাসা এইরূপ নানা বিষয় বলিতে লাগিলেন। আমার মনটাকে যেন রোগীর কাছ হইতে লইয়া অন্যদিকে চালাইয়া দিলেন। তথন বুঝিলাম যে ব্যাম ভাল হইবে না। আড়াই বছরের মেয়েটা মারা যাইবে বটে কিন্তু ইহাতে অভিভূত হইবার কি আছে। জগতে ঢের উচ্চ জিনিষ ভাবিবার আছে। সেদিন তিনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অমায়িক ব্যবহার সচরাচর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকটার ভিতর যেন সকলের প্রতি একটা নিয়ত ভালবাসার ভাব ছিল।

শরৎ মহারাজের ও যোগেন মহারাজের খাইতে যাওয়া

একদিন শনিবার গ্রীষ্মকালে গিরিশবাবুর বাড়ীতে দুইটা আড়াইটার সময় গিয়াছিলাম। গিরিশ বাবু বসিয়া আছেন, দেবেন বাবু, শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজ এবং আমি গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। যোগেন মহারাজ কথা তুলিলেন। দেবেন বাবু, তোমাদের বাড়ীর রান্না নাকি বড় ভাল? সকলের মুখে শুনেছি যে তোমাদের বাড়ীর রসুই খুব উঁচু রকমের হয়। একদিন আমাদের খাওয়াও না? দেবেন বাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি আর রান্না, শাকপাতড়া, তার আর কি বিশেষত্ব আছে? তার পর এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তা চলিল। গিরিশ বাবু বলিলেন, ঐ শাক পাতড়ার ভিতরই সুন্দর রান্না হয় যা আমরা সাধারণের ভিতর পাই না। তখন দেবেন বাবু বাগবাজারের কোন স্থানে থাকিতেন। বাড়ী আমার ঠিক জানা নাই।

দেবেন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আচ্ছা বেশ, শরৎ বাবু ও যোগেন বাবু কালকে আমাদের বাড়ী খাইতে যাইবেন। তখন বাবু শব্দ ব্যবহার হইত মহারাজ শব্দ ব্যবহারে আসে নাই। শরৎ ও যোগেন মহারাজ খুব খুসী, দেবেন বাবুর বাড়ীতে নূতন রকম রান্না খাইতে যাইবেন। তারপর বড়ই হাসি তামাসা হইল। কিন্তু দেবেন বাবু গিরিশ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। একবারও তাঁর নাম উল্লেখ করিয়া গিরিশ বাবুকে খাইতে বলিলেন না। গিরিশ বেগতিক দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মহা ভঙ্গিমা করিয়া যোড়হাত করিয়া নিবেদন করিলেন, "দেবেন বাবু, বামুনের বাড়ীতে দুই বামুন আহার করতে যাবে, তা গাড়ু গামছা নিয়ে যাবার জন্যে ও এঁটো পাত মুক্ত করবার জন্যত একটা চাকরের দরকার হয়, তা আমি কায়েৎ চির কালইত বামুনের চাকর আমি নয় দুই বামুনের পেছনে পেছনে দুই গাড়ু গামছা বয়ে নিয়ে যাব আর একটা পাত মুক্ত করব ও দুইটী প্রেসাদ পেয়ে আসব। আমাকে তবে কেন বঞ্চিত করেন?" গিরিশ বাবু অভিনয় ছলে কথাটী এমন ভাবে বলিলেন যে সকলে হাসিতে হাসিতে মুখামুখী করিতে লাগিলেন। দেবেন বাবুও একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ও কথাটা আর বলবার কি দরকার ছিল। বামুনের বাড়ীতে কায়েতরা চিরকালইত প্রসাদ পেয়ে থাকে।" যাহা হউক, এক দিকে যেমন দেবেন বাবুর বাড়ীর রান্নার সুখ্যাতি হইল তেমি গিরিশ বাবু দেবেন বাবুকে আর একদিকে কি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তাহাও প্রকাশ পাইল। সকলের ভিতর

কি সরল অমায়িক আত্মীয় ভাব এবং পরস্পরের ভিতর কি ভালবাসা ও টান ছিল, এই উপাখ্যানটীতে তাই প্রকাশ পায়।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে রঁাধুয়ের গল্প

বলরাম বাবুর বাড়ীর রাস্তার দিকে দাঁড়াইয়া দেবেন বাবু একদিন গল্প সুরু করিলেন। দেখ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে এক রঁাধুয়ে ছিল। সে রান্না ঘরে ঢুকিতে ঢের দেরি করিত, কিন্তু ঝি চাকরদের বলা ছিল যে খুব সকালে উনানে আগুন দিয়া একটা হাঁড়ীতে ডাল চড়াইয়া দিবে। আর যত আনাজ তরকারী আছে কুটিয়া আর একটায় সিদ্ধ চড়াইয়া দিবে। আর একটা হাঁড়ীর উনানে জল গরম করিতে দিবে। চালটা অপর হাঁড়ীতেই চাপাইয়া দিবে। তাহা হইলেই ঘণ্টা খানেকের ভিতর সকল রকম তরকারী তৈয়ার করিয়া দিব। রান্না ঘরের ঝি চাকর নিত্য তাই করিত। রঁাধুয়ে বেলা করিয়া আসিয়া হাঁড়ীতে হাত দিয়া দেখিত যে আনাজ তরকারী সব সিদ্ধ হইয়াছে। হাঁড়ীটা নামাইল এবং সিদ্ধ আনাজ গুলি পালায় থালায় পৃথক করিয়া ফেলিল। তারপর তিত, ঝাল, টক মিশাইয়া একটা পল্‌তার সুকতো করিল, একটা ডালনা করিল, একটা চর্চ্চরী ও একটা টক এইরূপ বহু প্রকার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মসলা ও একটু গরম জল দিয়া দিল। সুন্দর তরকারী হইল। তার কোথায় কি কেরামতী করিল তা কেহ ধরিতে পারিল না। অথচ এক ঘণ্টার ভিতর দশ তরকারী করিয়া ঠিক সময়ে সকলকে ভাত দিল। দেবেন বাবু এই গল্পটী বলিয়া মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, বলিতেন ব্যাপারটা এইত বটেই। ছোট জিনিষ দেখ্‌ছি বলেইত হাসছি কিন্তু জগতের ব্যাপারও ঠিক এই বটে। ভিন্ন ভিন্ন আনাজ তরকারী সবইত এক হাণ্ডায় সিদ্ধ হয় শুধু মোশলা দেওয়ায় ও গরম জলের পরিমাণ করে দেওয়া এতেইত ঝোলও হয়, চর্চ্চরীও হয়, ডালনাও হয়। জগতটা ত তাই দেখ্‌ছি, একই জিনিষ এক জায়গায় সিদ্ধ হয়, শুধু হলুদ ও মশলার তফাতে নানা রকম করে দেখ্‌ছি আর বলছি কোনটার সহিত পরস্পরের মিল নাই কিন্তু সিদ্ধ এক জায়গায় হবেছে। এই কথা বলিতে বলিতে দেবেন বাবু মুখ গম্ভীর ও স্থির করিয়া থাকিতেন। ভিতরে তাঁর যে গম্ভীর চিন্তা আসিত সেটা যেন তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেন না। হাসি তামাসা হইতে কথাটা সুরু করিয়া অতি গম্ভীর দিকে লইয়া যাইতেন। এইটাই ছিল তখন ভক্তদিগের মধ্যের ভাব। হাসি তামাসার ভিতরে কিরূপে মন উচ্চ স্তরে যায় এইভাব তখন সকলের ভিতর প্রোজ্জ্বলিত ছিল।

গিরিশ বাবুর কাছে চাকরী করা

দেবেন বাবু কয়েক বৎসর গিরিশ বাবুর কাছে চাকুরী করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু মুখে বলিয়া যাইতেন দেবেন বাবু সেই সকল লিখিয়া লইতেন। এইরূপে অনেক গ্রন্থ দেবেন বাবুর হস্তে লিখিত হইয়াছিল গিরিশ বাবুর যে কয় খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে এই সময়ই হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র বাবুর হাতের লিখা। কারণ সে সময় অপর কেহ গিরিশ বাবুর বই লিখিতেন না। এই রূপ অনুমান করিতেছি। দেবেন বাবুর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। এই স্থলে ইহাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে দেবেন বাবু যদিও গিরিশ বাবুর কাছে কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিন্তু গিরিশ বাবু তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া কথা কহিতেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি সাধারণতঃ যেরূপ আজ্ঞা বা আদেশ বা উচ্চ নীচ ভাব প্রদর্শন করিতে দেখা যায় এরূপ কিছু ছিল না। উভয়ে যেন পরম আত্মীয় এবং পরস্পরকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যভাব ও শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে দেবেন বাবু গিরিশ বাবুকে ধমকাইতেন। এবং গিরিশ বাবু ধীর ভাবে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইতেন। এস্থলে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে গিরিশ বাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন এবং গুণগ্রাহীও ছিলেন সেই জন্যে তিনি দেবেন বাবুকে এইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং দেবেন বাবুও সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন এইজন্য গিরিশ বাবুর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়ায় অবসর পাইলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বার্ত্তা ও আলোচনা হইত।

(ক্রমশঃ)

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী, লিমিটেড

সূচনা

১৮৯৭ সালে বোম্বাই নগরে পরলোকগত মিষ্টার রুস্তমজী, ই, ভারুচার সহযোগিতায় মিষ্টার আর্নেষ্ট ফ্রেডারিক এলান "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নায়ক

মিঃ ই, এফ, এলাম

সার ফিরোজশাহ মেহ্‌তা কোম্পানীর প্রথম চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মাত্র ৫১ হাজার ৫ শত টাকা মূলধন লইয়া যে কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল এক্ষণে তাহার বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকার অধিক এবং মোট সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে তিন কোটী টাকারও উপর। "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া"র ডাইরেক্টরগণ সকলেই প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মিষ্টার কে, আর, কামা বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী। সমগ্র

মিঃ আর, ই, ভারুচা

ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, ইহার অপেক্ষা সুপরিচিত জীবনবীমা কোম্পানী আর নাই।

বৈশিষ্ট্য

"এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহা অপর কোম্পানীর নাই। প্রথমতঃ, ইহার চাঁদার হার অত্যন্ত কম। অন্যান্য বহু কোম্পানী হাজার টাকার জীবন বীমার জন্য যে পরিমাণ চাঁদা লইয়া থাকেন সেই টাকায় "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"য় হাজার টাকার অনেক অধিক পরিমাণ জীবন বীমা হয়। এই অতিরিক্ত বীমা যে তদতিরিক্ত অনেক টাকার বোনাস্ অপেক্ষাও অধিকতর প্রার্থনীয় তাহা বীমাবিদ্ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

মিঃ রুস্তম কে, আর, কামা

দ্বিতীয়তঃ, "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র টাকা খাটাইবার প্রণালী অত্যন্ত নিরাপদ। ইহাদের সমস্ত টাকা গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত সিকিউরিটিতে ন্যস্ত। সুদ অবশ্য ইহাতে কম পাওয়া যায়, কিন্তু প্রয়োজন মত যে কোন সময়ে বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যায় এবং চুরি করার অবকাশ থাকে না—কোন বন্ধুবান্ধব বা আশ্রিত ব্যক্তির ৭০ হাজার টাকা মূল্যের বাটী বন্ধক রাখিয়া লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া চলে না।

তৃতীয়তঃ, "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া"র আয়ের তুলনায় ব্যয়ের হার অত্যন্ত কম। যাঁহারা উচ্চহারে বোনাস্ দেন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ব্যয়ের হার অত্যন্ত বেশী, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের বোনাসের উৎপত্তির মূলে গলদ আছে। যে কোম্পানী শতকরা চাঁদার আয়ের ৫০ টাকা পরিচালনের বাবদে ব্যয় করেন অথচ অস্বাভাবিক উচ্চ হারে সুদ অর্জ্জন অথবা চাঁদা গ্রহণ করেন না সে কোম্পানী যদি হাজারকরা ২০ টাকা বার্ষিক
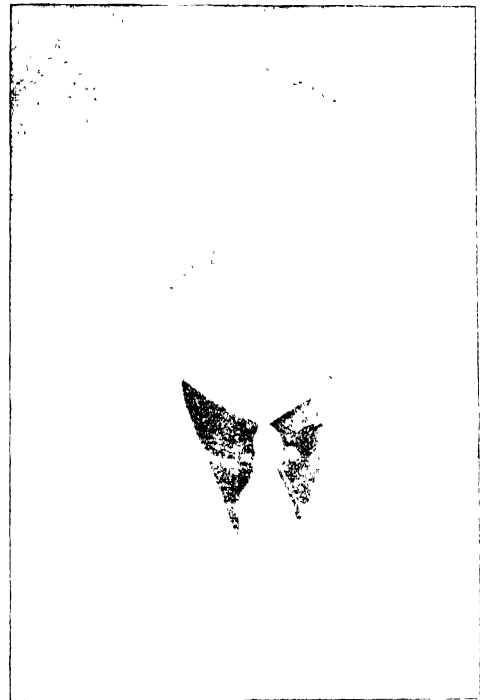
মিঃ এ, সি, সেন

বোনাস ঘোষণা করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার মূলে গলদ আছে। একথা বলিলে ক্ষেত্রবিশেষে স্বদেশ-দ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য কথা বলা হয়। এবং যেহেতু "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র ব্যয়ের হার ন্যূনাধিক শতকরা ২০ টাকা মাত্র, ইহার বোনাসের মূলে যে গলদ নাই একথা সহজে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই।

চতুর্থতঃ, কোম্পানীর দায়িত্বের সঙ্গে বীমার তহবিল এবং অন্যান্য তহবিলের তুলনা করিলে "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে এমন কোম্পানী এদেশে, আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বোচ্চহারে বোনাস্ দেওয়ার উগ্র প্রলোভন সংবরণ লভ্যাংশের শতকরা প্রায় ত্রিশ টাকা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখিয়া হাজারকরা বার্ষিক ১৫ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির দাম কমিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী-গুলির বিশেষতঃ উগ্র বোনাসপন্থীদের মহলে আজ আতঙ্কের
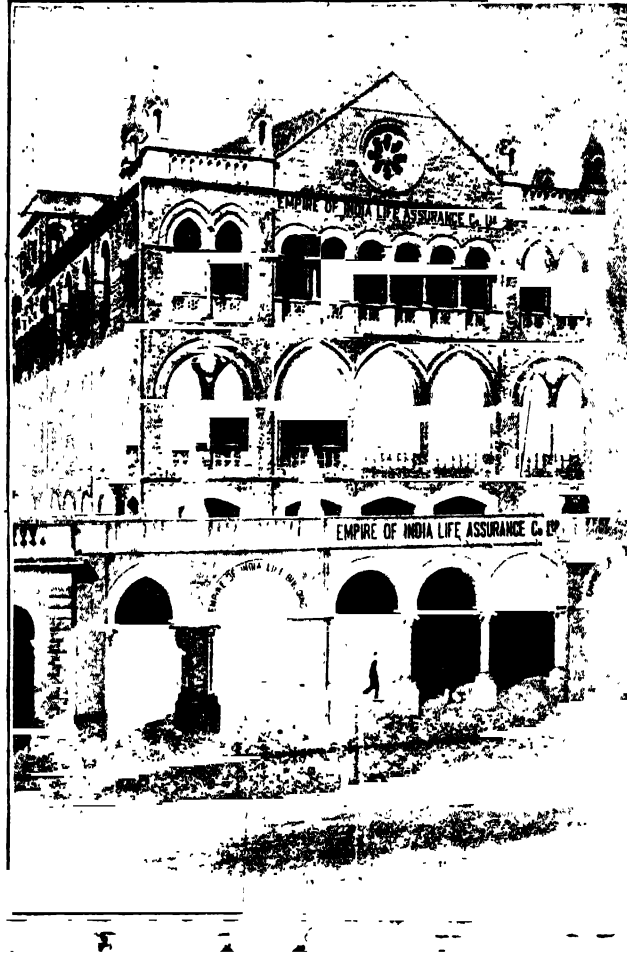
এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া হেড অফিস বোম্বাই

করিতে না পারিয়া ভারতের বৃহত্তম বীমা কোম্পানীকে সেদিন লাভের থলি (surplus) নিঃশেষে খালি করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। আর "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র ১৯২৭ সালের ভ্যালুয়েশনের ফলে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও সর্ব্বোচ্চহারে বোনাস দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা সূচনা হইয়াছে—আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহাদিগকে অঙ্ক শাস্ত্রের ফাঁকি খুঁজিতে হইতেছে। কিন্তু "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" উদ্বৃত্ত তহবিলের কয়েক লক্ষ টাকা মজুত রাখিয়া তখন যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার ফলে বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে।
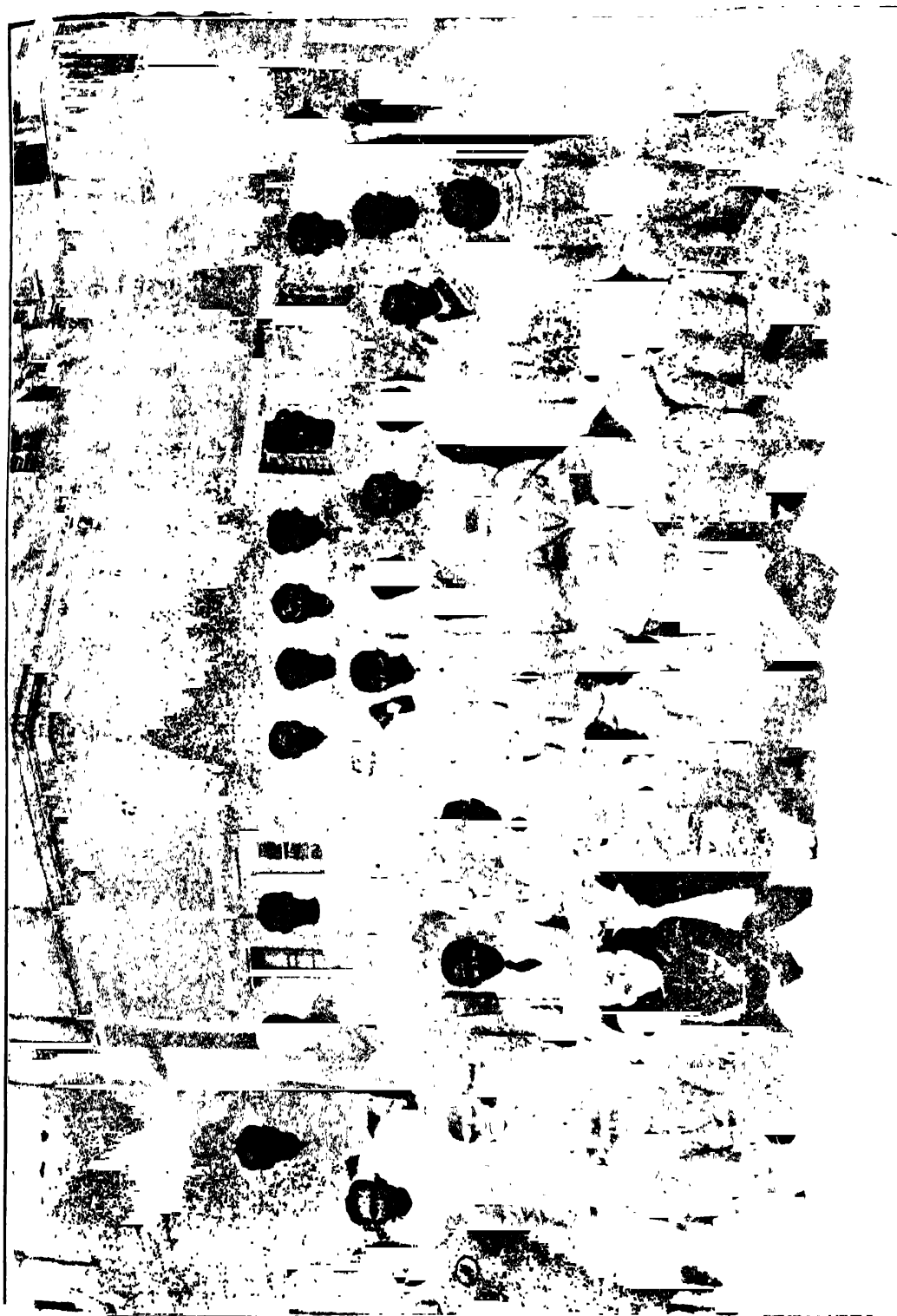
"এম্পায়ার অব্‌ ইণ্ডিয়া"র
কলিকাতা চীফ্‌ এজেন্সি আফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ।

নিজস্ব ভবন

কলিকাতার কোম্পানী বিশেষের ন্যায় কোন সুবৃহৎ ভবনের একাংশ ভাড়া লইয়া সমগ্র গৃহটীকে নিজস্ব বলিয়া ইঁহারা পরিচয় দেন না। বোম্বাই এর যে সুবৃহৎ অট্টালিকায় "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"র অফিস অবস্থিত তাহা কোম্পানীর নিজস্ব সম্পত্তি।

বিগত বর্ষের কর্ম্ম পরিচয়

১৯৩০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" জীবন বীমা কোম্পানী ১ কোটী ৮২ লক্ষ ১৯ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকার জীবন বীমার জন্য ৯ হাজার ৯ শত ৮৪ খানি আবেদন পাইয়াছিলেন এবং ১ কোটী ৪০ লক্ষ ২ হাজার ১ শত ৩৫ টাকার জীবন বীমার বাবদে ৭ হাজার ৮ শত ৩ খানি বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বীমার চাঁদা বাবদে ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ২২ টাকা ও সুদের বাবদে ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত ৫ টাকা আয় হইয়াছিল। কোম্পানী মৃত্যুর বাবদে ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ১ শত ৭৫ টাকা ও বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৬ শত ৫২ টাকা দিয়াছিলেন। কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনের জন্য ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩ শত ৫৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বৎসরান্তে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে তিন কোটী টাকারও অধিক দাঁড়াইয়াছিল

জীবন বীমা কোম্পানী বিচারের যতগুলি মানদণ্ড আছে তাহার সকলগুলি প্রয়োগ করিলেও দেখা যাইবে, "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" ভারতের একটী অত্যুৎকৃষ্ট কোম্পানী।

মেসার্স ডি, এম, দাশ এণ্ড সন্স, লিমিটেড

"এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" স্থাপিত হওয়ার অল্পদিন পরেই মেসার্স ডি, এম দাশ এণ্ড সন্স কোম্পানীর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেণ্টস নিযুক্ত হন। ইঁহারা প্রথম বৎসরেই আড়াই লক্ষ টাকার জীবন বীমার কাজ সংগ্রহ করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আড়াই লক্ষ টাকার জীবন বীমার কাজ সংগ্রহ করা কোন চীফ এজেন্সীর পক্ষে কঠিন না হইতে পারে কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করা স্বপ্নাতীত ছিল বলিলেও চলে। ১৯০৮ সালে মিঃ দাশের মৃত্যুর পর মেসার্স ডি, এম, দাশ এণ্ড সন্সের সমগ্র পরিচালন ভার শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র সেনের স্কন্ধে পতিত হয়। সেন মহাশয়ের মেধা, কৃতিত্ব, সংগঠন-শক্তি ও অসাধারণ কার্য্যনৈপুণ্যের ফলে "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" এক্ষণে বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত কোম্পানী বলিয়া পরিগণিত। বাঙ্গালার সজ্জনসমাজে মিঃ সেন সুপরিচিত এবং জীবন বীমার ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার সাফল্য ও তাহার আদর্শ আমাদের দেশের বীমা-জীবী যুবকগণকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করুক—আমাদের এই কামনা।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

উপাসনা।

"সর্ব্বহারা সন্তানের অবরুদ্ধ কণ্ঠের রোদন
মাতার সকল গর্ব্ব, সর্ব্ব গৌরবের অপচয়
দেবত্বের মহিমারে পায়ে দলি' ঘোষে পরাজয়।"

২৩শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ | ৮ম সংখ্যা

প্রস্থায়িণী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

দেহ-দেউলের দেবতা দিয়াছে ফাঁকি
নয়নে তোমার ধরা কি পড়ে না প্রিয়া ?
পূজার অর্ঘ্য, ছিন্ন কুসুম-মালা
শুধু মমতায় বুকে রাখি আগুলিয়া।
লাবণ্য-সুধা দেহাধারে উপচিয়া
শুকাল ধরার তৃষিত বক্ষ তলে,
বরাঙ্গ হ'তে অনঙ্গ প্রভা রাশি
স্তিমিত-শিখায় শ্মশান চিতায় জ্বলে!
রক্তকরবী ফুটেছিল যে অধরে
আজি সে শূন্য ডালার শুষ্ক ফুল;
নেহারি হৃদয় ব্যথায় আকুলি মরে
মনে হয় যেন কোথায় করেছি ভুল।

অপাঙ্গ হ'তে তীক্ষ্ণ শায়ক হানি'
মন-বিহঙ্গে বিঁধিয়াছ কত হায়!
আজিকে কৃষ্ণ রেখার পরিখা মাঝে
ঝিমায় আহত আঁখি দু'টি বেদনায়।
পেলব ওদু'টি বাহুলতা দেখি আজ
মলিন শীর্ণ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠে,
ভিক্ষাপাত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া কাঁদে
ছিন্ন আঁচল ধূলায় পড়িছে লুটে।
দাও দাও বলি' কণ্ঠে সরে না বাণী
অতি নিরুপায় নয়নে সজল মায়া,
আমার প্রাণের যত প্রেমনিবেদন
তোমার মাঝারে আজি পেতে চায় কায়া!
বহ্নি! তুমি কি গত জীবনের ছায়া
মরমে মরিয়া রাখিয়াছ শীতলতা?
মধু যামিনীর সুখস্মৃতি অবশেষ
ভাঁটায় ফুরাল স্রোতের চঞ্চলতা!
ললিত গতির উছল উন্মাদনা
স্থির হ'য়ে আছে ও দু'টি চরণ ধরে'
এলায়িত বেণী প্রাণহীন ফণি সম
বৃথাই লুটায় আনত পৃষ্ঠ 'পরে।
যুগ্ম ভুরুর রুচির মহিমা নাহি
নাহি ললাটের চন্দন-প্রসাধন,
সিঁথির সিঁদুর ভরা জ্যোৎস্নায় ম্লান
মরা হাসি আজ শঙ্কিত করে মন।
নব বসন্ত কখন চলিয়া গেল
পিক কণ্ঠের মধু সঙ্গীত থির,
গহন বনের দহন জ্বালায় দহি'
শাঙন ব্যথায় ফেলিছ অশ্রুনীর!
ওগো যৌবন-সঙ্গিনী মনোরমা
কবে শেষ হ'ল তব প্রেম-অভিসার
পায়ের চিহ্ন ধূলায় ঢাকিয়া গেল
বুক ভেঙ্গে আসে নয়নে অশ্রুধার!

বিনিদ্র রজনী

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

রাত বারোটায় ঘুম ভেঙেছিল, এখন রাত দুটো বাজে। মনে করেছিলাম ভোর হয়ে গেছে, নিদ্রাহীন রাতের ভোরটাকে ভৈরোঁর সুরাচার করে স্বাগত করবার আয়োজন করবো। দূরের কোন বড় লোকের দেউড়ীর দরোয়ান দুটো বাজালে এই মাত্র। ভাবলাম হয়তো আমার ঘুমের স্বল্পতাকে ওই দরোয়ান প্রগাঢ় নিদ্রার দ্বারা পূরণ ক'রে এইমাত্র উঠে বুঝি তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধন করবার জন্যে এই ভোর বেলা দুটো বাজিয়ে বসেচে। জানালা দিয়ে শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নার পানে তাকিয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই, কোথাকার মোরগটা ডেকে উঠল যেমন ক'রে ও ভোর বেলা ডাকে। অন্ধকারেই উঠে' ঘড়িটার পানে তাকালাম, তার উজ্জ্বল কাঁটা জানিয়ে দিলে দুটো বাজে। তখনো মনে হ'লো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে বুঝিবা, ওরও হয়তো দেউড়ীর দরোয়ানের মতই আজ ঘুম পেয়েছিল। কানের কাছে নিয়ে দেখি ঘড়ির নাড়ী বেশ নমর্যালই আছে। আজ রাতে আমারই সময় কি অতি দ্রুত ভোরের সীমায় এসে পৌঁছালো আর বিশ্ব জগতের সময়টা তার নিয়মিত চালে চলতে গিয়ে এতদূর পিছিয়ে রাত দুটোর মোড়েই পড়ে রইল?

আশ্চর্য্য এই সময়ের পরিমাপ ওই দরোয়ানের কাছে যার পরিমাণ মাত্র দুঘণ্টা তাই আমার বিনিদ্র মনের কাছে পাঁচ ঘণ্টায় পরিণত হয়েচে। আবার ওই দুঘণ্টাই কি পরীক্ষার হলে এক ঘণ্টায় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে না? অনেকেই বলবেন উভয় স্থলেই মনের বোধটা ভুল আর ঠিক হচ্চে ওই যন্ত্রের নির্ভুল ইঙ্গিত। কিন্তু কথাটা হয়ত এত সহজ নয়। প্রথমতঃ এই যে আমাদের মাঝে সময়ের পরিমাণ-বোধ এটা হয় কেমন ক'রে? মনে করা যাক্ ঘড়ি নেই; যখন ঘড়ি ছিল না তখনো মানুষ তো সময়ের হিসেব করেচে—কেমন ক'রে? তার মনের কাছে কতকগুলি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়েচে, যেমন দিনরাত্রি, সূর্য্যের এবং নক্ষত্রের স্থান পরিবর্ত্তন, সেই পরিবর্ত্তনগুলো তার মনে একটা মোটামুটি কালের ধারণা উৎপন্ন করেচে। যেমন এক সূর্য্যোদয় থেকে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঘটনা পরিবর্ত্তনের একটা সাধারণ গতিবেগ সে লক্ষ্য করেচে এবং এই সাধারণ গতিবেগের দ্বারাই কালের একটা Standardকে সে নিজের মনের কাছে দাঁড় করিয়েচে। সূর্য্যোদয় থেকে সুরু করে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সাধারণ কৃষক কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাজ করে যায়; চাষবাসের কাজ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সে সূর্য্যের গতিবেগের সঙ্গে এবং স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখে। মাঝে মাঝে কখনো কদাচিৎ তার কাজ করার গতি খুব বেশী বেড়ে ওঠে, কখনো হঠাৎ অত্যন্ত ঢিলে হয়ে পড়ে কিন্তু সেটা হ'ল তার জীবনে ব্যতিক্রমের মত, তা না হ'লে তার মনের গতিবেগ একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা ধরেই যেন চলতে থাকে। এরই অভ্যাস তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়েচে যে কাল হচ্চে একটা বাইরেকার বস্তু। এমনি ক'রে তার মনের ওপরে সে কালের প্রভুত্ব স্বীকার ক'রে বসে।

কিন্তু এই বিনিদ্র রজনী আমায় বলচে, না, কাল বস্তুটা একটা সুনির্দ্দিষ্ট গতিবেগের অধীন নয়। সময় কখনো জোরে চলে, কখনো ধীরে চলে, এর চাইতে সত্য আর কিছু হ'তে পারে না। পরিবর্ত্তনের বেগই হচ্চে কালের পরিমাপ। তাই ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখি তখন এক মিনিটে আমরা একটা সুদীর্ঘ জীবনের লীলা করতে পারি। পরিবর্ত্তনের বহুলতাই কালের দৈর্ঘ্য জানায়, যেখানে পরিবর্ত্তন যত কম সেখানে কালও তত সংক্ষিপ্ত। বলা বাহুল্য পরিবর্ত্তন বাইরে হোক না হোক সেটা অবান্তর কথা; কথা হচ্চে মনের ওপর দিয়ে পরিবর্ত্তন কতখানি হয়ে গেল। রামচন্দ্র যখন সীতাকে নিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন অপলক দৃষ্টিতে, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন সেই রাত্রিটি ভালো ক'রে আসার পূর্ব্বেই চলে গেল। তার কারণ একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে রামচন্দ্রের মন এমনি স্থির হয়ে গিয়েছিল যে আর কোনো পরিবর্ত্তনের অনুভূতিই তাঁর চিত্তে হয়নি; অন্য দিকে শোক যখন ঝটিকার মত আমাদের মনের ওপর দিয়ে । জনের বিগত জীবনটাকে টেনে;

নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তখনকার সেই পরিবর্ত্তনের বিপুলতা কি আমাদের মনে রাতারাতি বার্দ্ধক্য নিয়ে আসে না? মনে হয় নাকি যেন এই বিশ্ব জগৎ নিতান্ত প্রাচীন জীর্ণ হয়ে গেছে!

যে-বস্তু আমাদের যতখানি কামনার, সেই বস্তুর পরিবর্ত্তনের দিকটা আমাদের তত কম চোখে পড়ে। একখানি সুন্দর মুখ যখন মনকে মুগ্ধ করে তখন তার কোনো পরিবর্ত্তনের দিকে যেন চোখ যেতেই চায় না; তাই বহুক্ষণ দেখেও কবির মনে এই দুঃখই জাগে 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। তখন লক্ষ যুগের সঙ্গ:কও নিমেষ মাত্রই মনে হয়। কিন্তু যাকে চাই না, এক নিমেষে সে আমাদের দৃষ্টিকে ক্লান্ত ক'রে তোলে, মনে হয় যেন ওর মধ্যে দেখবার কিছুই নেই, এক নিমেষেই যেন লক্ষ যুগের দেখা হয়ে গেছে। মনস্তত্ত্বের বইতে দেখেছি পণ্ডিতেরা বলেচেন যে পরিবর্ত্তনই ভালো-লাগাটাকে বজায় রাখে, আর অপরিবর্ত্তনই বস্তুকে বিস্বাদ করে তোলে। কিন্তু আমি দেখছি পরিবর্ত্তনই বস্তুকে প্রাচীন করে তোলে। দীর্ঘ কালের মলিনতা দিয়ে তাকে শ্রীহীন ক'রে তোলে, আর পরিবর্ত্তনহীনতাই বস্তুকে একটি নিমেষের মধ্যে পরিপূর্ণ ক'রে রাখে, কালের স্পর্শ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে!

কিন্তু মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতেরা যে কথাটি বলেচেন সেই কথাটি মিথ্যা নয়, শুধু তাঁরা কথাটা বলতে গিয়ে বোধ করি একটু অন্য রকম ক'রে ফেলেচেন। আসল কথা হচ্চে পরিবর্ত্তন যেখানে নেই সেখানেই পরিবর্ত্তনের বোধ জাগে আর যেখানে পরিবর্ত্তন হয়ে চলেচে সেখানেই বোধ করি পরিবর্ত্তনের বোধ আমাদের থাকে না। এই আপাতঃ বিরোধী কথাটাকে শুধু কথার কারসাজি বলে মনে করলে ভুল করা হবে। একটু চিন্তা করলেই কথাটা যে সত্য তা বোঝা যাবে।

ভালো-লাগা আর ভালো-না-লাগার কথাটা একটু ভেবে দেখতে বলি। পূর্ব্বে বলেচি ভালো-লাগা না-লাগার মূলে কামনা চাই। এই কামনার সঙ্গে যার বিরোধ রয়েচে তা যেমন ভালো লাগতে পারে না, তেমনি কামনার সঙ্গে যার বিরোধ নেই তারও তেমনি ভালো-না-লাগার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু কামনার সঙ্গে কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির বিরোধই বা ঘটে কখন আর মিলনই বা ঘটে কখন?

এখানে চলন্ত রেলগাড়ীর কথাটা ভেবে দেখা যাক্। মনে করা যাক আমি হচ্চি চলন্ত রেলগাড়ী আর তার দুপাশের বাতায়ন হচ্চে আমার চোখ। যা কিছু আমারি সমান বেগে আমারি দিকে চলছে না সেই সবই কি আমার বিপরীত দিকে ছুটে চলছে না? যে শুধু আমারি বেগে চলবে সেই শুধু আমার দৃষ্টির সামনে স্থির হয়ে থাকতে পারে, আর যা কিছু স্থির হয়ে গাছগুলোর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, যা কিছু মন্দ গতিতে আমার পেছনে পেছনে আসবে সেই সবই কি আমার দৃষ্টিতে চঞ্চলের মত সরে যাবে না?

পরিবর্ত্তনের কথা আলোচনার সূত্রে তাই আমাদের ওই সচল মনের কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। তাই মনের সচল কামনার সমুখে সেই বস্তুই অপরিবর্ত্তনীয় হয়ে থাকতে পারবে যা নিমেষে নিমেষে ওই মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে। তাই মনস্তাত্ত্বিক বলতে পারেন যে মানুষের ভালো লাগাকে বজায় রাখতে হ'লে বস্তুর মধ্যে পরিবর্ত্তন চাই অথবা বস্তুর নতুন নতুন দিকে দৃষ্টি পড়া চাই। যে বস্তুর মধ্যে কোনো পরিবর্ত্তনই হচ্চে না সেই বস্তু মনের গতির তুলনায় পিছিয়ে পড়চে অর্থাৎ পুরাণো হয়ে পড়চে।

এই বস্তু-জগতের কালের পরিমাপ হচ্চে এই জগতেরই কতকগুলি পরিবর্ত্তনের দ্বারা; তেমনি মনোলোকের কালের পরিমাপ হচ্চে সেখানকার কামনার পরিবর্ত্তনের দ্বারা। মানুষ এই দ্বিলোকের অধিবাসী, তাই কখনো সে এই লোকের কাল দিয়ে মনোলোকের কালের বিচার করে আবার কখনো মনোলোকের কাল দিয়ে এই লোকের কালের বিচার করতে বসে। স্বপ্নে, মানসিক কল্পনার চিন্তায় আমরা এই ঘটিকা-যন্ত্রের জগৎ ভুলে যাই এবং সেখানকার কালের গতিবেগ যদি দ্রুত হয়—যেমন আজকার এই বিনিদ্র রাত্রিবেলা—তা হ'লে আমরা ইহলোকের কালকে পেছনে ফেলে চলে যাই আর সেখানকার কালের গতি যদি মন্দ হয়ে যায়, কামনার গতির সঙ্গে সঙ্গে যদি কাম্য বস্তুও এগিয়ে চলতে থাকে তা হ'লে ইহলোকের কাল আমাদের মনোলোকের কালকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যায় যেমন সীতাকে পাওয়ার রাতে রামের মনে হয়েছিল।

সেকেলে গল্প

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

এক যে বামুন মুখ্যু ছিল, পণ্ডিত হ'ল। হাতে পাঁজি কাঁধে ছাতি, পায়ে পয়জার, দাঁতে চিবে। এ গাঁ থেকে ও গাঁ যাচ্চেন; স্বর্গের পঞ্চ কন্যা মর্ত্ত্যে নেমে' বত্ত কচ্চেন।

বল্লেন,—তোমরা কি কচ্চ?

না—বত্ত কচ্চি, কথা শুনচি।

এ কর্‌লে কি হয়?

নির্ধনের ধন হয়, অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, বন্দী থাকলে খালাশ হয়, তিন ঠাঁইয়ের মানুষ এক ঠাঁইয়ে হয়, দূরের সুসমাচার ঘরে আসে।

না—আমি কর্‌ব।

কর না কেন।

ফুলের ভাগ, ফলের ভাগ, নৈবিদ্যির ভাগ দিলেন। বত্ত কর্‌লেন, কথা শুন্‌লেন। স্বর্গ থেকে হাতি নেমে' শুঁড়ে কোরে মুড়ে তুলে নিয়ে রাজা কর্‌ল।

রাজা পান তামাক খেয়ে শুয়ে আছেন, রাণী পান গুয়ো খাচ্ছেন রাণী বল্লেন—রাজা সুখ সম্পত্তি কিসে হ'ল?

না—নীল কমল ঠাকুরের কথায় হ'ল

কহ কথা শুমি, বিপত্তি-কাহিনী।

না—আমি কেন শুন্‌বো, যার বিপদ হয়েছে সেই শুন্‌বে।

রাস্তা দিয়ে নীলকমল ঠাকুর যাচ্ছিলেন। তিনি বল্লেন আমার কথা স্মরণ কোরে শুন্‌লে না; যাতে বিপদ হয় তাই করব।

রাতের মধ্যে আঁত পড়ল, কাঁথ পড়ল, ঔরি চৌরি দক্ষিণ দুয়োরী ঘর পড়ল।

রাজা বল্লেন—চল পদ্মা বনে যাই।

রাণীর একটী ছেলে কোলে, একটী ছেলে পেটে। বনে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে রয়েচেন।

রাত্তিরে প্রসব-বেদনা হ'ল, ছেলে হ'ল।

রাজা বল্লেন,—এহেন পুত্তুর হ'ল, দই কিনে বিলোতে হয়, মাছ কিনে বিলোতে হয়, সন্দেশ কিনে বিলোতে হয়।

রাণী বল্লেন—

যখন যেমন তখন তেমন
কার বনে হয় কেমন।
থাক্ বাড়ী থাক ঘর,
রাজা একটু আগুন আন
পুইয়ে বাঁচি।

রাজা গেলেন আগুন আন্‌তে। কোন্ দেশের রাজা মরে গিয়ে সিংহাসন খালি পড়েচে। পাগলা হাতি এসে রাজাকে শুঁড়ে কোরে মুড়ে তুলে নিয়ে রাজা করল।

বড় ছেলেটীর কোলে ছোট ছেলেটীকে দিয়ে রাণী গেলেন ন্যাকড়া কাচ্‌তে।

ঘাটে হাজারমুনে সওদাগরি নৌকা এসে ঠেকেচে। রাণী ন্যাকড়া কাচ্‌চেন, তারই ঢেউ লেগে নৌকা দুল্‌চে।

সওদাগররা ভাবচে, সাত দিন সাত রাত নৌকো ঠেকেচে; কে সতী লক্ষ্মী! ঢেউ লেগে নৌকো দুল্‌চে!

বড় সদাগর বল্‌লে—মা আমাদের নৌকোয় একবার হাত দাও ত। হাত দিলেন—সোঁ সোঁ করে নৌকো চ'লে গেল।

তার মধ্যে একটা দুষ্টু সদাগর ছিল—সে বল্লে ঠাঁইয়ে অঠাঁইয়ে আবার যদি বিপদ আপদ হয়, চল্ মেয়েটিকে তুলে নিয়ে আসি। নৌকো ফিরিয়ে এনে রাণীকে তুলে নিয়ে গেল।

রাণী ভাবলেন, ওমা কেমন কোরে আমার ধর্ম্ম থাকবে; হে সূর্য্যদেব, দিবাকর, রাজ রাজেশ্বর—আমার রূপ যৌবন তুমি নাও, তোমার জরা কুষ্ঠ আমায় দাও।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রূপ যৌবন সব মিলিয়ে গেল, সারা শরীর কুষ্ঠে ভরা—মাছি ভন্ ভন্ করচে।

সদাগররা বলাবলি করতে লাগল—কি সতী লক্ষ্মী দেখচিস্—দেখতে দেখতে দেহ বদ্‌লে গেল।

রাণী স্বেচ্ছনি হয়ে এক পাশে পড়ে রইল।

এদিকে বনে রাত্তির হল, বাঘ ডাক্‌চে, ভালুক ডাক্‌চে—ছেলে দুটি মাগো, বাবাগো বলে কাঁদ্‌চে।

কোটাল চৌকি দিতে এসে ভাবচে—বার বচ্ছর চৌকি দিচ্চি—এ বনে ত কখন ছেলে কান্নার সাড়া পাই নি। হ্যারে তোরা কারা, বনে কাঁদ্‌চিস্‌?

না—আমরা রাজার ছেলে।

রাজার ছেলে বনে কেন?

না—কাছে এসো, বল্‌চি।

কোটাল কাছে এল—বড় ছেলেটী বল্‌তে লাগল—এক যে বামুন মুখ্যু ছিল, পণ্ডিত হ'ল। হাতে পাঁজি, কাঁধে ছাতি, পায়ে পয়জার, দাঁতে চিবে.........

*　　*　　*　　*

বাবা গেল আগুন আন্‌তে বাবা না ফিরে এল;
আমার কোলে ছোট ছেলেটি দিয়ে মা গেল
ন্যাকড়া কাচ্‌তে, মা না ফিরে এল।
মা গেল আনে, বাবা গেল বানে
আমরা দুটি ভাই রইলাম নানা স্থানে।
শোন কোটাল দুটি কানে।

কোটাল বল্‌লে, চ' আমি তোদের নিয়ে যাই। একটী ছেলে কাঁধে, একটী ছেলে কোলে, কোটাল বাড়ী ফিরে এল। বল্‌লে কোটালনী, তুই জন্ম-বাঁজা, এই ছেলে দুটি মানুষ কর।

না—কার ছেলে মানুষ করব, বড় হলেই কেড়ে নিয়ে যাবে।

কোটাল বল্‌লে—এদের মাও নেই, বাপও নেই; তবে রাজার ছেলে, জাত মারিস্‌নে।

গোয়ালা বাড়ী দুধ বল্‌লে, ময়রা বাড়ী সন্দেশ বল্‌লে, ছেলে দুটী মানুষ করতে লাগল।

এদিকে রাজবাড়ীর ঘাটে কতদিনে সদাগরি নৌকা এসে লাগল। কোটালকে ডেকে রাজা বললেন—ঘাটে চৌকি দিতে হবে, বনে চৌকি দিতে হবে, মাঠে চৌকি দিতে হবে, তিনি ঠাঁইয়ে চৌকি দিতে হবে—যদি চুরি হয় ত মাথা যাবে।

কোটাল ভাবতে ভাবতে এসে শুয়ে পড়ল—খায়ও নি, দায়ও নি। একা মানুষ, তিন ঠাঁইয়ে চৌকি, কালই মাথা যাবে।

ছেলে দুটি খেলাধুলো করে বিকেলবেলা এসে বল্লে, মা—বাবা কোথায়?

না—ঐ ঘরে শুয়ে আছেন,—খায়ওনি দায়ওনি।

কেন?

শুধোও না।

বাবা, কেন তুমি অমন কোরে শুয়ে আছ?

না—তোদের বোলে কি হবে? তোরা ছেলে মানুষ।

কেন হবে না! আমাদের এত কোরে মানুষ কর্‌লে; বলই না।

রাজার ঘাটে সদাগরি নৌকা লেগেছে। হুকুম হ'য়েচে, ঘাটে চৌকি দিতে হবে, বনে চৌকি দিতে হবে, মাঠে চৌকি দিতে হবে। তিন ঠাঁইয়ে চৌকি দিতে হবে; যদি চুরি হয় ত মাথা যাবে। একা মানুষ, তিন ঠাঁইয়ে চৌকি। কালই সকালে মাথা যাবে—তাই শুয়ে আছি।

না—তার আর ভাবনা কি! আমরা দু ভাইএ ঘাটে চৌকি দেবো।

তোরা ছেলে মানুষ পার্‌বি কি?

কেন পারব না? খুব পারব।

সন্ধ্যে হতেই ছেলে দুটি খেয়েদেয়ে নাচতে নাচতে নৌকোর কাছে গেল। বড়টি তুরুক্‌ কোরে নৌকোয় উঠ্‌ল। ছোটটি উঠ্‌তে না পেরে 'বাবাগো মাগো' বোলে কাঁদতে লাগল।

আবাগে ভাই, কখনো বাপের মুখ দেখিচিস, না মায়ের মুখ দেখিচিস্‌! দাদা বোলে কাঁদ্‌—যে হাত ধোরে তুলে নিই।

দাদা বোলে কাঁদলো, হাত ধোরে তুলে নিল। নৌকোয় উঠে ছোট ছেলেটি বলচে—

দাদা, মাঝিরা কেমন ঘি মশলা দিয়ে রাঁধ্‌চে, আমার বড় খেতে ইচ্ছে কর্‌চে।

ছি ভাই আমাদের কি ও খেতে আছে? যদি কখনো নীলকমল ঠাকুর বাপের দেখা পাই, পদ্মাবতী মার দেখা পাই,—বাবা আনবেন, মা রন্ধন করবেন, আমরা দুটি ভাই ভোজন করব।

স্বেহুনি প'ড়ে প'ড়ে ভাব্‌চে—ওমা, এরা কাদের ছেলে?

রাত বেশী হ'ল। ছোট ভাইটি বলচে—দাদা আমার বড় ঘুম পাচ্চে—একটা রূপকথা বলনা।

রূপ কথা ত জানিনে ভাই, মা বাপের কথা জানি তাই বলি?

তা বল।

বড়টি বল্‌চে—

এক যে বামুন মুখ্যু ছিল ;—পণ্ডিত হ'ল, হাতে পাঁজি, কাঁধে ছাতি, পায়ে পয়জার, দাঁতে চিবে। এ গাঁ থেকে ও গাঁ যাচ্চেন, ...

* + * *

মা গেল আনে, বাপ গেল বানে

শোন ভাইটি দুটি কানে।

ভোর হ'তেই ছেলে দুটি তুরুক্ তুরুক্ কোরে নেমে বাড়ী চ'লে গেল।

স্বেদুনি ভাবচে—ওমা, এরা ত আমারই ছেলে! রোদ উঠল, বেলা হল। মাঝিরা বল্‌চে—এই স্বেদুনি, ওঠ্, মুখ ধো!

স্বেদুনি বললে—আমি আজ উঠবোও না, মুখও ধোব না, খাবও না।

কেন?

না—কোটাল কোত্থেকে দুটো ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারা আমায় বড় ঠাট্টা কোরে গিয়েচে। রাজা যদি এর বিচার করেন তবেই উঠব খাব, নইলে উঠবোও না খাবোও না।

রাজার কাছে খবর গেল—স্বেদুনি উঠবেও না, খাবেও না। কোটালের ছেলে দুটো তাকে ঠাট্টা কোরে গিয়েছে—রাজার বিচার কোর্ত্তে হবে। কোটালের তলব হ'ল,—বিচার হবে।

কোটাল কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে বললে—হ্যাঁরে তোরা স্বেদুনিকে কি ঠাট্টা কোরে এসেচিস,—এইবার সগোষ্ঠির মাথা যাবে।

না—আমরা ত ঠাট্টা করিনি; আমাদের দুঃখের কথা, মা বাপের কথা বলিচি। চল—রাজা মশাইয়ের কাছে গিয়ে বলব।

রাজা বসলেন, মন্ত্রী বসলেন। কোটাল এল, কোটালনী এল, ছেলে দুটি এল, স্বেদুনি এল। বিচার হবে।

রাজা বল্লেন—হ্যাঁরে, তোরা স্বেদুনিকে কি ঠাট্টা কোরে এসেচিস্?

আমরা ত ঠাট্টা করিনি, ছোট ভাইটির ঘুম পাচ্ছিল, তাই বললে—দাদা একটা রূপকথা বল। আমি বল্লাম—রূপকথা ত জানিনে ভাই। মা বাবার কথা জানি, তাই বলি। আমরা তাই বলিছিলাম।

কি বলিছিলি?

এক যে বামুন মুখ্যু ছিল। পণ্ডিত হ'ল। হাতে পাঁজি, কাঁধে ছাতি, পায়ে পয়জার, দাঁতে চিবে।

* * * *

মা গেল আনে, বাবা গেল বানে,

আমরা দুটি ভাই রইলাম নানা স্থানে,

শোন রাজামশাই, দুটি কানে।

রাজা বল্লেন—হ্যাঁ স্বেদুনি, এরা এমন দুঃখের কথা বলেচে—ঠাট্টা কি করল?

স্বেদুনি বল্‌লে—ঠাট্টা ত করেনি, ওরা আমার ছেলে।

তোর ছেলে কি করে হ'ল, কোটালনীর ছেলে।

তখন স্বেদুনি বলে—আমার ছেলে; কোটালনী বলে আমার ছেলে।—কোঁদল বেধে গেল।

রাজা বললেন—তোরা ঝগড়া করিসনে, আমি বিচার কর্‌চি।

ছেলে দুটির মুখে সাতপুরু কাপড় জড়িয়ে, স্বেদুনি আর কোটালনীকে সাত হাত দূরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। রাজা বললেন, যার মাইএর দুধ ছেলের মুখে যাবে—তারই ছেলে।

কোটালনী মাই টিপল;—জয় রাজা, কাট-মাই, এক ফোঁটাও দুধ বেরুল না।

স্বেদুনি মাই টিপল;—বত্রিশ ধারে দুধ গিয়ে কাপড় ভিজে, পেট ভ'রে, বুক বেয়ে দুধ পড়তে লাগল।

রাজা বললেন—স্বেদুনিরই ছেলে, কোটালনীর মানুষ করা ছেলে।

স্বেদুনি বললে—তুমি আমার রাজা; আমি তোমার রাণী।

রাজা হেসে বললেন—তোর ঐ রূপ, ঐ চেহারা, তুই আমার রাণী!

না—যদি বদলাতে পারি?

তা হ'লে হ'তে পারে।

স্বেদুনি তখন বললে—সূর্য্যদেব, দিবাকর, রাজরাজেশ্বর তোমার জরা কুষ্ঠ তুমি নাও, আমার রূপ যৌবন ফিরিয়ে দাও।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে জরাকুষ্ঠ চ'লে গেল—রাণীর রূপ যৌবন ফিরে এল।

রাজা চম্‌কে পদ্মাবতীকে চিনতে পারলেন; রাজা রাণী দুই ছেলে—তিন ঠাঁইয়ের মানুষ এক ঠাঁই হইল।

আমার কথাটি ফুরুল।

মাঝি

[শ্রীবসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী]

মাঝিরে ভাই, আইজ তুমি নাও কইরনা নোঙর,
ঝড় তুফানে জোয়ার টানে ফির‍্যা যাইয়না ঘর !
আছিকালের বর্ষাকালে ভাসাইলা যে নাও,
আইজ তবে আর কেনে ঘরে ফির‍্যা যাবার চাও ?
মাঝদইরায় নাও ভাসায়্যা ঘুইরা দেশে দেশে
ভাবচ বুঝি, এবার ঘরে ফিরবা অবশেষে !
করছ আশা দেখ্‌বা বাতি বাড়ীর ঘাটের পর
অনেক দিনের পরে যখন যাইবা ফির‍্যা ঘর !

তুমিত ভাই জাননা, সেই ঘর যে তোমার নাই,
বৈশাখ মাসে আগুন লাইগ্যা পুইড়্যা হৈল ছাই !
ঘরের মানুষ কোথায় গেল, বলতে কেবা পারে—
তুমি কি ভাই দেশে দেশে ফিরবা খুঁইজ্যা তারে ?
গাঁয়ের লোকে বলাবলি করছে যে সে নাকি
দূর দেশে কোন্ চইলা গ্যাছে তোমায় দিয়া ফাঁকী !
তুমি যে আইজ যাইবা সেথা, দেখবা শূন্য ঘর
কেমনে সে সইবা ফির‍্যা এত দিনের পর ?

তাইত বলি' অহনে সেথা যাইবার কাজ নাই
নাও ভাসায়্যা দেশে দেশে চল আবার যাই !
হাটের ঘাটে নাও লাগায়্যা জিগাইয়ো সবারে'
চোখ দুইটা যার কালোবরণ, দেখছ কি কেউ তারে ?
শোন্‌ছ কি কেউ কারো গলায় এমন কোনো গান,
যাতে দূরের নদীর নায়ের পালে লাগ্‌ল টান ?
শেষ বেলা কোন্ ঘাটে তুমি দেখবা হয়ত চায়্যা
জল ভরিতে আইস্যাছে সে—ওরে আমার নায়্যা,
চিনবেনা সে তোমারে, জল ভইরা ফিরব ঘর
ভাস্‌বা তুমি, ভাস্‌ব আমি, আবার জলের পর !

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১০

বাস্‌-এ উঠিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না : সামনের জায়গাটাতে পিছন ফিরিয়া উমা বসিয়া আছে। নিশ্চয়ই উমা। তাই বলিয়া এক-বাস্‌ লোকের সাম্‌নে হঠাৎ তাহাকে সম্ভাষণ করিলে সেটা বাঙলা-সমাজের রুচিতে হয়তো বাধিবে। উমা কোথায় নামে সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য প্রদীপ তাহার গন্তব্য স্থানের সীমাটুকু পার হইয়া চলিল। কেন না উমাকেও হঠাৎ চম্‌কাইয়া দিতে হইবে।

বাস্‌ একটা গলির মোড়ে আসিয়া থামিল। উমা এত উদাসীন যে নামিবার সময়ও প্রদীপকে একবার লক্ষ্য করিল না, কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই টের পাইল পেছন হইতে কে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে। ভয়ে চোখ মুখ পাংশু হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল :

—আপনি এখানে? বা রে! আর আমি আপনাকে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রদীপ ততক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার আঁচল ছাড়িয়া দিয়াছে। ফুটপাতের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছ কি রকম? তুমি পুলিশের গুপ্তচর নাকি? এখানে এলে কবে?

উমা কহিল,—বাঃ, এখানে এসেছি আজ ঠিক সাত দিন হ'ল। বাবা-মাও এসেছেন। বাবা দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন যে। আমি যে বেথুন ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলাম।

প্রদীপ উমারই বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিল : বাঃ, এত খবর—আমি ত' কিছুই জানতে পাইনি।

—কি করে' পারেন? আমাদের খবর পাবার জন্যে ত, আপনার আর মাথা ধরে নি! ল্যাঙ্কাশায়ারে ক'টা কাপড়ের মিল্‌ বন্ধ হ'ল এ-সব বড় বড় খবর রাখ্‌তেই আপনাদের সময় যায় ফুরিয়ে, না? আমরা বাঁচলাম কি মরলাম—তাতে আপনার বয়ে' গেল!

উমার কথার সুরে স্নিগ্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িল। সে যে মনে মনে কখন্‌ এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে প্রদীপ তাহা ভাবিয়া পাইল না। কণ্ঠস্বর কোমলতর করিয়া কহিল,—আমি যে এখানে ছিলাম না বহুদিন। গিয়েছিলাম বহুদূরে—পাঞ্জাবে। জরুরি কাজ ছিল।

একটি অস্ফুট ভ্রূভঙ্গি করিয়া উমা কহিল,—সবই ত' আপনার জরুরি কাজ। কিন্তু যাবার আগে আমাদের আপনাদের ঠিকানাটা লিখে পাঠালে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের ট্রেন মিস্‌ করতেন না। তা' আমাদের সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক কি বলুন। দাদার সঙ্গে সব ছাই হ'য়ে গেছে।

রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই সব কথার কি উত্তর দিবে প্রদীপের ভাষায় কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না। এই মেয়েটির কথায় তাহার চিত্ত যেন ভরিয়া উঠিল। এই পৃথিবীর পারে কেহ তাহার জন্য একটি সশঙ্ক স্নেহ নিভৃতে লালন করিতেছে ভাবিতে তাহার মন ভিজিয়া গেল। বলিল,—আমার ঠিকানার হঠাৎ এত দরকার হল!

—না, দরকার আর কি! অজানা মানুষ, কল্‌কাতায় এলাম—তেমন কোনো বন্ধু আত্মীয়ও আর নেই যে দু-চারটে উপদেশ দেবে। দাদা থাকলে বরং—

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই উমা প্রদীপের মুখের দিকে তাকাইল এবং চোখোচোখি হইতেই সে ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই স্বল্প সঙ্কেতময় হাসিটিতে প্রদীপের মর্ম্মবেদনা নিমেষে মুছিয়া দিয়া উমা কহিল,—দাদার পুরোনো ডায়রিতে আপনার মেস্‌-এর একটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। সেখানে বার তিনেক লোক পাঠিয়েছি; প্রথম বার বল্লে, বাবু ঘুমুচ্ছেন; দ্বিতীয় বার বল্লে, বাবু বাড়ী নেই; তৃতীয় বার বল্লে, ও বাড়ীর কেউ বাবুকে চেনেই না। বলিয়া উমা একটু নুইয়া পড়িয়া খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল,—চতুর্থ বার লোক পাঠালে খবর পেতে বাবু মাথা স্তাড়া করে' বেলতলায় গেছেন হাওয়া খেতে।

উমা গম্ভীর হইয়া বলিল,—কথা একটা বল্‌লেই হ'ল নাকি? কি কথাটার মানে?

—ভেবেছিলাম মানেটা বুঝ্‌তে না চেয়েই তুমি হাসবে! মানে একটা কিছু আছে বৈ কি। ন্যাড়া যে বেলতলায় দু'বার যায় না, তা ত' জানই; কিন্তু আমরা এমন হতচ্ছাড়া, সর্ব্বস্ব খুইয়ে ন্যাড়া হ'য়েও বারে বারেই সেই উদ্যত বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা দেশের কাজ করি কি না! কিন্তু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা না দিলেও চলবে। তোমাদের বাড়িটা কোথায়?

আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া উমা কহিল,—ঐ গলিতে। বিয়াল্লিশ নম্বর। যাবেন? গরিবদের ঘরে পায়ের ধুলো দিতে বাধা নেই ত'?

—তুমি কী যে বল, উমা! বলিয়া প্রদীপ উমার হাত ধরিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গলিতে পা দিতেই প্রদীপের কেন জানি মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কণ্টকসঙ্কুল রুক্ষ পথ-প্রান্তে কেহ তাহার জন্য একটি আশ্রয়-নীড় নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া বিধাতাকে তাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল বোধ হয়। আকাশ-বিস্তীর্ণ মহা শূন্যতায় তাহার উড্ডীন দুই পাখা আবার ক্ষণতরে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পেছন হইতে কোনো গুপ্তচর তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে না ত'?

এই মেয়েটি তাহার ছোট দুইটি করতলে এ কী সান্ত্বনা লইয়া আসিয়াছে! নয়, নয়—তাহার জন্য স্নেহ নয়, সেবা নয়—সুধার আস্বাদ সে এই জীবনে নাই বা লাভ করিল? তবু একবার সে এই তিমিরময়ী রাত্রির পার খুঁজিবে—এই নিরানন্দ পথরেখা কোথায় আসিয়া আবার সুখস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার সন্ধান না লইলে চলিবে কেন?

বত্রিশ, তেত্রিশ—বাড়িটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে আর কি! উমার ডাকে সে আরেকটি দুঃখিনী নারীর অনুচ্চারিত অনুনয় শুনিয়া থাকিবে হয় ত। আরেকটু অগ্রসর হইলেই নমিতার দেখা পাইবে ভাবিতেই প্রদীপের মন বাজিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য, এত দিন নমিতার কথা তাহার একটুও মনে হয় নাই। সে এত দিন এত সব ভয়ঙ্কর সমস্যায় জর্জ্জরিত হইয়া ছিল যে, তাহার কাছে কোনো ব্যক্তি বিশেষের সামান্য দুঃখ দুর্দ্দশা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের চেয়েও হীন ছিল। কিন্তু এখন নিবিষ্ট মনে নমিতার নিরাভরণ ব্যথা-মলিন মূর্ত্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার ধ্যানের ভারতবর্ষ ত' এমনিই। এমনিই বিগতগৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব। শুধু অতীতের একটি ক্ষীণায়মান স্মৃতির সুধা সেচন করিয়া নিজের বর্ত্তমান বিকৃত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। নমিতার মত তাহারো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এমনি মূক, এমনি প্রতিবাদহীন।

বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল, কিন্তু নমিতার বিষয়ে উমাকে একটা প্রশ্নও করা হইল না। সে কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে না জানি। প্রশ্ন করা হইল না বটে, কিন্তু উমার পদানুসরণ করিয়া উপরে আসিয়াই তাহার চক্ষু সন্ধিৎসু হইয়া উঠিল। একটা তক্তপোষের উপর বসিয়া অরুণা একটি যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন; প্রদীপ আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি পা দুইটাকে একটু সরাইয়া লইলেন মাত্র, কুশল জিজ্ঞাসা বা আনন্দ জ্ঞাপনের সাধারণ সাংসারিক রীতিটুকু পর্য্যন্ত পালন করিলেন না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহার বিসদৃশতাটা প্রথমে প্রদীপের চোখে পড়িল না; সে আপনার খুসিতে বলিয়া চলিল: দেখা আবার হ'তেই হবে। হয় ত' এতক্ষণে কোনো অছিলায় হাজতে গিয়ে পচ্‌তে হ'ত, কিন্তু দিব্যি উমার সঙ্গে মা'র কাছে চলে' এলাম। আমাকে আর পায় কে?

এই কথাগুলির সস্নেহ প্রতিধ্বনি মিলিল না। অরুণা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া কহিলেন, তুমি ভলান্টিয়ারি করে' জেল খেটেছিলে বুঝি?

প্রদীপ হাসিয়া কহিল, সামান্য। মোটে এক মাস।

উমা বলিল, তৃপ্তি হয় নি বুঝি?

প্রদীপ কি যেন বলিতে যাইতেছিল, অরুণা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, তবে তোমার এ বাড়ীতে আসাটা আর সঙ্গত হবে না। উনি নিশ্চয়ই বরদাস্ত করতে পারবেন না।

উমা প্রখর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কারণ?

মেয়ের মুখের এই প্রশ্ন শুনিবার জন্য অরুণা প্রস্তুত ছিলেন না। উমাই যে প্রদীপকে ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং তাহাকে হঠাৎ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলাটা যে

উমার পক্ষেই অপমানকর তাহা অরুণাকে তখন কে বুঝাইয়া দিবে? তাই তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, কারণ আবার কি? তিনি এদের মত রাজদ্রোহিতা করবার জন্যে মাসে মাসে মাইনে পান্ না। সত্যি প্রদীপ, তুমি না এলেই উনি খুসি হবেন।

প্রদীপ বিস্ময়ে মূক, পাথর হইয়া গেল। খালি সন্দেহ হইতে লাগিল অরুণার কারণটাই যেন সব নয়—কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে। নতুবা অরুণার এই অপ্রীতিকর আচরণের জন্যই সে আশা করিয়া আসে নাই। মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা কি হইয়া গেল সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হইতে পারে সে যেমন করিয়া তাহার দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতেছে তাহা অবনী বাবু ও তাঁহার প্রভুদের মনঃপূত নয়, কিন্তু তাঁহাদের হইয়া হঠাৎ অরুণা তাহাকে প্রথম দর্শনেই একেবারে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবেন তাহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? আরো কতক্ষণ থাকিয়া সহজ আলাপের স্ফূর্ত্তিতে এই অপমানকে অন্যায় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া আবার আগেকার দিনের মত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিবে, না, এখুনিই রাস্তায় নামিয়া বন্দেমাতরম্ হাঁকিয়া বসিবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে সে একবার উমার মুখের পানে তাকাইল। সে মুখ কালো, লজ্জায় বিধুর। কোথায় যে একটা কদর্য্যতা রহিয়াছে প্রদীপ ধরিতে পারিল না। তবু কহিল, কোথাও ব'সে থাকবার সময় আমাদের এমনিই কম, তবু চেনা লোকের মুখ দেখতে পেলে তাদের পাশে একটুখানি না জিরিয়ে পারি না, মা। আমরাও না। একজনকে ত' চিরদিনের জন্যেই হারিয়েছি, কিন্তু নমিতাকে দেখতে পাচ্ছিনে ত'। তাকে একবার ডাকবে, উমা?

অরুণার দৃষ্টি কুটিল হইয়া উঠিল; কথা শুনিয়া তিনি এমন সবেগে সরিয়া বসিলেন যে যেন শারীরিক গ্লানি বোধ করিতেছেন। দৃশ্যটা উমা ও প্রদীপ দুই জনেরই চোখে পড়িল। কিন্তু এই আচরণের একটা বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা বাহির করিবার আগেই অরুণা কহিলেন, তার খোঁজে দরকার কি? সে বাপের বাড়ি আছে।

কটু কণ্ঠস্বরে প্রদীপ সামান্য বিচলিত হইল। তবু সহজ স্বরে স্মিতমুখে কহিল, ভালই হ'ল। তার বাপের বাড়ি শুনেছিলাম কলকাতায়ই। ঠিকানাটা ভুলে গেছি। ঠিকানাটা বলুন না, একবার দেখা করে' রাখি। কখন আবার জেলে যাই ঠিক নেই।

প্রদীপের এতটা অবিনয় অরুণার সহ্য হইল না। তিনি এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, তার ঠিকানা নিয়ে তোমার কি এমন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘট্‌বে শুনি?

—আমার না ঘট্‌লে দেশের কিছুটা ঘট্‌তে পারে হয় ত'। নমিতার হাতে এখন আর কী কাজ থাকতে পারে? জীবনে তার যা পরম ক্ষতি ঘটেছে তাকে দেশের সেবায় পুষিয়ে নিতে না পারলে নিজের কাছে লজ্জার যে তার সীমা থাকবে না।

—তুমি যে চমৎকার বক্তা হয়েছ দেখছি। নমিতার কি করা উচিত না উচিত তার জন্যে তার অভিভাবক আছে। তোমার মাথা না ঘামালে কোনো ক্ষতি নেই।

প্রদীপ তবু হাসিল বটে, কিন্তু গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল: শাস্ত্রবিহিত অভিভাবকের চেয়ে নিজের বিবেকের শাসনই প্রবল হ'য়ে ওঠে, মা। বিংশশতাব্দীর ধর্ম্মই এই। নমিতার কি করা উচিত না উচিত সে-পরামর্শ তার সঙ্গেই করা ভালো।

অরুণার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল; কহিলেন, তুমি বল্‌তে চাও স্বামীর ধ্যান ছেড়ে তোমাদের এই তুচ্ছ দেশ সেবায় তাকে তুমি প্ররোচিত করবে?

—আমার সাধ্য কি মা? নিজে না জাগলে কেউ কাউকে ঠেলে জাগাতে পারে না। যদি নমিতা একদিন বোঝে তার এই স্বামী-ধ্যানটাই তুচ্ছ, তা হ'লে সেটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যসূচনা। কেন না দেশের সেবায়ই সে বেশি মর্য্যাদা পাবে। মরা লোককে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে আমরা আমাদের মনগুলিকে মিউজিয়মে রূপান্তরিত করি নি। যাক্, ঠিকানাটা দিন্, সত্যিই আমারো বেশি সময় নেই।

অরুণা কহিলেন, তোমাকে তার ঠিকানা দিতে পারলাম না।

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল, কারণটা জানতে পারি?

—নিশ্চয়। কারণ, আমরা চাই না বাইরের লোক এসে আমাদের ঘরের বউর সঙ্গে বাজে আলাপ করে।

সমস্ত কুয়াসা এতক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের নিশ্বাস হাল্‌কা হইয়া আসিল। যেন সে একটা গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। একটু হাসিয়া কহিল, আপনার বিধান আমি মেনে নিলাম, মা। ঠিকানা আমি তার চাইনে। যদি সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হয়ে ওঠে তবে একদিন তার দেখা পাবই—এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাবতাম, নমিতা আমার বন্ধুর স্ত্রী—তার প্রতি আমারো দায়িত্ব আছে। এখন সে-সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিলেন বলে' ভালোই হ'ল। এখন যদি নমিতার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, সে আর আমার বন্ধুর স্ত্রী নয়, মা, খালি বন্ধু। চাইনে ঠিকানা। বলিয়া প্রদীপ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে উমার ব্যগ্র কলকণ্ঠ শোনা গেল: দাঁড়ান, দাঁড়ান্ দীপদা। বউদির ঠিকানা নাই বা পেলেন, নিজের ঠিকানা না দিয়ে পালাচ্ছেন যে।

১১

দরজার গোড়ায় প্রদীপকে উমা ধরিয়া ফেলিল। কহিল, আপনার সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা আমার একান্ত আন্তরিক ছিল বলে'ই ত' আজ বাস্-এ আমাদের দেখা হ'য়ে গেল। কিন্তু সেই দেখা অসম্পূর্ণ রাখতে হবে এমন দুর্ঘটনা অবশ্যি এখনো ঘটেনি।

প্রদীপ আশ্চর্য্য হইয়া উমার মুখের পানে তাকাইল। দুইটি উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বুদ্ধিতে দীপ্তি পাইতেছে, ছোট সঙ্কীর্ণ ললাটটিতে প্রতিভার স্থির একটি আভা বিরাজমান। কৃষ দেহটি ঘিরিয়া আসন্ন যৌবনের যে একটি লালিত্য লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহা মুহূর্ত্তের জন্য প্রদীপের ক্লান্ত মন ও চক্ষু আবিষ্ট করিয়া তুলিল। উমার এই ছুটিয়া ডাকিতে আসাটির মধ্যে কোথায় যে একটি সযত্নসমৃদ্ধ সুস্নিগ্ধ স্নেহের স্বাদ আছে তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া এই মেয়েটির প্রতি প্রদীপের মায়ার আর শেষ রহিল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া লইবার জন্য প্রদীপ এক পলক অপলক চোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমা কহিল,—এখুনি পালাতে চাইলেই আমি ছাড়্‌ব আর কি। আপনার সঙ্গে আমার কত যে কথা আছে তা এতদিন ভেবে ভেবে আমি শেষ করতে পারিনি। দাঁড়ান্, সব আমাকে ভেবে নিতে দিন্।

প্রদীপ ম্লান হাসিয়া কহিল, সময় নেই, উমা। তা ছাড়া আমার সঙ্গে মিশ্‌তে দেখলে মা খুসি হবেন না।

উমা নির্ভীক কণ্ঠে কহিল, আপাতত নিজে খুসি হলেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে' যাবে'খন। বেশ ত এ বাড়িতে ডেকে এনে আপনাকে যদি অপমানিত করে' থাকি, দাঁড়ান্, আমি আপনার মেস্-এ যাবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রকাণ্ড ইতিহাস শেষ করা যাবে না।

—তুমি পাগলের মতো কী বক্‌তে সুরু করলে!

—বক্‌লেই পাগল হয় না এবং ঢের পাগল আছে যারা মোটেই বকে না। আমি বক্‌ছিও না, পাগলও হইনি। দেখবার-ইচ্ছাটা আন্তরিক হ'লে দৈবাৎ এক আধবার মাত্র দেখা হ'তে পারে, কিন্তু দেখাটা যখন আবশ্যকীয় হয় তখন ইচ্ছাটা খালি আন্তরিক হ'লেই চলে না, দস্তুরমত ঠিকানা জানা দরকার। আপনার ঠিকানা যদি না দেন তবে বল্‌ব মার থেকে বৌদির ঠিকানা না পেয়ে আপনি ছোট ছেলের মত অভিমান করেছেন। পুরুষ মানুষের রাগ আমি সইতে পারি, কিন্তু ছিঁচকাঁদুনের মত অভিমান আপনাদের মানায় না কক্ষনো।

প্রদীপ আবার ভালো করিয়া উমাকে না দেখিয়া পারিল না। উহার সাদাসিধে শাড়িখানা যেন নিমেষে তাহার অজস্র স্নেহে মাখিয়া উঠিল, উহার দুই চোখে যেন অদেখা আকাশের ছায়া পড়িয়াছে! কিন্তু নারীর রূপকে সে ধ্যানী বা কবির চোখেই দেখিতে শিখিয়াছে, তাই এই দৃপ্তা সাহসিকাকে ভারতোদ্ধারবাহিনীর অগ্রবর্ত্তিনী করা যায় কি না তাহাই ভাবিয়া তাহার আশা ও আনন্দ একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। কহিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ভবিষ্যৎ বলে' আমার যেমন কিছু নেই, তেমন আমার ঠিকানাও আমি নিজেই খুঁজে পাই না। স্থায়িত্ব জিনিষটা আমার ধাতে সয় না। আশা আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, স্নেহ জীবন মরণ সব কিছু স্বল্পায়ু

বলে'ই আমরা কাজ করতে এত বল পাই এবং তাড়াতাড়ি করে' ফেলবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

উমার দুইটি চোখের কোলে তরল হাসি টল্‌টল্ করিয়া উঠিল। কহিল, আমি দার্শনিকতা বুঝি না। সোজা স্পষ্ট কথা বলতে পারলে বেঁচে যাই। অবশ্যি আপনার দেশসেবায় আমি ব্রতধারিণী হ'তে পার্‌বো না, সে আমার বোকা মুখ ও বেচারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু দেশসেবা ছাড়া জীবনে আর বড়ো কাজ নেই এ-কথা আপনি বুদ্ধিমান হ'লে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না। তেমন কোনো কাজে আপনাকে দরকার হ'লে কোথায় আমি কড়া নাড়ব?

প্রদীপ কহিল, তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলে আমিই বেশি খুসি হতাম, উমা, কেননা কড়া-নাড়ার প্রতীক্ষা করে' বসে' থাক্‌তে আমার হয় ত' ভালই লাগ্‌ত। কিন্তু আজ এখানে আছি, কালকেই হয় ত' লাহোর, দু'দিন পরেই কে জানে ফের রেঙ্গুন পাড়ি মারতে হ'বে। এক জায়গায় চুপ করে' বসে' থাকলে খালি মনে হয় বৃথা আয়ুক্ষয় করছি। অন্তত চল্‌ছি—এটুকু চেতনা না থাক্‌লে মরতে আর আমার বাকি থাকে না।

—হেঁয়ালি রাখুন দিকি—বড়ো বড়ো কথা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবেন। ঠিকানা না থাকে, এমন একটা জায়গার নাম করুন যেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে দু দণ্ড আপনার সঙ্গে বসে' কথা কইলে সমাজ বা আইনের চোখে দণ্ডনীয় হবো না। মা বোধ হয় আসছেন নেমে, বলুন শিগ্‌গির করে'।

প্রদীপ ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, ১৬ নং শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইন্। ওটা একটা মেস্। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, চিঠি লিখো, কেমন?

উমা হাসিয়া কহিল, কলমের চেয়ে পা চালাতে আমি বেশী ভালোবাসি। কিন্তু বৌদিদির ঠিকানা আপনি সত্যিই চান্? তার সঙ্গে দেখা করবেন?

কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া প্রদীপ নিদারুণ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল অরুণা সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়াছেন। চলিয়া যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, দরকার নেই। ঠিকানা নিয়ে সে-বাড়ীতে গেলেও যে ফিরে যেতে হবে না তার ভরসা কি! তবে নমিতার ইচ্ছা যদি কোনোদিন সত্যিই আন্তরিক হয়ে উঠে, আকাশের কোটি গৃহ-নক্ষত্র ষড়যন্ত্র কর্‌লেও আমাদের দেখা হওয়াকে কিছুতেই খণ্ডাতে পার্‌বে না কেউ। বলিয়া বাহিরের জনাকীর্ণ রাজপথে প্রদীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হইয়া উমা উপরে উঠিয়া আসিল। মা-ও পুনরায় ঘরে আসিলেন। তারপরে এমন একটা তুমুল গোলমাল সুরু হইল যাহাতে শচীপ্রসাদ প্রদীপের প্রতি যতই কেন না অপ্রসন্ন থাক্, সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। তক্তপোষের এক ধারে শচীপ্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এখন তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া মেয়ের এই নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে অরুণা বিচার-প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। শচীপ্রসাদ সম্প্রতি পরো'ক্ষে উমার উমেদারি করিতেছিল বলিয়া তাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে তাহার মন উঠিতেছিল না, তাই তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল প্রদীপের উপর। খুব জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া শচীপ্রসাদ বলিল, ও-সব undesirableদের বাড়ীতে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়। সুধী যদি বেঁচে থাকত তার বন্ধুতার একটা মানে ছিল, কিন্তু এখন তার পক্ষে এ-বাড়ীতে ঢোকা অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কি বলব।

উমা মার অন্যায় তিরস্কার শুনিয়াই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই অযাচিত সমালোচনায় সে আর সংযম রাখিতে পারিল না। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, আর কিছু বলবেন কি করে'? আপনাদের কি চোখ আছে না চোখের স্বচ্ছতা আছে? উনি নিজে যেচে এখানে আসেন নি, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছিলাম। তা ছাড়া দাদা মারা গেছেন ব'লেই ওঁকেও আমরা ভূত বানিয়ে ফেল্‌বো আমাদের এ অকৃতজ্ঞতা বিধাতা ক্ষমা করবেন না। উনি আমাদের সংসারে অবাঞ্ছনীয় হলেন সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ওঁর সংস্পর্শে এলে একটা নূতন জগতের আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেতেন নিশ্চয়।

শচীপ্রসাদ ভাবিল উমাকে অযথা চটাইয়া দিয়া সে ঠকিয়া গিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া নিক্ষিপ্ত তীর ফিরাইয়া আনা যায় তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছিল এমন সময় অরুণাই তাহাকে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, কিন্তু অমন

গুণ্ডাকে রাস্তা থেকে ধরে' আনবারই বা এমন কি দায় পড়েছিল ?

—দায় পড়্‌ত যদি আমার বা তোমার প্রাণান্তকর অসুখ হ'ত – তখন রাত জেগে গা-গতর ঢেলে সেবা করবার দরকার পড়্‌ত যে। যদ্দিন তিনি দাদার সেবা করেছেন ততদিন তিনি মহাপুরুষ, সাধু ; আর আজ তিনি তাঁর দেশের সেবা করছেন বলেই গুণ্ডা। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে যে তাঁর সজ্ঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু ওঁর আবির্ভাবে বাবার চাকরির সঙ্গে সঙ্গে যদি ঘরের চাল্‌টাও উড়ে যায় মা, তা হ'লে সবাই মিলে দেশের কিছু উপকার করলেও করতে পারতাম।

শচীপ্রসাদ টিপ্পনি কাটিল : দেশ কথাটা বানান করা নেহাৎ সোজা বলে' সবাই তা নিয়ে ফোঁপরদালালি করে

উমা কহিল, দেশ বানান্ করা সোজা বটে, কিন্তু বানানো সোজা নয়। সেটা দয়া ক'রে মনে রাখবেন।

রূঢ় কথা শচীপ্রসাদও কহিতে জানে, কিন্তু কথায়-কথায় কোথায় আসিয়া পৌঁছিবে তাহার ঠিকানা কি! তাহার চেয়ে চুপ করিয়া সিল্কের রুমাল দিয়া ঘাড়টা বার পনেরো রগ্‌ড়াইলে বরং কাজ দিবে।

কথা কহিলেন অরুণা।—কিন্তু এমন বেহেড্‌ বকাটের সঙ্গে তোর আবার অত ঘটা করে' সম্পর্ক রাখ্‌তে যাওয়া কেন ? আমি ভাব্‌ছি আস্‌চে হপ্তায়ই তোকে হষ্টেলে ভর্ত্তি করে' দেব।

উমা চুলগুলি লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছিল ; কহিল, তার মানে আমাকে প্রদীপদার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখ্‌তে চাও। হষ্টেলে ত' আমি যাবই তা বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবারই বা কি দরকার ? কিন্তু হষ্টেলে গিয়ে সত্যিই যদি আমাকে দীপদার সাহচর্য্য থেকে সরে' থাকতে হয় তা হ'লে সেটা আমার সীতার বনবাসের চেয়েও অসহনীয় হ'বে।

এই প্রগল্‌ভ দুর্বিনীত মেয়েটাকে প্রহার করিতে পারিলেই বুঝি অরুণা সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহাতে বাধা ছিল। তাই কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া তিনি কহিলেন, তুই আর ওর চরিত্রের কী জানিস্ ? পরের বাড়ীর বৌর ওপর কেন ওর এত দরদ তা তুই বুঝবি কি ক'রে ?

না বুঝিলেও উমাকে বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত অরুণার স্বস্তি ছিল না। শচীপ্রসাদ এ-বাড়ীতে সম্পূর্ণ আগন্তুক নয়, অরুণার দিক হইতে তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। তাই তাহার সামনে প্রদীপের নিন্দাটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইবে না ভাবিয়াই অরুণা তাহাকেই সম্বোধন করিলেন।

—ভেবেছিলাম সুধী-র বন্ধু, ভদ্রলোক, লেখাপড়া শিখেছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এমন খারাপ তা মোটেই আন্দাজ করতে পারিনি, শচী। মরা বন্ধুর প্রতি এতটুকু যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে পুলিশেই ঠিক সম্মান দেখাতে পারবে।

এইটুকু ভূমিকা করিয়া অরুণা সবিস্তারে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের নীতিবিরুদ্ধ সান্নিধ্যের একটা বিশ্রী বর্ণনা দিয়া ফেলিলেন। পাছে পুত্রবধূর কল্পিত বিশ্বাস-ঘাতকতায় স্বর্গগত পুত্রের আঘাত লাগে সেই ভয়ে স্নেহময়ী অরুণা সমস্ত কলঙ্ক প্রদীপের মুখেই মাথাইয়া দিলেন। অবনী বাবুর কাছে প্রদীপ-নমিতা-সংস্পর্শের যেটুকু বিবরণ পাইয়াছিলেন তাহাতে সুবিধা মত একটু বর্ণচ্ছটা না মিশাইলে চলিত না, তাই সহসা উমার সম্মুখে প্রদীপ একেবারে কালো ও কলুষিত হইয়া উঠিল। অরুণা ফোড়ন দিলেন : দেশের নাম করে' যেদিন থেকে গুণ্ডামি সুরু হ'য়েছে সে দিন থেকেই ওর প্রতি আমি আস্থা হারিয়েছি।

শচীপ্রসাদও রসনাকে নিরস্ত করিতে পারিল না : চেহারা থেকেই যাঁরা মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করেন সে সব লোকের কথায় বিশ্বাস আমার ষোল আনা। ওঁর চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছিল লোকটা ভালো নয়। এর পর এ-সব পাড়ায় পা দিলে ওঁকে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে।

উমার মুখ পাংশু হইয়া গলা শুকাইয়া নিমেষে যে কেমন করিয়া উঠিল বুঝা গেল না। না পারিল তীব্র প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল অভিযোগটা আয়ত্ত করিতে। প্রদীপ উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া একান্ত অকিঞ্চিৎকর পিপীলিকার সমান হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল প্রদীপকে ডাকিয়া আনে, সে নিমেষে এই সব অতি মুখর নির্লজ্জ কটুভাষণের বিরুদ্ধে তাহার অগ্নিময় ভাষার বাণ হানিয়া এই দুই আততায়ীকে অভিভূত করিয়া ফেলুক।

আর কিছুই না বলিয়া উমা নিজের ঘরে আসিয়া একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাক্, এই সব ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইলেও তাহার চলিবে। সে এখানে পড়িতে আসিয়াছে, মন দিয়া পড়িয়া পরীক্ষা-সমুদ্রগুলি পার হইতে পারিলেই তাহার ছুটি মিলিবে। পরে কি হইবে এখন হইতে ভাবিয়া রাখার মত মুর্খতা আর কি আছে? তাহার মত অবস্থার মেয়ে দেশের মুক্তির জন্য কতটুকু কাজ করিতে পারে, সে বিষয়ে প্রদীপদার সঙ্গে খোলাখুলি একটা পরামর্শ করিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু আপাতত তাহা স্থগিত রাখাই সমীচীন হইবে। কাজের জন্য প্রথমত খানিকটা যোগ্যতা ত' দরকার মনকে সেই আশ্বাস দিয়া সে সেলফ্ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

এমন সময় শচীপ্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ফের উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। শচীপ্রসাদের বয়স একুশ, চেহারা দোহারা, পরনের জামা-কাপড়গুলি অত্যুগ্ররূপে পরিচ্ছন্ন। কামানো দাড়ি-গোঁফ, ব্যাক্-ব্রাশড্ চুল,—মুখে একটা মেয়েলি-ভাবের কৃত্রিম কমণীয়তা আছে। কলেজের ছাত্র হিসাবে খুবই ভালো, এই বৎসর সসম্মানে বি, এ পাশ করিয়াছে,—বোধ হয় শীঘ্রই বিলাত যাইবে আই-সি-এস হইবার জন্য। উহার বাবার ইচ্ছা শচীপ্রসাদ বিলাত যাইবার আগে এখানেই পাণিগ্রহণটা সারিয়া লয়; পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া শচীও তাই ঘন-ঘন এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেছে। অবনীবাবু অস্পষ্ট করিয়া মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু উমার আগে এক মেয়ে নিজের অনিচ্ছায় বিয়ে করিয়া স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য মারা গিয়াছিল বলিয়া চট্ করিয়া মত দিয়া ফেলিতে অরুণা ইতস্তত করিতেছিলেন। মেয়েকে খোলাখুলি কিছু প্রশ্ন না করিয়া বিবাহের যোগাড়-যন্ত্র করিবারও কোনো অর্থ নাই, কেননা দেশের হাওয়া বদ্লাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেয়েও যেমন স্বাতন্ত্র্যসাধিকা হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে বিয়ের নামে নাক সিঁট্‌কাইয়া একদিন খদ্দর কাঁধে ফেলিয়া রাস্তায় ফিরি করিতে বাহির হইয়া পড়াটা তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং স্বয়ং শচীপ্রসাদকেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও নির্বিঘ্ন অবকাশের সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা স্বামী স্ত্রী নেপথ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

খবরটা উমার কানে যাইবেনা উমা তেমন নিরীহ ছিল না, কিন্তু সে বোধ করি বুঝিত যে বিবাহের প্রস্তাবের মধ্য দিয়া প্রেমের শুভাবির্ভাবের সূচনা হয় না। শচীপ্রসাদ তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিত ভীরু ভক্তের মত নয়, অনেকটা কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন প্রভুর মত। অর্থাৎ উমার চিত্ত জয় করিবার জন্য প্রেম দিয়া নিজের চিত্ত-প্রসাধন করিবার প্রয়োজন সে বুঝিত না। জোয়ারের জলের মত উমার যৌবন ধীরে ধীরে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। উমার বাবা-মা যখন সঙ্কেত করিয়াছেন তখন কোনো ব্যতিক্রমের জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত ছিল। নতুবা, তাহারো রোমাণ্টিক বা কল্পনাপ্রবণ হইবার বয়স ত' ইহাই। হাত বাড়াইয়াই যখন উমাকে আয়ত্ত করা যায়, তখন তাহাকে আকাশচারিণী শশীলেখার সঙ্গে তুলনা করিয়া বামন হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার কোনো মানে হয় না। উমা সুন্দর, শোভনাঙ্গী; তাহা ছাড়া অবনী বাবুর সম্পত্তি উমার আঙুলের ফাঁক দিয়া নিশ্চয়ই তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে। অতএব শচীপ্রসাদ যদি বুদ্ধিমান হয় তবে অযথা কালবিলম্ব করিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে সে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিবে।

অথচ, শচীপ্রসাদের এই সকল অধিকার খাটানোর জন্যই তাহার প্রতি উমা প্রসন্ন হইতে পারিল না। এমন নির্লিপ্তের মত আত্ম-নিবেদনের লজ্জা হয়ত' তাহাকে সঙ্গোপনে আহত করিত। সে এমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিতে চাহে না। নিশীথ রাত্রি ভরিয়া কাহাকে ভাবিয়া আকাশের তারাগুলির দিকে তাহার চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কেহ আসিবে এই অসম্ভব একটি বিশ্বাস লালন করিয়া সে তাহার অনতি-উদ্‌ঘাটিত যৌবনকে পূজার দীপশিখার মত আগ্রহ-কম্প্র উন্মুখ করিয়া রাখিবে, সে না আসিলে তাহার পড়ায় মন বসিবে না, চুল বাঁধিতে বাঁধিতে জন-যান-মুখর রাজপথের পানে চাহিয়া সে সানন্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। জীবনের এমন কতগুলি মুহূর্ত্ত না বাঁচিয়া সে এত অনায়াসে ফুরাইয়া যাইতে চাহে না। শচীপ্রসাদ যদি তাহার ঘরে নিঃশব্দ পদপাতে একটি ভয়-ভঙ্গুর অনুচ্চারিত প্রার্থনা লইয়া প্রবেশ করিত,

তাহা হইলে উমার সর্ব্বদেহ মন রোমাঞ্চময় হইয়া উঠিত কি না কে জানে!

শচীপ্রসাদ হাসিয়া বলিল, চল বায়স্কোপে যাই, পর্দ্দায় আবার তোমার সেই গরা লা প্রাঁতে দেখা দিয়েছেন।

বই হইতে উমা মুখ তুলিল না; কহিল, বিদেশী ফিল্ম্ দেখে পয়সা খরচ করাকে আর ক্ষমা করতে পারবো না। বরং বিকেলে বেরিয়ে আমার জন্যে যদি একটা কাজ করতে পারেন, ত' ভালো হয়।

শচীপ্রসাদ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, কি?

দুইটি স্থির জিজ্ঞাসু চোখ মেলিয়া উমা বলিল, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনটা কোথায় জানেন?

—না; কেন?

—তবে দয়া করে' একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন ওখানে যেতে হ'লে বাস্ থেকে কোথায় নাম্‌লে সুবিধে।

শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনে নিশ্চয়ই উমার কোনো সহপাঠিনী আছে বিশ্বাস করিয়া শচীপ্রসাদ একটু প্রফুল্লই হইয়া উঠিল হয় ত'। উমার পরিচয়ের সূত্রে আরেকটি মেয়ের কাছে আসিতে পারিলে যে ভালোই হয় সে দুর্ব্বলতা শচীপ্রসাদের বয়সের ছেলেদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় নয়। এবং সেই অনামা মেয়েটির সান্নিধ্যে যে শচীপ্রসাদ স্বাভাবিক সঙ্কোচ তাহার সমস্ত আচরণটিকে সুমধুর করিয়া তুলিত তাহাতে আর সন্দেহ কি! তাই সেই গলিটার অবস্থান ও আয়তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবে? বেশ ত, চল না, দু'জন বেরিয়ে পড়ি। কাছাকাছি কোথাও হবে হয় ত'। কল্‌কাতার রাস্তা খুঁজে বেড়াতে আমার ভালোই লাগে। বেশ একটু বেড়ানোও হবে'খন।

বইয়ের পৃষ্ঠায় ফের চোখ নামাইয়া উমা বলিল, না, সেখানে আমাকে একলাই যেতে হবে। আপনি দয়া করে' একটু জেনে এলেই চল্‌বে।

শচীপ্রসাদ ভাবিত হইল। এইবার তাহার স্বরে আর বিনয়স্নিগ্ধ কুণ্ঠা রহিল না। আরেকটু সরিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে কে আছে শুনতে পাই?

উমা টলিল না, কহিল, সব কথাই কি সব্বাইকে বলতে হয়?

—অন্ততঃ আমাকে তোমার বলা দরকার।

—এমন অনেক কথা আছে যা নিজেকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে বলা যায় না।

রুক্ষস্বরে শচীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, আমাকে না বল্‌লে আমার সাহায্য করাটা অসঙ্গত হবে।

উমা একটু হাসিল; বলিল, আপনি সাহায্য করলেও শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনটা বাড়ীর দরজায় চ'লে আস্‌ত না, হেঁটেই যেতে হ'ত। হাঁট্‌তে আমি একলাই পারি।

এই বলিয়া বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতে যাইতেই তাহার নজর পড়িল যে বইটা একটা রেলওয়ে-সম্পর্কিত আইনের ইস্তাহার। এতক্ষণ তাহার মনকে শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনের সন্ধানে পাঠাইয়া সে এত মনোযোগ সহকারে ইহাই পড়িতেছিল নাকি!

তাড়াতাড়ি বইটা রাখিয়া দিয়া উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীপ্রসাদের কিছু বলিবার আগেই সে হাসিয়া কহিল, আপনার বায়স্কোপের পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম। ও পয়সাটা চোখ মেলে কোনো দেশী ফাণ্ডে দিয়ে দেবেন।

শচীপ্রসাদের কণ্ঠে বিষ আছে: ভিক্ষা দেওয়াকে আমি পাপ মনে করি। তুমি না গেলেই যে বায়স্কোপ পটল তুলবে এমন কথা না ভাবলেই তোমার বুদ্ধি আছে স্বীকার করব। আমার পাশে একটা মারোয়াড়ি বস্‌লেও ফিল্ম্ আমি কম enjoy করব না। (ক্রমশঃ)

কেবল একটী কথার জন্য

(V. S. Morozov হইতে)

[শ্রীভীমাপদ ঘোষ]

একদিন শীতকালে পরিচিত এক চায়ের দোকানে চা পান করছিলাম। তখন বৈকাল চারটা,—নিয়মিত খরিদ্দার, তাই খাতির করে দোকানদার খবরের কাগজখানি সামনে ধরে দিলেন।

বুড়ো মানুষ, চসমাটা চোখে দিয়ে মন দিয়ে লিয়ো টলষ্টয় সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়তে লাগলাম।

খরিদ্দারের ভিড় ছিল না, বেশ চুপচাপ, কাজেই পড়তে পড়তে একরূপ তন্ময় হয়ে গেলাম।

এমন সময় জীর্ণ পোষাক পরিহিত, পায়ে তালিমারা জুতা, হাতে একটী ব্যাগ নিয়ে এক কৃষক ধীরে ধীরে দোকানে ঢুকে আমার পাশে এসে বল্‌লে "মশায়, দয়া করে কিছু ভিক্ষা দেবেন কি? আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত।"

পাঠে এইরূপ ব্যাঘাত করায় আমি লোকটার উপর চটে গেলাম, আমি নিজে দরিদ্র, ভিক্ষুক বললেই হয়, তবে কখনও কারও কাছে হাত পাতি নাই। যাক্ কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললাম, "অনেক ক্ষুধার্ত্ত লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি নিজেই ক্ষুধার্ত্ত, পালাও এখান থেকে—এখানে কিছু হবে না।"

এই বলে আমি আবার পড়তে লাগলাম কিন্তু কান্নার শব্দে আমার পড়ার ব্যাঘাত হল।

চসমাটা খুলে খবরের কাগজের উপর রেখে দিয়ে ভিক্ষুকটার দিকে তাকালাম। বুড়ো লোক, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে একজন কৃষক,—শীর্ণ শরীর, শুষ্ক মুখ, কুব্জ দেহ, সেইখানেই স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বক্ষপঞ্জর ভেদ করে ক্রন্দনধ্বনি উঠছে।

দেখে আমার কষ্ট হল ও নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলাম। আমিও বুড়ো মানুষ, দুর্ব্বল চিত্তের লোক, অতি কষ্টে নিজের কান্না চেপে রাখলাম। লোকটাকে কিছু না দিয়ে রূঢ় কথা বলায় লজ্জিত ও দুঃখিত হলাম।

মনে করলাম, "আমারই বা দোষ কি? আমারও ত কাজকর্ম্ম কিছু নাই, বহু পরিবার পুষতে হচ্ছে, তার উপর আমিও ক্ষুধার্ত্ত।" কিন্তু অন্তর হতে তখনি বিবেকের ধ্বনি শুনতে পেলাম "তবু ওরূপ ব্যবহার করা ভাল হয় নাই। ভ্যাসিলি, তুমি অন্যায় করেছ।"

জানিনা লোকটা আমার বাক্যের জ্বালায় না ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে? দীর্ঘ ষাট বছর ধরে জীবনে সুখ ও আনন্দ খুব কমই পেয়েছি। লোকটাকে যেরূপ রূঢ়কথা আমি বলেছি তার চাইতে কর্কশ কথা কত লোকে কতবার আমাকে বলেছে। তবুও মনে বড় কষ্ট হ'ল।

আমি বসে আছি—লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট খানেক তার দিকে তাকিয়ে আছি, কি বল্‌ব ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। কিছু পূর্ব্বে ভিক্ষা চাইবার সময় সে যেরূপ করুণ করে—তার নিবেদন জানিয়েছিল, আমিও সেইরূপ ভাবেই তাকে বল্‌লাম "ভাই, কাঁদছ কেন? কাঁদলে কি অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হবে? সংসারে লোককে কত সইতে হয়—"

"কিন্তু আমার যে ভাই অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমি কাজের চেষ্টা করেছি পাইনি, ভিক্ষা কেউ দেয়ও না—ভিক্ষা আমার ব্যবসাও নয়। বল্‌লে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা আজ তিন দিন হ'ল জেল থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, কিন্তু এই তিন দিনে একটুক্‌রা রুটীও পেটে পড়ে নাই।"

এই বলে লোকটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে পরল। ব্যাপার দেখে আমিও ব্যথিত হলাম। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কেবল খেতে না পেয়েই লোকটী কাঁদ্‌ছে না, তার অন্তরে কোনও আঘাত লেগেছে। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে তাকে যদি কিছু সান্ত্বনা দিতে পারি এই মনে করে বল্‌লাম—

"কেঁদে আর লাভ কি ভাই? ওতে তোমাকে আরও

বিচলিত কর্‌বে, এস, আমার পাশে বস, একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্। তোমার কি হয়েছে খুলে বল।"

ব্যাগটী হাঁটুর উপর রেখে বুড়ো লোকটী আমার পাশে বস্‌ল। আমি তাকে প্রশ্ন কর্‌তে লাগলাম—

"ভাই, তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"আমার! আমার বাড়ী কুরস্ক প্রদেশে, ওবয়ানস্ক জেলায়, ববরেভিক গ্রামে।"

"তবে তুমি এখানে কি করে এলে ?"

সে বলল, "আমি এখানে কি করে এলাম ? এখানে আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে।" আমি বললাম, "কি অপরাধে ?" "কেন নির্ব্বাসিত করা হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছেন ?—কেবল একটা মাত্র কথার জন্য !"

"সে কথাটা কি ভাই !"

কেন এত কষ্ট ভোগ করছে এই কথা বল্‌তে সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমিও নিজে কৃষক কিন্তু আমার পোষাকপরিচ্ছদ ভাল, সামনে সংবাদ পত্র ও চসমা।

সন্দেহবশে বেশ ভাল করে সে সব দেখ্‌তে লাগল। হয়ত আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে কোনও উত্তর দিল না।

মনে করলে লোকটা একথা জিজ্ঞাসা করে কেন ? এরই বা বাড়ী কোথায় ? এই রকম সাত পাঁচ ভেবে বেফাঁস কথা বলা চাইতে চুপ করে থাকা ভাল মনে করে সে চুপ করে থাক্‌ল

আমি বুঝতে পার্‌লাম—অপরিচিত কোনও লোককে সহসা তার কষ্টের কথা বল্‌তে লোকটা ইতস্ততঃ করছে, কাজেই আমিও আর তাকে বেশী কিছু বললাম না। গতিক দেখে এইটুকু বুঝতে পারলাম যে কোনও রাজনৈতিক কারণে লোকটী নির্ব্বাসিত হয়েছে।

বহু রাজনৈতিক অপরাধীর সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে। অনেকের সঙ্গে একত্র বহুদিন থেকেছি। তারা স্বাবলম্বী, উন্নতমনা ও বাগ্মী—কিন্তু জানিনা কি করে এই বুড়ো লোকটী তাদের দলে ভিড়্‌ল।

যাক্! আমি বল্‌লাম "দেখ, তুমি ঐ ছোট ঘরটাতে গিয়ে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা সব এলে আমি তোমার জন্য কিছু চাঁদা তুলে দেবার চেষ্টা করব। এখন দোকান থেকে ঝোল ও রুটি নিয়ে পেট ঠাণ্ডা কর

"কিন্তু আমার যে পয়সা নাই। কি দিয়ে রুটী ও ঝোল কিনব ?"

"তার জন্য চিন্তা কি ? তুমি গিয়ে খাওনা, দাম আমি দেব।"

বুড়ো লোকটী চলে গেল। আমি আবার চসমা লাগিয়ে প্রবন্ধটী পড়্‌তে লাগলাম, কিন্তু পুনরায় দোকানের এক বেয়ারা এসে পড়ায় ব্যাঘাত কর্‌লে।

"ভ্যাসিলি ষ্টেপানিভ্‌চ, আপনি কি একটী বুড়ো লোককে ঝোল, রুটী দিতে বলেছেন ?"

"হাঁ।"

"তার দাম বার কোপেক (আন্দাজ তিন আনা)—তা আপনি দেবেন ?"

"হাঁ"

ট্রেণ ছেড়ে যাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়োয়ানরা চা ও খাবার জন্য এসে উপস্থিত হ'ল। যে স্থান একটু পূর্ব্বেই চুপচাপ ছিল এখন তাদের কথাবার্ত্তায় তা মুখরিত হয়ে পড়ল। কেউ সেনাপতির কথা, কেউ কোনও আরোহীর কথা—কেউ বা কদর্য্য রাস্তার কথা বলতে লাগল। একজনের কথা শেষ না হতে হতেই অপরে কথা বলে। এইরূপ ঠাট্টা তামাসার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি সকলকে চাঁদার জন্য ধরবার সুযোগের অপেক্ষায় থাক্‌লাম, নিজে অনেক দিন গাড়োয়ান ছিলাম, কাজেই তারাও আমাকে জানে, আমিও তাহাদিগকে জানি।

আধ ঘণ্টা পরে গল্পের জের একটু কমে এল, সকলেই আহার সেরে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল, কেউ বা চা, কেউ বা মদ খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমি—সাহস করে তাদের মধ্যে একজন ভাল লোকের কাছে কথাটা পাড়্‌লাম। সাধারণতঃ তাকে "আলেখা" বলেই লোকে ডাকৃত, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আলেক্সি টিটিক্ বলা হত।

আমি তাকে ব্যাপারটী খুলে বলে এই অনুরোধ করলাম যে আমরা উভয়ে চেষ্টা করে এই গরীব নির্ব্বাসিত কৃষকের জন্য কিছু চাঁদা গাড়োয়ানদের কাছ থেকে তুলে দেব।

তারপর আমি বুড়ো লোকটীকে ছোট অন্ধকার ঘরটী থেকে ডেকে আন্‌লাম। গাড়োয়ানরা কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেনা, কেন ভিক্ষা চাচ্ছে তাও খোঁজ করলেনা। আমাদের কথা শুনেই নিজের নিজের থলি থেকে যৎকিঞ্চিৎ দান বুড়ো লোকটীর হাতে দিতে লাগ্‌ল।

তারা বল্‌লে "ভাই তোমার নির্ব্বাসন হওয়ায় মন খারাপ করোনা। যেরূপ দিনকাল পড়েছে বিনা কারণেই কত জনের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে।"

ব্যাপার দেখে বুড়ো লোকটা অবাক্ হ'য়ে গেল। নমস্কার কর্‌তেও ভুলে গেল, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়ে গেল। তার হাত দু'টী তাম্রমুদ্রায় ভরে গেল।

এখন আর ভয় ও অবিশ্বাসের কোনও কারণ না থাকায় আমি তাকে আমার পাশে বসালাম ও জিজ্ঞাসা করলাম—"ভাই কি কথার জন্য তোমার নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েছে জান্‌তে পারি কি?"

তার পূর্ব্বেই সন্দেহের ভয়-ভাব তিরোহিত হয়েছিল। সে সকলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাদের সকলকে তার কাহিনী শুন্‌তে অনুরোধ কর্‌লে ও বল্‌তে লাগল—

"বন্ধুগণ, কাহিনীটী বড় নির্ম্মম! আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন? ভগবান সাক্ষী, আমি সত্য ছাড়া কিছুই বল্‌ব না। কেবল একটি মাত্র কথার জন্য আমি এই কষ্ট ভোগ কর্‌ছি। ব্যাপারটা এই রকম হ'য়েছিল,—কুরস্ক প্রদেশে প্রজা বিদ্রোহ হয়ে ছিল তা বোধ হয় আপনারা সকলেই শুনেছেন?"

কতকগুলি লোক একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল "হাঁ হাঁ জানি বৈকি! সব সংবাদপত্রেই তা বেরিয়ে ছিল।"

"হাঁ হতে পারে সব সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল, গুজবটী তাই দেশময় প্রচার হ'য়ে প'ড়ে ছিল। কৃষকেরা ভদ্রলোকদের যথাসর্ব্বস্ব লুট পাট করে অনেক সময় তাদের বাসগৃহে পর্য্যন্ত আগুণ ধরিয়ে দিতে লাগ্‌ল।"

আলেখা জিজ্ঞাসা কর্‌লে "আপনিও বুঝি এই সব গোলমালে লিপ্ত ছিলেন?"

"কে, আমি? না মোটেই কিছু করি নাই। কেবল একটী কথার জন্য আমার নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েছে। আমি একদিন ওবেরণ সহর থেকে আমাদের জমিদারের কতকগুলি মজুর ও কৃষকগণের সঙ্গে গাড়ী চালিয়ে আস্‌ছিলাম। পথে নানা রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। একজন বল্‌ছিল, "মিকিস্কা, খুব বাহাদুর তোমরা! জমিদারকে ওবেরণ থেকে তাড়িয়েছ, এখন খামার বাড়িটা থেকে তাড়িয়ে এটাতে আগুণ ধরিয়ে দাওনা।" আমি কেবল বললাম "ওবেরাণের লোকেরা জমিদারকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়েছে, তোমরা ইচ্ছা করলে নিজেই তার গোলা বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পার।"

এই খানেই কথাবার্ত্তা শেষ হ'ল। আমরাও বিদায় নিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেলাম।

এরপর আমি এ সব কথা ভুলেই গেলাম ও শান্তিতে কাজ কর্ম্ম করতে লাগ্‌লাম। হঠাৎ এক সপ্তাহ পর একদিন সন্ধ্যায় আমি ঘুমতে যাব এমন সময় একজন আমার বাড়ীর জানালার ধারে এসে আমাকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। বড় কন্যাটী দুয়ার খুলে দিলে। আমার মনে হ'ল আমার নাম ধরে কেউ আমার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

কন্যা উত্তর দিলে "হাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন।"

আমি বুঝতে পারলাম না, লোকটী কে—একটু পরেই দেখলাম একজন পুলিশের লোক আমাদের কুটীরে প্রবেশ করে আমার নাম ধরে খোঁজ কর্‌লে।

আমি ত অবাক্ হ'য়ে গেলাম। আমার সঙ্গে এর কি দরকার? জমিদারের লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার কথা আমার মনে আদৌ উদিত হ'ল না।

"শীঘ্র এস, পোষাক পরে নাও, এখনি তোমাকে থানার কর্ম্মচারীর কাছে যেতে হবে।"

আমি কারণ জানতে চাইলাম, কিন্তু লোকটা একেবারে গোঁয়ার। মাটিতে পদাঘাত করে চীৎকার করে উঠ্‌ল "আমি কৈফিয়তের ধার ধারিনা। হুকুম, যেতে হবে, শীঘ্র চল।" আমি তাড়াতাড়ি এই কোটটা গায়ে দিলাম। অন্য পোষাক বা দস্তানা নেবার সময় হ'ল না। আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়েই রওনা হ'লাম। পুলিশ কর্ম্মচারী ঘোড়ায় চড়ে, আর আমি পদব্রজে। আমার ছেলে মেয়েরা খুব ভীত হ'য়ে পড়ল। আমার পাঁচটা ছেলে মেয়ে। বড়

কন্যাটীর বয়স সতের বছর, বার বছরের এক পুত্র সেই এখন গৃহের কর্ত্তা, আর সব তার চাইতেও ছোট। তারা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করে কিছুক্ষণ আমার পিছু পিছু এল।"

এইটুকু বলে বুড়ো লোকটা হাঁপাতে লাগল, তার বক্ষ স্পন্দিত হতে লাগল ও সে হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করে ফেললে। "ভাই সব, আমি ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করছি, ভগবান আমার বড় কন্যাটীকে রক্ষা করুন! আমার পুত্র সেও ত কচি ছেলে; আজ আমি তাদের পাঁচজনের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েছি। এই কষ্ট সহ্য করবার মত শক্তি আমার শরীরে নাই। জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে, বছরটা কোনও প্রকারে কেটে গেলে হয়।"

"কিন্তু কেমন করে এই সব ব্যাপার ঘটল তা ত বললে না?"

"আমি যেরূপ শুনেছি তাই বলছি। জমিদারের কৃষাণরা বাড়ী গিয়ে তাদের সর্দ্দারকে বলেছিল, "আজকে আমরা মিকিস্কার সঙ্গে গাড়ী নিয়ে আস্‌ছিলাম। তাদের অঞ্চল থেকে ওবেরণের লোকেরা কিরূপে জমিদারকে দেশছাড়া করেছে তাই বলছিল। শেষে সে বললে "এইবার তোমরা তাকে খামার বাড়ী থেকে আগুন লাগিয়ে তাড়িয়ে দাও"। সর্দ্দার এই কথা জমিদারকে জানায়। জমিদার একজন পেন্সন-প্রাপ্ত কর্ণেল। তিনি গবর্ণরকে পত্র দেন যে মিকিস্কা আমার লোকদিগকে আমার খামার বাড়ী পুড়িয়ে দেবার জন্য উত্তেজিত করছে।"

"কোথায় আমাকে নিয়ে গেল এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন? পুলিসের লোক প্রথমে আমাকে থানায় নিয়ে যায়। তখন রাত্রি হ'য়েছে, কাজেই আমাকে গারদ ঘরে রেখে দেয়। সে রাত্রি আর কাটতে চায় না। আমি এক বারও চক্ষু বুজি নাই। মনে করিয়াছিলাম "পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখবেন না। দু' চার কথা জিজ্ঞাসা করেই ছুটি দেবেন। আমিও বাড়ী গিয়ে নিদ্রা যাব।"

"এইরূপ ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, বেলা হল, তবু কারও দেখা নাই। গতিক দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে ব্যাপার ভাল নয়। যাক্ হঠাৎ তালা ও দুয়ার খোলার শব্দে চম্‌কে উঠলাম। এক জন লোক এসে আমাকে পুলিশ কর্ম্মচারীর কাছে নিয়ে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন—

"কি হে বুড়ো, তুমি দেখছি ভাল কাজে হাত দিয়েছ! কোথায় তুমি যুবকদিগকে অসৎপথ থেকে নিবৃত্ত করবে না তুমিই প্রচার কার্য্য করে বেড়াচ্ছ!" তারপর একখণ্ড কাগজ হাতে ক'রে বললেন "শোন, গবর্ণর বাহাদুরের হুকুম". কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি চোখে আঁধার দেখলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবলমাত্র এই কথা কাণে গেল যে আমি দেশের লোকদিগকে জমিদারের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে বলেছি। তিনি হুকুম পড়া শেষ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কোন প্রদেশে নির্ব্বাসিত হ'তে চাও?" আমি কি বলব ভেবে ঠিক পেলাম না। তিনি আবার বললেন "কোন্ প্রদেশে?" আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আচ্ছা, তবে তোমাকে টুলায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছ ত? "হাঁ, শুনেছি, আমি একবার বাড়ী যেতে পারি কি?"

"কে আছ একে এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

"দুইজন সৈনিক দাঁড়িয়েছিল। আদেশ পাবামাত্র এক জন আমার সামনে আর এক জন আমার পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে করে আমাকে জেলখানায় নিয়ে চলল, যেন আমি একটা বন্য পশু। সেখানে দুই সপ্তাহ থাকার পর পুলিশের হেপাজতে আমাকে টুলায় আনা হয়। আর কখনও আমি এদেশে আসি নাই। আজ তিন দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাত্র আজ একখানা রুটী মাত্র খেয়েছি। এদেশে কাজও মিলে না, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই পাই নাই। ভিক্ষা আমার ব্যবসা নয়। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! তিনিই আজ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আমি পেট ভরে খেতে পেয়েছি ও তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে আমার কিছু পুঁজি করে দিয়েছ। ভগবান নিশ্চয়ই এর জন্য তোমাদিগকে পুরস্কার দেবেন।" এই বলে বুড়ো লোকটী সকলকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

একজন জিজ্ঞাসা করলে "তোমার কি বিচার হয় নাই?"

"বিচার! কই কিছুই ত হয় নাই।"

"তারা তোমাকে দেশ থেকে প্রথমে কোথায় আনলে?"

"আমাকে প্রথমে টুলায় এনে রাত্রিতে জেলে রেখে দেয়। প্রাতে বলে দিলে প্রতি বুধবার থানায় হাজিরা দিতে হবে, আর এক বছরের মধ্যে টুলার চতুর্দ্দিকে দশ মাইলের বেশী দূরে কোনও স্থানে যেতে পারব না। কিন্তু কেমন করে আমার বা আমার ছেলে মেয়েদের চল্‌বে তা তারা বল্‌লে না। এমন করে যে এক বছর বেঁচে থাক্‌ব, এও ত মনে হয় না, হয় ত বিদেশেই মরতে হবে।"

"কি করবে দাদা? দেশেই মর বা বিদেশেই মর, পৃথিবী সর্ব্বত্রই সমান। সমস্ত দেশই কি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়? তুমি না থাকলেও ছেলেরা কোন রকমে পালিত হবে। নিত্যই ত খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছ দেশের জন্য শত শত লোক জেলে যাচ্ছে, কেউ হয়ত সত্যের জন্য, কেউ হয়ত সামান্য অপরাধের জন্য, কত লোকের ফাঁসি হ'চ্ছে কত লোকের উপর গুলি চালান হচ্ছে—দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষ বিচারালয়ের দিন আগত প্রায়! কি করবে দাদা, আত্মা যতদিন শরীর ছেড়ে না যায় কোনও ক্রমে জীবন ধারণ করে যাও।"

বুড়ো লোকটি কথা শুনে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে ও গা চুলকাতে লাগল, কারণ অপরিষ্কার জেলখানার নানা রকম পোকা তার দেহে বাসা করেছে।

একজন বললে "ভাই তুমি স্নান করে নাও, কাপড়-চোপড়গুলি বেশ করে গরম আগুনে সেঁকে নিও, না হলে জেলখানার পোকায় তোমাকে তিষ্ঠাতে দেবে না।"

"ঠিক বলেছ ভাই, আমি অনেক দিন স্নান করি নাই, আচ্ছা আজ তবে আসি, ভগবান কপালে যা লিখেছেন তাই হবে। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।"

কিছু মনে করোনা ভাই, দরকার হলে আবার এস। আমরা তোমার জন্য আবার কিছু চাঁদা তুলে দেব।"

"ধন্যবাদ ভাই, কপালে থাকে ত কা'ল কাজ পাব, ট্রামওয়েতে কা'ল একটা কাজ হবার কথা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আজ তবে আসি।"

"কোথায় যাবে, সরাইখানায়?"

"না, না, কাল রাত্রিতে সেখানে ছিলাম, যে উৎপাত সেখানে কি মানুষে থাকে! আমি আজ রেল ষ্টেশনে শুয়ে পড়ে থাকব।"

আমিও তার সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। আরও কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম।

"বন্ধু, বহু ধন্যবাদ, আপনি আমায় খুব উপকার করেছেন

এই বলে টুপি খুলে অভিবাদন করে সে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল, আমিও বাড়ী ফিরে এলাম।

ভাবলাম, "এই লোকটি বুড়ো বয়সে ছেলে মেয়ে ছেড়ে পড়ে আছে। এক বছর দীর্ঘকাল, কি ঘটবে কে জানে? একি আর এত কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকবে? এর বড় মেয়েটীর দশাই বা কি হবে? যাক্ যা হয় ঘট্‌বে। সংসারে যাদের কেউ কোথাও নাই জুয়াচোর ও বদমাইস লোকে তাদেরই ঠকায়।"
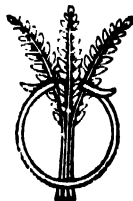
দিনান্ত

[আব্‌দুল কাদের]

সন্ধ্যার সিন্ধুতে ওই পাড়ি দিলো কালের কাণ্ডারী
দিবস তরণী বাহি', ম্লানছন্দে উঠিছে ঝঙ্কারি'
ক্লান্তপক্ষ বিহগের কণ্ঠে তারি শেষ সারি-গান।
সন্ধ্যাতারকার বাতি জ্বালাইয়া স্তিমিত নয়ান
বিদায়-বিধুর ধরা চাহি' রহে স্থির অপলক
আনমনা—দোলে তার স্বর্ণশিখা-ঝলিত অলক।
মিলনের রাগরেখা ধীরে মুছি' স্মরণপ্রদোষে
আলোক লিপির কথা ভাবে একা আঁধারে সে বসে'—
যেই জ্যোতির্দেবতার স্বাদ লভেছিল, তারে চাহি'
শ্যামায়িত বক্ষে তার বিষ-দাহ, শান্তি নাহি নাহি॥

শান্তি নাহি নাহি মোর। আজিকার দিনান্ত-সঙ্গীতে
গন্ধের বেদনা জাগে মোর ম্লান মঞ্জরীর চিতে।
সে পুষ্পমঞ্জরী মোর দেবতার—একদা ঊষায়
লীলাচ্ছলে অর্পেছিলো মোর করে বসন্তভূষায়,
অম্লান ফিরায়ে তারে দিব ব'লে কৃতজ্ঞ-অন্তরে।
জীবনের যাত্রা-পথে আজি দেখি অস্তরবি-করে—
শুষ্ক হয়ে এসেছে সে প্রত্যহের পথের ধূলায়,
আলোর মাধবী মোর অন্ধরাতে ঝরিছে হেলায়,
ফুল্ল এরে করিবে যে ঊষার শিশিরে অবগাহি'
কোথা সে দেবতা মোর—তারে ভাবি' তন্দ্রা নাহি নাহি!

তন্দ্রা নাহি নাহি কারো—শুষ্ক প্রাণ ধরার, আমার।
অঙ্গে অনুক্ষণ বাজে অবসাদ-শৃঙ্খল-ঝঙ্কার,
বিশীর্ণ বিবশ বাহু, শ্লথ বেশ, স্রস্ত কেশপাশ,
তুষার-পাণ্ডুর-শোভা, চিত্তমূলে মৃত্যুর নিশ্বাস,—
নয়নে নাহিক ঘুম বাঞ্ছিতের স্বপ্ন দেখি বসে'—
নব-প্রাণ সঞ্চারিবে কবে আসি' পরশ-রভসে!
গোধূলি-রথাশ্ব খুরে বাজি' ওঠে বিদায় মূর্চ্ছনা,
তারি মাঝে কে রচিল প্রভাতের আসন্ন অর্চ্চনা—
উদয় পথের জ্যোতি শোভে তার সিঁথির সিন্দুরে
নিজেরে নির্ম্মুক্ত করি' মুক্তি দিব কেমনে বন্ধুরে—
ভাবি আমি। জানি জানি ধরণীর অদৃষ্ট-বারতা,
নাহি জানি কোন্‌ লগ্নে দেখা দিবে আমার দেবতা॥

আলো-আঁধারি

[শ্রীকিরণ কুমার রায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দশ মিনিট পরে বসিবার ঘরে চায়ের বাটি সম্মুখে রাখিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম,—এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল? শয়ন করিতে গিয়াছিলাম প্রকাশ মিত্র, জাগিয়া উঠিয়াছি বিজন গুপ্ত ....

চায়ের বাটিতে চা ঠাণ্ডা হইয়া সরবৎ হইল, এক চুমুক চাও পেটে পড়িল না। রাজা বেলশাজারের মত সম্মুখের সাদা দেওয়ালে নিজের ভবিতব্য স্পষ্টাক্ষরে লিখিত দেখিলাম। বুঝিলাম, ইদানীং বিজনগুপ্ত প্রচুর পরিমাণে খোরাক পাইয়াছে; দেখিতাম সে পূর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টাবয়ব হইয়াছে, তাহার খর্ব্বাকৃতি, সঙ্কুচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে রক্ত চলাচল করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সে ব্যাপার আমার লক্ষীভূত হইয়াছিল। সেদিন সকালে অনেক দিবসের অনেকানেক কথাই মনে পড়িল। মনে পড়িল যে ইতিপূর্ব্বেই সন্দেহ জাগিয়াছিল, প্রকাশ মিত্রকে বিজন গুপ্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে, হয়তো বা কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণগ্রাস ঘটিতেও বিলম্ব হইবে না, প্রকাশ মিত্র উঠিয়া যাইবে, রহিবে বিজন গুপ্ত। আবিষ্কৃত রাসায়নিকের ফলও সকল সময়ে সমান ফলিয়াছে এ কথা বলিতে পারি না। এই মারাত্মক গবেষণার প্রথম দিকে এক দিন রাসায়নিক ফল দর্শাইতে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তৎপরে দুই চারি বার পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া ফল পাইতে হইয়াছে, একবার দ্বিগুণ ছাড়িয়া ত্রিগুণ করিতে হইয়াছিল, সে দিন আমার মরণ হইলেও আমি আশ্চর্য্য হইতাম না—হইলে ভালো হইত কিন্তু সে কথা ভাবিয়া আর কি লাভ!

গবেষণার প্রথম দিকে প্রকাশ মিত্রের বিজন গুপ্ত হওয়া ছিল কষ্টকর, আজ হাওয়া উল্টা বহিয়াছে, বিজন গুপ্তের প্রকাশ মিত্রে ফিরিয়া যাওয়া হইয়াছে কষ্টকর। মনে মনে নিজেকেই নিজে তারিফ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "জীতা রহো"—সেদিন সকালে বসিয়া বসিয়া কেবল তাই ভাবিতে লাগিলাম,—নকল আসলকে খাইয়া বসিয়াছে। —নিজেকে চিরতরে হারাইবার গহ্বরসম্মুখে আনিয়াছি না খাদে পড়িয়াছি?

কিন্তু তবু উপায় আছে। নিজের নিরুপায়তার সহিত এ কথা সেদিন মনে হইল যে হয় আজ হইতে বিজন গুপ্ত, নয় প্রকাশ মিত্র, দুয়ের একজন বাঁচিয়া থাকিবে, দুই জনের বাঁচিয়া থাকা হইবে না।—

প্রকাশ মিত্র ও বিজন গুপ্ত, এই দুইজনের প্রকৃতির সমস্ত বিভিন্ন, ইহার কোনও বৃত্তির সহিত উহার কোনওটির এতটুকু মিল নাই। শুধু এক স্মৃতিশক্তির স্নায়ুকেন্দ্র দুইজনেরই ছিল সমান—তাই ডাঃ মিত্র অবসর পাইলে বসিয়া বসিয়া বিজন গুপ্তের দুষ্কৃতির গিলিত চর্ব্বণ করিত। কিন্তু বিজন গুপ্ত জীবনে ভুলিয়াও ডাঃ মিত্রের কথা মনে রাখিত না, আর যদিই বা মনে রাখিত তবে দুর্ব্বৃত্ত পুত্র যেমন তাহার পিতার কথা মনে রাখে, "যাই করি বাবা তো আছে"--বিজনের প্রকাশ মিত্রের প্রতি ছিল এমনই দরদ। অন্যদিকে ডাঃ মিত্রেরও ছিল বিজনগুপ্ত বলিতে পুত্রের মতোই মায়ামমতা, তাহার দোষত্রুটি ঢাকিয়া ঢুকিয়া সারিয়া সুরিয়া ডাঃ মিত্র চলাফেরা করিতেন।—ভাবিলাম, ডাঃ মিত্রই থাকুক, —বিজন গুপ্ত অপসৃত হোক, কিন্তু তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া গোপনে গোপনে যে লালসার খোরাক যোগাইয়াছি, সে লালসার পরিসমাপ্তি এই খানেই। ডাঃ মিত্র গিয়া বিজন গুপ্ত থাকিলে থাকিবে শুধু নাম-যশ-খ্যাতি-হীন, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, এক তিল পরিমাণ জ্ঞানোৎসুক্য নাই, একেবারে বন্ধুহীন, ঘৃণ্য একটি অমানুষ।—তা ছাড়া আরও একটি কথা, ডাঃ মিত্র যদি থাকে তবে সে বসিয়া বসিয়া বিজন গুপ্তের রোমন্থন করিবে, বিজন গুপ্তের সে বালাই নাই!

এমন দ্বন্দ্বে আমিই যে প্রথম পড়িয়াছিলাম তাহা নয়,

অবশ্য ভাবিতে গেলে আমার অবস্থা অভিনব। কিন্তু যুগ যুগান্তর হইতে মানুষ, আমারই মত এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, ছিন্নভিন্ন হইয়া আসিতেছে—যেখানে যত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইবার মোহদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, সেখানেই তাহাকে আমারই মত পদে পদে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের জটিল অনুভূতির উপলব্ধি করিতে হইয়াছে, এবং ঠিক আমারই মতো তাহাদের যাহা শুভ, যাহা সৎ, তাহাকে বাছিয়া নিবার সুবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ইচ্ছাশক্তির অভাবে বারে বারে আহত হইয়াছে এবং পরিশেষে হয়তো সে বুদ্ধি একেবারেই নিহত হইয়াছে।

শেষ অবধি বিজন গুপ্তেরই প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়া ডাঃ মিত্রকে খালাস দিলাম—ভাবিলাম সেই থাকুক, তাহার বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া ও সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া; বিজন গুপ্ত মরুক, মরুক তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহার যৌবন, বিলাস, তাহার দায়িত্বহীন আসক্তি ও আবেশ। কিন্তু একটু গলতি থাকিল এই যে বিজন গুপ্তের নীড় বিনষ্ট করিলাম না, তোরঙ্গে তাহার জামা কাপড়গুলিও থাকিয়া গেল।

পুরা দুটি মাস বিজন গুপ্ত মরিয়া থাকিল, সম্পূর্ণ দুই মাস ধরিয়া যে তপশ্চরণ করিয়াছিলাম,—তাহাতে বোধ করি আমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল, মনে মনে সেই প্রায়শ্চিত্তের গৌরব বোধ করিতাম। কিন্তু দিন কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ও কাটিল, প্রায়শ্চিত্তের আত্মপ্রসাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, মাঝে মাঝে মনের মধ্যে বিজন গুপ্ত উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল—এবং একদিন আর বারণ মানিল না, রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া আবার এক দিন বিজন গুপ্ত সদর পথে বাহির হইয়া পড়িল।

—এই রাত্রে গোয়েনকা খুন হয়।

অনেকদিন ধরিয়া খাঁচায় বন্ধ রাখিয়া বাঘকে ছাড়িয়া দিলে রক্তপিপাসা তাহার যেমন মারাত্মক হইয়া উঠে, বিজনেরও সেদিন হইয়াছিল তাই।—তাহার অন্তরস্থ সমস্ত দুর্ব্বৃত্তি সেদিন সম্পূর্ণ মাথানাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—এ আমি যে মুহূর্ত্তে রাসায়নিক গ্রহণ করি, তখনই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কোথা হইতে যেন সেদিন কে আসিয়া আগাগোড়া নরকের দ্বার খুলিয়া দিয়া গেল, আর সেখানকার যতগুলি ভূতপ্রেত সেদিন বিজন গুপ্তকে আশ্রয় করিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিল না হইলে গোয়েনকা করিয়াছিল কি?

আঃ, সেই অর্দ্ধালোকিত পথে তাহার কাত্‌রানির কথা মনে পড়িতেছে! কি অসম্ভব অমানুষিক উল্লাসেই না বিজন তাহাকে নিধন করে, প্রত্যেক পরবর্ত্তী আঘাত পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাতকে অমানুষিকতায় অতিক্রম করিয়া কি নৃশংসতার মধ্যেই না গোয়েনকা হত হইয়াছিল—! এই নৃশংসতার সমাপ্তিও হইল কি ভয়ানক ভাবে। যে মুহূর্ত্তে বিজন বুঝিল এ হত্যাকাণ্ড অগোচর থাকিবেনা, সেই মুহূর্ত্তে মনে তাহার ভয় ঢুকিল। এক দিকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম আনন্দ, অপর দিকে প্রাণভয়, দুয়ে মিলিয়া সেদিন তাহাকে একই সময়ে সার্থকতার গৌরবে ও অপরাধ ধরা পাড়বার আশঙ্কায় ভরিয়া তুলিল।

পলাইয়া বিজন সেদিন তাহার নীড়ে গিয়া তখনই যাহাকিছু কাগজপত্র তাহার পরিচয় দিতে পারে, সমস্ত পুড়াইয়া ছাই করিয়া সেই রাত্রেই বাড়ী ছাড়িয়া এই ল্যাবরেটরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।—ফিরিবার পথেও তাহার মনে ঐ আনন্দ ও আশঙ্কা।

সেদিন বিজন গুপ্ত রাসায়নিক প্রস্তুত করিবার সময় বোধ করি বা মনে মনে গানের কলিই সুরে আবৃত্তি করিয়াছিল—

পরিবর্ত্তনের আলোড়ন শেষ হইল। অনুতপ্ত প্রকাশ মিত্র শতাশ্রুধারায় নিজেকে সিক্ত করিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল।

সেদিন আমি আমাকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করিলাম—আত্মপ্রবঞ্চনার অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া আপাদ মস্তক নিজেকে নিজে চিনিলাম। আমার জীবনের আদ্যন্ত সেদিন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। শৈশবে যখন বাবার হাত ধরিয়া সকালে মাঠের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে আনন্দে আত্মহারা হইতাম, কৈশোরের স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের দিনগুলির আবিষ্টতা এবং তারপর যৌবনের কঠিন সাধনা ও জ্ঞানবিকাশের স্তরপারম্পর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তারী জীবনের ত্যাগ ও তপস্যা—সমস্ত একটির পর একটি করিয়া মনে খেলিয়া গেল।—পরিশেষে মনে পড়িল,

এই রাত্রের ঘটনা, অন্তরাত্মার বুক চাপিয়া যেন সন্ধ্যার রক্তাক্ত ঘটনা বসিয়া থাকিল। চীৎকার করিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। দুই চক্ষু বাহিয়া নীরব অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, আর মনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রার্থনার একটি বাণী—কিন্তু তবু রক্ষা পাইলামনা, চারি দিক হইতে কাহারা সব কোলাহল করিয়া জানাইতে লাগিল, 'তুমি পাপী, যে পাপ তুমি করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা নাই।'

—কিন্তু সব কোলাহল ছাড়িয়াও নিষ্কৃতি পাইবার উল্লাসে মন নাচিয়া উঠিল। বিজন গুপ্ত আর থাকিলনা, থাকিতে সে আর পারে না, থাকিতে চাহিলেই তাহাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবে—এই চিন্তার আনন্দে মস্‌গুল হইয়া উঠিলাম। আমার স্বভাবের জটিল সমস্যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মিটিয়া গেল—নাই, নাই, বিজন গুপ্ত আর নাই—প্রকাশ মিত্র চাহিলেও নাই, না চাহিলেও নাই।—চিরকালের মত গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হইয়া প্রকাশ মিত্র বাঁচিয়াছে—আবার জীবনের ঋজু পথে সহজ শুভ্র প্রকাশ মিত্র চলিবে, চলিতে পারিবে। ল্যাবরেটরীর খিড়কীর দুয়ার বন্ধ হইল—সে-পথে আর প্রয়োজন নাই,—দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিলাম।

পরদিনের খবরের কাগজ খুলিয়া প্রথমেই দেখিলাম,—ঐ সংবাদ—গোয়েনকা হত হইয়াছে,হত্যাকারী পালাইয়াছে, কিন্তু হত্যাকারীকে স্বচক্ষে যে দেখিয়াছে, সে তাহার সঠিক বর্ণনাও সংবাদ পত্রের রিপোর্টারকে জানাইয়াছে।—বিজনের সহিত বর্ণে বর্ণে সে বর্ণনার মিল। পাপ শুধু পরলোকেই পাপ নয়, বুঝিলাম পাপে ইহলোকের ফাঁকিও রহিয়া গিয়াছে ঢের, সেই ফাঁকির ভিতর দিয়া পুলিশ, কাছারী, হাকিম পেয়াদা সব হুড়্‌মুড় করিয়া আসিবে।—বাঁচিয়াছি, প্রকাশ মিত্র আমার রক্ষাকবচ হইয়াছে, বিজন গুপ্ত সে রক্ষাকবচের প্রহরা ভাঙ্গিবে কি করিয়া? ভাঙ্গিলেই বিশ্ব-জগতের সমস্ত লোক অঙ্গুলি তুলিয়া তাহাকে দেখাইবে, বলিবে, "ঐ খুনী, উহাকে খুন কর।"—সেদিনের সংবাদ পত্র যেন আমাকে স্বস্তি-বচন শুনাইল।—

প্রকাশ মিত্র আবার বিগত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সুরু করিল। তোমার মনে আছে, এই সময়ে আমি দুঃখাভিহত আর্ত্ত মানুষকে দুই হাতে কি সেবাই না করিয়াছি, ভাণ্ডার খুলিয়া বিপন্নকে যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি—তোমরা ধন্য ধন্য করিয়াছ, তৃপ্তিতে আমার মন প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। দিন হইতে দিনে আমি আমার অন্তরস্থ সৎকে প্রকাশ করিয়াছি আর প্রতিদিনই আমি নূতন করিয়া আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি।

কিন্তু মন যাহার দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছে, বাহিরের সমস্ত কিছুই যে তাহার কাছে ব্যর্থ। অনুতাপের প্রথম ঝোঁক কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই, সে সম্বন্ধে তীব্রতাও আমাকে ত্যাগ করিল—এবং আবার কারাগারের ভিতর হইতে বন্দিনী ব্যাঘ্রীর রক্তপিপাসার গর্জ্জন মাঝে মাঝে কানে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। অবশ্য স্বপ্নেও বিজন গুপ্তকে বাঁচাইবার কল্পনা করি নাই,—করিবার সাহসও ছিল না। কিন্তু প্রকাশ মিত্র নিজেই মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং একদিন এই চাঞ্চল্যের পরিসমাপ্তি হইল প্রাক্-বিজন-গুপ্ত জীবনের গোপন লালসা চরিতার্থতার পুনরাবৃত্তিতে।

সব জিনিষেরই শেষ আছে।—আমার এই নিমিষের দৌর্ব্বল্য আমার শেষেরই দ্বারোদ্ঘাটন করিল।—কিন্তু তখন এতটুকু মাত্রও মনে আশঙ্কা জাগে নাই।—অথচ এই একটি মুহুর্ত্তের মূঢ়তা আমাকে একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত করিল। কিন্তু সেদিন ভাবিয়াছিলাম,—ইহাতে আর কি হইবে?—রাসায়নিক যখন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখনকার মত এ ঘটনাও জীবনে সামান্য দাগই রাখিতে পারিবে।

হেমন্তের সকাল—তৃণে তৃণে শিশির শয়ন বিছাইয়াছে, চারিদিকে ভিজা ঘাসের সুমিষ্ট গন্ধ।—কার্জ্জন পার্কে সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। স্বাস্থ্যান্বেষীর দল, এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটি মাড়োয়ারী মালকোঁচা মারিয়া তাহার স্ফীত উদর কমাইবার জন্য দৌড়াইতেছে, একটি ফিরিঙ্গী ছোক্‌রা তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে—এই সব দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, এই কলিকাতা সহরেও কি এত নাম-না-জানা পাখীর কল কাকলী!—প্রভাতের প্রথম কুয়াসা কাটিয়া রৌদ্র উঠিতেছিল—নিরালা দেখিয়া একটি বেঞ্চ অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলাম। অল্প অল্প রৌদ্র উঠিয়াছিল, কেমন এক প্রকার মন্থর আলস্যে আমার সমস্ত

শরীর মন আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল—ভিতরকার পশুটা বুঝি সময় বুঝিয়া তাই উস্‌খুস্ করিতে সুরু করিল, পুরাতন স্মৃতির চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে বসিয়া গেলাম। সান্ত্বনা পাইলাম এই ভাবিয়া যে মোটের উপর আমি আর পাঁচ জনের মতই। ঠিক সেই সময়ে মনে অহঙ্কার আসিল, নিজের কৃতিত্বের, নিজের বদান্যতার, পরোপকার-বৃত্তির জন্য আত্ম-প্রসাদ মনে জাগিল—

—হঠাৎ সমস্ত শরীর মোচ্‌ড়াইয়া উঠিল, গা কেমন বমি বমি এবং হাত পা রিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল—খানিকক্ষণ মাত্র—এবং ঠিক সেই খানিকক্ষণ পরেই বেশ অনুভব করিলাম, আমার বুকের রক্ত আবার উদ্দাম তালে নাচিতে সুরু করিতেছে, মনে যাহা-কিছু-করিবার দুঃসাহস জাগিয়াছে, কোথাও কোনও বাধা নাই, বিপদ নাই, আশঙ্কা নাই, সমস্ত কর্ত্তব্যের দায়িত্বের বন্ধন হইতে আমি যেন মুক্তি পাইয়াছি। কি মনে করিয়া একবার নিজেকে নিজে দেখিতে চাহিলাম,—একি? আমারই দেহ হইতে আমার কাপড় চোপড় খসিয়া খসিয়া পড়িতে চায় যে, নিজের হাতের দিকে চাহিলাম, সেই রোমশ কঠিন হাত! মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলাম, এই প্রভাতের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মোহে বেঞ্চে যে আসিয়া বসিয়াছিল সেই প্রকাশ মিত্র আর নাই, পরিবর্ত্তে সেখানে বিজন গুপ্ত বসিয়া আছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই বেঞ্চে যে বসিয়া ছিল, তাহাকে দেখিলে লোকে সসম্ভ্রমে দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত, এখন যে বসিয়া আছে, তাহাকে পুলিশ ডাকিয়া সেই লোকেই ধরাইয়া দিবে!—

রহস্যের কি অন্ত নাই?

এই অসম্ভব বিপদ একেবারে আমার বুদ্ধিবিবেচনা সমস্তের মূলে গিয়া ঘা দিল—নাড়া খাইলাম বটে কিন্তু পলকের মধ্যে আবার নিজেকে ঠিক করিয়া নিলাম। ইহা দেখিয়াছি আমার ইতর চরিত্রে আমি অধিকতর বুদ্ধিশালী হইতাম, কে যেন আমার সাধারণ বুদ্ধিকে তখন শাণ দিয়া চক্‌চকে করিয়া তুলিত।—ফলে যে বিপদের মাঝে প্রকাশ মিত্র পড়িলে অথৈ জলে হাবুডুবু খাইত, সেই বিপদেরই মধ্য হইতে বিজন দিব্য গুছাইয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়া জাল গুটাইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিত।—বর্ত্তমান বিপদের বিরুদ্ধে বিজন এক নিমিষের মধ্যেই নিজেকে সতর্ক করিয়া তুলিল—মনে পড়িল, রাসায়নিক প্রস্তুত করিবার মালমশলাগুলি ল্যাবরেটরীর ড্রয়ারে বন্ধ রহিয়াছে বাহির হইবার সময় প্রকাশ মিত্র সে ঘরে তালা দিয়া আসিয়াছে—সে চাবি পকেটে, এখন ফিরিয়া যদি ল্যাবরেটরী-ঘরের দুয়ার খুলিতে যাই, তবে আমারই চাকরবাকরেরা আমাকে পুলিশের হাতে দিয়া ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইবার ব্যবস্থা করিবে। কি করিয়া সে গুলি হাতে পাইতে পারি,—তাই ভাবিতে লাগিলাম। আর কাহারও সাহায্য বিনা কোনও উপায় নাই। কাহাকে দিয়া এ কাজ সম্ভব হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে যামিনীর কথা মনে হইল। যামিনীর কাছে যাইতে হইবে, কিন্তু গেলেই হইবে না তাকে আমার ওখানে পাঠাইয়া ল্যাবরেটরী হইতে মালমশলাগুলি আনাইতে হইবে। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই ফেরারী আসামী বলিয়া পুলিশ ধরিতে পারে—আর যদি নাই বা ধরে, তবু এই পোষাকে এই চেহারায় গিয়া যামিনীকে কি করিয়া কি বুঝাইব? যার তার কথায় গিয়া আমার ঘরের তালা খুলিয়া যা আনিতে বলিবে, তাই আনিয়া দিবে, এমন লোক সে নয়—তবে কি করা যায়?—হঠাৎ মনে পড়িল, চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে তো হয়,—বিজন গুপ্তের অবস্থায় প্রকাশ মিত্রের আর সব হারাইলেও ডাক্তারের হাতের লেখা তো লিখিতে পারিবে। এ চিন্তা মনে খেলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

রাস্তা দিয়া একটা গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত করিতেই সে গাড়ী থামাইল। কাপড় চোপড় যথা সম্ভব গুছাইয়া সেই গাড়ীতে চড়িয়া একটা হোটেলে চলিয়া গেলাম। আমার চেহারা দেখিয়া গাড়োয়ানটা হাসি থামাইতে পারিতেছিলনা,—বুঝিয়া সর্ব্ব শরীর আমার রাগে রি-রি করিয়া জলিয়া উঠিল। লোকটি তা বুঝিতে পারিয়াই হোক্ কি আর যে কোনও কারণেই হোক্—আর হাসিল না, ভাগ্য তার ভালো, কেননা আর একটু হাসিলে বিজন যে তাকে নিয়া কি করিত তার ইয়ত্তা নাই। হোটেলে নামিয়া একটি নির্জ্জন ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাকে দেখিয়া হোটেলের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা ঠাট্টা হাসির খেলা চলিল, বুঝিতে পারিলাম—

মনে হইল এক একটার মাথা ধরিয়া দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকিয়া দিই—দাঁত কস্‌মস্‌ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই লিখিবার সাজসরঞ্জাম আনিবার জন্য একটি বেয়ারাকে অর্ডার করিলাম।

—প্রাণ ভয়ে ত্রস্ত বিজন গুপ্তের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম,—যতইনা কেন তার অন্য লোক গুলির প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার কারণ থাক্‌—নিজের স্বার্থকে ভুলিবার পাত্র সে নয়। পাছে রাগিয়া মাগিয়া একটা কিছু করিয়া বসে এবং লোকগুলি পুলিশে খবর দেয়—এই ভয়ে সে প্রত্যেকের হাসি টিট্‌কারী অদ্ভুত সংযমের সহিত সহ্য করিতে লাগিল —এবং অদ্ভুত সংযমের সহিত দু'খানি চিঠি—একটি যামিনী ডাক্তারকে, অন্যটি সুনীল কম্পাউণ্ডারকে—লিখিয়া রেজিষ্টি ডাকে সেগুলি অবিলম্বে পাঠাইবার ব্যবস্থাও করিল।

সমস্ত দিনটা সে ঘরে তার কি রকম করিয়া কাটিল, এ কেবল সেই জানে—জানালা দিয়া রাস্তার লোকচলাচল দেখিবারও উপায় নাই। দোর জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের এ প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঙুলের নখ দাঁত দিয়া কুরিয়া কুরিয়া আর কত সময় কাটে? সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে—আমি বলিতে বাধিয়া যায়—পথে বাহির হইয়া একটি গাড়ী ডাকিয়া ভিতরে উঠিয়া শার্সি তুলিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে যেথানে খুশী সেথানে হাঁকাইবার জন্য হুকুম দিল।

অন্তরে তখন মাত্র দু'টি ভাব, ভয় ও বিদ্বেষ—ইহা ছাড়া আমার কোনও মানুষী বৃত্তি-ই তখন অবশিষ্ট নাই। অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর গাড়োয়ানকে একটু একটু কেমন কেমন লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পথচারীদের সহিত মিশিয়া গেলাম—কিন্তু সেই কিম্ভূৎ কিমাকার আর অদৃষ্টপূর্ব্ব চেহারা নিয়া ভীড়ের সহিত মিশিবই বা কি করিয়া? অথচ রাত্রি বারোটা বাজিতে তখনও ঢের বাকী —তাই কোনও মতে অন্ধকার গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইলাম। একটি গলির ভিতরে একটা বুড়ী ঝি বুঝি কি করিয়া গায়ে আসিয়া পড়ে—পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধাক্কা দিয়া ড্রেণের ভিতর ফেলিয়া দিই—অন্ধকারে পড়িয়া বুড়ী কাত্‌রাইতে লাগিল, আমি চলিয়া গেলাম।

যামিনীর বাড়ীতে যখন নিজেকে ফিরিয়া পাই—তখন যামিনী যে অস্ফুট ভীত চীৎকার করিয়াছিল,—কানে তা বাজিতেছে। নিজেকে নিজে ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিবার ভয় গিয়া মন বিজন গুপ্ত হইবার ভয়ে ভরিয়া উঠিয়াছিল -সে কথা মনে আছে। যামিনী অনেক কিছু বলিয়াছিল, সব কথাগুলি শুনি নাই,— কি রকম যেন হইয়া গিয়াছিলাম, স্বপ্নাবিষ্টের মত বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। যৎসামান্য ভোজন করিয়া শয়ন করিবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়ি। সে ঘুম সকালের আগে ভাঙে নাই। সকালে ঘুম ভাঙিলে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম— অন্তরের গোপন গুহায় যে ভয়ানক জন্তুটা রহিয়াছে, তার ভয় অবশ্য ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে এই সান্ত্বনাও ছিল যে হাতের কাছেই তাহাকে নিধন করিবার অস্ত্রপাতিও সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সব ভয় ও সান্ত্বনা সমস্তকে অতিক্রম করিয়া মনে মনে গত কল্যাকার বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি কৃতজ্ঞতাও বোধ করিতেছিলাম— সে কৃতজ্ঞতা কাহার কাছে সঠিক বলা কঠিন

প্রাতরাশ সারিয়া আঙিনায় বেড়াইতেছিলাম,—মৃদু বাতাস দিব্য লাগিতেছিল। এই দিব্য লাগিবার বোধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই আলোড়ন! দ্রুত পায়ে ল্যাবরেটরী-ঘরে ঢুকিতেই বিজন গুপ্ত হইয়াছি বুঝিলাম। সম্পূর্ণ দু'টি ডোজ রাসায়নিক খাইয়া নিজেকে নিজেতে ফিরাইয়া পাইলাম। ইহার পর ছয় ঘণ্টাও কাটিল না—।

তারপর হইতেই সুরু হইল,—এই মল্লযুদ্ধ। ডাঃ মিত্রে আর বিজন গুপ্তে দিন রাত কুস্তি চলিতেছে, ডাঃ মিত্র সম্পূর্ণ রকমে হারিবে এই মাত্র অপেক্ষা। কথা নাই বার্ত্তা নাই,—আলোড়ন কম্পন সুরু হয় ······

ঘুমাইলে কিম্বা তন্দ্রা আসিলে আর রক্ষা নাই—সুতরাং নিদ্রা একেবারে বাদ দিতেই বাধ্য হইলাম। একে এই অভাবনীয় বিপদের ঝক্কি তার উপর অনিদ্রা, দেহে মনে যেন আর তিল মাত্র শক্তি রহিল না।

এইখানে তোমাকে সমগ্র ব্যাপারটির একটি মোটামুটি ধারণা করিতে বলি। আমি ডাঃ প্রকাশ মিত্র, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে, বুদ্ধি বিদ্যায় সকলের সম্ভ্রমের পাত্র, কারণে অকারণে পূজা পাই, প্রণাম পাই—কবে কোন্

যৌবনের আবেগ-দৌর্ব্বল্যে আমার পদস্খলন হইয়াছিল, সেই পদস্খলন হইতে আর রক্ষা পাইলামনা। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আজ এই বিগত যৌবনে ঘরে বন্ধ থাকিয়া অহরহ মনে এক সর্ব্বনাশা দুর্ভাবনা ভোগ করিতে হইতেছে যে আমার আর প্রকাশ মিত্রের খ্যাতি প্রতিপত্তি, বিদ্যাবুদ্ধি, যশঅর্থ কিছুরই উপর দাবী নাই—পলকের মধ্যে আমি সব হারাইয়া এমন একটি ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইব, যাকে ধরাইয়া দিলে ধর্ম্মাধিকরণ হইতে তাহার, অর্থাৎ আমার প্রাণদণ্ডাদেশ হইবে।

ব্যাপারটি অলৌকিক! বিশ্বাস করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না—কেইবা বিশ্বাস করিবে! কিন্তু আমার কথা বাদ দিয়াই ভাবিয়া দেখ যে এমনটি ঘটিতে পারে কিনা,—ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে মন্দকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করিয়া যদি তুমিই কোনদিন তাহাকে প্রশয় দিয়া থাক—তবে এই প্রৌঢ় বয়সে তার হলাহল তোমাকে প্রতিনিয়ত মরণের পথে ঠেলিয়া দিব কিনা।

বিজন গুপ্তের ভূত কখন আমার স্কন্ধে চাপিবে,—আর কতক্ষণে—এই ভয়ে আমার দিন রাত্রির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত বিষাক্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। যেই আলোড়ন সুরু হয়, অমনি লাফাইয়া উঠি,—মেজার গ্লাশে উপকরণ গুলি ঢালি—রাসায়নিক প্রস্তুত করিয়া, সেই রাসায়নিক গলাধঃকরণ করি—কতক্ষণ মানুষে এই একই কার্য্য করিতে পারে? কিন্তু করিয়াই বা কি হইবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোড়নের সে মারাত্মক যন্ত্রণা কমিয়া আসিল—অত্যন্ত সহজেই আমি নিজেকে হারাইয়া বিজন গুপ্তে বিলীন হইতে থাকিলাম।

আবার ওষুধ খাই, আবার নিজেকে ফিরিয়া পাই।

গল্পেও কোনদিন এমন পাঠ কর নাই, না? একটি সজীব মানুষ অন্য একটি সজীব মানুষে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইতেছে আর ওষুধ খাইতেছে। হাস্যকর কিন্তু কি ভয়ানক ভাবে হাস্যকর, আমার দিক দিয়া দেখিলে তা বুঝিতে পারিবে।

প্রকাশ মিত্রের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—বিজন গুপ্ত অপরাজেয় হইয়া উঠিল। দু'জনে দু'জনকে সম্পূর্ণ শক্তিতে লড়িতেছে—এ যুদ্ধে ডাঃ মিত্রের জীবন পণ। বিজন সম্বন্ধে তাহার এখন আর বিন্দুমাত্র মায়া নাই—সম্পূর্ণ বিদ্বেষে ডাঃ মিত্র সব কিছু দিয়া এখন বিজনকে মারিতে চায়। খাল কাটিয়া কুমীর আনা আর কাকে বলে?

কিন্তু বিজন কি মানুষ?—পঙ্কের কীটও তা হইলে মানুষ! সেই কীটের কাছে আজ আমাকে পরাজয় মানিয়া নিতে হইতেছে। এই প্রহসনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখাত্মক ব্যাপারটা এই—পাঁকের কর্দ্দম আজ মাথা নাড়িয়া উঠিয়াছে, পাঁক হইতে সে কথা কহিতেছে—হাত পা নাড়িতেছে, পাপ করিতে তার বাধিতেছেনা—। জড়ের কাছে চেতন পদার্থের এ কি ভয়াবহ পরাজয়!—এই পাঁকের পোকা আজ আমার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল,—প্রণয়িণীর মত সে আমার বাহুতে বাহু বাঁধিয়া রহিয়াছে,—এতটুকু অবহেলার অবসর পাইলেই সে বাহু আমাকে ধূলিশায়ী করিবে—! বুঝিতাম তার কোন স্বতন্ত্র সত্বা আছে, কোনও পৃথক অবয়ব আছে—তাও নয়। আমারই অস্থি মজ্জা মেদ মাংস ভেদ করিয়া সে জীবন পাইবে—আবার আমারই সর্ব্বনাশ করিবে—এ অসহ্য যন্ত্রণা কি করিয়া ভুলি? বিজনেরও স্বস্তি নাই! নিজের প্রাণভয়ে বারে বারে তাহাকে ডাঃ মিত্র হইতে হইবে—ডাঃ মিত্র ছাড়া তার জীবন নাই। তাই ডাক্তার মিত্রের উপরই তার রাগ সমধিক। তাই যেটুকু অবসর মিলে, সেই টুকুর মধ্যেই সে আমাকে নিগৃহীত করিয়া নেয়,—আমার ব'য়ের পাতায় কালীর আঁচড় কাটিয়া রাখে—আমার চিঠি পত্র ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া একাকার করে,—টেবিলের উপর হইতে আমার বাবার ফটো নিয়া মেজেয় ফেলিয়া চৌচির করিয়া ফেলে। কিন্তু এসব করিয়াই বা তার লাভ কি? ডাঃ মিত্রের আশ্রয় ছাড়া তার বাঁচিবার উপায় নাই—উপায় থাকিলে সে হয়তো একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। কিন্তু নিজের স্বার্থের এতটুকু হানি করিবার পাত্র সে নয়। জীবনের উপর মমতা তার আর সমস্ত আকর্ষণকে ছাড়িয়া, তাই সে তখনও আমাকে নিষ্কৃতি দিতেছিল, না হইলে কি যে করিত তা সে নিজেই জানে—।

—কিন্তু আর দরকার নাই। লিখিবার সামর্থ্য ক্রমেই যাইতেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই এটুকুও হারাইয়া বসিব। এত যন্ত্রণা কেহ কোনদিন পায় নাই—শুধু এই কথাটা

তোমাকে বলিয়া রাখি। এ যন্ত্রণার শেষ কিছুক্ষণের মধ্যেই হইবে—কেননা 'রাসায়নিকের মালমসলা ফুরাইয়া আসিতেছে। গবেষণার প্রথমে যে মাল মজুত করিয়াছিলাম তার পরে আর কোনও দিন মাল আনি নাই। সে মজুত শেষ হইয়া আসিল। নূতন মসলা আনিতে দিলাম। আনিয়া রাসায়নিক প্রস্তুত করিতে বসিলাম—হইলনা। খাইয়া দেখিলাম, এ জিনিষ নয়। তোমার মনে পড়িবে সুনীলকে দিয়া কয়দিন ধরিয়া কলিকাতা সহরের সমস্ত গুলি ঔষধালয় অতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও আমি আমার মশলা পাই নাই। সে নামে যে মশলা আনে,—সে মশলায় কাজ হয় না। সুতরাং মনে হইতেছে, প্রথমে আমি যে মশলা মজুত করি, তাহাতে গলদ ছিল, এবং সেই গোড়ার গলদই আমাকে মারিয়াছে।

* * * *

সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে। এই আমার শেষ রাসায়ণিক, ইহার প্রভাব কাটিয়া গেলেই ডাঃ মিত্র চিরকালের মত অদৃশ্য হইবে—কোথায় থাকিবে তাহার গৌরব-মুকুট? আজীবনের সঞ্চয় তাহার রহিল কোথায়? কিন্তু কথা আর বাড়াইব না। চিরকালের মত নিজেকে নিজে একবার দেখিয়া নিই। উন্নত বলিষ্ঠ উদারচরিত্র দেবপূজ্য প্রকাশ মিত্র, কোথায় সে সৌন্দর্য্য, যার জন্য বিদেশিনীরা তোমাকে 'অ্যাপলো' বলিয়া ডাকিয়াছিল?—কিন্তু আবার কথাতে পাইয়া বসিতেছে।

কে জানে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিজন জাগিয়া উঠিয়া হয়তো যাহা-কিছু লিখিলাম, সব ছিঁড়িয়া ফেলিবে। এতদিন যে তাহার এ সুবুদ্ধি হয় নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।

বিজনও আর সে বিজন নাই—তাহার যে শেষ ঘনাইয়া আসিতেছে, একথা সে-ও বুঝিয়াছে। হতভাগ্যের জন্য অনুকম্পা হয়।

আর হয়তো আধঘণ্টা, তারপরে ডাঃ মিত্রের এই সাধের ল্যাবরেটরীতে, দক্ষিণ হইতে বামে পায়চারি করিয়া ক্লান্ত হইয়া আর্মচেয়ারে বসিয়া ভয়ে ভাবনায় কাঁপিয়া যে খুন হইবে, সে ঐ বিজন গুপ্ত! ডাঃ প্রকাশ মিত্র চিরকালের মত লোপ পাইবে, পম্পে যেমন বিষুবিয়ূসের অগ্ন্যুৎপাতে তার সমৃদ্ধি প্রতিপত্তি নিয়া লোপ পাইয়াছিল তেমনই।

কত সাধ আশা অপূর্ণ থাকিয়া গেল, কিছু পূর্ণ করিতে পারিলামনা। ভাই ঘোষ, আমার সমস্ত অর্থ সমগ্র সম্পত্তি এখন একটা অনুষ্ঠান গঠন করিতে ব্যয় করিয়ো,—যে অনুষ্ঠানের মূলমন্ত্র হইবে সমাজ-সংস্কারের সমস্ত প্রকার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, নীতিবুদ্ধি যেন সে মানুষকে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না করে—মিথ্যা নীতি, মিথ্যা সব, মানুষ মহামানব—পাপের সংস্কার তাহার মন হইতে মুছিয়া দাও, তবেই সে পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে তৎপূর্ব্বে নয়। আর যতদিন পাপকে পাপ বলিয়া মানুষকে তাহার সাধনে নিষেধ করিবে, ততদিন পাপ বলিতে মানুষের মোহ থাকিবে।

—হাঁ, শেষ হইয়া আসিয়াছে!

ভাবিতেছি, বিজনের কি দশা হইবে, পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া ফাঁসীকাঠে ঝুলিবে না নিজেকে শেষ করিবার সাহস তাহার জোগাইবে?

জানিনা, জানিতে চাহিনা। আমি আমার মৃত্যুলগ্নকে অনুভব করিতেছি,—কেবলই মনে হইতেছে, কোথা হইতে যেন কোন্ পরিচিত প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ আমার এই অন্ধকার ভরিয়া বাহিয়া আসিল—সে কি আমার পুনর্জ্জন্মের সংস্কার, পুনর্জ্জীবনের আশা? যাই হোক্, তাহাকে নমস্কার!

হে বন্ধু বিদায়! বিদায় বন্ধু বিদায়!

(শেষ)

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ষষ্ঠ অধ্যায়

২৫। কুশীনারার মল্লগণ এই সব কথা শুনিয়া সমবেত ব্যক্তিগণকে কহিলেন—তথাগত আমাদেরই জনপদের অন্তর্গত গ্রামে দেহ রক্ষণ করিয়াছেন; সুতরাং আমরা তাঁহার দেহভস্মের কণিকাংশও কাহাকে দিতে প্রস্তুত নহি।

সকলে এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"পূজনীয় মহাশয়দের নিকট আমার এক নিবেদন আছে। ভগবান বুদ্ধদেব জীবিতকালে আমাদের ক্ষমা ও সহ্যগুণ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে সেই মনুজ শ্রেষ্ঠের ভক্ত শিষ্যগণ মধ্যে তাঁহার চিতাভস্মের অংশ দাবী লইয়া আজ এইরূপ কলহ উপস্থিত হইল। এবং হয়তো ইহারই উপলক্ষে যুদ্ধ ও রক্তপাতও দেখা দিবে। অতএব আমার সানুনয় নিবেদন যে সকলে সুহৃৎ ও শান্তভাবে এক মত হইয়া তথাগতের দেহভস্মকে আট ভাগে ভাগ করুন। এবং প্রত্যেক দল এক এক ভাগ গ্রহণ করুন ও নিজ নিজ লব্ধাংশের উপর সুবিশাল ও সুরম্য স্তূপ রচনা করুন। এবং এই সকল স্তূপের দর্শন ও আরাধনার দ্বারা যেন জগৎবাসীরা জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধের প্রতি আস্থা ও আসক্তি রাখিতে শিক্ষা করেন।"

ব্রাহ্মণ দ্রোণের সদুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলে একবাক্যে কহিলেন—"হে ব্রাহ্মণ আপনার কথাই শিরোধার্য্য। আপনিই স্বহস্তে তথাগতের দেহাংশ আটভাগে সমভাগ করিয়া প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করুন।"

দ্রোণ 'তাহাই হউক' বলিয়া তথাগতের চিতাভস্ম আট সমান ভাগে ভাগ করিলেন, এবং প্রত্যেক দলকে তাহাদের প্রাপ্য ভাগ মিটাইয়া দিয়া অবশেষে কহিলেন "মহাশয়গণ আপনারা তথাগতের দেহভস্ম পাইলেন; আমার প্রার্থনা আপনারা আমাকে ভস্মের এই আধার-পাত্রটী মাত্র দান করুন। আমি এই আধার-পাত্রটীর উপর একটী স্তূপ রচনা করিব; এবং বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করিব।" সকলেই দ্রোণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং দ্রোণ আধার-পাত্রটী লাভ করিলেন।

২৬। পিপ্পলীবনের মৌর্য্যরা তথাগতের পরিনির্ব্বাণ লাভ সংবাদ পাইয়া মল্লদিগের নিকট এক দূত মুখে এই সমাচার পাঠাইলেন—"তথাগত ক্ষত্রিয় ছিলেন; আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব আমরাও তথাগতের দেহভস্মের অংশ লাভ প্রার্থনা করিতে পারি। আমরা উহার উপর এক সুরম্য পবিত্র স্তূপ গড়িব। এবং তদুপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করিব।"

প্রত্যুত্তরে মৌর্য্যগণ যখন শুনিলেন যে তথাগতের দেহভস্ম ইতিপূর্ব্বেই যথাযথ ভাগে বিতরিত হইয়া গিয়াছে তখন তাঁহারা নির্ব্বাপিত চিতার অঙ্গারখণ্ডগুলি লইয়া গেলেন।

২৭। এইরূপে লব্ধ পবিত্র দেহভস্ম ও ভস্মাধার-পাত্র ও অঙ্গারখণ্ডগুলির উপর দশটী সুরম্য পবিত্র স্তূপ রচিত হইয়া উঠিল।

(ক) বৈদেহী পুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে এক স্তূপ রচনা করেন ও তদুপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করিব।

(খ) বৈশালীর লিচ্ছবীগণ লব্ধ ভস্মাংশের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(গ) কপিলাবস্তুর শাক্যগণ লব্ধ ভস্মাংশের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) অল্লকপ্পের বুলীয়গণ লব্ধ ভস্মাংশের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(ঙ) রামগ্রামের কোলীয়গণ লব্ধ ভস্মাংশের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(চ) বৈঠ দ্বীপের ব্রাহ্মণ নিজ লব্ধ ভস্মাংশের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(ছ) পাবার মল্লগণ লব্ধ চিতাভস্মের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(জ) কুশীনরের মল্লগণ স্বলব্ধ দেহভস্মের উপর এক স্তূপ রচনা করেন ও উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

(ঝ) ব্রাহ্মণ দ্রোণ স্বলব্ধ ভস্মাধার পাত্রের উপর এক স্তূপ রচনা করতঃ বাৎসরিক উৎসব ব্যবস্থা করেন।

(ঞ) পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ স্বলব্ধ অঙ্গারভাগের উপর এক স্তূপ রচনা করতঃ বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেন।

এইরূপে দেহভস্মের উপর আটটী ও ভস্মাধার কুম্ভের উপর একটী ও চিতার অঙ্গার খণ্ডের উপর একটী সর্ব্বশুদ্ধ দশটী স্তূপ রচিত হইল।

(ইতি মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র সমাপ্ত)

অগ্নিমুখী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীনিখিলেশ রাহা]

সমুদ্রের ঢেউগুলি উঁচু উঁচু হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে এবং তার উপর অনন্ত অদ্ভুত সৌন্দর্য্যে চাঁদের আলো ঝিকমিক করছে। সামনে সীমাহীন নীল জল, এক পাশে অস্পষ্ট তীরের রেখা জ্যোস্নালোকে আরো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কমল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। এ তার প্রতি দিনের কাজ—দিনের কর্ম্ম অবসানে নিঃস্তব্ধ জগতের এক পাশে সে ঠিক পূজারীর মত ধ্যানে বসে—দেবতা তার অতি পরিচিত একটি শুভ্র বালিকা—অর্ঘ তার সিক্ত হৃদয়ের অফুরন্ত অশ্রু। আজ তার হঠাৎ কেন জানি মনে হ'ল যে এই যে বেদনা এর মূলে যেন রমার অনেক খানি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে—যেন তার এ অপমান এবং দুর্ভাগ্য এর জন্য সম্পূর্ণ রমাই দায়ী। এতদিন সে ভাবতো তার যে বেদনা তাকে গৃহহারা করছে তার একটুখানি বেদনাও অন্ততঃ রমার বুকে বেজেছে কিন্তু আজ তার মনে হ'ল সব ভুল ;—যে পরিচয় তার জীবনের এতখানি, রমার কাছে তা প্রতিদিনকার অতি সামান্য ঘটনা—এবং এ পরিচয়ের স্মৃতি তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সে বুকের মাঝে একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করতে লাগলো এবং অবশেষে বিষাক্ত চিন্তার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মৃদুস্বরে গান গাইতে আরম্ভ করলো। চাঁদ ধীরে ধীরে ডুবে গেল, কত গান যে গাইলো তা সে নিজেই জানে না। তার হৃদয়ে আজ যত অভাব যত বেদনা জেগে উঠ্‌ছিল তা যেন আজ গানের সুরে ভাসিয়ে দিতে চায়। নিজের অন্তরে যে বেদনার সুর তার বাজে সেই সুরে সে যে কখন নিজে নিজেই ভাঙ্গাচোরা গান তৈরী করছিল তার ঠিক নাই।

তার চোখে জল—গানের প্রথম নাই শেষ নাই—সে শুধু গাইছিল—

"সারাটি রজনী জাগিলাম যদি
সারা দিন কি গো যাবে কাঁদিয়া
আমার জনম মরণ শেষ হয় যদি তবু কি তোমারে পাব না।"

গান গাইতে গাইতে নিঃশব্দে চোখের জল তার গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। সমস্ত অন্তর যেন শুধু এই কথা কটিকে আশ্রয় করে তার সমস্ত বেদনা প্রকাশ করতে লাগলো।...... আমার দিন গেল রজনী গেল বঁধু তোমার বিহনে ; আমার বক্ষে বেদনা নয়নে অশ্রু নিয়ে আরো কত দীর্ঘ দিন এই ভাবে কেটে যাবে—আমার মরণের পরেও কি তোমাকে পাব না ?......

কমল কাউকে স্মরণ করতে পারলো না—কাউকে তার জীবন-মরণের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না—শুধু গম্ভীর বেদনাভরে বার বার গাইতে লাগলো—আমার জীবন মরণ শেষ হয় যদি তবু কি তোমাকে পাব না ?......

এ বেদনার যেন শেষ নাই এ কান্নার যেন শেষ নাই এ ভাষার অর্থও যেন অনন্ত। কোথায় যে তার আকাঙ্খা কি যে সে চায় তা' সে সাহস করে' ভাবতে পারছিল না, শুধু বেদনায় কাঁদছিল—ওগো জীবন-মরণের বাঞ্ছিত দেবতা—আমার জীবন এবং মরণ এর সমস্ত দিনের পরিসমাপ্তির পরেও কি কখনও তোমাকে পাব না ?......

--বাবু—জাহাজের একটা ছোকরা চাকর তার হাতে একটা স্লিপ গুঁজে দিয়ে গেল।......

কমল চোখ মেলে দেখলো নাম নাই সম্ভাষণ নাই শুধু দু' ছত্রের নিমন্ত্রণ চিঠি :—তোমার প্রতীক্ষা করছি—নিশ্চয় এস।......

চিঠি পড়ে' কমলের মুখ শক্ত হ'য়ে গেল। জ্যোস্নার কুহেলীভরা তার সোণার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে সে নিজের কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' শু'য়ে পড়লো।

চোখের জল হয় ত তখনো শেষ হয় নাই।

চিঠিখানা যে পাঠিয়েছে তার নাম ফ্লোরা—একলা নিজের দেশে ফিরে চলেছে। কমল জাহাজের কাজে তার কাছে অনেকবার গিয়েছে এবং তার স্বপ্নভরা চোখ এবং

ম্লানমুখ যে কি করে এই বিদেশী নারীর কাছে এত ভাল লেগেছে তা ভেবে তার নিজেরই বিস্ময় লাগে। আভাষে ইঙ্গিতে ছলনায় ফ্লোরা কমলকে বহুবার তার অভিপ্রায় জানিয়েছে কিন্তু তাকে সে পায়নি। কমলের মন তখন দেহের কামনা ছেড়ে অন্য কিছুর আকাঙ্খায় ডুবে গেছে তাই তার যৌবন এবং ছলনা কমলকে একদিনের জন্যও প্রলুব্ধ করতে পারেনি। আজো পারলে না।

আরো দিন দুই কেটে গেছে। ফ্লোরার সাথে কমলের এর মাঝে একবার দেখা হয়েছিল। তাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই কমল পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। ফ্লোরা চাপাকণ্ঠে বলেছিল, "সেদিন সন্ধ্যা না হতেই সমস্ত আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌লো। অল্প অল্প বৃষ্টি এবং বাতাস দেখা দিয়েছে। জাহাজের কাপ্তেন বিপদ-বিজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার নিজের কেবিনে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে। রাত্রি গভীর না হতেই ডেক জনশূন্য—শুধু জাহাজের কর্ম্মচারীরা এদিকে ওদিকে কর্ম্মে ব্যস্ত—কমলও তাই।

জাহাজের দোলা ক্রমেই বাড়তে লাগলো কমল তখনও ডেকে। ঝড় যত বাড়তে লাগলো তার হৃদয়ও কেন জানি শ্রাবন মেঘের ডাকে উতলা ময়ূরীর মত পুলকে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। বহুদিন একঘেয়ে অলস জীবনের পর আজ বিশ্ব প্রকৃতির এই উন্মত্ততার সঙ্গে তার যৌবনের লীলা-চঞ্চল বক্ষরক্তও যেন মেতে উঠতে লাগলো। রক্তের দ্রুত চঞ্চলতা তার হৃদয়কে মদের নেশার মত ফেনিয়ে তুলতে লাগলো। বহুদিন পরে সে আজ তার হৃদয়ের অশ্রুকুহেলী ঠেলে চারিদিকে চোখ মেলে তাকাবার ক্ষমতা ফিরে পেল ---যেমন ফিরে পায় দীর্ঘ শীতের শেষে হতচেতন সরীসৃপ। গত কয়েক মাসের দুর্ব্বলতা এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস স্মরণ করে, সে হো হো করে হেসে উঠ্‌লো।—কী দুর্ব্বল সে—কি কাল্পনিক দুঃখে সে তার জীবনকে, তার বর্ত্তমানকে অবহেলা করেছে! মনের আনন্দে সে কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর মত কেবিনের দরজায় গিয়ে যাত্রীদের কুশল প্রশ্ন এবং প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

ফ্লোরার ঘরের কাছে গিয়ে একটুখানি চুপ করে দাঁড়াল—দরজা খোলা এবং ঘরের অধিকারী জাগ্রত। কমল বক্ষের দ্রুত চঞ্চলতা উপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলো - কিছু প্রয়োজন আছে মিস্‌......

না—ধন্যবাদ—ফ্লোরার মুখ গম্ভীর এবং কঠোর। কমল মনে অত্যন্ত আঘাত পেল—আজ তার বসন্তের দিনে সে যাকে উপেক্ষা করবে না ভেবেছিল সেই তাকে অবহেলায় ফিরিয়ে দিল।......

ঝড় হয়েও হ'লো না—অঝোর ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—কেবিনের দরজা সব বন্ধ—যাত্রীরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। কমল জল বাঁচিয়ে চুপ করে একটা নিরালা কোনে বসে' আছে। তার চোখে ঘুম নাই। রাত্রির গভীরতা এবং নিস্তব্ধতা, সমুদ্রের মৃদু কল্লোল, বৃষ্টিধারা এবং মেসিনের সমবেত শব্দ তার সন্ধ্যাবেলার উত্তেজিত মনের উপর দুরন্ত প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো।

কমল যত ভাবে না দুঃখ করবোনা শক্ত হব—ততই তার মন যেন ভিতরে ভিতরে অজানা এক ব্যথায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। সন্ধ্যাবেলা যে অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার মন দ্বিগুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। বাতাসের অশান্ত মাতলামী রুদ্ধ হৃদয়ের দীর্ঘ নিশ্বাসের মত তার চারি পাশে হুহু করে বয়ে যাচ্ছে—জলকল্লোলের চাপা শব্দ যেন কোন ব্যথিত বক্ষের গুমরে-ওঠা বেদনা—অন্ধকার আকাশে সজল মেঘের ডাক—তার বুক চিরে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

যে কান্নার সুরের সাথে সে এতদিন অভ্যস্ত তাই আবার তার অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বাইরের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার সম্মুখে পিছনে পার্শ্বে অনন্ত শূন্যতা—মনে শতযুগের জমা-করা অন্ধকার। কমল আপনার বলে' কাউকে ভাবতে পারলো না—বন্ধু বলে কাউকে ভাবতে পারলো না। এই সঙ্গীহীন স্নেহহীন একলা জীবন নিয়ে সে সম্মুখের অন্তহীন অন্ধকারে কিসের আশায় চলেছে।......আজ যদি তার মৃত্যু হয় এখনি এই খানে তা হলেও সে তার চির বিদায়ের আগে নিজের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে কোন পরিচিত স্নেহব্যাকুল মুখের কাতর দৃষ্টি—কারু ব্যাকুলতা কারু বিন্দু অশ্রু কারু একটু সান্ত্বনা সে

পাবে না! এই ত তার জীবন। নিজের অসহায় অবস্থা এবং নিঃসঙ্গ জীবনের গ্লানি স্মরণ করে কাঁদতে লাগলো।

ফ্লোরা যে কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে জানে না। পিঠের উপর মৃদু চাপ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে সে ফ্লোরাকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। ফ্লোরা লোক চেনে—। কমলের চেয়ারের হাতলের উপর বসে দু'হাতে তার মাথা নিজের সুকোমল বক্ষের উপর ন্যস্ত করে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে।

কিছু না—

ফ্লোরা খুব মিষ্টি সুরে বললো—না হয়েছে, বল, বলবে না আমায়?

কমল তার বুকে মুখ রেখে আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো।

ফ্লোরা মমতা-ভরা সুরে বল্লো—এস আমার কেবিনে, লক্ষীটি এস।

কমল মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করলো।

কেবিনের দরজা বন্ধ করে মৃদু নীল আলোক জ্বালিয়ে ফ্লোরা তার অতিথিকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার মনে কি দুঃখ আছে আমায় বল ত', পারবে না বল্‌তে? কমল জলভরা চোখে চেয়ে থাকে। কমলের হাতে ঠেকতে সে চমকে উঠ্‌লো।

—একি তোমার হাত এত ঠাণ্ডা, নিশ্চয় এই ঝড়বৃষ্টিতে বাইরে বসে' থাকার জন্য হয়েছে। দাঁড়াও আমি এর ব্যবস্থা করছি! সে উঠে দাঁড়িয়ে কমলের মুখটা দু'হাতে নেড়ে তাকে একটু সজীব করে' আলমারী খুলে ব্রাণ্ডি সোডা এবং একটা প্লেটে খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে কমলের সামনে রাখলো।

—খাও বলে সে জোর করে একখানা বিস্কুট কমলের মুখে গুঁজে দিল।

মদ কমল কোন কালেই খায় না—তবু আজ ফ্লোরা যখন তার হাতে গ্লাস দিতে এল সে বিনা আপত্তিতে তুলে নিল! ফ্লোরার চোখে চোখ রেখে শুধু জিজ্ঞাসা করলো কতখানি দিয়েছ, বেশী দাও নাই ত'?

ফ্লোরার মুখ দীপ্তিতে উজ্জ্বল—না, না, খাও কিছু হবে না। কমল গ্লাস তুলে মুখে দিল। মদের নেশায় সে ক্রমশঃ গম্ভীর হ'য়ে পড়ছিল—ফ্লোরা চুপ করে তার স্তব্ধ বিষণ্ণ সুরা-উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ফ্লোরা শেষ পাত্র পূর্ণ করে তার হাতে দিয়ে বল্লো—খেয়ে নাও, তারপর চুপ করে শুয়ে থাক—রাত অনেক।

—এই যে খাই—

আরো খানিকক্ষণ পরে ফ্লোরা অনিচ্ছায় জিজ্ঞাসা করলো—আর খাবে?

—না—তারপর জড়িত কণ্ঠে ডাক্‌লো, ফ্লোরা—

কি বল—সে কমলের খুব কাছে এসে বস্‌লো।

আমার কতগুলি কথা শুনবে—

—অনেক ত শুনেছি—আজকে থাক কাল ব'লো।

না— আজই বলবো।

কমল জড়িত কণ্ঠে তার জীবনের সব চেয়ে গোপন ব্যথার ইতিহাস তার রাত্রি-জাগার সাথীকে শুনাল। তার মধ্যে তার কত ব্যথা কত অভিমান তা ফ্লোরার বুঝতে বাকী রইল না।

কমল যখন বারবার বল্‌তে লাগলো—ফ্লোরা, আমার জীবন ভালবাসার অভাবে এত শুষ্ক যে তার দাহ আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে, তুমি কি আমায় ভালবাসতে পার না? ফ্লোরা জবাব দিল—কিন্তু তুমি আমাকে প্রতিদিন অবহেলা এবং অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছ আজ আমিও তোমাকে ফিরিয়ে দেব। তোমাকে ভালবাসা আমার অসম্ভব।

—কেন?

—আমিত বলেছি স্বেচ্ছায় তুমি যখন আমায় চাওনি তখন অন্যের উপর যে ভালবাসা তোমার আছে তাতে আমি হস্তক্ষেপ করবো না।

কিন্তু আমিত বলেছি তাকে আমি ভালবাসিনা, ভাল-বাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কেন বারবার তুমি সেই এক কথাই তোলো?

যে কারণেই হোক তোমাকে আজ আমি ফিরিয়ে দেব—আমারও ত' আত্মসম্মান আছে—যখন আমি তোমাকে চেয়েছি তখন তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ—আর আজ তোমার প্রয়োজনে তুমি ডাকলেই আমার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে এতটা কাঙাল ত' আমি নই—কমল বিহ্বল দৃষ্টি তুলে বল্‌লো—ফিরিয়ে দেবে?—সে যেন

ঠিক বুঝতে পারছিল না এ ছলনা না সত্য, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—যদি তুমিও আজ আমাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে এ সমুদ্রে আমি ঝাঁপ দিয়ে মরবো। আমি তা'হলে জানবো যে জগতে আমার কোন প্রয়োজন নাই—কোন কাজ-নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই। তারপর ফ্লোরার খুব কাছে সরে এসে তার হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লো—কিন্তু ফ্লোরা আমি ত' তোমায় ভালবাসি—কাল পর্য্যন্তও হয়ত তোমায় আমি ভালবাসতাম না কিন্তু আজ যে তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমি যে আমার সব চেয়ে প্রিয় একথা ত' আমি অস্বীকার করি না, তা'হ'লে কেন তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে?

ফ্লোরা তবু চুপ করে বসে'—এবং খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ উচ্চ হাসি হেসে বললো—Beware of women—মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থেকো—তা' নইলে জীবনে আরো দুঃখ পাবে! অত দুর্ব্বল মন নিয়ে সংসারে চলে না—বুঝলে?

কমল বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো—বহুক্ষণ ধরে'।

ফ্লোরা শেষে বললো—নাও ওঠ—যাও—চুপ করে আমার বিছানায় শুয়ে থাক, তুমি বড় পরিশ্রান্ত।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কি—?

—কোথায় শোবে?—

সে তোমার ভাবতে হবে না—যাও শোওগে—

কমল ভাল ছেলের মত বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে তার ক্লান্ত অঙ্গ এলিয়ে দিল এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফ্লোরা যখন বেশ পরিবর্ত্তন করে' আলো নিভিয়ে তার পাশে এসে তার শয্যার অংশভাগিনী হ'তে চাইলো কমল আস্তে আস্তে বললো—আমি জানতাম তুমি আসবে।

ফ্লোরা জবাব দিল না, কমল তার বক্ষের অতি কাছে জীবনে প্রথম একটি পরিপূর্ণ নারী-দেহের মৃদু তপ্ত স্পর্শ অনুভব করলো। সেদিন সে উচ্ছৃঙ্খল বাদলার রাত্রে কমলের অতৃপ্ত যৌবনে ফ্লোরার দেহ সারারাত্রি বিনিদ্র উৎসবের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। কমল তাকে বলেছিল, তুমি আমার অগ্নিশিখা;—আরো বলেছিল—এতদিন আমি ভাবতাম যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যে নারী আমার গৃহে তারার মত জেগে থাকবে সে নারী যেন ঠিক আমার বোন রমার মত হয় কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে—ফ্লোরা, যদি সমস্ত জীবন ভরে' তোমায় আমি এমনি করে' পেতাম।

* * * *

কমল এবং ফ্লোরার পরিচয় জাহাজের প্রত্যেকের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে—এবং তারা উভয়েই সেই কথা জানে। প্যারিসের উপকূলে কমল জাহাজ হ'তে বিতাড়িত হ'ল।

ফ্লোরা চোখের জলের ভিতর বল্লো—বন্ধু অবশেষে আমিই তোমার বিপদের কারণ হ'লাম।

কমল বল্‌লো—না, আমার অন্ধকার জীবন ঊষার আলোয় রাঙিয়ে তুমিই যে আমার মুক্তির দূতী হ'য়ে এসেছ, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ফ্লোরা কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লো—না বন্ধু না, আমি জানি আমি বুঝেছি আমি তোমায় কি করেছি।

কমল হাস্‌তে চেষ্টা করে দু'হাতে ফ্লোরার মুখখানি তুলে ধরে বল্‌লো—তুমি আমার যা করেছ তা না করলে' আজ আমার চোখের জল ত' তুমি পেতে না! জীবনে যদি কখনও আমার কথা মনে হয় তখন একথা বিশ্বাস করো যে তোমাকেও আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। জীবনে প্রথম দুঃখ এবং প্রথম প্রেমের মত প্রবল জিনিষ আর কিছু নাই এবং তাকে পাওয়া এবং হারানোই সংসারে সবচেয়ে বড় আঘাত। আমার প্রথম দুঃখ আমি পেয়েছি—আমার প্রথম প্রেম তোমাকে আমি নিবেদন করলাম, এ যে কত বড় ব্যথা তা সেই বুঝতে পারবে যার জীবনের অভিজ্ঞতায় এর ক্ষত-রেখা চিহ্নিত আছে।

ফ্লোরা ব'লল—কিন্তু আমিও যে তোমাকে ভালবেসেছিলাম তাতে তোমার সন্দেহ নাই ত'?

—ফ্লোরার অশ্রুভরা দুটি চোখ চুম্বন করে' কমল জবাব দিল,—ওগো বিদেশিনী, তোমার ভালবাসা আমি জীবনে কখনও ভুলবোনা—তোমাকে যে জীবনে আমি প্রথম ভালবেসেছিলাম একথা কেন ভুলে যাও?

—মনে থাকবে—

হাঁ—কোন রকমে কমল জবাব দেয়। দুজনে তারা কাঁদে, একে অপরকে ভোলায়, কমল কাঁদে বেশী, ফ্লোরা

তার চোখের জল মোছায়। চিরন্তন নারী চিরদিনকার দুর্ব্বল পুরুষের ললাটে মমতার জয়টিকা পরিয়ে দেয়—কমল অশ্রু মুছে বিদায় নেয়। ফ্লোরা তখন সহযাত্রীদের কাছে, --স্থগিত অন্তরে বেদনার বহ্নি।

—আমার প্রথম দুঃখ আমি পেয়েছি আমার প্রথম ভালবাসা তোমাকে দিলাম—যে অতিথি চিরজীবনের মত তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার শেষ কথা স্মরণ করে' ফ্লোরা অসহ্য বেদনায় অবিরল অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো।

কমল চিঠি লিখে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে টাকা আনিয়েছে—ফ্লোরা বিদায়ের আগে যে টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিল সে টাকাও সে একদিন পাঠিয়ে দিল। সেই দিন চোখের জলের ভিতর কমলের দিন কেটে গেল। তারপর নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুদূর প্রবাসে সঙ্গীহীন কমলের সে কি অক্লান্ত পরিশ্রম। ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিন বৎসর কেটে গেছে। সংসারের পথে ঘা খেয়ে খেয়ে কমলের ভালবাসার মোহ কেটে গেছে। নারীকে সে আর ভালবাসে না—জীবনের একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে তার মূল্য যাচাই করে। লাভ লোকসানের ওজন করে। ফ্লোরাকে হারানোর ক্ষত আজও তার বুক হ'তে মুছে যায় নাই কিন্তু যে আনন্দ যে মাধুর্য্য তাকে বিদায় দেওয়ার সাথে সাথে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, দীর্ঘ দিনের অবসানে সেটুকু ফিরিয়ে আনার আগ্রহ এবং ধৃষ্টতা তার নাই। তাই দীর্ঘ তিন বৎসর পরে সে যখন দেশে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল, ফ্লোরাকে সে শুধু লিখেছিল—ফ্লোরা আমি শীঘ্রই দেশে যাচ্ছি—হয়ত আর কখনও আসবোনা। তোমাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম যে তোমার কাছে যাব, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নাই—তোমারও না আমারও না। তুমি আমাকে একদিন ভালবেসেছিলে। হয়ত তুমি আজ সে কথা ভুলে গেছ কিন্তু তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি তাকে অবহেলা করে ভুলে থাকি এত শক্তি আমার নাই। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলেই আমার চরম দুঃখের দিনগুলি আমি ভুলতে পেরেছিলাম—এবং হয়ত আজ তোমার অভাবও যে আমার হৃদয়ে তত বেদনার সঞ্চার করে না এও তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে। তুমি আমার হৃদয়-কুটিরে সন্ধ্যা-প্রদীপ, যা দুঃখের দিনে কাছে টানে এবং বিপদের দিনে দূর পথের সন্ধান দেয়, তুমি আজো আমার অগ্নিশিখা, আজো আমার মুক্তিপথের অগ্রদূত—তোমাকে শত শত নমস্কার। বিদেশী বন্ধু আজ বহু বেদনা এবং বহু শ্রদ্ধার সাথে তোমাকে স্মরণ করে বিদায় প্রার্থনা জানাচ্ছে। আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করো।

একদিন হেমন্তের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় সে যখন বোম্বাইয়ের ঘাটে পদার্পণ করলো তখন সে তার সমস্ত অন্তরে বিশ্বের শূন্যতা অনুভব করতে লাগলো। আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে সে সজল নয়নে এই প্রার্থনা করতে লাগলো—ভারতবর্ষ থেকে বহু বেদনা নিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম—আজ আমি আবার সে স্থানে ফিরে এলাম; ওগো অলক্ষ্য দেবতা, আমি ধন চাই না, মান চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, আমাকে তুমি শুধু এইটুকু দয়া কর যেন আমি আবার আমার পূর্ব্বের স্থানে ফিরে আসতে পারি—মাঝের এই তিনটি বছরকে যেন স্বপ্ন বলে' মনে করতে পারি।

মাতা যেমন বহুক্ষণ উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার পর সন্তানকে কোলে পেলে দেহ এবং মনের সব কিছু দিয়ে তার স্পর্শ অনুভব করে তেমনি সে রাত্রে হোটেলে শুয়ে শুয়ে কমল ভারতবর্ষের সব কিছুকে তেমনি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগল হ'য়ে উঠ্‌লো। কলকাতার মেসের জীবন, সেখানকার পরিচিত কত বন্ধু; রমা, সেই পিসীমার বাড়ী সেই সহজ জীবন ভাবতে ভাবতে কমল উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌লো। রাত্রি যেন আর কাটে না। কখন ভোর হবে কখন সে দিল্লী যাবে—এতকাল পরে হঠাৎ আচমকা উপস্থিত হ'লে পিসীমার গৃহে সে কি উৎসব, কি কোলাহল, রমা কি বলবে ভাবতে ভাবতে সে যেন আর কোন শেষ পায় না। পরদিন প্রথম গাড়ীতেই সে দিল্লী রওনা হ'ল। গাড়ী যখন বাড়ীর কাছাকাছি উত্তেজনায় তার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপছে—গাড়ী থামতেই সে গাড়ী হ'তে লাফিয়ে পড়ে' দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

—পিসীমা—বলে ডাকতেই পিসীমা ছুটে এলেন,

—একি কমল—তুই—?

যে পিসীমার সাথে তার এক মাসের বেশী সাক্ষাৎ নাই তারি বুকে মাথা রেখে কমল ছেলেমানুষের মত চোখের জল ফেলতে লাগলো।

পিসীমা তার মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলাতে লাগলেন। রমা এসে পায়ের ধূলা নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। কমল অনিমিষ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল।

রমা অনেকটা বড় হয়েছে। সে চাঞ্চল্য নাই, অনেক যে তখন ছিল স্কুলের বেণীদোলানো লীলাচঞ্চলা কিশোরী সেই আজ যৌবনভারাবনতা কলেজের ছাত্রী। কমল আজ আর তাকে বাঘের গল্প বলতে পারে না।

সাত আট দিন কমল সেখানে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে ছিল। রমা এখনও গল্প শোনে তবে সে গল্পের সুর এবং সৌন্দর্য্য আলাদা। তার রূপকথার রাজপুত্র আজ সাত সমুদ্র তের নদী—কত তেপান্তরের মাঠ দুধসাগর পার হ'য়ে সোণার সিংহাসনে রাজমুকুট পরে' রাজা হয়েছে। তার ইতিহাস জানায় রমার আজ আর আগ্রহ নাই। কমল তার প্রবাস-জীবনের গল্প বলে; রমা শোনে—প্রশ্ন করে—কত কথা জানার চেষ্টা করে। বলে—আচ্ছা ছেলে যা হোক; বলা নাই কওয়া নাই একেবারে সাগর পার। পুরাকালে লঙ্কাদ্বীপে বন্দিনী সীতার খবর তুমিই নিশ্চয় রামচন্দ্রকে এনে দিয়েছিলে—নইলে সাগরপারে যাওয়ার এত ঝোঁক!......

কমল হাসে।

আরো দু'একদিন পরে কমল পিসীমাকে বল্লো—পিসীমা এইবার যাই কলকাতায়?—কত কাজ সেখানে...

পিসীমা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় দিলেন। বল্লেন—কমল লক্ষ্মী ত' সোণা ঘরের ছেলে ঘরেই থাকিস বাবা—বিয়ে করে' সংসারী হ'। অমত করিসনে—বাপের বংশে তুই ত' একমাত্র আছিস।

কমল বলে—সেই জন্যইত সে বংশের আর নাম ডুবাতে চাই না—আমি ম'লে বংশকে ডোবাবার আর কেউ থাকবে না

পিসীমা বল্লেন—বালাই, ষাট—ছেলের কথা দেখ।

কমল হাসতে হাসতে বিদায় নিল—চলি পিসীমা—রমা, চল্লুম—

রমা বল্লো—সুবিধা পেলেই এস কমলদা...

গাড়ীতে বসে' বসে' কমলের মনে শুধু এই কথা ক্রমাগত পাক খেতে লাগলো—সেই রমা আজ এই হয়েছে—আজ আর সে তার বিদায়েতে কাঁদে না—বাড়ী যেতে চাওয়া ত' ঢের দূরের কথা।......কমল সম্পূর্ণ বদলে গেছে তবু তার বুকেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘনিয়ে ওঠে। আগে সে ভেবেছিল ভারতবর্ষে সে যখন আসবে তখন না জানি কি সৌভাগ্য কি আনন্দ কি আয়োজনই না তার জন্য অপেক্ষা করছে। আনন্দের আতিশয্যে সে তাই পিসীমার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল। কিন্তু এ স্বপ্ন তার আস্তে আস্তে ভেঙ্গে আসছিল। তার মনে হল' জীবন তার অভিশপ্ত, ঘর বাঁধার আয়োজন করতেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কেটে যাবে—ঘর বাঁধা তার আর হবে না সমস্ত জীবনটা সে যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে,—সঞ্চয় করার মত তার কি আছে—কি অবলম্বন নিয়ে সে সংসারে দাঁড়াবে? কোথায় তার আশ্রয়?

এই সব চিন্তা তাকে পাগল করে তুল্তো তাই মন থেকে জোর করে এই চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে সে বারবার বলতে লাগলো—না না আমার সবি আছে। কলকাতায় মেসের জীবনে একদিন আমার সব আনন্দ ছিল—অন্ততঃ নিরানন্দ ছিলনা—আমি আবার সেই জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেব। কোন আশা করবো না—কারু ভালবাসায় আমার প্রয়োজন নাই—সংসারে যে আমার কেউ নাই এ কথা আমি আর ভুলবোনা—আমি আমার জীবনের অল্পপরিসর রাস্তাতেই আবার নূতন করে চলা সুরু করবো।

ভোর সাতটায় সে ক'লকাতায় এসে পৌঁছুল। হোটেলে জিনিষপত্র রেখে সে তার পুরানো মেসে এল অনন্তর খোঁজে। মেসের বহু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে—পুরাণো বাসিন্দা প্রায় কেউই নাই। পুরাণো দারোয়ান ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো—বছরখানেক আগে অনন্ত এ মেস ছেড়ে চলে গেছে।

—নাই? কমলের বুকে আবার আঘাত লাগলো-তার ঠোঁট চিরে কঠিন হাসি ফুটে বার হ'ল, এ বিরাট জনসমুদ্রে আমার পরিচিত কেউ নাই—যেখানে যাই

সেখানে বিফলতা, যা চাই মৃগতৃষ্ণিকার মত তা দূর হ'তে দূ'রে সরে যায়।

বেলা ক্রমে বাড়তে লাগলো। কলকাতায় হেমন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধতা মিশে গিয়ে রৌদ্র ক্রমে প্রখর হ'তে লাগলো। কমল এপথ ওপথ অকারণে উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে একটা গলির সামনে আসতে হঠাৎ তার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল জাগল, মনে পড়লো—একজন ত তাকে একদিন বলেছিল—ভালবাসি, ভালবাসি—আজ জীবনের এই দুঃসময়ই সে ভালবাসার মূল্য যাচাই করার প্রকৃষ্ট সময়।

সে যদিও জানতো সুদূর অতীতে একদিন যাকে ভাল-বাসি বলে মনে হয় অদর্শনে এবং কালের পরিবর্ত্তনে সেই ভালবাসাকেই জীবনের পর মুহূর্ত্তে স্মরণ করলে হাসি পায় তবু সে না গিয়ে পারলো না। সে নিজের মনে মনে বললো—যে একদিন প্যারিসের বুকে বসে নারীর দেহ এবং নারীর প্রেম নিয়ে খেলা করে বেড়িয়েছে—সেই আজ এতকাল পরে আবার প্রেম ভিক্ষার আশায় চলেছে বেশ্যার কাছে ?

একটা পরিচিত মুখ দেখার জন্য সে যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে—তার মন তখন এত অসহায়। সে চায় কারু কাছে সে আজ নিজের দুঃখের কথা বলে' কেঁদে নিজেকে হাল্কা করে।

—পদ্ম সেই বাড়ীতেই আছে; কমল তাকে কি বলেছিল তা তার নিজেরই মনে নাই, তবে পদ্ম তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার এখন অন্য বাবু আসে।

কমল আবার পথে খানিকটা চলে—আবার থামে—সহরে কোথায় যাই। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে আসছে; রাস্তার কল টিপে সে অঞ্জলি করে জল খেতে মুখ নীচু করে দাঁড়ালো। কলে এক ফোঁটা জল নাই। নিশ্বাস চেপে সে পথ চলতে লাগলো। তাপ মনে হ'তে লাগলো যেন দীপ্ত মধ্যাহ্নের কঠিন পিচ্ছিল পথের উপর থেকে একটা আগুনের জ্বালা ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে লেলিহান জিহ্বা মেলে ছুটে চলেছে। সে কপালের দুফোটা তপ্ত ঘাম জামার হাতায় মুছে স্খলিত পদে এগিয়ে চল্‌লো।

কোথায় কে জানে!

পথহারা পাখী সারাক্ষণ উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সাথে যুদ্ধ করে' এগিয়ে এসেছে তার কুলায় আশ্রয় আশা ক'রে—গৃহে ফিরে সে দেখে, শাখা তার ছিন্ন, নীড় তার ভগ্ন,—সে অবশ দেহে ঝড়ের বাতাসে ছেড়ে দেয় আপনাকে—ঝড় তাকে নিক্ষেপ করে কঠিন মাটির তলে।

এই ত জগতের নিয়ম—তাতে দুঃখ কি? [সমাপ্ত]

বাঙ্গালা-সাহিত্যে সনেট্

[শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত]

সনেট-কবিতার (চতুর্দ্দশপদী কবিতা) উৎপত্তি ইটালীতে এবং রেণেসাঁর (Renaissance) কবি ফ্রান্সিস্কো পেট্রার্ক ইহার উদ্ভাবক। পেট্রার্ক স্বীয় প্রণয়িনী ল্যরার (*Laura*) উদ্দেশে প্রেমাঞ্জলি নিবেদনের অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রথম এই বিশিষ্ট technique (রীতি)টী আবিষ্কার করেন। তৎপরে তাঁহার দেশবাসী মহাকবি দান্তে ও ট্যাসো যথাক্রমে স্ব স্ব প্রণয়িনী বেয়াট্রিস্ (Beatrice) ও এলিওনরার (Elionora) উদ্দেশে অসংখ্য সনেট রচনা করিয়া ইটালীর সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। '*Lusid*' কাব্যের রচয়িতা ডাচ্ কবি ক্যাঁমিস্ এবং প্রথম রেণেসাঁর অনেক ফরাসী কবিও ইটালীয় কবিদের অনুকরণে সনেট রচনা করেন। এইভাবে ক্রমে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইউরোপীয় অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যে সনেটের অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং সনেটের চরমতম বিকাশ ইরাজীতেই লিখিত হয়। এই জন্য নিম্নে ইংরাজী সনেটের ইতিহাসটা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।—

ইংরাজী সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগে স্যার টমাস ওয়াট্ (Wyatt) সর্ব্ব প্রথম ইটালী হইতে সনেট আমদানী করেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারই সমসাময়িক সুরে (Surrey) এবং অল্প দিন পরেই স্পেন্সার, সিডনী ও সেক্স্‌পিয়ার সনেট লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইটালীয় অর্থাৎ পেট্রার্কীয় সনেটের সহিত এলিজাবেথীয় সনেটের অনেকগুলি পার্থক্য আছে— প্রথম উভয়ের রচনা-পদ্ধতির পার্থক্য—। পেট্রার্কীয় সনেটের চৌদ্দটী লাইন নির্দ্দিষ্ট দুইটী ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের আট লাইনের নাম Octave ও তাহার মিলনের রীতি ***ab ba, ab ba*** ; দ্বিতীয় ভাগের ছয় লাইনের নাম Sestette এবং এই অংশে মিলনের তেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, যেমন, *cd cd cd*, অথবা *cd dc cd*, অথবা *cde cde* ইত্যাদি। কিন্তু এলিজাবেথীয় সনেটকে সাধারণতঃ এই ভাবে নির্দ্দিষ্ট দুইটী অংশে ভাগ করিয়া লওয়া হইত না, "it consisted of three quatrains followed by a couplet"—অর্থাৎ ইহা হইতেছে চার লাইন বিশিষ্ট তিনটী পংক্তি ও দুই লাইন পয়ারের সমষ্টি এবং ঐ চার-লাইন-বিশিষ্ট পংক্তিগুলির মিলনের রীতি হইতেছে *ab ab, cd cd, ef ef*। আকৃতির দিক ছাড়া প্রকৃতির দিক দিয়াও পেট্রার্কীয় সনেটের সহিত এলিজাবেথীয় সনেটের কিছু পার্থক্য আছে।*

পেট্রার্কীয় সনেটের কতকগুলি বাঁধা কানুন্ (canon) ছিল—যেমন, সনেটের প্রতিপাদ্য বিষয় একাধিক হইবে না এবং সে বিষয় স্বভাবতঃই কবির স্বকীয় প্রেম-সম্বন্ধীয় হইবে; Octaveএ যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইবে Sestetteএ তাহারই উপসংহার করিতে হইবে— ইত্যাদি ইত্যাদি। এলিজাবেথীয় সনেট-লেখকরা এ সব আইন-কানুন ও বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলেন নাই, তাঁহারা নানা বিষয়ের উপরই সনেট লিখিয়াছেন, এমন কি সাধারণ চিঠিপত্র পর্য্যন্ত। পরবর্ত্তীকালে মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি করিয়া রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম যেখানে যত কিছু অন্যায়, অসত্য, যত কিছু গলদ আছে সে সমস্তেরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সনেট লিখিয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার কথা যে একেবারে বাদ গিয়াছে তাহা নয়। ফলতঃ তাঁহারা ক্লাসিক ও রোমান্টিক উভয় আদর্শের—সে প্রাণ এবং অবয়ব উভয় দিক দিয়াই—অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সনেটের ভিত্তিকে চিরস্থায়ী ভাবে উন্নত ও পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ইংরাজী

* অবশ্য ওয়াট মূল ইটালীয় আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম-সাময়িকদের মধ্যে ড্যানিয়াল, ড্রেটন প্রভৃতি কবিরা পেট্রার্ককেই অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুরে হইতেই এই নূতন রীতির প্রচলন আরম্ভ হয়।

সাহিত্যের কতকগুলি বিখ্যাত সনেটের নাম করা গেল। কৌতূহলী পাঠক আবশ্যক বোধ করিলে সেগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

ড্রেটনের *'A Parting'* ; সিড্‌নীর *'On sleep'* ; স্পেন্সারের *'To my Lady'* ; সেক্সপিয়ারের *'Let me not to the marriage of noble minds'*, *'Shall I compare thee to a Summer's day ?'*; মিল্টনের *'On his Blindness'*, *'Avenge O Lord !' 'Thy slaughtered saints'*, *'On his arriving at the age of Twenty three'*,—

—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের *'Westminister 'Milton'*, *'The World is too much with us'* ; বাইরণের *'On the castle of Chillon'* ; শেলীর *'Ovymandias'* ; কীট্‌স্‌এর *'To Fanny'*, *'To one long in city pent'* ; টেনিসনের *'Bounaparte'* ; ব্যারেট ব্রাউনিং-এর *'How do I love thee, let me count the ways'* ; রসেটীর *'Lost days'* ইত্যাদি।

[২]

ইহাই গেল সংক্ষেপে ইংরাজী সনেটের কথা। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বাঙ্গালা-সাহিত্যে সনেটের কথা বলিতে গিয়া ইংরাজী সনেটের ইতিহাস বিবৃত করিবার সার্থকতা কি ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সনেট সম্বন্ধে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অনেকেরই বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই, কাজেই সনেটের উৎপত্তি ও পরিণতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস না জানিলে বাঙ্গালা সনেট-কবিতার মাধুর্য্য বা রস উপলব্ধি তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ সুগম হইবে না। তদ্ভিন্ন সনেটের উৎপত্তিই ইউরোপীয় সনেট, বিশেষ করিয়া ইংরাজী সনেট হইতে ; সুতরাং ইহা অনেক রূপেই ইংরাজী সনেটের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত,—তাহা ছাড়া দুইটী স্বতন্ত্র ভাষায় সাহিত্যের এই একটা technique লইয়া এত অনুশীলন হইয়া গেছে যে এ দু'য়ের মধ্যে একটা তুলনায় সমালোচনা করাও যে একেবারে অসঙ্গত তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত সনেটের প্রবর্ত্তন করেন ইহাই সকলে জানেন। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতি-কাব্য' প্রবন্ধে নরহরি দাস প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'তাঁহার লেখা অনেকগুলি সনেট আছে'। তাহাতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—বৈষ্ণবীয় যুগে কি সনেট লিখিবার রীতি ছিল, তাই নরহরি বা জ্ঞান দাস সনেট লিখিবেন ? আপাততঃ এ প্রশ্ন অসমীচীন নয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি নরহরি বা জ্ঞান দাস ছাড়া, চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি কবিরও পয়ার ছন্দে গ্রথিত চতুর্দ্দশটী পদ বিশিষ্ট এক জাতীয় কবিতা আছে। বলরাম দাসের একটী সর্ব্বজন পরিচিত পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে পাইতে নবনী ॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন-মন্দিরে।
নিদ্রা-ভঙ্গে উঠি বৈসে পালঙ্ক উপরে ॥" ইত্যাদি।*

ইহা হইতে অনুমান হয় হয়ত সেকালেও চতুর্দ্দশ পদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কবিতা লিখিবার রীতি ছিল ; নচেৎ এতগুলি প্রাচীন লেখকের লেখাতেই ঠিক এক কালে চতুর্দ্দশ পদ বিশিষ্ট কবিতা পাওয়া যায় কেমন করিয়া ? তদ্ভিন্ন বররুচির নামে প্রচলিত অনেক সংস্কৃত সমস্যায় এবং ভর্ত্তৃহরির শতকের মধ্যেও চতুর্দ্দশ পদের কবিতা আছে। কাজেই এ দেশে চতুর্দ্দশপদী কবিতা যে একেবারে অপরিচিত ছিল তাহা বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে ইহা ঠিক যে, ইউরোপীয় সনেটের সহিত ইহাদের আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নাই। ইহারা সাধারণ পয়ারে গ্রথিত চতুর্দ্দশটী চরণের সমাহার মাত্র—অন্য আইন্‌-কানুন্‌ বা রীতি-নীতিও ইহাদের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে অবলম্বিত বিষয় ইহাদেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম—এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় কবিতার কথা প্রথমেই একটু বলিয়া রাখা হইল এই জন্য যে পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন এই শ্রেণীর কবিতা অনেক লিখিয়াছেন, যাহা এতদ্দেশে সনেট নামে পরিচিত

*রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

(৩

যাহাই হউক মাইকেলই প্রথম ইউরোপীয় আদর্শে সনেট্ লেখেন। ফরাসী দেশে লিখিত তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রারম্ভে তিনি পেট্রার্কের উদ্দেশে যে সনেট্‌টী লিখিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও মধুসূদন ইটালীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মূল পেট্রার্কও তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না এবং যদিও তিনি পেট্রার্ক হইতেই সনেট্ রচনার প্রথম প্রেরণা পাইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সনেট্ পড়িয়া এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে মধুসূদনের উপর ইংরাজী সনেটের প্রভাবও কিছু কম নয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, নেতা প্রভৃতির উদ্দেশে যে সমস্ত সনেট লিখিয়াছেন, যেমন 'কাশীদাস,' 'কালিদাস', 'কৃত্তিবাস,' 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,' 'সত্যেন্দ্র ঠাকুর' ইত্যাদি—তাহার প্রত্যেকটীর অনুরূপ সনেট্ ইংরাজী সাহিত্যে পাওয়া যায়; যেমন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের '*Milton*'; Matthew Arnold এর '*Homer*' '*Shakespeare*' Swinburneএর '*Charles Lamb*' ইত্যাদি। কোন পুস্তক পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে মধুসূদন যে সমস্ত সনেট লিখিয়াছেন, যেমন, 'শ্রীমন্তের টোপর' 'অন্নদার ঝাঁপি' ইত্যাদি – ইংরাজী সাহিত্যেও তেমনই কীট্‌স্-এর '*Chapman's Homer*', '*Lovers' Complaint*'; এণ্ড্রু ল্যাং এর '*Odyssey*' প্রভৃতি অসংখ্য সনেট আছে। তদ্ভিন্ন 'যশের মন্দির', 'দ্বেষ' এসবেরও অনুরূপ সনেট প্যালগ্রেভের পুস্তকেই অনেক পাওয়া যাইবে।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মধুসূদন দত্তের সনেটের মৌলিকতায় অবিশ্বাস করিতেছি। আমরা দেখাইতেছি শুধু তাঁহার সনেট রচনার মূলে ইংরাজী সনেটের প্রেরণা কতটুকু। নচেৎ তাঁহার প্রত্যেকটী সনেট তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সাধনালব্ধ, এই সনেটগুলি কবির দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব পরিচয় স্থল! বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালার কাব্য, বাঙ্গালার নদ-নদী, বন-উপবন, বাঙ্গালার পশু-পাখী, বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ, বাঙ্গালীর ভাষা—এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার আবাল্যের স্বপ্ন, সৌন্দর্য্যের লীলা-ভূমি প্যারিসেও তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বাহিরের সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী মধুসূদনে ও ভিতরের কবি মধুসূদনে সত্যকার পার্থক্য কতখানি তাহা যেমন এই সনেটে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তেমন 'মেঘনাদ বধে'ও হয় না 'ব্রজাঙ্গনা'তেও হয় না। এই জন্য বুঝি Rickett বলিয়াছেন, "The Sonnet is, after all, a personal reminiscence of the poet himself," কিন্তু আমরা দেখাইতেছিলাম বাঙ্গালা সনেটের গঠনের মূলে ইংরাজী সনেটের প্রভাব কতটুকু, সে প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক। কথায় কথায় অন্য কথায় আসিয়া পড়া গেল।

মধুসূদনের সনেটে লক্ষ্য করিবার আর একটী জিনিস আছে। তিনি পেট্রার্কীয় এবং এলিজাবেথীয় উভয় আদর্শেই সনেট লিখিলেও ইউরোপীয় সনেটের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক চরণে বক্তব্য সমাপ্ত না করিয়া পরবর্ত্তী চরণ পর্য্যন্ত যতি টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

যেমন —

"কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা-পর্ব্বতে
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরিশ।"—'বিদ্যাসাগর'।

ইহাদ্বারা সনেটে তিনি অমিত্রাক্ষরে প্রসারতা ও বেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন; সাধারণতঃ সনেট কবিতার যাহা দোষ—একঘেঁয়েমি,—তাহার হাত হইতেও তাঁহার সনেটগুলি এজন্য রক্ষা পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন মধুসূদন পেট্রার্কীয় আদর্শে লিখিত সনেট সমূহেও অক্টেভ্-সেষ্টেটের বাঁধাবাঁধি কোথাও মানেন নাই—কাজেই তাঁহার সনেটে বেশ একটী লিরিক্-সরলতা লক্ষিত হয়। মধুসূদনে সনেটের আবেগ আছে, ওজস্বিতা আছে, ব্যথা দিয়া অনুভব করিবার চিহ্ন আছে; সুদূর ফরাসী দেশে থাকিয়াও তিনি তাঁহার শৈশবের কপোতাক্ষীকে স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সতত হে নদ তুমি পড়' মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-বীণাধ্বনি; তব কল কলে
জুড়াই একাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে—
কিন্তু এ প্রাণের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতঃ রূপী তুমি মাতৃ-ভূমি স্তনে।"

হিব্রু, লাটিন্‌, গ্রীক্‌, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত মধুসূদন তাঁহার স্নেহের মাতৃ ভাষার উদ্দেশে বলিতেছেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পর-ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ—
পর দ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি!"

কিন্তু তাঁহার সনেটের প্রধান দোষ হইতেছে তাঁহার গভীর অনুভূতির (realization) অভাব, যে জন্য তাঁহার অমর কাব্য পর্য্যন্ত অনেক স্থলে আড়ষ্ট নীরসতা ও কষ্ট-কল্পনা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শেষ সনেটটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৪)

মধুসূদনের পরবর্ত্তী সনেট-লেখকেদের মধ্যে আমরা প্রথমে অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। * ইহার কারণ অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ সনেটের যে ধারার প্রবর্ত্তক, তাহা তাঁহাদের পরবর্ত্তীয়দের দ্বারা অবলম্বিত হইয়া উন্নতি ও পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। তাঁহারা উভয়েই যেন অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও অনেকটা স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের সনেট সম্বন্ধে একথা খাটে না—এমন কি আজ পর্য্যন্তকার বাঙ্গালা সনেটের পরোক্ষ ভাবে অনেকখানি রবি-প্রভাব আছে একথা অস্বীকার করা চলে না, কাজেই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'স্কুল' (শিষ্যমণ্ডলী) সম্বন্ধে পর পরিচ্ছেদে আলোচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত।

অক্ষয়কুমার সনেট খুব বেশী লেখেন নাই। তাঁহার 'শঙ্খ' কাব্যে কয়েকটী মাত্র সনেট দেখিতে পাই, যেমন, 'হেমচন্দ্র', 'ঈশানচন্দ্র', 'রবীন্দ্রনাথ', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি। অক্ষয়কুমারের সনেটের বিশেষত্ব তাহার আন্তরিকতা, তাহার দরদ—'হেমচন্দ্র' কবিতায় কবি-জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের প্রতি কত বড় প্রাণ-জোড়া সহানুভূতির পরিচয় তিনি দিয়াছেন; 'ঈশানচন্দ্রে' 'অকাল কোকিলে'র কবি ঈশানচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কতটা অমায়িকতার সহিত এই বিস্মৃত-প্রায় কবিকে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন—সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহার সম-সাময়িক মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র এঁরা সবাই কেহ লইলেন পারিজাত, কেহ লইলেন ঐরাবত, কেহ লইলেন উচ্চৈঃশ্রবা—আর হতভাগ্য ঈশান-চন্দ্র বিলম্বে আসিয়া কেবল পাইলেন বিষ! কত বড় প্রাণের কথা এটা! রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান প্রতিভাকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই, তাঁহার সম-কালবর্ত্তী লেখকদের মত ছাপার অক্ষরে ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে ভড়্‌কাইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই—তিনি 'দূরে মেঘ শিরে শিরে প্রভাত তপনের' স্বচ্ছ আলোককে কুয়াসার কালী দিয়া ঢাকিতে চাহেন নাই; তিনি সেই 'আধো আলো, আধো অন্ধকারে ধরা স্বর্গ ছবিতে' 'রবি-কবি'র বিকাশকে অপূর্ব্ব মহানুভবতার সহিত মাথা পাতিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 'প্রকৃতি' কবিতাটী মার্কিন্‌ কবি লংফেলোর 'Evening' শীর্ষক সনেট হইতে অনূদিত, যদিও পুস্তকে একথার উল্লেখ নাই। ইহাই সংক্ষেপে অক্ষয়কুমারের সনেট; এই মুষ্টিমেয় রচনা-সম্ভারে একটী জিনিস মাত্র আমরা দেখিয়াছি—তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার ক্ষমতা এবং তাহাই অক্ষয়-কুমারের সনেটের বিশেষত্ব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সনেট-লেখক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার অপেক্ষা উঁচু দরের কবি। তাঁহার সনেটের চিন্তা-ক্ষেত্র যেমন প্রশস্ত, তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গীরও তেমনই একটী নিজস্ব ধারা আছে; তবে একটা কথা এস্থলে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে অক্ষয়কুমার সনেটে পুরাপুরি এলিজাবেথীয় আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, (চারি চরণ বিশিষ্ট তিনটী পংক্তি ও দুই লাইন পয়ার)। মাইকেলী রীতির অনুসরণ করিয়া তিনি প্রথম চরণের বক্তব্যকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় চরণের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায়ই টানিয়া আনেন নাই, তদ্ভিন্ন শব্দ যোজনা ও পদ-লালিত্যের উপর তিনি টেনিসনের মত বরাবরই একটু বেশী রকম যত্ন ও মনোযোগ দিয়াছেন দেখিতে পাই—এজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার সনেটগুলিতে ভাবের দিক দিয়া স্বাভাবিকতার অসদ্ভাব ঘটিলেও অবয়বের দিক দিয়া দেবেন্দ্রনাথের সনেট অপেক্ষা তাঁহার সনেটগুলি অধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে। কিন্তু form (অবয়ব) এর জোড়-তোড় বা অলঙ্কারের ঘনঘটা সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপারে ততটা বড় জিনিস নয়, matter

* নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনীর' চতুর্থ ভাগে একটী কবিতা আছে, যাহা কবি স্বয়ং সনেট নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সনেটত্ব কিছু দেখি না।

(বস্তু) এর গাঢ়তা যতটা—যদিও form এবং matter উভয়ের সংমিশ্রণেই বড় artএর বিকাশ। কিন্তু সে কথা যাক। দেবেন্দ্রনাথের একটী সর্ব্বজনপরিচিত সনেটের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্য সম্যক্ উপলব্ধি হইবে—

'তবু ভরিল না চিত্ত, ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে, মুঙ্গেরের সীতা-কুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চির-দুঃখী জানকীর দুঃখে।" ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথের সনেটের আর একটী বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রথম ইহাতে হাস্য-রসের অবতারণা করেন। 'অশোক-গুচ্ছে'র 'গুমট' 'আতা' প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। পরবর্ত্তী কালে প্রমথ বাবুও (বীরবল) হাস্য-রসাত্মক সনেট কতকগুলি লিখিয়াছেন—কিন্তু এদিক দিয়া বাঙ্গালা সনেটের বিশেষ অনুশীলন এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই।

(৫)

কিন্তু বাঙ্গালা-সনেটে সত্যকার জীবন দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার যাদুকরী কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে ইহাতে প্রাণের হিল্লোল বহিয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের সনেটকে আমরা মোটামুটি চারিটী নির্দ্দিষ্ট স্তরে ভাগ করিতে পারি। প্রথম—প্রেম-মূলক; 'কড়ি ও কোমল', 'ছবি ও গান' প্রভৃতির সনেটগুলি। এই অংশে 'যৌবন-স্বপ্ন'—

"আমার যৌবন-স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে অপ্সরীর চুম্বনের মত";

'বাসনা'—"ফেল গো বসন ফেল'; অথবা 'চুম্বন', 'পূর্ণ মিলন' প্রভৃতি সনেট বাঙ্গালা প্রেম-কাব্যের অমূল্য সম্পদ। জানি কোন কোন বিরুদ্ধ সমালোচক এই সকল কবিতায় অত্যধিক দৈহিকতার বাড়াবাড়ি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন! কিন্তু নীতি বা রুচির মাপকাঠির রসের বিচার কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না; মানুষের জীবন যখন কেবলমাত্র কতকগুলি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে idea (ধারণা) বা theory (মত) র সমষ্টি নয়—জীবনের যখন একটা সত্যকার অস্তিত্ব (reality) আছে, তখন জীবনের স্থূল উপাদান দেহকে এড়াইয়া কেবল মাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম spirit (সত্ত্বা) এর দিকে ঝুঁকিয়া থাকা moralist (নীতিবিদ) এর পক্ষে হয়ত সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কবির বা শিল্পীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে হাফিজ, সাদী, ওমর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা জ্ঞানদাসের মূল্য কোথায়? তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সুরুচি, শৃঙ্খলা ও শালীনতা artist মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এই সকল কবিতায় কোথাও সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

দ্বিতীয় স্তরে গার্হস্থ্য চিত্র—'চৈতালী', চিত্রা প্রভৃতির সনেটগুলি। পদ্মার তীরে, মজুরদের ছোট মেয়েটী কেমন 'জননীর প্রতিনিধি' সাজিয়া তাহার ছোট ভাইটীকে চোখে চোখে রাখে; রৌদ্র-দগ্ধ দ্বিপ্রহরে কর্দ্দমাক্ত পুকুরের ঘোলা জলে অলস দেহভার ন্যস্ত করিয়া একটী মহিষ কেবল সহজ আনন্দে নিঃস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে এবং একটী ছোট বালক কত আদরের সহিত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—এই সমস্ত দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি, দুই একটী কথার ইঙ্গিতে কেমন সতেজ স্ফূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন ইউরোপীয় সাহিত্যেও এমন pictorial (চিত্র কাব্য) কবিতা খুব কম আছে বলিয়াই মনে হয়।

তৃতীয় স্তর :— দেশাত্মবোধক; 'স্বদেশ', 'সঙ্কল্প' প্রভৃতির সনেটগুলি। এই স্তরে কবি প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। সেই ভারতের বিরাট, বিদর্ভ, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজ্য, সেই তপোবন—'নীবার ধান্যের মুষ্টি'তে বর্দ্ধিত 'গ্লানি-হীন দিনগুলি', সেই সমুদয় সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দে 'সংসারে নিত্য-ব্রহ্মের সম্মুখে' রাখিবার আদর্শ; সেই নৃপতির আদর্শ, গৃহস্থের আদর্শ, বীরের আদর্শ—সেই গিরি-নদী, বন উপবন, এমন কি জড় প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন আত্মার বন্ধনে বদ্ধ জীবন;—আর এই ইঁট-কাঠ-প্রস্তরে ভরা, কলের ধোঁয়ায় মলিন, রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু-সঙ্কুল আভিজাত্য-দৃপ্ত অস্বাভাবিক জীবন! এই 'পদে পদে ছোটবড় নিষেধের ডোরে' বাঁধা সঙ্কীর্ণ জীবনের সঙ্গে সেই 'ভয়শূন্য চিত্ত, উচ্চশির' জীবনের কি বিরাট পার্থক্য! অন্য কিছু না লিখিলেও একমাত্র সনেট লিখিয়াই কবিগুরু কত বড় হইতে পারিতেন এই শ্রেণীর সনেট হইতেই তাহা বোঝা যায়।

চতুর্থ স্তর :—আধ্যাত্মিক ; 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি।—

এই স্তরেই রবীন্দ্রনাথের সনেটের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হয়। তাঁহার সাধন-মার্গের ক্রমোন্নতির ধারাটী সর্ব্বশেষ স্তরে উপনীত হইলে বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পরে—প্রথমে দেহ, তৎপরে মন, তৎপরে আত্মা, অবশেষে পরমাত্মা! এই স্তর সম্বন্ধে অধিক বলার সময় নাই। কবির অন্য একখানি কাব্য হইতে এই স্তরের 'হিমালয়ে'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—পাঠক স্বয়ং তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

—"হে নিস্তব্ধ গিরি-রাজ! অভ্র-ভেদী তোমার সঙ্গীত,
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত, উদাত্ত স্বরিত;
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে,
দুর্গম-দুরূহ-পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!"

রবীন্দ্র-সনেটের technique সম্বন্ধেও একটী কথা বলিয়া রাখি প্রথম যৌবনের সনেটগুলিতে তিনি অনেকস্থলে পেট্রার্কীয় বা এলিজাবেথীয় আদর্শ লইলেও, পরবর্ত্তীকালে অমিত্রাক্ষর লক্ষণাক্রান্ত পয়ারই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে দেখিতে পাই—কাজেই ক্লাসিকাল আইন অনুসারে এই সকল রচনা সনেট নহে, কিন্তু এলিজাবেথীয় সনেটও যখন ক্লাসিকাল সনেট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সনেট নাম পাইয়াছে, তখন বাঙ্গালা (বৈষ্ণবীয়) সনেটকেও আমরা সনেটের পর্য্যায় হইতে বাদ দিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের সনেট-শিষ্যদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরা প্রথম স্থান দিই। সকলেই জানেন, দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথের 'স্কুলের' কবি ছিলেন না। কাজেই তাঁহাকে রবীন্দ্র-শিষ্যদের অন্তর্গত করায় অনেকে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা 'কিশোরকিশোরী' বা 'সাগর সঙ্গীতে'র কবিকে ছাড়িয়া কেবল 'মালঞ্চ'-রচয়িতা চিত্তরঞ্জনকে মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। 'মালঞ্চের' 'আমার চুম্বন যেন চঞ্চল বিহঙ্গ' অথবা 'তোমার প্রণয় যেন শাণিত কৃপাণ' অথবা 'ওফালিয়া' প্রভৃতি সনেটগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্তরে আলোচিত সনেটগুলির তুলনা করিলেই এ কথার মীমাংসা হইয়া যাইবে। 'কবি ভ্রাতা দেবেন্দ্র নাথ সেনের প্রতি' কবিতায় দেশবন্ধু নিজেই 'রবির লেখা সুন্দরী সনেটের' প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা হইতেও আমাদের অনুমান অনেক খানি প্রমাণের আশ্রয় পায়। দেশবন্ধুর জীবনীতে হেমেন্দ্রবাবু ও পৃথ্বীশ বাবুও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে 'মালঞ্চ' একেবারে রবি-প্রভাব হইতে মুক্ত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে 'রবির ছায়া'তেই সংবর্দ্ধিত।

তবে দেশবন্ধুর পরবর্ত্তী কাব্য-সমূহে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই বলিলেই চলে। এই ভাব-বিবর্ত্তনের [transition] মুখেই তিনি 'সাগর সঙ্গীতের' প্রথম সনেটটী লিখিয়াছেন ইহা বেশ বোঝা যায়।—

"হে আমার আশাতীত! হে কৌতুকময়ী,
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে ল'ই!
* * *
দাঁড়াও ক্ষণেক আমি অম্বরের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দ-হীন অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব,
অন্তর-বিজনে আজি তোমারে বাঁধিব।"

[৬]

বর্ত্তমান সময়ের কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ,' শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'সনেট গুচ্ছ' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার 'সনেট' ও শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার 'দে'র 'দীপালী' পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র দত্তের 'মেথর' (কুহু ও কেকা) ও শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'শেষ'ও দুই একখানি সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়াছে দেখিতে পাই। আমাদের সম্প্রতি স্থানাভাব, কাজেই এই সকল কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করা এক্ষণে সম্ভব হইবে না। সংক্ষেপে প্রমথ বাবু, কান্তি বাবু ও মোহিত বাবু সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমথ বাবু সনেটে হাস্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন।* কিন্তু প্রমথ বাবুর গদ্য রচনায় বৈশিষ্ট্য যা—শুভ্র, সংযত, তীক্ষ্ণ, অবিমিশ্র humour—তাহা এই সনেট কবিতা গুলিতে নাই। অনেক ক্ষেত্রেই প্রমথ বাবু চতুর্দ্দশী নদী কবিতার ভিতর দিয়া কতকগুলি 'মামুলী'

* অন্য শ্রেণীর সনেট যেমন 'ভাস' লইয়া আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। প্রমথ বাবুর খ্যাতি যে জন্য অর্থাৎ যাহা তাঁহার forte, তাহাই আমাদের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট।

'ইয়ারকির' প্রমথ বাবুর নিজের কথার মারফতে যেটাকে pure humour এ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাস্য রসে দাঁড় করাইতে গিয়াছেন তাহা নিতান্ত 'সেকেলে দাদামশায়ী ধরণের রসিকতায়' পর্য্যবসিত হইয়াছে - যেমন, "জীবনে প্রথম কভু হ'ইনি ইস্কুলে," অথবা, "সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট"। সনেটের সহিত 'বনেট' ছন্দে মেলে ভাল, কিন্তু কেবল মাত্র ছন্দ মিলিলেই কবিতা হয় কেমন করিয়া? 'বিচিত্রা' যতই মাথার দিব্য দিয়া তাঁহার সনেটের প্রশংসা করুন, যে, তিনি খাঁটী পেট্রার্কীয় আদর্শ বজায় রাখিয়া প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় সনেট লিখিয়াছেন, তিনি ইহাতে নূতন রস সৃষ্টির উপাদান অনেক কিছু দিয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি, তথাপি সমস্ত সত্য হইলেও এ কথাও মানিতেই হইবে যে প্রমথ বাবুর মত পাকা লেখকের কাছে এরূপ একখানা কবিতা পুস্তক আমরা মোটেই আশা করি নাই। এই পঞ্চাশটী কবিতার একটীতেও আমরা আন্তরিক প্রেরণার পরিচয় পাই না; আগা গোড়া দেখি কথার মারপ্যাঁচ, সুলেখক র‍্যালে যাহার নাম দিয়াছেন 'Intellectual gymnastic!'

কান্তি বাবুর সনেট সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ইহার সমালোচনায় বলিয়াছেন, "তোমার সনেট গুলি আঁটা সাঁটা ডাঁসা পেয়ারার মত"। প্রবীণ জহুরীর এই টিপ্পনীটুকুতে কি এই কথাই বোঝায় না যে, "আঁটা সাঁটা ডাঁসা পেয়ারাতে" যেমন মিষ্ট-রসের অভাব না থাকিলেও বিচির অভাব নাই, এবং তাহা চিবাইতেও যেমন দাঁতের জোর আবশ্যক, হজম করিতেও তেমনি পাক-যন্ত্রের যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন? স্থূল কথা, যে কান্তিচন্দ্র 'ওমর খৈয়ামের' অনুবাদে মূল কবিতার স্নিগ্ধ স্বাভাবিকতা দিয়া পাঠক সমাজকে বিস্মিত করিয়াছেন, মূল রচনার বেলা তিনি এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অকৃতকার্য্য হইলেন কেন বুঝি না! 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কান্তিচন্দ্রের সনেটের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন;—তাঁহার মতে এ রকম সনেট নাকি বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয় নাই, পরেও হইবে কি না সন্দেহ! তাহা নাও হইতে পারে, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিশ্বাস বসন্তবাবুর নিজের 'সপ্ত-স্বরা' পুস্তকেই এমন একটি দুটি সনেট আছে যাহা তাঁহার প্রশংসিত কবির সনেট অপেক্ষা সুগঠিত ও সুখসাধ্য! তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে কান্তি বাবুর technique ভাল।

কিন্তু 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণীর' কবি মোহিতলাল মজুমদারের সনেট পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ইহার প্রতিটী বর্ণ কবির হৃদয়-ছেঁচা শোণিত দিয়া লেখা! তাঁহার কবিতার যা বিশেষত্ব—সহজ, সরল আন্তরিকতা—তাহা এই সনেট-সম্ভারেও বাদ যায় নাই! এই সূত্রে 'ছায়াপথের' কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর 'সন্ধ্যা' সনেটটীরও উল্লেখ করিয়া রাখি। কিন্তু উপস্থিত এই পর্য্যন্ত।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে সনেটের অনুশীলন চলিতেছে—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইহার যতখানি উন্নতি বা বিকাশ আশা করা যাইতে পারে ততখানি কিন্তু হয় নাই! কেন হয় নাই তাহা অবশ্য ভাবিবার কথা।

এই কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, প্রকৃত কবি কখনও অত বাঁধাবাঁধি মেনে চ'ল্তে পারে না—অক্টেভ্ সেষ্টেট্, হেনো, তেনো—তার 'মটো' (motto, হবে—

> 'আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
> আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
> আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব' গাহিয়া—
> আকুল পাগল পারা!"

সত্যিকার প্রেরণা যখন প্রাণে আসে, তখন তা বেরিয়ে পড়ে গৈরিক নিঃস্রাবের মত আপনা থেকেই; তখন তাকে শৃঙ্খলার আট্ঘাট্ দিয়া বাঁধতে গেলেই তা হয় অস্বাভাবিক!" ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ তোমার কথার একটা দিক সত্য যে বড় প্রেরণা প্রাণে এলে তা বেরিয়ে পড়ে গৈরিক-নিঃস্রাবের মতই, কিন্তু তাকে সংহত না ক'র্লে, একটা নিরূপিত লক্ষ্যের পথে নিয়ন্ত্রিত না করলে কখনও রস-সৃষ্টি হ'তে পারে না! এই যে কবিতাংশটুকু তুমি উদ্ধৃত কর্লে এটুকুতে গৈরিক নিঃস্রাবের মত spontaneity (স্বাভাবিকতা) আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কয়েকটী জিনিষ আছে—যার একটি হচ্ছে ছন্দের

বাঁধন। এটা না মানলে কবিতাটা হ'য়ে প'ড়ত কতকগুলা পরস্পর অসম্বদ্ধ [incoherent] ছোটবড় লাইনের সমষ্টি; যে কোন ছন্দই দেখ'না কেন তার একটা rhythmic unit [ছন্দের মাত্রা] আছে, যেটা না থাকলে উঁচু দরের কবিতাও [যেমন হুইটম্যান] প্রাণে সত্যিকার সাড়া দিতে পারে না! এই জন্য কবিতায় একটু খানি limitation [বাঁধাবাঁধি]ও দরকার! শুধু কবিতার পক্ষে কেন? গানের ও তালের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে, সেটা তোমাকে মান্‌তেই হবে; তার পর তুমি fixed area (নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী)র মধ্যে খাদেই গাও আর জিলেই গাও সে তোমার ইচ্ছে; চিত্র-বিন্যাতেও আপন খেয়াল মাফিক কতকগুলা রঙ্‌ এক জায়গায় জড়' ক'রলেই হ'ল না, তারও একটা colouring এর standard [ধারা] থাকা চাই। এই standard জিনিষটাই হচ্ছে art [শিল্পের] এর সব চেয়ে subtle (সূক্ষ্ম) পদার্থ! এর এক চুল ওদিকে থাকলে যেটা হয় art, এক চুল এদিকে এলে সেটা হয় license [যথেচ্ছাচার]—সেই এক চুল জায়গার ওপরই নির্ভর ক'রছে সাহিত্যের যত কিছু technique, যত কিছু form, যত কিছু model! এই জন্যই টলষ্টয় ব'লেছেন, "আর্টের প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে restraint [সংযম]"। এ কথা যে কত বড় সত্যি তা আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন দেখি রুবাইতের বাঁধা আইন ও কড়াকড়ির ভেতরও হাফিজ বা ওমরের মত কবির প্রকাশ সম্ভব হ'য়েছে! কাজেই সনেট লিখতে গেলেই যে কবিতা অস্বাভাবিক হ'য়ে প'ড়বে বা কল্পনার স্বচ্ছন্দ-গতিকে খর্ব্ব বা ব্যাহত করা হবে এ কথা মেনে নিতে পারি নে। বরং বাঙ্গালা সাহিত্যের এই নব-জন্মের [renaissance] দিনে এটাই আমরা আশাকরি যে এই অপূর্ব্ব জিনিষটিতে আমাদের বড় বড় প্রতিভা আকৃষ্ট হবে এবং এর পূর্ণতম স্ফুরণও তাঁহারাই সাধন ক'র্‌বেন।" উপসংহারের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

চক্র (হস্তলিখিত পত্রিকা শরৎ সংখ্যা)

আমরা 'অমৃত-চক্র' পরিচালিত 'চক্র' পত্রিকার শরৎ সংখ্যা দেখিলাম। হস্তলিখিত হইলেও ইহা গল্পে প্রবন্ধে ও চিত্রে অনেক মুদ্রিত মাসিকপত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বর্গীয় রসরাজ অমৃতলালের একটি অপ্রকাশিত কবিতা আছে এবং অনেকগুলি নবীন লেখকের রচনার সহিত অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পুরাতন লেখকের লেখাও আছে। এইরূপ হস্তলিখিত পত্রিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন লেখক তৈয়ারী করিয়া থাকে—অমৃতচক্রও সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা চালাইতেছেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না—। অমৃতচক্র পরিচালিত পত্রে অমৃতলালের রচনার সম্বন্ধে আলোচনা কিছুই দেখিলাম না। আমরা এ বিষয়ে অমৃতচক্রের সচিব শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যিনি প্রচ্ছদ-পট আঁকিয়াছেন তিনি সাধনা করিলে একজন শিল্পী হইতে পারিবেন। এবং যিনি এই ১৪০ পৃষ্ঠার লিপিকর তাঁহার ধৈর্য্য ও যত্ন প্রশংসনীয়।

অমৃতচক্র—প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—

"হাস্যরসে অমৃতলাল" সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখককে অমৃতচক্র হইতে একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। যে কেহ এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। প্রবন্ধটী বর্ত্তমান বর্ষের ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে 'অমৃতচক্রে'র সচিবের নিকট ১২৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লাটের খাজনা চলিয়া গিয়াছে ; ধীরেন মণ্ডলকে গাড়ী লইয়া যাইতে হইল ; পাইক বরকন্দাজ যেমন প্রতি বৎসর যায় সেইরূপ গেল ; অন্য বৎসর রাজুও সমভিব্যাহারী হইত ; ইন্দ্র সরকারের অনুপস্থিতি হেতু আর একটি ব্যতিক্রম, পাল্কী করিয়া সঙ্গে মুখুযোর যাত্রা। – আমলার দল একবার নিঃশ্বাস ফেলিয়া উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। শ্রীনগর জমিদার-বাড়ীতে আজ একটা উৎসবের দিন ; বৎসরে যে চারিটি বড় উৎসব নিয়মিতরূপে হইত, তাহার মধ্যে ধূমধাম বেশী অবশ্য দুর্গাপূজার সময়, সে সময় বড় বড় যাত্রা পার্টি বায়না হইত, পূজার সৌষ্ঠব বেশ জমকাল রকমের ; কিন্তু বৈশাখ মাসের এই ব্যাপারে অন্যান্য অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হইলেও ব্যয়বাহুল্য সমানই ছিল কারণ এই উপলক্ষে বাইজীর নাচ হওয়া একটা চলিত প্রথা ; এবং গত আট দশ বৎসর হইতে কর্ত্তার শ্যালক স্বয়ং এই কর্তৃত্বভার গ্রহণ করায় এই দিকটার সৌষ্ঠব ও ব্যয় যুগপৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই বৎসর আবার তাহার উপরেও বিশেষত্ব আছে ; কারণ কলিকাতা হইতে সুধীর বাবুর দুইজন বন্ধু বিবাহ প্রস্তাব পাকাপাকি করিতে ও ললিতকে দেখিতে আসিয়াছেন ; একজন পাত্রী রাজকন্যার নিজ মাতুল। গ্রামের যাত্রাপার্টি অক্ষয়পুরের আসিয়া এই সমঝদার আগন্তুকদের সম্মুখে কৃতিত্ব প্রকাশের সুবিধার জন্য আবেদন করিয়াছিল —জন্মাষ্টমী ও আশু বিবাহ উৎসবে তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে এই স্তোক বাক্যে তাহারা নিবৃত্ত হইয়াছে।

উৎসবের রূপই অন্য প্রকার ; এমন কি অট্টালিকা, বাগান মন্দির পর্য্যন্ত যেন মাতিয়াছে ; ইঁট পাথর ও উদ্ভিদেও যেন সে রস প্রবেশ করিয়াছে ; মানবের চোখে মুখে, হাত পা নাড়ায় একটা অধীরতা, চপলতা আসিয়াছে। বড় হল ঘর আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, বারন্দার দিকে বড় বড় আটটা দ্বার ও বিপরীত দিকের সমসংখ্যক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত গবাক্ষ মৃদু সমীরণকে আবাহন করিতেছে ; দালানের দিকে পশ্চিমমুখী দরজাগুলিতে চিক্ ঝুলিতেছে। দিনের আলো তখনও নিষ্প্রভ হয় নাই, কিন্তু ঝাড় ও দেয়ালগিরির সমস্ত বাতিগুলি জ্বলিতেছে—আজ ফুলের মোটা মোটা মালা স্তরে স্তরে কক্ষগাত্রে বিলম্বিত ; একটা বিশাল পুষ্পস্তবক ছাদ হইতে কর্ত্তাবাবুর নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর ঝুলিয়া আছে ; ভৃত্য পরিচারকদের প্রসাধন অবধি দৃষ্টিবিমোহন, অধিকাংশের এমন কি আমলা মুহুরীদের চক্ষুতেও 'সিদ্ধি'র আভা। দিনব্যাপী দীয়তাং ভুজ্যতাং অক্লান্ত চলিয়াছে, কাছারী-বাড়ীর সম্মুখের মাঠে পাল টাঙ্গান, নিম্নশ্রেণীদের ভোজন-কলরবের নিবৃত্তি নাই—দালানে অন্য শ্রেণীদের আহার কিয়ৎকাল হইল ক্ষান্ত হইয়াছে—শ্রীনগরের আবাল বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে, নিকটতর গ্রামের বহুসংখ্যক, এমন কি সহর হইতেও অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট, আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকলেই বিদ্যমান। ব্রজকিশোরের উৎসাহ এই বৎসর অতি পঙ্গু—ললিত সারাদিন উৎসব-সমারোহ হইতে দূরে দূরে কাটাইয়াছে ; সুধীরবাবু একাই সব, তাঁহার উৎসাহেই সকলে বিপর্য্যস্ত—ক্ষণে ক্ষণে সে উৎসাহকে গোপনে সিঞ্চিত করিয়া লইতেও কার্পণ্য নাই—কি সদর-মহলে, কি ভিয়ান-ঘরে, কি পরিবেশন-স্থলে তাঁহার গতিবিধি, ভাবভঙ্গী ও কথা-বার্ত্তা সাধারণের হর্ষ বিস্ময় উদ্রেক করিয়া ফিরিতেছে—ভিয়ান ঘরের দিক হইতে মুহুর্মুহু চীৎকার তর্জ্জন তত্রস্থ ধূম্রাবরণের মধ্যে জ্ঞানবাবুর অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে—তিনি ভাণ্ডারীরূপে আজ ভোক্তাদের কাণ্ডারী। শুভ্র ফরাসের উপর একদিকে একটি মূল্যবান্ গালিচা পাতা—ব্রজকিশোর আসন গ্রহণ করিলেন, আগন্তুক দুইজন, যুগল কূর্ম্মাবতারের ভঙ্গীতে উঁহার দক্ষিণে বসিয়াছেন, সুধীর বাবুর শিষ্ট পরিচর্য্যা ও অতিথি সৎকারের যথেষ্ট লক্ষণ তাঁহাদের মুখে চোখে বর্ত্তমান—সুধীর বাবু স্বয়ং ভগ্নীপতির পশ্চাতে বসিলেন,—সুধীর বাবুই যে আজিকার উৎসবের এই অঙ্গের কর্ত্তা ও কারণ তাহা অন্যে যদি নাও বুঝিয়া থাকে তিনি নিজে সে কথা ভুলিতে পারেন না তাই দক্ষিণে যুগলকূর্ম্ম ও সম্মুখে ভগ্নীপতিকে রক্ষা করিয়া নিজের আসন নির্ব্বাচন করিয়াছেন। হল ঘর বাহিরের বারন্দা দর্শকে পূর্ণ—নর্ত্তকীর জন্য স্থান যথেষ্ট রাখা হইয়াছে—বাইজী ও দল তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম-কক্ষ হইতে আসিয়া আসরের মধ্যে সমবেত দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইয়া বসিল। ওস্তাদজী পাখোয়াজ-বাদক গ্রামের বৃদ্ধ চাটুর্য্যেদা ও অন্য বিশিষ্টেরা কর্ত্তার বাম দিকে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী পর্য্যায়ে মাতব্বরী গাম্ভীর্য্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে উপাবিষ্ট।

চির প্রচলিত প্রথানুসারে বাইজীদের মহলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ওস্তাদজীকে সঙ্গত করিতে হইবে, আসরের পদ্ধতি অনুসারে তিনিই কর্ত্তা, অন্য সকলে, বাইজীরাও তাঁহার অতিথি—দুই চারিটি সময়োচিত শিষ্ট প্রসঙ্গ, অতি

পুরাতন কয়েকটি কৌতুকবাক্য বিনিময়—ওস্তাদজী ও চাটুযোদা প্রস্তুত হইয়া, আসরের দিকে মাথা অবনত করিয়া নমস্কার জানাইলেন—আসর নীরব ও প্রতীক্ষার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রথমে রাগিণী আলাপ, তাহার পর একটি মাত্র গাওনা—ব্রজকিশোর অনুমতিসূচক ভঙ্গী করিলেন—রাগিণীর আলাপ আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমটা দীন দুঃখী পীড়িতের গুমরিয়া কান্নার মত তাহার পর, কত অনুনয়, কাতর প্রার্থনা, ক্ষমা ভিক্ষা—আবার কে যেন কাহার পায়ে ধরিতেছে—আশায় অনুরোধে নহে, নৈরাশ্যের শেষ অবলম্বনে, দৃকপাতহীন করুণ আত্ম সমর্পণে, ভ্রান্তিহীন, অবিচলিত উদ্যত অসি মুখে—তাহার পর যেন একটা দীর্ঘ শ্বাস, বহুক্ষণ ব্যাপী, ধৈর্য্য-বিধ্বস্তকারী, চিত্ত যেন আশ্রয়ভ্রষ্ট হইতে চাহে—শ্রোতৃবৃন্দের শ্বাস কষ্টবাহী হইয়া আসিতেছে—অকস্মাৎ যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, দেবতার কল্যাণবরে যেন অমোঘ শক্তি সঞ্চার; জয়ধ্বনির অপ্রত্যাশিত তূরীনিনাদ, মৃত্যুকে ভ্রুকুটি করিয়া, অতীতের দুঃখ নৈরাশ্যকে বিদ্রুপ করিয়া নব-দৈবতেজের স্বাগত হুঙ্কার বৃহৎ কক্ষের মধ্যে গম্‌গম্‌ করিয়া ফিরিতে লাগিল—ওস্তাদজী কোন মুহূর্ত্তে তানপুরা নামাইলেন, মুগ্ধ শ্রোতা কেহ বুঝিতে পারিল না।—চাটুযোদা ললাটের স্বেদজাল অপনয়ন করিতে করিতে মৃদু স্বরে কি বলিলেন, ওস্তাদজীর বদন প্রসন্নতা মণ্ডিত; কক্ষস্থ সকলে এতক্ষণে বাহবা বেশ ইত্যাদি কথায় সবাক্ হইয়া উঠিল—সুরের ইন্দ্রজাল ভাষায় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ আলাপে সম্পূর্ণ মূর্ত্ত ও প্রত্যক্ষ হইল। ব্রজকিশোরের হৃদয়-ভাব অনেকটা লাঘব; বিপরীতদিগের দ্বিতলের দালানে উপবিষ্ট ললিত, অন্তরে প্রতিধ্বনি অনুভব করিতেছে। একটু বিরাম দিয়া ওস্তাদজী গান আরম্ভ করিলেন—"তুয়া চরণ কমল পর মন ভ্রমরারে—" জলদ-গম্ভীর, অলঙ্কার-বাহুল্যবর্জ্জিত, সুরের বিশুদ্ধরূপ অনুসরণে, অতঃপর বাইজীদের অভ্যুদয় কষ্টসাধ্য না হয় সেই দিকে একটা লক্ষ্য রাখিয়া, অযথা চড়া সুরে, সকলকে প্রথম হইতে বিপর্য্যস্ত করিবার ক্ষুদ্র লোভ রহিত গীত সমাপ্ত হইলে ওস্তাদজী ব্রজকিশোরের মুখের দিকে প্রশ্নময় অথচ ধীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—বুঝিলেন ইন্দ্র সরকারের অনুপস্থিতি, অনিশ্চিত বিপদ-কল্পনা দুশ্চিন্তা, সুধীর বাবুর অক্লান্ত প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা-চেষ্টাজনিত ক্লান্তি, জ্ঞান বাবুর অবান্তর অবতারণার নিয়ত চেষ্টা, দারোগার বিরক্তিকর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্যম আর তাঁহাকে অহঃরহঃ পীড়া দিতেছে না।—

সুধীর বাবুর মনোরথ পূর্ণ করিতে ও নিজের তহবিলের আয়তন বিস্তার করিতে সলিমা বিবি এই সুদূর শ্রীনগরে আসিয়াছে, সঙ্গে একজন সখী ও অন্য সঙ্গতকারী, পরিচারক ইত্যাদি আছে। সলিমা ওস্তাদজীর নিমন্ত্রণ পাইয়া একটু আগাইয়া বসিল—সলিমা তন্বঙ্গী, কটা রং চক্ষু দুটিও কটা, বেশ পিঙ্গলাভ, শরীরের বিন্যাস বালিকার মত—তাহার আগমন-বার্ত্তার প্রথম ঘোষণা হইতে যে উৎসাহ সকলকে ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহার চাক্ষুষ দর্শনে তাহা যেন আপনা হইতে মন্দীভূত হইয়াছে। ব্রজকিশোরের মনে কেবল একটা কথা জাগিতে লাগিল, টানাটানির সময় বৃথা টাকা জলে গেল—সে ভাব যেন কোন অলক্ষ্য পথে সুধীর বাবুর মস্তিষ্কের বিলাতী সুধারস নিঃসৃত বাষ্প-আবরণকে ত্রস্ত করিল। সলিমাও যেন নিজে অপ্রতিভ, আত্মবিশ্বাস সম্পদ শূন্য, প্রথম হইতে দারুণ ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছে—সরেঙ্গী বাঁয়া তৈয়ার, সলিমা আসরকে নমস্কার করিয়া গাহিল, "ঘোরে ঘোরে আওরে বদরিয়া" পেশাদারের অভ্যস্ত সমস্ত কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সঙ্গীত চিত্তাকর্ষক নহে, মুখ ভাবের দ্রুত বৈচিত্র্যময় পরিবর্ত্তনে চোখ মুখ জিম্‌নাষ্টিক করিতেছে—দেহযষ্টী ও হস্তদ্বয়ের আন্দোলন গতিলীলায়, কলালালিত্যের অভাব; বিসদৃশ রূঢ়তা অসামঞ্জস্যের মধ্য হইতে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে—গীতান্তে এবারেও সকলে নীরব, কিন্তু এ ভাষাহীনতার উক্তি পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সলিমা পেশাদার না হইলে কাঁদিয়া ফেলিত—তাহার উদ্যম হাল্কা, ফিকে হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া, সে অধোবদনে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার সখী তাহার নিকটে আসিল; সারেঙ্গী ও দুইজনের পরামর্শে যোগ দিয়া অতঃপর ব্রজকিশোর বাবুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কি নিবেদন করিল, তিনি বিরক্ত অসহিষ্ণু ভাবে অনুমতি দিলেন। বাইজী দুইজনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিল—তখন সমবেত সকলের মনে সমালোচনার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ তর্ক-আন্দোলন-স্পৃহাতে পরিণত হইতেছে, সলিমার সখীর নর্ত্তকীবেশে আবির্ভাবে, কৌতুহল বিস্ময় আবার সকলের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করিল। বয়স হইয়াছে, দেহও স্থূল বলিলে বলা যাইতে পারে, বর্ণ মধুর শ্যাম নয়ন যাহাতে তৃপ্তি ও বিরাম লাভ করে সেই ধরণের চক্ষু দুটি দীর্ঘ আয়ত ভাবের ব্যঞ্জনায় সম্মোহনময়, দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন একটা মন্ত্র-ভরপুর হইয়া আছে, পীতবর্ণের ঘাগরা লাল পাড় দেওয়া আর গাঢ় নীল রঙের ওড়না, চুমকি বসান, আকাশগাত্রে অসংখ্য তারার মত; যেন একটী রহস্যের আকর, এখনই তাহার গোপন কথাটি বলিয়া ফেলিবে। অস্ফুট আলোচনার মধ্যে সঙ্গত ঠিক করিয়া সলিমার সখী নৃত্য আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ সাহিত্য

[শ্রীঅকিঞ্চন দাশ]

কবি নজরুল ইস্‌লাম কর্ত্তৃক অনুবাদিত রুবাইৎ-ই-হাফিজ পড়লাম। এবৎসর আমরা আরও একখানি কাব্যানুবাদ পড়িচি—কবি কালিদাস রায়ের গীতগোবিন্দম্। মূল ভাষায় উভয় কাব্যেরই যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। অনুবাদ কোরেচেন বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ দুইজন কবি এবং তার মধ্যে যাঁর যে বিষয়ে অধিকার ছিল তিনি তাতেই হাত দিয়েচেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। কাব্যরসাস্বাদজনিত আবেগের বশে কালিদাস রায় যদি হাফেজকে ধরতেন আর নজরুল ইস্‌লাম জয়দেবের ভার নিতেন, তবে কাব্য জগতে হয়ত আরও দুই নম্বর দুঃখের উৎপত্তি হ'ত।

কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকলে তা খণ্ডন করবার শক্তি কারও নেই—লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদেরও নেই। গীতগোবিন্দের অনুবাদ যা হইয়াছে, তার চেয়ে আরও ভাল হ'তে পারত কিনা সন্দেহের বিষয়। তবু তা প'ড়ে ক্ষোভ হয়—'এরই নাম গীতগোবিন্দম্।' সংস্কৃতছন্দের বৃন্দাবনে যে সব শ্লোক-বিহঙ্গম বহুদিন বহু লোকের মন হরণ করছিল, বাংলা ভাষার খাঁচায় পুরলে তাদের গীত কি এই রকম শোনায়? বনের পাখীর ডাক শুনে আমাদের মনে যে সব ভাবের উদ্রেক হয় তার জন্য পাখাই যথেষ্ট নয়, বনের আড়ালেরও একান্ত প্রয়োজন আছে একথা পাখী পুষলেই বোঝা যায়, যখন দেখি তার ডাকের মধ্যে শুধু ভাবের অভাব নয়, অতিসাধারণ ক্ষুৎপিপাসার ভাবই বেশী ফুটে উঠ্‌ছে। একটা কথা প্রচলিত আছে—গীত-গোবিন্দে গীত থাকতে পারে, গোবিন্দ নেই। গীত বল্‌তে সোজাসুজি গান ধরলে একথা সত্য হ'তে পারে। কিন্তু গীত অর্থে যদি কাব্য-গীতি ধরা হয়, তা হ'লে বল্‌তে হবে যে কালিদাস রায়ের বাংলা অনুবাদে স্পষ্টভাবে ধরা পড়্‌ল গীতগোবিন্দে গীতেরও একান্ত অভাব ছিল। কাব্য-গীতের প্রধান অবলম্বন রস। গীতগোবিন্দে সে রসের দৈন্ত যে কত, সুকবি কালিদাস রায় তাই বাংলা কথায় ব'লে দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদের ছন্দ সুমধুরই হ'য়েছে। রস যাতে ঘন হয় সেদিকে কবির বেশ দৃষ্টি ছিল তাও বোঝা যায়, কারণ অনুবাদ অনেক স্থলে মূলকে ছাড়িয়ে চল্‌বার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু পরিশ্রম সার্থক হয়নি—কারণ জ্বাল দিয়ে রসকে ঘন করা যায়, জল ঘন হয় না; বরং তরল ছন্দের গুঞ্জন উবে গিয়ে যে অর্থটুকু চোখে পড়ছে তা ধুলাবালির মতই নগণ্য ও নীরস। গীত-গোবিন্দের অনুবাদ করার পরিকল্পনা কাব্যদৃষ্টি থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। সব হাঁড়ি হাটে ভাঙা চলে না। অনেক কাব্য ভাষান্তরিত করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তবে এর জন্য কবি স্বয়ং দায়ী না হ'তেও পারেন।

কবি নজরুলের 'হাফিজ' পড়েও আমরা দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না। প্রথম এবং প্রধান দুঃখের সাক্ষাৎকার লাভ করলাম তার প্রথম পাতাতে—যেখানে কবি তাঁর বড় স্নেহের শিশুপুত্র বুলবুলের বিয়োগব্যথার কথা, পদ্যে নয়, সোজা গদ্যে লিপিবদ্ধ কোরেচেন। এই উৎসর্গের প্রত্যেক পংক্তি চোখের জলে ধোয়া; আমরাও চোখে জল নিয়ে 'হাফিজ' পড়া আরম্ভ করতে বাধ্য হ'লাম।

তারপর মুখবন্ধে কবি এই অনুবাদের ইতিহাস এবং রুবাইগুলি বুঝবার কিছু কিছু উপকরণ আমাদের দিয়েচেন। সেগুলি অবহিতচিত্তে পাঠ করলাম, কারণ বিশ্ববিশ্রুত ফার্সি কবির মর্ম্মের গান বুঝবার আগ্রহ আছে, কিন্তু পার্সি ভাষা জানি না, বাঙ্গালী কবির দেওয়া নির্দ্দেশ-গুলি আমাদের হাফিজ বুঝবার পথে বিশেষ সাহায্য ক'রেচে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর কথাগুলির অনুবাদ সংযত ও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একাধিক বার প'ড়ে হর্ষবিষাদে মন বিষণ্ণ হ'য়েই উঠল। অনেক শ্লোক বেশ বুঝ্‌লাম, অনেক শ্লোক কতক কতক বুঝলাম। কিন্তু অনেক শ্লোক মোটেই বুঝতে পারলাম না। যদি বা কথার মানে বুঝলাম শ্লোকের রস ধরতে পারলাম না। বহু শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের কোন সহজ সম্বন্ধ খুঁজে পেলাম না। যেগুলি বুঝলাম তাতে মন খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল; হাফিজ যা বলতে চেয়েচেন তার সঙ্গে প্রাণের বেশ মিল পেলাম। যেমন—

"প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা ?
বন্ধু পীড়ন সহ্য কর।
আমার পরামর্শ শোন,
সকল ভুলে' শারাব ধর।"

"গোপন মনের স্বপনসাথী
পেলাম না গো বন্ধু কোনো,
ব্যথাই আমার ব্যথার ব্যথী,
তোমার মতই নিঠুর নিখিল।"

এমনি তরল রূপ গো তাহার—
বুকের তলে হৃদয় দেখায়,
স্বচ্ছ দীঘির কালো জলে
সুডৌল (?) পাষাণ-নুড়ি যেমন।"

"বিনিদ্র কাল কাট্‌ল নিশি
একলা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রু-মণির হার গেঁথেছি
নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।"

এই সব শ্লোকে—ভাব, ভাষা, তত্ত্ব ও রস পরস্পরকে সাহায্য কোরে পাঠকের মনকে খাঁটি কাব্যরসের সন্ধান দেখায়। অনুবাদ সার্থক হয়েচে মনে হয়।

কিন্তু দুঃখ জাগে অনেক জায়গায়—যখন দেখি প্রথিতযশঃ বাঙ্গালী কবি ছন্দ নিয়ে, ভাষা নিয়ে, অর্থ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যত সহজ ছন্দে শ্লোকগুলি ভাষান্তরিত করা যেতে পার্‌ত—কবি তাই কোরেচেন। ৮টি ছত্রের মধ্যে মাত্র ৩টিতে শেষ শব্দে মিল রাখলেই চলে, আর কোন বাধাবন্ধন কবি স্বীকার করেন নি। নজরুলের ন্যায় ছন্দকুশল কবির হাতে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ২।৪টী অতিরিক্ত মিল বা অনুপ্রাস এসে পড়া অসম্ভব ছিল না, এবং হাফিজ সম্পর্কে তা অশোভন হ'ত না। কিন্তু আমাদের সে আশা কদাচিৎ পূর্ণ হ'য়েছে। বরঞ্চ এই সহজ ছন্দের মধ্যেও কুশলী কবির বিপন্ন হওয়ায় চিহ্ন বহু স্থানে এমন সুস্পষ্ট, যে তা পাঠকের মনকে একান্ত পীড়া দেয়। উদাহরণের অভাব নেই :—

"মরকত্ নীল ও কেশ-ফাঁসে
যতক্ষণ না প্রাণ বিসরি'।"

"মাতোয়ালা 'নার্গিস' সরমে"

"কর্‌তেছি পান পাত্রে ব্যথার।"

"তোমার মুখের মিল আছে, ফুল,
সাথে সে এক কমল-মুখীর।
যে-ফুল হেরে দিল দেওয়ানা,
গন্ধ যথা সদাই খুশীর।"

'প্রাণ বিসরি' অর্থাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করি ? দাশু রায় কোদাল অর্থে কোদণ্ড ব্যবহার কোরে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহলেও রেহাই পেয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভুল হ'লেও অর্থটা সেস্থানে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। উদ্ধৃত অংশগুলিতেও অর্থ বুঝতে বাধে না ; কিন্তু এও বোঝা যায় কবি শব্দগুলি সাজাতে গিয়ে কি রকম বিব্রত হ'য়ে পড়চেন এবং মাত্র শেষ শব্দটীর মিলটীকে কত বেশী খাতির কোরে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। কবি ছায়ানুবাদ কোরেচেন কি কায়ানুবাদ কোরেচেন তা স্পষ্টভাবে না বল্‌লেও আমাদের মনে হয় তিনি ফার্সি রুবাইয়াৎ গুলির শব্দপারম্পর্য্যের ধারাও যথাসম্ভব অনুসরণ কোরেচেন,—নচেৎ তাঁর ন্যায় শব্দশিল্পীর হাতে রচনা এমন আড়ষ্ট হ'য়ে উঠত না।

তারপর অর্থ ও ভাবের কথা। কবি নিজে স্বীকার কোরেচেন যে আটত্রিশ নম্বর রুবাইএর প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোন মিল নেই এবং ওর কোনো মানেও হয় না। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত কোরেচেন এই রুবাইটি বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত। তা' যদি হয়, তবে আমাদের মনে হয় বেচারী ৩৮নং রুবাইটিই একা অপরাধী নয়—গ্রন্থের অনেকগুলি রুবাই-ই প্রক্ষিপ্ত।

"পাতার পর্দ্দানশীন্ মুকুল,
ফুটেই হেরে তোমায় পাছে।
মাতোয়ালা 'নার্গিস সরমে
তোমায় হেরি মরণ যাচে।"

ফার্সিতে এর কি মানে হয় বল্‌তে পারিনে, কিন্তু বাংলায় প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় দুই লাইনের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, তা অনেকটা সীতার শোকে দুর্য্যোধনের মৃত্যুর অনুরূপ ব'লেই মনে হয়। হাফিজ ঠিক এই কথা বল্‌তে চেয়েচেন মনে করার চেয়ে এটিও প্রক্ষিপ্ত বলা শ্রেয়ঃ। কেবল প্রথম লাইনটির জন্য দুঃখ থেকে যায় ;—

"পাতার পর্দ্দানশীন মুকুল,
ফুটেই হেরে তোমায় পাছে।"

এই পংক্তিতে যে রসলোকের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকের মনে এনেছিল সেইটুকুর জন্য মন কেমন করে।

"দরবেশ-আমার সাম্‌নে এল
ফিরে তোমার সেই বিরহ,
বুকের কাটা ঘায়ে যেন
নুনের ছিটে দুর্ব্বিষহ।
ভয় ছিল যে, তোমার থেকে
আর কিছুদিন রইব দূরে,
দেখছি শেষে আস্‌ল আবার—
সেই অশুভ দিন অ-বহ।"

এখানে প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের বন্ধন হচ্চে "ভয় ছিল" এই বাক্যাংশটী। কিন্তু এর সঙ্গতি কোথায়? 'ভয় ছিল' না ভরসা ছিল, না ইচ্ছা ছিল? শ্লোকটীর অতি গভীর এবং অতি প্যাঁচান অর্থ একটী করা হয় ত সম্ভব, কিন্তু শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে সে রকম কোন ইঙ্গিত না থাকায় আমরা তা করতে রাজী নই।

"আলিঙ্গন ও চুম্বন হায়
মরল তোমায় ধেয়ান ক'রে,
তোমার ঠোঁটের চুম না পেয়ে
পান্না চুনি গেল ম'রে।
কাহিনী আর বাড়াব না
অল্পে সারি কল্প কথা—
মরল কেহ ফিরে এসে
প্রতীক্ষাতে জীবন ধ'রে।"

কল্প-কথা শেষ চুছত্রের পূর্ব্বে শেষ করলেই সুন্দর হ'ত, কারণ শেষের কথাটি এতই অল্পতা দোষদুষ্ট যে তার অর্থ ই খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনী অংশে কবি বলেচেন হাফেজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্ত্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা! এটা প'ড়ে কেবলই মনে হ'ল, বাঙ্গালী পাঠকের কত বড় দুরদৃষ্ট!

কতকগুলি শ্লোকে প্রকৃত কাব্যরসের আস্বাদন পেয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে অনুবাদককে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যে সব অসঙ্গতি, অস্বচ্ছতা, তৃতীয় শ্রেণীর ভাব অনেক স্থানে দেখলাম তা কি হাফেজের? এ কথা মনে করাও পাপ। তবে কি কবি নজরুলের? কবি নজরুলকে যাঁরা জানেন তাঁদের পক্ষে একথা মনে করা পাপ না হ'লেও একান্ত কষ্ট-সাধ্য ও কষ্টকর। তবে দোষ কার? মুখবন্ধে দেখলাম কবি ফার্সিভাষা শেখেন যুদ্ধক্ষেত্রে, বাঙ্গালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে। তাঁর কাছেই তিনি 'হাফিজ' শিখে তার অনুবাদ কর্ত্তে ইচ্ছুক হন। একে যুদ্ধক্ষেত্র, তার মধ্যে বাঙ্গালী পল্টনে এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে মৌলবী সাহেব! খুব সম্ভব যুদ্ধ কর্ত্তেই। তিনি বাংলা জান্‌তেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কাছে যে শিক্ষাটী হ'ল, সেইখানে কোন গলদ ছিল না ত? আর একজন পূর্ব্ব যুগের বীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে শিক্ষা গ্রহণ কোরেছিলেন, তার শেষ অর্থ আজ পর্য্যন্ত নিরাকৃত হল না; তা পাঠ কোরে কেউ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করচে, কেউবা বোমা তৈরী করচে। অজ্ঞাত মৌলবী সিপাহীর শিক্ষায় যে গ্রন্থের উৎপত্তি হ'ল, তারও বিভিন্ন অর্থ হতে পারে না এমন কথা জোর গলায় কেমন ক'রে বলি? তবে আমাদের মনে হয় পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব আমাদের বাঙ্গালী কবিকে হয়ত সব ফার্সি কথার সব অর্থ ঠিক মত শেখান নি, আর সেই জন্যই 'হাফিজ' প'ড়ে আমাদের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হচ্ছে। এর শেষ বিচার ফার্সি ও বাংলায় সমান অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই করতে পারবেন। ফার্সিতে অনভিজ্ঞ অথচ হাফিজের কাব্যরস-পিপাসু বাঙ্গালী পাঠকদের তরফ থেকে যা মনে হয় আমরা তাই বল্‌লাম। অনুবাদের স্থানে স্থানে যে রসবস্তুর গন্ধ পাওয়া যায়, তা হাফিজের সন্দেহ নেই। আর অধিকাংশ স্থানে যে কষ্টভোগ করলাম তার জন্য হাফেজও দায়ী নয়, কবি নজরুলও দায়ী নয়। বাঙ্গালী পাঠকের অদৃষ্টদোষে হাফিজ বাংলায় এলেন পাঞ্জাবী মৌলভীর মারফতে!

জীবন-বীমা ও অক্ষমতার সুবিধা
DISABILITY BENEFITS.

[শ্রীশরদিন্দু সাহা]

জীবন বীমার কোনও ভাবী মক্কেলকে (Prospect) যদি জিজ্ঞেস করা যায়—"মশাই জীবন বীমার ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?" তিনি সটান জবাব দেবেন—"জানি বৈ কি, জীবন বীমা করে মরতে পারলেই লাভ; বেঁচে থাকলেই লোকসান।" এরূপ উক্তির সাথে সাথে তাঁর চোখে মুখে সহজ গাম্ভীর্য্যের এমন একটা অনাবিল ছাপ পড়ে মনে হয় তাঁর আত্মপ্রসাদযুক্ত মনের গোপন কোণের একটা ভাব উকি মেরে বলতে চায় যে তিনি মস্ত বড় একটা বাজীমাৎ করলেন। সাধারণত: দেখা যায় বীমার দালালগণ কথার উপর কথার ইন্দ্রজাল বিস্তার করে যুক্তির বহর দেখিয়ে মক্কেলদের আক্কেল গুড়ুম করে কাজ বাগাতে সিদ্ধহস্ত। তাদের যুক্তিকে কাটতে পারলে মক্কেলগণ "পার্শ্বাপলী"র যুদ্ধ-জয়ীর ন্যায় বিজয়-গৌরবের আত্মপ্রসাদ লাভ যে করবেন তাতে আৎকে উঠবার কী এমন আছে? বাইরে থেকে দেখলে গোটা জবাবটাই একটা খাঁটি সত্য বলে মনে হলেও আধুনিক জীবন-বীমা ব্যবস্থার উদার সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রেখে তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ঐরূপ উক্তির পেছনে নিছক সত্যের দাবী ত নাই-ই বরং যেরূপ হঠকারিতার বশে তাঁরা উক্তরূপ তুরন্ত জবাব দেন তাতে তাঁদের আধুনিক জীবন-বীমা প্রণালী সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণাই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তা ছাড়া ক্রমোন্নতির জয়-যাত্রাপথে জীবন-বীমা বর্ত্তমানে গোটা সভ্য দেশসমূহের গোষ্ঠী ও ব্যষ্টি জীবনে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেচে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সোণার কাঠির পরশ লাভ করে জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ কাল তাদের চুক্তিপত্রে (Policy) বীমাকারিদের যেরূপ সুযোগ সুবিধা দিতে সক্ষম হয়েচে তা ভাবলে মক্কেলদের উক্তরূপ উক্তির পেছনে যে নিরেট অজ্ঞতার দাবী ও প্রভাব অনেক-খানি বর্ত্তমান তা অস্বীকার করা যায় না। আজকাল উন্নতিশীল উদার জীবন-বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলোর বীমাপত্রে (Policy) বীমাকারীর মৃত্যুর পূর্ব্বে চুক্তি-পত্রের চলতি অবস্থায় বীমাকারীর স্থায়ী বা অস্থায়ী পূর্ণ অক্ষমতায় বিশেষ সুবিধা (Permanent or temporary total disability benefits), স্বত্বলোপহীনতার অধিকার (Nonforfeiture privilege) চাঁদা-শোধ বীমাপত্র (Paid-up policy) প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender value) বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা (Free medical, Surgical and Nursing benefits) দৈব দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ (Double indemnity on death by accident) অসময়ে ঋণ দান ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সব সুবিধা-জনক সর্ত্ত সমূহ দেখা যায় তা ঐরূপ জবাবের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ।

আমাদের দেশে বীমাকারীগণ যে ঐরূপ উক্তি করেন তার পক্ষে বলবার যথেষ্ট কারণও যে নেই তা নয়। কারণ আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে ভারতের জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিচালন-ব্যবস্থায় এমন সব গলদ আছে যাতে বীমাকারীগণ এসব বিষয়ে কিছু জানবার সুযোগ মোটেই পান না। ভারতে আমরা জাতি হিসাবে যা কিছু পুরাতন

যা কিছু সনাতন তাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকাতেই সোয়াস্তি বোধ করি। রক্ষণশীলতার বদ্‌রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে জমাট বেধে গিয়ে গোটা জাতটাকে এমনভাবে পঙ্গু করেচে যে নতুনের আলো, সংস্কারের দীপ্তি আমাদের ধাতে মোটেই সয় না। তাই বাস্তব জীবনের কঠোর পেষণে বাধ্য হয়ে যদিও বা নতুন কিছু গ্রহণ করি দুদিন বাদেই তাতে রক্ষণশীলতার মরচে ধরে যায়। চির নতুনের উপাসক আধুনিক দুনিয়ার নিত্য নতুন সৃষ্টির উদ্দাম প্রেরণা আমাদের বিচলিত করতে পারে না। আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রেই যখন এরূপ জীর্ণ রক্ষণশীলতার আবহাওয়া বর্ত্তমান বীমা-ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হয় কিরূপে? তাই জীবন-বীমাক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সব প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আর্থিক জগতে সর্ব্বহারা ভুখারী ভারতকে জীবন-বীমার নবান্ন পরিবেশন করে' ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ভারতের স্থায়ী কল্যাণ কামনায় যা'রা জীবন-বীমার সুমহান আদর্শকে ভারতের ব্যষ্টী ও গোষ্ঠীজীবনে প্রতিফলিত করে' বর্ত্তমান আর্থিক দুনিয়ায় "পারিয়া" ভারতকে কূলে উঠাবার ভার নিয়েছিলেন ভারতের দুর্ভাগ্য যে তাঁরাও আজ আদর্শচ্যুত হয়ে রক্ষণশীলতার প্রভাবে পড়ে জীবন-বীমা জগতের নব নব আদর্শ ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে আমল না দিয়ে একটা কপট আভিজাত্যের অহঙ্কারে মনকে চোখ ঠারছেন।

আজ জীবন-বীমাজগতে যেখানে উন্নতিশীল দেশ সমূহে জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো পুরান বীমা-পত্রের দোষগুলি ছেঁটে ফেলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নানারূপ উদার সর্ত্ত সমূহ যুক্ত করে বীমাকারীগণকে ভবিষ্যতের যাবতীয় আপদ বিপদ দৈব দুর্ঘটনার জন্য অশান্তিকর চিন্তার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের জীবনকে সুখময় করতে প্রয়াসী সেখানে আমাদের দেশের হোমরা চোমরা জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে পূর্ণ উদাসীন। তারা বীমাকারিগণকে অনুরূপ সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত করে তাদেরেই কষ্টার্জ্জিত রক্ত-জল-করা পয়সা লুটবার ফন্দিতে ব্যস্ত। যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান কুরুক্ষেত্রের পঞ্চ পাণ্ডবের [Big five] মতই ভারতের জীবন-বীমাক্ষেত্রে নাম কিনেচে দুঃখের বিষয় তাদের সবগুলোই বীমাকারীদের প্রতি উদার সুযোগ সুবিধা দানের দায়িত্বকে একভাবেই এড়িয়ে চলেচে। এদের এরূপ উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতাকে সমর্থন করার জন্য যখন এদের প্রধান কর্ম্মসচিব থেকে লাগায়েৎ দালালগুলো পর্য্যন্ত কপট যুক্তি ও প্রচারের মায়াজাল ছড়িয়ে সমস্বরে বীমা-পত্রে এই সব সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান অনুমোদিত নয় বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে তখন শেয়ালের "আঙ্গুর টক"-এর গল্পকেই মনে করিয়ে দেয়। বীমা-জগতের উন্নত দেশ সমূহের বড় বড় বীমাবিৎ পাণ্ডারাই [Insurance Experts] বীমাকারীদের এরূপ সুবিধাদানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতাকে একবাক্যে স্বীকার করেচেন। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রধান প্রধান জীবন-বীমা কোম্পানী-গুলো এরূপ সুবিধা দিয়া থাকে। কোন কোন দেশে রাজ সরকারের বীমাসম্বন্ধীয় আইনে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে বীমা কোম্পানীগুলো বীমাকারীগণকে এরূপ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। জার্ম্মাণি, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি ডেনমার্ক ফিনল্যাণ্ড ক্যানাডা প্রভৃতি বীমাজগতের শীর্ষস্থানীয় দেশ সমূহে জীবন-বীমাকারিগণের এরূপ সুবিধা লাভ মোটেই নতুন কিছুই নয়। আমেরিকার বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলোর বীমাকারীদের মধ্যে যারা এরূপ সুবিধা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাদের শতকরা আশী নব্বই জনই এরূপ সুবিধাজনক সর্ত্তযুক্ত বীমাপত্র গ্রহণ করে থাকে।

আমেরিকার তথা পৃথিবীর বৃহত্তম বীমা-প্রতিষ্ঠান "Metropolitan"এর বীমা-পত্রের সাথে যে অতিরিক্ত চুক্তি-পত্র [Supplementary contract] দেওয়া হয় তাতে এরূপ সুবিধাজনক সর্ত্তসমূহ বর্ত্তমান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত চুক্তি-পত্রের এক অংশ নীচে উঠিয়ে দেওয়া গেল, এতে কোম্পানীর উদার ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

…'The waiver of premiums and monthly payments (*one per cent of the sum assured*) herein provided shall be in addition to all benefits (including participation in distribution of surpluses) under said Policy.……… Monthly income payments shall not be subject to commutation."

এদের বীমা-পত্রে বীমাকারীর মাথা খারাপ হলেও তার ওয়ারিশকে মাসিক ভাতা দেবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য অতিরিক্ত সুবিধার জন্য কোম্পানী বীমার দাবীর প্রতি হাজার করা ২৲৩৲ টাকা উপরি চাঁদা গ্রহণ করে থাকে।

এমন একদিন ছিল যখন জীবন-বীমার মোটেই প্রচলন হয় নি তখন কোন ব্যক্তি মরলে তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের একটা গতি করার জন্য লোকের মাথা ব্যথা হয়েছিলো, তাই জীবন বীমার প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়েছিলো—। কিন্তু ক্রমে লোকে ভাবতে লাগলো, তাই তো জীবন-বীমা যে করচে সে যদি জীবিত অবস্থায় শক্ত দুরারোগ্য ব্যাধি বা দৈব দুর্ঘটনার চক্রে উপার্জ্জনে অক্ষম হয়ে পড়ে তা হলে সে বীমার চাঁদাই বা যোগাবে কোত্থেকে আর তার ফলে আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী পুত্র দিয়ে তার সংসারই বা চালাবে কি করে? এই প্রশ্ন তাদের উদ্ব্যস্ত করে তুললো। তারই ফলে সম্ভব হলো বীমা-পত্রে এরূপ অক্ষমতাজনিত সুবিধা [Disability benefits] দেওয়ার প্রচলন। বীমা জগতে ব্যাধি-বীমা, দৈববীমা ও বার্দ্ধক্য-বীমার যিনি গোড়া পত্তন করেন তিনি যে সে লোক নন্। তিনি স্বয়ং Bismark [বিসমার্ক],—জার্ম্মানির সর্ব্ব যুগের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদ বিসমার্ক—যিনি অর্দ্ধ শতাব্দী কাল গোটা ইউরোপকে তার দুর্ভেদ্য কূটনীতির ইন্দ্রজালের আবরণে ভুলিয়ে বেকুব করে রেখেছিলেন। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানি সারা দুনিয়ার হোমরা চোমরা শক্তিবর্গের সাথে ছয় ছয়টা বছর যে অমিত বিক্রমে লড়ল তার শক্তির উৎস যুগিয়েছে যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে এই বিসমার্ক এবং আরও মজার কথা এই যে জার্ম্মান জাতিকে গোটা ইউরোপ তথা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সংহত, দুর্দ্ধর্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য বিসমার্কের আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল করার পথে সর্ব্বশ্রেষ্ট পাথেয় হয়েছিল এই তিন প্রকার বীমা ব্যবস্থা—ব্যাধিবীমা, দৈববীমা, ও বার্দ্ধক্যবীমা। বিসমার্ক চল্লিশ বছর আগেই টের পেয়েছিলেন যে জগতের শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক প্রভুত্বলাভের জন্য ইউরোপে একটা মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা। যুদ্ধ করতে হলে দেশের গোটা জাতকে সংহত করা ও সৈন্য শক্তির সংগঠন প্রয়োজন। তাই—তিনি ভাবলেন যে গোটা জার্ম্মান জাতটাকে স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ ভাবী লড়ায়ের জন্য তৈরী করতে হবে। কিন্তু দেশের লোক যে যুদ্ধে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গবে, প্রাণ দেবে—তাদের বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র পরিবার বাপ দাদা মাসী পিসি এরা খাবে কি? তাই তিনি ঠিক করলেন যে এইরূপ তিন প্রকার বীমা ব্যবস্থার ফলে দেশবাসী—ঘরের মায়া ভুলে দেশের জন্য মরিয়া হয়ে নিশ্চিন্ত মনে লড়তে পারবে। ১৮৮৩ সালে তিনি এরূপ বীমা প্রথার প্রচলন করেন। তার ফলে এক বছরেই জার্ম্মানীর তিন ভাগের এক ভাগ লোক দৈববীমা করে' ভবিষ্যত জীবনের ভাবী বিপদাপদের দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। বীমা জগতে এই বিসমার্কই এই তিন রকম বীমা প্রথার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলে' পরিচিত এবং তাই অনুসরণ করে আজ ৪০।৫০ বৎসর ধরে অন্যান্য দেশের বীমাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কগণ আপনাপন দেশ ও জাতিকে সংহত করে চলেছেন। বীমা-জগতেও এই মহাশক্তিশালী আবিষ্কর্ত্তা বিসমার্ক চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকবেন।

জগতে ইংলণ্ড যে কোনরূপ বীমা প্রথার বিধিমত ভাবে প্রবর্ত্তনের পথ-প্রদর্শক হলেও একথা মিথ্যা নয় যে বীমা জগতে যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞতার ফলে বীমা ব্যবস্থায় বিশেষতঃ জীবন-বীমাক্ষেত্রে যে সব সংস্কারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিলো রক্ষণশীল ইংলণ্ড সে দিকে পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু কাল-প্রভাবে তাকেও আইন করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়েছিলো। জার্ম্মানীতে দৈববীমা ব্যাধিবীমা প্রভৃতি আবিষ্কারের পর অন্যান্য দেশ বিশেষ তৎপরতার সাথে উক্তরূপ বীমা প্রথা গ্রহণ করলেও রক্ষণ-শীল ইংরাজ মাত্র সে দিন ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে শুধু শ্রমিক বীমাকারীদের [Industrial Policy-holders] জন্য আইন করে পাঁচটা বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে [National Insurance Art of 1914]। ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থায় কি কি সুবিধা দেওয়া হয় সংক্ষেপে তার বিবরণ নীচে তুলে দেওয়া গেল।

১। রোগে ভাতা [Sick pay]—এতে সপ্তাহে পুরুষগণ দশ শিলিং ও মেয়েরা সাড়ে সাত শিলিং করে ভাতা পায়। বীমাকারী রোগে পড়ায় তিন দিনের দিন থেকে

ঐরূপ ভাতা পাওয়ার অধিকারী। এগুলি অস্থায়ী অক্ষমতার ব্যবস্থা; এদ্বারা চিরস্থায়ী অক্ষমতায় বীমাকারী স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অক্ষম হওয়ার ছ' মাস পর থেকে ৭০ বছর বয়স পর্য্যন্ত সপ্তাহে ৫ শিলিং করে পায়। পুরো ২ বছরের বীমাচাঁদা দেওয়ার পর ইহা কার্য্যকরী হয়।

২। মুফৎ চিকিৎসা-ব্যবস্থা [Free medical benefits]—এতে বীমাকারীর অসুখ হলে ডাক্তার এসে দেখে যায়, বীমা-কোম্পানি তার ফী যোগায়।

৩। বিনা খরচায় ওষুধ-দান ও শল্য চিকিৎসা [Free medicine and surgical benefits]—এতে বীমাকারীর রোগের ওষুধ ও কাটাছেড়ার যাবতীয় খরচা বীমা-কোম্পানী দেয়।

৪। মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা [Maternity benefits]—এতে কোন স্ত্রীলোকের বা বীমাকারীর স্ত্রীর সন্তান হলে প্রত্যেক সন্তান পিছু ৩০ শিলিং করে ভাতা পায়।

৫। যক্ষ্মা রোগে স্বাস্থ্যনিবাসের ব্যবস্থা [Sanitorium benefit for Consumption cases] বীমাকারী ব্যক্তির যক্ষ্মা হলে স্বাস্থ্যনিবাসে বা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানী করে থাকে।

—এতে দেখতে পাই যে রক্ষণশীল ইংলণ্ড দেরীতে গ্রহণ করলেও বীমাকারীদের জন্যে যেরূপ ব্যবস্থা করেচে আমাদের দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কাছে আজও এরূপ ব্যবস্থা করা কল্পনাতীত হয়েই আছে। পাশ্চাত্য দেশে বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলোর এরূপ উদার ব্যবস্থায় বীমাকারী-গণ ভবিষ্যত সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হতে পেরেচে। জীবিত অবস্থায় তাদের কেহ রোগে বা দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে যাওয়াতে যে আর্থিক আয়ের ক্ষতি হয় বীমা-প্রতিষ্ঠান তার বীমাপত্রানুযায়ী ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা করে থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত বীমা-কোম্পানীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ডাক্তার সি, আর, হেনরি এম, ডি (C. R. Henry M.D.) যথার্থই বলেচেন—"In disability insurance the thing insured is the earning power of the policy holder." এর ওপর বীমাচাঁদা দেওয়ার দায় থেকেও বীমাকারী রেহাই পায় অথচ তার মৃত্যুর পর বীমা কোম্পানী মৃত ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভরশীল দুঃস্থ পরিবারকে বীমাপত্রের নির্দ্দেশমত যে মোটা টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তা পুরোপুরি বা কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত রূপে বীমাকারির জীবিত অবস্থায় যে অর্থ দাদন করে থাকে তা বাদ দিয়ে বীমদাবীর টাকা বীমাকারীর ওয়ারীশকে দিয়ে দেয়। এরূপ ব্যবস্থায় বীমাকারীকে দৈব দুর্ঘটনার ফলে কি তার জীবিতাবস্থায় কি তার মৃত্যুর ফলে তার নিঃস্ব পরিবারকে কোন অবস্থাতেই পথে এসে দাঁড়াতে হয় না। এরূপ স্থলে বীমাকারী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে যদিও মনে হয় যে বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বীমাপত্রে বীমাকারীদের জন্য এরূপ উদার ব্যবস্থা করায় বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে এরূপ ব্যবস্থা করে কোন কোম্পানি এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ ত হয়ই নি বরং লাভ করেচে ঢের বেশী। বীমাচাঁদার ওপর যৎসামান্য উপরি চাঁদা (Extra loading charge) নিলেই যথেষ্ট এবং কোন কোন স্থলে একদম কিছু না নিয়েও বীমা কোম্পানী এরূপ দায়িত্ব অনায়াসে বহন করতে পারে। অথচ আমাদের দেশের বড় বড় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক ও প্রতিনিধিগণ অক্ষমতা বীমার ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকার করতেও নারাজ। নীচে তুলে দেওয়া কানাডার বিশিষ্ট বীমাবিদ পণ্ডিত Mr. W. A. Woodএর উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এদের বীমা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা মোটেই নির্ভুল নয়। তিনি বলেচেন—It should however be borne in mind that the cost of these benefits were very small, as compared with the total life Premiums, and losses to some degree could very well be met out of loading on the full premium...... ....
A large volume of business had in fact been obtained through the disability benefits without corresponding procuration costs.' (Speech delivered in The International Congress of Actuaries held in London, 1927)

ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বীমাকারী-গণকে এরূপ সুবিধা দান করার বিপক্ষে যাই বলুন না কেন এ কথা আর চেপে রাখতে পারবেন না যে তাদের বীমা-কারীদের প্রতি এরূপ অনুদার আচরণের মূলে রয়েচে দেশবাসীর প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের অভাব। বলতে লজ্জা

হয় যে বীমাকারীদের চিরস্থায়ী অক্ষমতার বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা (Permanent total disability benefit)—যাতে আশঙ্কা খুব কম, তাও ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করার ভার নিয়েছিল একটা উন্নতিশীল নতুন বিদেশী কোম্পানী।

ভারতের দরিদ্র বীমাকারীগণের অতি কষ্টে সঞ্চিত অর্থ ও আন্তরিক স্বদেশানুরাগই দেশীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান গুলোর উন্নতির মূল। আর তাদেরই রক্ত-জল-করা পয়সার দৌলতে যে সব দেশী বীমা-প্রতিষ্ঠান বড় বড় দালান ইমারত তৈরী করে অযথা জাঁকজমকের ভড়ং দেখিয়ে নতুন মক্কেল ভেড়াবার ফন্দীতে ব্যস্ত, সেই সব দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে তারা এতটুকু বিশ্বাস ও সহানুভূতি লাভেও বঞ্চিত যা নাকি একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠান বিশ বছর আগেও তাদের দিতে কৃপণতা করেনাই। এরূপ দেশ-দ্রোহিতার লজ্জাকর অভিনয় একমাত্র এই ভাগ্যহীন সম্বিৎ-হীন, আত্ম-বিস্মৃত দেশেই সম্ভব। আশার কথা আজ কাল দেশে আন্তরিক দেশাত্মবোধের হাওয়া আবার বইতে সুরু করেচে। তাই আধুনিকতম কতকগুলো দেশীয় জীবনবীমা-প্রতিষ্ঠান তাদের বীমাকারীগণের মধ্যে জীবনবীমা-জগতের নতুন নতুন সুযোগ সুবিধার নৈবেদ্য বিতরণ করতে আর অযথা সঙ্কোচ বোধ করে না। আজ ভারতের দেশাত্মবোধ-জাগরণের এই গৌরবময় যুগে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও স্থিতিস্থাপক, জাতির সঞ্চিত অর্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীভূ স্বরূপ জীবনবীমা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা স্বজাতীয় বীমাকারীদের ভাবী জীবনকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু-জনিত দৈন্যের বিভীষিকার হাত থেকে মুক্ত করে সুখময় করতে প্রয়াসী, দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও অভিনন্দনের বিজয় মাল্য তাঁরা চিরদিনই লাভ করবেন।

জীবন-বীমার চুক্তি-পত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ উদার সুবিধা দান করার পথে বিশেষ বিপদ যে নেই তা নয়, বরং আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থায় বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী তা অস্বীকার করা যায় না। কেন না বীমা বিজ্ঞানে বিশেষতঃ অক্ষমতা-বীমার পরিচালন সম্বন্ধে যারা মোটেই ওয়াকিব হাল নয় তাদের হাতে যদি কোন বীমা-প্রতিষ্ঠানের ভার ন্যস্ত থাকে [যা আমাদের দেশে হামেশাই হয়ে থাকে] তাদের পক্ষে হুজুগে পড়ে এরূপ সুবিধাযুক্ত বীমা-পত্রের প্রচলন করলে তার ফল যে ভাল হবে তা মোটেই স্বীকার করা যায় না। এমন কি আমাদের দেশের অনেক বীমা বিদ্দেরই অক্ষমতা-বীমা সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা বিশেষ স্পষ্ট নয়। তার কারণ তাদের বেশীর ভাগই ইংরাজদের লেখা ২।৪টা বীমা সম্বন্ধে কেতাব-পত্র পড়ে' এ বিষয়ে পণ্ডিত হ'বার সখ মিটিয়ে নেন। অথচ এটা অতি সত্য কথা যে ইংরাজ প্রভুদেরও অক্ষমতা-বীমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিতান্ত সে দিনের এবং তাও অনেকটা ধোঁয়াটে রকমের। বীমা জগতে এ বিষয়ে তাদের মতামতের মূল্য খুব অল্প। জার্ম্মাণী আমেরিকা প্রভৃতি যে সব দেশে অক্ষমতাবীমা-ব্যবস্থা বিশেষ রূপ প্রভাব বিস্তার করেচে তাদের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে ঢের বেশী। এমতাবস্থায় ভারতে উদার ভাবের জীবন-বীমা প্রচলন করতে হলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশ সমূহের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে বিশেষরূপ খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। এরূপ বীমা-ব্যবস্থার চাঁদার হার ঠিক করাতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ বীমা-ব্যবস্থার বনিয়াদ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান জগতে যেমন একটু এদিক ওদিক হ'লেই গোটা তত্ত্বটাই উল্টে যাবার সম্ভাবনা তেমনি যে কোনরূপ বীমা-ব্যবস্থায়ও বিশেষরূপ সতর্কতার আশ্রয় না নিলে "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ"-এর "সংযুক্ত বীমা-পত্রে"র [Combined Policy] মতই শেষে পস্তাতে হবে। জীবন বীমার চাঁদার হার ঠিক করাতে যেমন মৃত্যু-তালিকার [Mortality table] সাহায্য পাওয়া যায়, অক্ষমতা বীমার উপরি চাঁদার হার ঠিক করাতে সেরূপ কোন সঠিক অবলম্বন [Definite data] পাওয়া যায় না। তবে আজকাল আমেরিকার Hunter's Disability Table এর ওপর ভিত্তি করে দেশ কাল পাত্র ভেদে ২।৪ বছর এদিক সেদিক করেই অন্যান্য দেশের জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অক্ষমতা বীমার কাজ চালান। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত আমেরিকায় বীমাবিদ সমিতির রিপোর্টে (Report of the Actuarial Society of America) এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া কয়েক বছর আগে বিলাতে যে International Congress of Actuaries এর অধিবেশন হয়, সেখানে Disability benefits সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোচনা হয় তাতেও কিছু কিছু মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায়। ভারতের পক্ষে সিঙ্গাপুরের Great Eastern নামক বিদেশী পরিচালিত কোম্পানীর অভিজ্ঞতা যদিও সামান্য তবুও বিশেষ মূল্যবান। এ সম্বন্ধে কাগজে কলমেও বিশেষরূপ আন্দোলন হওয়া দরকার।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,

14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

২৩শ বর্ষ পৌষ, ১৩৩৭ ৯ম সংখ্যা

কষ্টি-পরীক্ষা

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

দিন নাই রাত্রি নাই—কাগজে কালিতে মাখামাখি—
দেশ দেশ দেশ !
দেশ কোথা, দেশ কার ? কারে এই ব্যর্থ ডাকাডাকি
অক্লান্ত অশেষ ?
চিনিনা জানিনা যারে, বুঝি নাই কভু কোনোদিন
যার মৌন ভাষা,
অস্পৃশ্য যাহার ছায়া, তবু যারে রাখিয়া অধীন
সাধি স্বার্থ-আশা ;
সুখ দুঃখ দূরে থাক্, যাহার মমত্ব কোনো কালে
পুষি নাই বুকে,
তারে ল'য়ে এই খেলা—জুয়াড়ীর অক্ষ-ক্রীড়া-জালে
নির্লজ্জ কৌতুকে !
যে কালি কাগজে মাখি, কলঙ্ক তাহার দশগুণ
মাখিয়া ললাটে
ভাবি নিজ জয়ধ্বজা উড়াইনু অক্ষয় নিপুণ
এই বিশ্ব হাটে

এত অন্ধ নহে বিশ্ব, বিশ্বাসিবে কভু কোনোকালে
হেন পরিহাস,—
পৌরুষবিহীন ক্লীবে বিরচিবে ধরিত্রীর ভালে
নিজ ইতিহাস ?
বীর্য্যশুল্কা বসুন্ধরা বীর্য্যে শুধু করে অর্ঘ্যদান
শ্রদ্ধামুগ্ধ চোখে,
দেশে দেশে যুগে যুগে বীর্য্যবন্ত বিজয়-সম্মান
লভে বিশ্বলোকে।
বলিষ্ঠ ত্যাগের শক্তি মনুষ্যত্বে বরি' একদিন
পূজিল ব্রাহ্মণে,
বলিষ্ঠ ভোগের শক্তি ক্ষাত্রবীর্য্যে বসালো স্বাধীন
রাজ-সিংহাসনে।
অন্তঃসারশূন্য দম্ভ বাহিরে যা করে আস্ফালন
স্বার্থ-কোলাহলে,
যথার্থ শক্তির কাছে সে কেবল মুণ্ড-আভরণ
চণ্ডিকার গলে!

খদ্যোৎ নহেক অগ্নি, যতই করুক বারম্বার
দীপ্তি-অভিনয় ;
মোহান্ধ রাত্রির কীট, অন্ধকারে তুচ্ছতা তাহার
দণ্ড ছু'য়ে লয়!
একবিন্দু দাব-বহ্নি মহারণ্যে করে ভস্মসাৎ
খাণ্ডবের মত',
সভয়ে পালায় প্রাণী লভি' রুদ্র সত্যের আঘাত
মৃত্যু-বেত্রাহত!
এক বিন্দু প্রতাপের বজ্রতেজে মোগল-মহিমা
ভয়ে কম্পমান,
এক বিন্দু শিবাজীর শূরত্বের দিতে নারে সীমা
সারা হিন্দুস্থান ;
একফুল্কি ছত্রসাল বুন্দেলার ঝঞ্ঝাময় মেঘে
জ্বালে যে বিদ্যুৎ—
সাম্রাজ্য ধ্বসিয়া পড়ে, শত্রু মিত্র পালায় উদ্বেগে
হেরি' মৃত্যুদূত!

সেদিন গিয়াছে চলি'—আজি দেশ বচন-গম্বুজে
আচ্ছন্ন আহত,
মহাশিব পড়ে' আছে পদতলে ত্রিনয়ন বুঁজে'
শক্তি তন্দ্রাগত !
দুর্ব্বল নারীর মত' পরস্পরে হানাহানি করি'
কলহে কুৎসায়—
ঈর্ষ্যার কালিতে মোরা আপন কলঙ্ক তুলি ভরি'
কাগজের গায় !
হীন ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি' মমত্বেরে করি বলিদান
সবাকার পরে,
ভায়ের লাঞ্ছনা করি, জননীর সাধি অপমান
রহি' তাঁরি ঘরে ;
বাহিরে ঢক্কার নাদে আপনারে করি সে প্রচার
স্বদেশের নামে,
বুঝি না হাসিছে পৃথ্বী বাতুলের দেখি ব্যবহার
দক্ষিণে ও বামে ।

ত্যাগের গৈরিক সূত্রে প্রতিষ্ঠার পতাকা রচনা
ভুবনে বিদিত ;
মরণের কষ্টিতলে যথার্থ নিষ্ঠার খাঁটি সোনা
হয় পরীক্ষিত ।
শাশ্বত কালের কোলে এ সত্যের কভু কোনোদিন
হয়নি ব্যত্যয়,
প্রাণের সীমানা ছাড়ি' প্রেম তবে হ'য়েছে কঠিন—
তাই সে অক্ষয় ।
প্রেমহীন প্রাণহীন শক্তিহীন বাক্য যার বল,
ভিক্ষা যার কাজ,
বৃত্তি যার স্বার্থ-সন্ধি, কীর্ত্তি যার সঙ্কীর্ণ কৌশল,
দাস্যে নাহি লাজ ;
যা খুসী বলুক্ কিম্বা যা খুসী করুক্ অভিনয়
যথা ইচ্ছা তার,
দেশের সন্তান বলি' সে যেন না দেয় পরিচয়
বিশ্বে আপনার ।

ধর্ম্ম ও সমাজ

[স্বামী বাসুদেবানন্দ]

যুগান্তর

একটা সভ্যতার যখন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় তার পূর্ব্বে একটা নবভাবের প্রবল অভ্যুত্থান দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থান বা রোমান সাম্রাজ্যের পতন অথবা সারাসিন সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান—আপাতঃ দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে এ সকলের মূল কারণ রাজনীতিক পরিবর্ত্তন, বৈদেশিক আক্রমণ অথবা কোন রাজবংশের পতন। কিন্তু তখনকার ইতিহাস যদি মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তা হ'লে বেশ বুঝতে পারা যায় যে একটা নব ভাবের বন্যা ধীরে ধীরে সকল ব্যষ্টির অন্তস্থল পরিপূর্ণ করায় সমষ্টিতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়ায়। চন্দ্রগুপ্ত, আটিলা, সোলেমান বা শিবাজী আপাতঃ দৃষ্টিতে যুগপরিবর্ত্তনকারী বটে কিন্তু যথার্থ দৃষ্টিতে তাঁরাও সেই নবভাবের কর্ম্মীমাত্র। যখন একটা নূতন সভ্যতা ওঠে তখন সেটা প্রথমতঃ আচরিত প্রথা এবং প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা ও বুদ্ধিতে আঘাত করতে থাকে। এই সংঘর্ষের পরিণত অবস্থাকে ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সেই নবীন ভাব সংক্রমিত হওয়াই বিপর্য্যয়ের অসাধারণ কারণ। বর্ত্তমান যুগও ঐরূপ একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবী এখন নব কলেবর ধারণ করচেন।

পরিবর্ত্তনের মূলে দু'টো কারণ দেখা যায়,—(১) সভ্যতার মূল ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সামাজিক বিশ্বাস নষ্ট হ'য়ে যাওয়া এবং (২) বিজ্ঞান ও শ্রম-শিল্পের নবনব আবিষ্কারের সহিত জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের অবস্থান্তর প্রাপ্তি। একদিকে অতীতের সংস্কার এখনও খুব প্রবল, অন্যদিকে নবীন জ্ঞানও তার সংস্কার গঠনে তৎপর—নিজেকে সে অতীতের আসনে বসাবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। এই দ্বন্দ্বের রূপান্তর বা নামান্তর যুগ-পরিবর্ত্তন বা অরাজক ব্যাপার।

এই ধ্বংস-লীলার মধ্যে যে কিরূপে সৃষ্টির পদ্ম ফুটে উঠবে তার একটা সঠিক নির্দ্দেশ এখনও পর্য্যন্ত ক'রতে পারা যায় নি। কি নীতির ওপর যে সামাজিক সভ্যতা গড়ে উঠবে, সমষ্টির ইচ্ছাতে তা এখনও অস্ফুট। কেন না দেখতে পাওয়া যাচ্চে ব্যষ্টির ইচ্ছা আজ যা চায়, কাল তা চায় না। তবে এটা খুব সত্যভাবে প্রতীয়মান হ'য়ে পড়েছে যে আগামী পালনী-শক্তির আসন ঐ সমষ্টির বক্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ যাকে জনতা, ভিড়, রাস্তার হৈ রৈ, ছেলে ছোকরার হঠকারিতা বলছি, তারই সংস্কৃত সংজ্ঞা হচ্চে সমষ্টি।

কত বিশ্বাস, যা ধ্রুব সত্য বলে' বিচারের অতীত ছিল, নতুন জ্ঞানের ধাক্কার পর ধাক্কা লেগে তাতেও ফাটল ধরিয়ে দিলে। অবশেষে জিতবে বোধ হয় এই জন-শক্তি—আর সব বোধ হয় এ একেবারে হজম করে ফেলবে। দেখাও যাচ্চে প্রাচান প্রাসাদের স্তম্ভের পর স্তম্ভ ধ্বসে' প'ড়ছে পরন্তু জনতার জোয়ার উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যুগ অতীত হ'য়েছে, আসছে এখন কলি, শূদ্র বা জনতার যুগ। এ যুগে ধর্ম্মও যেরূপ সুলভ, কপটতাও তেমনি প্রচুর।

এক শতাব্দী পূর্ব্বেও তথাকথিত জাতীয় যুদ্ধ ব্যক্তিগত ছিল, আর ব্যক্তিরই অনুযায়ী ঐতিহাসিক ঘটনা রূপ নিত। সাধারণের মতামত কোথাও কিছু কিছু নেওয়া হ'ত, কোথাও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হ'ত না। কিন্তু সেদিন আর নেই; এখন ব্যক্তির মতামতের ওপর ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর করে না, সাধারণের মতের অনুযায়ী এখন নূতন ইতিহাস গ'ড়তে চ'লেছে। সাধারণের মত এখন ব্যক্তিবিশেষের মতকে উপেক্ষা করে' ভগবানের মত বলে' প্রতিষ্ঠিত হ'তে চ'লেছে। জাতির ভাগ্য এখন আর ধনি-সংসদে নির্ণীত হবে না, তার বিচার স্থিরীকৃত হবে ব্যষ্টির মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে।

এ যুগের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা যাচ্চে যে কর্ম্মী সম্প্রদায়ই ক্রমে কর্ত্তৃত্বের ভার নিজেদের মাথায় তুলে নিচ্চে। বহু দেশে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন মত গ্রহণ করা হ'লেও কর্ম্মীরা এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারত না। বুদ্ধি-

মানের দ্বারা প্রেরিত হ'য়েই তারা তাদের মতামত দিত —বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ইচ্ছা বলে' তাদের কিছুই ছিল না। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে দার্শনিক মতবাদ তা যে কখনও কার্য্যকরী হ'তে পারবে, এ চিন্তাও কারও মনে কখনও ওঠে নি। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে সেই প্রাচীন মহতী চিন্তা প্রতিক্ষণে ব্যষ্টির হৃদয় ও মনকে আক্রমণ করে' সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ওপর একটা বাস্তব জীবনকে লাভ করবার চেষ্টা করচে। সেই চেষ্টা আজ অনুকূলিত হয়ে', যে জনমতকে একটা জড়তার সমষ্টি বলে' মনে হ'ত, তাকে সচেতন করে তুলচে। নাবালক যেমন সময় পূর্ণ হ'লে সমস্ত শক্তি-সম্পদ এক এক করে' তার রক্ষকের নিকট হ'তে বুঝে নেয় তেমনি আজ জনমতের নিকট অভিজাতকে তার সমগ্র শক্তি-সম্পদ একটার পর একটা করে' বুঝিয়ে দিতে হ'চ্চে। পশুর মত যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটত আজ তারাও ব'লতে শিখেছে, আমাদেরও তোমাদের মত ছুটি ও আমোদ আহ্লাদের দরকার—সময় কমাও নইলে ডবল দাম দাও। নিরক্ষর এখন সভায় তার প্রতিনিধি পাঠাতে শিখেচে, যার মধ্য দিয়ে কর্ত্তব্য ও কর্ম্মের সুবিধা সম্বন্ধে সে তার মতামত জানাতে পারে।

দেখতে দেখিতে জনশক্তির চাওয়াটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠচে এবং তাদের চাওয়াটা পাওয়া মানে বর্ত্তমান সমাজের ধ্বংস। এই দাবীর পূরণ—মনুষ্যের আদিম সভ্যতায় প্রত্যাবর্ত্তন—তবে জ্ঞানের ওপর। পরিশ্রমের সময় সংক্ষেপ, খনি, রেলওয়ে এবং জমিকে জাতীয় সম্পদ করা, লভ্যাংশ সমান ভাগে বিভাগ, ছোট বড় দু'ভাগ নাশ, বেদ বা জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার, এই সব হ'চ্চে তাদের বর্ত্তমান দাবী।

জনতা যুক্তি জানে না কিন্তু কাজ ক'রতে জানে। সংঘ-শক্তি ও জন-শক্তির মিশ্রণে একটা বিপুল বলের প্রকাশ হ'য়েচে। শীঘ্রই এই বলের সাহায্যে, যে সব রীতি নীতি এখন নূতন ঠেকচে, কিছুকাল পরে সেইগুলিই পুরাতনের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রচারিত হবে, যেমন এক সময় জন্মগত স্বত্ববাদ স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রচারিত হ'য়েছিল। কিন্তু কালে জন্মগত কর্ত্তৃত্বের দৈবীস্বত্ব মানবস্বত্বে রূপান্তরিত হবে।

যে সব সাহিত্যিকেরা এতদিন আভিজাত্য-প্রসাদী ছিলেন, এবং সংকীর্ণ বাঁধাধরা ভাসাভাসা সন্দেহ-বাদ প্রকাশ করে' আত্মানন্দে বিভোর হ'তেন, তাঁরাও আজ মনুষ্য-সমুদ্র আলোড়ন করে' এই ঘুমন্ত দৈত্যের অভ্যুত্থানে ভীত ও ত্রস্ত। তাঁরা আজ ব'লচেন, বিজ্ঞান দেউলে হ'য়ে গ্যাছে, বেদান্তের একাত্মবাদ একটা মিথ্যা গল্প। হঠাৎ তাঁরা ধর্ম্মের সকল গোঁড়ামীর অনুষ্ঠান স্বীকার করে' কাশী বৃন্দাবনে পাপ ধৌত করবার চেষ্টা ক'রছেন। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত এখন আর সময় নেই। অসময়ে এ সব ভড়ং দেখিয়ে লাভ কি? ক'রলে কিছু আগে থেকে আরম্ভ করাই উচিত ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে অবিশ্বাস করাটা বড়লোক মহলে একটা ফ্যাসান ছিল। প্রাচীন সব জিনিষই খেলো করে' দেওয়া, খেলো করে' বলা, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা একটা বড়লোকী চাল ছিল। কাল তাঁরা যা করেছেন, গরীবরা আজ তাই শিখেছে। এখন তীর্থেই যাও আর পুরাণ থেকে বেচে বেচে কুসংস্কার গুলোর আবৃত্তি বা জন্মগত স্বত্ব বলে' চীৎকারই কর, "ভবী ভোলবার নয়।" বেদান্তের একাত্মবাদ, বুদ্ধের জীবন, ইউরোপের ইতিহাস জনতার হাতে তুলে' দিয়েছিল কে? মনু মহারাজ যে সব বই সাধারণের জন্যে proscribe (নিষেধ) করে গ্যালেন, সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে' সাধারণের কাছে পৌছে দিয়ে, এখন হা হুতাশ ক'রলে চলবে কেন? বর্ত্তমানে এমন কোনও দৈবী বা মনুষ্যশক্তি নেই যা আজ এই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণ-চৈতন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।

বিজ্ঞান এখনও দেউলে হয় নি, বেদান্তও একটা মিথ্যা গল্প নয় এবং মনুষ্য সমাজের বিপ্লবের জন্যে তারা দায়ীও হ'তে পারে না। তবে দোষের মধ্যে সত্য জিনিষটা তারা আপামরে বিতরণ ক'রেছে। তারপর সমাজ বা শাসন কিরূপ হবে বা না হবে সে মানুষ নিজে বুঝুক। বিজ্ঞানের দেওয়া জাগতিক সত্য এবং বেদান্তের দেওয়া পারমার্থিক, মানুষের বুদ্ধির বেশ একটা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, ভাবের অস্পষ্টতারূপ ধোঁয়ার আচরণ একেবারেই তাতে নেই। এবং সত্য আপাতঃ সুখ শান্তি ভেঙ্গে দেয় বটে কিন্তু একটা বিরাট সুখ-ছবির সন্ধান মানুষের সামনে তুলে ধরে। সত্য, মিথ্যার অনুনয় সম্বন্ধে বধির, সে যে স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয় তা সহস্র ক্রন্দন বা চেষ্টাতেও ফেরাবার নয়।

সারা বিশ্বে একটা নব জাগরণের সাড়া পড়ে' গ্যাছে, অদূর ভবিষ্যতে তার নিরোধের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। মানবের অদৃষ্টে যে কি আছে তা বলা যায় না, কিন্তু এই অদৃষ্টের কবলিত সকলকেই কালে হ'তে হবে। বৃথা তর্ক—বৃথা শক্তিক্ষয়। কিন্তু পৃথিবীর এই গর্ভযন্ত্রণা নবজাত সভ্যতারই দ্যোতক। এ প্রসবের নিরোধ কি কেউ করতে পারে!

একটা বাড়ি জীর্ণ হ'লেই বর্ষা ও দমকা হাওয়া এসে তাকে ফেলে দেয়। লোকে বলে, 'ঝড়-বৃষ্টি বাড়িটে পড়ে' যাবার কারণ'; কিন্তু ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই লোকে বাড়ী তৈরী করে। তাই ব'লতে হয় জীর্ণতাই পড়ার কারণ, ঝড় বৃষ্টি নয়। কিন্তু সভ্যেরা বলেন, সামাজিক বা জাতীয় প্রাসাদ এই বন্য বর্ব্বর অশিক্ষিতেরাই ঝড়ের মত এসে ভেঙ্গে দিলে।

কিন্তু গ'ড়তে হ'লে জ্ঞানীর প্রয়োজন। খুব অল্প লোকেই গড়ে, বাকী তাদের অধীনে খাটে। জনতা গ'ড়তে জানে না, ভাঙতে জানে। যতদিন গড়ার কাজ শেষ না হয়, যত দিন সে প্রাসাদ জীর্ণ না হয়, ততদিন ঐ বন্য থাকে ঘুমিয়ে। কিন্তু যেই প্রাসাদ জীর্ণ হ'ল, অমনি তার প্রাকৃতিক নিয়মে ঘুমও ভাঙল এবং তার সংঘর্ষে প্রাচীনের স্তম্ভ-গম্বুজে ধ্বংসের চিহ্ন ব'সিয়ে দিলে

গড়ার মধ্যে থাকে আইন কানুন, পশুবুদ্ধির পরিবর্ত্তে যুক্তির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও আনুশীলনিক বৃত্তি। বন্য কিছুদিন ঐ সকল শৃঙ্খলের আয়ত্ত থাকে কিন্তু যেই সুযোগ উপস্থিত হয় অমনি জীবাণুর মত বিরাটের দেহ ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। সেই কাল এখন এসে উপস্থিত হ'য়েচে। এখন যুক্তির দর্শন চ'লবে না, সংখ্যা-দর্শনই সকল শাস্ত্রের সেরা।

আগামী সভ্যতার বনাত বুনচে মোটর, বাষ্প ও বিদ্যুৎ, তার মাকু হ'চ্চে এরোপ্লেন, ষ্টিমশিপ, তার ওপর কারুকার্য্য করচে ফিল্‌ম। এই বননের ঝঞ্ঝায় প্রাচীরও ঘুম ভেঙে গ্যাছে, সেও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এই বনন-কার্য্যের ব্রত নিলে। পাশ্চাত্য তার বিজ্ঞানের টানা যেমন ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক'রলে, প্রাচ্যও অমনি তার আধ্যাত্মিকতার পড়েন চিকাগো পর্য্যন্ত চালিয়ে দিলে। এই অরণ্যের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ জগতে চিরকালই ছিল কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হ'তে পারেনি বলে' সমাজে শাসনে ও ধর্ম্মে বিপর্য্যয় এমন ব্যাপকভাবেও কখনও হয় নি। এ অশান্ত পরিশ্রম ততদিন চলবে যতদিন না নবীন দ্বীপান্তরিত মানব তার অবস্থায় অনুযায়ী উপযোগ্যতা লাভ না করবে।

এতকাল ধরে' যে পদ্ধতিগত শিক্ষা জগতে বিস্তৃত হচ্ছিল, সেটাকে যদি দু'ভাগে সাজান যায় তা হ'লে দেখা যায়, তার একটা হ'ল রাষ্ট্রিক আর একটা হ'ল সাম্প্রদায়িক। রাষ্ট্র শেখাচ্ছেন যে তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাঁদেরই সভ্যতা জগৎকে নিতে হবে। তাঁদেরই জগতে বাঁচবার একমাত্র অধিকার। অন্যদিকে সম্প্রদায় ব'লছেন, আমাদেরই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, স্বর্গরাজ্য ভগবান আমাদের জন্যই তৈরী ক'রেচেন। রাষ্ট্র ব'লচেন দেশিকতা ভগবানের দান, কিন্তু অপর জাতির দেশিকতা সয়তানী ব্যাপার। একটা যুদ্ধ হ'ল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র তার বিভিন্ন ইতিহাস তৈরী ক'রলে, কেউ ব'ল্লে শিবাজী ধর্ম্মবীর, কেউ ব'ল্লে দস্যু। এদিকে ধর্ম্ম সম্প্রদায় অনুরোধে অনেক সময় সত্য চেপে রাখেন, বা একটু অসত্যের সঙ্গে মিশিয়ে বলেন বা একটা দিক্ আড়াল করে' আর একটা দিক দেখিয়ে দেন। 'শূদ্র' প্রভৃতি কত শব্দের অপব্যাখ্যা, নারীলিখিত দেবীসূক্ত প্রভৃতি শাস্ত্র নারীর অপাঠ্য তাঁকে ক'রতে হয়। কাজে কাজেই যে জ্ঞানলাভ আমরা ক'রচি তার অধিকাংশই অর্দ্ধসত্য, মিশ্রিত সত্য, সত্যাভাস, কোথাও বা একেবারে চাপা। ফলে দাঁড়ায়, মন থেকে জিজ্ঞাসা জিনিষটা একেবারে অন্তর্হিত হ'য়ে মন মুখ এক করে', কাজ ক'রতে পারা যায় না, নগ্ন সত্য দেখেও সেখান থেকে পালাতে হয় বা সেখানে বসে' পাথরের মত চুপ ক'রে থাকতে হয়। যেমন প্রাচীন খৃষ্টানেরা বিশ্বাস ক'রত যে পৃথিবীর উল্টো দিকে নরক, কিন্তু যেদিন কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার ক'রলেন সে দিন সেই ধর্ম্মযাজকদের মনের অবস্থা কিরূপ হ'য়েছিল একবার ভাব দেখি। একটা জিনিষ বারংবার চিন্তা ক'রতে ক'রতে অভ্যাসে পরিণত হয়। ক্রমে এই অভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি বলে' খ্যাতি লাভ করেন। ইঁনি কোনও যুক্তিই শুনতে চান না, সত্য নিজে অতিথি হয়ে' এলেও তার সৎকার ইঁনি ক'রতে নারাজ। এই অসত্য অভ্যাসকে তাড়াতে গিয়ে জগতে ধর্ম্ম ও সভ্যতার নামে যে কত নিষ্ঠুর

হত্যাকাণ্ডই ঘটে গ্যাছে, তার গণন-সংখ্যা ইতিহাসের সংকীর্ণ পত্রপুটে ধরে না।

সংবৃত বা পদ্ধতিগত ধারণা আমাদের মনে এত দৃঢ়মূল হ'য়ে বসে যে নবীন আগন্তুক সত্যকে প্রকাশ ক'রতে আমাদের সাহস হয় না। স্বামিজীর কথায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয় যে, আলোক যেমন অন্ধকারের সৃষ্টি ক'রতে পারে না, জ্ঞান তেমনি কখনও অজ্ঞানের সৃষ্টি ক'রতে পারে না। অধিকারিবাদ জাতি, কুল বা বংশের অনুযায়ী মানা যেতে পারে না, তার স্থান ব্যক্তির দেহ ও মনের গঠন এবং ধারণা-শক্তির অনুপাতে। যে দিন থেকে খৃষ্টীয় চার্চ্চ তার পদ্ধতিগত সাহিত্য ছাড়া গৃহস্থের অন্য সাহিত্যের চর্চ্চা বেআইনী বল্লে, সে দিন থেকেই সে পিছিয়ে প'ড়তে আরম্ভ হ'ল। স্বামিজী এক জায়গায় লিখেছেন, যে "ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, কৃশ্চান ধর্ম্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে কৃশ্চানী ধর্ম্মের অনুমোদিত? কৃশ্চানী সংঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ ক'রতে পারে? আজ পর্য্যন্ত "চর্চ্চ" প্রোফেন (ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লিখিত) সাহিত্য প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের প্রবেশ আছে, তার কি অকপট কৃশ্চান হওয়া সম্ভব? নিউ টেষ্টামেণ্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান মনীষিগণ ইউরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লেমারিঁয়, ভিক্টর হুগোকুল বর্ত্তমানকালে কৃশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত।......এক দানসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনও কার্য্যপদ্ধতি গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপী যা কিছু উন্নতি হ'য়েচে, তার প্রত্যেকটিই খৃষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে কৃশ্চানীর শক্তি থাকত, তা হলে 'পাস্তের' এবং 'ককে'র ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত; এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত বর্ত্তমান ইউরোপে কৃশ্চানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিষ। সভ্যতা, এখন তার প্রাচীন শত্রু কৃশ্চানীর বিনাশের জন্য, পাদ্রিকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয় সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হ'য়েচে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তা হ'লে কৃশ্চানী তাহার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ ক'রতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হ'ত; কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই কৃশ্চানী ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু!" *

আমেরিকায় ইংগারসোল একবার স্বামিজীকে বলেছিলেন, "আমি নাস্তিক বটে, কিন্তু আমি না থাকলে আজ তোমাকে ইঁটিয়ে মারত।" হিন্দু জাতির সৌভাগ্য যে আজ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আগমনে তার পদ্ধতিগত ছাঁচের বাঁধ ভেঙ্গে গ্যাছে, তার স্থানে এখন দেখা দিচ্চে সর্ব্বদিকে সৃষ্টিমুখী চিন্তা ও বুদ্ধি।

"Men fear thought as they fear nothing else on earth—more than ruin, more even than death."† সত্যচিন্তাকে মানুষ যেমন ভয় করে পৃথিবীতে মানুষ এমন আর কিছুকেই ভয় করে না—ধ্বংস ও মৃত্যুর চাইতেও এ ভয়াবহ। সত্যচিন্তা মানুষকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে' দেয়, জাতীয় জীবনে বিপ্লব, বিভীষিকা এনে দেয়। ব্যক্তিগত সুবিধা, চিরন্তনী প্রতিষ্ঠান এবং আরামপ্রিয়তার কাছে সে নিষ্ঠুর। প্রাচীন জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বের জায়গায় বেআইনী, অরাজক ব্যাপার করে' তোলে, নুক্কারের মত অসৎকে সে ত্যাগ করে। নরকের অন্ধকার ভেদ ক'রেও তার দৃষ্টি চলে। সে জানে অজ্ঞেয় কাল-প্রবাহে সে একটা ছোট ঘূর্ণী-মাত্র, কিন্তু তবুও তার ব্যবহার বিধাতার মত সর্ব্বশক্তিমান। এর গতি ঝড়ের মত, এর প্রকাশ সূর্য্যের মত, এ সম্পদ মানুষের মহাগৌরব। একে পেলে, "ন বিভেতি কুতশ্চন"—মানুষের আর ভয় থাকে না। জ্ঞানীকে সকলে ভয় করে, কিন্তু ভয় করে কতদিন, যতদিন না সেই সত্য ব্যাপকভাবে জাতি, সমাজ, সংঘ ও পরিবারে গৃহীত হয়। "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"—বহুকালের অভ্যাস থেকে কতকগুলো ধারণা, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক নিয়মের ওপর আসক্তি আসে, তখন মানুষ সেগুলো হারাবার ভয়ে ভীত হ'য়ে পড়ে। ভয় কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগতির সাহায্য ক'রতে পারে না,—উন্নতি, বৃদ্ধি, নব সত্যের আশাই সকল প্রতিষ্ঠানকে জাগ্রত করে' দেয়। আরাম-প্রিয়তা সর্ব্বদাই সৃষ্টিমুখ সত্যের সন্ধানে বিরত।

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ

† Principles of Social Reconstruction—Bertrand Russel.

স্বপ্ন ও জীবন

[শ্রীফণীন্দ্র পাল]

কালিদাসের ভাষায় আজকের আকাশের বর্ণনা করা যায় অনেকখানি কিন্তু কালিদাসের কাব্য থেকে চুরি করে' আপনাদের কাছে আকাশের রূপ বর্ণনা করলে সেটা মারাত্মক হয়ে উঠবে। নিজস্বভাবে বলা চ'লতে পারে যে আজ আকাশ মেঘের এলোচুলে ঢাকা, সজল—অশ্রান্ত বর্ষণধারায় মুখর।

নেশা অনেকেরই অনেক রকম থাকে, আমাদের কয়েকজনেরও ছিল অনেক রাত-অবধি একটি চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া। আমাদের এ মোহ এতই প্রখর ছিল যে যদি কোনদিন দৈবক্রমে সকাল-সকাল অর্থাৎ দশটায় বাড়ী ফিরতাম তা'হলে আমাদের আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আসত' যে আমাদের কোন অসুখ-বিসুখ হ'য়েছে কিনা!

সেদিন আমরা কয়েকজন সেই ঝড় বাদলের ভেতরে 'বিজু-কেবিন'এর গোল মার্ব্বেল টেবিলটি ঘিরে ব'সলাম। দুই একজন যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁদের অজুহাত এই যে তাঁরা বিবাহিত। আর এতগুলি তরুণের মধ্যে কেউই যে প্রেম-বায়ুগ্রস্ত থাকবেনা একথা ব'লে আমি আপনাদের সন্দেহের অবকাশ দিতে চাই না। আমাদের পরেশদা' যে একটু 'মেয়ে-পাগল' একথা আপনাদের জানাচ্ছি জানলে সে নিশ্চয়ই একমাস আমার মুখদর্শন ক'রবে না কিন্তু তার এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে অনেক নজীর সংগ্রহ ক'রেছি বলে' আমার যা-কিছু ভরসা আর গল্প লিখছি ব'লেই যে আপনাদের কাছে আগাগোড়া সব মিথ্যা বানিয়ে ব'লতে হবে এমন স্পর্দ্ধা আমার যেন না হয়। পয়সা খরচ করে' তেমন নির্লজ্জ মিথ্যা বরদাস্ত করবার আগ্রহ আপনাদের না-থাকাই সম্ভব। যাই হোক্, পরেশদা'ও সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন।

আমাদের আড্ডাতে চলত না কি!—সাহিত্য আলোচনা, শিশির ভাদুড়ীর নটনৈপুণ্য, দেশের শোচনীয় দুরবস্থার কথা, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, টেষ্ট ম্যাচের হারজিত, কর্পোরেশনের ইলেক্‌শন, উদয়শঙ্করের নাচ, চা, সিগার, বিঁড়ি, নস্য ও অন্যান্য ছোট বড় কোন প্রসঙ্গই বাদ পড়বার জো' ছিল না।

সেদিন আড্ডার ওজন কম থাকার সুযোগে পয়সা খরচের পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনায় এক চাল বদান্যতা দেখানো গেল। অর্থাৎ সেদিনকার চায়ের অর্ডার দিলাম আমিই। গম্ভীরভাবে অর্ডার দিয়ে এমন ভঙ্গী দেখালাম যেন এই বর্ষার দিনে আমার চাতৃষাতুর বন্ধুদের আমি ছাড়া আর কোন গতি ছিল না।

আমাদের ভেতর তখন কথা চ'লছিল, মানুষের জীবনে দুঃখ কোন দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী প্রসারতা লাভ ক'রবার পথ পায়। কানাইয়ের মতে অর্থকষ্টই মানুষের চরম দুঃখ, সুকুমারের মতে ব্যর্থ প্রেম। তর্কের ঝড় ঝাপটার মাঝখানে এল চা আর সেই সঙ্গে শশাঙ্ক এল বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে। রাত সাড়ে ন'টা। এত রাত্রে ভিজতে ভিজতে শশাঙ্কের হঠাৎ আবির্ভাব আমাদের একটু বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে উঠল, কারণ শশাঙ্ক বিবাহিত।

শৈলেন জিজ্ঞেস ক'রল, কিহে, বাদলার দিনে এতরাতে ভিজে-ভিজে? বউ রাগ ক'রবেনা?

শশাঙ্ক মুচকে হেসে ব'ললে, সেইজন্যেই তো এলাম—এতরাতে ভিজে বাড়ী ফিরে ব'লব ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে, তাতে তাঁর অভিমান যাবে আপনা থেকে ভেঙে; প্রিয়ার শঙ্কাব্যাকুল অনুরাগের ব্যবহারটুকু বেশ লাগবে এই বর্ষার রাত্রে। তাছাড়া it will be a bit of প্রণয়ের রসিকতা, কি বলহে মুরারি?

তোমরাই ওসব ভাল বোঝ ভাই; শচীন একটা সিগার দে' তো।—বলে' মুরারি শচীনের দিকে চুপে চুপে একটা ইসারা ক'রলে। ইসারার অর্থ আমরা জানতাম সকলেই, অবশ্য শশাঙ্ক বাদে, ইসারাকে ভাষায় জানালে এই দাঁড়ায় যে এইবার শশাঙ্কের দাম্পত্য-অনুরাগের মান-অভিমান, আলাপ-ব্যবহারের একটা লম্বা ফিরিস্তি আমাদের শুনতে হবে।

আমাদের আশঙ্কানুরূপ শশাঙ্কও আরম্ভ ক'রছিল এমন সময় একটি লোক এসে গম্ভীরভাবে আমাদের পাশে ব'সল, যেন আমাদের কতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শীর্ণ শরীর, চোখদু'টো অসম্ভব রকম বসে' গেছে। মুখে এক মুখ দাড়ি, কোঁকড়া অযত্ন-রুক্ষ চুল চোখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পায়ে জুতো নেই, গায়ের জামার একটা হাতা নেই, পরণে একটা ছেঁড়া আধময়লা সাড়ী। তার এই দীন চেহারার ভেতর কি যেন এক অপরিসীম ক্লান্তি, গভীর বিষণ্ণতা; তবু তার কোটরগত চোখে কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষার ব্যাকুল-ছায়া পড়েছে, সে প্রতীক্ষা বুঝি অনন্ত কালের, নিষ্ঠুর, স্বপ্নময়।

শচীন চাপাস্বরে আমাদের ব'ললে, এর নাম পাগল অবিনাশ। মাঝে মাঝে এর সামান্ত জ্ঞান ফিরে আসে বটে কিন্তু সেইটেই এর পক্ষে সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক। এর পাগল হ'য়ে যাওয়ার মূলে আছে এক গভীর দুঃখের করুণ কাহিনী। খুন করার অপরাধে এর জেল হ'য়েছিল কিন্তু পাগল হ'য়ে যাওয়াতে ছেড়ে দিয়েছে। অবিনাশ **offensive type**এর পাগল নয়। এখন হয়তো নিজের খেয়ালে তন্ময় হয়ে আছে। অবিনাশ, অবিনাশ শুনছ—এক কাপ্ চা খাবে?

অবিনাশ যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ায় হঠাৎ চমকে উঠে বললে, চা! তা' মন্দ কি! সকাল থেকে উপোস করে আছি।

হঠাৎ অবিনাশের পাগলামি আরম্ভ হয়, অতীতকে বর্ত্তমানের আলো দিয়ে দেখাই তার উন্মত্ততা। সে তখন ব'লছিল, সেই কোন সকালে নাকে মুখে গুঁজে দু'টি খেয়ে আফিস গেছলাম, দুপুরে টিফিন খাইনি শুনলে কমলা আবার রাগ করে, তা' আপনারা চা' খাওয়াচ্ছেন, মন্দ কি! তা' বলে' দোকানে কি আর কমলার মত চা' তৈরী করতে পারবে। শুধু কি চা', রান্নায় কমলা দ্রৌপদীর জুড়ী; নিয়ে যাব একদিন আপনাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে'।

তারপর সে যেন আপনার মনে কথা ব'লতে লাগল, বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে—দুত্তোর ছাই, বাড়ী ফেরবার মুখে এল বৃষ্টি—ভগবানটা নিশ্চয়ই পাগল নইলে যখন তখন এরকম করে' কাঁদে কেন? কমলা হয়তো দেরী দেখে কত ভাববে, এতক্ষণে হয়তো ভয়ভাবনায় কেঁদেই ফেলেছে। এত ভীরু, অভিমানী আমার কমলা। খোকা—বুলু নিশ্চয়ই এখনও জেগে আছে, গেলে ব'লবে, 'বাবা লবেনচু'।

অবিনাশ ব্যস্তভাবে তার জামার পকেট হাতড়া'তে লাগল, তারপর হতাশ সুরে ব'ললে, ঐ যাঃ লজেনচুস্ কিনতেই যে ভুলে গেছি। যাক্ পথে কিনে নিলেই হবে। আজ রাতে কমলাকে ঘুমোতে দেব না! ও এত ঘুমকাতুরে কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার ক'রবে না—আজ বৃষ্টির মত বাচাল হ'য়ে কমলার সঙ্গে কথা কইব।

হঠাৎ সে আমাদের দিকে ফিরে প্রশ্ন ক'রল, বিয়ে করেছেন আপনারা? করেননি! এঃ নিতান্ত ছেলেমানুষ সব। আচ্ছা শেষরাতে যদি বৃষ্টি থেমে গিয়ে জ্যোৎস্না ফোটে আর আকাশে দু' একটা তারা, তা'হলে কমলাকে গান গাইতে ব'লব। ও এমন মৃদু মিষ্টি সুরে গান গায়—ও যখন দুষ্টু বুলুকে ঘুম পাড়াবার জন্যে গুণ গুণ ক'রে গায়—এমন চমৎকার লাগে।

এমন সময় চা' এল। অবিনাশ চায়ে চুমুক দিয়ে ব'ললে, বুঝলেন, পৃথিবীতে শান্তি কোথায়?—শান্তি হ'চ্ছে একটি ছোট সংসারে। আমার কমলার মত একটি স্ত্রী আর আমার বুলুর মত একটি খোকাকে নিয়ে,—জীবনের একান্ত আপনার আত্মীয় হ'য়ে যে মেয়েটি আমার সুখে-দুঃখে জড়িয়ে যাবে তাকে নিয়ে আর একটি দামাল ছেলের মুখরতা দিয়ে যে-সংসার, তারই জন্যে পৃথিবীর সকলকে পাগল হ'য়ে যেতে হবে,—হবে, হবে। পৃথিবীর জীবনে এইটুকুই শাশ্বত, সুন্দর। যৌবনের দিনের প্রেমের স্বপ্নটি নিয়ে বার্দ্ধক্যের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেঁচে থাকি আমরা। এ যে না চায়, হয় সে বোকা নয় বিরাগী।

অবিনাশ কি পাগল! জীবনে যে এত বড় তাজমহলের স্বপ্ন দেখে তাকে পাগল বলি কি করে'?

শচীন জিজ্ঞেস ক'রল, অবিনাশ তোমার বাড়ী কোথায়?

অবিনাশ ব'ললে, বাড়ী আমার শ্রীরামপুরের দিকে একটা গাঁয়ে। চাকরীর খাতিরে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী ক'রতে হয় ভাই। গ্রামটার নাম কাজলী। সেখানে একটি ছোট বাড়ী আছে, মেটে। সামনে দীঘি আছে একটা, পেছনে

মাঠ-ভরা ধানের ফসল। দীঘির পারেই লাল-ধূলোর রাস্তা তারপর আবার মাঠ, যতদূর চোখ যায়। রজনীগন্ধার গাছ লাগিয়েছি বাড়ীর চারপাশে, আচ্ছা আমায় আপনারা হেনার চারা জোগাড় করে' দিতে পারেন কয়েকটা? হ্যাঁ, সেখানে থাকি আমি আর কমলা—দুটি ঘুঘুর মত।

শচীন ব'লল, বড় কাব্য হ'য়ে প'ড়ছে অবিনাশ।

অবিনাশ একটু উজ্জ্বল হাসি হেসে ব'ললে, প্রেমই তো কবিতা; ছুটির দিন সমস্তক্ষণ কি করি শুনবেন? কমলাকে বলি, 'তুমি আমার চেয়ে সুন্দর' সে বলে, 'না, তুমি' আমি বলি, 'হাসলে তোমার মত আমার গালে টোল পড়ে না, আর তোমার বাঁ দিকে ঠোঁটের কাছে ওই ছোট তিলটুকু তাও যে আমার নেই ছাই।' তবু সে বলে, 'না, তবু তুমিই আমার চেয়ে সুন্দর।' কিছুতেই মীমাংসা হয় না। হঠাৎ দুলে দুলে খোকা এসে ঢোকে, খিল খিল করে' হাসতে হাসতে, ছুটে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে কমলা বলে, 'খোকাই সব চেয়ে সুন্দর।' তার পর আমরা দু'জনে মিলে খোকাকে আদরে আদরে ব্যস্ত করে তুলি। খোকা—আমাদের দুষ্টু খোকা, দামাল খোকা আধো আধো ভাষায় কথা ব'লতে গিয়ে আমাদের হাসিয়ে মারে।

চা তখনো খাওয়া হয়নি, অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল, যাই, শেষ প্যাসেঞ্জার রাত ১০টায় ছাড়ে, ধ'রতে হবে, নাহ'লে কমলা হয়তো সারা রাত কেঁদে কাটাবে, কিছু মুখে তুলবে না। খোকাকেও হয়তো জাগন্ত দেখতে পাব না।

শচীন ব'লল, আর একটু বসনা অবিনাশ, ট্রেণের এখনো অনেক দেরী।

বাইরে তখনও বৃষ্টি নূপুর বাজিয়ে চ'লেছে। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতর এই গৃহহীন উন্মাদ লোকটিকে ছেড়ে দিতে কি জানি কেন আমাদের মমতা হ'ল। অথচ জানি এই বৃহৎ পৃথ্বীর প্রান্তরে কত অজ্ঞাত উন্মাদ আজিকার প্রলয়োন্মত্ত আকাশের তলায় তাদের বিচিত্র উন্মত্ততা নিয়ে তন্ময় হ'য়ে রয়েছে, তাদের না আছে আশ্রয়, না আছে ভালবাসার কেউ।

অবিনাশ আবার ব'সল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে ব'ললে, জানেন? একবার কমলাতে আমাতে তর্ক লেগে গেল, কে আগে ম'রবে। আমি ব'ললাম, 'আমি ম'রে গেলে তুমি কাঁদবে কমলা, তোমার কি খুব দুঃখ হবে?' কমলা বললে, 'দূর, তা' কেন, আমিই যে আগে ম'রব তোমার কোলে মাথা রেখে। হ্যাঁগা, আমি মরে' গেলে তুমি আবার বিয়ে ক'রবে?' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে সে ব'ললে, 'বিয়ে কোরো কিন্তু; না হ'লে তোমার যে ভারি কষ্ট হবে—যে আপনভোলা লোক তুমি।' আমি ব'ললাম, 'না, আমারই আগে মরা উচিত।' কমলার চোখে জল এসে প'ড়ল, ব'ললে, 'আবার যদি এরকম বলো তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না। একদিন আফিস থেকে ফিরে এসে হয়তো দেখবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছি।' তখন খোকা সেখানে ব'সেছিল, হঠাৎ সে ব'ললে, 'আমি ম'লব।'

অবিনাশ থামল তার সমস্ত মুখখানা কেমন যেন গভীর বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে। শচীন ব'ললে, তারপর অবিনাশ, তোমার খোকা—

একী হল! অবিনাশের স্বপ্ন তখন ভেঙে গেছে। এক নির্ম্মম চেতনা যেন কুয়াসার আড়াল থেকে সুমুখে এসে দাঁড়াল, তীব্র ভ্রূকুটি করে', চৈত্র-মধ্যাহ্নের নিষ্ঠুর প্রখর রোদের মত। শচীনকে বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে অবিনাশ ব'ললে, চুপ করুন, আমার খোকা নেই,—খোকা আমার মরে' গেছে, এতক্ষণ আপনাদের কাছে মিথ্যা ব'লছিলাম, বুঝলেন এ সব মিথ্যা। খোকা ম'রেছে, এক ফোঁটা ওষুধ তার মুখে দিতে পারিনি। ওষুধ কিনতে পয়সা লাগে, ওষুধ গরীবদের জন্যে নয়। গরীবের বেঁচে থাকাই অন্যায়।

একটু থেমে অবিনাশ ব'লতে লাগল, যাদের পয়সা নেই তাদের আবার প্রেমের স্বপ্ন দেখা কি, তাদের বিয়ে করা অন্যায়, তাদের ছেলে হওয়া অন্যায়। আলো, আকাশ, বাতাস তাদের জন্যে নয়। তাদের লজ্জা ঢা'কবার জন্যে শুধু রাত্রি—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি।

সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে সে ব'লল, আপনাদেরই মত লেখাপড়া শিখেছিলাম, যদিও অনেক কষ্টের সঙ্গে যুঝে', তার চেয়ে কষ্টে একটা তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি জুটিয়েছিলাম। কিন্তু খোকা মরবার এক সপ্তাহ আগে বড়বাবুর এক আত্মীয়ের জন্যে সে চাকরীটি দরকার হ'য়ে

প'ড়ল। খোকার তখন অসুখ, পয়সা অভাবে চিকিৎসা হ'ল না। তারপর—

অবিনাশ থামলে। চোখে তার জল নেই, আগুনও নেই; শুধু অপূর্ব্ব বিষণ্ণ প্রশান্ত দৃষ্টি। একটু চুপ করে' সে আরম্ভ ক'রল, তারপর কি কষ্টেই যে কেটেছে। কমলার গয়না সব অনেকদিন আগেই বাঁধা পড়েছে। সধবার চিহ্ন বজায় রাখবার জন্যে তখন তার হাতে কাপড়ের ফালি বাঁধা। সেই কমলা, যে গোপনে নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছে তার হ'ল অসুখ, যক্ষ্মা। খোকা ওষুধ না খেয়ে ম'রেছে, তেমনিভাবে ও ম'রবে এ ভাবতে পারলাম না। যেরকম করে' হোক পয়সা জোগাড় ক'রতে হবে, করলাম চুরি। শুনুন আমি চোর।

সে আবার চুপ ক'রল। একটু পরে সে ব'ললে, ওষুধ এল। একদিন রাত্রে কমলার পাশে বসে আছি, হঠাৎ সে ঘুম থেকে চম্‌কে উঠে বললে, 'ওগো ভাল ক'রে আমায় জড়িয়ে ধরো, তোমাকে ছেড়ে আমি ম'রতে চাই না। কিন্তু আমি তখন ভাবছি এ রকম করে' বেশীক্ষণ বেঁচে থেকে তার লাভ কি, সে তো ম'রবেই। অনাহারে, অনিদ্রায়, চিন্তায় আমার বুদ্ধি লোপ হ'ল—দিলাম তাকে poison ব'লে লেখা মালিশের ওষুধটা খাইয়ে। তার ফলে তখনই গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সব নিঃসাড়। আর সেই রক্ত গেল আমার কাপড় জামায় লেগে। আমার মন তখন একবার ব'ললে, এবার তো সব শেষ এখন পালাও। কিন্তু পালাবো কোথায়, কমলার জীবনরক্তে আমি যে দাগী হয়ে' গেছি।—

হঠাৎ অবিনাশ চেয়ার থেকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে উঠে চীৎকার করে' ব'লল, একি! একি চা দিয়েছ—এ যে সমস্ত রক্ত!—ব'লে সে বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাইরে তখনো অশ্রান্ত বৃষ্টি আর ঝড় উন্মত্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে—রাত তখন সাড়ে এগারোটা। জনহীন ক্লান্ত পথ বৃষ্টির জলে থৈ থৈ করছে। সেই ঝড় বাদলের শব্দের ভেতরেও মাঝে মাঝে অবিনাশের আর্ত্তনাদ ভেসে আসতে লাগলো—ওঃ এত রক্ত! ভগবান আমার মুক্তি হবে কবে?

মনে হ'ল, এই বর্ষামুখর রাত্রে অকস্মাৎ জননী বসুন্ধরার মোহসুপ্তি ভেঙ্গে গেছে, তিনিও যেন নিরুদ্ধ কান্নার দুয়ার খুলে দিয়ে উন্মাদিনীর মত ব'লছেন, এ নিষ্ঠুর অভিশাপ থেকে আমার মুক্তি হবে কবে?

তাজ-হ'তে

[শ্রীগোপাললাল দে]

ধূপের গন্ধ আসিছে তাজের মর্ম্ম হ'তে,
যমুনা-কিনারে এখনও ফিরিছে আজান গান,
আমারে এখন ফিরে যেতে হবে পুরানো পথে,
কাণে এসে লাগে তারই বিদায়ের করুণ তান।

মেহেরুন্নিসা, তাহারই ভ্রাতার কন্যা এই!
যোধবাই-বধূ, মোগল রাজের মহিষী রাণী!
আলমগীরের মাতা এই নারী যৌবনেই,
দেহ সঁপিয়াছে হারেমের হেম-লতিকা খানি।

আমি এর নাম শুনেছি আমার জন্ম আগে,
রেখেছি যতনে মনো-মন্দিরে কল্পলোকে,
আকাশে এঁকেছি মুগ্ধ হিয়ার প্রেমানুরাগে,
বাতাসের দূত পাঠায়েছি এর অলকা লোকে।

চলিতে চলিতে আজ জীবনের পথের পাশে,
দেখা হ'য়ে গেল শরৎ আলোর ওড়নাতলে,
আধেক জীবন কাটায়েছি এর আসার আশে,
আর আধখানি কাটায় ইহার ভাষার ছলে।

স্বপ্নে গ'ড়েছি এতদিন এরে কল্পনাতে,
পূজেছি মন্ত্রে, সেরা কবিদের রচিত গীতে,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিনু আজিকে বন্দনাতে,
এবার ধ্যানের মণিপীঠে রবে মৌন শ্রীতে।

বিদায়, বিদায়, বুক ফেটে যায় বিদায় তবু,
মনে থাকে যদি ডাক দিও আরও একটিবার,
ভুলিব তোমারে হেন দিন কারো আসে কি কভু?
হেমলাঞ্ছন প্রেম-মঞ্জিল! নমস্কার।

ফারসী সাহিত্যের আলোচনা

[কাজী নওয়াজ খোদা]

ফারসী সাহিত্যে ভাষার সৌন্দর্য্য, সুষমা, আর ভাবের অভিনবত্ব ও লালিমা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে "উপাসনা"র পাঠকদের জানিয়ে রেখেছি। সে ভাষা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে' আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা যিনি যে পরিমাণে ক'রবেন, সাহিত্য-জগৎ তাঁর কাছে সেই পরিমাণেই ঋণী হ'য়ে থাকবে। কিছুদিন থেকে হিন্দু সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে প'ড়েছে; ফলে "খাইয়ামের' নাম দিয়ে, আর 'হাফেজে'র নাম নিয়ে দুই এক খানি অনুবাদ বাজারে বের হ'য়েছে। ফারসী সাহিত্যে অধিকার ও সে সম্বন্ধে তাঁদের সুযোগ সুবিধা ভেবে তাঁদের সেই অনুবাদ নিয়ে আর তার সঙ্গে মূল কবিতাগুলি মিলিয়ে দেখে আলোচনা করবার সময় আদৌ এখনও হয়নি। তাই কেবল তাঁদের এই 'সদিচ্ছা'র প্রশংসা করে' আর তার জন্য তাঁদিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স'রে পড়লেই সেদিকের কর্ত্তব্য একরূপ শেষ হ'য়ে যায় ব'লেই মনে হয়।

কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিক, যাঁদের ফারসী ভাষা জানার অভিমান আছে আর যাঁরা ঠিক আসলের 'স্বরূপ' বজায় রেখেই অনুবাদ ক'রচেন ব'লে দাবী করেন, তাঁদের অনুবাদ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা না ক'রলে কর্ত্তব্যের ক্রটী হবে ব'লেই আমাদের ধারণা। তাই সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ব'লবো ব'লেই আজ 'উপাসনা'র পাঠকদের সামনে উপস্থিত হ'য়েছি। হয়তো আমাদের এ আলোচনা অনেকের পক্ষে অপ্রিয় হবে; কিন্তু যেটা সত্য, তা সত্যের খাতিরেই না ব'লে উপায় নেই। আসলের নামে যে সব ভেজাল বাজারে বের হয়, মাঝে মাঝে যথাসাধ্য তার গতিরোধ করবার চেষ্টা না ক'রলে অন্ততঃ ভেজালকে ভেজাল বলে' ধ'রিয়ে না দিলে কর্ত্তব্যের হানি তো হয়ই, তার উপর বাজারটাও নেহাৎ খারাব হ'য়ে পড়ে। তাই এখন থেকে মাঝে মাঝে এ নিয়ে আমরা আলোচনা ক'রবো স্থির করেছি।

কিছুদিন আগে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু স্বনামধন্য জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব মুসলমান সাহিত্যিকদের 'ফারসীর অনুবাদ' নিয়ে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে তাঁদের সাবধান ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে দু'চার কথা ব'লেছেন।

প্রথমতঃ দেখা যায় ফারসী শব্দগুলি বাঙলায় লিখতে গিয়ে তাঁরা ভীষণ বিভ্রাটের সৃষ্টি ক'রে ব'সেছেন। শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ তো হয়ই না, তার উপর এক একটা আজগুবী শব্দের আমদানী করে' বসেন, যা স্বর্গ মর্ত্ত, আকাশ পাতাল কোথাও খুঁজে পাবার উপায় নেই। কেউ 'দীওয়ানে হাফেজ্' লিখতে গিয়ে 'দিব্-অ্যানে-হাফিজ' লিখে মস্ত একটা 'কেরামত' জাহির হ'লো মনে করেন। আবার 'আব রু'র (ভ্রূ, সম্মান, ইজ্জৎ) তর্জ্জমা ক'রতে গিয়ে 'মেঘের' নাম নিয়ে ফারসী ভাষার সম্মান হানি ক'রে বসেন। কেউ আবার ইতিহাসের নামে "আঈনায়ে খোদবিনী শিকস্ত" এর বাঙ্গলা অনুবাদ ক'রতে "খোদবিনী"র (আত্মম্ভরিতার) তর্জ্জমা "নিজেকে দেখা" লিখে ফারসী ভাষার মুণ্ডপাৎ ক'রে ব'সেছেন।

বিগত শ্রাবণ সংখ্যার (সম্ভবতঃ শেষ সংখ্যা) "জয়তী"র প্রথমেই 'হাফেজে'র একটী গজলের বাঙলা তর্জ্জমা বের হ'য়েছে। তর্জ্জমাটী দেখে আমরা কিন্তু একটু অবাক্ না হ'য়ে পারিনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "বাসনামে চুলু'বতে" চরণটীর অনুবাদে 'সনম' মানে "ভোর-হাওয়া," আর "বাদে সবা চুবুগ্জরী বর সারে কুয়ে আঁপরী"র 'কু'শব্দের মানে 'ছায়াবীথি', তারপর "কেস্সায়ে হাফেজশ বগো"র 'কেস্সা' মানে "গান নিরালা"—এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'সানাম্' মানে 'বোৎ', 'মাশুক'—প্রতিমা, প্রিয়া, আর 'কু' মানে 'কুচা', 'মহল্লা',—গলি, পাড়া, 'কেস্সা' মানে 'গান নিরালা' নয়ই, তার মানে 'হিকায়েৎ', 'কাহানী'—গল্প।

তারপর ভাবের দিক থেকেও বিশেষ অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশিষ্ট নামজাদা মুসলমান সাহিত্যিকদের এই রকম 'বেপরওয়ায়ী' দেখে স্নেহের অনুযোগ স্বরূপ দু'টো কথা না বলে' থাকৃতে পারলুমনা না। তাঁদের দিক থেকে মনে মনে অনেক আশা ভরসা আমরা পোষণ করি তাই বিশেষ ভাবেই একথাটা ব'লে রাখলুম। হাতের কাছে অন্ততঃ পক্ষে ২।১ খানি ফারসী না হয় উর্দ্দু লোগতের (অভিধান) কেতাব রাখলেই এসব সামান্য সামান্য সমস্যার সহজেই সমাধান হ'য়ে যায়।

একটি কথা

[শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ]

আমার মনের কথাগুলি আজ তোমার মনের সাথে
মুখে-মুখে-ছুটি-কপোতের মতো করিয়াছে কোলাকুলি।
আকাশে কখন রৌদ্র-ছায়ার খেলা
শেষ হ'ল ; এল সলাজ সন্ধ্যাবেলা।
চারিটি চোখের একটি সাগরে কত ঢেউ গেল তুলি'।
অনন্ত কাল—মুহূর্ত্ত যেন। ব'সে আছি হাতে হাতে।

সব হ'ল বলা ; তবু যেন কোথা একটি না-বলা কথা
সকল কথার পিছনে থাকিয়া লুকালো সঙ্গোপনে।
মোর বুকে তার ধ্বনিটি বাজিল যবে,
কিছু কি তখন বোঝনাই অনুভবে ?
যদি বুঝে থাক, ভাষা দাও তারে তোমার গহন মনে।
তারি লাগি' মোর বুকে জ্বলে দেখ নিরুপায় আকুলতা।

তাহারে বাঁধিতে ছন্দের ফাঁদ পাতিয়াছি বারে বারে।
যে পড়িল ধরা, মুখপানে চেয়ে মনে হ'ল সে-তো নয়!
তুমি আছ আজ, দেখ তো যতন করি'
আলোরে কোথায় লুকাইল বিভাবরী ?
কোন্ গুহাতলে—যেথা নাই কোনো স্বপনের অভিনয় ?
স্বপনে ভুলো না,—স্বপন মিলায় বাস্তব সংসারে।

মনে পড়ে শেলী এইমতো ছিল স্বপনের অনুরাগী ;
প্রণয়ের নীড় পারে নি রচিতে ধূলি-ভরা ধরণীতে।
কবে সেই প্রেম বলাকার পাখা মেলি'
আকাশে উড়িল মাটিরে হেলায় ফেলি',
অস্ত-রবির আগুনে ঝলসি' মিলাইল সঙ্গীতে।
এমিলিয়া আজো কাঁদে যেন এই ধরার ধূলার লাগি'।

ওকি ! দেখ চেয়ে, হারানো কথাটি সন্ধ্যাতারার চোখে
উঠিল ঝলকি' ; পুন খসে' পড়ে শূন্য আকাশ তলে ;
পলেক থামিল দেওদার তরুশিরে,
কম্পন তোলে রুক্ষ বাকল চিরে ;
শিকড়ে শিকড়ে দ্রুত সঞ্চরে ; ভ'রে ওঠে ফুলে ফলে ।
বীজে অঙ্কুরে অগ্নি জ্বলিছে মাটির মানস-লোকে ।

আঙুলে তোমার একি শিহরণ ! শিরায় শিরায় জ্বলি,
তোমার সোণার তনুখানি ভরি' তুমি হ'লে বাণীময় ।
নিরুপায় ভাষা কূল খুঁজে নাহি পায় ।—
মনে হয় আঁকি চিত্রীর তুলিকায় ;
রঙের পরশে তোমারে ফুটাই—জগতের বিস্ময় !
রূপায়িত হ'য়ে মোর শেষ কথা নয়নে উঠুক ঝলি' ।

এইক্ষণে যদি তোমার তোমারে আমার মাঝারে আনি'
অস্ত-সাগরে সূর্য্যের মতো পারিতাম ডুবাইতে,
দেখিতে দেখিতে সারা তনু-মন মম
বেদনা-শোণিতে রাঙা হ'ত অনুপম !
আকাশ বাতাস মূর্চ্ছিত হ'ত পূরবীর রাগিণীতে ।
স্থলে জলে আর দূর নভতলে উঠিত কি কাণাকাণি ।

তোমার মনের অভিলাষ হ'ত আমারি মনের ধন ।
তব আঁখি দিয়ে দেখিতাম চেয়ে স্থষ্টি-রহস্ পানে ।
তব আত্মার উৎসের তটে গিয়া
তৃষা মিটাতাম অঞ্জলি ভরি' নিয়া ;
ভাবী যুগ মোর বন্দী পড়িত তোমার বর্ত্তমানে ।
হ'ত একাকার তোমার আমার দুটি হাসি-ক্রন্দন ।

অসীম আবেগে এই দেখ তব ঠোঁট দুটি চুমিলাম ।
আমি হ'নু জয়ী । তোমারে বাঁধিনু বলিষ্ঠ বাহু ডোরে ।
পূর্ব্ব-আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদ হেন
প্রেম-বহ্নিতে মরণ পুড়িছে যেন ।
যে ফুল তুলিনু—কত ভালোবাসি কহিব কেমন ক'রে ?
অনাগত উষা আসিবে এখনি ; মুখে তার মোর নাম ।

শিলং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

১৪ই বৈশাখ—ভোর ৫টায় উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা প্রস্তুত হইলাম। ধর্ম্মশালায় স্নানের সুবিধা হইল না।

সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া প্রভাতে চারিদিক পরিষ্কার হইয়াছে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় যে ট্যাক্সিতে গৌহাটী আসিয়াছিলাম, ষ্টেশনে যাইবার জন্য সেই খানাই ভাড়া করা হইয়াছিল, ছয়টার সময় ট্যাক্সি আসিল।

ধর্ম্মশালার লোকজনদের বকশিষ দিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি নেড়াবাবু ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। যে মোটর বাসখানা প্রথমে ছাড়িয়া পরের খানার সঙ্গেই প্রায় শিলং পৌছে সেখানার ভাড়া অল্প অনেকটা মাল বহনের লরীর ন্যায়।

নেড়াবাবু অল্প ভাড়ার গাড়ীখানিরই টিকিট কাটিলেন। আমাদের মাল পত্রসহ ভৃত্যটিকে নেড়াবাবুর জিম্মায় দিয়া আমরা পরের গাড়ীখানির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তখনও গাড়ীর বিলম্ব ছিল, কাজেই একটু বেড়াইয়া আসা গেল। রাস্তার হোটেল হইতে বাণীরা চা খাইয়া নিল। আমরা বাজারের দিক ঘুরিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম, বাজার দেখা হইল না।

বেলা ৮টায় আমাদের লইয়া যে বাসখানা ছাড়িল উহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। আরোহী মন্দ নহে, তিনটি ভদ্র মহিলা, দুইটি বালিকা, দুইজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, সপরিবারে একটি মাড়োয়ারী, তিনটি বাঙ্গালি বাবু।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, গৌহাটী পশ্চাতে রাখিয়া আমরা সবুজ প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছি। দুই পার্শ্বে প্রকৃতির অপূর্ব্ব মায়াকুঞ্জ। পাদপভূষিত পাহাড়ের কোলে রাখালরা গরু চরাইতেছে। মেয়েরা ক্ষেতের কাজ করিতেছে। আকাশে মেঘ থাকিলেও স্নিগ্ধ নীলোজ্জল, রৌদ্র টুকু সুমিষ্ট।

মাইল তিনেক আসার পর পথের পরিবর্ত্তন সূচনা হইল। আমরা ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতেছি। আমাদের একদিকে অনন্ত গিরিমালা, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ মাথা তুলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। আকাশ যেন আনত হইয়া গভীর প্রেমে গিরিশ্রেণীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। কোথায়ও অনুচ্চ পাহাড়, শতভাগে থরে থরে পূজার নৈবেদ্যের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। এক একটি শৈলগাত্রে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কোনটি আবার বনফুলের গহনায় সাজিয়া মেঘের মুকুট মাথায় পরিয়াছে।

রাস্তার একদিকে পাহাড়, অপর দিকে গভীর গহ্বর। গহ্বরের নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া কলনাদিনী গিরিনদী বঙ্কিম ভঙ্গীতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা অশান্ত জলপ্রপাত পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া শিলা হইতে শিলান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে। চারিদিকের দৃশ্য কি সুন্দর, কি মনোরম! মেঘ ও রৌদ্রের অপূর্ব্ব খেলা, গিরিনদীর কল-কল্লোল, তরুলতার পুলক-হিল্লোল, বনকুসুমের ঝিমঝিম মাধুর্য্য—কে উহাকে ভাষায় ফুটাইতে পারে? এ শুধু অন্তরে অনুভব করিবার সম্পদ! কি বিপদসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথ, প্রতি পদে পদে আশঙ্কা। কখনো উর্দ্ধে কখনো নিম্নে কখনও চক্রাকারে ঘুরিয়া মোটর অগ্রসর হইতেছে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনীতে আমাদের সঙ্গী ছোট একটি মেয়ে পাদ্রী সাহেবের গায়ের উপরেই এমন একটি কাজ করিয়া বসিল যাহা কাহারও পক্ষেই প্রীতিকর নহে, সুন্দর ছোট মেয়েটিকে আদর করিয়া কাছে বসাইবার বিলক্ষণ প্রতিফল ভোগ করিয়া সাহেব বিকৃত মুখে গায়ের কোটটা খুলিয়া বেঞ্চির নীচে রাখিয়া দিলেন। মেয়েটির ছোঁয়াচ গিয়া লাগিল মাড়োয়ারী মহিলার। তিনি অনবরত বমি করিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আমারও মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া চোখের পাতা বুঁজিয়া আসিতে লাগিল।

প্রবল ঝাঁকুনীর চোটে মহিলারা সকলেই গাড়ীর বাতায়নে মাথা রাখিলেন। দুই একজনা আত্মীয় বন্ধুর কোলে শুইয়া পড়িলেন। সহযাত্রী পুরুষ কয়েকটিকেও খুব সুস্থ মনে হইল না।

অর্দ্ধ পথ আসিয়া এক ছায়াময় সমতল ভূমিতে মোটর থামিল। এখানে একটি বিশ্রাম-কক্ষ আছে, বিশ্রাম-কক্ষে নানারূপ ঔষধ, খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জল রাখা হয়।

সকলেই নামিয়া বিশ্রাম-কক্ষে গিয়া বসিলাম। মাথা চোখে মুখে জল দিতেই শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর পুনরায় যাত্রা সুরু হইল। বাঁকা অপ্রশস্ত পথ বাহিয়া যাইতেছি। সহস্র উপলখণ্ড বক্ষে লইয়া গিরিনদীটি আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছেন। রহিয়া রহিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেও আবার দুই একটি বাঁক ঘুরিতেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত কিরণে শৈল শিখরগুলি হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে। ক্রমেই শীতল বাতাসের সাহত ঘনিষ্ঠতা হইতেছে। সকলেরই সঙ্গের গায়ের কাপড় গায়ে উঠিয়াছে।—আর দেরী নাই, লোকালয়ের কাছে আসিয়াছি। স্থানে স্থানে পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষরা পাথর কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে। দূর হইতে পত্রান্তরালের ফাঁকে ফাঁকে শিলংএর দুগ্ধধবলিত টীনের বাড়ীগুলি হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে।

বেলা একটা কুড়ি মিনিটের সময়
'পুষ্প যেথা নিত্য হাসে
লক্ষ লতার তরুণ শাখে
মত্তমধুপ গুঞ্জরিয়া কুঞ্জকানন মুখর রাখে

—সেই স্থানে উপনীত হইলাম। মিনিট পাঁচেক পূর্ব্বেই নেড়া বাবুরাও পৌঁছিয়াছিলেন, আমরা নামিবামাত্র তিনি আমাদের সচল ভৃত্য ও অচল মালপত্র বুঝাইয়া দিলেন।

শিলংএর মোটর ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র, একটা লম্বা গ্যারেজ, পার্শ্বে টিকিট ঘর। টীনের বেড়া দিয়া চতুর্পার্শ্ব ঘেরা। এখনেও নেপালি স্ত্রী পুরুষরা পৃষ্ঠে করিয়া মাল বহন করে। গৌহাটীর ন্যায় শিলংএ মোটরের চুক্তি ভাড়া, মিটার নাই।

শিলং প্রবাসী নরেশ বাবু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকটে শুনিলাম বাসা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ষ্টেশন হইতে বহুদূরে, কাজেই ট্যাক্সি ভাড়া করিতে হইল।

বাসায় পৌঁছিয়া খুবই ভাল লাগিল। শহরের বাহিরে নূতন বাড়ী খানি, চারিদিক খোলা, বড় বড় ঘরগুলি আসবাবপত্রে সাজানো। সম্মুখে ফুলের বাগান, পশ্চাতে ফলের বাগান। বাসাটা খাশিয়াদের, প্রতিবেশী সকলেই খাশিয়া। বাগানে দলে দলে মুরগি চরিতেছে। এক একটা আকারে বড় রাজহাঁসের ন্যায়।

নরেশ বাবু কয়েকটা বালতি ও টীন কিনিয়া স্নানের ঘরে আমাদের জন্য প্রচুর জলের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহারি কাছে চাউল, ডালের মোটামুটি একটা ফর্দ্দ ও টাকা দিয়া কুলী দ্বারা সেগুলি পাঠাইয়া দিতে বলিয়া আমরা স্নান সারিয়া লইলাম। বৈশাখ মাসে এ অঞ্চলে শীতের তেমন তীব্রতা নাই, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

স্নানান্তে জলযোগের পর সঙ্গের বড় ষ্টোভটা ধরাইয়া সংক্ষেপে খিচুড়ী ও ডিমের ডালনা রান্না হইল। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পর হইতেই নানারূপ অনিয়মে ও রাস্তার কষ্টে শরীর ভারী ক্লান্ত হইয়াছিল। সাট মাইল মোটরে আসিয়া আহারাদির পর আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। খাটের উপর এক একটা বালিস টানিয়া লইয়া কম্বলে গা ঢাকিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম।

নরেশ বাবুর ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল—তখন শিলং সুন্দরী সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়াছেন। পথে পথে গাছের মাথায় বিজলি বাতি জ্বলিতেছে।

১৫ই বৈশাখ—প্রভাতে জাগিয়া দেখি সোণার রৌদ্রে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। কাঁচের গবাক্ষপথে রৌদ্ররশ্মি ঘরে ঢুকিয়া মেজেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে। কামাখ্যা ও গৌহাটীতে মেঘের ঘন ঘটায় ভয় পাইয়াছিলাম, এখানকার সুন্দর রৌদ্রের আভাসে মনটা প্রফুল্ল হইল।

আমরা মুখ, হাত ধুইয়া, বারান্দায় বসিয়াই দুধওয়ালা ঠিক করিলাম। শিলং-এ দুধ, ঘি, মাখন ভেজালশূন্য, দামও সস্তা।

কাল কিছুই ভালরূপে অনুভব করিবার অবকাশ হয় নাই। সূর্য্য কিরণে অনুরঞ্জিত আজ এ প্রদেশ স্বপ্নময় মধুময় লাগিতেছে। দূরে বহু দূরে মেঘের মত পর্ব্বতশ্রেণী মণ্ডলাকারে সৌন্দর্য্যের রাণী শিলংকে বেষ্টন করিয়া

রাখিয়াছে। পত্রাচ্ছাদিত গিরিশিখর রবিরশ্মিপাতে ঝকমক করিতেছে।

আমাদের বাসার চারিদিকেই সম্পন্ন খাসিয়াদের বাড়ী। বাড়ীগুলি ইংরাজি ফ্যাসানে সজ্জিত। প্রত্যেক বাড়ীতেই লতানো গোলাপের ফটক। সামনে পুষ্পোদ্যান, নানা বর্ণের ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে। এখানে হাজার জাতীয় ফুল ফোটে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই ফুলের বাহার খোলে। সকল গৃহেই পিচ, কমলা লেবু ন্যাস্পাতির গাছ। এখন মুকুল হইতে ফলগুলি কেবল আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শরতে পাকিবার সময়। ফলফুলের প্রতি ইহাদের যেরূপ অনুরাগ, শাকসব্জির প্রতিও তেমনি। সব বাড়ীরই পশ্চাদ্ভাগে ছোট বড় সব্জির ক্ষেত। আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলি চীরতরুতে ছায়াময়।

আমাদের বাসার সম্মুখেই রাস্তার উপর জলের কল, দরিদ্র খাশিয়া বালক বালিকারা বৃহৎ পিত্তলের হাঁড়ি স্কন্ধে করিয়া জল লইতে আসিয়াছে। খাশিয়ারা খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ। কামাখ্যার ন্যায় এখানেও সুপুরুষ বড় চোখে পড়ে না। মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই গৌরবর্ণা। স্বাস্থ্যে লাবণ্যে বিকশিত ফুলের মতন। খাশিয়ারা অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী। পোষাক পরিচ্ছদ খৃষ্টানদের অনুকরণীয়, কিন্তু পা অনাবৃত। মেয়েরা গাউনের উপর মুগা অথবা জাপানি শিল্কের লম্বা উড়ানি স্কন্ধের নীচে বাঁধিয়া গাউন অর্দ্ধ আবরিত করিয়া রাখে। সকলেরই মস্তকে আচ্ছাদন। গহনার প্রতি ইহারা তেমন অনুরাগিণী নহে। সকলেরই লক্ষ্য পরিচ্ছদের উপরে।

আমরা বারান্দায় বসিয়া থাকিতে থাকিতেই নেড়া বাবু আসিলেন। খাশিয়া পল্লীর ভিতর বাঙ্গালী ভদ্র লোককে পাইয়া আমরা যেন মহারত্ন কুড়াইয়া পাইলাম। নেড়া বাবুদের বাড়ী 'লাইমোখাড়া' শহরের অপর প্রান্তে। প্রভাতেই অতদূর হইতে ইনি আমাদের সংবাদ লইতে আসিয়াছেন বলিয়া আমরা ভারী কৃতজ্ঞ হইলাম। ছেলেটির নম্র ব্যবহারে মিষ্ট কথাবার্ত্তায় বড়ই ভাল লাগিল।

চা খাইয়া নেড়া বাবুর সহিত বাজার দেখিতে বাহির হওয়া গেল, এখানে সপ্তাহে তিন দিন বাজার অর্থাৎ হাট বসিয়া থাকে। রবিবারের হাটকে ইহারা বড় বাজার বলে, বৃহস্পতিবারের হাটের নাম নয়া বাজার, শুক্রবার ছোট। তিন স্থানে তিন দিন হাট বসে। আজ রবিবার বড় বাজার। বাজার আমাদের বাসা হইতে অর্দ্ধ মাইল।

বাজারে গিয়া বিস্মিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে এত বড় বাজার দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। উপরে নীচে বহু স্থান ব্যাপিয়া বাজার বসিয়াছে। বাজারে দূর দূরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সর্ব্ব প্রকার তরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া ফলমূল, চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ি, মশ্লার গুড়া, মাছ, মাংস, শুট্‌কি মাছ, ভাত ব্যঞ্জন, পিঠা, চা, পশুপক্ষী এবং কাপড় জামা ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তই রাশি রাশি মজুত হইয়া রহিয়াছে। নানারূপ ধাতু পাত্র, সোণা রূপার গহনা অবধি বাদ যায় নাই।

বিক্রেতারা সকলেই রমণী, বসনেভূষণে, রূপে দোকান আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ক্রেতাদের ভিতরেও রমণীর সংখ্যাই বেশী। এ যেন বাদশার নওরোজের মেলা।

'রমণীরা বেচে, রমণীরা কেনে
লেগেছে রমণী রূপের হাট।'

ঘুরিয়া ফিরিয়া চেনা অচেনা ঢের জিনিস কিনিয়া অনেক বেলায় বাসায় ফিরিলাম। নেড়া বাবু বাজার হইতেই গৃহে ফিরিলেন।

অনেক জিনিসই কেনা হইয়াছিল, কাজেই রান্না খাওয়ার ব্যাপারটা খুব সোজা হইল না। গুরুতর আহারের পর সমস্ত দ্বিপ্রহরটা বিছানায় গড়াইয়া অপরাহ্নে বারান্দায় আইতেই এক খাশিয়া প্রতিবেশিনা আমাকে ডাকিলেন।

বাগানের পথটুকু পার হইয়া তাঁহার বাড়ী যাওয়া মাত্র তিনি সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বেতের মোড়ায় বসাইলেন। ইহারা খুব অতিথিপরায়ণ, বাড়ীতে অভ্যাগত গেলে 'পানগুয়া' দিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া থাকে। গাছপান ও কাঁচা সুপারী খাশিয়াদের অত্যন্ত প্রিয়। খয়ের কিংবা মশ্লা সংযোগে ইহারা পান খাইতে পারে না। কাঁচা সুপারী পান দিবা-রাত্রি খাশিয়া স্ত্রী-পুরুষদের মুখে লাগিয়াই থাকে।

প্রতিবেশিনী আমাকে বসাইয়া প্রথমেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে পানগুয়া দিয়া আমাকে সম্মান করিলেন। তাঁহার

সম্মান রক্ষার জন্য আমিও তখুনি বাধ্য হইয়া পান সুপারী মুখে দিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে কাঁচা সুপারীর ক্রিয়া করিলেও সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না।

আমার প্রতিবেশিনী তাহার নিজের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতে অভিজ্ঞ নহে, আমিও তদ্রূপ, তথাপি আলাপ পরিচয় মন্দ হইল না। মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশ, দেখিতে সুন্দরী, নাম এমেলি। স্বামী ইস্কুল ইন্‌স্পেক্টর, তাঁহাকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়। দুইটি ছেলে ও কোলের খুকীটিকে লইয়া এমেলির ঘরে থাকিতে ভাল লাগে না। ভৃত্য তাহার সমস্ত কাজ করে, রাত্রে কাকীমা আসিয়া কাছে থাকে।

এমেলির শ্বশুর-বাড়ী আমাদের বাসার সাম্‌নে। শাশুড়ী সেখানে থাকে না, শ্বশুর পুনরায় বিবাহ করিয়া পত্নী-গৃহেই বাস করিতেছে।

খাশিয়া মেয়েরা বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী যায় না। ছেলেরাই বিবাহের পর পিতামাতার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লয়। খাশিয়ারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে, মেয়েরাই উত্তরাধিকারিণী। কাজেই ইহাদের মেয়েদের ভারী আদরযত্ন। যাহারা দুই দিন পর পরের ঘরে 'পর' হইয়া যাইবে তাহাদেরি অনাদর অবহেলা।

খাশিয়ারা স্বাধীন, ইহাদের আইন আদালত বিভিন্ন। খাশিয়া নারীজাতি পূর্ণ স্বাধীনা, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নহে। ইহাদের শান্ত গাম্ভীর্য্যে শ্রদ্ধা হয়।

এমেলির সহিত ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া বাসায় ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় 'লাইমোখাড়ার' দিকে বেড়াইতে গেলাম। রাস্তায় খেলার মাঠে ছেলেদের ম্যাচ খেলা দেখা গেল।

২০শে বৈশাখ—দুইটি বাঙ্গালী পরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছে। একটি ডাক্তার, অপর শিলং-এর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার। কাছাকাছি দুইজনা স্বদেশী ভদ্রলোককে আবিষ্কার করিয়া উনি দিব্য আড্ডা গাড়িয়া তুলিয়াছেন। দুই পরিবারের ছেলেমেয়েদের সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই বাণীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমিও বঞ্চিত হই নাই, ডাক্তার বাবুর এবং ইঞ্জিনীয়ার বাবুর স্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনায় খাশিয়া পল্লীতে বাস করিবার খেদ মিটাইতেছি।

ইঞ্জিনীয়ার বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছোট সান্যাল বিজলি বাতির কারখানায় কাজ করেন। প্রভাতে তিনি আমাদিগকে কারখানা দেখাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন। দূর হইতে 'পাওয়ার হাউজের' ভীষণ উৎড়াই রাস্তা দেখিয়া সে পাতাল-পুরে নামিবার তেমন উৎসাহ ছিল না, আজ পাতালপুরের সাথী পাইয়া কিঞ্চিৎ সাহস হইল।

চা পানান্তে গায়ে গরম জামা শাল চাপাইয়া সকলে বাহির হইলাম।

উঁচু নীচু কয়েকটা বঙ্কিম পথ পাড়ি দিয়া কাঠের সেতু পার হইয়া পাতালপুরের পথে আসা গেল। প্রতি পদে পদে পথের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া মনের ভিতর আর উৎসাহের চিহ্নও রহিল না। খাড়াই পাহাড়ের গা দিয়া একটা বাঁকা রাস্তা নিম্নে, বহু নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। কারখানার টীনের বাড়ীটা চোখেই পড়ে না। দূরবীণ দিয়া দেখিলে কাগজের খেলার ঘর বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত বিডন ঝরণা সুউচ্চ গিরিশির হইতে গর্জ্জন সহকারে লাফাইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্ব দিন রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে ঝরণার স্রোত শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজলির কারখানার এক পার্শ্বে 'বিডন', অপর পার্শ্বে বিশপ্ত, বিশপ্তের জল-উচ্ছ্বাস তেমন প্রবল নহে, সহযোগীর দুর্ব্বলতায় বিডন যেন আনন্দে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। জলের কল্লোল-ধ্বনির সহিত পাতার মর্ম্মর মিশিয়া পথটিকে মধুর করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা ধীরে ধীরে নীচে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই পাতাল-গহ্বরে ছোট সান্যালকে দুইবার নামিতে এবং উঠিতে হয় ভাবিতেই বেচারীর প্রতি অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইল।

কিয়দ্দূরে গিয়া এক বৃদ্ধের সহিত একটি বালককে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল। বৃদ্ধ নাতীকে লইয়া বিজলির কারখানা দেখিতে নামিতেছিলেন। খানিকটা নামিয়াই নাতীর আতঙ্ক ও ক্রন্দনে বিব্রত হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইতেছে। বালকের পথশ্রমে মলিন মুখ দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। আমি সে হাসিতে যোগ দিতে

পারিলাম না। তখন হাসিবার মত আমার শরীরের অবস্থাও ছিল না। গা বাহিয়া ঘাম বহিতেছিল, বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতেছিল। গায়ের শালখানা পূর্ব্বেই হাতে লইয়াছিলাম। বালকের প্রতি আমার সহানুভূতি হইল। উহারা আস্তে আস্তে তেছিল, আমরা নামিতে-ছিলাম। রাস্তা —

> 'কভু বা পন্থ গহন জটিল,
> কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল,
> কভু সঙ্কট ছায়া শঙ্কিল
> বঙ্কিম দুরগম,—'

অবশেষে পথের শেষ হইল। এক বিরাট পাথরের আসনে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা কারখানায় ঢুকিলাম।

ইন্‌জিন চক্রবৎ ঘুরিতেছে, শব্দে কাণে তালা লাগে, ছোট সানাল কলকব্জা খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। বিদ্যুতের অপূর্ব্ব খেলায় শত রামধনুর বিবিধ বর্ণে চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

সান্যাল চা খাওয়াইতে চাহিলেন, চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম কারখানাতেই ছিল। আমরা চা'য়ের পরিবর্ত্তে এক এক পেয়ালা শীতল জল পান করিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরের দৃশ্য যেমন রমণীয় তেমনি মধুর। নির্ম্মল নীলাকাশ সূর্য্যের দীপ্ত কিরণে প্রভাম্বিত। চারিদিকের পাহাড় নিম্নভূমিকে যেন পরিবেষ্টন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। বিডনের বিপুল জলরাশি ওঁখারা নদীর সহিত মিশিয়া অজস্র প্রস্তরখণ্ডকে আঘাত করিয়া সবেগে বহিয়া যাইতেছে। নদীর জল এক হস্ত পরিমিত, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ কিন্তু ভয়ানক স্রোত। নদীর দুই তটে কত অজানা বৃক্ষে অচেনা ফুল ফুটিয়া আছে। পাহাড়ের গায়ে কারখানার কুলিরা আলু, কপি ও আদার চাষ করিয়াছে। অসংখ্য লবঙ্গ এলাচের গাছ, ফুল হইতে ফল হইয়াছে, কিন্তু এখনও পুষ্ট হয় নাই।

রহিয়া রহিয়া পাহাড়ী পাখী সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিতেছে। বাল্যকাল হইতে পাতাল সম্বন্ধে যে উপমা শুনিয়া আসিতেছিলাম—

> নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল
> নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি—

এ পাতাল তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারিল না।

দেখাশুনার পর যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিলাম। পাহাড়ে নামা যত সহজ উঠা তদপেক্ষা কঠিন। বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও চলিতে হইল। বেলা ১২টায় নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বাসায় আসিলাম। (ক্রমশঃ)

সন্ধানী

[শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর]

> সুধা পিয়ে শিব হয়নি অমর
> গরল ভরা যে কণ্ঠ তার ;
> শ্যাম-সোহাগিনী হয়েছে রাধিকা
> পান ক'রে বিষ বঞ্চনার।
>
> চির বিরহের ব্যথায় দহিয়া
> সরসী পেয়েছে চাঁদ বুকে ;
> সাধু শশাঙ্ক হ'লো সুধাকর
> নিয়ে কলঙ্ক দাগ মুখে।
>
> ক্রুশের কাঁটায় জীবন ত্যজিয়া
> খৃষ্ট অমর উচ্চশির
> মৃত্যুর মাঝে অমৃত কোথা যে
> জানা আছে তাহা সন্ধানীর।

সন্ধান

[শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

দেশভ্রমণের কাহিনী দিয়ে সে দিন আমাদের আড্ডা জমাবার কথা ছিল। নিশীথ রোজ রোজই ফাঁকি দেয় বলে' আজ তাকেই পাকড়াও করা গেল সব প্রথমে। সে অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' ভাবল, শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'লল—'শোন তা হ'লে।' তার গল্প চ'লল—

ভূটান সীমান্তে গিয়েছিলাম—শুধু খেয়ালের বশে। ই, বি, আর রেলের জয়ন্তী ষ্টেশন ওদিককারের শেষ ষ্টেশন। পাশেই জয়ন্তী নদী পাথরের নুড়ির রাশ ঠেলে চ'লেছে—কোথাও উদ্দাম স্রোতে, কোথাও ক্ষীণ ধারায়। সামনে মেঘের মত কালো পাহাড় নদীর দিকে অশ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দিনশেষের সূর্য্যাস্ত-উপভোগের স্থান ছিল আমার এই উপলবহুল পাহাড়ী নদীটির ধারে।

বর্ষার রাতের নিবিড় সমারোহ। আকাশটা যেন মাটির বুকে ঝুঁকে পড়েছে। আকুল মাটির টানে বিপুল জলের ধারা নেমে এল ঝর ঝর করে'। হিমালয়ের বুকের খবর নিয়ে দুরন্ত বাতাস এল কনকনে হয়ে'। এই দুর্য্যোগেও আমায় জন-বিরল ষ্টেশনে যেতে হ'ল এক আত্মীয়কে পথ চিনিয়ে আনতে।

আঁধার রাতের বুক চিরে মেল ট্রেণের সার্চ্চ-লাইট এসে প'ল—সুদূরের পথ নির্দ্দেশ করে'। ভাবলাম—একা আমি ছাড়া এ দুর্য্যোগে কেউ আসেনি। ভুল ভাঙ্গল—গাড়ী খুঁজতে গিয়ে। দেখলাম পাশাপাশি একটি বর্ষীয়সীও ম্লান মুখে সকল গাড়ীর মধ্যে উঁকি দিয়ে ফিরছেন। ম্লানকাতর মুখের উপর প্রত্যাশার ক্ষণিক দীপ্তি চকিতেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। অসীম ব্যাকুলতার কি উদ্বেগ তাঁর মুখে। ভাল করে' চেয়ে দেখলাম—হঠাৎ দেখলে বেশী বয়স বোধ হয় বটে কিন্তু ঠাউরে দেখলে বোঝা যায় বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী উপরে যায় নি—হয়ত' বা মধ্যেই আছে।

আত্মীয়টি এলেন না। বাসার পথ ধরে' ফিরছি। কৌতূহলী চোখ দু'টোকে আর একবার সেই মেয়েটির মুখের উপর না বুলিয়ে পারলাম না। ষ্টেশনের ক্ষীণ আলোকে মনে হ'ল—তাঁর মুখের উপর দিয়ে ধারা ব'য়ে চ'লেছে। বৃষ্টিতে ভিজছেন হয়ত'—ছাতা ত ছিল না।

একটি দশ এগারো বছরের ছেলে ছাতা হাতে করে' কোথা থেকে হঠাৎ এগিয়ে এল। একে আগে লক্ষ্য করিনি। সে ব'ললে—শীগগীর চলো দিদি, আমি আর পারিনে তোমায় নিয়ে।

তার মুখে বিরক্তির রেখা; দিদির মুখে ম্লান করুণ হাসি। ব'ললেন, 'এই যে ভাই হ'য়েছে।'

ভাইটি ব'ললে—'কিন্তু এ আর শেষ হবে কবে দিদি! এ কি পারা যায় রোজ রোজ। তুমি একাই এসো ছাই এখন থেকে।'

খানিক পরে কি ভেবে আবার ব'ললে—'না না। তাই বা কি করে' হবে ছাই। আমি না এলে, তুমি সেই কোন রাতে ফিরবে। আমার পড়া হবে না।'

দিদি উত্তর দিলেন না। খানিক পরে ব'ললেন—'চল্ তোকে পড়াই গিয়ে।'

তাঁরা যেতে সুরু ক'রলেন। আমার ঐ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা অদম্য হ'য়ে উঠল; ব'ললাম—'শুনছেন?'

তিনি চ'মকে উঠলেন, ব'ললেন—'আমায় ব'লছেন? —নতুন এসেছন বুঝি?'

ব্যথিত চোখের করুণ দৃষ্টি আমার উপর এসে প'ড়ল। যেন এ একান্ত অপ্রত্যাশিত, যেন তাঁর সম্বন্ধে জানতে কারুর কিছু বাকী থাকার কথা নয়। আমি কিছু উত্তর দিতে পারলাম না কারণ তিনি হঠাৎ নিজেকে অতি দ্রুত অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ঠেলে দিলেন—যেন আত্মগোপন করা একান্ত দরকার।

আমার আত্মীয়টি আমায় বড়ই অসুবিধায় ফেললেন। পরদিন গেলাম তিনি এলেন না, তার পরের দিনও না।

এ দুদিনই সে মেয়েটি এসেছিলেন—নিশ্চয়ই আমার মত আত্মীয়কে এগিয়ে নিতে। দু'দিনই তিনি গাড়ী দেখা শেষ করে' চলে গিয়েছিলেন—অতি হঠাৎ এবং অতি ত্রস্তে।

তার পর দিন টেলিগ্রাম পেয়ে দিনের ট্রেন দেখতে গেলাম—মেয়েটি আমার আগেই এসেছেন।

আত্মীয়টি এলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে বাসায় ফেরার পথে দেখলাম -সেই স্ত্রীলোকটি অতি ধীরে চ'লেছেন, শুষ্ক মুখে, কাঠফাটা রোদের মধ্য দিয়ে; যেন অসহ্য রোদটা অত্যুগ্র উপভোগের জিনিষ।

এ' দেশটায় বাঙ্গালী নেই ব'ললেই হয়—পাহাড়ীর দেশ। ষ্টেশন ষ্টাফের মধ্যে প্রায় সবাই বাঙ্গালী বটে কিন্তু তখনও ভাল করে' কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি।

বৈকালে আত্মীয়টিকে নিয়ে ষ্টেশনে বেড়াতে গেলাম। দেখলাম—তিনিও এসেছেন। নমস্কার করে' প্রশ্ন ক'রলাম —'আপনিও আমার মত ফেরে পড়েছেন দেখছি।'

ছোট্ট করে উত্তর এল—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আমার আত্মীয়টিকে দেখিয়ে ব'ললাম—'এর চেয়েও দেখছি তিনি অবিবেচক।'

তিনি যেন বিরক্ত হ'লেন; তাড়াতাড়ি ব'ললেন— 'বিবেচনা তাঁর কম নেই কারুর চেয়ে। সুবিধে করে' উঠ্‌তে পারছেন না নিশ্চয়।'

—'খবর একটা দেওয়া উচিত ছিল ত।'

একটু জোর দিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—'পেরে উঠ্‌ছে না নিশ্চয়ই। নইলে সে ত—'

কথাটা আর শেষ হ'ল না; চলে গেলেন।

ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। খাসা লোকটি। বিদেশে বাঙ্গালী ভায়ের বাড়ী। আড্ডা জমাতে দিন কতক ষ্টেশনে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু হ'ল। পাঁচ সাত দিন যেতেই খেয়াল হ'ল—মেয়েটি নিত্যকার সব ট্রেণগুলিই খোঁজ করেন। তাঁর ভাই রাতের ট্রেণ দু'টোর সময়ে সঙ্গে আসে। ঝড় বাদলে, আলোকে আঁধারে তাঁর কামাই দেখলাম না কোনও দিন কোনও ট্রেণে। আমি ত পরমাত্মীয়ের জন্যও এতটা সইতে রাজী নই। তাঁকে গিয়ে ব'ললাম—'হয় চিঠি নয় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন। রোজ রোজ এ রকম অনর্থক হয়রাণি।'

আমার সহানুভূতি তাঁকে যেন আঘাত ক'রল। রূঢ়কণ্ঠে ভদ্রতা বাঁচিয়ে ব'ললেন—'এ সোজা কথাটা আমার মাথায় আসেনি এতদিন—আশ্চর্য্য!'

তার পরেও ট্রেণ দেখার বিরাম নেই। 'কেন?' প্রশ্ন করলাম, উত্তর দিলেন—'গভর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগের ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। অনর্থক পয়সা নষ্ট।'

এর পরে হঠাৎ একদিন তাঁকে ষ্টেশনে দেখলাম না। পরের দিন দেখি—সেই ছেলেটি একলা, বরফ নিতে।

তাকে ডেকে কাছে বসালাম। জিজ্ঞাসা ক'রলাম— 'দিদি কই খোকা? আজ যে তিনি বড় এলেন না?'

—'আর আসবেন না তিনি। তাঁরই জন্য বরফ নিতে এসেছি।'

—'হঠাৎ?'

ছেলেটি উত্তর দেবার অবসর পেলোনা, বরফ নিতে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।

ষ্টেশন মাষ্টার এসে মনে করিয়ে দিলেন চা-বাগানের বড় বাবুর বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণ আছে।

বড় বাবুর বাড়ীতে গেলাম রাতে। বরের বয়স একটু বেশী; শুনলাম—খুব বিদ্বান; অনেক দেশ ঘুরে বিদ্যাচর্চ্চা আর স্বদেশ উদ্ধার ক'রতে গিয়ে বিয়ের ফুরসত পাননি এতদিন। এককালে নাকি তিনি গভর্ণমেণ্টের বড় শত্রু ছিলেন, আজ তাই গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরী নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

বিবাহ-সভায় সেই ছোট্ট ছেলেটিকে কিছুক্ষণের জন্য দেখলাম। সে এসে ব'ললে—'দিদির বড় অসুখ বড় বাবু, আসতে পারলেন না।'

জামাই আসর জ'মকে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর কথা কাণে আসতেই দাঁড়িয়ে প'ড়লাম। সঙ্গীকে লক্ষ্য করে' বলছেন—'এদেশে আসে মানুষ বিয়ে করতে? কলকাতায় সব ব্যবস্থা ক'রলেই হ'ত। মেয়েদের কি একটুও শ্লীলতা থাকতে নেই এখানে? হ'লই না হয় পাহাড়ীর দেশ।'

সঙ্গী প্রতিবাদ ক'রলেন—'এ তোমার অন্যায় কথা ভাই! কোথায় একটা মেয়ে কি একটু অসভ্যতা ক'রেছে, আর অমনি সকলকেই—'

—'একটু অসভ্যতা ?. কি বলো ? ধেড়ে মাগী আমার পায়ে পড়ে কেঁদে বলে কিনা—এলে তুমি দেবতা ? আমার প্রতীক্ষার ব্যথা ভগবানের বুকে বেজেছে তাহলে এতদিনে ?'

সঙ্গীটি হেসে উঠ্‌লেন, ব'ললেন—'যাই বল একটা রোম্যান্স হ'য়েছিল বটে—

'—ছিঃ ছিঃ ছিঃ আবার তিনি নাকি এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী— ।'

আহারের ডাক প'ড়ল, আর শোনা হ'ল না। খাওয়া দাওয়ার পর বাসায় ফেরার পথে ষ্টেশন মাষ্টার কথায় কথায় সেই মেয়েটির কথা তুললেন, ব'ললেন—'আহা! এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও একটা ব'লতে ভুলে গেছি তোমাদের। সেই মেয়েটির সম্পর্কে।—মেয়েটি চাকুরে বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে আজ প্রায় চোদ্দ পনের বছরের কথা। ফেরারী এক যুবকের সঙ্গে তার ভালবাসা হয় এই পাহাড়ী দেশে। সে যুবকটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এদেশে এসেছিল। তারা দু'জনে ব'সত গিয়ে ঐ জয়ন্তী নদীর বুকের পাথর.গুলোর উপরে; কথা আর তাদের ফুরাতনা।' শেষে একদিন পুলিশ তার সন্ধান পেল। বিয়ের সব স্থির। কিন্তু বিয়ের দিনের আগেই সেই ছেলেটিকে পুলিশের ভয়ে পালাতে হ'ল। মেয়েটি শুনেছি— এ বিষয়ে তাকে অনেক সাহায্য করেছিল। সেই ছেলেটা আজও ফেরেনি। ঐ মেয়েটাও আসে তাই রোজ রোজ ট্রেণ দেখতে তার আসার আসায়।'

শুনতে শুনতে মনটা উদাস হয়ে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার বলেই চললেন—'তার মা বাবা বদলী হয়ে চলে গেলেও সে এদেশ ত্যাগ ক'রল না। এখানকার মেয়ে স্কুলের মিষ্ট্রেস হ'য়ে র'য়ে গেল বাপ মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে'। ষ্টেশনে সেদিন বাপে মেয়েতে কি টানাটানি মশাই! সেও ত আজ প্রায় দশ বছর হ'তে গেল। মেয়েটি অল্প বয়সেই একেবারে বুড়ী হ'য়ে পড়েছে।'

'কিন্তু মেয়েটি ত আজ দুদিন ষ্টেশনে আসেনি।'

কে একজন ব'ললে—'আর কতকাল আসবে মশাই? আর আসবে না।'

ষ্টেশন মাষ্টার প্রতিবাদ ক'রলেন—'সে না এসে পারে না মশাই, আজ এত বছর ধরে' দেখে আসছি ত? অরে ধুঁকতে ধুঁকতেও সে ট্রেণ দেখতে এসেছে কতদিন। তবে এ অনুপস্থিত হওয়াটা আশ্চর্য্য বটে!'

তার পর দিন বর বরযাত্রী চলে গেল। আমি দু'দিন আর বর্ষা বলে' বার হইনি। তৃতীয় দিনে গিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি ছোট ছেলেটির হাত ধরে' আসছেন। ভাই বোনের ভাঙ্গা কথার এক টুকরো কাণে এল—"দিদি ভাই, এ ভারী অন্যায় সেদিন ব'ললে আর আসবে না, তাঁকে খুঁজে পেয়েছ। তার হাত ধরে' কাঁদাকাটি করে' কত কি ব'ললে! তবে আজ কেন আবার?'

দিদি যেন ঘুম থেকে জেগে বললেন—'রাগ করিসনে ভাই, ভুল কি মানুষের হয় না! যে কটা দিন বেঁচে আছি, আমায় নিত্যি আসতে হবেই।'

তিনি আকুল আগ্রহে ভাইটিকে বুকে চেপে ধ'রলেন। ভাই প্রতিবাদ করলে—'কিন্তু তোমার ত সামান্য বিষয়েও কখনও ভুল হয় না দিদি।'

দিদি জোর করে' ব'লতে পারলেন না তাঁর বাস্তবিকই ভুল হয়েছে। মুখে হাসি এনে চোখের জল মুছে ফেললেন।

নিশীথ গল্প শেষ করে' উপসংহারে ব'লল—'আমি চলে এসেছি আজ অনেকদিন হ'ল। তবুও আমার ধ্রুব বিশ্বাস, খোঁজার পালা তাঁর আজও শেষ হয়নি—জীবনে হবে কিনা সন্দেহ।'

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ওস্তাদজীর আলাপের যেখানে সমাপ্তি জয়ধ্বনির মধ্যে সেইখানে সে আরম্ভ করিল,—"রাসমণ্ডল করি নাচত কান"—একটা বিপুল আনন্দ যেন দেহ-মনে-প্রাণে ধরে না; ফাটিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হইতে চাহে, সে দুর্দ্দান্ত আনন্দ-উৎস যেন বিশ্ব-প্লাবনের জন্য অধৈর্য্য—প্রতি লীলা-ভঙ্গীতে, সে নর্ত্তন-বিলাসের প্রতি ছিন্ন অংশ হইতে যেন পুলক-দ্যুতি, বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় বিকীরিত—'রাসমণ্ডল করি নাচত কান' চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া গোপিনীরা নাচিতেছে, বৃক্ষশাখা আকুল আন্দোলনে নর্ত্তনশীল—'অথির ভ'য়ো যমুনা-বারি' ধেনু-বৎস নাচিতেছে, বাতাস নাচে কাঁপিতেছে, তারা-চন্দ্র নাচে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, কোটি কোটি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছুরিত কিরণের জাল নর্ত্তনের গতিতে রচিত—আকাশ ছাইয়া গিয়াছে—ধরণী নাচে দুলিতেছে—আকাশ আর থাকিতে পারিল না। তাহার পর নাচের নেশায় অবসাদ, ঘোর আচ্ছন্ন ক্লান্তি—কানু তোমার বংশীবাদন থামাও—আমরা আর নাচিতে পারি না, বিশ্বের প্রতি গ্রন্থি যে শিথিল। আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়, প্রতি বৃত্তি, প্রতি অনুভূতি যে অচৈতন্য, স্থানভ্রষ্ট, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া গেল; 'আর বাঁশী বাজায়োনা শ্যাম'; নৃত্যের আনন্দের অবসান কর, শক্তি ধ্বংসপ্রায়, আধার ক্ষুদ্র।—কানু বংশী সংবৃত করিয়াছে—প্রাণ-প্রকৃতি জীব-জড় সমগ্র বিশ্ব বিশ্রামপরায়ণ, মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিমূঢ়; নিশ্চিন্ত, নীরব নিশ্চল। হঠাৎ হাতের বাঁশী আপনা হইতে বাজিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে কোথায় চৈতন্যের রেশ জীবন্ত ছিল—তাহার সাড়া পাইয়া, সকলে সমস্বরে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল 'কই সে আনন্দ—আমরা মরিতে হয় মরিব, আনন্দ ছাড়া বাঁচিব না, বাজাও কানু তোমার মুরলী বাজাও—তোমার বাঁশীর সুরে পূর্ণ হইয়া নাচিতে নাচিতে, আনন্দের মধ্যে লয় হইয়া যাই, ধ্বংসকে বরণ করি—আসুক মরণ, সে মরণের পরেও অনন্ত কাল তোমার বাঁশীর সুর থাকিবে, আমরা না থাকিলে কি হয়—বাজাও বাজাও, নাচ নাচ—আবার সেই 'রাসমণ্ডল করি নাচত কান'—তাহার পর গীত থামিল, কিন্তু নৃত্য থামিল না। নীল ওড়না তারা-খচিত আকাশের মত নাচিতেছে; নীল ওড়নায় কক্ষ, চক্ষু, অন্তর পরিপূর্ণ—লঘু-চঞ্চল লীলা-চাপল্য নাই, মৃদুমন্দ গাম্ভীর্য্যের ধারায়, পূর্ণ জোয়ারে—প্রাণের নিভৃত কন্দর কাহারও শূন্য নাই।—

বাইজী বসিয়াছে—সেলিমা শশব্যস্তে ব্যজন করিতেছে। ওস্তাদজী নিকটে আসিয়া বসিলেন, ব্রজকিশোর হাতের আংটি খুলিয়া বাইজীকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন—নিকটে আসিলে বাইজীকে সেইখানে বসিতে বলিলেন, "এই-খানে বসে' দুটো গান শুনোতে হবে, জিরিয়ে নিন—এত' শুনেছি দেখেছি, এমনটি নয়—।" সুধীর বাবুর বাক্‌শক্তি কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে—। প্রশংসা স্বতঃ উৎসারিত; মৃদু গুঞ্জনে কক্ষ মুখরিত।

বাইজী কিছুক্ষণ পরে বাংলা গান ধরিল, "আর কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, অঞ্জলি অঞ্জলি খাব জল যমুনার"—ঝড়ের পর যেন মলয়, পার্থসারথি যেন আবার নন্দের দুলাল বেশে অন্তরের আঁচল ধরিয়া আব্দারে আকর্ষণ করিতেছে। গান শেষ হইল। বড় বড় তালপাখা দুলিতেছে—পান সরবতের পালা—বাইজী উঠিতে চাহিল—ব্রজকিশোরের প্রাণে যেন বালক জাগিয়াছে, তিনি জিদ্ করিলেন 'আর একটি'। ঈষৎ হাস্যে "হুকুম করিলেই হয়" বলিয়া বাইজী এবার গাহিল, "বঁধু কি আর কহিব আমি, জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি"—বাংলার ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণে অভিনব, মাধুর্য্য আরও গাঢ়—একটু চটুল, প্রজাপতির মত ক্ষিপ্র অনায়াস গতি—ওস্তাদজী বুঝিলেন পুনরায় অনুরোধের পথ বাইজী রাখিল না—। গীতান্তে তিনি বাইজীর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, 'ছপ্পনছুরী'—বাইজী কেবল যুক্তকরে তাঁহাকে নমস্কার জানাইল, সখীর নিমন্ত্রণে কৌতূহলের

বশবর্তী হইয়াই সে আসিয়াছে—পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌতুকেই তাহার পারিশ্রমিক।—

পরের দিন।

অক্ষয় একটু বিলম্বেই স্নান করিতে বাহির হইয়াছে। চন্দ্র পাঠকের দোকানে, নিত্যঅভ্যাসমত তৈল মর্দ্দন ও প্রভাতের সংবাদাদি আদানপ্রদানের জন্য দোকানের রোয়াকে গিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে, একখানি উল্টান কেরোসিন বাক্সের উপর উপবেশন করিতেই চন্দ্র পাঠক তাঁহার মনের মধ্যে গত রাত্রি হইতে যে কথাটা গুমরাইতেছিল তাহা ব্যক্ত করিলেন. জমিদার-বাড়ীর প্রতি উৎসব উপলক্ষে তাঁহার মনে প্রতিবারই অভিমান-ব্যথা জাগিয়া উঠিত, গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বত্র প্রাপ্য আসন এখানে তাঁহাকে দেওয়া হইত না, তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিবার একটা সযত্ন চেষ্টা অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ হইত—পূর্ব্বপুরুষের পুরাতন সংস্রব যেন এখনও বর্ত্তমান। অক্ষয় বিজ্ঞ সহানুভূতির স্বরে বলিল, "অতি দর্পে হত লঙ্কা, রাতের পর দিন আছে, চিন্তা কি ?"

চন্দ্র—"আর এদিকের খবর কি ? দারোগার সাড়াশব্দ নেই, রেজো বেটা গা ঢাকা দিয়েছে, ধীরেন বোধ হয় কাল গাড়ী নিয়ে ফিরবে। দারোগার মনের ভাব বোঝা ভাব।" —অক্ষয় বলিল, "আমি আছি—চাষামুখুদের ব্যাপার হ'লে ল্যাজে খেলত, সে সব সাহস করবে না— ওঃ ওই আসছে যে—বাঁচবে অনেকদিন।" দারোগা তদন্ত করিয়া থানায় ফিরিতেছিলেন, সাদর আহ্বানে উপরে উঠিয়া আসিলেন। পাঠক একটি বসিবার মোড়া বাহির করিয়া দিলেন।—ইন্দ্র সরকারের অনুপস্থিতিতে গত রাত্রে তাঁহার আদর আপ্যায়নের ত্রুটিজনিত আত্মাভিমানের ব্যথা দারোগাবাবুর হৃদয়াকাশে—ঈশানের ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের মত রক্ত আঁখি দেখাইতেছিল। তিনজনে নূতন করিয়া যুক্তি আরম্ভ হইল। শেষে সিদ্ধান্ত হইল, "ধীরেন আসিলে দু'পাঁচ দিনের মধ্যে ছেলে ও টাকা দুই চুরির অভিযোগ করাইতে হইবে—পাঠক মহাশয়কেও টাকার অস্তিত্ব ও বিবরণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হইবে—" পদোচিত গম্ভীর স্বরে দারোগাবাবু মন্তব্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।—তখন দুই বন্ধু দারোগার মন্তব্য লইয়া আলোচনায় রত হইল—উপরওয়ালার পরামর্শ ও সাহায্য ব্যতিরেকে প্রবলের আশ্রিত রাজুর কেশাগ্র বিচলিত করাও দুরূহ—সহরের উপরওয়ালার সহানুভূতি অর্থসাপেক্ষ। দারোগাবাবুর ইহা একটি বাঁধাগৎ —চন্দ্র পাঠক আশ্বাস দিয়াছেন, টাকাই টাকা টানে—বিনা খরচে লাভ হয় না, এ সকল তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল। দারোগাবাবুর মন, বাহ্যিক যতটা দেখাইলেন ততটা না হইলেও কতকটা স্থির হইয়াছিল—তবে ইন্দ্র সরকারের সহিত একবার সাক্ষাৎ আলোচনা পর্য্যন্ত কোন্ দিকে হেলিবেন সেটা সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে পারেন নাই —আর ইন্দ্র সরকারের লোকটিও সোজা নহেন—তাহা দারোগা বাবুর নীতিশাস্ত্রই পরিচয় দিতেছে।—

দোকানে ভিড় জমিল, গত নিশির আলোচনা সকলেরই মুখে মুখে। অক্ষয়ের মন্তব্য সকলকে মধ্যে মধ্যে বিস্মিত বিচলিত করিতেছে, এমন সময় জ্ঞানবাবু রাস্তার উপর হইতে অক্ষয়কে ডাকিতে সে উঠিয়া গেল। আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য জমিদার-গৃহিণী চারুবালা অক্ষয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন —বিশিষ্ট অতিথি কেহ আসিলে ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রত উপলক্ষে পিতাপুত্র কুটুম্ব সম্পর্কে জমিদার-বাটিতে নিমন্ত্রিত হইতেন। কিন্তু আজিকার এই নিমন্ত্রণের মধ্যে বিশেষত্ব আছে—এই অঘটন ঘটনের যে এইখানে পর্য্যবসান নহে তাহা উপলব্ধি করিয়া পিতাপুত্রের একটা দৃষ্টি বিনিময় হইল। অক্ষয়ের মনে পড়িল আট বৎসর পূর্ব্বের একটি দিনের কথা —সেই দিন, অন্দর মহলের অবারিত দ্বার—ললিতের সৎমার একটি কথায় তাহার সম্মুখে রুদ্ধ, প্রবেশ-নিষিদ্ধ হইয়াছিল—বন্ধুর প্রতি ললিতের ছল ছল চোখের সমবেদনার দৃষ্টি—অক্ষমতার ক্ষোভে সজল—মনে সবই পড়িল, পরক্ষণেই অক্ষয় চিত্তবিকার ঝাড়িয়া ফেলিল—সে ছেলেবেলার কথা, তারপর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ সেই ললিতের সৎমা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অন্তঃপুরে সুধীর বাবু, ললিত ও অক্ষয় আহার করিবে—বাকী অতিথিদের সঙ্গে নিয়মিত স্থলে।—আশা নানারূপে নানা চিত্রে অক্ষয়ের মধ্যে জাগিয়াছে, সে নিমন্ত্রণকে সাদরে নীরবে বরণ করিল।—শ্বশুরের সদ্যপ্রাপ্ত পত্রের নিমন্ত্রণে কলিকাতা যাত্রা ও তদীয় মুরব্বীদের সাহায্যে পুনরায় পাশের চেষ্টা এতক্ষণে সে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দচিত্তে মন হইতে প্রত্যাখান

করিতে পারিল।—এই নিমন্ত্রণ যে থালাবাটিতে সাজান' চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের অতিরিক্ত অন্য কিছুর তাহা যেন অক্ষয় স্থির অবধারিত করিয়া লইয়াছে।

জ্ঞান বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাত্রা করিবার পরে কিঞ্চিৎ বিলম্বে অক্ষয় বন্ধুর সহিত রহস্যালাপে কতকটা সময় কাটাইয়া জমিদারবাটি অভিমুখে চলিল। ব্রজকিশোর বৈঠকখানায় বসিয়া; অতিথি দুইজন ও কয়েকজন গ্রাম-বিজ্ঞ সকলে মিলিয়া জ্ঞান বাবুর অবিরাম বক্তৃতাস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে—জ্ঞান বাবুর অপূর্ব্ব গুম্ফরাজি ঘন ওষ্ঠান্দোলনে, সৈনিক দলের সঙ্গীন সহ কাওয়াজের অনুকরণ-রত। মুখ-মৃতের নিপীড়নে সকলের ঈষৎ জড়সড় ভাব; নৈরাশ্যব্যঞ্জক নানা ভঙ্গীতে তাঁহাদের সঙ্কুচিত অবস্থান, করুণ হাস্যরসের সমাবেশ। সদা-সপ্রতিভ জ্ঞান বাবু পুত্রকে দর্শনমাত্র আদেশ করিলেন, "যা, যা বাড়ীর ভেতরে, ছেলে ছোকরা তোদের আবার লজ্জা কি?" অক্ষয় অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেল

অন্দর মহলে সম্মুখের একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে, কয়েকটি জোড়া তক্তপোষের উপর ঢালা ও শুভ্র বিছানায় তাকিয়া অবলম্বনে সদ্যস্নাত সুধীর বাবু, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হরির মা'র হস্তস্থিত তালবৃন্ত-সেবা গ্রহণ করিতেছেন। তদীয় ভগ্নী চারুবালা দ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া, অক্ষয়কে অভ্যর্থনা করিলেন, "এসো বাবা এসো, লজ্জা কি, ঘরের ছেলে তুমি।" অক্ষয়ের লজ্জার আপদ বালাই একরকম নাই, তবে এই অপ্রত্যাশিত প্রীতির আতিশয্যে সে প্রথমটা সহজ হইতে পারিল না। কিন্তু ইহার অন্তরালে যে অর্থ তাহা অতি গূঢ়, এই স্থির বিশ্বাসে নিজেকে উৎসাহিত ও সহজ সংযত করিয়া লইল। যথারীতি প্রণামাদি সমাপনান্তে সে শয্যার এক পার্শ্বে বসিল,—"তব আজ্ঞা শিরে ধরি হেলায় লঙ্ঘিব গিরি" এই ভাব মুখে সাধ্যমত ব্যক্ত, আদেশের নীরব প্রতীক্ষা। সুধীর বাবু এমনটি আশা করেন নাই। ইতি-পূর্ব্বে ভগ্নীর সহিত পরামর্শে গড়িয়া পিটিয়া ইত্যাদি অর্থ-বোধক যে সব বাক্য তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার এই আকস্মিক অসারতা প্রতিপন্ন হওয়াতে তিনি উপস্থিত সম্ভাবণের খেই হারাইয়া ফেলিলেন।.. চিরাভ্যস্ত মোহন বাক্যচ্ছটার মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্যের ক্ষীণ ও সুপটু সমাবেশের প্রয়োজনাভাবে তাঁহাকে নীরব হইতে হইল। সুদক্ষ সোদরা ত্বরিতে সব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অক্ষয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আসল কথা কি জান বাছা, দাদা খোকার একটা সম্বন্ধ এনেছেন—কিন্তু সে যা ছেলে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়েই বসে' আছে—আর বাপও ছেলে ব'লতে অজ্ঞান, যা ধরবে তাই—শাসন টাশন কিছু নেই।—কেবল আমার উপর হিংসে, যেন তার মা মরে গেছে সেটা আমারই দোষ—যাক সে সব কথা, এখন তুমি হ'লে তার সমবয়সী বন্ধু—তুমি তার মনের কথাটা ঠিক বের করে আনতে পার্ব্বে, সেই বুঝে দাদা কথাটা পাড়বেন—না হলে শেষে একটা অনর্থক লজ্জা আর অপমান, বুঝলে?—আর যদি তাকে কোন মতে এই বিয়েতে রাজী কর্ত্তে পার তা'হলে বুঝতেই পারছো —আমরা সকলে তোমার ওপর খুব খুসী হব,—খাবার এখন দেরী আছে, ঠাঁই হলে ডেকে পাঠাব, দুজনেই এক সঙ্গে এসো—এখন সে দোতলায় তার ঘরে আছে—তুমি জানই তো কোন দিকে তার ঘর।" অক্ষয় এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই উঠিয়া বলিল, "আমি যাচ্ছি, তাকে রাজী করে আসব।"—অক্ষয় যাইবার সময় চারুবালার চক্ষের অকস্মাৎ দীপ্তি দেখিয়া গেল।—সুধীর বাবু ভগ্নীকে বলিলেন, "এ ছোঁড়া যে বড় বেশী চালাক।" তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া চারুবালা বলিলেন, "সে আমি বুঝব এখন, ও জেনে শুনেও আমাদের পক্ষে থাকবে—ললিতের ওপর ওর একটা রাগ আছে—আর তা ছাড়া আমি আজকেই ওকে একটা বড় টোপ্ দেব।" সুধীর বাবু বলিলেন, "ছোঁড়ার বউ আছে —তাকে মাকড়ী কি নাকছবি একটা কিছু—।" —"সে হবে, আমায় আর শেখাতে হবে না—।" সুধীর বাবু অন্য কথা পাড়িলেন, "তোমার ছোট দেওরের হাঁপানি অসুখ শুনছি, সে আর এমন কি যে ইন্দ্র সরকার ওখানে দেখতে গেল—আবার ফিরে এসে একটা উৎপাত না বাধায়; টাকা কড়ির কি সব তাগাদা কচ্ছে শুনতে পাই।" —"টাকা চাইতে পারে, তাদের বিষয় সম্পত্তি রয়েছে তারা বুঝে নেবে, হিসেব দেখে টাকা, এখানকার বাড়ীতে যা খরচ সব তো সরকারী; তাদের খৃষ্টান্ মিষ্টান্ আনাগোনা ঐ সদর পর্য্যন্ত, এখানে নয়।" সুধীর বাবু বলিলেন, "তা নয়, ভাবছি ওই তোর নামে যে জমিদারী কেনা হ'ল তাই নিয়ে

দাবী দাওয়া না করে—ইন্দ্র লোকটা বড় ঘুঘু।" চারুবালা উত্তর দিলেন, "সে আমার প্রাণ থাকতে হচ্ছে না; আমার নামে যা হয়েছে তা ছাড়ব না, আর দাদা, এ বাড়ীতে যাতে আমার দাবী থাকে সেরকম একটা করিয়ে দিতে হবে তোমায়—এদিকে সতীনপো আর ওদিকে দুই দেওরপো, এক বেটি মেম আবার জুটেছে, কি আছে অদৃষ্টে কে জানে?" সুধীর বাবু ভগ্নীকে পরামর্শ দিলেন, "তুই যদি আমার কথা শুনে চলিস তবে সব ঠিক করে দেব।"

চারু—"আমি কোনটে না শুনছি—তবে আমার জমান' টাকা থেকে আর ধার দিতে পারবো না—তুমি নিয়ে কেবল নষ্ট কর্ব্বে, যা দিয়েছি তা পাবো না জানি, চাইওনা ফেরৎ।"

সুধীর—"না, সে ব'ল্‌ছি না, তবে যখন যেটি বল্‌ব সব অক্ষরে অক্ষরে কর্ত্তে হবে—."

চারু—"এ বিয়েটা হ'লে তোমার খুব সুবিধে হবে, না?"

সুধীর—"খুব আমার নয় তবে তোদের, সে তখন বুঝবি।"

ব্রজকিশোর এই সময় আহারের কত বিলম্ব দেখিবার অছিলায় জ্ঞান বাবুর নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অন্দর-মহলে আসিয়া দর্শন দিলেন,—"কি গো, ভাইবোনে কি ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে?" সুধীর বাবু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। অক্ষয় আসিতেই তখন হরির মাকে বিদায় করা হইয়াছিল, পাখাটা তুলিয়া নিজেই জোরে বাতাস খাইতে লাগিলেন। চারুবালা স্বামীর কৌতুকের স্বর অনুকরণ করিয়া বলিলেন, "তোমার জমিদারী লুট করার ফন্দী হ'চ্ছে।" (পরে গম্ভীর ভাবে) "আমাদের অক্ষয় বেশ ছেলে—ঝরঝরে তকৃতকে—ওকে কাছারীতে লাগিয়ে দাও না—আঁটা বেকার বসে আছে। তোমার ইন্দ্র কেবল তাস দাবার নেশায় চুর হ'য়ে আছে, বয়সও হচ্ছে বেচারীর—পারবেই বা কেন; আর একজনকে সময় থাকতে শিখিয়ে নেওয়া ভাল—।" চারুবালা কলিকাতার মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে ভ্রাতার সম্মুখেই কথা কওয়ার অধিকার তাঁহার প্রাপ্য—সেদিনেও কলিকাতার যশ এমনি ছিল। স্ত্রীর চক্ষু অবগুণ্ঠনের আড়ালে পড়িয়াছে, কিন্তু চঞ্চল করের চুড়ীর চমক চক্ষুর কার্য্যের ভার লইয়াছে—স্বামী বুঝিলেন, একটা নূতন অবশ্য-পাল্য কর্ত্তব্য উপস্থিত, এতদিন নজরে পড়ে নাই সেই তাঁহার অপরাধ, তথাপি বলিলেন, "আজ হঠাৎ ওর উপর সদয়,—কারণ কি?"

চারু—"আগে কথা দাও ওকে কাল থেকে বাহাল কর্ব্বে—এখন কেবল কাজ শিখুক—মুখুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে কাজ দেখলেই দুদিনে তোমার ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে যাবে দেখো—তুমি কথা দিলে তবে কারণ ব'লব, ভাল কারণ আছে।"

ব্রজ—"আচ্ছা কথা দিচ্ছি—এখন বল?"

চারু—"এই তোমার খোকাবাবুর মন পেতে, সৎমা বলে' চিরকাল অশ্রদ্ধা করে; দেখি যদি ওর মামার বাড়ীর সম্পর্কের লোকের আদর যত্ন কর্লে ওর মনটা গলে।" গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ কি উচ্ছ্বসিত আক্ষেপ তাহা অনিশ্চিত রহিয়া গেল—ব্রজকিশোর নিরস্ত হইলেন। পোষ-মানান দেবতাটি অভীষ্ট বরদানে উপস্থিতির প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়া স্বস্থান, সদর-মহলে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অক্ষয় নিজের অদৃষ্টের আশু ঔজ্জ্বল্য যেন পূর্ব্ববৎ অনুভব করিয়াই মহাউৎসাহে ললিতের শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপনীত হইল। ললিতের শয়ন-কক্ষ ও পাঠ-গৃহ পাশাপাশি, মধ্যে দ্বার আছে—সদর-মহলে প্রবেশ-পথ ও দুই পাশের দুইটি ঘরের উপর একটি বড় ও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট এই দুইটি ঘর—ললিতের রাজ্য।—শয়ন-কক্ষে কয়েকটি অতিকায় আলমারী ও লুপ্ত কারুকার্য্যের নিদর্শন, বিচিত্র খোদাই-করা প্রাচীন ধরণের কাঠের সিন্দুক—দেয়ালে এলোমেলো বড় বড় ছবি, কতক অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী বণিকদের অয়েলপেন্টিং, কতক বিলাতী দৃশ্য, সজীব নির্জ্জীব উভয়ই—বদলী-হুকুমপ্রাপ্ত সাহেবদের আসবাব নীলামের সময়ে সংগৃহীত, রবিবর্ম্মারও কতক কতক ছবি,—প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার পর একটি বিশাল বিচিত্র ড্রেসিং-টেবিল ও দুটি বড় বড় ওয়াল-গ্লাস নয়নপথের পথিক হয়—কিন্তু দৃষ্টির স্থির মুগ্ধ লক্ষ্যের বিষয়, এই কক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু—একটি খাট—অনতিউচ্চ ভারী মোটা কাঠের তৈয়ারী, সর্ব্বাঙ্গে খোদিত নক্সার নামাবলী—শিয়রের দিকে দুইটি স্বপ্নরাজ্যের লতা, অবনত ভঙ্গীতে দুই কোণ হইতে উঠিয়া মধ্য পথে পরস্পরকে একাকার অবিচ্ছিন্ন

আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছে—পায়ের দিকে সারি সারি পাখী একটি সুগোল দণ্ডের উপর, উড্ডীন প্রড্ডীন মহোড্ডীন ইত্যাদি নানা ভঙ্গীতে ন্যস্ত—কিন্তু কুন্দন-কার্য্যের চূড়ান্ত শিল্প তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষে, যেন শয্যার উপর অতি মনোযোগের সহিত কি অন্বেষণ করিতেছে—ললিতের পিতামহ দুইখানি একই নক্সার পালঙ্ক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—অন্যটি ব্রজকিশোরের শয়ন-কক্ষ অলঙ্কৃত করিতেছে—এইটি নন্দকিশোরের ছিল।

গদীর স্থূলতা পালঙ্কের খর্ব্বতা-দোষ নিবারণ করিয়াছে—শয্যায় এককালে দশজন বিশ্রাম করিতে পারে, বালিশগুলিও দৈত্যের উপযুক্ত প্রকাণ্ড—ব্যবহারযোগ্য বালিশও কয়েকটি আছে। ললিত শয়নকক্ষের এক কোণে একটি পাটিতে শুইয়া বই পড়িতেছিল। সে দিন দারোগার কথা লইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর তাহার মনে একটা তরঙ্গ আসিয়াছিল—জীবনস্রোতপ্রবাহে পরিচালনা-প্রণালীর হালের প্রয়োজন সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, নিস্ফল আত্মনির্য্যাতন ও আবছায়া আদর্শ পরিহার করিয়া, অপরাধী স্বভাবের উপর আত্মার তীক্ষ্ণ শাসন-দৃষ্টি নিয়ত আবশ্যক, ইহা উপলব্ধি করিবার সহিত কৈশোরধর্ম্মী যৌবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া সে প্রকৃত ক্রিয়াশীল যৌবনের রাজ্যে উপস্থিত হইতে চাহে।—সকল অতীতের শিক্ষা জ্ঞান মন্থন করিয়া, উঠুক সুধা উঠুক গরল, বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বকে আকণ্ঠ পান করাইবার সঙ্কল্পই তাহাকে রাজুর গৃহে সেদিন সন্ধ্যায় লইয়া গিয়াছিল।—রাজুর নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যক্তিত্ব আর একবার আস্ফালন করিয়া উঠিল—সে থাকিলে আমি ঠিক কড়ায় গণ্ডায় তার দেনা শোধ করিতাম—নেই এখন আর উপায় কি। ব্যক্তিত্বের এখন চেষ্টা চলিয়াছে এই ক্রিয়াশীলতাকে মানসিক সত্তার মধ্যে আবদ্ধ রাখা।—বাহিরে আসিবার অনিচ্ছা, পূর্ণ হইবার আশঙ্কা—মানবের প্রকৃতি হইতে মানবের ইচ্ছার পার্থক্য, ইহাই মানব-স্বভাবের রহস্য—যে দিন ভয়, ঘৃণা, আলস্য, লজ্জাকে বর্জ্জন করিয়া ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ফুটিয়া উঠিবে সে দিন দ্বিধা, দুঃখ, অশান্তি সমস্তের অবসান। মানবের জীবনে তাহা বড় একটা আসে না, যাহা আসে তাহা সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত। ব্যক্তিত্ব জীবনে পূর্ণ লাঞ্ছিত হইলে ললিতের মত এমনই একটা প্রেরণা মহতের দিকে মানবকে সাময়িক ধাবিত করে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব আবার ক্ষিপ্রহস্তে নব নব জাল রচনা করিয়া দুর্ব্বলতাকে সমর্থন ও প্রশ্রয়ের পথ নির্ম্মাণ করে। আমাদের প্রত্যক্ষ সংসারজগতে যাহা কিছু বেদনা, আনন্দ, যতকিছু মহৎ, নীচ, সফল, হতাশ, বড় ছোট, বিদ্বান মূর্খ, সৎ অসৎ, সমস্ত এই ব্যক্তিত্বকে লইয়া—ইহার অন্তরালে যাহা আছে তাহার সহিত এই সংসারের সম্পর্ক কচিত এক শতাব্দীতে একবার দুইবার দৃষ্ট হয়। সংস্কার, সমাজ, মানবের জ্ঞান, এই সকলের বর্ম্মে ও অস্ত্রে নিজেকে প্রচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত করিয়া দেহ ও মনকে লইয়া ব্যক্তিত্ব খেলায়—নিজে খেলিতে চাহে না তাহার প্রধান কার্য্য বাহির ও অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা, এক একবার তাহাকে বাহিরে আসিতে হইলেও সে অবিলম্বে পুনরায় কোটরে প্রবেশ করে।

অক্ষয়ের আগমনে ললিত সুখী নহে। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "এখানে কি মনে করে'?" অক্ষয়ের সাময়িক বল আছে, সে হঠাৎ দমিল না, খাটের উপর বসিয়া বিজ্ঞজনোচিত স্বরে বলিল, "তোমাকে বিবাহে রাজী করাতে এসেছি—পিসীমার কাছে রাজী করাব বলে কথা দিয়ে এলাম—।" এই সম্পূর্ণ অভাবনীয় নূতন অক্ষয়কে দেখিয়া ললিত স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অন্তরের বহ্নি এত দিনের একঘেয়ে নিজেকে ছাড়া অন্য দাহ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া লেলিহান শিখায় ছুটিয়া আসিল—দুর্জ্জয় ক্রোধের আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল, "কি বেয়াদবী, আস্পর্দ্ধা—তুমি কে? তোমার পিসীমারইবা এত মাথাব্যথা কেন? বেরোও আমার ঘর থেকে—আমি বিয়ে করব না, আর বলতে এলে গলাধাক্কা খাবে ব'লছি—।" ললিত হাঁফাইতে লাগিল, অক্ষয় কিন্তু কেবল কণ্ঠে বিজ্ঞতা লইয়া আসে নাই, সে আকণ্ঠ বিজ্ঞতার আরকে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ললিতের আবেগে সে তিল মাত্র বিচলিত নহে; গুপ্ত শাণিত অস্ত্রের বলে সে নিশ্চিন্ত, ব্যবহারেও তাহার কুণ্ঠা নাই—এবার প্রয়োগ করিল,—বিচারকের অনুকরণীয় ভাবে সে বলিল, "খুদীর ব্যাপার সব জানি, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব, পিসে মশাইয়ের কাছে গ্রামে আর মুখ দেখাতে পারবে না, পাশ করা

বিদ্বানের মুখ থাকবে কোথায় ?”—অস্ত্র শাণিত বটে, ললিত আতঙ্কে শিহরিয়া মৌন ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। অক্ষয় নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, মুখে একটা অব্যক্ত ভাব, বোধ হয় কষ্টে-চাপিয়া-রাখা জয়-গৌরবের ক্রূর অথবা বিদ্রুপের চটুল হাসি। ললিত একবার অক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল—চক্ষে একটা কাতর মিনতির অর্দ্ধস্ফুট ভাষা; পরমুহূর্ত্তে সে ফিরিয়া আবার নীরবে পায়চারী করিতে লাগিল—তাহার দেহ কাঁপিতেছে, পা টলমল করিতেছে—চক্ষের সম্মুখে এক উত্তপ্ত অন্ধকার। অক্ষয় ঈষৎ অসহিষ্ণু, ভাবিতেছে ‘এইবার’—। ললিত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে—কিন্তু একি, তাহার মুখে কে যেন আত্মগোপন করিয়াছিল—আজ হঠাৎ প্রকাশ পাইল—সবিস্ময়ে অক্ষয় দেখিল,—এ যেন রাজু—অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার মাথার দপদপানিকে ছাপাইয়া তাহার কর্ণে নিনাদিত হইল, “—যাও, এখুনি বলে দাও সবাইকে, আমার নিজের সাহস নেই বলবার, তুমি সে উপকারটা করে দাও—যাও—” অক্ষয়ের মনে একটা ভয় আসিয়াছে—সে অনেকক্ষণ পরে একটু অনুযোগের স্বরে বলিল, “ভেবে দেখ তোমার কি অবস্থা হবে, আমি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না—বিবাহে রাজী না হ’লে আমি বলে’ দেব—তখন পস্তাবে।” নিজের পরিচিত কণ্ঠধ্বনি অক্ষয়ের মনে আবার সাহস সঞ্চার করিল —এমন কি শেষের দিকে আবার তাহার আশা পূর্ণ জাগ্রত হইতে বাকী থাকিল না, ভাবটাও অনেকটা আগের মত। একটা ঝোড়ো হাসি হাসিয়া ললিত বলিল, “না আমি বিয়ে করব না, পিসীমাকে জানিও আর খুদীর কথা নিশ্চয় নিশ্চয় করে সবাইকে বলে দিও।” অক্ষয় আবার কি যেন বলিবে, ললিত বাধা দিয়া বলিল, “বেরোও, দূর হও ঘর থেকে।” কশাঘাতে মলিন বদন, কুঞ্চিত পুচ্ছ-সার মেষের ন্যায় অক্ষয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দারুণ দ্বেষ অন্তরে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে—বিরাট জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে খুদীর কাহিনীর মুক্তকণ্ঠ প্রচারে গ্রামকে কম্পিত, স্তম্ভিত করা ভিন্ন অন্য কিছু উপায়ই সে দেখিতেছে না। সিঁড়ি দিয়া একটু সাবধানে নামিতে হইল—মনে খট্‌ করিয়া একটা চিন্তা আসিল—তারপর ধারাবাহিক স্রোত চলিল—লোকে যখন জিজ্ঞাসিবে—তুমি জানিলে কিরূপে, এতদিন গোপন রাখিয়াছিলে কেন ? আজ প্রকাশ করিতে আসিয়াছ কেন ?......তাহা ছাড়া অস্ত্র একবার প্রয়োগ করিলে আর হাতে ফিরিবার নহে, তূণে সঞ্চিত রাখা শ্রেয়স্কর —আর জমিদার-গৃহিণীর ন্যায় নেত্রীর অধীনে নষ্ট গৌরব উদ্ধারের সুযোগ বিরল হইবে না—আর এই একটি পরাজয়ে তিনিও আত্মহারা হইবার পাত্রী নহেন, সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় তিনি কেবল নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ের অন্বেষণ করিবেন, পুরাতন পরাজয় মনে রাখিবেন না।—এই চিন্তাধারা অক্ষয়কে প্রকৃতিস্থ করিল,—ক্রোধ, দ্বেষ অন্তরের মধ্যে থিতাইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ভ্রাতা ভগ্নীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে সে সহজ কণ্ঠে বলিল, “নাঃ তাকে রাজী করান যাবে না, অন্য কাজ থাকে আমায় বলে’ দেখুন আমি প্রাণ-পণে হাঁসিল করে’ আসবো—একাজ হোল না, হবেও না।” সুধীর বাবু মুখ বিকৃত করিলেন, চারুবালা সস্মিত বদনেই মন্তব্য করিলেন, “আচ্ছা তা আর কি হয়েছে—আবার কাজ পড়লে তোমায় বলব বই কি বাবা।” তাহার পর অক্ষয়কে তাহার নব কর্ত্তব্যের সংবাদ দানে পরিতুষ্ট করিয়া, ইন্দ্র সরকারের স্থানে তাহাকে অভিষিক্ত করাই যে তাঁহার বাসনা, ইহা জানাইয়া—তিনি “খাবারের জোগাড় দেখিগে, বেলা হ’ল—খোকা বাবুর খাবার—বোধ হয় শুনব হুকুম আছে দোতলায় তাঁর ঘরে দিয়ে আসবার—যাই সব ব্যবস্থা করে আসি—এই ঘরেই দুটো ঠাঁই করে দিক্‌” বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

বিচিত্র

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়]

তোমারে বেসেছি কতরূপে ভাল কত যুগে কতবার
ওগো বিচিত্র অন্তরতম সীমাহীন পারাবার!
কভু প্রশান্ত কভু চঞ্চল তুলি তরঙ্গরব,
কভু উদ্দাম প্রলয়নৃত্যে প্রমত্ত ভৈরব!
কখনও আঁধার কুহেলীতে ঢাকা, কখনও জ্যোৎস্নাময়
ওগো অতৃপ্ত অযুত নদীর অনন্ত-আশ্রয়!

জীবনে জীবনে আসিয়াছ তুমি কতবার কতরূপে,
কভু গৌরবে উৎসবে, কভু চোরের মতন চুপে!
সে দিন তখন তপোবন-শিরে প্রথম-প্রভাত-আলো
পড়েছে ছড়ায়ে; উটজের দ্বারে মৃগশিশুগুলি কাল'—
অবশ আলসে করে রোমন্থ কাটেনি ঘুমের ঘোর;
তখন নীবার-অরণ্য-শিরে দুলিছে শিশিরলোর!
তুমি দেখা দিলে তরুণ তাপস তপোবন-নদীতটে,
আশ্রম-তরু-পিপাসা মিটাতে যেথা মৃণ্ময়ঘটে—
ঊষার মতন রক্তবসনা দাঁড়ায়ে ঋষির মেয়ে!
—তারপর যদি হৃদয়ে তাহার তোমার ও মুখ চেয়ে
ফুটে উঠে থাকে লাজ-রক্তিম তাপস-বিরোধী ভাব,
যদি হ'য়ে থাকে শকুন্তলার আবার আবির্ভাব,
যদি চম্পক-অরণ্যে পশে ভ্রমর মনের ভুলে,
হে মায়াবী, তব মায়ার স্পর্শ কে না লবে বুকে তুলে!

আসে গৌরবে রাজ-ঈশ্বর উৎসব-পুরী-পথে,
তুলি চঞ্চল মকর-কেতন সজ্জিত শোভা-রথে।
উৎসুক লাজ-কম্পিত করে খুলে বাতায়ন-দ্বার
পুরস্ত্রীদের নয়নকমল উঁকি দেয় বার বার।
ভাঙি হাসি গান রূপ-জীবিনীরা ছাড়িয়া নাট্যশালা
দাঁড়ায় দুয়ারে—ভ্রষ্ট নূপুর, স্খলিত কাঞ্চীমালা।
লাজে লুকাইয়া আপনার মাঝে দাঁড়াইয়া ভিখারিণী
হয়ত তাহার মনে হ'য়েছিল তোমারে চিনি বা চিনি।
লক্ষ লোকের মাঝখান হতে কেমনে, হে নরনাথ,
তুমি চিনে তারে তুলে নিলে রথে ধরি দুটি হাতে হাত?
তা'র ফলে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে উৎসব-আয়োজন;
বন্ধ করিয়া পুরাঙ্গনারা যদি গৃহ-বাতায়ন
চলে' গিয়ে থাকে; পণ্য-নারীর যদি রতি-পরিমল
রজনীতে আর নাহি করে থাকে উপবন চঞ্চল;

সে দিন আঁধার নীরব আকাশে শুধু যদি দুটি তারা
এ উহার মুখ চেয়ে হ'য়ে থাকে ভয়ে বিস্ময়ে সারা;
যদি কোন দিন হ'য়ে থাকে সখা এমনই অঘটন
ঘটেছে যখন ঘটনা বলিয়া মানিবে রসিক জন!

হাজার বরষ দৈত্য-পুরীতে ঘুমায় রাজার মেয়ে,
শিয়রে জীবন মরণের কাঠি, আছে মহাক্ষণ চেয়ে!
হাতীশালে হাতী ঘুমায়ে পড়েছে, ঘোড়াশালে শুয়ে ঘোড়া;
ঘুমায় সৈন্য শান্ত্রী সেপাই রাজ-অঙ্গন যোড়া;
জড়ের মাঝারে জাগিছে চেতন সবাই গণিছে দিন,
কবে ভেঙে যাবে কারাপিঞ্জর, বন্ধন হবে ক্ষীণ।
কে দলিবে বন মরুকান্তার লঙ্ঘিবে পর্ব্বত
সাত-সমুদ্র-তের-নদী পারে চড়ি যৌবন-রথ!
—এমন সময় যদি কোন দিন আসে সে রাজকুমার
উড়ন্ত ঘোড়া চড়িয়া, কটিতে বাঁধি অসি খরধার!
গতি-বেগে তার দ্বিধা হ'য়ে যায় সাত সাগরের জল,
পর্ব্বত ভয়ে মাথা করে নীচু, নদী করে টলমল।
তারপর যদি রাজার মেয়ের ভেঙে যায় ঘুমঘোর,
যদি সে বাঁধিতে অতিথির গলে চাহে দুটি বাহুডোর,
তাহ'লে সে আর এমনত' খুব বেশী কথা কিছু নয়,
এমনি ধারা ত নিতি নিতি ঘটে ইথে কোথা বিস্ময়!

আর একদিন গাঢ় রজনীতে ভাঙিয়া তোরণদ্বার
আসে দিক্‌জয়ী পুরীর বক্ষে জাগাইয়া হাহাকার!
এক হাতে তার মশালের আলো আর হাতে তলোয়ার,
অগ্নি-দহন হত্যা-প্লাবন লুণ্ঠন-চীৎকার—
চিরসাথী করি; ছিন্ন করিয়া মার কোল হতে ছেলে
আছাড়িয়া মারে; মস্‌জিদ-শিরে দাঁড়াইয়া খুন খেলে;
"টাকা চাই!" বলে' উপাড়িয়া ফেলে বাদশার দুটি চোক;
হাজার নারীরে পতিহীনা করে, বহায় পুত্র-শোক;
লাখে লাখে ধরি ভেড়ার মতন ল'য়ে যায় নরনারী;
রেখে যায় শুধু শবদেহ আর দস্যুতা মহামারী।
যদি তারি লাগি বিধবা-পুরীতে কেহ হয় চঞ্চল,
এক চোখে চায় পথপানে মুছি আর চোখে আঁখিজল,
সেই দুর্ব্বার নিষ্ঠুরতার রথ-চক্রের তলে
যদি মরি কেহ সুখ পেয়ে থাকে, কি হবে মন্দ বলে'!
তোমারি মায়ায় স্পর্শ মায়াবী! নিখিলের অন্তরে,
শ্রেয় যে কি তাহা বুঝে নাক কেউ প্রিয় যাহা তাই করে!

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১২

সেই রাত্রি নমিতার আর কাটিতে চাহে না। একে একে বাড়ির সমস্ত বাতি নিভিয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুম না আসিলে সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু আজ যে স্পন্দমান চঞ্চল হৃদয়কে ঘুম পাড়াইয়া সে উদাসীন হইয়া সীমাশূন্যতার ধ্যান করিবে তাহা অসম্ভব। প্রথমেই মনে পড়িল রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু দিয়া কিছুতেই সে আজ অজয়ের নাগাল পাইবে না। এই উপলব্ধি করিতেই নমিতা বারান্দায় দ্রুতপদে পাইচারি সুরু করিয়া দিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়িতে যে ছাত্রটি রাত জাগিয়া নীরবে পড়া করে তাহারো টেবিলের মোমবাতিটা নিভিল। সেই ঘনায়মান চতুঃপার্শ্বের নীরবতার মধ্যে নমিতা কি করিবে কিছুরই কূল খুঁজিয়া পাইল না। খালি নিজের ডান হাতখানি বারম্বার কপালের উপর রাখিয়া সে অজয়ের জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিতেছে।

নমিতা খোলা চুলগুলি আঁট করিয়া খোঁপা বাঁধিল; পরণের কাপড়ের প্রান্তটাকে পায়ের দিকে আরো একটু প্রসারিত ও বুকের উপর আরো একটু রাশীকৃত করিয়া লইল। চাবির গোছাটা আঁচলের প্রান্ত হইতে খুলিয়া বালিশের তলায় রাখিল ও উত্তুরে হাওয়া জোরে বহিতেছে বলিয়া মার পায়ের দিকের জানালাটাও বন্ধ করিতে ভুলিল না। অন্ধকারে পথ ঠাহর করিতে নমিতার বেগ পাইতে হয় না,—অতিনিঃশব্দপদে সে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা নামাইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ যে অনেকক্ষণই বিবর্ণ বেদনায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা সে জানিত; এখন সহসা সামনের ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে হঠাৎ চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন লাবণ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সিঁড়িতে একবার পা রাখিলে হয় ত' মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতেই নীচে নামিয়া আসিতে হয়। নমিতা শুধু নীচে নামিয়া আসিল না, একেবারে অজয়ের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া অবতীর্ণ হইল।

এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। তর্ক করিতে চাও, নমিতা তাহাতে কান পাতিবে না। তাহার পক্ষ হইতেও নীতি কথা বলা যায় না। রুগ্ন পরনির্ভরকামীকে সেবা করা অধর্ম্ম নয়। কিন্তু এত লোক থাকিতে তাহারই বা এমন কোন্ গরজ পড়িল? বচসা করিবার সময় নমিতার আর নাই, কাকিমার মেয়েটার চেঁচাইয়া উঠিবার সময় হইয়াছে। দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিবার আগে নমিতা শুধু এইটুকু বলিয়া যাইবে যে—

এক ঠেলা মারিয়া নমিতা বন্ধ দরজা খুলিয়া ফেলিল। যাহা দেখিল তাহাতে প্রথমে সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে যে কেন অকারণে দেরি করিতেছিল তাহার জন্য সে শতরসনায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। দেখিল সেই শতছিন্ন তোষকটার উপর উবু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজয় গোঙাইতেছে; কবে কি-সব ছাই-ভস্ম গলাধঃকরণ করিয়াছিল তাহাই বমি করিয়া মেঝেটাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। বমির বেগ এখনো প্রশমিত হয় নাই, অন্ধকারেও অজয়ের রোগবিকৃত বীভৎস মুখের ছায়া চোখে পড়িল। নমিতা তাড়াতাড়ি অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ভরিয়া একেবারে তাহার কোলের উপর তুলিয়া পাঞ্জাবির তলায় পিঠের উপর অল্প একটুখানি হাত রাখিয়া দেখিল জ্বরে অজয় দগ্ধ হইতেছে। কপালের সমুখের যে চুলগুলি লুটাইয়া পড়িতেছে তাহা মাথার উপর ধীরে তুলিয়া দিয়া নিজের আঁচল দিয়া অজয়ের শুক্‌নো ঠোঁট দুইটা মুছিয়া দিল। মুহূর্ত্তে যে কি হইয়া গেল জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অজয় আনুপূর্ব্বিক কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় শুভ্রবাসা একটি মেয়েকে তাহার

পার্শ্বচারিণীরূপে ভালো করিয়া তখনো চিনিতে না পারিলেও আজ রাত্রেই যে তাহার আসিবার কথা ও এমন করিয়া যে তাহার এই পীড়িত দেহটাকে বুকে টানিয়া নিবার একটা অলৌকিক চুক্তি ছিল তাহা সে নিমেষে ঠিক করিয়া ফেলিল, জড়িতস্বরে কহিল,—"শিগ্‌গির আমাকে একটু জল এনে দাও, আমার গলা-জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল যে।"

নমিতা অজয়ের মাথাটা ধীরে ধীরে নামাইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেয়ালের প্রতিটি ইঁট ও মেঝের প্রতিটি ধূলিকণা যে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে সে বিষয়ে তাহার খেয়াল রহিল না। রান্নাঘরের দরজার শিকল নামাইয়া সে গ্লাসে করিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইল ও বাঁ হাতে এক বাল্‌তি জল লইয়া আবার ঘরে ঢুকিল। বাল্‌তিটা দুয়ারের কাছে নামাইয়া তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা অজয়ের কাছে আনিয়া ধরিল। কহিল,—"আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠুন্, জলটা খেয়ে নিন্।"

এইবার নমিতাকে অজয় ভালো করিয়া চিনিয়াছে। পিপাসা তাহার সত্যই পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবু পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়া নমিতার অকুণ্ঠিত বাম বাহুটি অবলম্বন করিয়া সে উঠিল। ঢক্ ঢক্ করিয়া সমস্তটা জল খাইয়া ফেলিয়া সে ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। নিজেই নমিতার আঁচলের প্রান্তটা টানিয়া লইয়া মুখ মুছিল। বলিল,—"আজ সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল একসঙ্গে করে'ও তোমাকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ত না। আমার প্রয়োজনের দাবী এত প্রচুর ছিল যে কোনো প্রাচীরই আর তোমাকে বন্দী রাখ্‌তে পার্‌ল না, নমিতা। কিন্তু আমার প্রয়োজন যে কি অসামান্য, তা তুমি জান?" বলিয়া অজয় নমিতার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিবার স্বল্প চেষ্টা করিয়া বলিল,—"ছাড়ুন, ঘরটা পরিষ্কার করে' ফেলি। দেশলাই নেই? আলো জ্বালাতে হ'বে।"

—"না না, আলো জ্বালিয়ে কাজ নেই, নমিতা। আলোতে তোমাকে সম্পূর্ণ করে' দেখা হবে না। তোমাকে কি এই বেশ মানায়? আমি মনে মনে তোমার যে মূর্ত্তি এঁকেছি আলো জেলে তাকে কলঙ্কিত কোরো না।" বার কয়েক ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল,—"তোমার পরনে রক্ত চেলি, চোখে ক্ষুধা, হাতে কৃপাণ—চুলগুলি পিঠের উপর আলুলিত হ'য়ে পড়েছে—কৃষ্ণ সুনিবিড় চুল! বজ্রে তোমার কঙ্কণ, বিদ্যুৎ তোমার কণ্ঠহার! তুমি আমার সঙ্গে যাবে নমিতা?"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"উত্তেজিত হবেন না। চুপ ক'রে ঘুমুবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় জলপটি দিচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া বালতির জলে ন্যাক্‌ড়ার অভাবে নিজের আঁচলটাই ভিজাইয়া লইল কপালের উপর তাহাই স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া পাখার অভাবে সামনের দেওয়াল হইতে একটা ক্যালেণ্ডার পাড়িয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। কহিল,-"দেশলাই থাক্‌লে আলোটা জ্বালাতুম।"

অজয় কহিল,—"আলো জ্বালালেই তোমার আজকের রাতের এই কীর্ত্তিটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে না। তোমার কাকিমার কাছ থেকে দেশ্‌লাই চেয়ে আনতে পার্‌বে?" বলিয়া অজয় সেই জ্বরের মধ্যেই ভূতের মত হাসিয়া উঠিল। নমিতার পা-দুইটি তক্তপোষের উপর যেখানে গুটাইয়া রহিয়াছে তাহার অদূর ব্যবধানে নিজের একটা শিথিল হাত রাখিয়া আস্তে একটা আঙুল বাড়াইয়া দিয়া নমিতার পা এমন আলগোছে একটু ছুঁইল যে তাহা টের পাইবার সাধ্য নাই। কহিল,—"উত্তেজিত আমি হইনি, নমিতা। যেটুকু চাঞ্চল্য আজ তুমি আমার দেখছ সেটা আমার জ্বরের বিকার নয়। ওটা আমার স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। আমার কথার উত্তর দেবে নমিতা?"

নমিতাও কপালের গণ্ডী ছাড়াইয়া হাতখানি অজয়ের গালের উপর ভুলক্রমে আনিয়া ফেলিয়াছে। অস্ফুটস্বরে কহিল,—"কি?"

দৃঢ় স্পষ্ট অনুত্তেজিত কণ্ঠে অজিত কহিল,—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

নমিতার স্বর ভীত, বিমূঢ়: "কোথায়?"

আবার সেই শীতল স্পষ্ট স্বর: "মরতে। মরতে তোমার ভয় হয়, নমিতা?"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল : "কি বলছেন আপনি যা-তা ? বল্‌ছি ঘুমুন্, তা না খালি বক্ বক্ করছেন !"

অজয় শান্ত, উদাস স্বরে বলিল,—"তুমিও যে মরতে ভয় পাও না তা আমার ঘরে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবেই আমি বুঝেছি। তা হ'লে চল আজকের এই রাত্রি শেষ না হ'তেই একটা গাড়ি ডেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমার খুব বেশি ভার হ'ব না, দেখবে। কাল ভোরেই আবার আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ব। শুয়ে শুয়ে এই সব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায় ?"

নমিতা আরো জোরে ক্যালেণ্ডারটা চালাইতে লাগিল, অজয়ের গায়ের উপর চাদরটা আরো ঘন করিয়া টানিয়া দিল ; বলিল,—"আপনি এমনি বক বক করলে আমি চ'লে যাব ঘর ছেড়ে।"

অজয় কহিল,—"সত্যিই গায়ে চাদর টেনে পাখার হাওয়া খেয়ে জ্বরের ঘোরে এ-পাশ ও-পাশ করবার বিলাসিতা আমার নয়, নমিতা। আমি মরবার পণ করে' পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। রোগে ছাঁতা ধরে দেহ জীর্ণ হোক, তবু রোগের হাতে জীবন সমর্পণ ক'রে মৃত্যুকে কলঙ্কিত করব না। তুমি যে-জীবন বহন করছ তা ত' একটা কলঙ্কিত মৃত্যু, অসতীত্বের চেয়েও লজ্জাকর। সত্যি করে' মরে' গৌরবান্বিত হ'তে তোমার ইচ্ছা করে না, নমিতা ?" কি ভাবিয়া লইবার জন্য অজয় একটু থামিল, পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গা হইতে চাদর সরাইয়া ফেলিল। নমিতার স্তম্ভিত ভাবটা কাটিবার আগেই তক্তপোষের প্রান্তে সরিয়া আসিয়া জুতার জন্য সেই নোংরা মেঝের উপর পা বাড়াইয়া দিল ; কহিল, "তুমি এমনি চুপ করে' এখানে বসে' থাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে—এই আনন্দে আমি রাস্তায় বেরিয়ে যে করে' হোক্ একটা গাড়ি ধ'রে আনতে পারবই ঠিক।"

অজয়ের আর জুতা পরিবার সময় হইল না। নমিতা ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পা দুইটা সহসা অবশ হইয়া আসিল বুঝি। দীপ্ত কণ্ঠে কহিল,—"আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি ? কোথায় যাব আপনার সঙ্গে ?"

অজয় আবার সেই নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে কহিল,—"পাগল আমরা সত্যিই। হঠকারিতাকে আর বাধাই-নিন্দে করুক আমরা করিনে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে গেলে সময়ই ফুরোয়, কাজ আর এগোয় না। তুমি কি সত্যিই এই অন্ধকূপের অন্তরালে স্বল্পপরিমিত জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারবে ? নিশান্তে দু'টি ভাত খেয়ে ও দিনান্তে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েই কি তুমি জীবনকে এমন অনায়াসে ক্ষয় করে' ফেলবে ? তোমার জীবনের ওপর তোমার একার দাবিত্ব নেই, আমাদেরো লোভ আছে। তুমি একা, সংসারে কারো কাছে তোমার এতটুকু ধার নেই—তোমার কত সুবিধে। তুমি একবার হ্যাঁ বল, দেখবে আমার সমস্ত জ্বর নেমে গেছে। নোংরা মেঝে সাফ অক্তে করে ক্ষতি হবে না, অনেক বড়ো ও অনেক দুঃখময় কলঙ্ক তোমার নির্ম্মল হাতের স্পর্শে শুচিস্নিগ্ধ হ'বার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজকের ভারতবর্ষে জীবন-ধারণই কলঙ্ক, নমিতা,—তুমি এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া অসহায় শিশুর মত অজয় নমিতার দুই হাত ব্যাকুলভাবে চাপিয়া ধরিল।

নমিতা কি ভাবিল কে জানে, সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া কর্কশ স্বরে কহিল,—"আপনি আমাকে কী ভাবেন ? আপনার অসুখ দেখে আমি ভালো ভেবে আপনার সেবা করতে এলুম আর আপনি তার এই প্রতিদান দিচ্ছেন ? ছি! আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি।" বলিয়া নমিতা আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া অজয় প্রথমে একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল, তাহার শরীরে কণামাত্রও আর শক্তি রহিল না। সে যেন একটা পর্ব্বতচূড়া আরোহণ করিতে গিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় আসিয়া ডুবিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া যেন ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর প্রান্ত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার ভয় হইতে সে আত্মরক্ষা করিল। দুই হাত দিয়া মাথার লম্বা চুলগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে কান্না রোধ করিল হয় ত'—সে কি না ক্ষীণজীবিণী কোমলকায়া বাঙালি মেয়ের মাঝে আকাশের বিদ্যুদ্বতী বাত্যার দেখিতে চাহিয়াছিল। চাপা স্বরে গোঙাইয়া গোঙাইয়া কহিল,—"আমার সত্যিই ভুল হয়েছে, নমিতা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপই বকছিলুম হয় ত'। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাতি জ্বাল্‌তে পার,—হাত বাড়ালেই তাকের ওপর দেশলাই পাবে। অন্ধকারে আর তোমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই"।

বাতি না জ্বালাইয়াই নমিতাকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া অজয় কহিয়া উঠিল: "একটা কথা স্পষ্ট করে' জেনে যাও। তোমার দেহের উপর আমার লোভ ছিল এ-কথা ঘুণাক্ষরে মনে কোরো না—লোভ ছিল তোমার এই জীবনের ওপর। আমরা যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি তাতে তোমার জীবনকে আহুতিরূপে কামনা করেছিলুম মাত্র। তেমন মরা মর্‌তে পার্‌লে মানুষ হ'তে পার্‌তে, নমিতা।"

এতটা পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাওয়াটা শোভন হইত না, তা ছাড়া দুইটা দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের বাহিরে অন্ধকারে কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার আর নিশ্বাস পড়িল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল কাকিমা—কোলে খুকি। নমিতা ভাবিয়াছিল আজ হয় ত' খুকি স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু কাকিমার নীচে আসিবার আগে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কত যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়া গেছে তাহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার এই আচরণে যেন কিছুই অস্বাভাবিকতা নাই কণ্ঠস্বর তেমনি সহজ করিয়া নমিতা কহিল,—"অজয় বাবুর জ্বর খুব বেড়ে গেছে, কাকিমা। ডাক্তার ডেকে পাঠানো উচিত।"

এই সব কথার চালাকি করিয়া কাকিমাকে ঠকানো যাইবে না। তিনি ভেঙ্‌চাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অজয় বাবু বুঝি তোমাকে বিনা-তারে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল যে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে দরজা বন্ধ করে তুমি তাঁর জ্বর নামাচ্ছ?" হঠাৎ তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "ও ঠাকুরঝি! দেখে যাও তোমার মেয়ের কীর্ত্তি! সামনেই অঘ্রাণ মাস, নতুন করে' মেয়ে-জামাই ঘরে তোলো!"

দরজার বাহিরেই এমন একটা বীভৎস-রসের অভিনয় শুনিয়া অজয় বিছানায় আর স্থির থাকিতে পারিল না। টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। কোন রকমে দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"রাত-দুপুরে হঠাৎ চেঁচামেচি সুরু কর্‌লে কেন? কী এমন কাণ্ড ঘটেছে?"

অজয়ের শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া কমলমণির গলায় মন্দা পড়িল না: "এই আমাদের অজয় বাবুর অসুখ! রাত্রিবেলা ক'দিন থেকে এই অসুখ চলছে শুনি?"

এমন সময় উপর হইতে নমিতার মা একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নমিতা তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া একেবারে অবোধ আত্মহারার মত কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েকে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন,—"কি, কি হ'ল?"

হাত ও মুখের একটা কুৎসিত ভঙ্গি করিয়া কমলমণি কহিলেন,—"কি আবার হ'বে! রাত্রে তোমার মেয়ে অভিসারে বেরিয়েছিলেন! আর ভয় নেই দিদি, মেয়ে তোমার খুব ভালো রোজকারের পথ পেয়েছে।"

নমিতা ফুঁপাইয়া উঠিল, কিন্তু এই অন্যায় ও কদর্য্য কথা শুনিয়া অজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। আর্ত্ত-স্বরে কহিল,—"মুখে যা আসে তাই বোলো না, দিদি। নমিতা কেন নীচে এসেছিল জানি না, কিন্তু আমার বমি করবার আওয়াজ শুনেই ঘরে ঢুকেছিল! রোগীর প্রতি ওর এই করুণার এমন কদর্য্য অর্থ যদি কর ত' ভালো হবে না।"

"কিসের ভালো হবে না শুনি?" কমলমণি খেঁকাইয়া উঠিলেন: "আর রাতের পর রাত এই ঢলাঢলিই খুব ভালো, না? পরের বাড়ি বসে' এই সব কেলেঙ্কারি চলবে না, অজয়। আমি বাবাকে লিখে দিচ্ছি তোমার মতন বাঁদরকে আমি পুষতে পার্‌বো না।" ক্রন্দনরতা মেয়েটার গালে সবেগে এক চিম্‌টি মারিয়া ফের জাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আর তোমাকেও বলছি দিদি, এই ধুম্‌সো মেয়ে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে পথ দেখ। এইখেনে থেকে আর আত্মীয় স্বজনের মুখ হাসিয়ো না।"

"নমিতা!" অজয়ের ডাক শুনিয়া নমিতা মায়ের বুকের মধ্যে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। "তুমি তবু এই মিথ্যাচারে এই পাপের মধ্যে বেঁচে থাক্‌বে? সব ছেড়ে (ছুড়ে) এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া হঠাৎ দুর্নিবার আবেগে অজয় হয় ত' এক পা আগাইয়া আসিতে চাহিল। সামনেই সিঁড়ি। টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে বেশ বুঝা গেল কপালের সাম্‌নেটা ফাটিয়া গিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কমলমণি গিরিশ বাবুকে খবর দিতে উপরে ছুটিলেন।

গিরিশ বাবু যখন নামিয়া আসিলেন তখনো অজয়ের জ্ঞান হয় নাই। নমিতার মার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে—আর নমিতা দূরে একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে।

গিরিশ বাবু আসিয়াই হাঁক দিলেন: "এ সব কি কাণ্ড বৌদি! তুমিও এসে এই অনাছিষ্টি ব্যাপারে হাত দেবে ভাবিনি। রাখ, রাখ,—রক্ত বন্ধ হয়েচে ত'? শুইয়ে দাও বিছানায়।" বলিয়া চাকরকে উঠাইয়া ধরাধরি করিয়া অজয়কে তাহার বিছানায় আনিয়া ফেলিলেন। নমিতা তখনো মূঢ়ের মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। গিরিশ বাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন: "তুই আর এখানে মরতে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? যা এখান থেকে।"

গিরিশ বাবু পেছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নমিতার কাণে তখনো যেন অজয়ের করুণ গোঙানি লাগিয়া রহিয়াছে, তবু তাহাকে উপরেই যাইতে হইল। আর বারান্দায় নয়, একেবারে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। মা উপরে আসিলে নমিতা একবার চোখ চাহিয়াছিল হয় ত'; মা ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন,—"আমাকে আর তুই ছুঁস্‌নে পোড়ামুখি! তোর কপালে কেরোসিন তেল জুটল না। এর আগে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়্‌তেও ত' পার্‌তিস হতভাগী।" বলিয়াই মা পাগলের মত তাঁহার কপালটা বারে বারে ঘরের দেয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।

পর দিন ভোর হইতেই গিরিশ বাবু দরজার গোড়ায় আসিয়া হাঁকিলেন: "বৌদি!"

নমিতা সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারে নাই। কাকার ডাক শুনিয়া মাকে জাগাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। নমিতার মা কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিরিশ বাবু কহিলেন,—"তোমার মেয়েকে আমার বাড়িতে আর রাখা চল্‌বে না, বৌঠান্। ওর শ্বশুর ত' এখেনেই আছে, একটা চিঠি লিখে দি নিয়ে যাক্। অজয়টাকেও আজ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলুন।"

নমিতার মা না বলিয়া পারিলেন না: "এত জ্বরের মধ্যে!"

গিরিশ বাবু একটা ট্রাঙ্কের উপর জায়গা করিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"আজ যদি না যায়, সেবা করতে তোমার মেয়েকে ত' আর সেখানে পাঠানো চল্‌বে না।" বলিয়া নমিতার দিকে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

নমিতা অনেক সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এইবার তাহার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা এক সঙ্গে মোচড় দিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"একজন পরিত্যক্ত রুগীর পরিচর্য্যা করার মধ্যে আপনারা যতই কেন না পাপ খুঁজে বেড়া'ন কাকাবাবু, যিনি মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে' দেখছেন তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হন্ নি।" বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল নামিয়া আসিল।

গিরিশ বাবুকে কোন কথা কহিতে না দিয়াই নমিতার মা কহিলেন,—"চুপ কর্, বল্‌ছি। তাই ভাল, ঠাকুরপো, অবনী বাবুকে খবর দাও। ওখেনেই গিয়ে থাকুক্ কয়েক দিন।"

নমিতা আবার শক্ত হইল। কহিল, "কেন আমি ওখানে গিয়ে থাক্‌বো? আমি কি করেছি? ওটা কি আমার নির্ব্বাসন নাকি?"

গিরিশ বাবু দাঁত খিঁচাইলেন: "তবে ঐ গুণ্ডাটার গলা ধরে' বেরিয়ে পড়্‌লেই ত' পারতিস্।"

মাও কাকার কথার সুরে সায় দিলেন: "শ্বশুর বাড়ি না যাবি ত' যমের বাড়ি যাস্।"

নমিতা গোঁ ধরিয়া বসিল: "এমন একটা কাণ্ড আমি অবশ্য করিনি যাতে রাতারাতি তোমাদের ঘর-সংসার একেবারে উল্‌টে ছত্রখান হ'য়ে গেল। আমি শুধু শুধু সেখানে যাবো কেন?"

পাশের ঘর হইতে কমলমণি ছুটিয়া আসিলেন,—"বসে' বসে' কে তোমাকে এখানে গেলাবে শুনি? মন্দরও ত' বেহদ্দ হয়েছ—এবার রোজকার করে' পয়সা আন, নিজেরটা নিজে জোগাড় কর এবার থেকে। বাবাঃ, কী গলগ্রহই যে জুটেছে!"

নমিতা আর কথা না কহিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও একটুও বদল হয় নাই, রাস্তার ধূলার উপরে তেমনিই রোদের গুঁড়া পড়িয়াছে। সকাল হইতেই যে কুঠে বুড়োটা বহুলোচ্চারিত ঈশ্বরের নামটাকে

একটা বিকৃত ধ্বনিতে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছে সে লাঠি ভর করিয়া গলির মোড়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু কাল্‌কের রাত পোহাইতেই নমিতা যেন এক নব প্রভাতের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। হয় ত' এখন অজয় আরেকবার ডাকিলে সে বাহির হইয়া পড়িতে পারিত। কোথায় যাইত তাহা সে জানে না, কিন্তু এমন করিয়া মরিতে হয় ত' নয়।

রেলিঙে ঝুঁকিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই তাহার নজর পড়িল একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এক রাজ্যের মাল-বোঝাই হইয়া গলি পার হইতেছে। গাড়ির ভিতরে নজর পড়িতেই বাহির হইয়া পড়া দূরের কথা, নমিতার নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিল। পেছনের সিট্‌টাতে হেলান দিয়া অজয় অতি কষ্টে সামনের জায়গাটায় পা দুইটা ছড়াইয়া শুইবার মতন করিয়া বসিয়া আছে—মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ বাধা। দেখিয়া নমিতা সম্বিৎ হারাইল কিনা কে জানে, সে সহসা হাতছানি দিয়া গাড়োয়ান্‌কে থামিবার জন্য সঙ্কেত করিল। গাড়োয়ান তাহা লক্ষ্য করিল না, ভিতরে যে ব্যক্তি যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল এই ইঙ্গিতটি তাহারও অগোচর রহিয়া গেল।

গাড়ী অবশ্য অজয় থামাইত না। গাড়ী মোড় পার হইয়া গেলে সে একবার পেছনে বাড়ীটা দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইল—যাহাকে দেখা গেল না তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল: আমার সঙ্গে না এসে ভালোই করেছ, নমিতা। একদিন যাতে নিজেরই পায়ের জোরে পথের ওপর নেমে আস্‌তে পার তোমার ওপর ততটা লাঞ্ছনা হোক্। আমি সুখী হ'ব।

১৩

নানা জায়গা ঘুরিয়া সন্ধ্যাটা কাটাইয়া প্রদীপ তাহার মেসের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কে একটা লোক তাহার বিছানার উপর উবু হইয়া পড়িয়া আছে। তিন সিটের ঘর—বাকী দুই জনের এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কথা নয়। রমেন বাবু শহরের কি-একটা বায়স্কোপ-ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া টিকিট কুড়ান, আর প্রীতিনিধান রাত্রি করিয়া কোন্-একটা কোচিং-ক্লাশে জেগ্রাফি পড়িতে যায়। তাহারা এই অসময়ে মেসে ফিরিয়া আসিলেও কখনই প্রদীপের বিছানায় গড়াইতে সাহস করিত না। প্রদীপ উহাদের চেয়ে শয্যা-বিলাস সম্বন্ধে উদাসীন বা অপরিচ্ছন্ন বলিয়া নয়, উহাদের সংস্রব হইতে সে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিত বলিয়া। তা ছাড়া ঘরের তালাই বা কে খুলিল,—খুলিল ত' কষ্ট করিয়া আলোটাই বা জ্বালাইল না কেন!

লণ্ঠন জ্বালাইবার সময় ছিল না; সাহস করিয়া আগন্তুকের গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—কে?

লোকটি অনেকক্ষণ পরে সাড়া দিল। মুখ না ফিরাইয়া আন্দাজে উত্তর দিল; প্রদীপ এলে?

স্বর পরিচিত। এইবার পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাইল। দেখিল, অজয়। জীর্ণ ময়লা কাপড়-জামার মধ্যে নিজের শরীরটাকে শামুকের মত সঙ্কুচিত করিয়া পড়িয়া আছে। অজয়ের গলা শুনিয়া প্রদীপ যেমন সুখী হইয়াছিল ভয়ও হইয়াছিল ততখানি। ভয় হইয়াছিল অজয় বুঝি তাহার স্বাভাবিক যৌবন-প্রমত্ততায় আবার কোথাও হঠকারিতা করিয়া বিপদে পড়িয়াছে; আর সুখী হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে তাহার আশ্রয়ে সে যখন একবার আসিয়া পড়িয়াছে তখন তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে এমন লোককে পৃথিবীতে প্রদীপ নিশ্বাস নিতে দিবে না। কিন্তু আলো জ্বালাইয়া অজয়ের এই শ্রীহীন কাতর চেহারা দেখিয়া প্রদীপ বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এই সব জীব পৃথিবীতে বিভীষিকা ও জয়োল্লাস লইয়াই বাস করে—বিষাদ ইহাদের ধাতে সয় না। তাড়াতাড়ি অজয়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—কি হ'ল অজয়? কোত্থেকে?

একটা দুর্ব্বল হাত দিয়া প্রদীপের বাহুটা চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল,—জান-ই ত' লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্যে একটা ভদ্র আস্তানা ঠিক রেখেছিলুম, আপাতত সেই আস্তানা থেকেই আস্‌ছি। ভীষণ জ্বর এসেছে।

প্রদীপ ব্যাকুল হইয়া কহিল,—জ্বর নিয়ে বাড়ি ছাড়লে কেন? কেউ তাড়া করেছিল না কি?

ম্লান একটু হাসিয়া অজয় কহিল,—এবার যে তাড়া করেছিল সে আমাদের সকল শত্রুর চেয়ে দুর্দম। তার

কাছেই আমরা বার বার হেরেছি, বার বার হারব,—সে আমাদের ভাগ্য।

অজয়ের চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধ স্বরে প্রদীপ বলিল,—তোমার এই বড় দোষ অজয়, তুমি বড্ড ভাবুক। তুমি সোজা বুদ্ধিকে কল্পনা দিয়ে ঘুলিয়ে তোল। কি হয়েছে স্পষ্ট ক'রে বল্‌বে?

প্রদীপের ঠাণ্ডা হাতখানি অজয় তাহার উত্তপ্ত গালের উপর চাপিয়া ধরিল; কহিল,—ভাবুকতা না থাক্‌লে কোনো পরাজয়, কোনো ব্যর্থতাকেই মহনীয় করে' দেখা যায় না। সে-তর্ক তোমার সঙ্গে পরে করলেও চলবে। সোজা স্পষ্ট করে'ই বল্‌ছি। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে' বললে তার মানেটা সব সময়েই পরিস্ফুট হয় না, প্রদীপ। যেমন ধর, আমি যদি বলি, একটি মেয়ে আমার অনুগামিনী হ'ল না ব'লেই আমি অভিমানে বেরিয়ে পড়লাম—কথাটার আদ্যোপান্ত তুমি বুঝতে পারবে?

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—কথাটাকে যদিও এর চেয়ে স্পষ্ট করে' বলা যেত, তবু এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট অর্থবান হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে! আর আমাকে বলতে হবে না। রোগ শুধু তোমার গাত্রোত্তাপ নয় অজয়।

অজয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; হাঁ জানি। এ আমার আত্মার উত্তাপ, প্রদীপ। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেহের উত্তাপ ব'লেই ধরে' নিল। তোমাকে স্পষ্ট ক'রেই বলি তা হ'লে। দেখ কিছু করা যায় কি না। বলিয়া অজয় তাহার মাথাটা প্রদীপের কোলের উপর তুলিয়া দিল। যেন আপন অন্তরের সঙ্গে কথা কহিতেছে তেমনি মৃদু গভীর ও বেদনাগদ্গদ-স্বরে বলিতে লাগিল—মেয়েটি বিধবা, নিরলঙ্করা, অশ্রুমতী! আমাদের ব্রতচারিণী তপস্বিনী ভারতবর্ষ। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারই সেই ম্লান চোখে বিদ্যুৎ দেখতে পেলুম—বুঝলুম সে বিদ্রোহিণী। মনে মনে তাকে প্রার্থনার মত আহ্বান করেছিলুম হয় ত', সে আচার ও কৃত্রিম লজ্জাশীলতার বেড়া ট'পকে আমার ঘরে চলে' এল মর্ত্ত্যাবতীর্ণা মৃত্যুর মত। দুই হাতে সেবা নিয়ে, চোখে নিয়ে করুণা! মনে রেখো প্রদীপ, রাত্রে এল—যে-মুহূর্ত্তে কবির মনে কল্পনাকায়া কবিতার আবির্ভাব হয়। আমি তাকে বললুম, আমার হাত ধরে' বেরিয়ে পড়, নমিতা……

কথার মাঝখানে প্রদীপ হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল; নমিতা?

অজয় বলিয়া চলিল—আমাকে শেষ করতে দাও। বললুম, নমিতা, আমার সঙ্গে এস। লাখো লাখো মেয়ে মরছে, সমাজে সংসারে অসংখ্য তাদের অত্যাচার। কেউ মরছে আচারের দাসত্ব করে', কেউ সন্তানধারণ করে'—কেউ কেরসিন জ্বালিয়ে, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে। তুমি বীর-ভগ্নীর মত মরবে, এস।

প্রদীপ আবার বাধা দিল—নমিতা কি বললে?

ম্লান বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অজয় কহিল,—নমিতার উত্তর শুনে তুমি হেসো না, প্রদীপ। ভাবলে আমি বুঝি ওকে ঘর থেকে বের করে' নিয়ে যেতে চাই তুচ্ছ দেহ-বিলাসের জন্যে। বললে—আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবিনি। কথাটা মনের মধ্যে দাগ কেটে ব'সে আছে। পরে ভাবলুম, বাঙালি মেয়ের কাছ থেকে এর বেশী আর কী উত্তর আমরা প্রত্যাশা করতে পারি?

প্রদীপ কহিল,—ও! নমিতা তা হ'লে তোমার ভগ্নীপতির ভাইঝি হয়! কাছেই আছে তাহ'লে। আমি এতদিন ওর একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত পাই নি। তোমার সঙ্গে দেখাও ত' আজ প্রায় তিন বছর বাদে। প্রথম দেখা কবে হয়েছিল মনে আছে?

—আছে না? সেই চিতোর-গড়ে, রাণা কুম্ভের জয়-স্তম্ভের ওপরে। কিন্তু নমিতাকে তুমি চিনলে কি করে'?

—সেই জয়স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের অগণন পাহাড়ের দিকে চেয়ে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে, অজয়? বলেছিলে তুমি অতীতে ছিলে জয়মল্ল, দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে আকবরের হাতে প্রাণ দিয়েছ, পরে নতুন দেহ নিয়ে নতুন যুগে বাঙলা দেশে অজয় হ'য়ে জন্মিয়েছ। কথাটা ভাবুকতার চূড়ান্ত, কিন্তু সেই দিনই তোমার সঙ্গে বন্ধুতা না করে' পারলুম না। তার পর দুই জনে ঝড় আর বিদ্যুতের মত সহযাত্রী হ'য়ে সমস্ত উত্তর-ভারতটা মথিত করে' এলুম। আজ এত দিন বাদে তুমি আমার ঠিকানা পেলে কি করে'?

অজয় হাসিয়া কহিল,—তার চেয়েও বড়ো জিজ্ঞাস্য, তুমি নমিতাকে চিনলে কি করে'?

প্রদীপ বলিল,—নমিতার স্বামী সুধীন্দ্র আমার সাহিত্যিক বন্ধু ছিল। রাণীগঞ্জে ও যখন মরে তখন আমিই ওর পাশে ছিলাম।

—তোমার ঠিকানা আমি পেলুম অত্যাশ্চর্য্যরূপে, প্রায় সতেরোটা মেস্ খুঁজে। অত্যাশ্চর্য্য বলছি কারণ তুমি যে এখনো কলকাতায়ই আছ তা আমি ভেবে নিলুম কি করে'? মনে হ'ল এর আগে রাস্তায় একদিন যেন তোমাকে আমি দেখেছিলুম চিনে-বাদাম খাচ্ছ। দিন সাতেক আগে হয় ত'। এখনো তোমাকে চিনে-বাদাম খেতে হয় নাকি? ভাবলুম দিব্যি বিয়ে-থা করে' ব্যাপার সমুদ্র পার হ'য়ে এসেছ।

অজয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া প্রদীপ কহিল,—আমার ইতিহাসটা এমন নয় যে তাকে জাঁকজমক করে' বর্ণনা করতে হবে। নমিতার সন্ধান পেলুম, ঐটা আমার একটা সম্পত্তি, অজয়। নমিতাকে আর হারাচ্ছি না

এইবার অজয় একেবারে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল,—মেয়েমানুষ সব সাধনার বিঘ্ন, প্রদীপ—সে কবিতায়ই হোক্ বা ধর্ম্মাচরণেই হোক। আমার বিশ্বাস আর নেই। একাকী থাকবার মধ্যে সুখের চেয়ে সুবিধা বেশি। সে-বাড়িতে এতক্ষণে ঢি-ঢি পড়েছে—নমিতা সংসারের চোখে কুলটার কলঙ্ক নিয়ে বিরাজ করবে—তবু কুলপ্লাবিনী হ'য়ে বেরিয়ে পড়বে না!

—তুমি বল কি, অজয়?

—বলেছি না, ভাগ্য! নমিতার ভাগ্য। আমাকে খারাপ বলে' বর্জ্জন করে' সে তার শুদ্ধাচার সতীত্বের খাপে তার বিদ্রোহাচরণের তলোয়ার ঢেকে রাখছিল এমন সময় শাসনকর্ত্তার দণ্ড নিয়ে দিদির আবির্ভাব হ'ল। নমিতা ধরা পড়ল! আর যায় কোথা! নমিতা রাত করে' লুকিয়ে পরপুরুষের দুয়ারে পসারিণী হয়ে এসেছে! সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে নমিতা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তবু কালীর মত জেগে উঠ্‌তে পারল না। আমি ওকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলুম কিন্তু এমন নমিতাকে শেষ পর্য্যন্ত আমি শ্রদ্ধাটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না ভাই।

এইবার প্রদীপ আর না-হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অবোধ সন্তানকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন তেমনিভাবে কোলের উপর অজয়ের মাথাটাকে আস্তে আস্তে একটু একটু দোলা দিতে দিতে প্রদীপ কহিল,—তুমি এত বেশি হঠকারী যে ব্যগ্রতাকে সংযত করতে শেখনি। তোমার মত দ্রুত নিশ্বাস যে নিতে না পারে তাকে তুমি মৃত ব'লেই ত্যাগ কর—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। প্রত্যেক পরিণতির পেছনে প্রচুর প্রতীক্ষা চাই। আমরা এই বলদৃপ্ত যৌবনের পুজায় কত অসংলগ্ন দিন-রাত্রির অঞ্জলি দিয়েছি, তার হিসেব রাখ? ঝড়ে আমি বিশ্বাস করি না, তার চেয়ে একটি স্থির প্রশান্ত গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের আমি উপাসক।

নমিতা সংসারেই বিরাজ করুক, সেখানে থেকেই যদি তার গ্রন্থি ও শিথিল করতে পারে তবেই ভালো তার জন্যে ও লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক—সেটা তার আশীর্ব্বাদ।

নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল,—আমিও তাকে সেই কথাই বলে' এসেছি।

—সেইটেই সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা। আমার সঙ্গে তার যে একটা ব্যাপার ঘটে' গেছে সেটা তোমাকে পরে ব'ললেও চলবে। এখন তোমাকে কিছু খাওয়াই।

অজয় কহিল,—ক্ষিদে আমার সত্যিই পেয়েছে। কিন্তু তোমার আছে কি যে খাওয়াবে? এই ত তোমার বিছানার চেহারা! সামান্য একটা বাক্সও তোমার আছে বলে' মনে হচ্ছে না। বলিয়া মাথা তুলিয়া, অজয় ঘরের চারিদিকে একবার চাহিল।

প্রদীপ হাসিয়া বলিল,—দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার জ্বর হ'য়েছে বলে' তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না বলে' মনে হচ্ছে না। পকেটে দু' আনা এখনো আছে বোধ হয়। তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি সাবু আর মিছ্‌রী কিনে নিয়ে আসছি।

(ক্রমশঃ)

আষাঢ়ে গল্প

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সকাল বেলা চা খেয়ে সবেমাত্র একখানা কেতাব খুলে' বসেছি এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে বাইরের ঘরে একদল লোক এসে বসেছে, আমায় তাদের চাই-ই। ভোর বেলাতেই কি উৎপাত মনে করে' বইখানাকে মুড়ে' রাখলুম,—তারপর গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে গুটিসুটি বাইরের ঘরে চল্লুম। এসে দেখি ঘরের মধ্যে সমাসীন জন দশবার, ঘরের বাইরেও ভীড় জমেছে ঢের লোকের। ঘরের মধ্যে সবার চাইতে মুরুব্বিগোছের যিনি তিনি আমায় দেখে সনমস্কারে ব'ল্লেন—

"দেখুন, আমরা এ জগতের লোক নই,—জ্যোতিষ্ক রাজ্যের লোক। আমরা হ'চ্ছি তারার দল, এসেছি আপনার কাছে বড় দায় ঠেকে—।"

আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম—"আমি ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তি, আপনাদের কি কর্ত্তে পারি ?"

তিনি ফের বল্লেন—"আপনিই মশাই সব কর্ত্তে পারেন। সে প্রায় বছর ষোল সতেরোর কথা, আমাদের দুইটী আত্মীয় হঠাৎ একসঙ্গে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়; বহুদিন তাদের কোন পাত্তাই নেই। তারপর এই সেদিন দেবরাজের সভায় রাজজ্যোতিষীর কাছে নেহাৎ ধরে' পড়াতে খবর পেলাম যে আপনার স্ত্রীর অনুপম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে' তারা তাঁর চোখে বাসা বেঁধেছে। জাতভাই,—হাল ছেড়ে ত' দিতে পারি না, তাই আপনার দয়ার ভিখারী হয়ে' আজ আমরা এসেছি। আপনার স্ত্রীর আমরা একবার সাক্ষাৎ চাই। যদি দেবরাজ-জ্যোতিষীর কথা সত্য হয় তবে আমাদের বন্ধুটীকে একবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা ক'রব।"

আমি ত হতভম্ব। আমতা আমতা করে বল্লুম—"যদি আপনাদের অনুমান সত্য হয় এবং আপনাদের বন্ধু যদি ফিরে যেতে রাজী হ'ন তবে—আমার স্ত্রী অন্ধ হ'য়ে যাবেন না ত ?"

তারা-দের মোড়ল আমায় আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"সে ভাবনা ভাববেন না তার ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি যদি দয়া ক'রে এখন আপনার পত্নীকে একবার আমাদের সামনে ডাকেন তবেই আমরা ছুটী পাই। বেলা যতই বাড়ছে ততই পৃথিবীতে রূপ পরিগ্রহ করে' থাকতে আমাদের কষ্ট বেশী হচ্ছে।"

"দেখি কতদূর কি করতে পারি—" বলে' ভেতরে গিয়ে গিন্নিকে শুধালুম—"এরা সব কি বলছে গো ?"

সব শুনে গিন্নী ব'ল্লেন—"তা তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন ? ওরা দেখতে চায় আমায়, দেখুক না ?"

ধীরে ধীরে আমার স্ত্রী তখন আমার পেছনে পেছনে বাইরে এলেন এবং ঘরের মধ্যখানে এসে নীরবে মুখের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন ভাবে তুলে ধ'রলেন। আমি তাঁর মুখের ওপরে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম তাঁর চোখ দেয়ালে-টাঙ্গান আমার একখানা তৈলচিত্র প্রতিকৃতির উপর আবদ্ধ। চোখের দৃষ্টি সত্যি যেন সন্ধ্যা-তারার মত কোমল মধুর; ওঁর সতত চঞ্চল নয়ন কোন্ সুদূরের পিয়াসী হ'য়ে যেন জাগ্রত স্বপ্ন দেখছে। ওঁর চোখের অই অনবদ্য সুন্দর মাধুর্য্যটী আমি জীবনে দেখিনি,—না 'দেখিনি' বল্লে ঠিক হ'বে না—খুব কচিৎ দেখেছি।

তারা-দের প্রতিনিধিগণ যে কয়জন ঘরের মধ্যে ছিলেন, প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে' এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ওঁর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন এবং তারপর তাদের চোখে যেন নিরাশার আঁধার ঘনিয়ে এল। মোড়লটী তখন ব'ল্লেন—"কথায় বলে মশাই মুণিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এতদিনে সত্যসত্যই দেখলুম তাই। আপনার স্ত্রীর চোখে আমাদের বন্ধু দুটীর অস্তিত্বের কোনই সন্ধান পেলুম না। আপনার স্ত্রীর চোখ অপরূপ সুন্দর; আমাদের বন্ধুদের রূপ তার শতাংশের একাংশও নয়। আচ্ছা মশাই আমরা চল্লুম, কামনা করি আপনারা সুখে থাকুন।"

দেখতে দেখতে মনুষ্যাকৃতি তারার দল শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে গিন্নীকে বল্লুম—"ওদের রকম

সকম দেখে কি ভয়ই যে হচ্ছিল! আচ্ছা গাঁজাখুরী গল্প ফেঁদে ব'সেছিল বটে।"

আমার মন্তব্য শুনে স্ত্রী মুখ টিপে হেসে ব'ল্লেন—"ওরা যা' বলছিল তা কিন্তু মিছে কথা নয়। মার কাছে আমি গল্প শুনেছি আমি যখন চার পাঁচ বছরের মেয়ে তখন একদিন আকাশ থেকে দুটী তারা ছিটকে আমার দুচোখে পড়েছিল, তাতে আমার দৃষ্টি এমন বদলে গেল যে অনেকে নাকি অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাকে চিনতেই পারত না।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"তবে যে ওরা তোমার চোখ দেখে সে কথা ধরতে পারলে না?"

হঠাৎ রাঙিয়ে উঠে আমার স্ত্রী উত্তর দিলেন,—"কেন পারলে না জান? ওদের সামনে ঘোমটা খুলে তোমার ছবির ওপর চোখ রেখে আমি ভাবতে লাগলুম, সেই দিনের কথা,—যে দিন ছিল বাদল-সন্ধ্যা, আমাদের হুগলির বাগানের পূর্ব্ব-উত্তর কোণায় আমি দাঁড়িয়েছিলুম, সেখানে কেয়া আর কদম্বের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছিল; সূর্য্য তখন অস্ত যেতে যেতে গাছের চূড়ায় চূড়ায় বিদায়চুম্বন দিচ্ছেন।—এমন সময় তুমি ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে বসলে, আমার হাত দুখানি হাতের মুঠোয় ধরে' কত শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে প্রথম প্রণয় নিবেদন করলে। আমার কতদিনের আশা যখন মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠল, তখন আপন-হারা হয়ে যে নিবিড় প্রেমের চাউনি আমার চোখে ফুটে উঠেছিল, সেই কথা মনে করার সেই চাউনি আমার চোখে ওদের সামনেও ফুটে উঠে থাকবে। সত্যিকার আমার দৃষ্টির চাইতে সে দৃষ্টি কি মধুর হ'বে না? তাই ওরা আমার চোখ দেখে কিছু ঠাওরাতে পারে নি।"

ওঁর কথায় আনন্দে অহঙ্কারে আমার বুক ভরে' উঠল, প্রত্যুত্তরে নিবিড় প্রেমে তাঁকে বুকে টেনে নিলুম।*

দখিণা

[শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়]

দক্ষিণ মেরুর গেহে সুপ্ত ছিল কুমারী দখিণা
তুষার পালঙ্ক 'পরে; হিমশুভ্র বাহুখানি রাখি'
বিস্রস্ত কুন্তল-তলে, বরতনু অযতনে ঢাকি'
কুহেলি-অঞ্চলে,—যেন সুপ্ত সুর-নন্দনের বীণা।

দিবা রবিদীপ্তিহীন, তন্দ্রালেখা আলোর নয়নে,
শব্দ মূর্চ্ছাগত, নিস্পন্দ নীরব, শ্বাস নাহি বহে,
স্তিমিত নয়ন কাল ধ্যান-মৌন স্তব্ধ বসি' রহে
তুহিন আসনে কোন জরা হরা মন্ত্রের সাধনে।

সহসা নয়ন মেলি' সুনয়না জাগিল সুন্দরী,
ললাট ছুঁইল তার রবিরশ্মি সুবর্ণ শলাকা,—
তারপর লঘুপদে সিন্ধু তরি' মেরুর অপ্সরী
উত্তরিল ধরণীর তনুতটে হিমবিন্দু আঁকা।
উলঙ্গ ধরার দেহ রোমাঞ্চনে উঠিল শিহরি';
শীতের কুঞ্ঝটি সাথে উড়ে গেল কুন্দের বলাকা।

*ফরাসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে—ও

যাত্রার দল

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে—শীতের রাত্রি হবে—
মনসা-তলায় যাত্রাগানের আসরে বসিয়া সবে,
শুনিতেছি গান ; কর্ণ-বধের পালা শেষ হ'ল প্রায়,
চাকা-বসা রথ দেখিয়া সকলে করিতেছি হায়! হায়!
হেন কালে জুড়ি গাহিয়া উঠিল, 'কোথা জগদীশ্বর—'
কুয়াসায় ঢাকা আলোর দোসর—ভাঙ্গা, বীভৎস স্বর,—
কেহ কেঁদে বলে, কি হ'ল—কি হ'ল, কেহ বলে, হ'ল মাটী—
কেহ বলে ভাই, রসটা জবাই! কেহ করে কাঁদাকাটি!

—দেখিলাম চেয়ে, শীর্ণ বালক তেড়ে জুড়িগান গাহে—
বহু জাগরেতে নিদ্রা-অলস চোখে মিটি মিটি চাহে!
পঞ্চমে ধরি' বিকৃত কণ্ঠ খাদে ক্রমে টেনে আনে—
আর যে পারে না প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ তার শুধু জানে!
কোথায়, কেন বা কি গাহিতে হ'বে মাঝে মাঝে যায় ভুলি'—
খোঁচায় খোঁচায় চ্যাঁচায়ে উঠিয়া পুন পড়ে' যায় ঢুলি'!
ঘুমের জড়তা নেমে আসে পুন কি কহিতে কিবা কহে—
অধিকারী শুধু গোণে ক'টা ভুল, উন্মুখ আগ্রহে!

ভাবিলাম ভাই, আমারও সে দশা পঁচিশ বছর ধরে'—
বায়না লইয়া গাহিতেছি গান নিত্য নতুন করে'!
আজি এ আসরে, কাল ও আসরে মাকুর মতন ছুটি'—
ডাক পড়িলেই উঠিয়া দাঁড়ায়ে সবার সহিত জুটি!
কাল কি গেয়েছি আজ এ প্রভাতে নাহি আর মনে পড়ে—
আমারি মতন সমান বেহায়া জুটিয়াছে একঘরে!
অদ্ভুত বড় সকলেরই ভাই, সবগুলি 'পাঠ' সাধা—
কখন, কোথায় কি গাহিতে হ'বে আছে সব ধরাবাঁধা!

তামাক সাজার পাঠ যবে ছিল ভাবিতাম মনে মনে,
—রাজা হ'তে পেলে কতনা আমোদ—মানিবে সর্ব্বজনে!
তখন বুঝিনি তফাৎ কোথায় রাজা আর বিদূষকে—
সমান পরোয়া করিছে তাদের সবগুলো দর্শকে!

আমি বিদূষক, কভু হই রাজা—কভু বা তাহার রাণী—
চুল, দাঁড়ি আর গোঁফের তফাৎ এইটুকু শুধু মানি!
—আমি শুধু বসে' অপেক্ষা করি যথা যবে পড়ে ডাক—
জোড়াতালি দিয়ে নিত্য নূতন পূরাইতে হ'বে ফাঁক!

এক গালে লেপি' অজস্র চূণ আর গালে কালি মাখি'—
আসরে দাঁড়ায়ে দন্ত বিকশি' ওজন বুঝিয়া থাকি!
তাই দেখে কেহ উঠে বা হাসিয়া দেয় কেহ হাততালি—
আমি ভাবি মোর খাসা অভিনয় লভিল যশের থালি!
—শুধু ভুলে যাই যারা দর্শক তারাও যে অভিনেতা!
ভাঁড়ে ভাঁড়ে মোরা ধূল পরিমাণ—সমান ভাঁড়ামি হেথা!
মুখ কোথা ভাই—মুখোস পরিয়া সবাই রয়েছে বসি'—
দাঁড়াইলে দূরে দেখিতে পাইবে—মাঝে মাঝে যায় খসি'!

কাঁদিবার কালে মনে হয়, আমি সত্যি বুঝিবা কাঁদি—
প্রিয়ের বিরহে. চারিদিকে যেন ঘেরিয়া আসিল আঁধি!
হাসি যবে মনে ভাবি শতবার, এ জগৎ উৎফুল্ল—
দিকে, দিকে, দিকে জ্বলে রোস্‌নাই কিবা আছে এর তুল্য?
আসর হইতে নামিয়া বুঝেছি—সবই ভাঁড়ামির ঝোঁক—
ডাক পড়েছিল হাসিতে কিম্বা করিতে খানিক শোক!
—আমি চিরদিন বিরামবিহীন অদ্ভুত বিদূষক—
যত দিন আছি যাত্রার দলে, করি সাধা বকুবক্!

পঁচিশ বছর কেটে গেল ভাই—মাঝে মাঝে মনে হয়—
পারি না, পারি না, সহিতে পারি না—অসহ এ অভিনয়!
ক্লান্ত এ দেহে, শ্রান্ত নয়নে ঘুম যেন ছেয়ে আসে—
চোখ বুঁজে ডুব মেরে যেতে চাই—শান্তির অভিলাষে!
পুনঃ পড়ে ডাক—জুড়ি' গোঁফ দাড়ি অথবা কামা'য়ে মুখ—
বিশ্বের প্রহসনের আসরে বলি সাধা কথাটুক্!
ঘুমে ঢুলে আসে শ্রান্ত এ দেহ—শুধু ঠুকে মরি মাথা—
সেলাই কবে বা হ'বে শেষ মোর ছিন্ন জীবন-কাঁথা!

ন্যুট হ্যামসুন

[শ্রীনিখিলেশ রাহা]

দারিদ্র্য লইয়া যে জন্ম গ্রহণ করে এবং জীবনে বাঁচিবার জন্য যাহার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হয়—জীবনের সুখ-দুঃখের পাত্রটি তাহার অভিজ্ঞতা এবং বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। দরিদ্র কৃষকের পুত্র হ্যামসুনের জীবন-প্রভাতে যে অভাব এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল সেই দারিদ্র্য এবং অভাবই তাঁর জীবনকে অভিজ্ঞতা, আনন্দ এবং বেদনায় রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল। দারিদ্র্য অভিশাপ, কিন্তু হ্যামসুনের জীবনে উহা তাহার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ।

উনিশ বৎসর বয়সে উত্তর নরওয়ের এক জুতার দোকানে কাজ করিতে করিতে তিনি প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। তারপর নরওয়েরই আর এক প্রান্তে অতি নগণ্য গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া কিছুদিন তাঁহার কাটে। সরল শুভ্র চঞ্চল বালকবালিকাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তোলার দুরূহ কাজ,—কর্ম্ম নাই কোলাহল নাই শুধু জীবন আর পৃথিবী পাশাপাশি চলিয়াছে—তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই কয়লার খনিতে কাজ করিতে গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আবার কৃষকের মাঠের কাজে লাগিলেন।

আমেরিকায় আসিয়া প্রথমে তিনি মাঠের কাজে লাগেন :...তরুণ যুবক দীপ্তোজ্জ্বল হৃদয় এবং তীক্ষ্ণ মেধা লইয়া কৃষকের ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। মাথার উপর উন্মুক্ত নীলাকাশ—চারিপাশে ফসলে পরিপূর্ণ মাঠ, সম্মুখে দিগন্ত সীমায় তুষার শুভ্র গিরিরাজি; মাঠে কত লোক কাজ করিতেছে—স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ফুটন্ত কুসুমের মত পরিপূর্ণ তরুণী কৃষক-কন্যা তাহাদের হাত ধরিয়া পাশে পাশে চলিয়াছে। মাঠে কাজ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে কত আশা কত আনন্দ কত কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠে, হৃদয়ের কল্পনা যেন সম্মুখের রৌদ্রকিরণে মূর্ত্তি ধরিয়া আসা-যাওয়া করে। আমেরিকার সেই মাঠে কাজ করিতে করিতে হ্যামসুনের বক্ষে নরওয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। সেখানে কর্ম্মমুখর দিনের শেষে আগুনের ধারে বসিয়া তরুণ হৃদয়ের দিনান্তের অবসর—

—কিন্তু গৃহ ভাল লাগে না—তাই ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুভ্র হাল্কা বরফের বর্ষণ হইতেছে—শুক্ল পক্ষের চাঁদ দেখা যায় না—বরফের জালে আবছা হইয়া গিয়াছে। মাঠের আঁকাবাঁকা পথ ছাড়িয়া যুবক অস্পষ্ট বন-পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে পর্ব্বতের শিখরে আসিয়া দাঁড়ায়। পদতলে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর, মাথার উপর প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলির অন্ধকারে কানাকানি—অদূরে সমুদ্রের নীল জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।...

ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়া হ্যামসুন কোলাহল-মুখর চিকাগো নগরে ট্রামের চাকরী লইলেন। দীপ্ত মধ্যাহ্নে খররৌদ্র-জলে ট্রামের কণ্ডাক্টরী করিতে করিতে চোখের সম্মুখে কত স্বপ্ন ভাসিয়া বেড়াইত তাহা কে জানে!

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস Saltএর সারাংশ একটি Danish magazineএ প্রকাশিত হয়। সত্যকার দরদ যার আছে, বলিবার কথা, এবং অভিজ্ঞতা যাহার যথেষ্ট, লিখন-ভঙ্গী এবং ভাষা যাহার হৃদয়ের রঙে অনুরঞ্জিত, একখানি পুস্তকই তাহার পরিচয় দিতে সমর্থ। হ্যামসুন একদিন জানিতে পারিলেন তাহার অভিজ্ঞতা তাহার বেদনা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক Hunger নাম লইয়া অনূদিত হইল।

ইহার পর হ্যামসুন ক্রমাগত লিখিতে থাকেন। প্রত্যেক খানি বই তাঁহার অদ্ভুত মেধা এবং নূতন-করিয়া-জীবন-দেখিবার অপূর্ব্ব অনুভূতি লইয়া দিনের পর দিন তাঁহাকে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার সাহায্য করিতে লাগিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে Growth of the Soil নোবেল-প্রাইজ লাভ করিয়া জগতের কাছে হ্যামসুনকে পরিচিত করিল। হ্যামসুনের সাধনা লোকচক্ষে সার্থক হইল।

প্রথম জীবন মাঠে কাজ করিতে করিতে অবনতমুখী সহচারিণী তরুণীদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জীবনের যে-ছবি তাঁহার মনকে প্রলুব্ধ করিত—অতীত জীবনের সেই সঞ্চিত মধুকেই পরবর্ত্তী জীবনে তিলে তিলে আহরণ করিয়া তিনি তাঁহার সমর-উপন্যাস Growth of the Soil গড়িয়া তুলেন। ক্ষিতিকে যে প্রতিদিন আঘাত করিয়া ফসল বপন করিয়াছে এবং ভালবাসিয়াছে, সেই মাটির উপরে কি করিয়া সুখদুঃখমিশ্রিত জীবনের দিনগুলি শত পুণ্য শত পাপ শত প্রলোভনের ভিতর দিয়া শতদলের মত ফুটিয়া উঠে এ তাহারই ক্রমবিকাশ—কৃষক-জীবনের অমর কাব্য।

...পরিত্যক্ত অনুর্ব্বর এক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে একটি পুরুষ একটি নারী আসিয়া প্রথমে মাটিতে বীজ বপন করিল এবং অবশেষে ধীরে ধীরে তাহাদেরকে আশ্রয় করিয়া সেই লোকবিরল উপত্যকাই একদিন ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া নগরীর সৌন্দর্য্যে হাসিতে লাগিল।

হ্যামসুনের পুস্তকের ভিতর অভিমানবতার পরিচয় নাই। হৃদয়কে বঞ্চিত রাখিয়া জীবনকে উপবাসী করিয়া যে নীতিনিষ্ঠা আয়ত্ত করিতে হয় হ্যামসুনের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। দেহ-ধর্ম্মকে তিনি বড় স্থান দিয়াছেন, অতি সহজ সৌন্দর্য্য দিয়া তিনি মিলনলিপ্সু নরনারীর আত্মদানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, ভালমন্দর বিচার বিবেক নাই,—পরস্পর পরস্পরকে কামনা করে,—মিলনকে সার্থক করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। অনাবশ্যক নগ্ন-চিত্র অঙ্কিত করিতে তিনি চাহেন না—শুধু দুইটি জীবন পরস্পরকে ভালবাসিয়া—পরস্পরকে লাভ করিয়া যে-আনন্দ যে তৃপ্তি পায়, সেই সৌন্দর্য্যকেই তিনি তাহার কল্পনার তুলিতে উর্দ্ধমুখী ফুলের মতন তুলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি তাহার ভালমন্দর বিচারক নহেন—তৃপ্তহৃদয় দর্শক মাত্র—যিনি মানবের দুর্ব্বলতাকে শ্রদ্ধা করেন এবং যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি নরনারীকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করে, তাহার অলক্ষ্য সৌন্দর্য্যের পূজারী।

* * * *

Panএর নায়ক মর্ম্মর বনের অধিবাসী—শীকার তাহার উপজীবিকা—নারী এবং সুরা তাহার কাম্য। রাত্রির পর রাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া বন-মর্ম্মরে অরণ্যের ভাষা শোনে—নিশীথিনী ধীরে নিঃশব্দ-চরণে আলোকের সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে দেখে—নক্ষত্রের সাথে কথা কয়!—যাহাকে ভালবাসে তাহাকে না পাওয়ার জন্য শয্যা তাহার শয্য-কণ্টক—নিস্তব্ধ বনভূমিকে পরিপূর্ণ করিয়া এবং স্তব্ধ রাত্রিকে স্বপ্নে রাঙাইয়া যদি চঞ্চল লঘুপক্ষ হাল্কা পাখীর মত কোন পরিপূর্ণযৌবনা সুশ্রী তরুণীর সাক্ষাৎ সে লাভ করে, তাহাকে সে অস্বীকার করে না এবং একজনকে ভালবাসে বলিয়া অপরকে ভালবাসিতে না পারার মত সঙ্কীর্ণতাও তাহার হৃদয়ে নাই। Edvardaকে সে ভালবাসে—Eveও তাহার কম কাম্য নয়।

আদিম মানবের রক্ত তার শিরায় শিরায় চঞ্চল—বাঞ্ছিতা নারীকে সে যত ভালবাসে তাহার জন্য ঈর্ষাও তাহার তত প্রবল। Edvarda ডাক্তারের খোঁড়া পায়ের প্রশংসা করিয়াছিল—সে তাহা সহ্য করিতে পারে না—নিজের হাতে সে নিজের পায়ে গুলি মারিয়া খোঁড়া হইতে চাহিয়াছিল।

হ্যামসুনের সহিত রুশীয় লেখকদের সামঞ্জস্য খুব বেশী। অধিকাংশ রুশীয় লেখক মনস্তত্ত্বের যে দিক জোর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন হ্যামসুনও তাহারই পক্ষ-

পাতী বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার জীবন এবং তাহার সাহিত্যের কিছু প্রভাবও তাঁহার লেখায় আমরা পাই, "He is akin to the Russians in psychological analysis of mind of morbid types, but the American influence is prominent in his use of startling metaphors and the aptness of his expressions."

হ্যামসুনের লিখিবার ভঙ্গী এবং ভাষা অতি সহজ, সরল এবং সতেজ। যাহা বলিতে চাই তাহাকে অনাবশ্যক ঘুরাইয়া বলা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের তিনি একনিষ্ঠ পূজারী, মানুষের জীবনের সুখ দুঃখের সহিত আমরা প্রকৃতিকে পট-ভূমিকা হিসাবে কখনও উষার রক্তিম রাগে কখনো সন্ধ্যার শান্ত সৌন্দর্য্যে – কখনও বা নিস্তব্ধ রাত্রির স্তব্ধতা এবং শান্ত সৌন্দর্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। তাহার উপর আছে নরওয়ের তুষার-শুভ্র গিরিমালা—সমুদ্রতীরের কল্লোল—বিহঙ্গের গান এবং হেমন্ত-রাতের কক্ষচ্যুত তারকার হাহাকার! *

* হ্যামসুনের 'Hunger' এবং 'Pan' এই দুইখানি পুস্তক বাংলায় যথাক্রমে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

কবিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা

এক শত টাকা

১। এই পুরস্কারের নাম –"কবিতা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার"।

২। দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে—প্রত্যেকটি ৫০৲ টাকা। লিরিকের জন্য একটি, অপরটি গাথার (Ballad) জন্য।

৩। বর্ত্তমান ১৩৩৭ সালে নিম্নলিখিত সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত মৌলিক রচনা হইতে পুরস্কার-যোগ্য কবিতা নির্ব্বাচিত হইবে।—

সাময়িক পত্রের নাম।—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা, উত্তরা, উপাসনা, নবশক্তি ও বিজলী।

৪। ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই বিভিন্ন কাগজে পুরস্কৃত কবিতা ও তার রচয়িতার নাম প্রকাশিত হইবে।

৫। উপযুক্ত কাব্য-রসিকের হাতে নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইবে।

৬। বিশিষ্ট খ্যাতি-সম্পন্ন কবির কবিতা প্রতিযোগিতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

৭। পুরস্কার-যোগ্য কবিতার অভাবে, পুরস্কার পর বৎসরের জন্য গচ্ছিত থাকিবে।

রবীন্দ্র পরিষদ্ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার—সুবর্ণ পদক। দ্বিতীয় পুরস্কার—রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বই।

বিষয়—

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথ

যে কোন কলেজের ছাত্র ও রিসার্চ্চ ষ্টুডেন্ট এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। প্রবন্ধ-লেখক নিজের নাম, ঠিকানা, কলেজ ও ক্লাস লিখিয়া পাঠাইবেন। খামের উপর "প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা" লিখিয়া দিবেন।

নির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষ লাভ না করিলে পুরস্কার দেওয়া নাও হইতে পারে।

প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন—৩০শে মাঘ, ১৩৩৭।

নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক—রবীন্দ্র পরিষদ্, ষ্টুডেন্টস্ কমন্-রুম্,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত,
১০৪, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

পুস্তক-সমালোচনা

বন্ধনী—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত; প্রকাশক, শ্রীবারিদকান্তি বসু, আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

এই ছোট উপন্যাসখানির গল্পাংশ অত্যন্ত সরস ও সুন্দর করিয়া লেখা। সরোজ বাবুর ভাষা খুব ঝরঝরে—আভরণ বর্জ্জিত বলিয়া পাঠককে মোটেই ক্লান্ত করে না। গল্পটিতে এমন একটি সহজ স্রোত আছে যে একবার পড়িতে সুরু করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ইহা আজকালকার লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে।

পুস্তকের আখ্যানভাগ মোটেই মামুলি নয় দেখিয়া সুখী হইলাম। পুলিশের আক্রমণে একটি বিপ্লবী দল ভাঙিয়া গেল। সেই দলে একটি কঠোরপ্রকৃতি মেয়েও ছিল। মেয়েটি ঘটনাচক্রে সেই দলেরই একটি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে। পরে সমীরণ ও মক্ষি মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত সহরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কাপড়ের দোকান করিয়া দিন চালায়, শ্রান্ত হইলে কখনো কখনো কিপ্‌লিঙের কবিতা পড়ে। ঠিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও ইহাদের একটি সন্তান হয় এবং এক অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত্তে তার নিদ্রিতা স্ত্রী ও পুত্রকে ফেলিয়া সমীরণ হঠাৎ ঘর-দোর ফেলিয়া উধাও হইয়া যায়।

গল্পটি অতি-সংক্ষেপে ইহাই। কিন্তু বেশ মন দিয়া সরস করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া বইটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বিষয়বস্তুনির্ব্বাচনে লেখক সাহস দেখাইয়াছেন সেজন্য তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; এবং অহিংসাই যে ভারতবর্ষের মূলনীতি হওয়া দরকার এ সম্বন্ধে লেখকের লেখায় ইঙ্গিত আছে। বইয়ে অনেকগুলি চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু ঐ স্বল্প আয়তনে তাহারা সকলে সুস্ফুট হইবার অবসর পায় নাই। কিন্তু মক্ষিকে খুবই ভাল লাগিল। মেয়েটি প্রাণবতী। মা-হারা ছেলের মাতৃ-অন্বেষণের তৃষ্ণায় মক্ষির সুপ্ত মাতৃত্ব জাগিল—সুতরাং সতীর্থ সমীরণ মনের ভিতর গিয়া নীড় বাঁধিল।—এই কল্পনায় গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। ইহা ফুটাইবার মধ্যে দক্ষতাও অপূর্ব্ব। তারপর ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্য ইহাদের প্রেম যে সুনিবিড় রসধারার সৃষ্টি করিয়া উভয়ে উভয়কে সম্পূর্ণ করিল—তাহা বর্ণনা-কৌশলে শুধু উপভোগ্য নয়—অনুপম। মক্ষিকে সমীরণ ছাদের উপর ফেলিয়া দিলেও সে সহজেই নীচে নামিয়া পুলিশের সমস্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এড়াইয়া কি করিয়া এত সব কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিয়া রহিল তাহা লেখক চমৎকার ফুটাইয়াছেন। কিন্তু detailsএর অভাবে লেখক যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করিতে মনে জোর আসে না। যে যে দৃশ্যে প্রেমের কথোপকথন আছে লেখক সেই দৃশ্যগুলি ভারি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন—এই সব দৃশ্যবর্ণনায় লেখকের কুশলতা আছে। কিন্তু খুঁটিনাটি জিনিস বা ভঙ্গি বা ঘটনার একটু বাহুল্য থাকিলে দৃশ্যগুলি হয়ত আরো জীবন্ত হইতে পারিত। অনুপস্থিত হরবিলাসকেও আমাদের মন্দ লাগিল না। মানুষকে দেখিবার নতুন একটি ভঙ্গি এই বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। সেই জন্য লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি।

তথাপি গল্পের শেষের দিকটা যেন অনেকটা ফিকে হইয়া পড়িয়াছে। সমীরণ যে কেন তাহার স্ত্রী ও পুত্র বর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল—ইহা একটা সমস্যা।

কিন্তু মনে হয় এই সমস্যাটিকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার সমীরণ ও মল্লিকে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পুরুষ ভাব-প্রবণ হইলেও সে মূলতঃ কর্ম্মপ্রধান, বহির্ম্মুখী আর নারী কর্ম্মপ্রধান শিক্ষা পাইলেও তাহার চিত্ত চিরদিনই শান্তিকামী ও গৃহমুখী। এই জন্যই বোধ হয় কর্ম্মের অবকাশ আসিবা মাত্র বিপ্লবী সমীরণ নিদ্রিতা স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইল। কিন্তু ইহার বর্ণনায় নিমাই-চৈতন্যের গৃহত্যাগের প্রত্যক্ষ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের ভুল হইয়াছে। এই সম্পর্কে সমীরণের আদর্শের সহিত নিমাই-চৈতন্যের আদর্শের পার্থক্য মনে পড়ায় রসবোধে বিশেষ ব্যাঘাতই ঘটে। তার উপর গৃহত্যাগের সময় সমীরণ যখন মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা পুরো **stanza** আবৃত্তি করিতেছে তখন পাঠকের নিকট সে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

তবু বইটি সুলিখিত। এবং সুলিখিত বলিয়াই আমরা উপরের ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ছাপার ভুলও বিশেষ চোখে পড়িল না। বইটি পড়িয়া সকলেই যে খুসি হইবেন ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। বইটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কিশলয়—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক—বসুভূতি রক্ষিত, ১৮১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। আশ্বিন ১৩৩৭। মূল্য বার আনা।

'কিশলয়' কিশোর ও কিশোরী-বন্ধুকে লেখা পথিক-বন্ধুর বারখানি পত্র একশোটি পাতায় গ্রথিত। বইখানি কিশোর-কিশোরীদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। কৈশোরের পূর্ব্বে এমন রসের পত্র হাতে পড়িলে, পাতা ছেঁড়া-ই হইবে—নবীন কিশলয়ের সৌন্দর্য্য নয়ন-মন দিয়া উপলব্ধি করিবার বয়স তখনো হয়ত আসে নাই—তার স্বভাব-মৃদুল মর্ম্মর-ধ্বনি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' নাও পৌছিতে পারে। কিন্তু বাল্য ও পৌগণ্ডকে ছাড়িয়া দিলে জীবনের আর সকল অবস্থায়-ই এমন একখানি বই পরম আদরের। যে বয়সেই ইহা পড়া যাকনা কেন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য কৈশোরে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। কিশোর বয়সে অথবা যৌবনে এরূপ পত্র পাওয়া ত' ভাগ্যের কথা।

প্রচ্ছদ ব্যতীত বইখানির ভিতর চোখে-দেখার ছবি নাই কিন্তু উহার প্রতি পত্র পাঠকের মানস নয়নে যে-সকল চিত্র সিনেমার মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আনে, তার মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। বারটি পত্রের ভিতর সব ক'টি ঋতুর বিভিন্ন রূপ মনে প্রতিভাত হইয়া আমাদের নিজস্ব "বারমাস্যা"গুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রন্থকার কৈশোরের মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এককালে 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্' মানা হইত। বর্ত্তমানে প্রায় সকল রকমের সাহিত্যেই যৌবনের জয়-গান করা হয়, কিন্তু এ-কথা অনেকে ভুলিয়া যান যে, কিশোর-বয়সে যে-সকল ভাব ও কর্ম্ম-ধারার সহিত পরিচয় ঘটে, উত্তরকালে আসন্ন যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য অবধি প্রধানতঃ তাদের-ই কতকগুলি ধারা জীবনে পরিস্ফুট হয়। কৈশোরের সহজ মধুর ভাবকে উপেক্ষা করিলে অনেক সময় ট্রাজেডি'র সৃষ্টি হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দেশবন্ধুর "কিশোর-কিশোরী"র পর "কিশলয়"-এই কৈশোরের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতা জীবনের লক্ষণ, লক্ষ্য নয়; নির্ম্মল আনন্দের উত্তরাধিকারী সকল মানব, এই সব চির-সত্য কথা যেন কিশলয় পত্র-হিল্লোলে বলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

গ্রন্থকার উদীয়মান এবং চিন্তাশীল লেখক। ভাঙনে তাঁর ভয় নাই—কিন্তু একটু বোধ হয় আনন্দ রহিয়াছে। তাই কিশলয়ের দুই-একটি জায়গায় পরম্পরাগত সাধনা বিশ্বাস ও ভাবধারার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যুব-হৃদয়ের আবেগে একটু-আধটু অবিচার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তথাপি সহজ সরল ভাবে প্রাণের কথার ইঙ্গিত দেওয়ায় উহার স্বাভাবিকত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিশলয় কবিতা নয়, কিন্তু কাব্য এর ভিতরে রহিয়াছে, দর্শন নয়, ভুয়োদর্শনের দৃষ্টি ইহাতে আছে; গল্প ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা উপন্যাস নয়, কিন্তু বেশ একটানা পড়িয়া যাওয়া যায়; ঠিক আর্টের বই-ও নয়, তবু শিল্পী এ'তে মাল-মশলা পাইবেন। এক কথায় ইহা পাঠকের বিস্তর খোরাক যোগাইবে। গ্রন্থকার কিন্তু বইখানাকে কোন্ ক্লাসে

ফেলিবেন ঠিক করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বর্গীকরণে এই না-গল্প না-উপন্যাস না-ইতিহাস গ্রন্থটিকে কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইবে, তা নিয়া সরাসর নেতি বলিলেন—'কিশলয় উপদেষ্টা নয়, প্রাণের সহজ স্ফূর্ত্তি সে জাগিয়ে তুলতে চায়।' তা হইলেই ত' চরম আর্ট হইল। গ্রন্থাগারিক এর বহিরাবণ দেখিয়া প্রধানত ইহাকে রাখিবেন পত্র-সাহিত্যে; তার পর আর্টে ত নিশ্চয় ইহার সন্ধান থাকিবে এবং গ্রন্থকার যতই বলুন-না, 'উপদেষ্টা নয়', শিক্ষা বিজ্ঞান বা পেডাগগিক্স্-এ এর স্থান বা সন্ধান থাকা অশোভন হইবে না।

এরূপ গ্রন্থ যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁরও কৃতিত্ব কম নয়। গল্প উপন্যাসপ্লাবিত বাংলা সাহিত্যের বাজারে এই ধরণের পুস্তক ছাড়িয়া দিয়া তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তা' দেখিয়া তাঁর দূরদৃষ্টি ও সহজ ভাবপ্রবণতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বইখানি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। শুদ্ধিপত্রের অতিরিক্ত ছাপার ভুল এক-আধটি থাকিলেও মারাত্মক কিছু নাই। প্রচ্ছদ-পট নিপুণ হাতের শিল্প। এরূপ বই এর উৎসাহী প্রকাশক বাংলায় খুবই কম। মূল্য বার আনা, বেশী নয়।

গুরু-ঠাকুর

চারণ—প্রকাশক—বাগচী এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'চারণ'—কথাকাব্য; শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত; দাম বারো আনা। রাজস্থান-ইতিহাসের অবদান-কল্পলতা হইতে কথা-বস্তু চয়ন করিয়া সুরচিত একখানি কাব্য-পুস্তিকা। অতীতের 'নিবেদনের থালা' হইতে দেশদেবতার অর্ঘ্যাঞ্জলি লইয়াই কবি 'ব্যথার পূজা' করিয়াছেন। 'সম্ভবামি যুগে-যুগে'র অগ্রদূত-ভগীরথও তো এই চারণই; তাই কবির কণ্ঠে আবির্ভূত অদ্যকার এই 'চারণে'র কাব্য-ঝঙ্কার আমরা সাগ্রহে শুনিয়াছি।

'ক্ষুদ্র দান' বলিয়া কবি কুণ্ঠিত হইয়াছেন কেন? আড়ম্বর-শূন্য হইয়া দূর্ব্বা-তুলসী বিল্বদল হাতে করিয়া দাঁড়ানোটাই যে আজিকার দিনের শিক্ষা। সম্মুখপথে চারণের গতি অব্যাহত হউক। এই যুগে এ কাব্যরচনার বিশেষ সার্থকতা আছে।

পিকোচ্ছ্বাসম্—সত্যচরণ সেন ওরফে চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। ৮।১ সি মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

চিরন্তন ভাব-বৈচিত্র্যের সমাবেশে কবি সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কবিতা-কণিকা রচনা করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সারভূত তথ্যগুলিকে বেশ অবলীলাক্রমেই সাজাইয়াছেন। 'বিরল' হয় তো না-ও হইতে পারে, তবে সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ কাব্য মধুর বটে। ধীরপন্থী পাঠকমহলে বইখানির সমাদর হইবেই। তদুপরি, বাংলাতে ও ইংরাজীতে—দুই রকম অনুবাদ ব্যাখ্যা প্রত্যেকটি কবিতার নীচে সংযোগ করিয়া দেওয়াতে এই খণ্ড-কাব্যখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

স্বপ্ন-স্মৃতি

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা]

একদিন আমার জীবনের বহুকালের বন্ধ জানালা খুলিয়া গিয়াছিল। সেই উন্মুক্ত জানালা দিয়া অজস্র শুভ্র জ্যোৎস্নার সাথে মিশিয়া কোথা হইতে কোন্ এক নামহীন পুষ্প-তরুর প্রচুর সলজ্জ সুগন্ধ আসিয়া আমার জীবনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। আমি সেই উন্মুক্ত জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়াছিলাম! জানালার ওপারে সেদিন বসন্ত ঋতু—গাছে গাছে পাতায় পাতায় সবুজের সমারোহ! মধু-সন্ধানী মধু-মক্ষিকার প্রলাপ-গুঞ্জনে অরণ্য পূর্ণ! পাতার আড়ে সেই কাল পাখীটার মধু ভরা ডাক। অরণ্যের পত্র-পল্লবে আনন্দ-গুঞ্জন। বাতাসে বাতাসে শুধু বাঁশীর সুর—স্বর! সে সব এক মনে কান পাতিয়া শুনিয়াছিলাম!

ভাবিয়াছিলাম ঐ জানালাটীকে বন্ধ করিয়া দিয়া, ঐ কালটীকে চিরন্তন করিয়া রাখিব। চিরদিন ঐ জানালাটীর ওপারে অমনি সৌন্দর্য্য, রূপ-রসে প্রোজ্জ্বল থাকিবে ঐ কালটী ফুলে ফুলে পূর্ণ হইয়া রহিবে।

কিন্তু সেদিন তো জানিনাই চিরদিন চিরন্তন হইয়া কিছুই রহে না—কিছুই অপেক্ষা করে না! জানি নাই বুঝি নাই যে পৃথিবীর ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। যে সহজ সরল জ্যোৎস্নালোকিত পথ বহিয়া সেই কালটী উপস্থিত হয়, এক দিন সেই পথ হয় বক্র জটীল—একদিন সেই পথ হয় অমাবস্যার গাঢ় অমায় পূর্ণ! বুঝি নাই সেই পথও মনের আকাশ হইতে মুছিয়া যায়! কিন্তু স্মৃতিটী থাকে—

পাড়াগাঁয়ের ছেলে পড়াশুনায় বিদ্যাসাগর হইতে পারি নাই সত্য—আজও তাই, কিন্তু খেলাধুলায় সব্যসাচী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের কি সামান্য জ্ঞানবোধ ছিল না—থাকিলে কি আমায় তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি দিতেন? কিন্তু আজ বুঝিতেছি, তাঁহার জ্ঞান-বোধ রস-বোধ দুই-ই বিশেষ ছিল! সে দিন স্কুল পলাইয়া দুপুরে বাড়ী আসিলাম! বইগুলি অন্যের অলক্ষ্যে রাখিয়া পথে বাহির হইলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—নির্জ্জন। আকাশে সূর্য্যদেব তখন ঠিক মাঝখানে আসিয়াছেন। পার্শ্বে আমবাগানে আমগাছগুলি সূর্য্যের স্বর্ণালোকে রঙীন। মাঝে মাঝে ঘুঘু-পাখীর ডাক—শালিক পাখীর কিচির মিচির শব্দ মধ্যাহ্নের তপ্ত বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। কি করি ভাবিয়া পাইতেছি না। পালেদের বাগানে ঢুকিয়া কিছু ফুল তুলিব ঠিক করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু হাত দু'খানি স্থির থাকিল না। ইতস্তত ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে—পক্ষীগণকে ব্যস্ত করিয়া—উড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম! হঠাৎ দেখিলাম ঠিক ঘাটের নিকট রাস্তার উপরই একজোড়া কপোত, বসিয়া বসিয়া গলা ফুলাইয়া বকম্ বকম্ করিতেছে! ঢিল কুড়াইয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে দেরী হইল না—ছুড়িয়া দিলাম! কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল! ঢিলটী কপোতজোড়াটীর পাশ দিয়া পুষ্করিণীর ভিতরে পড়িল! একবার উড়ন্ত কপোতজোড়াটীকে দেখিয়া লইয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম! কিন্তু একি? ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া—রাণী!

আমি আসিতেই চোখ মুখ লাল করিয়া রাণী কহিল—হারামজাদা ছোঁড়া আমার লাগে না বুঝি! অশ্রুভারাক্রান্ত দুটী চোখে আমার দিকে তাকাইয়া একখানি পা বাড়াইয়া দিল! দেখিলাম আমারই নিক্ষিপ্ত ঢিলটী আসিয়া রাণীর পায়ে লাগিয়াছে—শুভ্র পাটির এক স্থান ফুলাইয়া লাল করিয়া দিয়া—ঢিলটী সোপানমূলে স্নিগ্ধ শীতল জলে বিশ্রাম-লাভ করিতেছে। আমাকে যন্ত্রণায় ফেলিয়া নিজে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রামলাভ করিতেছে—বেয়াদপ ঢিল—! কিন্তু রাগিয়া আর কি করিব। রাণীকে কহিলাম—আমি—আমি কই, আমি তো মারিনি। আমি আসছি ঐ ওখান দিয়ে—। আমি মারতে যাব কেন?……

রাণী জল হইতে ঢিলটী তুলিয়া লইয়া কহিল—না, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। কে এমন স্কুল কামাই করে' পালিয়ে বেড়ায়! দাঁড়াও তোমার মাকে বলে দিচ্ছি—। সে পায়ের

ব্যথিত স্ফীত স্থানটীর উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে অস্ফুট স্বরে কহিয়া উঠিল—উঃ বাপরে……!

মুস্কিলে পড়িলাম। আস্তে আস্তে কহিলাম—এই যদি তোমার বিশ্বাস হয় আমি মেরেছি—না হয় তুমিও ঐ ঢিল দিয়ে মার। এই বলিয়া নিজের একখানি পা বাড়াইয়া দিলাম। দেখিলাম রাণী ঘড়ায় জল পুরিতেছে—কথা কহিল না! আমি তাহার পায়ের আহত স্থানটীর উপর হাত দিয়া কহিলাম, না হয় জল দিয়ে ডলে' দিচ্ছি—লক্ষীটি আমি মারিনি—মিছিমিছি বলিস্‌নে—। রাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া কহিল—হয়েছে হয়েছে আর যত্ন দেখাতে হবে না—পা ছাড়—

পা ছাড়িয়া কহিলাম—পাটা কিন্তু বেশ—কেমন নরম—যেন পদ্ম ফুলের মত—। ফিক করিয়া হাসিয়া রাণী কহিল, বুড়োধাড়ি পা ছাড়—শেষে কেউ দেখে ফেলবে। হাসিয়া কহিলাম—দেখলেই বা—তা কি? বয়স অল্প হইলে কি হয় —মুখ চোখ রাঙ্গা করিয়া চুল দোলাইতে দোলাইতে রাণী প্রস্থান করিল! আমি পুষ্করিণীর স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে সোপাণশ্রেণীগুলির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ফুল তোলা হইল না—ভুলিয়া গেলাম! মধ্যাহ্নের তন্দ্রাতুর বাতাসে বনভূমির মর্ম্মর-ধ্বনি—নানা জাতীয় পাখীর কাকলী—অস্পষ্ট মৃদুমন্দ মধু-গন্ধ ভাসিয়া আসে! আমি বসিয়া বসিয়া রাণীর রাঙ্গা মুখখানি, অশ্রুভারাক্রান্ত দুটী চোখ ভাবিতে থাকি—আকাশের দিকে চাহিয়া তার কালো এলো চুলের রাশি সন্ধান করি। স্কুল কামাই নিত্য চলিতে লাগিল। একদিন দুপুরে প্রত্যহের মত স্কুল পলাইয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়া ঘুড়িলাটাই লইয়া রাণীদের বাড়ী আসিয়া অতি আস্তে ডাকিলাম—রাণী। সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এক ডাকে সে উপস্থিত! বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়া দাঁড়াইল। ইসারায় হাতছানি দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলাম—আয়। অল্প কিছুক্ষণ পর আসিতেই, কহিলাম—চ' এক মজা দেখাবো। কোন কথা আর না কহিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। পালেদের সেই পুকুর। পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া রাণী কহিল—কই কি মজা দেখাবে—? তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিলাম—এখানে কেন—ওই ধারে। অপর পাড়ে বকুল গাছটী ছিল। তাহার তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম! গাছের এক জায়গায় আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিলাম, পড় দেখি কি লেখা আছে। গাছের গা ছুরি দিয়া কাটিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—রাণী! রাণী লেখাটী পড়িয়া মুখ রাঙ্গা করিয়া কহিল,—আহাঃ আমার নাম লেখা হয়েছে। আমি একখানি হাত ধরিয়া কহিলাম—রাগ গেল—নয়? রাণী কথার উত্তর দিল না। আকাশ নির্ম্মল—চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। আমরা দুইজনে বকুল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিলাম! রাণীর রাঙ্গা মুখখানি—কাল চুলগুলি আমার মুখে আসিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে নির্জ্জন, আমরাও চুপচাপ। বকুল গাছে ফুল ফুটিয়াছে। বকুল ফুলের সুগন্ধে স্থানটী সুরভিত। মধুসন্ধানী মধুমক্ষিকারা গুণ গুণ করিয়া স্থানটীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। ঘুঘু পাখীর ডাক—শালিক চড়ুই পাখীর কিচির মিচির, কাঠঠোকরার ঠক্ ঠক্ সব ভাসিয়া আসিতেছে। আকাশের অল্প উর্দ্ধ দিয়া একটি চিল ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যাইতেছে—চি-ঈ-ই—! আমরা দুইজন সেই বকুল গাছটীর তলায় নরম ঘাসের উপর হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলাম! রাণীর কোমল চুল গুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, তাহার রাঙ্গা মুখখানি ধীরে টানিয়া নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিলাম। একটা আবেশ একটা মধুর মাদকতা ধীরে ধীরে সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতেছিল পৃথিবীর উপর শুধু সবুজ রং—গাছে গাছে—পাতায় পাতায়—পথে ঘাটে—জলে স্থলে—ফলে জলে শুধু সবুজ—সবুজে সবুজে একাকার। আর আকাশের ঐ অপর প্রান্তে অস্তাচলের পারে বসিয়া কে যেন বাঁশী বাজাইতেছে। সে মধু বাঁশীর মধু স্বর আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া পৃথিবীর প্রতি বস্তুতে মাখিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে শুধু বাঁশী—বাঁশী কি বলিতেছে, তা কি বলিব—কি বুঝিব—তবু যেন মনে হইতেছে পাখীর কণ্ঠে—অরণ্যের পত্র-পল্লবের মর্ম্মর-ধ্বনিতে —ফুলের কোমল গায়ে তৃণের শ্যাম অঙ্গে—শুধু বাঁশীর স্বর বাহির হইতেছে। ভাবিলাম এমনি ভাবে চিরদিন চিরকাল বুকে বুকে মুখে মুখে—নিশ্বাসে নিশ্বাস মিলাইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মাঝে বসিয়া থাকি! যদি কোনদিন কোন ঢেউ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া দেয় তবে যেন দুই-

জনে একসাথে ভাসিতে ভাসিতে কোনও মহাসাগরের বক্ষে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাই।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল! স্কুলের তিক্ত সময়ের ওপারে যে এমন মধুর কাল আছে—পূর্ব্বে তা জানিতাম না! এ সময়টুকু বুঝি আমার জন্যই এতদিন সীমাহারা কালসমুদ্রের বক্ষে সযত্নে রক্ষিত ছিল। এমনি করিয়া দুই মাস কাটিয়া গেল। সেটা আশ্বিন মাস। পূজা আসিয়া চলিয়া গেল! সে দিন বিজয়া দশমী! পাড়ার ছেলে মেয়ে একদল মিলিয়া গঙ্গার ধারে ভাসান দেখিতে চলিলাম! ভাসান দেখিবার পর একা একাই বাড়ী ফিরিতেছি! দলের অন্যান্য সকলে তখনও মেলা দেখিতেছে। রাস্তার মাঝে দেখি রাণী তাহার ভাইটীর সহিত চলিতেছে। পিছন হইতে আসিয়া রাণীর চোখ চাপিয়া ধরিলাম। রাণী চমকাইয়া কহিল—বারে, কে, চোখ ছাড়। চোখ ছাড়িয়া দিলাম।

—বারে, ভয় দেখাতে হয় এমনি করে—? রাণীর ভাই আগে আগে বীরের মত চলিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল—চাঁদ উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত! দূরে সানাই বাজিতেছে—। বনের মধ্যে বোধ হয় কোন ফুল ফুটিয়াছে—তাহারই সুগন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে! রাণীর কোমল একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া দলিতে লাগিলাম! আস্তে আস্তে তাহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলাম। সে আমার হাতখানি টানিয়া লইয়া মুখে চাপিয়া ধরিল! কেমন যেন হইয়া গেলাম! বুক যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে · শরীর যেন মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে! হাতে মুখে অল্প অল্প ঘাম।

পথের বাঁকে রাণীর ভাই অদৃশ্য হইয়াছে। পিছনেও কেহ নাই! রাণী কহিল—ওঃ তোমায় প্রণাম করি অশোকদা—প্রণাম তো করতেই হবে—! রাণী হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া কহিলাম—রাণী আমায় তুমি ভালবাস? চলিতে চলিতে সে থামিল! একবার এধার ওধারে তাকাইয়া কহিল—বাসি। আর কোন কথা বলিবার অবসর দিলাম না। তাহাকে কোলের নিকট টানিয়া লইয়া তাহার লাল ঠোঁট—গোলাপী দু'খানি গালে—চুমায় চুমায় ভরিয়া দিলাম! আকাশে অযুত তারা—বাতাসে নামহীন পুষ্পের সুগন্ধ—চতুর্দ্দিক পূর্ণ—আমাদের হৃদয়ও সীমাহীন আনন্দ-সাগরে ভাসমান—কোথাও একবিন্দু ফাঁক নাই। চতুর্দ্দিকের অগাধ আনন্দ-সাগরের মাঝে আমরা ডুবিয়া গেলাম। রাণী মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল—দুটী চাহনি এক হইয়া গেল।

শীত পড়িতেই আমার মামা আমায় কলিকাতা লইয়া গেলেন! রাণী কাঁদিয়াছিল কিনা জানি না। কলিকাতায় মামার সহিত মেসের ক্ষুদ্র কক্ষে তক্তাপোষের উপর শুইয়া বিজয়া দশমীর রাত্রির কথাটাই ভাবিতাম! ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম! স্বপ্ন দেখিতাম, দুই জনে পুকুরপাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া কালো কালো মেঘ আসিয়া সমস্ত আকাশকে ঢাকিয়া ফেলিল! গাছপালা স্তব্ধ হইয়া কিসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল! তারপর কোথা হইতে হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া গাছে গাছে লতায় পাতায় প্রচণ্ড তাণ্ডবনাচন নাচাইয়া বহিতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে শুকনো পাতা উড়িতেছে—পড়িতেছে—বকুল গাছ, আম, পেয়ারা, নারিকেল সব একযোগে হেলিতেছে দুলিতেছে। আকাশে থাকিয়া থাকিয়া শব্দ হইতেছে গুড়—গুড়—গুড়ুম! রাণী যেন আঁচলটী খুলিয়া পিছনের দিকে দুইটী খুঁট ধরিয়া বাতাসে কাপড় মেলিয়া ছুটিতে লাগিল! কালো মেঘের মত তাহার এক রাশ কালো এলো চুল—বাতাসে উড়িতে লাগিল! চারিদিকে বাতাসে পাতা উড়িতেছে—আকাশ মেঘে মেঘময়! হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, দেখি অন্ধকার ঘর! ব্যাথায় বেদনায় বুক টন্ টন্ করিতে থাকে। বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া মনে মনে ডাকি—রাণী—! প্রায় ছয় মাস পর গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিলাম! নিজের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কাপড় চোপড় জুতা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! এই কয় মাসের মধ্যেই রাণী যেন একটু গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে! নির্জ্জনে দেখা হইল! কহিলাম—ভাল আছ তো? মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, হুঁ। আর কোন কথা হইল না! ছুটি ফুরাইয়া গেল! কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম! রাণী কহিয়াছিল—আমাকেই ভালবাসে—আর স্বামী বলিয়া আমাকেই

জানে। চাঁদ কি আকাশে থাকে? চাঁদ সেইদিন হাতে পাইয়াছিলাম।

একগাছি মালা গাঁথিয়া তুলিতেছিলাম—সে মালার প্রতি পুষ্পটী পূর্ণ বিকশিত—রূপে রসে গন্ধে সম্পূর্ণ! একটি সিংহাসন প্রস্তুত করিতেছিলাম—রত্নখচিত বহুমূল্য নানা রত্নে ভূষিত—প্রত্যেকটী রত্ন উজ্জ্বল চমকপ্রদ। নিশীথ রাত্রে তারা-ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতাম—ঐ রত্নখচিত সিংহাসনে প্রিয়া যেন বসিয়া রহিয়াছে! তাহার গলে আমার হাতের তৈয়ারী পুষ্পমালা দুলিতেছে। চন্দ্রিকাধৃজসম পদযুগলের নিম্নে আমি যেন দুটী হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেছি—দেবি! আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে—যুঁই বেল গন্ধরাজ সিংহাসনের চারি পাশে ছড়ান রহিয়াছে। তাহারই মৃদু সুমিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গাছের আড়ালে পাখী ডাকিতেছে, কু-উ-কু! সিংহাসন হইতে দেবী যেন নামিয়া আসিলেন! নূপুর বাজিল। তারপর স্বহস্তে তিনি যেন নিজের গলার মালাটী খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। আমার কানে তাঁর রক্তাধর স্পর্শ করাইয়া কহিলেন—দেবী কেন, বল রাণী। আমি কহিলাম, রাণি রাণি।

নিশীথে দিবসে স্বপ্নের সাথে দোল খাইতে খাইতে সময় কাটে। বন্যায় দেশের সকল কূল বিলুপ্ত করিয়া দিয়া স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেশ-জননীর দারুণ দুঃখে স্থির থাকিতে না পারিয়া—সে বন্যার উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম! কূল কোথায়—সীমাহীন অসীম সে বন্যা। ভাসিতে ভাসিতে যেখানে ঠেকিলাম—দেখি একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে আমি আবদ্ধ, সম্মুখে লৌহ-দরজা। সেই বিরাট কুদর্শন লৌহ-দরজার ওপারে বিশ্ব আছে কিনা তাই ভাবিতে লাগিলাম! হিন্দুস্থানী পুলিশ ভাই হিন্দী ভাষায় আমায় কহিল—খোঁকা বাবু আরে আভি তো এক মাস হুয়া, আউর চার বরষ হেঁ পর রহে না হোগা—মাৎ কাঁদ না। হিন্দী হইল না নিশ্চয়ই। পুলিশ ভাইয়ের সে হিন্দী ভাষা আমার মনে নাই! তবে ভাবার্থ এই—এখানে চার বৎসর থাকিতে হইবে, যেন আমি কাঁদি না। কলঙ্কের কথা। বীররসে হৃদয় তখন পরিপূর্ণ—কাঁদিব কেন? হয়তো বা কখনও চোখ দিয়া দু এক ফোঁটা জল পড়িয়াছিল—কিন্তু তাহাকে কি কাঁদা বলে!

ভাবিতাম জীবনের কল্লোলিত ধারা বহিয়া যাইতেছে। কবে কিরূপে সে ধারা কোথায় পৌঁছাইবে! মনে মনে প্রার্থনা করিতাম সে ধারা কোথায় যাইবে অনুমান করা শক্ত! কিন্তু যেখানেই যাউক, সেই ধারার সহিত রাণী যেন ভাসিয়া যায়। দুই জনে ভাসিতে ভাসিতে যেন এক হইয়া এক জায়গায় পৌঁছাই। এ কথা কাহাকেও কখনও বলি নাই। কিন্তু যাঁহার অগোচর কিছুই রহে না—তিনিই অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার অন্তর বাহির সবই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন!

কারাকক্ষের ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আসিয়া চলিয়া গেল। বর্ষা-রাতের বাদল-ছন্দে কাহাকে যেন মনে পড়ে। সুখে দুঃখে চার বৎসর সীমাহারা সময়-সাগরের বক্ষে বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল। একদিন জেল হইতে মুক্তি পাইলাম। বাহিরের বিশ্ব সেদিন এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত সৌন্দর্য্য লইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ধরা দিল! এক নিমিষে মনে হইল আমার গঙ্গাতীরবর্ত্তী জননী জন্মভূমি—সেখানে জলের উপর সকাল সন্ধ্যায় আলো আঁধারের লুকোচুরি—দিগন্তপ্রসারিত নীলাকাশে সূর্য্য-চন্দ্র অযুত নক্ষত্র—সেখানে গাছ পালা মাঠ বাগান—সেখানে ঘুঘু পাখীর ডাক, শালিক পাখীর কিচির-মিচির—কোকিলের কুহু—মৌমাছিদের প্রলাপ গুঞ্জন!

আর গৃহে আমার অভাগিনী জননী—। একদণ্ড মন টিঁকিল না—গাঁয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম!

গ্রামে যখন পৌঁছাইলাম—তখন ভোর। সূর্য্যদেব লাল হইয়া উঠিতেছেন! ঝির্‌ঝিরে ভোরের বাতাস বহিতেছে—বনের ভিতর হইতে বাতাবিলেবু গাছের ফুটন্ত ফুলের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে! নিজের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! মা বলিয়া ডাকিলাম—কিন্তু বন্ধ দুয়ার খুলিল না। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—মা কোথায়? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া রাস্তায় নামিতেই দেখি বাঁড়ুয্যে মশায়—মা কই!

—কে রে, অশোক—আহাঃ বুড়ি তো মরণকালে খালি অশোক অশোক করেই মরেছে। সর্ব্ব শরীর কাঠ হইয়া গেল! কহিলাম—মা নাই! বাঁড়ুয্যে মশায় সান্ত্বনার সুরে কহিলেন—চিরদিন কি মা থাকে কারুর?

—চিরদিন যা থাকেনা ?

হাঁ, তাই। অশ্রুতে চক্ষু, বাষ্পে কণ্ঠনালী ভরিয়া উঠিল।—উঠিল, তাই কি ?

সেখানে একদণ্ডও থাকিতে মন সরিল না। কিন্তু যাইব কোথায় ? হাঁ মনে পড়িল, কহিলাম—বাঁড়ুয্যে মশায়, রাণী কোথায় ?

—তাও জানো না—তা জানবে কোথা থেকে! আহা বুড়ার বড় ইচ্ছা ছিল দু'টী হাত এক ক'রতে। কপাল সব—রাণীর শ্বশুর বাড়ী ঐ শিমুলতলা—শিমুলতলা জমিদার বাড়ী—জামাই বটে। যেন রাজপুত্তুর—এম-এ পাশ করেছে! পয়সার হৈ হৈ নেই। মেয়েটা সুখে থাক—রূপে গুণে রাণী ছিল—রাজরাণীই হয়েছে !

আমার বুকের আশা একেবারে নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হইয়া ডুবিয়া গেল! অন্তরে যে চমকপ্রদ রত্নখচিত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলাম - যে মালা পূর্ণ বিকশিত শতদল দিয়া অতি যত্নে একটীর পর একটি গাঁথিয়া তুলিয়াছিলাম—সব এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া শুকাইয়া গেল।

তা হোক্ তবুও ঐ শিমুলতলা যাইব। তাহাকে একটীবার দেখিয়া চলিয়া যাইব। হাঁটিতে সুরু করিলাম! শিমুলতলা—নাম শুনিয়াছি। একজনকে শুধাইয়া জানিলাম—ঠিক চার ক্রোশ। তা হোক্—চার ক্রোশ যেন ফুরাইতে চাহে না! মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিলাম! গত রাত্রের অনিদ্রায় সর্ব্বদেহ মন ক্লান্ত! পিপাসায় বুক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! পথের পার্শ্বে একজনের বাড়ী হইতে জল খাইয়া কহিলাম—বাপু ব'লতে পার, শিমুলতলা কত দুর ?

—শিমুলতলা—আর হদ্দ জোর ক্রোশ খানেক !

তাই হইবে! দূর হইতে জমিদারবাড়ীর গগনচুম্বী শ্বেত অট্টালিকার কিয়দংশ নজরে পড়িল! অতর্কিতে মনে হইল ঐ প্রাসাদে আমার প্রিয়া বন্দিনী—হাঁ বন্দিনীই তো—তার বহুমূল্য সাড়ীসেমিজ নানা রত্নালঙ্কারের মাঝে যে নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ অহরহ ধ্বনিত হইতেছে—তা কে শুনিতেছে! তার পরাহত রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ড ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্রণায় স্পন্দিত হইতেছে—তাই বা কে দেখিতেছে! আমি সব শুনিতে পাইতেছি, সে যেন অহর্নিশ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছে, ওগো রক্ষা কর, বাঁচাও।

জমিদারবাড়ী যখন পৌঁছাইলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে। দ্বিতলের কাছারী-বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। আর কেহ নাই শুধু একজন গোমস্তা খাতাপত্র লিখিতেছে। আমি ফরাসের উপর বসিলাম! গোমস্তা মশায় তাঁর চশমার ভিতর দিয়া আমার আপাদমস্তক দেখিয়া নিয়া কহিলেন—আপনার বাড়ী—কি দরকার? কহিলাম—দরকার—এই আমার বাড়ী হৃদয়পুর—এই—ইয়ে—রাণী—আমাদের দেশের—তাই দেখা,—। নামও কহিলাম।

—ওঃ—ওরে কে আছিস—। হাঁকিতেই ছোকরা চাকর উপস্থিত!

গোমস্তাবাবু কহিলেন—যা বল্‌গে—নূতন মাকে—যে হৃদয়পুর থেকে—অশোক বাবু এসেছেন—। সংবাদ চলিয়া গেল—পুনরায় সংবাদ আসিতেও দেরী হইল না! ছোক্‌রা চাকরটী ফিরিয়া আসিয়া কহিল—এখন তাঁর সময় নেই—ব'ললেন—যদি কোন দরকার থাকে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—

কহিলাম—নাম বলেছিলে বাপু—? সে কহিল—হাঁ—ব'ললাম অশোক বাবু এসেছেন! তা ঐ এক কথাই ব'ললেন।

—উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া নিষ্পলক চক্ষে সম্মুখে চাহিলাম! একবার গত দিনের পরিপূর্ণ মধুরতার মাঝে ডুবিয়া গেলাম! কিন্তু পরক্ষণেই, এক অব্যক্ত বেদনায় বক্ষ যেন রক্তাক্ত হইয়া উঠিল! রত্নখচিত সিংহাসন এক মুহূর্ত্তে ইন্দ্রজালের মত সহসা অন্ধকারের গভীর গহ্বরে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

জীবনের কল্লোলিত ধারা নিরুদ্ধ—হাসি গান রূপ রস মহা সমারোহে পুষ্পিত মালঞ্চের মত অন্তরের দ্বারে সাজিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু মরুভূমির অগ্নি-নিশ্বাসে সমস্ত শুকাইয়া গেল—রহিল ভস্মাবৃত মহা শ্মশান!

বহু কালের বন্ধ জানালাটি এতদিন পর খুলিলাম—দেখিলাম আমার জানালার ওপারে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি নাই—সে রাত্রির উপর গাঢ় অন্ধকারের প্রলেপ। নামহীন কল্পতরুর সলজ্জ সুগন্ধ—দূর অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি কিছুই নাই। কিন্তু সেই পুরাতন কালের যে স্বপ্ন-স্মৃতিটী সেখানে ছিল আজ তা বিলীন হইয়া গেল।

জীবন-বীমায় মৃত্যু-হার

[শ্রীযোগেশ দত্ত চৌধুরী]

মানুষ সমস্ত জীবন বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ম্যাদে জীবন বীমা করিয়া থাকে। বীমা চুক্তির ম্যাদ অন্তে বা ম্যাদ মধ্যে বীমাকারী মরিলে কোম্পানীর বার্ষিক চাঁদা—(premium) পাওয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং বীমাকারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওয়ারীশ চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা পাওয়ার অধিকারী হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপ বীমার চুক্তিতে কোন্ বয়সে কত টাকা বার্ষিক চাঁদা দাবী করা হইবে—তাহা নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যেক বয়সের বীমাকারীদের কি হারে মৃত্যু হইয়া আসিতেছে—তাহা জানা দরকার। যতদিন পর্য্যন্ত এই অভিজ্ঞতালব্ধ এবং নিরাপদে গ্রহণযোগ্য মৃত্যুর হার জানিবার পথ ছিল না ততদিন প্রত্যেক কোম্পানীকে ভয়ে ভয়ে বেশী হারে বার্ষিক চাঁদা দাবী করিতে হইত। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে অধিকাংশ কোম্পানী আজও যে হারে বার্ষিক চাঁদা দাবী করিতেছে—তাহা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী এবং বীমাকারীর স্বার্থবিরোধী।

আজ বীমা-ব্যবসায় এমন একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে—ইচ্ছা করিলে পরিচালন-খরচ বাদে প্রত্যেক বয়সের লোকের কোন্ চুক্তির পিছনে কত টাকা নির্দ্দিষ্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে রক্ষা করিয়া গেলে নিরূপিত মৃত্যুহার স্বীকার করিয়া তাহাদের ওয়ারীশকে চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা দেওয়ার পরও অবশিষ্ট লোকের চুক্তি মিটাইবার মত টাকা ম্যাদ অন্তে তহবীলে জমা হইবে—তাহার একটা নিরাপদে নির্ভরযোগ্য হিসাব করা যায়। এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ মৃত্যুর হার স্বীকার করিয়া প্রত্যেক চুক্তির পিছনে হিসাবমত যত টাকা উচিত তাহা নিয়মিত ভাবে থাকিয়া যাইতেছে কিনা এ বিষয়ে অনধিক ৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া হিসাব করার মত ব্যবস্থা বর্ত্তমান জীবন-বীমা-আইন অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানীরই করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ (Aotuary) দ্বারা এই প্রকার হিসাব-নিকাশ করার নাম ভ্যালুয়েশন (valuation) বা বীমা-চুক্তিগুলির সাময়িক মূল্য নির্দ্ধারণ।

ভবিষ্যতে প্রত্যেক বয়সের একটা নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুহার এবং একটা নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ চক্রবৃদ্ধি-সুদ কল্পনা করিয়া সেই সিদ্ধান্তের উপর সাধারণতঃ ভ্যালুয়েশনের গণনা চলিতে থাকে। স্বভাবতঃ বীমাকারীদের ভিতর যে হারে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইতেছে ভ্যালুয়েশনে তার চেয়ে কম হার ধরিলে কোনও কোম্পানী স্বচ্ছল প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রকৃত পক্ষে স্বচ্ছল বলিয়া ধরিয়া লওয়া খুব নিরাপদ নহে। সেই প্রকার ভবিষ্যতে যে সুদ অর্জ্জন করা হইবে, তার চেয়ে বেশী সুদ অর্জ্জনের কল্পনা করিয়া ভ্যালুয়েশন করিলে—বর্ত্তমান বীমা-তহবীল সমস্তগুলি বীমাচুক্তির পিছনে যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কোম্পানী অচল হওয়ার সম্ভাবনা। জনসাধারণ দূরের কথা অধিকাংশ বীমার দালাল এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার জন্য শুধু ভ্যালুয়েশনের বড় বড়

উদ্বৃত্ত টাকা (surplus) এবং তদ্বারা ঘোষণাকৃত বার্ষিক বোনাসের (bonus) পরিমাণ দেখিয়াই সাধারণতঃ নিজেদের কোম্পানী-নির্ব্বাচন-কার্য্য শেষ করিয়া বসেন ।—ফলে বাজারে ছলে বলে কৌশলে কেবল মাত্র বোনাসের প্রপাগেণ্ডাই চলিতেছে ; যে ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস্ নির্ভর করে তাহার মাপকাঠির প্রতি কেহই লক্ষ্য করে না, কিম্বা প্রিমিয়ামের কম বেশীর উপর বোনাস্ সৃষ্টি কতটা নির্ভর করে তাহাও কাহারও দেখার ততটা খেয়াল হয় না।

কোম্পানীর তহবীলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা থাকাঅবস্থায় ভ্যালুয়েশন আরম্ভ হয়। যিনি ভ্যালুয়েশন করেন তিনি পান কতকগুলি পলিসিতে বীমাকারীর বয়স, বীমা-সর্ত্ত এবং প্রত্যেকটী চুক্তির তারিখ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় হয়—ঐ চুক্তিগুলির পিছনে হিসাবমত কত টাকা থাকা দরকার। কিন্তু এই যে টাকার অঙ্কটা হিসাব করিয়া বাহির করা হইবে—উহার পরিমাণ নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণ হিসাবের দুইটী মাপকাঠির উপর। এই মাপকাঠি হইতেছে—১। কোম্পানীর বীমাকারীদের ভিতর কি হারে মৃত্যু ঘটিতেছে তাহা অনুমান করা, এবং ২। কোম্পানীর বীমা তহবীল কোনও প্রকারে নষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ দাদনের ভিতর দিয়াও নিশ্চিত কম পক্ষে কত হারে সুদ অর্জ্জন করা হইবে তাহাও অনুমান করা। এই দুইটী অনুমানকেই স্থির সিদ্ধান্ত বা মাপকাঠি মানিয়া লইয়া তার উপর হিসাব চলিতে থাকে। কোম্পানীর স্বচ্ছলতা বিবেচনা করিতে গিয়া প্রথমই বিচার করা দরকার এই দুইটা মাপকাঠির কোনও গলদ আছে কিনা। ভ্যালুয়েশনের সময় উদ্বৃত্ত টাকা (surplus) কমই দেখান বা বেশীই দেখান হউক তাহাতে বীমা-তহবীল ঠিক সমানই থাকে। কারণ উহা কোনও সিদ্ধান্ত মানিতে প্রস্তুত নহে। যেহেতু উহা থাকে কোম্পানীর সিন্ধুকে—নগদ বা দাদন-পত্রের দলিল ভাবে অর্থাৎ সোজা গণনার বিষয়ীভূত জিনিষ রূপে।

ভ্যালুয়েশনের দশ রকম দুর্ব্বলতার কারণ এবং সমস্ত মাপকাঠি আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া কেবলমাত্র মৃত্যুহার বিষয়ে যাহা সাধারণভাবে জানা দরকার তাহাই প্রকাশ করিব। বীমাকারীর মৃত্যুহার প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক বয়সের লোকের পক্ষে সমান নহে। বহু দিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে জীবনবীমার প্রচলন আছে। সেখানে প্রত্যেক বয়সের বীমাকারীদিগকে পৃথক পৃথক ধরিয়া তাদের মৃত্যুর একটা গড় বাহির করার চেষ্টা একাধিকবার হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক বারের গণনার ফল কতকটা এক রকম হওয়ায়—তদ্দ্বারা নিরাপদে নির্ভর যোগ্য মৃত্যুর চার্ট পাওয়া গিয়াছে

গত ১৯১২ সনে "ভারতীয় বীমা আইন" (Life Insurance Companies Act of 1912) পাশ হওয়ার পর হইতে অনধিক পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া ভ্যালুয়েশন করিতে হয়।—ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যু বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির কোনও অভিজ্ঞতালব্ধ চার্ট না থাকিলেও কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বীমা ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ একচুয়ারীগণ ভারতীয় বীমাকারিগণের মৃত্যু বিষয়ে অনুসন্ধানের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় বীমা-কোম্পানী সমূহের ভ্যালুয়েশনের সময় গ্রহণ করা হইয়া আসিতেছিল।—ঐ সময়ে দেখা যায়—প্রত্যেক বয়সের ভারতীয় বীমাকারিগণের মৃত্যুহার তাহাদের চেয়ে ৬।৭ বৎসর বেশী বয়স্ক ইংরেজ বীমাকারিদের মৃত্যু হারের অনুরূপ। কাজেই তাহাদের মতে আমাদের দেশের বীমাকারিদের বয়সের সঙ্গে ৬।৭ বৎসর যোগ করিয়া এই নূতন বয়সকেই খাঁটী বয়স মনে করিয়া ইংরেজদের দেশে বীমাকারিদের মৃত্যু বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুহার ভ্যালুয়েশনের সময় গ্রহণ করা চলে। এই ৬।৭ বৎসর প্রত্যেক বয়সের সঙ্গে যোগ করাকে বীমার ভাষায়—ইংরাজীতে "6 or 7 years rating up" করা বলে।

উপরের সিদ্ধান্তই আমাদের একমাত্র ভরসার জিনিষ নহে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির মৃত্যুবিষয়ক অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যুর চার্ট বাহির করিয়া লইতে পারি। আমাদের দেশে ৩০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ৫।৬টী পুরাতন ও সুদৃঢ় জীবন-বীমা কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে বোম্বে সহরে তিনটী যথাক্রমে ১৮৭১, ১৮৭৪ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা দেশে একটী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এবং পাঞ্জাবে একটী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইঁহারা সমবেতভাবে তাহাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর চার্ট বাহির করিয়া লইলে তাহাকেই ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যুহার বিষয়ক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য চার্ট ভাবে গ্রহণ করা চলে। ভারত গবর্ণমেণ্টের বীমা বিভাগ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কোম্পানীকে রক্ষার চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট

একচুয়ারী সময় ও সুযোগ হইলে বিদেশী কোম্পানীর সহায়তা করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ভারতীয় অর্থে পুষ্ট কর্ম্মচারীর বার্ষিক রিপোর্ট এবার যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা এবারের "ব্লু বুক" (Blue Book) খানাকে—বিদেশী কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকা ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিবেন না।—যাক্ ইহা পরাধীন জাতীর দুর্ভাগ্য।

সুখের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কোম্পানী নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুহার বাহির করিয়া লইতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল এবং কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজ একচুয়ারীগণের অনুসন্ধানের ফল একই রূপ দাঁড়াইয়াছে। কাজেই প্রকৃত বয়সের সঙ্গে ৬।৭ বৎসর যোগ করার পর ইংরেজ বীমাকারীদের মৃত্যু-চার্ট ভ্যালুয়েশনের সময় ব্যবহার করিলে—তদ্দ্বারা ভারতীয় বীমাকারিদের সঠিক মৃত্যুহারই ধরা হইবে। উভয় পরীক্ষার ফলে—British Table of Mortality Om or Hm. With 6 or 7 years rating up—দ্বারা যে প্রকৃত ভারতীয় বীমাকারীর মৃত্যুহার পাওয়া যায়—ইহার বিরুদ্ধে আর তর্ক চলে না।

এখন দেখা যাক্—ভারতীয় কোম্পানীগুলির ভিতর কেহ ভ্যালুয়েশনের সময় ঐ সিদ্ধান্ত অবহেলা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মৃত্যুচার্ট ব্যবহার করিয়াছে কিনা এবং ভারত গবর্ণমেন্টের একচুয়ারী এই দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীগুলির অনুকূলে ভ্যালুয়েশনের মিথ্যা মাপকাঠি—বার্ষিক গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টের ভিতর প্রচার করিয়াছেন কিনা। এই হিসাবে বাংলা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় দুইটী কোম্পানীকেই এই দিক দিয়া অপরাপর কোম্পানী অপেক্ষা দুর্ব্বল মৃত্যুর চার্ট ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। উঁহারা ১৯০৬ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এবং বেশ বড় কোম্পানী বলিয়াই বাজারে পরিচিত। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর স্বতন্ত্র চার্ট দেশের সম্মুখে ধরিতে না পারেন ততদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য কোম্পানীগুলির মত পূর্ব্বের দুইটী অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় বীমাকারিদের যে মৃত্যুহার স্বীকৃত হইয়াছে তার চেয়ে কম মৃত্যুহার ধরিয়া দুর্ব্বল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের স্বচ্ছলতার পরীক্ষা না দিলেই ভাল হইত। যাক্ তাঁহারা এবিষয়ে মিথ্যা প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। বরং ভারত গবর্ণমেণ্টের একচুয়ারী সাহেব (Actuary to the Govt of India) তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টের ভিতর দিয়া সে কাজটা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

উপরের লিখিত কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনও বিষয় প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু জীবন-বীমায় মৃত্যুহার বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া সর্ব্বত্র প্রকৃত মৃত্যুহার বিষয়ক সিদ্ধান্ত পালন করা হইতেছে কি না তাহাই মাত্র পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি গবর্ণমেণ্ট একচুয়ারী সাহেবের সঙ্গে—কি পত্র ব্যবহার করিয়াছি এবং কি উত্তর পাইয়াছি বা প্রত্যুত্তর দিয়াছি তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করাও সঙ্গত বোধ করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে—তিনি গত রিপোর্টে প্রত্যেক কোম্পানীর পক্ষেই কেবলমাত্র শেষ একটি ভ্যালুয়েশনের বিবরণ রক্ষা করিয়া অপর গুলির বিবরণ এবার বাদ দেওয়ায়—একটি কোম্পানীর গত ১৯২১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ভ্যালুয়েশন বিষয়ে এই লম্বা সময়ের পর কোনও সংশোধন প্রয়োজন হয় নাই—যেহেতু গত রিপোর্টে মাত্র ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ভ্যালুয়েশন বিষয়ক বিবরণই স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর কোম্পানীর ১৯২৭ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখের ভ্যালুয়েশন বিষয়ে বাধ্য হইয়াই এবার তাঁহার পূর্ব্ব রিপোর্ট সংশোধন করিতে হইয়াছে।—যাঁহারা বীমা-বিষয়ে বিশেষ সংবাদ রাখেন তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। বিরুদ্ধ-সমালোচনা দ্বারা ভারতীয় কোম্পানীর বিপক্ষে কিছু প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।—ভারতীয় কোম্পানীসমূহের পরিচালকদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে শুধু বোনাস্ বৃদ্ধির জন্য উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা যেন কোম্পানীকে দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করেন। কোম্পানীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বোনাস্ যদি দুই টাকা কম হয় বা আদৌ না হয় তাহাতেই বা আপত্তি কি? বোনাসের ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করিয়াও যদি শক্তির দিক দিয়া পিছাইয়া যাইতে হয় তবে—অন্যায় প্রতিযোগিতার লোভ ত্যাগ করিয়া—কাজ কমই হউক আর বেশীই হউক—শক্তির দিক দিয়া কোম্পানীগুলিকে প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে। মৃত্যুবিষয়ক চার্ট ব্যবহারের সামান্য তারতম্য দ্বারা কোম্পানীর খুব গুরুতর ক্ষতি যদিও না হয় তবু উহাদ্বারা পরিচালকশক্তির একটা বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা বাস্তবিক ভয়ের জিনিষ।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়
মাঘ, ১৩৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"পৃথিবীর বিপ্লব-ইতিহাসে ভারতবর্ষ এক অভিনব রীতি আনয়ন করিয়াছে ; সে রীতির সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ঐক্য আছে এবং যদি ইহার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা হইলে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইহা আমাদের সত্যকার অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

২৩শ বর্ষ মাঘ, ১৩৩৭ ১০ম সংখ্যা

পরম বাণী

গভীর তিমির অনাদিকালের অন্তরে
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা,
কালের তমিস্র ভেদি',
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি';
পথে পথে রচি আলিম্পনের লেখা।
আঁধার কাঁপায়ে গগনে গগনে
উচ্ছলি উঠি দিক্-প্রাঙ্গণে
বহ্নিচক্ররেখা।

আত্মার গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ আঁধারে
শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি',
মহাদুঃখের মহানন্দের
সংঘাত লাগি' চিরদ্বারের
চিৎপথের আবরণ গেল টুটি'।
মর্ত্যলোকে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা।
প্রথম পরম বাণী,
দিল হাতে বীণাপাণি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য-পরিমিতি

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

সূত্র

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংসার-রূপ বৃক্ষে দুইটী মাত্র অমৃত ফলের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—একটী কাব্যরস, অপরটী সাধুসঙ্গ। জীবনে আমরা নানা ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি সত্য, কিন্তু তাহার কোনটীকেই জোর করিয়া অমৃত ফল বলা যায় না। সাধুসঙ্গ এ যুগে একান্ত দুর্ল্লভ। এখন যাঁহারা অমৃত-ফলের আস্বাদ লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কাব্যরসই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু দেখা যায় এই কাব্যরস-রূপ অমৃতফলাকাঙ্খীদের মধ্যে নানা মতভেদ, বৈষম্য, এমন কি—বিসম্বাদ। এই মত-ভেদের কাব্যাতিরিক্ত ব্যক্তিগত কারণগুলি ছাড়িয়া দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে রস আস্বাদন অনেকেই করিয়াছেন, তাহার পথও অনেকের পরিচিত। তৎসত্ত্বেও এত মতভেদ দেখিয়া, এই বিচিত্র কাব্যরসের উৎস, ধারা ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিবার বাসনা মনে জাগিয়া উঠে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসের স্থান অতি উচ্চে,—তাহা না-কি ব্রহ্মাস্বাদ-সোদর। কিন্তু এ রস থাকে কোথায়? কবিচিত্তে, না কাব্যে, না পাঠকচিত্তে; অথবা কাব্যের ভিতর দিয়া কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার যে মিলন তাহারই নাম রস? কোন্ কাব্যে কি পরিমাণে রস আছে তাহার শেষ মীমাংসা যে আজও হইল-না, তাহার কারণ কি এই নয় যে—এ প্রশ্নের মূলে ভুল আছে? কাব্য ও রস হয়ত আধার আধেয় সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

এ সমস্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়া রসের স্বরূপ বোঝান ঠিক সম্ভবপর মনে হয় না। কারণ রস অনুভূতির বিষয়। কাব্য বুঝা যায় ও অনেকাংশে বুঝান যায়, কিন্তু রস অনুভব করিতে হয়। রস কেন বুঝা যায় না, এই আলোচনাই বোধ হয় রসের আলোচনা।

কাব্য কি বস্তু এবং রস কেন বুঝা যায় না, ইহার আলোচনা করিতে গিয়া দেখা যায়, যে এই ব্যাপারে দুইটী পৃথক ধারা কাজ করিতেছে।

প্রথমটী—কবিচিত্তধারা, যাহা কাব্য সৃষ্টি করে।

অপরটী—পাঠকচিত্তধারা, যাহা কাব্য উপভোগ করে। এই দুইটী ধারার পথে রসের হ্রদ কোথায়? কোন্ গহনের অন্তরালে তাহা আপনার অপার বিস্তৃতি ও অগাধ গভীরতা লইয়া বিরাজ করিতেছে? এ সন্ধান কাব্যের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে, কারণ কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের মিলন কাব্যের ভিতর দিয়াই সংঘটিত হয়। কাব্যই পাঠকচিত্তের পক্ষে রসে পৌছিবার উপায়, আর কবিচিত্তের পক্ষে রস-স্নানের পর তীরে উঠা। কথাটা বিশদ করিবার জন্য প্রথমে কবিচিত্তধারার অনুসরণ করি।

মানুষ মাটীর উপর দাঁড়াইয়া আছে; তাহার প্রথম ও শেষ পরিচয় এই বস্তু-জগতের সহিত। কাব্যজগতও এই বস্তু-জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবিচিত্তধারা বস্তুজগত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করে, সুতরাং কাব্যের মূল বস্তুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তু-জগৎ কবি, পাঠক, রসিক, অরসিকের সাধারণ বিচরণ-ক্ষেত্র।

কবিচিত্তধারা

বস্তু বা বিষয়ের সহিত মানবমনের ঘাতপ্রতিঘাতে 'ভাব'এর উৎপত্তি। ইংরাজীতে ইহাকে emotion বলা হয়। বাংলায় আমরা emotionকে কখনও চিত্তবৃত্তি, কখনও ভাবাবেগ বলিয়া থাকি। কিন্তু কাব্যবিচারে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যবহৃত 'ভাব' কথাটীই প্রশস্ত। কেবল সাবধানে থাকিতে হইবে, আমরা কোন লেখার ভাব বা ভাবার্থ বলিতে যাহা বুঝি, কাব্যতত্ত্ব-বিচারে 'ভাব' বলিলে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বুঝিতে হইবে। ভাব অর্থে আমরা অনেক সময় ideaকেও বুঝি। কিন্তু 'ভাব' বলিতে আমরা এখন বস্তু বা বিষয় সংঘাতে চিত্তের ভাবাবেগ বুঝিব।

ভাব

মানবমন একান্ত জটিল ও অপরূপ সৃষ্টি। তাহার কোন্ স্তরে কোন্ বস্তু বা বিষয়ের আঘাত লাগিয়া কোন্ সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের দুর্জ্ঞেয়; আর তাহার সম্যক্ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনও উপস্থিত নাই। একথা

সকলেই বুঝিতে পারি, মানব-মনের 'ভাব' সংখ্যায় অনেক। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাহাদিগকে প্রধানতঃ নয়টী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। ইহাদিগকে 'স্থায়ী ভাব' বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানা অপ্রধান ভাব স্থায়ী ভাবগুলির সহচর-রূপে মানব-মনে যাতায়াত করে,—তাহাদের 'সঞ্চারী ভাব' বলা হইয়াছে। ভাবকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, তাঁহাদের মতে কতকগুলি ভাব মানবমনের চিরন্তন সম্পত্তি। অতীতে তাহারা ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আর সঞ্চারী ভাব যুগে যুগে প্রবল দুর্ব্বল হইতে পারে, তাহারা স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে নিজেদের ধারা বজায় রাখিয়া চলে; কখনও বা ভাব-বিশেষ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, আবার যুগধর্ম্মে নূতন সঞ্চারী ভাবেরও অভ্যুদয় হয়। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই মনে রতি, হাস্য ইত্যাদি নয়টী ভাব চিরদিন ছিল ও থাকিবে। যাহা হউক, সাধারণ মানবচিত্তের ন্যায় কবি-চিত্তও এই সমস্ত 'ভাব'এর অধীন; প্রভেদ এই যে কবি-চিত্তে এই সমস্ত ভাবকে দশজনের উপভোগ্য করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জন্মে; অর্থাৎ কবিচিত্ত ভাবকে রসে পরিণত করিতে চায়। এই ইচ্ছা জন্মে কেন? ইহার সঠিক উত্তর সম্ভব নয়। যাহার প্রেরণায় বা তাগিদে কবিচিত্তে ভাবকে দশজনের উপভোগ্য করিয়া, অর্থাৎ রসে পরিণত করিয়া, প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তাহাকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি। যে অলৌকিক শক্তি সাধারণ মানবচিত্তধারা হইতে কবিচিত্তকে পৃথক করিয়া, ভাব হইতে তাহাকে রসে উঠিবার জন্য নিরন্তর উত্তেজিত করে, তাহাই কবিপ্রতিভা। যে অচিন্ত্য শক্তিবলে ধরিত্রী তাহার সাধারণ মৃৎরসকে গোলাপে, চম্পকে, বকুলে গন্ধান্বিত করিয়া তুলিতেছে, সেই শক্তি বোধ হয় মানবচিত্তে ভিন্নরূপে সক্রিয় হইয়া ভাবকে রসে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছা জন্মায়। অর্থলোভে ও যশোলোভে কাব্যনির্ম্মাণের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বস্তু, সে কথা এখানে বলিতেছি না।

প্রতিভা

বলিয়াছি, ভাবকে উপভোগ্য করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কবিচিত্তের বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু ভাষায় 'ভাব'-এর প্রকাশমাত্রই কাব্য নহে। ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন ক্রোধভাবের প্রকাশ হইলেও ইহা ভাবের লৌকিক প্রকাশ মাত্র। কবিচিত্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কারণ ক্রোধকে উপভোগ্য করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ক্রুদ্ধ মনিবের চিত্তে কখনও জাগে না। ক্রন্দনে প্রিয়বিয়োগের যে প্রকাশ, তাহা শোকের লৌকিক প্রকাশ। কবিচিত্তধারা সে পথে চলে না। সে ভাবকে উপভোগ্য করিয়া তবে প্রকাশ করিতে চাহে।

এই সব লৌকিক ভাবকে কবি কি উপায়ে উপভোগ্য করেন? কোন্ মন্ত্রে এমন অসম্ভব সম্ভব হয় যে রামসীতা-বিরহের অসহ দুঃখ হইতে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি; অপরের শোক হইতে আনন্দ পাইবার অভিলাষে রঙ্গালয়ে ছুটিয়া যাই? কবিচিত্ত যে উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করে তাহাকে আমরা 'কল্পনা' বলি। কবিমানসে কল্পনা নামে যে মায়াবিনী বাস করে, সেই এক মায়া-রাজ্যের সৃষ্টি করে—যেখানে পুত্রশোক ও প্রিয়া-মিলন উভয়ই উপভোগ্য হইয়া উঠে।

কল্পনা

কিন্তু ভাব অর্থাৎ emotionএর উদ্রেক মাত্র কি কবি কল্পনালোকে উপনীত হন? পুত্রশোক হইবামাত্র কেহ কবিতা লিখিবার উদ্দেশ্যে কল্পনার আশ্রয় লইতেছেন, ইহা শোনা যায় না। বস্তু-সংঘাতে চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহার পরও সেই সেই ভাবের স্মৃতি মানব-মনে জমা হইয়া থাকে। কবি সেই ভাবস্মৃতি হইতেই তাঁহার কল্পনার খোরাক গ্রহণ করেন। ভাব-লোকের পর ভাবস্মৃতির জগৎ আছে—তাহাকে পণ্ডিতেরা 'বাসনা' বলিয়াছেন। রতিভাব হইতে মনে 'রতি-বাসনা,' ক্রোধভাব হইতে 'ক্রোধ-বাসনা' শোকভাব হইতে 'শোক-বাসনা' ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সব 'বাসনা' 'ভাব'এর ন্যায়ই লৌকিক। মানব-চিত্তে শোক যেমন দুঃখপ্রদ, শোকের স্মৃতি বা বাসনাও প্রায় সেইরূপই দুঃখ-প্রদ। কবিচিত্ত বাসনা-লোকেও সাধারণ মানবচিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় নাই। কেবল ভাব বাসনার ক্ষেত্রে উঠিয়া, সাধারণ মানবচিত্ত অপেক্ষা কবিচিত্তে অধিকতর সংহতরূপ ধারণ করে, অর্থাৎ দানা বাঁধিয়া উঠে। কবিচিত্ত ভাব হইতে বাসনান্তরে উঠিবার সময় প্রতিভার দ্বারা পরোক্ষভাবে কথঞ্চিৎ ভাবিত হয় বলিয়াই এই সংহতি সম্ভব

বাসনা

হয়। কিন্তু বাসনার ঊর্দ্ধে যে কল্পনা-লোক, সেখানে প্রবেশের অধিকার কবিচিত্তেরই আছে। কল্পনা-লোকে আসিয়াই কবিচিত্ত বিশেষত্ব লাভ করে।

কোন বস্তু বা বিষয়ের আঘাত মাত্র যে 'ভাব'বিশেষ উৎপন্ন হইল সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই উত্তম কাব্য লেখা হইয়াছে,—ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে ভাবের নূতন আঘাতে কবিচিত্তে পূর্ব্ব-সঞ্চিত তজ্জাতীয় 'বাসনা' আলোড়িত হইয়াছে বলিয়াই কল্পনা-সাহায্যে সে কাব্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। ভাবলোক ও কল্পনালোকের মধ্যে বাসনা লোকের অবস্থান কল্পনামাত্র নহে।

'ভাব'এর মধ্য দিয়া আহৃত বস্তু বা বিষয়কে 'বাসনায়' সঞ্চিত করিয়া, প্রতিভার প্রেরণায় কবিচিত্ত কল্পনালোকে পৌছিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু মানবচিত্ত বুঝিতে চায়, কল্পনা-লোকে পৌছিয়া কবিচিত্ত কোন্ কৌশলে কাব্য সৃজন করে। কবি-চিত্ত-ধারার অনুসরণে এই মায়ার জগতে পৌছিয়া বুদ্ধি যদিও কতকটা দিশাহারা হয়, তথাপি সে এখনও একেবারে অভিভূত হয় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবলে সে ধরিতে পারে, যে এ রাজ্যে কবিচিত্তের যাহা প্রধান সম্বল তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়;—বিভাব, অনুভাব ও উপভাব। কবিচিত্ত কল্পনালোকে বসিয়া এই বিভাব, অনু-ভাব ও উপভাবের সাহায্যে ভাবস্মৃতি বা বাসনাকে উপ-ভোগ্য, অর্থাৎ রসে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস পায়। রতি বা অনুরাগ-বাসনা রূপান্তরিত হইয়া শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসে, বিভাব অনুভাব উপভাব হাস্য-বাসনা হাস্য রসে, শোক-বাসনা করুণ রসে, ক্রোধ-বাসনা রৌদ্র রসে, উৎসাহ-বাসনা বীর রসে, জুগুপ্সা-বাসনা বীভৎস রসে, বিস্ময়-বাসনা অদ্ভুত রসে ও শম-বাসনা শান্ত রসে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রকাশ তখনও কবিচিত্তে আবদ্ধ, শব্দ তখনও শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই, অলঙ্কার তখনও ঝঙ্কার তুলে নাই, অর্থ তখনও বাক্যকে ছাড়াইয়া যায় নাই। কল্পনালোকস্থ বিভাব, অনুভাব ও উপভাবের ইন্ধনে 'বাসনা' তখন পাক হইয়া কবিচিত্তে রস উৎপাদন করিতেছে।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা
প্রতিদিন আমি কোরেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।—

ইহা অনেকটা কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশ।

বিভাব, অনুভাব, উপভাব কি? বিশেষ বিশেষ ভাবের উৎপত্তির বিশেষ বিশেষ কারণ থাকে,—যেমন সুন্দরীর সংস্পর্শ রতিভাবের কারণ। বাসনাপুষ্ট কবিচিত্তে সেই কারণের প্রকাশ-কল্পনার নাম ঐ ভাবের বিভাব। প্রিয়-বিয়োগ শোকভাবের কারণ, কিন্তু তাহা শোকভাবের বিভাব নহে। শোক-বাসনাপুষ্ট কবিচিত্ত শোকভাবের কারণস্বরূপ প্রিয়বিয়োগের প্রকাশ বা বর্ণনা যে রূপে কল্পিত করে, তাহাই শোকভাবের বিভাব। কবিপ্রতিভার তার-তম্যানুযায়ী বিভাব উত্তম অধম হয়।

চিত্তে কোন ভাব উৎপন্ন হওয়ার পর দৈহিক কার্য্যে বা বহির্লক্ষণে তাহা প্রকাশ পায়,—যেমন শোকভাব ক্রন্দনে। কবিচিত্তে সেই সেই কার্য্য বা লক্ষণের প্রকাশ-কল্পনাকে 'অনুভাব' বলা যায়। ক্রন্দন শোকভাবের বহির্লক্ষণ মাত্র,—অনুভাব নহে। কবিচিত্তে সেই ক্রন্দন-প্রকাশের বিশিষ্ট কল্পনাকে শোকভাবের 'অনুভাব' বলা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রধান ভাবগুলি ছাড়াও অনেক গৌণ ভাব মানব-মনে যাতায়াত করে—যাহাদিগকে 'সঞ্চারী' ভাব বলা হয়। এই সমস্ত সঞ্চারী ভাব প্রধান ভাবকে পুষ্ট করে। রাজার চিত্তে রাজ্যনাশজনিত শোকভাবের সহিত রাজজনোচিত গর্ব্বভাবও মিশ্রিত থাকে। রাজার শোক-ভাব এই সঞ্চারী গর্ব্ব-ভাবের দ্বারা পুষ্ট হইয়া বিশেষত্ব লাভ করে। কবিচিত্তে প্রধান ভাবকে পুষ্ট করিবার জন্য এই সঞ্চারী-ভাবের প্রকাশের কল্পনাকে ঐ প্রধান ভাবের 'উপভাব' বলি।

'কাঙালিনী' কবিতায় কবিকল্পনা একটী বিশেষ শোক-ভাবকে করুণ রসে পরিণত করিয়াছে। এই কাব্যের কল্পনাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, কবিচিত্ত প্রথমে বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,

ম্লান-চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
কত কে যে আসে কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা
ঝলকিছে কাঞ্চন রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা ছবির মতন।

উৎসবমুখরিত ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ের মনে শোকভাব জাগিবার কারণগুলির এই যে বিশেষ কল্পনা,—ইহাই এ কবিতায় শোকভাবের বিভাব।

শোকের কারণ কল্পিত হইবার পর, শোকভাবের কার্য্যে বা বহির্লক্ষণে কল্পনার লীলা আরম্ভ হইল।

তাই বুঝি আঁখি ছল ছল
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে—মাগো এ কেমন ধারা।
এত বাঁশী, এত হাসি-রাশি,
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন?
* * * *
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে
আমি ত ওদের কেহ নই!

ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসে, কাঙালিনী মেয়ের শোক-ভাবাবিষ্ট মনের বহিঃপ্রকাশের এই যে কল্পনা, ইহাই এ কাব্যে শোক-ভাবের 'অনুভাব'।

কাঙালিনী মেয়ের মনের 'শোক'বিশেষ এ কবিতার ভাব। তাহার মন দুঃখ-কাতর। কিন্তু আবার দেখিতে পাই—

বালিকা কাতর অভিমানে
বলে—"মাগো এ কেমন ধারা?
এত বাঁশী এত হাসি-রাশি
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন?

এই যে অভিমানরূপ সঞ্চারীভাবের প্রকাশ-কল্পনা, ইহাই এ কবিতার উপভাব। এ কবিতার প্রধান ভাব, শোকভাব, অভিমানজনিত উপভাব দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া রসকে বিশেষত্ব দিতেছে। এ সঞ্চারী ভাবটী বাদ দিলে কবিতা বৈশিষ্ট্য-হীন হইত।

আর একটী উদাহরণ দ্বারা বিভাব, অনুভাব ও উপভাব-সাহায্যে রসে রূপান্তর বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কালি, মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
কুঞ্জ-কাননে সুখে,
ফেনিলোচ্ছল যৌবন-সুরা
ধোরেছি তোমার মুখে॥

মধুযামিনী, জ্যোৎস্না নিশীথ, ফেনিলোচ্ছল, যৌবন-সুরা—এই সব রতিভাবোদ্বোধক বাক্য বা বিষয়ের কল্পনা কবি-চিত্তের 'রতিবাসনা'কে মধুর রসে পরিণত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহাই এখানে রতিভাবের 'বিভাব'।

তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন,
মুখে নাহি ছিল বাণী।

এই সব রতিভাব-লক্ষণের কল্পনা কবিচিত্তের 'রতি বাসনা'কে মধুর রসে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে; এগুলি এখানে রতিভাবের 'অনুভাব'।

তব আনমিত মুখ খানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ স'য়েছিলে সখী
হাসি-মুকুলিত মুখে।—

ইহার মধ্যে রতিভাবের 'সঞ্চারী'রূপে যে উভয় মনের হর্ষ ও লজ্জা-ভাব প্রধান রতিভাবকে মধুরতর করিতেছে, কবিচিত্তে ইহাদের প্রকাশ-কল্পনাই 'উপভাব'। এখানে উদ্দিষ্ট মধুররসের উপযোগী পরিবেষ্টনী (atmosphere) রচনা করিবার জন্য কবিকল্পনা 'বিভাবের' আশ্রয় লইয়াছে; 'অনুভাব' দ্বারা রস ঘন হইয়াছে এবং 'উপভাব' রসকে রঞ্জিত করিতেছে। যে রতিভাব ব্যক্তির চিত্তে পশুভাব মাত্র, মাত্র ভাবরূপে যাহার প্রকাশ সমাজচিত্তে একান্ত

লজ্জাজনক, যে 'ভাবে'র সঞ্চিত স্মৃতি অর্থাৎ 'বাসনা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবমনকে অধোগামী করে, কল্পনার মায়ালোকে তাহাই রূপান্তরিত হইয়া 'শৃঙ্গার' বা 'মধুর' রসে পরিণত হইতেছে। ইহা যে রতিভাব বা রতি-বাসনা নহে, পরন্তু মধুর রস, তাহার প্রমাণ এই কাব্য হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। কবি-কল্পনা রতি-ভাব ও রতি-বাসনাকে রসলোক বা আনন্দলোকে উঠাইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই সে পরমুহূর্ত্তে পুনরায় কবি-চিত্তকে আনন্দ হইতে আনন্দান্তরে, রস হইতে রসান্তরে চালিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কবিকল্পনা এখানে কি বিচিত্র পথে কবিচিত্তকে লইয়া চলিয়াছে দেখুন,—

রস

আজি, নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে,
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশীতে উঠেছে বাজি,
এই নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী-তীরে আজি।

ইহার প্রত্যেক কথাটীর কল্পনা শান্তভাবের উদ্বোধক বা বিভাবরূপে শমভাবকে শান্তরসে উঠিবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছে। কাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধে কবিচিত্ত যদি রতিভাবলোক বা রতিবাসনালোকে নিবদ্ধ থাকিত, অর্থাৎ সে যদি আপনার মধ্যে ঐ ভাবকে কল্পনাকৌশলে 'রসে' রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত আনন্দরূপ দিতে না পারিত, উত্তরঙ্গ ভাব ও বাসনা-জলধির বিক্ষোভ মিটাইয়া তাহাকে শান্ত স্বচ্ছ রসসাগরে পরিণত করিতে সক্ষম না হইত, তবে সে চিত্তে সম্পূর্ণ বিরোধী অপর একটী ভাবের, অর্থাৎ শমভাবের, পরিকল্পনা উদিত হইতে পারিত না, কিম্বা উদিত হইলেও তাহা একেবারে বেসুর বলিত।

বস্তু এক,—সুন্দরী নারী; সে অবস্থাবিশেষে মানবমনকে ভাব হইতে ভাবান্তরে টানিয়া লইয়া যায়; আর ভাবসমূহের বাসনাপুষ্ট কবিচিত্ত যথোচিত বিভাব-অনুভাব-উপভাব-সমৃদ্ধ অপরূপ কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অরূপ রসে পরিণত করিতেছে।

কবিচিত্তধারা এখন রসলোকে বিচরণ করিতেছে। অর্থাৎ প্রতিভা যদি উত্তম শ্রেণীর হয়, তবে কবিচিত্ত এখনও রসলোকে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে—কাব্য এখনও লেখা হয় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন রস ইহা নয়, উহা নয়, কেবল নিজের সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণ-ব্যাপার, নিজের সত্ত্বার একটী বিশেষ আনন্দময় আস্বাদন। এখান হইতে আমাদের ফিরিয়া আসাই সঙ্গত। কারণ ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিক। কবি এখনও কাব্য লেখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি নিজের সত্ত্বার ইক্ষুদণ্ডকে চর্ব্বণ করিতেছেন, যাহার আস্বাদনই রস।

আমি বলিয়াছি প্রতিভা উত্তম শ্রেণীর হইলে, অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট কাব্যের জননী হইলে, কবিচিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কাব্য এখনও লেখা হয় নাই। কল্পনা-সাহায্যে রসাস্বাদ, ও কাব্যে তাহার প্রকাশ, দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। রসলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত রসসিক্ত কবিচিত্তই উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় সমর্থ হয়। তখন চলিতে থাকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'

অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দ-লোক করি বিরচন।

আর সেই মধুচক্র নির্ম্মিত হইয়া উঠে যাহাতে কেবল 'গৌড়জন' নহে বিশ্বের সমস্ত রসিকজন নিরবধি আনন্দে মধুপান করিবে। তখন মধুমক্ষিকার ন্যায় কবি পুনঃ পুনঃ রসসিক্ত অন্তরের কুসুমকাননে উড়িয়া যায়, আর ছন্দিত, অলঙ্কৃত এবং ব্যঞ্জিত বচনামৃত আহরণ করিয়া কাব্যের মধুচক্রে রাখিয়া যায়। মাঝে মাঝে পাঠকের চিত্ত লইয়া আপনার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া পুলকিত হয়—

কত যে বরণ কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া ক'রেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব।
কখনো সংশয়-দোলায় দোলে —
সোণার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশীতে ভ'রেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে মনে
ধরা দিলে কি?

কখনও ক্ষুব্ধ হয়—

মনে যে গানের থাকিত আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস
ছিঁড়িল তার।

রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে অনিবার যাতায়াত চলিতে থাকে, আর অনুপম কাব্যের মধুচক্র রচিত হইয়া উঠে। সে কাব্যে ছন্দ, অলঙ্কার, অর্থ এবং অন্যান্য কাব্য-কৌশল রসের অনুগত হইয়া চলে। সেই অবিরাম যাতায়াতের আয়াস কবিচিত্তকে ক্লান্ত করে না—আনন্দ দেয় এবং সে আয়াস কাব্যেও ধরা পড়ে না; কারণ আনন্দে যাহার পরিকল্পনা, আনন্দের মধ্য দিয়াই যাহার গতি, আনন্দেই তাহার পরিণতি ঘটে। কুশলী নর্ত্তকের পদ-বিক্ষেপ-শ্রম যেমন পথশ্রম নহে, নিপুণ নৃত্যের ছন্দে ও ভঙ্গীতে যেমন শ্রমের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে না, বরং তাহার চতুর্দ্দিকে আনন্দই হিল্লোলিত হইয়া উঠে, তেমনি রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে কবির এই যাতায়াতের আয়াস কবিচিত্তকে শ্রান্ত করে না, বা কাব্যে তাহার চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কবিচিত্তে ও কাব্যে তাহা আনন্দেরই কারণ-স্বরূপ হয়।

উত্তম-প্রতিভাচালিত কবিচিত্তের কাব্যনির্ম্মাণকালে রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে যাওয়া-আসার ব্যাপারটাও অনুভূতির বিষয়; বুদ্ধি দ্বারা তাহার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায় না। কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে কবিচিত্ত যে রূপ গ্রহণ করে বুদ্ধিদ্বারা তাহার বিশ্লেষণ করা যায় এবং পণ্ডিতেরা তাহা করিয়াছেন।

শব্দ হইতেছে কাব্যের কঙ্কাল, রীতি (Style) তাহার অবয়ব, অলঙ্কারই তাহার ভূষণ, বাচ্যার্থ তাহার মন, ব্যঞ্জনা তাহার বুদ্ধি ও রস তাহার আত্মা। বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত বুঝা যায়, আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। কাব্যেরও ব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝান যায়;—আত্মার কথা, রসের কথা, আপনা হইতে বাদ পড়িয়া যায়, বা অরসিকের কাছে তাহা প্রলাপের মত শুনায়। তবে জীবজগতের ন্যায় কাব্যজগতেও বৈচিত্র্য অসীম। মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব,—

কাব্য

অথচ এক মানবের মধ্যেই বৈচিত্র্য কত! আত্মা হইতে কঙ্কাল পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। তথাপি যেমন দুটি মানুষ ঠিক একরকমের নয়, তেমনি অনন্তবৈচিত্র্যময় কবিপ্রতিভার সৃষ্ট দুখানি উৎকৃষ্ট কাব্যও এক রকমের নয়। তাহার পর জীবজগতে যেমন সহস্র পর্য্যায় চলিয়াছে—মন আছে ত বুদ্ধি নাই, অবয়ব আছে ত শ্রী নাই; - তেমনি ব্যঞ্জনা-বিহীন, রীতিহীন, অলঙ্কারশূন্য, অথবা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহাদের সমবায়ে উৎপন্ন বহুবিধ কাব্য উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। মানবের তুলনায় অন্যান্য জীব যেমন নিকৃষ্ট, তেমনি সর্ব্বাবয়ব-বিশিষ্ট কাব্যের তুলনায় এসমস্ত কাব্য নিকৃষ্ট।

রসকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মাহীন জীব হয় না, সুতরাং রস না থাকিলে কাব্যও হয় না। নিকৃষ্ট কাব্যে রস আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়,—রসকে যে উচ্চ পদবী পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে সে রস অবশ্যই নিকৃষ্ট কাব্যে নাই; রসের ব্যবহারিক অর্থই এখানে করিতে হইবে। এবং এ হিসাবে সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট রসের আস্বাদও যে কাব্যে পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ কাব্যসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। দর্শনাতীত দর্শনে আত্মার যে সংজ্ঞাই দেওয়া হউক, জীবশৈবালের (Proto-plasm) আত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায়। মানবাত্মা ব্রহ্মসামীপ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে,—কোন ইতর জীবের সে সম্ভাবনাও নাই। এইরূপ রসে রসে তারতম্য আছে এবং কাব্যের স্তরভেদও ইহার উপর নির্ভর করে। জীবশৈবালের দেহ ও আত্মা উভয়ই নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া যেমন তাহা জীব হইয়াও নির্জ্জীব, তেমনি দুর্ব্বল বাক্য ও রসের সমবায়ে উৎপন্ন কাব্যকে অকাব্যই বলা যায়। অতি নিকৃষ্ট কাব্যই অকাব্য।

বলা হইয়াছে, শব্দই কাব্যের কঙ্কাল। কঙ্কাল যদি অসমঞ্জস হয়, তবে রীতি সুন্দর হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে ভাবোপযোগী সার্থক শব্দচয়ন করিতে সক্ষম হয়। শব্দচয়নের অক্ষমতা কবিচিত্তের প্রথম ও প্রধান অক্ষমতা।

শব্দ

কুম্ভকার দেবীপ্রতিমা গঠন করিবার পূর্ব্বে বাঁশ, দড়ি ও খড়ের সাহায্যে প্রথমে 'কাটামো' গড়িয়া লয়। যে কুম্ভকার উৎকৃষ্ট 'কাটামো' গঠন করিতে সক্ষম নহে, 'কাদার হাত' তাহার যতই ভাল হউক, মূর্ত্তি

উৎকৃষ্ট হয় না। কাব্যগঠনে শব্দের প্রাধান্য অবিসংবাদিত। শব্দসমষ্টি যদি অক্ষম এবং দুর্ব্বল হয়, অথবা তাহারা যদি ভাবোপযোগী না হয়, তবে কাব্যও উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না।

কাব্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ বাক্য অর্থাৎ কবিতা বুঝি। কিন্তু কাব্যের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াও বিচার চলিতে পারে, এবং প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমস্তই কাব্যপর্য্যায়ে পড়িতে পারে। কাব্যের ন্যায় ইহাদের প্রত্যেকটীতে শব্দরূপ কঙ্কাল আছে, রীতিরূপ অবয়ব আছে, বাচ্যার্থরূপ মন আছে, ব্যঞ্জনারূপ বুদ্ধি আছে এবং রস বা আত্মাও আছে। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে ছন্দ নাই, কবিতায় তাহা আছে। কিন্তু ছন্দকে যদি 'রীতির' অঙ্গ মনে করা যায়, তবে নিতান্ত ভুল করা হয় না। শব্দের কঙ্কালের উপর যে বিশেষ অঙ্গসংস্থান যোজনা করিলে সাহিত্য কবিতারূপ গ্রহণ করে তাহারই অপর নাম ছন্দ।

রীতি ও ছন্দ

ছন্দোবদ্ধ বাক্যের অর্থাৎ কবিতার ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রীতি হওয়ার বাধা নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছন্দোরূপ সাধারণ রীতিটি বর্ত্তমান থাকা চাই। এই হিসাবে রীতিকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—ছন্দিত ও মুক্ত। প্রতিভা ছন্দিত রীতির সাহায্যে ভাবকে বাসনা ও কল্পনার মধ্য দিয়া রসে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পাইলে তাহাকে সাধারণতঃ কবিপ্রতিভা বলি। কিন্তু সে যখন মুক্ত রীতির সাহায্যে ভাবকে রসে উঠাইবার চেষ্টায় গদ্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে তখনও তাহাকে কবি-প্রতিভা বলিবার বাধা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে আমরা যে 'কবিপ্রতিভা' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি সে তাঁহার 'বন্দেমাতরম' গানটীর জন্যই নহে,—উপন্যাসের মধ্য দিয়া ভাবকে রসমূর্ত্তি দিবার সফল-প্রযত্নতার জন্যই। তবে বঙ্কিমের কবিপ্রতিভা মুক্ত রীতির আশ্রয়ে ভাবকে রসে উঠাইয়াছিল।

রীতিকে মুক্ত ও ছন্দিত এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। রীতি-বিচারে শ্রবণেন্দ্রিয় আমাদের প্রধান সহায়ক। যাহার 'কান' আছে সেই রীতি ধরিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্ম কানওয়ালা পাঠকের কাছে মুক্ত রীতিতেও যে এক প্রকারের ছন্দ আছে তাহা ধরা পড়ে। উত্তম গদ্য সাহিত্যের যে কোন অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে তাহার একটা ছন্দ আছে। তবে সে ছন্দ কবিতার ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সেইজন্যই তাহাকে 'মুক্ত' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে; যদিও 'মুক্ত' অর্থে 'ক্ষিপ্ত' বুঝিলে চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গদ্যরচনা হইতে একথা প্রমাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের অংশ উদ্ধৃত করিয়াও একথা প্রমাণ করা যায়। "রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" এ কাব্যে শব্দসমষ্টি মুক্ত রীতির সাহায্যে গ্রথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহারও একটী ছন্দ আছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। ছন্দ যে আছে তাহার প্রমাণ এই, যে শব্দ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ইহার ছন্দ-পতন করা যায়। 'রাম' না বলিয়া যদি বলা হয়, 'কাকুৎস্থ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া', তবে ইহার ঈষৎ ছন্দ পতন ঘটে; রীতি পরিবর্ত্তিত না হইলেও তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায়। যদি বলি 'রাজতক্তায় বোসে', তবে যে ছন্দে কবি এখানে বক্তব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা হইতে ভিন্ন ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মুক্ত বা ছন্দিত উভয় রীতিতেই 'যতি' 'মাত্রা' জ্ঞান যাহার নাই সে সুকাব্য অর্থাৎ সুসাহিত্য রচনা করিতে পারে না। মুক্ত রীতির বিভাগ অনেক এবং সে মুক্ত বলিয়াই তাহার উপবিভাগ অসংখ্য হইতে পারে,—হইয়াছেও। ইহাকে কোন আইনের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

কিন্তু ছন্দিত রীতির নানা বিভাগ উপবিভাগ থাকিলেও সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল বরণ করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার বিধি-নিষেধ দেশে দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে বাংলা কাব্যে ছন্দের রূপ বিচার করিবার প্রয়াস না করিয়া ছন্দের সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে ২।১টা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

উৎকৃষ্ট কাব্যে ছন্দোরূপ কাব্যকৌশল মূল ভাবকে রসে উঠাইবার অনুকূল পরিবেষ্টনী রচনা করিয়া [illegible] এক্ষেত্রে ইহা কল্পনালোকের বিভাবের সহায়ক, এবং ভাব ও উপভাবের পরিপোষক। বিভাব ভাবকে রসে উঠাইবার উপযোগী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করে; সুনির্ব্বা[illegible] ছন্দ এই কার্য্যে তাহাকে সবিশেষ সহায়তা করে।

'নব বর্ষায়' কবিপ্রতিভা বর্ষার গুরু-গম্ভীর নৃত্যের ভাবটীকে রসান্বিত করিতে চাহিতেছে,—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

ছন্দ এখানে বিভাবকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ছন্দে বর্ষার গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নৃত্যের দোলা আছে। ছন্দ যদি কুনির্ব্বাচিত হইত, অর্থাৎ যদি অতি মাত্রায় গাম্ভীর্য্যের দিকে ঝোঁক দিত, কিম্বা একেবারে নৃত্য-চপল হইত, তবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক দুইটীর বিভিন্ন বিভাবদ্বয়কে প্রকাশিত করিতে পারিত না।

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণ দলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নব মালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণ-দলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে?

ইহার বিভাব বর্ষার উদাস-বিহ্বল ভাবটীকে রসমূর্ত্তি দিতে চাহে—ছন্দ তাহাকে বাধা দেয় নাই। আবার,—

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হ'তেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

এই শ্লোকের বিভাব বর্ষার নৃত্য-দোদুল ভাবটীকে রসান্বিত করিতে চাহিতেছে, এবং ছন্দ তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। এ কবিতা যদি 'বর্ষশেষে' কবিতার ছন্দে লেখা হইত, তবে কবিচিত্ত বর্ষা দেখিয়া ময়ূরের মত আনন্দে নাচিবার সময় পদে পদে বাধা পাইত। আবার ঝঞ্ঝার রুদ্র নৃত্য 'বর্ষশেষের' ছন্দে যেমন ফুটিয়াছে, এ ছন্দে তেমন ফুটিত না:—

আনন্দে আতঙ্কে মিশি' ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হা হা রবে।
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়,
ধূলি-সম তৃণ-সম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

ভাবকে রসে উঠাইতে বিভাব যে পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে, সুনির্ব্বাচিত ছন্দ তাহার সহায়ক হয়। আবার একই কবিতার বিভাব পরস্পর-বিরোধী না হইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে, সে সময় ছন্দই মূল ভাবটীর সুর টানিয়া রাখে। কবিচিত্ত কল্পনালোকে সুর-সপ্তকের বিভিন্ন পর্দায় রাগিণীর ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া (অর্থাৎ ভৈরবীতে পুরা ধৈবৎ না দিয়া) নব নব বিভাবের উপর কণ্ঠ খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ছন্দ তানপুরার ন্যায় তাহার মূল সুরটী রক্ষা করিয়া চলে। মাঝে মাঝে বিভাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ছন্দ সে অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া আনন্দের ধারাটী বজায় রাখে। ছন্দ কুনির্ব্বাচিত হইলে গান জমে না, মাঝে মাঝে রসভঙ্গ হয়।

আবার বিভাবের দ্বারা রসোপযোগী পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হওয়ার পর অনুভাব ও উপভাবের খেলা আরম্ভ হইলে ছন্দ সেই পরিবেষ্টনীকে রক্ষা করিয়া চলে।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।

ইহার একটানা ছন্দ ভারাক্রান্ত 'শেষ খেয়াকে' অনুভাব-পরম্পরার মধ্য দিয়া যেন টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; কোথাও তাহা বাধা পায় নাই।

বিভাব অনুভাব উপভাবকে ছন্দ এইরূপে সাহায্য করে বলিয়াই কবিতায় ছন্দের মূল্য অনেক। কিন্তু কবিচিত্ত যখন ভ্রম, নির্ব্বুদ্ধিতা, খেয়াল বা অক্ষমতাপ্রযুক্ত ছন্দকে বিভাব অনুভাব উপভাবের উপর স্থান দেয়, অর্থাৎ গন্তব্য ভুলিয়া পথের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন পাঠকচিত্ত পীড়িত হয়। সঙ্গীতের আসরে তানপুরার স্থান নিম্নে নহে, গায়কের স্কন্ধের উপরেই,—কিন্তু কেবল তানপুরা কে কতক্ষণ শুনিতে পারে? কবিচিত্ত যখন গান শুনাইতে আহ্বান করিয়া কেবল তানপুরা ভাঁজিতে আরম্ভ করে, অথবা গানের মধ্যে বাজনাকে প্রবল করিয়া তুলে, তখন পাঠকচিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

অলঙ্কার লইয়া বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত দেখি না, এবং শব্দার্থ অথবা বাচ্যার্থ লইয়াও কোন গোল নাই।

ব্যঞ্জনা

কিন্তু ব্যঞ্জনা বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। কোন কাব্যে বাক্যার্থকে ছাড়িয়া যে অর্থান্তরের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে তাহাই সে কাব্যের ব্যঞ্জনা।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।

কবির বলিবার ভঙ্গী হইতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিতেছে, যে ইহা পাখীর কথাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই বা হইবে না—বদ্ধজীব ও মুক্ত-জীবের কথাই ইহার বক্তব্য। ইহাই ব্যঞ্জনা।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিদেশিনীর সহিত কবিচিত্ত যখন অকূল সিন্ধুর মধ্যে তরী ভাসাইয়া চলিতেছে :—

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্ত ছবি।

তখন সতত-পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্রের বর্ণনারূপ বাক্যার্থকে ছাড়িয়া অদৃষ্টসাথী চিরচঞ্চল মানবজীবনের অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথাই ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাই এ কাব্যাংশের ব্যঞ্জনা। যখন 'পরশপাথর'এর ক্ষ্যাপা

সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হ'য়েছে সোণা জানে না কখন।

তখন লোহা ও সোণার বাচ্যার্থকে একেবারে ঢাকিয়া দুঃখময় পার্থিব জীবন ও আনন্দময় অপার্থিব জীবনের কথা মনে আসে—ইহা এই কাব্যাংশের ব্যঞ্জনা।

ব্যঞ্জনা লঘু গুরু গভীর ইত্যাদি নানা পর্য্যায়ের হইতে পারে। পৃথক পৃথক কাব্যাংশের মূল-রসাভিমুখী পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে, যেমন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র উদ্ধৃত অংশে; অথবা সমগ্র কাব্যের একটী মাত্র ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে, যেমন 'পরশপাথর'।

কবিচিত্তধারা অনুসরণ করিয়া শব্দ রীতি অলঙ্কার এই বহিরঙ্গবিশিষ্ট, এবং বাচ্যার্থ ব্যঞ্জনা, এই অন্তরঙ্গবিশিষ্ট কাব্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছি। তাহার পূর্ণতর পরিচয় লইয়া শ্রেণীবিভাগ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকচিত্তধারার গতি ও রীতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি। কঙ্কাল হইতে আত্মা

পাঠকচিত্তধারা

পর্য্যন্ত সমস্তই বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও জীব বাঁচিতে পারে না, যদি না তাহার খাদ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। কাব্য বাঁচিয়া থাকে পাঠকচিত্ত হইতে খোরাক সংগ্রহ করিয়া; সুতরাং কাব্যপরিচয়ে পাঠকচিত্তধারার অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

যেমন কবিচিত্তের, তেমনি পাঠকচিত্তের মূলও সেই বস্তু ও বিষয়-জগতে প্রতিষ্ঠিত। বস্তু বা বিষয়ের সংঘর্ষে পাঠকের মনেও নানারূপ 'ভাব' বা emotion উৎপন্ন হয়, এবং তাহার মনে সেই সেই ভাবের স্মৃতি বা বাসনা সঞ্চিত হয়। বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভাব ও বাসনার ক্ষেত্রে কবি ও পাঠকের মন প্রায় সমধর্ম্মী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কল্পনা কবির বাসনাকে রসে পরিণত করে। ভাব যতক্ষণ ভাবমাত্র থাকে ততক্ষণ তাহা কবিকল্পনার উপযুক্ত উপাদান নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট স্তরের কাব্যরচনা ভাবোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। পূর্ব্বযুগের কবিওয়ালাগণকে রাগাইয়া দিতে পারিলে একপ্রকারের রৌদ্র ও অদ্ভুতরসাত্মক কাব্য পাওয়া যাইত। যদিও অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কাব্য-রচনায় বাসনাই কবিচিত্তের উপাদান, তথাপি ভাবের ক্ষেত্র হইতে ভাবস্মৃতি বা বাসনার ক্ষেত্রে না উঠিয়াও কাব্য রচিত হইতে পারে।

কিন্তু বাসনা-ব্যতিরেকে পাঠকচিত্ত কাব্যাস্বাদের উপযোগী হয় না। রতি শোক ইত্যাদি ভাবের স্মৃতি যে

পাঠকের চিত্তে বাসনা-আকারে সঞ্চিত নাই, তাহার মনে মধুর বা করুণ রসের কাব্য প্রতিফলিত হইতেই পারে না। শঙ্করাচার্য্যের অসাধারণ মনীষা ও পাণ্ডিত্যও উভয়-ভারতীর রতিভাবাত্মক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ আজন্মব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর মনে রতিভাবের বাসনা সঞ্চিত ছিল না। ভাবের মধ্য দিয়া বাসনা সঞ্চয় করিয়া তবে তিনি প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাসনালোক হইতে পাঠকচিত্ত কাব্যক্ষেত্রে উঠিয়া রসের সন্ধান করে। কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্ত এই কাব্যক্ষেত্রে মুখোমুখী হইয়া আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করে। যে পথ দিয়া কবিচিত্ত রস হইতে কাব্যে যাতায়াত করিয়াছে, কাব্যেই তাহার ইঙ্গিত থাকে, কারণ সেই চলাচলের পথে অস্পষ্ট পায়ের দাগ পড়িয়া যায়। সমধর্ম্মী ও সমবাসনাবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত কাব্য হইতেই সেই পথের সঙ্কেত পায়। সে পথ স্পষ্ট নহে, সাঙ্কেতিক মাত্র ; আভাসে, ইঙ্গিতে তাহার সন্ধান মিলে। সেই পথ বাহিয়া পাঠকচিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হয় এবং সেখানে আবার সেই আপন সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণব্যাপার আরম্ভ হয়—যেখান হইতে আমরা একবার ফিরিয়া আসিয়াছি। রসলোকে কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের এই যে মিলন, ইহাই নির্ম্মল আনন্দের কারণ এবং কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার এই মিলনের নামই কাব্যরস।

একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে। *

(ক্রমশঃ)

নির্ঝর

(গান)

[শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়]

আমার, যশের বোঝা সরিয়ে দিয়ে
নামিয়েছ নাথ পথের ধূলায়।
আপনি এসে হাত ধ'রেছ—
পাছে আমায় আবার ভুলায়॥
আমার মাঝে যে জন আমি,
ওগো, ক্ষণে ক্ষণে পড়ে নামি'—
ভুলে যে যাই—
তুমি যে তাই—
পাছু হ'তে ধর আমায়।

অপমানের আঁধার-তলে—
ওগো, তোমার হাতের মাণিক জ্বলে,—
(তারা) জানে না যে—
(তাই) মাঝে মাঝে,—
ডাকে পাছু শুধু ছলায়।

মুছে দিয়ে আমার আমি—
কেবল তুমি—কেবল তুমি
শূন্য হৃদি—
পুণ্য ভূমি—
কর সখা তোমার ছায়ায়॥

* আগামী সংখ্যায় এই প্রবন্ধের চিত্রিত 'অঙ্কণ' অধ্যায় বাহির হইবে।

মরুর মায়া

[শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়]

লাল কাঁকরে ভরা—অসমতল প্রান্তর ধূ-ধূ করে;—দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে মরীচিকা-ধারার সঙ্গে প্রান্তরটাও যেন কাঁপে—।

যেন কোন ঘুমন্ত উদাসী-বৈরাগীর অঙ্গাবরণী—গৈরিক উত্তরীয়খানি মৃদু বাতাসে ধীরকম্পনে কাঁপিতেছে।

প্রান্তরটার পূর্ব্বে গ্রাম নিকটে,—প্রান্তরব্যাপী উদাসী রহস্যের মাঝেও গ্রামের ছায়া-নিবিড় মমতার রেশ বাজে।

দক্ষিণে, উত্তরে গ্রাম ওই দূরে,—দিকচক্ররেখার গায়ে, নীল আকাশ আর গেরুয়া প্রান্তরের মাঝে একটা নিবিড় কালো রেখা।

পশ্চিমে—দূরে—সুদূরে—আকাশে প্রান্তরে মাখামাখি, নীলিমা ও গৈরিকে সংমিশ্রণ। প্রান্তরটার একটা ঢালের গায়ে একটা ঝর্ণা, মৃদু ঝির ঝির শব্দে বহিয়া যায়, যেন ঐ বাউল বৈরাগীটির পায়ের নূপুর বাজে। মুক্ত প্রান্তর এক দিন মানুষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে; ছোট ছোট তাঁবু পড়ে, খটাখট্ খুঁটা গাড়া হয়—। খুঁটায় বাঁধা হয় কুকুরের দল, সবল, দীর্ঘদেহ, হিংস্র-দীপ্তি-ভরা দৃষ্টি। জোড়া পায়ে বাঁধিয়া ভারবাহী ঘোড়াগুলাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়,—ঘাসের সন্ধানে বেচারারা ঘুরিয়া মরে।

তাঁবুর সামনে ছোট ছোট চৌপায়া পাতা হয়, তার উপর বসিয়া বিশ্রাম করে—দীর্ঘদেহ পুরুষ, রোদে পোড়া তামাটে রং, পেশী-সবল দেহ, মাথায় দীর্ঘ-রুক্ষ চুল, গলায় লাল পাথরের কণ্ঠী, স্ফটিকের মালা, হাতে কাঠের মোটা মোটা গুলের তাগা, কারও বা লোহার; পরণে রঙ্গীন খাটো কাপড়, গায়ে কুর্ত্তা।

মেয়ের দল,—তাদেরও রোদে পোড়া তামাটে রং, রুক্ষ পিঙ্গলাভ চুল—তার উপর রঙ্গীন কাপড়ের ফালি বাঁধা উদ্দাম যৌবনকে বাঁধিয়া-আঁটা রঙ্গীন কাঁচুলী, পরণে রঙ্গীন ঘাঘ্‌রা, সমস্ত লইয়া একটা উগ্র সৌন্দর্য্য সবল চঞ্চল প্রভৃতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

হা-ঘরে,—চির পথিকের দল সব; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গৃহহীনের দল চলিয়াছে, শুধু চলিয়াছেই—।

বিশ্রামের তরেই প্রান্তরের বুকে তাঁবু পড়ে—

ঘোড়াগুলা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, কুকুরগুলাও ঘুমায়,—জীবগুলারও বুঝি ক্লান্তি আসে; বিশ্রাম নাই শুধু ওই প্রান্তরের যাত্রীদলের।

সংগ্রহ,—সঞ্চয়; ওরা সব দলে দলে গ্রামের পানে ছুটে; কেহ সন্ন্যাসী সাজে, মাথায় নামাবলী, কপালে তিলক, পরণে গেরুয়া, হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝুলি, মুখে আশীর্ব্বাদের বুলি—

"সী-তা-রাম,—সী-তা-রাম, সাধু সে-বা-করো-রাম,—বাড়ীর মঙ্গল হোবে রাম, ধন দৌলত দিবেন রাম।"

কেহ কেহ যায় বাঁশবাজী, দড়িবাজী করিতে, কসরৎ দেখাইতে, কপালের উপর লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া দেয়, তার উপরে শুইয়া থাকে হা-ঘরের ছেলে, সে আবার সেথায় হাততালি দেয়।

দড়ির উপর নাচে জোয়ান, তাহার দু' কাঁধে দুইটা ছেলে, হাতে একটা বাঁশ;—ডুগ ডুগ করিয়া ডমরুর মত বাজনা বাজে, তালে তালে জোয়ান নাচিয়া নাচিয়া দড়ির উপর চলে, হাতের বাঁশ নাচায়।

কেহ ভোজবাজী দেখায়;—বস্তার ছেলে পুরিয়া ধারাল' ছুরি দিয়া খুঁচিয়া খুঁচিয়া মারে—আবার তাহাকে বাঁচায়।

নারী ফেরে মাদুলী, বাতের তেল, ধানস পাখীর হাড়, ঝুমঝুমি বিক্রয় করিয়া—

"আয় গো বহুড়ী, আয় গো বিটীয়া, লে—লে—গে—মাদ্‌লী—লে—গে—। নিরসন্তানীকে—সো—না—চাঁদ—খোকা—হোবে,—সোয়ামী—না—পায়—সোয়ামী—পা বে—।—লে—লে—গে—।"

* * * *

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন ম্লান অপরাহ্ন,—আকাশের বুকে

কালো মেঘ ঘন হইয়া আসিতেছিল, সাথে সাথে ঘন গম্ভীর গর্জ্জন। পুরুষেরা ফিরিতেছিল বাঁশবাজী সারিয়া, ভিক্ষা সারিয়া। নারীর দল মাদুলী, হাড়, কুমীরের দাঁত, বাঁশী, ঝুমঝুমি বিক্রয় করিয়া। তরুণীরা তখনও ফিরি করার বুলি পথে পথে বলিতেছিল—

"এ—খোখার—মা—,ঝুমঝুম—লে—বি,—এ—খোখার—মা—।"

আকাশের বুক চিরিয়া বাজের আলো ঝলকিয়া উঠিল, সে একটা অসহনীয় নীল তীব্র দীপ্তি; বাজ ডাকিয়া উঠিল,—সাথে সাথে শ্রাবণের ধারা।

মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া।

সে যেন তাণ্ডবে কোন বিরাট পুরুষের মাতামাতি!

সমস্ত বিশ্ব যেন স্তব্ধ—অবসন্ন; কিন্তু হা ঘরের ছেলের দল মাথায় দুটী হাত দিয়া জলের মাঝে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

ওদিকে তাঁবুর ভিতরে মাদল বাজে,—ওরা সব মদ খায়, পুরুষে গান গায়, মেয়েরা নাচে।

শুধু একটী ছেলে কাঁদিতেছিল, সে যেন ফুলের তোড়ার মাঝে সৌখীনের সখ-করিয়া-রাখা রেশমের ফুল;—এদের সঙ্গে খাপ খায় না,—কেমন নরম নরম গড়ন, মুখে বর্ষার কচি ঘাসের শ্যাম-লাবণ্য, মাথায় রুক্ষ চুলের মাঝে কেমন অস্তোন্মুখ কৃষ্ণাভ কোমলতা।

তার বয়সী একটী ছোট মেয়ে নাচিতে নাচিতে তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলে—

"আ—য়ো—।"

ছেলেটী উঠে না—;—তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মেয়েটী কহে—"আর—এ—তু—কান্‌চিস্—, আ—য়ো—আয়ো,—বরখা কে—পানিয়া গিরে হ্যায়,—আয়ো—নাচি, পানিয়া শিঁর মে—ধরি—।"

ছেলেটী হাত ছাড়াইয়া কহিল—

"নে হি গে।"

মেয়েটী জোর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া যেন বিশ্বের সকল বিস্ময় মুখে ও কণ্ঠে মাখিয়া বলে—

"তু ভিঁজবি ন, নাচবি ন, শুধু কান্‌বি? কাহারে ভাই—?"

ছেলেটারও বুঝি বিস্ময় লাগে—সেও সবিস্ময়ে কহে—

"কৌন জানে গে,—মেয়া দিল্ দুখাতা—। বাজ কে হাঁক লে ডর্—লাগে—গে—।"

ঘৃণাভরে হা-ঘরের মেয়ে বলে—"দূরা—ডর কোক্‌না, ডর লাগে—ক্যা রে; সব কৈ কো ত নাচনা লাগে—।"

ছেলেটী কথা কয়না, তিরস্কারে ওর চোখের জল বাড়ে, বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে;—ভাষাহীন কাঁদন, মুখে শুধু একটী কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার বাহির হয়—

"মায়—গে—এ—গে—মায়—।"

দীপ্ত প্রখর আঁখিদুটী ম্লান করিয়া মেয়েটী ছেলেটির কান্নার পানে চাহিয়া থাকে,—ভাবে—"মা তো তাহার ওই তাঁবুর ভিতর—তবু ও কাঁদে কেন?" শেষ সে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকে—

"এ গে—ননকু কে মায়—এ গে—সানিয়া—।" ননকু ত্রস্ত হইয়া কাকুতিভরা কণ্ঠে কহে—

"নেহি—গে—নেহি গে—কাজরী।"

ননকুর মিনতিতে কিন্তু ননকুর মায়ের আগমন রোধ হইল না। সে আসিয়া কাজরীর পানে চাহিয়া কহিল—

"কাহে—গে কাজরী—?

কাজরী কথা কয় না, কিন্তু ননকুর কান্না সকল কথা তাহাকে কহিয়া দিল—মত্তা উগ্রা নারী—উগ্রস্বরে কহে—

"রোতা কাহে—?"

ননকু কথা কয় না,—কাঁদে।

সানিয়া বাহু প্রসারিয়া ডাকে "আ য়ো বেটা।"

ননকু সরিয়া গিয়া কহে "নেহি।"

কাজরী সবিস্ময়ে কহে "মায় কে লিয়ে রোতে রহলি—মায়কে লিয়ে দিল্—দুখাতা তেরা'—।" ননকু প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহে—

"নেহি উ হামারা মা ন লাগি।"

"উ হামারা মা ন লাগি!" সানিয়ার মত্ত বুকে কথাটা প্রবল আঘাত দেয়। ওরে বেইমান শিশু, ওরে বিদেশী, ওরে ভিন্ গাছের চারা, না হয় তুই চুরী-করা ধনই হইলি, কিন্তু ঐ বুকে কি তুই স্নেহের সন্ধান পাস্ নাই! কার স্তন্যে, কার আদরে তুই এত বড় হইলি? তবু—তবু সানিয়া তোর মা নয়? সেই মনে-না-পড়া স্বজনই তোর আপনার হইল?

বিপুল ব্যর্থতার ক্ষোভ তাহার মদিরা-মত্ত মুক দ্বিগুণ হইয়া বাজে, বজ্র বুকে জাগে আক্রোশ, সে বিপুল রোষে কহে—

"ভর কোক্না, নড়াপুতা, তোর অন্ন দেওয়াই আমার বরবাদ গেল " বলিয়া সজোরে শিশুটির বাহু দুটি ধরিয়া ঝাঁকি দেয়।

মানুষ জন্ম-বিদ্রোহী, শিশুও শাসন মানিতে চায় না, ননকু সানিয়ার হাতে কামড় বসাইয়া দিয়া কহে—

"নেহি—তু হামারা মা নেহি, তু হামারা মা নেহি।"

কথার ঘায়, দংশনের যাতনায়, বন্যা নারী হইয়া উঠে যেন আহতা প্রতিশোধপরায়ণা মার্জ্জারী—চোখের প্রখর দৃষ্টি ভরা তারা দুইটা যেন দু'খানা গণগণে আগুন, বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, দাঁতে দাঁত ঘসিয়া কঠোর হিংস্র শব্দ হয় কট্ কট্ কট্ কট্! বিপুল রোষে ছেলেটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সানিয়া একখানা পাথর তুলিয়া মারিবার উদ্যোগ করিয়া কহে—

"আরে বেইমান, জান লেব তেরা হামি আজ।"

এবার ননকু ত্রাসে কাঁদিয়া উঠে।

কিন্তু হা-ঘরের ওই ছোট্ট মেয়েটা, ওই ছেলেটার সঙ্গিনী কাজরী, ও ভয় পায় না, সে লাফ দিয়া আসিয়া ননকুকে আড়াল করিয়া ননকুর মায়ের মত ভঙ্গীতেই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর মত দাঁড়ায়;—যেন উদ্যত-ফণা সাপিনীর সম্মুখে কিশোর সর্পশিশু ফণা তুলিয়া গর্জ্জায়!

ননকুর মায়ের হাত উঠিল কিন্তু নামিল না, তাহার নিক্ষেপের সকল শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল পিছনের আর এক প্রবল শক্তির আকর্ষণে; একজন দীর্ঘ পুরুষ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল।

ননকুর মা পিছন ফিরিয়া দেখিল তাহার স্বামী, ননকুর বাপ ডগরু সরদার।

অভিমান, লতার মত তাহার প্রকৃতি, অসহায় কিন্তু জটীল, নিরাশ্রয়ে ধূলায় লুটায়, কিন্তু আশ্রয় পাইলে জটীল বেষ্টনে ঊর্দ্ধলোকে সহস্র ফণা মেলিয়া জাগিয়া উঠে।

ননকুর মায়ের অভিমান এতক্ষণে সহস্র ফণা মেলিয়া জাগিয়া উঠিল; অভিমানরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "দেখ্, দেখ্ তু ভি দেখ্—বেইমানকে রকম দেখ্ তু; কাঁহাসে ভর কোক্না-

ডগরু বাধা দিয়া কহে—"রহে দে গে, রহে দে; উ বাত রহে দে—"

তার পর কোমল কণ্ঠে বুঝাইয়া কহে—

"সব হবে সময়ে সব হবে সানিয়া, তোর ছেলে, তোরই ভবিষ্যতের ভরসা, মানুষ ক'রে নে, তোরই ভবিষ্যতের ভরসা, মানুষ ক'রে নে, তোরই সুখ।"

ননকুর মা হাসে—মৃদু ম্লান হাসি; হতাশায় ভরা সে হাসি চোখের জলের চেয়েও করুণ, ওই হাসিতেই ডগরুর কথা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ননকুর মায়ের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগে বুকের মাঝে যে ব্যর্থতার কথাটা অহরহ বাজে সে কথাটা আজ বাহিরে না আসিয়া ছাড়িল না, সে কহিল—

"সুখ! বেইমান সুখ তুই খুব দিলি, আবার ওই বেইমান দেবে! একই জাতের বাচ্চারে তোরা, তোরা দুখ দিতেই জানিস।"

ডগরু অপরাধীর মত নীরবে মাথা নত করিয়া থাকে।

সানিয়া বলিয়া যায়—"তুই বলবি 'যতন তো করি', হাঁ যতন করিস; কিন্তু যতনই কি দুনিয়ার বিল্‌কুল? জানিস আজ তক একটা বছরের ভেতর তোর দরদ-ভরা আদর আমি কখনও পাই নি; তোর ওই কুত্তাটাও দরদের কদর বোঝে, বেদরদী হাত ওর পিঠে পড়লে ও ঘেউ ক'রে ওঠে।"

কথা কয়টা বলিয়াই ব্যথাহত নারী ত্বরিত পদ-বিক্ষেপে চলিয়া গেল, বুঝি কাঁদন আর বাঁধন মানিতেছিল না; তখন বজ্র বুকে ক্রোধ আক্রোশ, কি প্রতিশোধের উত্তেজনা ছিল না, ছিল শুধু দুনিয়ার চিরন্তনী উপেক্ষিতার ব্যথা ও ক্রন্দন

নারীটির মর্ম্মান্তিক অভিযোগে ডগরুর দীর্ঘ সবল দেহ-খানা যেন নিশ্চল পাথর হইয়া গেল, স্থির দৃষ্টি তাহার সানিয়ার গমন-পথের পানে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, চেতনার মধ্যে, তাহার সবল বুক কাঁপাইয়া পড়িল দীর্ঘ কম্পিত নিঃশ্বাস—।

সংজ্ঞা ফিরিল তাহার একটী কিশোর কোমল কণ্ঠের আহ্বানে, তাহার স্পর্শে, ননকু তাহার কোল ঘেঁষিয়া জানু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—"বা-প-জী-ঈ!"

ডগরু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্নেহার্দ্র কোমল দৃষ্টি ননকুর পানে ফিরাইল; এই দৃষ্টিটুকু ননকুর বড় ভাল লাগিত, তাহার মর্ম্মে গিয়া যেন স্ফূর্ত্তির দোলা দিত, এমন দৃষ্টিটুকু আর কাহারও চোখে সে খুঁজিয়া পাইত না, অপর সকলের দৃষ্টি যেন প্রখর, উগ্র, এ দৃষ্টির পানে চাহিয়া তাহার আঁখি-পাতা যেন মুদিয়া আসিত।

ননকুর মাথায় হাত বুলাইয়া ডগরু কহিল—"বেটা!"

ননকু তাহাকে আরও নিবিড়-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া ছোট্ট একটী উত্তর দিল—"উঁ!"

কাজরী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—"দূরো, উ কা রে ননকু, ওউরৎ কা মাফিক—উঁ।"

শেষ 'উঁ' টা কাজরী অবিকল ননকুর নকল করিয়া ব্যঙ্গের সুরে করিয়াছিল 'উঁ'!

এবার ননকু কিন্তু রুখিয়া উঠিল, সঙ্গিনীর ব্যঙ্গের বিষ, অবহেলার জ্বালা যে বড় তীব্র!

ছোট দুটী নরনারীর এ দ্বন্দ্ব দেখিয়া ডগরুর ম্লান মুখেও হাসি ফুটিল, সে ননকুকে কোলে টানিয়া বাধা দিয়া কাজরীকেই কহিল—

"নেহি গে কাজরী, ওই সন্ নেহি বোল্‌না গে; তোম দুনো কো সাদী হোগা।"

কাজরী সবল প্রতিবাদে সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"কভ্‌হি না, কভ্‌হি না, উ ডর কোকনাকে হাম সাদী না করব।"

ডগরু কহিল—"নেহি, নেহি, ননকু মেরা ডর্ কোক্‌না নেহি হ্যায়, উ মরদ হ্যায়—শের হ্যায়; যাও বেটা, দেখো জঙ্গল মে শের বরখা কে পানিয়া শির মে লে তা, পাঁখী পেঁড় পর বৈঠ্‌কে আস্‌মান্ করতা, গাছ পানিয়া লে তা, তামাম দুনিয়া পানিয়া লে তা—আউর তুম্ রোতে রহে গা।"

তীব্র নীল আলোকের সাথে সাথে বাজ ডাকিয়া উঠে, পাখীগুলা গাছে বসিয়া সভয়ে কলরব করিয়া উঠে, ননকুর দেহেও উত্তেজনার মাঝে ক্ষীণ চঞ্চকের শিহরণ বহিয়া যায়, ডগরু অনুভব করিয়া বলে—

"বিজলী গরজাতা রে বেটা, বিজলী গরজাতা—ডর কেয়া? মরদ তুম, তুম্‌কো ভি উসিন্ হাঁকনে হোগা, তামাম দুনিয়া চুপ হো যায় গা।"

কাজরী কহিল—"হাঁ তব্ হাম সাদী করব।"

ননকু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাজরীর হাত ধরিয়া সেই বর্ষণের মাঝে নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া পড়িল, বর্ষণের ঝর্ ঝর্ সুরের সঙ্গে দুটী শিশু-নরনারীর কোমল-উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—

"ঝমাঝম্ বরখা গিরে, হো হো ঝমাঝম্ বরখা গিরে।"

তাঁবুর দরজায় ডগরু সানন্দে মাদল লইয়া বসিয়া যায়—"ঘনাঘন্, ঘন্ ঘনাঘন্—"

বাজের ডাকে, হাওয়ার হাঁকে, বারিপাতের শব্দের সঙ্গে মাদলের ঘন্‌ঘনানি, শিশুর কণ্ঠ, অদূরে তাঁবুর মধ্যে মত্ত নর-নারীর গীতি-কলরোল সে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়।

* * *

হা-ঘরের দল, প্রান্তরের যাত্রী, তাঁবু ফেলে পথে বিশ্রামের তরে, সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের তরে। সংগ্রহের তরে দিনে বাজী দেখায় ভিক্ষা করে, রাত্রে গভীর অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়ে তীব্রগতি বিষধরের মত; সিঁধ কাটে, চুরি করে, ধরা পড়িলে বিষধরের মতই দংশন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

গৃহহীনের বাঁধা গৃহ আবার ভাঙে—রজনীর অন্ধকারে পাপ ঢাকিতে রজনীর অন্ধকারেই চলে, আবার সে পাপ না থাকিলে দিনের আলোকেও চলে; গৃহহীন—আবার গৃহহীন, ঘোড়ার পিঠে তাঁবু উঠে, সাপের ঝাঁপি উঠে, ছোট আসবাব পুরুষের পিঠে বাঁধা, নারীর পিঠে ছেলে; বালকের দল কেউ হাটে, কেউ ঘোড়ার পিঠে সাপের ঝাঁপির উপর পা রাখিয়া চলিয়া যায়, ভিতরে সাপ গর্জ্জায় হা-ঘরের ছেলে ক্রোধে ঝাঁপির উপর চাপড়ায়।

ননকু ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চলিতেছিল, পাশে ডগরু। ননকু উদাস দৃষ্টিতে প্রান্তরের পানে চাহে, গ্রামের শ্যামলিমা দেখিলেই তাহার দৃষ্টি ব্যগ্র হইয়া উঠে। সহসা সে ডগরুকে চুপি চুপি কহে—

"গাঁও ইস্ মে আচ্ছা।"

ডগরুর চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে,—সে কি ভাবে, তারপর কহে—"কাহে নন্‌কু—ময়দান আচ্ছা নয়? গাঁয়ের মাঝে খুপ্‌রির মত ঘর—যেন খাঁচা; ওই খাঁচার পাখীর মত থাকা ভাল? নেহিরে বেটা, কত দেশ দেখবি, কত জঙ্গল, কত পাহাড়, কত নদী, কত মুলুক দেখবি; ই তোহারা আচ্ছা ন লাগি?"

ননকু কথা কহিল না, এক দৃষ্টে সম্মুখের প্রান্তরের শূন্য বুক বুঝি সে জঙ্গল, পাহাড়, দরিয়া মুল্লুকের ছবি দিয়া চিত্রিত করিয়া ভরিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ওদিক হইতে কাজরী ঘোড়ায় চড়িয়া ননকুর দিকে চাহিয়া বন্য আনন্দে ঘোড়া আগাইয়া দিয়া কহিল—

'আ—য়ো, পাক্ড়ো তো হামে—দেঁ খি।' ননকুর সকল উদাসীনতা কোথায় ভাসিয়া গেল, সেও ঘোড়ার পিছনে ছড়ি কসিয়া ঘোড়া আগাইয়া দিল। ননকুর মা ডগরুকে হাসিয়া কহে—

"দেখ্ দেখ্—কাজরী পিছে ননকু—দেখ্ দেখ্।"

ডগরু এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেও হাসিল, তাহারও মনে পড়িল—কোন পিছনে-ফেলিয়া-আসা প্রান্তর, কোন অতীতের দ্বিপ্রহর, কি সন্ধ্যা, কি প্রভাতে একটী সখীর অনুসরণে সখা, শিশু নারীর পিছনে শিশু নর, সানিয়ার পিছনে ডগরু।

* * *

প্রান্তরের পথে অবিরাম যাত্রায়, বিশ্রামে, দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। বালক ননকুর দেহে শীতান্তের শ্যাম শোভার মত কৈশোরের লাবণ্য দেখা দেয়, দীঘল ক্ষীণ তনু চিক্কণ অথচ সুদৃঢ় পুষ্টতায় ভরিয়া উঠে। শৈশবের ভীরু চটুলতা টুটিয়া গেছে, পৌরুষের চঞ্চলতায় সে দড়ির উপর বাঁশ হাতে নাচে, শূন্যে ডিগবাজী দিয়া কসরৎ দেখায়, তাহার হাতের তীর পশুপাখীর বুক চিরিয়া রক্তের প্রবাহ বহাইয়া দেয়, অন্ধকার রাত্রে প্রান্তরের বুকে হাত পাড়িয়া শিয়াল কুকুরের ভঙ্গীতে ছুটিতে অভ্যাস করে, মুখে নিখুঁত শেয়ালের ডাক ডাকে, সিঁধের ভিতর দিয়া দীঘল দৃঢ় দেহ সবার চেয়ে ত্বরিত গতিতে পশিয়া যায়,—গায়ে তার ধুলাও লাগে না।

দিনের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের সে ভাল-না-লাগা সুর নিশান্তের ছায়ার মত দূরে বুকের মাঝে কোন নিবিড় খান্টীতে গিয়া লুকাইয়াছে। ধূসর রৌদ্রদীপ্ত প্রান্তরের বুকে কে যেন আজ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে; আর সেই মরিচীকা-সায়রের বুকে শৈশবসঙ্গিনী কাজরী, আজ সেও কিশোরী, পিঙ্গল উগ্র সৌন্দর্য্যে মরুর মায়ার মত নৃত্যচপল ভঙ্গিমায় তাহাকে উদ্দাম গতিতে ওই প্রান্তরের বুকে টানে।

ননকু তীর ধনুক লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া শিকার করিতে চলে, সাথে চলে তার বাচ্চা কুকুরটা, ননকু থমকিয়া দাঁড়ায়, সেও দাঁড়ায়, ননকুর মুখের পানে চায়, হুকুমের প্রত্যাশা করে। তীর ছুটিয়া গিয়া শিকারকে বিদ্ধ করে, সাথে সাথে কুকুরটা ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সহসা কে গাছের আড়াল হইতে সাড়া দেয়—"কু"!

ননকু শিকার ফেলিয়া ছুটে সাথে সাথে কুকুরটা। সেও বোঝে, এ খেলায় মাতিয়াছে, সেও খেলিতে চায়, সেও সাথে সাথে ছুটে। ননকু আসিয়া পরম আগ্রহে কাজরীর হাত দু'খানা চাপিয়া ধরে, কুকুরটা ওদের বেড়িয়া বেড়িয়া ছুটে, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ।

কাজরী ননকুর হাত দুখান ছাড়াইতে চায়, কুকুরটা ঝাঁপাইয়া ননকুর বুকে উঠিয়া আদর কাড়িতে চায়; কুকুরটাকে ঠেলিয়া দিতে কাজরী হাত ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া যায় আর হাসে খিল্ খিল্ খিল্।

কুকুরটা বাধা পাইয়া এক জায়গায় বসিয়া ওদের খেলা দেখে। কাজরীর ওই হাসিতে ননকুর কেমন নেশা লাগিয়া, সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা চন্ চন্ করিয়া বাহিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকে—

"কাজরী, কাজরী।"

কাজরী হাসিতে হাসিতে কৌতুক-চপল ভঙ্গীতে কহে—

"নেহি গে নেহি গে ননকু।"

হাতখানা 'না'র ভঙ্গীতে নাড়িয়া, দেহখানা ঐ বেগে তরঙ্গিত হিল্লোলে দুলাইয়া বলে—

"আয়ো হো, আয়ো হো।"

সে আহ্বান ননকু বোঝে, সে ছোটে কাজরীকে ধরিতে; কাজরী ধরা দেয় না। আবার দূরে সরিয়া যায়, আর সেই ভঙ্গীতে কহে—

"নেহি গে—নেহি গে ননকু।"

ওরা ছুটিতে ছুটিতে কতটা দূর গিয়া পড়ে, তখন কুকুরটা আবার ছুটে, কাছে আসিয়া পড়িয়া সে আবার বসে, মুখখানা হাঁ, জিভটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কুকুরটা যেন হাসে।

ছুটিতে ছুটিতে ননকু শেষ কাজরীকে ধরিয়াও ফেলে, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারে না; আঁচড় কামড় দিয়া ননকুর

মুষ্টি শিথিল করিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আবার গলায় আর ডাকে—"নেহি গে—নেহি গে।"

আঁচড়ে, কামড়ে ননকু রাগে না, আবার অনুসরণ করে, —যেন এ খেলার এই ধারা, যেন মার্জ্জার মার্জ্জারী!

প্রবল আবেগে সবল বেষ্টনে আবার ননকু কাজরীকে আকর্ষণ করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে, আঁচড়ে কামড়ে ছাড়ে না, উন্মত্ত চুম্বনে তাহার মুখ ভরিয়া দেয়, কাজরীও যেন এবার অবশ হইয়া আসে; এক অসীম রহস্য-ভরা আবেশ-মাখা দৃষ্টিতে ননকুর পানে চাহিয়া আবিষ্ট এলান সুরে কহে—

"নেহি গে—নেহি গে ননকু।"

ওরা দু'জনে গাছতলায় বসে, আর দুজনে দুজনে মুখ পানে চাহিয়া হাসে; এবার কুকুরটা আসিয়া ঠিক সম্মুখে বসিয়া লেজ নাড়ে আর আব্‌দারের সুরে 'আঁউ' করিয়া ডাকিয়া উঠে, ননকু ওর ঘাড়ে একটা পা তুলিয়া দেয়, কুকুরটা চিৎ হইয়া শুইয়া পাগুলা গুটাইয়া যেন এলাইয়া পড়ে, সন্তর্পণে কামড়ায়, মাটীতে আধখানা কাটা লেজ পটাপট আছড়ায়।

মরুর মোহে ননকু ডুবিয়া যায়।

তবু তাহার মনের কোণে থামিয়া-যাওয়া বাঁশীর সুরের রেশের মত কোন বিস্মৃত ভাল-না-লাগার সুর মেঘলা সাঁঝে, নিঃসঙ্গ পথমাঝে জাগিয়া উঠে। নিঃসঙ্গ পথমাঝে দীর্ঘশ্বাসে নীরবতায় যখন তাহা ফুটিয়া উঠে তখন কুকুরটা আদর চাহিয়া ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিয়া খানিকটা ছুটিয়া যায়, খেলায় ননকুকে আহ্বান করে, ননকু খেলে না, কিন্তু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করে। কোন গাছের তলে কুকুরটাকে বুকে চাপিয়া প্রান্তরের বুকে উদাসীন দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া কি যেন সন্ধান করে—কি যেন মনে করিতে চায়।

মেঘলা সাঁঝে তাঁবুর অদূরে প্রান্তরে বসিয়া সে যখন কি ভাবে - কাজরী আসিয়া শুধায়—

"এই সিন্—কাহে হো—নন্‌কু।"

ননকু কহে—"কৌন জানে গে, উদাস লাগি দিল।"

কাজরী আজ আর ঘৃণা করে না, পাশে বসিয়া আবেদনে, অভিমানে মিশাইয়া বলে—"ই তোহার কা রীত হো?"

ননকু মেঘের ছায়ার পানে চাহিয়াই কাজরীর হাতখানা আপন হাতের মুঠার মাঝে চাপিয়া ধরে।

কাজরী ননকুর বুকে মাথা রাখে; ওর স্পর্শে সারা দেহে ননকুর শিহরণ বহিয়া যায়, সকল উদাসীনতা কোথায় ডুবিয়া যায়, কাজরীকে বুকে চাপিয়া ধরে, কাজরী ওর চোখের পানে তাকায়, দেখে দৃষ্টিতে আবেশ আছে, উদাসীনতা নাই,—মত্ত দীপ্ত দৃষ্টি।

(ক্রমশঃ)

"ঘুমা ঘুমা বধু—"

[সুফী মোতাহার হোসেন]

আফিমের নেশা আজো টুটে নাই, ঘুমে ভরা দু'টি আঁখি—
সারা বছরের সঞ্চিত মধু
দিবে উপহার বিরহিণী-বধূ—
বসন্ত-দূত শিশির-শয়নে ডাকে তারে থাকি থাকি।

তাই ক্ষণে ক্ষণে সাড়া জাগে যেন, ঘুমঘোর যায় টুটি'—
দু'একটি ফুল ফুটি ফুটি করে
হেথা হোথা যেন সুগন্ধ ঝরে
সজিনা-শাখায় বেণীর বন্ধ খসি' খসি' পড়ে লুটি'।

ঘুমা ঘুমা বধূ, শেষ শ্বাস আজো ফেলেনি শীতল বায়।
আজিও হিমানী তোমারে ঘিরিয়া
কাঁদে সারা নিশি অঝোরে ঝরিয়া
সজল কুয়াসা আজো কত মতে তোমারে সাধিয়া যায়।

নিশার আঁধার কত বেদনায় শিশিরে শিশিরে গলি'
তুমি জান না ত তোমার আননে
তোমার কণ্ঠে, তোমার নয়নে
কি মায়া ঢুলায় সুদূর শশীর কিরণে কিরণে ঝলি'।

ঘুমা ঘুমা বধূ, আজো আসে নাই সে কালো ভোমরা পাখী
প্রাণবন্যায় ফুলের দীপালি
ফাগুন আগুন দেয় নাই জ্বালি',
রঙের বাসর সাজে নাই আজো, সকলি রয়েছে বাকি।

কবে বনানীর রিক্ত শাখায় ঘন-পল্লব-লিখা—
নব জীবনের সবুজ নেশায়
জাগিয়া উঠিবে বিপুল ব্যথায়
অশোকে শিমুলে জ্বলি' জ্বলি' যাবে রক্ত-প্রদীপ-শিখা।—

মর্ম্মর রবে ডাক দেবে কবে ফাল্গুনী যাদুকর—
বাসর সাজায়ে মাধবী-কুঞ্জে
সেদিন জাগিও লাবণি-পুঞ্জে
সুরভি-সোহাগে রক্তিম-রাগে সার্থক সুন্দর।

মূল্যের কথা

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

আপেক্ষিকতা-বাদের কল্যাণে আজকাল আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে আমাদের জ্ঞানের জগতে যা-কিছু নিয়ে ব্যবহার চলছে সে সবই হচ্ছে আপেক্ষিক ভাবে সত্য। Absolute অর্থাৎ অন্য-কিছু-নিরপেক্ষ একেবারে আপনারি স্বতন্ত্র সত্তায় সত্য হ'য়ে কিছু আছে কিনা তা নিয়ে আজকাল অনেকের মনেই সন্দেহের আন্দোলন আলোড়ন চলেছে। ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য, উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, সোজা-বাঁকা এসবই যে আপেক্ষিক ভাবে সত্য, এরা যে সব কালে, সব দেশে এক এবং অবিকৃত রূপ নিয়ে থাকতে পারে না তা নিয়ে আজ আর তর্ক নেই।

তবু মানুষের মন সেই আদিকাল থেকে আপেক্ষিকতার উর্দ্ধে absolute স্ব-নিষ্ঠ, স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান ক'রে চলেছে; সে চেয়েছে চির সত্যকে, চির সুন্দরকে, চির কল্যাণকে যা কালের নিশ্বাসে মলিন হয় না, দেশের পট-পরিবর্ত্তনে যার স্বরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় না।

মানুষের একান্ত নিজস্ব এবং খাঁটি মূল্য কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্নটাও মনের সেই প্রবৃত্তি থেকেই জন্মলাভ করেছে।

মানুষের অভিজ্ঞতায় সবই আপেক্ষিক, এই আপেক্ষিকতার হাত থেকে কোনো কিছুকেই বাঁচানোর উপায় নেই। কেউ কেউ বলেন, আপেক্ষিকতার মাঝ থেকেই মানুষের মনে স্ব-নিষ্ঠতার 'কল্পনা' জেগেছে, কিন্তু কেউ কেউ বলেন, যদি স্বনিষ্ঠ সত্যই না থাকবে তো আপেক্ষিক জগতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কার প্রতিবিম্ব এত বিচিত্র হ'য়ে পড়ছে?

আপেক্ষিক তত্ত্বের বড় বড় জটিল সমস্যা সমাধানের দুশ্চেষ্টা করার প্রয়োজনও আপাততঃ নেই, সুতরাং আসল যে-কথাটা হঠাৎ ওই আলোচনাটাকে টেনে আনল, সেই কথাটাই বলি। মানুষের মূল্যের কথা ভাবছিলাম, এবং তার উঠতি-পড়তি, নানান্ লোকের কাছে একই মানুষের মূল্যান্তরের কথা মনে পড়ল, আর কোন্ মূল্যটা সেই মানুষের যথার্থ মূল্য তাও মনকে প্রশ্ন করলাম, এই করতে গিয়েই চিন্তার ধারা সিন্ধবাদের ভেলার মত ঘনান্ধকার আপেক্ষিক তত্ত্বগুহায় এসে প্রবেশ করল। সেই অন্ধকারে নানারকমের কথাই তারার মত জ্বলছে, সেগুলো তারা, না জ্যোতির্ম্ময় পাথরের টুকরো, না আরো-কিছু তা কে বলবে? সুতরাং ভেতরে প্রবেশ না ক'রে বাইরে থেকে মূল্য সম্বন্ধে জল্পনাগুলোকেই সম্মুখে উপস্থিত করছি।

হাঁ, মানুষের মূল্যের—তার আপেক্ষিক মূল্যের কথা ভাবতে বসে একেবারে ডাল-চালের দামের কথাও মনে এসে পড়ল, একটা জায়গায় মানুষের সঙ্গে ডাল-চালের তফাৎও নেই। ডাল চালের মূল্য বিচার করি আমরা মানুষের চাহিদার সম্পর্কে। মানুষের মূল্য-বিচার করি আমরা সমাজ সম্পর্কে, state বা রাষ্ট্র-সম্পর্কে, কিম্বা সঙ্ঘগত ধর্ম্ম-সম্পর্কে। ডাল-চালের আবির্ভাব বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় ঘটেছিল, কিন্তু সেটা কি মানুষেরই ক্ষুধা মেটানোর অভিপ্রায় নিয়ে? ধানের শীষ যখন হরিৎ ক্ষেত্রে হিল্লোলিত হয় তখন মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধিরই আশায় সে নৃত্য করে, না, তার অন্তরে মানুষের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ আর কোনো অনুভূতি তাকে আনন্দিত করে' থাকে? যদি ধানের গাছের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের কোনো সার্থকতা আছে ব'লে স্বীকার করা যায় তা হ'লে সেই সার্থকতাই তার নিজস্ব মূল্য ব'লে মানতে হবে আর মানুষ ডাল-চালের যে মূল্য নির্দ্দেশ ক'রে থাকে সেটাকে তার মূল্য ব'লে স্বীকার করাই এক হিসেবে ভুল হবে। বাস্তবিক ভেবে দেখতে গেলে কি তাই মনে হয় না? মানুষ ডাল-চালের যে মূল্য দেয় সেটা তো তার ক্ষুধা-নিবৃত্তির মূল্য, সত্যি বলতে গেলে ওতো ডাল-চালের মূল্য নয়। কোনো বস্তু-বিশেষের মূল্য বুদ্ধি দিয়ে আমরা কি শুধু আমাদের ভেতরকার অভাবের গুরুত্ব নির্দ্দেশ মাত্র করি না? মানুষের মূল্য সম্বন্ধেও কি তেমনি এই সমাজ বা রাষ্ট্র বা সঙ্ঘগত ধর্ম্ম মানুষের অর্থাৎ মানুষের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের মূল্য নির্দ্দেশ করেছে এটা কি সত্যি মানুষের মূল্য? সমাজ তার সুবিধা অসুবিধা দিয়ে

কতকগুলি ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিতের মূল্য সৃষ্টি করেছে; সেই মূল্য নির্ভর করছে সমাজের বিশেষ রুচি এবং তদনুযায়ী অভাবের গুরুত্বের ওপর। যেখানে বহু-পত্নীত্ব সমাজের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুকূল সেইখানে বহু-পত্নীত্ব একটা ভালো জিনিস বলে' স্বীকৃত; যার বহু পত্নী আছে তার মূল্যই তখন বেশি—আবার অন্য স্থানে ওই একই হিসেবে একপত্নীত্বের মর্য্যাদা বেশি। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে দেখতে পাই যে, কি ডাল-চালের, কি মানুষের, কারু সত্যকার intrinsic দাম নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। সর্ব্বত্রই চল্‌ছে কাগুজে মুদ্রার মত একটা মিথ্যা মূল্যারোপ। আমরা যে মূল্য দেই সেটা বিশেষ একটা অভাবের আর সেই অভাব হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বস্তু। সত্যিকার ভালো লোক এবং মন্দ লোক আছে কিনা, যদি থাকে তো সে কি, এই সব absolute তত্ত্বালোচনার এখানে প্রয়োজন নেই আপাততঃ, কারণ আমরা যে-মূল্য নিয়ে কথা কই সে মূল্য হচ্ছে আমাদেরই দৈহিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক অথবা তথাকথিত ধার্ম্মিক অভাববোধের একটা পরিমাণ মাত্র। আজকের সমাজে যে-মানুষটি আদৃত এবং সম্মানিত হচ্ছে সে-মানুষটির এই আদর এবং সম্মান তার inherent এবং absolute মূল্য নয়; এই মানুষটি বর্ত্তমান সমাজের অভাব পূরণের পক্ষে উপযোগী ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে এই মাত্র। ভবিষ্যতের সমাজে এই মানুষটির দর হয়ত খুব প'ড়েও যেতে পারে, এমন কি পৃথিবীর অন্য সমাজেও হয়ত এ মানুষটির আজই কোনো মূল্য নেই। আর এ থেকেই এও বোঝা যাচ্ছে যে এই যাকে আমরা মানুষটির মূল্য বল্‌ছি এটা তার যথার্থ মূল্যও নয়। কারণ, যদি তাই হ'ত তা হ'লে কোনো কাল এবং কোনো দেশই একে অস্বীকার করতে পারত না। আর যত দূর দেখা যাচ্ছে এ জগতে ওই absolute মূল্যের কোনো স্থানও নেই। আমরা এখানে সব জিনিসের এবং সব মানুষের মূল্য নির্দ্দেশ করছি আমাদের নানা অভাবের খাতিরে; তা নইলে দর-কসাকসির কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই।

এখন কথা হচ্ছে, এই যে একই মানুষের নানা কালে এবং নানা স্থানে নানা মূল্যের সম্ভাবনা, এই সব মূল্যের কোনোটাকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া চলে না। পূর্ব্বেই দেখেছি যে মূল্যটা হচ্ছে অভাবেরই একটা পরিণাম মাত্র। একটা বেদানার কথাই ধরা যাক্। যে-দেশে বেদানার বন রয়েছে সেখানে আর যে-দেশে বেদানা নেই সেই দেশে একই বেদানার মূল্য ভিন্ন, এ আমরা জানি। বেদানা কয় ত একই, তার মধ্যে গুণগত কোনো প্রভেদই নেই এ মেনে নিলেও দেখতে পাই দেশের ভিন্নতায় এর মূল্যের ভিন্নতা ঘটেছে। একস্থানে তার দাম এক পয়সাও নয় আর অন্য স্থানে তার দাম আট আনা দিয়েও মেটানো যায় না। এর মানে কি? এর মানে পাই ওই মানুষের অভাববোধের মধ্যে। আসল কথা মূল্যটা সত্যই বেদানার নয়; এ মূল্য হচ্ছে ওই অভাবের মূল্য। কোনো রুগীর প্রাণের মূল্যে এই বেদানারই মূল্য আরো অনেক বেশি হ'তে পারে। ফলতঃ 'বেদানার অভাব' কথাটা বল্‌তে এক শোনালেও, এই অভাব স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে ভিন্ন হ'তে বাধা এবং এই বিচিত্রতর অভাবের কোনোটিকেই কোনোটির চেয়ে ছোট ব'লে মনে করা যেতে পারে না।

সুতরাং মানুষের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে তার অভাব দিয়ে। যেখানে যে-মানুষের অভাব যত বেশি সেইখানে সেই মানুষের মূল্যও তত বেশি। সমাজ, রাষ্ট্র, সঙ্ঘধর্ম্ম থেকে মানুষের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে আর আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অনুসারে মানুষকে বিচার করছি এইটেই নিত্য চোখে পড়ে। গমের দর যেমন কৃষকের হাতে নয়, তাকে যেমন বাজার বিশেষের ওপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি মানুষের দরও নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে বিশেষ বিশেষ সমাজের রাষ্ট্রের এবং ধর্ম্মের বাজারে। 'অমুক মানুষটি ওখানে না হ'য়ে যদি এখানে হতেন তো হ'লে তিনি কত বড়ই না হ'তে পার্‌তেন', 'অমুক যদি অমুক সময় না জন্মিয়ে এই সময় জন্মাতেন তা হ'লে পরে তিনি কত কাজই না ক'রে যেতে পার্‌তেন' এমনি ধরণের কথা দিয়ে যে আমরা মানুষের কাল্পনিক মূল্য নির্দ্দেশ ক'রে থাকি সেটা নিছক কাল্পনিকই এবং তাকে মনের কুহক এবং আশার ছলনা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আপেক্ষিক মূল্য নিয়েই যখন বিচার তখন সেখানে আবার কাল্পনিক দেশ-কালের মধ্যে ব্যক্তিকে স্থাপন করবার অবকাশ কোথায়? ব্যক্তিকে তার দেশ-কালের বিশিষ্ট ক্ষেত্রের সম্পর্কেই বিচার ক'রে তার মূল্য নির্দ্দেশ করতে হবে। কোনো বিশেষ কাল এবং দেশেরই যখন একটা absolute সত্যতা নেই তখন ও চেষ্টা বৃথা; শুধু ব্যর্থ-জীবনের সাময়িক সান্ত্বনা হয়ত এতে হ'তে পারে।

সেদিন পথ দিয়ে যেতে যেতে একটা মজার দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা দাড়িওলা লোক কোট প্যান্ট আর হ্যাট লাগিয়ে কি হাতে নিয়ে যেন ফেরি করছে; প্রথম দৃষ্টিতে কিন্তু তার ফেরি করাটা চোখেই পড়েনি, কারণ তার বিচিত্র সাজ-সজ্জাই আমার সমস্ত মনকে আকৃষ্ট ক'রে ছিল, তার হ্যাট কোট প্যান্টের সর্ব্বত্র হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজী, বাংলায় কি জানি কত কি লেখা ছিল, প্রথম ভেবেছিলাম বুঝি ভগবানের নামের ছাপ মেরেছে; পরে দেখলাম তা নয়, কোনো বস্তু-বিশেষের বিজ্ঞাপন সে তার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে, পায়ের কাছ থেকে সুরু ক'রে মাথা অবধি, দাড়িটাও তার নিজস্ব নয়, আর চোখ দু'টোকেও সে কালো-চশমা দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রেছে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য হিসেবে তাকে সেদিন খুব উপভোগ করেছিলাম। কিন্তু এই মাত্র তার কথাটা মনে পড়ল যখন, তখন দেখছি ও দৃশ্যটা অদ্ভুত যতই হোক্, অসাধারণ মোটেই নয়। একটু ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলে সমাজের প্রায় মানুষকেই এমনি এক একটি সজীব সচল বিজ্ঞাপন ব'লে মনে হ'তে পারে।

আমাদের খাওয়া-বসা, চলা-ফেরা, কথাবার্ত্তা, কাজ-কর্ম্ম, চাল-চলন এর কোথাও কি আমরা আমাদের প্রকাশ ক'রে থাকি? আমাদের ব্যক্তিগত নিজস্ব রূপ বা মূল্য যা-কিছু আছে বা থাকতে পারে তাকে যথাসাধ্য আড়াল ক'রে কি সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম্মেরই প্রচলিত কথাবার্ত্তা কায়দা-কানুন রীতি-নীতি আত্মপ্রকাশ করছে না? সমাজ রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম মানুষের যে একটা traditional পুরাপ্রচলিত মূল্য নির্দ্দেশ করেছে সেই মূল্যেই মানুষের বিচার চলেছে দেখতে পাই।

এখানে অবিশ্যি একটা কথা স্বতঃই মনে না হ'য়ে যায় না, এই যে মূল্য-নির্দ্দেশ এও তো মানুষই করেছে; মানুষের জীবনের এই যে সামাজিক রাষ্ট্রিক এবং ধার্ম্মিক মূল্য-নিরূপণ এর traditional standard প্রচলিত মাপকাঠি দিয়েই হচ্ছে একথা স্বীকার ক'রেও তো বলতে হয় যে এই মাপকাঠিও মানুষেরই প্রবর্ত্তনায় হ'য়েছে। মানুষের এই যে প্রবর্ত্তনা এটা মানুষেরই অন্তর-উদ্ভূত, না, যুগের প্রেরণা মানুষকে নতুন বিচারে প্রবৃত্ত করে সে কথা বলা শক্ত। সে যাই হোক্ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে মানুষের মনে অভাবের তারতম্য ঘটে, আর সেই অনুসারে তার নানা বস্তু এবং নানা রকমের মানুষ সম্বন্ধে ধারণারও তারতম্য ঘটে। আজ মানুষ যার একটা বিশেষ মূল্য দিয়ে আসছে অভ্যাসবশে কিছুকাল ধ'রে সেই মূল্যই দিয়ে যাবে এটা তার অভ্যাস। কিন্তু একদিন আসবেই যখন কোনো একটি বিশেষ মানুষ হয়ত দাঁড়িয়ে মূল্য পরিবর্ত্তন ঘোষণা করবে, তখন জনসাধারণ অকস্মাৎ চকিত হ'য়ে দেখবে যে সব জিনিসেরই পুরানো দর বদলে গেছে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় মানব-সমাজে এমনি একটা মূল্যান্তর ঘোষিত হ'য়েছিল।

মানব-সমাজে রাষ্ট্রে ধর্ম্মে এই মূল্য পরিবর্ত্তনের দিন একটা যুগান্তরের দিন। যে-সব মানুষেরা পুরাভ্যস্ত মানব-সমূহকে এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলেন তাঁদের আমরা নবযুগস্রষ্টা ব'লে অভিনন্দিত ক'রে থাকি। যুগ পরিবর্ত্তনের ফলে অভাবের রূপান্তর ঘটে ব'লেই তার ঘোষণাকারীর আবির্ভাব হ'য়ে থাকে না, বিশেষ বিশেষ মানুষ এই জগৎ এবং জীবনের এক একটা নতুন মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন ব'লেই এদের রূপ বদলায় সে কথা বলা শক্ত; হয়ত দু'টোই সত্য। যদি সর্ব্বসাধারণের মনে ধীরে ধীরে অগোচরে অভাবের রূপান্তর না ঘটে তা হ'লে কোনো বিশেষ মানুষের কণ্ঠই সমূহগত ভাবে মানুষকে মূল্য পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু নতুন মূল্য উদ্ভাবন না হ'লেও অন্ততঃ আবিষ্কার ক'রে থাকেন বিশেষ বিশেষ মানুষেরাই। ওই যে এমার্সন বলচেন—

"Every new mind is a new classification. If it prove a mind of uncommon activity and power,......it imposes its classification on other men, and lo! a new system." একথা সত্যি। এমনি ধারা নতুন মন, যা পুরানো অভ্যাসকে বর্জ্জন ক'রেছে, নতুন মূল্য আবিষ্কার করে জীবনের সর্ব্বত্র। নীট্‌সের কথায় এদেরই সম্বন্ধে বলতে পারা যায়,

"Not around the inventors of noise but around the inventors of new values, doth the world revolve; inaudibly it revolveth."

অনাহূত

[শ্রীকনকচাঁপা মুখোপাধ্যায়]

[বেলজিয়মের কবি মরিস্ মেটারলিঙ্ক একাধারে কবি, নাট্যকার এবং প্রবন্ধকার। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কি কবিতা, কি নাটক সকল বিষয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার বহু গ্রন্থ ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

মেটারলিঙ্ক ছিলেন নিয়তির কবি। নিয়তির নিকট মানুষের ইচ্ছা কত ক্ষুদ্র, কত শক্তিহীন, নিয়তি বাজ পক্ষীর ন্যায় লুব্ধ দৃষ্টিতে মানুষের ইচ্ছার দিকে তাকাইয়া আছে। সুযোগ পাইলে ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর হইয়া মানুষের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াও দিতেছে। এই নিয়তিকে ঠেকাইবার জন্য মানুষ নিরন্তর কত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সব বৃথা! মৃত্যুকে অর্গল দিয়া আটকাইয়া রাখা যায় না। মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। কোথাও বিপদ নাই, হয়তো একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। অমনি কোথা হইতে নিয়তি আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরে। যদি বা ক্ষণিকের সুখের সূর্য্য দেখা গেল, আবার পরক্ষণেই সেই অনন্ত আঁধার।

কিন্তু মেটারলিঙ্কের বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রকাশ ভঙ্গিতে। আসল জিনিষটা প্রায়ই তিনি চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া বর্ণনা করেন। আশপাশ (environment) বর্ণনায় আসল জিনিষটা এমন সুন্দর (vivid) ফুটাইয়া তুলেন যে তাহাতে মনে হয় যেন ঘটনাগুলি চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে। হয়তো তিনি দেখাইতেছেন, একটা শান্তিময় গৃহস্থের উপর নিয়তির ক্রূর দৃষ্টি কেমন ভাবে পড়িতেছে। কিন্তু তিনি সেই গৃহস্থটাকেই চক্ষের অন্তরালে রাখেন। দরদী কবি নিয়তির ভীষণ দৃষ্টি কেমনভাবে গৃহস্থের উপর পড়িল, তাহা চোখের সামনে ধরিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, ভয় করেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাকৌশলে কোথাও আসল জিনিষটার একটু অভাব বোধ হয় না।

তাঁহার যাবতীয় লেখার মধ্যে Blue Bird (নীল পাখী) নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা একখানি রূপক। Blue Birdকে তিনি আমাদের পরমপ্রাপ্তি বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই Blue Birdকে ধরিবার জন্য মানুষের নিরন্তর কি প্রচেষ্টা; মরীচিকার মত সারা জীবন তাহাদিগকে ঐ Blue Birdএর পিছন ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। Blue Bird ধরিতে গিয়া আমরা কতবার টিলটিলের মত ভূত, প্রেত, দৈত্য, রোগ, শোকের কবলে পড়ি। তবু পাইবার আশায় আবার খুঁজিয়া বেড়াই। হয়তো বা মিলে। কিন্তু আমাদেরও টিলটিলের দশা হয়। টিলটিল Blue Birdকে লইয়া যেমন স্বপ্নপুরী হইতে চলিয়া আসিল, Blue Bird অমনি রঙ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। কবি বড় দুঃখে দেখাইয়াছেন Blue Bird আমাদের এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় বড় শীঘ্র রঙ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। দুনিয়ায় আমরা যদি বা ক্ষণেকের জন্যও তাহাকে পাই, তবু টিলটিলের হাত হইতে তাহার প্রতিবেশীর কন্যাকে Blue Bird দিবার সময় একটু অসাবধানতার জন্য সে উড়িয়া যায়। মেটারলিঙ্ক নিজে একজন ভাল নাট্যকার ছিলেন। রুটি, জল, আলো, ইত্যাদির পরিচ্ছদ নির্দ্দেশেই তাহা বুঝা যায়। পরিচ্ছদ দেখিয়াই কে কিসের অভিনয় করিতেছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। এই নাটকখানির ভিতর বেড়াল, কুকুর, গাছপালা ইত্যাদির বৈচিত্র্য থাকাতেই এতবড় একখানি রূপকও এমন সাধারণের চিত্তাকর্ষক ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী হইয়াছে। তাহা ছাড়া কবি কতকগুলি মূক-প্রাণী ও উদ্ভিদকে মুখর করিয়া তাহাদের বুকের ভাষা সকলকে শুনাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সকল প্রাণীর চরিত্রগুলিই বেশ প্রতীক হইয়াছে। কুকুরের প্রভুভক্তি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Mary Magdalene ইঁহার একখানি তিন অঙ্কের নাটক। ইহাও জনপ্রিয়। ইহার বিষয়-বস্তুতে মৌলিকত্ব নাই। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গী সম্পূর্ণ অভিনব। খ্রীষ্টের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা এবং তাঁহাকে ক্রুশ বিদ্ধ করার কাহিনী নিয়া ইহা রচিত। তিনিই নাটকের প্রধান চরিত্র কিন্তু সারা নাটকের অভিনয়ের মধ্যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না। তিনি পরোক্ষেই থাকিয়া যাইবেন। কিন্তু বর্ণনার চাতুর্য্যে আমরা নাটকের অভাব বোধ করিব না। রঙ্গমঞ্চে না দেখিয়াও তাঁহার অলৌকিকত্বের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। শুধুই হৃদয়ঙ্গম করা নহে;—পরোক্ষে থাকিয়াও প্রত্যক্ষের মতই মনের মধ্যে তিনি এমন একটা ছাপ দিতে থাকেন যে দর্শক প্রত্যেক দৃশ্যের প্রারম্ভেই আকুল আগ্রহে তাঁহারই প্রতীক্ষা করে। কিন্তু না পাইয়াও তাঁহার অভাব বোধ করে না। তাঁহার নাটিকাগুলির মধ্যে Tintagiles সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; মেটারলিঙ্কের মতে ইহা শুধু নাটিকাগুলির

মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা তাঁহার যাবতীয় নাটকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

Interior তাঁহার আর একটি নাটিকা। ইহাতেও নিয়তির দুর্ব্বোধ্য, অলঙ্ঘনীয় নিয়তিরই পরিচয় পাই। ইহাতেও প্রধান চরিত্রগুলি অন্তরীক্ষে রাখা হইয়াছে।

তাঁহার প্রবন্ধগুলিতেও ঐ সুর। Death; Our Eternity; The Unknown Guest; The Wreck of the Storm ইত্যাদি প্রবন্ধ বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

তাঁহার কবিতাগুলি Bernard Miall কর্ত্তৃক ইংরাজী পদ্যে অনুদিত হইয়াছে।

The Betrothal; The Treasure of the Humble; Wisdom and Destiny; The Life of the Bee; The Buried Temple; The Double Garden; Life and Flowers; Monna Vanna; Pelleas and Melisanda; Old-fashioned Flowers; Hour of Gladness ইত্যাদি তাঁহার বহুগ্রন্থ জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভাষায় অনুবাদের বাহুল্য না থাকায় বঙ্গভাষা শীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অনুবাদ না হইলে কোন দেশের কোন ভাষাই বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে না। মৌলিকত্বের লোভ সংবরণ করিয়া আজকালকার বঙ্গভাষার অসংখ্য লেখক যদি অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা কতকগুলি অন্তঃসারহীন গল্প এবং কবিতার সমষ্টি না হইয়া সত্যিকার একটা ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। সম্প্রতি দুই একখানি অনূদিত পুস্তকের কাট্‌তি দেখিয়া বুঝা যায় যে বঙ্গের পাঠকগণ বিশ্বসাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। আজকাল কিছু কিছু অনুবাদ দেখিয়া আশাও হইতেছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "অনাহুত" মেটারলিঙ্কের 'Intruder' নাটকখানির অনুবাদ। এই ধরণের অনুবাদ হওয়া যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

—শ্রীকালীপদ হাজরা]

[পুরাণো ধরণের বাড়ীর একটী স্বল্পালোকিত ঘর। সাম্‌নে ও পিছনে দুটী দরজা। এক কোণে একটী ছোট দরজার চিহ্ন পাওয়া যায়। পিছনে সবুজ রঙের কাঁচের সার্সি। ছাদের দিকে যাবার একটী ছোট কাঁচের দরজা। একপাশে ঘরে একটী বড় ঘড়ি টাঙানো। কেরোসিনের একটী বড় ল্যাম্প টেবিলের উপরে জ্বলছে]

মেয়ে তিনটী

এসো দাদামশায়। এই আলোর কাছ ঘিরে তুমি বসো—

মাতামহ

এখানে বেশী আলো নেই বলে' আমার কেবলই মনে হচ্ছে যেন—

পিতা

আমরা এখানে থাক্‌ব না ছাদে যাব?

কাকা

এখন থাকা কি ভাল হবে? এক'দিন ধ'রে ত অনবরতই বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে খুব স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা হবে না কি?

জ্যেষ্ঠা কন্যা

তারাগুলো এখনও আকাশে জ্বলছে?

কাকা

তারা! ও কিছু না!

পিতামহ

আমাদের এখানে থাকাই ভালো। কখন কি হয় তাত কেউ জানে না?

পিতা

এখন আর কোন চিন্তার কারণ নেই। বিপদ কেটে গেছে, ওর জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই।......

মাতামহ

আমার যেন কেন শুধু মনে হচ্ছে সে ভাল নেই......

পিতা

আপনি একথা ব'লছেন কেন?

মাতা

আমি তার কথা শুন্‌তে পেয়েছি।

পিতা

কিন্তু ডাক্তারেরা বল্‌ছেন যে তার সম্বন্ধে আমাদের ভাববার কিছু......

কাকা

দাদা, তুমি ত' জান তোমার শ্বশুর আমাদের ভয় দেখাতে ভালবাসেন !……

মাতামহ

ঠিক তোমাদের মত ক'রে এই সব ব্যাপার আমি ত' দেখ্‌তে পারিনে কিনা !

কাকা

তা হ'লে আমরা যারা দেখ্‌তে পাচ্ছি তাদের কথাই আপনার বিশ্বাস করা উচিত। আজ বিকেলেও তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন, এখনও তিনি বেশ ঘুমুচ্ছেন। কাজেই এই কয়দিনের পরিশ্রমের পর এই দিনটাকে আমরা নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে পারি না। আমার মনে হয় অন্ততঃ আজ আমাদের নিশ্চিন্ত হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ নয়—অধিকারই আছে। নিশ্চিন্ত ভাবে আজ সন্ধ্যায় যদি আমরা একটু আমোদ করি তা হ'লে মোটেই দোষের হবে না।

পিতা

তা ঠিক, সত্যিই এতদিনের পর আজ আমরা সবাই যেন একটু সোয়াস্তি বোধ করছি।

কাকা

অসুখ যখন একবার পরিবারের মধ্যে ঢোকে, তখন মনে হয় যেন কেউ একজন বাইরের লোক জোর করে' এসে আস্তানা গেড়েছে।

পিতা

তুমি ত তাহ'লে বুঝেছ, যে পরিবারের বাইরে কারুর উপরে নির্ভর করা নিরর্থক !

কাকা

হাঁ, নিশ্চয়ই…

মাতামহ

আমার মেয়েকে আজ দেখতে পাওয়ার বাধা কি ?

কাকা

আপনি ত ভাল করেই জানেন—ডাক্তার বারণ করেছেন।

মাতা

আমার সব ভাবনা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে……

কাকা

মিছে ভাবনা করা বোকামি—

মাতা—(বাঁ দিকের দরজা দেখাইয়া)

এখান থেকে বোধ হয় সে আমাদের কথা শুন্‌তে পায় না ?

পিতা

বেশী চাৎকার ক'রে কথা বলা ঠিক হবে না। দরজা-গুলো খুব পুরু অবশ্যি। তার সঙ্গে ঘরে নার্স রয়েছে, আমরা চেঁচামেচি ক'র্‌লে সে হয়ত সাবধান ক'রে দেবে।

মাতামহ—(ডান দিকের দরজা দেখাইয়া)

ছেলেটী আমাদের কথা শুনতে পায়না নিশ্চয়ই ?

পিতা

না, না—

মাতা

ওকি ঘুমিয়ে আছে ?

পিতা

আমার তাই মনে হয়

মাতামহ

কারুর গিয়ে দেখে আসা ভাল নয় কি ?

কাকা

তোমার স্ত্রীর চেয়ে ছোট্ট ছেলেটীই আমাকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। আজ কয় হপ্তা ধরে' ত' ওর জন্ম হ'য়েছে কিন্তু এর মধ্যে একবারও ন'ড়ে চ'ড়ে নি। এমন কি একবারও কাঁদেও নি ! যেন একখানা মোমের পুতুল !

মাতামহ

আমার মনে হ'চ্ছে যেন ছেলেটী কালা হবে—বোধ হয় বোবাও হবে—এ রকম বিয়ের ফল যা হ'য়ে থাকে !

(গুম্ হ'য়ে রইলেন)

পিতা

তার মাকে সে যত কষ্ট দিল, সে জন্ত ওর মঙ্গল কামনা ক'র্‌তে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না।

কাকা

সে অজ্ঞান,—ওর আর দোষ কি ! একাই ও ঘরে আছে নয় ?

পিতা

হাঁ, ডাক্তারেরা মায়ের সঙ্গে এক ঘরে ওকে রাখ্‌তে রাজী হচ্ছে না।

কাকা

কোনো নার্স কি তার সঙ্গে আছে?

পিতা

না তিনি একটু বিশ্রামের জন্য গেছেন। এ ক'দিন বেচারীর একটুও বিশ্রাম জোটে নি। সরলা, মা একবার দেখে এসো ত' সে ঘুমিয়েছে কিনা?

জ্যেষ্ঠা কন্যা

আচ্ছা, বাবা।

(মেয়ে তিনটি হাত ধরাধরি করে ডান দিকের ঘরে গেল)

পিতা

তোমার বোন্ কখন আস্‌বেন?

কাকা

বোধ হয় ন টার সময়।

পিতা

ন'টা ত বাজল। আস্‌বেন ত' তিনি? আমার স্ত্রী তাঁকে দেখ্‌বার জন্য ভারী ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছেন।

কাকা

সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। এই বাড়ীতে আসা কি তার এই প্রথম?

পিতা

এ বাড়ীতে তিনি আর আসেন নি।

কাকা

তাঁর আশ্রম ছেড়ে আসা ভারী কঠিন।

পিতা

তিনি কি একাই আস্‌বেন?

কাকা

বোধ হয় আশ্রমের কোন ব্রহ্মচারিণী তাঁর সঙ্গে আস্‌বেন। আশ্রম থেকে একা বার হওয়ার নিয়ম নেই।

পিতা

কিন্তু তিনি ত' সেখানকার কর্ত্রী।

কাকা

কিন্তু নিয়ম সকলের জন্যই সমান।

মাতামহ

তোমরা খুব অসোয়াস্তি বোধ ক'রছ না?

কাকা

কিজন্য অসোয়াস্তি বোধ ক'রব? তাতে আর কি লাভ বলুন? তা ছাড়া ভাবনারও ত কোনো কারণ নেই।

মাতামহ

তোমার বোন কি তোমার চাইতে বড়?

কাকা

হাঁ, সেই আমাদের সবার চাইতে বড়।

মাতামহ

আমি বুঝতে পারছিনা, কি জন্য আমি অসোয়াস্তি বোধ করছি। তোমার বোন যদি এখানে থাকতেন তাহ'লে ভাল হ'ত।

কাকা

সে আস্‌বে বলে' স্বীকার ক'রেছে।

মাতামহ

আজকের সন্ধ্যেটা যদি শেষ হয়ে যেত!

(মেয়ে তিনটী আবার ঘরে ঢুকল)

পিতা

ও বেশ ঘুমিয়ে আছে?

জ্যেষ্ঠা কন্যা

হাঁ, বাবা, খুব ঘুমুচ্ছে।

কাকা

এখানে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে কি করা যায়?

মাতামহ

এখানে কিসের জন্য আমরা ব'সে আছি?

কাকা

আমার বোনের অপেক্ষায় ব'সে আছি।

পিতা

সরলা, মা কেউ আস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

জ্যেষ্ঠা কন্যা (জানালার কাছে গিয়ে)

না বাবা, কই, কেউ আস্‌ছে না ত'।

পিতা

বাগানে? বাগান দেখ্‌তে পাচ্ছ ত?

কন্যা

হাঁ, বাবা, বাগান জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। দেবদারুর বন পর্য্যন্ত এখান থেকে বাগান বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মাতামহ

আর কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

কন্যা

না, দাদামশায়—

কাকা

বাইরে আকাশ কেমন লাগছে দেখ্‌তে?

কন্যা

খুব সুন্দর। বুলবুলের গান শুন্‌তে পাচ্ছ না কাকা?

কাকা

হাঁ, হাঁ—

কন্যা

বাগানে ছোট্ট একটা ঝড়ের মত উঠেছে যেন!

মাতা

বাগানের মধ্যে ঝড়!

কন্যা

গাছগুলো যেন একটু নড়ে' উঠ্‌ছে।

কাকা

আমার বোন এখনও এল না! ভারী আশ্চর্য্য ত'!

মাতা

এখন আর বুলবুলের গান শোনা যাচ্ছে না।

কন্যা

দাদামশায়, আমার মনে হ'চ্ছে বাগানের মধ্যে কেউ ঢুকেছে!

মাতামহ

কে!

কে তা ত' দেখতে পাচ্ছি না। কাউকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

কাকা

তা হ'লে কেউ না!

কন্যা

নিশ্চয়ই কেউ বাগানে ঢুকেছে। পাখীগুলো সব হঠাৎ গান বন্ধ ক'রল কেন?

মাতামহ

কিন্তু কেউ আস্‌ছে বলে'ও ত মনে হচ্ছে না!

কন্যা

নিশ্চয়ই কেউ পুকুরের পাড় দিয়ে যাচ্ছে। হাঁসগুলো যেন হঠাৎ এমন গুম্ হ'য়ে গেছে।

অন্য মেয়ে

পুকুরের মাছগুলো হঠাৎ যেন জলে ডুব মেরেছে।

পিতা

কাউকেই দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

কন্যা

না বাবা—

পিতা

পুকুরে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে হয়ত' ...

কন্যা

হাঁ তা বটে, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে হাঁসগুলো ভয় পেয়েছে···

কাকা

নিশ্চয়ই আমার দিদি হাঁসগুলোকে ভয় দেখাচ্ছে। সে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে থাক্‌বে।

পিতা

কুকুরগুলো শব্দ কর্‌ছে না কেন বুঝতে পারছিনে।

কন্যা

বড় কুকুরটা রান্নাঘরের পাশে ব'সে আছে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাঁসগুলো পুকুরের ওধারে চলে যাচ্ছে...

কাকা

নিশ্চয়ই এরা দিদিকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি নিজে গিয়ে দেখ্‌ছি (ডাক) দিদি! দিদি! তুমি কি এসেছ...ওখানে ত' কেউই নেই।

কন্যা

কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে কেউ বাগানে ঢুকেছে। তোমরা এগিয়ে দেখ।

কাকা

কিন্তু দিদি হ'লে ত জবাব দিত!

মাতামহ

বুলবুল্ কি আবার গান কর্‌ছে সরলা?

কন্যা

কই আমি ত কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

মাতামহ

তবুও কোন শব্দ নেই?

পিতা

সব চুপ—যেন শ্মশান!

মাতামহ

বাইরের কোন লোক এদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। বাড়ীর কেউ হ'লে নিশ্চয়ই জবাব দিত।

কাকা

বুলবুলের কথা আর তোমরা কতক্ষণ ধ'রে আলোচনা করবে?

মাতামহ

জানালাগুলো কি সব খোলা,—সরলা?

কন্যা

শুধু কাঁচের জানালাটা খোলা আছে দাদামশায়।

মাতামহ

আমার যেন মনে হ'চ্ছে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা এসে ঢুকছে!

কন্যা

বাইরে বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে দাদামশায়, ফুলের পাতাগুলো সব ঝরে' পড়ছে।

পিতা

অনেক রাত হ'ল। এবার দরজাগুলো সব বন্ধ ক'রে দাও

কন্যা

আচ্ছা দিচ্ছি…না বাবা আমি দরজা লাগাতে পারছি না!

আরও দুইটী মেয়ে

আমরা সবাই মিলেও পারছিনে—

মাতামহ

এঁ্যা, দরজায় আবার কি হ'ল?

কাকা

তোমরা গলা ভার ক'রে কথা কইছ কেন? আমি নিজে গিয়ে দেখছি।

জ্যেষ্ঠা কন্যা

আমরা বন্ধ করতে পারছিনে—

কাকা

ঠাণ্ডায় এমন হ'য়েছে—সবাই মিলে ধাক্কা দিলে ঠিক হবে, দরজাটা বোধ হয় একটু খারাপ হয়েছে।

পিতা

কাল মিস্ত্রী এসে ঠিক করে দেবে।

মাতামহ

এঁ্যা, কাল মিস্ত্রী আসবে, কেন?

কন্যা

হ্যাঁ দাদামশায়;—হেঁসেলের কাজ করবার জন্য কাল মিস্ত্রী আসবে।

মাতামহ

বাড়ীতে তা হ'লে ভীষণ গণ্ডগোল হবে ত!

কন্যা

তাকে আস্তে আস্তে কাজ করতে বলব'খন।

(হঠাৎ বাইরে দা ধারানোর শব্দ শোনা গেল)

মাতামহ (কাঁপতে কাঁপতে)

এঁ্যা:—!

কাকা

ও কি?

(ক্রমশঃ)

[illegible]ম্যবাদী

(দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ'—উঠে পূর্ণিমা চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে' যায় ধীরে আঁধারের অপরাধ;
তিথিতে তিথিতে জমে' যে বেদনা মরিল সূতিকাঘরে,
তারি বুক চিরে' হের' কি মাণিক জ্বলিল তোমারি তরে।
সোনার চস্‌মা খুঁজে' যা' পাওনি, ঐ দেখ' তাকে তোলা,
মশলার ডিবে এই তো সমুখে, এই দেখ' আল্‌বোলা;
হারানো চটির পাটিটি লুটায় দূরে ঐ আঙিনাতে,—
পেয়েছো তো সব—এইবার উঠে' চলো দেখি ভাই ছাতে;
—নাই, নাই, নাই! বালাই বালাই—নাই কি বলিতে আছে?
এখানে না হয় ওখানে আছে তা'—হয় দূরে নয় কাছে।

একটু দাঁড়াও—এই কোণটায় বিছাইয়া দিই পাটি,
বোসো বোসো ভাই, সেজে' দিই তব সাধের আল্‌বোলাটি;
দিব্য আরামে বোসো তো বন্ধু, মেজাজটা করি' মিঠে,
মোলাম করিয়া আনো ক্ষণতরে ঐ খর দৃষ্টিটে।
সুপ্তিদাত্রী এ হেন রাত্রি, এমন স্নিগ্ধ আলো—
জানো তো বন্ধু, বক্ষে তাহারো আছে কতখানি কালো;
ঐ দীপ্তির পিছনে লুকায়ে কত অতৃপ্তি-দাহ
নিয়তির রীতি মানি' হাসিমুখে ব্রত করে অতিবাহ;
জানে, এর পারে উদিবে সূর্য্য, জানে, পিছে আছে অমা,
তবু সুখে দুখে ঐ তো সমুখে হাসে চিরমনোরমা।

কুহূ-নিশীথিনী কে স্মরিবে আজি এমন চাঁদিনী রাতে?
তাই বলে' সে কি উঠিবে না আর আকাশের আঙিনাতে!
আজি এ আলোকে পড়েনাক' চোখে হারানো যে ক'টি তারা,
ভেবেছ কি মনে, অমার গহনে তারা চিরজ্যোতিহারা?
সম্মুখে যার মিলেনাক' দেখা, পশ্চাতে তাই আছে,
পিছু ফিরে' দেখ', সেই জ্বল্‌জ্বলে জ্বলিছে বুকের কাছে;
যে চোখের আলো পলকে মিলায় সুপ্তির আবরণে,
তা'র মাপকাঠি এতই কি খাঁটি—অনন্ত এ জীবনে!
মন মন করে' যে অহঙ্কারে কথা কহ থাকি' থাকি'—
শুধাই তোমায়, সেই মনটারই সত্য স্বরূপটা কি?

তার বাঁধা নাই যে মনোবীণায়, নাহি যার সুরবোধ,
ললিত বিভাস ভৈরোঁ যে তার ভৈরব দুর্ব্বোধ।
ব্যথাবোধ আর সুরবোধ—দোঁহে জাতি নহে কাছাকাছি;
চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে কেঁদে ঘুরেনা কি কাণামাছি?

হাই তুলিছ যে—ঘুম এল নাকি, বালিসটা দিব এনে ?
চৈত্র-হাওয়ায় দরকার নাই, কাঁথা কম্বল টেনে।
হেনার ঝাড়টা আচ্ছা বেহায়া— টবে থেকে খায় দোল,
মৃদু দখিণায় তোমারই ভাষায় তুলিয়া আর্ত্তরোল ;
নাকে ঢোকে তারি গন্ধের ব্যথা—চোখে দেখা যায় দেহ—
এত ব্যথা-বহা রূপটি কিন্তু মনে আনে সন্দেহ !

কথাই কওনা—চটে' গেলে নাকি ? অথবা এসেছে ঘুম ?
নয়নতারায় মুদিয়া দিল কি গন্ধধূপের ধূম ?
সুখ জেগে থাকে, দুঃখ ঘুমায়— শেষে কি বুঝিব তাই ?
চিরবিরহীরে তাই কি রাত্রে ডেকে সাড়া নাহি পাই !
আসল কথা কি, যতখানি সুখ—ঠিক ততখানি দুখ,
দিনরাত্রির আলোয়-কালোয় যেমন কালের মুখ !
সুখী বলে' তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষে থাকিত না অধিকার।
পূর্ণিমারাত, হেনার গন্ধ—সুমন্দ দখিণায়,
বন্ধুর নাকে বেদনার শাঁকে—মিছা বকে' মরি হায় !

একা নিরুপায় বসে' ভাবি তাই—দুখ লাগে কেন গুরু ;
দুখের চাম্‌ড়া পাতলা, আর কি সুখের চাম্‌ড়া পুরু ?
জন্ম হইতে সুখ পেয়ে, সুখে হ'য়ে যাই উদাসীন,
অনভ্যাসের পাতলা চর্ম্মে ব্যথা করে চিনচিন !
মাতার স্তন্যে জন্মপুষ্ট, পিতা পোষে বহুকাল,
শৈশব হ'তে শিখিতে হয় না ভাবনার জঞ্জাল :
পরেরো আনারই অভাবের বোধ যৌবনে উঠে জেগে,
নূতন-গজানো পাতলা চর্ম্মে কামনার হাওয়া লেগে ;
দুঃখের তাই সর্ব্বদা থাঁই, সুখের মেলেনা ভাত—
সুখের দিবস তবু চলে' যায়, দুখের কাটে না রাত।

চোখ তুলে' দেখি, এমন যে চাঁদ, সেও ঢাকা পড়ে মেঘে,
একবার করে' হাবুডুবু খায়, আরবার উঠে জেগে !
শঙ্কর-শিরে চির ঠাঁই যার—দীপ্তি-দেবতা শশী,
সেও আপনারে বজায় রাখিতে মাঝে মাঝে মাখে মসী :
হাওয়ার দেবতা বায়ু—বারে বারে দেখিতে সে চাঁদ মুখ,
ঘোমটা টানিয়া ঘোমটা খুলিয়া করে চিরকৌতুক !
বুড়া শিব সে তো ব্যাজার হইয়া সৃষ্টি করে না রোধ,—
ন্যাংটা পাগল সন্ন্যাসী, দেখি, তারো আছে রসবোধ !
সুখেরই লাগিয়া দুখের সৃষ্টি, উঁচু আছে বলে' নীচু,
জীবনের পথ মুক্ত যখন, আছে আগু আছে পিছু।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১৪

অজয়কে ঘুম পাড়াইয়া প্রদীপ ছাতে চলিয়া আসিল। নিজের তক্তপোষটা বন্ধুকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; তাহ ছাড়া ঘুমও যে আসিবে এমন মনে হইতেছে না। অস্থির-পদে সে ছাতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পাইচারি করিতে লাগিল। সে এ কয়দিন প্রচুর আলস্যভোগ করিয়াছে, এইবার আবার তাহার দুই ব্যাকুল পক্ষ প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু একটা করিবার মত কিছু না করিতে পারিলে তাহার আর স্বস্তি নাই।

রেলিঙ্-হীন ছাতের এক ধারে পা ঝুলাইয়া প্রদীপ বসিয়া পড়িল। অন্ধকার আকাশে অগণন তারা কোটি কোটি ব্যর্থ স্বপ্নের মত উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল একটি লোকও পথ চলিতেছে না। এই অবারিত স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে প্রদীপের কী যে নিঃসঙ্গ ও একাকী লাগিল! নিজের পেশীবহুল দৃঢ় বক্ষতটের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল সে কি জন্য নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—এই পৃথিবীতে সে আসিয়াছে কেন? কি সে করিতে চাহিতেছে? অজয়ের দুই চোখে উগ্র মৃত্যু-পিপাসা; সে বলে: আমরা পৃথিবীতে আসিয়া মরিব এই আমাদের জীবনধারণের পরম পরিপূর্ণতা—কর্ম্মসাধনায় আমাদের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই আমাদের কাজ। আমি আয়ুর ভিখারী নহি। স্ফটিক হইয়া চূর্ণ হইব তাহাও ভালো, তবু সামান্য প্রস্তরখণ্ড হইয়া গৃহচূড়ে অবিনশ্বর আলস্যে বিরাজ করিব না। জীবনের মর্য্যাদা কষিতে হইবে মানুষের মৃত্যুর মূল্যে।

অজয় তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সবলে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সে তাহা চায় না। তাহার বাবার সম্পত্তির আয় বৎসরে কম করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা, সে দুই হাতে তাহা নিয়া পুতুল খেলিতে পারিত। সে বলে: বাবা যদি আমার এই ত্যাগ দেখে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র না করেন ত' এই টাকা দিয়ে আমি মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করব—সামান্য হোক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা উদার উদাহরণ ত' দেখানো যাবে। সুদূর দৃষ্টি আমাদের দেশে অনেকেরই আছে প্রদীপ, কিন্তু সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত নেই।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: কি তোমার সেই উদাহরণ?

—মোটামুটি এই। জেল থেকে যে-সব কয়েদী বেরিয়ে এসে ফের চুরি ও ডাকাতি করা ছাড়া বেকার-যন্ত্রণা নিবারণ কর্‌বার আর পথ পায় না তাদের জন্যে ছোটখাট ক'রে একটা ভরণপোষণের সংস্থান করে' দেব। যারা চুরি ডাকাতি করে তারা যত গর্হিত কাজই করুক না কেন তাদের বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, দলবদ্ধ হ'বার কৌশল আছে। শুধু তাই নয়, একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার মধ্যে যে-সব গুণ থাকে তা থেকেও ওরা বঞ্চিত নয়।

প্রদীপ ফের প্রশ্ন করিয়াছিল: যেমন?

—যেমন ধরো কার্য্য সিদ্ধ করতে কেউ যদি আহত হয় তবে তাকে তারা নিরাপদ স্থানে বহন করে' রক্ষা করে—গোপনে-গোপনে সেবা-শুশ্রূষা করতে ত্রুটী করে না। এরাও মানুষ প্রদীপ, এদেরো মহত্ত্ব আছে। তোমাদের মত এরাও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে চাঁদ দেখে কোনো একখানি মুখের সাদৃশ্য খুঁজে নিতেও হয়ত' দেরী করেনি। সমাজ থেকে এদের বহিষ্করণের পথ আমি বন্ধ করে' দেব।

প্রদীপ হাসিয়া বলিয়াছিল: কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমাকেই বহিষ্কার করেন?

উত্তরে অজয়ও হাসিয়াছিল বৈ কি। বলিয়াছিল: বছরে চল্লিশ হাজার টাকা? ফুঃ! কেড়ে নিতে কতক্ষণ!

অদ্ভুত, অসাধারণ অজয়। তাহার সঙ্গে পা মিলাইয়া চলে প্রদীপের সাধ্য কি। সে তাহা চাহেও না। সে তাহার দেহের প্রতিটি স্নায়ু ভরিয়া তপ্ত রক্তস্রোত অনুভব করিতে চায়। এই ভাবে মরিয়া বাঁচিতে তাহার ইচ্ছা করে না। অজয় তাহাকে বিলাসী, ভাবুক, অলস—আরো কত-কি বলিবে, তবু আজিকার এই নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশের নীচে

সে নিজেকে বিরাগী মানুষ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়া সুখ পাইল ; স্বাধীন করিবার মত এমন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কথাকে সে আজ মনেও করিতে পারিতেছে না।

একটা ছোটখাট চাকুরী পাইলে সে বাঁচে। এমন করিয়া ভূতের বেগার খাটিতে সে লাহোর হইতে কলিকাতা আর ঘুরিতে পারে না। সে এখন একটু জিরাইয়া লইলে দেশের দুর্দ্দশা কি এমন ভয়াবহ হইত তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কত দিন পরে সে ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিল কে জানে! সে যে একদিন কল্পিত মানুষের সুখ-দুঃখ, মন দেওয়া-নেওয়া নিয়া গবেষণা করিয়াছে বা করিতে পারে এমন কথা সে নিজেই ভুলিতে বসিয়াছিল কিন্তু আজ তাহার রাত জাগিয়া ভারি মিষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে। একটি সাধারণ ঘরোয়া গল্প—দুইটি সংসারানভিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী লইয়া। গল্পের একটি ছত্রেও রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা থাকিবে না—পুষ্করিণীর মত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জীবন।

সে গল্প লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া থাকিবে, ঘরের আরেকটি লোক সামনের নিবু-নিবু দীপশিখাটি উস্কাইয়া দিলে তাহার সহসা জ্ঞান হইবে যে অন্ধকার ঘরে মাটির বাতিটির চেয়েও উজ্জ্বল আরেকখানি মুখ আছে। প্রদীপ চক্ষু বুজিয়া সে-মুখ ভাবিতে গেল। স্তিমিতাভ বিমর্ষ মুখ। আশ্চর্য্য, কপালে সিন্দুর নাই। মুখখানি দেখিয়া মনে হয় কত বৎসর আগে যেন তাহাকে একবার দেখিয়াছে। নাম ধরিয়া ডাকিলেই কথা কহিবে।

এই সব কথা শুনিলে অজয়ের দলের লোকেরা তাহাকে যে কি করিবে তাহা সে জানিত। কিন্তু এমন করিয়া ভণ্ডামী করিবারই বা কি মানে আছে? অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখের জন্য সে নিজের সুখকে তুচ্ছ করিতে পারিলে হয় ত কোনো দিন কলিকাতা সহরে তাহারই নামে একটা রাস্তা হইয়া যাইত; কিন্তু নিজের সুখকে যদি সে জুতার সুখতলার মত ছুঁড়িয়া ফেলিতে না পারে তবে কি তাহার ক্ষমা মিলিবে না? সুখ সে পাইবে কিনা কে জানে, হয়ত যে-পথে সে পা বাড়াইবে ভাবিতেছে সে-পথে দুঃখের রাজসমারোহ চলিয়াছে—তবু হয় ত তা সমারোহই। কোথায়ই বা সমারোহ নয়? যে কিছু চাহে না বলিয়া ভগবানকে চাহে, ঐশ্বর্য্য সে কম ভোগ করে না। মরিলে সে অমর হইবে এমন একটা পরম প্রলোভনেই ত' অজয় অজয় হইয়াছে।

সে এই মরণের মধ্যে নমিতাকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল। ছি ছি! নমিতার মধ্যে সে বন্দী ভারতবর্ষের মৌনী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিত হইল, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত কালের স্থবির সমাজের কলুষিত সংস্কার রহিয়াছে সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না। নমিতার মর্য্যাদা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহে নয়, সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাহার মুক্তি কৃপাণে নয়, কল্যাণে। প্রদীপ নমিতার পথ-নির্দ্দেশ করিবে। সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, হাঁটিতে সুরু করিল।

তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রদীপ ছাতের উপরই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বোধ করি। কি একটা শব্দ হইতেই তাহার ঘুম ভাঙিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল কে যেন তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। প্রথমটা ভালো করিয়া ঠাহর হইল না। লোকটাকে চিনিবার জন্য সে জামার পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিতে গেল। একা ছাতে আসিয়াছে অথচ টর্চ্চ লইয়া আসে নাই। এই লোকটা যদি এখন অপ্রতিবাদে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বসে! যে এত অসাবধান ও অমনোযোগী তাহার পক্ষে ত সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিব্য বিবাহ করাই প্রশস্ত। ঐ পক্ষ হইতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকিবে না! বেচারা অজয় অসহায়! হয় ত' আত্মহত্যাও করিতে পারিবে না।

ভীষণ ঘাবড়াইয়া গিয়া প্রদীপ কি করিয়া বসিবে ভাবিতে ভাবিতেই লোকটা ভারি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল: আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি সুধী।

—সুধী? আতঙ্কে ও বিস্ময়ে প্রদীপ লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রভাবে সে হঠাৎ পাগল হইয়া যায় নাই ত'? নাকের নীচে ডান হাতের তালুটা পাতিয়া সে নিজের নিশ্বাস অনুভব করিল। মনে ত হইল সে বাঁচিয়া আছে। তবে ছাত বাহিয়া এই লোকটা কোথা হইতে আসিয়া নিজেকে সুধী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ধমক দিবার জন্য সে চেঁচাইতে চাহিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না।

লোকটি কহিল; আমি বদ্‌লেছি ব'লে' ত' একটুও মনে হয় না। অনেক দূর দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম,—বায়ু কোণে ঐ যে তারাটা দেখছ সেখানে। সেখানে সাহিত্যিক ব'লে আমার খুব নাম হয়েছে। তোমাদের ভাষায় আমার বইগুলি অনূদিত হয় নি?

যাহা হোক্, লোকটা মারমুখো নয়, বেশ বিনাইয়া কথা কহিতে জানে। প্রদীপ এবার গলা খুলিয়া বলিতে পারিল; দূর দেশ থেকে এতদিন বাদে কি মনে করে'? বায়ুকোণের তারায়ও বেকার-সমস্যা চলেছে নাকি?

সুধী উদাসীন হইয়া কহিল—অনেকদিন পরে নমিতা আমাকে স্মরণ করেছে, প্রদীপ। না এসে থাকতে পারলুম না। আমি এখুনি তার কাছ থেকে আসছি।

—নমিতার কাছ থেকে আসছ—তার মানে? ভূত হ'য়েও তুমি তার ওপর স্বামীত্ব ফলাবে? কে আর তোমার নমিতা? সূর্য্য অস্ত গেলেও তোমাদের দেশে আলো থাকে নাকি? নমিতার প্রতি তোমার এই রূঢ় আচরণ আর আমি সহ্য করবো না। প্রদীপ হাত বাড়াইয়া সুধীকে ধরিতে যাইতেছিল, সে একটু সরিয়া বসিল।

সুধীর মুখে স্বল্প ম্লান হাসি; আমি সেই কথাই নমিতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম। তার ইহ জীবনে আমি যে তার সত্যি করে' কেউ ছিলুম না, মরে' তার পূজোপচার আমি কি করে' গ্রহণ করব? তার কাছে আমি তোমার নাম করে' এসেছি।

—আমার নাম কেন করতে যাবে? আমি কে? তুমি বলছ কি সুধী?

সুধী নিরুত্তর। তাহাকে নাড়া দিবার জন্য প্রদীপ সামনের দিকে তাহার দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু কঠিন একটা ইঁটে হাতের মুঠা দুইটা আহত হইতেই সে দেখিল ভোরের ফিঁকে আলোতে সুধীকে আর দেখা যাইতেছে না। বার কতক চক্ষু কচলাইয়া,—নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া রাস্তায় তাকাইল—কতগুলি ময়লা-ফেলার গাড়ি জড়ো হইয়াছে। প্রদীপ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, ছাতে ফের পাইচারি করিতে লাগিল। ভালো করিয়া তাহার ঘুম হয় নাই। এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে নাকি?

মেসের চাকর ছাতে কি একটা কাজে আসিয়াছিল, তাহাকে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল—তুই রাতে একবার উপরে এসেছিলি?

একটা পরিত্যক্ত কাপড় গুটাইতে গুটাইতে যদু কহিল,—না ত'।

—আচ্ছা, আমার ঘরের সবাই উঠেছে?

—অনেকক্ষণ।

—আমার বিছানায় কাল যিনি শুয়েছিলেন তিনি উঠেছেন?

—কৈ, জানি না, বাবু।

—যা, দেখে আয়।

যদু কাপড় গুছাইয়া নামিয়া গেল। বিনা-সমাধানে হঠাৎ এই ছাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সে নাম করিতে পারিল না। খানিক বাদে যদু ফিরিয়া আসিল; কহিল, —সে বাবু এখনো ওঠেন নি, শুনলুম তাঁর জ্বর। কিন্তু নীচে আপনাকে কে ডাকছেন।

—আমাকে? প্রদীপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীত স্বরে সে চুপি চুপি কহিল,—কে ডাকছে রে?

যদু হাসিয়া কহিল,—একটি মেয়ে। চিনি না।

—মেয়ে? কে মেয়ে? প্রদীপ দিবালোকেও রাতের স্বপ্নের জের টানিয়া চলিতেছে বোধ হয়।

হাত উল্টাইয়া যদু বলিল,—তা ত' আমি জিজ্ঞাসা করিনি, বাবু।

নিশ্চয়ই নমিতা আসিয়াছে। প্রদীপ আর সন্দেহ করিল না। স্যাণ্ডেল্ দুইটার মধ্যে পা দুইটা ঢুকাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল। সেই প্রত্যাশিত প্রভাত আজ আসিল বুঝি—নমিতাকে সে আজ কোন মূর্ত্তিতে দেখিবে? বিদ্রোহিণী বিজয়িনীর বেশে, না সমস্তনমিতা স্পর্শভীরু কবি-কল্পনার মত? ভগবান করুন, সে যেন এই নির্ম্মল প্রভাতটির সঙ্গে একটি অম্লান সাদৃশ্য রাখিয়াই অবতীর্ণ হয়! সেই অল্প কয়টি মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যে কত কিছু ভাবিয়া নিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নীচে আসিয়া যাহাকে সে দেখিল তাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বোধ করি।

দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—তুমি? এ সময়ে এখানে?

উমা মিষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল,—সকালবেলা যে আমি মাঠে বেড়াতে যাই। প্রত্যহ। শচীপ্রসাদকে কাল আসতে বারণ করে দিয়েছি। একাই বেরোলুম আজ।

হতাশার আবেশটা কাটিয়া যাইতেই প্রদীপ যেন সুস্থ ও সচেতন হইল। কহিল,—হঠাৎ আমার কাছে? কোনো দরকার আছে?

উমা দুইটি টল্‌টলে ডাগর চক্ষু নাচাইয়া কহিল,—বল্‌বার মত দরকার কিছুই নেই তেমন।

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—না বলবার মত আছে ত'?

তেমন একটা কিছু না থাকলে বিজ্ঞানই অচল হ'য়ে পড়ে শুনেছি। শুন্‌তে চান্? আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই, দেখা করতে এলুম। আমাদের বাড়ীর মত আপনিও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন নাকি?

প্রদীপ কহিল,—দিলেই কিন্তু ভালো হ'ত। কেননা এটা মেষজাতীয় পুরুষদের একটা মেস্। এখানে তোমার পায়ের ধূলো পড়লে অনেকের ব্যঞ্জনই বিস্বাদ হ'য়ে উঠবে।

কৌতূহলী হইয়া উমা কহিল,—কারণ?

—কারণ, আমাকে সুনজরে দেখে না এমন প্রতিবেশী আমার উঠতে বস্‌তে। প্রকাশ্যে তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার করলে কালক্রমে তুমিই হয় ত আমার ওপর অকরুণ হ'য়ে উঠবে; কারণ এক দিকে তোমার সংসার, অন্য দিকে এই কুৎসিত জনতা।

উমা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল,—অত সব কথা আমার মুখস্থ নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার আছে কি নেই সে বিচার আমি আপনার সঙ্গে করব। অন্য লোকের যদি তাতে গাত্রদাহ বা পিত্তশূল হয়, হবে। তাদের বিনা-দামে আমরা চিকিৎসা করতে যাব কেন? চলুন, ওপরে আপনার ঘরে। বল্‌বার মত দরকার একটা পেয়েছি।

প্রদীপ থামিয়া উঠিল। উমা উত্তেজিত হইয়া সিঁড়ির উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাকে বাধা দিতে গেলেই সে আরো অবাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর নামিয়া আসিল। বলিল,—চল পার্কে, তোমার দরকার অদরকারের সমাধান হ'বে।

উমা নড়িল না, কহিল,—সেখানেও প্রকাণ্ড জনতার ভয় আছে। আমি আপনার এই অন্যায় ও মিথ্যা সমাজ-হিতৈষণার শাসন করব। কথাটা খুব জম্‌কালো করে' বল্লুম, কেননা সোজা কথা ঘোরালো করে' না বল্‌লে আপনারা বোঝেন না। আপনার এই আতিথেয়তার প্রতিদান আমি দেব একদিন—আমাদের বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ করে'।

প্রদীপের তবু সাহস হইতেছিল না; না জানিয়া-শুনিয়া উমা এই বিপদের মুখে কেন পা বাড়াইতেছে? সে ধীরে কহিল,—ব্যাপারটা খুব শোভন হবে না, উমা। তা ছাড়া—

উমা হাসিয়া বলিল,—আপনার 'তা ছাড়া'-টা বলুন। আগের যুক্তিটা বাতিল। পরে মুখ নিদারুণ গম্ভীর করিয়া সে কহিল,—এত সব অমানুষিক কাজের ভার নিয়েছেন, অথচ একটি মেয়ের সম্পর্কে সামান্য লোকনিন্দা বহন করতে পারবেন না? তার চেয়ে বেত হাতে স্কুল-মাষ্টার হওয়াই আপনার উচিত ছিল। চলুন্।

প্রদীপও গম্ভীর হইল; তা ছাড়া আমার ঘরে একটি অসুস্থ বন্ধু আছেন। তাঁর জ্বর।

—বন্ধু? ভুরু কুঁচকাইয়া উমা কি ভাবিতে চেষ্টা করিল; তাঁর নাম কি?

—আমাদের বন্ধুদের নাম যাকে-তাকে বলতে হয় না।

—বেশ ত', তাঁরই সঙ্গে আমার দরকার। কি করে' আর আমার পথ আটকাবেন? এটা পঞ্চভূতের মেস্, আপনার নিজের বাড়ী নয়। আপনার অসুস্থ বন্ধুর হার্ট-ফেল্ থেকে তাঁকে শিগ্‌গির বাঁচান্ বল্‌ছি। বলিয়াই উমা পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

অগত্যা প্রদীপ আর পদানুসরণ না করিয়া করে কি। তাহাকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অজয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে; বালিশটাকে দেয়ালের গায়ে রাখিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া সে অন্যমনস্কের মত বসিয়া ছিল। ঘরে হঠাৎ একটি অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ হইতে চাপল্য যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে; মুখখানিতে সাধারণ বাঙালি মেয়ের মুখের মত একটা নিরীহতা নাই, অন্তত নমিতার মুখে সে এই দীপ্তি ও ধী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও ঘরে ঢুকিল। অজয়ের একটু আশ্বস্ত হইবার আগেই প্রদীপ

বলিয়া উঠিল—নমিতাকে ত' তুমি চিনতে, এ তারই ননদ। তোমার একটা সামাজিক পরিচয়ই দিলুম, উমা।

উমা চক্ষু বড় করিয়া কহিল,—আমার আরেকটা অসামাজিক পরিচয় আছে নাকি ?

প্রদীপ কহিল,—নেই ? বলুব তবে ?

উমা বলিল,—মিছিমিছি কেন অতিরঞ্জন করবেন ? আমিই বলছি : বাড়ির শাসন আমি মানি না, সকাল বেলা একা বেড়াতে বেরুই, মেস্-এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেউ বাধা দিলে তাকে টপ্‌কে উপরে উঠে আসি। এই ত' ?

দুই বন্ধু হাসিয়া উঠিল। অজয় বিছানার উপর একটু সরিয়া বসিল : বসুন্ এখানে।

যে ব্যক্তি মোক্তারি পড়ে সে বাহিরে যাইবে বলিয়া কাছা আঁটিতেছিল, চক্ষু দুইটা তেরছা করিয়া সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিল। বলিল,—একটা চেয়ার এনে দেব ?

উমা কহিল, চেয়ারে বসে' বক্তৃতা দিতে আমি আসিনি। (অজয়ের প্রতি) বয়েস আন্দাজে আমাকে আপনার খুব এঁচড়ে-পাকা মনে হচ্ছে, না ? আমি তাই।

কোটের উপর চাদর চড়াইয়া ভাবী মোক্তার অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অজয় কহিয়া উঠিল : লোকটা ভালো নয়, প্রদীপ। কাল রাতে লুকিয়ে ও আমার সুটকেশ্ ঘেঁটেছে। লোকটা হয় চোর, নয় তার চেয়েও জঘন্য আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমিও এক্ষুনি বেরব।

প্রদীপ চম্‌কাইয়া উঠিল : বল কি ? এই অসুস্থ শরীরে তুমি কোথায় যাবে ?

অজয় এমন করিয়া অল্প একটু হাসিল যে প্রদীপ অধোবদন হইল। তবু কহিল,—পয়সা ত আমার কাছে একটিও নেই।

—না থাক্ ; লাগ্‌বে না। এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চল্‌বে না। বলিয়া ক্লান্তপদে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন রকমে সার্টটা গায়ে দিল, পায়ে জুতা ছিল না—সুটকেশটা হাতে লইয়া বাঁ হাতে চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিল,—আমি চল্লুম। (উমার প্রতি) আপনার সঙ্গে ভালো করে' আলাপ হ'ল না। আবার যদি কোনো দিন দেখা হয় আপনাকে ঠিক চিনে নিতে পারব। কিন্তু আবার কি দেখা হবে ?

উমা ও প্রদীপের মুখে কোনো কথা আসিল না, সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা নিমেষে কেমন ভারী, থমথমে হইয়া উঠিয়াছে। অজয়কে সত্যসত্যই টলিতে টলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রদীপ বাধা দিয়া বলিল,— একটা গাড়ি ডেকে দেব ?

অজয় হাসিয়া কহিল —কিন্তু ভাড়া ? গাড়ি লাগবে না।

উমা এইবার কথা পাইল : যদি কিছু মনে না করেন ত' আমার কাছে সামান্য কিছু আছে।

—মনে কিছু নিশ্চয়ই করব। দিন্ শিগ্‌গির। বলিয়া অজয় হাত পাতিল।

সেমিজের মধ্য হইতে ছোট একটি ব্যাগ খুলিয়া তিনটি টাকা অজয়ের হাতে দিতেই সে মুঠা করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল,—আমার লোভ যে আরো বেড়ে যাচ্ছে। এবার আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত' আপনার দু' হাত থেকে একগাছি করে' সোণার চুড়ি আমাকে উপহার দিন্। দু'হাত থেকে একগাছি ক'রে চুড়ি আপনার খোয়া গেলে আপনাকে আরো সুন্দর দেখাবে। আমার একদম্ ট্রেন-ভাড়া নেই। (হাসিয়া) আমি আমার দেশের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি কি না। আস্‌চে সাতাশে তারিখে যে আমার বিয়ে হবে।

মুহূর্ত্তে যে কি হইয়া গেল ভাবাবেশে উমা আদ্যোপান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চুড়ি দুইগাছি সে খুলিয়া ফেলিল। তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার মত করিয়া তাড়াতাড়ি চুড়ি দুইগাছি টানিয়া নিয়া অজয় কহিল,—তা হ'লে গাড়ি একটা ডেকে দাও, প্রদীপ। পরের পয়সায় বাবুগিরি যখন কপালে আছেই, একটুতেই তা ছাড়ি কেন ? যাও দেরি ক'রো না।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, উমা কহিল,— দাঁড়ান্, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি ? একা বাড়ি ফিরতে পারবে না ?

হাসিয়া উমা জবাব দিল : না, পথ কি আর চিনি ? কিন্তু আপনার সঙ্গে দরকারী কথাটাই যে বাকি রইল।

অজয় কহিল,—চটুপট্ সেরে নিন্, বেশীক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারছি না।

উমা প্রদীপকে কহিল,—আপনি একদিন বৌদির ঠিকানা খুঁজছিলেন না? তিনি এখন আমাদের ওখানেই এসেছেন।

—কে? নমিতা? তোমাদের ওখানকার ঠিকানাটা কি শুনি? বলিয়া অজয় পকেট হাতড়াইয়া এক-টুকরা কাগজ বাহির করিল। সামনের কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর কোথাও পেন্সিল একটা পাওয়া যায় কি না তাহারই সন্ধানে অন্যমনস্ক অজয় কহিতে লাগিল,—যতই দুর্ব্বল আর সন্দিগ্ধ হোক্ না কেন, সেবায় নমিতার হাতে আছে। একটুও ঘেন্না না করে, দু'হাতে আমার বমি কাচালে। ভেবেছিলুম এ-কথা স্মরণ করে' নমিতাকে ভবিষ্যতে একটি অবিনশ্বর মর্য্যাদা দেব। কিন্তু পরে যখন তার ভেতর থেকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ভীরু নারীপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ কর্‌ল তখন তার সেই অধঃপতনকে ক্ষমা করতে পারলুম না।

প্রদীপ বলিল,—তাকে তোমার ক্ষমা না করলেও চলবে। স্বল্প পরিচয়ের অবসরে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আর সে আবেগে অন্ধ না হয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করল বলেই সে ভীরু? আমি তার বিচক্ষণতাকে প্রশংসা করি। উত্তেজনার কুয়াসায় বুদ্ধিকে সে আচ্ছন্ন করে নি।

—ঐ-রকম অকর্ম্মণ্য বুদ্ধি নিয়ে সে চিরকাল কৃত্রিম বৈধব্য-পালনই করুক্। অকারণ সন্তান-প্রসবের চেয়েও তা নিন্দনীয়।

প্রদীপের ইহা সহিল না। কহিল,—আত্মীয়ের নিন্দা আত্মীয়ের সামনে শোভন নয়। একটু সংযম শিক্ষা করলে ভালো করতে।

অজয় উমার দিকে ফিরিয়া কহিল,—ও! আপনি ব্যথিত হচ্ছেন? কিন্তু যেটা সত্যিই নিন্দনীয় সেটা গোপন করে' রাখলেই পাপ। এমনি করে' আমাদের সমাজে পাপের প্রসার হচ্ছে।

উমা কহিল,—এখন আপনার সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটাও আপনাকে শুনতে হ'লে আপনার এম্‌নি করে' অসুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার মতলবের কোনো মানে থাক্‌বে না। যান দীপদা, গাড়ি নিয়ে আসুন।

উমাকে নিজের পক্ষে পাইয়া প্রদীপ জোর পাইল। কহিল,—তুমি ভাবছ এমনি সর্ব্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই জীবন—

অজয় চেঁচাইয়া উঠিল: হাঁ, এই সর্ব্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতা! এ-ই জীবনের যথার্থ প্রতিশব্দ! নইলে ঐ ব্যর্থতা আমার সহ্য হয় নি, আমি তাকে বলিষ্ঠ কর্ম্মের মধ্যে আহ্বান করেছিলুম—যে-কর্ম্মের পুরস্কার মহামহিমান্বিত পরাজয়! নমিতা একটা পায়রার চেয়েও ভীরু

উমা কহিল,—দুর্ভাগ্যবশত আপনি হাততালি পেলেন না। আমি বৌদিকে আরেকবার বলে' দেখ্‌বখন।

অজয় পেন্সিল পাইল না। কহিল,—তার ঠিকানাটা দিন, দরকার হ'লে তার কাছে আবার আমার আবির্ভাব হ'বে। ইতিমধ্যে আকাশের ঝড়ের আকারে তার ওপরে সমাজের অভিশাপ বর্ষিত হ'তে থাকুক্। এবার এলে আমাকে যেন শূন্য হাতে আর ফিরতে না হয়, ভগবান।

উমা হাসিয়া কহিল,—আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন নাকি?

—নিশ্চয় করি।

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া কহিল,—উনি অবতার।

—সত্যি তাই। আমি আমার নিজের ভগবান। কিন্তু অযথা বাক্‌বিস্তার আর কর্‌বো না। ঠিকানাটা বলুন, মনে ক'রেই রাখ্‌ব ঠিক। নমিতাকে যদি না ভুলি ত' তার ঠিকানাটাও ভুলবো না।

উমা কহিল,—ঠিকানা জেনে লাভ নেই। আপনার আবির্ভাবের সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

—কেন? কেন? অজয় উৎসুক হইয়া উঠিল: আমার সম্পর্কে তার খুব নিন্দা হচ্ছে বুঝি? তার চরিত্রে দোষারোপ হয়েছে? তাই হোক্। আমি শুনে খুব সুখী হলাম।

প্রদীপ ঝাঁঝালো গলায় কহিল,—সুখী হ'লে? তুমি দিন-কে-দিন ইতর হচ্ছ।

অজয় চটিল না, কহিল,—আমি নমিতার উপকার চাই। অপবাদ ওর যত উপকার করবে শত উপদেশেও তা হবে না। নমিতা যদি বাঁচে নিজেকে যেন ঘৃণ্য মনে করেই

বাঁচে—তাতে যদি উদ্ধারের একটা উৎসাহ পায় নিজের সতীত্ব নিজেই যেন লুণ্ঠন না করে।

—ঢের হয়েছে, এবার থাম। শালীনতা ব'লে জিনিস তোমার জানা নেই দেখ্‌ছি। তুমি এখন গেলেই আমরা সুখী হ'ব।

অজয় চম্‌কাইয়া উঠিল; কহিল,—যাচ্ছি। বলুন ঠিকানাটা।

- ব'লো না, উমা খবরদার। তুমি একে চেন না।

প্রদীপের মুখের এই কর্কশ কথা শুনিয়া অজয় মুহূর্ত্তের জন্ম স্তব্ধ হইয়া গেল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নমিতার প্রতি সে কঠিন হইতেছে বলিয়া প্রদীপের কেন যে আঘাত লাগিতেছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সময় ছিল না; এবং সময় থাকিলেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে কোনো মুক্তি-তপস্বী যুবক সামান্য নারী-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারে এমন একটা জাজ্বল্যমান সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার করে। তবু কি ভাবিয়া সে কহিল,—সত্যিই আমাকে আপনি চেনেন না; চেনেন না ব'লেই তবু দুয়েকটা কথা বল্‌ছেন—আমাকে না চিন্‌বার আগেই যদি ঠিকানাটা দেন ত' পাই, নইলে—অজয় জোর দিয়া কহিল,—নইলে ঠিকানা একেবারে পাবই না ভেবেছ, প্রদীপ? আমাদের কোটি কোটি কামনার ফলে ভারতের স্বাধীনতা যেমন অনিবার্য্য, তেমনি নমিতার প্রতি আমার প্রয়োজনবোধ যদি কোনো দিন একান্ত হ'য়ে ওঠেই তোমাদের শত-লক্ষ অবরোধ তাকে নিবারণ করতে পার্‌বে না। এ-কথা তোমাকে আমি উঁচু গলায় বলে' যাচ্ছি। কিন্তু ভগবান করুন, আমার প্রয়োজনে তাকে যেন মুক্ত না হ'তে হয়, সে যেন নিজের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে!

—বলি তুমি যাবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কস্‌রৎ করবে? প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অজয় কহিল,—যাব বৈ কি। একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকবার জো কোথায়? (উমার প্রতি) কিন্তু ঠিকানা যখন পেলুমই না, তখন নমিতার সম্বন্ধে বাকি খবরটুকু জেনেই যাই না হয়। তার সঙ্গে দেখা হবার সমস্ত পথ ত' আপনারাই বন্ধ করে' দিলেন।

প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল: বাকি খবরে তোমার দরকার নেই। সে আমাকে উমা আরেকদিন বলবে। তোমার গাড়ি লাগবে কি না, বল। আমার কাজ আছে।

অজয় হাসিয়া কহিল, তার চেয়ে আমার কাজ আরো জরুরি। নমিতার খবর আমার চাই। বলুন। আমি নমিতাকে উদ্যত শাসনের ফণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলুম, সে স্বেচ্ছায় দাসত্ব যেচে নিয়েছে—

প্রদীপ ফের প্রতিবাদ করিল: তুমি তার আচরণের এমন কদর্য্য ব্যাখ্যা ক'রো না বল্‌ছি।

—হাঁা, সে দাসত্বের যূপকাষ্ঠে আবার গলা বাড়ালে। মেয়েদের আত্মকর্ত্তৃত্ব হয় ত' প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।

—তোমার সঙ্গে গেলে তুমি তার আচরণের যত মহান্ অর্থই দিতে না কেন আমরা তাকে স্বেচ্ছাচারিণী বল্‌তাম। সেখানেও সে তোমার দাসত্ব কর্‌ত।

—ভুল, প্রদীপ। সে দাসত্ব ক'রত ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতার। সে-দাসত্ব পূজা, নৈবেদ্য, জীবনোৎসর্গ!

উমা এতক্ষণে কথা কহিল: বৌদি ত' পুজোই করছেন। বাকি খবরটুকু তাঁর তাই

--পুজো করছে? কার? প্রশ্নের উত্তর পাইবার আগেই অজয় আপন মনে বলিয়া চলিল: তার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা দেখে সত্যিই আমি একেবারে আশা ছাড়িনি, প্রদীপ। বহু যুগের প্রথা ও সংস্কারের ভস্মে আচ্ছাদিত থেকেও তার মধ্যে আমি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলুম। নিজের দৈন্য রেখে একদিন দেশকে সে বড়ো করে' অনুভব করবেই। সে পূজার লগ্ন তার জীবনে এল?

উমা তরল কণ্ঠে কহিল,—দেশ নয়, স্বামী।

একটা বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি এতটা ঘাবড়াইবার হেতু ছিল না। অজয় যেন স্বপ্নে একটা পর্ব্বতচূড়া হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। রূঢ় রুক্ষস্বরে সে কহিল,—দেশ নয়, স্বামী! স্বামীপুজো করছে সে? স্বামীর ফোটো-পুজো?

উমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—ঠিক তাই।

এক মুহূর্ত্তও দেরি হইল না। উমার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অজয় সমস্ত ঘর-বাড়ি কাঁপাইয়া তুমুল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ঐ করখানা জীর্ণ পঞ্জরের মধ্য হইতে এমন

একটা বিক্রপোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হইতে পারে এ-কথা কোনো শারীরতত্ত্বশাস্ত্রে লেখা নাই। উমার কথা শুনিয়া প্রদীপও সামান্য স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন একটা কুৎসিত অপরিমের হাসি শুনিয়া তাহার স্নায়ুতে আর যেন বল রহিল না। উমাও দেয়ালের দিকে পিছাইয়া গিয়াছে। অজয় সুটকেশটার হাত বদল করিয়া বলিল,—ঠিকানা আর আমায় চাইনে। সে মরুক্! বলিয়াই সে দুর্ব্বল ক্লান্ত পায়ে নীচে নামিতে লাগিল। দুই তিনটা সিঁড়ি নামিয়া সে কহিল, আমি শরীরে এখন বেশ জোর পাচ্ছি, তোমার কষ্ট ক'রে আর গাড়ি ডাক্‌তে হবে না।

প্রদীপ কটুকণ্ঠে কহিল,—পরকে ত মরবার অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু দেখো নিজের উচ্ছৃঙ্খলতাই না তোমার শাপের বিপরীত অর্থ ক'রে বসে।

অজয় প্রায় নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এক ধাপ উঠিয়া কহিল,—আমি বহু পুণ্যাত্মার অভিসম্পাত কুড়িয়েই যাত্রা করেছি, প্রদীপ। কোনো পরিণামই আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত হবে না। কিন্তু সবাই যদি সর্ব্বান্তঃকরণে নমিতাকে শাপ', তা হলেই তার কল্যাণ হবে। জান, আমি ক্ষণকালের জন্য তার চোখে বিদ্যুৎ দেখেছিলুম। অভিসম্পাতে সে আগুন হয় ত' আরেকবার জ্বলে' উঠ্‌বে—আরেকবার।

অজয়কে আর দেখা গেল না।

১৫

নমিতা এক এক রাজ্যের লজ্জা লইয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। গত্যন্তর ছিল না। গিরিশ বাবু এ-হেন কুস্বভাবা মেয়ের দায়িত্ব লইবেন কোন্ সাহসে? তাই একদিন অবনী বাবুকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া তিনি মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন যে মেয়েটার সত্যকার পুণ্য সঞ্চয় হইবে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করিয়াই; তাহার সংসার শ্বশুরবাড়ির উঠোনটুকুতেই। শেষকালে এইটুকুও টীকা দিলেন: মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার কার্য্যকলাপ শাসনের চক্ষে অনুধাবন করিতে হইবে। কথাগুলি নমিতার সামনেই বলা হইয়াছিল; কিন্তু এত লজ্জাকর উপদেশ শুনিয়াও কেন যে তাহার মরিতে ইচ্ছা করিল না সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

অবনী বাবু নমিতাকে লইয়া আসিলেন। একখানি ছোট ঘর ছাড়া তাহার জন্য সামান্য একটু বারান্দাও আর রহিল না। সেই ঘরেরই বাহিরে অপরিসর একটু জায়গায় একটা তোলা-উনুনে তাহাকে রাঁধিতে হয়। সমস্ত সংসার-যাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন নির্ব্বাসিত নমিতা আর কি করিবে? বড় ঘর হইতে স্বামীর বৃহদায়তন ফোটোটা পাড়িয়া আনিয়া দুই বেলা তাহারই ধ্যান করে। স্বামীর মুখ সে প্রায় ভুলিয়া গেছে; মনে করাইয়া দিবার জন্য একটা প্রতীকের আবশ্যক আছে বৈকি। এক এক সময় তাহার মনে হয় এ মুখ যেন অন্য কারুর, তাহার স্বামী এই ছবির চেয়েও জীবন্ত ও সুন্দর ছিল। কিন্তু মনে মনে স্বামী-ধ্যান করিলে তাহার খ্যাতি বাড়িবে না বলিয়াই এমন একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য লৌকিক উদাহরণকে সে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

আর কোনো কাজে সে মন বসাইতে দেয় না। অজয়ের দেওয়া বইগুলি সে কোথায় ফেলিয়া আসিত? কিন্তু উহাদের একটিরো পৃষ্ঠা উলটাইলে তাহার স্বামী-পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সে উহাদের স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। মালী দরজার গোড়ায় ফুল রাখিয়া যায়, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে সেই ফুল লইয়া খেলিতে বসে। পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া লুণ্ঠিত হয়, সিক্ত শীতল শরীর হইতে এমন একটি সুন্দর পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে যে নমিতার পর্য্যন্ত নিজের জন্য মায়া করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই নির্জ্জীব অন্ধ ও বধির ছবির সম্মুখে নিজের এই পরিপূর্ণ দেহ-পাত্রখানি আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্যস্বরূপ তুলিয়া ধরে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, দেবতা আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে না, না বা সম্ভাষণ! কে সেই দেবতা? চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুল হইয়া যায়, স্বামীর স্মৃত মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাকায়, কিন্তু কৃত্রিম ছবি সাহায্য করিতে পারে না। কোথা হইতে আরেকখানি মুখ অন্ধকার অন্তরে আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করে। শত মনঃসংযোগ করিয়াও সে-মুখ নমিতা তাড়াইতে পারে না। তার দুই চোখে কি দুর্নিবার তেজ, ললাটে কি অহঙ্কার—কখনো কখনো ফুল নিবার জন্য সে এমন উৎসাহে হাত

দাঁড়াইয়া দেয় যে কুল তাহাকে দিতেই হয়। সেই দুরন্ত দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় কৈ? সেই দেবতা নমিতাকে ঘর ছাড়িবার জন্য একদিন শঙ্খ বাজাইয়াছিল। দেবতাকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার শঙ্খধ্বনি কবে হইতে আর শোনা যাইবে না?

মনের এই চাঞ্চল্য দমন করিতে হইবে। সংসার বলে বিধবার পক্ষে এই চিত্তবিভ্রম পাপ—যথার্থ, সংসারের আদেশ শিরোধার্য্য। নমিতা কৃচ্ছ্রসাধনায় মন দিল। একবেলা আহার করিত, এখন আহারের সংখ্যাগুলি এত কমাইয়া ফেলিল যে অরুণা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রবধূর এই স্বামীচর্য্যা তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি বাধা দিতে চাহিলেন, কিন্তু নমিতা তাহাতে কান পাতিবে কোন্ লজ্জায়? সে নিরম্বু একাদশী করে, ব্রত-উপবাস তাহার লাগিয়াই আছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দিতে চাহিলে সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে: স্বামীর নামই আমার জপমন্ত্র। আপনারা যদি একটুক্‌রো পাথরে ভগবান পান্, একটা ছবিতে তাঁকে পাওয়ায় আমার হানি কি? আমি স্বামী বুঝি, নারায়ণ বুঝি না।

সমস্ত সংসার নমিতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। সে তাহার কলঙ্কিত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সমস্ত সাহসিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনই একটি প্রতিক্রিয়া না পাইলে সংসার তাহার সামঞ্জস্য হারায়। সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখিতে নমিতা এমন করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতিকূলতা করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই কৃত্রিম পূজায় তাহার নেশা লাগিয়া গেল। খুনী সাধু ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাধু বনিয়াছিল, বহুলাচরিত অভ্যাসে নমিতাও যে তপশ্চারিণী হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? কিন্তু স্বামীকে মূর্ত্তি দিতে গেলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, তখন নিজেকে বৈধব্যচারিণী বলিতে বলিতে তাহার মন উঠে না। সংসারে তাহার এই আচরণটাই শোভন ও বাঞ্ছনীয় এই ভাবিয়াই সে রোজ স্নান করিয়া চন্দন ঘষে, ফুল দিয়া ফোটো সাজায়, ভুলিয়াও একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। সে এত করে তবু তাহার মন ভরিয়া উঠে না কেন? না, মানুষের মন একটা ব্যাধি; পায়ের তলায় বিঁধিয়া-থাকা কাঁটার মত তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। মনের টুঁটি টিপিয়া ধরিবার জন্য নমিতা গীতার একটা বাঙলা-সংস্করণ খুলিয়া বসিল।

এত লোক-জন, তবু এ-বাড়িতে তাহার বড় একলা লাগে। মা কাছে থাকিলে তাহার এমন খারাপ লাগিত না। সে-দিন মা তাহাকে মরিবার জন্য এক বোতল কেরোসিন তেল সাম্‌নে ধরিয়াছিলেন; তবু সে মরিলে মা-ই বেশী কাঁদিবেন বলিয়া সে স্বচ্ছন্দে বোতলটা স্বস্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। মাকে কাছে পাইলে তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে এই বলিয়াই কাঁদিত: মা গো, এত পূজা করিয়াও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এমন একটা অকর্ম্মণ্য আলস্যের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াই বা আমি করিব কি? রাত্রে তাহার একা শুইতে বড় ভয় করে, খালি মনে হয় কে যেন তাহাকে বাহিরে টানিয়া নিবার জন্য তাহার দৃঢ় ব্যগ্র হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। অরুণা প্রথম প্রথম তাঁহার কাছে শুইবার জন্য অনুরোধ করিতেন বটে, কিন্তু পূজা-ঘর ছাড়িয়া সে দিনে-রাত্রে কোথাও বাহির হইবে না বলিয়া পণ করিয়াছে, তাহাকে টলায় কাহার সাধ্য। মেঝের উপর বিছানা করিয়া শুইয়া তাহার সহজে ঘুম আসে না, খোলা জানালা দিয়া বহু দূরের তারাগুলি চোখে পড়ে। ঐ একটি তারার মধ্যেই হয় ত' তাহার স্বামীর সস্নেহ সঙ্কেত আছে—এমনি ভাবে সে এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের একটা উদার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খানিকক্ষণ চাহিতেই তারাগুলি একত্র হইয়া একজনের মুখের মত প্রতিভাত হয়। সেই মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব স্পষ্ট হইতে থাকে। নমিতা এমন বিভোর হইয়া পড়ে যে সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া তাহার স্বামীর ইঙ্গিতের একটি কণাও আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। কখন আবার জ্ঞান হয়; পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সম্বরণ করিতেছে এমনি ভাবে জানালাটা বন্ধ করিয়া দেয়; আলো জ্বালাইয়া গীতা পড়িতে বসে। এইবার শুইবার সময় স্বামীর ফটোটা পাশে লইয়া শোয়।

উমা ঠাট্টা করিয়া বলে: তোমার স্বামী-পূজার এত ঘটা দেখে সন্দেহ হয়, বৌদি।

নমিতা প্রশ্ন করে: কিসের সন্দেহ?

—মনে হয় যে কামনাকে তুমি জয় করছ ব'লে বিজ্ঞাপন দিচ্ছ সেটাতেই সপ্রমাণ হচ্ছে যে কামনা তোমার অণুতে-অণুতে।

নমিতা আঁৎকাইয়া উঠিল : তার মানে ?

—তার মানে স্বামী হারিয়েও তুমি স্বামী চাও। সে-যুগের সাবিত্রী এর চেয়েও কঠিন তপস্যা করেছিল কি না জানি না, কিন্তু যম সত্যবানকে ফিরিয়ে দিয়ে সাবিত্রীর মুখ রেখেছিল ; নইলে স্বামী বিহনে তার সেই কাঙালপনার লজ্জা সে সইতো কি করে'? তোমার এই বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরুষের সঙ্গ-কামনার উর্দ্ধে তুমি আজো ওঠনি।

নমিতা প্রতিবাদ করিল : পুরুষ কি বল্‌ছ, উমা? আমার স্বামী—দেবতা, ঈশ্বরের প্রতিভূ।

উমা ঘাড় হেলাইয়া কহিল : হোক্। যে দেবতার মূর্ত্তি ভাঙে সেই ভাঙা টুক্‌রো পুজো না করে' আরেকটা গোটা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই পুজোর অর্থ হয়। সে মূর্ত্তি তোমার দেশাত্মবোধে হোক্, প্রেমে হোক্, রোগীসেবায় হোক্—প্রতিষ্ঠিত কর। মৃত স্বামী আরাধনায় নয়। এটা একটা তুচ্ছ আচরণ।

নমিতা রাগিবার ভাণ করিল : অমন ঈশ্বরনিন্দা ক'রো না, উমা। স্বামী পূজা আমার একটা আচরণ মাত্র নয়, আমার ধর্ম্ম। বিরহবোধ মনের একটা পবিত্র প্রসাধন।

—ভালো করে' ভেবে দেখ সে বিরহবোধ কি মনের একটা দুর্ব্বলতা নয়?

—আমি ভালো করে' ভেবে দেখেছি।

—আমি হ'লে কিন্তু ফোটো পাশে না শুইয়ে একটা আস্ত জ্যান্ত লোক পাশে শোয়াতাম। সতীত্বের এমন অপমান করতাম না।

নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল : আমি হয় ত' এতদিন তাই ক'রে আসছিলাম।

দুপুর বেলাটাই তাহার কাছে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। তখন রাস্তায় একটা ফিরিওলার ডাক, একটা মোটরের শব্দ কিম্বা পথচারীদের ছোট ছোট কোলাহল শুনিবার আশায় সে কান পাতিয়া থাকে। কোনো কাজেই মন বসে না, কি কাজই বা সে করিবে? তখন অবাধ্য চিত্ত লঘু একটি প্রজাপতির মত নবীন কুণ্ডুর লেইনের বাড়িতে ঘুরিতে থাকে। নীচের তলা ছাড়িয়া উপরে আর উঠিতে চাহে না। সেই অযত্নবিন্যস্ত অপরিস্কার ছোট ঘরখানিকে সে পরম মমতায় স্পর্শ করে—সেই ছেঁড়া বিছানা, নোংরা মেঝেটা, দেয়াল হইতে চুণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে—কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। জানালার ও পিঠে শার্টটা মেলিয়া দিয়াছে, কেহ যদি হাত বাড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহাতে ত' ভারি আসিয়া যাইবে! ছেঁড়া হাঁ-করা জুতা-জোড়া পর্য্যন্ত মিলাইয়া লইবার নাম নাই। এমনি দুপুর বেলায় আসিয়া ভাত চাহিত। ঘরে যেন তাহার কে আছে সযত্নে ভাত বাড়িয়া বসিয়া থাকিবে। পাছে স্নান করিতে আসিয়া জল না পায় এই জন্য নমিতা কত দিন চাকরটাকে চৌবাচ্চায় জল ছাড়িয়া দিতে চুপি-চুপি বারণ করিয়াছে। তবু যদি তাহার হুঁস্ থাকিত!

এমনি এক দুপুর বেলায় অস্থির হইয়া নমিতা অবনী বাবুকে আর না বলিয়া পারিল না : বাবা, আমাকে কোনো একটা ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিন্, আমার দিন আর কাটে না।

অবনী বাবু মায়া করিয়া কহিলেন,—ধর্ম্মের মধ্যে এই ত' ভালো পথ পেয়েছ মা, এর চেয়েও ভালো স্কুল কি কিছু আছে ?

নমিতা মাথা হেঁট করিয়া রহিল, অনেক কথা বলিবার ছিল কিছুই বলিতে পারিল না। আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে অনেক পরে কহিল,—অন্তঃপুরে লেখা পড়া শিখ্‌বার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় না? যেমন সংস্কৃত, ইংরিজি।

অরুণা বাধা দিলেন : না, ও-সবে কাজ নেই। দিন না কাটে ঘরের কাজ-কর্ম্মও ত করতে পার। রাত-দিন ধর্ম্ম আবার চোখে ভাল দেখায় না।

কতটুকু ধর্ম্মাচরণ যে ভালো দেখায় তাহারই হিসাব করিতে করিতে নমিতা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঘরের কাজ-কর্ম্ম সে আর কত করিবে? করিবার আছেই বা কি? তবু তাহার অবসরযাপনের ক্লান্তির আর সীমা নাই। এখন দুপুরেও সে স্বামী-পূজা সুরু করিয়াছে।

এতদিনে নির্ব্বাক দেবতা বুঝি কথা কহিলেন। কাল রাতে সুধীকে নমিতা স্বপ্ন দেখিয়াছে—কি বিশ্রী স্বপ্ন! স্বামী তাহাকে বলিতেছেন : এ-সব তুমি কি ছেলেখেলা করছ, নমিতা? আমাকে তুমি এমন করে' বেঁধো না।

যে দিন নমিতা কাকার বাড়ি ছাড়িয়া প্রথম এখানে আসে সেদিনও সুধী স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কাল রাতের স্বর যেন অনেক স্পষ্ট, দৃঢ়। নমিতা বলিল : তবে আমি কি নিয়ে থাকবো?

উত্তর হইয়াছিল : যে তোমাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে।

—তুমি আমাকে ভালবাস না?

—না।

কে তবে তাহাকে ভালবাসে এমন একটা প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই নমিতা আর উত্থাপন করে নাই। সে বুঝি মনে মনে তাহার নাম জানিত। তবু গায়ে পড়িয়া সুধী কহিল,—তোমার প্রদীপকে মনে পড়ে? সে।

লজ্জায় অরুণবর্ণা ঊষার মত নমিতা কাঁপিয়া উঠিল। তখন পূর্ব্বদিকে প্রভাত হইতেছে। জাগিয়া উঠিয়া নমিতার ইচ্ছা হইল স্বামীর ফটোটা ছুঁড়িয়া ভাঙিয়া ফেলে।

(ক্রমশঃ)

পত্রাংশ

[শ্রীলীলা দেবী]

আরব্য সাগর, ২৮শে নভেম্বর।

আজকের অপরাহ্ণের নিখুঁৎ নির্ম্মল আকাশে বিচিত্র রঙের মেঘেরা উড়ে আস্‌ছে। যেন কোথাও অদৃশ্য প্রজাপতিরা পাখা থেকে কোমল রেণু ঝাড়্‌ছে।

*　*　*

২৯শে নভেম্বর।

আরবদেশের উপকূল সারা সকাল চোখে রয়েছে। পর্ব্বত-বন্ধুর।—পর্ব্বতচূড়াগুলি মেঘাবলম্বিত। তাদের ছায়া ও আমাদের জাহাজ—দুইয়ের মাঝখানে সমুদ্র শুয়ে আছে, যেন একখানা নীলবর্ণ মরুভূমি। এত প্রশান্ত যে লোভ হয় এর উপর দিয়ে হেঁটে ভারতবর্ষে ফিরে যাই।...

আজকের সূর্য্যোদয়টি ছিল যার বাড়া নেই। মেঘেদের গায়ে মেঘেরা টলে পড়ছিল, যেন সোণালি চুলের রাশ। আলো যেন বাতাস হয়ে কার সোণালি কেশপাশ খুলে দিয়েছে, আর সেই অবিন্যস্ত অবহেলিত কেশ আনন্দে দিশেহারা।

এখনো আরবদেশ দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় সুন্দর দেশ। আকাশ অতি পাণ্ডুর, সমুদ্র গম্ভীর গাঢ় নীল-ধূসর। তটভূমি নীলমিশ্রিত লোহিত। পর্ব্বতগুলির উপরে মেঘের বালিশে মাথা রেখে দৈত্যেরা ঘুমন্ত। তাদের নাকের গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছি যেন।

*　*　*

৩০শে নভেম্বর।

এখনো আরবদেশ দেখা যায়। মনে হয় মন কাড়্‌বার মতো দেশ। তুষারমৌলি পর্ব্বত। বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। বল্‌তে পারা যায়, জনপ্রাণীবর্জ্জিত। এইমাত্র একটা বিপুলকায় শুশুক তার জল-চক্‌চকে পৃষ্ঠভাগ দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবজ্ঞার সঙ্গে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাসও ছাড়্‌ল।...

রাতগুলি বড্ড সুন্দর। সমুদ্রটি অতি মোলায়েম কালো মখমল। দিগ্বলয়টি মরকতমণি—আভা তার অন্তর্হিত হয়েছে চিরন্তন কালের গভীরতায়। তারাগুলি স্বচ্ছ—ওগুলি হলো রাত্রের চোখের পাতায় দুলতে-থাকা অশ্রুকণা। চন্দ্রমাকে বল্‌তে পারি স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক। প্রত্যেক মেঘখণ্ডের অন্তরাল হতে অম্লানভাবে নির্গত হচ্ছে তাঁর মুক্তাবিনিন্দী রূপ।

*　*　*

লোহিত সাগর, ২রা ডিসেম্বর।

সমুদ্র যেন গলিত রজত। পশ্চিম দিগ্বলয়ের গায়ে শুঁড় গুঁজে কৃষ্ণকায় মেঘ-হস্তীরা ঝিমচ্ছে।...

কাল রাত্রে জাহাজের তাড়া খেয়ে ঢেউগুলি যখন পালিয়ে যাচ্ছিল চাঁদের আলো তখন তাদের পিঠে সওয়ার হয়ে বসছিল।...

চাঁদের বাঁকানো পেয়ালায় ছিল রূপালি মদিরা। পৃথিবীকে, আকাশকে, সমুদ্রকে সেই মধুর মদিরা সে অকৃপণভাবে ঢেলে দিচ্ছিল।...

আমার এই অদীর্ঘ জীবনের দিকে ফিরে তাকালে মনের চোখে পরিষ্কার দেখতে পাই—বছরগুলিকে নয়, মুহূর্ত্তগুলিকে। মাসের পর মাস গেছে নিভে, কিন্তু এক একটি চাউনি, এক একটি কথা, এক একটি অনুভূতি এখনো সমান তেজে জ্বলছে। শতাব্দীর চাইতেও মুহূর্ত্তের আয়ুষ্কাল দীর্ঘতর হতে পারে। তবু আমরা কালের আপেক্ষিকতায় সন্দেহ করে থাকি। আমি বলবো জীবনের নিবিড়তার কম-বেশীর উপর কালের কম-বেশী অপেক্ষা করে। যখন বোধ-শক্তি সম্পূর্ণ সজাগ থাকে তখন ঘড়িতে এক সেকেণ্ড কাল উত্তীর্ণ না হতেই প্রকৃতপক্ষে পাঁচ শতাব্দীকাল উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।...

*　*　*

৪ঠা ডিসেম্বর।

দিগ্বলয় মলিন স্বর্ণবর্ণ। কেবল যেখানটায় সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে সেইখানটায় নিবিড় সোণালি। তার অরুণ

সমুদ্রের মোহময় নীলিমা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কেবল সেই-খানটাতে। সেখান থেকে সমুদ্র ক্রমশঃ লঘু-নীল। তার তুলনায় চাঁদের রঙ্ ক্যাকাশে। যেন একটি স-খুঁৎ মুক্তা। তার গায়ে গিরি উপত্যকার দাগ।...

আমার পিছনে রক্তরাঙা প্রতীচি। সমগ্র প্রতীচি-গগনের পার্শ্বদেশ ভেদ করে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। দিনটির বহুমূল্য আয়ু সেই ক্ষত-পথ দিয়ে বাহির হয়ে যাচ্ছে, আর জড়িয়ে-থাকা মেঘ-বসনকে অপরূপ রঙে রাঙ'চ্ছে।...

আমাদের জাহাজের কাছ দিয়ে আর একটি জাহাজ যাচ্ছে। ভায়োলেট রঙের সমুদ্রের উপর সাদা ফেণার লহর তুল্‌ছে সেই হলদে রঙের ডেক্‌ওয়ালা জাহাজটির কালো রঙের প্রান্তদ্বয়। তার কালো রঙের চোঙাগুলির ছায়াছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে গাঢ় নীল রঙের আকাশের পটে। গাঢ় নীল রঙের আকাশ গলে পড়ছে সূর্য্যাস্তশেষের গোলাপী আভায়।...

চাঁদের আলোয় আফ্রিকার অসমতল নীল উপকূল সমুদ্রের অন্ধকার গা বেয়ে উঠ্‌ছে ও পড়্‌ছে। যেন একটা দুঃসাহসী ঢেউ ভালবাসার নেশায় লাফ দিয়ে চাঁদের রূপের রূপার শিকলে বাঁধা পড়তে গেছল; রূপান্তরিত হলো চন্দ্রকান্ত মণিতে। ঊর্দ্ধে চন্দ্রদেব; তাঁর কণ্ঠে ঝঞ্ঝাসূচক মেঘমালা। ওটি যেন বৌদ্ধদের ধর্ম্মচক্র। চন্দ্র হচ্ছে চক্রের অক্ষ; চন্দ্রের রশ্মিগুলি হচ্ছে চক্রনেমি। চাঁদের আলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে রঙ্গ কর্‌ছে। আলোর টুক্‌রাগুলি ঢেউদের চূড়ার থেকে চূড়ায় ও গহ্বর থেকে গহ্বরে লাফ দিতে দিতে পরস্পরকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রতলের রহস্যদ্যোতক স্ফুরজ্জ্যোতির (phosphorescence) সহিত চন্দ্রকিরণের সঙ্গম ঘট্‌ছে।

ম্লান নীল কুয়াশার মতো উপকূল, তাকে নীচে রেখে মেঘগুলি পাখা মেলেছে, যেন অতি দুষ্প্রাপ্য উটপাখীর পেখম। পেখমের মধ্যে খচিত তারাগুলি রহস্যবিমূঢ় দর্শকের দিকে উজ্জ্বল বিস্ময়ে উঁকি মার্‌ছে।

চন্দ্রের পূর্ব্বদিকে আকাশের পাণ্ডুর সাদা মেঘ-দিয়ে-গড়া হাতদুটি আকাশের নীল আঁচল-ঢাকা বুকের উপর সরু ও লম্বা আঙুলগুলিকে সুকোমলভাবে বেঁকিয়ে রেখেছে। একটি হাত পূর্ব্ব মহাদেশের প্রতি ইসারা কর্‌ছে, অপরটি পশ্চিম মহাদেশকে আশীর্ব্বাদ করছে। স্তন-চূড়াকে আড়াল-কর্‌তে-থাকা নীল রঙের ভাঁজগুলির ফাঁকে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে মাণিকের মতো। চন্দ্রমণ্ডলের বাহুমাঝে এক বিশাল-কায় মেঘ-পতঙ্গ প্রবেশপথ খুঁজ্‌ছে।...

চাঁদের আলোয় আফ্রিকাকে মনে হয় যেন কোন পরীর দেশ, আলোয় ছায়ায় বহুরূপী।

জংলা গাছের বিচিত্র পাতা বেয়ে মেঘগুলি গলে পড়ছে চলন্ত বালুর উপর। বালুকা-বলাকা শুভ্র কেশের মতো উড়ে পড়ছে রাত্রির প্রশান্ত ললাটের গায়ে। সে ললাট কোন ধ্যানী বুদ্ধের ললাট। এমন সুন্দর!

* * *

৫ই ডিসেম্বর।

সুয়েজ খাল দিয়ে যাচ্ছি। পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য আমাকে বাক্যহারা করেছে। একটি ঝলমলে পথ ধরে আলোটি আস্‌ছে আমার পায়ের কাছে। নীল লোহিত মরুভূমির ওপার থেকে আস্‌ছে ভায়োলেট রঙের ঢেউগুলির উপর দিয়ে। ইসারায় বল্‌ছে—চলো, পুব দেশে ফিরে চলো।...

বাক্যের জালে জড়িয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছি। যদি কথা দিয়ে প্রকাশ কর্‌তে যাই অত্যুক্তির মতো শোনাবে।*

* শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক ভাবান্তরিত

মরাবিল

[শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী]

এই সেই মরাবিল,—
গাঁয়ের প্রান্তে শেষ সীমান্তে ঝলিতেছে ঝিল্‌মিল্।
গোধূলি আলোর রঙিন্ তুলিকা কে যেন বুলায়ে যায়,
বুক হ'তে ওর মুখে আগাগোড়া পাও হ'তে সারা গায়।
চোখে জাগে কোন্ দিনের স্বপন মু'খানি ব্যথায় ম্লান,
মৌন সাঁঝের আঁধারে ফেলেছে হারা'য়ে ও হাসি গান।
ও যেন ধরার আদুরী মেয়েটী সদ্য-বিধবা-বেশ,—
আঁধারের কোলে এলায়েছে কালো আলো-করা এলোকেশ
সাদা থান্‌পরা বিষাদেতে মরা উদাস নয়নে ওর,
সবটুকু ঝ'রে শুকায়েছে আজ বেদনার ঘন লোর।
উত্তরি বায় লাগে এসে গায় দোলাইয়া অঞ্চল,
ওতো সাড়া নাহি দেয়, ভাবনায় মন যে ওর উতল।
দূরের গাঁ হ'তে গান গায় পাখী ওযে শুনে চম্‌কায়,
মরণে মরিয়া আছে মরাবিল,—এই শেষ দশা হায়!

বুক্ করে ধুক্-ধুক্,
ভরা ভাদরের আদর-প্লাবনে ভরা ছিল ওর বুক।
ওই বুকে কত ফুটিত পদ্ম-মৃণালে রক্ত-না'ল,
রাঙা হ'য়ে যেত সে রঙ্-বাহারে গোটা বুক মুখ্ গাল।
গেছে সে গুমোর আসিত ভ্রমর করি' মৃদু-গুঞ্জন,
আজ যেন তারা হঠাৎ ভুলেছে ফুল-মধু-ভুঞ্জন্।
মৃণাল ছিঁড়িয়া খাইতে আসে না মরাল মরালী আর,
চখাচখী ব'সে মুখোমুখি ব্যথা জানায় না আপনার।
সবুজের ঢেউ খেলেনা বুকেতে শুনো বুক্ ভ'রে রয়,
কোন্ সাহারার খাঁ-খাঁ হাহাকার দুরু দুরু ব্যথা ভয়।
শরতের মেঘ আকাশে ভাসিয়া যেত চ'ন্দ্রে কোন্ দেশ,
রহিত ও চেয়ে তারি পানে তুলি নয়ন নির্ণিমেষ।
ভোরবেলাকার কাঁচা রোদে নাওয়া পাকা আমনের বা'ল,
মুঠি মুঠি সোনা ছড়ায় না আর ঢাকিয়া ক্ষেতের আ'ল্।

আজ্ সব গেছে ওর,—
দুঃখের দিন ঘনায়েছে কবে সুখ-নিশি হ'লো ভোর।
বুকে বুকে ওর বেদনার ক্ষত দগদগি জ্বালাময়,
আজ কে উহারে কানে কানে দু'টো সান্ত্বনা-বাণী কয়!
কেহ ওর বুকে আসে না তো আর চড়িয়া সোনার নায়,
মরাবিল ওই ভরাট্ হ'য়েছে নেতি কাদা বালুকায়।
ওরি মত এই আমারও বুকেতে জ'মেছে কাদার স্তূপ্,
ওরি মত বুকে নিয়ে হাহাকার আমিও র'য়েছি চুপ্।

হাহাকার শুধু সার,—
ঝ'রে ঝ'রে আজ শুকায়েছে মোরও নয়নে অশ্রুধার।

সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্

[শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর]

উনিশ শো তিরিশ সালের 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন আমেরিকার সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্ (Sinclair Lewis)। আর কোন আমেরিকান এঁর আগে বিশ্ব-সাহিত্যের আসর হ'তে এত বড় সম্মান আদায় করতে পারেননি, কাজেই এই পুরস্কার পাওয়ায় ব্যক্তিগত হিসাবে সিন্‌ক্লেয়ার যতটা সম্মান পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী গৌরব হ'য়েছে আমেরিকার।

নোবেল প্রাইজের বয়স হ'ল আজ তিরিশ বছর। এই পুরস্কারের প্রবর্ত্তক হচ্ছেন নোবেল সাহেব। ইনি ডিনামাইট্ আবিষ্কার ক'রে জগতের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হয়তো ক'রেছেন বেশী। কিন্তু তার পর হ'তেই এই রসায়নবিদের চিন্তার ধারা আর অনুভূতি সমবেদনায় পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে হতভাগ্য রসায়নবিদ আর সাহিত্যিকদের জন্য—দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে যারা জীবনটা কাটিয়ে যায়, জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ কিছু দিয়ে যাবার আশায়। তাই নোবেল সাহেব যখন এই বিস্ফোরক পদার্থ (Dynamite) বিক্রী ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করলেন প্রচুর পরিমাণে তখন তিনি সেই সব অর্থে এই পুরস্কারের প্রবর্ত্তন করলেন হতভাগ্য কলাবিদ্ আর আবিষ্কারকদের প্রতিভা-উন্মেষের সুযোগ দিয়ে। জগতের বিজ্ঞান, রসায়ন ও সাহিত্য নোবেল সাহেবের কাছে এই গঠনমূলক কাজের জন্য ঋণী।

এই পুরস্কার এমনি একটা standard সৃষ্টি ক'রেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে নিয়ে যে এরই জন্য শিক্ষিত জগতে এঁদের সাহিত্য শুধু পরিচিত হ'য়ে উঠেনি লোভনীয়ও হ'য়ে উঠেছে। সিন্‌ক্লেয়ারের আগে অনেক বড় বড় জাতিই এই সম্মান পেয়েছে—ইংরাজদের 'কিপ্‌লিং', আইরিশদের "ইট্‌স্" আর "বার্ণাড্-শ", ফরাসীদের "আনাতোল ফ্রাঁস্" আর "রমাঁ রোলা", জার্ম্মানদের "টমাস্ মান", নরওয়েজিয়ান্‌দের "হ্যামসুন", আমাদের রবীন্দ্রনাথও—আরো অনেকেই। কিন্তু আমেরিকা এ পুরস্কার এতদিন পায়নি। ব'লতে গেলে আমেরিকার সাহিত্য এখনও শিশু। এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই শিশু-সাহিত্যই য়ুরোপের বহুযুগসাধনালব্ধ সাহিত্যের আসরে স্থান পেল। এখানে বলা যেতে পারে যে সাহিত্য-বিচারের ভার আছে যাঁদের উপরে তাঁরা শুধু কথাবস্তুর বিচার করেন না, তাঁরা বিচার করেন রসসৃষ্টির দিক দিয়ে আর দেশের সমসাময়িক অবস্থা সাহিত্যের মধ্যে কতখানি প্রকাশ পেয়েছে—সেই দিক্ দিয়ে।

সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এই পুরস্কার পেয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের খ্যাতনামাদের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে "মেন্ ষ্ট্রীট" (Main Street) প্রকাশ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই। এই বইখানি তিনি লিখেছেন আমেরিকার মধ্যবিত্তদের একঘেয়ে জীবনের তীব্র সমালোচনা ক'রে। এমনি একটি ছোট সহরের ছবি তিনি এঁকেছেন এই বইখানিতে—যে বইখানি পড়লে আমেরিকার যে কোন ছোট সহর ও তার সমাজের ধারণা করা যায়। তার পরের বিখ্যাত উপন্যাস "ব্যাবিট্" (Babbit)। এই উপন্যাসখানিতে তিনি আমেরিকার জীবনযাপনের ধারারে করেছেন তীব্র সমালোচনা, আমেরিকার খৃষ্টান ধর্ম্ম ও আমেরিকার ব্যবসাকে ক'রেছেন তীব্র ব্যঙ্গ। এই "ব্যাবিট"ই হচ্ছে সারা আমেরিকার রূপ। এই বইখানি পড়লে সারা আমেরিকাকে চিন্‌তে ও বুঝতে পারা যায়। এই বই সম্পর্কেই সেদিন বার্ণার্ড-শ' ব'লেছেন—"Mr. Sinclair Lewis has knocked Washington off his pedestal and substituted Babbit." তার পরের উপন্যাস হচ্ছে "দি জব" (The Job) আর "এল্মার জেন্ট্রি" (Elmer Gentry)। তারপর ইনি লিখেছেন "এ্যারোস্মিথ" (Arrowsmith) ডাক্তারী ব্যবসাকে ব্যঙ্গ ক'রে। তারপর এঁর খুব আধুনিক উপন্যাস হচ্ছে "দড্‌সোয়ার্থ" (Dodswarth)। এই বইখানিতে ইনি মার্কিন ও য়ুরোপীয় সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা ক'রেছেন। কেবল যে ইনি উপন্যাসই লিখেছেন তা নয়, নাটক লেখারও চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু এঁর নাটক "হোবার্ণিয়া" (Hobernia) তত ভাল হয়নি সমালোচকদের মতে।

ইনি যা বল্‌তে চান তা এঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ইনি দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছেন, কিন্তু এঁর লেখার ধরণ খুব সুন্দর মার্জ্জিত নয়—যদিও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এঁর লেখার ভঙ্গীটি বড় ঝাঁঝালো। লেখার মধ্যে গল্পাংশ খুবই কম আর যা আছে তাও অসংবদ্ধ—কোথাও আগাগোড়া কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, এ জন্য লিউইস্‌কে দোষ দেওয়া চলে না, কেননা কোনও দেশের জনসাধারণের জীবনের ধারা সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যের মধ্যে গড়ে ওঠেনি—সাহিত্যের মধ্যে সেই জনসাধারণের জীবন সুন্দর ক'রে দেখাতে গেলে সে সাহিত্য হ'ত মিথ্যে। সত্যকে তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যই হয়তো লিউইস্ নিজের সাহিত্যকে ম্লান ক'রে গড়েছেন—মাঝে মাঝে ইনি তাঁর দেশের যে সমাজের ছবি এঁকেছেন, তা মো'টই মোলায়েম নয়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ সমাজের ছবি আঁক্‌তে গিয়ে তাঁর সাহিত্য সুন্দর হ'তে পারেনি ব'লেই তিনি এই সমাজের ছবি তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তীব্রতার সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক গণ্ডীভূত সমাজের উগ্রতাকে তিনি উপহাস না ক'রে পারেননি—এইখানেই এঁর সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে সত্যিকারের আর্ট। এঁর এই নব্য ধরণের সাহিত্য-প্রতিভা থেকে আমরা আরো অনেক কিছু পাবার আশা করি—এঁর প্রতিভা অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যে আরো নূতন কিছু দিয়ে যাবে—এই আমাদের আশা। ভগবান এঁকে দীর্ঘজীবী করুন—এই আমাদের প্রার্থনা।

সিন্‌ক্লেয়ার লিউইস্
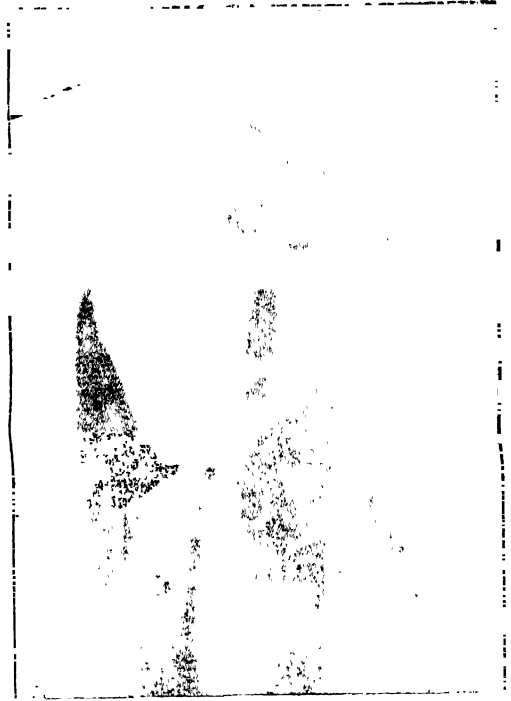
তাজ-পরিচয়

[শ্রীগোপাললাল দে]

ক্ষণেক দাঁড়াও তাজ ! আরবার দেখি ভাল করে',
ভারতের মহারাণী, ইরাণের রূপসী-সুন্দরী,
তুমি কি প্রেমের তীর্থ ? অনুরাগ-সিক্ত বক্ষ ভরে',
প্রণয়ের পুষ্পাঞ্জলি, তব পদে আগরা-নাগরী !

দেয় কি গো নরনারী ? মমতাজ ! কোথা মমতাজ
শাহান্‌শাহের প্রিয়া আজ তুমি নিখিলের রাণী,
ধরণীর কোণে কোণে ছড়ায়েছে শাজাহান আজ,
জোগায় পূজার ফুল সিন্ধু পার হ'তে তাই আনি !

মু'খানি টিপিয়া হাসে, ব্রীড়াহীন চির নববধূ,
রে মন্দির মরীচিকা ! প্রাণময়ী অহল্যা পাষাণী !
ধ্যানমৌন তপসনে রে প্রগল্‌ভা লালসার মধু !
বিশ্বের বিস্ময় তুমি, স্বর্লোকের প্রতিচ্ছবিখানি !
মনে হয় একবার বক্ষপট বিস্তারিয়া মোর,
দৃঢ় আলিঙ্গন দেই চারু অঙ্গ আবরিয়া তোর।

শিলং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

বিডন্ ফল্‌স্

২৭শে বৈশাখ—স্থানীয় বাঙ্গালী এবং প্রবাসী বাঙ্গালিদের যত্ন চেষ্টায় প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে একটি সম্মেলনী হইয়া থাকে। 'পূর্ণিমা সম্মেলনী'তে আমরাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম।

আজ আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। সমস্ত দ্বিপ্রহর মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া অপরাহ্নে বৃষ্টি থামিল বটে কিন্তু পরিষ্কার হইল না। জলকাদায় রাস্তা অপরিষ্কার হইয়া রহিল।

বেলা চারিটার পর আমরা উৎসবে উপস্থিত হইলাম। হল'গৃহ লোকে লোকারণ্য। প্রথমে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিল একটি খাসিয়া মহিলা। হিন্দু-মিশনের চেষ্টায় অল্প দিন হইল ইনি হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন, "ভুলোনা, ভুলোনা যে দেশের মেয়ে লীলা, খণাবতী, চিতোরের মেয়ে পদ্মিনী সতী।" গানটা ইঁহার মুখে বড়ই মধুর লাগিল। 'কমিক', 'আবৃত্তি' এবং অনেক গানের পর সভা ভঙ্গ হইল। সম্মেলনীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও রাখিয়াছিলেন। আমাদের উভয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বাণী কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিল।

আমরা সে স্থান হইতে 'লেকে' চলিলাম। লেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ একত্রে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশ সাহেব, মেম। শিক্ষয়িত্রীর সহিত অনেকগুলি বালিকা লেকের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছে। জলাশয়ের তীরে কয়েকটি যুবক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহাদের দৃষ্টি ঠিক জলের প্রতি নিবদ্ধ নহে। জলাশয় বেষ্টন করিয়া একটি সুন্দর প্রশস্ত পথ। প্রসারিত রাস্তা দিয়া দুই একখানা ট্যাক্সি চলিতেছে। বৃহৎ চীর তরুর ছায়ায় চারিদিক ছায়াপূর্ণ। মাঝে মাঝে কেয়ারি-করা ফুল গাছ, পুষ্পসজ্জায় সাজিয়া বায়ুহিল্লোলে হাসিতেছে। বৃক্ষের ছায়ায় কুঞ্জ-

বিতানের ফাঁকে এক একখানি লোহাসন। লেকের স্বচ্ছ জলে কয়েকটি শুভ্রবর্ণের রাজহাঁস সাঁতার কাটিতেছে।

আমরা চারিদিকে ঘুরিয়া জলের অনতিদূরে তৃণাসনে বিশ্রামের জন্য বসিলাম। ধীরে ধীরে মলিন দিবা সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করিলেন। মেঘভাঙ্গা আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতে না হইতে জলের উপর চন্দ্রের প্রতিবিম্ব শতবার গড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। আকাশের ছায়া, বৃক্ষের ছায়া চাঁদের ছায়া লেকের বুকে প্রতিফলিত হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল।

লাইমাখোড়া

রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা ও লরেটো গেলর্স স্কুল দেখা যায়।

২৮শে বৈশাখ—প্রভাতে এমেলি আসিয়া উপস্থিত, রাত্রে তাহার স্বামী বাড়ী আসিয়াছেন। তাহার দাদা হরিণ শিকার করিয়া আনিয়াছে। আমরা হরিণ মাংস খাইব কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। আমি মাংস খাই না, আমার কন্যার এবং কন্যার পিতার পেটের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া ধন্যবাদের সহিত মাংসগ্রহণের অনিচ্ছা জানাইয়া এমেলিকে ঘরে বসাইলাম। খাশিয়াদের যথেচ্ছা গরু, শুয়ার মুরগী ভোজনের ব্যবস্থা দেখিয়া ইহাদের প্রদত্ত হরিণমাংস লইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। মাংস লওয়া হইল না তজ্জন্য বাণী ও সিং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল।

এমেলি থাকিতে থাকিতেই তাহার স্বামী আমার স্বামীর সহিত আলাপ করিতে আসিলেন। ইংরাজী বাংলা দুই ভাষাতেই ভদ্রলোকের বেশ দখল আছে। আমাকে দেখা মাত্র নমস্কার করিয়া মাতৃ সম্বোধনে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাদের বিনম্র ব্যবহার, শিষ্টাচার প্রশংসনীয়। এমন আন্তরিক সৌজন্য বাঙ্গালীর নিকটে বাঙ্গালী বোধ হয় আশা করিতেও পারে না।

এমেলিরা বিদায় লইলে আমরাও বাহির হইলাম। শিলং-এ খাশিয়াদের অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। বড় গির্জ্জার পার্শ্ব দিয়া হাসপাতাল দেখিয়া আমরা পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে উপস্থিত হইলাম। কলিকাতাতেই জলাতঙ্কের চিকিৎসা হইতেছে বলিয়া এখানে তখন বিশেষ জনতা দেখা গেল না।

আজ আমরা দূরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। নিকটের পালা প্রায় শেষ হইয়াছে। শিলং হইতে পাঁচমাইল দূরে এলিফাণ্ট ফলস্ বা হাতীপানি। তিন মাইল দূরে শিলং পিক দুইটি দ্রষ্টব্যস্থান এক দিকেই অবস্থিত, এক ঢিলেই দুইটি পাখী মারিবার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতে হইল।

বেলা দুইটার সময় ট্যাক্সি আসিল, ট্যাক্সিওয়ালা নেপালী। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নেপালীটির সহিত ট্যাক্সিওয়ালার খুব ভাব হইয়া গেল। এ কয়েক দিন সিং বেচারী খাশিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ জমাইতে গিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আজ স্বজাতির সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইল।

দ্বারে তালা লাগাইয়া চাবি এমেলির কাছে রাখিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

যে পথে শিলং-এ আসিয়াছিলাম, সেই পথেই যাইতেছি—দেখিতে দেখিতে সৈন্যদের ছাউনি ছাড়াইয়া গাড়ী মাঠে আসিয়া পড়িল। মাঠের মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র, বাগান, কারখানাবাড়ী পাহাড়ের সুনির্জ্জনে ছবির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। কাঠুরিয়া স্ত্রী-পুরুষপৃষ্ঠে কাঠের বোঝা লইয়া সহরে ফিরিতেছে। এক এক বার উঁথারা নদী দৃষ্টিপথে আসিয়া সরিয়া যাইতেছে।

বেলা আড়াইটার সময় আমরা এক সঙ্কীর্ণ বনপথের পার্শ্বে নামিলাম। এ পথে ট্যাক্সি চলে না। নেপালী ট্যাক্সিওয়ালা বাহাদুর আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। রৌদ্রের প্রখর তেজ, আমরা হাঁটিয়া যাইতেছি। গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের রৌদ্র বড়ই প্রখর।

প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিবার পর এক ছায়া-শীতল নিভৃত স্থানে আমরা উপনীত হইলাম। প্রকৃতির সে সাধের কুঞ্জ-কাননে সূর্য্যের এতটুকু উত্তাপ নাই, কোথাও রবি-রশ্মিপাতের চিহ্ন নাই। স্নিগ্ধ সুশীতল বনতল।

হস্তীর মস্তকাকৃতি এক প্রশস্ত পাহাড় বাহিয়া অজস্র ধারায় জল ঝরিতেছে। অনুচ্চ পাহাড়ের অংশ হস্তীর মস্তকের ন্যায়, নিম্ন অংশ শুঁড়ের মতন, তাই এ ঝরণার নাম 'হাতী পানি'। এ ঝরণার উৎস-ক্ষেত্র কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। নির্ঝরের সাম্‌নেই ক্ষুদ্র বিশ্রাম-কক্ষ। ভ্রমণ-কারীরা বিশ্রামের কাঠের বেঞ্চির গায়ে ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া নিজেদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছে।

পায়ের চিহ্ন ধরিয়া নীচে নামিয়া আমরা একটি সেতু পাইলাম। সেতুর তলদেশ দিয়া অবারিত উচ্ছ্বসিত জল-ধারা দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। দুই পাশের বেতস বন বিপুল জলরাশির আলোড়নে কাঁপিয়া উঠিতেছে। গাছের গায়ে জড়িত হইয়া এক একখানি বিরাট পাথর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাথরের গায়ে কত লতা কত বন-ফুল। প্রকৃতি বিশ্বপিতার পূজার ডালি সযত্নে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। নির্ঝরের কোটী কোটী মুক্তাফলে রাশি রাশি বনকুসুমে তাঁহার পূজা হইতেছে। এখানে তিনি অদৃশ্য নহেন। তাঁহারি নির্ম্মাল্যস্বরূপ অনেকগুলি পুষ্প-গুচ্ছ তুলিয়া লইলাম। কয়েকটা ছোট ছোট ঝর্ণার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক ঝর্ণার পাশে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলাম। এখানকার শীতল জলে স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর মন জুড়াইয়া গেল।

'হাতীপানি' হইতে 'শিলং পিক' দুই মাইল, চারিটার সময় পাহাড়ের পাদদেশে গাড়ী রাখিয়া পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। শিলং পিকই শিলং-এর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান। পূর্ব্বে শিলং পিকেই শহর করিবার কথা হইয়াছিল। শিলং পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে বহু প্রান্তর, শস্য-ক্ষেত্র, দূরের অস্পষ্ট গ্রামগুলি পর্ব্বতের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। এ-প্রদেশ একেবারে জনশূন্য, শুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। চারিদিকের দৃশ্যাবলী মনোহর, তরুলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ, পাখীর কলকাকলী-পরিপূর্ণ।

কিয়দ্দূরে উঠিয়া আমি গাছের তলায় বসিয়া পড়িলাম। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, ভারী ক্লান্তি বোধ করিতে-ছিলাম। ঊর্দ্ধে পর্ব্বতচূড়ায় উঠিতে ইচ্ছা হইল না। আমার দেখা দেখি বাণীও আমার পাশে বসিল।

আমাদের অনিচ্ছা বুঝিয়া তিনি সিংকে আমাদের কাছে রাখিয়া বাহাদুরের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

সিংয়ের কি আনন্দ! একে পাহাড়ী, তায় বয়স কম, মুক্ত পাহাড়ের কোলে আসিয়া আনন্দে অধীর হইয়া গেল। গাছে চড়িয়া, ফুল ছিঁড়িয়া সে এক ফলের সন্ধান পাইল। পাতার ঠোঙায় কতকগুলি হরিদ্রা বর্ণের ফল আনিয়া আমাদের নিকটে হাজির করিল। বাজারে ফলের দোকানে এ ক্ষুদ্র ফলগুলি দেখিয়াছিলাম। খাইয়া দেখিলাম মন্দ নহে, একটু টক স্বাদ, ঝোপে ঝোপে গাছ ভরিয়া অসংখ্য ফল পাকিয়া রহিয়াছে।

সিং-এর সহিত বাণী ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল, ফল ভোজনের পর আমরা অগ্রসর হইলাম। একটি সুন্দর বাঁকা রাস্তা ঘুরিয়া পূর্ব্ব স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলাম তখনো তাঁহার সন্ধান নাই। রৌদ্র একেবারে পড়িয়া গিয়াছে, দূরে গিরি-অন্তরালে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গিয়াছেন। গিরিচূড়া রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

সিং "বাবু, বাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, বাণীর ক্ষীণ-কণ্ঠ ক্রন্দনে জড়াইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। কাছে লোক নাই, লোকালয় নাই, বেলাও নাই। ভয়ে ভাবনায় আমি দিশাহারা হইলাম। আমার ভয়ের অন্য একটা কারণ ছিল, খালি বাসায় টাকা না রাখিয়া তিনি আমাদের সঙ্গের সমস্ত টাকা কোটের পকেটে আনিয়াছিলেন।

বিদেশে দুর্গম গিরিপথে অতগুলি টাকা সাথে ভাবিতেই আমার আতঙ্ক হইতেছিল।

তাঁহাকে অনেক খুঁজিয়া ডাকিয়া যে পথে আসিয়া-ছিলাম অবশেষে সেই পথেই ফিরিলাম।

অর্দ্ধ রাস্তায় নামিয়াই বাহাদুরের সহিত দেখা। তিনি ও বাহাদুর সমস্ত পাহাড় নাকি আমাদের খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, যেদিকে তাঁহারা খুঁজিয়াছেন আমরা তাহার বিপরীত দিকে খুঁজিয়াছি। সুতরাং সমস্ত চিন্তার অবসান হইল।

ট্যাক্সির কাছে গিয়া দেখি তিনি আমাদের খুঁজিয়া হয়রান হইয়া তখনই ফিরিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের দোষখণ্ডনের জন্য একটু তর্কাতর্কির পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম তখন

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোণার আঁচল খসা ;
হাতে দীপ-শিখা,
দিনের কল্লোলপর টানি দিল ঝিল্লীস্বর
ঘন যবনিকা।"
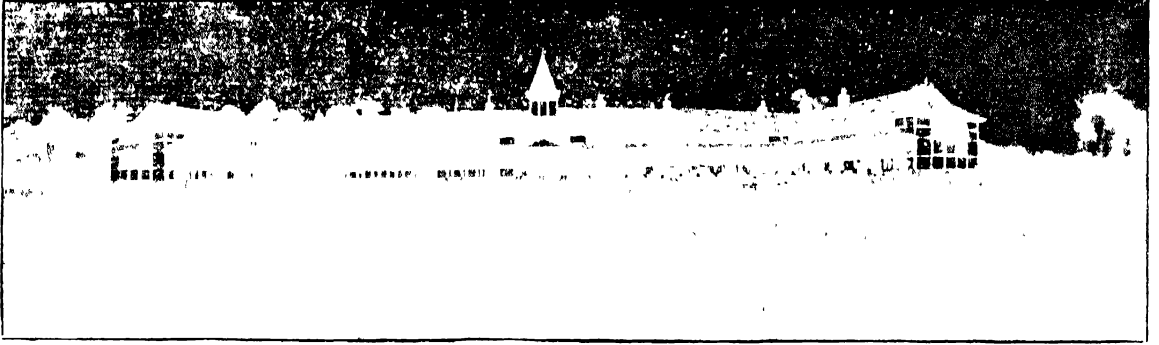
পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্

(ক্রমশঃ)

কামনা

[শ্রীসরোজবাসিনী দেবী]

হেথা—মেদিনীর বুকে দু'টি হতাশার
রেখে যাব দু'টি মূল,
একটি বহিবে তটিনী হইয়া
একটি ফোটাবে ফুল,

ফুলটি আমার দেব-পদতলে
ফুটিবে অর্ঘ্য হ'য়ে
প্রেয়-হিয়াতল ভরিবে তটিনী
গভীর ধারায় ব'য়ে।

ধোঁয়া আর ধূলো

[শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়]

ধোঁয়া আর ধূলো—

শহরের বুকে রাত্রিদিন একটা বুভুক্ষু বিরাট অজগর ফোঁসে যেন···তার জ্বালাময় উগ্র বিষাক্ত নিশ্বাসের সঙ্গে যে বিষ সে উগ্‌রে তোলে তা' লুফে নিয়েই ফাল্গুনের আগুন-হাওয়া মেতে ওঠে দিকে দিকে।

এক পাশ ঘেঁসে ষ্টেশন—আগম-নিগমের বাঁধা পথ। ষ্টেশনটি বিরাট না হ'লেও-মস্ত। জংসন···এধারে লাইন, ওধারে লাইন···ষ্টেশন-ইয়ার্ডের বুকের কাছে লোহার লাইনগুলোর সে কি ঠেলাঠেলি! বহুকালের মৃত দানবের শীর্ণ কঙ্কাল একটার সঙ্গে আর একটা যেন নিবিড় আত্মীয়তায় জড়িয়ে গেছে।

সমস্ত ষ্টেশন-ইয়ার্ডটা দিবারাত্র কি এক আশাভরা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে সুদূরের পানে। দূরদেশের অনেক কথা প্রথমে তারই কাছে ফাঁস হ'য়ে যায়;—বুঝি, নূতন কোন সংবাদের আশায়ই সে এমন ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে প্রতীক্ষা করে। বুকের মাঝে আগুন নিয়ে ছুটে আসে সুদূর থেকে ক্ষ্যাপা যন্ত্রদানব,···ষ্টেশন-ইয়ার্ডের শিরায় শিরায় খেলে যায় সেই আগুনের তীব্র জ্বালা,···আবার সে যন্ত্র-দানব মিলিয়ে যায় সুদূরে। ষ্টেশন ইয়ার্ডটা নিবিড় ব্যথায় মুস্‌ড়ে পড়ে···আহত রক্তাক্ত চেতনালুপ্ত পশুর মত।

আবার যাত্রীর হুড়াহুড়ি হল্লায় চেতনা তার ফিরে আসে। কিন্তু মাথা তোলার আগেই দূরযাত্রী দানবের উন্মত্ত উল্লাস শাসন-ঝটিকা তুলে শাঁ শাঁ ক'রে ছুটে আসে।

এম্‌নি মুহুর্মুহু মৃত্যু আর জীবনের সঙ্গে তার বোঝাপড়া চলে।

ষ্টেশন পেরিয়েই শেরশা'র আমলের সেই চিরন্তনী রাস্তা—

সুদূরের সঙ্গে তারও ষ্টেশন-ইয়ার্ডের মতই নিকট সম্বন্ধ। মুশাফিরের পরম দোস্ত্।

এই রাস্তার এক পাশে জনমানবশূন্য একটি ধর্ম্মশালা, আর তারই মুখোমুখি অপর পাশে সঙ্কীর্ণ ছায়ার নীচে গোল-পাতার ছাউনি দেওয়া একখানি ছোট জীর্ণ ঘর। যমুনা তার মালিক। সত্যকারের মালিক যে কে তা যমুনা নিজেও জানে না। একদিন বাসের নিতান্ত অযোগ্য ঘরটাকে শূন্য দেখেই সে দখল করে, কিন্তু বাসযোগ্য ক'রে তোলার পরেও কেউ দাবী ক'রে বসেনি ব'লেই আজ পর্য্যন্তও সেই মালিক।

তারও দাবীদাওয়া একদিন—খুব অল্প দিনেই হয়ত' মিটে যাবে সে জানে, কিন্তু ভাবে না। ভাব্‌বার অবসরও তার নেই।

চন্‌মনে টেরা ছেলেটা আসে যায় দম্‌কা বাতাসের মত—

যমুনা বলে, অত তাড়া কিসের তোর বল্‌ত' নানু? এক মুহূর্ত্তও তোকে থির হ'য়ে দাঁড়াতে দেখি না। এত খাটুলে—মানুষের শরীরত'—

বাকী কথাটা বলার ইচ্ছা যমুনার থাকে না, আর নানুও সে সুযোগ তাকে দেয় না। যমুনার সাম্‌নে-ছড়ানো বেতের ডালা, বাঁশের কুলো-ডুলো, চিরুনি-কুন্‌কে—হাতের সাম্‌নে যা পায় তা তুলে নিতে নিতে বলে, আর কিছু নেই ঘরে?

যমুনা শিল্পী;—নানু জিনিষপত্র সংগ্রহ ক'রে আনে মাত্র, বিক্রী করার ভারও তার পরেই। যমুনার এ সব জিনিষ তৈরী করায় যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য, নানুর বিক্রয়ে আবার তেমনি দক্ষতা। যমুনাকে হার মানতে হয় মাঝে মাঝে।

যমুনা বলে, দু'দণ্ড গল্প করব' না, একটু জিরোব' না,—সে আমি পারি না। তোর কি—না আছে হাঁটায় আলিস্যি, না হাঁকায়; ধাঁ ধাঁ ক'রে দেখতে দেখতে সব বিকিয়ে আসিস্।

নানু মৃদু হাসে, বলে, তবে এবার হার মানলে ত'?

—নিশ্চয়, একশোবার।

নান্নু সবগুলো ভাল ক'রে গুছিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ন'টায় একটা গাড়ী আসে প'চ্ছিম থেকে, না যমুনাদি ?

কথা শেষ ক'রেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে সুরু করে।

যমুনা তার দ্রুত পাদবিক্ষেপ লক্ষ্য ক'রে মনে মনে বলে, ওত' হাঁটে না, দৌড়ায়।

নান্নুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আবার মন করে।

ধর্ম্মশালার দরোয়ান ফইজুলাল খইনি আর ভাঙের রাজা। দিনভ'র খইনি টেপে আর ঝিমোয় এই তার পেশা। দেহে বেশ ভাঁজ প'ড়ে গেছে কিন্তু মনের কোথাও এতটুকু খাঁজ আজও পড়তে পায়নি। ফাগুনের মাতাল হাওয়ার বেয়াড়া ঝাপ্টা এসে লাগে চোখে, মুখে, কানে, মগজে কট্ ক'রে নেশা জমে, অম্‌নি সহজ অবস্থার 'যমুনা দিদি' ব'নে যায় 'যমুনাবাঈ' গোছ একটা কিছু—আর ফইজুলাল আশ্‌মানে বুন্‌তে থাকে স্বপন-জাল।…নেশা কাটে। বয়স তার কম ক'রেও পঞ্চান্ন। বলে, আরে ছিঃ!

দেহের সমদৈর্ঘ্যের বাঁশের লাঠিটি রাস্তার বুকে তালে তালে ঠুকে যমুনার ঘরের কাছে এসে নিজেই একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে ব'সে পড়ে। যমুনা মুখ না তুলেই বলে, কি খবর জমাদার সা'ব ?

শুধু জমাদারে ফইজুলালের মন পাওয়া যায় না।—

ফইজুলাল সহসা ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে ওঠে। প্রথমটা রাগের তীব্রতার ফলে তার ভাষা ফোটে না; যখন ফোটে—তা এমনি কদর্য্য ও শ্লীলতা-বর্জ্জিত যে যমুনা তাকে বর্ব্বর পশু ভিন্ন ক্ষণিকের জন্য আর কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু ফইজুলালের এই অসংযত স্বভাবের মধ্যে তেমন মারাত্মক কিছু দোষ নেই ব'লেই তার ওপর যমুনার অগাধ বিশ্বাস।

ফইজুলাল মুহূর্ত্তেই আবার সংযত সলজ্জ হ'য়ে ওঠে।

এ্যাঁ…এ্যাঁ…এ্যাঁ…লজ্জা কি সহজে কাটে, লাঠিটা বারকয়েক মাটিতে ঠুকে নিয়ে বলে, মাইরি যমুনা দিদি, তোকে মিথ্যা বলি—এমন সাহস আমার নেই। সেবার ইংরাজ আর জার্ম্মানে খুব লড়াই বেঁধে গেল। রুকমা সাত দিনের বোখার হ'য়ে গেল ম'রে—

দু' চোখের ওপর বাঁ হাতটা একবার বুলিয়ে নিয়ে বলে, মনটা ভারী দমে গেল। আর, কোন্ আশায় বা থাক্‌ব, শুনি ?…মরতে ত' এক দিন হবেই—একটু গা ঘামিয়েই তবে মরা যাক্ না - ভেবে, গাঁয়ের আরও অনেকের সঙ্গে পল্টনে নাম লিখিয়ে এলাম। একদিন ডাক এলো, 'সাজ' 'সাজ',—তার পরে, বসরায় পড়ল আমাদের তাঁবু। জানি—যুদ্ধে মরতে এসেছি, তবু সে কি স্ফূর্ত্তি। কাপ্তান মারিসের হুকুমে কেউ আমরা তাঁবুর একশো হাতের বাইরে যেতে পারতেম না, কিন্তু ফইজুলাল কি কারও হুকুমের তাঁবেদার, না সে মরতে ভয় পায় ?

ফইজুলাল গর্ব্বভরে হাসে।—

—রোশেনা থাকত' এক পল্লীর ভিতরে। দু'মাইল হেঁটে রোজ তাকে একবার আমার দেখতে যাওয়া চাই-ই। জানিই ত' যে কাপ্তান মারিস যদি একদিন টের পায় ত' গুলি ক'রে মারবে,—কে বা সে কথা তখন ভাবে,—রোজ যেতেম তাকে দেখতে। রোশেনা যেন লাল টুকটুকে গোলাব…দূর' থেকে আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রে বলত, কি খবর জমাদার সা'ব? তাকে আশ্বস্ত ক'রে বলতেম, কোন ভয় নেই তোর রোশেনা। এখানে যুদ্ধ যদি কোনদিন বাধে ত' আমি একাই জার্ম্মাণদের হটিয়ে দিতে পারব। বাধল'ও হটিয়েও ত' দিলেম;—কিন্তু যমুনাদিদি, সেই যে রোশেনা কোথায় একদিন চ'লে গেল, আর তাকে খুঁজে পাইনি। এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, রোশেনা যেন আমাকে জড়িয়ে ধ'রে তেমনি জিজ্ঞেস করছে, কি খবর জমাদার সা'ব ?…

এবার বৃদ্ধ ফইজুলালের দু'চোখ ব'য়ে ধারা নামে।

নান্নু এমন সময় এসে পড়ে। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে কারণটা সে তখনই বুঝে নিয়ে মনে মনে হেসে বলে, জমাদার সা'ব, টিশানে আজ খুব জোর খবর আছে… রোশেনা মারা গেছে।

বলিয়াই খুব জোরে হাসে।

ফইজুলাল চোখমুখ লাল ক'রে মাটি থেকে লাঠিটা হাতে তুলে নিতেই নান্নু সোজা ষ্টেশনের দিকে দৌড় মারে।

ফইজুল্লাল আবার নিজেকে সামলে নিয়ে ব'সে বলে, আমার কথা বিশ্বাস হয় না যমুনাদিদি? মেডেল আছে এখনও দেখাতে পারি।

যমুনা সে মেডেল বহুবার দেখেছে কিন্তু ফইজুল্লাল যা বলে তার একবর্ণও সে বিশ্বাস করে না। যমুনার আগ্রহ-হীনতায় ফইজুল্লাল ধীরে ধীরে কেমন নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে। নান্নু আবার ফইজুল্লালের হাতের কাছে এসে দাঁড়ায়। যমুনার নিষ্ঠুরতার কাছে নান্নুর নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করা চলে। নান্নুকে তাই হাতের কাছে পেয়েও ফইজুল্লাল আর বিচলিত হয় না।

অদূরে একখানা মালগাড়ী অলস স্তিমিত গতিতে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়;—অত্যন্ত ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ, আর্ত্ত তার নিশ্বাস।

বাজারের পূব দিকের জমীদারবাড়ীতে ভোরের কিছু আগে থেকেই নহবৎ বাজতে সুরু করেছিল। লোকজনের চঞ্চল চলাফেরা, বহু লোকের মিলিত কণ্ঠের দুর্ব্বোধ্য কাকলি, নানা জিনিষের শব্দসংঘর্ষ, গাড়ী ঘোড়ার দাপাদাপি ও শানাইয়ের মিষ্ট মধুর আলাপ একত্রিত হ'য়ে ভোরের আকাশকে ভ'রে তুলেছিল।

সেই মধুর মিশ্র কলতান কাণে লাগতেই নান্নু চোখ রগড়ে উঠে বসলো। চোখের ঘুম আর নেই, কিন্তু কেমন এক প্রকার নূতন আবেশে তার সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছিল।

বাজারের দোকানগুলো একটার পর একটা খুলছে। দেখতে দেখতে ভোরের সেই আবেশটুকু দোকানদারের বিশ্রী কলকণ্ঠের ঘায়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে নান্নুর মনে শেষে সে-আবেশ উশৃঙ্খল আর্ত্তনাদে পরিণতি লাভ করলো।

মুর্ণা সেদিন তাদের ফলের দোকানের ঝাঁপ খুলে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই তরুণ সূর্য্যের কিরণকর সহসা আড়াল থেকে লুব্ধের মত ছুটে এসে তার কচি মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুর্ণার চোখে মুখে তখনও স্বপ্ন-জড়িমা··আপেলসদৃশ গণ্ডে চূর্ণকুন্তলরাশি তখনও নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে রয়েছে···দেহময় অপরিতৃপ্ত নিদ্রার তন্দ্রা-চ্ছন্নতা। পরণে ঢিলে পায়জামা, অঙ্গে অন্তর্ব্বাস কাঁচলি-সদৃশ ফিন্‌ফিনে সবুজ একটা পিরাণ, আর তারই ওপরে একখানা গোলাপী ওড়নাই।

নান্নু কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে রইলো। তারপরে চমক ভাঙতে বললো, কিরে মুর্ণা, আজ যে বড় বেলা হ'য়ে গেল তোর উঠতে?

মুর্ণার দেশ পেশোয়ারে কিন্তু মুর্ণা যখন তিন বছরের তখন মুর্ণার বাপ পেশোয়ার পরিত্যাগ ক'রে এই সহরে এসে ফলের দোকান খুলে বসেছে আর কখনও দেশে ফিরে যায় নি। দেশে ফিরে যাওয়ার কথাও কোন দিন সে বলে না। লোকে তার কথা শুনে সহজেই বোঝে যে, দেশের সঙ্গে তার চিরতরে বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে।

মুর্ণা বেশ ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলতে পারে কিন্তু সহসা তার সে ভাষা শুনলে মনে হয়, সে তার দেশের ভাষাতেই কথা বলচে। জড়িত ও অস্পষ্ট উচ্চারণে মিষ্টতা বেড়েছে বই কমেনি।

মুর্ণা সলাজ হাসি হেসে বললো, ভোর বেলা শানাইয়ের প্রথম আওয়াজ শুনেই ঘুম ভেঙেছিল কিন্তু আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। শানাইয়ের ভারী মিঠে আওয়াজ কিন্তু।

নান্নু মুর্ণাকে বিদ্রূপ করবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ-লোলুপ হ'য়ে থাকে, আর মুর্ণাও স্বেচ্ছায় সারাদিন তাকে হাজারো রকমে সুযোগ সুবিধা দেয়,—অনিচ্ছায়ও বহুসময়।

নান্নুর টেরা চোখটা উল্লাসে দপ দপ ক'রে নেচে উঠলো, বললো, কিন্তু তোর গলার আওয়াজ যে আরও মিঠে মুর্ণা।

মুর্ণা কৃত্রিম রোষদীপ্ত মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, আচ্ছা, খুব হয়েছে।...কিন্তু রাত্তির থাকতে আজ হঠাৎ জমীদারবাড়ীতে শানাই বাজছে কেন রে?

নান্নু বললো, জমীদারের মেয়ের যে আজ বিয়ে।

তারপরে ঠোঁট চেপে একটু হাসলো।

এবার মুর্ণা সত্যই রাগ ক'রে নান্নুর ঘর ও নিজেদের ফলের দোকানের মাঝে যে সঙ্কীর্ণতম একটু পথরেখা, তার ভেতর দিয়ে দোকান-সংলগ্ন যে দ্বিতীয় ঘরটি তাদের, তার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো।

নান্নু একটা নিশ্বাস ফেলে মাথা দুলিয়ে অতিবিজ্ঞের মত মনে মনে মত প্রকাশ করলো, মুর্ণা সুন্দর কিন্তু ভারী বোকা...

সমস্ত দিন মাথার মধ্যে সেই কথারই প্রতিধ্বনি ওঠে —

ধোঁয়া আর ধূলোয় বিক্ষুব্ধ সহরের পথে পথে যমুনার হাতে-গড়া জিনিষ ফেরি করে' সারাদিন ধ'রে এমনি বে-ওজর যে মনে হয়, দম-দেওয়া ছোট একটা ইঞ্জিন। সন্ধ্যাতারা অলক্ষ্যে কখন আকাশ-সভায় এসে পৌঁছয়— তারও দম ফুরোও।...

ক্লান্ত-কাতর পা দু'টোকে মুর্ণার কথা স্মরণ ক'রেই নান্নু গৃহের দিকে টেনে নিয়ে চলে।

জমীদারের ছোট ছেলে কনক কল্‌কাতার কোন্ এক কলেজে পড়ে। বোনের বিয়ে উপলক্ষ ক'রে বাড়ী এসেছে। এমন সে মাসের মাধ্য প্রায়ই নানা অজুহাতে বাড়ী চ'লে আসে। গত বছর এমনি ক'রেই বি, এ পরীক্ষা তার দেওয়া হলো না—পার্সেন্টেজ কম পড়েছিল। এবার তাই বাপের খুব কড়া শাসন চলেছে তার ওপর, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুইত' তাঁর বলার থাকতে পারে না।

রোগা একহারা চেহারা...তার ওপরে আবার নানা অত্যাচার অসংযমে কাঁচা বয়সটাকে পর্য্যন্ত পাকিয়ে তুলেছে। চাঁপা ফুলের মত তাজা রঙটা গায়ের গরদের পাঞ্জাবীটার মতই তারুণ্য হারিয়ে ফেলেছে...কেমন ফ্যাকাশে জৌলুষহারা রৌদ্রদগ্ধ তৃণের মত। ঠোঁট দু'টো সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কেমন তামাটে হ'য়ে গেছে। চোখ দু'টো দীপ্তিহারা...আর চোখের কোলে উচ্ছৃঙ্খলতার দাগ।

—অমন সৌম্যশান্ত ধার্ম্মিক জমীদারের কিনা ছেলে!

বাজারের সবাইত বলেই, সহরের অনেকেও ব'লে থাকে। বাজারের বহুলোককেই তার অত্যাচার কোন না কোন রকমে স্পর্শ করেছে।

পথে বেরুতে হ'লেই সঙ্গে একটা কুকুর ও হাণ্টার হাতে থাকা চাই। সন্ধ্যার পরে বেরুতে হ'লে উপরন্তু টর্চ্চ-লাইটটাও সঙ্গে রাখে। এগুলোর যে কোন প্রয়োজন নেই তা সে যেন আর ভাবতেই পারে না। একটা অজানা শঙ্কার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার আয়োজন... সে-আয়োজনের ত্রুটীও বিধাতা রাখেনি,—জমীদার বংশেই তার জন্ম। বাইরে থেকে কোন অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা বড় একটা নেই। অবশ্য যদি হয়ই তবে এসব আয়োজন আর কোন কাজেই আসবে না—যদি না বিধাতার ত্রুটিহীন আয়োজন শুদ্ধ হ'য়ে থাকে। শুদ্ধ হ'য়ে আছেও।...

কনক ফল কেনার ছুতো ক'রে মুর্ণার দোকানে আসে। সব জিনিষের দরকষাকষি ক'রে তাকে একপ্রকার হায়রাণ ক'রে তোলে। এর মধ্যে যে কি আনন্দ মানুষের থাকতে পারে তা মুর্ণা বোঝে না। মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু কনক একটা কিছু না কিনে ফেরেনা, কাজেই খ'দ্দের হিসেবে কনককে মুর্ণা যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকে। বিরক্ত হ'লেও তার কথার জবাব তাকে দিতেই হয়, দোকানের বিক্রয়ের দিকে চেয়ে। ওদিকে আবার কনকের লোলুপ দৃষ্টির সামনে নিজেকে ভারী তার অনাবৃত বোধ হয়। বেশীক্ষণ তাই কনকের সঙ্গে সে কথা কাটাকাটি করতে পারে না। এক সময় নিজের অজ্ঞাতে এম্‌নি মৌন হ'য়ে যায় যে কনককে শেষে একাই অনেক কথা ব'লে যেতে হয়। অল্প পরেই সমস্ত ব্যাপারটার বিসদৃশতা কনকের চোখেও ধরা পড়ে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আচ্ছা, অনেক বকিয়েছি তোকে, না? বেশ, একপো আঙ্গুরই ওজন ক'রে দে।

মুর্ণা সলাজকম্পিত হস্তে আঙ্গুর ওজন করে।

কনক পকেট থেকে সিল্কের রক্তকরবী রঙের রুমালটা বের ক'রে মুর্ণার গায়ের ওপরেই একরকম ছুঁড়ে দিয়ে বলে, ওতেই বেঁধে দে।

মুর্ণা রুমালে আঙ্গুরগুলো যেমন বাঁধতে যাবে অম্‌নি তাড়াতাড়ি কনক তার একটা হাত এক হাত দিয়ে ধ'রে ফেলে বাধা দিয়ে বলে, আচ্ছা...থাক্,...ঐ ক'টিত আঙ্গুর —হাতে নিলেই চলবে, কেমন?

মুর্ণার কোমল হাতে একটু সামান্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে ফিকে হাসি একটু হাসে...গভীর জলে একখণ্ড খড় পড়লে যতটুকু আলোড়ন—তাও থেমে যায়।

আলোড়ন সুরু হয় মুর্ণার ভেতরে,—লাল ঠোঁট দু'টো শির্ শির্ ক'রে কাঁপে—রঙ পাল্টে কনকের রক্ত-করবী রঙের রুমালটার সঙ্গে মিশ খেতে চায়। কানে-মুখে রক্ত যেন চলকে চলকে ওঠে।

হাত কাঁপে, তবু কোন রকমে কনকের হাতে আঙুর-গুলো তুলে মুর্ণা দেয়। কয়েকটা তার হাতের বাইরে প'ড়ে যায়—হয়ত' কতকটা মুর্ণার উত্তেজনায়, আর কতকটা কেন—অনেকটাই কনকের অসাবধানতায়।

তার দৃষ্টি মুর্ণার মুখের ওপর থেকে সহজে সে তোলে না।

বাঁ হাতে আঙুরের দামটা ধ'রে দিয়ে পতিত আঙুর-গুলোর জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না ক'রেই সে চ'লে যায়। মুর্ণা ডেকে বলে, ছোটবাবু, আপনার রুমাল প'ড়ে রইলো যে।

কনক তার ডাক শুনে ফিরে তাকায়, আবার একটু হেসে চ'লে যায়। মুর্ণা নিবিড় লজ্জায় মূক হ'য়ে থাকে।

কনক শুধু রুমালটাই রেখে যায় না,—আরও একটা কিছু রেখে যায়—যা মুর্ণার হাতে রীতিমত জ্বালা ধরিয়ে দেয়—রূপোর কাঁচা টাকা একটা।

ইদানীং নান্নু ধর্ম্মশালার বারান্দায় দিনের শেষে একবার ক্ষণিকের জন্য হ'লেও আসে, ব'সে বিশ্রাম করে।

ফইজুলাল ভাঙের নেশায় বেশ মশগুল হ'য়ে থাকে। ধীরে ধীরে মহাযুদ্ধের কথা উঠে পড়ে···রোশেনার কথা ওঠে...বৃদ্ধ ফইজুলালের দু'চোখ জলে ভ'রে আসে। নান্নুও নিজেকে আর সংবরণ করতে পারে না। একদিন যা সে হেসে উড়িয়ে দিত, একদিন যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত—আজ তা করতে তার আর সাহস হয় না। অকপটে ফইজুলালের সকল কথাই বিশ্বাস করে, আবার ফইজুলালের অলক্ষ্যে তারই ব্যথায় অশ্রু ঢালে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন ক'রে নান্নু বলে, রোশেনা ভারী নিষ্ঠুর তো।

যাই হোক্, বৃদ্ধ আর নান্নুর শত চেষ্টায়ও কথা বলে না।

যমুনা ক'দিন ধ'রে নান্নুর কাজ কর্ম্মে অনাগ্রহ অমনো-যোগ লক্ষ্য ক'রে আসছিল। কিন্তু কারণটা কিছুই সে ভেবে ঠিক করতে পারেনি। কিম্বা সে সম্বন্ধে নান্নুকে সজাগ ক'রে দিতেও তার ইচ্ছা হয় নি।

নান্নুই শেষে একদিন বল্লে, যমুনাদি', তোমার ঘরে অনেক জিনিষ জ'মে গেছে, না? এক'দিন তেমন খাটতে পারি নি। আচ্ছা ওগুলো দেখতে দেখতে বেচে দিচ্ছি, ...কিন্তু আজকাল আর তেমন খাটতে ইচ্ছে করে না কেন যেন।

যমুনা বলে, আমারই কি ছাই ইচ্ছে করে? উঃ, যে গরম প'ড়ে গেছে এরই মধ্যে এবার—

হুঁ, এবার যেন বড় আগে থাকতেই গরম প'ড়ে গেল, না?—ব'লে নান্নু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভাববিপর্য্যয় যমুনার চোখের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

যমুনা আবার যেমন মৌন আগ্রহে কাজে মন দিতে যায় অমনি নান্নু তার দিকে ফিরে বলে, আচ্ছা যমনাদি' ফইজুলাল যা বলে সে সব তোমার বিশ্বাস হয়?...এই ধর' যেমন—যুদ্ধের কথা···রোশেনার কথা···

যমুনা মুখ না তুলেই বলে, আগে হ'তো না, এখন হয়।

—মুর্ণা ভারী নিষ্ঠুর কিন্তু যমনাদি'।

যমুনা হেসে মুখ তুলে বলে, কে মুর্ণা? মুর্ণা আবার কে নান্নু?

—না, না··রোশেনা। নামটা আমার মনে থাকে না কিছুতেই!

নান্নু আর শত চেষ্টায়ও সহজ অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।

ঘূর্ণী হাওয়ার চপল নৃত্য সুরু হয় প্রাচীন পথের বুকে। নান্নু সেদিকে চোখ দু'টো তুলে ব'সে থাকে। তার বুকের মাঝে সে নৃত্যের প্রতিধ্বনি গুমরে মরে।

বিকৃত চাপা কণ্ঠের মৃদু আর্ত্তনাদ শুনে নান্নু তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বাইরে জমজমে বিরাট অন্ধকারের স্তূপ। দু'একটা দোকান তখনও খোলা, আর-সবগুলোই প্রায় বন্ধ। নান্নুর ঘর আর মুর্ণাদের ফলের দোকান বাজারের এক কোনে,—সেদিকটা যেমন অন্ধকার—তেমন নিঃঝুম।

নান্নু আলো হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার হাতের আলোর ঝাপসা রশ্মি সর্ব্বাগ্রে যেখানে প্রতিফলিত হয় সেখানে দৃষ্টি ফেলেই নান্নু শিউরে ওঠে।···মুর্ণা তাদের

ফলের দোকানের ঝাঁপ ধ'রে অনড় পাষাণের মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মুখে উত্তেজনার বিপুল সংঘাত ···চোখ দু'টো হিংস্র মার্জ্জারীর মত আক্রোশ-প্রোজ্জ্বল···কপালের শিরগুলো থেকে থেকে দপ দপ ক'রে আঁৎকে আঁৎকে উঠছে···সব চেয়ে যা বিস্ময় জাগায় তা তার ওষ্ঠ-প্রান্তের তক্‌তকে তাজা রক্তের দাগ।

নান্নুর দেহেও মুহূর্ত্তে রক্তের বিপুল দাপাদাপি সুরু হয়।

মুর্ণার ওড়নার একপ্রান্ত তখনও তার কাঁধের ওপর, অপর প্রান্ত পশ্চাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সবুজ পিরাণটার বুকের কাছে অনেকখানি ফেঁসে গেছে—বাঁ দিক্‌কার বুকের কাপড় নেমে গেছে—মুর্ণার সেদিকে খেয়াল পর্য্যন্ত নেই।

এই বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত রূপ নান্নুকে মুগ্ধ করে, উন্মাদ করে।

অদূরে একটা কুকুর অশ্রান্ত চীৎকারে কিসের যেন বাধা জানায়।

মুর্ণা সহসা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ওঠে, বলে—

—কনক বাবু···

কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অভিমানে, ক্ষোভে ও লজ্জায় দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সেখানেই ব'সে পড়ে। নান্নু পিছু ফিরে পলকে কনকের কুকুরটাকে চিনতে পারে কিন্তু আবার মুর্ণার দিকে ফেরার আগেই কপালে অতর্কিত বিপুল আঘাত পেয়ে মাথা তার ঘুরে যায়···পৃথিবীর আলোবাতাস এক সঙ্গে যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে' গেছে—এইটুকু হুঁস্ তার থাকে মাত্র।

মুর্ণা তার পতনশব্দে চমকে উঠে মুখ তুলে দেখে, তার বাবার—সে কি নিষ্ঠুর জ্বালাময় প্রতিহিংসার মূর্ত্তি। অন্তরের শেষ শক্তিটুকুও সেই সঙ্গে তার নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

রূঢ় কণ্ঠে মুর্ণার পিতা বলে, তোর মা'র কথা ভুলে গেছিস বুঝি, মুর্ণা?

যমুনার বুকের কাছে নুয়ে পড়ে' ক্লান্ত-করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে মুর্ণা বলে, দিদি, তুমি ওকে এখান থেকে সরিয়ে নে' যাও। বাপজানকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি নে', বাপজান সব করতে পারে,—খুন পর্য্যন্ত···সহসা থেমে আবার ব'লে যেতে থাকে, মা'কে আমার খুন করতে ওর বাধেনি একটুও।

যমুনা মুর্ণাকে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে তার আনতে মস্তকে আশীষ চুম্বন এঁকে দিয়ে বলে, সে জন্য তোর ভাবনা নেই, মুর্ণা।

ঘরের ওদিক পানে গভীর যাতনায় উর্দ্ধে ক্ষীণদৃষ্টি যথা-সাধ্য বিস্তার করে' নান্নু অস্ফুট কণ্ঠে ডাকে, ও মা-গো!···

তার সেই ক্লিষ্ট-করুণ আর্ত্তনাদ যমুনার রক্তে ভীষণ দোলা লাগায়। মুর্ণা ব্যথিত দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে।

সেদিন যমুনা ও নান্নুর বিদায়ের পালা··

বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মুর্ণা দোকানে উঠে বসে। পাছে, সেই চঞ্চল মুহূর্ত্তে সে অসংযত হ'য়ে উঠে একটা বিসদৃশ কিছু কাণ্ড ক'রে বসে।

জমীদারবাড়ীর একটা চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলে, দু'টো বেদানা, আধসের আঙুর, আর চারটে কমলালেবু দেখি, কিন্তু একটু চটপট।

মুর্ণা জিনিষগুলো ঠিকমত ওজন ও হিসাব ক'রে দিতে দিতে বলে,—এত তাড়া কেন'রে, বিশু?

—ছোট বাবুর ভারী জ্বর। পরশু রেতের বেলা একটা পাগলা কুকুর বাবুর হাতটাকে কেম্‌ড়ে দিয়েছে।

জিনিষ পেয়ে বিশু আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়ায় না।

মুর্ণা জমীদারের ছোট ছেলের জ্বরের বিকৃত ইতিহাস শুনে হাসে কিন্তু অন্তরে তার অকারণে কেন যেন তীব্র অনুশোচনা জাগে।

—এতক্ষণে বুঝি বা নান্নু ও যমনাদি' চলে গেল—মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্ণা ওড়নার একপ্রান্ত চোখের ওপর চেপে ধরে।

দীপ-পতঙ্গ

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

অমাবস্যার শ্যাম অম্বরে
রজনী দীপান্বিতা ;
আজ যে দীপালী, ওরে পতঙ্গ !
বিস্মৃত হ'লি কি তা ?
মহারণ্যের পাতায় পাতায়
পাতা-ঘর প'ড়ে থাক্,
শুভ দীপালীর মরণোৎসবে
শোন্ রে, প'ড়েছে ডাক।

তিমির-পুরীর ললাটে ছাখ্ ওই
লক্ষ প্রদীপ আঁকা,
গহন বনের কোণ ছেড়ে' আজ
আকাশে মেল্ রে পাখা।
ক্ষণ-মিলনের অনলে তোদের
পোড়াতে প্রাণের আশ
তারায় তারায় কাঁপে ইসারায়
মরণের ভ্রূ-বিলাস।
জীবন-বৃন্তে মরণই ত' ফুটে,
কেন সন্দেহাকুল ?
দীপালী-রাতের জ্যোতিরুদ্যানে
তোরা মরসুমী ফুল।

আজি নটনাথ নৃত্য ভুলিয়া
মহাকালরূপে শুয়ে ;—
নেচে' চলে শ্যামা তাথিয়া তাথিয়া
চরণে মরণ ছুঁয়ে।
সে শ্যামা পূজায়, তোরা পতঙ্গ
শ্যাম পুষ্পাঞ্জলি ;
দীপে দীপে দীপে শিখার খড়্গে
লক্ষ নীরব বলি।
তোদের ধূপের শ্যাম ধূমে ঢাকে
দীপের রক্তপ্রভা,
তোদের মরণে শ্যাম হ'য়ে উঠে
শ্যামার রক্তজবা !

নহে বিদ্রোহ, নহে সে ত' মোহ,
অভিমানও নহে হায়,
দগ্ধ দীপের দাহনই ত' প্রেম,
গাহন করিস্ তায়।
দীপান্বিতার দীপে দীপ জ্বালা,
সে নহে তোদের কাজ ;
ওরে পতঙ্গ, দীপ্ত শিখায়
ঝাঁপ দিতে চল্ আজ।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ললিত আগন্তুক ভদ্রলোক দুইটির সহিত ভাল করিয়া কথাই কহিল না। তাঁহাদের শিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে যে দুই একটি উত্তর দিল, তাহা সংক্ষিপ্ত, প্রায় রূঢ়। জনান্তিকে পিতাকে জানাইল সে বিবাহ করিবে না।—এরূপ স্পষ্ট-বাদিতার জন্য ব্রজকিশোর প্রস্তুত ছিলেন না, পুত্রের এই অসম্ভব নির্লজ্জতাও জীবনে এই প্রথম। কিন্তু তথাপি তিনি জোর করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ভিতরে ভিতরে এই বিবাহে একটা প্রতি-বন্ধকের উৎপত্তিতে কতকটা তৃপ্তিও পাইলেন। অবশ্য উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার এই বিবাহের দ্বারা অতি সহজে হইত কনিষ্ঠ সহোদরকে টাকা মিটাইয়া দেওয়ার আর অসুবিধা থাকিত না—সুধীর বাবু কন্যা-পক্ষীয়দের যৌতুক সম্বন্ধে একরকম পাকা কথাই আনিয়াছিলেন—এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতে তাঁহার প্রবল দুশ্চিন্তার সূত্রপাত হইল। কিন্তু তিনি ইহাও অনুমান করিয়াছিলেন যে এ বিবাহ হইলেও তাঁহার নিত্য একটা অবিরাম গ্লানির কারণ হইবে—মেলাবাঁধার রাজবাড়ীর নানা খ্যাতির মধ্যে তাঁহাদের বংশানুক্রমিক আশ্চর্য্য কুৎসিত রূপের বর্ণনা লোকমুখে সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং টাকার জন্য পুত্রের উপর এইরূপ একটা অত্যাচার ও মর্ম্মান্তিক লোকনিন্দার ভয়ে ব্রজকিশোর পুত্রকে আর কিছুই বলিলেন না। বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।

সুধীর বাবু স-বন্ধু বিদায় লইলেন। যাইবার সময় ভগ্নী-পতিকে বলিলেন, "এ বিয়েটা হ'লে ভাল হ'ত; টাকাটা আপনার দরকারই ছিল, কাজে লাগত। তা যাই হোক আমি টাকার জন্যে চেষ্টা কর্ব্ব, আপনার যাতে অসুবিধা না হয় সে চেষ্টা আমার কর্ত্তব্য। বাদার কাজকর্ম্ম আরম্ভ আপাততঃ বন্ধ থাক—দত্ত বাবুদের আমি সামলে রাখবই—তবে উপরন্তু আপনার ভাইয়ের জন্য টাকাটা—আপনি একবার কলকাতা আসতে পারলে ভাল হয়—যাই হোক, আমি চিঠি দেব।" রোরুদ্যমানা ভগ্নীকে বলিলেন, "আসি তাহ'লে—কান্নাকাটি ক'র না—যা অদৃষ্ট! যা দরকার যেন জানতে পাই, যতদিন আছি।" সুধীর বাবু পাল্কীতে উঠিলেন।

ব্রজকিশোর আহারে বিশ্রামে গল্পে আমোদে রুচি হারাইলেন, সমস্তক্ষণ চিন্তা, উপস্থিত এই টাকার অভাব কেমন করিয়া মিটিতে পারে। অনুজের দাবীর মধ্যে অন্যায় ও অস্বাভাবিকত্বের সন্ধান কোনও মতে না পাইয়া মনকে সে পথে বুঝাইতে নিরস্ত হইলেন। এখন জপমালা হইয়া উঠিয়াছে কেমন করিয়া মুখ রক্ষা হয়, বাদার এলাকা খরিদ প্রকাশ করিলে একদিকে নিশ্চিন্ত কিন্তু অন্যদিকে পত্নীর এ সম্বন্ধে মনোভাব অতি স্পষ্ট—সেখানেও ঝঞ্ঝাট। অনটনে অনভ্যস্ত, আবাল্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের ক্রোড়ে যে লালিত, অর্থের অভাব তাহাকে যেমন পীড়া দেয় তাহা অন্যের কল্পনারও অগোচর। উপরন্তু আত্ম-সম্মানের দারুণ বিদ্রোহঘোষণায় তিনি অহরহ জর্জ্জরিত। একদিকে সোদরের নিকট অপমান, তাহাও আবার অনিশ্চিতের তীক্ষ্ণতায় মর্ম্মভেদী।—ইন্দ্র সরকার কি খবর লইয়া আসে, কবে আসে, কোন সংবাদই নাই। আবার অন্যদিকে কঠিন শাসন উপেক্ষা করিবার অক্ষমতা, অন্তরের এক নিভৃত কন্দরে মৃদু হইলেও অবিরাম—স্ত্রৈণ বলিয়া নিজের উপর একটা ধিক্কার।

চারুবালা শোকের পসরা খুলিয়া বসিয়াছেন। স্বামীকে দেখিলেই আক্ষেপোক্তি,—পিতার প্রতি যাহার সহানুভূতি নাই, পিতার অবর্ত্তমানে বিমাতার প্রতি সে সহজেই নিষ্ঠুর হইবে। স্বামীর এই কয়দিনের মধ্যে আকৃতির পরিবর্ত্তন ইঙ্গিত করিয়া যখন তখন তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন, পুত্রই পিতার মৃত্যুর কারণ হইবে। চোখের জলে এই সকল উক্তি আরও মর্ম্মস্পর্শী; মৃত্যুর উল্লেখমাত্র ব্রজ-কিশোর চতুর্দ্দিকে করাল ছায়া দেখিয়া শিহরিতে লাগি-

লেন। সজল নয়নের অনুরোধ, "সময় থাকতে এখনও ছেলেকে শাসন কর—আস্কারা দিয়ে মাথাটা খেয়ে ফেলেছো এখন ভোগান্তি, আর বাড় দিও না। তুমি জোর করে বল্লে ওকে শুনতেই হবে, না হ'লে যাবে কোথা!"—তাঁহাকে কেবল একবার এদিক একবার ওদিক মোচড় দিতে লাগল।

অন্নদাতার ভাব লক্ষ্য করিয়া ওস্তাদজী আন্তরিক দুঃখিত। বাবুর তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার একটা চেষ্টা ইদানীং লক্ষ্য করিয়া তিনি কেবল একটু উৎসাহ, একটু সুযোগের জন্য বিমর্ষভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্লানি-ধৌতকারী কল্যাণকামনার পুণ্যস্রোত সহানুভূতির উৎস বহির্গমনের পথ না পাইয়া তাঁহার অন্তরেই কাঁদিতে লাগিল।

ললিত নিতান্ত অপরাধীর মত সদা সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে, এমন কি আশ্রিত পরিবারদের সহিত ব্যবহারেও তাহার একটা সদা কাতর ভাব। বন্য জন্তুরাও পার্শ্বদেশে বিদ্ধ ভগ্ন বল্লমাগ্র বহন করিয়া স্বজাতির নিকট আত্মগোপন করিয়া একাকী মৃত্যুর অপেক্ষায় নিবিড়তর জঙ্গলে কষ্টে কাতর দেহ টানিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যেই বেদনা রাখিবার স্পৃহা পুরুষ মাত্রেরই একটা লক্ষণ। কারণ অবশ্য বিভিন্ন ও অনেক হইতে পারে। রক্তের স্রোতে এই প্রবৃত্তি বোধ হয় মানবের মধ্যেও ক্ষীণভাবে কতকটা ভাসিয়া আসিয়াছে। অক্ষয়ের সহিত ললিতের আর দেখা হয় নাই। শাণিত অস্ত্র যখন সে বক্ষ পাতিয়া লইয়াছে তখন আর তাহার ক্ষতের জন্য তেমন দুশ্চিন্তা নাই। অক্ষয় কিছু যখন প্রকাশ করিল না তখন ললিত আশ্চর্য্য হইল, একটু দুঃখিত হইল, আবার কৃতার্থও হইল যেন অজানা কে এক-জন তাহাকে অযাচিত উপকারদানে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছে।

অক্ষয় তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। কাছারী-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ইন্দ্র সরকারের অনুপস্থিতিতে তাহার বেশ সুবিধাই হইল—সমস্ত সেরেস্তা তাহার দাপটে বিধূনিত; নিরীহ মুখুয্যের একত্রিংশবৎসরবয়স্ক অহিফেন-নেশা মুহুর্মুহুঃ বিচলিত। বড় বড় খাতাবহির মলাটে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-প্রাপ্ত ধূলিরাশি শশব্যস্ত, তাহাদের হাহাকার কাছারীবাড়ী পূর্ণ করিয়া ব্যাপ্ত। দিনে দু' একবার রাণীমার নিকট তাহার এত্তেলা হয়, অক্ষয় ডাঙ্গায় পড়িয়াছে।

অক্ষয়-তৃতীয়ার পরের দিন ইন্দ্র সরকার আসিলেন। আগের দিন হইতে ব্রজকিশোর শয্যাশায়ী; পাল্কী বরাবর কাছারিবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বাহক-স্কন্ধের আশ্রয় ত্যাগ করিলে ব্রজকিশোরের নিকট বার্ত্তা প্রেরিত হইল। কর্ত্তা সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু অপ্রিয় সংবাদ যতক্ষণ না শোনা যায় ততক্ষণই আরাম; তিনি যুধিষ্ঠিরকে দিয়া জানাইলেন, "কে কেমন আছে? ইন্দ্র যেন বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া করে' ওবেলা আমার সঙ্গে দেখা করে। যাহা তাঁহার পীড়ার কারণ সেই অনিশ্চিতের আশু অবসান-সম্ভাবনায় তিনি সেই অনিশ্চিতকেই আঁকড়াইতে চাহিতেছেন। সংবাদ কিরূপ আসিয়াছে তাহারই নানা-রূপ কল্পনা-মূর্ত্তি-সৃজন ও নানারূপ অসম্পূর্ণ তর্কে তাহাদের বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-নির্য্যাতনের যাতনা ও আয়েস এই দুই উপভোগে দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইল। ইন্দ্র সরকার যুধিষ্ঠিরের নিকট যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে এই মনোভাবের কোনও ব্যতিক্রম সম্ভব নহে—মাত্র "খবর আর কি, বুঝতেই পারছেন, সাক্ষাতে সব বলব।" ইন্দ্র সরকারের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরদানের কারণ ছিল। কাছারীবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, অক্ষয় তখন অনুপস্থিত সুতরাং বক্তৃতা, বকুনী, কূজন গুঞ্জন, রব নিনাদ তাঁহাকে সেই ঘণ্টাব্যাপী প্রভুর আদেশ-প্রতীক্ষার সময়ের মধ্যে সমস্ত বুঝাইয়া দিল। নিজের আসন যে টলমল তাহা প্রতিপন্ন হইতে বাকী রহিল না। পথশ্রমে কাতর মনে সহজে রাগ আসিল। কল্পনা চলিতে লাগিল, দুই ভাইয়ের পক্ষে দুইজন কর্ম্মচারী আবশ্যকও হইতে পারে। আর তিনি যে আন্তরিক কাহার পক্ষে সে বিষয়েও একটা দ্রুত মীমাংসা হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া ইন্দ্রসরকার গৃহিণীর নিকট সময়োচিত অভ্যর্থনা পাইলেন। "কেমন, কেবল তাস পাশা আর আড্ডা এখন বুড়ো বয়সে মুখের মত হয়েছে। আমার অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা করে। সেদিনকার ছোঁড়া শেষে হ'ল ম্যানেজার, এখন কাশী-বাসের উদ্বেগ কর।" প্রকৃতপক্ষে অবশ্য অক্ষয় ম্যানেজার হয় নাই। পত্নীর জিদ্ বজায়

রাখিতে ব্রজকিশোর তাহাকে কেবল কাছারীবাড়ীতে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ও মাসান্তে কিছু লইতে অভিমত দিয়াছেন। মুখুয্যে তাঁহাকে একবার সভয় প্রশ্ন করিয়া এই মন্তব্য শুনিয়াছিল—"এখন ও কাজ শিখবে, যা শিখতে চায় দেখতে চায় কোন বাধা কেউ দিওনা।" অক্ষয়ের কার্য্যের স্থায়িত্ব ও নির্দ্দেশ কিছুই স্থির নহে কিন্তু গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, সে ম্যানেজার হইয়াছে—ইন্দ্র সরকার চিরকালই নিজেকে দেওয়ান বলিয়া আসিয়াছেন—ম্যানেজার ইংরাজী কথা সুতরাং সে নিশ্চয় দেওয়ানের উপর, গ্রামবাসী ইহাই বুঝিয়াছিল। অনেকে আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল—"ছোট ম্যানেজার।" ম্যানেজার শব্দটা অবশ্য এক্ষেত্রে অক্ষয়েরই নিজস্ব আমদানী।

নিদাঘ দিবসের প্রখর প্রতাপ ম্লান হইয়া আসিলে ইন্দ্র সরকার ব্রজকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্য সময় হইলে মনিবের শারীরিক পরিবর্ত্তনদৃষ্টে সহানুভূতি স্বতঃ উৎসারিত হইত, কিন্তু এখন নিজের ক্ষত বড় নূতন,—নিরপেক্ষ দৃষ্টি কেবল লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত। নিরুপায়ের অধৈর্য্যসহকারে কক্ষে প্রবেশমাত্র প্রশ্ন হইল, "কি দেখলে?"

ইন্দ্র—ছোটকর্ত্তা এখন যান্ তখন যান্ হ'য়ে আছেন—আমি যাবার পর থেকে খুব বাড়াবাড়ি, মাঝে একটু সামলেছেন মাত্র—যে দেশ পথ্যি পর্য্যন্ত করবার উপায় নেই—এখন হাকিমী চিকিৎসা চলছে।

ব্রজ—"শরীর আমারই বা কি ভাল? তারপর টাকার কথা কি বল্লে?"

ইন্দ্র—"টাকা যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাতে হবে, কাল পরশুর মধ্যে—আমি আসবার সময় কথা দিয়ে এসেছি।"

ব্রজ—"কথা দিতে গেলে কেন? কথা দেবার তুমি কে?"

ইন্দ্র—"তার টাকা তাঁকে পাঠাতে হবে, এতে আর কথা দেওয়া ক্ষতি কি? স্বচক্ষে সেখানকার ব্যাপার দেখলে আপনিও থাকতে পার্ত্তেন না; বড় ছেলে একদিন এসেছিলেন—মার মার কর্ত্তে লাগল, আমায় যাচ্ছে তাই করে বল্লে—আজ পর্য্যন্ত হিসেব করে সব পাওনা চুকিয়ে নেবে—মামলামকদ্দমা কত কি—কথাও সব বোঝা যায় না, অর্দ্ধেক ইংরাজী গান আর অর্দ্ধেক বাংলাহিন্দী মেশান খিস্তী—শ্যাম কিন্তু বেশ ধীর ঠাণ্ডা—বড়টি তার কথায় কেঁচো, এই যা রক্ষে—খরচার টাকা পর্য্যন্ত ধারধোর করে চালাতে হচ্ছে এমনি অবস্থা।"

ব্রজ—বেশ পড়ে এসেছো—আচ্ছা দেখা যাবে, টাকা পাঠাবই, কিন্তু—

ইন্দ্র—বাবু, 'কিন্তু' আর করবেন না। কলকাতায় ব্যাঙ্কে যে টাকা পাঠান হয়েছিল—আপনার নামে হাওলাৎ রাখতে বলেছিলেন—তার ওপর একটা বরাত করে দিন—দরকার হয় আমি নিজে কলকাতা কালই রওনা হব—সেখানকার অবস্থা দেখলে আপনি চোখের জল রাখতে পারতেন না।"

ব্রজ—"তোমার দরদ বেশী হ'য়ে থাকে তুমি পাঠাও যেখান থেকে পার—লাখ টাকা পাঠান মুখের কথা—ব্যাঙ্কে আছে কিন্তু হাঙ্গাম কত। আমার শরীর না সারলে—।" এই বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ইন্দ্র সরকার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "শেষটায় ভাইয়ে ভাইয়ে একটা বিবাদ!" ব্রজকিশোর ভাবিতেছিলেন এবার রাজু আসিলে তিনি শরীর অসুস্থ অছিলায় দেখা করিবেন না; কারণ তাহার বিষয়ে একটা কিনারা ইন্দ্র সরকারের সহায় বিনা সাধ্য নহে—আর সে সহায়তাভিক্ষায় এখন কেমন কুণ্ঠা আসিতেছে। ইন্দ্র সরকারের শেষ কথায় তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, "কি, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ?"

ইন্দ্র—চাকর কি মুনিবকে ভয় দেখায়? আর ভয়ই বা কি? টাকা মজুত আছে—আপনি পাঠাবেনও—তবে শরীর খারাপ—তেমনি আমরা আছি—আপনি হুকুম করলেই আমরা করে' দিই।

ব্রজকিশোর আবার শুইয়া পড়িলেন। কথা চাপা দিবার সুলভ উপায় উগ্র রসের অবতারণা, জমিল না। ইন্দ্র সরকার অবশ্য অনেক ব্যাপার জানেন না, জানিলে হয় ত অন্য মূর্ত্তি প্রকাশ পাইত। দুই একবার কাতরোক্তি করিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন, "আচ্ছা শীঘ্র ব্যবস্থা করা যাচ্ছে।" ইন্দ্র সরকার বুঝিলেন এখন এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তা হইবে না। কিন্তু তাঁহার আরও বক্তব্য ছিল, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রজকিশোরকে বাধ্য হইয়া শেষে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আর ব'সে আছ কেন? কাজকর্ম্ম

এতদিনে একাকার হ'য়ে আছে—একটু দেখাশুনা না করলে কি ছোট কর্ত্তার কোন ক্ষতি হবে ?”

ইন্দ্র—আজ্ঞে সেখানে নূতন (ম্যানেজার বলিতে কথাটা কণ্ঠে আটকাইল, স্বরও ভারি, বলিলেন) লোক এসেছে কাজকর্ম্ম দেখবার।

ব্রজ—সে তার কাজ দেখাবে, তোমার কাজ তোমায় দেখতে হবে—আর চারিদিকের তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়ায় আমি মলাম—এখন একটু রেহাই দাও, না হয় নন্দ এসে বিষয়সম্পত্তি দেখুক আমি কাশী যাই।” ইন্দ্র সরকার ফাঁপড়ে পরিলেন, ইহার উপর আর কথা বলা চলে না, বালকের আর স্ত্রীলোকের রাগ এমন মজারই জিনিষ। অথচ এই কথার মধ্যে তাঁহার মনের অভিমান কোন নূতন অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। একভাবে বুঝিতে গেলে অভিমানের কারণ এখন আদৌ নাই, কারণ তাঁহার কাজ দেখিবেন অর্থাৎ তাঁহার কোন ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইল না, প্রাধান্য অটুটই আছে—তথাপি অক্ষয়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা শুনিতে পাইলেই তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, মেঘ কাটিয়া যাইত। অক্ষয়ের কাজ অনিশ্চিত, অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া তাঁহার তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিতেছে।—এইখানেই তাঁহাকে আপাততঃ উঠিতে হইতেছে।

চারুবালার সহিত যুক্তি করিয়া অক্ষয় কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের ভার লইয়া নিজেকে ধরা দিল না। ইন্দ্র সরকারের সঙ্গে একটা দূরত্ব সদা সযত্নে বজায় রাখিয়া সে কাছারী বাড়ীর সকল কাজেই প্রতিদিন একটু একটু পরিদর্শন করিতে লাগিল। সংঘর্ষ এড়াইয়া স্বাধীনতা রক্ষা হইল; নির্লিপ্ত পরিদর্শকরূপে নিজের মর্য্যাদাও লোকচক্ষে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না।

ব্রজকিশোরের অসুখ সারিয়াছে কিন্তু অব্যাহতি নাই। ললিতের সামনে পড়িলেই তাঁহারও কেমন নিজেকে অপরাধীর মত মনে হয়—বিবাহের প্রস্তাব করাব মধ্যে তাঁহার পুত্রের প্রতি হৃদয়হীনতা যেন ধরা পড়িয়াছে। পরের কথায় ও অভাবের তাড়নায় এই পথে যাইতে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত যে প্রলোভন ও দুর্ব্বলতা স্থায়ী হয় নাই একথা নিজেকে বুঝাইয়াও বুঝাইতে পারিতেছেন না। তাহার প্রতি অতীতের অনেক ছোটখাট অন্যায় অবিচারের স্মৃতি এখনও সময়ে অসময়ে মনে পড়ে। পুত্রেরও সহজলক্ষ্য বিমর্ষভাবে মাতৃহারার তিরস্কার যেন স্থির হইয়া আছে। এদিকে ইন্দ্রসরকারের নানা ইঙ্গিতে প্রসঙ্গে টাকা পাঠাইবার জন্য তাগাদা—পত্নীর দুর্জ্জয় অভিমান, বিবেচনা ও বিবেকবিহীন শোক।—শেষে তিনি কলিকাতা যাওয়াই স্থির করিলেন—সুধীরবাবুই এখন একমাত্র ভরসা সে টাকার যোগাড় করিয়া দিবেই। ললিতকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা যাইতে হইতই—এখন পিতার সঙ্গেই যাইবে স্থির হইল।

ওস্তাদজীর মুখ ছুটিল। আনক যুক্তি তর্কে এই সরল গীত-ব্যবসায়ী অন্নদাতাকে কলিকাতাযাত্রায় নিরস্ত করিতে প্রদর্শন করিলেন, শেষটায় বলিলেন, “বাবুজী আপকা বদন্‌মে কলকত্তাকা পানি নাহি চলেগি; আওর সব হাল, হালৎ মিলকর বেখারী পেদা করণে সে, তব পস্তানা। আপকা পাশ হামারা রোটিপানি, আপ গোস্তাকি মাফ্ কিজিয়ে হামা সব অন্দরকা হাল মালুম কর লিয়া কোইসে শুনা নাই, লেকিন্ মতলবআন্দাজ সে মিলা ছোট বাবুকা রূপীয়াকা জরুরৎ—ইধর মজুৎ নহি, আপ কুটুম জনানামে ক্ষস কর সরমিন্দাকা লিয়ে ভরতেহে ইস্‌লিয়ে কলকাত্তা যানেসে কোই ফায়দা নহি···ফকৎ জিন্দগি মটিকর শুণা খরিদনা—আপ হুকুম দিজিয়ে হাম সিধা ছোটাবাবুকা পাশ চলা যায়েঙ্গে খোকাবাবুকো সাথ মেলকর সব সব কাম সিধা কর লেঙ্গে কোই ঝগড়া নহি কোই তকলিফ্ নহি—”

ব্রজকিশোর প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ভয়ের ভাব ভাব কতকটা কাটিলে বলিলেন, “আপনি কোনও চিন্তা করবেন না—এত বিপদ কিছু হয় নাই, ভাবনাও এমন কিছু নয় যে সেখানে তাকে সাধাসাধি করে মাথা হেঁট কর্ত্তে হবে। তবে এসব কথা আর কাউকে বলবেন না।”

সাত আট দিন পরে পিতা পুত্রে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে সরল বন্ধুর অন্তের অগোচরে কাতর মিনতি, পাল্কী দোলার তালে সমস্ত পথটা তাঁহার মনে নাচিতে লাগিল, “বাবুজী জলদি ফিরে আসবেন।

(ক্রমশঃ)

আইডিয়াল ডিমোক্রেটিক অ্যাসিওরেন্স এণ্ড মর্টগেজ লোন্‌স্ লিঃ

'আইডিয়াল ডিমোক্রেটিক' ১৯২৬ সালে নাগপুর সহরে স্থাপিত হয়। সচরাচর যেমন 'কানা ছেলের নাম' প্রায়ই 'পদ্মলোচন' হইয়া থাকে,—এই বীমা-প্রতিষ্ঠানের নামটি ঠিক তাহা নহে,—ইহার রীতিনীতিকে 'আইডিয়াল' (আদর্শ) ও আইনকানুনকে 'ডিমোক্রাটিক' (গণমঙ্গলমূলক) বলিলে খুব বেশী বলা হইবে না। যাঁহারা ইঁহাদের প্রস্পেক্টাস পড়িবেন একথা তাঁহারাই বুঝিবেন। ইহাতে একদিকে যেমন বীমাকারীদের প্রতিভূ হিসাবে বোর্ড অব ডিরেক্টরে একজনের স্থান আছে, অন্যদিকে এজেন্টগণেরও প্রতিনিধির কথা ভোলা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এজেন্টদিগের এতখানি সুবিধা ও মর্য্যাদা ভারতবর্ষের আর কোনও কোম্পানী দেয় নাই। বীমা-ক্ষেত্রে এজেন্টগণ অপরিহার্য্য—কিন্তু এই এজেন্টদিগকেই বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট মূল্য ও মর্য্যাদা দেয় নাই বলিয়া আমাদের বীমা এখনও জাতীয় গৌরবের বিষয় হইতে পারে নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি বলিয়াই এই কোম্পানীর পরিচয়-পত্রে আমরা এজেন্টগণের জন্য এই সুব্যবস্থার উল্লেখে খুশী হইয়াছে।

'আইডিয়াল ডিমোক্রেটিক'এর চেয়ারম্যান
অনারেবল্ মিঃ খাপর্দ্দে

'আইডিয়াল ডিমোক্রেটিক'এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার
মিঃ পাণ্ডারিপাণ্ডে

এই কোম্পানীর প্রাপ্ত মূলধন (Paid-up Capital) যথেষ্ট—৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯০ টাকা। এত সুপ্রচুর মূলধন নিয়া আমাদের দেশে বড় বেশী কোম্পানী কাজ আরম্ভ করে নাই। এই টাকা সুনিয়মিত ভাবে ন্যস্ত করিলে ইহা দ্বারা করা যায় না এমন ব্যাপারই নাই। এবং ইঁহাদের বোর্ড অব ডিরেক্টারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, – এ অর্থের অপব্যয় হইবে না। থাপর্দ্দে, দেশমুখ, মুঞ্জে, অ্যানে, দেশপাণ্ডে—এদেশে ইঁহাদের নাম জানেনা কে? এবং সে নামের পিছনে ফাঁকা যশই এক মাত্র অবলম্বন নয় যথেষ্ট ত্যাগও আছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পাণ্ডারিপাণ্ডাকে জানি—তিনি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, ধীর, ও উৎসাহী উদ্যোক্তা। তাঁহার হাতে এ প্রতিষ্ঠানের সম্পদ দিনে দিনে বাড়িবে।

চাঁদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, 'আইডিয়াল ডিমোক্রাটিক' এ দেশের বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যে অন্যতম লঘিষ্ঠ হারের গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহারা নিজেদের দেয় সুযোগ সুবিধাকে সঙ্কুচিত করেন নাই। আধুনিকতম বীমাপ্রতিষ্ঠানগুলির যত প্রকার সুবিধা কল্পনা করা যায় ইঁহারা সবই দিতেছেন, Automatic Nonforfeiture, Special Extension, Disability Benefit, Indisputability Privilege ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত কোম্পানী যে কাজ করিয়াছেন, তাহা কৃতকার্য্যতা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে এ কোম্পানী অতি সত্বর দেশবাসীর প্রিয় হইবে। সম্প্রতি ২, লায়ন্স রেঞ্জে কোম্পানী কলিকাতার শাখা-অফিস খুলিয়া শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীকে সে শাখার ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমরা শৈলেন বাবুকে জানি, তাই বলিতে পারি, যোগ্য হস্তেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী

কলিকাতার ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী "ইণ্ডিয়ান্ লাইফ অফিসেস্ এসোসিয়েশন" বা ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির দ্বারা গঠিত সমিতির সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনটী ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন বা বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধান-ফল বাহির হইয়াছে। কলিকাতার "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান" মছলিপত্তমের "অন্ধ্র" ও সাতারার "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান"। কলিকাতার "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান" এ পর্য্যন্ত কোন বোনাস দেন নাই, সম্প্রতি হাজারকরা জীবন বীমার জন্য বার্ষিক দশ টাকা বোনাস্ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। "অন্ধ্র"র এই প্রথম ভেলুয়েশন, অথচ অন্ধ্র ও ১০৲ দশ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়াছেন। সাতারার "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া" ভারতের একটী অত্যুৎকৃষ্ট জীবনবীমা কোম্পানী। ইঁহারা এ পর্য্যন্ত আজীবন ও এণ্ডাউমেণ্ট বীমার জন্য যথাক্রমে ২২॥০ ও ১৮৲ টাকা বোনাস দিতেছিলেন। নূতন ভ্যালুয়েশনেব ফলে বোনাসের হার বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে এবার হইতে ২৫৲ ও ২০৲ টাকায় দাঁড়াইল।

"লাইট অব্ এসিয়া" ইন্সিওরেন্স কোম্পানী উকীল পাড়া হইতে অফিস তুলিয়া ডালহাউসী স্কোয়ারে আনিয়াছেন। কোম্পানী বিজ্ঞাপনে স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জাহির করিতেছেন। রাজা সুবোধ চন্দ্র বাঙ্গালার কৃতী সন্তান ছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনায় তাঁহার অবদান আদর্শ স্বরূপ। তিনি প্রারম্ভে কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর ছিলেন, ঠিক প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাকে বলা যায় কিনা জানি না। "লাইট অব্ এসিয়া" তাঁহাকে ডাইরেক্টর হিসাবে পাইয়া একদিন ধন্য হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই কোম্পানী যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাকে সাফল্য বলা চলে না, বরং ইহার কার্য্যপ্রণালীর সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে দেখা যায় পরবর্ত্তী পরিচালকগণের হীন স্বার্থপরতার ফলে প্রতিষ্ঠাতাদের সাধু চেষ্টা একান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এ অবস্থায় স্বর্গগত রাজা সুবোধচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির এ অবমাননা কেন?

বাঙ্গালায় সম্প্রতি আবার দুইটী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল—'খুলনা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন' ও 'মহাজন ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোম্পানী'। খুলনা ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ আমরা বরাবরই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু 'মহাজন ব্যাঙ্কে'র যে এই শোচনীয় পরিণাম হইবে তাহা কোনও দিন কল্পনাও করি নাই। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, রাজসাহীর বদান্য দেশনায়ক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি যে ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর—বঙ্গভঙ্গ যুগের মুন্সেফ প্রেট্রিয়ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অগ্নি-অবতার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে যাহার পরিচালক—সে ব্যাঙ্ক রক্ষা করা সম্ভব হইল না কেন? যাঁহারা দেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করার উপায়ান্তর না দেখিয়া দু'একটী অংশ খরিদ করিয়া অথবা কোন অংশই খরিদ না করিয়া নামমাত্র lend করিয়া 'ডাইরেক্টর' সাজিয়া বসেন তাঁহারা দেশের কি ঘোরতর অনিষ্ট করেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। ডাইরেক্টরদের যে কঠোর দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী ডাইরেক্টররা অবহিত হইলে এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার এত অধিক পরিমাণে ঘটিতে পারে না। তবে এই সমস্ত ফেল পড়ার ব্যাপার হইতে একটা জিনিস বেশ বুঝিতে পারা যায় এই যে বাঙ্গালা দেশের স্বয়ংসিদ্ধ নেতাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ থাকিলেও বিশ্বাস আদৌ নাই। তাহা থাকিলে সহানুভূতির অভাবে এই দুইটী অনুষ্ঠান এইভাবে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইত না।

সম্প্রতি খবরের কাগজ খুলিলেই প্রত্যেক দিন এক একটি নূতন ব্যাঙ্ক ও ঋণদানসমিতির উদার ঋণদান-প্রথার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উদ্দেশ্য ইহাদের হয়তো মহৎ, সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু একটি কথা স্বতঃই মনে আসে। ব্যাঙ্ক কিম্বা ঋণদানসমিতির মূল কথা হইতেছে মূলধন। সে মূলধন ইহাদের হয়তো আছেও, কিন্তু অপ্রকাশিত কেন? এত টাকা আমাদের

পুঁজি, এই সুদে আমরা এত টাকা ধার দিতে পারি, ইহা সোজা কথা! কিন্তু অসংখ্য লোককে অগণিত টাকা দিব, তাও আবার নামমাত্র সুদে, কেবল মাত্র—বলিয়াই—লম্বা-চুক্তির ঘোষণাবাণী সন্দেহজনক। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, কর্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে তদন্ত সুরু করিয়াছেন, পুলিশ সাহায্যে শীঘ্রই এই সব ব্যাঙ্ক সম্পর্কে একটি সত্যকার তথ্য পাওয়া যাইবে। তদন্তের পূর্ব্বে পুলিশ দুই একজন ব্যাঙ্ক বিষয়ে অভিজ্ঞ (Bank Expert) ব্যক্তির কাছে গিয়া, সাধারণ ভাবে ব্যাঙ্ক বিষয়ে অনেক কথা জানিয়াছে, এ সংবাদও আমরা পাইয়াছি। সংবাদ সত্য হইলে ভালো। আশা করি শীঘ্রই জনসাধারণ পুলিশ কর্ত্তৃক তদন্তের ফল জানিতে পাইবে। ইতিমধ্যে লিবার্টি পত্রিকায় ৩১শে জানুয়ারীর সংখ্যায় নাগপুরের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

NAGPUR, JAN. 31.

Mr. Armstrong D.I.G. Police, Crimes and Railway C. P., notifies for public information:—

The general public are cautioned against fraudulent or shady banks and loan companies which are at present exploiting the country. Enquiries made by the police into several of these concerns showed that organisers are sometimes men of no substance or experience, whose whole object is to make a dishonest living out of the companies they float. In some instances the organisers are men of distinctly shady antecedents; in one case enquired into by the police two of the organisers of such a company were found to be ex-convicts from the Punjab with previous convictions for cheating. The terms and conditions of these loan companies are substantially the same. They claim to advance loans at a low rate of interest and to keep within the letter of the law, publish their terms and conditions. Since their dupes generally come from the uneducated classes the implication of these conditions are never realised or understood. The catch lies in securing what are known as "Secondaries" before the candidate is eligible for loan. A careful study of the terms will show that the conditions to be fulfilled before the loan is payable are well-nigh impossible.—"Free Press."

মোটামুটি ইহার বাংলা নীচে দেওয়া গেল।—

নাগপুর রেলওয়ে পুলিশের ডি, আই, জি নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি জারী করিয়াছেন।

দেশের নানা স্থানে এখন নানা রকম ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতির অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। ইহাদের সম্পর্কে সাধারণকে সতর্ক করা যায়। পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে ইহাদের উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই বিত্তহীন অনভিজ্ঞ ভবঘুরে সম্প্রদায়ের লোক। এবং ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে কোম্পানীর খরচে দিব্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। কখনও কখনও এই সব উদ্যোক্তাদের অতীত ইতিবৃত্ত রীতিমত সন্দেহজনক। একক্ষেত্রে পুলিশের লোকেরা অনুসন্ধান ফলে জানিয়াছিল যে পাঞ্জাবের দুইটি দাগী আসামী এমন একটি কোম্পানীর অন্যতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুইজন। ইহারা পূর্ব্বে প্রতারণা অভিযোগে জেল খাটিয়া আসিয়াছে। এমন কোম্পানীর সবগুলিরই ঋণদান-প্রথার রীতি-নীতি প্রায় এক। খুব কম সুদে ঋণ দেওয়া হয়, এই বলিয়া ইহারা প্রচার করে। আইন বাঁচাইবার জন্য নিজেদের আইনকানুনও কাগজে কাগজে বাহির করে। ইহাদের কথাতে যারা ভোলে, তাহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, সুতরাং চুক্তিফূরণ হইল কিনা সে বিচার হয় না, বড় কেউ বুঝিবার চেষ্টাও করে না। আবার টোপ গিলাইবার চেষ্টাও বহু রকমে আছে—কেহ ঋণ চাহিলে তাহাকে আবার অপরাপর ঋণপ্রার্থী সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। চুক্তির আইন কানুনগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে যে চুক্তিতে ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া জানানো যাইতেছে, তাহার ফূরণ প্রায় অসম্ভব।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—শ্রীকিরণকুমার রায়

ফাল্গুন, ১৩৩৭

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

জন্ম—৬ই মে, ১৮৬১ | মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

"পিয়া উঁচীরে অটরিয়া তোরী দেখন চলী।
চাঁদ সুরজ কোটি দিয়না বরতু হৈ,
তাবিচ ভূলী ডগরিয়া।"

—হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা, আমি দেখিতে চলিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যের কোটি দীপ কেবলি জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যেও পথ ভুলিয়া ফেলিতেছি! - -

২৩শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৩৭ ১১শ সংখ্যা

রূপজীবিনী

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী]

আলোকলতাটি কুলগাছ হ'তে বাহু মেলে বেলগাছে,—
হিল্লোলে ভরা হেম-বল্লরী তরঙ্গ তুলি' নাচে;
তরল রূপের ভরা লাবণ্য উছলে যা' নিজ দেহে,—
তাই দিয়ে যেন রাখিবে সে ছেয়ে তরুরে উদার স্নেহে!

কোথা মূল তার, কোথায় বা দল, নাহি ফুটে ফুল ফল,
চিরযৌবনা বন্ধ্যা রূপসী জানেনা চোখের জল;
প্রকৃতির মতো শ্মশানে বসায়ে শ্যামল শোভার হাট
নিত্য সাজায় তনু-পসরায় নবযৌবন-নাট!

কিছুতেই প্রাণ তৃপ্তি মানে না, শ্রান্তি নাহিক জানে,
লূতাতন্তুর মতো নিজ রসে জীবনের জের টানে ;
কুলগাছ হ'তে বেলগাছ ফিরে' শ্যাওড়ার পানে চাহে,
লতার আলোক বিলা'য়ে আপনি দহি' দেহ-দাবদাহে !

দুর্য্যোগরাতে যে গূঢ় আঘাতে চমকে তড়িল্লতা,
নিকষের দেহে যে দারুণ স্নেহে সোনা রাখে ক্ষয়-কথা ;
তিলে তিলে দহি' তৈল তাহার জ্বালে যে রূপের শিখা,
কেবা চেয়ে দেখে—কি যে পরিণাম ললাটে তাহার লিখা !

কালের কালোতে মিলায় যেদিন আলোকলতার আলো,
লতার ব্যথার সে করুণ কথা না তোলাই বুঝি ভালো ;
রূপের পীড়নে বাঁচে যদি কুল—বাঁচায় সে নিজ কূল,
আলোকলতার আলোটি হারায়ে সেইদিন ফুটে ভুল !

রূপ ক্ষণিকের, রূপ বণিকের—দুদিনের বেচাকেনা,
কে রাখিবে তারে বারেক চুকিলে চোখের পাওনা দেনা !
পলকে তাহার আলোক মিলায়, যেদিন শুকায় লতা ;
চিরজীবী হয়ে বাঁচে অপমান—স্মৃতিহীন ব্যর্থতা।

"খেয়ানৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার ত' তোমার বাহাদুরী—কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলে-ডিঙি নয়—খেয়ানৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গাল দিলে অবিচার করা হয়।"

উপাসনা
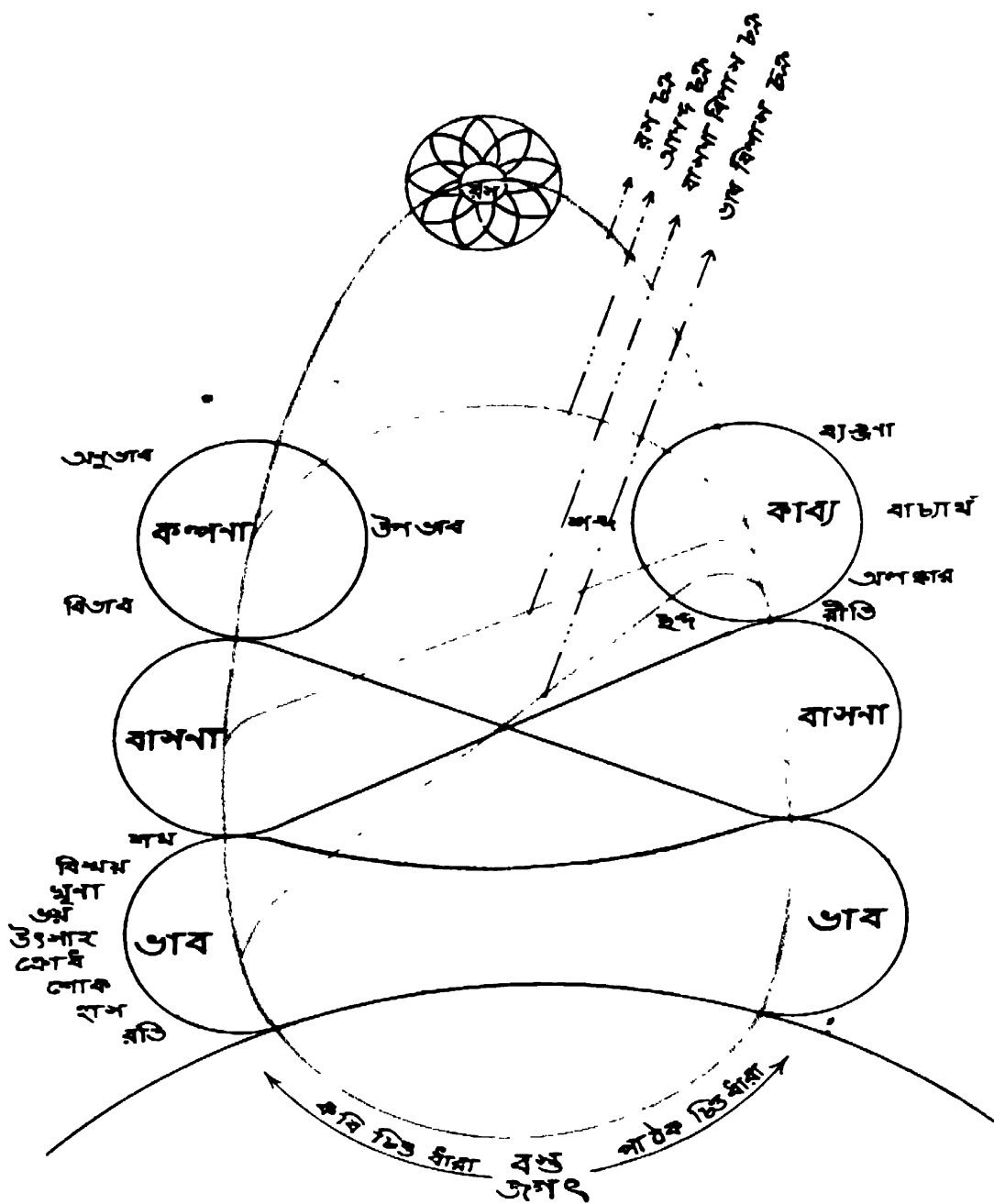
কাব্য-পরিমিতি—অঙ্কণ-অধ্যায়

কাব্য-পরিমিতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

অঙ্কন

প্রথিতযশা নাট্যকার পূজনীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। কলেজে তখন যন্ত্রপাতি বেশী ছিল না, থাকিলেও তাহা ক্লাশে আনিয়া দেখাইবার মত সহকারী ছিল না। অধ্যাপক বাক্যের সাহায্যে রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষাগুলি বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিতেন, ব্যাপার আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তখন তিনি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত সম্মুখে আনিয়া তাহার অঙ্গুষ্ঠটা উচ্ছ্রিত করিয়া ধরিতেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঠেকাইয়া বলিতেন—**Suppose this is a test tube ; I fill one-third of it with Sodium Chloride :**—ধর ইহা একটা টেষ্ট টিউব, আমি ইহার এক তৃতীয়াংশ লবণ দ্বারা পূর্ণ করিলাম। অমনি ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া আসিবার পথে দাঁড়াইত ; মানবমন এমনই প্রতিমা-উপাসক।

আমার প্রথম রসায়ন-শিক্ষা উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, যখন দেখিলাম কাব্যসম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধ হইতেছে না, তখন কাগজ পেন্সিল লইয়া মনকে বলিলাম,—ধর এইটা কবিচিত্তের গতিপথ, আর এইটা পাঠকচিত্তের গতিপথ; ইহা ভাবলোক, ইহা বাসনা-লোক, এইটা কল্পনা-লোক। এইরূপে আমার প্ল্যান-অঙ্কনে অভ্যস্ত চিত্ত লোকের পর লোক আঁকিয়া লোকোত্তর রসের সন্ধানে ব্যাপৃত হইল। নিজেকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অনেক পরিশ্রমে কাব্য-দর্শনের যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হইল তাহার মূর্ত্তি দেখিলাম (চিত্র দেখুন) ডিম্বাকার! প্রথমেই মনে হইল এত চেষ্টার ফলে যাহা বুঝিয়াছি তাহার প্রতীক কি এই অশ্বডিম্ব! পরক্ষণেই মনে হইল ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড মাত্র, সুতরাং আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। বরং দেখিলাম—কবি, কাব্য ও পাঠকের যে ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ আমার মনের কোণে অনেক দিন হইতে অস্পষ্টভাবে সঞ্চিত ছিল, তাহা এই রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝা ও বুঝান সহজ-সাধ্য হইয়াছে।

চিত্রে দেখিতেছি কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারা উভয়েরই উৎপত্তিস্থল বস্তুজগৎ। তাহার পর কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারা ভাবলোকে পৌঁছিয়াছে। এ ভাবলোকও অভিন্ন ; কেবল উভয়চিত্তধারার মধ্যস্থলে ভাবলোক-পরিধির ঈষৎ সঙ্কোচের দ্বারা কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তে ভাবের ঈষৎ বিভিন্ন প্রভাব সূচিত করিতেছে। তাহার পর উভয় ধারার বাসনালোক ভিন্ন হইলেও পরস্পর স্পর্শ করিয়া আছে। কবিচিত্তের ভাবস্মৃতি ও পাঠকচিত্তের ভাবস্মৃতি মূলতঃ একশ্রেণীস্থ হইলেও তাহাদের প্রকৃতির ভেদরেখা সুস্পষ্ট। কবিচিত্ত বাসনা হইতে কল্পনায় ও পাঠকচিত্ত বাসনা হইতে কাব্যে উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি রসলোক।

চিত্রে কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে কাব্যে দক্ষিণাবর্ত্তে (clockwise) দেখান হইয়াছে, এবং পাঠকচিত্ত বামাবর্ত্তে দেখান হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় কাব্য-সৃষ্টি ও তাহার আস্বাদগ্রহণ পরস্পর বিপরীতাভিমুখী। কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে কাব্যে পৌঁছিতে রস অতিক্রম করিয়া যায়, আর পাঠকচিত্তধারা রসে পৌঁছিতে কাব্য অতিক্রম করিয়া যায়। একের যাহা গন্তব্য, অপরের তাহা পথিমধ্যস্থ বিশ্রাম স্থান। কবিচিত্তের উদ্দেশ্য রস নহে, রস আনিয়া কাব্যে সঞ্চয় ; আর পাঠকচিত্তের উদ্দেশ্য কাব্য নহে, কাব্য হইতে রস-সংগ্রহ।

যে কাব্যরসকে ব্রহ্মস্বাদের তুল্য বলা হইয়াছে সেই রসের কথাই কহিয়া আসিতেছি। কিন্তু সাধারণ হিসাবে রসের পর্য্যায় ও স্তরভেদ আছে। অতি সাধারণ কাব্য পাঠে অতি সাধারণ পাঠকও যে আনন্দ পায় ইহা সত্য। ইহাকে রস বলা চলে না। উপস্থিত আনন্দই বলিব, যদিও ইহাতেও আপত্তি উঠিতে পারে। পূর্ব্বে যে কবিচিত্তধারার পরিচয় দিলাম, যাহা বস্তু হইতে উৎসারিত হইয়া ভাব,

বাসনা ও কল্পনার পথে রসে উঠিয়া কাব্যে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা উত্তমপ্রতিভা-প্রেরিত কবিচিত্তের ধারা। পাঠক-চিত্তের ধারাও ভাব ও বাসনার মধ্য দিয়াই কাব্যে পৌঁছে এবং উৎকৃষ্ট পাঠকচিত্তধারা সেখান হইতে রসলোকে উত্তীর্ণ হয়। পাঠকচিত্ত যদি কেবল রসজ্ঞ না হইয়া রসজ্ঞ ও ক্রিটিক্ উভয়ই হয়, তবে সে রসলোকেই থামিয়া যায় না; সেখান হইতে রসসিক্ত অন্তরে কবিচিত্তধারার প্রতিবর্ত্তন করিয়া কবির বিচিত্র কল্পনারাজ্যে নামিয়া আসিবার প্রয়াস পায়।

রস-প্রত্যাবৃত্ত কাব্যই উচ্চ শ্রেণীর কাব্য, আর তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে,—রসের সমুচ্চ লোকে উঠিবার শক্তিবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত। উত্তম শ্রেণীর বিপরীতাভিমুখী এই দুই ধারা রসলোকে পরস্পরের মধ্যে নিলীন হইয়া যে আনন্দ উৎপন্ন করে তাহাই ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্ভিন্ন কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অন্যান্য পথও থাকিতে পারে, এবং তাহাদের মিলনজনিত ভিন্ন বর্গের আনন্দও স্বাভাবিক। এই কথাই চিত্র-সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কাব্য রচনা করিবার জন্য যেমন কবির প্রয়োজন, তেমনি তাহার আস্বাদনজন্য পাঠকের প্রয়োজন। যে কাব্য কল্পিত হইল, কিন্তু লিখিত হইল না, তাহা সুকাব্য কি অকাব্য একথা উঠিতে পারে না। যে কাব্য রচিত হইয়াছে কিন্তু কখনও পঠিত হইল না, তাহার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার মিলনের ফলই কাব্যরস। এই দুই ধারা যে পথেই প্রবাহিত হউক যদি প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর মিলন হয় তবেই আনন্দ জন্মে। যে ক্ষেত্রে মিলন হইল না, সে ক্ষেত্রে কাব্য বিফল। সম ও বিষম (positive & negative) তড়িৎ যদি কোন পরিবাহচক্রে (cycle) অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবেই তাড়িৎ শক্তি প্রকাশ পায়; চক্রের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ (break) থাকিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সেইরূপ কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়ন-চক্র যেখানে অব্যাহত থাকে, সেইখানেই আনন্দ উৎপাদিত হয়। তাড়িৎ প্রবাহের বেগ, প্রকৃতি ও পরিমাণ যেমন তাহাদের উৎপাদক সম ও বিষম শক্তিদ্বয়ের উপর নির্ভর করে, তেমনি কাব্যায়নচক্রে উৎপাদিত আনন্দের প্রকৃতি ও পরিমাণ তাহাদের উৎপাদক কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার উপর নির্ভর করে। কথাটী বিশদ করি।

চিত্রে দেখা যায় কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে উদ্গত হইয়া প্রথমে ভাবলোকে পৌঁছে; সেখান হইতে সরাসরি কাব্য-ক্ষেত্রে যাইবার একটী পথ রহিয়াছে। ভাব হইতে ঋজু রেখায় কাব্যে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে যে উল্লেখ করিয়াছি, কবি বা তর্জ্জাওয়ালাদের রাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রৌদ্ররসের একপ্রকার কাব্য জন্মে, তাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর। ভাব অর্থাৎ emotionএর জন্মমাত্র কাব্যরচনা একান্ত অসম্ভব মনে হয় না। কলি-কাতার রাজপথে যখন হাঁকিয়া যায়,—

বাপ্‌রে বাপ্, বিষম কাণ্ড,
উল্টে বুঝি যায় ব্রহ্মাণ্ড!
পেটের ছেলে আপন হাতে
কাট্‌লে মায়ে নিশুৎ রাতে!
একটী পয়সা খরচ কোরে,
বাবুরা সব দেখুন প'ড়ে!

তখন কবিচিত্ত সে কাব্যে ভাব হইতে বাসনালোকে উঠিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। কোন ব্যাপার ঘটিবামাত্র ভাবটা কবিচিত্তে স্মৃতির জগতে, অর্থাৎ বাস-নায়, রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর কাব্য জন্মলাভ করে। ইহাদিগকে 'ভাবসমুখ-কাব্য' বলা যায়। প্রাণীজগতে মেরুদণ্ডহীন জীব যে শ্রেণীর, কাব্য-জগতে ভাবসমুখ কাব্যও প্রায় সেই শ্রেণীর।

ভাবসমুখ কাব্য

কিন্তু কে অস্বীকার করিতে পারে যে এ শ্রেণীর কাব্যেরও পাঠক আছে এবং তাহারা ইহা হইতেই আনন্দ পায়? আনন্দ যখন পায়, তখন ব্যাপারটীকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আনন্দ পাইবার কারণ এই, যে এক শ্রেণীর পাঠকচিত্ত আছে, যাহারা কাব্য হইতে কেবল emotionএ, ভাবেই, নামিতে চাহে; কল্পনা কি রসলোকের খোঁজ তাহারা রাখে না। বীর-রসের কাব্য পড়িয়া তাহারা সরাসরি 'উৎসাহে' নামিয়া আসে, হয়ত বিপ্লবীর দলে নাম লেখায়; রৌদ্ররসের অভিনয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জুতা

খুলিয়া থাকে ; মধুর-রসের কাব্যে তাহারা কেবলই রতিভাব খোঁজে। এ শ্রেণীর পাঠকচিত্তধারা রস বা কল্পনায় উঠিতে সমর্থ নয় এবং ইহাদের 'ভাবমুখী পাঠকচিত্ত' বলা যায়। ভাবসমুখ কাব্যে কবিচিত্তধারা যেমন ভাব হইতে কাব্যে সিধা উঠিয়া গিয়াছে, ভাবমুখী পাঠকচিত্তের ধারাও সেইরূপ কাব্য হইতে ভাবে সিধা ফিরিতে চায় ; সুতরাং অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ হইয়া এক প্রকারের আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। 'রসোন্মুখী' পাঠকচিত্তধারা কাব্য হইতে রসে উঠিতে চাহে, তাহার পথ ভিন্ন ; ভাবসমুখ কবিচিত্তধারার সহিত চক্র সম্পূর্ণ না হওয়ায় আনন্দ বহে না।

ভাবমুখী চিত্ত

ভাবসমুখ কাব্য যে ছন্দে, অলঙ্কারে, শ্রীহীন হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাচ্যার্থ ছাড়া ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা রসের ব্যঞ্জনা নহে, ভাবের ব্যঞ্জনা। হেমচন্দ্র যখন রেলগাড়ী দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

> এস কে বেড়াতে যাবে, শীঘ্র কর সাজ,
> ধরায় পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
> শীঘ্র উঠ, ত্বরা করি',
> বাক্স ব্যাগ তল্পি ধরি',
> এখনি বাজিবে বাঁশী,
> ঠং ঠং ঠং কাশি।...

কিম্বা,—

> ছেলাম টেম্প্‌ল্ চার্চ, আচ্ছা মজা নিলে,
> ভোজং দিয়ে ভোটাং খুলে মিউনিসিপ্যাল বিলে।

তখন তিনি বাসনা-লোকেও উঠেন নাই।

> মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
> মাথায় তুলে নে-রে ভাই!

এই জাতীয় অধিকাংশ জাতীয় সঙ্গীতের কাব্যাংশ ভাবসমুখ কাব্যের দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

সসঙ্কোচে উল্লেখ করিতে হয়, আদি-কবির প্রথম শ্লোকটী কোন্ শ্রেণীর কাব্য ? কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে ব্যাধ শরবিদ্ধ করায় তাঁহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ যে শ্লোক নির্গত হইল, তাহাতে তিনি ব্যাধকে অভিসম্পাত দিয়াছেন। ইহা তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়ের স্বতঃ ও সদ্যোনিঃসৃত ছন্দোবদ্ধ বাক্য। তাঁহার সেই শোকভাব স্মৃতির স্তর বাহিয়া কল্পনাস্তরে উঠিবার অবসর পায় নাই। ইহাকে ভাবসমুখ কাব্য বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় বলিয়া মনে হয় না। আদি কবির এই প্রথম রচনাকে যদি কাব্য-জগতের জীব-শৈবাল (protoplasm) বলা হয়, তবে তাহাতে আপত্তিরই বা কি কারণ থাকিতে পারে ? জীব-শৈবালে জীব-জগতের অসীম বৈচিত্র্যের কোন চিহ্নই নাই ; তথাপি তাহা জড় হইতে জীবের প্রথম অভিব্যক্তি বলিয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিকের আদরের বস্তু। কবিগুরুর মুখনিঃসৃত এই প্রথম শ্লোকও প্রত্যেক কবি ও রসিকের কাছে সেই হিসাবে আদরের জিনিষ। ইহার বেশী আর কিছুই এ শ্লোকে নাই এবং কবিগুরুর পরজীবনের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

বলা বাহুল্য কবিচিত্তধারার বিশ্লেষণ করিয়া আমি কবিদের জাতি বিভাগ করিবার প্রয়াসী নহি। কাব্যের শ্রেণী-বিভাগ করাই আমার উদ্দেশ্য। কোনও কাব্যে কবিচিত্তের যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সে কাব্যে কবিচিত্তের জাতি ও কাব্যের জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ ভাবসমুখ কাব্যে কবিচিত্তও ভাবসমুখ। কিন্তু কোন বিশেষ কবির চিত্তকে স্থায়ীভাবে ভাবসমুখ চিত্ত বলা অতীব দুঃসাহসের কথা এবং তাহা সত্যও নহে।

ভাবলোকের ঊর্দ্ধে স্মৃতির জগৎ,—বাসনালোক। যে কাব্যে কবিচিত্ত 'বাসনা' হইতে সিধা কাব্যক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে 'বাসনাসমুখ কাব্য' বলা যায়। এ শ্রেণীর কাব্য ভাবসমুখ কাব্য হইতে বিশেষ উন্নত না হইলেও ইহার ধারা বিভিন্ন। কবিচিত্ত ভাব বা emotion হইতে প্রত্যক্ষভাবে মালমশলা সংগ্রহ না করিয়া তাহার স্মৃতি বা বাসনা হইতে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে। এ কাব্যে 'রসোন্মুখী' পাঠকচিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে না। 'বাসনামুখী' পাঠকচিত্ত—যাহা কাব্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে বাসনালোকে নামিবার পক্ষে উপযোগী ও তাহারই জন্য উন্মুখ,—তাহা এইরূপ কবিতা হইতে আনন্দলাভ করে। এখানেও কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়ন-চক্র বাসনার মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এ কাব্যের আনন্দ এই জাতীয় পাঠকের মনে প্রতিভাত হইয়া উঠে। বাসনামুখী পাঠকচিত্ত ভাবমুখী পাঠকচিত্তকে অপেক্ষাকৃত অশ্রদ্ধা করে এবং

বাসনাসমুখ কাব্য ও বাসনামুখী চিত্ত

রসোন্মুখী পাঠকচিত্তকে সম্ভ্রম করে, অথবা অগ্রাহ্য করে। রতিবাসনাজাত কাব্য বাসনামুখী পাঠকচিত্তে রতিবাসনা-জনিত আনন্দ আনে এবং তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। এ কাব্য বা পাঠক মধুর রসের ধার ধরে না। ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার, এমন কি ব্যঞ্জনাও—যাহা বাসনার ব্যঞ্জনা, রসের নহে—থাকিতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক অংশ এই বাসনাসমুখ কাব্যের উজ্জ্বল উদাহরণ-স্থল। শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' নির্বেদ ভাবের (শমভাবের উপভাব) বাসনাসমুখ কাব্যের উদাহরণ। ঈশ্বরগুপ্তের 'পাঁটা' বা 'তপ্‌সে মাছ', হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনেক কবিতা এই বাসনাসমুখ কাব্য-পর্য্যায়ে পড়িতে পারে। অল্পশক্তি বিশিষ্ট কবিদের অনেক কাব্য ছন্দ, অলঙ্কার, এমন কি ব্যঞ্জনা-সংযুক্ত হইয়াও বাসনা-সমুখ পর্য্যায়ের উর্দ্ধে স্থান পাইতে পারে না।

ভাবসমুখ ও বাসনাসমুখ কাব্যকে এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। কারণ অয়নচক্র সম্পূর্ণ করিয়া এই দুই জাতীয় কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে পাঠক-চিত্তকে কাব্যক্ষেত্র হইতে নিম্নাভিমুখে ভাব বা বাসনালোকে নামিতে হয়। রতিভাব বা রতিবাসনা দুইএর কোনটাই উচ্চাঙ্গের বস্তু নয়। আর রসশাস্ত্রের মাপকাটিতে কাম-ভাবের উদ্রেক আর বৈরাগ্যভাবের উদ্রেক এক শ্রেণীতেই পড়ে, কারণ মধুর রস ও শান্ত রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। এ রাজ্যে ভাব ও বাসনার স্থান নিম্নে, কল্পনালোক তাহাদের উর্দ্ধে এবং রসলোক শীর্ষে অবস্থিত। সেই জন্য ভাবসমুখ ও বাসনাসমুখ কাব্য একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত নিম্নজাতীয় কাব্য। ভাবমুখী ও বাসনামুখী পাঠকের অভাব কোন কালেই হয় নাই, সেইজন্য এই জাতীয় কাব্যেরও অসদ্ভাব নাই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা নিম্ন স্তরের জীবদেহের ন্যায় ক্ষণে জন্মে, ক্ষণে মরে; আর কোনও রূপে আপনাদের ধারাটী বজায় রাখিয়া চলে।

লতা স্বভাবতঃ উর্দ্ধদেশে উঠিতে অক্ষম। মাটীর উপর লতাইয়া বেড়ানই তাহার ধর্ম্ম এবং গো-মহিষাদির ভক্ষ্য হওয়াই তাহার ভাগ্য। কিন্তু দণ্ডসাহায্যে সে উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এবং মাচায় উঠাইয়া দিলে গো-মহিষাদির মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ফল ফলাইতেও পারে। শক্তিশালী কবির রচিত অনেক বাসনাসমুখ কাব্যও মধুর ছন্দ, চতুর অলঙ্কার ও সবল রীতির আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া আছে এবং ফলও ফলাইয়াছে; কিন্তু তাহা কোন দিনই অমৃত ফল নহে।

এইবারে যে দেশের কথা কহিব—কল্পনালোক—সেখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষিদ্ধ না হইলেও সে মাঝে মাঝে দিশা হারা-ইয়া ফেলে। কবিচিত্তধারা যখন কল্পনা-লোক হইতে বিভাব, অনুভাব ও উপ-ভাব দ্বারা পুষ্ট হইয়া সমশীর্ষে অবস্থিত কাব্যক্ষেত্রে ছন্দ রীতি অলঙ্কার ও অর্থ-সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়, তখনকার কাব্য ভিন্ন বস্তু। আমরা ইহাকে 'কল্পনা-সমুখ' কাব্য বলিব। কবিচিত্ত কল্পনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, সুতরাং সাধারণ লৌকিক মনের উর্দ্ধে সে উপচার সংগ্রহ করিয়াছে। কল্পনাসমুখ কাব্যের কবিচিত্তধারা অয়নচক্র সম্পূর্ণ করে,—'কল্পনামুখী' পাঠকচিত্তধারার সহিত; সুতরাং এ কাব্যের আনন্দ কল্পনামুখী পাঠকচিত্তেই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়। রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত ইহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করিতে পারে না, আর বাসনামুখী কিম্বা ভাবমুখী পাঠকচিত্ত আভিজাত্যের জন্য ইহাকে সমীহ করিলেও আনন্দ পায় না। অয়নচক্র সম্পূর্ণ হওয়া না হওয়াই এই আনন্দ বা অবজ্ঞার কারণ; যেহেতু কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অবচ্ছেদ-হীন প্রবাহই আনন্দ।

কল্পনাসমুখ কাব্য ও কল্পনামুখী চিত্ত

কল্পনাসমুখ কাব্যে কবিচিত্ত বুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জিত; বিভাব-অনুভাব-উপভাব সম্বন্ধে জাগ্রত; শব্দচয়ন, ছন্দোবন্ধন, অলঙ্কার-নির্ব্বাচন, বাচ্যার্থবোধ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োজন—ইহাদের যথাযথ জ্ঞান তাহার আছে। এক কথায় কবিচিত্ত তাহার আদর্শ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। রসের উদ্বোধ তাহাকে করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রতিভা কাব্যসৃজনকালে রসাকাঙ্ক্ষী হইলেও রসোন্মুখী না হওয়ায় রসের দিকে উঠিবার চেষ্টা মাত্র করিয়াই কাব্যে নামিয়া আসে। কল্পনায় বিভাব এক অংশে সবল হইল, কিন্তু অপর অংশ হয়ত তাহাকে খণ্ডিত করিল; বিভাব উপযোগী হইলেও, অনুভাব-উপভাব বিরুদ্ধ হইয়া বেসুর বাজাইয়া দিল; শব্দ রীতি অলঙ্কার সুন্দর হইয়াও অর্থ ব্যঞ্জনার ধাপে উঠিল না, অথবা ব্যঞ্জনা দুর্ব্বল হইল; ছন্দ ও রীতি অর্থকে চাপা দিল; অলঙ্কার ব্যঞ্জনাকে ভাঙিয়া

দিল ; কিম্বা বিশ্লেষণ বুদ্ধি দ্বারা কোন মহৎ দোষ ধরা না পড়িলেও রস দানা বাঁধিল না। ইহার একমাত্র কারণ—কবিচিত্তধারা সেই কাব্যবিশেষে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রসলোক ঘুরিয়া আসে নাই ; হয় তাহার অভিনয় করিতেছে, নয় রসোদ্বোধ সাধ্যাতীত বুঝিয়া কাব্যের বহিরঙ্গে বিলাস করিতেছে।

কল্পনাসমুখ কাব্যের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে বিভাব, অনুভাব, উপভাব, শব্দ, ছন্দ, রীতি, অলঙ্কার, বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনা সমস্তই ইহাতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের সামঞ্জস্যের অভাব থাকে এবং তাহারা সুসংস্থিত হয় না। মূল ভাবটী রসে পরিবর্ত্তিত হইলে উক্ত কাব্য-কৌশল-পরম্পরা পরিমাণে, মাত্রায় ও বিন্যাসে স্বতঃই যথাযথ হয়, কিন্তু কল্পনাসমুখ কাব্যে এইগুলির অভাব ঘটে। কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত বলিতে সেই চিত্ত বুঝিতে হইবে, যাহা এই সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করে না, বা তাহা দ্বারা পীড়িত না হইয়া অসমঞ্জস কাব্যকৌশল হইতেই আনন্দ লাভ করিতে পারে। বলিষ্ঠ রীতি মাত্র যাহাকে সচকিত করে, সুন্দর ছন্দই যাহাকে মুগ্ধ করে, চতুর অলঙ্কার যাহাকে বিস্মিত করে, সবল বিভাব-অনুভাব-উপভাব মূল ভাবের বিরোধী হইলেও যাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও রসবিমুখীনতা যাহার গোচরীভূত হয় না, অংশের আনন্দই যাহার পূর্ণের তৃষ্ণাকে শমিত করে, তাহাই কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত।

বলা বাহুল্য, কল্পনাসমুখ কাব্যই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আর কল্পনামুখীচিত্তসম্পন্ন পাঠক ততোধিক। সংখ্যায় বহু এবং আভিজাত্যসম্পন্ন বলিয়া এই কাব্যে নানা স্তরবিভাগের চেষ্টা হয় ; কোন্ কবি কাহার অপেক্ষা বড়, কোন্ কাব্যের ওজন কত, তাহার বিচার লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। চিত্রে সমশীর্ষে অবস্থিত কল্পনা-লোক ও কাব্য-ক্ষেত্রের উপর এবং রসলোকের নিম্নে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে,—যাহার মধ্যে সংখ্যাতীত বক্ররেখা কল্পিত হইতে পারে। রসলোক হইতে তাহাদের দূরত্বানুযায়ী কাব্যকে উচ্চ নীচ মর্য্যাদা দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন রেখাটী রসলোক ঘুরিয়া আসে নাই ; সুতরাং রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের সহিত অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ না হওয়ায় আনন্দ উৎপন্ন হয় না। অল্পসংখ্যক রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত বলে—'ইহাতে রস কোথায় ?' সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বুদ্ধিমান কল্পনা-মুখী পাঠকচিত্ত বলে—'আমরা আনন্দ পাইতেছি, সুতরাং রস আছে,—খুঁজিয়া দেখ।'

কল্পনামুখী ও রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত সম্বন্ধে আর একটা কথা এইখানে বলা উচিত মনে করি। একই পাঠকের চিত্ত কোনও কাব্যে রসোন্মুখী, কোনও কাব্যে কল্পনামুখী হওয়া বিচিত্র নয়। ইহার কারণ 'বাসনা'র তারতম্য। যে ভাবের বাসনা যে চিত্তে দুর্ব্বল, সে চিত্তে উক্ত ভাবের রসমূর্ত্তি পূর্ণ প্রতিভাত হইতে পারে না। সুতরাং পাঠকবিশেষের চিত্ত কোনও এক রসের কাব্যে রসোন্মুখী হইলেও অপর রস-সম্বন্ধে সে কল্পনামুখী হইতে পারে। তবে রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের পক্ষে কখনও রসবিশেষে স্থায়ীভাবে বাসনামুখী বা ভাবমুখী হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না ; যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসনাসমুখ কাব্য ও ভাবসমুখ কাব্য নিম্নতর গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করি। ইহা অসম্ভব নহে যে শান্ত, করুণ, মধুর রসের অধিকারী কোন রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ'এ কবিপ্রতিভা 'ভূতভয়-ভাব'টীকে যে অপরূপ 'ভয়ানক রস'এ রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিল না ; কারণ তাহার অন্তরে ভূতভয়-ভাবের বাসনা দুর্ব্বল ছিল। এক্ষেত্রে সেই পাঠকচিত্ত 'কল্পনামুখী' হইয়া কল্পনার আনন্দই লাভ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া সে একেবারে ভাবলোকে নামিয়া আসিয়া ভাবমুখী পাঠকচিত্তের ন্যায় 'ভূত-ভয়-ভাব' খুঁজিবে ইহা অসম্ভব। এক রসে রসিক চিত্ত অন্য রসে পূর্ণ মাত্রায় অরসিক হইতে পারে না।

কবিচিত্ত যখন রসলোকে উত্থিত হইয়া কাব্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন কাব্যকে 'রসোত্তীর্ণ কাব্য' বলা যায়। এ কাব্যের

রসোত্তীর্ণ কাব্য ও রসোন্মুখী চিত্ত

পূর্ণ বিচার বুদ্ধিদ্বারা চলে না, ইহা অনুভূতিসাপেক্ষ। রসোত্তীর্ণ কাব্যের প্রকৃত বোদ্ধা—রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত, কারণ রসলোকের মধ্য দিয়া এই দুই ধারার অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে। এই মিলনের আস্বাদ সেই নিজের সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণ-ব্যাপার। সুতরাং এই লোকোত্তর লোকে দাঁড়াইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। এখান

হইতে নামিয়া কাব্যলোকে দাঁড়াইয়া রসোত্তীর্ণ কাব্যের যৎসামান্য আনন্দপরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে ব'সে রও?
কথা কও, কথা কও।
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে।
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
হেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কল-কল ভাষ নীরব তাহার,
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন
তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

অতীতের প্রতি যাহার কোনদিন কোন দরদ নাই, অর্থাৎ যাহার চিত্তে এই ভাবের বাসনা সঞ্চিত নাই, তাহার কথা একেবারেই বাদ দিতে হইবে; কারণ বাসনাহীন পাঠকচিত্ত কাব্যবিচারের বাহিরে। কিন্তু অতীতের প্রতি দরদসম্পন্ন চিত্তে সন্দেহ থাকে না, যে কবিচিত্ত এখানে অতীতের বাসনাসাগরে স্নান করিয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিল। ইহার শব্দ, রীতি, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনার বিচার পৃথকভাবে কে করে? কি ইহার বিভাব, কি অনুভাব, তাহাতেই বা কাহার প্রয়োজন? কেবল বুঝা যায় কবিচিত্ত এইমাত্র লোকোত্তর তার্থে অতীতের যে রসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, আপনার শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার-অর্থ সমস্তই একমুখী করিয়া সেই অতীতের বোধন করিতেছে। পাঠকচিত্তে রসলোকস্থিত সেই অতীতের ভীষণ কান্ত মূর্ত্তি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠে:—

যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে।

ইহার মধ্যে দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যাপ্তি, তাহার আনন্দ মনকে প্রসারিত করিয়া দ্যায়।

সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর
কল-কল ভাষ নীরব তাহার।

ইহার বিপুল নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি চিত্তকে অভিভূত করে।

তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন!

ভয়ের ভাব নয়, ভয়ের বাসনা নয়, ভয়ের কল্পনা নয়, ভয়ের আনন্দ ইহাতে জাগিয়া উঠে,—যাহাকে 'ভয়ানক রস' বলা হয়।

কবিচিত্ত আর একবার রসলোকে ডুব দিয়া আসিয়া বলিতেছে—

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!

কে একথা অবিশ্বাস করিতে পারে? পাঠকচিত্ত আপনা হইতে অন্তর্মুখী হইয়া আপনার মর্ম্মে অতীতের সঞ্চয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠে। এমনি করিয়া কবিচিত্ত-ধারা ও পাঠকচিত্তধারার মিলনে রসের আস্বাদন চলিতে থাকে—যাহা সংসার-বৃক্ষের অমৃতময় ফল; আর যে ফলে নিম্নাধিকারী পাঠকচিত্ত চিরবঞ্চিত।

(ক্রমশঃ)

অস্তরাগ

[সুফী মোতাহার হোসেন]

তিমির রাত্রির পানে একাকিনী চলেছ সুন্দরী,
সম্মুখে দুলিছে তব দিনান্তের ছায়া,
বুঝি তাই শঙ্কাভরে চরণ চলে না আর পথে—
তোমারে ফিরিয়া ডাকে ধরণীর মায়া।
মন্থর গতির ভঙ্গে অপরূপ রূপ বিভঙ্গিয়া
হেলাভরে ফুটায়েছ যে লীলাকমল—
একটি আকাশতলে অনবদ্য একটি স্বপন
সোনার সায়াহ্ন ভরি' করে ঝলমল।

ঘনবন অন্তরালে দোলে তব স্বর্ণাভ অঞ্চল
সিঁথিটি রাঙ্গায়ে নিছ গোধূলি-সিন্দুরে,
নামা'য়ে গুণ্ঠনখানি নির্নিমেষ আছো, আছো চেয়ে
শীতল সুস্নিগ্ধ শান্ত সরসী-মুকুরে।
তোমার নয়নে জ্বলে প্রণয়ের সুন্দর মিনতি,
আবীর-কুঙ্কুম-রাঙ্গা দেহের বরণ:
বেদনায় ম্লানমুখে সৌন্দর্য্যের অতুল বৈভব,
অশোকের রক্তরাগে রাঙ্গা দু'চরণ।
বিহ্বল মেঘের দল পড়ে আসি' অলকে তোমার—
মেলিয়া সহস্র বাহু পাখায় পাখায়,—
হরিৎ পাটল কালো, কভু ঘন সোনালী সুনীল—
লুটিয়া ছুটিয়া মরে মুগ্ধ অসহায়।

তুমি হোথা দিগন্তরে ম্লানমুখ বিষণ্ণ বিরস
আসন্ন বিরহ-ভয়ে ব্যাকুল অধীর,
কাতর নয়ন মেলি ফিরে ফিরে চাহ বারম্বার,—
কাহারে খুঁজিছ তুমি কোন্ সিন্ধু-তীর?
দুলে দুলে উঠে দূরে রজনীর গাঢ় যবনিকা,
জলতলে ডুবে যায় সোনার গাগরী।
হোমানলে জ্বালা তব নৈবেদ্যের রক্তবর্ণ থালি
সহসা লুটিয়া ল'বে আঁধার শর্ব্বরী।

* * *

পূজারিণি! চিনি, তোমা চিনি,—
তুমি সেই জ্যোতির্ল্লতা—
ঊষার উদয়চ্ছন্দে কবে লীলাচ্ছলে
জাগাইয়া ধরণীর সুখ-সুপ্ত কোন্ সে কিশোরে
আপনার কণ্ঠহার দিলে তার গলে।

বিস্ময়ের সীমা নাহি, সে কি স্বপ্ন, সে কি জাগরণ!
ক্ষণে ক্ষণে সে কি মৃদু সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা!
বিহ্বল আঁখির আগে জাগিয়া উঠিল নবরূপে
জন্মজন্মান্তের সে কি মূরতিকল্পনা।
একটি মুহূর্ত্ত শুধু, তারি মাঝে গুঞ্জরি' কাঁদিল
জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা।
একটি মুহূর্ত্ত পরে তুমি চলে' গেলে কোন্ দূরে—
বুঝিল না সে কিশোর দুর্ব্বোধ্য ছলনা।

তার পরে বহু বর্ষ বহু কাল গত হ'য়ে গেছে,
জীবনের জ্বরতপ্ত দুঃসহ দাহন—
ছারখার করিয়াছে যত স্বপ্ন যত সাধ ছিল,
তোমারে সে খুঁজিয়াছে তবু প্রাণপণ।
ক্ষুধার্ত্ত আঁখির দৃষ্টি প্রসারিয়া দূর দূরান্তরে
হেরিয়াছে মরীচিকা মোহিনী মায়ার।
নিদ্রাহীন বেদনায় শুনিয়াছে তব পদধ্বনি
তুমি ফিরে ক্ষণতরে আস নাই আর।
আজি যবে শান্ত সন্ধ্যা ঘনাইছে গগন-অঙ্গনে,
জ্বলে ধূপ বাজে শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে;
দিবসের শেষ তানে ক্রন্দি' উঠে করুণ পূরবী,
তারে কি পড়িল মনে নয়নের নীরে?

বিরহিণী, তাই তব অন্তরের ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা
অবহেলি' রজনীর গাঢ় আলিঙ্গন
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে ক্ষীণ কণ্ঠে নাম ধরি' তা'র
গুমরি' গুমরি' ফিরি করিছে ক্রন্দন।
ফিরিবার পথ নাহি, তোমারে চলিয়া যেতে হবে—
উঠিছে উন্মনা হ'য়ে তব স্বর্ণরথ।
ক্ষণিকের লীলানাট্যে সমাপ্তির শেষ রেখা টানি'
নিশীথের অন্তরালে হারাইবে পথ।

তব অন্তর্দ্ধান-পটে জ্বলিয়া উঠিবে সন্ধ্যাতারা—
প্রেমের সে অনির্ব্বাণ দীপ্ত দীপশিখা;—
তোমারে বেসেছি ভাল—এই কথা, এই কথা শুধু
অন্তকাল জ্যোতির অক্ষরে রবে লিখা।

গীতায় ইন্দ্রিয়-সংযম

[শ্রীঅনিলবরণ রায়]

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ভিতর হইতে বাসনা-কামনা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হয়, 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্'। বাসনা দূর করিতে হইলে বাসনার কারণ দূর করিতে হইবে। বাসনার মূল কারণ কি? ইন্দ্রিয়গণ যে স্ব স্ব বিষয় ধরিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য বেগে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়, ইহাই বাসনার কারণ। ইন্দ্রিয়গণের এই বহির্ম্মুখী বেগের দ্বারা মনে তীব্র চাঞ্চল্যের উদয় হয়, মন বাসনা, ভাবাবেগ, কাম, ক্রোধ, লোভাদির অধীন হইয়া পড়িয়া বুদ্ধিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। অতএব, প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, 'বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।'

ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিতে হইবে, সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাহা জানেন। ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধে যত উপদেশ দেওয়া হয় এত আর কোন বিষয়েই নহে; কিন্তু, এবিষয়ে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা মোটেই তত সহজ নহে। জ্ঞানী, সাধু, যত্নপরায়ণ সাধকেরাই ইন্দ্রিয়বেগে ভাসিয়া যান। ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে-ভাবে উপদেশ দেওয়া হয় বা অভ্যাস করা হয় তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অনুপযোগী। সাধারণতঃ আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের কঠোরতাকেই ইন্দ্রিয়-সংযম বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কি খাইতে হইবে বা হইবে না, কি পরিতে হইবে না, কি দেখিতে হইবে না, কি শুনিতে হইবে না, এই সব বাহ্যিক আচরণের উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ব্রহ্মচারী বলিলেই বুঝায় যে, তিনি কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান করেন, নিরামিষ আহার করেন, স্ত্রীলোকের সংসর্গ পরিহার করিয়া চলেন, সকল রকম ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতে নিজেকে যথাসম্ভব বঞ্চিত করিয়া রাখেন। লোকের চক্ষে এ-সব খুব ভাল দেখায় বটে এবং এই ভাবে জনসাধারণের নিকট সম্মান অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু এই সবকেই ইন্দ্রিয়সংযম মনে করা ভ্রম।—সাধারণতঃ এ-সবের দ্বারা কেবল আমাদের অহঙ্কারেরই তৃপ্তি হয়। গীতা এইরূপ লোক-দেখান বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের উপদেশ দেয় নাই, গীতা ভিতরে সংযম অভ্যাস করিবার কথাই বলিয়াছে। ভিতরের এই অভ্যাসের ফলেই প্রকৃত ইন্দ্রিয়জয় সম্ভব। যেখানে ভিতরের এই সাধনা নাই, সেখানে বাহিরের সমস্ত আচারই মিথ্যাচার। আর যেখানে এই ভিতরের অভ্যাস যথার্থ জ্ঞান ও নিষ্ঠার সহিত করা হয়, সেখানে বাহিরের আচারব্যবহারের উপর কোনও ঝোঁক দিবার আবশ্যক হয় না, সে সব আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়।

ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে ভিতরের সেই সাধনা কি? গীতা একটি সুন্দর উপমার দ্বারা তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে—

> যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
> ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২।৫৮

কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ সকলকে ভিতরের দিকে টানিয়া লয়, সেইরূপে যখন সাধক সকল প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহৃত করিয়া লন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই আপন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি আছে, সে বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সে বেগে সেইটিকে ধরিতে যায়, ভোগ করিতে যায়। এই বেগকে ধারণ করা অভ্যাস করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণ যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে চাহিবে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া ধরিতে হইবে। এখানে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতিই প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে, ইহারা ইন্দ্রিয়ের বাহ্য যন্ত্র মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ হইতেছে বস্তুতঃ মনেরই বিশেষ বিশেষ শক্তি, ইহারা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ করে, এবং হস্ত পদাদির দ্বারা বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়া করে। অতএব, ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়ার অর্থ মনেরই বহির্ম্মুখী গতিকে নিরোধ করিতে হইবে। মনের স্বভাব হইতেছে ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল বস্তুর প্রতি ধাবমান হওয়া, মনের এই স্বাভাবিক ঝোঁককে দমন করিতে হইবে, কোন-

রূপ বাহ্য স্পর্শ বা প্রেরণায় মনকে চঞ্চল হইতে দেওয়া চলিবে না।

ইহাই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃত পন্থা। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ বর্জ্জন করিয়া বনে বা নির্জ্জনে গিয়া বাস করা নহে; ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই বাস করিয়া তাহাদের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বেগকে রোধ করিতে হইবে। কূর্ম্ম যেমন বিপজ্জনক বস্তু হইতে হস্তপদাদি টানিয়া লইয়া নিজের কঠিন খোলের মধ্যে রাখে, তেমনই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া তাহাদের উৎপত্তি-স্থল মনের মধ্যে শান্ত করিয়া ধরিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিতে হইবে। বুদ্ধিকে আত্মায় ও আত্মজ্ঞানে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিতে হইবে। তখন আমরা সাক্ষ্যরূপে প্রকৃতির সমস্ত খেলা অবলোকন করিব, কিন্তু তাহার অধীন হইয়া পড়িব না, বাহ্য জীবন যাহা দিতে পারে এমন কোন বস্তুই কামনা করিব না। ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী বেগকে এইভাবে সংযত করা প্রথম প্রথম অতিশয় কঠিন বোধ হইবে, কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা ইহা ক্রমে সহজ হইয়া আসিবে। তখন আর সাধককে চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে না, কচ্ছপ যেমন অনিষ্টকর বস্তুর সম্মুখে স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গসকলকে গুটাইয়া লয়, সাধকও তেমনই ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে, উপরের দিকে টানিয়া লইতে পারিবেন। তখনই তিনি হইবেন স্থিতপ্রজ্ঞ।

গীতা ইন্দ্রিয়-সংযমের যে যৌগিক প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গীতার বিশ্লেষণটি অনুধাবন করা আবশ্যক। গীতা এখানে সাংখ্য মতেরই অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহার মূল কথা হইতেছে, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, পুরুষ সচেতন, অচল, অক্ষয়, আপনার জ্যোতিতে আপনি জ্যোতির্ম্ময়। প্রকৃতি শক্তি এবং শক্তির প্রক্রিয়া। পুরুষ নিজে কিছুই করে না, কেবল শক্তি ও শক্তির ক্রিয়া তাহার চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়াতে তাহাকে সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জন্ম, মৃত্যু, জীবন, জ্ঞান, অজ্ঞান, কর্ম্ম অকর্ম্ম, সুখদুঃখ প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপার উদ্ভূত হয়, এবং প্রকৃতির প্রভাবে পুরুষ এই সমুদয়কে নিজেরই বলিয়া ভ্রম করে; কিন্তু বস্তুতঃ এ-সব তাহার নহে, এ-সবই প্রকৃতির খেলা। সাংখ্য এই ভাবেই জগৎকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। সাংখ্য অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগত বিকাশের যে ক্রম (order) নির্দ্দেশ করিয়াছে, গীতা তাহাই কার্য্যতঃ উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে রহিয়াছে পুরুষ—শান্ত, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, এক, অপরিণামী, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা বিকাশ নাই; অন্যদিকে রহিয়াছে প্রকৃতি—ত্রিগুণময়ী, প্রথমে অব্যক্ত, সচেতন পুরুষকে ছাড়া প্রকৃতি নিশ্চল, inert, কিন্তু পুরুষের চেতনার সম্মুখে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে বিকাশ ও লয়ের খেলা চলে। আমরা যে অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের নিকটে যেটা আন্তরিক (subjective), তাহারই বিকাশ প্রথমে হয়, কারণ পুরুষের চেতনাই প্রথম কারণ, এবং অচেতন প্রকৃতি-শক্তি দ্বিতীয় কারণ, পুরুষ-সাপেক্ষ। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের অন্তরের করণগুলি প্রকৃতি হইতেই আসে, পুরুষ হইতে নহে। পর্য্যায়ক্রমে প্রথমেই আসে বুদ্ধি, ইহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ভেদ-বিচার বা নির্ণয়নের শক্তি, * এবং তাহারই একটি

* বুদ্ধি হইতেছে বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, intelligence and will. প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে বুদ্ধি ত' সচেতন, ইহা কেমন করিয়া অচেতন জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়? কিন্তু জড়জগতে অণুপরমাণুর মধ্যে অচেতন ভাবে যে ভেদবিচার, কর্ম্মনির্ব্বাচন চলিতেছে, আমাদের সচেতন মানসিক বুদ্ধি মূলতঃ সেই জিনিষই; এবং আমাদের এই সচেতন মনও যে জড়, matter হইতে উৎপন্ন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানও তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে অচেতন জড়ের ক্রিয়া কেমন করিয়া সচেতনরূপে প্রতিভাত হয়, বিজ্ঞান তাহার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। সাংখ্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছে; বুদ্ধির ক্রিয়া সচেতন পুরুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাই উহা সচেতন বলিয়া দেখায়। পুরুষের চেতনার আলোকই জড়ের উপরে আরোপ করা হয়, এবং এইরূপে পুরুষ প্রকৃতির খেলা দেখিতে দেখিতে ভ্রম করে যে, এ-সব বুঝি তাহার নিজেরই খেলা, পুরুষই যেন চিন্তা করিতেছে, সুখদুঃখ বোধ করিতেছে, কর্ম্মাকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছে; কিন্তু বস্তুতঃ এ সব প্রকৃতি এবং তাহার তিন গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতি ও তাহার কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমেই এই ভ্রমের নিরসন আবশ্যক।

অহঙ্কার, এই অহঙ্কারের বশেই পুরুষ প্রকৃতি ও প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে। দ্বিতীয় পর্য্যায়, ইহাদের হইতে মনের আবির্ভাব হয়। মন শব্দটি সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের ক্রিয়াও ইহার অন্তর্গত, আমাদের বাহ্য চেতনার সমস্ত ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে মন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু, এখানে মন বলিতে ইন্দ্রিয়-মন, sense-mind বুঝাইতেছে। মনই মূল ইন্দ্রিয়, ইহা সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া করে; কারণ মনের আছে একই সঙ্গে দুই প্রকার গতি, ইহা প্রত্যক্ষের দ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের স্পর্শ গ্রহণ করে, এবং এই ভাবে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান সঞ্চয় করে, আবার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাণশক্তির প্রয়োগ করে। মন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশ করিয়া তাহাদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করে, আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ করে। শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন ও আঘ্রাণ এই পাঁচ প্রকারের অনুভূতির জন্য পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্য, গমন, ধারণ, বহিষ্করণ ও প্রজনন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মের জন্য পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। তাহার পর আবির্ভূত হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং ইহাদের স্থূল ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চভূত আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্, ক্ষিতি। * এই পঞ্চভূতের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলেই বাহ্যজগৎ।

আমরা জড়জগৎ বিকাশের যে ক্রম (order) প্রত্যক্ষ করি ইহা তাহার বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। আমরা দেখিতেছি আগে এই জড়জগৎ, তাহা হইতেই ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির আবির্ভাব হইতেছে। কিন্তু, আমরা যদি স্মরণ রাখি যে বুদ্ধিও অচেতন প্রকৃতির জড়ক্রিয়া এবং এই অর্থে অনুপরমাণুর মধ্যেও একটা অচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে, ভেদ-বিচার ও নির্ব্বাচন চলিতেছে, উদ্ভিদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুখদুঃখের বেগ, স্মৃতি প্রভৃতির স্থূল উপাদান দেখা যাইতেছে এবং ক্রমবিকাশের ফলে এই সবই পশু ও মানবের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সচেতন অন্তঃকরণে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আধুনিক সায়ান্সের সিদ্ধান্তগুলির সহিত সাংখ্যের বেশই মিল রহিয়াছে। যে ক্রম অনুসারে প্রকৃতির বিকাশ হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ করিয়াই আমরা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। প্রথমে বাহ্যজগতের বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া মনের মধ্যে লইতে হইবে, মনকে বুদ্ধির মধ্যে লইতে হইবে, বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ প্রকৃতির ভেদ বুঝিয়া পুরুষের স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে। উপনিষদে এবং গীতায় তাহাই বলা হইয়াছে,—

> ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

—"ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়, মন ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই সচেতন আত্মা, পুরুষ।" অতএব গীতা বলিতেছে, এই যে পুরুষ আমাদের অন্তর্জীবনের শ্রেষ্ঠ কারণ, ইহাকেই বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, তাঁহাতেই আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই ভাবে আমাদের নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ সত্তাকে প্রকৃত সচেতন মহত্তর আত্মার সাহায্যে শান্ত ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া আমরা আমাদের শান্ত ও আত্মজয়ের পরম দুর্দ্দমনীয় শত্রু মানসিক বাসনা কামনাকে বিনষ্ট করিতে পারিব।

ইন্দ্রিয়গণকে যে এইরূপে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলা হইল, ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি বাহ্যত্যাগ ও বৈরাগ্যের, বাহ্যিক সংযম ও কঠোরতার উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ ভুল ধারণা নিরসনের জন্য পরের শ্লোকেই তিনি বলিলেন—

> বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
> রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ২।৫৯

সাংখ্যমতানুযায়ী সন্ন্যাসীগণ যে কঠোরতা অভ্যাস করে, শরীরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়, এমন কি আহার পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে চায়, সেরূপ আত্মসংযম বা বৈরাগ্যের শিক্ষা দেওয়া গীতার অভিমত নহে। গীতা যে প্রত্যাহারের উপদেশ

* স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে elements বা মৌলিক পদার্থ বলিতে যাহা বুঝায়, পঞ্চভূত ঠিক তাহা নহে; পঞ্চভূত হইতেছে জড়ের পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থার নাম, এই স্থূল জড়জগতে তাহাদিগকে অবিমিশ্র অবস্থায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দিয়াছে তাহা বাহ্যিক প্রত্যাহার নহে, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রত্যাহার, বাসনাত্যাগ। কেহ যদি উপবাস করে, আহার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে খাদ্যবস্তুর সহিত বাহ্যসংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে মাত্র, কিন্তু তাহার সহিত যে ভিতরের সম্বন্ধ, খাদ্যদ্রব্যের প্রতি রসনেন্দ্রিয়ের লালসা, সেটি থাকিয়া যায়, অথচ এই ভিতরের সম্বন্ধটিই হইতেছে যত অনিষ্টের মূল। জীব দেহ গ্রহণ করিয়া পার্থিব লীলার বিকাশ করিতেছে, এই দেহরক্ষার জন্য সাধারণতঃ আহারগ্রহণ প্রয়োজন। আহার করাতে কোনও দোষ নাই, কিন্তু খাদ্যবস্তুর প্রতি যে লালসা, যে আসক্তি, রসনাতৃপ্তির যে আকাঙ্খা সেইটাই দোষের। আহার্য্য দ্রব্যকে দূরে রাখিলেই সে লালসা দূর হয় না, অথচ উপবাসের দ্বারা দেহের অনিষ্ট হইয়া আত্মার আত্মলীলাবিকাশই ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। গীতা কোথাও এইরূপ দেহের উপর কঠোরতা বা অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় নাই; বরং স্পষ্টই বলিয়াছে যে, যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দেহকে পীড়া দেয়, তাহারা দেহের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকেই পীড়া দেয়, তাহারা নিশ্চয়ই অসুর।

বাহ্যসংযমের স্থূল দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতার উল্লিখিত শ্লোকে নিরাহার বা উপবাসের কথা বলা হইয়াছে। এখানে রসনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য। বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসাই দোষের নহে, কিন্তু বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়গণের যে প্রতিক্রিয়া (reaction) যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়টিকে ধরিবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য বেগে ধাবমান হয়, এইটিই দোষের, এইটিতেই চিত্তের বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, আভ্যন্তরীণ শান্তি, জ্ঞান, স্থিরপ্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণের এই বহির্ম্মুখী বেগ, এই প্রতিক্রিয়াকে রোধ করাই প্রকৃত প্রত্যাহার, এবং ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাহ্যবিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয়গণ শান্ত থাকিবে, রাগ দ্বেষে বিচলিত হইবে না, ইহাই আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা। এই অত্যুচ্চ আদর্শ অবস্থা লাভ করা যায় আত্মাকে দর্শন করিয়া,—পরং দৃষ্ট্বা।

উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে, বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে বিষয়সকল নিবৃত্ত হয়, ঐ নিবৃত্তি রসব্যতিরেকে হইয়া থাকে; অর্থাৎ বিষয় নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু রস থাকিয়া যায়, ইহাই রসবর্জ্জং শব্দের অর্থ। রস কি? বিষয় উপভোগ করিতে ইন্দ্রিয় যে সুখ পায় তাহাই রস; যে বস্তুতে ইন্দ্রিয় সুখ পায় সেইটিতেই সে লাগিয়া থাকিতে চায়, এই রাগ ও দ্বেষ, এই দুইটিই রসের দুইটি দিক। ইন্দ্রিয়গণ এই রাগদ্বেষের বশে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করে, তাহার মনকে সঙ্গে টানিয়া লয়, মন বুদ্ধিকে টানিয়া লয়, ফলে সমস্ত জীবন অশান্তিময়, দ্বন্দ্বময়, দুঃখময় হইয়া উঠে। রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে বিষয় সকলের উপর বিচরণ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা করাই ইন্দ্রিয়জয়ের প্রকৃত রহস্য। ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা বাহিরের জীবন হইতে ফিরিয়া অন্তর্ম্মুখী হইব, পরম বস্তু আত্মার দর্শন লাভ করিব, এবং বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের সমস্ত আভ্যন্তরীণ জীবন তাহার সহিত যুক্ত করিয়া তাহারই সহিত ঐক্যে ও যোগে জীবন যাপন করিব।

সাধারণ জীবনে মানুষ আত্মা হইতে, ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেহ, প্রাণ, মনের মধ্যে বাস করে, অজ্ঞান ও অহঙ্কারের বশে এই দেহ, প্রাণ, মনকেই তাহার "আমি" বলিয়া, প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করে, ইহা ছাড়া, ইহার উপরে তাহার সত্তার যে আর কিছু আছে তাহার কোন মর্ম্মই সে জানে না। কিন্তু, বস্তুতঃ মানুষের এই জীবনটি তাহার সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ, মূল সত্তায় মানুষ ভগবানের সহিত এক, সে ভগবানেরই অংশ। সাধারণ জীবনে মানুষ এই পরম সত্যটি ভুলিয়া থাকে, তাহার জীবনের মূল নীতি হয় অজ্ঞান, অহঙ্কার, বাসনা। যতক্ষণ মানুষ এই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে ততক্ষণ প্রকৃত ইন্দ্রিয়জয় অসম্ভব। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে যে সত্য রহিয়াছে, আমরা যে অহংভাবের মধ্যে বাস করি তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত যে পরম সত্য, সেটিকে জানিতে, ধরিতে, উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানবজীবনের দুঃখদ্বন্দ্ব বন্ধন অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সেই উপরের সত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম অনুভূতি হইতেছে এক বিশাল, নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষয় আত্মার শান্তি, উহা প্রকৃতির কর্ম্ম-জালে বদ্ধ নহে, ত্রিগুণের খেলার অধীন নহে, কিন্তু, উহার ধাতা, উৎপত্তি-স্থল, অন্তর্যামী সাক্ষ্যরূপে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। উহা অনন্ত, সবকে ধরিয়া রহিয়াছে, সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে এ সব কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম, তাহার নিজের কর্ম্ম নহে। আমরা যখন এই আত্মার দর্শন লাভ করি, তখন সমতা ও ঐক্যের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি, তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রেরণা বর্জ্জন করি। ঐ আত্মা চির শান্ত, আপনার আনন্দে আপনি পূর্ণ, সে আনন্দ সকল সুখ দুঃখ রাগদ্বেষদ্বন্দ্বের অতীত, যদি আমরা একবার এই আত্মার দর্শন লাভ করি, এবং আমাদের মন ও বুদ্ধিকে তাঁহার উপরে ন্যস্ত করি তাহা হইলে ঐ পরম আনন্দ আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়া দ্বন্দ্বময়, বিষয়াধীন, ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ভোগের স্থান গ্রহণ করে। ইহাই মুক্তিলাভের প্রকৃত পন্থা।

হোমিওপ্যাথি

[শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়]

১

শিবু খুড়ো দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া বেশ বেলা করিয়াই উঠিলেন। হাত মুখ ধুইয়া কাঁধে ভিজা গামছাটি ফেলিয়া রোয়াকের কিনারায় গিয়া বসিলেন এবং চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কোথায় সব,—এক ছিলিম পাব নাকি ?"

খুড়োর পরিচয়টা একটু দিয়াই আরম্ভ করি তা হইলে। কবে যে বিশেষ কাহার খুড়ো ছিলেন গ্রামের কেহ বলিতে পারে না, তবে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মুখেই ঐ এক-সম্পর্কের বুলি। এই আমাদের কথাই ধরি না।— কাকা 'শিবুখুড়ো' বলিতেন। আমি জ্ঞান হওয়ার পর দু'-একবার 'ঠাকুর্দ্দা' বলিবার চেষ্টা করি ; কিন্তু এমন অস্বস্তিকর শোনায় আর নিজেকে এমন গ্রামের বাহিরের লোক বলিয়া বোধ হয় যে সে-প্রয়াস ছাড়িয়া দিই। এই তো আমার অবস্থা ; ছেলেটাও সেদিন আসিয়া বলিল—"বাবা, শিবু খুড়ো বল্‌লেন যে ...." বলিলাম—"বেরো, ব্যাটার সম্পর্কজ্ঞান দেখ না· ...."

অত কথা কি, স্বয়ং 'রাঙাখুড়ী'ও বাদ যান না।—ছেলেবেলায় বিশালাক্ষীতলায় এই বলিয়া পুরুতকে দিয়া খুড়োর কল্যাণে পূজা দেওয়াইতে শুনিয়াছি,—"এই মা'রই বরের নামের খুড়ো ব'লে দিয়ে দিন না,—গেরামের কে না চেনে তাঁকে..."

যা হ'ক, শিবুখুড়ো রোয়াকের কিনারায় আসিয়া বসিলেন। রাঙাখুড়ী পিতলের প্রদীপ আর পিলসুজ জ্বালিতেছিলেন, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল ; তামাকের ফরমাস শুনিয়া আরও খানিকটা তেঁতুলের ছিব্‌ড়া লইয়া মাজা জিনিস দুটো আর একবার কষিয়া কষিয়া মাজিতে সুরু করিয়া দিলেন। খুড়ো একবার আড়চোখে দেখিয়া নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলেন ; কারণ, তাঁহার তামাক সাজা তো দূরের কথা, নিজের জলটি পর্য্যন্ত গড়াইয়া লইবার হুকুম নাই।

খুড়ী বলেন—"আমি যেদিন মরে' তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব, সেদিন থেকে নিজে সব ক'রো,—আশ মিটিয়ে ; তদ্দিন আর এ লোকদেখান কেন ?..."

খুড়ো, কলিকালে বিশেষ করিয়া সংসারের অসারতা সম্বন্ধে গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান গাহিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু তাহাতে পিলসুজ মাজার শব্দটা বেশী ঝাঁঝাল হইয়া গেল দেখিয়া থামিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া গেল, এবং মরিয়া হইয়া "খুক্-খুক্-খুক্" করিয়া তিনবার একটু কাশিলেন। খুড়ী একবার আড়চোখে চাহিয়া আবার কাজে লাগিলেন।

খুড়ো আবার বুকটা চাপিয়া ধরিয়া চার পাঁচ বার কাশিলেন ; বলিলেন—"এবার কাশিটা যেন জাঁকিয়ে এলো, দিব্যি ক'রে পাড়তে আর কি।"

খুড়ী সামনাসামনি হইয়া ফিরিয়া অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"যখন কোন রোগ না থাকবে তখন তো—'উঃ গেলুম গো—মলুম গো' করবে ; এখন সত্যিই যখন কাশিটা হ'য়েচে একটু, যাওনা একবার নবীন ডাক্তারের কাছে। রাতটা যদি বেড়েই থাকে, নয় একবার ডাকিয়ে পাঠাই।"

"কিসের জন্যে ? ওরা সব কি বিশ্বেস করে আমার কিছু হয়েছে ? এই সারা জন্মটা কিছু না কিছু একটাতে ভুগচিই ; ওরা কি কখনও বলেচে—'হ্যাঁ শিবুখুড়ো, এই অসুখটা তোমার কাবু করেচে' ? আসবে—সেই কাঁকড়া-বিছের মত অস্তরটা দিয়ে একবার এখানে টিপবে একবার ওখানে টিপবে, তারপর 'কৈ খুড়ো, তোমার তো কিছুই দোষ নেই'—আরে বাপু, আমার কি দোষ ? তোরা পারবি নি রোগ ধরতে আর আমার হবে দোষ ?"

"সে যদি বলে কোন রোগ নেই তো তাই মেনে নিতে হবে, অত বড় একটা ডাক্তার। তোমার আবার খুঁৎখুতুনি রোগও তো আছে।"

"ছাই ডাক্তার; এলোপ্যাথিতে আছে কি যে বড় ডাক্তার হ'বে—হাঁ্যা, সে কথা কবিরাজী সম্পর্কে বলা চলে। সেই কোন্ ছেলেবেলা অনুকূল কবরেজ সুধু একবার নাড়ীটি টিপে বলে দিয়েছিল—সারা জীবনটা নানান থানায় ভুগবে, ব্যস্, তারপর থেকে নাগাড়ে জের টেনে চলেছি, একটা না একটা লেগেই আছে।···সে সব প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন।···খক্ খক্ খক্—খুড়ী তামাক সাজিয়া আনিয়াছিলেন, বলিলেন—"ধর, আগুণটা ভাল ধরেনি; একটু ফুঁ দিয়ে নাও; ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে।···না, দাও, কাজ কি ওটুকু উবগারেতে, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। কাঁধ থেকে ভিজে গামছাটা নামিয়ে কেথাও কর দিকিন, এই সব অত্যাচারেই, আর সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়েছে, হবে না!"

"ঐঃ, ওইখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। ডাক্তারে এসেও ঐ কথাই বলবে, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েমানুষের সামিল কিনা। অথচ যার রোগ সে বলচে—'না ঐ শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়েছে বলেই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত উঠতে পারি না।' কিন্তু কে শোনে নিজের কথাই পাঁচ কাহন। এই সব দেখে শুনেই তো শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথি বইটা কিনলাম। হাঁ্যা, একটা শাস্ত্র বটে! পাওয়া গেল বইটা? খোঁজ না, দেখি একবার কি ওষুধ বলে এমন অবস্থায়।...খক্-খক্-খক্···"

"কি; আবার তুমি বসোতো তোমার সেই জগদ্দল বই আর মাকড়শার ডিম ভরা শিশি নিয়ে, কি কাণ্ডটা করি দেখোতো। বই গেছে, আপদ গেছে; রাজ্যির রোগ বিদায় হ'য়েছে। থাকলেই পাতা ঘেঁটে ঘেঁটে মিলিয়ে মিলিয়ে হরেক রকম রোগ জড় করবে। আমার শরীরটাও তো ঐ করে' পাড়বার চেষ্টা করে ছিলে।"

শিবু খুড়ো চুপ করিয়া গেলেন। বুকটা চাপিয়া খুব জোরে কয়েকবার কাশিয়া বলিলেন—"হু-হু করে বেড়ে চলেছে; এই থানটায় যেন একটা ব্যথাও উঠচে ব'লে বোধ হচ্চে।"

রাঙাখুড়ী দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"তাহ'লে নবীন ডাক্তার কাল এসে একবার দেখুক, কচি খোকার মত বায়নাক্কা চলবে না, এই বলে দিলাম···"

"আর নবীন ডাক্তার যদি তোমার মত এসে বলে—ও কিছু নয়, রাত্তির বেলা ঘুমিয়ে একটু শ্লেষ্মা হ'য়েচে।"

রাঙাখুড়ীর বিদ্রুপটুকু ধরিতে দেরি হইল না; অধর দংশন করিয়া বলিলেন—"বটে!" তাহার পর সহজ ভাবেই ব'ললেন—"তা হ'লে নিশ্চিন্দি বুঝব এ তোমার সেই চিরকেলে বুজরুকি।"

"তুমি নিশ্চিন্দি হবে আমি ম'লে..." ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু খুড়ো আর সেখানে বসিতে সাহস করিলেন না; হুঁকা লইয়া হন্ হন্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

রাঙাখুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"দেখ, বাড়িতে বাড়তে মুখ বেড়েই যাচ্ছে। যত মনে করি সামনে সাবিত্রীর বেরতোটা আসবে, কাজ কি কথা কয়ে; কিন্তু তোমার ইচ্ছে নয় যে কেউ মুখ বুঁজে থাকে। বলি, মড়ার ভয় দেখাও কাকে গা?—'মলেই নিশ্চিন্দি হও' হাঁ্যা, হই-ই তো, এসো এইবার মুখ খুলেচে—আজই মরনা—ওঃ, বড় সুখের সংসার বড় সোহাগের সোয়ামী। আমার আবার ঘটা ক'রে সাবিত্রীর বেরতো—ঢাক পিটিয়ে লোক হাসান। যম কোন সাহসে তোমায় নেবে? তারও গেরস্তর ঘর, একেবারে উত্তম কুস্তম হ'য়ে যাবে না?···ভাবলাম বেরতোটা আসবে, ক্রমাগতই ঘাটের রুগীর মত খক্-খক্ করবে কেন, দেখুক্ ডাক্তার একবার। ও—ম্মা!···"

২

তাহার পরদিন বিকালে রাঙাখুড়ী ঘুঁটে দেওয়ার জন্য গোবরের তাল মাখিতে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাম হাতে আঁচল ধরিয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন এমন সময় নবীন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"কি গো রাঙা খুড়ী, খুড়ো আবার কি হিড়িক লাগিয়েচে?"

খুড়ী বাম হাতের উল্টা দিক দিয়া মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া লইলেন, কহিলেন, "কে জানে বাপু, কাল বিকেল থেকে তো কাশতে আরম্ভ করেচেন, আর ক্রমাগতই —'এবারে আর ব্রতর জোগাড় করে কি হবে' এই বুলি। রোগ আছে কি নেই, সুধু মনের সন্দোতে এরকম গাল পাড়া কার সহ্যি হয় বলতো বাছা? তাই অভিরামকে বললাম,

'নবীনকে একবার আসতে বলিস্।' যাও, দেখ একবার।"

নবীন ডাক্তার ভিতরে গিয়া ডাকিল—"খুড়ো, কোথায় আছো গো?"

"এই যে ভাই, এসো। হঠাৎ কি মনে করে?" বলিয়া শিবু খুড়ো রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর যে যাহাই করুক, তিনি কাহাকেও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণ করেন না।

প্রশ্ন শুনিয়া নবীন একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু খুড়োকে সে কিছু আজই দেখিতেছে না। সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"না, এই এদিক দিয়ে একবার পালেদের ওখানে যাচ্ছিলাম, রাঙা খুড়ী বললেন—'তোমার নাকি একটু কাশি হচ্চে কাল থেকে, তাই··"

"কাশি!" বলিয়া খুড়ো যেন আকাশ থেকে পড়িলেন।—"আর তুমি এত বড় ডাক্তার হ'য়ে সেটা বিশ্বাস করে নিলে? আমার কখনও অসুখ হ'তে দেখেচ তোমরা?"

নবীন ডাক্তার মনে মনে হাসিয়া বলিল--"না, অমন নীরোগ শরীর তো দেখাই যায় না। আমি রাঙাখুড়ীকে সেই কথাই তো বলছিলাম। বললেন—'তবুও তুই এক-বার দেখে আয় বাপু; বাজে খক্‌খকানি শুনে শুনে আমার পিত্তি জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্চে।'"

খুড়ো অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে মুখটা একটু কুঁচকাইয়া রহিলেন; বলিলেন "না, না; ও সব মেয়েলী কথায় কান দিও না। আমার আবার অসুখ; আর অসুখ হ'লেই বা করি কি বল,—সংসারে কে কার?"

"সে কি কথা খুড়ো? তবে হ্যাঁ, রাঙাখুড়ীর আবার একটু রোগবাই আছে– মেয়ে মানুষ কিনা।···আচ্ছা তবে আসি" বলিয়া নবীন বাহির হইয়া যাইতেছিল, খুড়ো খক্-খক্ করিয়া দুইবার কাশিলেন। নবীনের ঠোঁটে একটু চটুল হাসি দেখা দিল, পিছন ফিরিয়া যাইতেছিল বলিয়া খুড়ো সেটা দেখিতে পাইলেন না। দাঁড়ায় না দেখিয়া খুড়ো আরও জোরে তিন চার বার কাশিলেন, এবং তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া অস্ফুট স্বরে ডাক্তারকে 'হারামজাদা, বদমায়েস' বলিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন—"এই রকম এক আধবার কাশছিলাম, কি রকম বোধ হচ্চে বলতো?···তোমার কানটা এই বয়সেই যায় বুঝি, একটু নজর রেখ।"

নবীন হাসি সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"খুব সহজ কাশি খুড়ো; না বলে দিলে কানেই লাগে না,—এর জন্যে রাঙাখুড়ী যে কেন ভেবে মরচেন···"

"আচ্ছা যখন এসেচ, দেখবে তো একবার দেখে নাও তোমার সেই আদাড়ে যন্ত্রটা নিয়ে, কেন যে ওগুনো ব্যবহার কর তোমরা বুঝতে পারি না।"

নবীন আর একটা হাসি কোন মতে চাপিয়া বলিল— "তা'হলে চল একবার ঘরে।"

খুড়োকে বিছানায় শোয়াইয়া নবীন ষ্টেথস্কোপ দিয়া বুক পিঠ চারিদিক পরীক্ষা করিল। দুষ্টামি করিয়া সত্য কথা-টাই বলিল—"দেখচি তোমার কথাই ঠিক খুড়ো; হার্টের এক্‌শন্ দিব্যি চলচে, কোন দোষ নেই বুকে" বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে ষ্টেথস্কোপটা গুটাইয়া সুঁটাইয়া পকেটে পুরিল।

খুড়ো শুইয়া শুইয়াই দুই তিন বার কাশিলেন, তাহার পর অনেক দিনের রুগীর মত নাক মুখ সিঁটকাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া একবার পকেটের যন্ত্রটার দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—"কত দিয়ে কিনে ছিলে?"

"তেরো টাকা দিয়ে।"

"একে জিনিষগুলোই ভুয়ো, তারপর আবার সস্তার মাল। ডবল নিউমোনিয়া হোলে ওতে কিছু সাড়া পাও?··· আমার যেন মনে হচ্চে বুকে হ'য়েচে একটা কিছু। তা থাক্, ও তোমাদের কর্ম্ম নয়, একবার অমর্ত্ত কবরেজকে ডাকতে হচ্চে। তাদের এসব ভড়ং টড়ং নেই, নাড়ী দেখেই ধ'রে দেবেখন।"

"কাকে ডাকতে হচ্চে?"—বলিয়া হাতের আঙুলের গোবর পরিষ্কার করিতে করিতে রাঙাখুড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া উগ্র শাসনের স্বরে বলিলেন—"নবীন যা' বলে তাই হবে; অন্য কবরেজবদ্যি বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে পারবে না, এই বলে দিলাম"—বলিয়া ত্রিসীমানার নিশানা স্বরূপ দেওয়ালে একটা গোবরের বৃত্তাংশ টানিয়া, তাঁহার বিধান সম্বন্ধে রোগীর মতামত জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য রোগী কোন মতামত দিল না। রাঙাখুড়ী ডাক্তারের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি রকম দেখলে বাবা? সত্যি, না আমার হাড়-জ্বালান বুজরুকি? আমার তো মনে হয় এতটুকুকে এতখানি করা হচ্চে

খুড়ো দুইবার জোরে কাশিয়া হাঁপাইয়া বলিলেন—"না, বুজরুকি।" বলিয়া বুকটা চাপিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার কাশিলেন।

ডাক্তার রাঙাখুড়ীরই সমর্থন করিয়া বলিল—"সামান্য একটু যেন সর্দ্দি হয়েচে ওপরে ওপরে। একটা ওষুধ দিচ্চি; কাশিটা শুকনো না থেকে নরম হ'য়ে যাবে'খন।"

"হ্যাঁ দাও, খান্। আমার মিছি মিছি ঢং অসহ্যি, চোপোর দিন মিছিমিছি গালাগালও অসহ্যি।...কেন গা,—কিসের জন্যে?"

ডাক্তার একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ লিখিয়া দিয়া বলিল—"এই-টে দু'বার ক'রে খেও। আর খুড়ো, তামাকটা একটু কমাও এ ক'টা দিন, তার পরে তো আচেই।"

শিবু খুড়োর পিত্তি জ্বলিয়া যাইতেছিল, বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমার হাত থেকে বেরিয়ে আবার আমি বেঁচে থাকলে, তবে তো। সাবিত্রীর কাজ অনেক সোজা ছিল, তাঁকে তো আর তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়নি।—যমকে ঠেকান অনেক সোজা।"

গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"দেখো!" তাহার পর বাঁ হাতে নবীনের হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওঠ, এক্ষুনি ওঠ; কেন এ পাপপুরীতে এসে মিছিমিছি গাল খেয়ে মরচ গা? ওর কি কিছু হিতাহিত জ্ঞান আচে? চোখের একটু পরদা আচে? মরবার সাধ হয়েচে তো মরুক; ঐখানে পচে গলে মরুক, কার বয়ে গেচে? বেরতো নিয়ে কথায় কথায় এত ঠেস্ দেওয়া কিসের? আহা ভারি আমার সত্যবানের মত সোয়ামী, সোয়াগ করে সাবিত্রীর বেরতো ক'রতে বসেচি! মুয়ে আগুন আমার, মুয়ে আগুন আমার বেরতোর, আর মুয়ে আগুন তা'র যে..."

খুড়ো রাঙাখুড়ীর দিকে চাহিয়া 'খক্ খক্' করিয়া দু' তিনবার কাশিলেন। ডাক্তার বলিল—"আর থাক্ খুড়ী; যেন খাওয়ান হয় ঠিক রকম।"

৩

শিশির ঔষধ কয়েক দাগ শেষ হইয়াছে। খুড়ো যে সেবনের দ্বারাই শেষ করিয়াছেন রাঙাখুড়ী একথা বিশ্বাস করেন না। সর্দ্দিটা আরও একটু বাড়িয়াছে। খুড়ী বলিতেছেন—"নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে কুপথ্যি করেচ, কোনও গুণে তো ঘাট নেই।"

খুড়ো বলিতেছেন—"এলোপ্যাথি ওষুধটাই একটা মস্ত বড় কুপথ্যি যে।"

খুড়ী বলিলেন—"কিম্বা বোধ হয় দাগের দাগ ঢেলে নিয়ে ফেলে দিচ্ছ;—তুমি সেও পার

খুড়ো উত্তর দিলেন—"তা যে করিনি তা'র প্রমাণ অসুখটা বেড়ে গেছে, কমেনি।"

খুড়ী বাঁধিতে ছিলেন। আর কিছু না বলিয়া, কড়াটাতে খুন্তির গোটাকতক ক্রুদ্ধ ঘা দিয়া অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত হাতটা ধুইয়া ফেলিলেন। ঘর থেকে শিশিটা বাহির করিয়া ক্রোধকম্পিত হস্তে হুড়্‌হুড়্ করিয়া খানিকটা ঔষধ গেলাসে ঢালিয়া কৃত্রিম শান্ত স্বরে বলিলেন, "খেয়ে ফেল।"

খুড়ো অকৃত্রিম শান্ত ও করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রায় আড়াই দাগ যে!"

রাঙাখুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"হাঁ, দেখেচি আড়াই দাগ! অনেক দেখে দেখে চোখ দুটো ক্ষয়ে গেছে বটে, কিন্তু কানা হইনি একেবারে। নাও, নেবে? না..."

খুড়ো ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"এই দাওনা; আমি বলছিলাম পুরো তিন দাগ ক'রে দিলে হোত না? হিসেব ঠিক থাকতো।" বলিয়া, একটুও মুখ বিকৃত না করিয়া ভাল ছেলের মত দু'দাগ ঔষধ গিলিয়া ফেলিলেন; তাহার পর আবার কহিলেন—"নবীন নেহাৎ মন্দ ডাক্তার হয় নি, কি বল? খক্-খক্ খক্...একটু যেন বেড়েচে আজ।"

রাঙাখুড়ী বলিলেন—"মন্দ কেন হোতে যাবে?—অমন নাম ডাক বেরিয়েচে কি অমনি?"

"হুঁ; তবে এলোপ্যাথি ওষুধ কিনা, রোগ সারাতে পারে না, এই যা। এই দেখ না, সর্দ্দিটা বেড়ে গেচে। বল্‌লাম; তা বল্লে,—'আয়োডাইড দিয়েচি কিনা সর্দ্দিটাকে নরম করবে একটু।'...অথচ আমি জানি, আসলে তা' ব্যাপার নয়।...তুমি দেখচি বড় অত্যাচার কর নিজের.

শরীরের ওপর; এখনও স্নান করনি বুঝি? আবার সামনে অমন পাহাড় ব্রতটা আসচে।

রাঙাখুড়ীর মেজাজ জল হইয়া গেল; বলিলেন—"নেও, তুমি সুস্তালয় ভালয় সেরে উঠ বাপু, তখন আমার বেরুতো আর অর্চ্চা।"

"তুমি পড়লেও তো আমার মনেও এই কথাই হবে? না, ছেলেমানষী রাখ; আগে নেয়ে নাওগে। ক'দিনে যেন আধখানা হ'য়ে গেছ।"

"যাই; হ্যাঁ, কি বলছিলে?—সর্দ্দিটা কেন বেড়েচে?"

"নবীন তো বলচে আয়োডাইড্ দিয়েচে তাই একটু নরম হয়েচে সর্দ্দিটা। অথচ আমি জানি কি ব্যাপার; কাল অমাবস্যা গেল, তাই একটু রস বৃদ্ধি হয়েচে। এসব কথা কবরেজ হলে ষট্ ক'রে ধরে ফেলতো। শাস্ত্র তো কবিরাজী, নাড়ীটি টিপ্‌লে, তারপর অনর্গল রোগের কুলুজি আওড়ে গেল; আর দ্বিতীয় কথাটি…না, আমি অমর্ত্ত কোবরেজকে ডাকতে বলচি না; তবে শত্রুরও যশ গাইতে হয়।"

"তোমার কোবরেজকেই যদি বিশ্বাস হয় তো না ডাক্‌বেই বা কেন? আগে বললেই হোত। সত্যিই তো বাপু, রোগ কোথায় কমবে না বেড়েই যাচ্ছে। অথচ প্রায় আড়াই দাগ ওষুধ এক সঙ্গে দিব্যি খেয়ে ফেললে। তুমি আমায় বল, অথচ নিজের শরীর সম্বন্ধে তোমারই নিজের কোন চাড় নেই; তা হক্ কথা বলব বাপু, হ্যাঁ।"

"যাঃ, মাছ চড়িয়ে এসেছিলে বুঝি? গেল বুঝি পুড়ে। ঐ তো এক মুঠো খাওয়া তোমার, তাতে মাছটা গেল পুড়ে। একবার নয় দেখব ভেলেপাড়ায়?"

"না, তোমায় আর অসুখ গায়ে বেরুতে হবে না। ঠাকুর দয়া করে আমার পোড়া মাছটুকুই জন্ম জন্ম বজায় রেখে যান এই ভিক্ষে (চক্ষে অঞ্চল দিলেন)। তোমার সাবুটুকু আগে দিই, তবে নাইব…তা'হ'লে বাপু আসুক অমর্ত্ত কোবরেজ একবার; ও আদাড়ে ওষুধ আর খেয়ে কাজ নেই। কি যে আমার অদিষ্টে আছে মা সতীরাণীই জানেন…,"

দিনটা বেশ অভঙ্গ শান্তিতে কাটিল। রাঙাখুড়ী ক্রমাগতই খুড়োর চিকিৎসা সম্বন্ধে সমস্ত অভিমতে সায় দিয়া গেলেন, এবং খুড়ো সকরুণ কাশি এবং তাঁহার প্রতি চিকিৎসা-জগতের নিদারুণ অবিচারের কাহিনীর দ্বারা খুড়ীর করুণা উদ্রেক করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার দিকে খুড়ো মনের শান্তিতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া তামাক টানিতে-ছিলেন, বাহিরে অমৃত কবিরাজের গলা শোনা গেল— "খুড়ো!"

খুড়ো আপনি আপনি বলিলেন—"বাব্বাঃ! খবর পেয়েচে কি ছুটেচে, কেউ তো আর ডাকে না ওদের। এক গেলেন তো আর এক জ্বালাতে এলেন।"

ডাকিলেন—"এই যে এসো" তাহার পর র‍্যাপারটা টানিয়া লইয়া বিরক্ত ভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অমৃত কবিরাজ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"রাঙাখুড়ী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কি, অসুখটা কি?"

খুড়োর কাশি আসিয়াছিল, প্রাণপণে চাপিয়া সেইরূপ অবস্থাতেই বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"দেখই না বাপু;—তোমাদের তো আবার সে গুমোরটুকু ষোল আনা আছে যে নাড়ী দেখেই হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পার। আমায় আর তবে বকাও কেন; একে কোমরের বেদনায় মরচি…"

অমৃত কবিরাজ বাড়ীটার সহিত খুব পরিচিত ছিল, একবার চারিদিকে চাহিয় বলিল—"রাঙাখুড়ী গেলেন কোথায়?"

"অসুখ তার নয়, আমার।"—বলিয়া খুড়ো উঠিয়া বসিয়া 'খক্-খক্' করিয়া কাশিয়া বলিলেন—"কোমরে ব্যথা হ'য়েচে শুয়ে শুয়ে; ক'দিন থেকে সর্দ্দিতে ভুগ্‌চি …নবীন ডাক্তার অত বড় এলোপ্যাথ সেই হার মেনে গেল তো তোমাদের গাছগাছড়ায় কি করবে বল?…বাঁ হাত না ডান হাত দেখবে?"

কবিরাজ বিনা বাক্যব্যয়ে খুড়োর বাঁ হাতটা তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল, একটু পরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"হুঁ—দু'টো দিন উপোস দিতে পার?"

খুড়ো বিরক্ত ভাবে চাহিয়া বলিলেন—"কেন, দিনান্তে ছটাকখানেক যে সাবু খাচ্চি সেটা কি ভুরিভোজন হ'য়ে যাচ্ছে নাকি? বল তো তাও বন্ধ ক'রে দিই; তোমাদের আশ মেটে, গিন্নিরও আমার জন্যে বাজে মেহনৎ একেবারে

কমে' যায়।...না বাপু, তোমাদের এ কর্ম্ম নয়। গিন্নিকে একশো বার বল্লাম—'ওগো, এ কালরোগে ধ'রেচে একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর,'—কে শোনে?...'একবার কবিরাজিটা দেখই না'—আরে বাপু, কবিরাজি তো তুমিও করতে পার।—ক্রমাগত মাসখানেক ধ'রে উপোস করাও আর জোলাপ দাও—উপোস করাও আর জোলাপ..."

খুড়ী আধা-ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, খাটের দিকে চাহিয়া কবিরাজকে প্রশ্ন করিলেন—"কি রকম দেখা হ'ল?"

"তেমন কিছু নয়; একটা উপোস দিলেই শরীরটা ঝর্‌ঝরে হ'য়ে যাবে; একটা বড়ীও দিয়ে যাচ্ছি। খুড়ো কিন্তু উপোসের নামে..."

খুড়ো তাড়াতাড়ি জুড়িয়া দিলেন—"...মহাখুসী। তা' তোমার খুড়ীও জানেন;—উপোস পেলে আমি রাজত্বও চাই না, অমন জিনিস আচে?" বলিয়া কথা যাহাতে না বাড়ান হয় সেজন্য অমৃত কবিরাজের দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চাহিলেন।

খুড়ী দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"খাওয়া তো কিছুই নেই; এক চুমুক ক'রে সাবু খান; এর ওপর আবার উপোস! আমি তো বলছিলাম শুকনো শুকনো কিছু যদি একটু খেতে দিতে। শরীরে কিছু নেই ভুগে ভুগে, দুনিয়ার অরুচি..."

অমৃত কবিরাজ মনে মনে বলিল—"তোমাদের বুঝে ওঠা দায়"—প্রকাশ্যে কহিল—"তা' উপোস যে নেহাৎই দরকার এমন কিছু নয়। ঘি মরিচ দিয়ে দুটো চিড়েভাজা খেতে পারেন। কিম্বা...খুড়ো, কি খেতে মন যায় বল দিকিন?"

খুড়ো উৎফুল্ল ভাবে—"গরম গরম" বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, খুড়ী বলিয়া উঠিলেন—"পোড়া কপাল আমার, উনি এক্ষুনি বলে বসবেন—"ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিছরি আর নেবুর সরবৎ হলে ভাল হয়।...আর মেলা লোভ বাড়িয়ে কাজ নেই। অভিরামকে সঙ্গে দিচ্চি, ওষুদটা তা' হ'লে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্‌।"

খুড়ো ভগ্নোৎসাহ হইয়া করুণ ভাবে কয়েকবার কাশিলেন। "গরম গরম" কি তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস হইল না। কবিরাজ চলিয়া গেলে রাঙা খুড়ীর মন জোগাইবার জন্য বলিলেন—"ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে, নৈলে উপোস করিয়েই আমার দফা..."

খুড়ী কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত বলিলেন—"কেন, উপোসটা কি খারাপ জিনিষ, না ডাক্তারবদ্যিরা মুখ্যু?"

খুড়ো থতমত খাইয়া বলিলেন—"না, উপোস জিনিষটা তো খুবই ভাল; আমিও তো..."

খুড়ী আরও একটু রাগিয়া বলিলেন—"ভাল বলে' কি তোমার এই কাহিল শরীরে এখন শোভা পায়?"

খুড়ো ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া—'না...সে আমি...তোমার গিয়ে' করিতেছিলেন—

ধমক দিয়া খুড়ী বলিলে—"আর থাম বাপু, জ্বালিও না।"

খুড়ো চুপ করিয়া রহিলেন, একটু পরে বলিলেন—"হোমিওপ্যাথির সেই বইটা পাওয়া গেল?"

খুড়ী বিছানাটা গুছাইতেছিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"গেলো।"

এ "গেলো'র অর্থ বুঝিতে খুড়োর বাকি রহিল না। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন—"শাস্ত্রটা উঁচু দরের; ওটা বের করতে কত লোকে যে প্রাণপাত করেচে..."

খুড়ী সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"তাহ'লে আসল কথাটা বলব?...তোমার মত হাজার লোকেও প্রাণপাত করলে সে শাস্তোর আর বের করতে পারবে না, তাকে অনেক দিন উনুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েচি!"

৪

ভগবানের 'চিড়িয়া খানা'র এক প্রকৃতির মানুষ আছে যাহারা অসন্তুষ্ট থাকিলেই ভাল থাকে। পৃথিবীর সবপ্রকার শুভ অশুভ, সবপ্রকার আনন্দ উৎসবের দিকে তাহারা সমান ভাবে নাসিকা কুঁচকাইয়া সারাটা জীবন যদি কাটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই ভাবে সার্থকতার চরম হইল। প্রকৃতিদেবী তাঁহার এই রকম খুঁৎখুঁতে সন্তানদের লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়েন এবং সাধ্যমত তাহাদের হাতের কাছে বিশেষ করিয়া সুখের এবং স্বস্তির সরঞ্জাম আগাইয়া

দিয়া মন জোগাইবার চেষ্টায় থাকেন; কিন্তু ফল হয় ঠিক উল্টা। তাহারা নিজের মনের তিক্ত রসে সব জিনিষই জরাইয়া রাইয়া মুখটা চিরকালই বিকৃত করিয়া থাকে। মাঝে পড়িয়া বিশ্ব-সংসারের আনন্দ উপকরণের খানিকটা অপচয় ঘটে মাত্র। স্নেহান্ধ সকল মা-এর মতই প্রকৃতি মায়ের এ ভুলটা রহিয়াই গেল।

আমাদের খুড়ো ঠিক এই প্রকৃতির লোক। কিছুরই অপ্রতুল নাই, অথচ অসন্তোষেরও সীমা নাই। খুড়োর কাণ্ডকারখানা দেখিলে এই রকমই মনে হয় যে বিধাতার ভাল মন্দ সমস্ত বন্দোবস্তই নিরপেক্ষ ভাবে পণ্ড করিবার অভিসন্ধি লইয়াই তাঁহার জীবন। সব ছাড়িয়া তাঁহার এই শরীরের কথাই ধরা যাক্ না। অসুস্থ থাকাটা যেমন কেহই পছন্দ করে না, সেই রকম তিনিও করেন না; কিন্তু সুস্থ থাকিলে আরও চটিয়া যান। এই জন্য, যেমন অষ্টপ্রহর ডাক্তার বৈদ্য না হইলে চলে না, সেই সঙ্গে ইহাও সমান ভাবে সত্য যে ডাক্তার বৈদ্য দেখিলেই তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে এবং কথায় কথায় তাহাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য সজাগ থাকেন। শুধু বাক্যের দ্বারাই নহে; কায় মনের দ্বারাও, অর্থাৎ প্রায়ই নিজের বিবেক এবং কখন কখন নিজের স্বাস্থ্য বলি দিয়াও...

আসলে কোন রোগই ছিল না খুড়োর, সখের কাশি কাশিয়া যাইতেছিলেন। রাঙা খুড়ী যে সেই আড়াই দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, সেই থেকে একটু কাশি হইয়াছিল। কবিরাজি ঔষধ খাইয়া সেটুকুও সারিয়া গেল। অবশ্য কাশি সেই রকমই চলিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজির নিন্দা। খুড়ী থাকিলে বাড়ে, কাশির জ্বালায় তিনি তো পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়াছেন।

বিকাল বেলা। রাঙাখুড়ী বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিতে অনেকক্ষণ লাগিবে। খুড়ো সুস্থ শরীরে নিশ্চিন্ত মনে কাশিটাশি বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া তামাক টানিতেছেন এবং টানের ফাঁকে ফাঁকে কখন নীচু গলায়, কখনও বা ভাবের আধিক্যে গলা উঁচু করিয়া দেহতত্ত্ববিষয়ক একটা রামপ্রসাদী গাহিয়া যাইতেছেন।...অমৃত কবিরাজ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। "রাঙাখুড়ী, আছো নাকি?"—বলিয়া একটা হাঁক দিতে যাইতেছিল, কিন্তু খুড়োর অসমসাহসিক গান শুনিয়া বুঝিল খুড়ী বাড়ী নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিল, তাহার পর নিঃশব্দে দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ একেবারে সামনাসামনি হইয়া কহিল—"এই যে খুড়ো, ভাল আছ দেখছি, কাশিটাতো একেবারেই নেই।"

পরাজয়ের ক্ষোভে খুড়োর প্রথমটা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মূঢ়ের মত একটু চাহিয়া সামলাইয়া লইবার জন্য একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমার গিয়ে একটু যেন আজ ..."

কবিরাজ শেষ করিতে না দিয়াই বলিল—"না একটু কেন? বেশ-ই ভাল আচ। আমি এই প্রায় আধঘণ্টার ওপর এসে বাড়িতে বসে আচি কিনা; ভাবলাম সাড়াশব্দ নেই, এঁরা সব কোথাও গেছেন নিশ্চয়, একটু বসে যাই।... তা' কই, অত যে কাশি ছিল তোমার একবারও তো শুনতে পেলাম না। কেউ ফিরচেনা দেখে উঠছিলাম, এমন সময় তোমার গান কাণে গেল, দিব্যি শ্লেষ্মালেশহীন গলা!..."

—খুড়োর নিজের এই অসতর্কতার জন্য আত্মধিক্কারে মনটা ভরিয়া গিয়া মুখটা বিকৃত হইয়া গেল—

"...তখন ভাবলাম—'বাবা, গঙ্গাধর সেনের নিজের বিধান মিলিয়ে তোয়ের-করা ওষুধ, এর আর নড় চড় হবার জো আছে!' "

খুড়ো মুখটা নামাইয়া শুনিতেছিলেন; কুটিল আড়চোখে একবার দেখিয়া আবার চক্ষু নামাইয়া লইলেন; শুধু বলিলেন—"হুঁ,—তা একদিনের ফলে কিছু বোঝা যায় না, কালও একবার এস।"

"দরকার হবে না, রোগের গোড়া মেরে ফেলেচি, খুড়ো, গঙ্গাধর সেনের নিজের গড়া সূত্র—'শ্লেষ্মায়াং পিত্তযুক্তায়াং'—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী একেবারে। আর আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন কিনা, 'অমৃত' নাম নিতে অজ্ঞান হ'তেন..."

খুড়ো মুখ টিপিয়া একটু মাথা নাড়িলেন,—"আর ম'লেন বুঝি হাতের ওষুধ খেয়ে?...যাক্, তুমি কাল একবার এসো। কাশিটা হঠাৎ চাপ প'ড়ল, আমি তেমন ভাল বুঝচি না, বোধ হয় চিকিৎসার কোন দোষ হ'য়েচে।"

"তা নয় আসব'খন একবার বেড়াতে বেড়াতে। আজ রাত্তিরটা একটু সাবধানে থেকো।"

খুড়ো একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অর্ত বড়াইয়ের পর তেরাত্তিরের ভয় ঢুকল নাকি? তোমাদের কবিরাজিকে চিনতে পারলাম, দাদা।"

অমৃত কবিরাজ হাসিয়া জবাব দিল—"আমাদের কবিরাজি কিন্তু তোমাকে—এই গিয়ে তোমার অসুখকে টপ করে ধরে ফেলেচে খুড়ো;—কেমন, নয়? আচ্ছা আসি।"

খুড়ো বলিলেন—"এসো।" কবিরাজ পেছন ফিরিলে চাপা গলায় বলিলেন—"বেটা গোয়েন্দা কোথাকার! আচ্ছা য়োসো—জান্ কবুল।"

তাহার পর অসাবধান নিজেকে এবং দাম্ভিক গঙ্গাধর-শিষ্যকে জব্দ করিবার জন্য উঠিলেন। ভাঁড়ার ঘরের তাকে একটা বড় বাটির এক বাটি দই ছিল; তাহার প্রায় আর্দ্ধেকটা সাবাড় করিয়া, বেড়াল গিয়া যাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি ঢাকা দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দুয়ারটা খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিলেন। তারপর তামাক সাজিয়া—আর যাহাতে ভুল না হইয়া যায় সেই মতলবে, হুঁকায় মুখ দিয়া সুদে আসলে কাশি সুরু করিয়া দিলেন।

খানিক বাদে রাঙাখুড়ী ফিরিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"কি বললে অমর্ত্ত কবরেজ?"

খুড়ো খুব জোরে কাশিতে কাশিতে ভাঙা ভাঙা কথায় বলিলেন—"কাশির আওয়াজ—শুনতেই পেলে না।"

খুড়ী কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাহার পরেই রান্নাঘরের খোলা দোরে চক্ষু পড়িল, "ঐগো, সব্বনাশ হয়েচে!" বলিয়া ছুটিলেন...

—দইয়ের ছত্রাকার! বেড়ালটা ইতিমধ্যে কখন আসিয়া, বাটি ফেলিয়া দই ছড়াইয়া বুড়োর দোষ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে!

খুড়ো হুঁকায় ছুটো টান দিয়া বার চারেক কাশিয়া নির্লিপ্তভাবে একবার চাহিয়া বলিলেন—"দোরটা বুঝি খুলে রেখে গিয়েছিলে?—তা' বেড়ালের তো আর সর্দ্দি হয়নি যে ক'বরেজের শাসন মানতে..."

আর শেষ করিতে হইল না; খুড়ী রান্না ঘরের বাহিরে আসিয়া ছুটো হাত ঝাঁকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আর তুমি কোন চুলোয় ছিলে?—একটা বেড়াল তাড়িয়েও উবগার জীবনে হ'ল না?—কি কাজে এলে?...কোথায় গেল অলপ্পেয়ে বেড়াল?—মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন—পেলে একবার দই খাওয়ার সখটা জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই। পাড়ার আবাগীরা বেড়াল পুষেচে—, নিজেদের পেটে খুদ জোটে না; বেড়ালের দই ক্ষীর চাই,—যে মুখে দই খেয়েচে সে মুখে নুড়ো জ্বালব তবে"

খুড়ো দই-খাওয়া মুখের সম্বন্ধে এরকম উৎকট গালাগালি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সদয়ভাবে বলিলেন—"আর থাকৃগে—আহা ষষ্ঠীর বাহন.."

খুড়ী আরও ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—"হক্ কথা ব'লতে ডরি না, বলি আমার আবার ষষ্ঠীর বাহন কি গা?—একটাও পেটে ধরলাম?—ভারি আমার ষষ্ঠী-ষষ্ঠী—তাঁর বাহনকে আমার সোহাগ করে দইসন্দেশ খাওয়াতে হবে—ভাগাড়ে দোর না অমন দইখেকো..."

খুড়োর মুখে তখনও দইয়ের স্বাদ লাগিয়া রহিয়াছে; আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তোমার আবার সাবিত্রী ব্রত কেন গা?...এগাল গুলো কি আমার ওপর পড়বে না?"

রাঙা খুড়ী একেবারে থ হইয়া গেলেন; চোখ মুখ কপালে তুলিয়া ঠাণ্ডা আওয়াজে প্রশ্ন করিলেন—"তোমার ওপর—পড়বে!—কেন শুনি?"

খুড়ো সেই মেজাজেই বলিলেন—"পড়বে বই কি,—একশোবার পড়বে.."

—রাঙাখুড়ী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

"...আমার দোষেই যদি দই খেয়ে গিয়ে থাকে তো বেড়ালের মুখে আগুন দেওয়ার মানেটা কি?—তাকে ভাগাড়ে দিলে কে ভাগাড়ে গেল?—আমি কি ঘাস খাই?—এটুকু আর বুঝতে পারব না?...ভাগাড়ে তো গিয়েই আছি—অষ্ট প্রহর গালমন্দ খেয়ে খেয়ে আর শরীরে...খক্-খক্ খক্-খক্—শরীরে আছে কি?—সাবিত্রী ব্রতর এইবার তো উদ্‌যাপন।—যম আসবে, আর ছুজোনার ছেঁড়াছেঁড়ি পড়ে যাবে।"

রাঙাখুড়ী একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া শেষকালে বলিলেন—"এই তো?—বলি, এই তো?—আচ্ছা রইল এ সংসার;—আবার যদি এ সংসারের কোন কথায় থাকি তো আমার অভিরড় কোটি দিব্যি।...উচ্ছে যাক্ পুড়ে যাক্—যা কিছু হোক..."বলিতে বলিতে রান্নাঘরে আঁচল বিছাইয়া

উবু হইয়া শুইয়া বর্ত্তমান ঘটনার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক নানা কথা তুলিয়া কান্না সুরু করিয়া দিলেন।

৮

খুড়োকে আজ আর জোর করিয়া কাশিতে হইতেছে না—দই যেন কথা শুনিয়াছে। কাশির চোটে রাঙাখুড়ী ত্যক্তবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খুড়োর মনটা খুব প্রসন্ন। কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। খুড়ী বলিয়াছিলেন—"যত ডাক্তার বদ্যি দেখবে তত্তই কি তোমার রোগ বেড়ে যাচ্ছে,—পেঁচার সবই উল্টো।"

খুড়ো উত্তর দিয়াছিলেন—"সাবিত্রীর ব্রত আগে সোয়ামী মরবার ব্রত কি না—একের পর এক যমদূত আসচে।"

রাঙাখুড়ী কাজের মধ্যে হঠাৎ থামিয়া—"কী!"—বলিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্যের সূচনা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে আওয়াজ হইল—"খুড়ো!"

"এই যে এস।···নাম করতেই হাজির"—খুড়ীর দিকে একটু চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"অমর্ত্ত কোবরেজ।—যমের সব চেয়ে হুঁসিয়ার চর কিনা।"

"কেমন আছ আজ" বলিতে বলিতে অমৃত কবিরাজ ভিতরে প্রবেশ করিল। খুড়ো কাশিতে কাশিতে বিজয়ের পৌরুষে বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া কবিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নাড়ী দেখিতে অমৃত কবিরাজের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। খুড়ো মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কি গো, গঙ্গাধর স্যানের সূত্র বলে কি?—হুঁ হুঁ, আমি বললাম এ রোগ স্যারান তোমাদের কর্ম্ম নয়—তা গঙ্গাধর স্যানই হোন্ আর···"

অমৃত কবিরাজ গুরুর নামের অমর্য্যাদা সহ্য করিতে না পারিয়া চটিয়া উঠিল, বলিল—"নিশ্চয় কোন অনাচার হ'য়েচে এই বলে দিলাম,—নৈলে যে-ওষুধ ..."

খুড়ো বলিলেন—"একটা বেড়ালে কাল রান্নাঘরে দই ছড়িয়ে আমার পা ঘেঁসে চলে গিয়েছিল—এই পর্য্যন্ত তো জানি···"

কবিরাজ একটু মৌন থাকিয়া কি ভাবিল, তাহার পর দুই তিনবার "তা' হ'লে তা' হ'লে" করিয়া হঠাৎ খুড়োর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা—দইটা খুব টক্ ছিল কি?"

মনে খুব স্ফূর্ত্তি থাকিলে লোকে একটু অসাবধান হইয়া পড়ে। খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়া বলিলেন—"কৈ না।"—এবং সঙ্গে সঙ্গেই সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"সে আমি কি ক'রে জানব?—বাঃ—এযে তোমার অন্যায় প্রশ্ন দেখচি···কাকে যে কি মাথামুণ্ড জিজ্ঞেস কর···"

ইহার পরে এ বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। কবিরাজ একবার রাঙাখুড়ীর দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিল, রাঙাখুড়ী একবার খুড়োর দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিলেন, আর খুড়ো কাহারও পানে না চাহিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে কবিরাজ বলিল—"তা হ'লে এখন ঐ ওষুধটাই চলুক রাঙাখুড়ী, ভাল হ'য়ে যাবে'খন। আমার আবার চৌধুরীদের বাড়ী যেতে হবে একটু। গোপাল চৌধুরীর ঠিক এই অসুখ; এই ওষুধ তো তাঁকেও দিচ্চি,—বেশ সেরে উঠচেন। আর সারতেই হবে'কিনা।—গঙ্গাধর সেনের নিজের হাতের গড়া সূত্র"—বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময় লেজ উঁচাইয়া একটা হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল মন্থর গতিতে বাড়ীতে আসিয়া প্রকাশ করিল। কবিরাজ খুড়োকে প্রশ্ন করিল—"এই বেড়ালটা বুঝি?···বেটী মিষ্টি দই খেয়ে খেয়ে চেহারা বেশ বাগিয়েচে তো!···"

কবিরাজ চলিয়া গেলে খুড়ী উগ্রভাবে খুড়োর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"তাই ষষ্ঠীর বাহনের উপর এত দরদ, না?"

—এবং সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিশানায় হাতের কাঞ্চের একটা ঘটি নিঃশব্দ ষষ্ঠীর বাহনের পিঠের মাঝখানে বসাইয়া বলিলেন—"খা দই—মিষ্টি থক্‌থকে দই···"

খুড়ো হুঁকাটা হাতে করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন।

* * * *

এই গেল খুড়োর চিকিৎসার ইতিহাস।

আরোগ্যের ইতিহাসটা এতটা জটিল নয়, তবে কৌতুকজনক বটে এবং বৈজ্ঞানিকদের বোধ হয় একটু ধাঁধায় ফেলিবে। হাতবশটা লইলেন রাঙাখুড়ী।

দুই দিন হইয়া গিয়াছে। কাশি কমে না—তবে কতটা আসল, কতটা ভ্যাজাল বলা কঠিন। খুড়ো শান্তি স্বস্ত্যয়নের উপর খুব জোর দিতেছেন,—তাহার সমান্তরালে হোমিওপ্যাথি চলুক, এই তাঁহার মত। নূতন একখানা "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা" আসিয়াছে ও একটা ছোট ওষুধের বাক্স। খুড়ী কোন গোলমাল করেন নাই,—এবারে সাবিত্রী ব্রতর জন্য গোটাকতক বেশী টাকা বাহির করিয়া দিয়া খুড়ো এ বিষয়ে আপাততঃ তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়াছেন। কাশির আওয়াজে নাক শিঁটকাইতেছেন এবং ক্রমাগতই ছিদ্র অন্বেষণে নিজেকে সজাগ রাখিতেছেন। যা' দু একটা পাওয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে সদ্য সদ্য 'হ'ক কথা' বলিতে না পারায় মনে মনে গুমরাইতেছেন, তবে আশা, একদিন না একদিন এসব কাজে লাগিবেই...।

খুড়ো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিলেন। বাহিরের পাট সারিয়া রাঙাখুড়ী একখানা কাঁথা সেলাই করিতে বসিলেন। খুড়ো বার দু' এক কাশিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছ আজ?"

খুড়ো মুখটি চুণ করিয়া বলিলেন—"আর কেমন আছি। এতে যেমন লিখচে তাতে তো দেখ্‌চি বড় জটিল ব্যাধি দাঁড়িয়ে গেছে।"

খুড়ীর উত্তরের প্রত্যাশায় একটু থামিয়া বলিলেন—"পুরোপুরি ব্রঙ্কোনিয়ার সিম্পটম।"

খুড়ী বইটার ওপর আগা গোড়াই চটা, কোন উত্তর করিলেন না।

খুড়ো বলিলেন—"চমৎকার শাস্ত্র..."

খুড়ী ছোট্ট করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ।"

"খুব সাদা কথা, সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউরেন্টিস্ অর্থাৎ বিষস্য বিষমৌষধি, অর্থাৎ কিনা বিষ দিয়েই বিষ তাড়াতে হবে।...ধর তোমার রাজযক্ষ্মা হ'য়ে..."

খুড়ী চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"কার কি হ'য়েচে?"

খুড়ো কথা ফিরাইয়া বলিলেন—"এই ধর ধর অমৃত কবরেজের রাজযক্ষ্মা..."

খুড়ী ছুঁচসুতা ছাড়িয়া দিয়া আরও উগ্রভাবে চাহিলেন। খুড়ো থতমত খাইয়া বলিলেন—"ধর—ধর—এই তোমার গিয়ে বেড়ালটার রাজযক্ষ্মা হয়েছে।...তখন দেখতে হবে এমন কি বিষ আছে যাতে রাজযক্ষ্মা সুস্থ শরীরে হ'তে পারে। সেই বিষ রোগীর শরীরে সাঁদ করাতে হবে। অর্থাৎ ভেতরে যে রোগ রয়েচে বাইরে থেকেও সেই রোগের..."

খুড়ী ক্রুদ্ধ হস্তে কাঁথাটা লুটাইয়া ফেলিয়া বইটার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—"এক্ষুনি বন্ধ কর বলচি অমন অলুক্ষুনে বই; এক্ষুনি...আচ্ছা থাক্, পড় যত ইচ্ছে পড়..."

খুড়ো কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খুড়ীর দিকে চাহিয়া কাশিলেন। খুড়ী সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ চড়াইয়া—"খক্—খক্—খক্—খক্" করিয়া চার বার কাশিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন।

খুড়ো বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"একি, তোমারও কাশি হয়েচে যে!—কখন থেকে?"

"এই মাত্র আরম্ভ হ'ল—"

"তাহ'লে একদাগ নক্সভমিকা খেয়ে নাও। লক্ষণগুলো একবার..."

"এই খাচ্চি, দাও" বলিয়া খুড়ী উঠিয়া ঔষধের বাক্সটা তুলিয়া লইলেন এবং সেটাকে নিজের তোরঙ্গের মধ্যে পুরিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। চাবিটা আঁচলে এমন করিয়া বাঁধিলেন যে খুড়োর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে ও বাক্স আর এ জন্মে বাহির হইবার নয়।

চুপ করিয়া থাকা অস্বস্তিকর বোধ হইতে লাগিল বলিয়া খুড়ো 'খক্—খক্' করিয়া দুই বার কাশিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খুড়ী বুকটা চাপিয়া এমন কাশি কাশিতে লাগিলেন যে খুড়োকে হুঁকা হাতে করিয়া বাহিরে গিয়া বসিতে হইল।...

কিন্তু ঔষধ ধরিল। ছয় সাত বার এই রকম কাশি-বিষের মাত্রা সেবন করিয়া খুড়োর অসুখটা অনেকটা কমিয়া আসিল। কাশির চোটে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত বিলক্ষণই হইল বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে রোগটা কমিল বই বাড়িল না।

তাহার পরদিন খুড়ী ঔষধের মাত্রা চড়া করিয়া দিলেন, অর্থাৎ খুড়োর কাশির অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই প্রথমে কাশিতে কাশিতে উঠিলেন। খুড়োর ঘুম ভাঙিয়া গেলে খুড়োকে তামাক সাজিয়া দিয়া কাশিতে কাশিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কেমন বোধ হচ্ছে?"

ভোরের শৈত্যে খুড়োর একটু কাশি আসিয়াছিল: কিন্তু খুড়ীর উগ্র কাশির কথা স্মরণ করিয়া, অতি কষ্টে বেগটাকে দমন করিয়া বলিলেন—"না, আজ যেন একটু ভাল আছি ব'লে বোধ হচ্ছে, গলাটা সামান্য খুস্ খুস্ করচে একটু।"

"ওটা কিছু নয়, তামাক খাওয়াটা ছেড়ে দাও দু'দিন—ঐ জন্যে হয়েচে" বলিয়া খুড়ী গোটাকতক বিষ-কাশি কাশিলেন।

খুড়ো মুখটা একটু বাঁকাইয়া লইয়া বলিলেন—"হুঁ, কাশিটা তামাক খেয়েই তো হয়; আধার যাদের সে অবোস নেই তাদের..."

"ও পাপ ধোঁয়াও সহ্যি হয় না,—কেশে মরে"—বলিয়া খুড়ী সেই উৎকট কাশি কাশিতে লাগিলেন।

খুড়ো নিজের বিদ্রূপের এই রকম উল্টা পরিণতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া এবং কাশির উৎপাত হইতে পরিত্রাণের জন্য হুঁকা লইয়া গটগট্ করিয়া বাহিরে গিয়া রোয়াকে বসিলেন। এ কয়েকদিনে অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, অথচ কাল থেকে প্রাণ খুলিয়া কাশা হয় নাই; রোয়াকের কিনারায় নিরিবিলিতে পেয়ারাতলাটিতে বসিয়া, হুঁকায় একটা লম্বা সুখটান দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গলা ছাড়িয়া কাশির স্রোত খুলিয়া দিলেন।

স্রোত বেশী নামিবার পূর্ব্বেই রাস্তা, খুড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন—"হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল; আমি বলি কি..."

আর শেষ করা হইল না। সে যা কাশির বান ডাকিল তাহাতে পূর্ব্বের স্রোতটি তো চাপা পড়িলই, স্রোতের উৎস-শিলাটিকেও একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

খুড়ো হুঁকাটা ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাতটা বারণের ভঙ্গিতে খুড়ীর দিকে বাড়াইয়া এবং মুখটা তাঁহার দিক হইতে ঘুরাইয়া বলিলেন—"হয়েচে—হয়েচে গো, ক্ষামা দাও—আমি পাজি, আমি নচ্ছার—আমি আদিখ্যাতা করি—কাশিটাশি আমার সব বুজরুকি—স-ব স্বীকার করচি—ক্ষান্ত দাও—এই নাক কাণ মলচি, আর কক্ষণও কাশব না—সান্নিপাতিক হ'লেও না—বাব্বাঃ—উঃ—কাল সমস্ত রাত..."

খুড়ী অনেক কষ্টে থামিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"কি হোল আবার—থক্—থক্—আমি বলি কি যখন তোমার কাশিটা—নেহাৎই ছাড়বে না—থক্—থক্—বাক্সটা না হয় বের করে দোব?—না হয় একটু হোমিও-প্যাথিই খেয়ে দেখনা—থক্—থক্ থক্—বেশ তো' বিষ দিয়েই যদি..."

খুড়ো মাথা আর হাতের যুগপৎ ঝাঁকানি দিয়া উগ্রভাবে কহিলেন—"হয়েচে—খু—ব হোমিওপ্যাথি খাওয়া হয়েচে—ব্যাগাতা করি—যাও এখন—আর এলোপ্যাথি ডোজে হোমিওপ্যাথি তোমার দিতে হবে না...উঃ—কাল সমস্ত রাত—বাব্বা..."

এই অকিঞ্চিত ঘটনাটুকুর পর খুড়োকে আর কেহ কাশিতে শুনে নাই। *

* [গল্পটির কিয়দংশ শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'কে মনে পড়াইয়া দেয় বলিয়া লেখককে যে পত্র দিই, তাহার উত্তর নীচে দিলাম। স-উত্তর ছাপিবার হেতু পত্রেই আছে।—উঃ সঃ]

আপনার বিগত ৩রা তারিখের পোষ্টকার্ডখানি পাই-লাম। উত্তর দিতে যে এতটা দেরী হইয়া গেল তাহার কারণ 'বামুনের মেয়ে' বইখানি একবার পড়িয়া দেখিয়া উত্তর দিতে হইল; অবশ্য পড়ার চেয়ে যোগাড় করিতেই বেশী সময় লাগিয়া গেল।

বইখানি এতদিন যে পড়ি নাই এটা অমার্জ্জনীয় বটে; কিন্তু বোধ হয় বিশ্বাস করিতে নারাজ হইবেন না। বিবে-চনাধীন আমার গল্পটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্যও এক হিসাবে এই ত্রুটিটুকুর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। আমার এই না-

পড়ার অপরাধ যে শুধু 'বামুনের মেয়ে' সম্পর্কেই তাহা নয়, অনেক ভাল ভাল বই সম্বন্ধে কথা হইলে আমায় হাঁ করিয়া থাকিতে হয়।

কিন্তু একথা এখানে বাড়াইয়া ফল নাই। শরৎবাবুর মত লেখকের সহিত খানিকটা ভাবসাম্য আসিয়া পড়ার দরুণ আমাদের মত লেখকদের শঙ্কা ও বেদনার কথা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইতে হইবে না ; কিন্তু এক্ষেত্রে এটা একেবারেই আকস্মিক। শেষের এই কথাটুকু জোর করিয়া বলা ভিন্ন গল্পের ছাপা-না-ছাপা সম্বন্ধে আর কি মত দিতে পারি বলুন ? তবে একটা কথা ঠিক যে সমতা যা-কিছু এক হিসাবে ঐ হোমিওপ্যাথি লইয়া আর তাহাও আমার খুড়ার চরিত্রের মধ্যে predominant trait নয়। খুড়ার চরিত্রের মূল কথা তাঁহার অসন্তোষ—দুনিয়ার সুখ দুঃখ সব কিছুর উপর সমানে নাক সিঁটকাইয়া থাকা আর প্রিয় মুখুজ্জে ('বামুনের মেয়ে'র) হোমিওপ্যাথি-আবিষ্ট একটি নিরীহ প্রাণী। দু'টি চরিত্রের bias একেবারে দু'রকমের।

খুড়ী-জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিস্তর তফাৎ। জগদ্ধাত্রীকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের একটি অমোঘ product করিয়া শরৎবাবু সৃষ্টি করিয়াছেন—যুগযুগাগত আচারসমষ্টির slave—তাঁহার সামনে স্বামী নাই, শাশুড়ী নাই, কন্যা নাই—একটি নীরস বজ্রকঠিন নারীমূর্ত্তি!

'খুড়ী'র পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ পৃথক। খুড়ী আচারনিষ্ঠাবতী কিনা সে-কথাই আসে না, খুড়োকে লইয়াই তাঁহার প্রাণান্ত। এর মধ্যে বাহিরের কঠিনতার অন্তরালে স্বামীর প্রতি আন্তরিক টানের একটা গূঢ়সূত্র বরাবর বর্ত্তমান। সাবিত্রীর ব্রতটা তাঁহার নিচক ব্রত নিষ্ঠা দেখানর জন্য আমি মোটেই অবতারণা করি নাই। আমার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—এক, বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে তাঁর অন্তঃসলিলা স্বামীভক্তি আর দ্বিতীয়তঃ এইটিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে তীব্রতা আন

মোট কথা, যেটা লইয়া শরৎ বাবুর সঙ্গে মিল সেটা নেহাৎ accidental. সেটা খানিকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ শুদ্ধ এই যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মধ্যেই বেশ খানিকটা humourএর খোরাক মজুৎ আছে—যেই এটা স্পর্শ করিবে সেই অনেকটা মালমসলা টানিয়া বাহির করিবে।

লেখকদের নিজস্ব খানিকটা দুরদৃষ্ট আছে। আমার গল্পটির মধ্যে রাজশেখর বাবুর চিকিৎসা-বিভ্রাটের খানিকটা সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে নাকি ? অথচ খুড়ার ব্যাপারটি আমার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে নোট করা।...আরও এক রকমের দৈব পরিহাস আছে,—আমার একটা গল্প লেখা পড়িয়া আছে—যা প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শেষ করিয়াছি। কিন্তু আমি বর্ত্তমানে যে-অবস্থার মধ্যে আছি তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে গল্পটি একদিক দিয়া এতটা মিলিয়া গিয়াছে যে গল্পটি প্রকাশিত হইলে আমায় অন্ততঃ এখানে বেশ খানিকটা অপযশের ভাগী হইতে হইবে।

আপনাকে বেশী রকম বিরক্ত করিলাম। গল্প ছাপার সম্বন্ধে আমার মত যখন অনুগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসাই করিয়াছেন তো আমি তো ছাপিতেই বলি,—এই জানিয়া যে জিনিসটি একেবারে খাঁটিভাবেই আমার নিজের জিনিস—সেই জন্যই এর এ-ভাবে প্রত্যাখ্যান আমায় বিঁধিবে। এ-সম্পর্কে তুলসীদাসের একটা দোঁহা মনে পড়িয়া গেল—আপনাকে শুনাই—

শুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহে রঘুনাথ
হানি-লাভ, জীবন-মরণ, যশ-অপযশ বিধি-হাত।

—ঠিক নয় কি ? না হইলে এসব coincidence আসে কোথা হইতে ? তবুও আমার পাঠকের হাত দিয়া বিধাতা আমার জন্য কি পরিবেশন করেন দেখাই যাক্‌ না। ইতি।

রঘুনাথ ও রঘুনন্দন

[শ্রীকালিদাস রায়]

একজন নৈয়ায়িক—তা আবার রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় নৈয়ায়িক, কেবল মাত্র আপ্ত বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধকে যে নতমস্তকে মানিতে পারেন নাই তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। রঘুনাথ কি কি কারণে রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধ মানিতে পারেন নাই—তাহা জানি না। তবে অভ্রান্ত যুক্তি ছাড়া যাঁহার কিছু মানা স্বাভাবিক নয়, তিনি যে ন্যায়ের কষ্টি-পাথরে স্মৃতির প্রত্যেক অনুশাসনটি পরীক্ষা করিয়া লইতে চাহিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

স্মৃতিশাস্ত্র আর্ষ বিধির দোহাই দিয়া সামাজিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য অসংখ্য অনুশাসন নির্দ্দেশ করিয়াছে।—কেন করিতে হইবে—করিলে সত্য সত্যই কি কল্যাণ হইবে—সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ শাস্ত্র নীরব। মানুষের মধ্যে সকলেই কিছু মেষধর্ম্মী নয়—গড্ডালিকা-প্রবাহে সকলেই চলিতে চাহে না—আর্ষবাক্যে বা আপ্তবাক্যে সকলের সমান বিশ্বাস নাই—থাকিতেও পারে না। মানুষ সকল বিষয়ে হেতু চায়—সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য খুঁজে—সকল বাক্যে যুক্তি খোঁজে—ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ইহাই জীবজগতে মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী দিয়াছে। তাই সে ভগবানের অস্তিত্বসম্বন্ধেও সন্দেহ করিয়াছে—ভগবানের অস্তিত্বপ্রমাণের জন্য আস্তিক মনীষিগণকে বিরাট ন্যায়শাস্ত্রটাই রচনা করিতে হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ নাস্তিকগণকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বরং নাস্তিকেরাই তাঁহাদিগকে রীতিমত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। নাস্তিকদের জন্যই তাঁহাদিগকে জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধনাকে নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল।

মানব-চিত্তের এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ইহাকে বিসর্জ্জন দিয়া অথবা ব্যবহার না করিয়া মানুষ মেষত্ব পাউক—ইহাই কি শাস্ত্রকারদের ইচ্ছা? অনুশাসনের হেতু যে জিজ্ঞাসা করে না—নির্বিচারে সকল অনুশাসনকে আপ্তবাক্য বা আর্ষবাক্য বলিয়া মানিয়া চলে—তাহাকেও হেতু দেখাইয়া সজ্ঞানে অনুশাসন পালন করিতে দেওয়া উচিত। তাহা না করিলেও, না বুঝিয়া চিকিৎসকের নির্দেশপালনের মত তাহার কল্যাণ হয় ত' প্রতিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্বের ঘোরতর অবমাননা করা হয়। এখানে কথা হইতে পারে যে হেতু বুঝিবার যে ব্যক্তি অধিকারী নয়—সে ব্যক্তি হেতুও খোঁজে না—নির্ব্বিচারে মহাজন-বাক্য পালন করিয়া যায়—তাহার বুদ্ধিভেদ না ঘটানই উচিত। এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু হেতু যাহারা খুঁজে—হেতু না জানিলে যাহাদের অনুশাসন পালন করিতে আগ্রহ বা বাসনা জন্মে না—অনুশাসন পালন করিলেও যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে মন দিয়া পালন করে না—না করিলে মিছামিছি সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তি হইবে বলিয়া চুপ করিয়া থাকে কিন্তু মনে মনে সত্যদেবতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে,—তাহারা ত' হেতু বুঝিবার অধিকারী সজ্ঞানে আপন কল্যাণ সাধন করিতে আগ্রহান্বিত। তাহাদের এই তৃষ্ণা নিবৃত্ত না হইলে সমস্তই যে পণ্ড হইয়া যাইবে। তাহারা হেতু জানিলে প্রাণমন দিয়া অনুশাসন পালন করিবে—না জানিলে বিদ্রোহী হইয়া হেতুহীন কল্যাণকেও অস্বীকার করিবে। মানুষের সত্যের পিপাসা যে-সভ্যতা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে না সে সভ্যতা অসম্পূর্ণ।

কিন্তু এই হেতু তাহাদিগকে কে বলিয়া দিবে? সমগ্র হিন্দু সমাজকেই বর্ব্বর ও অনধিকারী মনে করিয়াই যেন স্মৃতিকার অনুশাসন দিয়াছেন—যুক্তি দেন নাই। বোধ হয় ভাবেনও নাই কখনও কেহ হেতু জিজ্ঞাসা করিবে। এত সাহস কাহারও কি হইবে? হয়ত' স্মৃতিকার যে কারণে বা যে উদ্দেশ্যে বিধি দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলাই চলে না—অর্থাৎ তাহা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত,—নয় ত' তাঁহার প্রচ্ছন্ন হেতুগুলি কেবল তাঁহার সময়েরই উপযোগী ছিল—অর্থাৎ হেতু বলিয়া না দিলেও লোকে স্বভাবতঃই হেতুটা বুঝিত। তবু বিধানের সঙ্গে হেতুটাও দেওয়া থাকিলে বুঝা যাইত—ঐ হেতুটা এখনকারও উপযোগী কিনা। কিন্তু স্মার্ত্ত শাসকগণ তাহার উপায় রাখেন নাই। বিধানই প্রচার করিয়াছেন, নিদান

থাকিয়া গেল মনে মনে! বিধানই চলিতে লাগিল—কেন চলিতেছে বা কেন অনুসরণ করিতে হইবে তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলনা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল—সে পরম ভাগবত হইয়াও হইল নাস্তিক,—পরম সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী হইয়াও হইল অহিন্দু।

পাছে কেহ অনুশাসনের মূলে যুক্তি, হেতু বা উদ্দেশ্য সন্ধান করে—এবং সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া অবাধ্য হইয়া পড়ে—সেই ভয়ে সামাজিক শাসনের দ্বারা তথা-কথিত বিদ্রোহীকে দমনবিধিও স্মৃতিশাস্ত্রে আছে।—কিন্তু তাহার বুদ্ধি মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে কোন বাধ্যতাইত' সত্য হইয়া উঠে না। এই অসত্য ভিতরে ভিতরে জমিতে থাকিলে, তাহার যে কি বিষময় ফল তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই আমাদের দেশের সামাজিক জীবনে দেখিতেছেন। নৈয়ায়িক যুক্তি দ্বারাই মানুষের মনোবুদ্ধিকে বাধ্য করা যায়—আর এক অলৌকিক শক্তির বিকাশে মানুষের মনোবুদ্ধিকে মুহ্যমান করা চলে।

অতীত যুগের অধিকাংশ লোকই হয়ত সুশীল সুবোধ বশম্বদ মতিগতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিত। বিদ্রোহভাব কাহারও মনে জাগিলে তাহাকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য বাহুশক্তিরও হয়ত অভাব হইত না। কিন্তু এখন মানুষের মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এখন অধিকাংশ মানুষ অল্পবিস্তর নৈয়ায়িক মন লইয়াই জন্মায়—সকল বিষয়েই জিজ্ঞাসা করে—'কেন করিব?' ঋষিই হউক—রাজাই হউক—স্মৃতিকারই হউক—সমাজপতিই হউক—বৈদ্যই হউক—পঞ্জিকাকারই হউক—সকলের অনুশাসনেই তাহারা হেতু সন্ধান করে। এই সকল মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল বলো,—বিদ্রোহী বলো,—ধর্ম্মহীন বলো,—মূঢ় বলো,—তবু তাহারা সত্যই মানুষ—মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশেষ তাহাদের মধ্যে প্রবল—তাহাদের লইয়াই সংসার করিতে হইবে। তাহারা যুক্তি ছাড়া, সঙ্গত হেতু ছাড়া রাজারও অনুশাসন মানে না—চিকিৎসকের বিধানও অনুসরণ করে না। তাহাদের বুলি—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য-বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বিচার সম্বন্ধেই এই কথা—আচার সম্বন্ধে তো কথাই নাই।

লোকে এখন অতিমাত্রায় নির্ভীক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র স্বর্গের প্রলোভনে আর নরকের ভয়ে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায় না। কল্যাণ কে চাহে না? এ যুগের লোকেরাও কল্যাণ চাহে। প্রকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাহারা কল্যাণকে প্রত্যাখ্যান করিবে—এমন তো মনে হয় না। অজ্ঞানে বিধিনির্দ্দেশ পালন করিলেও কল্যাণ হয়—চিকিৎসকের বিধানের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সত্যের সহিত শিবের যোগ সাধন হয় না। এ যুগের মানুষ শিবের সহিত সত্যের যোগসাধন চায়।

এ যুগের লোক আর একটি সমস্যার সমাধান চায়। শাস্ত্রবিধির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা মিলাইতে গিয়া মহা গোলমালে পড়িয়া যায়। জীবনযাত্রা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কল্যাণের আদর্শ—ধর্ম্মের আদর্শ—সত্যের আদর্শ সবই যুগোপযোগী হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি অতীত যুগেরই উপযোগী। বর্ত্তমান যুগোপযোগী ও বর্ত্তমান যুগের মানুষের জীবনযাত্রার উপযোগী করিয়া শাস্ত্র পুনর্লিখিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। লোকে কি করে? অনাচারী বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিলেই ত চলে না। তাহাদের পক্ষ হইতেও ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। বহুলোক স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়,—শাস্ত্রবিধিকে মনে মনে মানিতে না পারিলেও পারিবারিক বা সামাজিক অশান্তির ভয়ে গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া দেয়। তাহাদের বাহ্যাচারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। তাহাদের মনের খবর নেওয়া উচিত—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের মতিগতির সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রবিধিপালনের সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত।

অতীত যুগে মহাপুরুষ ও সমাজকল্যাণব্রতী জ্ঞানী লোকের জন্ম হইত—এখন আর হয় না, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আমরা স্বীকার না করিলেই বা চিনিতে না পারিলেই তাঁহারা সংস্কারক নহেন, মহাপুরুষ নহেন—এরূপ ধারণা করা ভুল। এ যুগের লোক একবারে উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী, অবাধ্য, ধর্ম্মজ্ঞানহীন তাহাই বা কিরূপে বলি? বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহাদিগকে মানিয়া তো তাহারা চলে। সকল যুগের মানুষই তো সকল দেশে তাহাই করিয়াছে।

সকল যুগেই সকল দেশেই রঘুনাথের সহিত রঘুনন্দনের মিলন না ঘটিলে সমাজ-শৃঙ্খলা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শাস্ত্র-বিধির সহিত নৈয়ায়িক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিলে আজি হউক কালি হউক বিশৃঙ্খলা ঘটিবেই। রঘুনাথের সহিত রঘুনন্দনের মিলনে যদি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি হয়—তবে তাঁহারাই মননশীল মানুষের অনুসরণীয় হইয়া উঠিবেন। উপায় কি?

সোণার তাল

[শ্রীভূদেবচন্দ্র শোভাকর]

"কম খাজানাতে চষে' আমি খাই
তোমাদেরি দেওয়া জমি,
তাও পুরা কড়ি চাহ না রে ভাই
হ'লে ফসলের কমি ;
গোলা হ'তে ধান দাও করি' বা'র
নাই তার বাড়িদেড়ি
ছেলেপিলে নিয়ে বহু পরিবার
খেয়েছি তোমার ঢেরই,
জাতে চাষা বটে, এ গ্রামখানির
তুমিই ত' জমিদার ;
তুমি ধনী, আমি গরীব ব'লে ত'
করনি বাচ-বিচার,
দু'টি সংসার থাকি গলাগলি
নাইক' 'রায়ত-রাজা'
অমন কথাটি আজ কেন বলি
কর এ দীনের সাজা ?
এ সোণার তাল তোমারি জমিতে
আমার লাঙল-ফালে
উঠেছে যখন, হবে ভাই নিতে,
উঠেছে তোমারই ভালে।
আমি খাজনায় জমি চ'ষে খাই
ফসলেরি অধিকারী
তায় যদি ওঠে সোণা ওরে ভাই
আমি কি তা' নিতে পারি ?
যে বার আবাদে সোণা ফ'লে যায়
তুমি ত' আস না নিতে
দু'গুণ খাজনা চাহ না ত' তায়,
আমিও যাই না দিতে।
ছেলেপিলে নিয়ে সুখে দুখে ঘর
করি সে তোমারি দয়া
ফেলোনা আমাকে পাপের ভিতর
বাধিয়ে সোণার মায়া।"
জমিদার কয়, "তাও নাকি হয় ?
আমার হক্‌টা কোথা ?
তুমি পেলে সোণা তোমার হবে না
এ যে বড় বাঁকা কথা !
পৈতৃক জমি পাইয়াছি আমি
তুমি মৌরশীদার
সন সন যাবে খাজনাটি টানি'
ঐটুকু যা আমার,
পিতা পিতামহ সোণা পুঁতে রাখি'
যেতেন যদি বা ব'লে
তোমাকে তা হ'লে আপনিই ডাকি
নিতাম খুঁড়িয়া তুলে,
খাসের জমিতে ওঠে যদি সোণা
কৃষাণ মুনিষে তোলে
ছেড়ে দেবো ভাই ভুলেও ভেবো না
গরীবে তুলেছে ব'লে,
এসব হ'ল যে আইনের কথা
অত সোজাসুজি নয়
সাদাসিদে লোক ঘামায়োনা মাথা
যা বলি শুনিতে হয়,
হরিনাম ছাড়া দু'টি বেলা ভাই,
পেটে দাওনাক' জল
তোমার দুঃখ ঘোচালেন হরি
পাতি' এই এক কল !

যাহোক্ এ যদি মোর ধনই হয়,
দান আমি করিলাম—”
—শুনি' কয় চাষী কাণে দিয়া হাত,
“সে কি কথা ? 'রাম' 'রাম',
দান কি ? এ ধনে আমার মতন
একশো গরীবে কিনে
পালিতে পারিবে, এমন যে ধন
তা' কি সাজে এই দীনে ?
বড়'র বোঝা যে ভগবান ব'ন
আমি বল কোন্ ছার
কাঁধে ক'রে ব'য়ে এনে ছি না হয়
মজুরীটা দাও তার।”
জমিদার কয়, “বৃথা কথা আর
এর মীমাংসা আজ
হবে না, দু'জনে যদি না বিচার
ক'রে দেন মহারাজ—”

* * * *

রাজ-সভাতলে বলে সভাসদ্
শুনি' দু'জনার ভাষা,
'সাধু জমিদার, সাধু রে রায়ত,
'চাষা' নয় তোরা 'ভূষা'—
ভূপতির ভূষা তোরা দুইজন ;
হাসি' ক'ন মহারাজ,
'সোণা-তাল বহি' পেয়েছ বেদন !
থাক রাজপুরে আজ,
কাল সভাতলে করিব বিচার,
সোণা দাও রাজকোষে,—”
—শুনি' দু'জনের নামি' গেল ভার
যেন পাপ গেল খ'সে।

* * * *

পরদিন দেখে সচকিতে অতি
রাজসভা আলো-করা
রাধাকিশোরের যুগল মূরতি
কাঁচা সোণা দিয়ে গড়া।
মহারাজ আসি' ডাকি' দু' সখার
আদরে দু'হাত ধরি'
এক কড়ি দিয়া বলেন, বিচার
ওই রাখিয়াছি করি',
দু' জনেই হ'ন্ ওজনে সমান
যে যাহার বাছি' লও,
সাতটি মৌজা সহিত দিলাম
সেবায়েৎ হ'য়ে রও।

অন্তরাগ

[উপেন মৈত্রেয়]

দিনমান কাছে ছিল
আসিতেছে রাতি,
এ সময়ে চ'লে গেল
কোথা চিরসাথী !

থেকে-থেকে সাড়া ছায়
বলে আমি আছি,
নিশার মিলন-তরে,
শয্যা রচিয়াছি।

অবশেষে পুছিলাম,
আছ কোন্ ঘরে ?

* * *

ওপারের সুরে কয়
তোমারি অন্তরে।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১৬

একেবারে নীচেই যে কেহ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে প্রদীপ তাহা ভাবে নাই। তাই বসিবার ঘরে অবনী বাবুকে খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া শচীপ্রসাদ ধীরে ধীরে টেবিল বাজাইতেছে।

নিজের ঠোঁটের উপর তর্জ্জনীটা চাপিয়া ধরিয়া সঙ্কেত করিলে শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই ক্ষান্ত হইবে না; বরং ডাকাতি করিতে আসিয়াছে সন্দেহ করিয়া এমন ভাবে চেঁচাইয়া উঠিবে যে অবনী বাবু তাঁহার তন্ময়তা ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রদীপের জামার গলাটা চাপিয়া ধরিবেন। কিন্তু উপরে গিয়া নমিতার সঙ্গে তাহার দেখা না করিলেই নয়—দেখা তাহাকে করিতেই হইবে। চুরি করিয়া আসিতে তাহার লজ্জা ছিল না, কিন্তু গভীর রাত্রিতে আসিলে দরজা সে খোলা পাইত না নিশ্চয়ই—পাঁচিল ডিঙাইয়া সে তাহার সাহসকে দুর্দ্ধর্ষ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ করিতে চায় না। বেশ ত, অবনী বাবু জানুন, ক্ষতি নাই! নমিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে বোঝা-পড়া করিবেই। কোন বাধাই আজ আর যথেষ্ট নয়। পকেটে সে অস্ত্র নিয়া আসিয়াছে।

শচীপ্রসাদই আগে কথা কহিল,—কি মনে করে'?

অবনী বাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন। সাম্‌নেই প্রদীপকে দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও কুটিল হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বাঁকাইয়া তিনি তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন—সমস্ত অবয়বে স্বাভাবিক ভদ্রতার লেশমাত্র লালিত্যও তাঁহার চোখে পড়িল না। শীর্ণ কঠোর দেহটায় যেন একটা নিষ্ঠুর রুক্ষতা গাঢ় হইয়া আছে—কোথাও এতটুকু বিনয়নম্র কোমলতা নাই। চোখ দুইটা রাঙা, কপালের রেখায় কুটিল একটা ষড়যন্ত্র, সমস্ত মুখের ভাবে গূঢ় একটা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা! চেহারাটা অবনী বাবুর একটুও ভাল লাগিল না। অমন একটা দৃঢ় স্থিরসঙ্কল্প মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কহিলেন,—অনেক দিন পরে যে! এখানে?

শেষের প্রশ্নটার হয় ত' এই-ই অর্থ ছিল যে, সেদিন অমন অপমানিত হইবার পর আবার কোন্ প্রয়োজনে মুখ দেখাইতেছ? প্রদীপ ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া একটু হাসিল,—সে-হাসি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। সে-সঙ্কেতকে স্পষ্ট করিবার জন্য কথা বলিতে হয় না।

প্রদীপ একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। অবনী বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—ও-দিকে কোথায় যাচ্ছ?

প্রদীপ স্পষ্ট সংযত স্বরে কহিল,—নমিতার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

ইলেকট্রিক শক্ পাইয়া অবনী বাবু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন: নমিতার সঙ্গে দরকার?—তার মানে?

প্রদীপ কহিল,—মানে বলতে গিয়ে আমি অকারণে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার কাজ আছে। ভীষণ দরকার! আমাকে যেতেই হবে ওপরে।

অবনী বাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া প্রদীপের পথরোধ করিলেন; শচীপ্রসাদও তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনী বাবু তাঁহার দুই বলিষ্ঠ হাতে প্রদীপের কাঁধ দুইটায় ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন,—জান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি? তোমার এ-বেয়াদবিকে আমরা সহ্য করবো না, জান?

এই সামান্য দৈহিক অত্যাচারে প্রদীপ ধৈর্য্য হারাইল না। এত অনায়াসে তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দিতে নাই। সে বিদ্রোহী বটে, কিন্তু কৌশলীও। তাই সে স্বচ্ছ অথচ উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কহিল,—সব জানি। কিন্তু তবু আমার দেখা না করলেই নয়।

শচীপ্রসাদ বর্ব্বরের মত খেঁকাইয়া উঠিল : এ তোমার কোন্ দেশী ভদ্রতা ?

প্রদীপের মুখে সেই হাসি : আমরা যে-দেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, সেই দেশের। আপনি তা বুঝ্বেন না।

পরে কাঁধের উপর অবনী বাবুর আঙুলগুলিতে একটু চাপ দিয়া সে কহিল,—ছাড়ুন, আমার সত্যিই দেরি করবার সময় নেই।

অবনী বাবু বজ্রের মত হাঁকিয়া উঠিলেন : না।

বলিয়া বাঘের থাবার মত দুই হাতে জোর করিয়া তাহাকে সামনের সোফাটার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রদীপ নেহাৎই মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে বিনা প্রতিরোধে সোফার উপরে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অবনী বাবু তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন,—নমিতার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

প্রদীপ কহিল,—সে-কথা আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করিতে আসিনি। সেটা গোপনীয়।

—গোপনীয়। তোমার এতদূর আস্পর্দ্ধা ? একজন অন্তঃপুরিকা হিন্দু কুল-বধূর সঙ্গে তোমার কী দরকার হ'তে পারে ?

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—অন্তঃপুরিকা হিন্দুকুলবধূ ব'লেই বেশি দরকার। সে ত' আর বাইরে বেরয় না যে তাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করব। সে নেহাৎ বন্দিনী, তাই দরকারী কথা সেরে নেবার জন্যে আমাকে এখানে আস্তে হয়েছে। এখানে ছাড়া আর ত' তার দেখা পাওয়া যাবে না।

অবনী বাবু বাহিরের দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিলেন,—তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবে কি না বল।

মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরম উদাসীনের মত প্রদীপ বলিল,—যেতে বল্লেই সহজে চ'লে যাওয়া যায় না। ওপরে যাবার যেমন বাধা আছে, তেমনি বাইরেও।

অবনী বাবু আরো রুখিয়া উঠিলেন : না। তুমি যাবে বেরিয়ে। এক্ষুনি।

তেমনি নির্ব্বিকার শান্তস্বরে প্রদীপ বলিল,—এক কথা কত বার ক'রে বলব। আরো স্পষ্ট উত্তর চান্ নাকি ? আমি যাব না, অর্থাৎ নমিতার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। যদি বাধা পাই, সে-বাধা স্বীকার ক'রে রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। বেশ ত', তাকেই এখানে ডাকুন। কিম্বা যদি চান্, তাকে রাস্তায়ও বার ক'রে দিতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

অবনী বাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন : জান, তোমাকে এক্ষুনি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি ?

—জানি বৈকি। কিন্তু দয়া করে' ওটি করবেন না। সামান্য নারী-হরণের অভিযোগে পুলিশের হাতে আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছে নেই। কিন্তু বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা ক'রে লাভ কি ? যদি বলেন, আমি-ই না-হয় এখানে নমিতাকে ডাকি। বলিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া গলা চড়াইল : নমিতা। নমিতা।

অবনী বাবু কহিলেন,—তুমি যাও ত', শচীপ্রসাদ। শিগ্গির। মোড়ের থেকে একটা পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে এস ত'।

শচীপ্রসাদ বুক ফুলাইয়া সেনাপতির ভঙ্গীতে তর্জ্জনী হেলাইয়া কহিল,—যান্ শিগ্গির এখান থেকে। নইলে আপনার মত দু'-দশটাকে আমি ঘুষি মেরে সমান করে' দিতে পারি।

একটা হাই তুলিয়া প্রদীপ কহিল,—আর সমান করে' কাজ নেই, ভাই। মোড়ের থেকে পাহারওয়ালা ধরে' নিয়ে এস গে। (অবনী বাবুর প্রতি) আপনাদের বাড়িতে ত' ফোন্ আছে। থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিন্ না। লরি বোঝাই সেপাই এসে যাবে'খন। আমার পালাবার আর পথ থাকবে না। ততক্ষণে নমিতার সঙ্গে দরকারী কথাটা ধীরে সুস্থে সেরে নেওয়া যাবে। আড়মোড়া ভাঙিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল,—কাল সারা রাত্রি আর ঘুম হয় নি। নমিতার অধঃপতনে সমস্ত আকাশ মাটিতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে।

অবনী বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন : কি, কি ? নমিতার কি হয়েছে বল্লে ?

—পাহারওয়ালা আগে ডাকুন। বলছি।

শচীপ্রসাদ দিব্যি একটি ঘুসি পাকাইয়া প্রদীপের মুখের কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল,—আবার কথা কইবে ত' বত্রিশটা দাঁত গুঁড়ো করে' ফেল্‌ব।

প্রদীপ ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই করিতে পারিত হয় ত'। কিন্তু শচীপ্রসাদের উদ্ধত ঘুসিকে স্বচ্ছন্দে এড়াইয়া আবার সোফাটায় আসিয়া নির্লিপ্তের মত বসিয়া পড়িল। বলিল,—বেশ, আপনাদের সঙ্গে কথা আমি না-ই বা কইলাম। অধিক বীরত্ব প্রকাশ করলে আমি যে গান্ধি হয়ে বসে' থাক্‌ব এটা আশা করবেন না। তার চেয়ে থানায় একটা খবর দিন্। দাঁত গুঁড়ো করে' লাভ নেই, বাজারে কিন্‌তে পাব, বুঝলেন ?

অবনী বাবু সেই হইতে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি কহিলেন,—তুমি ত' ভদ্রলোক, কিন্তু অপমানবোধ বলে' কিছুই তোমার নেই নাকি ?

—আমরা আজো ততটা মহৎ হ'তে শিখিনি। অপমানিত হ'য়ে পিঠ দেখানোটাই অপমান, অপমানকে শাসন করাটাই আমাদের ধর্ম্ম।

অবনী বাবু কহিলেন,—আচ্ছা, দাঁড়াও। তা হ'লে শচীপ্রসাদ, ডাক ত' চাকর দু'টোকে।

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—কেন, পাহারওয়ালা কি হ'ল ? দেরি হ'য়ে যাবে বুঝি ? বাঃ, আমি ত' আর পালাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ডাকুন। ক'টা চাকর ? দু'টো ? এই ছোট সংসারে দু'টো চাকর লাগে ?

—কিসের চাকর ? বলিয়া শচীপ্রসাদ বাঁ হাতের মুঠিতে প্রদীপের চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—তুমি উঠবে কি না বল; নইলে—

আবার সে ঘুসি তুলিল।

এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়া দ্রুতপদে উমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রদীপের কণ্ঠে নমিতার ডাক তাঁহার কানে গিয়াছিল বুঝি। কিন্তু ঘরে আসিয়া এমন একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সে নিমেষে কাঠ হইয়া গেল। শচীপ্রসাদ প্রদীপের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঘুসি মারিতে উদ্যত, মামা রাগে গম্ভীর, স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন—আর সোফায় বসিয়া উদাসীন প্রদীপ অলস স্বরে বলিতেছে: দাঁত ভাঙলে আবার দাঁত পাব, কিন্তু আপনার চশমার ওপর যদি একটা ঘুসি মারি, তবে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও চোখ আর ফিরে পাবেন না। হ্যাঁ, দাঁতের চেয়ে চোখটাই বেশি প্রয়োজনীয়। বেশ, ভালো হয়ে বস্‌ছি। মারুন্। বলিয়া সে দুই পাটি শক্ত পরিষ্কার দাঁত বাহির করিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কি এমন হইতে পারে যে শচীপ্রসাদ পর্য্যন্ত প্রদীপের মুখের উপর ঘুঁসি বাগাইয়াছে আর অবনী বাবু তাহারই প্রয়োগনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত্তমাত্র। উমা তাড়াতাড়ি প্রদীপের সামনে আসিয়া পড়িল। বলিল,—এ কী !

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—শচীপ্রসাদকে বিয়ে ক'রো না, উমা। দেখেছ, চুলের ঝুঁটি কেমন শক্ত করে' আঁকড়ে ধরেছে ! শিগগির ওর পেটে সুড়সুড়ি দাও। নইলে চুল ও কিছুতেই ছাড়বে না।

উমা শচীপ্রসাদের হাত ছাড়াইয়া নিয়া কহিল,—আপনার এ কী দুঃসাহস ! দীপ-দার গায়ে হাত তোলেন !

অবনী বাবু স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—তুই সব তাতে সর্দ্দারি করতে আসিস্ কেন ? যা ভেতরে। ঐ গোঁয়ার ইতরটাকে সায়েস্তা আমরা করবই।

বার-কতক ইতস্ততঃ চাহিয়া উমা কহিল,—কেন, কি হয়েছে ?

—সে অনেক কথা। প্রদীপ সোফাটায় উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল: বোস আমার পাশে। এবার শচীপ্রসাদ পাহারওয়ালা ডাকতে যাবেন। পাহারওয়ালা আসুক। সব শুন্‌তে পাবে।

সত্য সত্যই উমা প্রদীপের পাশে সোফায় বসিল। যেন ইহার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা করিবার ছিল না। এই সান্নিধ্যের মধ্যে কোথাও জড়তা নাই, না বা ম্লানিমা—যেন পরিচয়প্রকাশের সামান্য একটি প্রচলিত রীতিমাত্র। কিন্তু অবনী বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এইবার শাসনের অত্যাচারে উমাকেই নির্জ্জিত হইতে হইল। প্রদীপ কয়েক মিনিটের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক।

অবনী বাবু কহিলেন,—ওঠ্ এখান থেকে। এই বেহায়াটার পাশে বস্‌লি যে !

শচীপ্রসাদ বলিল,—ওর ছায়া মাড়ালেও অশুচি হ'তে হয়। ওঠ।

উমা বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বলিল,—কেন, কি হয়েছে? সেদিনো ত' বাস্-এ পাশাপাশি বসে' এলাম। অশুচি হ'ব? পরে গঙ্গাস্নান কর্‌ব'খন, শচী প্রসাদ বাবু।

—ফের মুখে-মুখে তর্ক? ওঠ বল্‌ছি। অবাধ্য কোথাকার! বলিয়া অবনী বাবু আগাইয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কী যে হইয়া গেল কেহই স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিল না।

—আপনারা খানিকক্ষণ তর্ক করুন, আমি এই ফাঁকে নমিতার সঙ্গে কথাটা সেরে আসি। বলিয়া পলক ফেলিতে না ফেলিতেই প্রদীপ ভিতরের খোলা অরক্ষিত দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া পার হইতে হইতে সে কহিল,—তাড়াতাড়ি পাহারওয়ালা ডেকে নিয়ে আসুন, শচীপ্রসাদ বাবু। আমি নমিতাকে লুট্ করে' নিয়ে যেতে এসেছি।—কথাটা এইবারে একেবারে উপর হইতে আসিল: লুণ্ঠনের সময়ে একটা সঙ্ঘর্ষ না বাধলে কোনোই মাধুর্য্য থাকে না।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই একেবারে হিম, নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। সচেতন হইয়া শচীপ্রসাদ পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইতেছিল, অবনী বাবু বাধা দিলেন: ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে তুমি একা পারবে না। তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হওয়াটা—ঠিক নয়।

শচীপ্রসাদ কহিল,—কিন্তু ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে unscathed ছেড়ে দেবেন নাকি?

অবনী বাবু একটু পাইচারি করিয়া কহিলেন,—দেখি।—ওরা ভীষণ বোম্বেটে, শচী। নিজের প্রাণের 'পরেও ওদের একবিন্দু মমতা নেই। ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তুমি যখন ওর চুল টেনে ধরেছিলে তখন ভয়ে জিভ আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছ্‌ল।

উমা কহিল,—আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে দীপ-দার চুলের বিনিময়ে মুণ্ডুটা আপনাকে দিতে হয় নি।

শচীপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া কহিল,—তবে ঘরে-বাইরে আপনি মুখ বুঁজে এ-সব ডাকাত বোম্বেটের অত্যাচার সইবেন নাকি? কিছুই এর বিহিত করবেন না? আইন-আদালত নেই?

—আছে। তবে যারা মুখের একটা কথায় বহু মুহূর্ত্তের প্রাণটাকে হাসিমুখে বলি দিতে পারে আইন তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। যত নষ্টের গোড়া ঐ বৌ-টা। তুই যা ত' উমা, বৌমার সঙ্গে ঐ হতচ্ছাড়াটার কি-না-কি দরকারী কথা আছে। ওকে বাড়ির বা'র করে' দে ত', লক্ষ্মী। বুঝলি, আমাদের ওপর যেন রাগ না করে। পরে আমি থানায় গিয়ে একটা ট্রেস্‌পাসের রিপোর্ট লিখিয়ে আস্‌ব।

উমা এইবার কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখিল প্রদীপ বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে উঁকি দিতেছে। উমা হাসিয়া কহিল,—এটা নিরিমিষ্যি রান্নার ঘর। দুপুর বারোটার আগে এর উনুনে আগুন দেওয়া হয় না। দেখছেন না বাইরে থেকে তালা-বন্ধ আছে?

প্রদীপ দেখিল। কহিল,—নমিতা তা হ'লে কোন ঘরে?

দক্ষিণের দিকে আঙুল দেখাইয়া উমা বলিল,—ঐ যে। আসুন আমার সঙ্গে। বৌদি এখন পুজোয় বসেছেন। পুজোয় বস্‌লে কারু সঙ্গে আবার কথা কন্ না। টুঁ-টি পর্য্যন্ত না। প্রায় দু' ঘণ্টা।

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—দু' ঘণ্টা! বল কি? আমি কি দু' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তার এই নির্লজ্জ মৌনব্রতের তারিফ করব নাকি? আমার দু' সেকেণ্ডও সইবে না। চল।

উমা অবাক হইয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের সেই সৌম্য উদার স্নিগ্ধতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, চক্ষু দুইটা অনিদ্রায় তপ্ত, শাণিত—সমস্ত দেহ ঘিরিয়া এমন একটা রুদ্র রুক্ষতা যে, উমার মনটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। প্রদীপ কহিল,—নীচে একবার যাবে, উমা? দেখ ত', ওরা সত্যি সত্যিই পাহারওয়ালা ডেকে আন্‌ল কিনা।

উমা বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিল। তাহার কথার সুরে সুগোপন একটি অভিমান: যাচ্ছি। কিন্তু বৌদি যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধ্যান ভাঙানো চলবে না, দীপ-দা। একদিন সামান্য একখানা চিঠি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম বলে' আমার অপ্রস্তুতের আর

শেষ রইলো না। বৌদি সারাদিন খেলেন না, চান্ করলেন না—সমস্তক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘর-দোর ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাঁর ওপর এখন আর উপদ্রব না-ই করলাম আমরা। চলুন আমার ঘরে, আমাকে র‍্যাপেল্ পড়াবেন। খানিক বাদে আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

নমিতার ঘরের সম্মুখে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো—নিঃশব্দ, নিশ্বাসহীন। প্রদীপ কহিল,—উপদ্রবই চাই, উমা। ভালবেসে নয়, উপদ্রব করে'ই জড় অচল প্রস্তরকে দ্রব করা চাই। তোমার সেদিনকার উপদ্রবে সে উপোস করেছে, আজকে না-হয় আত্মহত্যা করবে। তবু সে কিছু একটা করুক্।

বলিয়া উমার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রদীপ হাত দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধ্যানাসীনা তন্ময়ী নমিতা একবার চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চোখ মেলিল না—সুকুমার মুখের উপর কোথা হইতে একটা অসহিষ্ণু অথচ অটল দৃঢ়তার তেজ ফুটিয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া ফেলিয়া প্রদীপ এ কী দেখিতেছে! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে পাথর হইয়া রহিল। নমিতা সদ্য স্নান করিয়া পূজায় বসিয়াছে, সামনের দেয়ালে তাহার স্বামীর ফোটোটা হেলানো—চন্দনলিপ্ত, মাল্যবিভূষিত। বাঁ পাশে পিতলের পিলসুজে একটা প্রদীপ, ধূপতিতে ধূনা জ্বলিতেছে—সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুগভীর বৈরাগ্যের শীতল পবিত্রতা! নমিতার মাথায় ঘোমটা নাই, ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া মেঝেটা স্পর্শ করিয়াছে—গায়ে বাহুল্য বস্ত্র নাই, একখানি নরম গরদের থান্ শাড়ি অযত্নে ন্যস্ত হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গে পদ্মাভা, অমৃতগন্ধ! বসিবার সহিষ্ণু ভঙ্গিটিতে কি কঠোর সুষমা, অগ্নিশিখার মত শীর্ণ ও ঋজু শরীরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আকাশ-শ্রী! প্রদীপ যেন তাহার চর্ম্মচক্ষুতে পুরাণবর্ণিতা তপস্বিনী শকুন্তলাকে দেখিতেছে—আদিম কবিতায় যে-বিরহিণীর মূর্ত্তিকল্পনা হইয়াছিল, সেই শরীরী কল্পনা! তপস্যা-পরীক্ষিত প্রেম! এই মূর্ত্তিকে সে স্পর্শ করিবে

প্রদীপ কি করিয়া বসে তাহারই প্রতীক্ষায় উমা ঘামিয়া উঠিল। কানে-কানে বৌদিকে সংবাদটা দিবে কি-না তাহাই সে বিবেচনা করিতেছিল। ভাবিয়াছিল এমন একটা সমাহিত ধ্যানলীন আননাভাসের প্রভাবে সে তাহার সমস্ত বিদ্রোহভাব দমন করিয়া তাহারই ঘরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু, বৃথা। প্রদীপ নমিতার মাথায় একটা ঠেলা মারিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিল,—এ-সব কী করছ, নমিতা?

নমিতা জ্বালাময় চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। কিন্তু আজ আর সে এই অনধিকার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। উদ্যত শাসনের ফণা তুলিয়া সে কহিল,—আমার পূজোর ঘরে না বলে' কয়ে' জুতো-পায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন যে। ওঁকে কী বলে' তুমি এখানে নিয়ে এলে, ঠাকুর-ঝি! জান না, এটা আমার পূজোর সময়।

ফোটোটার সাম্‌নে নমিতা আবার একটা ঘট রাখিয়াছে, —তাহার উপর আম্রপল্লবটি পর্য্যন্ত অম্লান। কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি ঘটে নাই। প্রদীপ জুতা দিয়া সেই ঘটকে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া ফেলিল: কিসের তোমার পূজো? এই ভণ্ডামি তোমাকে শেখালে কে?

উমা ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল—জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়া গিয়াছে। নমিতা খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে প্রদীপের এই হিংস্র বীভৎস মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে চোখে সৌজন্যের স্বাভাবিক সঙ্কোচ নাই, উগ্রতেজ তাপসীর নির্দ্দয় নির্লজ্জতা! সহসা সে সমস্ত শূন্য বিদীর্ণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: কেন আপনি আমার ঘট ভাঙলেন? আপনার কী আস্পর্দ্ধা যে ভদ্র-মহিলার অন্তঃপুরে ঢুকে এই দস্যুতা করবেন? যাও ত' ঠাকুর-ঝি, বাবাকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস।

প্রদীপ হাসিয়া কহিল,—সে পার্টের মহলা নীচে একবার দিয়ে এসেছি। পুনরভিনয় হবে, হোক্। যাও উমা ডেকে আন। কিন্তু তোমার এই জঘন্য অধঃপতনের কারণ কি?

উমা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এক পাশে ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল বাহির হইয়া যাইতে, না বা আসিল একটি অস্পষ্ট প্রতিবাদ

—অধঃপতন? নমিতা আসন ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সুদূর তিমিরাকাশে নীহারিকার

দিগ্‌বর্ত্তিকার মত।—সে-কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে যাব কেন? কে আপনি?

—আমি? অশুদ্ধ ভাষায় তোমারই কথার পুনরুক্তি করি—আমি ডাকাত। দেশ স্বাধীন করবার ব্যবসা আমারও। কিন্তু দেশ অর্থ স্ত্রী-জাতি। তাদেরই স্বাধীন করব। এর চেয়ে স্পষ্টতর পরিচয় আমার নেই।

—কিন্তু আমার উপর এই উৎপাত করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?

—অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, নমিতা। তাও অধিকার করতে হয়।

—সে-অধিকার কেড়ে নেবার ক্ষমতা আপনার আজো হয় নি! কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করিয়া সে কহিল,—আমি আমি-ই। তার থেকে একচুল আমি ভ্রষ্ট হ'ব না।

প্রদীপ বিহ্বল হইয়া কহিল,—তোমাকে ধন্যবাদ নমিতা। কিন্তু তুমি সত্যিই তুমি নও। তুমি সংস্কার শাসিতা, অন্ধ প্রথার একটা প্রাণহীন স্তূপমাত্র। নইলে এই সব অপদার্থ উপচার নিয়ে দেবতার পূজো করতে বসেছ? বলিয়া উলটানো ঘটটাকে আবার একটা লাথি মারিয়া সে দূরে দেয়ালের গায়ে ছিট্‌কাইয়া মারিল।

নমিতা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অনুপায় মিনতিতে সে প্রার্থনা করিল,—দয়া করে' আপনি এ-ঘর থেকে চ'লে গেলে বাধিত হব। আমাকে অযথা পীড়া করে' লাভ নেই।

—আমি এ-ঘর থেকে চলে' যাবার জন্যে আসিনি। পীড়ন করে' লাভ নেই বটে, কিন্তু পীড়িত হওয়াতে লাভ আছে।

নমিতা আবার চেঁচাইয়া উঠিল: তুমি বাবাকে ডেকে নিয়ে এলে না, ঠাকুর-ঝি? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ অপমান সইবো নাকি?

উমা তবু নড়িল না। নমিতা সাময়িক বিমূঢ়তা বিসর্জ্জন দিয়া বলিয়া উঠিল: তবে আমিই যাচ্ছি নীচে।

নমিতা যখন দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রদীপ উৎক্ষণাৎ তাহার দুই বাহু বিস্তার করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—তুমি এই ব্যূহে প্রবেশ করবারই পথ জানতে, বেরোবার কৌশল এখনো শেখনি। দাঁড়াও।

বিদ্যুৎবিকাশের মত একটি ক্ষীণ মুহূর্ত্তে দুইজনের স্পর্শ ঘটিয়াছিল। নমিতা আহত হইয়া সরিয়া গেল। প্রদীপের মনে হইল সে যেন হাতের মুঠায় ক্ষণকালের জন্য আকাশ-ব্যাপিনী মৃত্যুকে ছুঁইতে পাইয়াছে। তাহার অমৃতস্বাদে সে স্নান করিয়া উঠিল।

নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবনী বাবুকে আর ডাকিয়া আনিতে হইল না। পেছনে শচীপ্রসাদও হাজির। দুয়ারের কাছে তাহাদের দেখা পাইতেই নমিতা কাঁদিয়া ফেলিল: দেখুন এসে, ইনি আমার পূজার ঘরে ঢুকে কী-সব উৎপাত সুরু করেছেন! আমার ঘট উলটে দিয়েছেন, আর মুখে যা আসে তাই বলে' আমাকে অপমান করছেন। আমি যত না বলছি—

—নিশ্চয়, নমিতা। এ তোমার অপমান নয়, আশীর্ব্বাণী! কিসের জন্য তোমার এই তুচ্ছ পূজা? এই মালা কার গলায় দিচ্ছ? বলিয়া সুধী-র ফোটোর গলায় ঝুলানো রাজগন্ধার মালাটা টানিয়া সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল: কিসের এই ধূপধুনো? দিনের বেলায় কেন আবার আলো জ্বেলেছ? আকাশে চেয়ে সূর্য্য দেখতে পাচ্ছ না? বলিয়া প্রদীপ লাথি মারিয়া মারিয়া পিলসুজ ধূপতি সব উল্‌টাইয়া দিতে লাগিল।

নমিতা রাগে অপমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার আর সহিল না; তাহার মুখ রক্তপ্রাচুর্য্যে একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মেঝে হইতে ঘটটা কুড়াইয়া আনিয়া প্রদীপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। হয় ত' সতী বলিয়াই তাহার সে-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না। প্রদীপের ডান ভুরুর উপরে কপাল কাটিয়া আনন্দাশ্রুর মত রক্ত ঝরিতে লাগিল।

প্রদীপ যেন এতক্ষণ ধরিয়া এই আঘাতটিকেই কামনা করিতেছিল। নমিতার পরিপূর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরেও এমন মাদকতা নাই। সে অন্তরের গভীর সুরে কহিল,—তোমাকে নমস্কার, নমিতা। কিন্তু তোমার এই তেজ এই

বিদ্রোহ সমস্ত পুরুষ জাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে, অভিমানী সমাজের বিরুদ্ধে। তোমার তেজের এই বলিষ্ঠ উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করুক্। আর পাহারাওয়ালা ডেকে কাজ নেই, শচীপ্রসাদ বাবু।

অবনীবাবু কহিলেন,— তোমার শাসন এখনো যথেষ্ট হয় নি! ভাল চাও ত' এখনো বিদায় হও বল্‌ছি।

—যাচ্ছি, কিন্তু অভিনয়ের শেষ অঙ্ক এখনো বাকি আছে।

—না, নেই। বলিয়া অবনীবাবু হঠাৎ তাহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন।

প্রদীপ সামান্য একটু হাসিল। বাহির হইতে তাহার বাঁ পকেটটা মুড়িয়া ধরিয়া সে কহিল,—চেয়ে দেখুন, পকেটে এটা আমার কী! আকার দেখে চিন্‌তে পারছেন ত'? কিন্তু জীবন বিপন্ন না হ'লে ওটা আমরা প্রয়োগ করি না। আমার জীবন এখনো বিপন্ন হয় নি। সামান্য ঘাড়-ধরা থেকে ছাড়া পাবার জন্য যুযুৎসুর সোজা প্যাঁচ্ আমার শেখা আছে। কিন্তু আপনি মাননীয় গুরুজন, আপনাকে ভূপতিত করে' অপদস্থ করলে আমার মন খুসি হবে না।

ভয়ে ভয়ে অবনীবাবু হাতের মুষ্টি শিথিল করিয়া দিলেন। শচীপ্রসাদ বলিয়া গেল: আমি দিচ্ছি ফোন্ করে'।

প্রদীপ শান্তস্বরে কহিল,—পুলিশ আসবার আগেই শেষ অঙ্ক শেষ করে' ফেলি নমিতা। তুমি প্রস্তুত হও। তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। আঘাতের পরিবর্তে স্নেহ দিতে হবে এ-শিক্ষা আমরা নতুন লাভ করেছি এ-যুগে। তোমাকে আমি ভালবাসি। কথাটার যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তার উচ্চারণেই আছে, অলস অনুভূতিতে তার প্রমাণ নেই। এ-ভালবাসা তোমাকে জ্যোৎস্নালোকে শোনাবার মত নয়, স্পষ্ট দিনের আলোয় সমস্ত সমাজের মুখের ওপর প্রখর ভাষায় বল্‌বার মত। তুমি ভারতবর্ষের প্রতিমা কি না জানি না, কিন্তু আমার আত্মার সহোদরা।

উমা দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছে। নমিতা তখনো ভয়ে উদ্বেগে থমথম করিতেছে—গায়ের বসন তাহার সুসন্নিবেশিত নাই, শ্বশুরকে দেখিয়াও সে মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল না,—সে হতচেতন, বিমূঢ়, স্পন্দহীন। প্রদীপকে তাহারই সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। এমন অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত্তে অবনী বাবু পর্য্যন্ত তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না।

—যে-রক্ত আমার গৌরবের চিহ্ন হ'ল তাই তোমার কলঙ্ক হোক, নমিতা। বলিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য প্রদীপ দুই বাহুর মধ্যে হঠাৎ নমিতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ঠিক চুম্বন করিল কি না বোঝা গেল না, আলিঙ্গনচ্যুতা হইয়া নমিতা সরিয়া গেলে দেখা গেল প্রদীপেরই কপালের রক্তে তাহার মুখ, বুক একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রাবল্য নমিতা আর সহিতে পারিল না, মুহ্যমান অবস্থায় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রদীপ দুয়ারের দিকে হটিয়া আসিয়া কহিল,—হয় ত' এ-জীবনে আর দেখা হবে না, নমিতা। কিন্তু সংসারে লক্ষ-কোটি কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকবার অবকাশে এটুকু শুধু মনে করে' সুখ পেয়ো যে তোমারই কলঙ্কের মূল্যে আরেকজন মহান্ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছে। বলিয়া আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না করিয়া সে ডান হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সিঁড়িতে যখন নামিয়াছে তখন উপর হইতে উমার কণ্ঠের ডাক শোনা গেল: দীপ-দা, দাঁড়াও, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ্ করে' দি।

প্রদীপ একবার উপরে চাহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিল না

(ক্রমশঃ)

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নব-নিযুক্ত অক্ষয়ের গাম্ভীর্য্য ও পারিষদসংখ্যা বাড়িয়াছে। যাত্রা-পার্টির অনুগতদের মধ্যে এত কালের প্রচ্ছন্ন দৈহিক শক্তি মহা বিক্রমে পুরাতন আক্রোশের লক্ষ্য-স্থল বেচারীদিগের উপর সময় সময় প্রকাশ পাইতেছে; তাহারা গ্রাম্য গগনে নব নব উজ্জ্বল গ্রহের ন্যায় প্রতিভাত। দারোগা বাবুর মনের ইতস্ততঃ ভাব এখন তিরোহিত; উপরওয়ালার সদযুক্তি নিশ্চয় আসিয়া থাকিবে, পাঠকের উৎসাহ বন্ধুসৌভাগ্যে কূল ছাপাইয়াছে।—স্বয়ং অক্ষয়েরও এখন একটা ঝোঁক আসিয়াছে হারাধনকে হাত করা, এই অস্ত্র ললিতের বিরুদ্ধে আমোঘ বলিয়াই তাহার বিবেচনা; এখন রাজুর ভাগ্যাকাশ অন্ধকার হইবেই। ধীরেন মণ্ডল লাটের খাজনা সহরে পঁহুছাইতে জেলায় গিয়াছে। ইষ্টার পরব সারিয়া তাহার ফিরিতেই যা বিলম্ব।—সে যেদিন গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল সেই দিনই ডায়েরী করান হইল—রীতিমত ডায়েরী, টাকা ও শিশুসহ আসামী নিরুদ্দেশ, এইরূপ নোট দিয়া দারোগাবাবু কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন—গ্রামেও রাষ্ট্র হইয়া গেল। ধীরেন রাজুর নামে নালিশ করিয়াছে, এখন পুলিশ তাহাকে পাইলেই গ্রেপ্তার করিবে। ধর্ম্মান্তরগ্রাহী ধীরেন এতদিন কেবল নিজেই সাধারণ নির্য্যাতনের লক্ষ্য ছিল, আজ তাহাকে নিজে অন্যকে এইরূপে পীড়ন করিতে দেখিয়া অনেকে উত্তেজিত হইবেই, যাহারা রাজুর পক্ষপাতী তাহারা নানারূপ সংকল্প আঁটিতে লাগিল।

পরের দিন ধীরেন একগাড়ী পাকা আম সহরে বিক্রীর জন্য পুত্রের সহিত পাঠাইবে স্থির করিয়া বাগ্দীপাড়ায় ঝুড়ি আনিতে গিয়াছিল—সুরো বাগ্দীর কাকা বয়সকালে তাহার বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—সে বাঁকা কোমর সোজা করিয়া বলিল, "মণ্ডলের পো, মেয়ের আর নাতনির রোজগারের টাকা নেহাৎ উদ্ধার করে' ছাড়বে?—বুড়ো বয়সে আর কষ্ট পেতে হবে না; পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে' খাবে।" আর একজন সায় দিয়া বলিল, "পাদ্রী সাহেব যেমন শিখিয়ে দেবে তেমনি তো করবে।" ধীরেন ঝুড়ি কেনা ভুলিয়া পাঠকের দোকানে সোজা গিয়া অভিযোগ জানাইল। পাঠক বুঝাইলেন, পাপের অর্থ গ্রহণ না করিলেই হইবে, তিনি সে টাকা কোন সৎকাজে লাগাইয়া দিবেন, ধীরেনকে স্পর্শও করিতে হইবে না; সে ছেলে চায় ছেলে লইবে, তবে উদ্ধার হইলে তখন পরামর্শের সময়। আর এই সময় যদি ধীরেন দিন কতকের জন্য সহর ঘুরিয়া আসে তাহা হইলে অনেক বৃথা কলহের দায় হইতে সে নিস্কৃতি পাইবে। মণ্ডল মনে ভাবিল; পাদ্রী সাহেব ইষ্টারের প্রার্থনার পর সমবেত সকলকে, অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করিতে বলিয়াছেন—এই টাকাটার সদ্গতি হইবে। ধীরেন আমের গাড়ী লইয়া নিজে সহরে চলিল।

সেই দিনই মাড়োয়াড়ী নৌকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছে। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই নৌকা কলিকাতা রওনা করিতে হইবে। গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, এই ভাবের নগদ মজুরী গ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্যে নহে। মাড়োয়াড়ীর সঙ্গে পাঠকের জ্যেষ্ঠ পুত্রও কলিকাতা যাইবে, মাড়োয়াড়ী সেইখানে টাকা দিলে, আবার দুইজনে ফিরিয়া বাকী দ্রব্য আর একবারে চালান লইয়া যাইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত স্থির হইলে পূর্ণ নৌকাগুলি রওনা হইয়া গেল; শ্রীনগরে আবার শীঘ্র আসিয়া বাকী অর্দ্ধেক লইয়া যাইবে। অক্ষয় পাঠকের এই সব ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ততার সময় প্রায় আসিয়া খোঁজ লইয়াছে। 'কাকা, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমায় বলবেন।' অক্ষয় এখন গ্রামের মধ্যে একজন যে-সে-লোক নয়।

আজকাল, ইস্কুল ঘরের রোয়াকে মাদুর পাতিয়া অক্ষয়ের নিত্য নৈশ দরবারের বৈঠক বসে। সমবেত বন্ধুবর্গ ও প্রার্থিজনের মধ্যে পাঠক একজন বিশিষ্ট সভাসদ। অন্য সভ্যেরা উপস্থিত নাই, পাঠক সেদিন নৌকা রপ্তানী দিয়া আরামের

নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। দোকানে যেন আর মন বসিতেছে না; দ্বিতীয় পুত্র তথায় প্রতিনিধি হইয়া আছে। হৃদয় দুয়ার বন্ধুর নিকট খুলিয়া গেল।

পাঠক বলিতেছিলেন—"বড় ভাল কাজ অক্ষয়, যদি আগে থেকে এই পথ ধরতে পেতাম, আজ আমায় পায় কে? হাজার দশেক টাকা আমি লাগিয়েছি, খরচ খরচা যা কিছু সব মাড়োয়াড়ী দেবে। আমার টাকার সুদ দেবে, এখানে আমার মেহনতানা সেও বেশ ভাল করেই ধরা হয়েছে। চাষাদের কাছ থেকে মেপে নেওয়া তাতেও আমার দু-পয়সা ঘরে আসবে; আবার এই টাকা এখানে না মিটিয়ে কলকাতায় মিটোবে বলে আমাকে আরও পঞ্চাশ টাকা কবুল করলে, নগেন টাকা বুঝে নিয়ে তবে মাল ছাড় দেবে। কলকাতার মাড়োয়াড়ীর কে মহাজন আছে; প্রথম বার কিনা সবাই এখন সাবধানে ভয়ে ভয়ে আছে। তবে নগেনের সঙ্গেই মাড়োয়াড়ী আসবে নাহ'লে ছেলে মানুষ একা, টাকা—তাও আবার কম্‌সম্ নয়। ছেলেটা কিন্তু চালাক হয়ে উঠবে; লেখাপড়া মোটে শিখতেই পারল না, তবে যা হক্ যদি দুপয়সা সংস্থান কর্ত্তে শেখে, সেইটাই আসল।"

অক্ষয়—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাণিজ্যে বসতি লক্ষী. বিস্তায়াং নৈব নৈবচ। আচ্ছা কাকা তোমার কত টাকা জমান আছে?

পাঠক সগর্ব্বে বলিলেন, "তোমায় বলতে দোষ নেই, এ ছাড়াও ধারধোর দেওয়া বাকী সাকীও দু' তিন হাজার হবে। তবে থাকলে কি হয়—একটা মনের মত জমাজমী কিছু নেই। যখনি একটা জোগাড় করে উঠি, অমনি তোমার কর্ত্তার লোক এসে বাগড়া দিয়ে আছেই—কেন, আমি কি টাঁকে করে জমি নিয়ে যাব কোথাও? তবে এখন একটু ভরসা হচ্ছে তোমার কল্যাণে।" কথা আর বলা হইল না, চাষাপাড়ার দিকে আগুন লাগিয়াছে। প্রথমেই একটা চীৎকার, তাহার অর্থ গ্রামবাসীদের নিকট সহজ সরল, তারপরই আকাশগাত্রে কালো ধূমপুঞ্জ. যেন কোনও দৈত্য যুগের আক্রোশ উদ্গার করিতেছে—তাহার পরই সেই দৈত্যের লেলিহান্ ঘোর রক্তবর্ণ জিহ্বা যেন আকাশকে অন্বেষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিতেছে—যাহারা বাড়ীর মধ্যে কর্ম্মক্ষম, তাহারা নিজেদের ঘড়াদড়ি ঠিক করিয়া নিজ নিজ পাড়ায় সমবেত হইয়া কূপের জলের গভীরতা সম্বন্ধে পাড়ার কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিল; আর অকেজো যাহারা, নিরপেক্ষ ভাবে দর্শকপর্য্যায়ভুক্ত যাহারা, তাহারাই চলিল আগুন দেখিতে, সঙ্গে গেল বালকদল। এমন একটা ঘটনা না দেখিলে হয়। এই অভিজ্ঞতা শ্রীনগরে নূতন নহে। পল্লী-গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের প্রশস্ত সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, এই সময় রবি ফসলের শেষ কাজটি সমাপন করিয়া চাষী বসিয়া থাকে অনিশ্চিত বর্ষার অপেক্ষায় - কখন 'জো' হইবে, তাহার পরিশ্রমের দৈনন্দিন পালা আবার আরম্ভ হইবে। কিন্তু এই বসিয়া থাকার মধ্যে, এই অনিশ্চিত বিশ্রামের মধ্যে তৃপ্তি নাই, কারণ ইহা বাধ্য হইয়া অনিশ্চিত সময়ের জন্য আবার শান্তিও নাই কারণ এই বিশ্রামে ক্ষতি—'এত গ্রাস ভাত কম' চাষী তাহা সহজেই ও সত্বরেই কল্পনা করিতে আরম্ভ করে, অনুভব ত' করেই—তাহার উপর আবার কর্ম্মা-ভাস্তের পক্ষে দীর্ঘ অলসতা; সময়ের যে ব্যবহারে তাহারা অভ্যস্ত, যাহার ব্যতিরেকে অন্য কোনও ব্যবহার উদ্ভাবনে একরূপ অক্ষম, সেই সুযোগ অপহরণে তাহাদের মেজাজ খিটখিটে হইয়া যায়; অল্পে তাহাদের মধ্যে কলহ বাধে; আবার কলহের পরিণামও বড় হিংস্রক নিষ্ঠুর, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন।

ধীরেন মণ্ডলের আটচালা, গোলাঘর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—নীলমণি বসু আড্ডা ত্যাগ করিয়া সশিষ্য আসিয়াছিলেন, চেরাগলায় তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "আরে মাগী বড় সাধ্বী ছিল—ধীরেন খেষ্টান হতে সেই যে বিছানা নিয়েছে, কেবল দিনরাত মাকে ডাকছে, মা অন্তিমে যেন স্থান পাই—আমায় যেন গোরে যেতে না হয় মা। তাই মা ভক্তবৎসল, দৈত্যদলনী একসঙ্গে দুই কাজই সেরে নিলেন —দেখ্ দেখ্।"

একজন শিষ্য প্রশ্ন করিল, "খুড়ো, দুই কাজ আবার কোথায়? আর কেউতো পোড়েনি, ধীরেনের বুড়ী ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে এসে ওই গাছতলায় বসে' আছে।"

নীলমণি (সহাস্যে)—আরে বুড়ী অন্তিমে চিতা পেলো এই এক কাজ, আর খেষ্টানরা দৈত্য ছাড়া আর কি?

তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া তো' মায়েরই কাজ; চণ্ডী পড়েছ ?"

অক্ষয় পাঠককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এ সেই রেজো গয়লার কাজ আর কারুর নয়।" অনেকেই এই অভিমত স্পষ্ট শুনিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

ধীরেন মণ্ডল সহরে গেলেই কাজকর্ম্ম সারিয়া উপরন্তু তিন চারিদিন না কাটাইয়া ফিরিত না। তাহার অশিক্ষিত মনের মধ্যে যে সব প্রশ্ন স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিত, পাদ্রী সাহেব ও দেশী পাদ্রীদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে সেইগুলির সমাধান করিয়া লইবার চেষ্টা করিত, ভাগ্যে ধীরেন অশিক্ষিত, নচেৎ তাহার এই অভ্যাসের ফলে দুই পক্ষেরই অশান্তি হইত।

পাদ্রীদের আলোচনার ও মীমাংসার সম্মোহন কাটাইয়া, ধীরেন গ্রামে ফিরিবার সময় একবার গাড়ী লইয়া ষ্টেশনের নিকট দাঁড়াইয়াছে। দুর্ব্বোধ্য ও দুরূহ বিষয়, ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটিই হউক অথবা বাস্তবই হউক, তাহার চিত্তের উপর স্থির ও নিত্য প্রভাবসম্পন্ন। ধীরেন দাঁড়াইয়া সদ্য আগত ট্রেণ দেখিতেছে—এমন সময়ে সহরের একজন পরিচিত গাড়োয়ান দূর হইতে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বলি ও মণ্ডল, ভাড়া যাবি—তোদের শ্রীনগরের ভাড়া, গাড়ী খালি আছে ?" সঙ্গে সঙ্গে মাথায় মোট সমেত কুলী একটী ভদ্রলোককে পথ দেখাইয়া সেইখানে লইয়া আসিল; একটি বিলাতী কম্বলের বিছানা চামড়ার পেটি দিয়া জড়ান, একটি পিতলের গোল বড় কৌটা আংটা দেওয়া, আর একটি প্রকাণ্ড চামড়ার বাক্স, তাহাতে সাদা অক্ষরে ইংরাজীতে নাম লেখা। সাহেবদের সঙ্গে ধীরেনের কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে তাই সে অবাক হইয়া এই সকল সাহেবোচিত সরঞ্জামের মালিক ভদ্রলোকটিকে দেখিতে লাগিল—অল্পবয়স্ক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়, সম্প্রতি মুণ্ডিত মস্তকে অল্প কেশ দেখা দিয়াছে, দাড়ি গোঁফ সব কামান, গায়ে একখানা শুভ্র ঢিলা জামার উপর একটী শুভ্র উত্তরীয়, হাতে একটি বেতের পালিশ-করা ছড়ি, মাথাটা বোধ হয় সোণা বাঁধান।' ধীরেনের বিস্ময়ে বাধা দিয়া আগন্তুক বলিল, "তুমিই গাড়ী নিয়ে শ্রীনগর যাবে ? আমায় নিয়ে চল, যা ভাড়া তাই দেব।" ধীরেনের এই আগন্তুককে পছন্দ হইয়াছে, সে রাজি হইয়া কেবল মাত্র বলিল—"কিন্তু খৃষ্টান, জল টল।" "খৃষ্টান ? বেশ বেশ, তা আমায় কি করতে হবে তার জন্যে ?" ধীরেন কথা না বুঝিলেও তাহার সঙ্কোচ ও আপামরসাধারণের উপর তাহার যে বৈরীভাব তাহার অবশিষ্টাংশটুকু একসঙ্গে কাটিয়া গেল। বাক্সটি ছৈয়ের বাহিরে রাখিতেই আগন্তুক বলিল, "তোমার বেশ বসবার জায়গা হবে এর ওপর।" ধীরেন ও কুলির সাহায্যে বিছানা বন্ধনমুক্ত করিয়া আগন্তুক গাড়ীর ভিতর গুছাইয়া কুলীকে বিদায় করিলে, ধীরেন গরুদুটিকে বাগাইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক; 'Forword' এই কথা বলিয়া গাড়ীতে উঠিল, ধীরেন প্রফুল্ল চিত্তে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। —আগন্তুক গাড়ীর মধ্যে নিজেকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ বিন্যাস করিয়া ধীরেনকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, তাহারা ভোরে গ্রামে পঁহুছিবে, মধ্যে একটু বিশ্রাম করা দরকার—। তখন বেলা তিনটা।

রাস্তাটি বেশ ভাল। তদানীন্তন শ্রীনগরের জমিদার মোটা রকমের সাহায্য করায়, তাঁহারই উৎসাহে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের এই রাস্তাটি বেশ কায়েমী ভাবেই নির্ম্মিত। দুইধারে পূর্ণবয়স্ক অশ্বত্থ, কাঁঠাল, তেঁতুল ইত্যাদি ঘন ছায়াশীল বৃক্ষ রৌদ্রের ক্লেশ অপহরণে নিরত। রাস্তার পাঠখিলে রং ছায়ায় ঘোর দেখাইতেছে—দূরে সম্মুখে গরুর শিং-এর উপর দিয়া রক্তাভ, আরও দূরে যেন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; কোথাও বা ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র বর্ণান্তর সৃজন করিয়াছে; নিকটে গোলাপী, দূরে ধূসর। উপরে গাছের পাতার মধ্যে পবনের হিল্লোল-মর্ম্মর; নীচে গাড়ীর চাকার একটানা সঙ্গীত। যানাদির বিরলতায় রাস্তাটি এক প্রকার অক্ষতদেহ, তাই বিলম্বিত চিন্তাধারাছিন্নকারী ঝাঁকুনি নাই—। ছৈ-এর মধ্যে আরোহী গভীর চিন্তামগ্ন; বাহিরে মণ্ডল গাড়োয়ানী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের ঈষৎ প্রতিহত প্রতাপে, শোণিতপ্রবাহ মন্দ—তন্দ্রা ও চিন্তা দুইয়েরই অনুকূল অবস্থা।

আগন্তুক নন্দকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র শ্যাম। কুড়ি দিন হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে, শ্যাম জীবনে আজ প্রথম স্বগ্রামে স্বজন সাক্ষাতে আসিতেছে।—মৃত্যুকালীন পিতার মনে যে দারুণ অভিমান, তিন চারিখানি পত্র লিখিয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কোনও উত্তর না পাওয়ায় মুমূর্ষুর অন্তরে যে নিষ্ঠুর

কশাঘাতের বেদনা, তাহা শ্যামই কেবল অনুভব করিয়াছিল। মাতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনুপস্থিত, উপস্থিতি অপ্রিয়ই হইত। মৃত্যুর সময় বাক্‌শক্তিরহিত পিতার সজল চক্ষুতে ভাষাতীত মিনতি কেবলই মনে পড়িতেছে। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একাকী উপস্থিত তাহার নিজের চক্ষে অতিভাষায় সেই মিনতির সান্ত্বনাময় উত্তর আর হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের স্থির মূর্ত্তিরচনা,—যে উপায়ে হউক পিতার জীবনের শেষ ক্ষোভ মুছিয়া ফেলিতে হইবে, যাহা লইয়া তাঁহার উদ্বেগ অভিমান ও ব্যথা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকে পর্য্যন্ত বেদনাপ্লুত করিয়াছে—যতশীঘ্র সম্ভব ইহার অপনয়ন করিতেই হইবে—এই সকল তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। পিতার মৃত্যুর পরও সমস্ত ঘটনা একের পর এক চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলীর ন্যায় তাহার মনে অহঃরহ জাগিতেছে। মাতা ভাষাহীন স্থাণুর মত, নিক্ষোভ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়—জগতের একটা গূঢ় অঙ্কের উপর যবনিকা-পতন, বিশ্বের একটা রহস্য অযাচিত ভাবে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া গেল। তারপর পাওনাদারদের সঙ্গে জনে জনে আবার একত্রে নানারূপ মস্তিষ্কবিকৃতকারী আলোচনা, তর্ক, ক্ষণভঙ্গুর মীমাংসা, অবশেষে সিদ্ধান্ত; অনিচ্ছায় অহঃরহ মানবনীচতার পূতিগন্ধ, স্বার্থপরতার নগ্ন বীভৎসতা নিতান্ত আত্মীয়দের উপেক্ষার স্মৃতি; বন্ধুরূপধারীদের অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত অনায়াস রূপান্তর, সমস্তই মনে আছে। পুরাতন বন্ধুর ন্যায় অতি পরিচিত, নিত্য ব্যবহার-স্মৃতিতে পবিত্র বাড়ীর জিনিষগুলি, একে একে তাহাদের স্থানান্তরীকরণ—নবীনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন তাহাদের প্রত্যেকটির করুণ বিদায়সম্ভাষণ। তারপর প্রতি শূন্যকক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া আসিতে যাইতে এক জীবন্ত হাহাকারের ভর্ৎসনা। অবশেষে অর্দ্ধমৃতা জননীকে লইয়া কলিকাতাযাত্রা ও দারিদ্র্য-ব্যাধি গোপনপ্রয়াসে ক্লিষ্ট মাতুলালয়ে, প্রীতি সৌজন্য আপ্যায়নের, অভাবেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রাখিয়া, কর্ত্তব্যের পথে অনিশ্চিত ফলাফলের লক্ষ্য করিয়া স্বগ্রামে আগমন—এমনই করিয়া এই কুড়িটী দিন শ্যামের নিকট কুড়ি বৎসরের জীবন লইয়া কাটিয়াছে।—এই সকল স্মৃতি চিন্তা ও কল্পনা শ্যামের মনের অগ্নিতে অবিরাম ইন্ধন যোগাইয়া শকটের গতির সহিত অবলীলায় চলিয়াছে।—

রাস্তার উপর এলোমেলো অন্ধকার তাল পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় ধীরেন গাড়ী থামাইয়া বলিল, "ঠাকুর একবার নামতে হবে—একটু হাত পা ছাড়িয়ে জলটল খেয়ে নিন্—জোছনা ফুটলে আবার ছাড়ব, গরুদুটো একটু জিরিয়েও নেবে।" শ্যাম নামিয়া পড়িল। বলদ দুটিকে কয়েক আঁটি বিচালী দিয়া ধীরেন শ্যামের সঙ্গে খাবার আছে কি না প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া কোথা হইতে গুড় ও মুড়ী বাহির করিয়া চিবাইতে বসিল। শ্যামও তাহার পিতলের বড় কৌটাখানি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েক প্রকারের আহার্য্য বাহির করিল। শ্যামের পীড়াপীড়িতে ধীরেন তাহার ভাগ লইল। শ্যামকেও ধীরেনের অনুরোধে জীবনে প্রথম খেজুরের পাটালি গুড় আস্বাদ করিতে হইল—। শ্যামের স্বভাবভদ্রতা ও সহজসৌজন্যে ধীরেন মুগ্ধ। আহারান্তে সে নিবেদন করিল, তাহার নিকট কয়েকটি ডাব আছে, রুগ্না পত্নীর জন্য সে তাহার গ্রামে দুষ্প্রাপ্য এই বস্তু প্রতিবারই সহর হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে, যদি ভদ্রলোক একটি গ্রহণ করেন, ধীরেন চরিতার্থ হইবে, তিনিও তৃপ্তি পাইবেন।—বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণ, খৃষ্টানের স্পর্শদুষ্ট জল ব্যবহারে নিন্দাভয় আছে—শ্রীনগর অতি কদর্য্য স্থান; অগত্যা শ্যামকে স্বীকার করিতে হইল।—অধিক বাক্যালাপ না হইলেও এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ভদ্র ইতরের ব্যবধান-প্রাকার বহু স্থানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হইল। নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাই অনুভব করিয়া ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর আপনি কার বাড়ী যাবেন ?" মানবজাতি ও ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে ধীরেনের সাধারণ ঔদাসীন্য এক্ষেত্রে বিচলিত হইল। শ্যাম সংক্ষেপে কেবল, 'জ্যেঠার বাড়ী' এই উত্তর দিয়া ত্বরিতে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনে সে-কৌতূহল চাপা দিল—আত্ম-পরিচয় প্রকাশ পাইলে এই মূর্খ সরল গাড়োয়ানের সঙ্গে যে আর এমন সহজ প্রীতিকর থাকিবে না, তাহা বুঝিয়াই শ্যাম এইরূপ করিল। (ক্রমশঃ)

অনাহূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীকনকচাঁপা মুখোপাধ্যায়]

কন্যা

ঠিক ত জানি না। বোধ হয় মালী। ঘরের ছায়ায় বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে ; ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।

পিতা

বোধ হয় মালী কাজ কর্‌তে যাচ্ছে।

কাকা

সে রাতেও ঘাস কাটে না কি ?

পিতা

কাল ছুটীর দিন নয় ? ও তাই !—ঘরের চারধারে ঘাসগুলো খুব বড় বড় হয়েছিল কিনা ?

মাতামহ

কিন্তু নিড়ুনীতে কি এত শব্দ হয়···?

কন্যা

ঘরের কাছেই নিড়ুচ্ছে কিনা !

মাতামহ

সরলা, তুমি কি ওকে দেখতে পাচ্ছ ?

কন্যা

না দাদামশায়, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখতে পাচ্ছি না।

মাতামহ

আমার ভয় হচ্ছে যে ও রোগীকে জাগিয়ে তুল্‌বে।

কাকা

আমরা ত বেশী শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি না।

মাতামহ

আমার ত মনে হচ্ছে ও ঘরের মধ্যে নিড়ুনী চালাচ্ছে।

কাকা

রোগী শুন্‌তে পাবে না, সে ভয় নাই।

পিতা

আমার যেন মনে হচ্ছে আজ আলোটা ঠিক জ্বল্‌ছে না

কাকা

তেল কম আছে বোধ হয়।

পিতা

কিন্তু আজ সকালেই ত দেখেছি তেল ভরা আছে। তা নয় জানালা বন্ধ করার পর থেকেই খারাপ জ্বল্‌ছে।

কাকা

বোধ হয় চিম্‌নীটা অপরিস্কার হ'য়ে রয়েছে।

পিতা

এখনই আবার ভাল জ্বল্‌বে বোধ হয়।

কন্যা

দাদামশায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তিন দিন ধরে আজ একটুও ঘুমায় নি।

পিতা

এত কষ্ট পাচ্ছে !

কাকা

কিন্তু নিজেই কষ্ট পেলে কে কি করবে ? এক এক সময় এমন হয় যে কোন কথাই শুন্‌তে চাইবে না।

পিতা

তাঁর মত বয়সে এ ত খুব স্বাভাবিক।

কাকা

ভগবান জানেন যে ঐ বয়সে আমরা কি রকম হব।

পিতা

প্রায় আশী বছর বয়স হ'ল।

কাকা

তা হ'লে ত এ রকম হওয়ার তার দাবী জন্মেছে।

পিতা

সব অন্ধ লোকের মত তিনিও ঐ এক ধরণের।

কাকা

এরা খুব বেশী ভাবনা করে।

পিতা

এরূপ ভাববার সময়ও যে খুব বেশী আছে কিনা !

কাকা

আর ত এদের কিছু করবার নেই।

পিতা

তা ছাড়া, অন্য কোন দিকে মন দেবার সুযোগও নেই।

কাকা

এ ভয়ঙ্কর জিনিষ অবশ্যি—

পিতা

যাই হোক্ এও শেষে অভ্যেস হয়ে আসে,।

কাকা

আমি কিন্তু এ ভাব্‌তেও পারি নে।

পিতা

এদের প্রতি মমতা হওয়া উচিত।

কাকা

কোথায় কে আছে, কোত্থেকে কে এল, কোন দিকে কে যাচ্ছে কিছু জানবার যো নেই। দুপুর বেলা থেকে দুপুর রাত, শীত থেকে গ্রীষ্ম কিছু ঠিক করবার উপায় নেই। কেবল অন্ধকার…আমি হলে মরে যেতাম, এর কোন আরাম হবার আশা নেই?

পিতা

প্রায় তাই।

কাকা

কিন্তু উনি ত একেবারে অন্ধ নন!

পিতা

খুব বেশী আলো খানিকটা দেখতে পান।

কাকা

আমাদেরও চোখের যত্ন নেওয়া উচিত।

পিতা

এক এক সময় এঁর ধারণাগুলো এমন অদ্ভুত ঠেকে।

কাকা

কিন্তু এক এক সময় এগুলো মোটেই ছেলেমি নয়!

পিতা

ব্যাপার হচ্ছে উনি যা ভাবেন, ঠিক ঠিক সেই কথাই বলেন।

কাকা

কিন্তু চিরকালই কি উনি ওরকম ছিলেন?

পিতা

না, আগে ঠিক আমাদের মতই ছিলেন। অদ্ভুত কিছু বলতেন না। আমার মনে হয় সরলাই ওঁকে বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছে। ওই তাঁর সব কথার জবাব দেয় কিনা…

কাকা

তার সব কথার উত্তর না দেওয়াই ভাল। তাঁর প্রতি এ দয়ার কোন অর্থ ই নেই। (ঘড়িতে দশটা বাজল)

মাতামহ

আমি কি কাঁচের দরজাটার দিকে মুখ করে আছি?

কন্যা

দাদামশায়, তুমি ত বেশ ঘুমিয়ে নিলে?

মাতামহ

কাঁচের দরজাটা কি ঠিক আমার সাম্‌নে?

কন্যা

হাঁ, দাদাবাবু

মাতামহ

ওখানে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে?

কন্যা

না দাদামশায়, আমি ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

মাতামহ

আমার মনে হচ্ছিল ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কেউ আসে নি?

কন্যা

না দাদামশায়।

মাতামহ

(কাকা ও পিতার প্রতি)

তোমার দিদি এসেছেন?

কাকা

রাত ত' অনেক হয়ে গেল। আজ আর তা হলে এল না বোধ হয়। এত রাতে আসা তাঁর পক্ষে অশোভন হবে।

পিতা

তাঁর সম্বন্ধে আমার ভাবনা হচ্ছে।

(কেউ ঘরে ঢুকেচে এ রকম শব্দ শোনা গেল)

কাকা

এল বোধ হয় এতক্ষণে! তুমি শুন্‌তে পেয়েছ?

পিতা

কেউ বাইরের দরজার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

কাকা

নিশ্চয়ই আমার দিদি এসেছে তার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি।

মাতামহ

খুব সতর্ক পায়ের শব্দ শুনলাম যেন।

পিতা

খুব আস্তে কিন্তু তিনি আসছেন।

কাকা

বাড়ীতে রোগী আছে তাত জানে।

মাতামহ

কৈ এখন ত কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি না।

কাকা

এখুনি আস্‌বে এখানে। আমরা যে এখানে আছি চাকরেরা বলে দেবে হয়ত।

পিতা

তিনি এসেছেন বলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

কাকা

আমারও তাই বিশ্বাস ছিল যে নিশ্চয়ই আসবেন।

মাতামহ

উপরে আস্‌তে ত তাঁর খুব দেরী হচ্ছে।

কাকা

যাই হৌক্ এ নিশ্চয়ই তার আসার শব্দ।

পিতা

আর কারুর ত আজ আস্‌বার কথা নেই।

মাতামহ

বাইরের দরজায় ত' আর কোন শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি না?

পিতা

দাঁড়াও ঝিকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস কর্‌লেই জান্‌তে পারা যাবে।

মাতামহ

সিঁড়িতে যেন কার আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

পিতা

ঝি আস্‌ছে বোধ হয়—

মাতামহ

আমার যেন মনে হচ্ছে ঝি একা আস্‌ছে না।

পিতা

ঝি খুব আস্তে আস্তে আস্‌ছে।

মাতামহ

তোমার দিদির পায়ের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে নয় কি?

পিতা

আমি কিন্তু কেবল ঝিরই শুন্‌তে পাচ্ছি।

মাতামহ

এ নিশ্চয়ই তোমার দিদি! নিশ্চয়ই!

(দরজাতে ধাক্কার শব্দ)

পিতা

আমি নিজে গিয়েই দরজা খুলব। (দরজা একটু ফাঁক—ঝি বাইরে—ফাঁকের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে) ঝি, কোথায় তুমি—?

ঝি

আজ্ঞে এখানে।

মাতামহ

তোমার দিদি এসেছেন?

কাকা

আমি কেবল ঝিকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

পিতা

শুধু ঝি এসেছে—(ঝিকে) বাড়ীতে কে এসেছিল?

ঝি

বাড়ীতে—?

পিতা

হ্যাঁ, এইমাত্র কে এল না?

ঝি

আজ্ঞে, কেউ ত আসেনি।

মাতামহ

ওরকম ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ছে কে?

কাকা

ঝি ভয়ে ওরকম করছে।

মাতামহ

ঝি কি কাঁদছে?

কাকা

না, কাঁদবে কেন?

পিতা (ঝিকে)

কেউ আসেনি এখন ?

ঝি

আজ্ঞে না—

পিতা

কিন্তু আমরা দরজা খোলার শব্দ শুনলাম যে ?

ঝি

আমিই দরজা বন্ধ করছিলাম।

পিতা

দরজা কি খোলা ছিল ?

ঝি

আজ্ঞে হাঁ—

পিতা

এত রাতে দরজা খোলা ছিল কেন ?

ঝি

আমি ঠিক জানি না। আমি নিজেই দরজা বন্ধ করেছিলাম।

পিতা

তা'হলে দরজা খুলল কে ?

ঝি

আজ্ঞে আমি ঠিক জানি না, নিশ্চয়ই আমার পরে কেউ বাইরে গিয়েছে।

পিতা

খুব সাবধানে থেকো। দরজায় ওরকম ধাক্কা দিও না, শব্দ হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

ঝি

আজ্ঞে, আমি ত' দরজা ছুঁইনি।

পিতা

নিশ্চয়ই তুমি ধাক্কাচ্ছ, ঘরের মধ্যে আসবার চেষ্টা করছ না তুমি ?

ঝি

আমি ত' দরজা থেকে প্রায় পাঁচ ছয় হাত দূরে আছি।

পিতা

ও রকম চেঁচিও না।

মাতামহ

তোমরা আলো নিভিয়ে দিচ্ছ কেন ?

কন্যা

কৈ না ত' দাদাবাবু।

মাতামহ

আমার যেন মনে হচ্ছে চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার হয়ে আসছে।

পিতা (ঝিকে)

তুমি এখন নীচে যেতে পার, কিন্তু সিঁড়িতে ও রকম শব্দ ক'রো না।

ঝি

আমি ত' সিঁড়িতে কোনই শব্দ করিনি ?

পিতা

আমি বলছি, করেছ। আস্তে আস্তে নীচে যাও নইলে গিন্নী জানবে। যদি কেউ আসে ত' বলো যে আমরা বাড়ীতে নেই।

কাকা

হাঁ, ব'লো যে আমরা কেউ বাড়ীতে নেই।

মাতামহ (কাঁপতে কাঁপতে)

এ কথা বল্‌বে!

পিতা

·· হাঁ কেবল দিদি ও ডাক্তার ছাড়া···

কাকা

ডাক্তার কখন আস্‌বেন ?

পিতা

দুপুর রাতের আগে তিনি আস্‌বেন ব'লে' ত' মনে হয় না। (দরজা বন্ধ করলেন, ঘড়িতে দশটা বাজল)

মাতামহ

ও কি ঘরে এসেছে ?

পিতা

কে ?

মাতা

ঝি।

পিতা

না, সে ত' নীচে গেছে।

মাতা

আমার মনে হচ্ছিল সে এই টেবিলটার উপরে ব'সে আছে।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী]

বর্ত্তমান বাঙ্গলায় প্রচলিত অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইলে শেষের দিকে "সঙ্গীত স্বরলিপি" বলিয়া একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—ইহা হইতে একটি জিনিস বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অধুনাতন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔৎসুক্য জাগিয়াছে এবং সঙ্গীতরসজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল ব্যক্তিগণের আন্তরিক চেষ্টায় আজ বাঙ্গলা ভাষায় 'স্বরলিপি' সহজবোধ্য হইয়াছে,—লিপিবদ্ধ ভাবে সঙ্গীত চর্চ্চা আজ সাধারণ পাঠক বাঙ্গালীর মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, ইহা সেই সঙ্গীতসাধক ব্যক্তি মাত্রেরই গৌরবের পরিচায়ক।

—কিন্তু সেই সঙ্গীতসাধক ব্যক্তিগণের তালিকা দীর্ঘ নয়, এবং সেই তালিকাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে যাঁহার নাম প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে তাঁহারই স্মৃতিপূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য আজ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি।

সঙ্গীত সম্পর্কে যাঁহারা বিন্দুমাত্র সংবাদও রাখেন, তাঁহাদের কাছে সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এমনি একটি ভাবের দ্যোতক যে সে ভাব তাঁহাদের মনে প্রতিভা-পূজার আগ্রহ ও মর্য্যাদাদানের আনন্দসৃষ্টি করে। কোনও কলা-শিল্পীর শিল্পরচনার স্মৃতি তৎভাবসম্পন্ন শিল্পজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে আনন্দ-ভাব-দ্যোতক—কাব্যামোদীর পক্ষে যেমন মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা, চিত্রকলা যাঁহারা বোঝেন তাঁহাদের পক্ষে যেমন র‍্যাফেলের যে কোনও ছবির স্মৃতি, স্থপতিবিদ্যাবিশারদের কাছে যেমন অজন্তা বা এলোরার খোদিত চিত্রাবলী, তেমনি সঙ্গীতানুরাগী মনের কাছে কালীপ্রসন্নের "ন্যাস-তরঙ্গ-বাদন"এর স্মৃতি চিরদিন আনন্দের সৃষ্টি করিবে। কিন্তু ইহা ছাড়া সঙ্গীতানুরাগীর মনে তাঁহার স্মৃতি আর একটি ভাবেরও দ্যোতনা করিবে—সেই পুণ্য স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করিবার ভাব।—কিন্তু এই পূজার দাবী তাঁহার কিসের?—

তাহা বুঝিতে হইলে আপনাদিগকে আমি আজিকার এই পারিপার্শ্বিক হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গলার সত্তর বৎসর পূর্ব্বের কোনও বাঙ্গালী-গৃহের আঙ্গিনায় সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি—পথ খুব দুরন্ত হইবে না—কেননা প্রয়োজনীয় পাথেয় মাত্র কল্পনা।

—কল্পনা করুন, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক ফাল্গুন সন্ধ্যায় একটি গানের "জলসা" বসিয়াছে—সেই জলসাতে নানা দিগ্‌দেশাগত খ্যাতনামা সুর-সাধকের দল, তাঁহাদের মধ্যে একজন সঙ্গীতালাপ সুরু করিয়াছেন;—প্রথমে অস্ফুট গুঞ্জন, ক্রমে সেই গুঞ্জন স্বরলহরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া মজলিস্-গৃহটি প্রতিধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে। এমন সময় সম্মুখে উপবিষ্ট একজন ওস্তাদ পার্শ্ববর্ত্তী আর একজন ওস্তাদের কানে কানে কি একটা কথা কহিলেন;—একান হইতে ওকানে চলা ফেরা করিয়া সেই একটি মাত্র কথা সরব হইয়া সভাস্থ সকল লোককে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সঙ্গীতের জল্‌সা দ্বন্দ্বযুদ্ধক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হইল,—এ ওস্তাদ উঁহাকে প্রহারোদ্যত, ও ওস্তাদ তাঁহাকে সাপটাইয়া ধরিয়াছেন। ব্যাপারটি হাস্যকর হইলেও অধিক পরিমাণেই করুণাত্মক।

ইহার কারণ কি?—সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সঙ্গীতস্বরগ্রামের কোনও লিপিবদ্ধ আকৃতি ছিল না—কেবল শ্রবণে তাহার ধ্বনি ছিল—তাই ওস্তাদে ওস্তাদে মতভেদ ও কোলাহলের অন্ত ছিল না। কালীপ্রসন্নের সাধকপ্রাণ ইহাতে ব্যথিত হইয়াছিল তাই তিনি নিজের সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারা মুখে মুখে প্রচলিত অৰ্দ্ধ বিশুদ্ধ বা বিকৃত স্বরগ্রামকে বিজ্ঞানসম্মত সুরপর্য্যায়ে ফেলিয়া আধুনিক স্বরলিপিকে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকল্পিত জলসার অন্তরালে যে সভাকার জলসা রহিয়াছে তাহার পরিচালনায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ধন ভাণ্ডারের বহু মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। সেই সঙ্গীত সভায় আমাদের

দেশের "সমস্ত রাগ রাগিণীর জাতি অর্থাৎ ওড়ব, খাড়ব, ও সম্পূর্ণ—ইহার মধ্যে কোন জাতি বিশিষ্ট কোন রাগিণী এবং ইহাদের বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী নির্দ্দিষ্ট হয়।… এই সকল রাগরাগিণীগুলিকে স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীতসার নামক গ্রন্থের প্রকাশ করিবার ভার তাঁহার প্রধান ছাত্র এই কালীপ্রসন্নের উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি এই দুরূহ কার্য্য তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় যত্ন ও পরিশ্রমে সমাধা করেন।"

তাই বলিতেছিলাম, কালীপ্রসন্নের নাম প্রত্যেক সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে পূজার্হ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন এই কলিকাতা শহরের আহিরীটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন—মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীতবিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।—কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গীতপিপাসুদিগের মধ্যে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরেই পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে সংস্কৃত ন্যটক 'রত্নাবলী'র নাম-ভূমিকা অভিনয় করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শৌরীন্দ্র মোহনের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় "সঙ্গীতসার" গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান-পত্র পান। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন হইতে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী হইতে ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী হইতে কালীপ্রসন্ন প্রশংসা-পত্র ও সুবর্ণ-পদক লাভ করেন।

অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ্ আলি শা যখন মেটে-বুরুজে অবস্থান করেতেছিলেন তখন নিমন্ত্রিত কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে সুরবাহার যন্ত্রালাপে মুগ্ধ করেন—তিনি নিজের গলার ফুলের মালা খুলিয়া কালীপ্রসন্নের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—আপনার যোগ্য মহামূল্য রত্নমালা আমার নাই, আমি বন্দী—তাই ফুলের মালা দিয়া আপনার মর্য্যাদা রাখিলাম।

ভারত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় ভারত পরিদর্শনে আসিলে কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে ন্যাস-তরঙ্গ বাদনে চমৎকৃত করেন। ইউরোপের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক প্রবর রেমিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে আমন্ত্রিত হইয়া কালীপ্রসন্নের সেতার আলাপে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—এ দেশে ইঁহার গুণের যথেষ্ট আদর আপনারা করিতেছেন না। ইঁহার প্রশংসা করিবার মত ভাষা আমার নাই।

এই ভাবে বহু গুণী ব্যক্তি তাঁহাকে বহুতর প্রশংসা বাক্যে ভূষিত করিয়াছেন—সে প্রশংসায় তিনি আত্মহারা হন নাই। আমৃত্যু তিনি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও আচারানুষ্ঠান পালন করিয়া গিয়াছেন;—মাতার পদধূলি গ্রহণ না করিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না।

কালীপ্রসন্নকে কেন্দ্র করিয়া আজ এই চিন্তাই প্রধাণতঃ মনে জাগে যে প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধানুরাগ না থাকিলে আমাদের শিল্পসাধনার ইতিহাসের আলোচনা সার্থক হইতে পারে না।—কেন যে ন্যাস-তরঙ্গ বাদনে তাঁহার বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি তাহা যাঁহারা হঠযোগসাধনার বিষয় অবগত আছেন তাহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন নহে। যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ হঠযোগ সাধনার মূলীভূত উপায়, তাহাই ন্যাসতরঙ্গবাদনের অপরিহার্য্য অনুশীলন।—সাধনা এখানে শুধু উপলব্ধিগত নহে অনুশীলনসাপেক্ষ। এদিক দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম।

কালীপ্রসন্ন ৫৮ বৎসর বয়সে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সে মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লাভ নাই—তাঁহার জীবনের নিষ্ঠা যেন যুগে যুগে আমাদের শিক্ষার আদর্শ হইয়া থাকে। তাঁহার অমর আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণিপাত করিয়া আমার আজ মণীষী রোঁমা রোলার কথা মনে পড়িতেছে—

"You young men, you men of today, march over us, trample us under your feet, and press onward. Be ye greater and happier than we.

For myself I bid the soul, that was mine, farewell. I cast it from me like an empty shell. Life is a succession of deaths and resurrections. We must die, Christopher, to be born again."

আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া আমি আজিকার মত আপনাদের বিদায় গ্রহণ করিব।

আজ এই সভায় আর একটি বিশেষ আনন্দের অনুষ্ঠান আছে—বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বর্ত্তমানে একমাত্র পত্রিকা সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া সপ্তম বর্ষ পূর্ণ করিয়াছে—তাহারই আজ সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন। আশা ও আনন্দের কথা এই যে কোনও একটি বিশিষ্ট বিদ্যার আলোচনা ও গবেষণা লইয়া একখানি কাগজ সাত বৎসর বাঁচিয়া আছে। বর্ত্তমানে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অন্য কোনও মাসিক পত্রিকা আছে কিনা জানি না। পূর্ব্বে ভারত সঙ্গীত সমাজ হইতে "সঙ্গীত প্রকাশিকা" এবং স্বর্গীয়া প্রতিভা চৌধুরাণী সম্পাদিত "আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা" বলিয়া দুইখানি সঙ্গীত সম্পর্কে পত্রিকা প্রকাশিত হইত।—দীর্ঘ সাত বৎসর কাল এই পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করিয়া শ্রীযুক্ত আর, বি, দাস মহাশয় বাঙ্গলা দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীতাচার্য্য ভারতপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাধিকাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম আমাদের সহিত গভীর ভাবে সম্পর্কিত—ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আজ এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। *

তাজ-পথে

[শ্রীগোপাল লাল দে

জ্যোৎস্না জাগর শারদ যামিনী তন্দ্রালসা,
জাগিয়া কাটানু শিশির-ভূষণা উষার লাগি,
অরুণোদয়ের সাথে সাথে জাগে এ কটি আশা,
কালিন্দী কূলে তাজ-তীর্থের মিলন মাগি।

চির বিরহের মিলন তীর্থ কোন সে বনে,
ওগো ও পথিক! তাজ কোন পথে কোথায় তাজ?
চির রূপময়া ঘুমায় কোথায় সঙ্গোপনে,
পাশে বসি তার প্রেম পূজারত পৃথ্বীরাজ?

এই যে কিল্লা! বিবৃত জঘনা যমুনা কায়া,
পথ পাশে মরি দ্যুলোক রুচির শ্যামল বন,
আলো ছায়া মরি শীতল সমীরে মোহন মায়া!
মর্ত্ত্য সীমায় সহসা নামিল এ নন্দন।

কুঞ্জের আড়ে ওই ওই হেরি সে মন্দির!
আরও দ্রুত চলি, কভু দেখা যায়, লুকায় বনে,
প্রভাত আলোয় ঝলমল করি স্বর্ণ শির,
আবার লুকায় মরীচিকা যেন মৃগের সনে!

প্রভাতের আলো ছড়ায়েছে শিরে রতন গুঁড়া,
শিশির-মাজনে ঝলমল করে মু'খান তার,
ধন্য হলাম হেরি মর্ম্মর স্বর্ণ চূড়া
প্রেম মঞ্জিল দূর হতে করি নমস্কার।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তীর্থ পথের শেষে,
দাঁড়ানু আসিয়া তাজমহলের তোরণ তলে,
স্বর্ণ জ্যোতির মহিমায় ঘেরা ইরাণী বেশে,
হেরিয়া তখনই মন মুরছিল রূপের কোলে।

* গত ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৭, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে সভাপতিরূপে মহারাজ কর্ত্তৃক পঠিত

মরুর মায়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

[শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়]

শীতের এক ম্লান অপরাহ্নে কোন নাম-হীন প্রান্তরে হা-ঘরে'র দলের তাঁবু পড়িয়াছিল।

কতদিন চলিয়া গিয়াছে,—কালের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ডগরুকে কালে চাপিয়া ধরিয়াছে, বার্দ্ধক্যই ব্যাধি : জীর্ণ শুষ্কপ্রায় প্রাচীন বটবৃক্ষের মত মাংসহীন মোটা মোটা হাড়-গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁবুর মধ্যে খাটিয়ার উপর ডগরু শুইয়া কাশিতেছিল আর এপাশ ওপাশ করিতেছিল। কিন্তু দেহের চেয়ে মনের অস্বস্তি যেন শতগুণ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি বেদনাময় উদাস,— চাপা দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন বহিয়া যায়, কি যেন বলিতে চায়,— কিন্তু বলাও যেন যায় না।

মাথার শিয়রে ননকুর মা সানিয়া বসিয়া, উদ্বেগ আকুল দৃষ্টি, সেও যেন ডগরুর মনের কথা জানিতে চায় কথাটার আভাষও অনুভব করে।

তবু শুধাইতে পারে না,—গোপনে অবাধ্য অশ্রুকণাও ঝরিয়া পড়ে।

ননকু বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাছে আসিলেই তার কান্না ঠেলিয়া আসে, তাই সে দৃষ্টির অন্তরাল থাকিয়া রোদন রুদ্ধ করিতে চায়।

বধূ কাজরী তাঁবুর এক কোণে বসিয়া থাকে,—আপন তাঁবু শূন্য পড়িয়া আছে, বেদনা তার কম বাজে নাই।

শেষ ডগরু যেন জোর করিয়া কহিল—

"ওহি কাগজ ঠো—সানিয়া—।"

সানুনয় অনুরোধ!

সানিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া একটা ঝাঁপির ভিতর হইতে অতি জীর্ণ এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া ডগরুর হাতে দিল। মলিন বিবর্ণতার মাঝে কতকগুলা লেখা।

ডগরু অপলক দৃষ্টিতে জীর্ণ কাগজ টুক্‌রার পানে চাহিয়া ম্লান কালীর আঁচড় কয়টার রহস্য ভেদ করিতে চাহে।

শেষ ক্ষীণ কণ্ঠে ননকুকে কহে—'ননকু'

বাহির হইতে ম্লান মুখে নতদৃষ্টিতে ননকু আসিয়া দাঁড়াইল।

ডগরু কহিল—

"গাঁও মে যাও তো বাচ্চা,—ইস্‌মে কেয়া লিখা হুয়া হ্যায় প-ঢ়া লে আও, কেয়া নাম, কেয়া পতা,—জল্‌দি বেটা জল্‌দি...।"

ননকু চলিয়া যায়—।

ক্ষণ মুহূর্ত্তের ভিতর দিয়া কাল বহিয়া যায়,—প্রতি মুহূর্ত্তটী গুনিয়া গুনিয়া ডগরুর সময় আর কাটে না,—ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইয়া উঠে;—

আবার নিজেই হাসিয়া বলে—

"দিনের একটা বেলাই কত বড়,—উঃ—মানুষের পরমায়ু কত দীর্ঘ—!"

ক্ষণেক সে শান্ত হয়,—আবার অস্থির হইয়া—তাঁবুর দুয়ারের পানে মুখ ফিরাইয়া ঘুরাইয়া শোয়, সম্মুখের প্রান্তরের দূরের ঐ গাছটা দেখিয়া অতি ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠে—

"ও-হি ননকু আ-গেয়া—।"

সানিয়া চাহিয়া দেখে,—কিন্তু ভুল ভাঙিয়া দিতে পারে না;—

কাজরী উঠিয়া তাঁবুর দরজায় গিয়া দাঁড়ায়।

ডগরু নিজের ভ্রম নিজেই বুঝিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহে—

"নেহি—উ—নন্‌কু না—।"

সানিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, ফোঁটা দুই অবাধ্য অশ্রুও ঝরিয়া ডগরুর জ্বরতপ্ত ললাটে পড়িল—।

স্পর্শের অনুভূতি বড় সূক্ষ্ম,—দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সংবাদ উত্তেজিত ডগরুর অগোচর রহিলেও অশ্রুবিন্দুর তপ্ত স্পর্শ অগোচর রহিল না, ডগরু সানিয়ার মুখপানে চাহিয়া—কহিল—

"কাঁদিস্ না, তোকে ছেড়ে দুনিয়ার বুকে আর কারও কাছে আমি যাব না। তবে দুনিয়া ছেড়েও ত' যেতে হবে তার আগে কে আমি জেনে যেতে দে—।"

বন্যা নারীর বুকের কথা আর বুকে রহিল না,—আবেগময় বেষ্টনে ডগরুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—

"না দেব, হাম যানে না দেব।"

ডগরু আরও চঞ্চল হইয়া উঠে, বোধ করি সকল ভাবনা ছাপাইয়া তাহার নিজের যাওয়ার কথাটাই সুপ্রকট হইয়া উঠে; ডগরু সানিয়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি ব্যগ্রতায় কহে—

"সে কে গা;—সানিয়া সে কে গা;—পারবি সানিয়া পারবি রাখতে?"

সানিয়া কাঁদে;—উত্তর দিতে পারে না,—ভীরু দুর্ব্বল প্রেম চোখের জলে লিখিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করে—।

ডগরু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হতাশ কণ্ঠে কহে—

"যানা—হোগা,—যানা—হোগা—।"

এ সত্য খণ্ডনের ত' উত্তর নাই,—প্রত্যুত্তরের অভাবে সব নীরব হইয়া গেল—; ওদের মনে হয়—তাঁবুর আশে পাশে সে আসিয়াছে, তার পদশব্দ বুঝি শোনা যায়।

সত্যই পদশব্দ শোনা যায়—; সে বুঝি ঘরে পশিল;—ভয়ে সবার চোখ মুদিয়া আসে।

ননকু ডাকে—"বাপজী!"

ডগরু চোখ মেলিয়া ননকুকে দেখিয়া অতি উত্তেজনায় কনুয়ে ভর দিয়া সবলে ওই বিশাল ভারী দেহের আধখানা টানিয়া তোলে, কহে—"কহো বেটা, কা লিখা হ্যায়,—ক্যা নাম—কাঁহা ঘর।"

ননকু কহে—"এক বাংগালীকে নাম—অবনাশ চৌধ্রি, জিলা নদীয়া—জিমিদার।"

ডগরু বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া কতক্ষণ পরে আবার কহে—"কেয়া বেটা কেয়া।"

—"অবনাশ চৌধ্রি, জিমিদার, নওগাঁও—জিলা নদীয়া।"

ডগরু আপন মনে বলিয়া যায়—"অবনাশ চৌধ্রি, জমিদার, নওগাঁও, জিলা নদীয়া। অবনাশ চৌধ্রি, জমিদার, নওগাঁও, জিলা নদীয়া; মেরা বাপ, মেরা ঘর, বাংগালী, হাম বাংগালী; অবনাশ চৌধ্রি, মেরা বাপ্।"

ননকু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কহে—"বাংগালী?"

—হাঁ—ময় বাংগালী হুঁ, জিমিদারকে বেটা, বাপকে মেরা হাঁতী হ্যায়—ঘোড়া—জিমিদার কে বেটা।"

ননকুর কোন্ সুদূর অতীতের ঝাপসা ছবি বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে—সে অতি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে—"আওর হাম?—তুমভি;—"

সানিয়া প্রবল চীৎকারে কহে—"সর্দ্দার!"

ডগরু হাসিয়া কহে—"যানে ওয়াক্ত বোল্‌নে দেগে—সানিয়া; শুনো বেটা; তুম্—ভি বাংগালী।"

ননকু ক্ষিপ্তের মত কহে—"বাংগালী?"

সানিয়া তাড়াতাড়ি কহে—"জরুর, সর্দ্দার বাংগালী, উন্‌কে বেটা তুম জরুর বাংগালী।"

ডগরু ধীর ভাবে কহে—"নেহি,—শুনো ননকু, সানিয়াকে বাপ সর্দ্দার মে—কো চোরা করকে লায়া, উয়ো কাগজ মেরা জেবমে রহা।"

ননকু উত্তেজিত স্বরে কহে—"মেরা বাত্, মেরা বাত কহো।"

কাজরী বিস্ফারিত নেত্রে শুনে—তাহার কথা ফুটে না, সানিয়া কাঁদে।

ডগরু কহে—"তুম্ মেরা বেটা নেহি, হাম্ তুম্‌কো চোরী করকে লায়া—বাংগালীকে লড়কা মেরা আচ্ছা মালুম হোতা,—"

ননকু ডগরুর হাত ধরিয়া অস্থিরের মত কহে—"বোলো মেরে বাপকে নাম, ঘরকে পতা—বোলো—বোলো।"

—"তুম্‌হারা বাপকে নাম জগদীশ, হাঁ ঠিক্ মালুম হ্যায় উন্‌কে নাম জগদীশ রায়, জিলা—বর্দ্ধমান, গাঁও কালীপুর।"

মুহূর্ত্তে ননকুর বাল্যের অর্থহীন ভাল-না-লাগার অর্থ আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, মোহা আঁখরের লিপিলেখার অস্পষ্ট স্মৃতি সুস্পষ্ট হইয়া ওর মনে কত কথা কহিয়া যায়—ওর যেন মনে জাগে—ছায়ানিবিড় গ্রামখানির মাঝে ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে ছবির মত বাড়ী, তারই আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া মুখ-মনে-পড়ে না—এক বাঙ্গালী নারী—ব্যগ্র বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাকে ডাকে, 'আয় আয় ফিরে আয়—'; মা সেই তার মা। গ্রামের শ্যামলিমা যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, যেমন গাছের ডালের সাথে পাখীর নীড়খানি পাখীকে

ডাকে,—আয় আয় ফিরে আয় অসীমের মাঝে হারিয়ে যাবি ফিরে আয়।

অনুভূতির এ অর্থ সুস্পষ্ট রূপে মনের মাঝে ধরা না পড়িলেও আহ্বানের অনুভূতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

ডগরু তাহার জীর্ণ হাতখানা তুলিয়া ডাকিল—"বেটা"

ননকু—উন্মত্তের মত কহে—"নেহি, নেহি—হাম তুমহারা কৈ নেহি—কৈ নেহি—"

তারপর বিপুল উত্তেজনায় ডগরুর উদ্যত যে হাত খানা দারুণ আক্ষেপে এলাইয়া পড়িতে যাইতেছিল, সেই হাত-খানা সবল মুষ্টিতে ধরিয়া নির্ম্মম ঝাঁকি দিয়া কহে—

"কাহে, কাহে তুম হামকো চোরী কারকে লায়া, মায়কে বুক্‌সে ছিনাকে লায়া কাহে—?"

অপর হাত দিয়, সহসা সে ডগরুর গলা চাপিয়া ধরিতে চাহিল—যেন প্রতিশোধে ওর বুক হইতে ওর প্রাণটা লইতে চায়।

ডগরুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সানিয়া মুহূর্ত্তে উঠিয়া উন্মাদিনীর মত ননকুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া হাঁকিয়া উঠে—"খবরদার—বেইমান।"

কাজরী আসিয়া ধীর সবল আকর্ষণে ননকুর হাত আকর্ষণ করিয়া তিরস্কার করিয়া কহিল—"ছোড় —দেও।"

কাজরীর মুখের পানে চাহিয়া ডগরুকে সে ছাড়িয়া দিল।

পাশে কাজরী দাড়াইয়া, ননকু তার মুখের পানে চাহিয়া, বিচিত্র দৃষ্টি, কি যেন ভাবে ও—।

সহসা ধীর ভাবে কাজরীকে আরও পাশে সরাইয়া দিল, যেন কাজরীর ছবি দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে চায়,—ওকে যেন পিছনে ফেলিতে চায়; সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া কহে—"হাম যাতা হায়—।"

সমস্বরে তিনটী প্রাণী স্তম্ভিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

"কাঁহা—?"

ননকু তখন তাঁবুর বাহিরে। বাহির হইতে দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল—"মেরে ঘর, মেরে মায় কো পাশ—।"

কুকুরটা ওর পিছনে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

কাজরী আর্ত্তকণ্ঠে ডাকে—"ননকু—ননকু।"

উত্তর নাই।

কাজরী ছুটিয়া আসিয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সম্মুখের প্রান্তরের বুকে অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টি হানে।

রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে কোলের পানে আগাইয়া আসিতেছে, ননকু নাই। দূরে কুকুরের ডাক শোনা যায়, ওই, তারই আগে আগে একটা চলন্ত রেখা যেন সম্মুখের পানে ছুটিয়া চলে।

কাজরীর চোখ দুইটা অন্ধকারে হিংস্র ব্যাঘ্রীর মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে, সে একটা শাঁকাং-করা বর্ষা হাতে লইয়া ব্যাঘ্রীর মতই নিম্ন ভীষণ কণ্ঠে কহে—"চল্ তেরা জান লে—ব, হামি—বেইমান।"

ডগরু চমকিয়া আর্ত্তস্বরে কাজরীকে মিনতি করিয়া কহে, "নেহি গে—কাজরী—নেহি গে।"

কাজরী শোনে না, অন্ধকারের মাঝে মিলাইয়া যায়।

ব্যাঘ্রীর প্রেম—শুধু ত' উদ্দাম নয়, ক্রোধে, প্রতিহিংসায় জর্জ্জর—ভয়ঙ্কর।

ডগরু বলে—"সানিয়া, ওকে ফেরা!" সানিয়া ছুটিয়া গিয়া, কাজরীকে ধরে। কাজরী ফুঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

* * *

অন্ধকারের বুক চিরিয়া ননকু সম্মুখের পানে ছুটিয়া চলিয়াছিল; —দিকের খেয়াল তাহার হয় নাই—।

চলিতে চলিতে প্রথম উত্তেজনা তাহার শান্ত হইয়া আসিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে জাগিতেছিল—দিকের কথা—

কোন দিকে তাহার পথ?

কোথায় জেলা বর্‌ধবান্—গাঁও কালীপুর? কতদূর? কতদূরে তাহার মা—তাহার বাপ?

মা বাপ— এই দুইটী কথা মনে হইতেই দুইটী ছবি ননকুর মনে জাগিয়া উঠে—সানিয়া—ডগরু; সঙ্গে সঙ্গে কাজরী। না না না;—কিন্তু তবু সে ছবি মুছে না, সঙ্গে মনে জাগে কত কি—, শের কুকুরটা, আদরের ঘোড়াটা, বর্ষাটা, তীর ধনুক ওঃ—তীরগুলা কি সোজা, এতটুকু টাল নাই; জাগিয়া উঠিয়া লতার মত পায়ে জড়াইয়া ধরিল;—

সত্যই কে, কি যেন পায়ে লুটায়?

শের, শের, ননকু শেরের মাথায় হাত বুলায়।

মূক জন্তুটার ভালবাসায় ননকুর বুক কেমন করিয়া উঠে।

ঘোড়াটা কাল সকালে মুখ তুলিয়া পথের পানে চাহিবে—দানা কে দিবে? আরও দুটী চোখ, খয়রা রং-এর তারা—ছোট দুটি চোখ—চারিধারে তার সুর্ম্মার রেখা, কাজরী, কাজরী;—

ওই কে ডাকে না?—

'ননকু—ননকু হো—!'

কাজরী ডাকে বুঝি; সেই, সেই নিশ্চয়; পরের তাঁবুতে 'দারু' পিয়ে ননকু যেদিন উন্মত্তের মত নাচিত—সেদিন সে এমনি ডাকিত—'ননকু—হো!'

অন্ধকার রাত্রে গ্রামে সিঁদ কাটিয়া ফিরিত সে—তাঁবুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাজরী ডাকিত, 'ননকু হো!—'

ননকু স্থির হইয়া কান পাতিয়া শোনে, কানের পাশ দিয়া বাতাসের প্রবাহ একটা অবিচ্ছিন্ন অস্ফুট শব্দে বহিয়া যায়।

আবার সে ঘুরিয়া সম্মুখের পানে তাকায়—

নিবিড়, ঘন অন্ধকার, ওই গ্রাম, ওগুলা গাছ, নিবিড় অন্ধকারের মত দেখায়—

ননকু কুকুরটাকে বুকে ধরিয়া বসিয়া ভাবে।

ওই প্রান্তরের দিক হইতে ডাকে—কাজরী, সানিয়া, ডগরু, ঘোড়াটা, মরুর বুকের অনন্ত বিস্তৃত পথ—

আর ওই গ্রামের মাঝখান হইতে ডাকে তাহার অপরিচিতা মাতা—ব্যগ্র বাহু প্রসারণ করিয়া এক বাঙালী নারী—আয়, আয়, আয়।

ননকু আবার উঠিয়া ছুটে, ওই গ্রামের পানে—

পিছনে প্রান্তরের আকর্ষণ গ্রামের সীমারেখায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইবে।

নিস্তব্ধ গ্রাম, ননকু শ্রান্ত দেহে একটা বাড়ীর দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ননকু চারি পানে তাকাইয়া দেখে; তাহার গরম বোধ করে, গা দিয়া ঘাম ঝরে, অনন্ত কুটীল বন্ধন চারি ধারে—অপ্রশস্ত দীর্ঘ কালি পথখানি, দুধারে তার বাড়ীর বেষ্টনী;—

মাথার উপরে আকাশ—অসীম অনন্ত বিস্তৃত নয়, ওই পথের সমধারায় অমনি কালি আকাশ, তাও গাছের আচ্ছাদনে ঢাকা, নজরে পড়ে শুধু—টুকরা টুকরা আকাশের অংশ।

সম্মুখে তাকায়—ওই দীর্ঘ পথখানা ধরিয়া যদি দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায়, তাও না, সম্মুখের বাঁকে মোড়ের বাড়ীটায় দৃষ্টি প্রতিহত হয়

পরিশ্রান্ত দেহে ঘন গভীর নিঃশ্বাস টানিতে ননকুর যেন কষ্ট বোধ হয়, পাশের একটা গোয়ালবাড়ী হইতে একটি ভ্যাপসা উগ্রগন্ধে তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। ননকুর মনে হয় একটা অবরোধ। একটা বড় পিঁজরা। কুকুরটা পর্য্যন্ত ছট্‌ফট করে।

ননকু কত ভাবে।

এমনি গ্রাম খানির একখানি বাড়ীতে বাংগালী নারীর বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, মাইয়া গে—

কিন্তু, কিন্তু তাহারা তাহাকে লইবে তো?

ননকুর মনে পড়ে তাহার ওই শের কুকুরটার একদিনের কথা,—শেরকে সে বাচ্চা অবস্থায় তাহার মায়ের কাছ হইতে লইয়া আসিয়াছিল, তখন তার মায়ের কি রাগ—কি কান্না!

শেরের মা—হরকু সর্দ্দারের কুকুর!

হরকু বলিয়াছিল—আহা মা! আচ্ছা ননকু, তুই রোজ একবার দুধ 'পিলাইয়া' নিয়ে যাস্।

ননকু প্রথম দুদিন লইয়া যায় নাই, পাছে ওর মা ওকে লইয়া আসিতে না দেয়; তৃতীয় দিনের দিন বাচ্চাটা যখন জেরবার হইয়া পড়িল তখন সে লইয়া গিয়াছিল। মায়ের কাছে বাচ্চাটাকে নামাইয়া দিতেই কিন্তু শেরের মা গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, শেরকে লয় নাই, তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

—যদি তাই হয়!

ননকু চমকিয়া উঠে!

গাছের উপর কে কাঁদে না?

বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া ননকু দেখে, একটা নিশাচর পক্ষীর বাচ্চা কাঁদে, সে নীড়ে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু তাহার মা আর প্রবেশ করিতে দিবে না।

একটা বাতাসের প্রবাহ বহিয়া যায়, গাছ পালা দোলা দিয়া উঠিল, বেণুবন আলোড়িত হইয়া উঠিল, বাঁশের উপর

বাঁশ ঘষিয়া ঘষিয়া দোলে। ওই বেণুবনে কে কাঁদে না, কার করুণ কাঁদনের অস্ফুট সুর! ননকুর আর সহ্য হইল না, সে দাওয়া হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিল।

* * * *

ননকু চলিয়া গেল, কাজরী তাঁবুর কোনে ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সানিয়া বুক চাপড়াইল, কিন্তু ডগরু শান্ত স্থির ভাবে শুইয়া রহিল, শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘ শ্বাস তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া বাহির হইতেছিল। আরও পাশে ঝাঁপির ভিতর বড় পাহাড়ে অজাগরটা ডগরুর সঙ্গে সমানে বিষনিঃশ্বাস ফেলে। ওপাশে কোন একটা তাঁবুতে মাদল বাজে, মত্ত কণ্ঠের গান শোনা যায়, মাঝে মাঝে কাহারও গলার সাড়া পাওয়া যায়, "চুপ চুপ হল্লা মৎ করো, সর্দ্দার কে বেমার, ননকু ভি আয়া নেহি দেখতা।"

মত্ত কণ্ঠ ধীর হইয়া আসে, আবার জাগিয়া উঠে কোলাহলে; রজনী আগাইয়া চলে। ধীরে ধীরে ওদের কোলাহল নীরব হইয়া আসে, মত্ত নর নারীর দল বাহুতে বাহুতে মাথা রাখিয়া হয়ত' ঘুমাইয়া পড়ে, কেহ তাঁবুর ভিতর, কেহবা প্রান্তরের উপর; মাঝে মাঝে শুধু কুকুরগুলা ডাকিয়া উঠে।

রজনী কাটিল, যাযবের দল জাগিয়া উঠিল, ডগরু সানিয়াকে কহে, "যা গে, হরকুকে বোলা তনি।" হরকু আসিয়া দাঁড়াইতেই ডগরু কহে—

"বস্তি উঠাও, ভাইয়া বস্তি উঠাও।"

প্রৌঢ় হরকু কহে—"ননকু কাঁহা—ননকু?"

ডগরু কহিল—"মালুম হোতা রাতকো কাঁহা পাকড়া গেয়া।"

ডগরু মিথ্যা কহিল; রাত্রে চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে কহিল। নতুবা হয়ত' এই প্রান্তর-যাত্রীর দল প্রান্তরবুকের ঝড়ের মত তার সন্ধানে বাহির হইয়া ননকুর টুঁটী ছিঁড়িয়া আনিত।

কাজরী ইহার প্রতিবাদ করিল না, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। কেহ চুরী করিতে ধরা পড়িলে—সারাটা দল শুদ্ধ বিপদাপন্ন হয়—সে জন্য বাকী সকলে বস্তি উঠাইয়া চলিয়া যায়, যে গেল সে গেল, পিছনের তরে কাঁদিতে প্রান্তরের যাত্রীর দল পড়িয়া থাকে না।

খটা-খট তাঁবুর খুঁটায় ঘা পড়িতে লাগিল, বাঁধন খোলা হইল, গাঁঠরী বাঁধা হইল, ঘোড়ার পিঠে কম্বলের জিন্ কসা হইল।

উদাসীনের দলের আবার—আবার যাত্রা সুরু হইবে। পুরুষের দল তাঁবু গুটায়, নারীর দল গাঁঠরী বাঁধে।

কেহ গায়—"বহু দূর যানা হায় মুসাফের।"

দল উঠিবে, সর্দ্দারের তাঁবু অপরে গুটাইয়া দেয়, সানিয়া হাঁকে—"কাজরী গে কাজরী।"

কাজরী তখন অনেকটা দূরে এক ঝরণার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছিল।

তাহার মনে জাগিতেছিল, ঠিক এমনি এক ঝরণা-তীরে ননকু প্রথম তাহাকে বুকে ধরিয়াছিল, মুখে মুখ রাখিয়াছিল, সেই আনন্দ, সেই অনুভূতি।

পরক্ষণেই তাহার বুকটা মোচড় দিয়া উঠিল, হায়, আর সে ফিরিবে না!

প্রবল কাঁদনে কাজরী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঝরণার ধারে শ্যাম লাবণ্যে ভরা ভিজা মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

ওদিকে দূর হইতে সানিয়া হাঁকে—

"কাজরী গে, কাজরী!"

দলের কোলাহল শোনা যাইতেছিল, কাজরী বুঝিল এইবার দল উঠিবে।

কিন্তু যদি ননকু ফেরে!

আবার হাঁক আসে, "আগে কাজরী।"

অল্পক্ষণ পরেই সে পিঠে সস্নেহ স্পর্শ—অনুভব করিল, সে বুঝিল সনিয়া আসিয়াছে, তাহার কাঁদন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে কে ডাকিল—"কাজরী, মেরে পিয়ারী।"

শের ডাকিয়া উঠে—"ঘেউ—ঘেউ!"

কাজরী বন্যা হরিণীর মত চঞ্চল ভঙ্গীতে ফিরিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে, ননকু আর শের।

ননকু কহে—"আমি ফিরে এলাম, পথে এখানে দেখি তুমি—"

তার পর অতি ব্যগ্র মিনতিভরা কণ্ঠে তাহার হাত দু'টী ধরিয়া কহে—

"কাজরী মেরে পিয়ারী, মায় ঘুমকে আয়া, বাংগালী নাহী হাম্, হাম্ তোম্‌হারা—তোম্ মেরে পেয়ারী—সানিয়া মেরে মায়, সার্দ্দার মেরে বাপ—, কাজরী—"

ওধার হইতে হাঁক আসে, "কাজরী—।"

কাজরী মুহূর্ত্তে ননকুর হাত ছাড়াইয়া দলের পানে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতে ছুটিতে কহিল—

"পাকড়োতো হামে—দৈ—খে।"

(শেষ)

শিলং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

২৯শে বৈশাখ—টীনের টুং টাং কাঁচের জানালার ঝনঝন শব্দে ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি বাড়ী, ঘর খাট বিছানা সমস্তই দুলিতেছে। এ অঞ্চলে অনবরত ভূমিকম্প হইয়া থাকে, আজিকার কম্পনটা মাত্রাধিক হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে এমন শান্তভাবে ভূমিকম্পনকে অনুভব করিতে পারি নাই বলিয়া আমার খুবই মজা লাগিতেছিল, বাণী আমোদের পরিবর্ত্তে কাঁদিয়াই অস্থির।

মিনিট পনেরো কম্পনের পর বাসুকী স্থির হইলেন, আমরাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

চা পানান্তে বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল।

আজ বেশী দূর যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও উদ্দেশহীন ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে এক নিম্নভূমিতে পৌঁছিলাম। সঙ্কীর্ণ বনপথ অতিক্রম করিয়া সাম্‌নেই গিরিনদী। নদীর পরপারে নিবিড় জঙ্গলের দিকে কাঠুরিয়ারা কাঠের কাঠ কাটিতে যাইতেছে। তাহারা পাথরের উপর পা রাখিয়া লাফাইয়া নদী পার হইল। তাহাদেরি দৃষ্টান্তে আমরাও সেই উপায়ে নদীপারে আসিলাম। পার হইবার সময়ে বাণীর পায়ের জুতা জলে পড়িয়া ভাসিয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া কন্যার পিতা লাঠি দ্বারা তাহা উদ্ধার করিয়া আনিলেন। নদীর তীরে এক বৃহৎ পাথরের উপর আমরা বসিলাম। চারিদিকেই নির্জ্জন, বন হইতে পাখীদের কিচির মিচির সঙ্গীত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। প্রভাতী পবনে বৃক্ষ-পত্র আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের সম্মুখেই শ্মশান।

খাশিয়াদের অন্ত্যেষ্টি সৎকার অদ্ভুত। ইহাদের বিশ্বাস মানুষের আত্মা একবার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পুনরপি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই বিশ্বাসে খাশিয়ারা মৃত দেহ দুইদিন ঘরে রাখিয়া আত্মীয়কুটুম্ব সমবেত হইয়া উৎসব করিতে থাকে। মৃত দেহ বাড়ীতে রাখিয়া সে বাড়ীতে রন্ধন করিবার নিয়ম নাই। প্রতিবেশীর গৃহ হইতে রন্ধন করিয়া আনিয়া ভোজ দেওয়া হয়।

দুই একদিন পর সকলে একত্রে বাজনা বাজাইয়া মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যায়। মৃতার সৌখীন দ্রব্য পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই তাহার দেহের সহিত ভস্মীভূত করা হয়। আত্মীয় বন্ধুগণ চিতায় পানগুয়া আহুতি দিয়া মৃতদেহকে সম্মানিত করে।

বেলা বাড়িতেছিল, কাজেই সে অনন্ত শান্তিপূর্ণ ভীষণ শ্মশান ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উঠিতে হইল। খৃষ্টানদের গোরস্থানের পার্শ্ব দিয়া বাসায় ফিরিলাম। স্নানান্তে আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া আমাদের খাশিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর বিবাহ-উৎসব দেখিতে গেলাম। গৃহটি সুন্দর রূপে ফুলের মালায় সজ্জিত হইয়াছে। দ্বারের পাশে বসিয়া কয়েকটি লোক বাজনা বাজাইতেছে। দলে দলে সুন্দরী সুসজ্জিতা খাশিয়া রমণী পথ আলো করিয়া বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছে।

দ্বিপ্রহরে বিবাহের পর ভোজন-ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একখানি পিঁড়ির সামনে আর একখানি পিঁড়িতে অনেকগুলি লোক খাইতে বসিল। সম্মুখের পিঁড়িতে চিনামাটীর ডিশে ভাততরকারী রাখিয়া কাঠি দিয়া খাইতে লাগিল। ইহাদের ভোজ বাঙ্গালীর মত আড়ম্বর-পূর্ণ নহে। ভাত, একটা তরকারী ও মাংস ইহার বেশী নহে।

বৈকালে বাজারে বেড়াইতে গিয়া নেড়াবাবু ও ছোট সান্ন্যালের সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহারা নন্‌ক্রেমের নাচ দেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বছরে দুইবার খাশিয়াদের জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। উৎসব অর্থাৎ খাশিয়া নৃত্য। একমাস পূর্ব্বে শিলং-এর উৎসব হইয়াছে। এখন নন্‌ক্রেমে রাজভবনের বড় উৎসবটি বাকী। আগামী পরশু নন্‌ক্রেমের নাচ, এখনই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলে সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে, নহিলে পাওয়া কঠিন।

কয়েকদিন হইল আমরা নন্‌ক্রেমের নাচের গল্প শুনিতেছি, জীবনে আর কোন দিন এখানে আসা ঘটিবে কিনা ভাবিয়া

তখনই একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ফেলা হইল। শিলং হইতে নন্‌ক্রেম আট মাইল, লোকের আগ্রহে ট্যাক্সি ভাড়া চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের যাতায়াতের ট্যাক্সি কুড়ি টাকা ভাড়ায় স্থির হইল।

১লা জ্যৈষ্ঠ—বেলা দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। স্নানাগার সারিয়া আমরা প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। কিছু খাবার ও জল লইয়া সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। বেলা বারটার পর আজ আর শিলং হইতে নন্‌ক্রেমে ট্যাক্সি ছাড়িবার হুকুম নাই, কাজেই আমাদের আগে পিছে অসংখ্য গাড়ী ছুটিয়া চলিতেছে।

শিলং ছাড়াইতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ট্যাক্সিতে বসিয়াই আমরা রীতিমত ভিজিতেছি। মেটে রাস্তায় গাড়ীর চাকা আটকাইয়া পিছাইয়া যাইতেছে। রাস্তার একদিকে গিরিশ্রেণী, অপর দিকে অগভীর খাদ, খাদের পর শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোঁপ, কাঁটা বন।

ঘণ্টাখানেক বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছে। শিলং সুন্দরীর এক চোখে জল এক চোখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। জলের রেখা না মুছিতেই হাসির ছটায় চারিদিক উৎফুল্ল। আমাদের গাড়ীখানি প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছে, এদিকে এক ট্যাক্সি ছাড়া অন্য যানবাহনাদি নাই। আজ দেখিতেছি মাল বহনের খচ্চরের গাড়ীগুলিও কাজে লাগিয়াছে, পূর্ব্ব বঙ্গের গোযানের ন্যায় ছোট ছোট গাড়ী ভরিয়া অগণিত লোক নন্‌ক্রেমে চলিয়াছে।

যতই নন্‌ক্রেমের নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে। গাছের তলা, পথ লোকে লোকারণ্য। স্থানে স্থানে ত্রিপলের নীচে ভাত তরকারী, চা, পিঠা ইত্যাদি বিক্রয় হইতেছে। রাস্তায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভিড়ই বেশী। সুসজ্জিতা কুমারীরা অভিভাবিকার সহিত নৃত্য উৎসবে যোগ দিতে যাইতেছে। এ নৃত্য উৎসব কেবল কুমারীদের নিমিত্তই, বিবাহিতার নহে।

বেলা একটার সময় আমরা 'সীম'এর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। এক মাঠ শ্রেণীবদ্ধ ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে। আসে পাশে বহু খচ্চরের গাড়ী দৃষ্টিপথে পড়িতেছে।

নাচের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই রাজমন্ত্রী আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বারান্দার চেয়ারে লইয়া বসাইলেন। অভ্যাগতদের জন্য সাম্‌নের বারান্দায় আসনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জনসাধারণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্ব বাঁশের বেষ্টনী দ্বারা দাঁড়াইবার স্থান করা করা হইয়াছিল। নাচের অঙ্গন বালুকায় আবৃত। অঙ্গণের পার্শ্বে বাঁশের মাচার উপর বাজনা বাজিতেছে।

দুই একটি মেয়ে নাচের আসরে দেখা দিতে লাগিল। বেলা বাড়িবার সাথে সাথে যেমন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমনি নর্ত্তকীর সংখ্যাও বাড়িতেছিল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ বছরের বালিকা হইতে পঁচিশ বছরের যুবতীর সমাবেশ হইয়াছিল। অবশেষে রাজার দুই ভাইঝি, তিন কন্যা আসরে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকন্যা ব্যতীত সকলেরই মস্তকে রূপার মুকুট। রাজা প্রজার এইটুকু ব্যবধান। সবগুলি মেয়েরই হাতে, গলায় এবং কাণে একই ধরণের অদ্ভুত গহনা। গলায় মুণ্ডমালার ন্যায় সোণার বড় বড় মালা। চিক ও কাণের গহনায় অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। ভারে কাহারো ঘাড় ফিরাইবার শক্তি নাই বস্ত্রালঙ্কারে সকলেই আবৃত, হাত পায়ের অঙ্গুলি ও মুখখানি কেবল নয়নগোচর হইতেছিল।

খাশিয়াদের কুলদেবতা সর্প। রাজ-কুমারীদের সোণার মুকুটের দুই দিকে দুইটি করিয়া সাপ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। সকলের পরিধানেই সূক্ষ্ম রেশমের শাড়ী, ইহাদের নৃত্যভঙ্গী আশ্চর্য্য; সমস্ত শরীরটাকে পাষাণ প্রতিমার মত স্থির রাখিয়া ইহারা পদ দ্বারা বালির উপর রেখা টানিয়া যায়। সকলের নৃত্যই একরূপ, কোন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু খাশিয়া মেয়েদের অটল গাম্ভীর্য্য, পবিত্র সংযত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। হাজার হাজার দর্শকদের ভিতর কত ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ রহিয়াছে। কৌতুকের বশে একটি মেয়েকেও কাহারো পানে চোখ তুলিতে দেখা গেল না। পাঁচ বছরের বালিকাটি পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত ধীর শান্ত! সকলেরই মুখ স্নিগ্ধ গম্ভীর, দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ। নিজেদের জাতীয় উৎসবে রাজায় প্রজায় ভেদ ভুলিয়া কুমারীগণ সহস্র লোকের নয়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু নারীর শীলতা সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দেয় নাই।

কলিকাতা সহরে আজকাল একদল নৃত্যশীলা নারীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের বেশভূষা হাস্য লাস্য, কটাক্ষের সহিত এ চিরস্বাধীনা পার্ব্বত্য কুমারীদের মহিম-মণ্ডিত সংযত মূর্ত্তির তুলনা করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। এ দেশের মেয়েদের যতই দেখিতেছি ততই শ্রদ্ধা হইতেছে।

বেলাশেষে কুমারী সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের, মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে কুণ্ডল, সকলেই অস্ত্রেশস্ত্রে ভূষিত। মেয়েদের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য রাখিয়া হাতের চামর দুলাইয়া যুবকগণ বীরত্বসূচক 'হিপ্' 'হারা' শব্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। সে শব্দে আমাদেরই হাস্য সম্বরণ করা কঠিন, আশ্চর্য্যের বিষয় নৃতশালা কুমারীদের অধরে একবারও হাসির রেখা ফুটিল না, বা আঁখিপল্লব উর্দ্ধে উঠিল না।

চারিদিকে ফটো তুলিবার ধুম পড়িয়া গেল। দুইটি মহিলা নর্ত্তকীদের ছবি তুলিয়া লইলেন।

বেলা চারিটার পর আমরা বাহিরে আসিলাম। স্থানে স্থানে মেলা বসিয়া গিয়াছে। দূর হইতে যে সব কুমারী নৃত্য করিতে আসিয়াছিল তাহারা ফিরিবার আয়োজন করিতেছে। গাছতলায় দাঁড় করাইয়া সাঙ্গনীরা পরস্পরের গহনা খুলিয়া দিতেছে। অনেক ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে, বাকী গুলি "যাই যাই" করিতেছে

আমরা এক বৃক্ষছায়ায় বসিয়া সঙ্গের খাবার গুলির সদ্ব্যবহার করিলাম।

নীলোজ্জ্বল আকাশে এবেলা মেঘের লেশও নাই, এ প্রদেশে শীতের প্রকোপ কম। বাতাস বসন্তের ন্যায় স্নিগ্ধ মধুর, দূরের পর্ব্বত মালা সূর্য্যের ম্লান কিরণে অনুরঞ্জিত। নব নব পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের মধ্য দিয়া আবার আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—আজ আমাদের চেরাপুঞ্জী যাইবার দিন। বাহাদুরের ট্যাক্সি খানি পূর্ব্বেই ভাড়া করা হইয়াছে। শিলং হইতে চেরাপুঞ্জী ১৬ মাইল, সকলেরই বোধ হয় জানা আছে বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জী চির বিখ্যাত। আজ আবার চেরাপুঞ্জির হাট, বেলা চারিটার পর চেরাপুঞ্জী হইতে কোন ট্যাক্সি বাস ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। একটি মাত্র দুর্গম রাস্তার জন্যই এই নিয়ম। কাজেই বেলা দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই আমরা বাহির হইলাম। বাহাদুরের কথানুযায়ী কয়েকখানা মোটা কম্বল সঙ্গে লওয়া হইল।

শহর ছাড়াইয়া কত অরণ্য বসতি অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা আমাদের লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পথের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, মনে হইতেছে আমরা যে স্বপ্নরাজ্যে যাইতেছি; পথের দৃশ্যাবলী মনোরম অবর্ণনীয়। দুই পার্শ্বে পাদপভূষিত অনন্ত গিরিশ্রেণী দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। সুদূর উপত্যকা হইতে রাশি রাশি শুভ্র মেঘ উর্দ্ধে উঠিতেছে। আকাশস্পর্শী শৈলমালা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পথিকের প্রবেশের নিমিত্ত এতটুকু একটু সঙ্কীর্ণ পথ খুলিয়া দিয়াছে। সে বঙ্কিম পথটি পথ না অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার! দক্ষিণে বিরাট পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে; বামে অনবদ্য শোভার আকর পাহাড়শ্রেণী আমাদের সাথে সাথে যাইতেছে। পাহাড়ের মধ্যদেশে রজতরেখাবৎ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। নদীর বুকে ছোট বড় অসংখ্য উপলখণ্ড। দুইতটে পুষ্পের অনন্ত শয্যা। কত ফুল বিজন বনে ফুটিয়া বিজনেই ঝরিয়া পড়িতেছে। কোন খানে গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী তটিনীর সহিত মিশিতেছে। এক একটি পাহাড় হরিদ্রা বর্ণের ফুলে আচ্ছাদিত, কোনটি বা নীল ফুলে সজ্জিত। পর্ব্বতের এত রূপ ফুলের এত সুষমা, বৃক্ষের এ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

সৌন্দর্য্য মহাপারবার ঠেলিয়া আমরা ক্রমে লোকালয়ের নিকটে আসিলাম। পুরাতন চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছা মাত্র কোথায় গেল আলোকজ্জ্বল দিবা, কোথায় গেল নির্ম্মল রৌদ্র আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, কুয়াসায় চারিদিক ঘনায়মান। টিপিটিপি বৃষ্টির সহচর হইয়া বাতাসও বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। শীতে সকলেই জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম, গায়ের শালের উপর মোটা কম্বল চাপান হইল।

পুরাতন চেরাপুঞ্জীতে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত কয়লা তুলিয়া রাখা হইয়াছে। এদিকে কয়েকটা চুণের পাহাড়ও দেখিলাম। বসতি কম নহে, এখানকার বাসিন্দা খাশিয়া; নেপালি; স্থানে স্থানে

শস্যক্ষেত্র। ছাগল ও মুরগী ট্যাক্সি ও বাসে ভরিয়া অনেক লোক হাটে আসিয়াছে।

পুরাতন চেরাপুঞ্জীর খানিকটা দূরেই নূতন চেরাপুঞ্জী, চেরাপুঞ্জীতে আসিয়া আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। বহু লোক বেড়াইতে আসিয়াছে, গাছের তলায় পাথরের সামনে বসিয়া অনেকগুলি বিদেশী স্ত্রীপুরুষ ভোজন করিতেছে। কেহ কেহ সঙ্গীতচর্চ্চায় মনোবিবেশ করিয়াছে। বৃষ্টি আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু আকাশ মেঘভরে অবনত। পেঁজা তুলার আকারে শুভ্রমেঘ গাছের মাথায় পাহাড়ের গায়ে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে মেঘের ওড়না খুলিয়া রূপসী চেরাপুঞ্জী সৌন্দর্য্যচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। দূরের শ্রীহট্ট শহর দেখিবার নিমিত্ত আমরা এক উচ্চ পাহাড়ে উঠিলাম। অস্পষ্ট ছায়াগুলি বোধ হয় কমলালেবুর বাগান। এখন যাহা মেঘে ঢাকা দেখা যাইতেছে, উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে এখান হইতেই সেই শ্রীহট্টকে সুস্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু সে সৌভাগ্যসূর্য্য চেরাপুঞ্জীর ভাগ্যে সহজে উদয় হয় না।

পাহাড়ের নীচে নামিয়া আমরা একটি ছায়াময় কুঞ্জ বিতানে গিয়া বসিলাম। চেরাপুঞ্জীর সর্ব্বত্র প্রকৃতি আপনার হাতে সুন্দর সুদৃশ্য প্রস্তরাসন সাজাইয়া রাখিয়াছেন আমাদের আসনের নিম্নেই উন্মাদিনী গিরিনদী কলকল্লোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথে যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলাম, এখানে তাহার রূপের পরিবর্ত্তনে মুগ্ধ হইলাম সে আর ক্ষীণা মৃদুস্বরা গিরিকুমারী নহে; সঙ্কুচিতা তটিনী হঠাৎ যৌবনমদে মত্তা হইয়া দুই তটের পাথরের গায়ে আঘাত করিয়া—

"দুলিয়া ফুলিয়া চলিয়াছে নদী সিন্ধুদরশ আসে,
ঝর্ঝর স্বরে নির্ঝর আসি মিশিছে তাহারি পাশে;
বাতাসের মুখে শুধু কল গান, আকাশে উড়িছে মিলন নিশান;
বিশ্ব-সাগরে জেগেছে তুফান আনন্দ রসভাসে,
গিরিরে চুমিতে নেবেছে অভ্র ধরারে ধরিতে পাশে।"

নদীর জলে ঢিল্ ছুড়িয়া পাতা ভাসাইয়া ক্ষণেক পর আমরা সে রমণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

"পিয়া উঁচীরে অটরিয়া তোরী দেখন চলী।
চাঁদ সুরজ কোটি দিয়না বরতু হৈ,
তাবিচ ভূলী ডগরিয়া।"

—হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা, আমি দেখিতে
চলিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যের কোটি দীপ কেবলি জ্বলিতেছে,
তাহার মধ্যেও পথ ভুলিয়া যাইতেছি! - - - -

২৩শ বর্ষ   চৈত্র, ১৩৩৭   ১২শ সংখ্যা

প্রভাতের প্রেম

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কেঁপে ওঠে হিয়া? ঘুমভাঙানিয়া ঊষা-বিহঙ্গ ডাকে—
রাত্রি পোহাল, খোল দ্বার খোল, স্বপন দেখিছ কা'কে?
কাল খোলা ছিল কুঞ্জদুয়ার; সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে,
রজনীগন্ধা বেণীতে পরিয়া দাঁড়াইলে গৃহ-তলে,
রূপ প্রসাধন, প্রেমের সাধন অপরূপ ভঙ্গিমা
তনুদেহময় উছলিয়া পড়ে রসের তরঙ্গিমা;
বাসর জাগিতে পাতিলে শয়ন, গাঁথিলে বিনোদমালা
প্রিয়তম আশে সযতনে সই সাজা'লে বরণ-ডালা,
ধূপদহনের সুরভি গন্ধে মোহিয়া বাসর গেহ,
হৃদয়-পাত্রে অতি মমতায় রাখি' প্রেম-অনুলেহ,
পথপানে চাহি' কাটিল রজনী, জলভরা দু'টি আঁখি
যেন নিরুপায় বদ্ধ খাঁচায় মাথা খুঁড়ে মরে পাখী!

হায় সখী হায়! বেদনা ঘনায় নিবিড় মেঘের বুকে,
পুলকে শিহরি' ময়ূর-ময়ূরী নাচিছে সকৌতুকে,
বিজলি সমান অথির সকলি, হাসি ও রোদন মিছে,—
সুখ যদি টানে সম্মুখ পানে, দুঃখ টানিছে পিছে!
অনুরাগ-রাগে বৈভব জাগে রঙীন গোলাপ ফুলে
কাঁটার যাতনা তুমি কি জাননা? দেখনি কি ফুল তুলে?
বুকের উপর সে ফুল শুকায় গন্ধ উবিয়া যায়
ধূলায় ধূসর ঝরা ছেঁড়া ফুল উড়ে উত্তর বায়।
উচাটন-মন কেতকীর বন গন্ধে আমোদ করে
জাননা কি ধনি, বিষধর ফণী তারই তলে ফণা ধরে?

ভরা জ্যোৎস্নার আসিল জোয়ার সেই ত' সর্ব্বনাশী!
বসন্তশোভা মলিন হ'ল যে বিফল পূর্ণমাসী—
খুলে রেখেছিলে কুঞ্জ-দুয়ার, রচি' মঙ্গল ঘট
আশা রাগিণীরে বিফল করিয়া নেমে এল ছায়ানট।

চেয়ে দেখ সখি, সোণালি মেঘের থর নেমে গেছে জলে,
কমলদহে কি মনের আগুন পড়িতেছে গলে গলে?
সোণার কমল মেলিতেছে দল কলমীলতার বনে
ওপারের চখা এপারে আসিয়া মিলিল চখীর সনে,—
—তাই দেখে তোর চোখে জল আসে? আসিতেও পারে সখি,
ঐ দেখ্ ফিরে চখারে ফেলিয়ে উড়ে ওপারের চখী—।
ব্যর্থ বাসর? কিবা ক্ষতি তোর? ভরা প্রেম-অনুরাগে
হৃদয়ের রঙে রঙীন হইয়া প্রভাতের প্রেম জাগে।

ধর্ম্ম ও সমাজ

[স্বামী বাসুদেবানন্দ]

বিপর্য্যয়

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি, মানব সভ্যতার আজ এক দারুণ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। * পৃথিবী তার পুরাতন বাস ত্যাগ করে আজ নূতন বস্ত্র গ্রহণেচ্ছু। এই পরিবর্ত্তন ফুটে উঠছে মানবের প্রত্যেক বিশ্বাস, ধারণা, লক্ষ্য এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক প্রাচীন সত্য অটুট কিনা, তাই প্রশ্ন উঠেছে। যে সব সত্য এক সময় অভ্রান্ত বলে' পরিচিত ছিল, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তা মিথ্যায় পরিণত হওয়ায় সারা জগৎময় একটা সাড়া উপস্থিত হয়েছে। এ যেন ঠাণ্ডার মধ্যে লালিত একটা জীবকে হঠাৎ বিষুবের গরম আবহাওয়ায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। সত্য ও ব্যবহারের সংঘর্ষেই আজ সমগ্র মানবসমাজে এ প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি।

মানুষের দুটো দিক চিরকালই থাকবে, একটা আত্মিক আর একটা দৈহিক। যতই যুক্তিজাল বা পরীক্ষা, অভিজ্ঞতার নিদর্শন বিস্তৃত করে' ঐ প্রথম দিকটা অস্বীকার করবার চেষ্টা কর, সে সকল যুক্তির আগে মাথা তুলে দাঁড়াবেই, কারণ নিজের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হ'লে কোনও দর্শন বিজ্ঞান কোন কালে দাঁড়াতে পারবে না। সেটা যে নেই তা ত' বলবার যো নেই। যদি না থাকত তবে সেটাকে অবলম্বন করে' এত দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, এত বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক, এত বুদ্ধ খৃষ্ট বেরুল কোথা থেকে? আমরা আত্মার বাস্তবতায় বিশ্বাস করি, কারণ দেখেছি তার প্রগতি চিরকাল ধরে' চলেছে, জড়বাদের পাশাপাশি। প্রত্যক্ষ যদি প্রমাণ হয়, আর সকলেই যদি তা প্রত্যক্ষ করে, তবে তাকে অস্বীকারের উপায় কি? তবে বলতে পার, আমার মনোমত সমাজ তাতে গড়া যায় না, আমি সমাজের অনুযায়ী সত্য চাই, সত্যের অনুযায়ী সামাজিক প্রগতি চাই না।

পাশ্চাত্য গড়েছিল দেহ, প্রাণের সন্ধান তারা পায়নি, কাজেই সে দেহে ধরল পচন। প্রকৃতি তার রক্ষার জন্য তাই প্রাণের উৎস খুলে দিলেন প্রাচ্যের মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, যা ছিল সেখানে গোপন হ'য়ে। এই নিরুদ্ধ উৎসের সন্ধান প্রতীচ্য কত রকমেই না করেছে। কেউ বললে ওটা বোধ হয় মনের একটা ছায়া—ওটা ঠিক স্বপনের মত মানবের মনে তন্দ্রার আবেশ এনে দেয়। কেউ বল্লে পরপারে প্রাণের সন্ধান যারা করে তাদের পথ্যের ব্যবস্থা কর। প্রাচীন ছাঁদি কথা তাদের মনে স্থানই পেলে না। কেউ বল্লে, সব জিনিষেরই যখন কারণ আছে, তখন এ প্রাণেরও কারণ আছে, তার যদি কারণ না থাকে তবে জগতেরও কারণ নেই, তখন ও পরীর রাজ্যের অনুসন্ধানে কি ফল? ইতিহাস ত' কখনও তাকে কারুর সামনে ধরে দিতে পারে নি! মানুষ যে সুখদুঃখহীন, ক্লম-ক্লেদহীন স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করে সেটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে জগৎটা একটা অনর্থ ও অন্যায়ের জায়গা, কাজে কাজেই বলতে হয়, যে এটাকে সৃষ্টি করেচে সেও তাই। জগতে দুঃখদৈন্যের যাতনায় যখন মানুষ চীৎকার করে' বলে, 'হে বিধাতা! এর প্রতীকার কর।' বিধাতা থাকেন নীরব। এটা নাস্তিকতার একটা কত বড় প্রমাণ। অতএব হে মানব, দেহ নিয়ে থাক, প্রাণের অনুসন্ধান ক'রো না— ও চেষ্টা বিফল।

কেউ বল্লে, প্রাণ-বিজ্ঞানটিজ্ঞান যা কিছু হয়েছে ঐ সরল বিশ্বাসী অল্প-বুদ্ধি মানবের জন্যে। কিন্তু যেদিন আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে সেদিনই তার মনে জিজ্ঞাসা এসে উপস্থিত হ'ল—সেই জিজ্ঞাসা আজ মূর্ত্ত হ'য়ে কুসংস্কারের হিমালয়ের ওপর তার বাক্-বজ্র নিক্ষেপ করলে—'দেখে শুনে বুঝে খতিয়ে নেব।' সেই মহামুহূর্ত্তে মানব তার কৈশোরের রূপ-কথা ছিঁড়ে ফেলে যৌবনে পদার্পণ করলে। এখন যথার্থ প্রমাণ কী, তার অনুসন্ধান করতেই হবে। পুরানো মতামত এখন নতুন করে' শাস্ত্র ব্যাখ্যা যে করছে ওসব কিছুই নয়। ও যেন ঠিক ডোববার সময় মানুষের খড়টা আঁকড়ে ধরা। খৃষ্ট ধর্ম্মের নব ব্যাখ্যায় অতীতের প্রতি সম্মান আছে সত্য কিন্তু তাতে বুদ্ধির সততার হানি

* গত পৌষ সংখ্যা "উপাসনা" দ্রষ্টব্য।

হচ্ছে। কেউ বল্লে, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে ধর্মের অনুষ্ঠানের চিরবিরোধ। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নিষ্ঠুর অদৃষ্ট এই জগতের পেছুনে রয়েছে, যার কাছে পাপও কিছু নয়, পুণ্যও কিছু নয়, তাকে বিশ্লেষণ ক'রতে যাও, দেখবে অন্ধকার। কেউ বল্লেন, বাস্তব যুক্তি না থাকলেও ওটাকে অস্বীকার করবারও কোনও যুক্তি নেই—থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কেউ বল্লেন, ও মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, ও নিয়ে মাথা ঘামান নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ; কেউ বল্লেন, ও জিনিষ একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না, সমাজ ও শাসন সুশৃঙ্খলায় চালাবার জন্য ও ধারণার মূল্য ও উপকারিতা আছে। এবং সকল ধর্ম্মের অধিকাংশ লোকেরাই বলেন, ওর সত্যাসত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তবে অনুষ্ঠানগুলো যেমন বরাবর চলে আসছে তেমনই থাক, ওতে আমাদের যথেচ্ছাচারিতার কী ক্ষতি হচ্ছে? অপরে তার উত্তরে বল্লেন, মৃতেরা জীবন্তের শাসন করতে কখনও সক্ষম নয়। অতীতই যে জ্ঞানের একচেটে ব্যবসা খুলে বসে থাকবে, তা কখনও হতে পারে না।

কিন্তু তর্ক করে', ইন্দ্রিয় দিয়ে সে জিনিষ কি পাওয়া যাবে? বাইরে যতই অনুসন্ধান কর, বৃথা চেষ্টা। সে জিনিষ তোমার ভেতরই, তা তোমারই স্বরূপ। জড়ের রাজ্যে, ভোগের আবিলতায়, ইন্দ্রিয়ের স্বপ্নে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ। তার অনুসন্ধানের রাস্তা আমরা জানি। তাকে অনুভব করা যায়, অপরকেও অনুভব করান যায়। জড়শক্তির অনুসন্ধানে যে প্রযত্ন করেছ, তার অনুসন্ধানে একতিলও চেষ্টা ব্যয় করনি, অথচ ব'লছ সে জিনিষ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বেদান্তের উচ্চ আদর্শ সামাজিক বাস্তবতায় পরিণত করা যায় কি না? মনের ওপারের সত্যকে অবলম্বন করে বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হতে পারে কি না? স্বামিজী ব'লছেন, "Truth does not pay homage to any Society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die"—সত্য কোনও সমাজের নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে পারে না—তা সে যতই প্রাচীন বা সে যতই নতুন হোক, সত্যের অনুযায়ী সমাজ গঠিত হবে, সমাজের অনুযায়ী কখনও সত্য গঠিত হ'তে পারে না। * পশুবলের গর্ব্ব বা পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়ধ্বনি করলে মানব সমাজ এক ইঞ্চিও এগুবে না, যদি তা সত্য সমন্বিত না হয়—যদি তার মধ্য দিয়ে উচ্চ সত্য উপলব্ধ না হয়। সত্য দেখে ভয় করা কি গর্ব্বের পরিচায়ক? টাকা পয়সা এবং লোকসংখ্যা গুণতি করা ছাড়া কি জগতে আর কিছুই করবার নেই? আমরা বলি সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যেখানে অতি উচ্চ সত্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

তবে গোটা মানবসমাজের সম্পূর্ণতা সাধন ক'রতে হ'লে দুটো দিকেরই পাশাপাশি উন্নতি চাই। দেহের দিকটার সুখসুবিধা যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু শান্তি সুখ ত' এল না। তাই জড়ের উন্নতি ছেড়ে এখন আত্মার দিকে নজর দিতে হবে, বুদ্ধির চাইতে নীতির দিকটা বেশী দেখতে হবে, শাসনের পরিবর্ত্তে অনুশীলন, আইনের পরিবর্ত্তে অদৃষ্টের সন্ধান বেশী ক'রতে হবে। অনন্তকে শান্তের মধ্যে দেখতে হবে, আদর্শকে খাওয়াপরার মধ্যে অনুভব ক'রতে হবে। আদর্শের প্রতীক খৃষ্ট তাই ব'লেছিলেন, "তোমাদের আহারের জন্য এই নাও আমার রক্ত, এই নাও আমার মাংস।"—অর্থ হ'চ্ছে, আদর্শকে বাস্তবতার মধ্যে অনুভব কর। সে আদর্শ কি? মানবের সমগ্র কল্যাণগুণের সমষ্টি ভগবান। এই আদর্শ আছে ব'লেই মানব তার পশুজীবন থেকে এতদূর এগিয়ে এসেছে। আর আজ যদি সে কাম ও লোভের আদর্শ গড়ে' তারই অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকত তা হ'লে তার পূর্ব্বপুরুষদের চাইতে সে এতটুকু নিজেকে উন্নত বলে' মনে করতে পারত না।

এখন দেখা যাচ্ছে, প্রাচ্য সাহিত্য ও ধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রতীচ্যের মোহমুগ্ধ অন্তরে চেতনার বিকাশ করে তুলছে। কেউ কেউ তাদের মধ্যে আত্মস্থ হ'য়ে দেখছে, তার গার্হস্থ্য জীবন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—বিগত যুদ্ধ, ফ্রয়েড মনো-বিজ্ঞান, জন্মসংযমনের ফলে তার বিবাহজীবন কি মলিনতায় পর্য্যবসিত, তার সংযম, তার নীতি কতদূর ফিকে হ'য়ে পড়েছে—স্ত্রী ও পুরুষের কর্ত্তব্য গৃহ-সংঘে পরস্পরকে অতিক্রম

* এই সম্পর্কে প্রতীচ্যের আইনষ্টাইন আর প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথে সেদিন যে কথোপকথন হ'য়েছে, পাঠককে তা' মনে করিয়ে দিতে চাই।

করে' কী ভয়াবহ বিপর্য্যয়ই না সৃষ্টি করেছে। পবিত্রতায় সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় মাতৃত্বের জায়গায় অভিনেতৃত্ব সমাজে ফুটে উঠছে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, সৃষ্টি-শক্তির দোহাই দিয়ে অসংযমই প্রবল বেগে বেড়ে চলেছে। বন্য মানুষ যে পশুর ওপর বড় হ'ল—তার সদাচার, তার সংযমের মধ্য দিয়ে, এ কথা ভুলে গিয়ে সে বল্লে, কালে যখন আমরা পশুই ছিলাম এখনও তাই থাকব। ব্যভিচারটা কিছু নয় ওটা—self expression (আত্ম-বিকাশ)।

এদিকে নারী বল্‌ছে, ছোটও নয় বড়ও নয়—আমরা নরের সমান। আধুনিক এক শ্রেষ্ঠমানব স্বাধীনাদের তরফ থেকে ওকালতি করে বল্লেন, "যেটাকে আমরা নারীর কপটতা ভাব্‌ছি সেটা তার কপটতা নয়, সেটা সৃষ্টিশক্তির একটা প্রচণ্ড প্রেরণা। যেটাকে আমরা নারীর ত্যাগ বলছি, সেটার একটা উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যটা তার নিজের নয়—প্রকৃতি তার নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে ঐ নারীর মধ্য দিয়ে যার হাতে নর ক্রীড়া পুত্তলি। সৃষ্টি ব্যর্থ হবে ব'লেই নারীর নরের প্রতি এত সহানুভূতি, নরের তৃপ্তির মধ্য দিয়েই সে তার কার্য্য সাধন করে নেয়, কিন্তু নর যে ভাবে নারী একটা সুখের যন্ত্র, তার জন্য সে তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। তারা চায় না যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা শিল্পী তাকে একটা পরীক্ষার বিশ্লেষণের বস্তু বলে' গ্রহণ করে আত্মতৃপ্ত হয়। *

এই হ'ল আধুনিক নারীর মনের কথা—এ থেকেই হ'ল নারীজাগরণের সৃষ্টি—তাই সাহিত্য ও সমাজে এত ঘাত প্রতিঘাত—তাই প্রশ্ন, নারীর পক্ষে যা পাপ, নরের পক্ষে তা হবে না কেন? পুরোহিত ব'লছে, 'সামান্য টাকার জন্য পতিতার বিবাহ সঙ্গত হ'তে পারে?' স্ত্রীলোক ব'লছে, 'আমার বিবাহ যদি সঙ্গত হয়, তবে ও বিবাহও সঙ্গত; কারণ, আমার স্বামীও যে বিবাহের পূর্ব্বে পতিত ছিল।' †

এদিকে পাশ্চাত্যে নারীরা যত উপার্জ্জনক্ষম হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, ততই বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও বেড়ে উঠছে, শিশুর দলও বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেদিয়ার জীবন যাপন করায় বাড়ীর আনন্দ ভুলে যাচ্ছে। তারা বলে, শাস্ত্রের কথা শুনবে কে? তার দেবতারা ব্যভিচারী, তার সমাজকর্ত্তারা স্বার্থপর, নিজেদের ভুলগুলো অবাধে হজম করে, নারীকে সহস্র নাগপাশে বন্ধন করছেন। কারণ নারীর আত্মা নেই, মুক্তি নেই, সে জন্ম থেকেই নীচ অশুচি জ্ঞানে তার অনধিকার, পৃথিবী ও স্বর্গে সে ভোগের বস্তু, গোলামী তার পেশা তার উলঙ্গ ছবি ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন—বর্ত্তমান পুরুষগঠিত সভ্যতায় এই হ'লো নারীর স্থাননির্দ্দেশ।

পণ্ডিতেরা এখন বলাকওয়া আরম্ভ করেছেন যে, এ বিপ্লবাবস্থায় সমাজের বেশীদিন থাকা উচিত নয়। কিন্তু সমাধানের উপায়ও কিছু স্থির করতে পারছেন না। নাস্তিকেরাও ব'লতে আরম্ভ করেছেন, নবীনতার দ্বিপ্রহরে অতীতের রাহাজানি অসহ্য বটে কিন্তু বর্ত্তমানেও ত' আমরা সুখ শান্তি পাচ্ছি না। তাই আমাদের মনে হয়, অর্জ্জুন যে তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন, "কৃষ্ণ, যুদ্ধ করতে ত' বলছ, কিন্তু এতে যে বর্ণসংকর হয়ে জাতি ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়া হবে।"—হয়েছিলও তাই, যদু-বংশের ধ্বংসের পর যদু-স্ত্রীদের হরণ করলে আভির জাতেরা। এই ধ্বংসলীলা আবার পুনঃ কেন্দ্রীভূত হ'বার জোগাড় হয়েছে—যা মানব-সভ্যতার এমন সর্ব্বনাশ করবে, যা থেকে আবার উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে দীন প্রজার যে কত যুগ অতীত হবে তা কে বলতে পারে। কিন্তু ধ্বংসমুখী মানব কিছুতেই চুপ করবার নয়। সে বলছে জীবনই মানবের শেষ সম্পদ, যেমন করে পার ভোগ কর। পাপের মধ্যেও বীরত্বের আনন্দ আছে। কামবৃত্তিটার অস্তিত্বই হচ্ছে তার

* Vitality in a woman is a blind fury of creation. She sacrifices herself to it.
It is the self-sacrificing women that sacrifice others most recklessly. Because they are unselfish, they are kind in little things. Because they have a purpose which is not their own purpose, but that of the whole universe, a man is nothing to them but an instrument of that purpose. * * They tremble when we are in danger, and weep when we die; but the tears are not for us, but for a father wasted, a son's breeding thrown away. They accuse us of treating them as a mere means to our pleasure; but how can so feeble and transient a folly as a man's selfish pleasures enslave a woman, as the whole purpose of nature embodied in a woman can enslave a man?
— *Man and Superman* by Bernard Shaw.

† *Ghosts*—Henrik Ibsen

যথেষ্ট কৈফিয়ৎ। উচ্চ চিন্তার সঙ্গে ভোগের কোনও সম্বন্ধ নেই। খুব বড় মস্তিষ্কবান লোকেও এ বৃত্তি দেখা যায়। প্রকৃতির ইতিহাসে ত' সবই সমান— আজ যেটা ভাল, কাল সেটা মন্দ। যতদিন জীবন আছে, ততদিন সুখের পেয়ালা নিশ্বাসের পর নিশ্বাসে পান করে যাও, মৃত্যুর চিন্তা মনে তুলো না, জড়-শক্তির সংযোগে এটা জমাট বেঁধেছিল, আবার তার বিয়োগে সেটা ভেঙে যাবে। দুঃসাহসিকতার অভিমানে জীবনকে চালিয়ে যাও। জৈবী শক্তির বিকাশ ও স্ফূর্ত্তিই হ'চ্ছে একমাত্র মঙ্গল। এর নিরোধে রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ হ'য়ে জাতির ধ্বংস।

আমরা বলি, শিশু মানব একটু ধীরে, একটু ভেবে তবে অন্ধকারে লাফিয়ে পড়। কৈশোরের ক্রীড়াই ত' মানব প্রগতির সব নয়? দর্শন, বিজ্ঞান, অনুশীলন সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়, যদি তাতে ত্যাগ, প্রেম এবং ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের অনুসন্ধান না থাকে। ইন্দ্রিয়েতে বদ্ধ হয়ে জ্ঞানের অভিযান, নোঙড় ফেলে দাঁড় টানার মত বৃথা শ্রম। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ যতই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হোক না কেন, সে রূপ, রস, স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। নিম্ন ও উচ্চ স্তরের প্রাণীতে ভোগ ও আনন্দলিপ্সা সমান, একটু রকমফের মাত্র। দেবত্বহীন হ'য়ে প্রকৃতি থেকে যতই না শক্তি নিঙড়ে বার কর, ততই সর্ব্বনাশের অন্ধকারের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে। অতএব শান্তি ও আনন্দের সন্ধান প্রাচ্যের অরণ্যে, নীরবতার মধ্যে অনুসন্ধান কর।

তারপর ইউরোপের ভীষণ যন্ত্র-রাজ্য! যন্ত্র মানুষের পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু আর একদিকের আলস্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। মানুষ ভেবেছিল অবসর কালে তার কৃষ্টি ও শ্রম-শিল্প প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু ফলে দাঁড়াল, শিল্পের দক্ষতা ও ঐশ্বর্য্য যা ব্যাপক ভাবে দশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, তা একীভূত হয়ে ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ হওয়ায় মস্ত একটা অন্নসমস্যার সৃষ্টি করে' ব'সল। যান্ত্রিক, ব্যক্তির শিল্পপ্রতিভা গ্রহণ করে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তা বহুগুণিতাকারে, দশের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ এক জায়গায় স্তূপ সাজাচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ায় সৃষ্টিচাতুর্য্যের রহস্য, সৌন্দর্য্যবোধ, শিক্ষায় শ্রদ্ধার হানি হয়েছে, কাজে কাজেই দক্ষতাও আর তেমন নেই। কর্ম্মীর সকল প্রচেষ্টা এখন কী করে' কত শীঘ্র, কত বেশী জিনিষ সৃষ্টি করতে পারা যায়। যন্ত্রী যদি অতি শীঘ্র অসংখ্য মৃত্যুর বাণ না জোগাতে পারত তাহলে বিগত মৃত্যু-যজ্ঞের অগ্নিও এত বিরাট আকারে গগনস্পর্শী হ'তে পারত না। যমরাজ মানবাকারে মানুষকে শেখাচ্ছেন, এই যে আমরা কামানবন্দুক তৈরী করে সকলের হাতে তুলে দিচ্ছি, এতেই জগতে সাম্য আসবে। সবল দুর্ব্বল উভয়ের হাতেই যদি একটা বিভলভার থাকে, তখনই তারা নিজেদের সমান বলে' মনে করে। দরিদ্র এবং কাপুরুষেরাই দারিদ্র্যকে আশীর্ব্বাদ বলে' গ্রহণ করেছে। ধর্ম্মই দুর্ব্বলের বিষদাঁত ভেঙে দেয়। যে সাধু ও নিঃস্বার্থ সে নিজের গণ্ডা একেবারেই বোঝে না, যে সুখী সে বিপ্লব চায় না, যে পরলোকে বিশ্বাসী তার সমাজ-তন্ত্র বা শ্রমিক সংঘে আস্থা নেই, কাজে কাজেই দারিদ্র্যই তার একমাত্র ঈপ্সিত। * এই মন্ত্র গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ও তার শিষ্যেরা জগতে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে।

* Undershaft.—Leave it to the poor to pretend that poverty is a blessing: leave it to the coward to make a religion of his cowardice by preaching humility.

Cusins.—I don't think you quite know what the army does for the poor.

Undershaft.—Oh yes I do. It draws their teeth: that is enough for me—as a man of business—

Cusins.—Nonsense! It makes them sober—

Cusins—Honest—

Und.—Honest workmen are the most economical.

C.—Attached to their homes—

U.—So much the better: they will put up with any thing sooner than change their shop.

C.—Happy—

U.—An invaluable safeguard against revolution.

C.—Unselfish—

U.—Indifferent to their own interest which suits me exactly.

C.—With their thoughts on heavenly things—

U.—And not on Trade Unionism nor Socialism. —*Major Barbara* by Bernard Shaw

কর্ম্ম-মদিরা-পানোম্মত্ত মানব তার কর্ম্মের আনন্দ হারিয়েছে। সারা দিন গরু মোষের মত খেটে সন্ধ্যায় তার নাকের দড়ি খুলে ফেলে ছুটল নরকে নরকে। কর্ম্মে তার প্রাণ নেই, প্রাণ পড়ে থাকে তার ঐ আসব ও রূপের দোকানে। প্রয়োজন যেমন আবিষ্কারের হেতু, অবকাশ ও নির্জ্জনতাই হচ্ছে শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের কারণ। কিন্তু কাজের ছটফটানির মধ্যে থেকে থেকে চাঞ্চল্য অভ্যাসে দাঁড়ায়। এই দ্বিতীয় প্রকৃতি এবং উচ্চচিন্তাহীন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা তাকে দিনরাত অনাত্ম উত্তেজক সুখ খোঁজাচ্ছে। সে দোকান ছাড়া কাজ করতে পারে না, জনতা ছাড়া উপভোগ ক'রতে চায় না, দল নইলে ভ্রমণ তার নিরর্থক হ'য়ে যায়, সঙ্গী ছাড়া পাপ ক'রতে পারে না, সম্প্রদায় ছাড়া ধর্ম্মও তার অসম্ভব। মানবজীবনে সংহতি, সমবেততার একটা দিক আছে সত্য, কিন্তু আর একটা দিকও যে আছে, সেটা শুধু বিশিষ্ট দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীর জন্য নয়, সকল মানবের জন্য, যাকে অবজ্ঞা ক'রলে মানবজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যেটার স্থান হচ্ছে বনানীর শান্ত ছায়ায়, নদীতটে, শ্যামল ক্ষেত্রে, পর্ব্বতশিখরে, সমুদ্রের উপকূলে, গুহা-গহ্বরের গভীর নির্জ্জনতায় যেখানে আত্মা ও মনের সংযোগে আনন্দ ও শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যেটাকে অস্বীকার ক'রলে মানবের মধ্যে দেবতার অনুসন্ধান কোন কালেই মিলবে না। অত্যাচারী কর্ম্মের উত্তেজনায় এবং তাড়নায় সে আদর্শ ভুলে, কুবেরের আধিপত্য স্বীকার ক'রতে হবেই।

যন্ত্র-যুগে স্বর্গের একমাত্র ছাড়-পত্র কাঞ্চন। কাঞ্চন কাছে থাকলে, "উটও ছুঁচের মধ্য দিয়ে অক্লেশে রাস্তা করে' নিতে পারে।" মতলব হাঁসিলই হচ্ছে আদর্শ, তা যে কোনও উপায়ে, যে কোনও মূল্যে, যে কোনও পাপের দ্বারা। একজন বড় লোকের মেয়ে তার বাপকে জিজ্ঞেস করেছিল, তাঁর ধর্ম্মমত কি? বাপ উত্তর দিয়েছিল আমি মত টত বুঝি না, আমি এই পর্য্যন্ত জানি—আমি **millionaire**—আমি কোটিপতি—এই আমার ধর্ম্ম, এই আমার জাতি। যান্ত্রিক যুগের পূর্ব্বে বণিকের স্থান ব্রাহ্মণের অনেক নীচে ছিল। বিবিক্ত দেশসেবী, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, চিত্রের নির্জ্জন সাধকেরাই অবস্থানুযায়ী সমাজের বিধানকর্ত্তা ছিলেন। তখন দারিদ্র্য পাপ বলে' গণ্য হত না, কাঞ্চন-কৌলিন্যের শ্রেষ্ঠতা দেখে ব্রাহ্মণকে টাকার ব্যবসায়ে মঁজতে হ'ত না। ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতার লোভে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে গৃহহীন হ'য়ে হোটেলে বেদিয়ার জীবন যাপন ক'রতে হ'ত না। প্রমাণ আমেরিকা ও রাশিয়া। দাম্পত্যজীবন অধিকতর সুখসম্পন্ন করবার জন্য রাশিয়ার এক শক্তিমান পুরুষ এক পাগলামীর পরোয়ানা জারী ক'রলেন, "পারিবারিক জীবন থেকে কাপড় কাচা, রান্নাবান্না, ছেলেপুলের লালন-পালন, শিক্ষা তুলে দিলেই স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে অধিকতর সম্ভোগ করতে পারবে। সব কাজ দোকান ও বিদ্যালয় থেকে নিতে হবে।" ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানব এর ফলে কেঁচোর মত জড়, পাথরের মত স্নেহহীন হ'য়ে দাঁড়াবে।

তারপর যন্ত্র সর্ব্বদাই ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে চীৎকার করছে, কাজ, কাজ, কাজ নইলে তার গায় মরচে পড়বে। কাজে কাজেই ঐ রাক্ষসের পেট ভরাবার জন্য মানুষকে অভাবের পর অভাব বাড়িয়ে যেতেই হবে। জড় প্রগতির মন্ত্র হচ্ছে, "চাই, চাই, নইলে বড় জ্বালা।" তাই প্রতি আবিষ্কারের সঙ্গে তার মনের মরুভূমিটাই সাহারার মত বেড়িয়ে পড়ছে।

এরপর একবার পাশ্চাত্য রাজনীতির গণতন্ত্রের দিকটা আলোচনা করা যাক। ডেমক্রেসির মন্ত্রে বেসটাইলের কারাগৃহ, যা জাতির উপর ব্যক্তির অত্যাচারের চরম নিদর্শন—ধ্বংস হ'য়েছিল সত্য, এখনও কিন্তু কেউ বুকে হাত দিয়ে তার পূর্ণতার হলফ করতে নারাজ। ওটাও একটা যন্ত্রের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঐ শিল্পে দক্ষ যে সেই সেটা বেশ চালাতে জানে, সাধু বুদ্ধিমানের স্থান হওয়া বড় কঠিন। 'যেন তেন প্রকারেণ' নীতির অবলম্বন সত্য-নিষ্ঠের পক্ষে অসম্ভব। বিবেকের অনুযায়ী ভোট দেওয়া, প্রাণ খুলে বিচার করা, সব সময় সম্ভব নয়। ফলে ডেমক্রেসি একটা নামেই দাঁড়িয়ে যায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সর্ব্বনাশ হয়ে, কার্য্যে ও চিন্তায় অপরের মনস্তুষ্টি বিধানই বিবেকের স্থান অধিকার করে বটে। বুদ্ধি নিয়মিত হয় খবরের কাগজ পড়ে'—যাতে প্রত্যেক সাবান, তামাক, ওষুধ যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নেতার শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনও ঠিক

তেমনি। প্রপাগ্যাণ্ডার দাপটে নীতি ও বিজ্ঞানও যেমন ব্যাপক হচ্ছে, সমন্তরাল ভাবে মিথ্যাও ঠিক তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ নিজের স্বার্থটাকে, বৈজ্ঞানিক উপায়ের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলে, সাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীন চিন্তার বিলোপ করে' ডেমক্রেসির জয় ঘোষণা করচে। তাই আমরা বলি, সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ যার ব্যক্তি চিন্তাশীল কিন্তু প্রেমে সমবেত, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যে তার গৃহস্থকে অযথা বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ করে না, সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ যাতে সর্ব্ব স্তরের উপাসনারই স্থান আছে, সেই ব্যক্তিই মহান যার চিন্তা এবং কার্য্য অপরের অনিষ্ট সাধন করে না, তাহাই ইষ্ট যা ব্যক্তি ও সমষ্টির বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ জয়-যাত্রার শিবকরী

এই যে বিপর্য্যয় চলেছে, তার মনস্তাত্ত্বিক দিক হচ্ছে, অপকৃষ্টে উৎকৃষ্টে অথবা উৎকৃষ্টে উৎকৃষ্টতরে। ঠিক ঠিক ব'লতে গেলে বলতে হয় ঝগড়াটা ভাল মন্দ নিয়ে নয়, উপলব্ধির নিম্ন নিম্নতর স্তর বা উচ্চ উচ্চতর স্তরের প্রাধান্য নিয়ে। এখন কোনটা মানবপ্রগতির উচ্চ এবং কোনটা নিম্ন সেটা ঝোঁকের মাথায় বোঝা বড় দায়। যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাতে যারা সন্তুষ্ট, তাদের আমরা বলি সাধারণ শান্তিপ্রিয়—তারা খারাপ কখনও নয়। যারা সেই সত্যের অনাচার করে, তাদের আমরা বলি আসামী এইটাই দোষের। আর যারা নতুন সত্যের পরিপন্থী, তাদেরই আমরা বলি বিদ্রোহী—এই বিদ্রোহীদের মধ্যে যিনি অধিক ও ব্যাপক সত্যের দ্রষ্টা তিনি হলেন অতিমানব। কিন্তু তমে ও সত্ত্বে যেমন গুলিয়ে যায়, অল্পলোক ও তীব্রলোক যেমন একই অন্ধকারের সৃষ্টি করে তেমনি আসামী ও বিদ্রোহীর বিচার করা বড় কঠিন। একটা ডাকাতের দল যখন তার হিংসাবৃত্তি ও স্বার্থের জন্য লোকের সর্ব্বনাশ করে তখন তাকে বিদ্রোহী বলা চলে না তাকে ডাকাত বদমাস্ বলতে হয়। এদিকে নিজেদের অক্ষমতা, অপর দিকে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যখন অপরের সুস্থ অঙ্গ থেকে পরগাছা বা জোঁকের মত গোপনে আহার সংস্থান করে তখন তাকে সরিয়ে ফেলতে হবেই। সেই জন্য এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে মাপকাঠি ধরতে হবে ত্যাগকে। ত্যাগ জিনিষটাও বোঝা বড় কঠিন। দেশের জন্য খুব বড় কাজ করছি, অথচ আত্মসুখ ও মর্য্যাদার খাতিরে প্রথম ও দ্বিতীয় রিপুদুটির যদি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হতেই দেখা যায় তা হ'লে বাধ্য হয়েই আমাদের ব'লতে হবে যে দেশাত্মবোধ সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয়—ভারতের সাধনার তাতে অপচয় ছাড়া উপচয় হবে না। খুব কঠিন হ'লেও, ত্যাগের লক্ষণ হচ্চে প্রেম—তাতে হিংসাবোধ আসতেই পারে না। নবজাগরণের প্রথম চক্ররেখা যে ভারতবর্ষ, তার কেন্দ্র হোলো এই প্রেমে। হিংসা হিংসার দ্বারাই, অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারাই, কূটনীতি কূটনীতির দ্বারাই ধ্বংস হবে— আজ না হয় কাল— সাক্ষ্য তার ইতিহাস। যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গে গেলেও, তার হিংসার ফলটুকু দেবতাকেও ভুগতে হবে। দেহ ও মনে যদি একটুকু হিংসা ও কূটনীতি থাকে তা অতি বড় ধর্ম্মবীরকেও ভুগতে হবে। চৈতন্যের উন্মেষে ত্যাগের উৎপত্তি, উচ্চ-সত্যের আগমনে তার বৃদ্ধি, বাস্তব জীবনে তার উপলব্ধির প্রেরণাই মানুষকে তপস্বী ত্যাগী করে।

গারদ

[শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়]

গ্রাম ছাড়িয়া সহসা সহরে আসিয়া পড়িয়াছে। অতি-পরিচিত ক্ষুদ্রতম গণ্ডী হইতে একটা অপরিচিত বৃহত্তম গণ্ডীর মধ্যে আপতিত দেখিয়া সে কূল কিনারা করিয়া উঠিতে পারে না, দিশাহারা হইয়া যায়। মনে হয়, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে সে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছে।......

বোল্‌তা ও ফড়িং ধরিয়া তাহাদের সূতায় বাঁধিয়া উড়ানো, জোঁক ধরিয়া তাহাকে লবণের মাঝে ফেলিয়া রক্তাক্ত করা, প্রজাপতির রঙীন্ পাখ্‌না খসাইয়া লইয়া পলায়ন-তৎপর ছোট মেয়েটির কপালে আঁটিয়া দেওয়া, জলতলের গতিশীল মাছের গায়ে নিষ্ঠুর কোঁচ বিঁধিয়া তাহাকে গতিহারা করিয়া ছাড়া, সাপের মুখের ব্যাঙ্ কাড়িয়া আনা, গাছে গাছে পাখীর বাসার সন্ধানে ফেরা,......একটি চঞ্চলচিত্ত বেপরোয়া বালকের খেয়াল।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় বাঁশী হাতে সংস্কারবর্জ্জিত অতি পুরাতন ভাঙ্গা শিবমন্দিরের ততোধিক ভাঙ্গা সিঁড়িটির উপর আসিয়া কামনাশূন্য হইয়া মাথা নোয়ান'......সেও তাহার খেয়াল।

গ্রামের কন্যা ও বধূদের মিষ্ট মুখনাড়া, বনের পাখীদের কাতর অভিযোগ, খেলার চপল সাথীদের করুণ চাহনি, ভগ্ন-দেউলের দেবতাটির নীরব শাসন,......কিছুই সে মানে নাই।

পাষাণের চেয়েও নির্ম্মম কঠিন খেয়ালী বালক—

সে সব অতীত দিনের অর্দ্ধবিস্মৃত কাহিনী।

প্রচণ্ড উত্তাপ লইয়া প্রখর সূর্য্য মাথার উপরে বিরাট অগ্নিগোলকের মত ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। রাস্তা তাতিয়া পুড়িয়া কেমন খাঁ খাঁ করে। বৈশাখের খরদীপ্ত মধ্যদিন।....এসব অগ্রাহ্য করিয়াই তাহাকে সহরের বুকে ঘুরিয়া ফিরিতে হয়।

ঘর্......ঘর্......ঘর্......

হাতের ঘণ্টা টুং টুং করিয়া তালে তালে বাজিতে থাকে। রঙ্-বেরঙের জিনিষে সাজানো তিনচাকার গাড়ীটি ঠেলিয়া লইয়া চলে। ধরা-বাঁধা কোন পথ নাই।

চার চার আনা, মজার মজার খেল্‌না, কলের গাড়ী, চায়ের পিয়ালা, ছুরি কাঁচি, মমির পুতুল, হরেক রকম, হরেক রকম......

কেহ শোনে নাই ভাবিয়া আবার উচ্চকণ্ঠে হাঁকে, চার চার আনা.....চার চার আনা......

ঘণ্টাটা আর একটু জোর দিয়া বাজায়!

শান বাঁধানো গলির বাঁক ঘুরিতেই হয়ত কাণে আসিয়া লাগে কচি মেয়ের বায়না-ধরা কান্না। অমনি গাড়ী দাঁড়াইয়া যায়—নিতান্ত অভ্যাসের মত। দেখিতে দেখিতে তাহার ঘণ্টার ক্রমবর্দ্ধিত আওয়াজ পাড়ার যত ছেলেমেয়েদের মন্ত্রমুগ্ধের মত সেখানে টানিয়া আনে—কে কোন্ জিনিষটা লইবে, রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। তাহাদের চীৎকার ও হল্লায় আশেপাশের বাড়ীগুলির দরজা ও জানালায় ঘরের বধূদের হাতের বেহায়া চুড়িগুলি চঞ্চল হইয়া ওঠে,—প্রথম একটু লজ্জা—তাহাও কাটিয়া যায়, বলে, কিগো, ওতে কি আছে তোমার, দেখি?

কেহ আবার সাহস করিয়া দরজার বাহিরেও পা বাড়ায়, জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, পছন্দ হইলে দর কষাকষি করে, খুসি হইলে তবে দাম দিয়া রাখে, তার পরেও হয়ত' আবার বলে, কি সব্বনেশে দাম বাপু তোমার জিনিষপত্রের—

সে খুসিই হয়। আবার তাই হাঁকে, চার-চার আনা, চার-চার আনা।

টুং—টুং—টুং—

চারিদিকে ত্রস্ত একবার চোখ দুইটির দৃষ্টি বুলাইয়া লয়,—গ্রামের পরিচিত কোন মেয়েকে সহরে বধূরূপে যদি দেখিতে পায়।

ছয় আঙুলের হাতটা বাড়াইয়া তরঙ্গিণী বলে, কই, আজ কত পেলি দেখি?

ভোলা টিনের কৌটাটা তরঙ্গিণীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলে, ঐ ওতেই সব আছে, দেখে নাওগে।

তরঙ্গিণী মুখ ভার করিয়া বলে, কি রকম ?

ভোলা বলে, হুঁ, আমি কখ্খনও চুরি করি না, কোন দিন না।

অদূরে দাঁড়াইয়া পাঁচি হাসে।

পাঁচির রূপ ও লাবণ্যের কোন বালাই নাই। আছে স্বাস্থ্য, তাহাও আবার এমনই বিসদৃশ যে বিদ্রূপের মতই মনে হয়।

ভোলা রাগিলে তাই তাহাকে বলে, মুটকি কোলাব্যাঙ্ কোথাকার !

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতেই পাঁচির সাজগোজের ধুম পড়িয়া যায়। নিত্য একই সাজ, তবু আড়ম্বরের কোন ত্রুটি কেহ কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। তাহার সমস্ত বাক্স-পেঁটরা ঘাঁটিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা একখানি ধূপ-ছায়া রঙের ব্লাউজ—এখন গোলাপী বলিয়াই ভুল হয়; আর এক জোড়া জরি-উঠিয়া-যাওয়া জীর্ণ নাগরাই। আরও কিছু আছে—যাহা না হইলে পাঁচির একেবারেই চলে না;—পাউডারের পরিবর্ত্তে খড়ি। মুখের বীভৎস বসন্তের দাগগুলি তাহাতেও চাপা পড়িতে চাহে না। ভোলা তাহার সে ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া হাসিয়া মরে।

ভোলা কিন্তু সত্যই বোঝে না। বিধাতা পাঁচিকে লইয়া কেন এমন ব্যঙ্গ করে ? অবাক বিস্ময়ে তাই চাহিয়া থাকে।

এদিকে পাঁচি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথে সেই বিকৃত রূপ দেখাইয়া জঘন্য লালসা জাগাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবসন্ন দেহ লইয়া ফিরিয়া আসে।

এমনই দিনের পর দিন।

ভোলা তরঙ্গিণীর ঘরের এক পাশে মাদুর বিছাইয়া তখন তন্দ্রাভরে নিদ্রা যায়। কোন দিন আবার স্বপ্নও দেখে, সে মাছ—কোন্ নিষ্ঠুর তাহার প্রতি ধারালো কোঁচ তুলিয়াছে। পালাইবার পথ নাই। নিশ্বাস তাহার বন্ধ হইয়া আসে।

• •

নামহীন গলির ঠিকানাহীন বাড়ীটির কয় ঘর ভাড়াটের মধ্যে তরঙ্গিণীর হাতে কিছু পয়সা আছে,—সে তাহার অতীতের কুড়ানো কড়ি—ভবিষ্যতের সম্বল। এখন তাহার রূপও নাই, স্বাস্থ্যও নাই—সেদিকে সে দেউলিয়া হইয়া বসিয়াছে। এখন যা কিছু আছে—সে রাণুবই। রাণুর প্রশংসা করিবার মত রূপ নাই—আছে কণ্ঠ। স্বাস্থ্য অতি সাধারণ, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে তাহার অসাধারণ হাত। গড়ন ছিপছিপে, চলন-বলনের মধ্যে সুন্দর একটি সংযত ভাব,—বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক; কিন্তু পৃথক হইয়াও সে সকলের শত্রু হইয়া উঠে নাই। ঈর্ষ্যা তাহাকে সকলেই একটু করে হয়ত, কিন্তু প্রকাশ করিবার পথ সে তাহাদের রাখে নাই। আপনার হৃদয়ের সহজ স্বতঃ উৎসারিত সহানুভূতি দিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

প্রশান্তও ঠিক তাহারই মত ছিপছিপে লম্বা —সামনের দিকে একটু বেশীই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোমর পর্য্যন্ত ঝুলের পাঞ্জাবীটা একপাশে খুলিয়া রাখিয়া তাহার পকেট হইতে একটা চুরুট ও দেশ্লাই বাহির করিয়া চুরুটে আগুন ধরাইয়া একটি ক্লান্ত নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বলে, আজ আসতেই পারতুম না।

চুরুটে একটা টান দিয়া কাসতে সুরু করে। কাসিতে কাসিতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, মুখচোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। রাণু সভয়ে পাশে আসিয়া পাখার বাতাস করিতে থাকে। প্রশান্ত কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া চুরুটটা ঘরের মেঝেতে নিক্ষেপ করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, যত মনে করি চুরুট্ আর ছোঁব না—

রাণু বাধা দিয়া বলে, এখন কথা ব'লো না, একটু জিরিয়ে নাও আগে।

প্রশান্ত হাসিয়া বলে, অত ভয় পাও কেন বল ত' ? ঝোঁকটা একবার কেটে গেচে যখন তখন সহজে আর আসবে না।...পথে আজ সত্যদার সঙ্গে দেখা, ধরেচে ওদের কাগজের জন্যে একটা লেখা দিতে হবে। আমার সময় কোথা বলত' রাণু ? এই ধর,—কলেজ যাই—আর এম্-এর পড়াও ত' বড় চারটি খানি কথা না, ওদিকে ভাল রেজাল্টও করতে হবে,—আবার সঙ্গে ও'টাও আছে। তোমার কাছে না এলেও চলে না। সময় যে কেমন ক'রে করি তা ত' ভেবেই পাই না। সত্যদা কি কিছুতে শোনে।

রাণু সশঙ্ক সঙ্কোচে বলে, অত খেটো না।

প্রশান্তর বুকের জাগিয়া-ওঠা হাড়গুলি লক্ষ্য করিয়া আবার বলে, আছে ত' ঐ হাড়.ক'খানা। তারাও যে খুব শক্তি রাখে—এমনও না। রোগেরও অন্ত নেই...হুঁ, আজকাল হাঁপিটা কিছু কম বোধ করচ' কি? ওষুধটা ঠিক মত ব্যবহার করচ ত'?

প্রশান্ত রাণুর এসব প্রশ্ন চিরদিন অগ্রাহ্য করিয়াই চলে, শুনিয়াও শোনে না। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া সঙ্গে-আনা মাসিক পত্রের রাশ হইতে একখানি মাসিক পত্র তুলিয়া লইয়া নিজের একটা গল্প বাহির করিয়া বলে, আমার এই গল্পটার প্রশংসা শত্রু মিত্র সবাই করচে। সত্যদা'র কাগজে দিইনি ব'লে সেত' আমাকে খুন ক'রে তার আক্রোশ মেটাতে চায়।

রাণু গল্পটার উপর ত্রস্তে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলে, ওটাত' এখানে বসেই সেদিন শেষ করে' শোনালে। সত্যি, চমৎকার হয়েচে।

প্রশান্ত শির-ওঠা শীর্ণ ছোরার মত হাতটা বাড়াইয়া রাণুর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলে, ঠায় তিন রাত জেগে তবে ওটাকে শেষ করতে হয়েছিল, আর কিই বা দাম দিলে তার ওরা—

রাণু বাধা দিয়া বলে, উঃ, তুমি সর্ব্বনাশ করচ'। নিজেকে তুমি কিছুতেই আর বাঁচতে দেবে না।

জীবন মরণের সমস্যা প্রশান্তর নাই; সে বলে, বাঁচব' না?...তারপরে ক্ষীণ একটু হাসে।

ভোলা কি একটা কাজে রাণুর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া প্রশান্তকে দেখিয়া আবার ফিরিয়া যায়। রাণু ভোলার আগমন ও গমন টের পাইয়া ডাকিয়া বলে, ওরে ভোলা, আমার লক্ষ্মীটি, শুনে যা ভাই একবার।

ভোলা আবার ফিরিয়া আসিয়া রাণুর ঘরের একটা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, কি রাণুদি, কেন?

তারপরে প্রশান্তর দিকে একবার আড় চোখে চাহিয়া দৃষ্টি নত করে। ভোলা প্রশান্তর দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারে না—না পারার কারণও আছে। প্রশান্তকে ভোলা ভয় করে না, ভালবাসে। প্রশান্তও ভোলাকে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া তাহার আড় হইয়া বসিয়া আড় বাঁশীতে মেঠো সুরসাধনার অপূর্ব্ব ভঙ্গীটিকে। এ বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত যত লোক আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রশান্তকেই ভোলার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু প্রশান্তর চেহারার মধ্যে এমন কিছু সে পাইয়াছিল যাহাতে সে তাহাকে 'ফড়িংরাজ' আখ্যা দেওয়ার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারে নাই। প্রশান্তর অসাক্ষাতে ভোলা এই নামেই তাহাকে চিরদিন অভিহিত করিতেছে। কোন কথা উঠিলে সে বলে, রাণুদি, তোর ফড়িংরাজ কি বলে?...তোর ফড়িংরাজকে জিজ্ঞেস্ ক'রে দেখিস্....ইত্যাদি। খুব রাগের মাথায় আবার বলে, চশমা-আঁটা প্যাঙ্গা ফড়িংরাজ। প্রশান্তর অসাক্ষাতে ভোলা যে নামে তাহাকে অভিহিত করিত, সাক্ষাতে তাহারই লজ্জা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত। ফলে, সে প্রশান্তর দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিত না। সে ভাবিত, রাণুদি প্রশান্তকে একথা নিশ্চয় বলিয়া দিয়াছে এবং প্রশান্ত নিজের এই অদ্ভুত নামকরণে খুসি হইয়াই হয়ত' মাত্রাহীন হাসি হাসিয়াছে। ভোলা প্রশান্তর মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া প্রশান্তর মনে যদি সে কথা আবার জাগিয়া উঠে ও সে আবার সেদিনের সেই না-দেখা-হাসি ভোলার সাম্‌নেই হাসিয়া বসে ত' ভোলা তখন কি করিবে? এই ভয়েই ভোলা একযোগে বেশীক্ষণ প্রশান্তর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে না।

ভোলার কণ্ঠ শুনিয়া প্রশান্ত সেদিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলে, এই যে ভোলা, কই, তোর মেঠো বাঁশী আর শোনালি না? অনেক দিন শোনা হয় নি যে। যা—

রাণু প্রশান্তর কথায় বাধা দিয়া বলে, আগে ছুটে খাবার নিয়ে আয় ভাই।...কলেজ থেকে বাড়ী যাওনিত'।

—না, সত্যদা তাদের অফিসে নিয়ে গেল। সত্যদা একলা কাগজটা আর চালাতে পারে না। আমাকে তাই লেখাপত্তর একটু আধটু দেখে দিতে হয়।

রাণু রাগ করিয়া বলে, হয় লেখাপড়া ছাড়, নয়—এখানে আসা। এর যে কোন একটা পথে চললেই মরণের দেখা পাবে ক'দিন বাঁচবে বলত'?

ভোলা আড়ষ্ট হইয়া আড় বাঁশী বাজাইয়া চলে। অক্লান্ত শ্রোতা প্রশান্ত ডান হাতের কনুই শয্যার উপর রাখিয়া

হাতের উপর মাথা ন্যস্ত করিয়া ভোলার বাঁশীতে ফুঁ দিবার সহজ ভঙ্গীটি নিরীক্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে ঘুমে তাহার চোখের পাতা জড়াইয়া আসে। রাণু প্রশান্তর ঠিক মাথার কাছটিতে বসিয়া তাহার চোখের পাতা, লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালায়। প্রশান্ত রাণুর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলে, নিঝুম রাতে মাঠের মাঝে এম্‌নি ক'রে' যদি কেউ বাঁশী বাজাত ত' আমি সারারাত—সেখানে প'ড়ে থাকতে পারতুম। কি চমৎকার, সত্যি!

তারপরে একসময় প্রশান্তর হাত আর ঠিক থাকে না, মাথাটি রাণুর বিস্তৃত জানুর উপর লুটাইয়া পড়ে। রাণু প্রশান্তর মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া নিয়া তাহার রুক্ষ তৈলস্পর্শবর্জ্জিত কেশপাশ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলে, কাল একটা নাপিত ডেকে ক্ষুর চালাতে হচ্ছে ····· রোগের আর অপরাধ কি?

মেঠো সুর কাঁপিয়া থামিয়া যায়। ভোলা বাঁশের আড় বাঁশীটী কাপড় দিয়া মুছিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, অনেক রাত হ'লো, এখন যাই তবে, কেমন রাণুদি'?

রাণু কিছু বলার পূর্ব্বেই ভোলা বাহির হইয়া যায়। মরার মাথায় অগ্নিশিখার মত রাণু প্রশান্তর মাথা কোলে লইয়া বসিয়া থাকে। সমস্ত দেহ পুড়িয়া আগুন যেন মাথায় উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।·· ·· দেখিলে বেহুলার শবসাধনার কথা আচম্বিতে মনে পড়ে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রশান্তর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দারুণ চমক খাইয়া রাণু তাহাকে জাগাইয়া দিয়া বলে, রাত বেশী হ'য়ে যাবে শেষে শিগ্‌গির এই বেলা বাড়ী যাও।

প্রশান্ত রাস্তায় বাহির হইয়া যায়।

এখনও রাত কিন্তু বেশী হয় নাই। তথাপি পথের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গেছে। মাতালের অসংলগ্ন বাক্য·· কুকুরের অশ্রান্ত চীৎকার......মানুষের উদ্‌ভ্রান্ত হাসি, উদ্দাম লালসা, অর্থহীন প্রলাপ......অকারণ সচপল গতিভঙ্গী ·· সবই অতিরিক্ত, সব কিছুরই বাড়াবাড়ি···যেন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, অসংযমের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। মর্য্যাদা ধুলায় লুটায়······বিরাট শ্মশানে প্রাণের ঘৃতাহুতি চলিয়াছে...আত্মা হয়ত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যেন সব কিছুরই তাল কাটা গিয়াছে।

রাণু ভোলার সন্ধানে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসে। ভোলা পাঁচির ঘর হইতে নিতান্ত অপরাধীর মত বাহির হইয়া রাণুর কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। রাণু ব্যাকুলভাবে বলে, ভোলা, ফড়িংরাজ রাস্তায় গেছে। একটু দেখে আসবি ভাই, এ পথটা সে নিরুপদ্রবে পেরুলো কি না?

ভোলা চলিয়া গেলে রাণু একটা নিশ্বাস টানিয়া মনে মনে বলে, আহা, ছেলেটাকে খাবলে খাচ্ছে-

বাতাস পর্য্যন্ত বিষাক্ত—রাণু হতাশ হইয়া পড়ে।

চাতু মরণ-ভিখারী—

রোগ তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন কিন্তু মৃত্যু তাহার প্রতি অপ্রসন্ন। —আছে শুধু জীর্ণ কাঠামো, তাহাও ভাঙনের জন্য উন্মুখ। চাতু সেই ভাঙন-দিনটির জন্য একাগ্র সাধনা করিয়াও সার্থক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না কিন্তু আর বেশী বিলম্ব নাই জানিয়া সে খুসি হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত দিন পথে পথে ফিরি করিয়া যে পয়সা জোটে, তাহাই দিয়া ভোলা ডাক্তারবাবুর কাছ হইতে শিশি ভরিয়া ঔষধ লইয়া আসে চাতুর জন্য।

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলেন, রোগী দেখিনি, কি রোগ তাও জানিনে ওষুধ দেব কেমন ক'রে?

ভোলা বলে, খুব রোগ। মরতে বসেচে—তারই একটা ওষুধ।

ঔষধ সে পায়। জল কি অন্য কিছু তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখে না।

চাতু শিশিটা সযত্নে হাতে লইয়া ঘরে রাখে, ভোলা চোখের আড়াল হইলেই মেঝের উপর উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া একটু হাসে। সে জানে—সব ওষুধই এখন অচল।

চাতুর বাবু পঞ্চানন জুয়া খেলিয়া বিলকুল খোয়াইয়াছে। মাঝে মাঝে সে এখনও আসে—তবে চাতুর কাছে না; তরঙ্গিণীর সঞ্চিত অর্থের প্রতি তাহার অকারণে অসম্ভব মায়া জন্মিয়া গিয়াছে। এই পঞ্চানন মনে করে, ভোলার উপর তাহার একটা বিশেষ দাবী আছে। লোকের কাছে

সে গর্ব্ব করিয়া বলে, ছেলেটা রাস্তায় রাস্তায় নিষ্কর্ম্মা ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে মরত, দিলেম ত' ওর একটা হিল্লে ক'রে, একটা মাথা গোঁজবার ঠাই ক'রে।

তরঙ্গিণীকে বলে, তরঙ্গ, এই পঞ্চানন হাজরা পারে না এমন কাজই এ দুনিয়ায় নেই। যেদিন ব্যবসার কথা খুলে বললি আমাকে তার ক'দিনের মধ্যেই দিলুম ত' ছোঁড়াটাকে জুটিয়ে? কেমন কিনা?

তরঙ্গিণী একটু অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া বলে, কি -কি—ও, পঞ্চানন কি আমার বুদ্ধির তারিফ কচ্ছ?

সমাগত সকলেই বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়, তারপরে বিস্ময় কাটিলে হাসে। পঞ্চানন সোল্লাসে হাসিয়া বলে, তা ক'চ্ছি বই কি, তরঙ্গ। না ক'রে উপায়?

তরঙ্গিণী খুসি হইয়া বলে, তা'ত করবেই তোমাদের তরঙ্গ ঐ রকম বলেই ত' আজও বেঁচে আছে। রূপযৌবন ত' আর কারও চিরকেলে সম্পত্তি না, বুদ্ধিটাই সব, ওটা একটু যার থেকে—সেই—বুঝলে কিনা—

চারিপাশের সকলেই এ কথার সমর্থন করে।

চাতু এসব শুনিয়াও শোনে না। এসবে তাহার আর আগ্রহ নাই। ঘরের দরজায় বসিয়া সে ধুঁকিতে থাকে। —নিদারুণ শর-বেঁধা ক্লান্ত কাতর পাখী।

ঘরের ভিতর ঘুরঘুটি অন্ধকার। বাহিরে নগ্ন বীভৎসতা—নিষ্ঠুর অগ্নিশিখা—পতঙ্গ পুড়িবার জন্য উন্মুখ।

ঘরের সেই নিবিড় অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ভোলা বসিয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া আঁৎকাইয়া ওঠে।—অতীত তাহার ডুবিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ না থাকিলেই ভাল—আছে কি না আছে সে তাহা জানে না। এ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে—কিন্তু মুক্তি তাহার নাই। ঘরের মাঝে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া পরের হাতে চাবি তুলিয়া দিয়াছে—আত্মহত্যা করিয়া বসিয়াছে। বিপুল বিদ্রোহ প্রকাশের সামর্থ্য নাই। সম্মুখে ও পশ্চাতে বিরাট মরুভূমি, প্রাণে আকুল তৃষ্ণা, অদূরে মায়ামরীচিকা—সে যেন উন্মাদ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তরঙ্গিণী বুঝি হাসিতেছে—একথা ভোলার মনে হইলেই সে দুই হাতে চোখ চাপিয়া আবার শুইয়া পড়ে। তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া একটি কদর্য্য ঘৃণা বাহির হইতে চায়—!

রাণুর ঘরে তখনও আলো জ্বলে।

রাণু হাতের পাখা বন্ধ করিয়া প্রশান্তর হাতের কলম চাপিয়া ধরিয়া বলে, রাত হয়েছে, ওঠ। আর লিখে কাজ নেই।

প্রশান্ত নিদ্রা ও চিন্তাজড়িত চোখের পাতা বিস্ফারিত করিয়া বলে, অল্পই বাকী আছে। শেষ ক'রে ফেলি দাও।

কলম ছাড়িয়া দিয়া প্রশান্তর চিন্তাতপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, এই আবর্জ্জনা ছাইপাঁশ এরই জন্যে এমন মূল্যবান জীবনটা খোয়াবে? তোমার এই দানের মূল্য কি কেউ বুঝবে?

নিরুত্তরে প্রশান্ত লিখিয়া চলে—পাতার পর পাতা।

তরুণ সাধকের জীবনান্ত উগ্র সাধনার প্রতি বিস্মিত সজল চোখ পাতিয়া পতিতা রাণু বসিয়া থাকে। হাতের পাখাও থামিয়া যায়। বুঝি ভাবে, কোন্ নিয়তি তাহাকে এ পথে আনিয়াছে—কোন্ প্রয়োজনে প্রশান্তই বা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল—ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না।—বুক হইতে তাহার একটি মাত্র কথা নিশ্বাসের শব্দে বাহির হইয়া আসে—বাছারে!

সহসা প্রশান্ত কলম থামাইয়া উদভ্রান্তের মত রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থহীন উন্মাদ চাহনি। রাণু ভয় পায় না। আবার কলম চলিতে থাকে।

পাশের ঘরে পাচি দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের দস্যুকন্যার মত নিষ্ঠুর আক্রোশে ফুলিতে থাকে। বিকৃত তাহার ক্ষুধা—জঘন্য তাহার প্রয়াস—তবু মিটিল না।

ভয়াবহ দিনগুলিও কাটিয়া যায়। মনের উপর কিন্তু কোন ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে না। প্রত্যেকটি দিনের একই ইতিহাস, কোন রঙ পাল্টায় না—নিতান্ত একঘেয়ে। উদ্দেশ্যহীনের বৈচিত্র্যহীন দিবারাত্র—কাটিয়া যাইতেছে—এই পর্য্যন্ত।

ভোলা উদাসভাবে বলে, আচ্ছা রাণুদি' গা ছম্ ছম্ ক'রলে কি জ্বর আসে?

এই বাড়ীর ভাড়াটেদের মধ্যে একমাত্র রাণুর উপরই তাহার অবিচল আস্থা, তাহাকেই সে ভালবাসে, বিশ্বাসও করে।

দেখি—বলিয়া রাণু তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া একটু হাসে। তারপরে বলে, দূর বোকা। গা ছম্ ছম্ করে ভয়-টয় পেলেই তবে।

ভোলা মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া যায়। কি একটা একান্ত গোপন কথা যেন তাহার সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! রাণুর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত সে পারে না!

রাণু ভোলাকে নীরব দেখিয়া আবার বলে, আমাদের স্কুলে এক মাষ্টার ছিল, তাকে দূর দিয়ে যেতে দেখলেই আমার কেমন যেন গা ছমছম্ করতো।

ভোলা মনে মনে ঠিক করে যে, রাণু তাহার মনের অবস্থা সকলই টের পাইয়াছে। কাজেই কিছু গোপন করা যে বিবেচনার কাজ হইবে না তাহা বুঝিয়াই ত্রস্তে বলে, রাণুদি আজ কিন্তু ঠিকই পালিয়ে যেতেম। শিয়ালদার কাছ বরাবর গিয়ে পড়াতেই দেশের জন্য মনটা কেমন যেন ক'রে উঠল। আর যেতেমও ঠিক, কিন্তু এমনই বরাৎ যে টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি, এক আনা পয়সা কম।

কথাটা শেষ করিয়া ভোলা একটু হাসে, পরমুহূর্ত্তেই আবার হাসি থামাইয়া ভয়ব্যাকুলিতের মত রাণুর পায়ের কাছে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার দুই পা আকুল হইয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি রাণুদি, তুমি কিন্তু ওকে একথা ব'লে দিও না।

রাণু বিচলিত হইয়া ভোলাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বিগলিত করুণায় বলে, তুই কি ক্ষেপেছিস্ ভোলা? তরঙ্গ কি আমার পরম আত্মীয় যে তাকে একথা না বললে আমার ঘুম হবে না?

তারপরে ভোলাকে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইয়া সস্নেহে তাহার করপীড়ন করিয়া বলে, লক্ষ্মি ভাই আমার, তোর যা টাকা লাগে আমি দেব, তুই বাড়ী চলে যা।

ভোলা হতাশকণ্ঠে বলে, সেখানেও যে আমার কেউ নেই রাণুদি। রাণু বলে, তোর যেখানে খুসি সেখানে চ'লে যা। এখানে আর থাকিস্ নে, এক মুহূর্ত্তও না।

মুহূর্ত্তে ভোলার চোখে সমস্ত বিশ্ব কেমন ঘোলাটে হইয়া যায়। দুঃখে দরদী বন্ধুর দরদ মানুষকে আরও বেশী ব্যাকুল করিয়া তোলে। ভোলা আর কথা কহিতে পারে না।

— চাতুর শবদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে

রাণুর দেওয়া চারিটি টাকা ভোলার কাছে কাছে তিন দিন রহিয়াছে। পথে বাহির হইলে তাহার মনে হয়, আজই সে টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসিবে। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? দেশে? সেখানে আপনার বলিতে কেই বা আছে? একদিন সকলেই আপনার ছিল, কিন্তু তাহারা যে এখন তাহাকে আপনার বলিয়া লইবে এমন কথা সে ত' জোর করিয়া আজ বলিতে পারে না। হঠাৎ জীবনকে সে নূতন চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে। অতীতের দিনগুলিকে তাই স্বপ্ন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সেই স্বপ্নময় জগতে আবার ফিরিয়া যাইতেও সাধ হয়; ফিরিবার উপায় নাই জানিয়াই সে হতাশ হইয়া পড়ে।

এদিকে তরঙ্গিণীর অর্থগৃধ্নুতা, পাঁচির জ্বালাময় উগ্র নিশ্বাস, পঞ্চাননের নীচ রসিকতা···দিনের পর দিন আরও অসহ্য, আরও পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে।

সে বেঁহুস্ হইয়া পথ চলিতে থাকে। এত বড় দুনিয়ায় সে শান্তির আভাষ কোথাও খুঁজিয়া পায় না।

একমাত্র চাতুর চিতা পরম মিতার মত তাহাকে আহ্বান করে। সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলে সে যেন ধন্য হইয়া যাইত; কিন্তু পারে কই?

রাস্তায় সমস্ত দিন ধরিয়া সে হাঁকিয়া ফিরিল, এই রঙ্দার নিলামী মাল, সস্তা···সস্তা।

অবিশ্রান্ত টুং টাং করিয়া হাতের ঘণ্টাটি বাজাইল। আলো অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে সমস্ত দিনের পর গৃহে মাতালের মত টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিল। গাড়ীটি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া রাণুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাণু ঘরে নাই। ভালই হইল। রাণুর সঙ্গে দেখা হইলে সে হয়ত' গৃহের বাহিরে আর সে রাত্রে পা বাড়াইতে পারিত না। চোখের জলই বা সে গোপন করিত কেমন করিয়া? একটা নিশ্বাস চাপিয়া লইয়া সে ত্রস্তে সকলের অলক্ষ্যে আবার পথে বাহির হইয়া গেল।

গৃহের বাহিরে পা দেওয়ার সঙ্গেই বিধাতা পুরুষ হয়ত' অলক্ষ্যে হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।—

—রাণু না, পাঁচি না, তরঙ্গিণী না,···একটী শাদা ধব্‌ধবে কাশের গুচ্ছের মত মেয়ে মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিয়া বলে, মস্ত ঘা হ'য়ে গেচে, ভয় নেই, ও দু'দিনেই শুকিয়ে যাবে।

ভোলা তাহার সে কথার কোন অর্থই ভাল করিয়া বোঝে না। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। হঠাৎ কি যেন সব তাহার মনে পড়িয়া যায়, বলে, একটা গাড়ীর সঙ্গে আর একটা গাড়ী··· ঠুকে গেল?

কিছুক্ষণ পরে আবার বলে, আচ্ছা, হাঁসপাতালে কি কেউ বাঁচে না?

তারপরে গ্রামের কথা, রাণু, পাঁচি, চাতু তরঙ্গিণীর কথা,—কথার কোন বাঁধুনি নাই।

সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। পিছু পিছু চলে একপাল ছেলে।

ভোলা হিহি করিয়া হাসে। ছেলের দল ঢিল তুলিয়া ভয় দেখায়। ভোলা ঢিল দেখিয়া ভয় পায় না, হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হইয়া গিয়া হতাশ কণ্ঠে আর্ত্ত চীৎকার করিয়া বলে, দেখিস্, দেখিস্, ঠুকে যাবে এক্ষুণি।

ছেলের দল ঠাট্টা করিয়া বলে, কি ঠুকে যাবেরে ভোলা পাগ্‌লা? ভোলা মুখ টিপিয়া হাসে। তারপরে বলে, ঘ্যাশ্-ঘ্যাশ্-ঘ্যাশ্···ঘ্যাচ্চাং···ঘচ···

ছেলের দল উচ্ছ্বসিত হাসিতে তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া বলে, তোর মা-থ্-থা!

বসন্তের ব্যথা

[শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঋতুচক্র রথে আরোহিয়া,
বসন্ত এবার শুধু আনিলে বহিয়া
অকারণ বেদনার ভার।
শীতের প্রাকার
গলিয়া পড়িল তব আতপ্ত পরশে,
শুধু প্রকাশিত মোর বেদনার রসে
আপ্লুত হৃদয়খানি।
জানি
তব নিষঙ্গের শর,
মৃদুল প্রখর—
একবার হানো যার বুকে
নির্ম্মম কার্ম্মুকে,
তার বক্ষ হতে
পীযুষ-শোণিত উৎস বাহিরায় দুনিবার স্রোতে।
কিন্তু সখা, আমার অন্তরে
জীর্ণ পর্ণভার শুধু খসে গেল ঝরে
শিথিল বৃন্তের প্রান্ত হতে;
উন্মদ অধীর বায়ুপথে
দূরে উড়ে গেল তারা
কোথায় না জানি দিশাহারা।
আজি মোর নগ্নতার লাজ,—
কহ মোরে, কেমনে ঢাকিবে ঋতুরাজ?
জানি তুমি নিলাজ নির্ভয়,—
নিদ্রালসা ধরণীর সবলে বসন কাড়ি' লয়ে
ভাঙো ঘুম লজ্জার আঘাতে,
সুগন্ধ প্রলুব্ধ প্রভাতে;
চকিতে ধরণী জাগি' সরমে বিভ্রমে,
বঁধু সমাগমে,
মধু হাসে,
রিক্ত দেহ ঢাকে পুনঃ শ্যামল তরুণ তনু বাসে
তাই কহি, এই মোর মর্ম্মের দীনতা
—হিম-শীর্ণা লতা—
লও তুলে তোমার আরক্ত দুই করে,
তুলে ধর নবীন কনক রবিকরে,—
দেহে তার করুক সঞ্চার
আনন্দের পত্র পুষ্পভার।

বিবাহ-বন্ধন ও শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু যুবক

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়]

১

বর্ত্তমানে (১৯৩১ সালে), "শিক্ষিত" বাঙ্গালী হিন্দু যুবকদিগের মধ্যে, যৌবনে বিবাহে অনিচ্ছা প্রায়ই দেখা যায়। যাঁহারা লেখাপড়া কম শেখেন, তাঁহাদের মধ্যে এ ভাব দেখান যায় না। আমার এত দিনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতায়, একশতের মধ্যে একটিও বালক পাইয়াছি কিনা সন্দেহ,—যিনি অস্বাভাবিক উপায়ে নৈতিক পদস্খলনের শোকাবহ ফল বা স্বপ্নক্ষয়জনিত রোগ ভোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

এমন অবস্থায়, ঠিক শুকদেবভাবাপন্ন হইয়া যে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু যুবকরা বিবাহ করিতে চাহেন না, এমন কথা বলা যায় না। তবে, এ বিবাহে অনিচ্ছার কারণ কি? কারণ একটি নহে, বহু;—যদিও যুবকরা ঠিক সেগুলি সম্যক রূপে ভাবিয়া দেখেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম কারণ—শিক্ষার দোষ। বর্ত্তমান যুগে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা মানুষকে জ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল দিতে পারিলেও, কাহাকেও "মানুষ" করে না। বর্ত্তমানের ধর্ম্মজ্ঞানহীন-শিক্ষা মানুষকে আত্মস্থ করে না—মানুষের মনে ভোগের সহস্র লেলিহান শিখা জাগায় মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন করে, সে "স্বস্থ" হয়;—he finds out the centre of his gravity. সংস্কৃত "বিদ্যা" শব্দটি (বিদ্—জানা) সেই জ্ঞানলাভকেই ইঙ্গিত করে, যাঁহাকে জানিলে, সমস্তই জানা হয়—ভগবৎ-জ্ঞান। ইংরাজীতে education শব্দটির আসল অর্থ—যে উপায়ে মানবের সহজ মানসিক ও চিত্তবৃত্তি স্বতঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। কাজেই কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী—উভয় ভাষাতেই, "শিক্ষিত" বলিলে, সেই গুণটিকেই বুঝায়, যাহার অধিকারী হইলে, মানুষ স্বস্থ হয়,—এক কথায়, মানুষ প্রকৃতই "মানুষ" হয়—সংযমী, ত্যাগী, হৃদয়বান্ ও পরার্থপর হয়—আপনার অন্তরের দেবতার সঙ্গে জগতের সকল জীবকেই অভিন্ন দেখে। যতদিন হিন্দুর ঘরে "একান্নবর্ত্তিতা" * ছিল, তত দিন আমরা ততটা স্ব-স্ব প্রধান ও স্বার্থপর হই নাই। এখন, "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—অর্থাৎ জীবনটাকে ষোল আনা ভোগায়তন করিবার জন্যই, আজকাল লেখা পড়া শিখা! এই ত গেল বর্ত্তমানকালের শিক্ষার নৈতিক দিক। তাহার পরে বর্ত্তমান শিক্ষার সঙ্গে দেহের উন্নতির কোনও যোগাযোগ নাই। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ যাবত অনেকই লিখিয়াছি, অনেক বক্তৃতাও করিয়াছি;—এত দিন পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-স্বাস্থ্য-সমিতি ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। যে শিক্ষায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে কথা, স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়,—সে শিক্ষা মানুষের মনকে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষীণ করে, কারণ, mens sana in corpore sana (শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ)। বর্ত্তমানের শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগকে দুর্ব্বল করিতেছে—দেহে ও মনে। এই কারণে, আমরা বিলাসী ও ভোগী, কষ্টসহনে অক্ষম ও কাপুরুষ, স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর, উদ্যমহীন ও লঘুচেতা হইয়া সহজাত মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়া, তথাকথিত বিদ্যার গর্ব্বে আপনার নিকটে আপনাকেই বড় করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছি! যে বাঙ্গালা ইংরাজদের প্রথম আমলে, ভারতবর্ষের উত্তমাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত ছিল ("what Bengal thinks to day, India thinks to-morrow—Gokhale)—আজ সেই ভারতবর্ষেই, সেই সোণার বাঙ্গালার স্থান কোথায়? বাঙ্গালী যতটা মনে প্রাণে, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ঘরের ঠাকুরকে বিদায় দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় আত্মদান করিয়াছিল,—এখনো ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশ ততটা করে নাই বলিয়া, অ-বাঙ্গালীরা আজ বাঙ্গালার বুকে বসিয়া বাঙ্গালীর মাথার

* প্রত্যেক একান্নবর্ত্তী পরিবার এক একটি Commune ছিল—From each according to his ability, to each according to his need.

উপরে পা দিয়া চলিতে পারিতেছে। তাই বলিতেছিলাম—আমাদের শিক্ষার দোষ বহু। কবি গাহিয়াছেন:—

যেই শিক্ষা তোরে আত্মস্থ করে না,
যে শিক্ষা নিতুই বাড়ায় বাসনা,
সে কি শিক্ষা ভাই, খুঁজে নাহি পাই;—
কেন্দ্রস্থান হ'তে মরম উপাড়ি,
বহির্মুখী করে দেয় তারে ছাড়ি! (বনফুল)

দ্বিতীয় কারণ—সমাজের দোষ। বাস্তবিক পক্ষে, বাঙ্গালাদেশে, হিন্দুর প্রত্যেক গ্রামটি "স্বরাজ" ছিল। যাহার যে বৃত্তি জন্মগত তাহাই সে অবলম্বন করিত; জাতিভেদ প্রথা দৃঢ় থাকায়, প্রত্যেক জাতির ধন সেই জাতির কল্যাণেই ব্যয়িত হইত। পঞ্চায়ৎ দ্বারা সমাজ শাসিত হইত; সকলে মিলিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া, ঐ অধ্যাপকদ্বারা সমাজের ছেলেগুলিকে "মানুষ" তৈয়ারী করাইয়া লইতেন; জমাদারের অর্থে পুষ্ট কবিরাজ মহাশয়, বিনা দর্শনীতে ও বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া, সকলের চিকিৎসা করিতেন; এ দেশের অনুকূল অবস্থামত বিবাহাদি হইত; দেশে ধান, দুধ ও মাছ প্রচুর ছিল; কাযেই, গ্রামে গ্রামে স্বরাজ বর্ত্তমান করিত। এতদিন ধরিয়া, শত সহস্র পরগাছা তাহার উপরে জন্মাইলেও, বর্ত্তমানের শবরূপী হিন্দু-সমাজের আদর্শ ছিল উচ্চ, আকাঙ্খা ছিল অল্প, পরার্থপরতার ও সেবার, স্নেহের ও ভক্তির এবং শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তখন সখ্যতা, হৃদ্যতা, অনাবিল হাস্য ও যথার্থ আনন্দ এই সোনার বাঙ্গালায় প্রচুর ছিল। তখন প্রত্যেক হিন্দুই পিতামাতাকে জীবন্ত-বিগ্রহ জ্ঞান করিতেন এবং পিতামাতা যতই সন্তানবৎসল থাকুন না কেন, প্রত্যেক সন্তানের উপরে তৎকালীন সমাজের খরদৃষ্টি থাকিত। কাযেই, ছেলেরা অনর্থক আদর পাইত না, পিতামাতা কর্ত্তৃক জন্ম হইতে ভোগের পথে চালিত হইতে পারিত না। এ কথাগুলি যে শুধু আমাদের দেশেই খাটে তাহা নহে। টেনিসনের এই কয়েকটি পংক্তি পড়িলেই, বেশ বুঝা যায়, কিছু-পূর্ব্বে এমন কি ইংলণ্ডেও পিতৃ আজ্ঞার মূল্য কত ছিল:—

MY SON,
I married late; but I would wish to see
My grandchild on my knee before I die;
Now, therefore, look to Dora.

* * *

But in my time, a father's word was law;
And so it shall be now for me. Look to it.
—Tennyson ('Dora')

আজ হিন্দুর সমাজ নাই—যাহাও আছে, তাহা ক্ষণিক সুবিধাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত—কাযেই, তাহার বন্ধন অতীব শিথিল। ব্রাহ্মরা নিজ সমাজ গঠন করিয়াছেন—বিলাত-ফেরৎরা নিজ সমাজ গড়িয়াছেন—শিক্ষিতেরা নিজ সমাজ গড়িয়াছেন—চাকুরেরা আপনার দল পাকাইয়াছেন। বণিকরা নিজ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। অর্থাৎ, এক মতাবলম্বী, কাযেই স্ব স্ব স্বার্থান্বেষী—লোকরাই সুবিধামত, ও সুখ-সুবিধা লাভের জন্য, স্ব স্ব সমাজ গড়িয়াছেন। যে সমাজের মূলে স্বার্থপরতা (individualism), যে সমাজের ভিতরে অপর শ্রেণীর লোকের মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটাইবার সামর্থ্য বা স্পৃহা নাই বলিয়া, কাপুরুষতা ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান, সেই মৃত বা অভিভাবকহীন সমাজে থাকিয়া, ছেলেরা স্বৈরাচারী না হইয়া কেমন করিয়া মানুষ হয়? সে সমাজে, ছেলেরা বিলাসী ও কাপুরুষই হইয়া থাকে; সে সমাজে, ছেলেরা লেখা পড়া শিখিয়া তথাকথিত "শিক্ষিত" সাজিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা "মানুষ" হয় না, হইতেও পারে না!!!

তৃতীয় কারণ,—অভিভাবকগণের অপর ত্রুটি। শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ীতে যান—ভোগ ও অসংযমের তাণ্ডবলীলা পদে পদে। সামর্থ্য থাকুক আর নাই থাকুক, বাঙ্গালীকে কাপুড়ে বাবু সাজিতেই হইবে। সম্পূর্ণ দৈহিক ক্ষমতা থাকিলেও, উড়ে বামুন ও চরিত্রহীন দাসী সকলকেই রাখিতে হইবে। থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়া চাই—নতুবা "ভদ্র" হওয়া যায় না। মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা ঠুকিলেও, পুরুষরা পূজা-অর্চ্চনার দিক মাড়ান না। গুরু-পুরোহিত শিক্ষকদিগের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও উপহাসের বিষয়; সন্ধ্যা-আহ্নিক করা, একাদশী প্রভৃতি উপবাস করা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা—কয়টি শিক্ষিত হিন্দুর ঘরে দেখা যায়? যাহারা করে, তাহারা উপহসিত হয়—তাহারা বুদ্ধিহীন বিবেচিত হয়।

এইরূপ প্রতিকূল আবহাওয়ায় থাকিয়া, বিলাসিতা ও ভোগের আদর্শে মানুষ হইয়া, এইরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে যে হিন্দু-যুবক "শিক্ষিত" হইতে থাকে, সে যে "মানুষ" ছাড়া আর কিছু হইবে, তাহাতে কি দোষ দওয়া যায়? বাপ-মাই যে গোড়া হইতেই, গোড়া কাটিয়া দেন - শেষে আগায় জল ঢালিলে লাভ কি? কেন যে "এখনকার" ছেলেরা বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়, তাহা কি আরো বুঝাইয়া দিতে হইবে? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হিন্দু-কলেজের ডিরোজিয়োর ছাত্রদের লীলাখেলা যে পূর্ব্বাভাষ দিয়াছিল, এখন তাহারই কায়েমী সংস্করণ দেখিতেছি। উৎকৃষ্ট জমীতে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিলে, বিষবৃক্ষই জন্মায়। আমড়ার বীজে আম জন্মায় না। তাহাতে জমীর দোষ কি, জলবায়ুর দোষ কি? এই বারে একে একে, বিবাহের বিরুদ্ধে যুবকরা সাধারণতঃ যে যে যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

(২) Sentiment বা মতবাদ বা অহেতুক ধারণা। অনেকে, কোনও অজ্ঞাত কারণে, মনে মনে বিবাহের বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করে। তন্মধ্যে, আজকাল দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় যে ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধময় তথাকথিত সব অসম্ভব স্ত্রী-স্বাধীনতার (individualism and free-love মূলক) "গল্প" প্রকাশিত হয়, সেই গুলির পাঠকরাই এই শ্রেণীভুক্ত। কেহ কেহ, বালিকাদিগকে "ছেলেমানুষ" "মূর্খ" কাযেই শিক্ষিতের সহধর্ম্মিণী হইবার অনুপযুক্ত, এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। কেহ কেহ, বালিকাগণের দেহের পরিচ্ছন্নতার অভাবের বিষয়ে অসম্ভব ধারণা পোষণ করিয়া বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন। কেহ বা প্রত্যেক ভাবী বধূ মাত্রকেই Xanthippe বা সম্মার্জ্জনীহস্তা মনে করিয়া ভয়ে সরিয়া পড়েন। কেহ মনে করেন, নারী মায়াবিনী, আজ আমার আছে—কাল যে পরপুরুষাসক্তা হইবে না, কে বলিতে পারে?"—এই ভয়ে বিবাহের দিক মাড়াইতে চাহেন না। কেহ বা গৃহিণী অর্থে, স্বর্ণকারের উত্তমর্ণা ভাবিয়াই, রণে ভঙ্গ দেন। কেহ বা "বন্যার মত" পুত্রকন্যা হইবার ভয়ে বিবাহ করেন না—যদিও এটা জন্ম-শাসন বা birth control এর যুগ। যাহা হউক, sentiment মাত্রেই মানুষের নিজস্ব। এবং যাহারা ঐরূপ অহেতুক ধারণা পোষণ করে, তাহারা স্বভাবতঃই অত্যন্ত অহম্-অহমিকা যুক্ত। "আমি" যা বুঝি,—"আমার" মত এই, "আমার" ধারণা এই, ইত্যাদি। আমিত্ব-ময় এই শ্রেণীর লোকরা আপনার যত শত্রুতা করে, অপরে তাহাদের শতাংশেরও অপকার করিতে পারে না। ইহাকেই চিকিৎসকের ভাষায়, fatuity or psycholgia বা mental immobility বা exclusive self-regard বলে। মনের এই অবস্থা melancholia হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। এই শ্রেণীর লোকগুলি কৃপার পাত্র।

ইহাদের জ্ঞাতার্থ নিবেদন এই:—এত বড় বিরাট বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায়, স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টির ভুল ধরা বা তদুপরি বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা, বাতুলতার নামান্তর। তার পর, কীট-পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই যৌন আকর্ষণ বর্ত্তমান; ইহার অর্থ এই যে, যৌন সম্বন্ধ ভগবৎ-প্রেরিত জীবের স্বভাবিক ধর্ম্ম। যাঁহারা "সময়ে" বিবাহ করেন নাই, এমন বহু লোক প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়া, এই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, "তখন বয়সে বিবাহ করি নাই, মনে করিয়াছিলাম, এই মন লইয়াই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিব। এখন যে বয়স হইয়াছে, সে বয়সে ব্রাহ্ম, খৃষ্টীয় ও মুসলমান সমাজে পাত্রী পাইতে পারি;—কিন্তু, স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে, আমার বয়সের উপযোগী পাত্রী পাইব না বলিয়া, আর সমাজের মুখ পোড়াইব না। কিন্তু, এই বয়সে, একটা আসঙ্গলিপ্সা আসে, যাহা দুর্দ্দমনীয়।" তাহার পরে, যাহারা "think their fathers fools, so wise they grow", যাহারা বিবাহ করাটা ভুল মনে করে, তাহারা নিজ নিজ জীবনটাকেও ভুলের ফল ভুল বলিয়া মনে করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করে না কেন? সত্য সত্য "পোঁটা"-পড়া, "পুতুলখেলে" এমন বউ কয়টা লোকের ভাগ্যে ঘটে? আর যে স্বয়ংসিদ্ধ মহাপণ্ডিত স্ত্রীজাতিকে হেয় বা হীন—নরকস্য দ্বার—মনে করে, সে কি মাতার গর্ভে জন্মে নাই, মাতৃস্তন্য পান করে নাই, মাতার অকৃত্রিম স্নেহরসে আপ্লুত হয় নাই? তাহার কি ভগ্নী নাই? সে কি ভুলিয়া যায় যে, এক পক্ষে ভর করিয়া উঠা যায় না? সে কি জানে না যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই স্বভাবের প্রেরণায় স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরক্ত হয়? এদেশে, বধূরা একাধারে কার্য্যে দাসী, করণে মন্ত্রদাতৃ; সেবায় ও ক্ষমায় মাতা, রন্ধনে সৈরিন্ধ্রী, রোগ ও শোকে পরম সান্ত্বনাস্থল? বধূই গৃহ

কর্ত্রী মমতা শিক্ষাদাত্রী ; তাহার হাত ভরা সেবা, চোখ-ভরা স্নেহ, বুকভরা ভালবাসা তাহার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি, তাহার ধর্ম্মপরায়ণতা, তাহার মনের উদারতা—কয়টা পুরুষ তাহার সিকিও দিতে পারে ? পক্ষান্তরে, অবাধ লাম্পট্যের পথ উন্মুক্ত বলিয়া, এবং সাহিত্যের আবহাওয়া খারাপ হওয়ায়, তদুপরি বর্ত্তমান শিক্ষার মূলে ভোগের লালসার ফল্গু থাকায়, পুরুষরা অত্যন্ত অসংযমী। শিক্ষার দিক হইতে, বয়সে কম হইলেও, এবং কেতাবতী শিক্ষায় হীনা হইলেও, সকল দেশে, সকল যুগে, কম-বয়সী বধূ, বেশী-বয়সী পাত্রের সঙ্গে, সর্ব্ব বিষয়ে সমকক্ষ এমন কি শ্রেষ্ঠাও হয়। এ পর্য্যন্ত তাহার অন্যথা শোনা যায় নাই। যে জাতি স্বয়ং আদ্যাশক্তির অংশ—যাহার স্পর্শে শবরূপী শিব চেতনাময় জ্ঞানময় ও মঙ্গলময় হইয়া উঠেন, সেই মাতৃ-জাতি সামান্য নহে। মাতৃজঠরে স্থান পাওয়াও যতটা ভাগ্যের কথা, মাতৃত্বের অবসর দেওয়াটাও ততটা সৌভাগ্যের কথা। কাযেই, মনে হয়, যে রোমান্স বা অহেতুক মতবাদের উর্ণনাভে জড়াইয়া, যুবকরা বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করেন সেটা অসার—সার, ঠিক তাহার বিপরীত।

(২) আর্থিক অনটন।—একে ত বহু ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয় এবং লেখাপড়া শিখিলেও তদনুরূপ উপার্জ্জন হওয়া সুদূরপরাহত ; তাহার উপরে, বিবাহ করা কি ভাল ? এ যুক্তি কাপুরুষের যুক্তি ও অবিবেচকের উক্তি। যদি বিবাহ অর্থে, বৎসরে বৎসরে সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়, তাহা হইলে বলিব, সে ব্যক্তির বিবাহ করা উচিত হয় নাই—অপর উপায়ে তাহার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাই শ্রেয়ঃ ছিল। বিবাহ করা মানে, দায়িত্ব গ্রহণ করা—পৌরুষ প্রকাশ করা। রমণী আশ্রিতা, পুরুষ রমণীর রক্ষক। পুরুষ পরিশ্রম করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিবে, রমণী সংসারধর্ম্ম পালন করিবে। বিবাহ না করিলে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে যে বড় সাধনা—"প্রেম"—তাহার শিক্ষাই হয় না। প্রেম মানে, আত্ম বিস্মৃতি, আত্ম-ত্যাগ। প্রথমে স্ত্রীর উপরে—তাহার পরে সন্তানের উপরে, তাহার পরে তাহাদের সন্তানের উপরে, এমনি করিয়া করিয়া, আপনাকে তিল তিল ভুলিয়া, শেষে সারা বিশ্বে প্রেম জন্মায়. তখন সত্যই দেবতার পরশ-সুখ অনুভূত হয়। বিবাহ না করিলে, উন্নতির চেষ্টা বা প্রেরণা আসে না। জগতের বেশীর ভাগ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের মূলে এই বিবাহ-বন্ধন। যাহারা বিবাহিত হন, তাঁহারা বিনা বেতনের দাসী, ধাত্রী ও পাচিকা পান—ইহাতে ব্যয়লাঘব বেশী হয় না। যদি স্ত্রীকে তেমন শিক্ষিতা করিয়া লওয়া যায়, তবে জামা কাপড় ঘরে তৈয়ারী ও কাচা হইতে পারে। শিক্ষিতা স্ত্রীর দ্বারা অনেক লেখাপড়ার কাজও করান যায়। ব্যবসায়ীরা স্ত্রীর সাহায্যে ব্যবসায়ে অশেষবিধ উপকার পাইতে পারেন। বর্ত্তমানে, যে হারে এদেশে বালকদের শিক্ষালাভ হইয়াছে, অপর দেশের ও আমাদের দেশের তুলনায়ও, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর—তাহা মনে প্রাণে অনুভব করি। কিন্তু, তাহার চেয়ে ঢের বেশী অনুভব করি যে, তাহার চেয়ে ঢের বেশী হারে ও সংখ্যায়, স্ত্রী শিক্ষা হওয়া চাই। গৃহিণী শিক্ষিতা হইলে, শৈশবে তাঁহারই দ্বারা শিশু মানুষ হইতে পারে। গৃহিণীর আকাশ-প্রদীপের মত হওয়া চাই।—যে বাড়ীতে আকাশ-প্রদীপ থাকে, সে বাড়ীর ভিতর-বাহির আলোকিতই হয় এবং পাড়াসুদ্ধও আলোকিত হয়। আমরা বিবাহ করিবার দিন হইতে, এসেন্স, গন্ধতৈল হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেক বয়স পর্য্যন্ত নাটক নভেলের ব্যয় ও থিয়েটার বায়স্কোপের ব্যয় বহন করি ; কিন্তু কিসে গৃহিণী শিক্ষিতা হইলে সংসারে সকল বিষয়ে সুখ ও শান্তি আসিবে, সে শিক্ষার দিকে আদৌ মনোযোগ দিই না ;—অনর্থক কতকগুলি বাজে ও বিদেশী অঙ্গসৌষ্ঠবের জিনিষে অর্থ ব্যয় করিয়া, নিজের ও পরের রুচিবিকার ঘটাইয়া, শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া পড়ি! এ দেউলিয়া শুধু নিজের অর্থের বিষয়ে নহে—স্বীয় মনে ও পল্লীর নৈতিক বিষয়ে, ও দেশের অর্থ-নৈতিক বিষয়ে। আগে কাপড় বা গহনার অতটা বাড়াবাড়ি ছিল না—এবং পলকে পলকে গহনা বা বেশ-ভূষার চমকপ্রদ "পট-পরিবর্ত্তন" ঘটিত না—এখন যেমন ঘটিতেছে। বিবাহের দিন যদি স্বামী স্ত্রী সর্ব্ব বিষয়ে সংযম ও সাদাসিধা চালের প্রবর্ত্তনা করিতে পারেন, ত সে সংসারে সুখের ও শান্তির অবধি থাকে না। বিশেষ করিয়া, এখন যেমন একান্নবর্ত্তীতার লোপ পাইতেছে বলিয়া, একজনের গতরের (স্বাস্থ্যের) উপরে একটা সমগ্র সংসারের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে—তেমনি এখন প্রত্যেক বিবাহিত

দম্পতির কর্ত্তব্য—জীবন বীমা করা, খুব সাদাসিধে চালে, চলা, খুব অল্পসংখ্যক ভৃত্যাদি রাখা এবং স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া ও সকল ন্যায় বা সৎ কার্য্যে অগ্রসর হইবার সৎসাহস থাকা। ধনীদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা যদি মুসলমান ভ্রাতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখিতে পাই? দুই তিন পুরুষ আগে, তাঁহারা আমাদেরই একজন ছিলেন। এখন তাঁহারা বহু বিবাহ করেন আর আমরা একটা স্ত্রী গ্রহণে ভয় পাই। তাঁহাদের স্ত্রীরা ঘরে বসিয়া কত কাযই করেন। গৃহস্থালীর সকল কাজ করা বাদে, তাঁহারা কেহ মাংস প্রভৃতি তৈয়ারী খাদ্য বিক্রয়, কেহ পাথার রং করা ও ঝালর বসান, কেহ কাগজের খেলনা বা ফুল তৈয়ারী করা, কেহ চিকণের কাজ করা, কেহ রং পেষাই, কেহ বিড়ী পাকান, প্রভৃতি সহস্র রকমের অর্থকরী কার্য্য করিয়া, ঘরে বসিয়া, অর্থোপার্জ্জন করেন, চরকায় সুতা কাটিয়া, কাপড় বুনিয়া, ঘরে কেক, বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া, সংসারের আবশ্যকীয় সোয়েটার, মোজা বুনিয়া, নিত্য পরিধেয় জামা-জোড়া তৈয়ারী করিয়া, চাট্‌নী, জেলি, গুঁড়া মসলা, আচার, আমসত্ব প্রস্তুত করিয়া, বড়ি পাঁপর করিয়া, লেস চিকণের কাজ করিয়া—কত রকমে সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ ও অর্থোপার্জ্জন করা যায়—সেগুলি শিখাইয়া লইতে হয়। কাযেই, যদি বিবাহ করিয়া সকল বিষয়ে সংযত হইয়া চলা যায়, তবে অর্থের অনটনের ভয় থাকে না।

(৩) অ-বনিবনাও হইবার ভয়ে।—পূর্ব্বে, পাত্র ও পাত্রীর অল্প বয়সে বিবাহ হইত। তখন, অন্ততঃ পাত্রীর মনটি কাদার তালের মত নমনীয় থাকিত। কাযেই, অল্প বয়সে, পরের ঘরের মেয়েকে নিজ ঘরে আনিয়া, আপনার মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়ার প্রচুর সুবিধা ছিল। এখন ছেলেরা পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া ২৫ হইতে ৩০ বৎসরে বিবাহ করে বলিয়া, এবং সর্দ্দা-আইনের ভয়েও বটে, কন্যাদের ১৫ হইতে ১৮।১৯ বৎসরে বিবাহ হয় বলিয়া, আগেকার মত ব্যবহার ততটা সহজ নাও হইতে পারে—এই আশঙ্কা অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ যদি প্রকৃতই পুরুষ হয়—অর্থাৎ, দৃঢ় অথচ শান্ত হয়; স্নেহশীল অথচ দাস হয় না; পরমতসহিষ্ণু ও নিজ মত সম্বন্ধে অযথা অহংযুক্ত না হয়; তবে সে সংসারে অশান্তি কেন হইবে? স্ত্রী বয়সে ছোটই হয়; এবং এতকালের পিতৃমাতৃকুলের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির দৃঢ় সংস্কার একেবারে ধুইয়া মুছিয়া, নূতন আবহাওয়ায়, নূতন যায়গায়, একজন বয়সে, শিক্ষায় ও শক্তিতে গুরুর সহিত সর্ব্বদাই মুখোমুখী হইয়া ও ঠোকাঠুকী করিয়া থাকা রূপ কি ভীষণ ত্যাগ করে ও আপনার দেহে ও মনে কতটা যুদ্ধ করিতে থাকে—একথা ভাবিলে, স্বতঃই স্বামীর কৃপা হওয়া উচিত। কাযেই, যদি বয়োকনিষ্ঠা রমণী তাহার জীবনসর্ব্বস্বের কাছে কোনও বিষয়ে সংস্কারবশতঃ ভুলচুকই করে, তবে সেটা কি মানাইয়া লওয়া এত শক্ত? না, ভদ্র বংশে জন্মাইয়া, একজন ভদ্র কন্যাকে পালিত কন্যা রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার মতামতের বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখান এত কঠিন?

(৪) বহু সন্তানাদি হওয়া।—পুরুষের পক্ষে, যৌন সম্বন্ধ তাহার শত কাযের মধ্যে একটা কায। কিন্তু, রমণীর পক্ষে, মাতৃত্ব তাহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ধ্যান ও জ্ঞান।—এইটিই হইল চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা। কিন্তু, তাই বলিয়া, শিক্ষা কি সংযম আনে না—"বার্থ কণ্ট্রোল" বা "সন্তান নিরোধ" প্রথা যাহাই বলুক বা করুক না কেন, মাতৃত্বের ক্ষুধা রাক্ষসী ক্ষুধা নহে, দেবতার ক্ষুধা। এ বিষয়ে, পাশ্চাত্য জগত নারীজাতির উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করে তাহা আমাদের উপলব্ধ হওয়া উচিৎ।

(৫) দেশের কথা।—বর্ত্তমানে অন্ততঃ মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে, অনূঢ় বালক অপেক্ষা, অনূঢ়া বালিকাদের সংখ্যা ঢের বেশী। তাহার কুফল, প্রথমতঃ পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে বালিকা-চালান ব্যবসায়। দ্বিতীয়তঃ, অতি বৃদ্ধেরাও শিশু-দিগকে বিবাহ করিবার আস্পর্দ্ধা রাখে এবং তৃতীয়তঃ নারী ধর্ষণের ও নিগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু অনূঢ়া কন্যার সংখ্যাধিক্য বলিয়াই, আজকাল বিবাহে এত বেশী বর-পণ লইবার সুযোগ ঘটে। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক হিন্দুর কয়েকটি "ঋণ" থাকে—পিতৃমাতৃ ঋণ, দেব-ঋণ ইত্যাদি। বিবাহ দ্বারাই এই ঋণগুলি পরিশোধ্য। আমি যুবকদিগকে দেশের এই ঋণ ও পাপাচার গুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের দেশের মেয়েগুলির ভার তরুণ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যুবকরা না লইবেন, ত তাহাদের বৃদ্ধ পিতা-

মাতার ক্ষয়িষ্ণু ও ক্ষীণ বাহু কত দিন আর মেয়েদিগকে উপযুক্ত ও অপর নানাবিধ অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবে? যেমন, "আপনার মান রাখিতে আপনি, জননি, কৃপাণ ধর গো," তেমনি আমাদের যুবকরাই আমাদের যুবতীদের পরম গতি হওয়া উচিত।

লিখিতে লিখিতে অনেকই লিখিয়া ফেলিলাম। পরিশেষে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ভূমিকা হইতে সহধর্ম্মিণীর নানা রূপের কথা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

স্থিতি-বিধায়িনী!
আশ্রম-বিধায়িনী!
লীলাময়ী!
একটি দেবী মূর্ত্তি!
আনন্দময়ী!
গৃহ-লক্ষ্মী!
বর-পদায়িনী!
সামর্থ্য বিধায়িনী!
প্রবোধ-দায়িনী!
হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী!
যমভয়বারিণী!

চৈত্র-পূর্ণিমায়

[শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী]

রাতি যায় চৈত্র-পূর্ণিমার,
কথা আজি কহ' একবার—
দীর্ণ অবসন্ন প্রাণ তবু তবু গাহ' গান
আনো সেই শুভ্র যূথি-হার!
গাহ' গান চির-যৌবনার।

ফেলে দাও অসীম নৈরাশ,
ঊর্দ্ধে হের উদার আকাশ—
শতধা বিচ্ছিন্ন হিয়া একটি হৃদয়ে নিয়া
সৃষ্টি করো পূর্ণ অবকাশ;
আজি আর র'ব না উদাস!

নীড়হারা কে গো গান গাও—
মোর পানে ফিরিয়া তাকাও!
আমার আধেক প্রাণ তোমারেই করি দান;
সব নিয়ে চৈত্র-রাতি দাও!
নীড়হারা কে গো গান গাও!

একপাশে ছিল বেলী-ফুল—
নিশিগন্ধা মরণ-আকুল;
পাণ্ডুর-আনন শশী আকাশের কোলে বসি';
মোর কোলে?—হায়, সে কি ভুল!
নিশিগন্ধা মরণ-আকুল।

রজনী যে দিন হ'ল আজ;
কাক ডাকে,—এমনি নিলাজ!
পূর্ণ যৌবনের দিন ফিরে যায় নিদ্রাহীন
গান চলে তারা-সভা-মাঝ!
রজনী যে দিন হ'ল আজ।

শুক্লাম্বরে পড়ে এলোকেশ—
ছায়াময়ী, কোথা' সেই বেশ?
আমার সকল প্রাণ খোঁজে তা'রে, গাহে গান!
এ যে সবি হারানোর দেশ,
শুক্লাম্বরে কোথা' এলোকেশ?

কথা কও আজি একবার,
জানি হেথা সবি হারাবার—
তবু আনো সেই সুর, স্মৃতি-মধু-পরিপূর,
জীবনে যা' নহে ভুলিবার।
রাতি যায় চৈত্র-পূর্ণিমার!

ওগো, মোর হৃদয়-সীমায়—
যত্নে-রচা নাড় ভেঙে যায়!
তবু সেই ভাঙা নাড়ে একই মুখ ঘুরে ফিরে—
কেশ-গন্ধ মরিছে বৃথায়!
চৈত্র-পূর্ণিমার রাতি যায়।

কাব্য-পরিমিতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

সিদ্ধান্ত *

চিত্র-সাহায্যে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল যে কবিচিত্ত, কাব্য ও পাঠকচিত্ত ইহাদের প্রত্যেকটী চার শ্রেণীতে বিভক্ত। সৃষ্ট কাব্য হইতে যে চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই সে কাব্যের কবিচিত্ত, সুতরাং কবিচিত্ত ও কাব্যের পৃথক্ ভাবে শ্রেণীনির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন। রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত ও রসোত্তীর্ণ কাব্য সমসংজ্ঞায় পড়ে। কাব্যের বিভাগ,—

(১) ভাবসমুখ কাব্য।
(২) বাসনাসমুখ কাব্য।
(৩) কল্পনাসমুখ কাব্য।
(৪) রসোত্তীর্ণ কাব্য।

পাঠকচিত্তের বিভাগ,—

(১) ভাবমুখী চিত্ত।
(২) বাসনামুখী চিত্ত।
(৩) কল্পনামুখী চিত্ত।
(৪) রসোন্মুখী চিত্ত।

ইহাদের মধ্যে ভাবসমুখ কাব্যের সহিত ভাবমুখী চিত্তের, বাসনাসমুখ কাব্যের সহিত বাসনামুখী চিত্তের, কল্পনাসমুখ কাব্যের সহিত কল্পনামুখী চিত্তের, রসোত্তীর্ণ কাব্যের সহিত রসোন্মুখী চিত্তের অয়নচক্র সম্পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের উৎপত্তি হয়, যদিও সেই সেই আনন্দের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য আছেই। রসোত্তীর্ণ কাব্যের সহিত (অর্থাৎ কাব্য বিশেষে প্রকাশিত রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের সহিত) রসোন্মুখী (পাঠক) চিত্তের যে মিলন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ-স্বরূপ হয়; এই আনন্দেরই অপর নাম 'রস'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভাবসমুখ কাব্য ও বাসনাসমুখ কাব্য এক-গোত্রীয় এবং হীন-গোত্রীয়। তজ্জন্য আনন্দকে 'আনন্দ' না বলিয়া 'বিলাস' বলা সমীচান মনে করি, নচেৎ 'আনন্দ' শব্দটীর জাতি নষ্ট করা হয়। তাহা হইলে সূত্র এইরূপ দাঁড়ায়:—

১। ভাবসমুখ কাব্য + ভাবমুখী চিত্ত = ভাববিলাস।
২। বাসনাসমুখ কাব্য + বাসনামুখী চিত্ত = বাসনাবিলাস।
৩। কল্পনাসমুখ কাব্য + কল্পনামুখী চিত্ত = কল্পনানন্দ।
৪। রসোত্তীর্ণ কাব্য + রসোন্মুখী চিত্ত = রস।

যে চারটী পৃথক্ অয়নচক্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের নাম যথাক্রমে—১। ভাববিলাস চক্র }
২। বাসনাবিলাস চক্র } বিলাস চক্র
৩। কল্পনানন্দ চক্র বা আনন্দ চক্র
৪। রসচক্র

—রাখা যাইতে পারে।

ভাব হইতে কাব্যে পৌঁছিবার রেখাপথ একাধিক কল্পিত হইতে পারে, সুতরাং ভাববিলাস চক্রও একটী নহে—অনেক। কিন্তু এই চক্রের অধিকাংশ রেখাপথ বাসনালোক খণ্ডিত না করিয়া যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে খাঁটি ভাববিলাস চক্র অতি অল্প। প্রত্যেক চক্রেই বাসনার অল্পাধিক মিশ্রণ থাকে।

বাসনালোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে পৌঁছিবার বহু রেখা-পথ অঙ্কিত হইতে পারে, সুতরাং বাসনাবিলাস চক্রের সংখ্যাও অনেক। ইহাদের আপেক্ষিক গুণবিচার রেখা-চিত্রে চক্রের অবস্থান অনুসারে স্থির করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বাসনার উচ্চস্তর হইতে সমুত্থিত কবিচিত্ত কাব্যে পৌঁছিলে যে বিলাসচক্রের উৎপত্তি হয়, তাহা বাসনার নিম্নস্তরসমুখ চক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

বিলাসচক্র সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল কল্পনানন্দচক্র সম্বন্ধেও সেই কথা সম্পূর্ণ খাটে এবং রসচক্র সম্বন্ধেও না খাটিবার কথা নহে। রস বলিতে যতই লোকোত্তর ব্যাপারে সূচিত হউক, রসোত্তীর্ণ কাব্যেও হাস্যরস ও করুণরসে গভীরতার পার্থক্য আছে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং রসোত্তীর্ণ কাব্যমাত্রই একই রসচক্র উৎপাদন করে না। ভাবের প্রকৃতি ও কবিপ্রতিভার পার্থক্য অনুসারে রসচক্র বিভিন্ন হয়। কেবল ইহাদের

* এই অধ্যায় পড়িবার কালে পাঠককে গত সংখ্যায় প্রকাশিত অয়ন-চক্রকে সম্মুখে রাখিতে অনুরোধ করি—নহিলে অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটিবে। উঃ সঃ।

মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম এই, যে কবিচিত্ত কাব্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেই সেই রসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া ভাবলোক, বাসনালোক, ও কল্পনালোকের সীমান্ত হইতে চক্রের উদ্ভব হইতে পারে এবং সে-সব ক্ষেত্রে চক্র 'মিশ্র চক্রে' পরিণত হয়। এমন কাব্য আছে যাহার চক্র অংশতঃ ভাববিলাস ও অংশতঃ বাসনাবিলাস; অথবা অংশতঃ বাসনাবিলাস ও অংশতঃ কল্পনানন্দ হইতে পারে। এ সমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে কবিপ্রতিভা কত বিচিত্র এবং তাহার পূর্ণ পরিচয় ও শ্রেণী বিভাগ করা কত দুঃসাধ্য, তাহা কল্পিত রেখাচিত্র হইতেই বেশ স্পষ্ট হইতেছে।

ইহাও বলা সঙ্গত যে, অধিকাংশ কাব্যই মিশ্র চক্রের উৎপাদন করে। কাব্যের যে চারিটী বিভাগ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে কাব্যাংশের পক্ষে ঐ কথা সত্য হইলেও সমগ্র কাব্যে তাহার সমস্ত অংশ একই চক্রের উৎপাদন না করিতে পারে। তবে যে কাব্য ভাবপ্রধান তাহাকে ভাবসমুখ, যাহা বাসনাপ্রধান তাহাকে বাসনা-সমুখ, যাহা কল্পনাপ্রধান তাহাকে কল্পনাসমুখ এবং যে কাব্যে মুখ্য ভাবটী রস অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গৌণ কাব্য-কৌশলে অল্পাধিক বিচ্যুতি থাকিলেও, তাহাকেই রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিতে হইবে।

এইখানে শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায় আলোচনা করা যাইতে পারে। শিশুর মনে ত বাসনার বিশেষ বালাই নাই,

শিশুসাহিত্য

কারণ সে জগতে ভাবের সহিত পরিচয় লাভ করিতেছে মাত্র, ভাবের স্মৃতি তাহার চিত্তে এখনও সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। যে পাঠকচিত্তে বাসনা নাই তাহা কাব্যক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। সুতরাং কোন কাব্যের আস্বাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তবে শিশুকাব্যের সহিত শিশু-পাঠকচিত্তের অয়নচক্র কিরূপে সম্পূর্ণ হয় এবং আনন্দই বা কি উপায়ে উৎপাদিত হয়?

এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে শিশুসাহিত্য কোন্ 'ভাবের' কারবার করে। শিশুসাহিত্যের কারবার প্রধানতঃ বিস্ময় ও কৌতূহল ভাব লইয়া। বিস্ময় ও কৌতূহল এমন শ্রেণীর 'ভাব' যাহা বাসনার অভাবই সূচিত করে। বিস্ময় বা কৌতূহল ভাবোদ্বোধক বস্তুর পুনঃ পুনঃ সংঘাতে মনেবিস্ময় বা কৌতূহলের লাঘবই ঘটায়। যে চিত্ত জীবনে যত বেশী বার বিস্মিত হইয়াছে, তাহার বিস্মিত হইবার শক্তি তত কমিয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর ভাবের স্মৃতি যাহার চিত্তে যত কম সে ইহার উপভোগে তত বেশী অধিকারী। অতএব বিস্ময় বা কৌতূহল ভাবের স্মৃতির অভাবকেই এই ভাবের বাসনা বলা যাইতে পারে এবং সেই জন্যই শিশুপাঠকচিত্ত কৌতূহল ভাবলোক হইতে শিশু-কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হইবার অনধিকারী নহে।

শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিচিত্তধারা ভাব ও বাসনালোকের সীমান্তপ্রদেশ হইতেই কাব্যক্ষেত্রে যাত্রা করে বলিয়া মনে হয়। বাসনা ও কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট কবিচিত্ত হইতে উদ্ভূত শিশুসাহিত্য কোন দিনই শিশুপাঠকচিত্তের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই, বরং তাহাদের পিতাদের আনন্দ দিয়াছে ইহার উদাহরণ প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতাপুস্তকের অনেক কবিতাই ইহার সমর্থন করিবে।

> খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
> এলেম আমি কোথা থেকে,
> কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
> মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
> খোকারে তার বুক বেঁধে,
> "ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
> ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
> ভোরে শিব পূজার বেলায়
> তোরে আমি ভেঙেছি আর গ'ড়েছি।
> তুই আমার ঠাকুরের সনে
> ছিলি পূজার সিংহাসনে
> তারি পূজায় তোমার পূজা ক'রেছি।"

ইহার সমতুল্য কবিতা মোটেই সুলভ নহে। কিন্তু এখানে শিশু শিশু নয়, মা মা নয় এবং কাব্য শিশুকাব্য নহে। যে কবিচিত্ত শিশু না হইয়াও ভাব ও বাসনার সীমান্ত দেশে বাস করিতে জানে, তাহাই শিশুকাব্য রচনা করিবার উপযোগী। আমাদের পুরাতন ছড়ার সহিত আধুনিক শিশুকাব্যের তুলনা করিলেই একথা স্পষ্ট হইবে। অখ্যাত-নামা কবিগণ এখনকার নামজাদা শিশুকাব্য-লেখকগণের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বোকা সাজিয়া কাব্য রচনা করিত বলিয়া মনে হয় না। তাহারা বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শিশুর ন্যায় সরল ও কৌতূহলী ছিল, অথবা সময়ে সময়ে শিশু হইবার দুর্ল্লভ ক্ষমতা তাহাদের ছিল—যেমন স্নেহাতুরা জননী শিশুর সহিত শিশু হইয়া (কল্পনাবলে নহে) নিরর্থক শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া সার্থক শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি

করেন। ঘরে ঘরে জননীরা শিশু সন্তানের মুখ চাহিয়া যে প্রলাপোক্তি করেন তাহার সুনির্ব্বাচিত চয়নিকা করিতে পারিলে হয়ত পূর্ব্বপ্রচলিত ছড়ার সমকক্ষ আধুনিক শিশু-সাহিত্য প্রকাশিত হইতে পারে। একটী নমুনা লইয়া বিচার করা যাক্।

ওপারের জন্তী গাছটী, জন্তী বড় ফলে,
গোজন্তীর মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আইঢাই, গলা করে কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ?
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান,
পান কিনলাম চূণ কিনলাম ননদভেজে খেলাম।
একটী পান কম হ'ল দাদাকে ব'লে দেবো,
দাদা দাদা ডাক পাড়ি, দাদা নেই ঘরে,
সুবল সুবল ডাক পাড়ি সুবল যাচ্চে ঘরে।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে,
সুবলকে নিয়ে যায় দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে,
চিকন চিকণ চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে,
একটী নিলেন গুরুঠাকুর, একটী নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে,
গায়ে হলুদ দিয়ে,
গৌরী বেটী কনে,
নকা বেটা বর,
ঝামকুড়াকুড়্‌ বাদ্যি বাজে, চড়কডাঙ্গায় ঘর।

এই ছড়ার অন্তরে কবিচিত্তধারার অনুসরণ করিলে দেখা যায়, কবিচিত্তের বয়স বেশী নয় এবং তাহা একটী অর্দ্ধস্ফুট বালিকাচিত্ত। তাহা না হইলে একটী পানের জন্য দাদার কাছে নালিশ করিতে ছুটিত না এবং পরক্ষণেই সুবলের বিবাহ ব্যাপারে অমন মশ্‌গুল হইয়া যাইত না। জন্তীগাছ হয়ত আছে, কিন্তু 'গোজন্তীর মাথা' কেহ কস্মিন্ কালে দ্যাখে নাই, সুতরাং ইহার ভাবস্মৃতি বা বাসনা কবি-চিত্তে সঞ্চিত নাই। অন্যবিধ গাছের মাথা, যাহা খাইয়া 'প্রাণ কেমন' করিতে পারে অথবা 'গলা কাঠ' হইয়া আসে (যেমন তামাক পাতা) তাহারই অর্দ্ধস্ফুট বাসনা কবিচিত্তে ভাব ও বাসনার সীমান্ত-প্রদেশে হয়ত অবস্থান করিতেছিল, সেইখান হইতেই কবিচিত্ত সরাসরি কাব্য-ক্ষেত্রে উঠিতে চাহিতেছে। চুণ দিয়া পান খাওয়ার বাসনা কবিচিত্তে প্রস্ফুট, কিন্তু বিবাহ হইলেও তৎসম্পর্কীয় ভাব পরিপাক হইয়া এখনও বাসনা-লোকে বেশ ভিত গাড়ে নাই বলিয়াই মনে হয়। দিগ্‌নগর, কাৎলা মাছ, চিকণ চিকণ চুল, ইহাদের বাসনা স্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু টিয়ের মা'র বিয়ে বিস্ময়ভাবের কথা এবং ইহার অভাবই বিস্ময়বাসনার রূপ। 'ঝাম্‌কুড়াকুড়্‌ বাদ্যি' বাসনার নিম্ন স্তরের কথা, কারণ এই বাদ্যি-ভাবের স্মৃতি বা বাসনা যখন মানব-চিত্তে বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহা আর কাব্য-গঠনোপযোগী উপাদান থাকে না, তাহাকে থামাইবার জন্যই চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—কবিচিত্ত এ ছড়ায় কখনও ভাব-লোকে এবং কখনও বাসনা লোকে অর্থাৎ তাহাদের সীমান্তপ্রদেশে বিচরণ করিতেছে।

শিশুপাঠকচিত্তধারার অনুসরণ করিলে দেখিব—জন্তীগাছ, গোজন্তীর মাথা, প্রাণ কেমন, হরগৌরীর মাঠ, পাকা পাকা পান, ননদভাজে তাহার ভক্ষণ ইত্যাদি সমস্তই তাহার পক্ষে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুতরাং কৌতুহলের বস্তু। পাঠকচিত্ত এখানে অভাবাত্মক কৌতুহলবাসনার মধ্য দিয়া কাব্যে ছুটিয়াছে। এ চিত্ত জগতে ভাবের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া বাসনাসঞ্চয়ে সতত উন্মুখ, সুতরাং অংশতঃ ভাবমুখী অংশতঃ বাসনামুখী অর্থাৎ ভাবলোক ও বাসনালোকের সীমান্তপ্রদেশে পৌঁছিবার জন্য ইহার টান বেশী। অতএব কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইয়া এখানে আনন্দ অর্থাৎ বিলাস উৎপাদিত হইতেছে।

এ ছড়া হিসাবী লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক হিসাব ভুলিয়া লিখিতে পারে না, যেমন সাঁতার-জানা লোক ইচ্ছা করিলেও সাঁতার ভুলিয়া ডুবিয়া মরিতে পারে না। এ কাব্য শিশুমনে যতই উপভোগ্য হউক, কাব্যবিচারে ইহার আনন্দ বা বিলাস নিম্ন স্তরের, ইহাতে মতভেদ হইবার কারণ নাই। শিশু-সাহিত্য বলিতে আমি বালকসাহিত্য বলি নাই এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

যদি এমন কথা বলা হয় যে শিশুচিত্ত ছড়ারূপ শিশু-সাহিত্য হইতে যে আনন্দ লাভ করে তাহা সম্পূর্ণরূপে সুর-জাত, ছড়ার কথা হইতে সে কোন আনন্দ পায় না, তবে আমার যুক্তি-পরম্পরা অসত্য না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বলিতে হইবে।

অতএব দেখা গেল—কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইলেই কাব্যোপলব্ধি সম্ভব হয় এবং তাহাতে বিলাসচক্র, আনন্দচক্র, রসচক্র বা মিশ্রচক্র অবলম্বন করিয়া এই চারিশ্রেণীর যে-কোন এক শ্রেণীর আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

* আগামী সংখ্যায় এই প্রবন্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ "দৃষ্টান্ত" বাহির হইবে। দৃষ্টান্তে প্রথিতযশা কবিদের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাব্য-বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে, কাহার কাব্য-শক্তি নির্দ্দিষ্ট কবিতায় কি স্তরের। উঃ সঃ।

ভাঙ্গন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

যখন আবার গাড়ী ছাড়িল, তখন আরোহী ও চালকের মধ্যে একটা রীতিমত তর্কযুদ্ধ চলিতেছে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে। উত্তেজনাবশে ধীরেন ঘুরিয়া বসিয়াছে, বলদ দুইটা আপন গতিতে চলিয়াছে।

ধীরেন বলিতেছিল, "যীশুর মত আমাদের দুঃখ কে বুঝবে? তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের একমাত্র পুত্র, অত বড় দেবতা হ'য়েও মানুষের মঙ্গল কত্তে ক্রুশে দেহ রাখলেন; যারা গালাগাল দিচ্ছে অত যন্ত্রণার মধ্যেও তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন।"

শ্যাম—তাতে কি হয়? আমি যদি জানি যে আমি সাক্ষাৎ ভগবানের এক ছেলে; আমায় যে যাই করুক, ধরুক, বাঁধুক, মারুক, আমি অমর, আমার কিছু হবে না, তাহ'লে আমিও সবরকম দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য কত্তে পারি—তুমিও পার, বিশেষতঃ যদি আগে থেকে জানি যে তাতে আমাকে তোমাকে লোকে পূজো করবে।—এতে আর বাহাদুরী কি; যে সব মানুষ আমাদের মতই মানুষ, যীশুর চেয়েও বেশী বেশী কষ্ট, পরীক্ষা, দুঃখ সহ্য করে মন প্রাণ ঠিক রাখতে পেরেছে—হিন্দুরা যাদের অবতার বলে, যারা নিজেদের জীবনে প্রেম জ্ঞান ভক্তির চূড়ান্ত দেখিয়ে গেছে—তাদের বাহাদুরী ঢের বেশী।

ধীরেন—কিন্তু হিন্দুদের দেবতা কত, আমাদের এক ঈশ্বর।

শ্যাম-কেন খৃষ্টানের দেবতা কম কোথায়—যীশু, মেরি তা ছাড়া আবার কত দূত, কত সেণ্ট—এই সবই দেবতা, অপদেবতাও আছে সয়তান তার ছেলে মেয়ে চর—যেমন হিন্দু তেমনি খৃষ্টান।

ধীরেনের মেজাজ দুইবার পরাজয়ে একটু উষ্ণ হইল। সে এইবার বাদানুবাদের স্বরে বলিল, "হিন্দুদের যত অবতার কেবল, দশমুণ্ড, লেজ, শিং সব গাঁজাখুরী কাণ্ড—কেউ লাফ দিয়ে একশ যোজন যাচ্ছে, কেউ আবার মাথায় পাহাড় তুলে ধরে সাপের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে—অসম্ভব, মিথ্যা সব।"

শ্যাম ধীরেনের কথাবার্ত্তায় নিজের দুশ্চিন্তার গুরুভার হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছে—এই লঘু তর্কে সে অনেকটা আমোদও পাইতেছে, সেই জন্য নিজেও রাগের ভাণ করিয়া বলিল, "যীশু যে দেবতা, সে কেমন করে জানব—তার প্রমাণ কি?"

আর একটু হইলে ধীরেন হয় শকটচ্যুত হইত না হয় এই নূতন বন্ধুর গলা টিপিয়া ধরিত। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে চীৎকার করিয়া ধর্ম্মযাজকদের ভঙ্গীতে বলিয়া চলিল, যীশুর জন্মরহস্য, তাঁহার অলৌকিক কর্ম্মমালা, তাঁহার পুনরুত্থান ইত্যাদি। যখন কেবল ক্লান্তি বশতঃই সে বর্ণনায় ক্ষান্ত, তখন শ্যাম সহাস্যে বলিল, "এই বলছিলে যে তোমাদের মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই, তবে শূয়োরের মধ্যে ভূত জলের উপর হাঁটা, এসব এলো কেমন করে?" ধীরেন প্রশ্নকারীর কৌশল বুঝিতে পারিল, নিজের পরাজয়ও বুঝিল, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার স্বভাবানুযায়ী কলহ হইতে তাহার প্রকৃতিগত ন্যায়প্রিয়তা তাহাকে রক্ষা করিল—সে একবার নীরবে কৌশলকারীকে দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কারদগ্ধ করিয়া, মৌন ভাবে গাড়ী চালাইতে মন সংযোগ করিল। শ্যামের প্রথম দুই একটি কথার কোন উত্তরই সে দিল না, তাহার পর দুই একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, সে মূর্খ লোক, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনায় তাহার পাপ হইবে। কিন্তু শ্যাম ছাড়িবার পাত্র নহে, সে তখন সহানুভূতির স্বরে কথা আরম্ভ করিল—যীশুর মাহাত্ম্য কোথায়, প্রেম বিশ্বাস ত্যাগের মহিমা সরল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া অতি সুন্দর ভাবে বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় রচনা করিল, যাহা ধীরেনের হৃদয়গ্রাহী ত' হইলই উপরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার বোধগম্যও হইল—পাদ্রীদের নিকট এই সৌভাগ্য তাহার কখনও হয় নাই। তাহার অভিমানের মেঘ কখন উড়িয়া গিয়াছে। কথকের মুখের উপর শিশুর মত তন্ময় দুটি নয়ন

রাখিয়া সে ফিরিয়া বসিয়াছে—কখন. তাহা নিজে লক্ষ্য করে নাই। শ্যাম নীরব হইলে ধীরেন একবার এদিক ওদিক চাহিয়া কাছ ঘেঁসিয়া আসিল—অতি মৃদুস্বরে তাহার মনের গোপন কথাটি বলিয়া দিল, "ঠাকুর, এই খৃষ্ট আর কৃষ্ট এক. কাউকে বলবেন না যেন।" বলিয়া ফেলিয়াই চকিতে সরিয়া গিয়া বলদ দুইটির গতি সংশোধনে নিজেকে যেন ডুবাইয়া ফেলিল।

গ্রামের সীমানার তাহারা নিরূপিত সময়েই পৌঁছাইল। দুর্ব্বল আলোকে একজন লোক মাথায় একটা ঝুড়ি লইয়া আগে আগে যাইতেছে দেখা গেল। গাড়ার শব্দে সে পিছনে তাকাইয়া ধীরেনকে চিনিয়া প্রথমটা থতমত হইয়া গেল—তাহার পর সোৎসাহে ধীরেনকে অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত বিবরণ নিজের মনোমত ভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইল।

গাড়ী পড়িয়া রহিল, আরোহীর কথা কে মনে রাখে? একটা চীৎকার করিয়া ধীরেন গাড়ী হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। তাহার অন্তরে তখন এক রাক্ষস হাহাকার করিতেছে। যেখানে গাছতলায় অর্দ্ধদগ্ধ বাঁশচালা জড় করিয়া তাহার মূক বিমূঢ় পরিবার আশ্রয় লইয়া আছে, সেইখানে গিয়া ধীরেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্যাম পথিকের কথা শুনিতে পায় নাই। গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরেনের অনুসরণ করিবার মানসে লোকটিকে প্রশ্ন করিতে সংক্ষিপ্ত জবাব পাইল, "ও চিরকালই ওই রকম; থাকে থাকে একেবারে বদ্ধ পাগল হ'য়ে যায়—গরুতেই গাড়ী ঠিক বাড়ী নিয়ে যাবে এখন।" নূতন অপরিচিত স্থানে এই কথার অন্তরালে অন্য কিছু সন্দেহ করিবার শ্যাম পাইল না। প্রথম উদ্যমের উৎসাহ হারাইয়া ভাবিল বুঝি এই রকমই স্বাভাবিক ও সাধারণ হইবে। অগত্যা লোকটিকে রাজী করাইয়া তাহার মাথায় নিজের জিনিষ-পত্র তুলিয়া জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীতে যখন প্রবেশ করিল—তখন মাত্র ভোরের আভাব; দুই একজন করিয়া মানুষ জাগিতেছে।

এ লোকটি মেতা বাগ্দী, রাজুকে কতকগুলি জিনিষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দিয়া আসিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ছোট কর্ত্তার বিদেশে অকস্মাৎ মৃত্যুর সংবাদ ও তাঁহার পুত্রের এই আকাশ-হইতে-পড়া আগমনে, গ্রাম আন্দোলিত হইলেও, দুইজন ছিল যাহারা পূর্ব্বে হইতেই এই সকল সংবাদ সঠিক রাখিত,—একজন অক্ষয় আর একজন চারুবালা। ব্রজকিশোরের অনুপস্থিতিতে আগত চিঠি,—সে সব চিঠিই অক্ষয় মারফৎ চারুবালার নিকট প্রেরিত হইত। এই চিঠিগুলি কি কারণে চারুবালা গোপন রাখিতে অক্ষয়কে সাবধান করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন, হয় এগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা কিংবা স্বামীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল এমনই একটা ধারণা তাঁহার মনে হইয়াছিল। সকালে সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ইন্দু সরকার ছুটিয়া আসিলে শ্যাম অপরিচিতের প্রথম অস্বচ্ছন্দতা হইতে অব্যাহতি পাইল। ইতিপূর্ব্বে একটা সাধারণ অতিথি আপ্যায়িত করিবারও কোন চেষ্টা কোনদিকে লক্ষ্যগোচর হয় নাই। অন্তঃপুরে যাই যাই ভাবিয়া কিসের একটা বাধা অনুভব করিয়া শ্যাম সে বাসনা দমন করিল—জ্যাঠাইমার পক্ষ হইতে কোন কিছুর সাড়া সে পায় নাই। ইন্দু সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুব্যবস্থা তাহাকে অভ্যাগতের অবশ্যজ্ঞাতব্য অসুবিধাগুলিও ভাল করিয়া জানিতে দিল না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী জানাইলেন যে দেবরপুত্রের আহারাদি সদর মহলেই হইবে কারণ তাহার অগ্রজ বিলাতফেরৎ—অন্দরে সব একাকার। শ্যাম শুনিয়া সুখী হইল—যেখানে আন্তরিকতার অভাব সেখানে নিত্য একটা আত্মীয়তায় বাধ্য হইয়া মৌখিক অভিনয় করা তাহার অসহ্য। ললিতের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাহার পত্রব্যবহার ছিল। জীবনে কাব্যের প্রথম প্রভাববিস্তারের সময়, যখন বেনোজলে সে দিশেহারা, সেই সময় একটা উদ্দাম অভিনব আকাঙ্ক্ষায় ললিত শ্যামকে প্রথম চিঠি লিখিয়াছিল—তাহাতে অনেক কিছু ছিল, প্রতিপাদ্য বিষয় তাহারা দুইজনে ভাই, সমবয়সী, পরস্পরের জন্য ব্যাকুল, আর দুনিয়া অভিভাবকদের মুখোস পরিয়া তাহাদের নিয়ত বাধা দিতেছে—অদৃষ্টেরও একটা বিয়োগান্ত-রচনার ইচ্ছার ইঙ্গিত সেই পত্রে ছিল। তাহার পর অনেক চিঠি—ললিতের প্রত্যেকটিতে নিজে সেই সময়ে যাহা কিছু নূতন পাইতেছে—তাহারই চর্ব্বিতচর্ব্বণ, উচ্ছ্বাস, বড় বড়

অর্দ্ধজ্ঞাত কথার সমাবেশ, আর শ্যামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তর-গুলিতে, সেইগুলির মধ্যে একটা অর্থসামঞ্জস্য ও সুস্থতা আনয়নের চেষ্টা, সমালোচনাসম্পর্কশূন্য আন্তরিকতায় পূর্ণ। ললিত চাহিত নিজের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ অনুভূতি তাহা আর একজনের কাছে ঢালিয়া দিবার তৃপ্তি—কিন্তু নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ কোন কিছুই তখন গঠিত হয় নাই, আর অনুভব যাহা করিতেছে, তাহা আরাধ্য কবির মন লইয়া—কখনও Keats, কখনও Shelly, কখনও Byronএর। শ্যাম ললিতের ভ্রম, দোষ দেখিত না, দেখিত তাহার হৃদয়—সে সেইটুকু লইয়া সহানুভূতির ভাবে ও সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করিত। ললিতের প্রতি শ্যাম একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু ললিত শ্যামের ভক্ত হইয়াছে—তাহার পর এক দিকে খুদীর মৃত্যু ও অন্যদিকে পিতার রোগের শেষ পর্য্যায় ও পরিণতি, দুই পক্ষের চিঠি পত্র বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ললিতকে দেখিতে পাইলে শ্যাম সুখী হইত, জ্যাঠামহাশয়কে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন ক্ষণিকের জন্য দমিয়া গেল—কিন্তু অনায়ত্তের জন্য হা হুতাশ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, বিশেষতঃ জ্যাঠামহাশয়ের যখন শীঘ্রই ফিরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গ্রামে শ্যামের আগমন-বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী গ্রাম্যেরা তাহাদের দস্তুরমত সাহেবের ধারণা প্রত্যক্ষ করিতে আসিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেও ছোট কর্ত্তার ছেলের আত্মীয়তাজ্ঞাপক সহজ সম্ভাষণ ও ব্যবহারে তৃপ্তি লাভ করিয়া গেল—যাহারা আলাপের দাবী রাখে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার ভক্ত হইয়া উঠিল।

শ্যাম বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে—গ্রাম্য ইস্কুলে দেখা দিয়া জ্ঞানবাবুকে সশঙ্ক ও শশব্যস্ত করিয়া আসিল। ডাক্তার-খানায় গিয়া নিরুদ্দিষ্ট চাবির গোছার অভাবে, তালা ভাঙ্গাইয়া সব পরিস্কার গোছগাছ করিতে লোক লাগাইয়া দিল। টোলের পণ্ডিত মহাশয় তাহার সহিত দুই একটি বাক্য বিনিময় করিয়াই, নিজের লঘুকৌমুদী পর্য্যন্ত জ্ঞান লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন—ডাক্তারখানার ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত, তজ্জন্য মাসিক একটি টাকা তাঁহার উপরি প্রাপ্য। অতঃপর শ্যাম কাছারীবাড়ীতে হানা দিল, অক্ষয়ের সহিত একরকম জোর করিয়াই আলাপ করিল। অক্ষয়ের উপদেশ, গ্রামে যেখানে সেখানে যাওয়া আসা কল্পা গর্হিত—প্রকাশ্যে ঐরূপ করিলে নিন্দা উঠিতে পারে, সবই হাসিমুখে শুনিল। এই সকল পালা শেষ করিয়া শ্যাম এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে ওস্তাদজীর উপর বন্ধুত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল—দুইজনে সঙ্গীত, সৌন্দর্য্য, ভগবান লইয়া আলাপ প্রায়ই জমিয়া উঠে। কিন্তু এই সকলের অন্তরালে তাহার মনে একদিকে পিতার নিকট নীরব প্রতিশ্রুতি-পালনে বিলম্ব হওয়ার জন্য দুঃখ ও অন্যদিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালার প্রথম ঘনিষ্টতার মনোমোহনময় সুখ সদাই অনুভূত। বাঙ্গালার মায়া—গাছের পাতায়, মাঠের উন্মুক্ত দৃশ্যে, পল্লীজীবনপ্রণালীর নিত্য পর্য্যায়ের প্রতি দৃশ্যের অন্তরালে, ছায়ায়, রৌদ্রে, দিনের মন্থর গতিতে, নিশার গাঢ়তায়—কি যে মাতানো রস মনের সম্মুখে ধরে তাহা শ্যামের ন্যায় ভুক্তভোগীই জানে। কেবল অক্ষয়ের সাবধান-বচনের একটা ফল এই হইল যে, শ্যাম ধীরেন সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারিল না।

ইন্দ্র সরকার অনুমান করিয়াছিলেন, শ্যামের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য একজন মন্ত্রী প্রয়োজন, বিশেষতঃ সরিকী জমীদারী পরিচালনাক্ষেত্রে সে নিজের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার ন্যায় দক্ষ লোকেরই মন্ত্রণা লইবে। কিন্তু কিন্তু দুই একটি কথা কহিয়াই তিনি বুঝিলেন, শ্যামের মনে সে সকল চিন্তার উদ্রেক আদৌ হয় নাই—জ্যাঠামহাশয়ের আগমনের সঙ্গে তাহার সমস্যার একটা সরল স্বভাবিক মীমাংসা হইয়া যাইবে এ বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ নাই—বিশেষতঃ সে যখন শ্রীনগরে আসিয়া জানিয়াছে তাহার পিতার শেষ পত্র ও তাহার পত্র বড় কর্ত্তার কলিকাতাযাত্রার পরে আসাতে গিন্নীমার নিকট অখোলা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে—অন্ততঃ ইন্দ্র সরকারের জ্ঞান সেই পর্য্যন্ত। জ্যাঠা মহাশয়ের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে বৈরীভাবজ্ঞাপক কোন চিন্তা তাহার মনে আসে নাই; কেবল পরামর্শে, মন্ত্রণায়, আসিবারও নহে, সে কথা চতুর ইন্দ্র সরকার সহজেই উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ হইলেন—কিন্তু শ্যামের উপর আন্তরিক টান বাড়িয়া গেল। বিষয়কার্য্যে চুল পাকা-ইলেও, সরল ও নির্ভরপরায়ণকে, লোভ স্বার্থশূন্যতাকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি বজায় থাকাতে তিনি অন্তরে অন্তরে

অন্যতম প্রভুর পিতৃহীন পুত্রের সাধ্যমত সাহায্য সকল বিষয়ে করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ভ্রাতৃবিয়োগ ও শ্যামের আগমন-সংবাদ জানাইয়া ব্রজকিশোরকে শীঘ্র শ্রীনগর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরোধ করিয়া ইন্দ্র সরকার পত্র দিলেন এবং তাহাতে ইহাও লিখিত হইল যে টাকার দরকার আসিবামাত্রই হইবে, কারণ ছোটকর্ত্তার দেনা এখন মিটাইতেই হইবে। অতএব তিনি যেন কলিকাতা হইতে টাকা লইয়া আসেন —অবশ্য ইন্দ্র সরকারের পূর্ব্বেই টাকা পাঠানর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যে কর্ত্তা কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন সে সংবাদ এখনও কাহারও বিদিত নহে, ইহা জানাইতে ইন্দ্র সরকার ভুলিল না- অন্নদাতার অনুগ্রহ বাঞ্ছিতই হইয়া থাকে।

ক্রমে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল, ব্রজকিশোরের প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্ধারিত দিবস সকলেই জানিল।

শ্যামের উপস্থিতি দুইজনের নিকট বড় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে—অক্ষয়ের মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চারে, একটা নিশ্চিত বিফলতার আশঙ্কায় সে বিষণ্ণ, আর চারুবালা কিছু করিতে না পারিয়া নিজের রাত্রিদিনকে বিষময় করিয়া তুলিলেন। অক্ষয়ের জীবনে ঝঞ্ঝাট দিনে দিনে বাড়িতেছিল। নবীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পিতার সহিত তাহার মতদ্বৈধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দৈনিক জীবন প্রণালীর নগণ্যতম ব্যাপারে তুচ্ছ সামান্য অভ্যাসের বিষয় গুলিকে উপলক্ষ করিয়া দুইজনের তর্ক ও শেষে বচসা ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়াইতে লাগিল। জ্ঞান বাবু সহসা আবিষ্কার করিলেন বধূমাতা নিত্য আহার্য্যে লবণের কার্পণ্য করিতেছেন, ব্যঞ্জনপরিবেশনে লজ্জাহীনার ন্যায় পক্ষপাতিত্ব পাচকের কন্যার পক্ষে স্বাভাবিক, যখন তখন এই মত উচ্চৈস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একটি কোঁকড়া চুলওলা ছোট মাথা, দুইটী চঞ্চল সুগোল হাতের অলঙ্কার ঝঙ্কার, আর স্ফীত ঈষন্মুক্ত কম্পিত ওষ্ঠাধর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

তখন অক্ষয় সিদ্ধান্ত করিল, পিতার যে স্থূল বুদ্ধি তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত মাষ্টারীর সামান্য গণ্ডীর বাহিরে আনিতে সক্ষম হয় নাই—তাহার অন্যায় প্রশ্রয়ে জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ ও সাধারণের নিকট মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ করিতেছে। সেই দিন জ্ঞান বাবু ইস্কুল হইতে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মত বিরহম্লান নহে, কিন্তু গাঢ়কৃষ্ণ মেঘে লিপ্ত-মুখ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। চক্ষে দুর বিজলীর চিড়িক্ হানিতেছিল—কে ছিল লক্ষ্য করিবার? সেই দিনই শ্যাম ইস্কুল দেখিতে আসিয়াছিল, অপরিচিত জ্ঞান বাবুকে দুই একটা সংক্ষিপ্ত উপদেশ যাহা দিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি—"গুরুমহাশয় বয়েস অনেক হ'ল অনেক ছেলে ঠেঙ্গিয়েছেন—এখন সব ছেড়ে বাড়ী বসে ধর্ম্মকর্ম্ম করুনগে—প্রায়শ্চিত্ত হবে।"—সব শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া জ্ঞান বাবু দেখিলেন, হাত পা ধোয়ার জলটুকু পর্য্যন্ত প্রয়োজনমত তোলা নাই; বধূমাতা কক্ষান্তরে, অক্ষয়ও অসময়ে প্রকাশ হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিতেছে—যতটুকু শোনা গেল পালা 'মান' নহে, 'কলহান্তরিতার' ভাষাবিরলতা আছে আবার রসোদ্গারের কৌতুকছটা মাঝে মাঝে কক্ষপ্রাকারকে গ্রাহ্যই করিতেছে না। মাথার মধ্যে কড় কড় করিয়া বাজ ডাকিয়া উঠিল; প্রচণ্ড করাঘাত ভেজান দরজার উপর পতিত হওয়ায় কবাট দুইটী আর্ত্তনাদ করিয়া গৃহপ্রাকারে দেহ মিশাইল—কক্ষদৃশ্য জ্ঞান বাবুর জলন্ত চক্ষুরূপী lens এর মধ্যে দিয়া মস্তিষ্কের ক্যামেরায় চিরবন্দী হইল। জ্ঞান বাবু গোপীসুলভ ভাবের সাধনা কখনও জীবনে করেন নাই, গোপীভাবের ব্যাখ্যা যদ্যপি কখনও শ্রুত থাকেন অধুনা তাহা বিস্মৃত—এই সকল নানা অসুবিধার জন্য তাঁহার তখন মুক্তি হইল না। হইল, যাহা তাঁহার সহজেই হয়—অপরিমিত ক্রোধ।

চারুবালা চুল বাঁধিতেছেন, একজন দাসী বাতাস করিতেছে—অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী দাসীরা নানা কার্য্যে ও নানা ভাবে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত। বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সন্ধ্যায় আরতিদর্শন পর্য্যন্ত দীর্ঘসময় ব্যাপী এই কেশ ও অন্যান্য প্রসাধন দাসীকুলের একটা নিত্য বিভীষিকা। দশবার চুল বাঁধা আবার রাগে খুলিয়া ফেলা—সঙ্গে দাসী-দিগের মুণ্ডপাত করা অবশ্য আছেই; আজও একটু আগে বসনমণি মুখনাড়া খাইয়াছে—আদেশ ও ধমকে হাতের পাখা চাঁপার হাতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চাঁপা আজিকার পাখাধারীদের মধ্যে চতুর্থ-সশঙ্কচিত্তে প্রাণপণে বাতাস করিতেছে—নীচের ঠোঁটে উপরের দাঁত চাপিয়া পানের গাঢ় ছোপের উপরও রং ফলাইয়াছে—চক্ষের পাতা আর ভ্রুর মধ্যে একটা টাগ-অফ ওয়ার বেশ স্পষ্ট ও চিত্তা-কর্ষক। একদিকে পরিশ্রম ও নিদাঘদিবসের অস্তভাগের মন্দ উত্তাপ নিদ্রাকে আহ্বান করিতেছে—অন্য দিকে ভয় সেই নিদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাকুল চেষ্টায় নিম্নমুখী নেত্রপল্লব ও উর্দ্ধাকৃষ্ট ভ্রুর মধ্যে ব্যবধান কেবল বাড়াইয়াই চলিয়াছে। হরির পিসী জটচুললাগা চিরুণী পরিষ্কার কার্য্যে একাগ্রচিত্ত; চুল আচড়াইতেছে গিরি—আর সকলে ভয়ে ভয়ে মিটির মিটির চাহিয়া আছে—কেননা কার কপালে কি বা আছে কে জানে।

(ক্রমশঃ)

বিষ-বসন্ত

[শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ]

আজি অকরুণ খেয়াল খেলায় পথে পথে ওড়ে ধূলি।
দারুণ হাওয়ায় ঝ'রে প'ড়ে যায় ব্যাকুল বকুলগুলি।
অমা-যামিনীর তিমির-অলকে
তারা-ফুল খসে পলকে পলকে
দিগ্-বধূ কাঁদে বিধবার সাজে সাঁথির সিঁদূর তুলি'।

দীপ নিভে যায়, ভরে তমসায় ভবন-বলভি মোর।
আমার মতন কা'র চোখে আজ ঝরিছে নয়ন-লোর?
ওই গৃহকোণে বসি' অভিমানী
কপালে কঠিন কঙ্কণ হানি'
ধূলিতে লুটায়,—আকুল কবরী, শিথিল বসন-ডোর।

বাহিরের পানে চেয়ে চেয়ে শুনি বাতাসের হাহাকার।
ধূসর মাটির কবরে লুটায় ঝরা পাতা ফুলভার।
বৈতরণীর ধূ-ধূ মরুচরে
চখা আর চখী গুমরিয়া মরে,
দুজনার মাঝে বিছালো অবুঝ অপার অন্ধকার।

চোখে চোখে রাখি' পারিনি বলিতে, "ভালোবাসি, ভালোবাসি।"
মনে হয়েছিল, 'কি কাজ কথায় বেদনারে পরকাশি'?'
তবু নিশিদিন বাসনা-অনলে
হৃদয়ের ধূপ গিয়াছে তো জ্ব'লে,
সুরভি কি তার পশেনি তোমার মনোমন্দিরে আসি'?

তাই দূরে দূরে ফিরিলাম ঘুরে বিদেশী পথিকবেশে।
নয়নের জল পাছে উথলায় তাই তো বেড়ানু হেসে।
তাই সীমাহীন বিরহের মাঝে
মিলনের সুরে মোর গান বাজে।
লুকাতে কাঁটার ব্যথার প্রলাপ ফুটানু গোলাপ শেষে।

জীবনে তোমার দিনু উপহার রূপালি রোদের আলো।
ফুলের গন্ধ লঘু আনন্দ কা'র বা না-লাগে ভালো?
তব তরে ছিল মধু-উৎসব
নিকুঞ্জ ভরি' কুহু কলরব
মোর তরে তুলে দিয়াছিনু রাখি' রাতের নিকষ কালো।

আলোটির পাছে ছায়া যে বিরাজে স্মরণ ছিল না হায়।
তাই আজ সাত সাগরের জল দুই চোখে উথলায়।
মিলালো পলকে মরু-মঞ্জরী
আলো-কমলের দল গেল ঝরি';
ভাসানু যে-দীপ সে গো মরা-স্রোতে অতলে ডুবিয়া যায়।

কে জানিত বলো এমন করিয়া ক্ষণিকের মনোভুলে
ফুল ফেলি' দিয়া কণ্টক নিবে চম্পক অঙ্গুলে ?
ক্ষতমুখে তার তীক্ষ্ণ ফলকে
মরমের রাঙা শোণিত ঝলকে,
চিতার আগুন ঝলসিয়া ওঠে কালো নয়নের কূলে।

কোথা অপরাধ ? হানিলে আঘাত কেন যে বুঝিব কিসে ?
অধরের সাধু কটু কালকূটে কখন গিয়াছে মিশে।
দেহ ভরি তারি দহনের জ্বালা।
ছিলে লীলা-বধূ, হ'লে নাগ-বালা।
মধু-বসন্ত বিষাক্ত হ'ল তোমারি বুকের বিষে।

কবরীর থেকে তাই গেল ঝরি' অশোকের মঞ্জরী!
আফিমের ফুলে নেশায় ঝিমায় চঞ্চল চঞ্চরী!
রাতে যে তপ্ত ঝরে আঁখিনীর
প্রভাতে সে দেখি মৃত্যু-শিশির!
মনো-মধুকর তারে ঘিরে আর ফিরে নাতো গুঞ্জরি'।

কাম-বধূ নিজ কামনা আগুনে পুড়ে পুড়ে হ'ল ছাই।
আমার জীবনে প্রণয়ী জনের সান্ত্বনা কোথা পাই ?
এ-তো নয় ওরে সুধামন্থন,
এ-যে মোহ-হীন শুধু বন্ধন।
এই অবনীর নবনীতে তাই বিষ ছাড়া কিছু নাই।

তাই বনানীর মর্ম্মের পরে ঝটিকা উঠিল রাঙি'।
ভীত বলাকার পাখায় যে বাজ পড়িল আকাশ ভাঙি'।
হু-হু ক'রে বায়ু বহিছে সদাই।
আশা মরীচিকা! নাই, নাই, নাই!
তবু নীড়-হারা বিহগ-প্রেয়সী কাঁদিছে কুলায় মাঙি'।

একবার তবু চেয়ে দেখ দেখি নয়নে নয়ন রাখি'
মনে হয় আজো মরণ-বিজয়ী প্রেম কিছু আছে বাকী।
তাই দিয়ে তব আঁখি-বিষ-বারি
চুম্বনে যদি মুছে নিতে পারি,
মরা বসন্ত হয়তো হাসিবে আলোর আবীর মাখি'।

শিলং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

'মুস্‌মাই' ফলস্ দেখিবার নিমিত্ত একদল স্ত্রীপুরুষ রেলিং ধরিয়া পরপারে চাহিয়া ছিল, আমরাও তাহাদের দলভুক্ত হইলাম। রাস্তার শেষ সীমায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া গভীর গহ্বর, গহ্বরের পর আকাশস্পর্শী পর্ব্বত, তাহারই শিখরে সেই জগতবিখ্যাত মুস্‌মাই ফলস্। ঐটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সপ্তম ঝর্ণা, কিন্তু উহার দেখা পাওয়া কঠিন, মেঘের আবরণে নির্ঝরিণী অধিকাংশ সময় লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াই থাকে।

অনিমেষ দৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া থাকিলেও মেঘ অপসারিত হইল না। হতাশ হইয়া অনেকেই চলিয়া গেল। আমরা আশায় হৃদয় বাঁধিয়া তেমনি চাহিয়া রহিলাম। দূরবীণে মেঘের লীলাখেলা ভিন্ন কিছুই চোখে পড়ে না। মেঘের পশ্চাৎ মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। সম্মুখের গহ্বর কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কেবল জলপ্রপাতের ভৈরব হুঙ্কারে কাণে তালা লাগিয়া যায়।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার পর পরপারের ঘনীভূত মেঘ ধীরে ধীরে ফিকা হইয়া আসিল, নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্ত্তে যোজনব্যাপী গিরিশ্রেণী দেখা দিলেন, বিস্ময়ে পুলকে যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া রহিলাম—পাহাড়ের গা বহিয়া ধূর্জ্জটির জটাজালে আবদ্ধ জাহ্নবীধারার মত শুভ্র সলিল সহস্র ধারায় ভীষণ গর্জ্জন সহকারে নিম্নে অবতরণ করিতেছে। কি মহিমান্বিত অপূর্ব্ব দৃশ্য! হে নগাধিরাজ, তোমার চরণে প্রণাম। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যের নব নব বিকাশ সঞ্চিত রহিল, তুমি আমায় বঞ্চনা করনাই, হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরিয়া দিলে!

প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না দেখিতেই ধবল মেঘসমুদ্রে শৈলশিখর তাহার বক্ষোস্থিত কোটি কোটি মুক্তাহারসদৃশ নির্ঝর অন্তর্হিত হইল। আমরা হাট দেখিবার নিমিত্ত তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

হাটের সমস্ত দ্রব্যই প্রায় শ্রীহট্ট হইতে আমদানী। কলা, পেঁপে, আক ও শুকনো মাছের আধিক্যই বেশী। এখানকার হাটের জিনিস শিলং-এ চালান হয়। শিলং-এর তুলনায় এখানকার বাজার সস্তা।

হাটের বাহিরে আসিয়া হঠাৎ নেড়াবাবুর সহিত দেখা, কোন দূর আত্মীয়ের অসুস্থ সংবাদ পাইয়া তিনি পদব্রজে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন, পীড়িতকে শিলং-এ লইয়া যাইবার জন্য পুনর্ব্বার হাঁটিয়াই এখানে ট্যাক্সি স্থির করিতে আসিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। ছেলেটির পরোপকারের প্রবৃত্তি দেখিয়া ভারী শ্রদ্ধা হইল।

আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না, পথে 'রূপনাথের গুহা' দেখিবার আশায় তখনই বাহির হইলাম।

আবার সেই পথ, সেই সঙ্গীতমুখরা গিরিনদী—

> "বহিয়া চন্দ্রধনুর সপ্ত ভরা
> তরঙ্গদোলে দোলে দেবা শর্ব্বরী।
> অতল তলে পাতালপুরীর মেয়ে
> চল উচ্ছলে খেলা করে গান গেয়ে।"

বেলা সাড়ে চারিটায় একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামবাসীদের নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া মনে হইল। ইহারা কৃষক সম্প্রদায়, সারি সারি পাতার কুটীর, দরজা জানালার উৎপাত নাই। গ্রামবাসীদের পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত মলিন, দারিদ্র্যব্যঞ্জক, চতুর্দ্দিকেই শস্যক্ষেত্র।

পথিপার্শ্বে গাড়ী থামিবামাত্র দুই তিনটি দশ এগার বছর বয়স্ক বালক ছুটিয়া আসিল। শুনিলাম, ইহারাই নাকি 'রূপনাথের গাইড'। আমাদের ট্যাক্সির পশ্চাতে আর একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। ইঁহারাও রূপনাথের গুহার দর্শনপ্রত্যাশী। এদলে পাঁচজনা পুরুষ, একজনা মহিলা। মহিলার কোলে এক বছরের একটি শিশু।

দুই দল একত্র হইলাম। দুইটি বালক গাইড্ মশাল ও দেশলাই লইয়া আমাদের পথপ্রদর্শক হইল। একটি গাড়ীর পাহারায় রহিল। ট্যাক্সি-চালকরাও আমাদের সঙ্গী হইল।

অসমতল মেটে রাস্তা ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি, সরু রাস্তার দুই দিকেই ধানের ক্ষেত, ধান পাকিবার বিলম্ব নাই। রাস্তায় বৃষ্টির জল জমিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। সেই কাদার মধ্যে গাইডের লাঠির আঘাতে একটি সাপ মারা পড়িল। যাত্রারম্ভেই একটি জীবের অপমৃত্যুতে সকলেই শঙ্কিত হইলাম। মাইল খানেক পাড়ি দিবার পর সেই পরিচিত নদীটিকে পাইলাম। এ বিজনেও তাহার সৌন্দর্য্য যেন অম্লান রহিয়াছে; স্বচ্ছ জলরাশি সবেগে পাথরের গায়ে ধাক্কা খাইয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের সৃষ্টি করিতেছে। পারাপারের জন্য নদীর অল্পপরিসর স্থানে কয়েকটা পাথর রাখা হইয়াছে।

আমরা পাথরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নদী পার হইলাম। অসাবধানে আমার সঙ্গিনী জলে পড়িয়া গেলেন। ভাগ্যে তাঁহার কোলে শিশুটি ছিল না। থাকিলে বিপদ হইত।

ধানের জমির পর নিবিড় জঙ্গল। বনের ভিতর একটা অস্পষ্ট পথের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। রাস্তা এতই সঙ্কীর্ণ যে পাশাপাশি দুইটি মানুষ যাইতে পারে না। এ বনে বোধ হয় রৌদ্রের প্রবেশাধিকার নাই, কোথাও মনুষ্যসমাগমের লক্ষণ দেখা যায় না। বেলা শেষ হইয়াছে, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত মেঘের অন্ধকার মিশিয়া বনতল অন্ধকারের রাজত্ব করিয়া তুলিয়াছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। পদে পদে বনজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কা হইলেও সকলে অমিত উৎসাহে হাসি গল্প করিতে করিতে যাইতেছি। কিয়ৎদূর আসিতেই পথের ক্ষীণ রেখা একেবারে মুছিয়া গেল। আর রাস্তা নাই, বনদেবীর বেণীর ন্যায় লম্বিত লতা ধরিয়া গাছের শিকড়ের উপর দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কাঁটায় অনেকেরই কাপড় ছিঁড়িয়া গেল। গাছের ডালের আঘাত লাগিল। আমাদের সহযাত্রী এক ভদ্রলোক ক্লান্তিতে হঠাৎ বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেক উপরোধ অনুরোধেও তাঁহাকে উঠাইতে পারা গেল না। এই নির্জ্জন অরণ্যে একাকী বসিয়া থাকায় সকলেই তাঁহাকে বাঘের ভয় দেখাইলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এ দুর্গম পথে এত কষ্টে চলার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া মন্দ নহে।" ইহার পর প্রতিবাদ চলে না। অগত্যা তাঁহাকে ফেলিয়াই আমরা অগ্রসর হইলাম।

গুহার সম্মুখে আসিয়া সব কষ্ট অবসাদ অন্তর্হিত হইল। গাইড মশাল জ্বালাইল। সঙ্গের সবগুলি টর্চ্চ একত্রে জ্বলিয়া উঠিল। বাঘের আকস্মিক আগমনের ভয়ে সিং বাহাদুর ও ট্যাক্সিচালকদ্বয় 'কুকরী' ও লাঠি বাগাইয়া ধরিল। আমরা গুহায় প্রবেশ করিলাম।

গুহাটি বৃহৎ, এক সাথে ২০৷২২ জন লোক অবস্থান করিতে পারে। গুহার গা দিয়া একটি সুড়ঙ্গপথ কে জানে কোথায় গিয়া থামিয়াছে। গুহার ছাতে ও চারিদিকের দেওয়ালে প্রকৃতি অতুলনীয় আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃষ্টির জল জমিয়া জমিয়া কোথাও ফুল, লতা, কোথাও কুঞ্জকাননে রচিত হইয়াছে। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে কেবল চাহিয়াই রহিলাম, অদৃশ্য হস্তের এ কারুকার্য্যের নিকটে মানুষের শিল্প-কলা-পরিকল্পনা অনাদৃত হইয়া যায়। ইহা এমন অনবদ্য আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হয় প্রকৃতি আপনার বনাকীর্ণ বক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। শিলং-এ আসিয়া আর কিছু না দেখিয়া এই গুহা নিরীক্ষণ করিয়া গেলেই শিলং আগমন সার্থক হয়। গুহার নাম 'রূপনাথের গুহা'—কেন তাহা কেহই বলিতে পারিল না, কে সেই অজানা রূপনাথ, রূপের সাগর মন্থন করিয়া যিনি এই অমৃতময় স্বপ্নগুহা সৃষ্টি করিয়াছেন? কানন কুন্তলা বনশ্রী, অগণিত গিরিমালা, এরূপ রসময়ী বিশাল বিশ্ব যাঁহার রচনা, গুহা দেখিয়া বার বার তাঁহাকেই মনে পড়িতে লাগিল।

গুহার কয়েক টুকরা পাথর কুড়াইয়া লইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা বাহিরে আসিলাম। যিনি এতদূরে আসিয়াও এ অমূল্য সম্পদ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না, সেই সঙ্গীটির মন্দ ভাগ্যের জন্য দুঃখ হইতে লাগিল।

(শেষ)

অনাহূত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীকনকচাঁপা মুখোপাধ্যায়]

কাকা

কে ? ঝি ?

মাতামহ

হাঁ,—

কাকা

তা হ'লেই আমাদের সুখ ষোল কলায় পূর্ণ হ'ত।

মা

ঘরের মধ্যে কেউ আসেনি ?

পিতা

না, কেউ ত' আসেনি।

মাতামহ

তোমার দিদিও আসেননি ?

কাকা

না, দিদি আসেনি।

মা

তোমরা আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ !

কাকা

আপনাকে ফাঁকি !

মা

সবলা, মাথার দিব্যি তোদের, সত্য কথা আমায় বল্‌ত' বাবা।

জ্যেষ্ঠা কন্যা

দাদাবাবু ! তোমার হঠাৎ কি হ'ল ?

মাতামহ

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—নিশ্চয়ই তোমার মা ভাল নেই।

কাকা

আপনি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন ?

মাতামহ

তোমরা আমাকে বল্‌তে চাও না ? না···আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই কিছু ··

কাকা

তা হ'লে ত আপনিই আমাদের চাইতে ভাল দেখ্‌তে পান।

মাতামহ

সবলা—সত্যি কথা বল্‌বে তোমরা !

কন্যা

তোমায় ত ঠিক কথাই বলেছি দাদা বাবু !

মাতামহ

তোমার গলার স্বর অমন কাঁপছে কেন ?

পিতা

আপনি ওকে ভয় দেখিয়েছেন সেই জন্যই—

মাতামহ

তোমার গলার স্বরও ত' বদ্‌লে গেছে।

পিতা

আপনি পাগল হ'য়ে যাবেন !

(পিতা ও কাকা পরস্পরকে ইঙ্গিতে জানান যে এঁর মাথা খারাপ)

মাতামহ

আমি স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি যে তোমরা ভয় পেয়েছ !

পিতা

কিন্তু কিসের ভয় পেলাম আমরা ?

মাতামহ

আমাকে তোমরা ফাঁকি দিতে চাও কেন ?

কাকা

আপনাকে ফাঁকি দেওয়ার কথা কে ভাব্‌ছে !

মাতামহ

তা না হ'লে তোমরা আলো নিবিয়ে দিলে কেন ?

কাকা

কৈ আলো নিভানো হয়েছে ! আগে যেমন আলো ছিল ঠিক তেমনিই আছে !

কন্যা

আমার যেন মনে হচ্ছে আলোটা কমে গেছে!

পিতা

কিন্তু আমি ত' আগের মতই দেখতে পাচ্ছি!

মাতামহ

তবে আমার চোখে যেন জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েছে! তোরা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্—আমাকে মিথ্যা ব'লিস্ না। আমি এখান নিঃসঙ্গ, কেউ নেই আমার! এক আঁধার সীমাহীন অন্ধকার ছাড়া আমার কেউই নেই! আমার পাশে কে ব'সে আছে জানি না, এখান থেকে এক হাত দূরে কি হ'চ্ছে বোঝবার ক্ষমতা নেই! ওঃ, এত অসহায় আমি। ভগবান্!...তোমরা এমন ভয়ে ভয়ে নিশ্বাস ফেল্‌ছ কেন?

পিতা

কই! কেউ ত চাপা নিশ্বাস ফেলছে না!

মাতামহ

তুমি দরজার কাজে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় কথা কইছিলে না?

পিতা

আমি যা বলেছি তাত' আপনি শুনেছেন।

মাতামহ

তুমি ঘরের মধ্যে কাকে আনলে না?...

পিতা

কিন্তু আমি বলছি যে কেউ ঘরে আসেনি!

মাতামহ

আসেনি তোমার দিদি—?

আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করো না।—সরলা, দিদি তুইই বল্‌ত' ঘরে কে এসেছে?

কন্যা

কেউ ত' না দাদামশায়!

মাতামহ

তোমরা ফাঁকি দিওনা আমাকে! আমি সব জানি! আমার কাছে কিছুই গোপন নেই

—আমরা ঘরে ক'জন আছি?

কাকা

এইত' টেবিলের চারধারে আমরা মোট ছ'জন ব'সে আছি দাদাবাবু।

মাতামহ

তোমরা সবাই টেবিলের পাশে ব'সে আছ?

কন্যা

হাঁ দাদাবাবু—

মাতামহ

শ্রীশ, তুমিও আছ ওখানে?

পিতা

হাঁ।

মাতামহ

নরেন, তুমিও আছ ওখানে?

কাকা

নিশ্চয়ই, আমার জায়গাতেই আমি বসে আছি। সেটা ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই নয় আশা করি

মাতামহ

সরলা, তুমিও ওখানে আছত'?

সরলা

হাঁ দাদাবাবু।

মাতামহ

কমলা, তুমি?

কমলা

হা, দাদাবাবু—

মাতামহ

অমলা, তুমিও কি এই ঘরে আছ?

অমলা

নিশ্চয়ই দাদাবাবু, তোমার পাশেই ত'।

মাতামহ

তা হ'লে ওখানে কে ব'সে আছে?

কমলা

কোথায় দাদামশায়? কই কেউ ত' নেই?

মাতামহ

এই এখানে আমাদের মধ্যে!

কমলা

আমাদের মধ্যে ত' কেউ নেই!

পিতা

আমাদের কথা শুনুন,—এখানে কেউই নেই।

মাতামহ

কিন্তু তোমরা কেউই যে দেখ্‌তে পাচ্ছ না!

কাকা

হাঃ, আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

মাতামহ

ঠাট্টা করার মত অবস্থা যে আমার নেই, তোমাদেরকে সে আশ্বাস দিতে পারি।

কাকা

তা হ'লে যারা দেখতে পাচ্ছে তাদের কথাই বিশ্বাস করুন।

মাতামহ (অবিচলিত ভাবে)

আমি ভেবেছিলাম যেন কেউ..... ওঃ আমি আর বেশী ক্ষণ বাঁচব না!

কাকা

আমরা আপনাকে কি জন্য ফাকি দিব বলুন ত? এ'তে আমাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে!

পিতা

আপনাকে সত্য কথা জানানো এবং বলা ত' আমাদের কর্ত্তব্য......

কাকা

নিজেদেরকে ফাঁকি দেওয়ায় ত' কোন লাভ নেই?

পিতা

আর তা ছাড়া মিথ্যার মধ্যে কতক্ষণই বা বাস করা যায়।

মাতামহ (উঠবার চেষ্টা করে')

আমি এই অন্ধকার ভেদ ক'রতে চাই!......

পিতা

আপনি তা হ'লে কোথায় যেতে চান?

মাতা

ঐ ওখানে......

পিতা

এমন ব্যস্ত হবেন না ...

কাকা

আপনি আজ এমন উতলা হ'চ্ছেন কেন?

মাতামহ

তোমরাই আমার কাছে আজ অদ্ভুত মনে হ'চ্ছ!

পিতা

আপনি কি কিছু চান.....?

মাতামহ

আমি নিজে কি চাই কিছুই জানি না।

জ্যেষ্ঠাকন্যা

দাদাবাবু—ও দাদাবাবু, তোমার কি হয়েছে বলো না দাদাবাবু!

মাতামহ

তোমার হাতটা দেখি, সরু......

তিনটি কন্যা

এই যে দাদামশায়—

মাতামহ

তোমাদের তিন জনেরই হাত এমন কাঁপছে কেন?

জ্যেষ্ঠাকন্যা

কই, আমরা ত' মোটেই কাঁপছি না দাদাবাবু।

মাতামহ

আমার মনে হ'চ্ছে তোমরা তিন জনেই যেন শুকিয়ে গেছ!

জ্যেষ্ঠাকন্যা

রাত বেশী হ'য়েছে কিনা—তাই আমরা ক্লান্ত বোধ করছি।

পিতা

তোমরা তা হ'লে ঘুমুতে যাও—আর তোমাদের দাদাবাবুরও একটু বিশ্রামের দরকার—

মাতামহ

আজ রাতে আর আমি ঘুমুতে পারব না!

কাকা

আমাদেরকে ত' ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

মাতামহ

আসল কথা বল্‌বার জন্য তাহ'লে আমাকে তৈরী করছ,—বল!

কাকা

কিন্তু এর মধ্যে আসল কথা ত' কিছুই নেই!

মাতামহ

তা হ'লে কার মধ্যে আছে—এ বোঝা আমার সাধ্যের অতীত।

কাকা

আমি আপনাকে বলছি যে এর মধ্যে লুকানো কিছু নেই!

মাতামহ

মেয়েটাকে যদি এখন একবার দেখতে পেতাম!

পিতা

কিন্তু আপনিও বোঝেন তা অসম্ভব, তাকে এখন মিছিমিছি জানানো অন্যায় হবে।

কাকা

কালই তাকে দেখতে পাবেন।

মাতামহ

তার ঘরে কোন শব্দই ত' শোনা যাচ্ছে না!

কাকা

সেই ত' ভালো। শব্দ হ'লেই বরং আশঙ্কার কথা!

(ক্রমশঃ)

পদ্মরাগ

সাহিত্যের 'হাট বাজার' হইতে দূরে থাকিয়া যে কয়জন বাঙ্গালী কবি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছেন—রোগে শোকে দারিদ্র্য-দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়াও বাণীসেবার মহাপুণ্যকে যাঁহারা জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, —সাহিত্যগত প্রাণ, সেই কয় জনের মধ্যে "পদ্মরাগ"এর কবি শৌরীন্দ্রনাথ অন্যতম। শৌরীন্দ্রনাথ পরম বৈষ্ণব কবি—তাঁহার কবিচিত্ত বৈষ্ণবরসে অভিসিঞ্চিত বলিয়া তাঁহার সমগ্র কাব্যধারার মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেম-অনুরাগের মধুর অনুভূতি ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাই।—কবি বলিতেছেন—

তোমার পদের পরশ লেগে—দগ্ধ আমার কুঞ্জতলে
ফুটলো আবার পুষ্পকলি, করলে দয়া এ কোন্ ছলে?
কোন্ গোপনে রঙিয়ে দেছ আমার হিয়া তোমার ফাগে,
কখন্ দিলে ধন্য ক'রে' তোমার শ্রীপাদ পদ্ম-রাগে!

* * *

পদ্মরাগ এ নয় গো মণি,—আমার প্রভুর পদের দাগ্
এযে আমার হৃদয়-রাজের রাতুল শ্রীপাদ-পদ্মরাগ।

এই কাব্য-গ্রন্থে প্রকাশিত জগন্মাতা (শাক্ত ভাবাপন্ন) ছাড়া—শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, রসরাজ, বিশ্বব্রজ, চরণাশ্রিত, অভিষেক, অভিসার, প্রেমের তীর্থ, প্রতীক্ষায়, জীবন মহোৎসব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে প্রধানতঃ বৈষ্ণবরসাবেগই কবি-চিত্তের ভাবধারার (trend) বিশিষ্ট রূপটিকে প্রকাশ করিতেছে। শৌরীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আবিলতার নামগন্ধ নাই—দার্শনিক তত্ত্বের দিকটা মাঝে মাঝে সাবলীল কাব্যরসকে ব্যাহত করিলেও—কবির কাব্যানুভূতির স্তর যে কতখানি উচ্চে অবস্থিত তাহা প্রকাশ করিয়া কবির একদিকের আভিজাত্য বাড়াইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

কবির কাব্য হইতে আমরা কতকগুলি স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বৈষ্ণব-মনের পরিচয় দিব।

কান্ত-রসানন্দে—যে দিন রাসের মহামঞ্চে এলে,
মধুর প্রেমের অনন্তরস দিতে ধরার বক্ষে ঢেলে,

* * *

তার আগে আর রম্য প্রভাত হয়নিকো এ মর্ত্ত্যমাঝে
তেমন শোভার পূর্ণিমা আর হয়নি কভু পুণ্য সাঁঝে,
তার আগে আর কেউ জগতে হয়নি ছোট প্রিয়ার লাগি,
নারীর পায়ে লুটায়নি কেউ নারীর মনের ভিক্ষা মাগি।

(শ্রীরাধা)

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-বধূ শ্রীরাধার খুলিল গুণ্ঠন
বিশ্ব-কিশোরের লাগি কিশোরীর জাগে আলিঙ্গন।

* * *

অনন্ত রসের কেন্দ্রে হে কেন্দ্রীয় রসিকশেখর,
এ কি বাঁশী বাজে নিরন্তর।

(শ্রীকৃষ্ণ)

"ওগো রসরাজ, হে আমার চিদানন্দ
তোমারি মাঝারে নন্দিত মম জীবনের সব ছন্দ।

* * *

সুন্দরী লাগি' সুন্দর হ'লে নিখিলের প্রেম-কুঞ্জে

(রসরাজ)

ও' রূপে ডুবিতে সাধ, প্রকাশিতে নাহি কণ্ঠে বাণী
আমার সর্ব্বস্ব দিয়া রচি' দিব তব শয্যাখানি

তোমার আনন্দ তরে। সব কাম্য দিয়া বলিদান,
স্নিগ্ধ পদতলে তব যাব ঝরি ফুলের সমান।

*　　　*　　　*

মিলনের রসপূর্ণিমায়—
ডুবে যাক্ সারা সৃষ্টি ; নব তৃপ্তি লভি ধীরে ধীরে,
দাঁড়াব সার্থক আজি ধন্য হ'য়ে অমৃতের তীরে।

(চরণাশ্রিত)

মম হৃদি-রাস-মন্দির-মঞ্চেরি পরে তুমি
নাচিবে গো মৃদু মৃদু মন্দ
তুমি মদির বংশী সুরে নন্দিবে সদা প্রাণ
ছিঁড়ে যাবে শত বাধা বন্ধ।

(অভিষেক)

তোমার মিলন আশে যেতে চায় ছুটি
এ আত্মা-বালিকাবধূ। আসি জনে জনে,
চারিদিক হ'তে দেয় গঞ্জনার গ্লানি
মর্ত্ত্যের মানবস্বামী রোষবজ্র করে
বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। এ পাগল মন,
তবু ছটফটি কাঁদে যাইতে কাতরে
মনচোরা, নাহি জানি কবে অভিসার
বাঁধিবে মিলন-গ্রন্থি তোমার আমার।

(অভিসার)

তব প্রেমোৎসব-লাগি রঙ্গিণীর রসরঙ্গ-ঘোরে
মগ্ন চোখে রঙীন স্বপন,
হেনকালে মোর গেহে অকস্মাৎ এক দিন তব
মথুরার এল নিমন্ত্রণ।
মোহন মধুর কণ্ঠে অগ্নি-লিপি উঠিল গর্জ্জিয়া
কুঞ্জ আর বাঁশী র'ল পড়ি'
রুদ্র আকর্ষণে মোরে টানিয়া তুলিলে কর্ম্মরথে
দোলমঞ্চ যায় গড়াগড়ি!

(জীবন-মহোৎসব)

—এইরূপ প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই কবি অনন্ত রসের রসিক ভগবানকে বিচিত্র লীলার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। ভক্তিভাবপ্রবল কবি শৌরীন্দ্রনাথ তাই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যকে "রূপের রাজা"তে ভাগবৎ দৃষ্টিতেই অবলোকন করিয়া লিখিতেছেন—

রূপের রাজা গো অরূপ-সাগরে লীলা কর রসানন্দে,
ভুবন-জীবন বঞ্চিত করি' ঝরিছ অমৃত গন্ধে।
সৃষ্টির গায়ে জ্বলিতেছে রূপ,
পোড়ে অনন্ত চিত্তের ধূপ,
অহরহঃ তোমা হেরি' অপরূপ থেমে যায় যে গো দৃষ্টি,
রূপের দেবতা, আলোর সাগরে করিলে কী রস-সৃষ্টি!

কবির আর একটি বিশেষত্ব—তিনি ধর্ম্ম ও জাতীয়তার অনুভূতির মধ্যে দেশকালপাত্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত দেশাত্মবোধক কবিতা তাঁহার না থাকিলেও তিনি তাঁহার নানা কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে জাতীয়তার যে ভাবের দিকটা ধরিতে গিয়াছেন তাহা একদেশদর্শী নহে—

শুধু আজ নহ হিন্দু নহ বৌদ্ধ, নহ গো খ্রীষ্টান,
কিম্বা তুমি নহ মুসলমান।
নব তন্ত্রে নব মন্ত্রে আজ তব নব দীক্ষা-ক্ষণ,
বিশ্বের মানব-ধর্ম্মে মূর্ত্তি ধরে' পতিত পাবন—

*　　　*　　　*　　　*

সর্ব্ব লোকে মেলি বাহু স্নেহ-বক্ষ দিতে আজি দান
দাঁড়াইয়া ওই ভগবান।
নারায়ণ ভিক্ষা দেয়, নারায়ণ হস্ত দেয় পাতি
নারায়ণ প্রভু-শিরে নারায়ণ-ভৃত্য ধরে ছাতি।

—নরকে নারায়ণজ্ঞানে সম্প্রদায়, ধর্ম্ম ও জাতিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার উদার দৃষ্টি 'মানব ধর্ম্মে'র দিকে প্রসারিত। ইহা আশার কথা, আনন্দের কথা। অনন্যসুলভ না হইলেও জাতীয় কবির অনুভূতির দিক দিয়া বাঙালী জাতির ভাবের প্রতীক, অনুভূতির বিগ্রহ, প্রেরণার সত্যসন্ধ পূজারী—বাঙালী কবি, বাঙালী রাষ্ট্রগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি মনে প্রাণে কর্ম্মসাধনায় ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব, তাই তিনি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে, তাহার উত্থান, পতন পীড়ন ও নির্য্যাতনের মধ্যে, ক্রমবিকাশমান ভাগ্যসৃষ্টির মধ্যে শ্রীভগবানেরই বিচিত্র লীলা দেখিতেন—তাঁহার সকল রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে আমরা ধর্ম্ম ও জাতীয়তার একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধনের ধারা দেখিয়া বিস্মিত হই। কবি শৌরীন্দ্রনাথও এই ভাবোপলব্ধিতে বলিতেছেন—

মহা মিলনের যাত্রার পথে ছুটেছে নিদেশ তাঁর
বৈরীর বুকে বৈরীরে বাঁধি করে' দিতে একাকার।

(রথযাত্রা)

সকল দেশের তরুর তলায়
বাজছে যে তাঁর মোহন বাঁশী
ব্রজের পথে প্রেমের মানুষ
ছুটছে সকল শঙ্কা নাশি'।
মিশবে জাতি একটি বুকে
শান্ত হবে সকল জ্বালা,
ভিন্ন ভেদ আর রইবে না আজ
সবার রাজা নন্দলালা।

(বিশ্ব ব্রজ)

হে মর্ত্ত্যের মহারাজ, তোমা লাগি বসুন্ধরা
মধুভরা শস্য করে দান
তোমা লাগি ফুটে ফল, নদী বহে কুল কুল,
তোমা লাগি পাখী গাহে গান।
তব রাজ্যে নাহি ধনী, নাহি দীন, নাহি ভেদাভেদ্
তোমার সে লীলাভূমে নাহি দৈন্য নাহি কোন খেদ্।
বাতাস-আলোক মাঝে ভুঞ্জ তুমি সম অংশ তার,
সারা বিশ্বে এক তুমি, ভিন্ন রূপে হইলে বিস্তার।

নিখিলের সব সুখ, সব আনন্দের মধু,
বাঁটো তুমি করিয়া সমান,
কেবা কারে করে ভয়, কেবা কারে করে জয়,
খণ্ড খণ্ড তুমি ভগবান।

(আদি নর)

শৌরীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ) —"অতীত যুগের গর্ব্ব" "কল্যাণী মা" "সৌধরাণী" "অতীত যুগের এই ভারতের বাণিজ্যেরি কেন্দ্র"স্থানীয়া, "স্বর্ণময়ী মণীন্দ্র" নামে ধন্য কাশিমবাজারকে উদ্দেশ করিয়া কবি মর্ম্ম-ব্যথায় বলিতেছেন—

গৌরবেরি লুপ্ত স্মৃতি, বন্দনা তোর গ্রন্থে রাজে
ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আজ তোমার বিজয় তূর্য্য বাজে।
তোমার মাটি বান্দছে মা লক্ষ স্বনামধন্য জনে
দুঃখ তবু ঘুচলো না তোর মগ্ন-রলি আম্র বনে।
অশ্রু তবু মুছলো না তোর, যুগ্ম-রাজার যাত্রী তুমি
অদৃষ্টেরি যজ্ঞশালা আমার ভাঙ্গা বঙ্গভূমি।

—কাশিমবাজারের মহারাজা ও রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের বংশধর কুমার কমলারঞ্জনের ধাত্রীস্থানীয়া এই কাশিম-বাজার, তথাপি এই "কঙ্কালেরি মুক্ত মালা"—তাঁহাদের ভিখারিণী "গৃহশূন্যা" জন্মভূমির "শীর্ণ কণ্ঠে" বিরাজ করিতেছে—ইহাই কবির পক্ষে গভীর ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে।—

দুঃখে শোকে জীর্ণা তুমি কাঁদছ শীতে অন্ধ রাতে
ভাগ্যহীন এই পুত্র কাঁদে ক্ষুধার ভিক্ষাভাণ্ড হাতে।
তুই গো আমার কাঙাল মাতা, কাঙাল আমি পুত্র তোর
দুঃখ র'ল বক্ষ জোড়া, মুছতে নারি অশ্রু মোর।

কয়েকটি কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ছন্দ-বন্ধের প্রভাব দেখিতে পাওয়া গেলেও,—আলোচ্য কবিতাগুলির ছন্দ কোথাও নিন্দনীয় নহে। বিষয়োচিত ছন্দনির্ব্বাচনে কবির হাত আছে, এবং ভাষা প্রয়োগের মধ্যে যথোপযুক্ত তেজ ও ঝঙ্কার আছে।

সপ্তলোক-জনকণ্ঠে মত্ত কলরোল
স্তুতি-অর্ঘ্য ঢালে নিশিদিন ;
শব্দ-মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-উৎসব
বক্ষে তব হইছে বিলীন।

* * *

মত্ত পন্নগের রোষে লক্ষ ফণা তুলি
বন্যা হয়ে ছাড় সিংহনাদ
বিশ্বগ্রাসী ধ্বক ধ্বক বহ্নির শিখায়
নৃত্য তব হেরেছি উন্মাদ।

(অনন্ত-নৈবেদ্য)

রথশীর্ষে তব মুখে পাঞ্চজন্য বাজে নারায়ণ,
লোক হ'তে লোকান্তরে ছোটে তার গভীর নিঃস্বন।
তীব্র কশাঘাতে তব কালচক্র ঘুরিছে ঘর্ঘর,
অর্জ্জুন—নিঃশ্বাস তব ক্ষিপ্র-হস্তে ছাড়ে কোটিশর।
প্রাণহীন সারা বিশ্ব লুটি পড়ে শেষ শয্যা পরে
কে দেখিবে কোথা তুমি ? শেষ দৃষ্টি মুদিছে কাতরে!

* * *

তোমার বিজয়বাগ্নে দু'টি রন্ধ্রে বাজে দুটি সুর
একদিকে রুদ্র ভেরী অন্য দিকে বাঁশরী মধুর।

(মৃত্যু-দেবতা)

"নারী-ষড়রূপা" কবিতাটির মধ্যে কবি নারীকে ষড় ঋতুতে ষড়রূপে দেখিয়াছেন, কিন্তু "বসন্তে" আসিয়া কবির লেখনী দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে কবিতাটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য-প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

শৌরীন্দ্রনাথ প্রেমিক জীবনেও ভক্ত, তিনি প্রেয়সীকেও সেই উচ্চ স্থান হইতে ভক্তের চোখেই দেখিয়াছেন। প্রেয়সীর প্রতি কবির প্রেম তাই পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতার ভোগসুখপরায়ণ মানবীয় প্রেমের সাধারণ স্তরের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—

হে প্রেয়সি, হে কল্যাণি,　　সুন্দরের রাজ্য হ'তে
　　কবে কার প্রেম-তপস্যায় ;
এ মর্ত্ত্যে আসিলে নামি'　　নয়নের দৃষ্টি দিয়া
　　করুণার গঙ্গা গলে' যায়।
তব চিত্ত-প্রতিমায়　　তব চিত্ত-তুলনায়,
　　শূন্য রাজ-সম্পদের ডালা ;
এ সৃষ্টির কণ্ঠে দেবী,　　দুলায়ে দিয়াছ অয়ি
　　সত্য-শিব-সুন্দরের মালা।

—কবির ভাবসম্পদের অভাব নাই, ভাষা ও ছন্দের অধিকারও কবির যথেষ্ট বর্ত্তমান কবির সজাগ দৃষ্টিতে শৌরীন্দ্রনাথ আপনাকে ও বিশ্বকে দেখিয়াছেন—তাঁহার উদার অনুভূতি ও গভীর উপলব্ধির বলে তিনি আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইতেছেন—

নবীন রচনা নবীন জীবন চেয়েছে জীর্ণ ধরা
সে ত নহে নাশ, ভূমিকা সে যে গো সৃষ্টির মনোহরা।
জীর্ণতা ভাঙ্গি আমূল গঠন প্রকৃতির বশে হবে
বিশ্বনাথের পরমবার্ত্তা এই তো মহোৎসবে।
　　ওই শ্রবণ-রন্ধ্র ঘিরে,
　　তাঁর চরণের ধ্বনি ফিরে,
না জানি প্রাণেশ কোন্ নিরালায় এসেছেন কোন্ তীরে ?
　　আর বেশী দূরে নয়,
সহসা একদা অজানার ছলে উদিবেন দয়াময়। *

তাজ-দর্শন

[শ্রীগোপাললাল দে]

তাজ ! তাজ ! মমতাজ ! জ্যোতির্ম্ময়ি, অয়ি রূপময়ি !
তোমার মর্ম্মর মূর্ত্তি অকলঙ্ক অনবদ্য ছবি,
প্রেম তুমি, শোভা তুমি, ছায়া, মায়া শুভ্র-কান্তি অয়ি,
স্বপ্ন তুমি, কল্পলীলা। মণিপীঠে পরিপূর্ণ কবি,
রচিয়াছ বৈজয়ন্ত। তুমি হাসি, চিরঅশ্রু তুমি,
প্রেমপূত দীর্ঘ-শ্বাস বিরহের বিলাপবেদনা,
চিরনব অনুরাগমিলনেতে ওষ্ঠাধর চুমি'
কপোলে তাম্বুলরাগ, বিলাসের বিলোল বাসনা।
শশী-মৌলি-ধ্যান তুমি, প্রেমের তপস্যা পার্ব্বতীর,
ত্রিদিবের তোরণেতে উদয় ও অস্তরাগরেখা,
পূজা ও নৈবেদ্য তুমি, শঙ্খ ধূপ দীপ আরতির,
কালিন্দীর কূলে তুমি মরতের নব ইন্দুলেখা।
ধরণীর কবিদল যুগে যুগে হে তাজ তোমার,
জন্মান্তর-স্মৃতি বহে আজন্মের বহে প্রীতিভার।

---

* পদ্মরাগ :—সুকবি শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত কাব্য-গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা কাশিমবাজার (মুর্শিদাবাদ) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

"চরিত্রহীন"

[শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়]

শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" উপন্যাসখানি সম্বন্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনার সংবাদ পাইয়াছি। চরিত্রহীনে নাকি আত্মার বিদ্রোহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থ নাকি নীতি-বোধবিকাশের পরিপোষক নহে, পরিপন্থী। স্কুল কলেজের লাইব্রেরীর পাঠ্য-তালিকায় উপন্যাসখানির স্থান হয় নাই, এ মতও শুনিয়াছি। শরৎচন্দ্র নাকি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক, ইহাও অনেকেই বলিয়া থাকেন। যাঁহার তুলিকা সুরবালা, রমা, সাবিত্রী, বিরাজ বৌ প্রভৃতির চরিত্র আঁকিয়াছে তিনি কি প্রকারে যে শুধু বাস্তববাদী হইলেন তাই ভাবি! সাহিত্যে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের ছাপ মারিয়া সাহিত্য বিচার সঙ্গত নহে। বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদ—সকল ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে কি কোন clear-cut সীমারেখা টানা চলে? আজ যাহা বাস্তব তাহাই হয়তো পূর্ব্বযুগে আদর্শ ছিল। সাধনার দ্বারা সেই আদর্শ জাতীয় জীবনে অনুস্যূত হওয়ায় আজ তাহা বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার এই বাস্তবতার ক্ষেত্রেই উচ্চতর অবাস্তবতা বা আদর্শের অনুভূতি সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং ideal এবং real এর মধ্যে 'স্বগত-ভেদ' কিছু নাই। Ideal এবং real লইয়াই এক অখণ্ড সমগ্রতা। উভয় লইয়াই মানব-জীবন। এই উভয় লইয়াই অখণ্ড মানবতার পরিপূর্ণ রূপ। সাহিত্য মানব-জীবনেরই সমালোচনা। সুতরাং প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে আমরা ideal ও real এই উভয়কেই দেখিব। শরৎ-সাহিত্যে আমরা এই উভয়ই পাইয়াছি। যেখানে দিবাকর পাইয়াছি, সেইখানেই উপেন্দ্র, একদিকে কিরণময়ী অন্যদিকে আবার সুরবালা, স্বামীপ্রেমের সেই অপরূপ বিগ্রহ, সমাজ-আদর্শের সনাতন মূর্ত্তি, দুই নিয়া শরৎচন্দ্র।

যাক্ সে কথা। যে "চরিত্র-হীন" উপন্যাস চরিত্রবিকাশের পরিপোষক নহে বলিয়া অবজ্ঞাত, কোন্ কোন্ চরিত্র পরিলক্ষিত হইয়া উহার নাম চরিত্রহীন হইল? এ প্রশ্ন সকল পাঠকেরই মনে উদিত হইয়া থাকে। দিবাকরের পতন হইয়াছিল, কারণ তাহার অন্তরের শুচিতা নষ্ট হইয়াছিল। সাবিত্রী বিধবা, 'কায়মনোবাক্যে' না হইলেও সে সতীশকে ভালবাসিয়াছিল। ইহা তো নীতি-বিৎ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিকগণের রুচিকর হইবে না। সতীশের জীবনেও বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি কিরণময়ী। ইনি অমার্জ্জনীয়া। দিবাকর, সাবিত্রী প্রভৃতি চরিত্র 'চরিত্রহীন' নামের অংশতঃ কারণ হইলেও ইহারা দার্শনিকের ভাষায় 'নিমিত্ত কারণ', আর কিরণময়ীই নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ, দুই-ই। রুচি-বাগীশ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিক বলেন, 'ভাগবত জগতে পরকীয়ার প্রাধান্য থাকিতে পারে, নর-জগতে এরূপ হইবে কেন? কিরণময়ী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা হইয়া, স্বামী স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া, অনন্যমনা হইয়া কেন জীবন যাপন করিল না? অতএব সে সেরা পাপী।' শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে মহিমময় নারী বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। আমরাও এই মহিমময় নারী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সে দিন এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিতেছিলেন, যে কিরণময়ী চরিত্র খারাপ হইলেও, ইহা যেন পাঠকের উপর এক মোহজাল বিস্তৃত করে। পুস্তক খানির পাঠান্তে মনে হয় সকল দোষ সত্ত্বেও, সত্য সত্যই কিরণময়ী মহিমময়ী নারী বটে! ঔপন্যাসিকের যাদুকরী ভাষাই তাহার কারণ নহে। ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ইহা অতি সত্য কথা। কিরণময়ী চরিত্র বাস্তবিকই একটা তত্ত্ব। এই তত্ত্বালোচনায় সার্ব্বজনীন সাহিত্যের তরফ হইতে বিশেষ লাভ আছে। বিবিধ অবস্থার সমাবেশজনিত ঘন জটিলতার মধ্য দিয়া, বা পর পর বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া যে gradual নাটকীয় অভি-ব্যক্তির সম্ভব হয়, কিরণময়ী চরিত্রে তাহা না থাকিতে পারে, যাহা আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ দেখিয়াছি; পক্ষান্তরে

কিরণময়ী-চরিত্রে নারীচরিত্রের একটা মূলতত্ত্ব ধরিতে পারিয়াছি। নারী কি চায়? সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে নারী কি চাহিয়া আসিতেছে? মাতৃত্বের বা ভগ্নিত্বের চাহিদাই তাহার একমাত্র চাহিদা নহে। বিশ্ব-সৃষ্টির পর হইতেই আবহমান কাল নারী পুরুষের নিকট হইতে এবং পুরুষও নারীর নিকট হইতে সেই বস্তুই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, যাহা তাহাদের উভয়ের দুর্নিবার মিলনাকাঙ্খাকে সার্থক করিয়া তুলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে নর যখন নীলাকাশে নবীন তপনোদয় সন্দর্শন করিল, তখন তাহার সেই জন্মদিবসে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে প্রথম প্রভাতের নিখিল বিশ্বসৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে তাহার অন্তরে দ্বিতীয় বস্তুর জন্য যে লোলুপতা জাগিয়াছিল, এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার আনন্দপ্রেরণায়,—অন্তরের শাশ্বত বসন্তোম্মাদনায় যে তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহারই সিদ্ধিরূপে বাহিরে প্রকটিত হইয়াছিল যে রূপ, তাহাই নারী। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম বামা। সেই দিন হইতেই উভয়ের জন্য উভয়ের বুভুক্ষা। তাই নারী চায় পুরুষের নিকট প্রেম বা প্রীতি। কবি জ্ঞানদাস যখন গাহিলেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর"।

—তখন তিনি নরনারীর দৈহিক আকর্ষণের কথাই বলিয়াছিলেন। আমরা কিরণময়ী-চরিত্রের প্রথম ভাগে এইরূপ প্রীতিতত্ত্বেরই আভাষ পাই। আর ইহারই অপ্রাপ্তিহেতু নারীচিত্তে যে দুর্দ্দমনীয় মনোভাব জন্মে, কিরণময়ী-চরিত্রে তাহার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরকে বুঝাইতেছে—"অথচ এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই মানতো না। রূপের আকর্ষণে তার সেই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম।" এই উক্তি হইতেই কিরণময়ী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও রহস্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং কিরণময়ী চরিত্র কেবল psychological (মনস্তাত্ত্বিক) নহে, উহাতে sexological (যৌনবিজ্ঞানমূলক) সমস্যাও আলোচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ক্রমেই কথাটা বিশদ হইবে। প্রথমে দেখা যাক্ কিরণময়ী-চরিত্র কিরূপ atmosphereএ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিরণময়ীর বধূজীবনের ইতিহাস পাঠকের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে। শাশুড়ীর নিকট কিরণময়ী চির-ঘৃণ্যা—কোনদিনই তাঁহার কাছে স্নেহকণাও লাভ করে নাই। স্বামীর সহিত স্বামীসম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। স্বামী-প্রেম সে লাভ করে নাই। উহাদের মধ্যে ছিল গুরু-শিষ্যার কঠোর সম্বন্ধ। স্বামী "পাঠ মুখস্থ না করিতে পারিলে তিরস্কার করিতেন, প্রহার করিতেন।" আবার স্বামীর নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও তাহাকে আদর্শ শিক্ষা দেয় নাই। স্বামী শিখাইয়াছিলেন, "সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর সমস্তই উপলক্ষ্য"—ইহা ঈশ্বর-বর্জ্জিত ইউরোপীয় hedonism বা ভোগবাদ। আর এহেন কিরণময়ীর অন্তরে ছিল এক বিশাল ক্ষুধা যাহাকে সে বলিয়াছিল "রস"। "ভালবাসা আমার চাইই—ভাল আমাকে বাসতেই হবে।" আর এই "ভালবাসার এবং তা' ফিরিয়ে পাবার তৃষ্ণাটা" কোন মেয়েমানুষের চেয়ে তার কম ছিল না। এই ভালবাসা বা রসের প্রেরণাই তাহাকে মাতাল করিয়াছিল। স্বামী তাহার এই রসের খোরাক যোগায় নাই। কাজেই তাহার স্বাভাবিক অন্তরের আবেগ তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, যাহার জন্য সে সামাজিক নীতিধর্ম্মকেও স্বচ্ছন্দে পদদলিত করিতে পারিয়াছিল। এই রসের তৃষ্ণায় কিরণময়ী ডাক্তার অনঙ্গমোহনের সহিত প্রেমের সাধ মিটাইতে গিয়াছিল। কিরণময়ী তাহাকে ভালবাসে নাই—সে ভালবাসা ছিল প্রেমের ছলা মাত্র। কিরণময়ী জানিত—উহা প্রেম নহে, অমৃত নহে—বিষ।

ইহাতে কি তাহার অন্তরের শুচিতা নষ্ট হইয়াছিল? কিরণময়ী ডাক্তারকে ভালবাসে নাই, ডাক্তারের নিকট হইতে তাহার প্রার্থিত প্রেমপ্রাপ্তির আশা ছিল না। যে তৃষ্ণায় মানব নর্দ্দমার গাঢ় কালো জল অঞ্জলি ভরিয়া মুখে দেয় সেই রূপ-পিপাসায় সে কাতর হইয়াছিল। সেই তৃষ্ণায় জল গলায় ঢালিয়া দিয়া কিরণময়ী সে জলের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল—"তার পরে—উঃ, সে কি গাবমিবমির দিনগুলো কেটেছে।' বলিতে বলিতেই তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল"। ভালবাসার পাগল-করা প্রেরণাই তাহাকে এইরূপ নীতিবিগর্হিত কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিল। এইরূপে কিরণময়ী যখন বিষে জর্জ্জরিত ও প্রেম-বুভুক্ষায় কাতর, এমন সময়ে উপেন্দ্র আসিয়া

তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। উপেন্দ্র গুণসম্পন্ন নায়ক, পত্নী-প্রেমের আদর্শ। উপেন্দ্রের মধ্যে কিরণময়ীর অন্তরের 'রস' সম্যক চরিতার্থতা লাভ করিতে চাহিল। প্রথম দিন হইতেই উপেন্দ্র, কিরণময়ীর বুক ভরিয়া রহিল। তাহা হইলেও এমন সময় তাহার জীবনে আর একটা সমস্যা জুটিল। সুরবালার পতি প্রেমের ছবি তাহার অন্তরে গাঢ় ভাবে অঙ্কিত হইল। 'পরকীয়া ভালবাসার মদ সবে মাত্র পাত্র ভ'রে' খাইয়া যখন তাহার 'হাত পা অবশ' দুই চক্ষু ঢুলে' ঢুলে' আস্‌চে" সতীশ তখন তাহাকে সুরবালার অমানুষী পতি-প্রেম ও ত্যাগের বাণী শুনাইল। কিরণময়ীর জীবনে আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেবার মধ্য দিয়া সে তাহার স্বামীকে পাইতে চাহিল। সুরবালাই হইল তার গুরু। কিরণময়ী সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "মনে মনে বল্লুম, তোমাকে ত' দেখিনি তুমি কেমন, কিন্তু যেমনই হ'ক আজ থেকে তুমি হ'লে আমার গুরু।" কিন্তু সাধের সাধনা স্বামীর মৃত্যুতে অঙ্কুরেই শুকাইয়া গেল। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে নিবেদন করিল, "প্রথম দিন থেকে সেই যে তুমি আমার বুক জুড়ে রইলে, কোনো মতেই সেখান থেকে তোমাকে আর নড়াতে পারলুম না।" এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরণময়ী কেন স্বামীর স্মৃতি বুকে বহিয়া জীবন কাটাইল না?—কিরণময়ীর সে আদর্শ শিক্ষা হয় নাই। সে ছিল জড়বাদিনী, বুঝি বা অজ্ঞেয়বাদিনী। পরকালে বিশ্বাস তাহার ছিল না। কিরণময়ীর উক্তিতেই ইহার কৈফিয়ৎ মিলে। "আমি ভগবান মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল আর এই দেহটাকে।" এই দেহসর্ব্বস্বা নারী পেতে চেয়েছিল দেহ। তাই উপেন্দ্রকে পাওয়ার কামনা—তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু আদর্শের খাতিরে প্রতাপের প্রণয়মুগ্ধা গৃহত্যাগিনী শৈবলিনীর অন্তঃকরণে স্বামীপ্রেম ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। যোগবলে উহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন উচ্চাঙ্গের নাটকোচিত হয় নাই। সামাজিক আদর্শ সংরক্ষিত হইল বটে, নাটকোচিত স্বাভাবিকতা নষ্ট হইল। যে স্বভাব-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া dramatic evolution-এর সম্ভব হয় তাহা ক্ষুণ্ণ হইল। এক্ষেত্রে তিনি সত্যের মণিকোঠায় মানবতার পূর্ণ বিগ্রহ সন্দর্শন করিতে পারিলেন না বলিতে হইবে। শরৎচন্দ্র এরূপ করেন নাই। মানবমনের স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মানবতার নগ্ন সত্যরূপ ফুটিয়াছে তাঁহার কিরণময়ী-চরিত্রে। কিরণময়ী-চরিত্রের শেষ তিনি দেখিয়াছেন—কোথাও কৃত্রিমতার স্থান নাই। নির্ভীক ভাবে সত্যের মূর্ত্তি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন।

কিরণময়ী উপেন্দ্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল কিন্তু উপেন্দ্রের নিকট হইতে সে প্রেমের প্রতিদান পাইল না। একনিষ্ঠ উপেন্দ্র 'নাস্তিক, ভাইপার' বলিয়া তাহার প্রেম অস্বীকার করিল। এই সময় হইতে কিরণময়ীর মনোবৃত্তি অন্য পথে ধাবিত হইল। তাহার মনে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল তাহা দুর্দ্দমনীয়। প্রীতিবঞ্চিতা নারীমনের যে-রহস্য শরৎচন্দ্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন তাহা বিস্ময়াবহ এবং সম্পূর্ণরূপে Shakesperean বলিতে হইবে। এই গর্ব্বিতা নারীর অন্তঃকরণে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল। সে অনলে দিবাকর পুড়িতে লাগিল। দিবাকরকে লইয়া আরাকানে উধাও হইয়া তাহার সহিত কিরণময়ী যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। দিবাকরের সহিত তাহার প্রেমের 'ছদ্ম লীলা' যাহা কতকটা ইংরাজী coquetry মতই,—তাহাকে কোন নীতিবিৎই অবশ্য হজম করিবেন না। কিন্তু সে লীলায় কিরণময়ীর সামাজিক শুচিতা নষ্ট হইলেও সত্যকার শুচিতা নষ্ট হয় নাই, দেহেরও না, মনেরও না।

এই আরাকানেই কিরণময়ীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্ব্ব সূচনা আরম্ভ হইল। এখানে তাহার যথেষ্টই শিক্ষা হইয়াছিল। বাড়ীওয়ালীর গৃহে সে এরূপ ব্যবহার পাইল যাহা তাহার নারীমনের শুচিতার নিকট ভাবপ্রবণ প্রবৃত্তির নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। প্রায়শ্চিত্তের কশাঘাতে তাহার হৃদয় পরিষ্কৃত হইয়া তাহার মধ্যে যে 'ঐন্দ্রিয়িক' অপবিত্রতা ছিল তাহা বিনষ্ট করিল। সুরবালার যে-আদর্শ তাহাকে এক দিন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা আজ ফলপ্রসূ হইয়া তাহাকে প্রকৃত প্রেমের সন্ধান দিল; তাই তাহার শেষ জীবনে দেখিতে পাই পরলোকেও তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু এই reaction এর টাল সাম্‌লানো কিরণময়ীর মত সবল চরিত্রের পক্ষেও অসম্ভব হইল।—তাহার মস্তিষ্ক

বিকৃতি ঘটিল। কিন্তু সে-বিকৃতির মধ্যে reactionএর ফল সম্পূর্ণ মাত্রায় থাকিয়া গেল। তাই দেখি, পাগলিনী কিরণময়ী কালীমাতার আরাধনা করিতেছে, উপেনের ব্যারাম নিজে লইয়া প্রেমের স্থবর্ণবেদীতলে নিজ জীবন বলি দিয়া উপেনের জীবন ভিক্ষা করিতেছে। তাহার অন্তরের সকল সন্দেহ দূর হইবার পথে,—সকল "দোলাচলচিত্ত বৃত্তি" অন্তরের নিবিড়তায় সমাহিত হইতেছে। তাই যখন উপেনের মৃত্যুতে "সকলের বিদীর্ণ কণ্ঠে গগনভেদী ক্রন্দনে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়া উঠিল তখন নীচের ঘরে কিরণময়ী নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে লাগিল।"

যেমন tragic, তেমনই suggestive.

নীতিবিৎ কিরণময়ীর জীবনকাহিনী শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আমরা যাহা পাইলাম তাহার সাহিত্যিক মূল্য কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখিব। আমাদের মনে হয় কিরণময়ীর জীবন-ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি প্রীতি-তত্ত্বের ইতিহাস। কপালকুণ্ডলায় ফুটিয়াছে প্রবৃত্তি-হীন নারীর মন আর চরিত্রহীনের কিরণময়ীতে ফুটিয়াছে প্রবৃত্তি-শাসিত নারীর বেগচঞ্চল মন। প্রবৃত্তি লইয়াই প্রীতির আরম্ভ। যৌবনের আকাঙ্ক্ষা—ইহা নরনারীর শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা। এই বৃত্তির অনুশীলনও শাশ্বত। নারীর মনোবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রীতিবৃত্তি কিরূপ প্রবল তাহা কিরণময়ীর চরিত্রে অতি ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রীতিই, দেহবুভুক্ষার আলোবাতাসে যাহার বৈজিক বিকাশ সাধিত হইয়া যৌনসম্মিলন সার্থক করে, তাহাই আবার গুরুরূপী হইয়া অবশেষে সেই আদর্শ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়, সামাজিক জীবনে যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং আত্মত্যাগ যাহার বুনিয়াদ। এই প্রীতি হইতে বঞ্চিতা নারীর জীবন দুর্ব্বহ। এই প্রীতির মাদকতায় সমাজধর্ম্ম, নীতিধর্ম্ম সব পদদলিত হয়,—এই প্রীতি তাহার চাইই। স্বামীকে আশ্রয় করিয়াই হউক আর অপর কাহারও মধ্য দিয়াই হউক এই প্রীতি তাহার জীবনধারণের জন্য চাই। এই প্রীতি-তত্ত্বই উপেন্দ্রের প্রতি কিরণময়ীর প্রীতির মনোবৈজ্ঞানিক কৈফিয়ৎ। অনঙ্গমোহন ও দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর প্রেমাভিনয়ের মধ্যে যে নৈতিক অসামঞ্জস্য দেখা এই প্রীতিতত্ত্বই তাহার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ। বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে এইরূপ প্রীতিবঞ্চিতা নারীর মনোবৃত্তি কিরূপ আকার ধারণ করে,—কিরূপ তাহার পরিণতি—ইহার সত্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা কিরণময়ীর চরিত্রবিকাশে যেমনটি দেখিতে পাইয়াছি তেমনটি বঙ্গসাহিত্যে কোথাও নাই। বঙ্গসাহিত্যে ইহা নূতন।

নীতিবিৎ সাহিত্যিক সাহিত্যের স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে গিয়া কিরণময়ী চরিত্রে ভীত হইতে থাকুন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব, শরৎচন্দ্র সত্যের মূর্ত্তি যে নির্ভীক ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। জীবনের সম্যক আস্বাদ তিনি করিয়াছেন। সকল বিধিনিষেধরূপ অচলায়তনের ঊর্দ্ধদেশে যে মানব-জীবন এবং তাহার অখণ্ড প্রবাহ, মাধুর্য্য ও কমনীয়তাই যাহার একমাত্র স্বরূপ নহে —ভয়াল তরঙ্গভঙ্গ, বিশাল আবর্ত্ত যাহাকে চিরকাল সার্থক করিয়া তুলিতেছে, সেই সীমাহীন চিররহস্যময় মানব-জীবনের সত্যমূর্ত্তি চরিত্রহীনে ও তাঁহার সকল উপন্যাসেই উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাই তাঁহার সাহিত্য সার্ব্বজনীন। যুধিষ্ঠির, সীতা, সাবিত্রী, বেহুলার চিত্র আঁকিয়া একটা monotonous idealism সৃষ্টি করাটাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকতার নিদর্শন নহে। মানবতার যাহা বাস্তব রূপ, তাহা উহার উত্থান ও পতন লইয়াই—অলঙ্কার শাস্ত্র যাহাকে tragedy বলিয়াছেন তাহাই তো উহার সত্য রূপ। সার্ব্বজনীন সাহিত্যে এই রূপ ফুটিয়া উঠিবেই। সার্ব্বজনীন সাহিত্যিক অখণ্ড মানবজীবনের পরিপূর্ণ রূপ আঁকিয়া যান—উহার সকল দিকই বিশ্লেষিত করিয়া থাকেন। কিরণময়ী, সুরবালা লইয়াই মানবজীবন, উপেন্দ্র, দিবাকর লইয়াই অখণ্ড মানবতার রূপ।

এইবার সাবিত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। সাবিত্রী সত্য সত্যই রমণীরত্ন, মূর্ত্তিমতী সেবা, নিষ্কাম প্রেমের পুণ্য বিগ্রহ। বাঙ্গালী পাঠকের এই মূর্ত্তির সহিত পরিচয় আছে। বঙ্কিমের অমর তুলিকায় আয়েষার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাবিত্রীমূর্ত্তি উহারই নব সংস্করণ। সাবিত্রীচিত্র আয়েষারই বোধ হয় বিস্তৃত রূপ। আয়েষার পরিসর যেন কিছু ছোট; তাই ইহাতে যেন একটু আকস্মিকতার ভাব রহিয়া গিয়াছে। সাবিত্রীর মধ্যে পাওয়া যায় [illegible]ম প্রেমের আরও বিস্তৃত illustration. নানা

ঘটনার মধ্য দিয়া এই নিষ্কাম প্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাবিত্রী তাহার প্রেমকথা সতীশের নিকট কোন মতেই ব্যক্ত করিতে চাহে নাই। তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘনাইয়াছিল তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাবিত্রীর প্রেম উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে। নিষ্কাম প্রেমের প্রকৃতি এই যে ইহা চিরকাল দয়িতের প্রকৃত কল্যাণ-কামনায় নিযুক্ত থাকে। তাই যখনই সতীশের নৈতিক পতনের সম্ভাবনা হইয়াছে তখনই সাবিত্রী পরমকল্যাণী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সতীশকে রক্ষা করিয়াছে। ভালবাসিবার অধিকার সকলেরই আছে। স্মৃতির বিধিনিষেধ কোন কালেই তাহার বাধা হইবে না। সাবিত্রীর মধ্যে যে প্রেম জন্মিয়াছিল তাহাতে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ছিল না। বাস্তবিকই দেহ দিয়া সাবিত্রী সতীশকে পাইতে চাহে নাই। আজীবন তাহার অতীন্দ্রিয় নিষ্কাম প্রেম দিয়া সে সতীশকে সেবা করিতে চাহিয়াছিল। সতীশের নিকট প্রতিদানের যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাবিত্রীর সত্বময়ী প্রকৃতি ও তাহার শুদ্ধ সত্বপ্রেম—তাহা স্বীকার করে নাই। তাই সতীশ যখন অপরের হইল যখন "তাহার ভাবনার, তাহার বাসনার, তাহার পরম সুখের, চরম দুঃখের, তাহার দুঃসহ বেদনার" সমষ্টি হইল তখন কিন্তু "ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস পর্য্যন্ত সে পড়িতে দিল না।" এত বড় দৃঢ়তা আমরা আয়েষাতেও এত সমুজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইতে দেখি নাই। অনেক সময়ই আয়েষা আত্মসংবরণ করিতে গিয়া অপারগ্ হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু আয়েষাকে পদ্মফুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আয়েষা সত্যই পদ্মফুল—এই পদ্মফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। দর্শক এই পদ্মফুলদর্শনে মুগ্ধ হইয়া যায়, তন্ময় হইয়া যায়। আয়েষা হইতেছে ঘন-সৌন্দর্য্যসার, কি এক অপরূপ স্বর্গীয় সুষমা তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে একটা synthetic whole. আর সাবিত্রীর মধ্যে সেই আয়েষারূপই যেন কতকটা আবার বিশ্লেষিত হইয়াছে। তাই সাবিত্রীর জীবনে human life আরও সমুজ্জ্বল।

চরিত্রহীনের আদর্শ চরিত্র সুরবালার সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। এই হিন্দু সতীরূপ বাঙ্গালী-পাঠকের নিকট চিরপরিচিত। ইহা আমাদের নিত্যকালের ঘরের জিনিষ। এ রূপ হিন্দুর গৃহ চিরকালই আলো করিয়া রাখিয়াছে।

পত্নী প্রেমের আদর্শে আমাদের সাহিত্য পূর্ণ; কিন্তু উপেন্দ্রের ন্যায় পত্নী-প্রেমের ছবি ইহাতে বিরল। আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে উপেন্দ্রের পত্নী-প্রেমের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আকাশ মেঘাবৃত। জীবনে তিনি যে জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সে-দিনকার আকাশের মেঘগুলি তাহারই যেন স্বরূপ। "উপেন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত চোখ দুটি মেলিয়া, আস্তে আস্তে বলিলেন 'সম্মুখের জানালাটা একটু খুলে' দে দিদি, সেই বড় নক্ষত্রটি একবার দেখি।" পত্নী-প্রেম ধ্রুবতারার মত তাঁহার জীবন-আকাশে দীপ্যমান ছিল। কিরণময়ী সে ভাস্বর জ্যোতি বিন্দুমাত্র মলিন করিতে পারে নাই। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে সেই প্রেমের "আলোকছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল,—চাহিয়া চাহিয়া উপেন্দ্রের কিছুতেই যেন আর সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল—" পড়িতে পড়িতে মনে হয় ভাষাকুশলী শরৎচন্দ্রের যেন তুলনা নাই।

Popular literature বা folk literature-এ জাতির ও বিশিষ্ট যুগের বিশিষ্ট আদর্শ স্থান পাইয়া থাকে। এইরূপ সাহিত্যই প্রত্যক্ষ ভাবে জাতীয় চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। এইরূপ সাহিত্যে বিজাতীয় ভাব ও নীতি প্রচারিত হইলে তাহা জাতি গঠনের বাধক হয়। জাতীয় চরিত্রের উপর সার্ব্বজনীন সাহিত্যের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষ নহে। যাহাকে আমরা universal বা সার্ব্বজনীন সাহিত্য বলি তাহা কোন বিশেষকে represent করে না। ইহার বিষয়বস্তু বৃহৎ। মানবতা সম্বন্ধে বড় বড় প্রশ্ন ইহাতে মীমাংসিত হইয়া থাকে, খণ্ডতা ও বিশেষের উর্দ্ধে মানবতারূপ অসীম রহস্যময় ভূমাই ইহার প্রকৃত বিষয়। প্রতিপদেই নীতিবাদ ইহাকে বাধা দেয় না।

'চরিত্রহীনে' পাইয়াছি আমরা এই সার্ব্বজনীন সাহিত্য। কিরণময়ীর মধ্য দিয়া নারীমনের যে সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থখানি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যৌনমূলক যে তাত্ত্বিকতা ফুটিয়াছে তাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের মানবহৃদয়ের জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান আজও হয় নাই। সুরবালা, উপেন্দ্র ও সাবিত্রীর উচ্চাদর্শতায় ইহা দিব্য শ্রী মণ্ডিত। সে আদর্শ মানবের চিরপ্রার্থনীয় বস্তু। নীতি-সাহিত্য যাহাই বলুন, বঙ্গসাহিত্যে চরিত্রহীনকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্য্যাদাপূর্ণ উচ্চস্থানপ্রদানে কেহই কখনও কুণ্ঠিত হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কাকজ্যোৎস্না

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

১৭

প্রদীপ বড় রাস্তায় পড়িয়াই ট্যাক্সি লইয়া কাছাকাছি একটা ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিয়া উঠিল। ডাক্তারটি পরিচিত। ট্যাক্সিভাড়াটা তিনিই দিয়া দিলেন যা হোক্। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আঘাত গুরুতর হইয়াছে। যে পরিমাণে রক্তক্ষয় হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন,—বাড়ি গিয়ে চুপ করে' শুয়ে থাকুন গে। সঙ্গে এই ওষুধটাও নিয়ে যাবেন।

ঔষধটা পকেটে পুরিয়া প্রদীপ পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার জন্যই সে মাথা পাতিয়া আঘাত নিয়াছে আর কি! কিন্তু ঘা-টার সুতীব্র যন্ত্রণা তাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। অজয়ও এমন করিয়া নমিতারই জন্য আঘাত নিয়াছে, কিন্তু সেটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র, নমিতার নিজের হাতের পরিবেষণ নয়। অজয়ের আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা চোরের নীচতা আছে, কিন্তু এমন একটা সুপ্রবল দস্যুতার প্রমত্ততা নাই। প্রতিযোগিতায় সে-ই বোধ হয় বেশি লাভ করিল।

কিন্তু কেন যে তাহার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্দ্দাম চঞ্চলতা আসিল সে ইহা বুঝিয়া পাইল না। নমিতা যে আর কাহারো অন্তরের অন্তঃপুরে কায়াহীন কল্পনার মতও বিরাজ করিবে তাহাতেও প্রদীপের ক্ষমা নাই। সে হয় ত' নির্জ্জন-লালিত ভাবমূর্ত্তিতেই নমিতাকে আস্বাদ করিত—তাহার সমস্ত কর্ম্মমুখর ব্যস্ততায় নিশীথরাত্রির স্বপ্নরঙ্গিনীর মত; তাহার এই বিশ্বাসও ছিল যে, যাহাকে এমন করিয়া কামনা করা যায় সে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিতেই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিবে। কিন্তু অজয়ের ব্যস্ত আচরণে সে প্রতীক্ষার অবিচল তপস্যা যেন সহসা ভাঙিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সত্যকে ঘিরিয়া ভাবের যে কুজ্ঝটিকা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতেই প্রদীপের চোখে পড়িল যে নমিতাকে না হইলে তাহার চলিবে না। যেমন তাহার বুকের নিশ্বাস, পকেটের অন্ন। হয় ত নমিতার পক্ষে কোনো লৌকিক উপমাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। প্রেমকে মহত্তর করিতে গিয়া যাহারা প্রণামের সাধনা করে, প্রদীপের তত প্রচুর ধৈর্য্য নাই। তাহাকে ছিনাইয়া, কাড়িয়া, মূলচ্যুত করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। পাওয়াটাই বড় কথা, রীতিটা অনর্থক। অজয় যতই কেননা নারীনিন্দুক হোক, ক্ষণকালের জন্য তাহার চোখে প্রদীপ নেশার ঘোর দেখিয়াছে—সে-নেশার পিছনে নিশ্চয়ই বঞ্চিত উপবাসী যৌবনের তৃষ্ণা ছিল। ছিল না? তাই ত' সে যাইবার সময় নমিতার পাতিব্রত্যের প্রতি এমন নিদারুণ কশাঘাত করিতে দ্বিরুক্তি করিল না। নমিতা তাহার কাছে একটা প্রতীক মাত্র, কিন্তু প্রদীপের কাছে সে প্রতিমার অতিরিক্ত,—প্রাণবতী, দেহিনী। তাহাকে তাহার চাই—ভোগে বিরহে কর্ম্মপ্রেরণায় প্রদোষ-আলস্যে।

মনে পড়ে সেই রাণীগঞ্জে শালবনের তলায় তাহাদের দুই জনকে ফেলিয়া সুধী যখন ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সেই ঘনায়িত তিমির বন্যার উপরে সে যে দুইটি স্থির আঁখিপদ্মকে তুলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল তাহা তাহার সমস্ত কর্ম্ম-জগতের পারে দুইটি ক্ষুদ্র বাতায়ন হইয়া বিরাট অ-দেখা আকাশকে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। সে দুইটি চোখই তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু সে-দুইটি চোখকে তুলিয়া আনিতে গিয়া নমিতাকে সে অন্ধ করিয়া আসিল বুঝি। কাড়িতে গেলেও পাওয়া যায় না এমন কোন্ রত্নের লোভে সে দিশাহারা হইয়াছে! অজয়ের হঠকারিতা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন? ইহাতে তাহার এমন কী রাজ্যলাভ ঘটিয়াছে! কিন্তু ঐ জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে আঘাত না করিয়াই বা কী উপায় ছিল!

সমস্ত দুপুরটা টো-টো করিয়া প্রদীপ সন্ধ্যাকালে এক রেষ্টুরান্টে ঢুকিয়া যা-তা কতগুলি গলাধঃকরণ করিল। এখন সে কোথায় যাইবে? দলের কতগুলি লোক লইয়া রাত্রিকালে সে নমিতাকে চুরি করিলেই ত' পারিত। দলের লোকেরা নারী-হরণের এই নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না নিশ্চয়। মূর্খ। মাটির ভারতবর্ষের চেয়ে ঐ মাটির দেহটির মূল্য অনেক বেশি। দেশ সম্বন্ধে প্রীতির আধিক্য ভাবাকুলতার একটা দুর্ব্বল নিদর্শন মাত্র, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রখর নয় বলিয়াই প্রদীপের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তাহার চেয়ে নমিতার প্রতি তাহার এই প্রতিনিশ্বাসের প্রেমে ঢের বেশি সত্য আছে। সব সত্যই সার্থক নয়। না-ই হোক্। তবু এ সত্যকে সে আকাশের রৌদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

অগত্যা মেসেই সে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত গা ব্যথা করিয়া জ্বর আসিয়া গেল—মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু অজয়ের মত সে পলাইয়া বাঁচিবে না, এই ঘরে সে আত্মহত্যা করিবে। দেশ স্বাধীন না হোক্, তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না—তাহার চেয়েও বড় ব্যর্থতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। একেবারে অপ্রয়োজনে এমন করিয়া সে প্রাণ দিবে—দলের লোকেরা তাহাকে যতই ব্যঙ্গ করুক্, তাহারা হৃদয়হীন, অমানুষ। সে রক্তের মাঝে অশ্রু দেখে, হত্যার অন্তরালে বৈধব্য। নিষ্ফল কর্ম্মের পেছনে সে অতৃপ্তির হাহাকার শুনিতে পায়, প্রচেষ্টার পেছনে অভাবনীয় ব্যর্থতা। সে রাত জাগিয়া তারা দেখিয়াছে, ধূসর অতীতের কুয়াসায় বর্ত্তমানকে ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছে, নমিতার দুইটি শুষ্ক শীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে তাহারই একটি পিপাসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। তাহার জীবন ত' ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার হিসাবের খাতার বাজে-খরচের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছেন—তাহার জন্য আবার জবাবদিহি কি? ঘরের মধ্যেকার পুঞ্জিত অন্ধকার যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে—এই তিমির রাত্রির অবসান কোথায়? এই মেসের ময়লা বিছানায় শুইয়াই সে আকাশের জ্যোৎস্নায় গা ঢালিয়া দিয়াছে—সে আকাশ সহসা এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেল নাকি? কোথায় তাহার বাড়ি-ঘর, মা বাপ, আত্মীয়-স্বজন! কেহ নাই। কোথায় নমিতা? সে ভারতবর্ষের মুক্তির চেয়েও দুষ্প্রাপ্য, বিধাতার নিয়মের চেয়েও দুর্দ্দাম!

প্রদীপ ঝট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। না, আলো জ্বালাইতে হইবে না। প্রীতিসাধনরা কেহ এখন ফিরিবে না। কাজটা এখনই সারিতে হইবে। এমন অকর্ম্মণ্যকে নিজ হাতে মারিয়া ফেলার মত গৌরব কোথায়? প্রদীপ পকেটে বাঁ হাতটা ডুবাইয়া অস্ত্রটা স্পর্শ করিল।

অমনিই দরজা ঠেলিয়া যদুর প্রবেশ। সে এমন বোকা, জ্বরের ঘোরে তাড়াতাড়িতে দরজাটায় পর্য্যন্ত খিল লাগায় নাই। যদু কহিল,—আপনার একখানা চিঠি এসেছে।

—চিঠি! প্রদীপ আকাশ থেকে পড়িল,—তাহার ঠিকানা লোকে কি করিয়া জানিতে পারিবে? অজয়ের চিঠি নয় ত'? নতুন কোনো বিপদে পড়িল নাকি? কিন্তু বিপদে পড়িলেও তাহার ত' চিঠি লিখিবার কথা নয়। তাহাদের মধ্যে এমন কোনো সম্বন্ধের সূত্র রাখাও ত' সমীচীন হইবে না। প্রদীপ হাত বাড়াইয়া চিঠিটা নিয়া কহিল, আলোটা জ্বালা ত' শিগ্‌গির। কী আবার ফ্যাসাদে পড়্‌লাম।

লণ্ঠনটা জ্বালাইতেই প্রদীপ চিঠিটার ঠিকানা দেখিল,—এমন হস্তাক্ষর পৃথিবীতে আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। তাহার মা নয় ত'? তিনি কি আজো বাঁচিয়া আছেন?

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিতেই নীচে নাম দেখিল—নমিতা।

প্রদীপ চীৎকার করিয়া উঠিল: এই চিঠি তোকে কে দিল? ধাপ্পাবাজ! আমার অসুখের সময় আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছিস্?

যদু কহিল,—না বাবু, ইয়ার্কি করতে যাব কেন? পিওন এসে দিয়ে গেছে। আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না।

—পিওন দিয়ে গেছে? আমি বাড়ি ছিলাম না! তুই বল্‌ছিস্ কি, যদু?

পোষ্টাফিসের ষ্ট্যাম্প্ দেখিয়া বুঝিল, সত্যই,—চিঠিটা ডাকেই আসিয়াছে। দুটার সময়কার প্রথম ছাপ, এখানে পৌঁছিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। তবু যেন প্রদীপের বিশ্বাস হয় না: পিওন দিয়ে গেছে? তুই ঠিক জানিস্? কেউ চালাকি করেনি ত'?

—কে আবার খামের মধ্যে বসে' চালাকি করতে যাবে ?

—সত্যিই, কে আবার চালাকি করবে ! চালাকি করে' কার বা কী লাভ ? কে বা জানে এ-সব ? কিন্তু শচীপ্রসাদ যদি চালাকি করে ? ও, তুই তাকে কি করে' চিন্‌বি ? সে আবার আমার চুলের ঝুঁটি টেনে ধরেছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। তুই বড্ড সময়ে চিঠিটা দিয়ে গেছিস্‌, যদু। নইলে—। শচীপ্রসাদকে শাসন না করেই যে কি ক'রে মরতে যাচ্ছিলাম ! হাঁ্যা, তুই যা। বড্ড জ্বর এসে গেল রে যদু। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাস দিকি। আর, লণ্ঠনটা তক্তপোষের ওপর তুলে দে।

লণ্ঠনটা তুলিয়া দিয়া যদু জল আনিতে গেল। কিন্তু এত কাছে আলো পাইয়াও চিঠিটা পড়িতে তাহার সাহস হইল না, চিঠিটা হাতে নিয়া মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবার চোখ বুলাইয়াই সে দেখিয়া নিয়াছে পত্রটি একটি কণা মাত্র, সামান্য দু'তিন লাইন লিখিয়াই শেষ করিয়াছে। কিন্তু এমন নির্ম্মম আঘাত করিয়া কি-বা তাহার এমন প্রয়োজন ঘটিয়া গেল। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে বুঝি। কিম্বা হয় ত' আরো ভৎর্সনা করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার জন্য আবার চিঠি কেন ?

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রদীপ চিঠিটা পড়িয়া গেল :

প্রদীপবাবু,

এ-সংসারে আমার আর স্থান নেই। আত্মহত্যা করতে পারতাম বটে, কিন্তু মরতে আমার ভয় করে। আর এক মা ছিলেন, তিনিও বিমুখ হয়েছেন। এখন আপনি মাত্র আমার সহায়। এ বাড়ীর বৌ হয়ে অবধি কোনদিন পথে বেরইনি, একা বেরুতে আমার পা কাঁপ্‌ছে। আপনি আজ রাত্রি ঠিক একটার সময় আমাদের গলির মোড়ে অপেক্ষা করবেন—আমি এক কাপড়ে বেরিয়ে আস্‌ব। তারপর আপনি আমাকে যেখানে নেবেন সেখানে যেতে আমি আর দ্বিধা করব না। ইতি।

-নমিতা

যদু জল লইয়া আসিয়াছে ; এক ঢোঁকে সবটা গিলিয়া ফেলিয়াও সে ঠাণ্ডা হইল না। যদুর হাতটা চাপিয়া কহিল;—ঠিক বলছিস্‌, পিওন দিয়ে গেছে ? গায়ে খাকির জামা, মাথায় পাগ্‌ড়ি, পায়ে ফেটি বাঁধা। ঠিক বল্‌ছিস ?

যদু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—মিথ্যে বলে' আমার লাভ কি, বাবু ?

—না না, তুই মিথ্যে বল্‌বি কেন ? তুই কি তেমন ছেলে ? তুই লক্ষ্মী, আর জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম।

হাত ছাড়াইয়া নিয়া যদু কহিল,—কী বল্‌ছেন বাবু ? সামান্য একটা চিঠি এনে দিয়েছি—তাতে—

—তুই তার কিছু বুঝবি নে। লেখপড়া তো' কোনোদিন কিছু শিখ্‌লিনে, পরের বাড়ীতে খালি বাসনই মাজ্‌লি। তুই যে একটি রত্ন, এ-কথা তুই নিজেই ভুলে আছিস্‌। হাঁ্যা, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই সব—সব তোর। আর, আমার এমন কিছুই নেই যে তোকে দেওয়ার মত দিতে পারি। ঠিক বলছিস্‌ ? পায়ে ফেটি বাঁধা, মাথায় পাগ্‌ড়ি, গায়ে খাকির জামা—ঠিক ? তুই যখন দেখেছিস্‌ তখন ঠিক না হ'য়ে পারে ? তুই কি আর আমার সঙ্গে চালাকি করবি ?

যদু 'ছি' বলিয়া জিভ কাটিল।

প্রদীপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে : সব তোকে দিলাম। সব তোর নিতে হবে। কিছুই আর আমার দরকার নেই। সে ভারি মজা,—এই বিছানা বালিশ বাক্স প্যাঁটরা জামা-কাপড়—সামান্য যা-কিছু মানুষের লাগে—এক-এক সময় একেবারে লাগে না। কিছু দিয়েই কিছু হয় না। হাঁ্যা, তুই বিশ্বাস করছিস্‌ না বুঝি ? এ আর এমন কি রাজ্য তোকে দিচ্ছি যে প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে আছিস্‌। বোকা-টা !

যদু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—আপনার তা হ'লে কি করে' চল্‌বে ?

—আমার চল্‌বে না রে পাগ্‌লা, চল্‌বে না। আমার আবার আর চলাচলি কিসের ? হাঁ্যা, আরেকটা কাজ তোকে করে' দিতে হবে ভাই।

—বলুন্‌।

—মোড় থেকে একটা রিক্‌স্‌ নিয়ে আয় দিকি, একটু বেড়াতে বেরুব।

—আপনার যে জ্বর। পড়ে' গিয়ে মাথা যে আপনার ফেটে গেছে।

—দেখছিস্ না চেহারাটা ভালুকের মত, জ্বরও ভালুকের। কখন যে আসে কখন যে নেমে যায় ঠাহর করা যায় না।

প্রদীপের গলার উপরে যদু স্বচ্ছন্দে হাত রাখিল। ভীত হইয়া কহিল,—গা যে পুড়ে' যাচ্ছে।

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া বলিল,—ওটা তোর হাতের দোষ। যা রিক্‌স্ আন একটা। জল্‌দি।

—বাইরে যে বেজায় হিম পড়ছে বাবু।

—দুত্তোর হিম। বেশ ত ঠাণ্ডায় আবার জ্বর জুড়িয়ে যাবে'খন। কোনোদিন ত' আর লেখাপড়া শিখ্‌লিনে, কিসে করে' যে কী হয় তোর চোদ্দপুরুষও বুঝে উঠতে পারবে না। যা। তোকে গালাগাল দিলাম না ওটা। কী মূর্খের পাল্লায়ই যে পড়েছি! বেশ জোয়ান দেখে রিক্‌স্ আনবি। হা হা—জোয়ান রিক্‌শ।

যদু চলিয়া গেলে প্রদীপ আবার নতুন নমস্কার পড়িল। টাকা কোথায়? পকেটের বাইরে ও ভেতরে দুই দিকই সমান দুইটা শূন্য। তবে? অবিনাশের কাছে গিয়া সাহায্য চাহিবে? এখন সে কলিকাতায় না কালিঘাট্-এ তাহারই বা ঠিকানা কি? হ্যাঁ, যখন সে সব ছাড়িয়াছে, তখন তাহার টাকাও লাগিবে না। পাগল! সে একা নয়, সঙ্গে নমিতা। সে-কথা সে ভুলিয়া গেল নাকি? না না, ভুলিতে সে মরিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মরিলেও সে ভুলিতে পারিত না। কিন্তু টাকা চাই। অস্ত্রটা বেচিবে? কাহার কাছে? অস্ত্রটার সাহায্যে কোনো দোকানে গিয়া লুট করিয়া আসিবে? কোন্ দোকান? যদি ধরা পড়ে! উঃ, ভাবা যায় না। শরীরের এমন অবস্থা, এক পা-ও সে দৌড়াইতে পারিবে না। নমিতা মধ্যরাত্রিতে গলির মোড়টা একেলা আসিয়াই ঘুরিয়া যাইবে। বিশ্বাসঘাতক, প্রদীপ, চরিত্রহীন পাপিষ্ঠ। কুলনারীকে বাড়ির বাহির করিয়া সে আরামে বিছানায় শুইয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। ছি! কিন্তু নমিতা নিশ্চয়ই সেমিজের তলায় টাকা নিয়া আসিবে। আসুক্, তবু তার কাছ থেকে খরচ চাহিলে তাহার পুরুষগর্ব্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে যে। হোক্, যে সহচারিণী বন্ধু তার কাছ থেকে এটুকু সাহায্য নিতে লজ্জা কোথায়? কিন্তু নমিতা কোথায় টাকা পাইবে? গায়ে তাহার একখানা গয়না পর্য্যন্ত নাই। সে-সব অবনীবাবুর সিন্দুকে নির্ব্বাপিত মৃৎপ্রদীপের মত ঘুমাইয়া আছে। একদিন আগে খবর পাইলে সে-সিন্দুকের শক্তি না-হয় সে পরীক্ষা করিত। না, না টাকা চাই। কোনো দ্বিধা নাই, টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

কি ভাবিয়া প্রদীপ দরজায় খিল দিল। একটা লোহার শলা ঢুকাইয়া সজোরে একটা চাড় দিতেই প্রীতিনিধানের ট্রাঙ্কের তলোটা ফাঁক হইয়া গেল। সে চুরি করিতেছে, হ্যাঁ, সে জানে। চুরিই করিতেছে সে। উদ্দেশ্যবিচারেই মহত্ত্ব প্রমাণিত হোক্, রীতিবিচারটা বর্ব্বর প্রথা। ভগবান আছেন। যে চোর, যে নারীহর্ত্তা তার জন্যও ভগবান আছেন। প্রীতিনিধানের কাপড়ের তলায় কতগুলি নোট।

দরজায় কে টোকা দিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল,—কে?

—আমি, বাবু। রিক্‌স এসেছে।

—এসেছে? বেশ জোয়ান রিক্‌স ত' রে? বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে দরজা খুলিয়া দিল।

আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করিল না: চল্লাম রে যদু।

যদু কহিল,—আর আসবেন না?

—না। বলিয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হোঁচট্ খাইতে খাইতে সে নামিতে লাগিল। উপর হইতে যদুর প্রশ্ন শোনা গেল: দড়িতে টাঙানো আপনার ঐ সিল্কের জামাটাও আমার।

—হ্যাঁ, তোর। সব। গরদ তসর সিল্ক মট্‌কা মসলিন আল্‌পাকা—সব।

রিক্‌সয় চাপিয়া প্রদীপ কহিল—চল্ কাশিপুর।

রিক্‌স-ওয়ালা অবাক হইয়া কহিল,—সে কি বাবু? সে ত' বহুদূর।

—আচ্ছা, আচ্ছা, উল্টোমুখো করে' নে গাড়ীটা। ভবানীপুর চল্।

—সে ও ত, ঢের দূর বাবু।

—তবে কি সাবু খেয়ে গাড়ী টানিস্? নে, হেদোয় যেতে পারবি?

ডাণ্ডা তুলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌স-ওয়ালা টানিতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল,—বেশী মেহনৎ হ'লে আয়েকটাতে চাপিয়ে দিস্ মনে করে'। বুঝ্‌লি?

১৮

একটা বাজিবার বহু আগে হইতেই প্রদীপ গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করিতেছে। চিঠি পাইবার পর অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু এখনো যেন সে ভালো করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছে না। যে নির্ম্মম ঘৃণায় আঘাত করিতে পারে, সেই আবার কালবিলম্ব না করিয়া সহযাত্রিণী হয় এমন একটা চেতনায় প্রদীপ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনে এমন কি পারম্পরিক বৃত্তি-বৈষম্য ঘটিতে পারে, ভাবিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। ভয়ও করিতেছিল না এমন নয়; যতক্ষণ নমিতা শ্বশুরালয়ে স্থাণুর মত অচল হইয়া বসিয়া ছিল ততক্ষণ তাহাকে সংস্কার ও বুদ্ধি দিয়া আয়ত্ত করা যাইত, কিন্তু যখন সে সেই পরিচিত ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে কূল-প্লাবিনী নদীর মত নামিয়া আসিল তখন তাহাকে যেন আর সীমার মধ্যে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। কোথায় একটা অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্যের বেসুর বাজিতেছে অথচ এমন একটা খররুদ্র বিদ্রোহাচরণের মাঝেই ত' সে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল! কিন্তু এমন আকস্মিকতার সঙ্গে হয় ত' নয়। এই নিদারুণ অসহিষ্ণুতার মাঝে যেন কুশ্রী নির্লজ্জতা আছে। যে বিদ্রোহ আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাহাতে সুষমা কোথায়?

অজয় হইলে হয় ত' লাফাইয়া উঠিত,—নমিতাকে সঙ্গে নিয়া হয় ত' তখনই গলবস্ত্র হইয়া উদ্যত খড়্গের নীচে মাথা পাতিত! কিন্তু প্রদীপ নমিতাকে পরিপূর্ণ ও প্রগল্‌ভ জীবনোৎসবের মাঝখানেই নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছে। নমিতাকে নিয়া তাহার তৃপ্তির তপস্যা, সৃষ্টির সমারোহ। সে তাহাকে নিয়া মরণের হোলি খেলিতে চাহে নাই। কিন্তু যে প্রেম দীর্ঘ প্রতীক্ষার অশ্রুসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইল না, সে প্রেম একটা শরীরের স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র, তাহার কোথায় বা লাবণ্য, কী-বা তার ঐশ্বর্য্য! সাহসিকা অভি-সারিকার চেয়ে একটি সাশ্রুলেখাননা বাতায়নবর্ত্তিনী বন্দিনী মেয়ের মাঝে হয় ত' বেশি মাধুরী। কিন্তু এখন ইহা নিয়া অনুতাপ করিবার কোন অর্থ নাই। কেন যে সে কী আঘাত পাইয়া হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ের আকারে নমিতাকে লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, কেনই বা যে নমিতা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াও পুনরায় পরাভূত হইল ইহার কারণ নির্ণয় করিবারো সময় ফুরাইয়াছে।

রিক্‌স ছাড়িয়া নানা অলি গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রদীপ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া আসাতেই সে নমিতার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মধ্যে আর মাদকতার স্বাদ পাইল না। তবু এখন রাস্তার মাঝ-খানে নমিতাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িবার মার্জ্জনা নাই। যখন পথে একবার পা দিয়াছে তখন তাহার পার খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

রাস্তা ক্রমে ক্রমে পাতলা হইয়া আসিল। রাত্রির কলিকাতার স্তব্ধতার মাঝে উন্মুক্ততার একটা প্রাণান্তকর বিশালতা আছে—এত বড় মুক্তির কথা ভাবিয়া প্রদীপের হাঁপ ধরিল। গলির মোড় হইতে অবনীবাবুর বাড়ির একটা হলদে দেয়াল অস্পষ্টাকারে চোখে পড়ে, তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ চক্ষুকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। এ কী—নমিতাই ত', সমস্ত গায়ে চাদর মুড়িয়া এদিকে অগ্রসর হইতেছে। আশ্চর্য্য, তাহা হইলে চিঠিটার মধ্যে এতটুকু অসত্য ছিল না? নমিতা তাহা হইলে নিতান্তই কলঙ্কের কুলা মাথায় লইয়া কূল ডিঙাইল! সে প্রদীপকে এতখানি বিশ্বাস করে! সে একবারো কি এই কথা ভাবে নাই যে, যে অমিতচারী উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব প্রদীপ অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নির্লজ্জ ও কদর্য্য অভিনয় করিয়া আসিতে পারে, তাহার বিশ্বাসঘাতক হইতেও দেরি লাগে না? কে জানে হয় ত' সে এই কথাই ভাবিয়াছিল, তাহার উপর যাহার এমন দুর্দ্দমনীয় লুব্ধতা, সে নিশ্চয়ই এমন সোনার সুযোগ সহজে ফস্‌কাইতে দিবে না, দুই লোলুপ বাহু মেলিয়া গলির মোড়ে ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিবে। হয় ত' সে প্রদীপের আগ্রহকে এমনি একটা কদর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। সে ত' ডাকাত-ই, পরস্বা-পহরণই ত' তার ব্যবসা। নমিতা তাহাকে অকারণে কেন সন্দেহ করিবে? কে জানে, তাহা হইলে নমিতার না আসিলেই ভালো হইত। একটা চিঠি লিখিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে হয় ত' তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিত না।

নমিতা সরাসরি প্রদীপের সম্মুখে হাঁটিয়া আসিল, কহিল, —কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন। গাড়ি ঠিক রেখেছেন।

প্রদীপ ভালো করিয়া নমিতার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, তবু ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে যেটুকু আভাস পাইল তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে-মুখ নিদারুণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলাকার সেই প্রশান্ত ও গাম্ভীর্য্যগদ্‌গদ মুখখানি এখন নিরানন্দ শুষ্কতায় কুটিল ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। কথায় পর্য্যন্ত সেই কুণ্ঠিত মাধুর্য্যের কণা নাই। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, —গাড়ি-টাড়ি ঠিক নেই।

নমিতা সামান্য বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—ভাবছিলেন বুঝি চিঠিতে আপনাকে একটা ধোকা দিয়েছি। মিথ্যা কথা সহজে আমি বলি না। চলুন, গাড়ি একটা পাওয়া যাবে হয় ত'।

ক্লান্তস্বরে প্রদীপ কহিল,—কিন্তু কোথায়ই বা যাবে?

—বাঃ, সে ত' আপনি জানেন। আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন তার আমি কী জানি?

প্রদীপ ম্লান চক্ষু দুইটি নমিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—সত্যি, কোথায় যাব তার আমি কিছুই জানি না।

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিছুই জানেন না? এখন এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না? তখন ঘটা করে' আমার ঘরে গিয়ে যাত্রা-দলের ভীমের পার্ট করে' এসে এখন শকুনি সাজলে চলবে কেন? চলুন, এগোই। এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা করবার সময় নেই। খানিক বাদেই বাড়িতে তুফান লেগে যাবে। তখন মরবারো আর মুখ থাকবে না। চলুন। বলিয়া নমিতাই বড় রাস্তা ধরিয়া আগাইতে লাগিল।

পিছে পিছে দুই পা চলিতে চলিতে প্রদীপ কহিল,—আমাকে ক্ষমা কর, নমিতা। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও।

নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সামনেই গ্যাস্‌পোস্‌টটা, তাহার আলোতে সে-মুখের সব ক'টা রেখা নিমেষে দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠিল; আপনি এত বড় কাপুরুষ? বাড়ির বাইরে টেনে এনে আবার তাকে বাড়িমুখো হবার পরামর্শ দেন কোন্ লজ্জায়? আর, ফেরবার পথ অত সহজ নয়। কিন্তু ঐ দেখুন, একটা গাড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় খালি—ডাকুন না, দেখা যাক্।

গাড়িতে উঠিলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাব?

প্রদীপ নমিতাকে প্রশ্ন করিল,—কোথায় যেতে বল্‌ব ওকে? তোমার বাপের বাড়ি?

—বাপের বাড়ি! আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত্রে ওখানে ফিরে গেলে বাপের বাড়ির এয়োরা সব বরণ-ডালা নিয়ে আসবে না। কোথায় যেতে বলবেন আমি কি জানি।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া প্রদীপ বলিল,—চল শেয়ালদা।

দুই জনে মুখোমুখি বসিয়াছে। নমিতা জান্‌লা দিয়া রাস্তার উপরে চলমান গাড়ির ছায়াটাই বোধ করি লক্ষ্য করিতেছিল, প্রদীপ একেবারে মূঢ়, স্পন্দহীন। শেয়ালদা হইতেই যে কোথায় যাওয়া যাইতে পারে তাহার কোনো কিনারাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এ-সময় অজয়ের দেখা পাইলে মন্দ হইত না। সে সমস্ত সমস্যাই খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, হয় ত' ভোর হইলেই সে নমিতাকে নিয়া একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়া ফেলিত। কিন্তু নমিতা যদি আসিলই তবে রূঢ় কোলাহলে সে যেন নিজেকে ব্যয় না করে, আকাশের দর্পণে সে তার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখুক্।

প্রদীপ অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল,—তুমি এমন করে' হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে, এ ভাব্‌তেও পারিনি, নমিতা।

নমিতা জান্‌লা হইতে মুখ ফিরাইল না, কহিল—তবে কি ভাব্‌তে পেরেছিলেন শুনি?

একটু দম নিয়া প্রদীপ কহিল,—ভেবেছিলাম মেরুদণ্ডের অভাবে চিরকাল তোমাকে সমাজের অচলায়তনে কুঁকড়েই থাক্‌তে হবে।

নমিতা ভিতরে মুখ আনিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল—এখন আমার মেরুদণ্ডটা বুঝি আপনার কাছে প্রকাণ্ড দণ্ড হ'য়ে উঠেছে, তাই আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বল্‌ছেন। কিন্তু আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। বলিয়া আবার সে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ কহিল,—সংসারে কা'র জন্য কা'র ভাবনা করতে হয় কিছু লেখা থাকে না, নমিতা। তুমি আমার

সঙ্গেই ত' চলেছ। এ-যাত্রায় পৃথক ফল যখন কোনদিক থেকেই নেই, তখন ভাবনার অংশটা আমাকেও ত' খানিকটা নিতে হবে।

নমিতা সোজা হইয়া বসিল। ঘোমটার তলা হইতে কতকগুলি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল মুখের উপড় ঝুঁইয়া পড়িয়াছে। সে দুইটি ঠোঁট ঈষৎ চাপিয়া কি-একটা কঠিন কথা সংযত করিয়া নিল। পরে স্পষ্ট করিয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে চলছি বটে, কিন্তু আপনার জন্যেই বেরিয়ে আসিনি, দয়া করে' তা মনে রাখ্‌বেন।

ম্লান একটু হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—সে-কথা আমাকে মনে না করিয়ে দিলেও চল্‌ত, নমিতা। বেরিয়ে যে এসেছ এইটেই আজকের রাতের পক্ষে সত্য, কিসের জন্য এসেছ সেইটে অবান্তর। আমার জন্য বেরিয়ে আসবে এমন একটা অন্যায্য অভিলাষের কলুষে তোমার এ বিজয়গর্বকে আমি ছোট করতে চাইনে। কিন্তু এ যখন তোমার একারই দায়িত্ব তখন আমাকে আর গাড়ি ক'রে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ?

নমিতা চোখের সম্মুখে বিপদ দেখিল। প্রদীপকে এত সহজে মোহমুক্ত করাটা ঠিক হয় নাই। সে হাসিয়া কহিল,—আমি টেনে নিয়ে চলেছি মানে? আজকে সকালবেলা আমার পুজোর ঘরে কে ঘটোৎকচবধের পালা শেষ করে' এলো? বক্তৃতায় পটু, কাজে কপট—এমন লোক দেশ স্বাধীন করবার অহঙ্কার করে কোন হিসাবে? যখন তার কাছে দেশ অর্থ স্ত্রী-জাতি? কোনো রমণীকে কুলের বার করে'-এনে মাঝপথে তাকে ফেলে চলে' যাওয়াটা বীরধর্ম্ম নয়। আপনি যেখানে যাবেন আমাকেও সেখানেই যেতে হবে।

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এক রাতে সেই নিদ্রাকুণ্ঠিতা নমিতা মুখরভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে। চোখে চটুলতা, কথায় বিদ্রূপ, ব্যবহারে পরম সাহস। তাহার সেই ধ্যানময় প্রেমগরিমা কোথায় অন্তর্হিত হইল। সেই তেজোদীপ্ত দৃঢ়তার বদলে এ কিসের তরলচাপল্য! তাহার বিদ্রোহাচরণে এমন একটা অপরিচ্ছন্নতা থাকিবে ইহা প্রদীপ কোনদিন বিশ্বাস করে নাই।

প্রদীপ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি ত মৃত্যু-অভিসারিক।

নমিতা বলিল—কবির ভাষায় আমিও তা হ'লে মৃত্যু-স্বয়ংবরা।

প্রদীপ গম্ভীর হইয়া কহিল,—সত্যিই আমি মৃত্যুকে জীবনের মূল্য-নির্দ্ধারক বলে' স্বীকার করি না। আমি বাঁচ্‌তে চাই, পরিপূর্ণ ও প্রচুর করে' বাঁচা।

নমিতা হাসিয়া কহিল,—এ আপনারই যোগ্য বটে। বিসংবাদী মনোভাব নিয়েই আপনি কারবার করেন দেখ্‌ছি। একবার বলেন বেরোও, বেরুলে বলেন, ফের। মন খারাপ হ'লে বলেন, মরব; মরবার সময় গল্পের কাঠুরের মত বলেন,—বাঁচাও। আমার উপায় নেই, আপনার কথায় সায় আমাকে দিতেই হবে। আপনি যদি বাঁচান্, ত' বাঁচ্‌বো বৈ কি। বাঁচতে চাই বলে'ই ত' বেরিয়ে এলুম। মরলুম আর কৈ।

নমিতার এতগুলি কথার মধ্যে একটি কথামাত্র প্রদীপ কুড়াইয়া লইল: আমার সঙ্গে সায় দিতে হবে তোমার এমন কোনো চুক্তি আছে নাকি, নমিতা?

—না থেকে আর উপায় কি? আপনার সঙ্গেই যখন যেতে হচ্ছে।

—আমার সঙ্গে যাবার জন্যে ত' তোমার দিক থেকে কোনো আয়োজনই হয় নি নমিতা। আমি তোমার সঙ্গে আছি এ তোমার জীবনের আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তুমি ত' আর সত্যি আমার জন্যেই পথে নাম নি।

নমিতা কহিল,—তা ত' নয়ই। সে-কথা বার বার বল্‌লে মানে উল্‌টে যাবে না কখনই। আমি একলাই বেরুতুম, কিন্তু পুরুষ একজন সঙ্গে থাক্‌লে কিছুটা আমার সুবিধে হবে ভেবেই আপনাকে চিঠি লিখেছি। আপনি আমার পথের অবলম্বন মাত্র, বিশ্রামের আশ্রয় নয়। সত্যভাষণের দীপ্তি যদি সইতে না পারেন, তবে নেমে যান গাড়ি থেকে, আমার আপত্তি নেই। যে-দেবতা আমাকে ডাক দিলেন, রাখ্‌তে হয় তিনিই আমাকে রাখ্‌বেন। মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলুম হয় ত'।'

নমিতা জান্‌লার উপরে বাহুর মাঝে মুখ লুকাইল।

প্রদীপ কহিল,—তোমার মাঝে আমি মুক্তির মহিমা দেখ্‌ছি, নমিতা—

নমিতা মুখ না তুলিয়াই কহিল,—এটা কবিত্ব করবার সময় নয়।

—জানি। নানা রকম বিপদের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে, নানারকম সমস্যা। সমাজ, আইন, হৃদয়। সে-সবের মীমাংসা অহিংসামূলকই করে'-তুল্‌ব আমরা। দাঁড়াও, কথা আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার চিঠি পেয়ে এ-কথা যদি একবারো ভেবে থাকি যে বেরুলেই তুমি আমার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হবে সেটা নেহাৎই আমার অন্ধতা। দুটো দেহের স্থানিক সান্নিধ্যই মিলন নয়, নমিতা। সে লুব্ধতা আমার ছিল কি ছিল না তেমন বিচার আগে থেকে করতে গিয়ে তুমি থামোকা লাঞ্ছিত হয়ো না। ধরে' নাও আমি তোমার বন্ধু। তবে এখন বলতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়—কেন তুমি এমন বিস্ময়কর কাজ করে' ফেল্‌লে?

নমিতা মুখ তুলিল। অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে হইল সে কাঁদিতেছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া সে কহিল,—বিস্মিত আমিও নিজে কম হইনি প্রদীপবাবু। কিন্তু বেরিয়ে না এসে সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বসে' থাকবার মত অমানুষিক সতীত্ব আমার সইলোনা। কুরুসভায় দ্রৌপদীও এতদূর লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কি না মহাভারত লেখে না। আমার এতদিনকার স্বামিবিধান কৃচ্ছ্রপালন সমস্তই আমার বৈধব্যের মতই নিষ্ফল হ'ল। ভাবলুম, আপনার সেই হৃদয়হীন দস্যুতাই যখন আমার সকল অত্যাচারের মূল, তখন দায়িত্বও আপনারই। তাই আপনাকে চিঠি লিখলুম। যত বড় অমানুষই হোন্ না কেন একজন ভদ্রনারীর করুণ আবেদন হয় ত' অগ্রাহ্য না-ও করতে পারতেন। তবু যদি রাস্তায় এসে আপনাকে না পেতুম আমাকে সামনেই চল্‌তে হ'ত, এগোবার সময় ফেরবার সমস্ত গতি নিবৃত্ত করেই বেরিয়েছি। বলিয়া নমিতা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রদীপ কহিল,—হৃদয়হীন সত্যিই আমি ছিলাম না, নমিতা। তবু যদি সন্দেহ কর এই বিদ্রোহাচরণে কোনো কল্যাণ নেই, তবে বল, গাড়ি ফিরতে ব'ল।

কান্নার মধ্যেই কর্কশ স্বরে নমিতা কহিল,—না।

প্রদীপ কহিল,—দায়িত্ব আমারই। ভেবেছিলাম, যাকে চাওয়া যায় তাকে পাওয়া যায় না, এ নিয়ম ঈশ্বরের মতই অবধারিত। কিন্তু জোর করে' যদি তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তবেও ত' তাকেই পাওয়া হ'ল। স্তরভেদের সূক্ষ্মতাবিচার ভুলে গিয়েছিলাম, নমিতা। ভুল হয় ত' আমার ভেঙেছে, কিন্তু সময় যদি একদিন আসে, বুঝবে, সত্যিই আমি হৃদয়হীন ছিলাম না। আমি তোমাকে পাই না পাই, সংসার-ব্যাপারে এ একটা অতি তুচ্ছ কথা। তুমি তোমাকে পাও এই খালি প্রার্থনা করি। কিন্তু যাক্, গাড়িটা ষ্টেশনে ঢুক্‌ছে। বাকি রাতটা প্লাটফর্মেই কাটাতে হবে। ভোর বেলা ট্রেনে চাপ্‌ব।

ট্রেনে চাপিয়া কোথায় যাইবে এমন একটা কৌতূহলী-প্রশ্নও নমিতার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার মুখ আবার সহসা রুক্ষ ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের প্রত্যেকটি রেখায় একটা আত্মঘাতী প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রদীপের প্রতি বীভৎস ঘৃণায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে কহিল,—দায়িত্ব থেকে আপনাকে আমি মুক্তি দিলুম—স্বচ্ছন্দে, অতি সহজে। আপনি বাড়ি ফিরে যান্। প্ল্যাট্‌ফর্মে বা কোথায় রাত কাটাতে হবে সে-পরামর্শ আমার চাইনে। বলিয়া নিজেই গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল,—তোমাকে কত দিতে হবে?

আঁচলের গেরো হইতে পয়সা বাহির করিতে আর হাত উঠিল না, গাড়ির ভিতরে হঠাৎ প্রদীপের আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া সে জান্‌লা দিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মাথার ব্যাণ্ডেজটা মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে এবং কপালের যে জায়গাটা কাটিয়া গিয়াছিল সেই ক্ষতস্থান হইতে নূতন করিয়া রক্ত ঝরিয়া প্রদীপের জামা-কাপড় ভাসাইয়া দিতেছে। উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা কহিল,—ঈস্! কি ক'রে খুলে গেল ব্যাণ্ডেজ? আসুন, আসুন, নেমে আসুন শিগ্‌গির।

প্রদীপ নড়িল না। নমিতা আবার গাড়িতেই উঠিয়া বসিল। বলিল—ঈস্! এতটা কেটে গিয়েছিল নাকি? দাঁড়ান্, চুপ করে' থাকুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

—এখানে হবে না। চল, নামি। বলিয়া প্রদীপ নমিতার বাহুতে ভর দিয়া নামিয়া আসিল।

—ভাড়াটা আমিই দিচ্ছি। প্রদীপ ব্যাগ খুলিল।

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে প্রদীপ বলিল,—ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ভাল করে' বেঁধে দাও, নমিতা।

নমিতা বলিল,—শুয়ে পড়ুন। কেমন করে' খুল্‌লেন?

প্রদীপ কপালে নমিতার আঙুল ক'টির স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে বলিল,—কেমন আপনা থেকে খুলে গেল, নমিতা।

(ক্রমশঃ)

রাতের তলে

[শ্রীবিনোদভূষণ ঘোষ]

ফুটেছে অনেক ফুল, লাল আর শাদা হ'য়ে আমাদের চারি পাশে পাশে,
এমন সুন্দর রাত, রাতের চাঁদের আলো ভরিয়াছে কুসুমের বন—
ফুটেছে অনেক তারা—অনেক ফুলের মত, আজিকার আলোর আকাশে,
সুন্দর মসৃণ ফুল—সুন্দর মসৃণ আলো ; ঠিক তব মুখের মতন।

পৃথিবী ঢাকিয়া রাখে—সবুজ ঘাসের তলে মাটি আর যত মলিনতা,
আমাদের চারিপাশে কোথাও যায় না দেখা আঁধারের একটু আভাষ—
সবুজ ঘাসের ঠোঁটে, তোমার ঠোঁটের কোণে, লেগে আছে গাঢ় সজীবতা,
তোমার চোখের মত, আবেগ-চঞ্চল আজ তারাভরা রাতের আকাশ।

আসিবে আমার সাথে:? একটু বেড়াই গিয়ে কুসুমের খুব কাছে কাছে,
চাঁদের আলোর সাথে আজিকার আঁধারের নাই আর কোন রেষারেষি,
নিঝুম নিরালা রাত, একটি ভ্রমর নাই, একটিও পাখী নাই গাছে—
এমন নিরালা রাতে, তুমি আর আমি শুধু, আমাদের এই খুব বেশী।

কত ব্যর্থ দিন গেল—কঠিন মুহূর্ত্ত কত বুকে বুকে বিঁধিল কেবল,
আজিকার এই রাতে আমরা জ্বলিব কেন স্পর্শাতুর হৃদয়ের তাপে—
উজ্জল সুখের স্বপ্ন, দুঃখের চেতনাস্পর্শে কতবার হ'য়েছে বিফল,
বুকের বাসনা তবু পাতার আড়ালতলে চাঁপার কলির মত কাঁপে।

রাতের চাঁদের আলো, লুটায়ে পড়িতে চায়, তবু যদি ফুটিত মুকুল
শিশিরের স্পর্শ পেয়ে আকাঙ্খা জাগিত যদি মুকুলের ঠোঁটের উপরে,
রাতের আকাশতলে নিঃশব্দ স্পন্দন এক, থেকে থেকে ব্যথায় আকুল,
অধীর বাতাস শুধু ধীরে ধীরে স্পর্শ করে কুসুমের অস্ফুট অধরে।

চাঁদের আলোর সাধ, মুকুলে মুকুলে সাধে ফোটাবার এত আয়োজন—
কাল ভোরে ভেঙ্গে যাবে তরুণ আলোর স্পর্শে কুসুমের যত অভিমান,
ভোরের সোণার আলো কুণ্ঠার গুণ্ঠন তুলি' ফুলে ফুলে জাগাবে যৌবন
দিনের আলোর তেজে অবসন্ন ফুলে ফুলে যৌবনেব হ'বে অবসান।

এসো আজ আমরাও, ফুলে ফুলে স্পর্শ করি কমনীয় কোমল আস্বাদ—
তোমার মসৃণ মুখ দিনের আলোর তাপে হয়তো বা দেখাবে মলিন,
কাল ভোরে মনে হ'বে দুর্ব্বল মোহের মত আমাদের হৃদয়ের সাধ
জীবনের দৈন্য যত ব্যর্থতায় ভরে' দেবে আমাদের দুঃখের দুর্দ্দিন।

"আহরণী"

[শ্রীকিরণকুমার রায়]
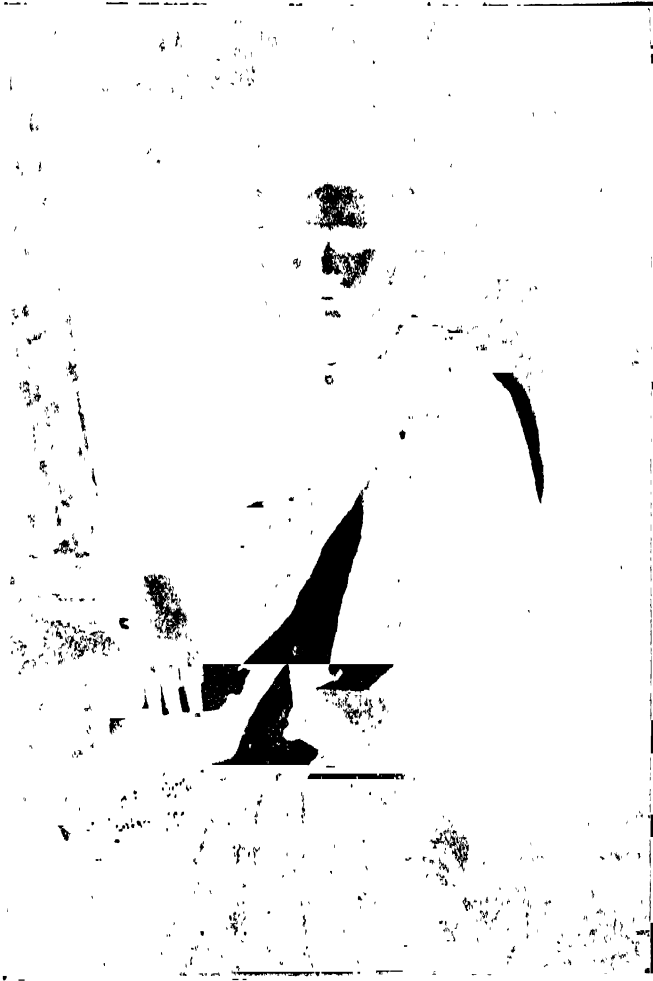
শ্রীকালিদাস রায়

ড্রয়িং-পণ্ডিত মহাশয় ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ডিক্‌টেশন দিতেন। ডিক্‌টেশন ছিল শেষ ঘণ্টায়। কোনও রকমে যাহা তাহা লিখিয়া দিয়া বাড়াতে ফিরিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতাম। সেদিনও তাই করিতেছিলাম,—পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশরুমে ঢুকিয়া একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইয়া বলিলেন—"মনোযোগ দিয়ে সবাই শোনো, এই কবিতাটি যে নির্ভুল লিখতে পারবে, সে আগে ছুটি পাবে——না, শুধু নির্ভুল লিখলে চ'ল্‌বে না, লিখে এটাকে মুখস্থ ব'ল্‌তে হবে"—বলিয়া কবিতাটি পড়িলেন,—

"নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলেনা চল মলয়ানিল লুটিয়া ফুলগন্ধভার"।

—যতদুর মনে পড়িতেছে, 'মলয়ানিল' এর স্থানে সেদিন 'মন্দানিল' মুখস্থ করিয়াছিলাম।

—বয়স তখন বছর দশেক। কবিতার কিছুই বুঝি না, কিন্তু তবু ছন্দ কানে মধু বৃষ্টি করিয়াছিল; যাহার ফলে সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ কবিতে বেশী সময় লাগে নাই—এবং ঘণ্টা বাজিবার বহু পুর্ব্বেই বাড়ী ফিরিবার ছুটি পাইয়াছিলাম বলিয়া মনে আছে।

সেটি ১৯১৩ সন হইবে—তারপর পুরা পোনেরো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কলেজে আসিয়াই কালিদাস রায়ের কবিতা পড়ি এবং ক্রমে তাঁহার সহিত পরিচিতও হই। ইতি-মধ্যে আমার দশ বৎসরের ভাইপোটি সেদিন আমাদের বাসায় তাঁহাকে দেখিয়া নেপথ্যে আমাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিল:—"উনি-ই কি কবি কালিদাস রায়, কাকা!" দেশের স্কুলে সেও আজ ফোর্থ ক্লাসে উঠিয়াছে। আমি যে বয়সে কবিতা পড়িয়াছিলাম, কবি কে তা জানি নাই, সে সেই বয়সে কবিতা তো' পড়িয়াছেই, কবিসম্পর্কে দিব্য একটি শ্রদ্ধাও সঞ্চয় করিয়াছে।

কালিদাস রায়ের কবি-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই কাহিনী-উল্লেখের প্রয়োজন ছিল—যে প্রতিষ্ঠা কেবল কাব্যামোদী দু'এক জনের মধ্যে আবদ্ধ নহে, যাহা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কালিদাস রায় সেই কবি-প্রতিষ্ঠার অধিকারী।

কিন্তু প্রতিষ্ঠার মতো শঠ, বিশ্বাসঘাতক সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। "আহরণী" পড়িয়া তাহাই বুঝিয়া, যথেষ্ট অক্ষমতা সত্ত্বেও—এই সম্পর্কে একটি যে মোটা কথা আমার মনে হইয়াছে, সেটি লিখিতে বসিয়াছি।

কথাটি হইতেছে এই। প্রতিষ্ঠা ও যশ পুঞ্জীভূত হইয়া এক এক জনকে এক একটি মূর্ত্তি দেয়—সেই মূর্ত্তি কাগজে কাগজে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া, জানা-অজানা নানা লোকের মধ্যে সেই সেই প্রতিষ্ঠা ও যশের অধিকারীকে সেই সেই মূর্ত্তিতে পরিচিত করে। কিন্তু হয়তো ইতিমধ্যে যে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল, তাহার যিনি আদি, তিনি নিজেকে আরও প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু প্রচলিত যে প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তি, তাহা লোকসমাজে এমনই মূল গাড়িয়া বসিয়াছে যে সে মূর্ত্তিকে ভাঙিয়া ফেলা যাইতে পারে—কিন্তু তাহাকে বিভিন্ন রূপ দিয়া সজীব করিয়া তোলা প্রায় অসম্ভব।

"আহরণী" পড়িয়া সেই অসম্ভব আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এইখানে বলি যে "আহরণী" কালিদাস রায়ের কাব্যসমষ্টির চয়নিকা। তাঁহার সমগ্র কবিতার এই সার-সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল, কেননা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া এত বিভিন্ন কাগজে তিনি এত বিবিধ কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে সে কবিতার মূল সুরটি ধরিয়া উঠিবার জন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই "আহরণী"র বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঐ মূল সুরটি হইতেছে আসল কথা।

আমাদের বিশ্বাস যে যে-কোনও শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় একটি মূল সুর থাকিবেই থাকিবে, যাহা তাঁহার Criticism of Life—যাহাকে তাঁহার Philosophy বলা যায়। এই Philosophyর যেখানে অভাব, সেখানে বুঝিব কবি কাব্যরচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন নাই। যে কোনও শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে সে সুর খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইবে না। এমন অবশ্য হইতে পারে যে বিষয়ের বিভিন্নতায় কাহারও কাহারও কবিতায় মূল সুরেরও বিভেদ ঘটিয়াছে, যেমন "নারী" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি সুর আবার "জীবন-দেবতা" সম্পর্কে আর একটি; এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার একটি বিশিষ্ট সুর দেখি। পৃথিবীতে কিন্তু কদাচিৎ এমন কবি জন্মায় যিনি এমন প্রত্যেক বিষয়ে নিজে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া—বিভিন্ন সুর সাধিবার শক্তি রাখেন। অধিকাংশ কবির কাব্যই খুঁজিয়া দেখিব—কেহ জীবন ভরিয়া ভৈরবী সাধিতেছেন যেখানে পূরবী সাধিতে গিয়াছেন, সেখানে ঐ ভৈরবীর আমেজ আসিয়া গিয়াছে। গানের ক্ষেত্রে যাহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা—এবং লজ্জাকর অপরাধ, কাব্যের ক্ষেত্রে তাহাই বৈশিষ্ট্য হইয়া কবির ললাটে বিজয়-তিলক পরাইতেছে।

কবির কাব্যের এই মূল সুরকে, key-note কিম্বা angle of visionকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে, নহিলে কাব্যবিচার সম্যক ও সম্পূর্ণ হইবে না। কালিদাস রায়ের কাব্যের এই চাবিকাঠিটির আমি সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে, ভয়ে ভয়ে তাহার পরিচয় দিতেছি।

পর্ণপুটের কবি কালিদাস রায় ইংরাজীতে যাহাকে Pastoral বা Rural Poetry বলা হয়—তাই লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। "আহরণী"র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পোনেরো পৃষ্ঠা পড়িলে যে কেহ এই প্রসিদ্ধির হেতু বুঝিবেন।

ব্রজবেণুর কবি কালিদাস রায় তো অত্যন্ত সুপরিচিত—লুকোচুরি খেলায় যাহার তুলনা নাই, বৃন্দাবন যিনি ছাড়িয়া অন্ধকার করিয়াছিলেন, মথুরার দ্বারে দ্বারে যাহার জন্য গোপগণ মাথা কুটিয়া মরিল,—যে ভালবাসে তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া যিনি খুশী এবং অন্যান্য বহুবিধ 'গুণ'এর যিনি আকর—সেই দুষ্ট ভদ্রলোকটিকে কালিদাস রায়ের কাব্যের পাতায় কে না দেখিয়াছে?—সিন্ধুকূলে গিয়া কেবলই যে নন্দদুলালের কথা মনে পড়ে, ভক্তের হৃদয়ে যিনি চিরবন্দী, যিনি এক কি দুই কেহ জানে না—তাহাকে কালিদাস রায় জানিয়াছেন ও জানাইয়াছেন।

—বাংলার Homeকে যিনি Heaven করিয়া দেখিয়াছেন, সে কালিদাস রায়ও স্বনামধন্য। 'বাপ পিতামোর ভিটা'কে এমন দৃষ্টিতে আর কে দেখিয়াছেন?

> আমার তরে হেথায় হ'লো কত আয়োজনই
> তিনশো বছর আগেও আমার বাজ্‌ল আগমনী,
> অলক্ষ্যে সব রক্ষা-কবচ আমায় ঘিরে রাখে—
> ছাড়তে গেলে অনেক পাণিই পিছন হ'তে ডাকে।

—এমন কোন্ বাঙালার ছেলে আছে, এ কবিতা পড়িয়া যাহার দৃষ্টি না ঝাপসা হয়—আর সম্মুখে না ভাসিয়া উঠে—কোন্ অলক্ষ্যে বিদায়-নেওয়া বনবাদাড়ে ঘেরা একখানি জীর্ণ অট্টালিকার অঙ্গন!

প্রেমিক কবি কালিদাস রায়কেও সকলে জানি। প্রেয়সীকে যিনি—

মনে পড়ে' আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
চোখে তব দেখা পেতাম চকিত কৈশোর কুতূহলে—

বলিয়া সমূহ বিপদে ফেলিতে চাহেন।

উপর্য্যুক্ত সমস্ত রকমে এবং আরও নানারকমে—যেমন সামাজিক চিত্রের নিপুণ পটরচনায়, রঙ্গ ও ব্যঙ্গের সাবলীল প্রকাশভঙ্গীতে, নিসর্গ চিত্রের সুষ্ঠু ব্যাখ্যানে—কালিদাস রায়ের খ্যাতি আছে।

কিন্তু ইহাদের প্রত্যেককে অতিক্রম করিয়া কালিদাস রায় আরও কতকগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রচনায় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন—পরিচারিকা পাঠে জানিলাম যে এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র "তুলসী" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। কবিতাগুলিকে "ভারত-ভারতী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই পর্য্যায়ের শেষ কবিতা "শঙ্খ"—নীচে তাহার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি।

নমি শঙ্খ শুভ্রজ্যোতি দিব্যদ্যুতি চিরপুণ্যব্রত,
হে ঋষি কঙ্কালসার, তপঃশীর্ণ নমি সারস্বত।
গহন জলধিতলে বিক্রমের রচি তপোবন,
কত যুগ যুগ ধরি তপস্যায় ছিলে নিমগন?
অপার অনধিগম্য জলধির অন্তরের বাণী
সান্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত ভরি তব চিত্তরন্ধ্রখানি.
সেই বাণী তব কণ্ঠে শান্তিঘন বরাভয়াময়,
গৃহে গৃহে কর তাই উদীরণ অনন্তের জয়।

শ্রুতির অগ্রজ তুমি, পন্থা শুদ্ধি করি আগে আগে
আশ্রমে আনিলে তারে—সেই ধ্বনি আজো কণ্ঠে জাগে,
মোরা মূঢ় দীক্ষাহীন দৈনিক স্বাধ্যায়-মঙ্গল
তব কণ্ঠে গৃহে গৃহে শুনি তার বারতা কেবল।

—মনে হইতেছে সমস্তটুকু উঠাইয়া দিই। অংশ উঠাইয়া কবিতার প্রতি অবিচার করা হইতেছে—বেশ বুঝিতেছি। কিন্তু উপায় নাই। এই পর্য্যায়ের প্রথম কবিতা "সুরধুনী"তে—পতিতপাবনী সুরধুনীকে আহ্বান করিয়া কবি বলিতেছেন—

তব কূলে আজি কল্পনা মম হেথা হ'তে ছুটে অন্যলোকে,
ঘন চিতাধূম আবছায়া-ফাঁকে মহাপথ জাগে আমার চোখে।
পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়েছে চলি,
শত শত পাণি দেয় হাতছানি ডাকে 'আয় আয় আয়রে' বলি।

অনাবিষ্কৃত পথবক্ষস্থ ভয়ে নিরাশায় আকুল করে
তব আশ্বাস শীতনিশ্বাস ললাটের স্বেদবিন্দু হরে।

—ইহা ছাড়া "হিমাদ্রি" "তুলসী" "কুশ" "জবা" "সোম" ও "ইন্দ্র" নামে আরও ছয়টি কবিতা এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। ইহাদের বক্তব্য বিষয় বিভিন্ন, কিন্তু সমস্ত ক'টি জুড়িয়া সুর এক। যে আরণ্যক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতবর্ষ আজও গৌরব আসনে বসিয়া আছে সেই সভ্যতা স্মরণে কবি কখনও পুলকিত, কখনও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের গৌরবময় স্বর্ণ শৃঙ্খলে নিজের সত্ত্বাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চক্ষু বাহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, আর তিনি সেই শৃঙ্খলের সম্পূর্ণ সূত্রকে অনুভব করিতেছেন—যে সূত্র যোজন-ব্যাপী ও যুগযুগসমৃদ্ধ—কলপ্লাবিনী সুরধুনী ও বিপুল বিরাট হিমাদ্রি যাহার প্রতীক মাত্র।

—এই অনুভূতি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য-পরিমিতির পরিভাষায় যাহাকে "বাসনা" বলিতে পারি—কবি কালিদাস রায়ের কাব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এইটিই তাঁহার মূল সুর। এই সুরে তাঁহার মনের বীণা বাঁধা রহিয়াছে, এবং সেই বীণায় যখনই এই পর্দায় হাত পড়িতেছে তখনই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তিনি শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া নিজে লোকোত্তর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন।—এই "বাসনা"রই প্রকাশ-বীজ "লক্ষ্মী-মাসে" দেখিয়াছি, যেখানে তিনি বলিতেছেন—

ঘটভরা জলে ঘুচায়েছে ঘরে দ্বারের 'তালবোণা',
আঁক' লক্ষ্মীর আনাগোনা-পথে আজিকে আল্পনা।

এই সুরই—

নূপুর খুলিয়া নীলাকাশে সেই ক্ষতপদে আসাযাওয়া
বনমরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,

ঝঙ্কারে ভরিয়া রাখিয়াছে।

এই সুরেই তাঁহার পৌরাণিক কবিতাগুলি ভরা—দুর্ব্বাসার দুর্ব্বার বেগ ও মেনকার অশ্রু:ত, একলব্যের দীক্ষার দক্ষিণায় সেই একই সুর রণিয়া উঠিতেছে।—

এই স্থানে উঠিলেই তিনি একেশ্বর।
এইখানে বসিয়াই গাহিতেছেন,

—অলকাস্মৃতি ভূলোকতীরে
উদাসী করে এ প্রবাসীরে—

—কবি পণ্ডিত, সুতরাং এদিক দিয়া তাঁহার পার পাইবারও উপায় নাই। কোথা হইতে কোথায় গিয়া পড়িতেছেন আমাদিগকে নিয়া যাইতেছেন তাহার কিনারা করা কঠিন—"ভারত-ভারতী" পর্য্যায়ের বহু স্থানে এমন পৌরাণিক উল্লেখ আছে, যাহার অর্থোদ্ধার করিতে পুঁথি নিয়া বসিতে হইবে। অগুচ্ছদ ভাঙ্গিবার আগে গরুড়ের শেষতন্দ্রার কথা কে মনে রাখিয়াছে? কোন্ স্থানে তাহার উল্লেখ আছে—? কবির কাছে ইহা প্রায় অ-আ ক-খ। কিন্তু সাধারণ পাঠককে একটু বেগ পাইতে হয়।

—কিন্তু সেই বেগ হইতে উদ্ধার পাইলে, কাব্য মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধির ব্যাপার হয়। সুতরাং এই 'বেগ' বাধা না হইয়া কাব্যসম্পদের সহায়কই হয়।

কালিদাস রায়ের বাণী তপোবনের বাণী স্মরণে ও মননে, তপস্যার ধ্যানদৃষ্টিতে,—তাঁহার বাণী বেদ উপনিষদ পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি সংহিতার বাণী,—এবং তাহারই যে রেশ প্রাচীন পথ বাহিয়া আধুনিক বাংলায় আসিয়া শ্রদ্ধাসন পাইয়াছে—আমাদের মতে কালিদাস রায়ের key-note হইতেছে তাই। এই Romantic কবিতার যুগে কালিদাস রায় Classic কবিতার পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছেন—এবং এই সুরটির সহিত অপরিচিত থাকিলে কালিদাস রায়ের কাব্যও অপঠিত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখিব যে অন্যত্র কালিদাস রায় সাধারণ সুরশিল্পী—কিন্তু এই এক সুরসাধনায় তিনি অদ্বিতীয়।

—প্রতিষ্ঠা নিয়া আগে যে কথা বলিয়াছিলাম, সেই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া সাঙ্গ করিব। পর্ণপুট ব্রজবেণু ইত্যাদির যে-কবি কালিদাস রায়ের সহিত সাধারণ পাঠক পরিচিত- তাঁহাদের মনে কালিদাস রায়ের কবি-প্রতিভার যে মূর্ত্তি আছে, "ভারত ভারতী"র কবিতার সন্ধানী-আলোয় সে প্রচলিত মূর্ত্তি শুধু যে প্রাণবন্ত ও মোহন হইয়া উঠিবে তাহাই নয়,—সে মূর্ত্তির রূপই বিভিন্ন হইবে। কেননা "Shakespeare of apprenticeship is not the Shakespeare of maturity much less of deeper passion."*

চোখে যদি জল আসে

[সুফী মোতাহার হোসেন]

চোখে যদি জল আসে মুছিও না, মুছিও না তায়।
মুক্তার বিন্দুর মত কাঁপুক সে নয়ন সীমায়।
সুন্দর কপোল 'পরে সুন্দর ও-নয়ন-সলিলে
কান্না সে সুন্দর কত বুঝিবে কি কথায় কহিলে?
মনে আছে, একদিন তখনো হয়নি নিশি ভোর
শিশিরে কাঁদিতেছিল নিশীথের মায়ামোহঘোর।
সে কী কান্না! আঁধারের সে কী মূক গভীর বেদনা!
প্রভাতের দ্বার-তটে সে কী তার করুণ প্রার্থনা!
সারারাত দেখেছে সে কত না স্বপন, বুনিয়াছে
কত না সুবর্ণজাল! সেই স্বপ্ন থাক তার কাছে
চাহে না সে আলোকেরে। উষসার আলোয় উজ্জ্বল
সেই কান্না মনে পড়ে হেরি' তব নয়নের জল।
যদি চোখে জল আসে, ভেঙ্গে যায় সোণার স্বপন
তেমনি কাঁদিও তুমি, মুছিও না অঞ্চলে নয়ন।

---

* আহরণী:—২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগচী এণ্ড সন্স হইতে শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী এম্, এ ক প্রকাশিত। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। মূল্য দুই টাকা।

জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি

[শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব]

জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি বর্ত্তমান যুগের ইংরাজ সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। ইংরাজ লেখককে নোবেল পুরস্কার দেবার কথা তুল্‌লে আমাদের তিনজনের নাম মনে পড়ে—হল্ কেন্, জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ও এইচ, জি, ওয়েল্‌স্। তিনজনেই চিন্তাশীল—এঁদের মধ্যে গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি আবার একাধারে নাট্যকার এবং উপন্যাস-লেখক। এখন এঁর বয়স হবে প্রায় ৬৩ বছর। নাটক লেখ্‌বার বহুপূর্ব্বে তিনি প্রথমে কতকগুলি গল্প উপন্যাস লেখেন এবং ১৯০০ চার ভাগে গ্রন্থাবলী আকারে সেগুলি জন সিন্‌জন্ ছদ্মনাম গ্রহণ ক'রে প্রকাশ করেন। এখনকার তুলনায় সেকালের জন সিন্‌জনের লেখা নেহাত্ তুচ্ছ এবং পাঠকসমাজেও সে বইগুলির কিছুমাত্র আদর হয়নি। এর মধ্যে ভিলা রুবেন (Villa Rubein) নামে উপন্যাসে প্রথম আভাস পাওয়া যায় যেটা তাঁর সব্ গ্রন্থেই বক্তব্য,—মানুষের আত্মিকতার সঙ্গে সমাজের প্রাণহীন দ্বন্দ্ব।

তারপর উপন্যাস ছেড়ে তিনি নাটকরচনায় মনোনিবেশ কর্‌লেন। বহু নাটক লিখেছেন, উপন্যাসও লিখেছেন পরে অনেক। এ প্রবন্ধে তাঁর নাটকের কথাই আলোচনা কর্‌বো। গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির যে-কোনো নাটক পড়্‌লেই দেখা যায় প্রতিদিনের সাধারণ, সামান্য ঘটনাই হচ্ছে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু বা প্লট। সেইজন্য তাঁর লেখা সমস্ত নাটকেই বাস্তবতার এমন একটা আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করেছে যা কোনো লেখকের লেখাতেই দৃষ্ট হয় না।

তাঁর চরিত্রগুলি সবই হচ্ছে সাধরণ মানুষ, কেউ ক্ষণিকের মোহে চুরি ক'রে চিরকালের জন্য চোরই রয়ে গেল, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পার্লামেন্টের সভ্য, শ্রমিক বা ব্যবসাদার, ধোপানী বা সৈনিকের স্ত্রী—এই সমস্ত সাধারণ জীবনের নিত্যকার ঘটনাবলী নিয়েই তিনি তাঁর নাটক-উপন্যাস রচনা করেছেন।

"রূপার বাক্স" [The Silver Box] বলে' নাটকখানা লেখা হয়েছে চুরির কথা নিয়ে। একজন লম্পট যুবক তার রক্ষিতার সঙ্গে মদের ঝোঁকে ঝগড়া কর্‌লে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য তার হাতব্যাগ ও টাকাকড়ি চুরি কর্‌লে। এদিকে একজন মজুর, বেচারী খেতে পায় না, চাকরী গেছে, পেটের দায়ে চুরি কর্‌লে একটি রূপার চুরুটের বাক্স। দুজনেই চোর, যথার্থ দোষের বিচার করতে গেলে লম্পট লোকটারই দোষ বেশী, কিন্তু তার অবস্থা ভালো বলে আদালতের বিচারে সে চেষ্টাচরিত্র ক'রে মুক্তিলাভ করলে আর যে-বেচারী পেটের দায়ে এ-কাজ করলে তারই সাজা হ'ল।

'আনন্দ' [Joy] নামে নাটকখানিতে দেখা যায় একজন স্ত্রীলোক তার বিবাহিত জীবনে সুখী হ'তে পার্‌লে না, অবশেষে সে আরেকজনের সঙ্গে প্রেমে পড়্‌লে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির যে মেয়ে ছিল সে মাকে কিছুতেই বিবাহচ্ছেদ কর্‌তে দিলে না। মেয়ের মুখ চেয়ে সে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিলে কিন্তু সেই মেয়েই যখন চলে গেল তার প্রেমিকের সঙ্গে, তখন সে একবারের জন্য মার কথা ভেবে দেখ্‌লে না।

"ধর্ম্মঘট" [Strike] নাটকে দেখান হ'য়েছে খালি ধনিক আর শ্রমিকের একগুঁয়েমীর ফল হচ্ছে ধর্ম্মঘট। আর

এর জন্য অশেষ কষ্টভোগ করতে হয় শ্রমিকদের আর ধনিকেরও লোকসান কম হয় না। শেষপর্য্যন্ত দুদলই একটা মাঝামাঝি রাস্তায় এসে মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় কিন্তু গোড়াতেই কেউই কিছুতে রাজী হ'বে না।

"বিচার [Justice] নামে নাটকখানিতে শাসনযন্ত্রের মনুষ্যত্বহীন ব্যবস্থার কথা দেখানো হয়েছে। দুর্ব্বলচিত্ত একজন লোক নিমেষের ভুলে একটা অন্যায় করে ফেলেছে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে পড়ে। কিন্তু শাসনযন্ত্র, সে তো মানুষকে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিচার করবে না, সে দেখবে খালি আইনের ঘোরপ্যাঁচ। ফলে লোকটির কঠিন শাস্তি হ'ল। শাসনযন্ত্র তিক্ত ক'রে দিলে তার জীবনটাকে। অবশেষে সে বেচারা আত্মহত্যা করলে।

"জ্যেষ্ঠপুত্র"এ [The Eldest Son] দেখান হয়েছে একজন লোকের ভণ্ডামী। সে লোকটির একজন কর্ম্মচারী একটি মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে তাকে অকূলে ভাসিয়ে দেয়। তখন সে ভদ্রলোক বাধ্য করলে কর্ম্মচারীটিকে বিয়ে করতেও এই মেয়েটিকে। কিন্তু আবার নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র যখন ঠিক ঐরকমই একটি কায করলে, ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজী, তখন কর্ত্তা ধর্ম্মের কথা ভুলে সমাজের, বংশের মুখ চেয়ে ছেলেকে এ-বিয়ে করতে দিলে না।

এমনিধারা সাধারণ লোকের জীবনের নিত্যকার ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে তিনি লিখে চলেছেন নাটকের পর নাটক, উপন্যাসের পর উপন্যাস, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে—সমাজের ভণ্ডামী, বিচারের প্রহসন প্রভৃতি।

চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে এবং সাধারণ মানুষের চরিত্র নিয়ে লেখার দিক দিয়ে বার্ণাড্ শ আর গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিকে তুলনা করা যায় কিন্তু এঁদের মধ্যে পার্থক্যও আছে খুব বেশী। চরিত্রগুলি সাধারণ হ'লেও বার্ণাড্ শ ফুটিয়ে তোলেন সাধারণতঃ একটা অ-সাধারণ ব্যাপার যেটা প্রাত্যহিক জীবনে সচরাচর চোখে পড়ে না। গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি অসাধারণের ধার দিয়েও যান না, এমন কি ইবসেনের মত মনস্তত্ত্বের কথা নিয়েও নাড়াচাড়া করেন না। ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু মাত্র বলেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ছবি এমনভাবে গুছিয়ে দিয়ে যান যাতে ঠিক প্লট তিনি যেরকম চান—সেই রকম ভাবেই অগ্রসর হয়

তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের জীবনের দুঃখকাহিনীটাই ফুটে ওঠে বেশী, সুখের দিকটা যেন পর্দ্দার আড়ালেই থেকে যায়, কখনো কদাচ দুটো একটা তুলির টানে তিনি ছোট একটা ছবি ফুটিয়ে তুলে সেদিকে আর লক্ষ্য না ক'রে চলে যান।

"আনন্দ"এ প্রেমিক প্রেমিকা সমস্ত জগৎ ভুলে নিজেদের ঘিরে যে সুখের জাল বুনলে সেইই কি চিরস্থায়ী হবে? কিছুদিন পরেই সে-কথা তারা ভুলে যাবে, অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে এই দুটি নরনারী, খালি চিরন্তন আইন অনুযায়ী দু'জনে দু'জনকে মাত্র সহ্য ক'রে চলবে কিন্তু তার বেশী নয়। হয় তো কখনো দূর অতীতের মধুর স্মৃতি মনের কোণে উঁকি মেরে তাদের দুজনের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আবার মিলিয়ে যাবে অতীতের গর্ভে।

'পায়রা' নামে নাটকখানির আরম্ভ ভারী সুন্দর, হাস্যরসেরও উপাদান আছে কিছু—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত করুণ দৃশ্যের ছাপই রেখে যায় মনের উপরে। তাঁর যে-কোনো নাটক পড়লেই দেখা যায় আশা আনন্দের বাণী নেই, আছে শুধু মানুষের জীবনের একটানা করুণ কাহিনী। তা' বলে কিন্তু গাল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি 'Cynic' নন। তিনি যাদের এঁকেছেন সকলেই রক্তমাংসে গড়া মানুষ, সকলেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তিনি বলতে চান যে মানুষের এই যে দুঃখ এ-হচ্ছে মানুষের নিজের হাতে তৈরী। সমাজ এর জন্য খুব বেশী দায়ী। আর যে-সব লোক তাঁর নাটকে বা উপন্যাসে দুঃখ-ভোগ করছে সকলই দুর্ব্বলচিত্ত লোক। তারা কেউই বীর নয়, শেষ পর্য্যন্ত কেউ লড়ছে না। অল্পেই সবাই ভেঙে পড়ছে দুর্ভাগ্যের নাড়ায়। তাঁর মতে মানুষের এই যে সব দৈনন্দিন দুঃখদুর্দ্দশা এ সমাজ দূর করতে পারে, তবে স্পষ্ট এ-সব তিনি বলেন না, মাত্র ইঙ্গিতে করে যান। তিনি খালি সমস্যাগুলোকে এনে লোকের সামনে তার নাটকের মধ্যে দিয়ে ধরেছেন। সমাধানের কথা তিনি খালি এই পর্য্যন্ত বলেন যে কঠিন নিগড়ের ব্যবস্থা করলে কোনো দিক দিয়েই কিছু সুবিধা হ'বে না; ভালবেসে, সহানুভূতি দেখিয়ে যদি সমাজ চলে, আইনআদালত চলে তবেই মানুষ সুখী হ'তে পারে।

Printed and Published by Sabitri Prasanna Chatterji at the UPASANA PRESS,
14-A, Sarat Ghose Street, Entally, Calcutta.

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আপনাদেরই অনুগ্রহে আগামী বৈশাখ সংখ্যায় উপাসনা ২৪শ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। আপনাদের প্রিয় লেখকগণ এবারও উপাসনার উপচার সাজাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা সম্ভারে উপাসনাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিবার আয়োজন হইয়াছে; অধিকন্তু সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা প্রতি সংখ্যার উপাসনাকে ঋদ্ধ করিবে। বাঙলা সাহিত্যে গঠনমূলক সমালোচনা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য—ভবিষ্যতে আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা হইবে, সেই অভাব দূর করার।

চৈত্র সংখ্যায় যাঁহাদের গ্রাহক-মূল্য শেষ হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা বৈশাখের মধ্যেই তাঁহাদের গ্রাহক মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গ্রাহক মূল্য না পাওয়া যাইবে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হইবে—ভিঃ পিঃ গ্রহণে যাহাদের অনিচ্ছা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে জানাইলে আমরা উপকৃত হইবে।

বিনীত— **কর্ম্মকর্ত্তা**

কবির এ কল্পনা তখনই মূর্তি
পরিগ্রহ করে যখন প্রত্যেক
নর-নারীর প্রধান অবলম্বন
—হয়—
তরুণ অরুণ সম স্বর্ণাভ রাগ-
রঞ্জিত এবং মন-বিমোহন
মৃদু-মন্দ গন্ধবহ
কেশের পতন ও অকাল পক্কতা এবং মা
খুস্কি ও মরামাস নিবারণ করে। মাথ
ধরা, মাথা ঘোরা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস
প্রভৃতি নিরাময় করে।
সংসারী লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী
সকল বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।
কলিকাতা।
Kshitindranath Tagore
Collection